সাধনা বিউটি ক্রীম

শুধু আপনার ত্বকের যত্ন নেয় না, তাকে লাবণ্যময় করে

সৌন্দর্য বিকশিত হয় ত্বকের পরিচর্যায়। সাধনা বিউটি ক্রীম মেয়েদের এক সৌন্দর্যের গোপন রহস্য।

ত্বক কুসুম-কোমল, পাপড়ি-পেলব যৌবন-সুলভ ও লাবণ্যময় করে শীতের প্রকোপ থেকে ত্বককে রক্ষা করে ও সতেজ রাখে।

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

পোড়া ---- কাটা ---- পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

ডাক্তার কাছে
জানুন

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস

OBL

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
পৌষ ১৩৭৪, DECEMBER, 1967
ত্রয়োবিংশতি বর্ষ—৭ম সংখ্যা

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক কল্যাণ রায়

নতুন বাক্সে

আপনার বহুকালের প্রিয়

ভৃঙ্গল

সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদমতে তৈরী
সুরভিত মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল

দ্বিবিধ গুণসম্পন্ন ভৃঙ্গল

- *মাথা ঠাণ্ডা রাখে*
- *স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্দ্ধনে সাহায্য করে*

ছোট শিশির জন্যই আপাততঃ এই নতুন বাক্স। ছোট ও বড় দু'রকম শিশিতেই এখনও পুরানো লেবেল চলবে। পরে আসবে নতুন লেবেল। চিঠি লিখলে ভৃঙ্গল-এর বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা পাঠান হয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

CC-18-67

দীপ্তি

আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

'দীপ্তি' মার্কা এনামেলের বাসন—অল্প দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিমিটেড

৬৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দীপ্তি লণ্ঠন

খাস জনতা

এনামেলের বাসন

Kalpana on Zia

প্রধান বিচারপতির রায়

আমাদের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত কণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন : "যিনি যাহাই বলুন, ইংরেজী আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। উহা শিখিবার সহায়ক এমন একটি উৎকৃষ্ট অভিধানগ্রন্থ প্রথম শিক্ষার্থীদের হাতে তুলিয়া দিলেন বলিয়া আমি শ্রীযুক্ত দাসকে অভিনন্দন জানাইতেছি।"

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রকাশিত

"COMMON WORDS"

—নামক ছেলেমেয়েদের জন্য সংকলিত অভিনব
সচিত্র ইংরেজী-বাংলা অভিধান সম্বন্ধেই তাঁহার উল্লিখিত রায়।

॥ পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ মূল্য মাত্র দুই টাকা ॥

আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য এই অভিধান অপরিহার্য

॥ নিকটবর্তী বইয়ের দোকানে খোঁজ করুন ॥

জেনারেল বুক্স্ এ-৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং-এ বই পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন—অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২১৪

॥ স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত ॥

আমার জীবনকথা	মূল্য : আট টাকা	মরণের পারে	মূল্য : ছয় টাকা
যোগশিক্ষা	দুই টাকা পঞ্চাশ প:	পুনর্জন্মবাদ	মূল্য : তিন টাকা
ভারতীয় সংস্কৃতি (O.P.)	মূল্য : ছয় টাকা	শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম	মূল্য : চার টাকা
কর্মবিজ্ঞান	মূল্য : দুই টাকা	মনের বিচিত্র রূপ	মূল্য : তিন টাকা
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	মূল্য : দুই টাকা	আত্মজ্ঞান (যন্ত্রস্থ)	
আত্মবিকাশ	মূল্য : দুই টাকা	স্বামী বিবেকানন্দ	মূল্য : ৫০ পয়সা
স্তোত্র-রত্নাকর	মূল্য : তিন টাকা	হিন্দুনারী	তিন টাকা পঞ্চাশ প:
কাশ্মীর ও তিব্বতে	মূল্য : আট টাকা	অর্চনা	মূল্য : কুড়ি পয়সা
অভেদানন্দের বিজ্ঞান দৃষ্টি (যন্ত্রস্থ)		পত্র সংকলন (যন্ত্রস্থ)	
অভিভাষণ	মূল্য : ২৫ পয়সা		

ENGLISH PUBLICATION

By Swami Avedananda

Memoirs of Ram Krishna	...	Rs. 10·00
Mystry of Death	...	Rs. 12·00
Life Beyond Death	...	Re. 10·00
India And Her People	...	Rs. 8·00
True Psychology	...	Rs. 12·00
Science of Psychic Phenomena	...	Rs. 6·00
Doctrine of Karma	...	Rs. 5·00
Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta (New Book) Published in July 1967	...	Rs. 8·00

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ইনি স্কুলের একজন শিক্ষক। দেশ ও জাতির প্রতি অনলস সেবার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কার বা এই সম্মানই অবশ্য তাঁর আনন্দের উৎস নয়। তিনি বলেন, "আমার সন্তানরা তাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে আর সেই জন্যই আমি সুখী। আমার দুটি মেয়ে। একটি মেয়ে কলেজের লেকচারার হয়েছে অন্যটি ডাক্তারি পড়ছে। ছেলেমেয়ে কম হওয়াই

ভালো কারণ তাতে ছেলেমেয়েদের যেমন উপযুক্তভাবে মানুষ করা যায় তেমনি নিজেদের ও দুর্ভাবনা কম থাকে। আমি সেজন্যই সুখী।"

ইনি সুখী।

আপনি?

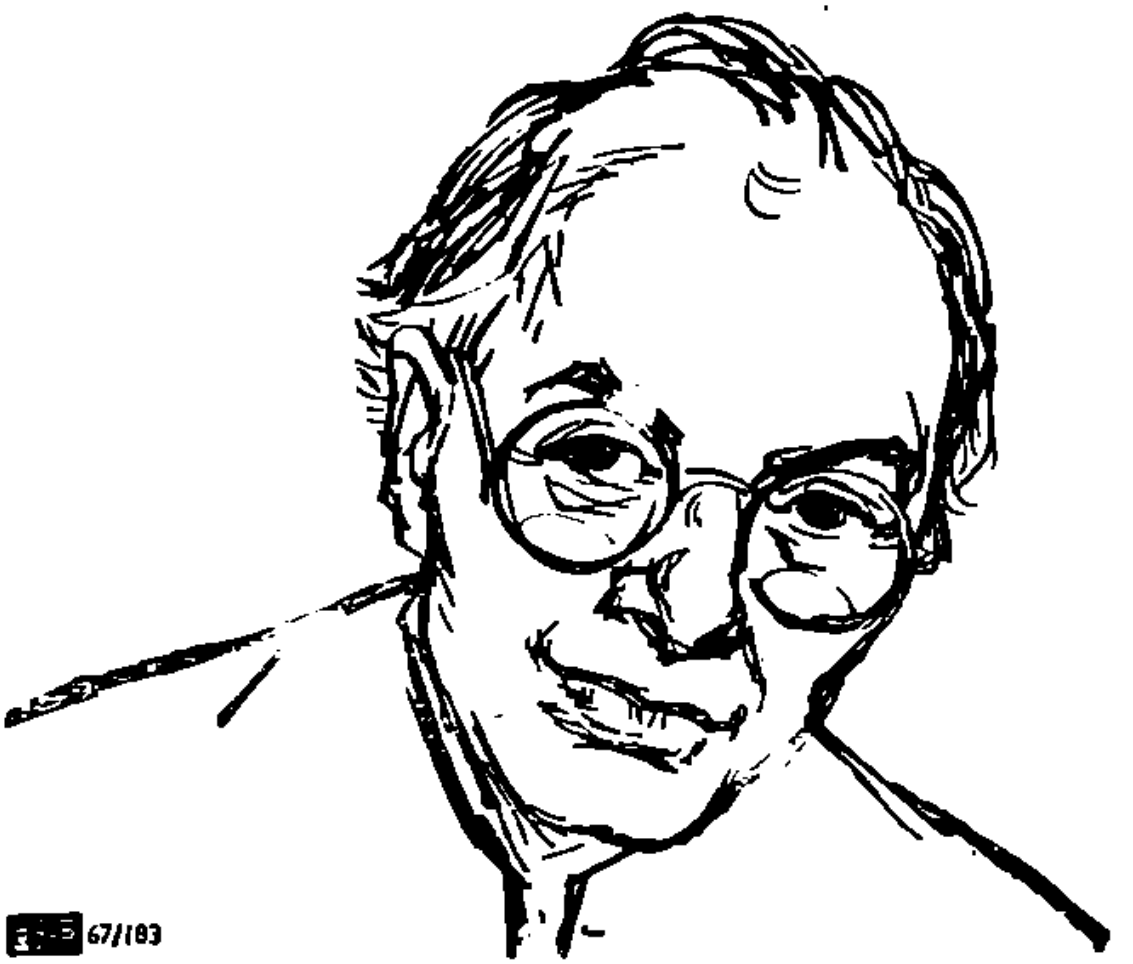

অমৃতবাজার পত্রিকা

সত্যিই অমৃত

—মহাত্মা গান্ধী

১৯৪৭ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা যখন সাম্প্রদায়িক মত্ততার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল মহাত্মা গান্ধী তখন বলেছিলেন—"অমৃতবাজার পত্রিকা সত্যিই অমৃত।"
জাতির জনকের কাছ থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার এ এক বিরাট পুরস্কার।
জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ অমৃতবাজার পত্রিকা যখন নির্ভীকভাবে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিল পত্রিকার অন্যতম বিশিষ্ট পাঠক মহামতি লেনিন তখন অমৃতবাজারে সেই সংবাদ পাঠ করে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি জানাবার জন্যে নির্দেশ দিলে উত্তর ভারতের বলশেভিক ব্যুরোর চীফ এজেন্ট আলেক্সিয়েভ যে পত্র দিয়েছিলেন নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল :
"মঁসিয়ে লেনিন আপনার বিখ্যাত কাগজে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী বিবরণ পড়েছেন এবং তিনি আমাকে ভারতবর্ষের জনগণকে জানাতে বলেছেন যে, সোভিয়েত সরকার তাঁদের ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল। যেহেতু আপনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় পত্রিকাটি সম্পাদনা করছেন, তাই আমি আপনাকে এই চিঠি পাঠাতে প্রয়াসী হয়েছি।"
মহামতি লেনিন কর্তৃক অমৃতবাজার পত্রিকাকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় পত্রিকার গৌরবদান মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাণী ও অন্যান্য বহু মানব-দরদী নেতার আন্তরিক শুভেচ্ছা, দেশবাসীর অকৃপণ সমর্থন আর ভালোবাসার জোরে অমৃতবাজার পত্রিকা দেশের সেবায় সমস্ত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হতে পেরেছে। সেই অকৃপণ সমর্থন ও ভালোবাসার জোরেই সে এক সামান্য আরম্ভ থেকে আজ ভারতের অন্যতম জাতীয় দৈনিকে পরিণত হয়েছে।
শতবর্ষ পূর্তির দ্বারপ্রান্তে যে মঙ্গলঘট সাজানো হয়েছে জনগণের অন্তরনিঃসৃত প্রীতি ধারাতেই তা পরিপূর্ণ হোক।

শতবর্ষ পূর্তির গৌরবে অমৃতবাজার পত্রিকা

১৯৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী জাতির সেবায় অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্ণ হবে। অন্যায়, অপমান ও অত্যাচার যখন ছিল ভারতবাসীর ভাগ্যলেখা, দেশবাসীর অসহায় দীর্ঘশ্বাসে যখন আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত ঠিক সেই সময়ে তাদের দুঃখ ও বেদনাকে ভাষা দেবার জন্যে এবং তাদের ন্যায্য দাবী তুলে ধরার জন্যে জন্ম হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকার ১৮৬৮ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারী যশোহরের এক দূর গ্রামে বাংলা সাপ্তাহিক হিসাবে।
অমৃতবাজার পত্রিকার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীনতার আগে বহু বাধা-বিপত্তি আর পীড়নমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। কিন্তু পত্রিকা নির্ভীকভাবে জাতির প্রতি তার সুমহান দায়িত্ব পালন করে এসেছে।
অমৃতবাজার পত্রিকা সব সময়েই স্বাধীনতা গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে সংগ্রাম করেছে এবং কখনও কোনো অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতার সঙ্গে কোনো রকম আপোষ করেনি। আজও তার সে নীতি অম্লান রয়েছে।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

জেনারেলের গ্রন্থরত্ন

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত ঐতিহাসিক
'ভারততত্ত্ব-ভাস্কর'
আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের
বাংলাদেশের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড—প্রাচীন যুগ ১০·০০
দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্য যুগ ২০·০০
অসংখ্য দুর্লভ চিত্রসম্বলিত বাংলাদেশের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য ইতিহাস

আজীবন জ্ঞানসাধক
'বিদ্যাবাচস্পতি'
ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাকের
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র
প্রথম খণ্ড—৫১৬ পৃঃ ১৫·০০
দ্বিতীয় খণ্ড—৫৫০ পৃঃ ১১·০০
সংস্কৃত মূলসহ প্রাঞ্জল অনুবাদ, প্রাচীন
ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-
বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

'বিদ্যাবাচস্পতি' ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের অনুবাদ

কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর
পালরাজত্বের শেষ যুগের ইতিহাস
রামচরিত ৫·০০

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে অন্ধ্র দেশের
নরপতি হালের
গাথাসপ্তশতী ১০·০০

জেনারেল বুকস্
এ-৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল, অক্ষুধা

কোন টী থেকে ভুগছেন ?

আমাদের

ভাস্কর লবণ

খেলে নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।

যাঁরাই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন,
অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে

নিম এর উপকারিতা

হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে হিতকর বহুযুগ পরীক্ষিত মহোপকারী **নিম**-এর মৃদু অথচ সক্রিয় উপাদান-গুলি **নিম** টুথ পেস্ট-এ আছে। তাছাড়া **নিম** টুথ পেস্ট-এ রয়েছে 'ফ্লুরাইড' এবং আধুনিক দন্ত বিজ্ঞান সম্মত অন্যান্য উপাদান। **নিম** টুথ পেস্ট-এর হিতকর ফেনা মাড়ী সবল করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁতের ক্ষয় ও পায়োরিয়া নিবারণে সাহায্য করে ও দাঁত ঝকঝকে করে।

নিম টুথ পেস্ট-এর সর্বগুণ সমন্বিত মার্গোক্রিস টুথ পাউডারও পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কর্তৃক প্রস্তুত

CNF-18-67

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৩৪৩
উদাত্ত আহ্বান		৩৪৭
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)		৩৪৯
ভাববার কথা	—সদানন্দ	৩৪৮
বন্যা কন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩৫৩
স্বামী অভেদানন্দ		
স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রপথিক সংগ্রামী স্বামী অভেদানন্দ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৬৩
নবীন বাংলার আদর্শ স্বামী অভেদানন্দ		৩৬৫

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

ভেষ্ট • বেনিয়ন • বেসরী • লাভলি • পাইওনীয়ার ফুল • হাফ হাই • 'সিক্সার হাই' • 'হাইটেক্স' • সিক্সটি • স্পোর্ট মাস্টার • ইন্টারলক • ইন-টেক্স • 'পাইওটেক্স' ও জনতা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রাণ্ড-এর পাওয়া যায়।

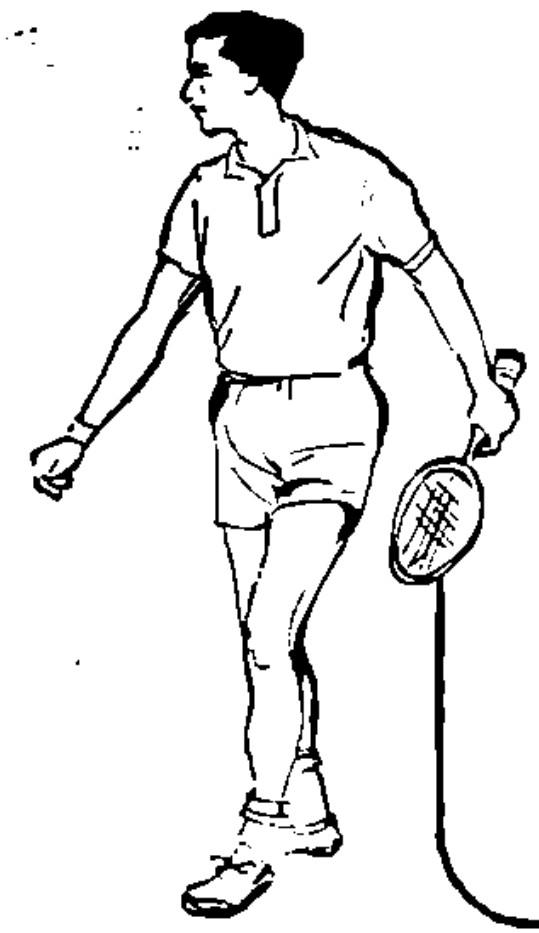

* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেনিস সার্ট • ভেষ সার্ট • ড্রয়ার ও ব্রীফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধৌত ও প্রস্তুত।

ফোন: ৪৬-২৯৮৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

এই সংখ্যায়

আলোর সাধক অভেদানন্দ	—সুনীলকুমার বোস	৩৬৮
স্বামী অভেদানন্দের রাশিচক্র বিচার		৩৭১
দেবী দুর্গা	—স্বামী অভেদানন্দ	৩৭৩
স্বামী অভেদানন্দ—দিব্য জীবনের খণ্ডচিত্র		৩৭৪
স্বামী অভেদানন্দের জীবনের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা		৩৭৭
স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশের গুপ্ত সমিতির অবদান	—মনোরঞ্জন গুপ্ত	৩৭৯

Sulekha
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32
ardeeyar

এই সংখ্যায়

বন্দী-বিধাতা (উপন্যাস)	—প্রভাত মুখোপাধ্যায়	৩৮৯
পুরাতন পাতা		
কলিকাতার আদি কাণ্ড	—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৪১৬
যুগান্তর (গল্প)	—বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২১
মন্থর প্রহর „	—নারায়ণ চক্রবর্তী	৪২৫
প্রেম নামক অভিজ্ঞতা „	—অশোক দত্ত	৪৩৩
নার্সিং হোম (রস-রচনা)	—গোরাচাঁদ নন্দী	৪৩৬
মৃত্যুর স্বাদ (গল্প)	—অনিলকুমার ভট্টাচার্য	৪৪৭
ধর্মঠাকুরের কাহিনী	—অমলেন্দু মিত্র	৪৪৮

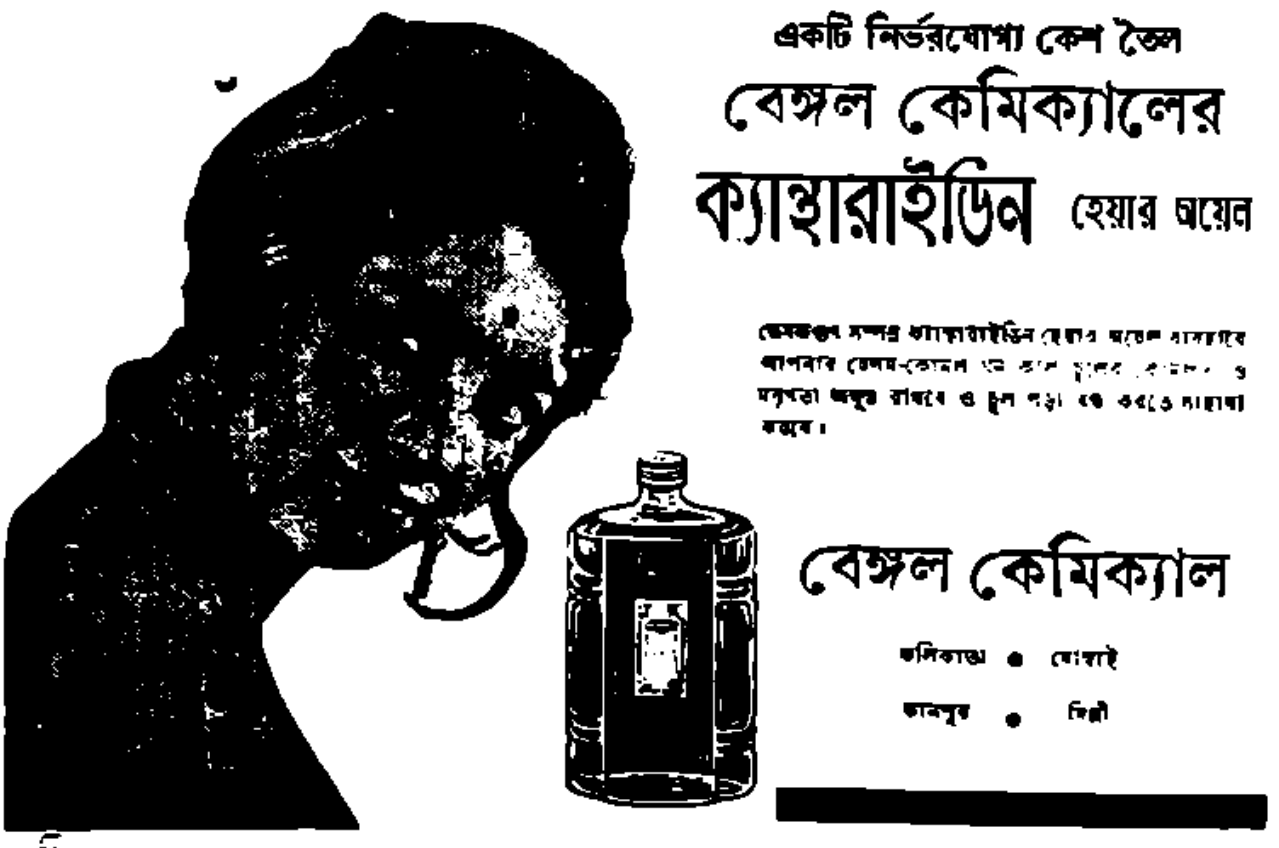

NRM

THE HOUSE OF NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS IN INDIA

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED AUTOMOBILE TYRE COMPANY

Inchek Tyres Limited

উত্তরণ জীবন যাপনের [illegible]

ঘরের দিনগুলি লাইট লাগান আর রাত্রি আসলে এমন আপনার মুখের অন্ধকার অবিলম্বে দূর করে ফেলুন। অন্ধকার দিনগুলি লাইট-এ চোখে ধোরে পড়ে না। অন্ধকার লাগান আর আপনার সমস্যার সমাধান করে আপনাকে চোখ-ধাঁধানো দিন যে দেবে আমাদের তার ওরস্ত সাহায্য করুন।

GEC

Osram

একটি আশ্চর্য ল্যাম্প

GEC আপনার গ্যারান্টি

এই সংখ্যায়

নাট মঞ্চ	—রত্নাকর	৪৫২
চলতি দুনিয়া		৪৬০
ব্যাপার যা চলছে	—চক্রপাণি	৪৬৪
মেয়ে মজলিশ		
বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থায় মেয়েরা	—বেলা দে	৪৬৬
পৌষ পার্বণ	—উষা ভট্টাচার্য	৪৭১
শীতের দিনে ছ'টি খাবার	—মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়	৪৭১
অঙ্গনা সংবাদ	—দেবযানী	৪৭১
খেলাধূলা	—শ্রীজ্যোতির্ময়	৪৭৭

আমার কী সিগারেট চাই আমি জানি

সেরা তামাকের স্বাদ আর সত্যিকারের আমেজ

"কখনোই বুঝি সিগারেটের এত সিগারেট ৮ খাঁটি তামাকের স্বাদ, চমৎকার আরামের মজা— উইলস প্লেনই আমার পছন্দ। যেখানে যেখানে—সাথে মজা মন ভরানো। প্রতিটি টান চমৎকার, কেমন যে একটা ধরিয়ে।"

৮০ পয়সায় ১০টি

উইলস প্লেন

—প্লেন সিগারেটের সেরা

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

সরকার তার নাম নয়, সরকার উপাধি।

নাম যশোদাজীবন সরকার।

কিন্তু যশোদাজীবন নামটা লোকে ভুলেই গিয়েছিল। সরকার বলে ডাকে সবাই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

'দেশ' কোথায় জিজ্ঞাসা করলে বলে, দেশ আর কোথায় মশাই, দেশ-টেশ্ নেই।

—সে কি কথা, দেশ নেই কি বলছেন?

সরকার বলে, ছিল মশাই পূর্ববঙ্গে, এখন আর সেটাকে তো দেশ বলতে পারি না!

—কেন পারেন না?

—কেমন করে পারব বলুন? বলতে বলতে সরকার বসলো। বসে বললে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবতাম দেশের কথা। পনেরো বছর আগে আমরা এসেছি সেখান থেকে। আসতে বাধ্য হয়েছি। সবাই আসিনি। ভাই, বোন, পিসি রইলো সেখানে। তা রইলো তো রইলো, আজও রইলো কালও রইলো। এখন আবার এমন করে পথে কাঁটা দিয়ে দিলে যে কারও সেখানে যাবারও তো নেই, আসবার তো নেই। কেউ যদি মরেও যায় তো আর দেখতে পাব না কেউ কাউকে।

চোখদুটো জলে ভরে এলো সরকারের।

ভাবলাম অন্যায় করেছি দেশের কথা জিজ্ঞাসা করে।

জামার হাতায় চোখদুটো মুছে সরকার বললে, আমরা কি মানুষের রাজত্বে বাস করছি বলতে চান? একটু থেমে কি যেন ভেবে সরকার আবার বললে,—কী এমন অপরাধ করেছি যার জন্যে এই শাস্তি? এ তো ভগবানের দেওয়া শাস্তি নয়, মানুষের দেওয়া শাস্তি। আপনি কি বলেন?

কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। কারণ সেকথার জবাব আমার জানা ছিল না।

ধর্মতলার ওপর একটি গলির মুখে সরকারের মোজা-গেঞ্জির দোকান। সেই দোকানের আয় থেকে তার-সংসার চলে। সংসারটি খুব ছোট নয়। ছেলেতে মেয়েতে আটটি। সরকার নিজেই বললে।

আবার হাসতে হাসতে এ-কথাও জানালে যে, আবার একটি আসছে।

বললে, সেইজন্যেই তো 'বেবি-ফুডে'র সন্ধানে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি। আজকাল তো 'বেবি ফুড' চট্ করে পাওয়া যায় না। আগে থেকে জোগাড় করে রাখা ভাল—না কি বলেন? আমি আবার ধর্মভীরু মানুষ, ব্ল্যাকে কিনতে পারিনা।

বললাম, বেবি ফুড খাওয়ানো ভাল নয়। গরুর দুধ খাওয়াবেন, মানুষ মায়ের দুধ খাওয়াবেন।

সরকার বললে, মায়ের দুধ থাকলে তো খাওয়াবো! কোলে একটা রয়েছে যে বছরখানেকের। ডাক্তার বলেছে, দুটোতে যদি মায়ের দুধ টানে তো স্ত্রী আপনার মারা যাবেন।

জ্ঞানপাপী এই মানুষটি দেখছি জানে সবই! আটটি আছে, আর-একটি আসছে,—এই ন'টি সন্তানের জনককে বললাম, এদিক দিয়ে অনেক আগেই আপনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

—আপনি কি বলতে চান আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি বলবেন- জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বলবেন দেশে খাদ্যাভাব। ও-সব কথা কাগজে পড়েছি। ভেবেও দেখেছি। কেউ বলেছে অপারেশন করাতে কেউ বলেছে 'সুপ্' নিতে। কিন্তু আপনি তো জানেন আমি ধর্মভীরু মানুষ, ও-সবের মধ্যে আমি নেই।

বললাম, এতে ধর্মকে টানছেন কেন? এতে ধর্মের কি আছে?

সরকার বললে, আছে বই কি। যে আসছে তাকে তো ভগবান পাঠাচ্ছেন। তাকে আসতে না দেওয়া আর মেরে ফেলা একই কথা।

সুতরাং এই ধর্মভীরু লোকটিকে কিছু বুঝাতে যাওয়া বৃথা। বললাম, আপনি ঠিকই করেছেন। আসুন। নমস্কার।

সরকারকে সেদিন বিদায় করে দিয়ে ভেবেছিলাম নিষ্কৃতি পেলাম।

কিন্তু নিষ্কৃতি সে আমাকে দিলে না।

আবার একদিন এলো। এসেই বললে, এই সময় কেউ নেই আপনার কাছে চুপিচুপি একটা কথা বলি।

বললাম, বলুন।

সরকার বললে, জিনিসপত্রের দাম যেরকম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে—আমার ওই দোকানের আয় থেকে 'বিরাট' সংসার ম্যানেজ করা একটু মুস্কিল হয়ে পড়ছে।

বললাম, সংসারটিকে বৃহৎ তো আপনিই করেছেন।

সরকার জোর গলায় প্রতিবাদ করলে। বললে, আজ্ঞে না, আমি করিনি, ভগবান করেছেন।

বললাম, তাহলে সেই ভগবানকেই বলুন। প্রতিকারের উপায়টা তিনিই বাৎলে দেবেন।

সরকার বললে, ঠিক বলেছেন। আর সেইজন্যেই এলাম আপনার কাছে।

এই বলে সরকার তার চেয়ারটিকে টেনে টেনে নিয়ে এলো আমার কাছে। বললে, আমি ধর্মভীরু মানুষ তা তো আপনি জানেন।

—জানি।

সরকার বললে, আমাদের তো অনেক দেবতা, কাকে ডাকি বলতে পারেন?

কঠিন প্রশ্ন। জবাব দিতে পারলাম না। বললাম, আপনার যাকে খুশী।

সরকারের মুখ দেখে মনে হলো আমার মন্তব্যে সে খুশী হতে পারেনি। বললে, না। এক দেবতাকে

ডাকলে আর-এক দেবতা রাগ করতে পারে। ধরুন কেষ্ট-ঠাকুরকে ডাকলাম, কালী-ঠাকুর রাগ করে বসলো। আবার কালীকে ডাকলাম, দুর্গা রাগ করলে। এই জন্যেই আমাদের এত কষ্ট। তার চেয়ে সাহেবদের দেখুন—কিরকম সুখে আছে ওরা। একটি দেবতা তো! যীশু খ্রীষ্ট। একজনকে ডাকলেই ল্যাঠা চুকে গেল। রাগ্‌টাগ্‌ করবার কেউ নেই।

লোকটিকে তাড়াতাড়ি বিদায় করবার জন্যে বললাম, বেশ তাই যীশুখ্রীষ্টকেই ডাকুন।

—ঠিক বলেছেন। মনে-মনে ডাকবো—কেউ কিছু জানতেও পারবে না।

সরকার কি করবে না করবে ঠিক করেই ফেলেছিল। আমার কাছে এসেছিল শুধু সমর্থন আদায় করবার জন্যে।

তার পরেই সুরু হলো যুক্ত ফ্রন্টের আইন অমান্য আন্দোলন।

সরকারের দোকানটি ধর্মতলা অঞ্চলে, আর গোলমাল সুরু হয় সেইখানেই। রোজ দুটো বাজবার পরেই দোকানপাট বন্ধ করে সরকার বাড়ী চলে আসে।

বাড়ী ফিরেই সেদিন আমার কাছে চলে এলো।

এলো বোধকরি দুঃখের কথা বলতে।

—একে তো এমনিতেই হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছিলাম, তার ওপর দেখুন কিরকম ঝঞ্ঝাট বাড়লো একবেলায় কত আর বিক্রি হবে!

বললাম, কয়েকটা দিন একটু কষ্ট করুন। দুদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কয়েকটাদিন আর সবুর করতে হলো না।

সরকার সেদিন এসেই ছেলেমানুষের মতন কাঁদতে লাগলো।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে মশাই। আমার দোকানটা লুট হয়ে গেছে। সকালে দোকান খুলতে গিয়ে দেখি—কিছু নেই।

সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। বললাম, আপনি ধর্মভীরু মানুষ। ভগবান আপনাকে রক্ষা করবেন।

চীৎকার করে উঠলো সরকার। বললে, না। না—সব বোগাস্‌!

চরম দুঃখের দিনে সত্য কথাটি সরকার বোধকরি বুঝতে পেরেছে। বললে, নিজে রক্ষা করতে না পারলে কেউ রক্ষা করবে না।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

উদাত্ত আহ্বান

"আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্মকে অপমানিত করিব। আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পীকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর, সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না। আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না। একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কখনোই নহে। নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের দুই চারিদিনের এই ইস্কুলের মুখস্থ বিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষঃ কুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃ শনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গল দীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে সেইখানে আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" একবার স্বীকার করো যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা করো, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকাল-কুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।"

অন্তরীক্ষে

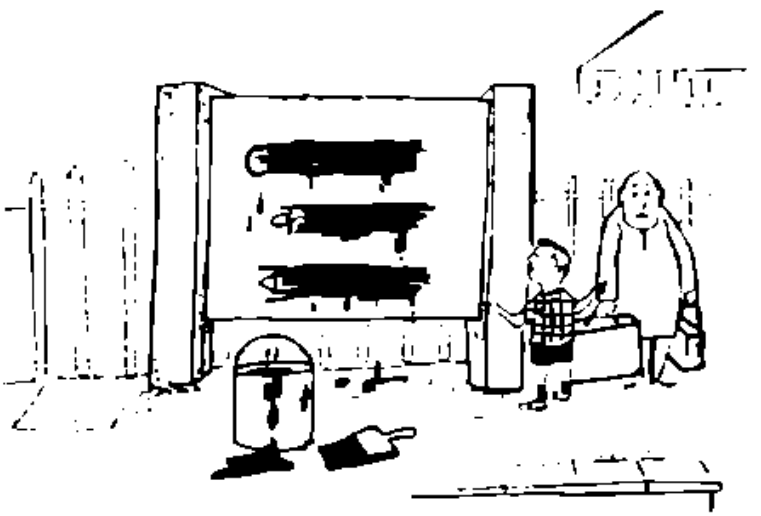

বাবা! এটা কোন স্টেশন! বলোনা!!

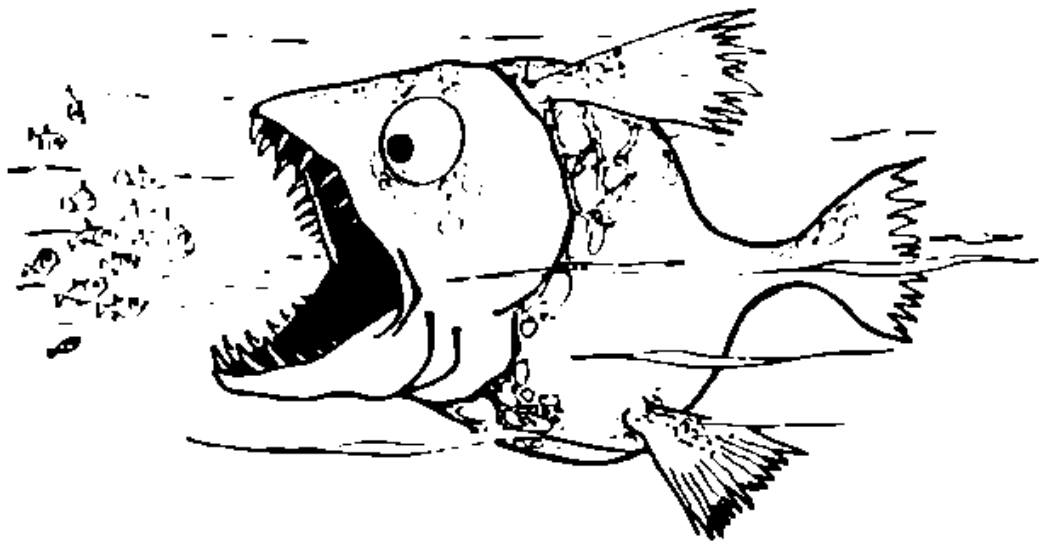

—মতবাদ

বহুভাষী সাবধান।

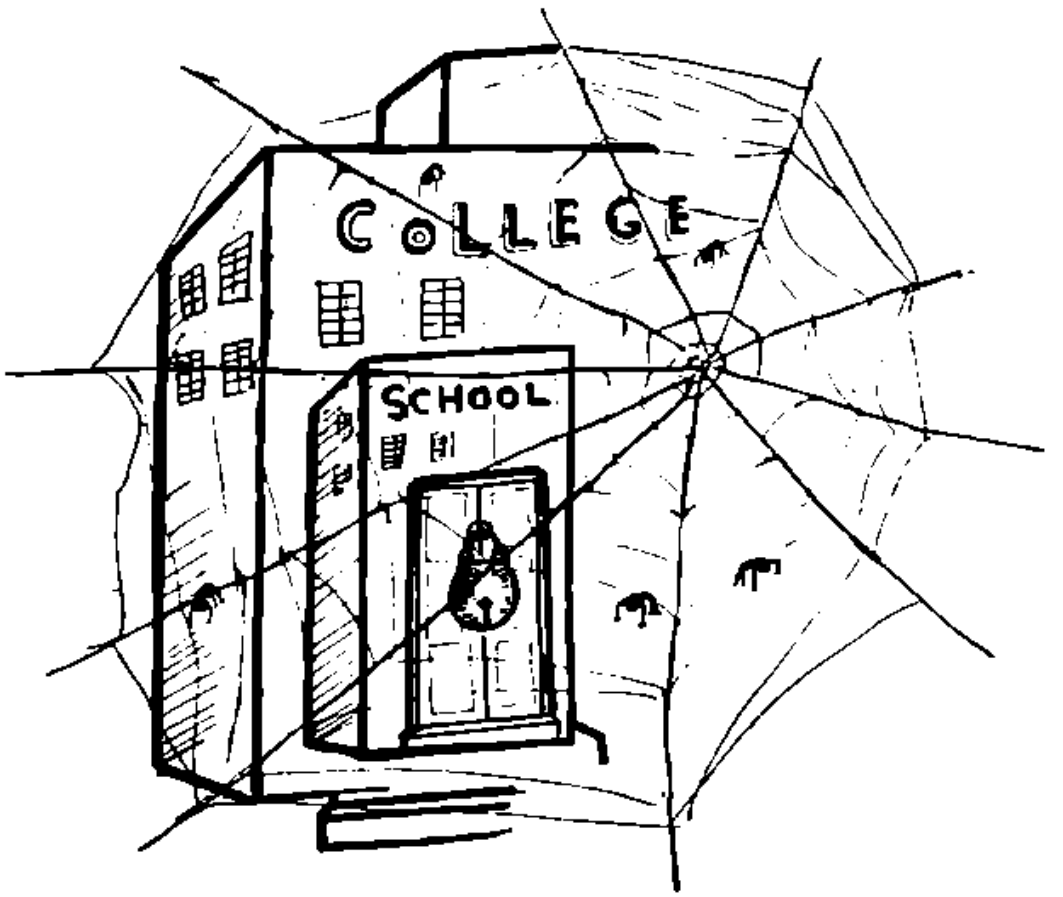

অন্তঃকিম ॥

ভাববার কথা

সদানন্দ

বহুদিন ধরে আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে একটা রঙীন আশার নেশা নিজেদের আত্ম-প্রবঞ্চিত করে রেখেছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার পর তাই সেই ফাঁকা আওয়াজ যখন সেই রঙীন নেশাকে নির্মমভাবে ভেঙে দিল, তখন তাদের ভেতরের চেহারা নগ্নভাবে ফুটে উঠলো। তখন দেখা গেল গত দুশো বছরের পরাধীনতার ফলে তাদের মনের মধ্যে বহুদিন ধরে জমে ছিল একটি আকাশ কুসুমের স্বপ্ন ও তার সঙ্গে এক নিদারুণ ক্লান্তি ও অবসন্নতা। কাজেই আকাশ কুসুম উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেখে গেল কেবল সেই নিদারুণ ক্লান্তি ও অবসন্নতা।

সুতরাং দেশের জনসাধারণ খুঁজতে সুরু করলে সব রকম হালকা ও সস্তা আত্মতৃপ্তির পথ। জীবন থেকে তাদের বিদায় নিল আদর্শ, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা; জীবনকে বৃহৎ করে মহৎ করে গড়ে তোলবার প্রেরণা। যা কিছু সিরিয়াস, যা কিছু মননধর্মী তা সবই সরে পড়লো একে একে। ফলে দাঁড়াল যে তাদের সৃজনধর্মী কোন শক্ত কাজেই আর মন বসতে চায় না। কোনকিছু গুরুত্বপূর্ণ তারা ভাবতেও পারে না। শক্ত কিছু চিন্তা করতে বা কোন শক্ত বিষয়ের মীমাংসা করতে বা কোন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতেও তারা পারে না। মনের এই যে নিদারুণ অক্ষমতা তার পরিণতি যা হলো তা তো আজ সকলের সামনেই সুস্পষ্ট। এই যে অক্ষমতা, এই যে চিন্তা-শক্তির অবক্ষয়, এই থেকে দেখা দিল চিন্তার দৈন্য—চিন্তা-রাজ্যে অরাজকতা। কাজেই কোন কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, কোন কিছু রক্ষা করাই আর সম্ভব হচ্ছে না আজকের মানুষের। বরং যা কিছু ছিল গৌরব করার, যা কিছু ছিল স্পর্ধা করার, তাও তলিয়ে যাচ্ছে।

এই দুরবস্থা থেকে, এই মানসিক অপমৃত্যু থেকে, যদি আমাদের বাঁচতে হয় তবে আমাদের মনের চেহারার আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

কি করে তা হবে এই প্রশ্নই আজ দেশশুদ্ধ চিন্তাশীল মানুষকে বিহ্বল করছে। কিন্তু এই অতি দুঃসাধ্য কাজ করতে পারে একমাত্র সাহিত্য। একদিন আমাদের দেশেই, সাহিত্য এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করে সারাদেশের মানুষকে বিপ্লবী করেছিল।

বাংলা-সাহিত্যের প্রাণধর্মে আজও যাঁদের আস্থা আছে, যাঁরা আজও বিশ্বাস করেন বাংলা-সাহিত্য জগতের অগ্রগতির রথের চাকা, যাঁরা এখনও বিশ্বাস করেন বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল বিশ্বমানুষের প্রয়োজনে, তাঁদের আজ সেই বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হতে হবে সব বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে প্রলোভন পরিত্যাগ করে। আজও বাংলা তথা বাঙালীর জীবনকে ঘিরে, যে ক্রমবর্ধমান তমসা চারিদিক থেকে ছেয়ে আসছে তা থেকে বাঙালী জাতির প্রাণবহ্নিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সেই সর্বকলুষ, মলিনতা ও পাপমুক্ত তার মহান সাহিত্য। আজ বাঙালী সাহিত্যিকদের ওপর ইতিহাস এনে দিয়েছে এক অতি গুরুদায়িত্ব। শত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতেও মরেনি যে বাঙালীর মন আর মস্তিষ্ক, তাকে রক্ষা করতে হবে সেই মহৎ সাহিত্যের রক্ষাকবচ দিয়ে।

তাই আজ জাতির জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেই সাহিত্যিকদের, যারা সর্বশক্তি দিয়ে, না, প্রাণ দিয়ে, ফিরিয়ে আনবে বাঙালীর সেই বিগত দিনের প্রাণবহ্নি—সেই অমৃতের ভাণ্ডার।

———

রামপদ মুখোপাধ্যায়

রেডিওয় ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা ঘোষিত হল, প্রবীণ ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক রামপদ মুখোপাধ্যায় গত ২৫শে ডিসেম্বর রাত দশটায় পি. জি. হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। হঠাৎ খবরটা শুনে মর্মাহত হলেম। এই তো সেদিনও তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কত কথা হল, কত আলোচনা। সেদিন একটি লেখাও তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। গল্প-ভারতীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন তিনি। গল্প-ভারতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পত্রিকার জন্মকাল থেকে। প্রথম সংখ্যা থেকেই, তিনি এই পত্রিকায় লিখেছেন, নানা লেখা, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী। জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেছেন তিনি। কিন্তু কখনো তাঁকে কাতর বা ম্রিয়মাণ হতে দেখিনি। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে একটি সহজ প্রসন্ন মাধুর্য ছিল, তা আধুনিককালে দুর্লভ। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন নিরহঙ্কারী, আত্মপ্রচার বিমুখ, সদালাপী এবং একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী। বহু উৎকৃষ্ট রচনার লেখক রামপদবাবু, যে স্বীকৃতি ও সম্মানের যোগ্য ছিলেন, তা তিনি পাননি। কিন্তু সেজন্য তাঁর মনে কোন ক্ষোভ ছিল না।

আগামী সংখ্যায় আমরা রামপদবাবুর একটি অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশ করবো। শোক-সন্তপ্ত চিত্তে আমরা তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করছি এবং তাঁর সহধর্মিনীকে আমাদের আন্তরিক সমাবেদনা জ্ঞাপন করছি

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

[**পূর্বকথা :** শরদিন্দু মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। শরদিন্দু মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর শরদিন্দুর বাড়িতে টি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার ফার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে।

হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছে থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃস্নেহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না।

একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জনজনকে জানবার জন্যে যে সে জায়া, সে সুধী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্থির করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক ঘরের হ্যাটে ঘর্ষিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপট্যেরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।]

॥ তেরো ॥

পার্টির পর দুদিন অফিস গেল না বনছায়া। 'সিক রিপোর্ট' করল। তৃতীয় দিনে যখন যাবে তখনই বা কী বলে দেবজ্যোতির মুখোমুখি হবে? মুখোমুখি হবার কারণ কী! যদি ডাকে! সাধারণত ডাকবার তো কথা নয়। বিয়ের পর কটা দিন যে অফিস করেছিল, কই ডাকেনি তো। ডাকেনি কেননা তখনো খবরটা সরবে দেবজ্যোতির কানে পৌঁছয়নি। কিন্তু, এখন পার্টির পর খবরটা প্রচারিত হওয়াই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, হিমাংশুই বলবে। তার পক্ষে নিশ্চয়ই এ একটা বলবার মত খবর, বিশেষত দেবজ্যোতিকে, যে কিনা তার কামনার নেপথ্যসাক্ষী। তবে প্রত্যাহিত হওয়া তো এমনকম পরাজিত হওয়াই, সেই ভেবে হারের কথাটা বলতে যদি তার গৌরবে বাধে! তাছাড়া সে যদি রেগে দিল্লি-বোম্বাই চলে গিয়ে থাকে, তবে এমনিই দেবজ্যোতি ওয়াকিবহাল নাও হতে পারে। কিছুটা সময় চলে যাক। সময় মানেই স্মৃতিহরণ। একটা কেরানি মেয়ে একটা কেরানি ছেলেকে বিয়ে করেছে এর মধ্যে খবর কী! ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ভালোবাসা বড় এ খবরটাও মামুলি।

আর খবর যদি পায়ই, সেটা নিশ্চয়ই নালিশ বলে ধরবে না। রাজনীতি অর্থই তো চক্ষে ধুলি-নিক্ষেপ। প্রেম তো রাজনীতির মধ্যেও কূটনীতি। আত্মগোপন তো সমস্ত কূটনীতির মর্মকথা। তাই

প্রেমের জন্যে বনছায়া যদি প্রভুদের প্রতিও কৈতব অবলম্বন করে থাকে, নিজের কিছু করেনি। তাই এতে কিছু নালিশ করবার নেই। কবিতায় যেমন ছন্দ ভালোবাসায় তেমনি ছলটা প্রচলিত পোশাক! তাছাড়া হিমাংশুর মধ্যে তো তেমন কিছু ক্ষুব্ধতা লক্ষ্য করা গেল না। তাহলে দেবজ্যোতিরই বা বিরক্ত হবার কারণ কী? আর, তাকে অতিক্রম করেছি বলে সে যদি বিরক্ত হয়ও, তার কাছে সেই জন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে কেন? জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে আমার অস্তিত্বের একটা অংশ তার অধীন বটে কিন্তু আমার দুরন্তর সত্তা, আমার আত্মা, কারু অধীন নয়। অফিসের টেবিলের সামনে নিজের চেয়ারে দৃঢ় হয়ে বসল বনছায়া।

তবে অসন্তুষ্ট প্রভু গোপনে ক্ষতিসাধন করতে পারে। দেবজ্যোতি যদি তেমনি ক্ষুদ্রাশয় হয়, বনছায়া কী করতে পারে? আমি তো তার কোনো ক্ষতি করিনি। কারুই ক্ষতি করিনি। হিমাংশু তার চেয়ে আরো কত শাঁসালো স্ত্রী পাবে, সমাজ-আলো-করা কত বিদ্যুৎবর্ণা মেয়ে, তাদের তুলনায় বনছায়া কত নিষ্প্রভ। দেবজ্যোতির বিচারে তো সে আরো বিবর্ণ। আর বনছায়া যদি হিমাংশুর অভিলষিতাই হয় তবে সেই সন্ধানের বস্তু সে পায়নি জেনে তার বন্ধু দেবজ্যোতি ক্ষুণ্ণ হবে একথা কলিকালের কোনো শাস্ত্র লেখেনা। এক বন্ধুর অলাভে আরেক বন্ধু মনে মনে আনন্দিত হয় এই তো যুগধর্ম।

নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে হাত দিল বনছায়া।

কিন্তু কী আশ্চর্য, প্রথম ঘণ্টাতেই দেবজ্যোতি বনছায়াকে ডেকে পাঠাল।

বনছায়ার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল। মাঝে-মধ্যে যখন ডাকে তখন তো দুপুরের দিকেই ডাকে, সাত সকালে কবে আবার খোঁজ করে? আজকের এ ব্যতিক্রমের নিশ্চয়ই কোনো ঘোরালো অর্থ আছে। আপাদমস্তক বিরক্ত হল বনছায়া। সে কাকে বিয়ে করেছে না করেছে তাতে অফিসের কী মাথাব্যথা!

দেবজ্যোতির ঘরে নীরবে এসে দাঁড়াল বনছায়া। দাঁড়িয়ে রইল। তাকে কেমন যেন নিস্তেজ নিরলঙ্কার মনে হল। তার অন্তরের আনন্দের শিখা মাথায় কালো চুলের মাঝখানে আগুন হয়ে ওঠেনি। বনের মাঝখানে সরু গ্রাম্য পথ যেমন সাদা ছিল তেমনি সাদাই রয়ে গেছে।

কী বলবে দেবজ্যোতি চট করে ঠিক করতে পারল না।

'আমাকে ডেকেছেন?' বনছায়াই প্রশ্ন করল।

'ও, হ্যাঁ। দুদিন আসেননি, কী হয়েছিল আপনার?'

অন্য কী কথা ভাবছিল, বনছায়া অসতর্কে বলে উঠল: 'কী আবার হবে!'

'সিক রিপোর্ট করলেন যে!'

বনছায়ার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে, 'মানে, জ্বর হয়েছিল। আপনার প্রশ্নটা তখন ঠিক বুঝতে পারিনি, মাপ করবেন।'

আসনের উচ্চতা দেবজ্যোতির কণ্ঠে অকারণ রুক্ষতা এনে দিল। জিজ্ঞাসু চোখে বনছায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দুদিনেই জ্বর সেরে গেল? কী রকম জ্বর?'

দেবজ্যোতি বুঝি অবিশ্বাস করছে। বলা ঠিক হচ্ছে কিনা বিবেচনা না করেই বনছায়া বলে বসল: 'কেন, মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে?'

'না। সে জন্যে নয়। আমি বলছি কদিন বেশি ছুটি নিন, ধরুন দু'সপ্তাহ। তারপর কোথাও চেঞ্জে চলে যান।'

'কোথায় যাব ?'

'যে কোনো জায়গায়, দার্জিলিং, উটি, মানালি, সম্ভব হলে বিলেত—'

উদাস মুখে একটু হাসল বনছায়া। বললে, 'সামান্য জ্বর সারাতে এত দূর !'

'নয়তো কাছাকাছি কোথাও যান। সাঁওতাল পরগণা, ঘাটশিলা, নিদেন ভায়রওহারবার। জ্বর সামান্য কে বলে ? জ্বর অসামান্য। এ তো আমি আপনার চেহারা দেখেই বলে দিচ্ছি। দুদিনে সারবার মত এ নয়। ডাক্তার কী সার্টিফিকেট দেবে ? সে এ জ্বরের জানে কী ! আর এ জ্বর থাকতে থাকতেই তো চেঞ্জে যাবার মজা।'

কী অর্থে কী বলছে কিছু বুঝতে পারছে না বনছায়া। তার চেহারার সাজসজ্জায় এমন কিছু তো নেই যার থেকে কেউ কিছু অনুমান করতে পারে। তবু প্রাঞ্জল অর্থেই কথাটাকে ধরে রাখল। বললে, 'চেঞ্জে যে যাব সঙ্গতি কই ?'

'যার বাপ-দাদারা এত বড়লোক, তার আবার চেঞ্জে যাবার ভাবনা !'

কথাটা আঘাতের মত লাগল। বাড়ির কথা বাবার কথা মনে হতেই বনছায়ার মুখ বিষণ্ণ হয়ে এল। চোখও বুঝি উঠল প্রায় ছলছল করে। দেবজ্যোতি ভাবল এবার বুঝি বনছায়া তার নিজের থেকেই বলবে তার জ্বরের কথা, সৌভাগ্যোদয়ের কথা। নইলে আর কিসে সে এই বিচ্ছেদ-বিষাদকে অতিক্রম করবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে যেন কত অপরাধী ! যেন গ্লানিমার প্রতিমা !

কী একটা টাইপ-করা কাগজ নিয়ে দেবজ্যোতি নাড়াচাড়া করছিল—হঠাৎ ভঙ্গির শৈথিল্যটাকে সংশোধন করে ভীক্ষ্ণস্বরে বললে, 'এখন যান। দুপুরে আবার ডাকব। একটা জরুরি অর্ডার আছে।'

মুখ কালো করে বনছায়া দেবজ্যোতির দিকে তাকাল। দেখল দেবজ্যোতির চোখ টেবিলে রাখা ফাইলের উপর নিবদ্ধ। টাইপ-করা কাগজটা পাশে পেপারওয়েটে চাপা দেওয়া।

ধীরে চলে গেল বনছায়া। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভার পাথর হয়ে রইল। কী সে অর্ডার যা আতঙ্কের ভূমিকা সৃষ্টি করে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় ? যা ডেকে এনেও তক্ষুনি-তক্ষুনি হাতে-হাতে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায় না ? কেমন তবে জরুরি অর্ডার ? মিথ্যে কথা বলে ছুটি নিয়েছে তারই জন্যে কি দেবজ্যোতি কৈফিয়ৎ চেয়েছে ? মিথ্যে কথা কেথোয় ? জ্বর তুলছে না এমন মানুষ কে আছে পৃথিবীতে ? এমনিতেও ছোটখাটো আকস্মিক অসুখ তো হতেই পারে মানুষের—তা অবিশ্বাস করার কী আছে ? এতে জরুরি অর্ডারের স্থান কোথায় ? ক্যাজুয়েল নিত না দেয়, 'উইদাউট পে' করে দিক—দুদিনের তো ব্যাপার ! আবার এদিকে বলছে কিনা চেঞ্জে যান ! কত ছলনা !

চেঞ্জে যান ! চেঞ্জ মানে কি চাকরি থেকে ছুট হয়ে যাওয়া ? জরুরি অর্ডার কি মূলে কুঠারাঘাত ? বিয়ের আগে চাকরি ছেড়ে দেবার অহঙ্কার করেছিল এ কি তবে সেই ধড় ? অথচ চাকরি ছেড়ে দেবার বিপক্ষেই তো দেবজ্যোতি মত দিয়েছিল সেদিন। তবে এ কিসের অর্ডার ? চেঞ্জ মানে কি তবে বদলি ? কেরানি আবার বদলি হয় কবে ?

দুপুরে ডাক আসতেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল বনছায়া। সবশু ভঙ্গিতে মিলিয়ে নিল তার ভীরুতা, কিছুটা বা দৃঢ়তার দীপ্তি। দেখি না কী অর্ডার ! দরকার হলে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে, মনের মধ্যে নিল সেই উদ্যতির প্রস্তুতি।

প্রথমবার বসতে বলেনি, এবার দেবজ্যোতি বসতে বললে।

কিন্তু বসে, আরামের ভঙ্গি পেয়েও, বনছায়া মুখটা হাসি-হাসি করতে পারল না। চোখ নামিয়ে রইল। মুখের ছবিতে একটা অনিশ্চয়তার কুয়াশা জড়ানো।

দেবজ্যোতি প্রশ্ন করল, 'আপনাকে আনতে অফিসের গাড়ি যায় না?'

'না।'

'সে কী? কেন? আগে তো যেত।'

'আমি সম্প্রতি বাড়ি বদলেছি।'

'তাতে কী! অফিসে ঠিকানা দেওয়া থাকলে নিশ্চয়ই যেত।'

'কিন্তু এখন যে গলিতে থাকি সে গলিতে গাড়ি ঢুকবে না।'

'আহা, গাড়ি না ঢুকল, আপনি ঠিক সময়ে গলির মুখে এসে দাঁড়াবেন, আপনাকে পিক আপ করে নেবে।'

'যদি বলেন এবার থেকে তাই করব।'

'হ্যাঁ, তাই করবেন। গলিতে থাকা কোনো অপরাধ নয়। আনন্দ শুধু বড় রাস্তায়ই নয়। আনন্দ গলিতে-গলিতে।'

চোখ তুলে তাকাল বনছায়া। চাকরিটা তাহলে নিরাপদ! কিন্তু পরের প্রশ্নটাতে আবার চোখ নত করতে হল।

'বাড়িটা কার?'

উত্তরে বনছায়া 'আমার' বা 'আমাদের' বলল না, স্বামীকে প্রাধান্য দেবার জন্যে বলল, 'সুবীর চট্টোপাধ্যায়ের।'

'কে সে ভদ্রলোক?'

'আমার স্বামী।'

'স্বামী!' আশ্চর্য হবার অভিনয় করল দেবজ্যোতি: 'আপনার বিয়ে হয়ে গেল?'

'কেন, আপনি কিছু শোনেননি?'

'শুনেছি, অন্যের মুখে শুনেছি। অন্যের গলায় কি তৃপ্তির সুর আছে, না কি আশীর্বাদ আছে? খালি হিংসে, খালি বালিশ। তাই আপনার নিজের মুখে শুনতে চেয়েছি। তা আপনি তো কিছুই বলতে চাননা। না মুখে, না মাথায়।'

'মাথায়?'

'হ্যাঁ, সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন?'

অল্প একটু হাসল বনছায়া। বললে, 'রেখেছি বিয়ে তো।'

'ভালোবাসার বিয়ে। কত বড় সাফল্যের কথা, সৌভাগ্যের কথা। সেই জয়পত্রটা মাথায় বহন করবেন না? আপনি কেমনতরো!'

একটি মিথ্যা কথা বলল বনছায়া। বলল, 'আমার স্বামী সিঁদুর পছন্দ করেন না। বলেন, ওটা পরাধীনতার চিহ্ন।'

আগে-আগে তাই বলত বটে সুবীর, এখন বরং সে তার প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্যে সিঁদুরের পক্ষপাতী। ঐ সিঁদুর কার প্রভুত্বের স্বাক্ষর? না, অরবিন্দ এক কেরানি-কবির। সেটা কি কম সম্ভোগ! শুধু অফিসে চাপা কণ্ঠের হৈ-চৈ হবে বলে স্নানের পর সিঁথিতে আর সিঁদুর আঁকেনি বনছায়া, কিন্তু সন্ধ্যায়

চুল বাঁধতে বসে সে ঠিক রক্তিত হবে। তার সীমন্তপথায় আলবে সে আনন্দের স্বর্ণরেখা। কিন্তু অত কথা শুকজনকে বলার কোনো মানে হয় না।

'আপনি ঐ যে তার কথা শুনে সিঁদুর থেকে বিরত হলেন সেটাও তো পরাধীনতা।' দেবজ্যোতি একটু বুঝি নৈর্ব্যক্তিক হল : 'ভালোবাসায় পরাধীনতাই তো সুখ। যে দাসী সে দাসী হয়, যে রাজা সে কিঙ্কর হয়ে যায়।'

কিন্তু অর্ডারটা কী? টাইপ-করা কাগজটা কোথায় চাপা পড়ল?

দেবজ্যোতিকে খুশি করবার জন্যে বনছায়া বললে, 'কাল স্বামীর মত নিয়ে নেব। পরব সিঁদুর।'

যখন জানাজানি হয়েই গেল তখন আর সিঁদুর লুকিয়ে লাভ নেই। যখন যা হতে যাবে, তখন লুকোবে কী করে?

'আচ্ছা, আপনার স্বামী তো হিমাংশুর কার্যে কাজ করে?'

বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল বনছায়া। সম্মতির ভঙ্গিতে চোখ নামাল।

'কিছু মনে করবেন না, কত মাইনে পায়?'

এমন একটা বিভ্রান্তিকর প্রশ্নও কেউ করে নাকি? কিন্তু কিছু একটা উত্তর না দিলেও তো অশোভন হয়। আত্মীয়বুদ্ধিতেই বুঝি জিজ্ঞেস করেছে, আর এই আত্মীয়তাটা রক্ষা করবার জন্যে কিছু বলা উচিত। কিন্তু কেউ কোথাও অপদস্থ না হয় তাও দেখা দরকার। তাই অতি সংক্ষেপে বললে, 'কম।'

'আপনার চেয়ে কম তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কত কম?'

মোটেই ও রকম তুলনার দিক থেকে কিছু বলেনি বনছায়া, কম বলতে সে অল্প বা অযথেষ্ট বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু দেবজ্যোতি মাইনে দুটোকে আলাদা করে সব ঘুলিয়ে দিল। কিন্তু বনছায়ার কাছে এ প্রশ্নেরও সুন্দর উত্তর আছে। সে বললে, 'আমাদের মাইনে আর এখন দুটো নয়, এক মাইনে। ছুয়ে মিল এক। তাই কার কম কার বেশি এ প্রশ্ন আর ওঠে না। আমার আছে আর ওর নেই, ওর আছে আর আমার নেই, এখন সে একই কথা।'

'চমৎকার বলেছেন।' দেবজ্যোতি উচ্ছ্বসিত হল : 'এক দেহ এক মন এক মাইনে। এই তো খাঁটি ভালোবাসার কথা। সত্যি খুব ভালো লাগল শুনে। কিন্তু আপনাদের পার্টিতে আমাকে নেমন্তন্ন করেননি কেন?'

মরমে মরে গেল বনছায়া।

'অথচ হিমাংশুকে করলেন।'

'সে আমার স্বামী করেছিলেন— তাঁর বস বলে।'

'আর স্ত্রীর বস বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছে! না কি এখানেও পরাধীনতা?'

অতি কষ্টে গলার থেকে স্বর বার করল বনছায়া : 'আপনি যেতেন?'

'হিমাংশু যায়নি কিন্তু আমি যেতাম।'

'যেতেন?'

'কেন, তোমাদের বাড়ির সেই গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নে যাইনি?'

'সেটা তো বাবার বাড়ি।'

'কিন্তু তোমার নিজের বাড়ির গৃহপ্রবেশে আমাকে বাদ দিলে কেন?'

'যা গৃহ—' বনছায়া চাইল বুঝি হেয় করতে : 'একখানা মোটে ঘর।'

'ও কথা বলবেন না। যে গৃহে ভালোবাসা বিরাজ করে সে গৃহ মন্দির। ভালোবাসার জন্যে সমুদ্রে ভাসা যায়, আপনারা তো তবু যা-হোক একটা ঘর পেয়েছেন—'

বনছায়ার আর যেন দেরি সইছিল না, ভয়ের কারণটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। তাই সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, 'জরুরি কী একটা অর্ডার ছিল বলেছিলেন—'

'ও, ভোলেননি দেখছি।' সরল শিশুর মত হাসল দেবজ্যোতি: 'আপনি আমাকে নেমন্তন্ন না করলেও আমার উপহার আপনাকে দিচ্ছি—দেখুন পছন্দ কিনা।' বলে বাঁধানো ফাইলের তলা থেকে সেই টাইপ-করা কাগজটা বার করে বনছায়ার হাতে দিল।

বনছায়ার হাতটা বুঝি একটু কেঁপে উঠল। তা হলে কাগজটা প্রহার নয়, পরিতোষ।

পড়তে পড়তে সারা মুখ সিঁদুর হয়ে উঠল বনছায়ার। তার মাইনে আড়াইশো থেকে তিনশো হয়েছে। তাও আগামী মাস থেকে নয়, চার মাস আগে থেকে। তার মানে চার মাসের বকেয়া ইনক্রিমেণ্টটা এক ঝোকে এখুনি সে পেয়ে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, তাই।' দেবজ্যোতি আরো বিশদ হল: 'আপনি একাউণ্টেণ্টের কাছে যান, ক্যাশ বন্ধ হবার আগে চার মাসের বকেয়া ছশো টাকা আজই নিয়ে নিন।'

বনছায়া ঘড়ির দিকে তাকাবে না অর্ডারের দিকে তাকাবে না কি দেবজ্যোতির মুখের দিকে, ঠিক করতে পারল না।

'বলে কিনা, ইনিসিনিয়র, মিথ্যাবাদী।' তার নিজের মনে অর্ধস্ফুটে বললে দেবজ্যোতি: 'ভালোবাসায় যার নিষ্ঠা, আর কোনো আকর্ষণে যে টলল না, সমস্ত বিরুদ্ধতা যে মাথা পেতে নিল, তাকে ইনসিনিয়র বলি কী করে? আর মিথ্যে? প্রাণের মন্দিরে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ও সব মিথ্যে তো মিথ্যে নয়, মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ি।'

কাকে উদ্দেশ করে দেবজ্যোতি এ কথাগুলো বলছে বনছায়া বুঝতে পারল না। বুঝতে চাইলও না। শুধু যে বলছে তারই দিকে সমস্ত অন্তর মুখের উপর উদ্ভাসিত করে রাখল।

চলে যাচ্ছিল বনছায়া, দেবজ্যোতি ডাকল। বললে, 'যদি কখনো কোনো অসুবিধে হয়, আর যদি বোধেন আমার দ্বারা কিছু সুরাহা হতে পারে, তা হলে আমাকে জানাতে সঙ্কোচ করবেন না।'

সরল হাসি মুখে বনছায়া বললে, 'একটা অসুবিধের কথা আপনাকে এখুনি জানিয়ে রাখি।'

'বলুন।' উদ্বিগ্ন মুখে তাকাল দেবজ্যোতি।

'আমাদের জন্যে যদি একটা দু-ঘরের ফ্ল্যাট খুঁজে দেন। অন্তত দু-ঘর। এখন একটা এক ঘর আর বারান্দা নিয়ে আছি। লেখাপড়ার অসুবিধে হচ্ছে।'

'ও, হ্যাঁ, আপনারা তো আবার লেখক-লেখিকা।' সস্নেহে হাসল দেবজ্যোতি: 'নিশ্চয়ই, আমি দেখব। লোক লাগাব।'

'ভাড়া খুব বেশি হেড়শো পর্যন্ত দিতে পারব বোধ হয়।'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

বুকের মধ্যে একটা আনন্দের সিংহাসন নিয়ে বাড়ি ফিরল বনছায়া। তার মনে হল ভালোবাসারও বুঝি একজন দেবতা আছে। সে দেবতা তার ভক্তকে দু হাত ভরে আশীর্বাদ করে, সমস্ত মেহনতের মজুরি ছুটিয়ে দেয়। বঞ্চনা করে না।

ছুটির দুটো দিন বনছায়া প্রাণ ভরে ঘর গুছোল, বারান্দায় রান্নার জায়গা ঠিক করে নিল। সুধীর প্রথম আপত্তি করতে চেয়েছিল। ও সব হাঙ্গামায় কী দরকার? সকালে রেস্টুরেণ্ট থেকে ডিম-রুটি-চা দিয়ে যাবে, তাই খেয়ে নটার মধ্যে অফিসে বেরিয়ে পড়ব দুজনে, দুপুরে ক্যান্টিনে না হোক, কোনো সস্তা

হোটেলে ভাত-ডাল খেয়ে নেব, বিকেলের চা-ও বাইরে সেরে যে যার পথে বাড়ি ফিরব, তারপর বাড়িতে একটু হয়ে সন্ধের বেরুব আবার, চৌরঙ্গি পাড়ায় কোনো দামি হোটেলে ডিনার খাব আর খেতে-খেতে বাজনা শুনব।

দু তিন দিন এমনি চালাবার পর হতশ্রদ্ধ হয়ে বনছায়া বললে, 'দূর, এখন সংসার করছি, এখন কি আর এ ব্যবস্থা সহ্য হয়?'

'সংসার করলে কী করতে হবে?' সুবীর কথার সুরে বিদ্রূপের টান দিল।

'বা, নিজের হাতে রান্না করব না? একবেলাও না? অন্তত সকালবেলা?'

'রান্না তুমি করেছ কোনোদিন?'

'তা করিনি। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে শিখে নেব। মেয়েরা সব কিছুই শিখে নিতে পারে। তুমি শুধু উনুনটা ধরিয়ে দিও।'

'ওরে বাবাঃ। একটা সিগারেট ধরাতে আলস্য, তার উনুন ধরানো! বিয়ের পর আমার খাটনি বেড়ে গেল দেখছি।'

'নিশ্চয়ই বাড়ল, সেটা টের পাচ্ছ না?' হাসল বনছায়া: 'সমান-সমান। ফিফটি-ফিফটি। তুমিও কিছু করবে, আমিও কিছু করব। দু হাতে তালি বাজাব। উনুন ধরাতে না পারো বাজার করে আনবে তো?'

'তা বরং আনতে পারি।' সুবীর মাথা চুলকোল।

'মশলা না হয় আমিই পিষলাম, তুমি মাছ কুটতে পারবে তো?'

'রক্ষে করো। সকালবেলা নিরামিষ খাব। শুধু সেদ্ধ আর মাখন।'

'তারপর-খাবার পর বাসন মাজবে তো?' বনছায়া সুরটা একটু বাঁকা করল: 'তোমার ডিগনিটি অব লেবার!'

সুবীর ঝাপটে উঠল: 'কাঁচের বাসনে খাব।'

'বেশ তাই। তবে বোসো, ফর্দ করো। তারপর জিনিষপত্র কিনতে বেরুই।'

একটা কথাইও হাত রাখতে পারলে ভালো হত, কিন্তু তার থাকবার মত বাড়িতে জায়গা কই? নটা সাড়ে নটার মধ্যে বাড়িতে তালা দিয়ে দুজনে বেরিয়ে গেলে সে কোথায় থাকে? তাহলে সেই সঙ্গে তাকেও বেরিয়ে যেতে হয়। বেরিয়ে গেলে সে আবার কখন ফিরবে? ওদের স্বামী-স্ত্রীরই তো ফেরবার কোনো একটা ঘড়িধরা সময় নেই, কখনো কখনো সন্ধে পার করে ফেরে। কাজের লোকটা যদি বিকেলের মধ্যেই না কাজে লাগতে পারে তাহলে সুরাহা কী। বাড়ির তালার ডুপ্লিকেট ছবি স্বামী-স্ত্রীর কাছে আছে, লোকটার জন্যে তবে ট্রিপ্লিকেট করতে হয়। তাহলে তো সবই ফক্কা। এমন বিশ্বাসী লোক কে আছে যার হেফাজতে বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? বাড়তি বা ফালতু বা অনাবশ্যক এমন কোনো আত্মীয়-আত্মীয়াও তো কাছ নেই। সুতরাং বনছায়াকে নিজের হাতে রান্না করা ছাড়া উপায় কি।

তাছাড়া নিজের হাতে রান্না করে স্বামীকে খাওয়ানো প্রায় একটা কবিতার চেহারা। যদি পোড়া কোড়া কিছু হয়, তেলে নুনে ঘাটতি ঘটে, স্বাদে কম পড়ে, হাসিমুখে বিব্যি বলা যাবে এ তোমার আধুনিক কবিতা।

কিন্তু নিজের হাতে রান্না মানেই গন্ধমাদনের আয়োজন। শিল-নোড়া ছুরি-বঁটি থেকে সুরু করে হেন দ্রব্য নয় যার ডাক পড়েনা। সামান্য নুন রাখবার জন্যেও জায়গা দরকার। থালা বাটি গ্লাস না হয় কাঁচের হল কিন্তু হাঁড়িকুঁড়ি, তেলের কড়া দুধের কড়া? আবার জিনিসকে রাখবার জন্যে জিনিস। সে এক রাজসূয় ব্যাপার। গুছিয়ে রাখবার জন্যে তাক। সাজিয়ে রাখবার জন্যে আলমারি।

আসল প্রশ্ন, একসঙ্গে এতগুলি জিনিস কেনবার মত টাকা কোথায় ?

'তোমার সেই একশো টাকা কী হল ?' জিজ্ঞেস করল বনছায়া : 'যেটা তোমার বস দিয়েছিল ?'

'সেই টাকা আছে নাকি ? কখন পাখা গজিয়ে উড়ে গেছে।'

'কিসে খরচ করলে ?'

'সে তোমার কাছে হিসেব দিতে হবে নাকি ' সুবীর চোঁদ করে উঠল।

'হিসেব নয়, তবে তোমার স্মরণশক্তি তো খুব ভালো, তাই বলছিলাম যদি মনে করে বলতে পারো—'

'সে তো পার্টিতেই বেরিয়ে গেছে।'

'এই শুনেছিলাম না পীযূষবাবুই সব খরচ দেবেন।'

'মাথা খারাপ ! সম্পাদক কখনো খাওয়ায় ? সে নিজে খায়। দেখলেনা ত্রিশটা সিঙাড়া গেল।'

'যাঃ !'

'তারপর দেখনি তো তার 'জুস' খাওয়া। ওর নামই তো পীযূষ—পীযূষ।'

কটূক্তিটা বনছায়ার ভালো লাগলনা, সে গম্ভীর মুখে বললে, 'পার্টির খরচ তাহলে কে দিল ?'

'আমার বন্ধুরা। সুতরাং আমাকেও চাঁদা দিতে হল। ও টাকা আর নেই। তবে যদি বলো, ধার করতে পারি।'

'না, ধার করতে হবেনা, আমার কাছে ছোট্ট একটা পুঁজি আছে তার থেকে দিচ্ছি—'

'তাই দাও, পরে কিস্তি কিস্তি বেসিস্-এ আস্তে আমি তোমাকে দিয়ে দেব।'

'না, দিতে হবেনা।' বলেই বনছায়া বুঝল মুখ ভার করে লাভ নেই। তাই হালকা হবার চেষ্টায় বললে, 'পুঁজিটা ছিল বলেই রক্ষে ! তাহলেই দেখতে পাচ্ছ পুঁজিবাদটা একেবারে নিন্দনীয় নয়।'

ভেবেছিল সুবীরকে বোধহয় বক্তৃতায় তপ্ত করে তুলতে পারবে। কিন্তু সম্প্রতি টাকার কায়েলাটা মিটে গেল বলেই বোধহয় সে আর গা করলনা। কিংবা কে বলবে বিয়ের পর সে হয়তো তার পুরোনো বিশ্বাসগুলোকে আর তত আমল দিচ্ছেনা !

কিন্তু আজ আর সুবীর উদাসীন হয়ে থাকতে পারল কই ? বনছায়া একেবারে বুকের মধ্যে দুশো টাকার গরম নিয়ে সুবীরকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'জানো, ভীষণ সুখবর, আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়ল।'

বিয়ের আগে বাপের সংসারে মাইনে বাড়লে এই গাঢ় আবার থাকতনা। এখন তাদের সংগ্রামী সংসারে টাকার একটু সচ্ছলতা মানেই বিলাসিতা।

'তার মানে তোমার মাইনে তিনশো হল, আমার চেয়ে একশো বেশী।'

এ সব বালকীয় হিসেব এখন বর্তব্যের মধ্যেই নয়—বনছায়া নিজের আনন্দে আরো উন্মীলিত হল। বললে, 'ইনক্রিমেন্টটা উইথ এফেক্ট ফ্রম ফোর মান্থস্ বিকোর—তার মানে একসঙ্গে নগদ দুশো টাকা উপহার পেয়ে গেলাম। তোমার বস্ তো তোমাকে ষোটে একশো টাকা দিয়েছিল—আমার বস কত ভালো—'

'আমার বস তো তোমাকেও দিয়েছিল। তোমার বস—' সুবীর বাকি কথাটা বুঝি মুখে আনতে পারল না।

'যা, সে তো আমি তোমার বসের পরিচিত বলে। তুমি তো আমার বসের পরিচিত নও।'

'দরকার নেই পরিচিত হয়ে।'

'দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আলাপ হলে বুঝবে কী ভালো লোক।'

'তুমি তোমার ভালো নিয়ে থাকো, আমার আলাপে দরকার নেই।' বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল সুবীর। দরকার ছিলনা, তবু অবান্তর প্রশ্ন করল : 'ভদ্রলোকের বয়স কত ?'

'পঞ্চাশ-ষাট হবে।' একটুও ভ্রুকুটি করলনা বনছায়া। সরলমুখে বললে, 'এ টাকাটা দিয়ে দিয়ে কিছু ফার্নিচার কিনব।'

ঠাট্টার মত করে সুবীর বলে উঠল, 'ফার্নিচার রাখবে কোথায় ?'

'মিস্টার ভৌমিককে বলেছি আমাদের জন্যে একটা ফ্ল্যাট দেখে দিতে। তিনি যখন রাজি হয়েছেন তখন নিশ্চয়ই জোগাড় করতে পারবেন। নতুন বাড়ির জন্যে ফার্নিচার কিনব।'

কেন কে জানে সুবীর উৎসাহিত হলনা। চুপ করে রইল।

বনছায়াই আবার খোঁচা দিল : 'কী, ফার্নিচারে তোমার মত নেই ?'

'তোমার টাকা তুমি যেমন খুশি খরচ করবে তাতে আমার আপত্তি করার কিছু নেই।'

পরদিন বনছায়ার জন্যে অফিস থেকে গাড়ি এল। বনছায়াকে গলির মোড়ে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হলনা, ড্রাইভার নিজেই এল ডেকে নিতে।

বনছায়া বললে, 'ও বাড়িতেও আমার জন্যে গাড়ি আসত।' পরে একমুহূর্ত থেমে সুবীরকে নাড়া দিয়ে বললে, 'তুমিও আমার সঙ্গে চলনা। বেশ কতদূর যেতে পারবে অনায়াসে।'

'দূর ! আমি এখনো রেডি নই।'

'চট করে নাও না তৈরি হয়ে। ড্রাইভার ওয়েট করবে।'

'তোমার অফিসের গাড়িতে আমি যাব কেন ?' সুবীর ঝমকে উঠল।

'এখন গাড়িতে তো আমি একা। আমার কাছেই আগে এসেছে। এখনো এটা অফিসের গাড়ি হয়নি।'

'তোমার গাড়িতে তুমি যাও। আমারও অফিস আছে, সম্মান আছে।'

সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা বলার নতুন বান্ধব জুটেছে সুবীরের। সে হিমাংশু। সবলে ঠেলে যাক, সুবীরের বসই বা কী কম উদার, কম দয়ালু !

আস্তে আস্তে এগিয়ে সুবীরকে সমমর্মিতায় টেনে আনছে হিমাংশু। তার সংসারের খুঁটিনাটি খবর নিচ্ছে, এমনকি ছুচারটে নিভৃত প্রসঙ্গেও ইঙ্গিত করবার মত অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলছে ক্রমে ক্রমে।

তাই সুখবরটা না দিয়ে পারলনা সুবীর। সুখবর বলেই সেটা ঘোষণা করল। বললে, 'আমার স্ত্রীর পঞ্চাশটাকা মাইনে বেড়েছে।'

'বলেন কী ? মিস্টার ভৌমিক মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে ?' বলে প্রায় উন্মনস্কের মত ভৌমিকের নম্বরে ডায়াল করল। ভৌমিককে পাওয়া গেলনা। রিসিভারটা রাখল যেন খানিকটা ক্রুদ্ধ হয়ে। সুবীরকে বললে, 'আপনি এখন যান পরে আবার ডাকব।'

সুবীর বুঝতে পারলনা, হিমাংশুর এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী ! (ক্রমশ:)

স্বামী অভেদানন্দ

"তোমরা জাগ্রত হও। তোমরা অমৃতের পুত্র—এই সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া বলীয়ান হও। একবার মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেশের বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আত্মপ্রত্যয় যাহাতে তোমাদের আইসে তজ্জন্য যত্নবান হও। তোমাদের জাতীয়তা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তোমরা স্বাধীনতা হারাইয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছ এবং সকলের নিকট ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছ। জাতীয় শিক্ষার অভাবে, তোমাদের সন্তান সন্ততিগণ তোমাদের পূর্বপুরুষদিগের গৌরব ও মহিমা ভুলিয়া যাইতেছে। সিংহশাবক মেষরূপে পরিণত হইতেছে। জাতীয় ধর্মের উচ্চ আদর্শগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া নির্ভীকচিত্তে অগ্রসর হও এবং নিজ জীবন গঠিত কর। জগন্মাতা তোমাদিগকে ডাকিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"। তাঁহার বিশ্বব্যাপী শ্রবণ কর, হৃদয়ঙ্গম কর, ধ্যান কর। একতাবদ্ধ হইয়া আপন পায়ে দাঁড়াইতে শিক্ষা কর, জগন্মাতা তোমাদের ভিতর অসীম শক্তি ও শুভাশীষ দান করিয়া কর্মক্ষেত্রে চালাইবেন। এ বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া সাহসের উপর ভর করিয়া মাভৈঃ রবে জগৎকে মাতাইয়া তোল। ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মই আমাদের রাজনীতি। ধর্মপথে চলিয়া তোমরা নিজ নিজ চরিত্র গঠন কর এবং জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হও। গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে গমন করিয়া, জরা ব্যাধি এবং অন্নকষ্ট দূর করিয়া জাতীয় জীবনে নবশক্তি সঞ্চার কর।

ব্রহ্মচর্য চাই। ব্রহ্মচর্য চাই-ই চাই। ব্রহ্মচর্যে মহাশক্তির বিকাশ হয়। উপনিষদের ঋষিদিগের মত আমাদিগকেও ঈশ্বরের নিকট সদা সর্বদা প্রার্থনা করতে হবে—ওজো মেহি যে, বীর্যং মেহি যে, তেজো মেহি যে। যে নির্বীর্য সে পৃথিবীর ভারস্বরূপ—তাহার দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ সাধনই হবে না।

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে বেদ প্রচার করিয়াছিল—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। তারপর গীতায় পার্থসারথি তারস্বরে ঘোষণা করলেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"। পুনরায় পাঁচ হাজার বৎসর পরে এই সত্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের জীবনে বিভিন্ন দিক দিয়ে উপলব্ধি করিয়া সরল ভাষায় শিক্ষা দিলেন—"যত মত তত পথ"। এই মহাদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাও—জাত আবার উঠবে। আবার আমরা জগতে শ্রেষ্ঠ হবো; স্বাধীনতার অধিকারী হবো। হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টান সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও ভালবাসা আসবে। একতা হবে।

আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত—এইটুকু ভাব দেখি, তা হলে ঈশ্বরলাভ হল। আগে জ্ঞান লাভ কর, তারপর সংসার কর। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—"অবৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর"। যে প্রাণ থেকে বলতে পারে—আমি পরমাত্মার অংশ—সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে যায়।"

—স্বামী অভেদানন্দ

স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রপথিক
সংগ্রামী স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলন যখন দেশের মধ্যে সুরু হল তখন জগৎ-সভায় ভারতের সেই সংগ্রামের কথা ঘোষণা ক'রে বিশ্বের জনমতকে ভারতের অনুকূল করে তোলার ভার নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় স্বামী বিবেকানন্দ। সুদূর অতীতেও বিবেকানন্দ প্রচারের মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতে যে সংগ্রাম সূচিত হল, পৃথিবীর মানুষকে তা জানানো দরকার, ভারতের মর্মবাণী, ভারতবাসীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস, মরণ-পণ করা লড়াই, এসবের পরিচয় পাশ্চাত্য দেশবাসীর জানা আবশ্যক, তবেই তো তারা বুঝবে যে ভারতের সম্বন্ধে ইংরাজদের কুৎসা প্রচার সত্য নয়; ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়, অশিক্ষিত, অসভ্য নয় ভারতের নরনারী।

বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর গুরুভাই অভেদানন্দ, তাঁর প্রথম জীবনকে এই কাজেই উৎসর্গীকৃত করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি এক প্রবন্ধে লেখেন—"একদিকে এখন আমাদের দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, অন্যদিকে দুনিয়ার কাছে ভারতের বাণী নিয়ে যেতে হবে।"

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে, বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ প্রবর্তিত বিশ্ব-প্রচার আন্দোলনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল ১৯০৫ সালের বিপ্লব। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশে আন্দোলন আরম্ভ করেন ১৮৯৩ সালে। তাঁর তিরোধান ঘটে ১৯০২ সালে। তাঁর পর তাঁর আরব্ধ কাজকে যিনি ব্যাপক ও দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি হলেন স্বামী অভেদানন্দ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, জাতীয় মুক্তির জন্য একদিকে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য; অন্যদিকে প্রয়োজন বহির্বিশ্বের জনমত সংগঠন। এবং আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনের জন্য দরকার বৈদেশিক প্রচার। নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের নায়করূপে অভেদানন্দ সাফল্যের সঙ্গে তাঁর অভিযান চালিয়েছিলেন।

বহির্বিশ্বে প্রচারকার্য চালনা করার প্রয়োজনের কথা নেতাজী ঘোষণা করেন ১৯৩৭-৩৮ সালে, যা স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন ১৮৯৩ সালে আর যা প্রচার করেছিলেন স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৫ সালে।

শঠতা আর বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা ভারতবর্ষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ইংরেজ পৃথিবীময় প্রচার করতে থাকে যে ভারতবর্ষে ধর্ম নেই, শিক্ষা নেই, দর্শন নেই। বজ্রনির্ঘোষে অভেদানন্দ তার প্রতিবাদ করলেন এবং লিখলেন—"ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপল।" (১৯০৬)। এই বইএর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, পাশ্চাত্যের দেশসমূহে বিশেষ করে আমেরিকাবাসীদের মনে ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে তা নিরসন করাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য।

জাতীয়তা গঠনের জন্য ভারতবর্ষে কেমনধারা শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন, কীভাবে তা পরিচালিত

হবে? সেকথা ওদেশের লোক প্রথম জানতে পারলো অভেদানন্দের মারফতে। তিনি বলেন, "আজ ভারতবর্ষের দরকার গণশিক্ষা প্রচারের। তাদের দিতে হবে অবৈতনিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা, তাদের প্রয়োজন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের, তাদের চাই মানুষ হবার শিক্ষা। ভারতবাসীরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে প্রতিভায় তারা পাশ্চাত্যবাসীদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু ইংরেজ শাসনে হৃতসর্বস্ব ভারতবাসীর পক্ষে স্বচেষ্টায় কতটুকু করা সম্ভব!" সেই বিপ্লবের যুগে (১৯০৫ সালে) তিনি আমেরিকা-বাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ভারতবাসীর কাছে আজ একটিমাত্র প্রশ্ন এবং তা হল বাঁচবার প্রশ্ন —"টুডে দি কোশ্চেন ইজ, হাউ টু লিভ্।" তিনি বলেন— "বৈদেশিক শাসনে সর্বহারা ভারতবাসীর কাছে আজ খাওয়া পরার চেয়ে বড় প্রশ্ন আর কিছু নেই। আজ ভারতের জন-সাধারণ অতি দরিদ্র অবস্থায় পৌঁছেচে। এদের দরকার অন্ন বস্ত্র আর মাথা গোঁজবার ঠাঁই। এদের পরিবার প্রতিপালনের সামর্থ পর্যন্ত নেই। বিদেশী ও সহানুভূতিহীন রাজশক্তি লোভ, স্বার্থ আর অত্যাচার স্পৃহায় অন্ধ হয়ে উচ্চ কর্মচারীদের সাহায্যে ভারতের অগ্রগতিকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিচ্ছে। তাদের এই প্রতিরোধের ফলে ভারতবাসীর প্রাণশক্তি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।"

অভেদানন্দ অকুতোভয়ে প্রকাশ্যেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং প্রমাণ করে দেখান, বৃটিশ সরকার কেমন করে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করেছে, ভারতের সর্বপ্রকার শিল্প ধ্বংস করেছে এবং কোটি কোটি নরনারীকে হৃতসর্বস্ব করেছে। নজিরের পর নজির প্রমাণের পর প্রমাণ উপস্থাপিত করে তিনি দেখান, ভারতে ইংরাজ শাসনের ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস, নিপীড়নের ইতিহাস, ভারতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করে স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। ইংরাজ যে সময় বহির্জগতে প্রচার করত, ইংরাজ শাসনে ভারতীয়দের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, ইংরাজ তার ঘরের টাকা এনে ভারতের উন্নতির জন্য খরচ করছে। অভেদানন্দই প্রথম এই মিথ্যাকে জগতের কাছে উদ্ঘাটিত করেন।

ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন, অভেদানন্দের এই বৈদেশিক প্রচার ভারতীয় বিপ্লবকে গঠন করার কাজে, উৎসাহ দেবার কাজে অসীম সহায়তা দান করেছিল। তাঁর গ্রন্থের (ইণ্ডিয়া আণ্ড হার পিপল) মাধ্যমেই ইউরোপ ও আমেরিকার জিজ্ঞাসু পাঠকরা ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে সর্ব প্রথম সত্য পরিচয় পেল। এই বইটিকে বৃটিশ সরকার ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। দীর্ঘকাল পরে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

স্বামী অভেদানন্দের কর্মপ্রচেষ্টার ধারা অনুসরণ করলে স্পষ্টই দেখা যায় তাঁর সকল কর্মের মধ্যে একটি সুর সকল সময় উচ্চারিত হত—সে সুর বিপ্লবের সুর ভারতের স্বাধীনতা আকাঙ্খার সুর। তাঁর জীবনব্যাপী বেদান্ত প্রচারের মধ্যেও ছিল সেই একই উদ্দেশ্য—অনাগত স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্ভব করে তোলা, ত্বরান্বিত করে তোলা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনের এক মহান অগ্রপথিক রূপে তাঁর অবদান আজ অনুসন্ধিৎসু-পাঠকের কাছে সর্বান্তঃকরণে স্বীকৃত।

———

[১৯২৫ সালে 'আত্মশক্তি'তে প্রকাশিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সংক্ষেপিত পুনর্মুদ্রণ]

নবীন বাঙলার আদর্শ

স্বামী অভেদানন্দ

আমরা কি চাই

আমরা চাই স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা কিরূপ স্বাধীনতা লাভ করিতে চাই? আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ জগতের সকল জাতির আদর্শ হইতে মহত্তর। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভে সন্তুষ্ট থাকে। আমরা এই উভয়বিধ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেই কি পরিতৃপ্ত থাকিব? না, কারণ জগতের অন্যান্য জাতির আদর্শ হইতে আমাদের আদর্শ উচ্চতর, সুতরাং স্বাধীনতা বলিতে প্রকৃতপক্ষে যাহা বুঝায় আমরা সেই স্বাধীনতা চাই। যাহাকে মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তি বলে, বেদে তাহাই স্বাধীনতার আদর্শ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। জগতের স্বাধীনতার যে সকল স্বরূপ বা আদর্শ বিদ্যমান, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই তৎসমুদয়ের মূল ভিত্তি। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বা মুক্তিই আদর্শ এবং তদ্লাভই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। উহা লাভ করিবার জন্য আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্তব্য, কারণ সর্বপ্রকার স্বাধীনতার মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ। মহাত্মা-গান্ধী ইহাকেই 'স্বরাজ' নামে প্রচার করেন।

নেতা কে?

ত্যাগই নেতার ভূষণ। কেবলমাত্র বাক্যবাগীশ কখনও নেতা হইতে পারেন না। কেহ যদি প্রকৃত ত্যাগী না হন, তবে খুব বেশী বলিতে বা লিখিতে পারিলেই তিনি কখনও নেতা হইতে পারেন না। আত্মত্যাগই তাঁহার মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহাকে উহা জীবনের প্রতিমুহূর্তে প্রদর্শন করিতে হইবে। যদি আপনাদের মধ্যে এরূপ একজনকেও দেখিতে পান—যিনি জন্মভূমি ও স্বদেশবাসীর হিতার্থে নীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছেন, তবে তাঁহার অনুসরণ করুন, আপনাদের জয় হইবে। নেতা কখনও তৈয়ারী করা যায় না. কোন কোন মানুষ নেতারূপে আপনিই জন্মগ্রহণ করেন। আর যিনি অধ্যাত্মভাবাপন্ন নহেন. তিনি

কখনও নেতা হইতে পারেন না। যখন কোন আধ্যাত্মিক বা ধর্মনেতা জগৎসম্বন্ধে ধারণা করেন তখন তিনি দিব্যশক্তির অধিকারী, তিনি কখনও ভ্রমের বশীভূত হন না, কারণ তিনি ভগবদ্ পরিচালিত। তিনি কখনও পরদিন অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হন না, কারণ ভবিষ্যৎই তাঁহার চিন্তা করে, আর ইহাই তাঁহার মহত্বের নিদর্শন। নাম যশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থবশীভূত রাজনৈতিক নেতা কখনও সফলতা লাভ করিতে পারেন না। প্রকৃত নেতা চরিত্রবান ও নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে সাক্ষাৎ নীতি স্বরূপ হইতে হইবে, নতুবা উপনিষৎ বলিয়াছে তিনি নিজেকে ও অন্য সকলকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবেন। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা আপনাদিগকে মহৎ ও সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বিবেচনা করে এবং শিষ্য ও অনুচরবর্গ সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। তাহারা স্বয়ং অন্ধ এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণ করে তাহারাও অন্ধ নেতা কর্তৃক নীয়মান হইয়া অবিদ্যা ও ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়। অতএব নেতা নির্বাচনে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। যিনি কোন প্রতিদানের আশা না রাখিয়া নিজ কর্মকে স্বেচ্ছায় জগতের জন্য উৎসর্গ করিতে পারেন এরূপ ব্যক্তির আগমনের জন্যে আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে এবং প্রস্তুত হইতে হইবে। এরূপ নেতা আসিবেনই, কারণ যেখানেই কোন কিছুর প্রয়োজন বা অভাব হয় সেখানেই ত্বরায় বা বিলম্বে তাহা পূর্ণ হইবে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব যিনি আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিবেন এবং আমাদের স্বাধীনতা শুধু কায়িক, মানসিক বা সামাজিক নহে, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাও আনয়ন করিবেন, সেই দিব্যগুরুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই আমাদের কর্তব্য। যখনই কোন জাতি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বা মুক্তি লাভ করে তখন তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভও অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক স্বাধীনতা গৌণ বস্তু, উহা চরম আদর্শ হওয়া উচিত নহে। জগতের সর্বত্র রাজনৈতিক নেতৃগণের মধ্যে দলাদলি, দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ইংলণ্ডে যান দেখিবেন উদারনৈতিক দলের সহিত রক্ষণশীল দলের বিরোধ চলিয়াছে। আমেরিকায় যান, সেখানেও দেখিবেন যে, সাধারণতন্ত্র দল প্রজাতান্ত্রিক দলের সঙ্গতকে যে কোন উপায়ে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আজ যাহারা পদদলিত সেই সকল জাতিকে ঘৃণা করিবেন না। তাহারা সহস্র সহস্র বৎসর নির্যাতন ভোগ করিয়াছে ও তাহাদের শক্তিসমূহ সঞ্চিত করিতেছে। কোন নেতার অভ্যুদয় হইলে তিনি এতাবৎ রক্ষিত ঐ শক্তি নিচয়ের সহিত অবতীর্ণ হইবেন। ঐ শক্তিরাশিই সেই মহান নেতারূপে প্রকাশমান হইবে। যদি আপনারা গৌরবলাভ করিতে ও আপনাদের জাতি ও জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে চান তাহা হইলে আপনাদের শক্তিসমূহ সঞ্চয় করুন এবং সত্যসন্ধ শুদ্ধ ও নীতিপরায়ণ হউন। এরূপ হওয়াই ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবনযাপন করা। আপনাদের বিপন্ন ভাইকে সর্বদা সাহায্য করিবেন। তাহার জাতি বা সামাজিক অবস্থার প্রতি আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করুন এবং সাহায্য ও শিক্ষাদান করিয়া তাহাকে আপনাদের মাতৃভূমির একটী যোগ্য অধিবাসীতে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করুন, ইহাই আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত।

চাই শক্তিময়ী নারী

সুযোগ পাইলে স্ত্রীলোকেরা অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বহুকালযাবৎ কোন সুযোগ পান নাই, সেইজন্য তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু একবার সুযোগ দিন, দেখিবেন অনেক বিষয়ে তাঁহারা আপনাদের সমকক্ষ হইবেন। তাঁহারা বড় বড় কর্মিনী হইবেন। আমাদের দেশ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ উৎপাদন

করিয়াছে। আপনারা বিখ্যাত ঝাঁসির কথা এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় যিনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই ঝাঁসির রাণীর কথা অবগত আছেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মতে ঝাঁসির রাণী বিপক্ষদলের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন। আমাদের দেশই এইরূপ মহাবলশালিনীদিগকে প্রসব করিয়াছিল। শৃঙ্খলিত নারীগণকে একবার সুযোগ দিন—তাঁহারা দেখাইবেন যে, তাঁহারা কি অদ্ভুত শক্তির অধিকারিণী। আমরা যে জগজ্জননী কালীমাতার পূজা করি, প্রত্যেক নারীকে তাঁহারই মূর্তস্বরূপা বলিয়া জানিবেন।

চাই একনিষ্ঠ সৈনিক

পাশ্চাত্য জাতিগণের নিকট হইতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের মধ্যে আজ্ঞাবহতা অন্যতম। আমাদের দেশে নেতা আছে হাজার হাজার, কিন্তু আজ্ঞা পালন করিবার কেহ নাই। যে কখনও নিষ্ঠাবান সৈনিক ছিল না সে দক্ষ সেনাপতি হইতে পারে না। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাহাদের জাতীয় আদর্শের অতিশয় বাধ্য এবং একনিষ্ঠ ভক্ত। এখনও আমাদের ঠিক কোন জাতীয় আদর্শ সৃষ্টি হয় নাই। ব্যবসা বুদ্ধিতে বরং আমাদের স্বার্থ ও শাসননীতি পরিচালিত হয়। আমরা উহার অনুসরণ করিব না। আধ্যাত্মিক আদর্শই আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবে; কারণ উহাই আমাদের জাতীয় লক্ষ্য। ব্যবসাবুদ্ধি যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে আমাদের জাতি অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

দেশের ভাইবোনদের ভালবাস

যদি আমরা নিজেদের মঙ্গল কামনা করি তাহা হইলে আমাদের ভাইবোনদের ভালবাসিতে হইবে। ভালোবাসার অর্থ একত্বের অভিব্যক্তি। জৌতিক জগতে এই একত্ব হইতে পারে না। দুইটি মুখ কখনও সম্পূর্ণ রূপে এক হয় না। আর মানসিক বা বুদ্ধিশক্তির স্তরেও আমরা সকলে সমান হইতে পারি না। আধ্যাত্মিক ভূমিতেই এই একত্বের বিকাশ হইতে পারে, কারণ চৈতন্য বা আত্মারূপে সকলেই আমরা এক ও অভিন্ন। আমাদের ধর্মশিক্ষা "তোমার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ ভালবাসিবে,—শুধু প্রতিবাসীকে নহে সমস্ত জীবকে নিজস্বরূপজ্ঞানে ভালবাসিবে।" কারণ নরনারী বা তদেতর প্রাণীগণের মধ্যে একই চৈতন্য বা আত্মা বিরাজমান।

এখানেই মিলন এবং এখানেই একত্বের ভিত্তি। আমরা সকলেই 'অমৃতের সন্তান' ইহাই বেদের ঘোষণা। যদি আমরা ইহা স্মরণ রাখিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারি তাহা হইলে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যে চৈতন্যরূপে আমরা সকলেই এক। সেই মহতী বেদবাণী "অমৃতস্য পুত্রাঃ" সতত আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হউক। আমরা যদি সকলেই অমৃতের ও আনন্দের সন্তান হই, তবে আত্মায় জাতি বা সম্প্রদায় ভেদের স্থান কোথায়? আত্মা জাতিবর্ণহীন, ইহা নিত্যশুদ্ধ। আত্মারূপে আমরা সকলেই ভগবানের সন্তান—সকলেই সমান। এমনকি সামাজিক দৃষ্টিতে অতি হীন ও হীন বলিয়া গণ্য চণ্ডাল বা মেথরের মধ্যেও অবিনশ্বর আত্মা বিদ্যমান আছেন,—আমাদের ন্যায় সেও ভগবানের সন্তান। অতএব তাহাকে সম্মান ও সাহায্য করা কি উচিত নহে? সে কি আমাদের ভাই নয়? তাহার প্রতি ভাই-এর ন্যায় ব্যবহার না করিলে কি আমরা প্রাচীন ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও ধর্মে বিশ্বাসহারা হইব না? আমাদের ধর্ম কি শিক্ষা দেয় না—"বিদ্যা—বিনয়—সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।" এইরূপে ধর্মই আমাদের একতাশক্তি উদ্বুদ্ধ করিবে এবং উহাকেই আমাদের সকল কর্মোদ্যমের ভিত্তিরূপে পরিণত করিবে, নতুবা আমাদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা অসম্ভব। পাশ্চাত্য জাতিগণের রাষ্ট্রনীতি অল্পদিন মাত্র স্থায়ী এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু আমাদের রাজনীতি একাত্মতা বা আত্মার একত্বরূপ সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা আমাদিগকে যে লক্ষ্যে লইয়া যাইবে তাহা ক্ষণস্থায়ী নহে,—তাহা চরম শান্তি ও সুখের আলয়। মোক্ষ বা স্বাধীনতা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনা, পরন্তু উহা হইতে সামাজিক, মানসিক নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাও লাভ হয়।

আলোর সাধক অভেদানন্দ

সুনীলকুমার বোস

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাতপাখির গান!"

রবীন্দ্রনাথের প্রাণে এই রবির কর কিভাবে পশেছিল আমরা জানি না, তবে এটুকু জানি যে এই কর-এর পরশ পেয়ে তিনি যুগপৎ পুলকিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছিলেন। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ এক ঝলক আলোক ও এক টুকরো গানের রেশ এসে কবির হৃদয়-গুহার সমস্ত অন্ধকার দূর করে দিয়ে গেল, আলো আর গানের পরশে তাঁর সমস্ত হিয়া থর থর কেঁপে উঠল। কবি বিহ্বল হলেন। কেন এমন হয় কেউ তা জানে না, 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না'।

স্বামী অভেদানন্দও সেইরকম বলেছেন মানুষের আত্মানুভূতি কখন হবে কেউ তা বলে দিতে পারে না। এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থাতেই এই আত্মানুভূতি হতে পারে। তিনি বলেছেন,—"The awakening may come at any time and under any circumstances. One may be suddenly awakened in the midst of all the comforts, luxuries and pleasures of the earthly life. No one can tell when or how such an awakening will come to the individul soul." অর্থাৎ এই জাগরণ (আত্মানুভূতি) যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থাতেই আসতে পারে। পার্থিব জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-বিলাসের মধ্যেও হঠাৎ কাহারও জাগরণ আসতে পারে। ব্যক্তি-আত্মার এই, জাগরণটিক কখনও কিভাবে আসবে তা কেউ নিশ্চয় কোরে বলতে পারে না। ধনী হোক, দরিদ্র হোক প্রত্যেক মানুষেরই একদিন না একদিন জাগরণ আসবে, সে দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তার আত্মানুভূতি হবে। এমন কি কীট পতঙ্গও এ থেকে বাদ যাবে না। এই আত্মানুভূতির প্রত্যক্ষ প্রকাশ বা দিব্য চেতনা স্বামী অভেদানন্দ যাকে বলেছেন 'divine flash' তা প্রায় সময়েই মানুষের অজ্ঞাতসারেই আসে। অভেদানন্দ একে সাঁতার বা সাইকেল চড়া শেখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সাঁতার শিখতে হলে অনেক হাবুডুবু খেতে হয়, সাইকেল চড়া শিখতে গেলে অনেক আছাড় খেতে হয় কিন্তু ঠিক কখন যে এই জিনিষ দুটি শেখা হবে তা কেউ বলে দিতে পারে না। তবে আত্মানুভূতির জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং এই চেষ্টা করতে করতে এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন একেবারে হঠাৎ ঐ divine flash এর স্পর্শ পেয়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাব। হাজার বছরের

অন্ধকার ঘরে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে যেমন সমস্ত ঘরটি আলোকিত হয়ে ওঠে এও তেমনি। অভেদানন্দ বলেছেন—"A room that has held darkness for thousands of years, a cave where darkness has been for thousands of years, are instantly illumined by the stroke of a match-stick—the darkness of thousands of years is dispelled." অর্থাৎ যে ঘরে বা গুহায় হাজার হাজার বছর ধরে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে সেই ঘরে বা গুহায় একটি দেশলাই কাঠি জ্বাললে অমনি সঙ্গে সঙ্গেই আলোকিত হয়ে ওঠে, হাজার হাজার বছরের অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হয়। তাই এই divine flash, রবির কর ও প্রভাত-পাখীর গান যাতে কোন শুভক্ষণে বা শুভলগ্নে আমাদের হৃদয়ে পশতে পারে সেইজন্য আমাদের হৃদয় দুয়ার সব সময় খুলে রাখতে হবে! কারণ তারই পথপ্রান্তে গিয়ে আমাদের 'জীবন মুদিতে চায়'।

এই divine flash এর জন্যে সীমাহীন আর্তি নিয়ে মানুষ জন্মেছে, তার স্বরূপে রয়েছে অসীমের হাতছানি। তাই সে সুদূরের পিয়াসী, সুদূরের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্যে সব সময় উন্মুখ হয়ে থাকে, সীমার মাঝে অসীমকে খোঁজে। সে তার সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে থাকতে পারে না, তার পাশবিক, এমন কি মানবিক প্রকৃতির উর্দ্ধেও সে উঠতে চায়, সে বিশ্বচেতনার সঙ্গে তার নিজের সত্তার সাযুজ্য অনুভব করতে চায়। এ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, "The tendency of the individual self of each man is not to remain confined to one narrow circle, but to go beyond the boundary of the circle of the animal nature, beyond human nature and ultimately to become universal." অর্থাৎ ব্যক্তি-আত্মার প্রবণতা হচ্ছে কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকা; সে পাশবিক ও মানবিক প্রকৃতির সীমা ছাড়িয়ে একেবারে বিশ্বচেতনার দিকে অগ্রসর হতে চায়। মানুষ স্বভাবতই চৈতন্যময় বা শিব। অজ্ঞানতা বশতঃ বা ভুল ধরবার জন্যেই সে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারছেনা। সে নিজেকে এই পৃথিবীর মরণশীল মানুষ বলে মনে করছে। কিন্তু মানুষ এই পৃথিবীতে যা কিছু করছে তা শুধু নিজেকে জানবার জন্যে, নিজেকে বুঝবার জন্যে। জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক সে সব সময় চেষ্টা করছে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে। স্বাভাবিক প্রেরণা বশে যখন সে তার অজ্ঞানতার সংকীর্ণ পরিধিকে অতিক্রম করতে পারবে তখনই সে নিজের শাশ্বত দিব্যমহিমাকে উপলব্ধি করতে পারবে, তখনই সে বিশ্বচেতনার আলোর পরশ পাবে। আত্মানুভূতির প্রত্যক্ষ প্রকাশ বা এই দিব্য আলোক হঠাৎ নিমেষের মধ্যেই মানুষের মধ্যে আসলেও একে ঠিক আকস্মিক ঘটনা বলা যায় না। কারণ আত্ম-চৈতন্যের জ্যোতি সর্বদাই প্রকাশমান, আমাদের অন্ধদৃষ্টির জন্য আমরা তা দেখতে পাইনা। অথচ ভেতরে ভেতরে ঠিক প্রস্তুতি চলতে থাকে; যেমন মাছ ধরার জন্যে চার আর ছিপ ফেলে মানুষ বসে থাকে। সে কিন্তু ঠিক একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই। তার নজর ঐ ফাৎনার দিকে, তার সমগ্র সত্তা তখন ঐ ফাৎনার মধ্যে—কখন, ফাৎনা ডোবে। ফাৎনা ডুবল তো হয়েই গেল। সে জানে মাছ আছে, ফাৎনা একসময় না, এক সময় ডুববেই। দিব্যালোকের বেলাও ঠিক তাই। আলো সর্বক্ষণই রয়েছে, আমাদের অজ্ঞানতার জন্যেই আমরা সে আলো দেখতে পাচ্ছি না, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে যে কোন সময়ে সে আলো আমাদের জীবনে আসতে পারে। কেহ কেহ একে সুষুপ্তি থেকে হঠাৎ জাগরণ বলেছেন। কেহ কেহ আবার একে বলেছেন দিব্যানুভূতি। চেতনার এই জাগরণকে স্বামী অভেদানন্দ অদ্বৈতের আলোকে দেখেছেন। তিনি আত্মানুভূতিকে 'মানুষের ক্রমবিকাশের শেষ বা চরম পরিণতি' বলেছেন।

মানুষ যখন একবার এই আলোর পরশ পায় তখন তার সমগ্র সত্তাই আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তার সমস্ত ভেদজ্ঞান লোপ পায়, নাম রূপ সহ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক অখণ্ড চৈতন্য সাগরে বিলীন হয়, নিজেকে এই চৈতন্য সাগরে একটা সামান্য বুদ্বুদমাত্র বলে মনে হয়। এখানে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন—"On, that highest spiritual plane there is no distinction, no idea of separation, no idea of creation. All ideas of separateness, all differentiations of phenomenal names and forms merge into the absolute ocean of reality which is unchangeable, eternal and one. The essence is like the all pervading background of the phenomenal appearances. Phenomena are like the waves in the ocean of Infinite Reality. Individual souls are like so many bubbles in that ocean of Absolute Existence." অর্থাৎ, সেই চূড়ান্ত অধ্যাত্মভূমিতে কোন ভেদ, পার্থক্য, এমন কি জগৎ-বোধও থাকে না। এই পরিদৃশ্যমান জগতের নাম রূপ থেকে উদ্ভূত যত ভেদ বুদ্ধি তা সেই অখণ্ড, অপরিবর্তনীয়, অনন্ত, এক চৈতন্যসাগরে লোপ পায়। এই চৈতন্য সত্তাই দৃশ্যমান জগতের সর্বব্যাপী পটভূমিকা। দৃশ্যমান সব কিছুই সেই অনন্ত চৈতন্যসাগরে কতকগুলি তরঙ্গমাত্র। ব্যক্তি আত্মা সমূহ এই চৈতন্যসাগরে কতকগুলি বুদ্বুদ মাত্র। সব কিছুই চৈতন্যময়, অন্তর ও বাহির তখন চৈতন্যের আলোয় আলোকিত, আলোকের বর্ণাধারায় তখন সমগ্র সত্তা স্নাত। এই আলোই ব্রহ্ম, এই আলোই জীবন ও জগৎ। এই জগৎ মিথ্যা বা মায়া নয়, এই আলোক ব্রহ্মেরই প্রকাশ মাত্র। 'তিনিই সব হয়েছেন,' সবকিছু ব্রহ্ম, সবকিছু চেতন, সবকিছুই আলো। ব্রহ্মই জীবজগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছেন। শাঁস, বীচি ও খোলাকে বাদ দিলে যেমন বেলের সার্থকতা কিছুই থাকে না, তেমনি সবকিছুকে নিয়েই ব্রহ্ম পূর্ণ, সবকিছুর সার্থকতাই ব্রহ্মকে নিয়ে। এ ধারণা শ্রীরামকৃষ্ণের। স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই এই আলোক ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর নয়নের দৃষ্টি হতে সমস্ত কালো ঘুচিয়েছিলেন, সে দৃষ্টি যেখানে পড়ত সেখানে শুধু আলোই দেখত। আলো—পৃথিবীতে আলো ছাড়া আর কিছুই নেই। দিব্যজ্যোতি বা divine flash-এ তাঁর সমগ্র সত্তা এমন ভরপুর হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর সর্বক্ষণ মনে হত—

'আলো, আমার আলো, ওগো আলোয় ভুবন ভরা
আলোয় আমার নয়ন ধোওয়া, আলোয় হৃদয়হরা।'

* * *

Education means the development and spiritual unfoldment of the soul in all the various branches of learning · India needs to day, free education, free industrial and technical schools and colleges···India needs a National University · Education should be the culture of the soul for the good of all···The highest ideal of education is the attainment of God consciousness···Unless the parents are properly educated they cannot properly educate their children···Education must be in harmony with commonsense, which is the best sense that God has given us. It is divine wisdom···we do not gain any knowledge from outside. It comes from within; our soul is all knowing.

—Swami Abhedananda

স্বামী অভেদানন্দের রাশিচক্র বিচার

ওঁ তৎসৎ। জন্মকাল। শক-নরপতে গতাব্দাদ্যাঃ ১৭৮৮।৫।১৬ সন ১২৭৩ সাল বঙ্গাব্দ ১৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার। রাত্রি ৪৭ ঘটিকা। কৃষ্ণা নবমী তিথি। ২৩। অক্টোবর ১৮৬৬। বৃষ লগ্ন। পুষ্যা নক্ষত্র। চন্দ্রের ক্ষেত্র। রবির হোরা। কর্কট রাশি। দেবগণ। বিপ্রবর্ণ। অষ্টোত্তরী চন্দ্রের দশা। বিংশোত্তরী শনির দশা। জন্মস্থান কলিকাতার উত্তর প্রান্তে আহেরীটোলায় নিমু গোস্বামী লেনে। মাতা ৺ঈ কালীপূজা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন বলিয়া নাম হইল কালীপ্রসাদ।

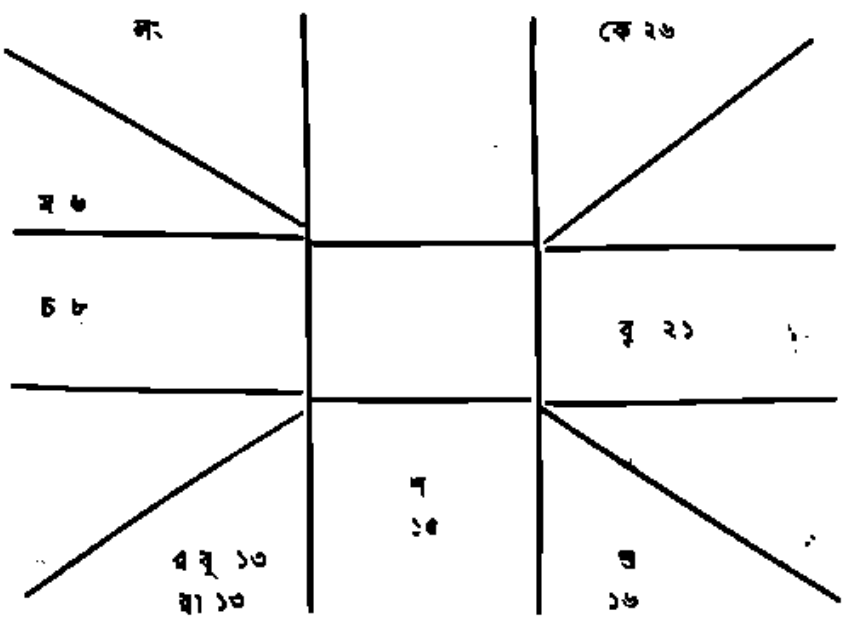

। জন্মপত্রিকা বিচার ।

পরব্রহ্ম যখন নরাকারে অবতীর্ণ হন তখন ছয়টি গ্রহ তুঙ্গী হয়। রামচন্দ্র অবতারে তাঁহার কুণ্ডলীতে বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, শুক্র ও রবি এই পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গী ছিল এবং রাহু কন্যারাশিগত হওয়ায় তুঙ্গস্থানের ফল দিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে বুধ, শনি, মঙ্গল ও চন্দ্র চারিটি গ্রহ তুঙ্গগত এবং রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রগত ছিল। এইরকম যোগাযোগ অবতারেই সম্ভব। কালীপ্রসাদের কুণ্ডলীতে শনি ও বুধ

তুঙ্গী, কন্যায় রাহু ও একাদশ স্থানে কেতু থাকায় তুঙ্গীতুল্য ফলদাতা। ইহার ফলে ইনি অবতারের পার্ষদ হইয়া চক্রবর্তীর গৌরব লাভ করিয়াছিলেন।

তুলায় শনির অবস্থান হেতু ইনি সন্ন্যাসী হইয়াও কীর্তিমান, লক্ষ্মীযুক্ত পণ্ডিত, দাতা, মঠের জন্য জমির অধিপতি ও বিদুষী মহিলাদিগের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

বুধ তুঙ্গে কন্যারাশিতে অবস্থান হেতু ইনি সন্ন্যাসী হইয়াও শিষ্য শিষ্যারূপ পুত্র কন্যা, উচ্চপদস্থ সন্তান, রাজসম্মানযুক্ত, লোকনায়ক, বিদ্যাবিনোদী ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন।

কন্যারাশিতে বুধ থাকায় ইনি বক্তা, প্রসিদ্ধ লেখক ও উন্নতমনা হইয়াছিলেন এবং ইহার কার্যের সাহায্যের জন্য অনেক সুন্দরী মহিলাও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইহার জন্মকালে রাহু কন্যায় অবস্থান করায় ইনি সন্ন্যাসী হইলেও রাজাধিরাজের মত ছিলেন। ইহার ইচ্ছামাত্র ধনদৌলত, অশ্ব-হস্তী-মোটর প্রভৃতি যানবাহনাদি উপস্থিত হইত অর্থাৎ রাজারাজড়া ইহার অনুগত ছিলেন। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী অগ্নির নিকট তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইত। তর্কযুদ্ধে ইহাকে পরাজয় করা সুকঠিন ছিল।

কেতু একাদশস্থ হওয়ায় ইনি সুরূপ, সুবেশধারী, সুদর্শন, সুবিদ্বান ও সৌভাগ্যশালী ছিলেন।

তুঙ্গীগ্রহগণের আলোচনার ফলে দেখা গেল যে, অভেদানন্দ পৃথিবীর তুঙ্গীলোকের বা নরশ্রেষ্ঠ মনীষিগণের প্রশংসা বা শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মকালে কলিকাতা শহর ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসাবে ভারতের সংস্কৃতির সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ হইতেছিল। অভেদানন্দের চরিত্রে ভারত-সংস্কৃতির সহিত পাশ্চাত্য ভাবধারার অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখাইতে পারিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: 'নরেনের পরেই তোর বুদ্ধি'। বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন: 'যখন আমি মহাপ্রয়াণ করিব আমার বাণী তোমার মুখে প্রচারিত হইবে ও জগৎ শুনিবে'। গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে কালীবেদান্তী বা কালী তপস্বী বলিয়া ডাকিতেন। আলোয়ার নৃপতি প্রভৃতির কথা নাই বা ধরিলাম। তিনি তপস্বী ও মহাপণ্ডিত ধনরাজ গিরির প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন: "অভেদানন্দ, অলৌকিকী প্রজ্ঞা"। ইংলণ্ডের বেদপ্রচারক মোক্ষমুলার, জার্মানীর বেদান্তের পণ্ডিত ডয়সন, আমেরিকার মনস্তত্ত্ববিদ্ জেমস, বৈজ্ঞানিক আডিসন, দার্শনিক রয়েস প্রভৃতি তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ম্যাকিনলী তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

লগ্নপতি শুক্র পাপগ্রহ দৃষ্ট না হইয়া কেন্দ্রে থাকায় ইনি অর্ধশতাব্দী যাবৎ রোগ কাহাকে বলে জানিতেন না। একবার নিজের ব্রহ্মজ্ঞান পরীক্ষা করিতে নিজে প্রার্থনা করিয়া শরীরে রোগ আনয়ন করেন; নতুবা পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় স্থানে বলবান চন্দ্র বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট ও তৃতীয় স্থান হইতে কেন্দ্র স্থানে বৃহস্পতির অবস্থানে তিনি সুস্বরবান ছিলেন। আমেরিকার শ্রোতাগণ বলাবলি করিত—He has a resonant and rythimical voice.

[বিশ্ববাণীর সৌজন্যে]

দেবী দুর্গা

স্বামী অভেদানন্দ

বৈদিক যুগ হইতে কেবল হিন্দুধর্মই এই জগন্মাতার পূজা প্রচার করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের এরূপ মাতৃভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বিশ্ব-প্রসবিনী মহামায়া নানাবিধ মূর্তিতে হিন্দুভক্তবৃন্দের গৃহে গৃহে এবং ভারতের ও অন্যান্য দেশের সমস্ত তীর্থস্থানে আজও পর্যন্ত পূজিত হইয়া থাকেন। ইনি এক হইয়াও দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি বহুনামে ও মূর্তিতে উপাসকদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিতেছেন।

বৈদিক যুগে ভারতবাসী আর্যঋষিদিগের মধ্যেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্তকে 'দেবীসূক্ত' বলা হয়।

৯০ এবং ১২৭তম সূক্তটী 'রাত্রিসূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ, কারণ ইহাতে রাত্রিদেবীর পূজা বর্ণিত আছে। 'বৃহদ্দেবতা' নামক বৈদিক দেবব্যাখ্যা গ্রন্থে রাত্রিদেবীকে বাক্, সরস্বতী, অদিতি ও দুর্গাদেবী বলা হইয়াছে। এই রাত্রিদেবী পরে 'কালী' নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। 'ভদ্রকালী' নামটী শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে আছে এবং ভবানী দেবীকে বলিহরণ দিবার ব্যবস্থা হিরণ্যকেশী-গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়।

দুর্গার নাম 'কাত্যায়নী' হইয়াছে, কারণ পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে: মহর্ষি কাত্যায়ণ নামে একজন মুনি হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করিতেন। একদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার আশ্রমে আসিয়া মহিষাসুর বধের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ দেহ হইতে শক্তি বাহির করিয়া এক দেবীকে সৃষ্টি করেন। সেই দেবীকে মহর্ষি কাত্যায়ণ প্রথমে পূজা করেন, আর সেইজন্য দুর্গার নাম 'কাত্যায়নী' হইয়াছে। সেই দুর্গাদেবী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে উদ্ভূতা হইয়াছিলেন এবং শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে কাত্যায়ণের দ্বারা পূজিত হইয়াছিলেন এবং দশমীতে তিনি মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। দুর্গাদেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তিরূপিনী। দুর্গার অপর একটি নাম 'নারায়ণী' অর্থাৎ শেষনাগ-শয়নশায়ী নারায়ণের অংশ যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া আদ্যাশক্তি।

ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান যেখানেই যান দেখিবেন তাহাদের উদ্দেশ্যের একতা রহিয়াছে। একজন ইংরেজ, আমেরিকান, জাপানী, জার্মান, বা ফরাসীকে জিজ্ঞাসা করুন সে কি জাতির জন্য জীবনধারণ করে, না—নিজের জন্য। সে বলিবে যে, তার জাতিকে বাদ দিলে ও তার স্বদেশকে বাদ দিলে তার অস্তিত্বই থাকিবে না। তার প্রত্যেক কাজ সে করে জাতির মঙ্গলের জন্য। এই সকল জাতির এক একটি বিশেষ আদর্শ ও উদ্দেশ্য আছে। সেই আদর্শ লাভের জন্য প্রত্যেকেই একপ্রাণ। আর আমাদের দেশে ৩০ কোটী লোকের ৩০ কোটী উদ্দেশ্য এবং ৩০ কোটি আদর্শ। একমতাবলী ভারতবাসী দুজনও পাইবে না। জাতীয় আদর্শে পৌঁছিতে হইলে আমাদের একজন একপ্রাণ হইতে হইবে। বাংলাদেশে ৮ কোটী লোকের বাস। যদি তাঁহারা একই উদ্দেশ্য লইয়া দণ্ডায়মান হন তাহা হইলে জগতে এমন কোন্ শক্তি আছে যে তাহা দমন করে?

স্বামী অভেদানন্দ

দিব্যজীবনের খণ্ড চিত্র

লণ্ডনের এক বিকেল। ১৮৯৬ সাল। স্বামী বিবেকানন্দের ডাকে অভেদানন্দ সবে মাত্র কলকাতা থেকে লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছেছেন। সেদিন লণ্ডনের ব্রুমস বারি ষ্ট্রোয়ারে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে এক সভা বসেছে।

হঠাৎ বিবেকানন্দের আদেশ হল, সেই সভায় অভেদানন্দকে বক্তৃতা দিতে হবে। শুনে অভেদানন্দের সর্ব অঙ্গ হিম হয়ে গেল। একি বিপাকে ফেললে প্রভু। বক্তৃতা!! জীবনে তো তিনি কখনও বক্তৃতা করেননি। তার ওপর আবার মহামহা পণ্ডিতদের সামনে ইংরাজীতে বক্তৃতা। তিনি রাজী হচ্ছেন না। বিবেকানন্দও ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত অভেদানন্দ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। সেই দিনটি (১৮৯৬ সালের ২৭শে অক্টোবর) তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। বক্তৃতার বিষয় ছিল বেদান্তের এক বিশেষ মতবাদ।

ভাষণ আরম্ভ হল। কম্পু-কণ্ঠ ক্রমে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। শ্রোতৃমণ্ডলী গভীর আগ্রহে সেই উদাত্ত ভাষণ শুনতে লাগল এবং সেই নবীন সন্ন্যাসীর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতায় বিমুগ্ধ হল। সভায় বহুজ্ঞানী মনীষীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, মিঃ ষ্টার্ডি, মিঃ গুডউইন, মিস মুলার, মিস নোবল (নিবেদিতা), ক্যাপ্টেন সেভিয়ার, প্রমুখ অগণিত দার্শনিক, পণ্ডিত এবং বিদ্বজ্জন।

সেই বক্তৃতার পর বিবেকানন্দ তাঁর গুরু ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—Eevn if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it.

মিথ্যা হয়নি স্বামীজীর সেই বেদবাক্য।

১৮৮৬ সালের ৩রা অক্টোবর মঙ্গলবার (১২৭৩, ১৭ই আশ্বিন) নিমু গোস্বামী লেনের একটি ছোট বাড়ীতে যে ছেলেটি জন্মগ্রহণ করেছিল, তার জন্মকোষ্ঠী তৈরী করবার সময় জ্যোতিষী দুচোখ বড় করে বলেছিলেন, ওরে বাবা, এযে সাংঘাতিক ছেলে, দুনিয়া উলিয়ে দেবে।

রসিকলাল চন্দ্র এবং নয়নতারা দেবীর পুত্র কালীপ্রসাদ সত্যিই জ্যোতিষীর কথা নিজের জীবনে ফলিয়েছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি ঝোঁক।

১৮৩৩ সালে কালীপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম গিয়েছিলেন, এবং তারপর প্রায় তিন বছর ধরে প্রথমে দক্ষিণেশ্বর, তারপরে শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে যাওয়া আসা করেছিলেন। ঐ সময়ে ঠাকুরের অন্য সমস্ত যুবক-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ), রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) বাবুরাম (প্রেমানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ), হরিনাথ (তুরীয়ানন্দ) প্রভৃতির সঙ্গে একে একে তিনি পরিচিত হন। কখনও কখনও সেখানে রাত্রিবেলায় থেকে তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে বসে যোগ সাধনের উপদেশ ও উপায় শিখতেন। ঐ সময়ে ঠাকুরের তিন চারজন যুবক শিষ্য প্রায় প্রত্যেক রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের

কাছে থাকতেন এবং সারারাত্রি জেগে গভীর ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন। বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) সঙ্গে কালীপ্রসাদ আগে বহু পণ্ডিতের আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে এক ক্লাসে পড়তেন। এখন দক্ষিণেশ্বরে আবার দুজনে ঠাকুরের শিষ্য হওয়ায় তাঁদের সেই আগেকার পুরানো বন্ধুত্ব আরও জমাট ও মধুর হয়ে উঠল। ঠাকুরের এই সমস্ত যুবক শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট) কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে দেহত্যাগ করবার আগে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে তাঁর শিষ্যদের নেতা করে তাঁর উপর সমস্ত শিষ্যদের চালাবার ও দেখাশোনার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। সেইজন্য ঠাকুরের সমস্ত শিষ্যরা স্বেচ্ছায় নরেন্দ্রনাথকে 'নিজেদের নেতা' কিংবা 'লিডার' বলে সম্মান করতেন ও তাঁর আদেশ মত কাজ করতেন। কালীপ্রসাদও প্রথম পরিচয় থেকেই নরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুরাগী ও অনুগত হয়ে পড়েছিলেন। সাধন ভজন পড়াশোনা ও জ্ঞানের আলোচনায় সব সময়েই তিনি নরেন্দ্রের সঙ্গী হয়ে থাকতেন।

স্বামী অভেদানন্দ কুড়ি বছর বয়সে সন্ন্যাসী হন। সেই অল্প বয়সে বেদান্ত দর্শনে তাঁর অদ্ভুত পাণ্ডিত্য গভীর জ্ঞান আর কঠোর তপস্যার জন্যে তাঁর গুরু ভাইরেরা তাঁকে আদর করে 'কালী বেদান্তী' ও কালীতপস্বী ব'লে ডাকতেন।

স্বামী অভেদানন্দ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বরাহনগরে সেই পুরানো ভাড়াবাড়ীর আশ্রম থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন করেছিলেন। সেখান থেকে তুলসী মহারাজের সঙ্গে তারকেশ্বর দর্শন ক'রে তিনি কাশীধাম পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। কাশীধামে তিনি সেখানকার সিদ্ধ মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামিজীকে দর্শন করেন। তারপর শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ সরস্বতীকে দর্শন ও তাঁর সঙ্গে বেদান্তের বিচার করেছিলেন। এইভাবে তিনি বৃন্দাবন, অযোধ্যা, দ্বারকা জুনাগড় প্রভৃতি অনেক জায়গায় তীর্থদর্শন ও তপস্যা করার পর হরিদ্বারে এসে কিছুদিন থাকেন। তারপর এলাহাবাদের কাছে মুসির কেল্লার কিছু দূরে একটি পাহাড়ে তিনি কয়েকমাস কঠোর তপস্যায় কাটিয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি আঠার ঘণ্টা একাসনে ধ্যানে ডুবে থাকতেন। তখন তিনি এমন তন্ময় হয়ে পড়তেন যে পাশের কেল্লা থেকে কামানের আওয়াজেও তাঁর ধ্যান ভাঙ্গতো না। হরিদ্বার থেকে স্বামী অভেদানন্দ তারপর হৃষীকেশ চলে যান এবং সিদ্ধ মহাত্মা ধনরাজগিরির কাছে কয়েক বছর ধরে বেদান্ত, উপনিষদ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অভেদানন্দের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও সত্যকে জানবার অসাধারণ আগ্রহ দেখে ধনরাজগিরি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কয়েকমাস বাদে হৃষীকেশে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ধনরাজগিরির দেখা হয়েছিল। সেই সময়ে স্বামী অভেদানন্দের সম্বন্ধে ধনরাজগিরি স্বামী বিবেকনেন্দকে বলেছিলেন "অভেদানন্দ! অলৌকিকী প্রজ্ঞা।"

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নিউয়র্কে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ নতুনভাবে বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। আমেরিকায় তাঁকে বেদান্ত প্রচারের সমস্ত কাজ নতুনভাবে গড়তে হয়েছিল। বেদান্ত সোসাইটিকে তিনি নিজের বুদ্ধি, পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের জোরে নতুনভাবে গড়তে লাগলেন। তাঁর প্রচার কাজে ও ধর্ম-ব্যাখ্যান, এবং আলাপ আলোচনায় সুফল শীঘ্রই দেখাদিল। আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়, সভা, সমিতি, প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায়ই তাঁকে সম্মানের সঙ্গে আহ্বান করা হতো। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ম্যাককিনলি স্বামী অভেদানন্দকে আহ্বান করে তাঁর সঙ্গে বেদান্ত দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধে আলাপ করেছিলেন। দুতিন বছর বাদে সমস্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও আলাস্কায় পণ্ডিত সমাজে জানাজানি হয়ে গেলো, স্বামী অভেদানন্দ যেমন জ্ঞানী তেমনি সিদ্ধ যোগীপুরুষ ও নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত। একবছর বাদেই নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটীর নিজের বাড়ী তৈরী হয়ে গেলো।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার স্বামী তুরিয়ানন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতাকে নিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে প্রচারকার্যে স্বামী অভেদানন্দের বিপুল সাফল্য সুখ্যাতি ও সম্মান দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিবেকানন্দ তাঁর গুরু ভাইকে নিজের প্রাণঢালা ভালবাসা জানালেন। এইভাবে স্বামী অভেদানন্দ বছরের পর বছর ধরে সমস্ত উত্তর আমেরিকা ও কখন কখন লণ্ডনে, প্যারিসে ও বার্লিনে অক্লান্তভাবে প্রচারকার্য করে যেতে লাগলেন।

১৯০২ সালে স্বামিজীর (বিবেকানন্দ দেহত্যাগের পর অভেদানন্দ কয়েকবছর ধরে নানাস্থানে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। সেইসব বক্তৃতাগুলিই কিছুদিন বাদে India & Her people" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইংলণ্ড ফ্রান্স, জার্মাণী, আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশের সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত নরনারীরা এই বইখানি পড়ে জানতে পারলেন ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীন হ'লেও সভ্যতা, ধর্মে, বলে কত মহান প্রাচীন ও উন্নত। খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভারত সম্বন্ধে প্রচার শুধু অযথা নিন্দা বিদ্বেষ ও কুৎসা রটনা করা ভিন্ন আর কিছু নয়।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্য দেশে পঁচিশ বৎসর প্রচারকার্যের পর স্বদেশে ফিরে এলেন। কলিকাতায় ঐ সময়ে কয়েকটি বড় বড় অভ্যর্থনা সভায় হিন্দু সমাজের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে অভিনন্দন দিয়েছিলেন। কলকাতা, ঢাকা, গৌহাটী প্রভৃতি সহরের ছাত্র সমাজ ও শিক্ষিত যুবকদের দল অনেকগুলি সভার আয়োজন করে উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনতেন। বাঙ্গালী যুবক সমাজ শুধু তাঁর মুখ থেকে ধর্মসাধনার বাণী শুনেই মুগ্ধ হয়নি, দেশ, সমাজ ও জাতিকে এই যুগে কিভাবে গড়ে তোলা যায় সে সম্বন্ধে ঐ সময়ে যুবক সমাজে ও ছাত্রদের কাছে অনেক সভায় তিনি নতুন নতুন চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছিলেন যা শুনে দেশের যুব-সম্প্রদায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, অনুপ্রাণিত হয়েছিল, দেশের সেবা করার জন্যে, দেশকে মুক্ত করবার জন্যে মরণপণ প্রতিজ্ঞা করেছিল। বাংলার তরুণদল বুঝেছিলেন 'স্বামী অভেদানন্দ শুধু একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী দার্শনিক মনীষী বা মহাপণ্ডিত নন তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন স্বদেশপ্রেমিক দেশসেবক ও জাতীয়তাভাবে উদ্বুদ্ধ মহাত্মা। দেশ ও সমাজের দুঃখ দুর্গতি ও অবনতির জন্য তিনি কত কাতর ও ব্যাকুল। দেশের জন-সাধারণের আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনই তাঁর জীবনের প্রধান আকাঙ্খা।

তিনি ইংরাজী এবং বাংলায় অনেকগুলি বই লিখেছিলেন যার মধ্যে তাঁর প্রজ্ঞা, মনীষা এবং অসাধারণ লিপি-নৈপুণ্যের বিস্ময়কর প্রকাশ দেখা গিয়েছে।

১৯২৩ সালে তিনি কলকাতায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের নতুন বাড়ীটিকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' নাম দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে দেবত্তর সম্পত্তি রূপে সেই মঠকে উৎসর্গ করেন।

১৯৩৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর এই মহাপ্রাণ কর্মবীর সন্ন্যাসীর তিরোধান ঘটে।

স্বামী অভেদানন্দের জীবনের কয়েটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা

টাউন হলের মহতী সভা

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে আমাদের দেশের হিন্দুরা একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন যে তিনি হিন্দু ধর্মের যথার্থ প্রতিনিধি নন। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে ছিল কিছু সংখ্যক মিশনারীর অপপ্রচার। বিবেকানন্দ তখন আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিখ্যাত ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে আমেরিকাবাসীর হৃদয় ও মন জয় করে বিশেষ গৌরব অর্জন করেছেন। এই ধরণের অপ-প্রচারের খবর পেয়ে তার মন চঞ্চল হয়। তিনি অভেদানন্দ প্রমুখ তাঁর গুরুভাইদের কলকাতায় একটি ধর্ম সভার আয়োজন করতে বলেন এবং সেই সভায় আমেরিকায় তাঁর কার্যাবলী সমর্থন করে তিনি যে হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধি এই কথা প্রচার করতে বলেন। ১৮৯৪ সালে এই উদ্দেশ্যে কলকাতার টাউন হলে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে অভেদানন্দের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এদেশের বিশিষ্ট হিন্দুদের মুখে তখন শোনা গিয়েছিল—"হিন্দু হোয়ে যারা কালাপানি পার হয় তারা খাটি হিন্দু নয় তাঁদের সঙ্গে আমাদের সংস্রব রাখা উচিৎ নয়।" ইত্যাদি। এমন কি সেই সময়কার একজন বাঙালী বিচারপতি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—"বিবেকানন্দ নাম তার গুরু প্রদত্ত নয় তাছাড়া শাস্ত্র অনুসারে শূদ্রের সন্ন্যাস দীক্ষায় অধিকার নেই। অতএব এই শাস্ত্র বহির্ভূত ব্যাপারে আমার কোন আস্থা নেই, কাজেই এই সভায় সভাপতি হোতে আমি রাজী নই।' এই তো তখনকার গোড়া হিন্দুদের মানসিক রূপ। তারই বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন স্বামী অভেদানন্দ। সভা করতেই হবে। যেমন করেই হোক। আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে ছুটোছুটি করেছেন কলকাতা ও আশপাশ জায়গার বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে। শেষপর্যন্ত উত্তরপাড়ার ধনাঢ্যবন্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সেই সভার সভাপতি হন এবং ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর টাউন হলে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। পাঁচ ছ' হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল সেই সভায় তাদের মধ্যে বহু মনীষীও উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন।

এই সভাটির (যার উল্লেখ বিশেষ কোথাও নেই) বিশেষ গুরুত্ব ছিল বিবেকানন্দ-অভেদানন্দের কর্ম-জীবনের সূচনায়। এই সভাই দেশের লোকের মনকে তাঁদের প্রতি আরো বেশী আকৃষ্ট করেছিল। সভাপতির ভাষণে রাজাপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন "Brother Vivekananda has opened the eyes of an important section of the civilized world by explaining the great truths of Hindu religion and has convinced them that the most valuable products of human thought in the regions of philosopy and religion are to be found not in the western science and literature but in our ancient shastras এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি যথাসময়ে ডক্টর ব্যারোজ মেরী হেল ও বিবেকানন্দের কাছে আমেরিকায় পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশ্ন

বিস্ময়কর মিল দেখা যায় বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে দোলায়মান চিত্তের ব্যাকুলতায়।

হঠাৎ একদিন ঠাকুর অভেদানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যাঁরে, তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস?"

চমকে উঠলেন অভেদানন্দ! ঠাকুর তাঁর মনের দ্বন্দ্ব ঠিক টের পেয়েছেন। তিনি চুপ করে রইলেন। ঠাকুরের আবার প্রশ্ন—"তুই ঈশ্বর মানিস, শাস্ত্র মানিস, লোকাচার মানিস?"

অভেদানন্দ সংক্ষেপে বললেন—"না।"

ঠাকুর গলা চড়িয়ে বললেন—"অন্য কোন সাধুর কাছে যদি একথা বলতিস তো সে তোর গালে চড় মারতো।"

অভেদানন্দ বললেন—"আপনিও মারুন। যতক্ষণ না নিশ্চয় করে বুঝতে পারছি যে ঈশ্বর আছেন এবং যে সত্য ততক্ষণ শুধু অন্ধবিশ্বাসে আমি মানবো কি করে? আমাকে বুঝিয়ে দিন, আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে দিন, তখন আমি সব মানব।"

পরমহংসদেব হেসে বললেন—"একদিন জানবি সব। মানবি সব। ওইতো, নরেন, তোরই মত, একদিন কিছু মানতো না, আর এখন রাধে রাধে বলে কাঁদে, কেত্তনের আসরে নাচে। এর পর তুইও সব মানবি।"

স্বামী অভেদানন্দের জীবনে পরমহংসদেবের সেদিনকার ওই কথাগুলির অসীম তাৎপর্য ছিল তা পরে আমরা সহজেই জানতে পেরেছি স্বামীজীর জীবনচরিত পড়ে।

প্রথম স্মৃতি সভা

স্বামী অভেদানন্দের তিরোধানের পর ১৯৩৯ সালের ২ অক্টোবর সন্ধ্যা ছয়টায় এক বিরাট স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয় আলবার্ট হলে (কলেজ স্কোয়ার)। সেই সভায় বহু জনসমাবেশ হয়েছিল। বহু জ্ঞানীগুণী মনীষী স্বামীজীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সমবেত হয়েছিলেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ব্যারিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জি। সভাপতির ভাষণে তাঁর একটি উক্তি এখনো আমাদের কানে বাজছে ও চিরদিনই বাজবে। স্বামী বিবেকানন্দ আর স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে তিনি সেদিন উদ্দীপ্ত কণ্ঠে যা ঘোষণা করেছিলেন তা ভারতবাসীর মনে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি বলেছিলেন—Two Lions of India roared at the shores of America, Swami Vivekananda and Swami Abhedananda.

সত্যিই পুরুষসিংহ ছিলেন ওই দুই বীরসন্ন্যাসী।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশের গুপ্ত সমিতির অবদান

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

কংগ্রেস আন্দোলনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু হয়, যখন বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে 'বয়কট ও স্বদেশী' আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন থেকে এই প্রতিবাদ পূর্ব্বের মতো ক্রন্দন ও আবেদন নিবেদনের রূপ না নিয়ে শত্রুর শক্তির বিরুদ্ধে নিজের শক্তি প্রয়োগের রূপ গ্রহণ করলো—অর্থাৎ একটা Sanction এর ভিত্তির উপরে গঠিত আন্দোলন হয়ে দাঁড়ালো। এ আন্দোলনের মূল কথাটা হচ্ছে এই যে আমরা যেন ইংরেজকে ডেকে বলছি—"হে ইংরেজ! আমাদের মতের বিরুদ্ধে নিজের সুবিধার জন্যে জোর করে তুমি যে বাংলা দেশটাকে দুইভাগে ভাগ করেছে, তাতে আমাদের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। তুমি যদি বঙ্গভঙ্গ রহিত করতে রাজি না হও, তবে আমরা দেখাবো যে আমরাও শক্তিহীন নই—আমরাও আমাদের শক্তি প্রয়োগ করে তোমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার ব্যবস্থা করবো তোমার আনীত পণ্য-সম্ভার বর্জ্জন করে।" ইংরেজ বণিকের জাত, বাণিজ্যই ছিল তার শ্রীবৃদ্ধির প্রধান সহায়। তাই বয়কট অস্ত্র-প্রয়োগে তার সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। বাংলা দেশের এই বয়কট প্রস্তাবটি প্রথম প্রথম কংগ্রেস গ্রহণ করতে রাজি না হলেও—শেষ পর্য্যন্ত গ্রহণ না করে পারেনি।

এই সময় পর্য্যন্ত যে প্রস্তাবাদির মাধ্যমে কংগ্রেস তার দাবী-দাওয়া পেশ করেছে, তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ভারতীয় জাতির জন্যে প্রথম প্রথম কংগ্রেস চাচ্ছিলো খানিকটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা (Some power in the administration of the country)। কিন্তু এই খানিকটা ক্ষমতা-লাভের দাবীটাই যে এক দিন পূর্ণ ক্ষমতা-লাভের দাবীতে পর্য্যবসিত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না—হওয়াই অনিবার্য এবং হয়েছেও তা-ই। (The demand for all power is inherent in this demand for some power in the administration of the country and some day it is bound to be so). ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্মের চুয়াল্লিশ বছর পরেই ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সম্বলিত প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়েছিল।

বাংলা দেশ বয়কট প্রস্তাব কার্যকরী করে তুলতে অগ্রসর হলে গভর্ণমেণ্ট দেশের বুকের উপর দিয়ে অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিলে। কিন্তু এ অত্যাচারের প্রতিকার কি? প্রতিকারের পথ বা প্রতিশোধ নেবার পথ কংগ্রেস খুঁজে পেলোনা—পাওয়াও সম্ভবপর ছিল না। এই সময়ে বাংলা দেশে সমগ্র জাতির জন্যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের আশায় উদ্বুদ্ধ এক দল চিন্তাবীর ও বহু যুবক ইটালীর স্বাধীনতা-আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটা আখড়া আন্দোলন (Physical culture movement) গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা

মনে করেছিলেন যে দেশের স্বাধীনতা লাভ করতে হলে ইংরেজের সঙ্গে একদিন না একদিন যুদ্ধ করতেই হবে—যুদ্ধ করতে হলে, দৈহিক শক্তি-সম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান ও সাহসী বহু যুবক-সৈন্য চাই। কিন্তু বাঙালী সামরিক শিক্ষা কোথায় পাবে। ইংরেজ বাঙালীকে বিশ্বাস করে না। তাই বাঙালীর পক্ষে সামরিক শিক্ষা নিষিদ্ধ। এরূপ অবস্থায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে গোপনে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারই প্রস্তুতি হিসেবে প্রথমে দেশময় সংঘ-বদ্ধ শরীর-চর্চ্চা প্রয়োজন। তাই দেশের সর্ব্বত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক চর্চ্চার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের ফলে এই সব দলের লোকদের মনে এই চিন্তা এলো যে এভাবে মুখ বুজে ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করা, কিছু না বলে পড়ে পড়ে মার খাওয়া জাতীয় অবমাননার একশেষ—এরূপ অবস্থায় একটা ঢিল ছুঁড়তে পারলেও জাতীয় আত্ম-অবমাননার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এই অবস্থা ও এই মনোভাব থেকে উদ্ভূত হ'লো বোমা-রিভলবার ও গুপ্ত সমিতির আন্দোলন। ইটালীর কার্ব্বোনারী গুপ্ত-সমিতির দৃষ্টান্তই এ সব সমিতির আদর্শ হিসেবে গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল-মন্ত্র হোলো—চাই "অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি"। প্রথম থেকেই এ আন্দোলন বিদেশী শক্তির অত্যাচারের নিরসনকল্পে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলন হিসেবেই গড়ে উঠেছিল।

যখন একটা বিরাট বিপুল দুর্জ্জয় অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে একটা তীব্র নৈতিক বিদ্রোহের ভাব অত্যাচারিতের মনে ঘনিয়ে ওঠে, অথচ নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে প্রতিকারের কোনো পথ খুঁজে পায় না, তখন তাদের মধ্যে যারা নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে চায় না, তারা প্রতিশোধ নেবার জন্যে এমন অস্ত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, যা সহজে লুকিয়ে রাখা যায়, কিংবা লুকিয়ে নিয়ে চলা-ফেরা করা যায়। কেন না, প্রকাশ্যভাবে তার বিরুদ্ধে কিছু করবার শক্তি না থাকলেও, বোমা রিভলবার লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ আক্রমণে অত্যাচারী কর্ম্মচারীর চরম শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা খুবই সম্ভবপর। এ দেশেও এই ভাবেই বোমা-রিভলবারের দল গজিয়ে উঠতে থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আখড়া আন্দোলন থেকে এবং তার ফলে এ দেশে গুপ্ত সমিতির যুগ প্রবর্ত্তিত হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা অনুশীলন সমিতির লাঠি-ছোরা খেলার আখড়া থেকে বারীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বোমার দলের উদ্ভব, পুলিন দাস মহাশয়ের লাঠি-ছোরা খেলার আখড়া থেকে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির উৎপত্তি, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত আত্মোন্নতি সমিতির আখড়া থেকে বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির উদ্ভব, ময়মনসিংহের হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সাধনা সমিতি এবং বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী বরিশাল দলের উৎপত্তির ইতিহাসও একই; অর্থাৎ আখড়া আন্দোলন থেকে উদ্ভূত। বাংলা দেশের অন্যান্য জেলার বিপ্লবী দলের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

এ দেশে বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির যুগ কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, সে সম্বন্ধে ১৩৪৯ সনের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে ক্ষীরোদ কুমার দত্ত মহাশয় লিখেছেন—১৮৭০ সালের নিকটবর্ত্তী কোনো এক সময়ে বাংলায় বিপ্লবের আদিপর্ব্বের সূচনা বলা যায়। তিনি আরো বলেন—বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র কুমার, ভূপেন্দ্রনাথ, পুলিনচন্দ্র সকলেই বিপ্লব-যজ্ঞের হোতা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের নামও বাদ দেওয়া যায় না।

কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে যা কিছু হয়েছে, সবই প্রায় ইটালীর স্বাধীনতা-অর্জনের ব্রতে ব্রতী কার্বোনারীদের আদর্শে গুপ্ত সমিতির ভাবটাকে (idea) নিয়ে দেশের শিক্ষিতদের ভিতরে একটা আলোড়ন—একটা খেলা ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃত কাজ আরম্ভ হয় বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়টাতেই। এর পূর্বে দেশের অবস্থা ও জন-সাধারণের মনোভাব বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির অনুকূলে গড়ে ওঠেনি। তাই নিবারণ স্বামী, বারীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁরাই চেষ্টা করেছেন কিছু একটা গড়ে তুলতে, কেউ-ই সফলকাম হ'তে পারেননি। ১৯০৫ সালের পূর্বে বারীনবাবু একবার গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা দেশে এসেছিলেন, কিন্তু অবস্থা অনুকূল নয়, দেখে ফিরে গিয়েছিলেন বরোদায়।

বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির লোকেরা ইংরেজের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার প্রচেষ্টায় মারের বদলে মার দিতে গিয়ে মার খেয়েছে অনেক বেশী। তাই এ সব সমিতির মেম্বারগণকে যে কোনো আপদ-বিপদ, দুঃখ, কষ্ট, দীর্ঘ-মেয়াদী কারাবাস—এমন কি ফাঁসির জন্যেও সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হ'তো এবং সেই রকম শিক্ষাই তাদের দেওয়া হতো। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাদের অপরিসীম আত্ম ত্যাগ ও দুঃখ-বরণের দৃষ্টান্তে দেশের লোকের মন তাদের প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে লাগলো। দেশের লোকের মন তাদের প্রতি যতটা সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হতে লাগলো ইংরেজের প্রতি অন্তত ততটা ভীতত্রস্ত ও ভীতত্রাস হয়ে উঠতে লাগলো। তাই এ কথা বলা যায় যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে আত্ম-ত্যাগ ও দুঃখ-বরণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচারের জন্যে এবং দেশের লোকের মন থেকে ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের ভাব ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্যে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে কেউ রাজনৈতিক কাজে এগিয়ে যাবে, তাকে আত্ম-ত্যাগ ও দুঃখ-বরণের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে এবং যে সেজন্যে প্রস্তুত না হবে, তার যে রাজনৈতিক কাজ করার অধিকারই নেই—এই ভাবটা গুপ্ত সমিতির লোকদের আত্মত্যাগ ও পূর্ণ আত্মাহুতির দৃষ্টান্তে দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কোনো লোক কোনো দুঃখ-বরণের কাজে এগিয়ে না গিয়ে যদি শুধু জন-সভায় বক্তৃতা দিয়ে এসে চুপ করে ঘরে বসে থাকতো, তবে তার সম্বন্ধে অন্য লোকেরা বলতো—"ভারী তো রাজনীতি করেন তিনি—বক্তৃতা দিয়ে এসে চুপ করে ঘরে বসে থাকেন। একে কি রাজনীতি করা বলে? রাজনীতির ধারিত্ব এড়িয়ে চলা কোন দিশী রাজনীতি?" ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়ের পূর্বেই দেশের লোকের মনোভাব এরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (Sacrifice and suffering as a political method already established itself in the psychology of the people, before the advent of Mahatma Gandhi into Indian politics).

বিপ্লবীদের কর্ম-পদ্ধতি হচ্ছে দুঃখ-কষ্ট বরণের পদ্ধতি—দুঃখ-কষ্ট বরণ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা। মহাত্মা গান্ধীর কর্ম-পদ্ধতিও তাই—তাঁর অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পদ্ধতিও দুঃখ-কষ্ট বরণের পদ্ধতি। তাই এ কথা বলা যায় যে মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত দুঃখ-কষ্ট বরণের পথ গ্রহণ করবার জন্যে দেশের লোকের মন বিপ্লবীদের কার্য-কলাপের ফলে আগে থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিল। তৈরী ক্ষেত্রেই তিনি এসে কাজে লেগেছিলেন। তাই জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে যখন তিনি কংগ্রেসের মারফৎ ডাক দিলেন, দেশশুদ্ধ লোকই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

বিপ্লবী দলের যে দুঃখ-কষ্ট বরণের পদ্ধতি সে পথটি বহু লোক অনুসরণ করতে পারেনা—স্বল্প লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর। অথচ ইংরেজের মতো একটা অমিত পরাক্রমশালী শক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যু পণ করে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়া এবং অসম সাহসিক কাজের দ্বারা প্রমাণ করা যে ইংরেজ যত বড় শক্তি-

শালীই হোক না কেন, তাকে মানিনে—তাকে গ্রাহ্য করিনে—যেমন করে হোক, এক দিন না একদিন তাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবই—এরূপ শক্তিত আচরণ ঘুমন্ত দেশটাকে জাগাবার জন্যে আন্দোলনের প্রথম পর্ব্বে একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ কাজের জন্যে বেশী লোকের প্রয়োজন নেই—অল্প সংখ্যক লোকই যথেষ্ট। তা ছাড়া দেশশুদ্ধ লোক নিয়ে গুপ্ত সমিতি গঠন করা চলেনা—করলে তা আর গুপ্ত সমিতি থাকে না। তাই বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কর্ম্ম-পদ্ধতিকে বলা যায় অল্প সংখ্যক লোকের কর্ম্ম-পদ্ধতি। (It is a method of the few).

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বোমা রিভলবার বাদ দিয়ে কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা হিসেবে যে অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করলেন, তাও দুঃখকষ্ট বরণের পদ্ধতি বটে। কিন্তু এ পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে আমরাই দুঃখ কষ্ট বরণ করবো, অপর পক্ষের দুঃখ-কষ্টের কারণ সৃষ্টি করবো না—মারের বদলে মার দেবোনা, মার খেয়ে হটেও যাবোনা—বরং মার খেতে খেতেই সত্যের পথে—কর্ত্তব্যের পথে এগিয়ে যাবো। এই পদ্ধতি অনুসারে কাজ করতে এগিয়ে আসার জন্যে দেশশুদ্ধ লোককেই ডাক দেওয়া চলে এবং দেশের যে-কেউ-ই এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে—অন্ততঃ আগের চেয়ে যে অনেক বেশী লোকের পক্ষে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভবপর, এ কথা পরবর্ত্তী ইতিহাসই প্রমাণ করেছে। তাই মহাত্মা গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিকে বলা যায় অধিক সংখ্যক লোকের পদ্ধতি। (Method of the many)।

দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে দুঃখ-কষ্ট বরণের এই যে পদ্ধতি, এর মোট রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বা রাজনৈতিক ফলটা কি? গান্ধীজী বলেন—প্রতিশোধ না নিয়ে দুঃখ-কষ্ট বরণের ফলে আমাদের ন্যায্য দাবীর প্রতি ক্রমে বিশ্বের অধিক সংখ্যক লোকের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ—এমনকি ইংরাজের দেশের সাধারণ লোকের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভও সম্ভবপর এবং তার ফলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন সহজতর হওয়া অনিবার্য। এইভাবে দুঃখ-কষ্ট বরণের আর একটা ফল হলো এই যে, ইংরেজ রাজত্বের প্রতি আমাদের যে একটা সহজ আনুকূল্য ও সমর্থন ছিল, তা খসে যেতে লাগলো। যে কোনো গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে বিশেষ করে এই গণ-তান্ত্রিক যুগে, শাসিত জন-গণের অধিকাংশের স্বেচ্ছাকৃত সমর্থন। (willing support of the majority of the people is the very basis of any government)। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পিছনেও এ দেশের অধিকাংশ লোকের একটা সাগ্রহ সমর্থন ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার সময়ে দেশের অধিকাংশ লোক বিশেষ করে নব্য শিক্ষিত লোকেরা মনে প্রাণে ইংরেজের শাসনকে অভিনন্দিত করেছে। সে যুগে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে যে মানত রাখা হ'তো, তা অনেকেই জানেন। ডাক-হরকরা রাত্রে পথ চলতে চলতে মহারাণীর নামে দোহাই পাড়লে, বাঘ-ও যে নিরীহ মেষ-শাবকের ন্যায় ব্যবহার করে এবং দূরে সরে যায়, এ কথা বহু লোক বিশ্বাস করতো। মহারাণীর মৃত্যু শোকে এ দেশের বহু সংখ্যক লোক যে কেঁদে আকুল হয়েছিল তার সাক্ষ্য দেবার লোকের এখনো অভাব নেই। ইংরেজ রাজের প্রতি আমাদের এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রতি আমাদের যে একটা প্রাণের টান দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, দীর্ঘ দিন ধরে আমরা দুঃখ কষ্ট বরণের পদ্ধতি অনুসরণ করে তার মূল ধসিয়ে দিয়েছি। ক্রমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দেশের প্রায় সমস্ত লোকের মনোভাবই এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তাদের মধ্যে কেউ আর ইংরেজকে চায় না। সকলের মনেই এই ভাবটা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে ইংরেজ শাসন বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বা এদেশের মঙ্গল নেই। বার বার সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে এ দেশের লোকেরা ইংরেজকে চায়না—চায় কংগ্রেসকে এবং

কংগ্রেসের শাসনকে। ষাট বছর ধরে কংগ্রেসের পতাকাতলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশে একটা রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে—যা কোনো দিন এ দেশে ছিলনা এবং এই রাজনৈতিক ঐক্য অধিগত হওয়ার ফলেই আমরা স্বাধীন হয়েছি।

দেশের অধিকাংশ লোক যে গভর্ণমেণ্টকে চায়না, সে গভর্ণমেণ্ট বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনা—এক দিন না একদিন তাকে যেতেই হবে—যাওয়া অনিবার্য্য। সে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ক্রমে ঘরে বাইরে এত সমস্যা দেখা দেয় যে দেশের লোকের সমর্থন ছাড়া সে সব সমস্যার কোনো সমাধান সে খুঁজে পায় না। তখন তার টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরও সেই অবস্থাই হয়েছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক ঐক্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় গড়ে ওঠেনি, বলাই বাহুল্য। রাজা রাম মোহন রায়ের সময় থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তি কোনো সংঘ বা কোনো প্রতিষ্ঠান দেশের উন্নতির জন্যে সংহতির জন্যে কিংবা দেশের স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে যদি কিছু মাত্র প্রয়াসও করে থাকে, তবে এই রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার ব্যাপারে সে ব্যক্তি, সে সংঘ বা সে প্রতিষ্ঠানের অবদান অবশ্যই আছে। এমন কি যে ব্যক্তি মনে মনেও সত্যি সত্যি দেশের স্বাধীনতা কামনা করেছে, এ ব্যাপারে তারও অবদান নিশ্চয় আছে।

কংগ্রেস হচ্ছে একটা সাধারণীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান—জাতির স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টার মূর্ত্ত প্রতীক। এই হিসেবে কংগ্রেস সমগ্র দেশের বা সমগ্র জাতির প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান—একটা কোনো দল বিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়। কংগ্রেস কর্ত্তৃক বিপ্লবীদের কর্ম্ম-পন্থার মূলগত ভাবটা (spirit) গৃহীত হলেও, বিপ্লবীদের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ তখনও কংগ্রেস গ্রহণ করেনি। তাই কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগের আহ্বানে দেশের জন-সাধারণের একটা খুব বড় অংশ সাড়া দিলেও, বিপ্লব-পন্থী দলের প্রভাব ও প্রসার কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হ'লো না—বরং উত্তরোত্তর বেড়েই যেতে লাগলো। যে পর্য্যন্ত না কংগ্রেস ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ অসংশয়িতভাবে গ্রহণ করেছে, সে পর্য্যন্ত বিপ্লব-পন্থী গুপ্ত সমিতির প্রভাব পুরোপুরি ভাবেই অব্যাহত ছিল। দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে বিপ্লবীদের বার বার কারা-বরণ ও মৃত্যু-বরণের দৃষ্টান্তে দেশের লোকের মনে স্বাধীনতার আদর্শ বদ্ধমূল হয়ে উঠতে থাকে। কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে যখন এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ লোকেরা সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করলো, তখন অনিবার্য্য রূপেই কংগ্রেস কর্ত্তৃক এই আদর্শ গৃহীত হলো।

১৯০৬ সালে দাদাভাই নৌরোজী কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতায় স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরে স্বরাজের সংজ্ঞা নির্দ্দেশের জন্যে দাবী উপস্থিত হয়। গান্ধীজী বললেন—Swaraj within British Empire if possible, or outside if necessary—সম্ভবপর হ'লে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে, আবশ্যক হলে বাইরে গিয়েও স্বরাজ লাভ। কিন্তু বিপ্লবী দলের লোকেরা ও তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরা এতে খুশী হলো না। তারা বছর বছর কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব উপস্থিত করতে লাগলো। তাদের পক্ষ থেকে বহু বছর ঢাকার উকিল শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই কাজটা করেছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতার ফলে কংগ্রেসে সে প্রস্তাব গৃহীত হতো না। শ্রীশবাবু বক্তৃতায় এই কথাটাই বলতেন—"আমার কথা আজ আপনারা শুনছেন না বটে। কিন্তু একদিন না একদিন, শুনতেও হবে, মানতেও হবে। কেন না,- আমি যাদের অন্তরের কথা এই কংগ্রেসের বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে আজ বলছি, তারা কথা বলে না—বক্তৃতা দেয় না, তারা প্রাণ দিয়ে

রাজনীতির চর্চা করে।" এ কথার মানে—বিপ্লবীদের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই বছর বছর শ্রীশবাবু এই প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থিত করতেন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের ব্রুসেলস্ নগরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লিগ-এর একটা কন্‌ফারেন্স হচ্ছিলো। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সেখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—কংগ্রেস কি চায়? তার উদ্দেশ্য কি? তিনি বলেছিলেন—কংগ্রেস চায় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (Self-Government)। তখন কন্‌ফারেন্স্-এর কর্তৃপক্ষ পণ্ডিত নেহেরুকে বলেছিলেন—"আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অর্থ যদি হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, তবে তো আপনার এখানে অংশ গ্রহণ করার অধিকারই নেই। এটা সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী কন্‌ফারেন্স। যারা কোনো সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ চায়—পূর্ণ স্বাধীনতা চায় না, তাদের স্থান তো এখানে হতে পারে না।" কথাটা খুবই সত্য। জহরলাল খুবই অপ্রস্তুত হলেন—কোনো জবাব দিতে পারলেন না। তার পরেই তিনি ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পথে কলম্বোতে নেমে সেখান থেকে সোজা মাদ্রাজ কংগ্রেসে এসে স্বাধীনতা প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কেবল বিপ্লববাদী দলের যারা সেখানে ছিল, তারা ও তাদের সমর্থনকারী বন্ধুবর্গ অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে এ প্রস্তাবের পক্ষে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে লোকমত সংগ্রহের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ বছর সে প্রস্তাব পাশ হলো না—পরিবর্তিত আকারে যে প্রস্তাব পাশ হলো তাতে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ছিল না।

পরের বছর কলিকাতা কংগ্রেসে Independence League ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপোষ-রফার ফলে যখন ঠিক হ'লো যে সেবারে আর কংগ্রেসে স্বাধীনতা-প্রস্তাব তোলা হবে না,—এক বছরের মধ্যে Dominion Status যদি লাভ করা না যায়, তবে পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে আবার এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে, তখন বাংলার বিপ্লবীরাই সুভাষ বাবুকে দিয়ে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে স্বাধীনতার সমর্থনে পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল! এবারেও এ প্রস্তাব পাশ হলো না।

তারপরে মহাত্মা গান্ধী স্থির করলেন যে পরবর্তী বছরে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বেই একটা সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে। কাউন্সিল ও অ্যাসেম্বলী থেকে পদত্যাগের নির্দেশও সেবারের দেওয়া হয়েছিল। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হওয়া অনিবার্য। তার পূর্বে কোনো আন্দোলন আরম্ভ করলে, তা Dominion Status-এর জন্যে আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার বিপ্লবীরা তখনই আন্দোলন আরম্ভ করার বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো। তাদের এক প্রতিনিধি এলাহাবাদে গিয়ে সেবারের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে ধরলেন। তাঁকে বলা হলো—"আগামী বছর Independence League-এর প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হ'বেন। আমরা চাই তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন আরম্ভ হোক। কিন্তু এখন আন্দোলন আরম্ভ করলে, কবে যে আবার কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে এবং কবে যে জহরলালজী প্রেসিডেন্ট হবেন, তা একেবারেই অনিশ্চিৎ। ২।৪ বছরও কেটে যেতে পারে। তার অর্থ—কবে যে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হবে, তারও ঠিক নেই। এখন আন্দোলন আরম্ভ করলে সকলে মনে করবে যে স্বাধীনতার প্রস্তাবটাকে আরও কিছু দিন অন্ততঃ ঠেকিয়ে রাখবার জন্যেই গান্ধীজী অসময়ে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। তাতে আন্দোলনের জোর হবে না।"

এর পরে যে কারণেই হোক, মতিলালজী নিজেই উদ্যোক্তা হয়ে মহাত্মাজীকে বলে করে তখনকার

মতো আন্দোলন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করলেন। লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে মহাত্মাজী মতিলাল নেহেরুকে সঙ্গে নিয়ে বড় লাটের সঙ্গে দেখা করে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন যে ইংরেজ তখনো Dominion Status-এর কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি কি না। কিন্তু তিনি বড়লাটের কাছ থেকে সেরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি পান নি। তাই লাহোর কংগ্রেসে অনিবার্য রূপে বিনা বাধায় স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। এই সব কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার অর্থ এইটে দেখানো যে প্রধানতঃ বিপ্লবীদের চেষ্টায়ই স্বাধীনতার প্রস্তাব ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পাশ হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর অনিচ্ছা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও।

মোটের উপর একথা বলা যায় যে বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারা যে কাজটা হাসিল হয়েছে, তা হচ্ছে —এক দিকে দেশোদ্ধারের উদ্দেশ্য নিয়ে অসম-সাহসিক কার্য-কলাপ ও বিপুল প্রচেষ্টার দ্বারা ধাক্কা দিয়ে ঘুমন্ত দেশটাকে জাগিয়ে দেওয়া এবং পরিকল্পনা অনুসারে কার্যোদ্ধারের জন্য বার বার স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে সমগ্র দেশের জন্যে মৃত্যুর সনদ এনে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের সব চেয়ে বড় নালিশ এই যে তাঁহারা আমাদের জন্য অন্নের সংস্থান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর সনদ রাখিয়া যান নাই। সেই তো তাঁহারা মরিলেনই, কিন্তু মরার মতো মরিলেন না কেন? যদি কোনো একটা উপলক্ষে তাঁহারা তা করিতেন, তবে আমরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিতাম।" যে জাতির লোকেরা মরে, কিন্তু জীবন দিতে জানে না, তাদের বাঁচবারই অধিকার নেই। তাই প্রত্যেক জাতিরই জাতি হিসেবে বাঁচবার জন্যেই মৃত্যুর সনদ থাকা চাই। আমাদের তা ছিল না। বিপ্লবীরাই প্রথম এ জাতির জন্যে মৃত্যুর সনদ অর্জন করতে এগিয়ে গিয়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণেই তা অর্জন করেছিল।

বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে এক দিকে এই মৃত্যুর সনদ অর্জন করা হয়েছে। অপর দিকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ও দুঃখ-কষ্ট বরণের কর্ম-পন্থা গ্রহণ করিয়ে সে প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা অর্জনের একটা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। (The net result of the whole revolutionary movement was to make the Indian National Congress a fit instrument for the capture of complete political power)। বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেস আন্দোলন ও বৈপ্লবিক আন্দোলন উভয়ে উভয়ের পরিপূরক ছিল। কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, বৈপ্লবিক আন্দোলন আগে আগে চলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, কংগ্রেস পরে এসে সে ক্ষেত্রের ফল-শস্য আহরণ করেছে। কংগ্রেসের দুঃখ কষ্ট বরণের কর্ম-পন্থা অবলম্বন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এবং লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ —উভয় ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

লাহোর কংগ্রেসের পরে কংগ্রেসের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এই আন্দোলনের শেষ দিকে যখন ছোট বড় সব কংগ্রেস নেতারা জেলে এবং আন্দোলনও প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে, তখন বাংলা দেশে বোমা-রিভলবারের সাহায্যে বিপ্লবীদের সন্ত্রাস সৃষ্টির আন্দোলন। তখনকার অবস্থা এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে কলকাতার রাস্তায় খদ্দর বস্ত্র পরিহিত কাউকে দেখলেই পুলিশ তাকে বেদম প্রহার করতো। ক্রমে দেশীয় পুলিশ নিরীহ নির্দোষ লোকদিগকে লাঠি-পেটা করতে অস্বীকার করলো। তখন দেশীয় পুলিশরা দাঁড়িয়ে থাকতো এবং ইউরোপীয় সার্জেন্টরা খদ্দরধারী দেখলেই নির্মমভাবে প্রহার করতো। তখন সাধারণ লোকের ভিতরেও স্বভাবতঃই এই শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিশোধের মনোভাব জেগে উঠেছিল। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ করে বিপ্লবীরা তখন যে কর্ম-পন্থা গ্রহণ করলো, তার মূল কথাটা হচ্ছে—বাংলা দেশের যে কোনো জায়গায়—যত বেশী জায়গায় সম্ভব, প্রধানতঃ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের

উপর সশস্ত্র আক্রমণ—প্রতি ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা সফল হোক, কি না হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। (Attempt on European lives as widely as possible, success or failure does not matter)। এ দেশে যে আর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের জীবন নিরাপদ নয়—এই কথাটা বিপ্লবীরা কর্তৃপক্ষের মনে বদ্ধমূল করে দিতে চেয়েছিল।

এই পরিকল্পনা অনুসারে সেবারে বিপ্লবীদের দ্বারা যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তার মধ্যে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :—

ডালহৌসী স্কোয়ারে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপরে বোমা নিক্ষেপ, ঢাকায় লোম্যানের হত্যা, কুমিল্লায় ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যা, কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ জেলের ইন্‌স্পেকটর জেনারেল সিমসনের হত্যা, মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পেডী ও ডগলাস সাহেবের হত্যা, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট হলে বাংলার লাট জ্যাকসনের হত্যা-চেষ্টা, দুই দুই বার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ভারত-বিদ্বেষী ওয়াইল্‌সনের হত্যা-চেষ্টা, বিভলবারের গুলিতে বিচারক গালিকের হত্যা প্রভৃতি।

লবণ সত্যাগ্রহ এবং সেই সময়কার বিপ্লবী আন্দোলনের সময়ে গভর্ণমেণ্ট দেশের বহু লোককে বিচারে বা বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রেখেছিল। ১৯৩৮ সালের মধ্যে একে একে প্রায় সবাই মুক্তিলাভ করে। বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে অনেকেই জেলে বসে পরামর্শ করে স্থির করেছিলো যে, কংগ্রেস যখন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করেছে, তখন আর বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কোনো প্রয়োজন নেই—গুপ্ত সমিতির কার্য্য-কলাপ বন্ধ করে দিয়ে বিপ্লবীদের সর্ব্বান্তঃকরণে কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কংগ্রেসই এখন সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে তারা প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির অস্তিত্ব লোপ করে দিয়েছিল।

এইভাবে গুপ্ত সমিতি লুপ্ত হওয়ার ফলে জাতীয় প্রচেষ্টার দুই ধারা এক হয়ে গিয়েছিল—সবাই কংগ্রেসের পতাকাতলে মিলিত হয়ে এক মতে, এক পথে, একই নায়কের অধিনায়কত্বে স্বাধীনতা অর্জ্জনের কাজে যোগ দিয়েছিল। এর ফলে দেশে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হ'লো। তখন দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই দাবী—পূর্ণ স্বাধীনতা। এই দাবী নিয়ে মুসলমান সমাজের অধিকাংশ সংঘবদ্ধ হলো মুসলেম লিগ্ ও মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে এবং দেশের বাকী সকলের একই দাবী নিয়ে সংঘবদ্ধ হলো কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। এই রাজনৈতিক ঐক্যের ফলেই আমরা স্বাধীন হয়েছি বটে, কিন্তু সমগ্র দেশের পরিপূর্ণ দাবী মেটাতে দেশটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা অনিবার্য্য হয়েছিল।

রাজনৈতিক ঐক্যের ফলে কেমন করে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হলো, সেই কথাটা বলে প্রবন্ধ শেষ করছি।

১৯৩৯ সালে ইউরোপীয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯৪৬ সালে যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধে আমেরিকার সাহায্যে ইংরেজের জয় হলো বটে, কিন্তু এ যুদ্ধে ইংরেজ সর্ব্বান্ত হয়ে অয়লাভ করলো। তার যেখানে যে টাকা লগ্নী ছিল, সব যুদ্ধে মুছে শেষ হয়ে গেল, অধিকন্তু সাম্রাজ্যের প্রায় সব দেশের নিকটই ইংরেজ সরকার দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। যুদ্ধ চলাকালে তার কল-কারখানায় রপ্তানি-যোগ্য মালের উৎপাদন ছিল না। সেখানে তৈরী করা হতো যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম। রপ্তানীযোগ্য মাল বিক্রী করে, সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থে তার খাদ্য-দ্রব্য ও উৎপাদনের উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। নইলে তার খাওয়াও চলবে না, কল-কারখানাও চালু হবে না। ইংরেজ আমেরিকার কাছে হাত পাতলো অর্থের জন্যে।

আমেরিকা বললো—"কত দিন তোমাকে বাইরে বাঁচাবো? কতদিনে এবং কেমন করে তুমি এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারবে? তোমার পরিকল্পনাটা বা কি?" ইংরেজ বুঝলো যে তার কল-কারখানা চালু করতেই হবে। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। সে জন্যে শ্রমিক চাই। দেশের প্রত্যেকটি সমর্থ যুবক সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হয়ে তখনও পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কারখানা চালু করতে হলে তাদের সব দেশে ফিরিয়ে এনে কাজে লাগাতে হবে। অথচ সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হলে এদের বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা চলে না। তাই তার সমস্যা দাঁড়ালো—সাম্রাজ্য বাঁচাবে, না ব্যবসা চালু রাখবে? রাজনৈতিক বুদ্ধিতে ইংরেজ দুনিয়ার সকলের সেরা। সে বুঝলো—ভারতবর্ষের যা অবস্থা, তাতে ভারতীয়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশী দিন ভারতবর্ষ করায়ত্ত রাখা যাবে না। বিশেষ করে এখন যদি আবার ভারতে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তবে তার মুকাবিলা করবার মতো তার না আছে লোক-বল, না আছে অর্থ-বল। আর ভারতবর্ষ যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে বাকী সাম্রাজ্য রক্ষা করাও যায়, তার কোনো মানেও হয় না। তারা বুঝলো—এই অবস্থায় জোর করে সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করলে, শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যও যাবে, ব্যবসাও যাবে—তার পুনর্গঠন সম্ভবপর হবে না। তাই তারা প্রধানতঃ ব্যবসাদারের জাত বলে সাম্রাজ্য ছেড়ে ব্যবসা রক্ষা করার পথ-ই বেছে নিলো।

ব্যবসা রক্ষা করতে হলে একদিকে যেমন রপ্তানি যোগ্য মালের উৎপাদন চাই, অপর দিকে সে সব মাল কাটাবার বাজার চাই। যে ভারতবর্ষে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোক বাস করে, সে ভারতবর্ষই তার মাল কাটাবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় বাজার আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকা চাই। নইলে তার তৈরী মাল কাটাবার ব্যবস্থাই করা যাবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও, ব্যবহারে অন্যান্য জিনিসের চাহিদা মেটাবার জন্যে বহুদিন তাকে বাইরে থেকে তৈরেরী মাল আমদানি করতেই হবে। তা ছাড়া ভারতবর্ষের বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে প্রয়োজনীয় টাকার লেন-দেন যদি ষ্টার্লিং মুদ্রায় না করা হয়, তবে ডলারের তুলনায় ষ্টার্লিং যে একেবারে মূল্যহীন হয়ে যাবে। তাতে ইংরেজের সর্বনাশ। তাই তার বাঁচবার জন্যেই ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। এখন সমস্যা দাঁড়ালো এই যে, কেমন করে তা সম্ভবপর করে তোলা যায়। তা করতে পারলে তার বাঁচবার পথ হলেও হতে পারে, নইলে নয়।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এটলি সাহেব মাউন্ট্ ব্যাটেন সাহেবকে বললেন—তোমার উপর এ কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি যাও ভারতবর্ষে। তিনি ভেবে চিন্তে বললেন—"ভারতবর্ষে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে দুইটি প্রতিষ্ঠান ও দুইটি ব্যক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে—এক কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধী, দ্বিতীয় মুসলেম লিগ্ ও দ্বিতীয় জিন্না। মুসলেম লিগ্ ও জিন্না সাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে না। কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে—বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীকে নিয়েই আসল সমস্যা। মহাত্মা গান্ধী এক আশ্চর্য আদর্শবাদী মানুষ। দুনিয়ায় কাউকেই তিনি শত্রু বলে মনে করেন না। ইংরেজের প্রতিও তাঁর কোনো বিদ্বেষ নেই,—বরং প্রীতির ভাবই বিদ্যমান আছে। তাই তাঁর সঙ্গে বোঝা পড়াও খুব কঠিন কাজ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তিনি একরোখা ও এক কথার মানুষ। তিনি যা বলেন, ভেবে চিন্তেই বলেন বটে। কিন্তু একবার যা বলবেন, তার অন্যথা করতে কখনো রাজি হবেন না। "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের সময়ে তিনি চরম কথা বলে দিয়েছেন—আগে ভারত ছাড়ো, তার পরে কথাবার্তা—তার আগে নয়। (first quit then negotiation)। এ কথার আর অন্যথা হতে পারবে না। তাই ভারতে যাবার আগেই ঘোষণা করতে হবে, কবে আমরা ভারত ছেড়ে আসবো। নইলে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করা যে একেবারেই পণ্ডশ্রম, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মহাত্মা গান্ধী বেঁকে দাঁড়ালে, দেশশুদ্ধ লোক তাঁর কথায়ই সায় দিবে,

কংগ্রেস ও অবশ্যম্ভাবী রূপে তার কথা মেনে নেবে। প্রথমে গান্ধীজীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেলে, তারপরে আর কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বিশেষ অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।" মাউন্ট্ ব্যাটেন সাহেবের পরামর্শ অনুসারে তাঁর ভারতবর্ষে যাত্রা করার পূর্ব্বেই এটলি সাহেব ইংরেজের ভারতছাড়ার তারিখ ঘোষণা করেছিলেন। এইভাবে নিজের বাঁচবার জন্যেই ইংরেজ এদেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হওয়ায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে।

কেউ বলেন বিপ্লবীরা ভুল পথে চলেছিল, গান্ধীজী এসে তাদের ঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছেন এবং তার চেষ্টায়ই দেশ স্বাধীন হয়েছে। কেউ বলেন—তা নয়—নেতাজীর চেষ্টায়ই দেশ স্বাধীন হয়েছে। এর কোনোটাই পুরোপুরি ঠিক নয়। আসল কথা—আগেই বলেছি, কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারাই দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি—হয়েছে বহু লোকের চেষ্টায়। দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মিলিত চেষ্টার সমষ্টিভূত ফল। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত যে প্রচেষ্টা, সে আন্দোলন হয়েছে, সবটা মিলে সে এক অখণ্ড আন্দোলন। তার বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভিন্ন রকমের কার্য্যক্রম অনুসৃত হয়েছে এইমাত্র। বিপ্লবী আন্দোলনও সেই এক অখণ্ড আন্দোলনের পর্য্যায়-বিশেষ মাত্র। বিপ্লবী আন্দোলন যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, মহাত্মাজীর আন্দোলন তারই ফল শস্য আহরণ করে পুষ্ট হয়েছে। আর নেতাজীর প্রচেষ্টা বিপ্লবী আন্দোলনেরই শেষ পর্য্যায়। পরের আন্দোলন পূর্ব্বের আন্দোলনের দ্বারা পুষ্ট হয়—এটাই স্বাভাবিক—অনিবার্য্যও বটে। তাই আমি বলি—দেশের কাজে যদি কেউ কিছুমাত্র অংশ গ্রহণও করে থাকে—এমন কি কেউ যদি মনে মনেও সত্যি সত্যি দেশের স্বাধীনতা কামনা করে থাকে, তবে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে তারও অবদান নিশ্চয়ই আছে। যে হেতু দেশের সামগ্রীক রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টিতে তার নীরব সমর্থনের মূল্য অপরিসীম। দেশের অধিকাংশ লোকের নীরব সমর্থন এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যক লোকের প্রাণপণ পরিশ্রম ও মরণ জয়ী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ফলেই দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

* * *

সশস্ত্র বিপ্লবী দলের পরিকল্পনাকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য তখন প্রয়োজন হইল প্রচুর অর্থের। কাজেই এই অর্থ সংগ্রহ করার জন্য মাঝে মাঝে ডাকাতি করা হইত। এইরূপ একটি ডাকাতি সম্পন্ন হয় নদীয়া জেলার শিবপুর গ্রামে এক ধনী মহাজনের বাড়িতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর। এই দুঃসাহসিক ডাকাতি সম্পন্ন হয় নরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে। ডাকাতি সম্পন্ন হয় শেষ রাত্রিতে। ডাকাতির পর যখন আমরা সকলে নৌকায় উঠি তখন রাত্রি তিনটা। গ্রামবাসী ও পুলিশ এসে নদীর দু'পার হতে চিৎকার করতে থাকে। তাতে অনেক লোক এসে জড় হয়। এক বড় জনতা লাঠি, বল্লম, দাও, ইট, পাথর। প্রভৃতি নিয়ে আমাদের নৌকা আক্রমণ করে। তখন শ্রীসতীন সেন ও শ্রীসুধীর দাসগুপ্ত (পরে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের প্রফেসার) মসার ম্যাগাজিন পিস্তল নিয়ে নৌকা থেকে পাড়ে উঠেন এবং জনতা ও পুলিশকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি চালাতে আরম্ভ করেন। ঐ পিস্তলের পাল্লা ছিল বন্দুকের মত। পিস্তলের গুলিতে একজন পুলিশ কনষ্টেবল মারা যায় ও কিছু লোক আহত হয়। শ্রীসতীন সেন ও তাঁর বন্ধু শ্রীসুধীর দাসগুপ্ত যে কত বড় সাহসী তা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছি। জনতাকে ঘুরে হটিয়ে দিয়ে তাঁরা দুজনই আবার নৌকায় উঠেন।

বন্দী বিধাতা

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পূর্বকথা—জীবনজ্যোতি গাঙ্গুলী অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। ব্যাঙ্কে কাজ করেন। ভল্টের ইনচার্জ! এগারোটি ছেলেমেয়ে, স্ত্রী। সংসার চালাতে পারেন না। স্ত্রীর গঞ্জনা শোনেন।…বড় মেয়ে উমা ভালবাসে মানবেশকে। মেস মেয়ে রমা মানবেশেরই ছোট ভাই নিখিলেশের সঙ্গে বোম্বাই পালিয়ে গিয়ে বিপদে পড়ে। তখন স্থির হয় নিখিলেশের সঙ্গে রমার বিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু বিয়ে দিতে গেলে তো টাকা চাই? কোথায় পাবেন টাকা জীবনবাবু? ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ল তাঁর ব্যাঙ্কের এক বড় মক্কেলের কথা—আলোকময় সেন। ভল্টে তাঁর অনেক টাকা! বিশ পঁচিশ লাখ। মাঝে মাঝে ভল্টে টাকা রাখতে আসেন এবং সেই সময় দাদু অর্থাৎ জীবনবাবুর সঙ্গে আলাপ করেন। দাদু স্থির করলেন, আলোক সেনের কাছে গিয়ে কিছু টাকা ধার চাইবেন। তিনি কত হাজার হাজার টাকা দান করেন—দাদুর বিপদ শুনে অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন।… একদিন সকালে দাদু গেলেন আলোক সেনের বাড়ী। গিয়ে দেখলেন আর একটি ছোকরা আগে থেকেই অপেক্ষা করছে। আলোকময় সেন বৈঠকখানায় আসতে দাদু তাঁর আরজি পেশ করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। আলোকময় তাঁকে অপমান করে বিদায় করে দিলেন।…তারপর সেই ছোকরাকেও তাড়িয়ে দিলেন। ছেলেটির নাম ইন্দ্রনীল। আলোকময় ইন্দ্রনীলের বাবাকে টাকা ধার দিয়েছিলেন। ইন্দ্রনীলের বাবা মারা গেছেন। দেনা শোধ হয় নি। আলোকময় নালিশ করে ডিক্রি জারী করেছেন। ইন্দ্রনীল কিছু সময় চাইতে এসেছিল, কিন্তু কোন ফল হল না। আলোকময় বললেন, বুদ্ধি দিয়ে টাকা রোজগার করতে হয়, তুমি ইডিয়ট্, তাই টাকা রোজগার করতে পারো না। যাও। ইন্দ্রনীল চলে গেল, যাবার সময় শুধু বলে গেল, বুদ্ধি! আচ্ছা, দেখা যাবে।…পথে নেমে ইন্দ্রনীল দাদুকে রাস্তায় পেয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করল এবং তাঁর কথা শুনে তাঁকে চার পাঁচশো টাকা ধার দিল। পরে ইন্দ্রনীল নিজের নাম ভাঁড়িয়ে অরুণ নাম নিয়ে দাদুর বাড়ির সকলের সঙ্গে পরিচিত হল এবং দাদু, দাদুর স্ত্রী সকলেই তাকে খুব আপনজন বলে মনে করতে লাগল। উমার সঙ্গে ইন্দ্রনীলের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠবার মুখেই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হল। ইন্দ্রনীলের দুর্জ্ঞে

চরিত্র দাদু এবং আর সকলে বুঝতে পারে না।···এর পরে একদিন ইন্দ্রনীল দাদুকে এসে বললে তার স্ত্রী হাসপাতালে মরমর, দাদুকে এক কাজ করতে হবে, তার ছেলেকে শিশু হোস্টেল থেকে নিয়ে ওয়ালডর্ফ হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে।···দাদু রাজী হলেন।···আসলে এ ব্যাপারটা হল, আলোক সেনের ওপর ইন্দ্রনীলের প্রতিশোধ নেবার ষড়যন্ত্র। আলোক সেনের ছেলে মারা গিয়েছিল। তার ছেলে বিবেক, বছর চারেক বয়স। বিবেক হ'ল তার বিধবা মা চন্দনার অন্ধ ভালবাসা আর বাবাহত ঠাকুরদার অন্ধের যষ্টি। তাকে ইন্দ্রনীল আলোক সেনের বাড়ীতে দেখেছে। সেই ছেলেকে ইন্দ্রনীল দাদুর সাহায্যে চুরী করে আনল। দাদু অবশ্য সরল বিশ্বাসেই কাজ করেছিলেন। তিনি বিবেককে ইতিপূর্বে দেখেন নি, ভেবেছিলেন, বিবেক সত্যিই ইন্দ্রনীলেরই ছেলে। ওয়ালডর্ফ হোটেলে এসে ইন্দ্রনীল বিবেককে অনেক খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখলো আর দাদুর হাতে নোট গুঁজে দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে বিদায় দিল।···আলোক সেনের বাড়িতে ফোন গেল। সেই ফোন ধরলেন, আলোকময় সেন·····

ইতিমধ্যে ট্যাকসি এলো আর একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স নাবল গাড়ী থেকে। সে ব্যাগ থেকে একটা চিঠি বের করতেই মিস বোস সেটা দেখে ইশারা ক'রে দিলেন ওপরে যাওয়ার জন্যে। নার্সটি ওপরে উঠে গেল আর মিস বোস গেলেন ঘরে আর আলোক সেন ডাক্তারের দিকে ঘুরে বললেন—

● তাহলে ডাঃ রয় ?

● ঐ টাইফয়েডই হবে।

● হুম্।

● ছেলেটিকে আনিয়েই নিন, চাইছেন যখন অত অত ক'রে দেখতে আর রোগটা যখন ছোঁয়াচে নয়, তখন কি দরকার বাধা দিয়ে ?

● আচ্ছা।

ডাক্তার গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন আর ঘরে এসে আলোক সেন গর্জে উঠলেন—

● আমি তোমাকে বহুবার ব'লেছি কল্যানী ·····

ওকে থামিয়ে দিয়ে কল্যানী বলল—

● লোকটা লাইন কেটে দিয়েছে।

থমকে গেলেন আলোক সেন। বিশ্বাসই হল না কথাটা, বললেন—

● তার মানে ?···লোকটা কি খেলা পেয়েছে নাকি ?

● বোধহয় না। আপনি ব্যস্ত শুনে প্রথমে জানতে চাইল চন্দনাদি আজ কেমন আছেন তারপর বলল বিবেকের নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

● অ্যাক্সিডেন্ট ? বিবেকের ?···কি ? কি ? কি হয়েছে ?

● জানতে চেয়েছিলাম কিন্তু তার আগেই লোকটা লাইন কেটে দিল।

● দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? খোঁজ নাও !

কল্যানী রিসিভার তুললো। উনি ওর হাত থেকে নিয়ে বললেন—

● আমি করছি !

ডায়ালটা ঘোরাতে গিয়ে হাতটা দুবার আটকালো তারপর অধৈর্যতার কথাও আটকে গেল। বড়

মেমসাহেবের সঙ্গে যেটুকু কথা হল তাতে জানা গেল যে আলোক সেনের চিঠি অনুযায়ী মার অসুখ বলে বিবেককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

● আমার চিঠি ?

মেমসাহেব বললেন

● আপনার লেটার প্যাড আর আপনার সই, দুটোই আমার খুব চেনা !

● কতক্ষণ গেছে ?

● আধ ঘণ্টা।

● কার সঙ্গে ? কিসে ?

রিসিভারটা আর একটু হ'লে ওর হাত থেকে পড়েই যেত'। উনি কোন রকমে সামলে নিয়ে ব'সে পড়লেন যেন প্রকাণ্ড একটা ভারভূপ। কল্যানী ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে জড় পদার্থের মতন নিথর দাঁড়িয়েছিল নিজের টেবিলের কাছে, উনি বললেন—

● বিবেকের স্কুলে গিয়ে সব জিনিষটা জেনে এসো। গাড়ী নিয়ে এক্ষুনি যাও।

কল্যানী বেরিয়ে যাচ্ছিল, দরজার কাছে যেতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। কল্যানী ধরবার ব'লে ছুটে আসছিল, উনি বললেন—

● তোমায় যা বলেছি কর।

কল্যানী দৌড়ে বেরিয়ে গেল। টেলিফোনটা বার কয়েক বাজলো। আলোক সেনের আজ আর সাহস হল না ওটা তোলেন। হাত বাড়িয়ে তুলতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিলেন আর যখন সাহস ক'রে তুললেন তখন টেলিফোনটা থেমে গেছে। রিসিভারটা দু চারবার দেখে রেখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওটা বেজে উঠল'। উনি চট করে তুলেই বললেন—

● কে তুমি ?

বিছানায় শুয়েছিল ইন্দ্রনীল। এবার উঠে বসল। তখন দেখাগেল পেছনের ঘাটে এক রাশ খেলনার মাঝখানে ব'সে আছে বিবেক। ও বেশ জুৎ ক'রে বসে বলল।

● বলছি। তার আগে বলুন বিবেকের খবর কিছু পেলেন ?

● সে কোথায় ? কোথায় সে ?

কাঁধের ওপর রিসিভারটা চেপে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বলল—

● এতো বোঝেন আর এই সামান্য জিনিষটা বুঝলেন না ? দাঁড়ান।

ঘুরে দেখল বিবেকের দিকে আর রিসিভারটা তার মুখের কাছে ধরে বলল—

● দাদুকে হ্যালো বল তো বাবা।

বিবেক কিছুটা বিরক্তিই হল তবু বলল'—

● হ্যালো দাদু ! আমি খেলছি। আমার কাছে না, একটা বন্দুক আছে !

ব'লে বোধহয় দাদুকে সেটা টেলিফোনের মধ্যেই দেখাবার চেষ্টা করছিল, ইন্দ্রনীল রিসিভারটা সরিয়ে নিয়ে নিজেই বলল—

● বলুন ?

● তুমি···তুমি ওকে চুরি করেছ।

● করেছি।

টেবিল চাপড়ে আর চিৎকার করে আলোক সেন বলে উঠলেন—

● আমি···আমি তোমাকে পুলিশে দেব রাসকেল আমি তোমায় খুন করব'···

ফিলটার টিপ সিগারেটটা দাঁতে চেপে ঠোঁটের ওপর ঘোরালো ইন্দ্রনীল, তারপর বলল—

● হুম্! তাহলে টেলিফোনটা রেখে দি?

বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠল আলোক সেনের, বললেন—

● না না প্লিজ··

বলতে বলতে আবার চেয়ারে ব'সে পড়লেন আর অনুনয়ের সুরে বললেন—

● প্লিজ আপনি কে?···কেন ওকে চুরি করেছেন? কি চান আপনি?

খলখলিয়ে হেসে উঠল ইন্দ্রনীল, বললে—

● টাকা। টাকা চাই।

● কত?

সিগারেটটায় সুখ টান দিল তারপর পা দিয়ে ওটা গুড়িয়ে ফেলল। বললো—

● পঞ্চাশহাজার। ফিফটি থাউসণ্ড।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন আলোক সেন আর তখনই দেখা গেল সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেবে আসছে চন্দনা।

আলোক সেন বললেন—

● নেভার! পঞ্চাশ হাজার আমি কিছুতেই দেবোনা।

● হ্যাঁ দেবেন। দিতে হবে···

বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো আলোক সেনের পুত্রবধূ। অসুস্থতায় ট'লে ট'লে পড়ছে, কাপড় জামা চুল এবং চলন সবটাই তার আলু থালু। হাতে চিঠি লেখানা নার্স এনেছিল। চন্দনা ঘরে ঢুকে দম নিল' টেবিলের কোনটায় দাঁড়িয়ে, বললে—

● দেবেন। আপনি না দেন, আমি দেব'

অবাক হয়ে গেলেন আলোক সেন পুত্রবধূকে দেখে। বললেন—

● বৌমা? তুমি?

● আপনার লাখ লাখ টাকা আছে কিন্তু আমার ঐ একটি ছেলে···আমি দেবো—

হুমড়ি খেয়ে পড়ল চন্দনা টেলিফোনের ওপর, অসহায় আর্তনাদ ক'রে টেলিফোনটা কেড়ে নিল শ্বশুরের হাত থেকে, আর গভীর উদ্দীপ্ত অবস্থায় বলল—

● আমি দেবো। উনি না দেন আমি দেব। আপনি দয়া ক'রে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন। আমার কেউ নেই···শুনুন। শুনছেন···

ইন্দ্রনীল অবশ্যই শুনছিল না। চন্দনার গলা পেয়েই ও বিবেককে টেনে আনল টেলিফোনে আর মাউথ পিস্‌টা চেপে ধরে বলল—

● তোমার মা। বল তুমি খুব ভালো আছ আর খেলা করছ। —বল

ওদিকে, কথার জবাব না পেয়ে চন্দনা আর্তনাদ করছিল টেলিফোনে 'হ্যালো! হ্যালো!

বিবেক রিসিভারটা হাতে নিয়ে বলল—

● মামণি। আমি খুব ভালো আছি আর কানু আমাকে অনেক খেলনা দিয়েছে···

রিসিভারটা ওর হাত থেকে নিয়ে ইন্দ্রনীল বলল—

● বুঝতে পারছেন ভয়ের কিছু নেই আর ও কত ভালো আছে। টাকা পেলেই আমি ওকে পাঠিয়ে দেব।

নিশ্চিন্ত না হ'লেও নির্ভরযোগ্য ভঙ্গিমায় চন্দনা বলল—

● আমি টাকার ব্যবস্থা করব।

ও ধার থেকে ইন্দ্রনীল বলল'—

● আরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশকে যেন কোনভাবেই খবর দেওয়া না হয়। দিলে, চুরি করতে যখন আমার আটকাবেনি তখন ছুরি চালাতেও অসুবিধে হবে না।

● আমি নিলাম সে দায়িত্ব। আমার ছেলের নামে শপথ ক'রে বলছি পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হবে না। আর কিছু?

গভীর পরিতৃপ্তিতে ইন্দ্রনীল হাসল; আনন্দে, উৎসাহে এবং বছরখানেক আগে বুদ্ধির লড়াই করেছিল আলোক সেনের কাছে তারই পুণ্ডিতে, বললে—

● আলোকবাবুকে দিন, আমি ওঁকে টাকা কি ভাবে কোথায় দিতে হবে সে কথাটা ব'লে দি।

চন্দনা রিসিভারটা বাড়িয়ে দিল আলোকবাবুর দিকে। এতোক্ষণ উনি মাথায় হাত দিয়ে ব'সেছিলেন অসহায়ের মতন, এবার হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নিয়ে নির্জীব কণ্ঠে বললেন—

● বলুন।

এতোক্ষণের উত্তেজনার পর চন্দনা শরীরে যে উদ্বৃত্ত শক্তি ছিল তা দাঁড়াবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। ও অবসাদে ব'সে পড়ল আর ক্ষমতার আছেকটা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল ব্যবস্থাটা কি হচ্ছে কিন্তু, হ্যাঁ, না আর ঠিক আছে'র মধ্যে তার আভাসও পাওয়া গেলোনা। ও উঠে চ'লে যাচ্ছিল, কথা শেষ ক'রে আলোক সেন রিসিভারটা রেখে বললেন—

● মিছিমিছি তুমি—

যে ভাবে চন্দনা দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ালো তাতে কথা শেষ করার সাহসও আলোকবাবুর হল না। এক পা এগিয়ে এসে চন্দনা বললে—

● কি বললেন? মিছিমিছি? মনে আছে, সেদিন ঘুষ না দিয়ে আর দু কোটি টাকার কনট্রাক্ট না নিয়ে আপনার ছেলে ফিরে এসেছিলেন সেদিন তাকেও আপনি এই ক'রেই ঠিক এই কথাই বলেছিলেন আর তিনি অপমানে লজ্জায় আত্মহত্যা ক'রেছিলেন। মনে আছে?

আলোক সেন মাথা নিচু ক'রে দাঁড়ালেন। চন্দনা ব'লে গেল—

● ছেলে গেল, নাতি যেতে বসেছে অথচ আপনার টাকার মোহ তবু গেলোনা।··· কোটি কোটি টাকা আপনি আনতে পারেন—পারেন আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে?

অসহায়ের মতন ব'সে পড়ল চন্দনা। ইতিমধ্যে নার্স এসে দাঁড়ালো দরজায়। আলোক সেন বললেন:

● এঁকে ওপরে নিয়ে যাও।

আবার উঠে দাঁড়ালো চন্দনা, বললে—

● আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

● কোথায় ?

● টাকা পৌঁছে দিতে।

● তুমি যাবে ?

● হ্যাঁ।

● কেন ?

● কারণ আমার শরীরের চেয়ে আর আপনার টাকার চেয়ে আমার ছেলের জীবন অনেক দামী। চলুন। দেরি করলে ব্যাঙ্ক বন্ধ হ'য়ে যাবে।

ওঁরা বেরিয়ে পড়লেন। চন্দনা কিছুতেই শুনলোনা। সে সঙ্গে গেল'। মনে মনে ও ঘরিয়া হ'য়ে উঠেছিল আর ঠিক ক'রেই ফেলেছিল যে যতক্ষণ টাকা না দিবে ও সবাইকে তাঁর কালোবাজারি কলঙ্কের কথা জানিয়ে কাগজ মারফৎ ছেলের জন্যে কৃপা ভিক্ষা করবে। আলোক সেন সেটা আন্দাজে জানতেন বলেই টাকা নিয়ে আর দু'বার ভাবলেন না। ইন্দ্রনীলের কথা মত সুটকেশ নিতেও ভুললেন না।

ইন্দ্রনীল একথালা খাবার আনালো বিবেকের ইচ্ছেমত আর খাওয়া শেষ ক'রে ওকে একটা স্লিপিং ট্যাবলেট খাওয়ালো নিজের ইচ্ছামত। অচেনা লোকের গাড়ীতে উঠে বিবেকের ভয় অবশ্যই হ'য়েছিল কিন্তু হোটেলের ঘর ভর্তি খেলনা দেখে ভুলতে আর সব ভুলে ইন্দ্রনীলকে ভালোবাসতে তার সময় লাগেনি। ট্যাবলেট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবেক ঘুমে ঢলে পড়ল আর ওকে কোলে নিয়ে ইন্দ্রনীল বেরিয়ে পড়ল।

ড্রাইভের চেয়ারে যাদু আছে, বসলেই ঘুম পায়। অতদিনের কথা আলাদা কিন্তু আজ আর যাদুর কিছুতেই ঘুম এলোনা। অল্পের জন্যে ভাবনার শেষ নেই। এমন ভালো ছেলে, অথচ ভাগ্যটা কি ? এতো বিপদ মাথার ওপর কিন্তু একবারও টাকার কথা ভুললোনা। অবশ্য ভুললেই যে যাদু দিতে পারতেন, তা নয়, তবু, বিপদের দোহাই দিয়ে যার চাওয়া আর যার কিনে চাওয়া বাঙালীর মজ্জাগত অভ্যাস। আর ঘুম এলোনা আনন্দে। এতো বড় বিপদে ওকে সাহায্য করতে পেরেছেন একি কম ভাগ্যের কথা ? আর ছেলেটা ? একেবারে রাজপুত্তুর। সত্যি, এতোদিন পর সংসার করতে এসে ভাগ্যে সইলোনা। টেঁপিকে সব কথা আজ কিভাবে গুছিয়ে বলা যায় সবে ভাবতে আরম্ভ ক'রেছেন, হঠাৎ মনে হল হাজার মাইল দূর থেকে কে যেন ওঁকে ডাকছে। ধড় ফড়িয়ে উঠে ব'সে দেখলেন সামনে আলোকবাবু।

● স্যার আপনি ?···এই মানে একটুখানি চোখে চোখ লেগেছিল আর কি।

● চলুন।

● এই যে—তা কেমন, আছেন স্যার ?

প্রচণ্ড বিরক্ত ভরে খাতা সই করলেন আর সময়ের ঘরে লিখলেন সাড়ে বারোটা। যাদু জীব কাটলেন আর চাবি বের করতে করতে বললেন—

● বলেন কি ? এই তো সাড়ে দশটায় ছেলেটাকে পৌঁছে দিয়ে এলাম—আর এরই মধ্যে সাড়ে বারোটা—

বেশ বিরক্ত হ'য়েই আলোক সেন বললেন—

● হ্যাঁ! হ্যাঁ! চলুন দেখি তাড়াতাড়ি!

● দূর ছাই। চাবিটা যে কোথায় রাখি···ও! এই যে। বুঝলেন স্যার আজ একটা বিচ্ছিরি অ্যাক্সিডেন্ট হ'য়ে গেছে। মানে, ছেলেটার নাম কি জানি—ঐ যে ছাই—কি ইস্কুল···অ্যাক—

কথা আর শেষ হল না দাদুর, গলা ধরে ধাক্কা মেরে আলোক সেন বললেন—

● স্ল্যাম ইওর মাউথ! ভল্‌ট খোল'···

দাদুর চশমাটা ছিটকে পড়ল, আর নেহাৎ ভাগ্য ভালো নাহ'লে আলমারির ওপর হাতটা না প'ড়ে মাথাটা পড়লেই হ'য়েছিল আর কি! তারপর দাদু আর মুখ তো খুললেনই না, মাথাও তুললেন না—বেলা তিনটে পর্য্যন্ত।

ভল্‌ট বন্ধ করার ঠিক মিনিটখানেক আগে ইন্দ্রনীল এলো। চেহারাটা সকালের চেয়ে আরো চার গুণ ময়লা, বেদনাহত, বিব্রত এবং বিধ্বস্ত। দাদুকে দেখে বলল—

● কি ব্যাপার? বিপদ তো আমার, আপনার চেহারা এরকম কেন?

● আর বোলোনা। আলোকবাবুকে তোমার দুর্ঘটনার কথা—

● বলেছেন?

● বলব' কি ক'রে? তোমার ছেলেটার নামটা কিছুতেই মনে পড়ল না—

অস্থির নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল ব'সে পড়ল। দাদু কি যে বলল, কিছু সে শুনলই না। দাদু ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—

● কি ব্যাপার? তোমার বৌ কেমন?

● একই রকম।

● ইন্‌জেকশন পেলে?

হতাশার টানা নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল বললে—

● জানি না।

ওর শূন্যতার হাহাকারটা দাদুর বয়সী মনে কে ধাক্কা দিল। দাদু যেহাবিকো অস্থির হ'য়ে বললেন—

● না না অমন, এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? বিপদ যখন হ'য়েছে, বুক ঠুকে দাঁড়াতে হবে বৈকি।

ইন্দ্রনীল বললে—

● টাঙ্ককলে খবর পেয়ে আমার বাবা এসেছেন দিল্লী থেকে একেবারে ইন্‌জেকশন সমেত।

● কোথায়? কোথায়?

● উষা বলতে পারবে।

● উষা?

অবাক হ'লেন দাদু, বললেন—

● উষা কি ক'রে জানবে?

● কি করব বলুন। বাড়ীতো নেই যে ঠিকানা দেবো, আর বুড়ো মানুষকে হাসপাতালেই বা যেতে বলি কি ক'রে? তাই উষার কাছেই যেতে বললাম।

দাদু উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজিত হ'য়ে আর ওকে টেনে তুললেন পরম উদ্বিগ্নতায়, বললেন,

● তাহ'লে চল যাওয়া হক। ঐ বুড়ো মানুষকে বসিয়ে রাখা উচিৎ হবে না।

প্রচণ্ড জোরে মাথা নাড়লো ইন্দ্রনীল, বললে—

● না না—আমি পারবো না। আপনি যান আর যদি পান তাহ'লে হাসপাতালেই নিয়ে আসবেন। সাত নম্বর কেবিন।

● আচ্ছা! নিশ্চয়……

তারপর আবার ওকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধ'রে বললেন—

● কিছু ভেবোনা বাবা। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

দাদুর পায়ের ধুলো নিলো ইন্দ্রনীল, বললে—

● আশীর্বাদ করুন যেন শেষ রক্ষা হয়……

ওরা বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। পরোপকারের উত্তেজনায় ভল্টঘরের চাবিটা পর্যন্ত ভুলে গেলেন দাদু—আর ভাঁড়ারলাল না হ'লে চাকরিটাই চ'লে যেত'।

ইন্টারন্যাশন্যাল হোটেলের লবীতে লোকের আসা যাওয়ার শেষ নেই ব'লে রিসেপশানে উমারও কাজের সীমা নেই। ও যখন থেকে আসে আর যতক্ষণ না যায়, এক মুহূর্ত বসে না। ব্যস্ততায় ঘুরপাক খায়। তার অবশ্য আরও কিছু কারণ আছে। ম্যানেজার বুড়ো, লোক ভালো কিন্তু লোভ ভয়ানক। আসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার তো পেলেই ওকে ছিঁড়ে খায়। তা ছাড়াও আছে বড় ব্যবসাদার যারা দিল্লী বম্বে থেকে আসে মিটিং করতে; আর আছে মার্কিনী টুরিস্ট, সিনেমার হিরো, কয়েন ডিপ্লোম্যাট। এদের সকলেরই লক্ষ্য এক, মোক্ষও একই—উমা। ঠিক তেমনি ক'রে এদের সবাইকে নিয়ে উমারও একটাই লক্ষ্য—নিজেকে বাঁচানো আর বিছানায় না শুয়ে চাকরি রাখতে গিয়ে ওকে ছুটে বেড়াতে হয় কাজের অছিলায়—তাই আলোক সেন যখন নির্দেশ মত সুটকেশটা ওর হাতে দিয়ে বললেন খুব সাবধানে রেখো, এতে ওষুধ আছে আর আমার ছেলে অরুণ লোক পাঠালে তার হাতে দিয়ে দিও, তখন ও বৃদ্ধকেও ভালো ক'রে লক্ষ্য করল না আর অরুণ নামটা কানে তুললেও, মনে নিল' না। বৃদ্ধ চ'লে যাওয়ার পর সুটকেশটা কাউন্টারের তলায় রাখতে রাখতে ও মনে করতে চেষ্টা করল ভদ্রলোক কোন ঘরে আছেন এবং কিছুতেই যখন সেটা মনে করতে না পেরে ও আবিষ্কার করল' যে ভদ্রলোক হোটেলের ধারিন্দাই নন তখন তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে ভদ্রলোককে ধরল' যখন উনি গাড়ীতে উঠছেন। সুটকেশটা এগিয়ে ধ'রে বললে—

● আপনি তো আমাদের হোটেলে থাকেন না আর আপনার ছেলেও এখানে থাকেন না তাহ'লে—এ কাজটা……

ঠিক কি ক'রে যে কথাটা পরিষ্কার করবে বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে গেল'। ভদ্রলোক বললেন—

● বিশ্বাস কর মা—ভয়ানক বিপদ আমি ……

চন্দনা গাড়ীর মধ্যে চোখ বুঁজে এলিয়ে ছিল, এবার এগিয়ে এসে বলল'—

● ওতে যে ওষুধ আছে সেটা না পেলে—আমার ছেলে বাঁচবে না—তার জীবন মৃত্যু তোমার হাতে……

এক মুহূর্ত থেমে গেলো চন্দনা, তারপর উমার হাত দুটো ধ'রে বললে—

● আমার ছেলেকে তুমি বাঁচাও ভাই !

মুমূর্ষু মার মর্মন্তুদ আবেদনে ওর মনটা গ'লে গেল'। ও বললে—

● আচ্ছা।

সুটকেশটা নিয়ে ও রিসেপশন্ কাউণ্টারে ফিরে এলো বটে কিন্তু মন থেকে ভাবনার বোঝা ওর খুব একটা নাবলো না কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় সে নিয়ে ভাববার অবকাশও তেমন পেলো না। আধ ঘণ্টাটাক পর যখন দাদু এসে বললেন—

● অরুণের বাবা একটা সুটকেশ রেখে গেছেন ?

ও তখন দুটো চেনা লোকের আশ্বাস পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচল', বললে—

● হ্যাঁ। উনি বুঝি ওঁর বাবা ?

● হ্যাঁ চট ক'রে যে।

● এই যে—

ও কাউণ্টারের তলা থেকে সুটকেশটা বের ক'রে হাতে দিয়ে আর অরুণের স্ত্রীর চেহারা মনের মধ্যে ভালো করে যাচাই করতে করতে বললো,—

● অরুণ বাবুর স্ত্রী আছে ?

● হুম। ছেলেও আছে।

দাদু উঠে পড়লেন। ও বললে—

● ছেলে কেমন আছে জানো ?

বেরিয়ে যেতে যেতে দাদু বললেন—

● ছেলে তো ভালোই, স্ত্রী যায় যায়……

কথাটা ওর কানে লাগল'। কেমন হল ? স্ত্রী ব'লে গেলেন ছেলে যায় যায়। ওষুধ না হ'লে বাঁচবে না আর বাবা বললেন—? জট ছাড়ানো জিনিসটা আবার পুরোপুরি জটিল হ'য়ে উঠল'। একবার ভাবল' না হয় বাবাকে ডেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে নেয় আবার তখনি মনে হল রাত্রে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নিলেই হবে—আবার ভাবল' এক্ষুণিই না হয়—কিন্তু হল না। বুড়ো ম্যানেজার বেরিয়ে এসে বলল'—

● চল ওরা চা খেয়ে আসি !

● চা ? এই দেখুন……আমি এই মাত্র দু দুবার ঘোল খেলাম—বেশ কড়া ঘোল……

• • •

পিসির গেটেই পায়চারি করছিলো ইন্দ্রনীল। দাদুকে দেখতেই ও জড়িয়ে ধরল'। দাদু বললেন—

● সে কি ? ……সব শেষ ?

● সব। চলুন।

গাড়ীতে উঠে বসলেন দুজন আর এসে ঢুকলেন ওয়ালডর্ফের তিনতলার কোণের ঘরে। ইন্দ্রনীল ঘরে ঢুকেই কম সার্ভিসকে হুকুম করল' দু পেগ হুইস্কি। দাদু অত্যন্ত দুঃখে মর্মাহত হ'লেও ঠাণ্ডা ঘরের আনন্দটা মনের আনন্দে উপলব্ধি করছিলেন। চমকে উঠে বললেন—

● হুইস্কি ?

● হ্যাঁ দাদু—হুইস্কি—পীওর মীট স্কচ অন দি রকস্ !

বেয়ারা সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল। গেলাস দুটো তুলে আর দাদুর দিকে এগিয়ে ইন্দ্রনীল বললে—

● চলবে ?

দাদু নাকে ঘুড়ির কৌচা চাপা দিয়ে মাথা নাড়লেন। হেসে ইন্দ্রনীল দু গেলাস এক ক'রে এক চোকে শেষ ক'রে দিল আর বেয়ারাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললে—

● গেট আউট।

বেয়ারা চ'লে গেল' আর অকথের এই বেয়াড়া অবেলাটা দাদুর মনটাকে ধাক্কা দিল। একদিকে ওর শোক আর অন্য দিকে এই সুরার মস্তখানে দাদুর সনাতনী মনটা ঘুরপাক খেতে খেতে জড়িয়ে গেল'। ইন্দ্রনীল চুল আঁচড়াচ্ছিল, দাদু বললেন—

● এই ওষুধটা আর কাজে লাগলনা !

● লাগবে, লাগবে···

বলতে বলতে ইন্দ্রনীল এগিয়ে এলো, বললে—

● এটা ওষুধ নয় দাদু, এটা—

খুলে ফেলল সুটকেসটা, বললে—

● টনিক !

দাদুর চোখ দুটো এক পলকে চিনে বাদাম চেরা থেকে ছানা বড়ার মতন ছিটকে গিয়ে কপালে আটকে গেল। অনেক চেষ্টা ক'রে বললেন—

● টাকা ?

● পঞ্চাশ হাজার !···কিফ্‌টি থাউজেণ্ড।

বলে নোটগুলোকে পাগলের মতন দাদুর মাথার ওপর ঢেলে দিয়ে বললে—

● আদ্ধেক আমার আদ্ধেক আপনার !

● তা ··তার—মানে ?

● আমি বুদ্ধি খাটিয়েছি আর আপনি আমার ওয়াকিং পার্টনার হ'য়ে কাজটা ক'রে দিয়েছেন। —মনে নেই আপনার সেই অপমান ? —যেদিন আলোক সেনের আপনি পা ধরেছিলেন ? আর সে ব'লেছিলো বুদ্ধি খাটিয়ে টাকা রোজগার করে—ভিক্ষে দেওয়ার জন্যে নয় ?—আজ তার টাকা আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে কেড়ে নিয়েছি—আর সে আমাদের পা জড়িয়ে ধ'রে তার নাতিকে ভিক্ষে চাইছে !

চমকে উঠলেন দাদু, আঁতকেই উঠলেন, ভয়ে, মনে প'ড়ে গেল বিধেকের কথা, প্রশ্ন করলেন ভয়ার্ত কণ্ঠে—

● সে···কো···কোথায় ?

● আছে। সময় মত জানা যাবে।

গলা দাদুর আরও শুকোলো, বললেন—

● তাহ'লে ? ও তোমার ছেলে নয় ?

● না।

● ও আলোক সেনের নাতি ?

● হ্যাঁ।

● আর আমি ওকে চুরি ক'রে এনেছি ? ইস্কুল থেকে ?

● হুম। ঠিক তাই।

এ কটা কথা বলতে বলতেই দাদুর গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ, বললেন—

● একটু জল···আমি জল খাবো।

বলতে বলতে দাদু ব'সে পড়লেন। ইন্দ্রনীল গ্লাস থেকে জল ঢালছিল, দাদু এক লাফে তার কাছে গিয়ে তার হাত দুটো ধ'রে বললেন—

● অরুণ·····

● বলুন

● মানে, আলোক সেন ওকে ফিরে চান ব'লে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন ?

● আদ্ধেক আমার আদ্ধেক আপনার।

আঁতকে উঠে দাদু আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—

● না না···ও আমার চাই না···আমার চাই না।

ওকে প্রায় থামিয়ে দিয়েই ইন্দ্রনীল বলল—

● চাই···চাই···সারা জীবন কষ্ট ক'রেছেন, লাথি খেয়েছেন, কাঁটা খেয়েছেন···গরীব বলে! শেষ জীবনে আরাম ক'রে নিন!

কোন রকমে জলের গ্লাসটা গলধঃকরণ ক'রে দাদু বললেন—

● না না···না বাবা না···ও পাপের টাকা—

● পাপ ? কিসের পাপ ? কার পাপ ? ওরা পাপ করে না ? যারা বুদ্ধির কোহাই দিয়ে মানুষ মারছে ওষুধে ভেজাল দিয়ে আর চাল গোদামে পুরে ? ও পাপ করছে না ? —ঐ আলোক সেন ? যে লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে কোটি টাকা লুটে তোলে ? তুলে নাও টাকা···

● না বাবা না···।

● না ?···বেশ তাহ'লে যাই থানায় ?

● থানায় ?

● ছেলে কে চুরি ক'রেছে ?—তুমি। কে এনে তাকে এ হোটেলে রেখেছে নাম ভাঁড়িয়ে ? তুমি। টাকার সুটকেশ কোথায় ছিল ? তোমার মেয়ের কাছে। তার কাছ থেকে সুটকেশটা কে নিয়ে গেল ?—তুমি ?—এবার বুঝেছ ?

সুটকেশে তাদের টাকাটা ভরে এগিয়ে দিল ওঁর দিকে ইন্দ্রনীল। আর বলল—

● কে ধরা পড়বে ?—তুমি আর তোমার মেয়ে উমা।

যন্ত্রচালিতের মতন সুটকেশটা হাতে নিল দাদু।

ইন্দ্রনীল বলল—

● চল।

● কো···কোথায় ?

● বাড়ী।

● আর সেই ছেলেটার···

● হবে হবে ব্যস্ত কেন? টাকাটা আগে বাড়ীতে রেখে তারপর ফেরৎ দিয়ে আসা যাবে।

সুটকেশটা এগিয়ে দিয়ে দাদু বললেন—

—বরং এই টাকাটাও...

বাকি ছড়ানো টাকাগুলো ও দু হাতে কুড়োচ্ছিল। দাদুর দিকে একবার তাকিয়ে টাকা তুলতে তুলতে হাসল ইন্দ্রনীল, বলল—

● পাগল।

ছড়ানো টাকাগুলো ও গুছিয়ে তুলে বলল—

● চলুন।

দু'জন বেরিয়ে পড়লেন।

সুটকেশ তো নয় যেন জগদ্দল পাথর। দাদুর পা আজ যেন আর চলতেই চায়না। দুঃখের বোঝা বইতে বইতে যে মানুষটার জীবনই বলতে গেলে কেটে গেল,' অন্তের পাপের জালে জড়িয়ে আজ সেই মানুষটাই অচল হ'য়ে উঠলেন। হোটেলের বিল চুকিয়ে ওঁরা বেরিয়ে এলেন আর গাড়ীতে উঠবার সময় মন ভাঙানো আর্তনাদে দাদু অস্পষ্ট বললেন—

● বাবা অরুণ।

ওকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনীল বলল—

● না উঠলে আমি থানায় যাবো।

দাদু উঠে বসলেন। সামনের বিপদ যাই হক পেছনের ব্যাপ্তি তার অনেক বেশী। ছেলেমেয়ে সংসার স্ত্রী, জামাই। আর যে মানুষ বড়লোকের ছেলে চুরি করতে পারে, সে গরীবের সংসার ভাঙতে তো পারেই। দাদুর ওপর সুটকেশটা বসিয়ে দাদু সুটকেশের ওপর মাথাটা রাখলেন।

উমার ডিউটি শেষ হল সাড়ে পাঁচটায় আর এ কাজ সে কাজের অজুহাতে ছোট ম্যানেজার ওকে আটকালো প্রায় ছটা পর্যন্ত। অনুরোধে কখনই ওর সঙ্গে সিনেমা যায়নি ব'লে টক্কে ছিল আজ সে উমাকে উপরোধের ঢেঁকি গেলাবে কিন্তু গোলমাল বাঁধালো বড় ম্যানেজার। চা খেতে গিয়ে সেই যে পার্শি মেয়েটার পাশে বসল, আর দেখা নেই। সারা হোটেলে সাড়ে চারশো ঘর তার মধ্যে কম ক'রে শ'দুয়েক খালি। কোথায় খুঁজবে? কাজেই বাধ্য হ'য়ে ঠিক ছটার সময় যখন উমা ছুটি চাইতে এলো তখন করুণার কণ্ঠ কোমল ক'রে সে উমাকে অনুমতি তো দিলই, হোটেলের গাড়ীখানাও অফার ক'রে বসল'। অন্য মেয়েদের কাছ থেকে উমা আগেই জেনে নিয়েছে যে ওটা একটা মস্ত মেয়ে ধরা কল, একবার নেওয়ার অভ্যাস হ'লে অনেক কিছু দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই নিঃসঙ্কোচে "না" ব'লে ও বেরিয়ে এলো। আর হোটেলের বাইরেই দেখা হল মানবেশের সঙ্গে। সে বললে—

● বেশ মেয়ে, সেই সাড়ে পাঁচটা থেকে দাঁড়িয়ে আছি!

● কথা ছিল কি?

ছেলে মানবেশ বলল—

● মুখে হয়নি কিন্তু মনে ঠিকই ছিল। না?

● মোটেও না। কিন্তু এসে ভালোই করেছ, অনেক খবর আছে।

ওরা চানাচুর চিবোতে চিবোতে গিয়ে বসল, ভিক্টোরিয়ার উল্টো মাঠে, মাড়োয়ারি মাতামাতির মাঝখানে। ভীড়ের মধ্যে ব'সে আর আঙুলে আঙুল ছোঁওয়া ঠীক ভালোবাসার মধ্যে তলিয়েও ওরা অরুণকে কিছুতেই ভুলতে পারলোনা আর অনেক ভেবেও তার কোন কূল পেলোনা।

ইন্দ্রনীল গাড়ীটাকে মোড়ের মাথায় রাখল, আর রোখের মাথায় হুকুম দিল পনেরো মিনিটের মধ্যে বাস্কট রেখে আসতে। দাদু নেমে ওর দিকে অত্যন্ত অসহায়ের মতন চোখ তুললেন, বললেন—

● তুমি আসবে না? এতোদিন পরে এলে আর—

ইন্দ্রনীল ছোট্ট জবাব দিল—

● সময় নেই।

দাদু দু চার পা যেতেই ইন্দ্রনীল বলল—

● ছেলেটাকেও তো আবার ফেরৎ দিতে হবে।

হঠাৎ যেন কোথা থেকে একরাশ আনন্দ আতিশয্য দাদুর মনকে মত্ত ক'রে ছুঁয়ে গেল। দাদু প্রায় ছুট দিলেন।

বাড়ীতে সবাই আজ অবাক। টেঁপির স্মরণের মধ্যে এমন কাণ্ড কখন হয়নি। বাবা বাড়ী ফিরেছেন পাকা পোয়া দু ফটা লেট। হাতে অচেনা সুটকেস আর মুখে কথা নেই। স্বভাবের নিয়মে মেয়ের অনুযোগে বেশ দু কথা বলতে আরম্ভ ক'রেই টেঁপি থেমে গেল। দাদুর দু চোখে আজ রাগের আগুন। ছোট মেয়ে আন্না অনেক আদরের। সে প্রাত্যহিক নিয়মে আজও বাবার পেছন পেছন ঘরে ঢুকে আধো আধো বলল—

● বাবা চা আনি?

● না।

খানিকটা সে দ'মে গেল। বাবার এমন রুক্ষ গলা সে জীবনে কখন শোনে নি। কি করবে ভেবে না পেয়ে আন্না খাটের কোণে দাঁড়িয়ে রইল। দাদু খাটে বসলেন আর ও চিরাচরিত নিয়মে ওপরে উঠে বাবার ঠিক পেছনে বসল; সার্ট খুললেই ও পিঠ চুলকে দেবে। দাদু আজ আর সার্ট খুললেন না, কোলের ওপর থেকে সুটকেসটা নামিয়ে পাশে রাখলেন আর অতল ভাবনার মধ্যে নিজের পিঠ নিজেই চুলকোতে আরম্ভ করলেন। আন্না খানিকটা অবাক হল কিন্তু বাবাকে খুশী করার এমন অপূর্ব সুযোগ সে ছাড়তেও পারল না। লম্বরে এগিয়ে এসে তার ছোট্ট হাতখানা সাগ্রহে বাবার পিঠে রাখতেই দাদু খেঁকিয়ে উঠলেন আর অভিমান চাপতে গিয়ে সে যখন সুটকেসের ওপর আঙুল ঘ'সে আওয়াজ করল, দাদু ওর গালে চড় বসিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আর সুটকেসটা আলমারির মাথায় রেখে ঘুরতেই দেখলেন দরজায় টেঁপি। বললেন—

● সুটকেসে ভয়ানক দামি ওষুধ আছে কেউ যেন হাত না দেয়।

● ওষুধ?

'টেঁপির ছোট্ট চোখ দুটো ছানা বড়ার মতন ছেতরে গেল'—

● কার?

● অরুণের—

● ও—

ও'টা অভ্যাসের, তারপরই যে হাঁটা হল' চেষ্টা না করলেও তাতে হাতি গ'লে যায়। পেছন পেছন ঘরজা পর্য্যন্ত এসে টেঁপি বলল—

● এ কি? আবার যাচ্ছ কোথায়?

● কাজ আছে।

● কোথায়?

দাদু থেমে গেলেন, ঘুরে দাঁড়ালেন. বললেন—

● জাহান্নমে! যাবে?

তারপরই হন্ হন্ ক'রে চলে গেলেন। আজ অভিমানে টেঁপির চোখে জল এলো। বিয়ের চল্লিশ বছরের প্রথম দু চারটে বাদ দিলে দেখা যাবে যে বাকি প্রায় সব কটাই টেঁপি স্বামীকে বকে বকেই কাটিয়েছে আর তার নীরক্তর স্বভাবের মধ্যেই সোহাগের অসীম আনন্দ পেয়েছে। আজ জীবনে এই প্রথম টেঁপি তার বকুনির জবাব পেল এবং ব্যঙ্গের ভাষাতে! চোখে তাই আজ তার জল এলো এবং বন্যার স্রোতে!

ইন্দ্রনীলের গাড়ী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল'। টালিগঞ্জ থেকে আসতে আসতে যখন নিউ আলিপুরের দিকে গাড়ী ঘুরল' তখন দাদু ভাবলেন একবার জেনে নেন যে এদিকে কেন যাচ্ছে কিন্তু ভয়ে মনটা এমনই ঘুষড়ে ছিল যে সাহস হল না। নতুন আলোয় ঝলকানি লাগা নিউ আলিপুর পেরিয়ে গিয়েই গাড়ীটা যখন ঘুরলো বুড়ো শিবতলার দিকে তখন দারুণ শীতের মধ্যেও দাদু ঘেমে স্নান ক'রে ফেললেন আর গাড়ীটা যখন এসে দাঁড়ালো ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা প্রকাণ্ড একটা ভাঙা মিলের সামনে তখন দাদু ভয়ে একেবারে আধমরা।

● এখানে?

● হুম্। এসো।

ইন্দ্রনীল তার কথার তিক্ততায় আর চাউনির তীক্ষ্ণতায় বুঝিয়ে দিল যে এরপর আর কথা চলবে না, কিছু বললেই চলবে হাত এবং তারপরই পুলিশের হুমকি।

মিলটা বহুকাল আগে আগুনে পুড়ে ছিল তারে তারে লাঠালাঠির পর আর তখন থেকে পড়েই আছে মামলার জালের মতন মামলার ফাঁদে। আলিপুর থেকে মামলা যখন সদর আদালতে আর আপিলের ঘূর্ণীতে ঘুরতে ঘুরতে সুপ্রীম কোর্টে পৌঁছোল' তখন দেখা গেল বড় ভাই বেঁচে নেই আর ছোট ভাই বাঁচিতে। পালটা পালটি মামলার মধ্যে কিছু সিভিল কিছু ক্রিমিন্যাল। এই সব মিলিয়ে এমন একটা বিচ্ছিরি তালগোল পাকিয়ে গেল যে ভায়েদের বংশধরেরা জাত ব্যবসা ছেড়ে চাকরির সহজ পথ নিল আর সবাই এমন চারিদিকে ছিটকে পড়ল' যে এক ছোট হ'য়ে সম্পত্তিটা যে বিক্রি ক'রে দেবে সে পথও রইল' না। আজ বছর পনেরো এখানে সাপ, বেজি, বাদুড় আর বহুমাত্রেয়দের আড্ডা।

ভাঙা পাঁচিল, আধ ভাঙা সিঁড়ি আর লোহা লক্কড়ের স্তূপ পেরিয়ে ওরা এসে দাঁড়ালেন একটা ভাঙা দেওয়া ঘরজার সামনে।

দাদু ভ'য়ে ভ'য়ে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বললেন—

● এখানে?

● ছেলেটা।

● কো···কোথায়?

● ঐ ঘরে।

দাদু ঘরের দিকে পা বাড়াতেই ইন্দ্রনীল বলল'

● দাঁড়াও!

দাদু ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলেন ওর হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি। ইন্দ্রনীল বললে—

● এটা নাও।

● ছুরি কেন?

লম্বা টানা অপেক্ষার পর অত্যন্ত অস্পষ্ট কণ্ঠে ইন্দ্রনীল বলল—

● খুন।

কথাটা দাদুর কানে বাজ পড়ার মতন শোনালো।

● খুন?

ইন্দ্রনীল মাথা নাড়ল'।

● ঐ অতটুকু বাচ্চাকে—খুন?

● হ্যাঁ।

● তুমি যে বললে—

● বোকার মতন কথা বোল'না। ছাড়া যায় নাকি? ওকে ছাড়লে আমরা ধরা প'ড়ে যাবো না?—যাও।

ছুরিটা এগিয়ে ধরল ইন্দ্রনীল আর পাগলের মতন চিৎকার ক'রে উঠলেন দাদু—

● না···না···আমি পারব' না।

● পারবে। পারতে হবে।

● আমি কিছুতেই পারব' না···

পড়েই যেতেন দাদু যদি না ইন্দ্রনীল ওঁর শার্টের কলারটা ধ'রে ফেলত। কলার ধ'রে টেনে তুললো ওকে ইন্দ্রনীল আর বাঁ হাতে এমন জোরে চড় মারল' যে ঠোঁট কেটে দাদুর রক্ত বেরিয়ে এলো।

দাদু তবু বললেন—

● আমি পারব' না পারব' না—

বেড়াল যেমন ইঁদুরকে ঝাঁকানি দেয়, তেমনি ভাবে ওঁকে ঝাঁকানি দিয়ে ইন্দ্রনীল বলল—

● পারবে তুমি। পারতে হবে। না পারলে আমি তোমায় কুকুরের মতন গুলি ক'রে খুন করতে পারব' তারপর ছুরিটা তোমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে পুলিশে খবর দিতে পারব' যে তুমি ছেলেটাকে খুন করতে যাচ্ছিলে বলে আমি তোমায় গুলি ক'রেছি···এবার পারবে?

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন দাদু, জবাব দেওয়ার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। ছুরিটা আবার ওর হাতের দিকে এগিয়ে দিতেই দাদু আর আপত্তি করলেন না, নিয়ে নিলেন। তালাটা খুলে দিয়ে ইন্দ্রনীল বললে—

● যাও। কাজ সারো। আমি বাইরে গাড়ীর কাছে আছি।

যন্ত্র চালিতের মতন ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন দাদু ছুরিখানা হাতে নিয়ে আর পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন ভেতর থেকে। তারপরই শিস্ দিতে দিতে ইন্দ্রনীল চ'লে গেল গাড়ীর দিকে।

শীতের আমেজে মানবেশের হাতের স্পর্শ, কুয়াশা ঘেরা সন্ধ্যায় মনের কুহকভরা শূন্যতা, যৌবনের ঘুণী আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব মিলিয়ে এমন একটা আবেশ ছড়ালো যে নদীর বুকে মৌকাভিসার ক'রে বাড়ী ফিরতে ওদের আটটা বাজল'। উমা ঘরে ঢুকে দেখল' সারা বাড়ীটা থমথম করছে। কারণ বুঝবার আগেই মার অকারণ চিৎকারে ও বুঝে নিল' যে বেশ বড় ধরণের কিছু একটা বাড়ীতে ঘটে গেছে। মাকে থামাবার জন্যে ও অরুণ প্রসঙ্গের অবার্থ বর্ম সামনে তুলে ধ'রে বলল—

● জানো, অরুণ বাবুর বৌ আছে?

টেঁপি আজ দ্বিতীয়বার হাতি গেলা প্রমাণ হা ক'রে দাঁড়িয়ে গেল আর সেই সুযোগে উমা দ্বিতীয় বান ছাড়ল'—

● একটা ছেলেও আছে।

দেখতে দেখতে প্রায় সারা বাড়ী সব গরম হ'য়ে উঠল' আর উমা অরুণের বাবার সুটকেশ নিয়ে হোটেলে আসা থেকে আরম্ভ ক'রে বলতে শুরু ক'রে যখন গাড়ীতে অরুণের স্ত্রীর প্রসঙ্গে এসে পৌঁচেছে ঠিক সেই সময় আয়া এসে বলল—

● দিদি রেডিওটা চালিয়ে দাও!

গল্প তখন এমন গভীর ভাবে জ'মে উঠেছে যে উমা কথাটা কানেই নিল'না। আয়া আবার বলল'—

● দিদি···দাও!

● আঃ তুমি বড্ড জ্বালাতন কর।

ব'লে নেহাৎ তাচ্ছিল্য ভরে ট্রানজিসটারটা অন ক'রে দিতেই ঘোষণা ভেসে এলো যে—

"নোট ভরা সুটকেসটা আলোক সেনকে জমা দিতে বলা হ'য়েছিল ইণ্টারন্যাশন্যাল হোটেলের রিসেপশানে—"

চমকে উঠল' উমা। নোটভরা সুটকেস?

অবাক হ'য়ে মা তাকালেন উমার দিকে। উমা ঝুঁকে পড়ল ট্রানজিসটারের ওপর।

"কথা ছিল টাকা পাওয়ার পরই আততায়ীরা আলোক সেনের নাতিকে ফেরৎ দিয়ে যাবে কিন্তু হোটেল থেকে টাকা ভর্তি সুটকেস নেওয়ার এক ঘণ্টা পরেও যখন সে ছেলেটিকে ফেরৎ দিলোনা—তখন আলোক সেন পুলিশের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। এ বিষয় যিনি ছেলে চুরির ব্যাপারে কিছু সন্ধান দিতে পারবেন তিনি উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত হবেন এবং ধরিয়ে দিতে পারলে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে।"

টেঁপি অসহায় শিশুর মতন মেয়েকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন—

● উমা! ঐ সেই সুটকেস! কি হবে মা?

মাকে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে উমা উঠে গেল আর আলমারির ওপর থেকে সুটকেসটা নামিয়ে আনল'। আনতে সময় লাগলোনা, কিন্তু খুলতে গিয়ে ভয়ে ওর হাত পা হীম হ'য়ে গেল'। তবু খুলতেই হল। সুটকেস ভর্তি নোট!!

• • • •

রোগ শয্যায় বালিশে মাথা গুঁজে চন্দনা শুধুই কাঁদছিল। মাথার কাছে ডাক্তার আর

পায়ের কাছে নার্স আর জানলার কাছে শক্তর কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তিও যেন আজ আর কারোরই নেই। জানলার গরাদটা বার দুয়েক টেনে আলোক সেন ঘুরে বললেন—

● তখনই জানতাম যে টাকা দিলেও কিছু হবে না। বৌমাই তো জোর ক'রে···

সবেগে উঠে বসল' চন্দনা। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলে উঠেছে, চুলগুলো চামরের মতন ফোলা। বললে—

● হ্যাঁ, আমি দিয়েছি। জোর ক'রেই দিয়েছি। কিন্তু চুরি গেল' কার অপরাধে? আমার, না আপনার ব্ল্যাকের টাকার? ঐ টাকার জন্যে আপনার ছেলে গেছেন।···ঐ টাকার জন্যে আজ আমার ছেলে যেতে ব'সেছে···আর একদিন আপনিও যাবেন তাও ব'লে দিলাম।

আর বলতে পারল'না চন্দনা। বিছানায় লুটিয়ে পড়ল দৃষ্টিতের বিস্তৃতায়।

• • • •

রেডিওর খবর শুনেই এ বাড়ীর খোঁজ নিতে এলো মানবেশ এবং অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ আলোচনা ক'রে ঠিক হল যে সকাল পর্যন্ত দাদুর অপেক্ষা ক'রে তবেই যা কিছু করার তা করা হবে। মানবেশের উকিল মন উমাকে বাঁচাবার জন্যে কন্দি আঁটল' অনেক, কিন্তু টেঁপি বলল সে থাকতে কিছুতেই তা হওয়ার নয়। লেখা পড়ায় প্রথম ভাগের শেষ সীমানা সে কখন পার হয়নি কিন্তু জীবনায়নে সে অনেকের চাইতে অনেকখানি এগিয়ে। চোখ মুছতে মুছতে বলল—

● মৃত্যু ব'লে কি আমার মন নেই? একটা বিধবার বাচ্চাকে চুরি করবে টাকার লোভে আর জেনে শুনেও আমরা চুপ ক'রে থাকব?

মানবেশ কিছু একটা বলতে গিয়ে কেবল "ধরুন যদি!"—বলেই থেমে গেল'।

টেঁপি সবেগে ঘুরে বললো—

● কি?

● না, মানে···

থেমে গেল' আবার, আর দুই বিনিময়ের মধ্যে উমাকে অনুনয় করল' কথাটা নেই বলুক। আমতা আমতা ক'রে উমা বলল—

● ধর যদি বাবা ছেলেটিকে ইতিমধ্যেই···

উমাকে চুপ করিয়ে দিলেন উমাও চিৎকারে, বললেন—

● চুপ কর পোড়ামুখী ও-কথা মুখেও আনিস্ না। পাপে তোর মুখ খসে পড়বে! যে লোকটা মানুষ নয়, দেবতা, জীবনে একটা মাছি পর্যন্ত কখন মারেনি সে খুন করবে? খুন?

• • • •

রাস্তার ধারে গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালেন দাদু। সার্ট ভর্তি রক্ত। বললেন—

● চল।

● হয়েছে?

দাদু মাথা নাড়লেন, জবাব দিলেন না।

● কোটটা ? কোটটা কি হল ?

● রক্ত লেগেছিল। ফেলে এসেছি—

● হুম্।

"বাঁ হাতটা ভেঙে ধ'রে রইলেন ডান হাতের মুঠোয় আর গভীর অবসাদে দাদু মাথাটা হেলিয়ে দিলেন গাড়ীর দরজার ওপর। গাড়ী চালাতে চালাতে ইন্দ্রনীল আড় চোখে এক সময় দেখল' দাদু সামনের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছেন পাথরের মতন প্রাণহীন। মানুষ যখন, মন তো আছেই।

ইন্দ্রনীলের মায়া হল, বলল—

● কি দাদু ? কি ভাবছ ?

● ভাবছি ? ভাবছি টাকা নিয়ে কি করব ? তুমিই বা কি করবে ? ঐ বড়লোকরাই বা কি ক'রে ?

ইন্দ্রনীল হাসল' বিজ্ঞের মতন আর বলল—

● কেন ? গাড়ী করে, বাড়ী করে, স্ফূর্তি করে। আমিও করব'।

● করলে। তারপর ?

● মানে ?

● ঐ যে, বাড়ী করলে, গাড়ী করলে, স্ফূর্তি করলে। তারপর কি করবে ?

বেশ জোরেই ব্রেক ক'ষে গাড়ীটা থামালো ইন্দ্রনীল। সামনে সব-বাত্তা। দাদু কিছু বললেন না ওর সঙ্গে ছোট্ট একটা দৃষ্টি বিনিময়ের পর হাসলেন শুধু।

দাদুকে কিছুতেই কাছ ছাড়া করল'না ইন্দ্রনীল। দাদু অনেক কাকুতি মিনতি করলেন, ছেলেমেয়ের জন্যে মন কেমন করার করুণ নিবেদন জানালেন কিন্তু ইন্দ্রনীল নাছোড়বান্দা। এক সময় গাড়ী থেকে নেবে ইন্দ্রনীল কিছু খাবার কিনল আর পেগ দুয়েক হুইস্কি গিলে সঙ্গে একটা বোতলও নিয়ে এলো আর তাই দেখে দাদু রীতিমত বেপরোয়া হ'য়ে চিৎকার ক'রে বললেন—

● শোন' রাসকেল! আমি বাড়ী যাবো। আর যদি না নিয়ে যাও আমি চিৎকার ক'রে লোক জড় করব'—বুঝেছ রাসকেল ?

ইন্দ্রনীল অবাক হ'য়ে গেল', বললে—

● ব্যাপার কি ? চটছো কেন ?

● হুম্ ঘর জ্বালা! সমঝতা পারতা ? ইডিয়েট! তোমার জন্যে আমি চুরি ক'রেছি, চুরির টাকা ঘরে তুলেছি, রক্তের বন্যা বইয়েছি—তাই ব'লে বাড়ী যাবোনা ?—রাসকেল কাঁহিকা!

দাদুর মূর্তি দেখে ইন্দ্রনীল প্রমাদ গুনল', মন বললে সবই পাগলামির লক্ষণ। বললে—

● চল তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

একেবারে উল্টো সুরে দাদু বললেন—

● বেঁচে থাকো বাবা। বেঁচে থাকো···

তারপর হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—

● আমি আর পারছিনা বাবা, আমি আর পারছিনা···আমি একটু ঘুমোবো।···

দাদু মাথাটা আবার হেলিয়ে দিলেন দরজার ওপর।

গলির মোড়ে গাড়ী থামালো ইন্দ্রনীল আর ধাক্কা মেরে তুলে দিলো দাদুকে। দাদু চমকে উঠে বসলেন, চারিদিকে তাকিয়ে ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না কোথায় এসেছেন, বললেন—

● কোথায় এলাম ?

● বাড়ীর মোড়ে।

● ও হ্যাঁ···আচ্ছা···

নেমে গেলেন দাদু আর দাঁড়ালেন না এক মুহূর্ত। ইন্দ্রনীল গাড়ীতে ব'সে ব'সেই দাদুর ওপর নজর রাখল'। দাদু যখন গলির মোড়ে ঘুরে গেলেন তখন পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বের ক'রে দেখল সেটা খালি। সামনের দোকানে গিয়ে প্যাকেট চাইল একটা আর ঘড়িতে সিগারেট ধরাতে ধরাতে শুনলো বিড়ি পাকানো দুই বাবুর কথা। ওরা আলোচনা করছে রেডিওতে ছেলে চুরির ঘোষণা আর পঁচিশ হাজারের ইনামটা কি ক'রে পাওয়া যায় তারই জল্পনা কল্পনা।

ইন্দ্রনীল দাঁড়িয়ে পড়ল আর ব্যাপারটা কি হ'য়েছে জানবার জন্যে উদগ্রীব আগ্রহে প্যাকেটটা ওদের দিকে এগিয়ে বললে—

● চলবে ?

ওরা ইতস্তত: করল'। ইন্দ্রনীল বললে—

● নিন না···

ওরা দুজনে চোখাচুখি ক'রে হাত বাড়ালো আর সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে ইন্দ্রনীল বললে,

● ব্যাপারটা কি বলুন তো ? কার ছেলে চুরি গেল ?

● কেন ? শোনেন নি রেডিওতে ?

● কৈ না তো ?

ওরা সবিস্তারে সংবাদ দিতে আরম্ভ করল'।

চার

॥ চৈতন্য ॥

সারা বাড়ীটা অন্ধকার কিন্তু সামান্য ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল'। প্রথমে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন কেউ জেগে কিনা। সবাই অকাতরে ঘুমোচ্ছে। পরম সতর্কতায় দাদু ওদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে। এখানে শোয় ওঁর তিন বড় মেয়ে আর তাদের মাসতুতো বোনেরা। সবাই এরা মশারীর মধ্যে তাই কেউ জেগে আছে কিনা বোঝা গেল'না। দাদু সন্তর্পনে এ ঘরটাও পেরিয়ে গেলেন আর নজরটা সামনের দিকে ছিল' ব'লে জানলার ধার থেকে টেঁপি যে ওঁর পেছন পেছন এলো তা বুঝলেন না।

নিজের ঘরে এসে দেখলেন আন্না আর ছোট ছেলে শিবু অঘোরে ঘুমোচ্ছে, টেঁপি পাশে নেই। ওদের গায়ে কাঁথা ঢাকা ছিল তাই বিনা আয়াসেই কম্বলটা উনি তুলে নিলেন। ঠিক সেই সময় আন্না পাশ ফিরে শুলো আর বোধহয় অস্পষ্ট বলল 'বাবা'। দাদু বসে পড়লেন খাটের ওপর। আজ ওকে চড়

মেরেছিলেন, এখন ইচ্ছে হল একবার বুকে জড়িয়ে আদর করেন। উনি ঘুমন্ত মেয়ের মাথায় স্নেহের স্পর্শ দিতেই একটা অদ্ভুত আবেশে চোখ বুঁজে এলো আর ঠিক সেই সময় টেঁপি ওদের দরজায় ছিটকিনি দিল। দাদু আড় চোখে দেখে আড়ষ্ট হ'য়ে বসলেন আর পোকার ওপর দৃষ্টি আটকে টিকটিকি যেমন পা পা ক'রে এগিয়ে আসে তেমনি ভাবে টেঁপি এসে ওঁর পেছনে দাঁড়ালো আর সার্টের কলারটা ধ'রে একটানে ওকে দাঁড় করিয়ে বলল—

● তুমি···

বুক ভর্তি রক্তের চাপ চাপ দাগ দেখে টেঁপির কণ্ঠরোধ হল। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি, ওর এক নতুন অনুভূতি আর বুকের অনেক গভীর থেকে কান্নার যে ধাক্কাটা এলো তার অসহ্য ব্যথা। স্বামীর সার্টের কলার ধরা হাত দুখানার ওপর মাথাটা বার কয়েক ঘষে, কান্নার ধাক্কাটা সামলে নিল আর চোখের জলটা পুঁছে নিয়ে বলল—

● আমরা মা ঠাকুমার কাছে শুনেছি স্বামী হলেন দেবতা ওঁকে পুজো করতে হয় আর যে চোর যে খুনী যে পাপী তাকে ঘেন্না করতে হয়। বলতে পারো, স্বামী যদি খুনী আসামী হয় তাহ'লে স্ত্রী কি করবে?

দাদু চুপ ক'রে রইলেন। সারা জীবন বকুনি শুনেছেন আর মুখ বুঁজে সব সহ্য ক'রেছেন কিন্তু বুক ফেটে কখন কান্না আসেনি। ওকে সজোরে নাড়া দিয়ে টেঁপি বলল—

● মুখ বুঁজে থেকোনা তুমি, জবাব দাও। কেন চুরি ক'রেছ তুমি? কেন খুন করেছ? কি দরকার ছিল তোমার টাকার?

অতি কষ্টে দাদু বললেন—

● ছাড়ো। আমার এখনও অনেক কাজ বাকি আছে—ছাড়ো।

বুক ফাটা আর্তনাদে টেঁপি ওঁর বুকের ওপর পড়ে বলল—

● তার আগে ব'লে যাও আমি কি করব।

ওকে আজ বহু আদরে কাছে টেনে দাদু বললেন—

● ক্ষমা আর আমার জন্যে কিছু প্রার্থনা।

দাদু আর দাঁড়ালেন না, কম্বলটা হাতে নিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

• • • •

পানওয়ালার দোকানে মোটা কিছু পাওনার সংবাদ পাওয়া মাত্র ইন্দ্রনীল মন ঠিক ক'রে ফেলল' যে রাত্রে আর দাদুকে বিরক্ত না ক'রে ভোর বেলা ওকে গাড়ীতে তুলে সোজা আলোক সেনের বাড়ীতে নিয়ে হাজির করবে। গাড়ীটা স্টার্ট দিয়ে আবার বন্ধ ক'রে দিল। ভোর হ'তে আর তো মাত্র কয়েক ঘন্টা, কি দরকার ওকে চোখের আড়াল ক'রে? তাছাড়া মদের নেশাটাও বেশ একটা মৌতাতের সৃষ্টি ক'রেছে। গাড়ীর কাঁচ তুলে ও গা এলিয়ে দিল।

পথে নেবেই দাদু দেখল' অরুণের গাড়ী আর বুঝল' ওটা ওকেই পাহারা দেওয়ার জন্যে। একবার ভাবলো পাশ কাটিয়ে চুপ চাপ পেরিয়ে যায় কিন্তু সাহসে কুলোলো না। এমনই অমানুষ যে ও মানুষটা সব পারে। থমকে দাঁড়ালেন এক পলক তারপর কি ভেবে উনি বাড়ী ফিরে গিয়ে উমাকে ডাক দিলেন—

● উমা···উমা···মা

উমা ধড়মড় ক'রে উঠে বসল—

● বাবা ?

● হ্যাঁ মা···শোন মা···আমি যাচ্ছি বুড়ো শিবতলার ধারে ভাঙা মিলটাতে। তুই···মানে,··· মানবেশকে নিয়ে তুই এক্ষুনি থা আর পুলিশে খবর দে।

দাদু আবার ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেলেন আর উমা মুখ তুলেই দেখল মা দরজায় দাঁড়িয়ে। স্পষ্ট উনি বললেন—

● আমি তৈরি। তুই মানবেশকে ডাক।

• • • •

মদের নেশায় আর টাকার স্বপ্নে ইন্দ্রনীল এমন অচেতন হ'য়ে ঘুমোচ্ছিল যে গাড়ীর কাঁচের ওপর দাদুর থাবা থাকিতে পাশের কুকুরটা খেঁকিয়ে উঠল কিন্তু ইন্দ্রনীলের হুঁশ নেই। কাঁচটা যখন প্রায় ভাঙে আর কি তখন ইন্দ্রনীল উঠে ব'সে অবাক হ'য়ে ওঁকে দেখল' আর বেশ খানিকক্ষণ নিজের চোখটাকেই অবিশ্বাস করে হাঁ হ'য়ে রইল তারপর কাঁচটা নাবাতে নাবাতে বলল—

● এতো রাত্রে ?

গাড়ীতে উঠে বসতে বসতে দাদু বললেন—

লাস তুলতে হবে না ?

● লাস ?

● হ্যাঁ গো ! এরই মধ্যে ভুলে মেরে ? ঐ ছেলেটা গো···

● ও হ্যাঁ।

● কখন এনেছি। এতেই জড়িয়ে আনব। কি বল ?

মনে মনে আনন্দে ও আটখানা হ'য়ে বলল—

● বাঃ ! চমৎকার হবে।

গাড়ী ছুটিয়ে ও ভাবতে বসল'। একেই বলে না চাইতেই এক কাঁদি। শুধু আসামী নয় একেবারে লাস সমেত হাজির করবে থানায় ! মনে মনে হিসেব ক'রে নিল'—আছে পঁচিশ আর পাবে পঁচিশ, হল পঞ্চাশ। দাদুর পঁচিশটা হাতানো যায় না ? মনে মনে হিসেব ক'রে বলল—

● দাদু ?

● হুঁ ?

● ঐ সুটকেশটা সামলে রেখেছিলে তো ?

● সে আর বলতে হবে না। লুকোলেই সব সন্দেহ হবে, তাই সবার চোখের সামনে রেখেছি। বলেছি খুব সাবধান, অনেকের দরকারি অমুধ আছে।

কথাটা শুনল বটে কিন্তু অত সহজে যে সুটকেশটা হাতানো যাবে ভাবতেই পারা গেল না। বাঘাল দাদুকে থানায় পুরে চেঁপি মাকে বললেই হবে। তাঁর মন আর তাজা চিঁড়ে, ভিজতে একদম সময়ই লাগে না।

গাড়ী এসে থামল ভাঙা বাড়ীটা একটু ছাড়িয়েই। দাদু বললেন—

● এসো।

এতো সহজে ফাঁদে পা দেওয়ার ছেলে আর যেই হক ইন্দ্রনীল নয়, বললে—

● আমি বরং গাড়ীতে থাকি।

● হুম্। সেই ভালো।

দাদু কম্বলটা গুটিয়ে নিয়ে ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল'।

পাঁচ মিনিট গেল তারপর দশ পনেরো আর দেখতে দেখতে প্রায় আধ ঘন্টা কেটে গেল কিন্তু দাদু এলেন না। এরপর কম্বল হ'লেই লোক চলাচল আরম্ভ হবে তখন সব কাজটা সহজে নাও সারা যেতে পারে। অস্থির উত্তেজনায় সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাই-র শেষ কাঠিটা নিজেরই নিঃশ্বাসে নিভে গেল। অধৈর্য্য প্রতীক্ষায় দেশলাই-র খালি বাক্সটা ব'সে ব'সে ভাঙল' তারপর আস্ত সিগারেটটা পা দিয়ে মাড়িয়ে দুমড়ে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনীল ভেতরে ঢুকে গেল।

ওপরের ভাঙা ঘরটার মধ্যে একটা খড়ের গাদার ওপর দাদুর কোটের তলায় বিবেক নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল আর দাদুর বাঁ হাতটার ওপর যে লম্বা টানা কাটার চারিধারে চাপ চাপ রক্ত জমে পাথরে মতন শক্ত হয়েছিল দাদু সেইখানে হাত বোলাচ্ছিল। সত্ত আনা কম্বলের কিছুটা ছিল দাদুর গায়ে আর বাকিটা ছিল বিবেকের গায়ে। বিবেক হঠাৎ পাশ ফিরল আর দাদু তার ভাবনার রেশ থামিয়ে ডাক দিলেন।

● দাদু···দাদু···

বিবেক আবার পাশ ফিরল। তারপর বার দুয়েক পরম্পরে দাদু ওর মাথায় হাত বুলোতেই বিবেক চোখ খুলে বলল'—

● আমি বাড়ী যাবো···

ওকে স্নেহ প্রাবল্যে জড়িয়ে ধ'রে দাদু বললেন—

● যাবে বৈকি দাদু, তোমাকে নিয়ে যাবো ব'লেই তো এসেছি···

উঠে বসতে বসতে বিবেক বলল—

● তুমি কে?

● আমি দাদু।

● ধ্যাৎ। তুমি তো সেই বুড়ো।

● হ্যাঁ। আমি তোমার বুড়ো দাদু

ব'লে ওকে যেই জড়িয়ে ধরতে গেলেন বিবেক বলল···

● কত রক্ত।

হাসলেন দাদু, আর হাতখানা বাগিয়ে ধ'রে বললেন—

● এই যে ছুরি দিয়ে হাত কেটেছিলাম তার রক্ত···

● কেন কাটলে?

● কেন কাটলাম!

বাকিটা আর বলা হল না। নিচে থেকে ইন্দ্রনীল ডাক দিল—

● দাদু।

আনলা দিয়ে উঁকি মেরে দাদু দেখলেন অরুণ উঠে আসছে ওপরে। কি করবেন প্রথমটা বুঝতে না পেরে দাদু খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর বিবেককে একধারে সরিয়ে দিয়ে দরজাটা দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওকে ডাক দিতে দিতে ওপরে উঠে এসে ইন্দ্রনীল দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল—

● দরজা খোল'।

ভয়ে বিবেক চিৎকার ক'রে উঠল—

● দাদু!

অন্ধ রাগে উন্মত্ত হ'য়ে ইন্দ্রনীল দরজাটা ভেঙে ফেলবার উপক্রম ক'রে বললে—

● খোল' নইলে দুজনকেই খুন করব!

লম্বা টানা আটার বছরের জীবনে যে মানুষটা কখন একটা পাখির হাতে নেয়নি সে ছুরিটা দেখিয়ে বিবেককে বললে, 'যাও তো ওটা আর দিয়েই স'রে যাও'। ওদিকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে দরজায় বার কয়েক ঘা দিয়ে ইন্দ্রনীল যখন ভাঙতে পারলে না তখন গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ও দরজায় চাপ দিল আর সুযোগ বুঝে দাদু স'রে যেতেই ইন্দ্রনীল ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়ল, মুখ থুবড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে দাদু ওর ওপর লাফিয়ে পড়লেন হিংস্র বাঘের মতন, আর সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুরিটা বসিয়ে দিলেন ওর পিঠে, ওর কাঁধে তারপর ওর বুকে। যে মানুষটা জীবনে কখন রাগ ক'রে কাউকে কটু কথা বলার সাহস পায়নি আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমানায় এসে সে অসুরের শক্তিতে অস্ত্র ধরল, আর কিছু জানবার ও বুঝবার কি শুনবার আগেই শত্রুকে খুন ক'রে ফেলল। পুলিশ নিয়ে যখন আলোক সেন উমা, ভৌমিক সব এসে পড়লেন তখন অশকা-অবসাদে দাদু প্রায় অজ্ঞান। বিবেককে নিয়ে কোন রকমে টলতে টলতে উনি নেমে এলেন নিচে আর আলোক সেনের দিকে বিবেককে ঠেলে দিয়ে বললেন—

● এই নিন আপনার নাতি···আর কখন বুদ্ধির দোহাই দিয়ে কাউকে ব্যঙ্গ করবেন না—

তারপর ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন—

● বলতে পারছি না তবে মনে হয় লোকটা মরেই গেছে।

আলোক সেন বললেন—

● কে? কে মরে গেছে?

● অরুণ। অরুণ সেন···

ওপরে অরুণ নামীয় লোকটিকে দেখে আলোক সেন আঁতকে উঠলেন।

শেষ

॥ চন্দ্রমৌলি ॥

খুন খারাবিতে মানুষের খানিকটা কৌতূহল; তার ওপর যদি ষাটের বুড়ো, ছেলে চুরি করার পর ছুরি চালিয়ে খুনের মতো কথাই নেই। সেদিন কোর্টে সারা শহর ভেঙে পড়ল'। সব কথা শুনে

চন্দনা নিজে গিয়েছিল টে'পির সঙ্গে দেখা করতে আর দাদুর সংসার থেকে আদর ক'রে মাথায় তুলেছিল কিন্তু একটা পয়সাও ছোঁয়নি। সাদরে ফিরিয়ে দিয়ে টে'পি বললে, স্বামীর বারণ আছে। যন্তরকে সঙ্গে নিয়ে তখন চন্দনা গেল দাদুর কাছে, হাজতে ; কিন্তু তিনিও ওকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—

● আমার মতন লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে যে টাকা জড় করা হ'য়েছে—তাই নিয়ে আমি বাঁচব ? তাও কি কখন হয় ?

আলোক সেন মাথা নিচু ক'রে রইলেন। চন্দনা নিজের গলার হারটা এগিয়ে দিয়ে বললো,—

● মারা যাওয়ার আগের দিন আমার স্বামী এটা দিয়েছিলেন। আপনি বিশ্বাস করুন এতে অন্যায়ের রোজগার এক কানাকড়িও নেই।

ওর হাতটা চেপে ধরলেন দাদু। চোখে জল নাবল' বাধা না মেনে। বললেন—

● ওটা থাক। থাক···

সবই থাকল। দাদুর জেদও থেকেই গেল। সেশন কোর্টে সহস্র লোকের মাঝে ঐ মানুষটা একলা এসে দাঁড়ালো কাঠগড়ায়—খুনের আসামী হ'য়ে। সরকার পক্ষ থেকে উকিল বসল সাতজন। জুরী বসল তেরো জন। জজসাহেব অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—

● আপনার পক্ষে উকিল নেই ?

সগর্বে উঠে দাঁড়ালেন দাদু ; চারিদিকে ভালো ক'রে দেখে নিয়ে বললেন—

● না হজুর।

● আপনি দারিদ্র্যের উল্লেখ ক'রে দরখাস্ত করলে কোর্ট কিন্তু সে ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে।

● আমি দরিদ্র হজুর ঠিকই কিন্তু উকিলের প্রয়োজন নেই। আমি তো স্বীকার করেছি যে আমি খুন করেছি। ঐ উকিলবাবুরা ব'সে আছেন, ঐ জুরীবাবুরা ব'সে আছেন, ঐ লোকরা ব'সে আছেন, আর হজুর আপনি নিজে আছেন। আপনারা সবাই শুনুন হজুর আমি খুন করেছি। আপনাদের এই উকিল সাক্ষী সাবুদ ওসব কিছুই দরকার নেই। আমি খুন করেছি। এবার শাস্তি দিন।

সারা কোর্ট অনন্ত বিস্ময়ে আর অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ব'সে রইল। তিরীশ বছরের অভিজ্ঞতিতে এমন ধারা অভিজ্ঞতা জজসাহেবের হয়নি। জুরীদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনযুদ্ধে হেরবার হাসি কান্না মেশানো সহজ মানুষ। তাদের মনটা সতেজ বলে সহানুভূতির সুরে নড়ে উঠল'। বেশ খেলিয়ে খুলিয়ে খুনের আসামীকে ফাঁসিতে ঝোলাবার এক একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে দেখে প্রবীন পাব্লিক প্রসিকিউটার প্রভাত সরকার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

● ইয়র অনার আসামীর এই সমস্ত ভাবপ্রবণ অভিব্যক্তি

জজসাহেব হাতের ইশারায় ওকে থামিয়ে দাদুর দিকে চেয়ে বললেন—

● এটা আপনার জীবন মরণের সমস্যা তা বোঝেন ?

● বুঝি হজুর।

● আপনি যা বলছেন তার মানে বোঝেন ?

● বুঝি হজুর। আমি যা বলেছি তাতে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে এই তো।

● হ্যাঁ।

● আমি আর বাঁচতে চাই না হজুর।

● আপনার আর কিছু বলার আছে ?

রেলিংটা দাদু মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলেন। এমন শক্ত সে মুঠি যে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতটা আবার খুলে গেল আর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়াতে শুরু করল। চারিদিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলেন। ঘুরতে ঘুরতে চোখটা গিয়ে আটকালো আলোক সেনের চোখের ওপর আর তখনই সগর্বে বললেন—

● আছে হুজুর—বলতে সময় লাগবে। পারো ?

● বলুন।

চারিদিকে আরও একবার বেশ ভালো ক'রে চেয়ে দেখলেন দাদু। যত চেনা মুখ, চেনা মানুষ সব পেরিয়ে ওঁর দৃষ্টি এসে থামল চন্দনার ওপর। সে তখন তার স্বামীর দেওয়া হাতটা ধ'রে অপলক দৃষ্টিতে ওঁরই দিকে চেয়েছিল। দাদু আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করলেন—

● হুজুর। দেড় বছর বয়সে আমার বাবা মা দুজনেই মারা যান আর আমি পথে পথে মানুষ। আজ আমার বয়স আটান্ন বছর—জীবনে কোনদিনও দু বেলা পেট ভ'রে খেয়েছি ব'লে আমার মনে নেই। আমিও না হুজুর, আর ঐ আমার স্ত্রী ব'সে আছে, ওও না। আমরা এগারটি সন্তান মানুষ করেছি। পুন্নি আরও আছে—সবাই মিলে সতেরোজন। হুজুর! দুঃখে কষ্টে আমরা হেসেছি, কেঁদেছি, কিন্তু ৫০ বছরে কখন একটা মাছির গায়ে হাত তুলিনি, আর ব্যাঙ্কে লাখ লাখ টাকা এসেছে গেছে—হিসেবের বাইরে কালো টাকা হুজুর—কিন্তু কখন একটা কানা কড়িও কারো ছুঁইনি। ঐ আমার ব্যাঙ্কের বড়বাবু ব'সে আছেন আর [কপালে হাত ঠেকিয়ে] ঐ আমার ছোট সাহেব, ওঁদের জিজ্ঞেস করুন ওঁরা বলবেন। ঐ ছোট সাহেবের বাবা হুজুর, ঘোড়ায় টানা ট্রামের বড় সাহেব ছিলেন। আমার যখন সাত বছর বয়েস তখন সবাই শিখিয়ে দিল ওঁর কাছে গিয়ে মিথ্যে কথা বলতে। বলিনি হুজুর। সাতদিন অনাহারে ছিলাম, তবু বলিনি। আমার এগারটি ছেলেমেয়ের দিব্যি ক'রে বলছি হুজুর—যদি মিথ্যে হয় ওদের মরা মুখ দেখব—আমি জীবনে কখন মিথ্যে কথা বলিনি—কেবল একটা ছাড়া। ভাঙা মিল থেকে সেদিন রাত্রে যখন বেরিয়ে এলাম আর অরুণ যখন জানতে চাইল ছেলেটিকে খুন ক'রেছি কিনা তখন বলেছিলাম হ্যাঁ করেছি। না বললে ও ছেলেটিকে খুন করত। ওকে বাঁচবার জন্যে আমি মিথ্যে ব'লেছিলাম।

এই হল আমার জীবনের ইতিহাস। পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে আমি একটা—অতি সামান্য—একটা কীট। তাদের সকলের মতন দু মুঠো অন্নের চাইতে বেশী চাহিদা আমার কখন ছিল না আর আজও নেই। তবু আমি নিজের হাতে খুন করেছি, মানুষের রক্ত গায়ে মেখেছি—আপনাদের সবাইকে বলছি হুজুর—ভাবুন তো কেন ? কে আমাকে দিয়ে খুন করালো ? জানেন ?—জানেন না। আমি বলব—আর মুখ্যু মানুষ আমি, যদি অন্যায় কিছু বলি, ক্ষমা করবেন—আমাকে দিয়ে খুন করিয়েছে ঐ আলোক সেন—যে আমার মতন গরীব, নিঃস্ব, অসহায় মানুষদের অন্ন কেড়ে নিয়ে ব্লাক মার্কেটের টাকায় ব্যাঙ্কের ভল্ট ভর্তি করেছে, আর যখন জিজ্ঞেস করেছি তখন বলেছে—যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা হুজুর, আর যারা বুদ্ধি খাটিয়ে ব্লাকের টাকা ব্যাঙ্কে তোলে তারাই মানুষ।—

আমাকে দিয়ে খুন করিয়েছে ঐ অসীম দত্ত, যে দিনের পর দিন ওষুধে জল মিশিয়ে ব্যাঙ্কের ভল্ট ভরেছে, আর ঐ বুনবুনওয়ালা যে তেলের সঙ্গে বিষ মিশিয়েছে। আর ঐ ত্রিবেনীপ্রসাদ যে চাল গুদামে পুরেছে। আর ঐ উকিলের দল হুজুর যারা টাকার লোভে এই সব সত্যিকার খুনী আসামীদের দিনের পর দিন বাঁচিয়েছে। আমাকে দিয়ে খুন করিয়েছে ঐ রাজনীতির-দল, হুজুর, যারা আমাদের জীবন নিয়ে

জুয়ো খেলে নিজেদের পকেট ভরেছে। আর ঐ ওরা হুজুর যারা একদিন জেলে গিয়েছিল ব'লে আজ আমাদের ঘাতে মারছে—আর ঐ ওরা হুজুর যারা ঘুস নিয়ে চোখ বুজে থাকে। আর ঐ ওরা হুজুর যারা ঘুস দিয়ে পুকুর চুরি করে—আর আর আপনারা হুজুর যাঁরা বিচারক হয়েছেন কিন্তু বিচার জানেন না—যদি জানতেন হুজুর তাহ'লে বুঝতে পারতেন যে এঁরা সবাই—শুধু আমাকে আপনাকে নয় হুজুর—এঁরা টাকা দিয়ে বিধাতাকে পর্য্যন্ত বন্দী করেছেন!! হুজুর, আপনার মাথার ওপরেই আছে সত্যমেব জয়তে—এঁদের টাকার লোভে ও সত্য মরে গেছে হুজুর—যদি বাঁচাতে চান তাহ'লে ঐ অশোক চক্রে হবে না, আজ আপনার হাতে সুদর্শন চক্র তুলে নিন হুজুর, আর নতুন ক'রে বলুন—বন্দে মাতরম!

থেমে গেলেন দাদু, আবেগে, ভাবে আর কথার অভাবে। সারা কোর্ট স্তব্ধ হ'য়ে রইল, ভয়ে, বেদনায় আর সত্যের অপরিসীম গাম্ভীর্যে। হঠাৎ দাদু আবার বললেন—

● আমায় ফাঁসি দিন হুজুর, কোন ক্ষতি নেই—কেবল ভারতের, বোবা মুখ্যু বোকা আর আধমরা চল্লিশ কোটি বন্দী মানুষকে এই সব অমানুষ পিশাচদের হাত থেকে বাঁচান হুজুর—নইলে আজ একটা মানুষের রক্ত দেখছেন, কাল সে রক্তের বন্যা ব'য়ে যাবে।

ব'সে পড়লেন দাদু আর প্রচণ্ড উত্তেজনায় জেগে উঠল সারা কোর্ট। হাততালি তো নয় যেন হাজার মেঘের গর্জন। জজ সাহেবের হাতুড়ি হার মেনে থেমে গেল। জনতাকে থামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন একজন এপারোজন উকিল আর হুজুরের কাছে অনুমতি চাইলেন আসামীর পক্ষ সমর্থন করার। বললেন—

● ইওর অনার, আমরা মনে করি যে উনি নির্দোষ। বিবেককে বাঁচাতে হলে ও ছাড়া আর পথ ছিল না—অতএব আপনি যদি অনুমতি দেন—

জজ সাহেব হয়ত এইটাই চাইছিলেন, বললেন—

● আমার তো আপত্তি নেই কিন্তু উনি—

ওঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই চন্দনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—

● ইওর অনার। ওঁকে রাজী করানোর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি—

● তুমি?

স-রোষে উঠে দাঁড়ালেন আলোক সেন। চন্দনা বললে—

● হ্যাঁ আমি—

● বেশ……

আর কিছু বলতে না পেরে আলোক সেন কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন আর সারা কোর্ট হৈ হৈ ক'রে উঠল। এবার এক হাতুড়িতে সব মুখ বন্ধ। সরকারি উকিল বললেন—

● ইওর অনার, আসামী যখন সর্ব সমক্ষে তার সব দোষ স্বীকার ক'রে নিয়েছে……

ইশারায় থামিয়ে দিয়ে জজ সাহেব বললেন—

● তাহ'লেও বিচারের প্রয়োজন আছে। আসামীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—

● এঁরা যদি আপনার পক্ষ সমর্থন করেন আপনার আপত্তি নেই তো?

চন্দনাই জবাব দিল—

● না হুজুর—এই যে ওঁর ওকালতনামা।

● ফাইল।

মানবেশের উৎসাহে, উমার আনন্দে আর চন্দনার অর্থে আসামীপক্ষ তৈরি হ'লেন ঠিক আট দিনে। আসামীপক্ষের যুক্তিতে আত্মরক্ষা আর তার চেয়ে বড় কারণ বিবেককে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই উনি খুন করতে বাধ্য হন, আর সেই জন্যেই অস্ত্র-চর্বসার বৃদ্ধের গায়েও অমন অসুরের শক্তি এসে যায়। সরকার পক্ষ ছেলে চুরির ওপর জোর দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন যে টাকার ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া হয় বলেই উনি কেনে শুনে এবং ঐ নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওকে খুন করেন।

দুই পক্ষের উকিল-লড়াই চলল আঠারো দিন, জজ সাহেব জুরীকে কেসটা বোঝাতে নিলেন আধ ঘণ্টা আর জুরী আট মিনিট ভেবে নিয়েই বলল, এটা খুন, নয় আত্মরক্ষা, আর বিশেষ ক'রে ঐ শিশুকে রক্ষা করার একমাত্র পথ। অতএব জীবনজ্যোতি গাঙ্গুলী নির্দোষ, আর তাই শুনে জজ সাহেব ওঁকে দিলেন মুক্তি। টেঁপি কোর্টেই ছিল। সে অবাক হ'য়ে চন্দনাকে বলল—

● অ চন্দনা, বিচার তো হচ্ছিল উমার বাবুর, তা জীবনজ্যোতিটা আবার কা গা?

চন্দনা হাসল। উমা বললে—

● আচ্ছা মা, তুমি কি?···বাবুই তো জীবনজ্যোতি!

টেঁপি উঠতে উঠতে বলল—

● তাই বুঝি? ভাগ্যিস্ খুনটা করেছিল, নইলে ও নামটার কথা জানতেই পারতুম না!

আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের

মধুপর্ক

নতুন পর্যায় : স্মৃতিমন্থন। প্রমথেশ বড়ুয়া।

এই পর্যায়ে প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর চেনাজানা নানা মানুষের অন্তরঙ্গ কাহিনী মাঝে মাঝে পরিবেশন করবেন।

পুরাতন পাতা

কলিকাতার আদি কাণ্ড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[প্রাচীন কলকাতা নিয়ে অনেক লেখা এবং বই বেরিয়েছে। গল্পভারতীর পৃষ্ঠাতেও ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় একাধিক রচনা ও কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। তা হোক। প্রাচীন কলকাতার কথা পাঠকদের কাছে পুরানো হয় না, তা আমরা জানি। তাই এই সংখ্যায় এক মহাপণ্ডিত ও মনীষীর একটি ৮০ বছর আগেকার রচনা পুনরুদ্ধার করে দিলাম। লেখাটির মধ্যে কিছু নতুন তথ্য ও কাহিনী আছে যা ইতিপূর্বে জানা যায়নি। সেদিক থেকে লেখাটির মূল্য কম নয়। রচনাটি আদিকালের পত্রিকা নব্যভারত থেকে সংকলিত।—গল্পভারতী সম্পাদক]

এই যে কলিকাতা নামক মহান নগর এক্ষণে নানা অট্টালিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছেন, ভাবুন দেখি প্রাচীনকালে অর্থাৎ ১৬৮৩ সালে ইহার কিরূপ অবস্থা ছিল।

বাগবাজার হইতে খিদিরপুর পর্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগে তখন তিনটি মাত্র ছোট ছোট গ্রাম ছিল।

যেখানে এইক্ষণে ফোর্ট উইলিয়ম বিরাজমান, সেখানে গোবিন্দপুর, লালদীঘি ও গঙ্গার ধারখানে কলিকাতা, হাটখোলার উত্তর সমস্ত সুতানটী। কলিকাতা বলিলে যেমন ঐ ক্ষুদ্র গ্রামটি বুঝাইত তেমনি একটি বৃহৎ পরগণাও বুঝাইত। একটি রাস্তা দিয়া এই তিনটি গ্রামে যাওয়া যাইত। সেইটি এখন চিৎপুর রোড। প্রতি গ্রামে দুই ঘর এক ঘর করিয়া ভদ্রলোক, ঘর কত জেলিয়া, ঘর কত সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় বাস করিত। চিৎপুর রোডের অল্প দূরেই জলা-জঙ্গল ছিল, এমন কি সময়ে সময়ে বাঘেরও দৌরাত্ম্য হইত। সেইরূপ গ্রাম এক্ষণে গঙ্গার ধারে প্রায়ই দেখা যায় না। কোঠাবাড়ী-এক আধটা হয়ত ছিল। কিন্তু দোতলা একেবারেই ছিল না। কারণ তখন নবাবের হুকুম ব্যতিরেকে কেহই দোতালা বাড়ী করিতে পারিত না, এবং নবাবের হুকুম আনাইতে পারে, এরূপ লোক এ তিন গ্রামে না থাকাই সম্ভব।

ইহার মধ্যে আবার শুনিয়াছি, গোবিন্দপুর নূতন পত্তন। আন্দুলের দত্ত চৌধুরী-বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি ঐ গ্রাম পত্তন করেন এবং এই হইতেই হাটখোলার দত্তদিগের উৎপত্তি হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হাটখোলার দত্তেরা হাটখোলায় আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ। সুতানটীতে অনেক দিন হইতে হাট ছিল, কিন্তু সে হাট কাহা কর্তৃক স্থাপিত, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কলিকাতার নিকটে কালীঘাট বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ছিল, এবং চিৎপুরের কালীর নিকট নরবলি হইত বলিয়া বহুকাল প্রসিদ্ধি ছিল।

শুনিয়াছি ইংরাজেরা যখন প্রথম মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, তখন তাঁহারা হাটখোলার ঘাটে জাহাজ লাগাইয়া একজন ধোবানিয়া চাহিয়া পাঠান। হাটের লোক ধোবানিয়ার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ঐ হাটখোলার বসাকদিগের নিকট উপস্থিত হন। বসাকেরা একজন ধোবা পাঠাইয়া দেন। তদবধি ধোবারা অনেকদিন ইংরাজদের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। এবং সেকালে কাস্ত ধোবা বলিয়া একজন ইংরাজের অনুগ্রহে বিলক্ষণ ধনশালী ও ক্ষমতাপালী হইয়া উঠিয়াছিল।

পূর্বের কথা আমরা যতই কেন বলি না, সবই একটু ঘোর ঘোর বোধ হইবে, পরিষ্কার হইবে না। আমাদের বোধ হয়, বাঙ্গলায় ইংরাজ বাণিজ্যের সূত্রপাত হইতেই সুতানটীতে ইংরাজদিগের কিছু না কিছু কারবার ছিল, কারণ, হুগলীতে যখন ইংরাজদের খুব কারবার চলে, তখনও সুতানটীর উপর তাঁহাদের বিলক্ষণ টান ছিল দেখা যায়। বোধ হয় চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের যেমন বরাহনগরে ছোটখাট একটা কুঠী ছিল, সুতানটীতেও ইংরাজদের সেইরূপ অল্পবিস্তর কিছু কারবার ছিল। যখন মোগলের সহিত যুদ্ধে ইংরাজকে হুগলীর ব্যবসা ফেলিয়া পলায়ন করিতে হয়, তখন তাঁহারা দিনকতক চানকে ও দিনকতক সুতানটীতে ছিলেন।

যাহা হউক, ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তাঁহারা কলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রামের জমিদারী ক্রয় করিতে অনুমতি পান এবং ঐ সময়ে তাঁহারা লালদীঘি ও গঙ্গার মধ্যে পুরান কেল্লাটি নির্মাণ করেন এবং তদবধি কলিকাতায় তাঁহাদের ভরাডুবি হয়। সেই সময় চার্ণক সাহেব কলিকাতার সংস্থাপন-কর্ত্তা এবং তাঁহার সময় হইতেই ইংরাজদের চার্ণকের বাগান ও আলীপুরের (বলডেডিয়ার) উৎপত্তি। এই চার্ণক সাহেবকে এদেশীয় লোকে অত্যন্ত ভালবাসিত, তিনি এদেশীয় একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছিলেন। কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ গোরস্থানে তাঁহার গোর অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়।

১৬৯৮ সাল হইতে ১৭৫৭ পর্যন্ত কলিকাতার প্রথম যুগ বলিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা একটি সামান্য গ্রাম হইতে একটি নগরের আকার ধারণ করে। ফরাশীদের হাতে যেমন শ্রীরামপুর একটি ছোটখাট সহর, ইংরাজদের হাতেও কলিকাতা তেমনি ছোটখাট সহর হইয়াছিল। পূর্বোক্ত চারিটি সহরেরই এই যুগের মধ্যে উৎপত্তি, তন্মধ্যে ফরাসডাঙ্গাই কিছু বিশেষ সমৃদ্ধশালী হইয়াছিল, কারণ, ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ইউরোপ হইতে এ যুগের মধ্যে কেহ আর আইসেন নাই।

এ যুগে কলিকাতায় বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী লোক আসিয়া বাস করে এবং বহু সংখ্যক অট্টালিকা নির্মিত ও বাজার সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে চিৎপুর রোডের পশ্চিমে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাস হয়, এবং পূর্বে বড় বড় বাগান প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। জলা ও জঙ্গল কাটিয়া বাগান প্রস্তুত করা বড় সহজ ছিল না, প্রায়ই জলার মধ্যস্থলে পুষ্করিণী কাটিয়া সেই মাটি চারিদিকে ছড়াইয়া বাগানের জন্য জমি বাহির করিতে হইত। যে কেহ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে দিয়া যাতায়াত করেন, তিনি দেখিতে পাইবেন যে, এখনও উক্ত রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে এই জমি বাহির করা হইতেছে।

এই সময়ের দুইটি বাগানের কিছু ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে :—একটীর নাম হালসী বাগান ও অপরটির নাম উমিচাঁদের বাগান। হালসী বাগান গোবিন্দরাম মিত্রের বাগান, উহা ইংরাজ জমিদারীর বাহিরে, কিন্তু গোবিন্দরাম মিত্রই বহুকাল অবধি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর ব্লাক জমিদার ছিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে যখন মহারাষ্ট্র খাত খনন করা হয়, তখন গোবিন্দরাম মিত্রের অনুরোধে ইংরাজেরা হালসী বাগান খাতভুক্ত করিয়া লন। মহারাষ্ট্র খাত এখনও কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটীর সীমা। অনেকে মনে করেন,

বাগবাজারের খালই বুঝি মহারাষ্ট্র খাত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বাগবাজারের খালের একটু দক্ষিণে একটি খাল আছে, সেই খাল ক্রমে ক্রমে আসিয়া সারকিউলার রোডের পূর্বদিকের খালের মিলিয়া গিয়াছে। এই খাল বরাবর বাগবাজারের খালের মুখ হইতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র খাত নামে অভিহিত ছিল। মহারাষ্ট্র খাত কলিকাতার চতুর্দিকে কখনই ছিল না। মহারাষ্ট্র খাত শেষ হইবার পরেই বহুবাজারের রাস্তা। ঐ রাস্তা তৎকালেও বিদ্যমান ছিল। উহার দ্বারা পূর্বদিক হইতে আসিয়া একেবারে পুরাণ কেল্লায় উঠা যাইত।

বহুবাজারের রাস্তার পর দক্ষিণদিকে আরও একটা খাল ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। অনেকে বলেন, তাহার কিয়দংশ বুজাইয়া ত্রিকারা নামক রাস্তা হইয়াছে। তৎকালেও চৌরঙ্গি নামক স্থান ছিল, এবং সেইখানেই সাহেবেরা বাস করিতেন। কিন্তু সে চৌরঙ্গির সহিত এখনকার চৌরঙ্গির তুলনা হয় না। তখনকার চৌরঙ্গিতেও জঙ্গল ও জঙ্গল ছিল। তখন মহারাষ্ট্র খাতের মধ্যে অনেক জায়গায় চাষবাস হইত। এমন কি ১৭৭৮ সালে যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস মহারাজা নবকৃষ্ণকে সুতানটীর তালুকদারী প্রদান করেন, তখনও ঐ তালুকের মধ্যে অনেক জায়গায় চাষবাস হইত, কারণ, ঐ দলীলে স্পষ্ট চাষবাসের উল্লেখ আছে।

ইংরাজেরা ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তিন গ্রামের জমিদারী পাইয়া আপনাদের কাউন্সিলের একজনকে জমিদার নিযুক্ত করিতেন; তিনি দুই হাজার টাকা করিয়া মাহিয়ানা পাইতেন। চারি পাঁচ মাস অন্তর জমিদার বদল হইত অর্থাৎ কাউনসিলের সকল মেম্বারেরাই কিছুদিন করিয়া দুই হাজার টাকা মাহিয়ানা পাইতেন। তিনি কাজকর্ম কিছুই করিতেন না, কখনও দুই একটা সহি করিতেন। তাঁহার অধীনে একজন ব্লাক জমিদার থাকিতেন, তাঁহার হাতে জমিদারীর ভার থাকিত। ব্লাক জমিদারের মাহিয়ানা ত্রিশ টাকা ছিল।

কুমারটুলীর মিত্রদিগের আদিপুরুষ গোবিন্দরাম মিত্র ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের ব্লাক জমিদার পদে নিযুক্ত হন, তাঁহার পূর্বে ঐ পদে কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিছুদিন পরে গোবিন্দরাম মিত্রের বেতন ত্রিশটাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা হয়, কারণ, তিনি কোম্পানীর নিকট আরজী করেন যে, ত্রিশ টাকায় ব্লাক জমিদার নামক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির চিৎপুর রোডের ধারে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গোবিন্দরাম মিত্রের একজন কর্মচারী বনমালী সরকার তৎকালের একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। কুমারটুলীতে বনমালী সরকারের নামে রাস্তা আছে। হাটখোলার দত্ত মহাশয়েরা ধনে, মানে ও কুলমর্য্যাদায় সর্বপ্রধান ছিলেন, কিন্তু, তাঁহারা সরকারী কোন কাজে কখনও লিপ্ত হয়েন নাই। নকুড় ধর নামক এক ব্যক্তি এই সময়ে অসাধারণ সম্পত্তিশালী হইয়াছিলেন, তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক। ইংরাজ মহলে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজই করিতেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন চাকুরী পাইতে হইলে লোক নকুড় ধরের উমেদারী করিত। এমন কি ১৭৬৮।৬৯ সালের প্রসিদ্ধ নবকৃষ্ণও নকুড় ধরের নিকট উমেদারী করিতেন এবং ১৭৭০ সালে নকুড় ধর তাঁহাকে হেষ্টিংস সাহেবের মুন্সী করিয়া দেন। নকুড় ধরের বিরাট কারবার ছিল। নকুড় ধর নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র রাজা সুখময়। সুখময়ের বংশধরেরা অদ্যাপি নকুড় ধরের অতুল ঐশ্বর্য উপভোগ করিতেছেন।

বড়বাজারের মল্লিকেরাও তৎকালে বিলক্ষণ ধনী ছিলেন। ইহাদের বাণিজ্য ব্যবসায় বিলক্ষণ বিস্তৃত ছিল। উল্লিখিত কয়েকটি পরিবার ভিন্ন কলিকাতায় অন্য কোন প্রসিদ্ধ পরিবারের উল্লেখ এ যুগে পাওয়া যায় না। পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের আদি অন্বেষণ এ যুগে পাওয়া যায় না। যে দুই এক

ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা গোবিন্দরাম মিত্রের অধীনে বাজার ইজারা লইতেন অর্থাৎ গোবিন্দরাম মিত্র অল্পটাকায় বেনামী করিয়া সমস্ত বাজারগুলি ডাকিয়া লইতেন এবং পরে বিলক্ষণ লাভ করিয়া ঐগুলি বিলি করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়। তৎকালে বাজার ইজারা লওয়া বিলক্ষণ লাভের ব্যাপার ছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইজারাদারও বিলক্ষণ লাভ করিত। কোম্পানী জমিদারী হইয়া যে কয়টি বাজার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বন্দোবস্তের ভার গোবিন্দরাম মিত্রের হাতে ছিল। গোবিন্দরাম মিত্র তাহা হইতে বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জন করিতেন। বর্তমান ঠাকুর পরিবারের স্থাপয়িতা দর্পনারায়ণ ও নীলমণি আগামী যুগের লোক। এই সময়ে কলিকাতায় বহুসংখ্যক অট্টালিকা প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে ইংরাজ দিগের গবর্ণরের বাটী, কৌন্সিল বাটী, চার্চ, কোর্ট হাউস প্রভৃতি প্রধান। লালদীঘি অতি প্রাচীন পুষ্করিণী।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতার তৃতীয় যুগের উৎপত্তি। এই যুগে প্রথম রাজা নবকৃষ্ণের আবির্ভাব। রাজা নবকৃষ্ণ পলাশী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দাদাকে লিখিয়া পাঠান, দাদা, ছাপান ছাও, এইবারেই পূজা করিতে হইবে। তিন মাসের মধ্যে ছাপান প্রস্তুত হইল। নবকৃষ্ণ মহাসমারোহে পূজা করিলেন। সমস্ত ইংরাজদের নিমন্ত্রণ হইল। কলিকাতার, এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষের যুগপরিবর্তন হইল। এই সালে ইংরাজেরা নূতন কেল্লা নির্মাণ করেন। তাহাতে গোবিন্দপুর গ্রামটির সমস্ত লোককে উঠাইয়া দিতে হয়। গোবিন্দপুরের অধিবাসীরা এওয়াজি যে জমি পান, তাহাতে শাঁখারী টোলা, ডিঙ্গেডাঙ্গা, বহুবাজার, মঙ্গলা প্রভৃতি স্থানে লোকের বসবাস হয়। তাঁহারা যখন গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া এই সকল স্থানে বাস করেন, তখনও এখানে বাঘের ভয় বিলক্ষণ ছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান লোক আসিয়া কলিকাতায় বাড়ী করেন। তাহার মধ্যে জগদ্রাম দুর্লভ রায়ের পুত্র রাজা রাজবল্লভ বাগবাজারে এবং মহারাজা নন্দকুমার এখন যেখানে বিডন স্কোয়ার হইয়াছে, তাহার সন্নিকটে প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ করেন। মহম্মদ রেজা খাঁ কলিকাতায় আসিলে চিৎপুরে থাকিতেন, কিন্তু কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকটও তাঁহার এক প্রকাণ্ড বাটি ছিল। অতএব পলাশী যুদ্ধের পরই মুর্শিদাবাদ অবসন্ন হইতে লাগিল। এবং কলিকতার জাঁক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে কোম্পানীর চাকরী করিয়া কলিকাতায় লোক খুব বড় মানুষ হইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে নীলমণি ঠাকুর, পাথুরেঘাটার ঘোষেরা ও জোড়াসাঁকোর সিংহেরা প্রধান। এই সময়ে পল্লীগ্রাম হইতে অনেক উদ্যমশীল ব্যক্তি বড় মানুষ হইবার আশায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জাহাজের কাপ্তেন ধরাই ইহাদের প্রধান ব্যবসায় ছিল।

কলিকাতায় যে সকল বড় বড় বাটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে কাপ্তেন ধরা ব্যবসাই দেখিতে পাওয়া যাইবে। পল্লীগ্রামের এই সকল লোক নদীর ধারে বহুদূর অগ্রসর হইয়া মুচিখোলা, ফলতা প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষা করিত। জাহাজের নিশান দেখিয়া জানিত এ বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের জাহাজ, পিতুরী মহাশয়ের জাহাজ, এটা দত্ত মহাশয়ের জাহাজ। নূতন জাহাজ দেখিলেই তাঁহারা তাড়াতাড়ি আক্রমণ করিতেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকার করিয়া লইতেন। এখন যেমন সমস্ত ব্যবসায় ইংরাজদিগের হাতে গিয়াছে, তখন ঐরূপ হয় নাই। অনেক দেশীয় লোকও এ ব্যবসায়ের লাভের অংশ ভোগ করিত। এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোকও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আগমন করেন। যখন আমেরিকানেরা প্রথম এদেশে আসেন, তখন তাঁহারা প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকারকে তাঁহাদের মুরুব্বী করিয়া লন। মার্কিন দেশে ও এদেশে এখনও অনেকে জানেন যে, রামদুলাল সরকারই ভারতবর্ষের সহিত আমেরিকা বাণিজ্যের সৃষ্টিকর্তা।

তৎকালে যে সমস্ত সম্ভ্রান্তশালী লোক কলিকাতায় বাস করিতেন, তাঁহাদের উদারতা অত্যন্ত অধিক ছিল। নবকৃষ্ণ ও রামদুলালের দানশক্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা নবকৃষ্ণকে গালি দিয়া থাকেন। বাঙ্গালীরাও নবকৃষ্ণের প্রতি তত শ্রদ্ধাবান নহেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের কার্যকলাপ দেখিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ উন্নতমনা বলিয়াই বোধহয়। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা খরচ করেন, কিন্তু তিনি মুসলমানদিগের মসজিদ ও খৃষ্টানদিগের চার্চ নির্ম্মাণেও সাহায্য করেন। পাথুরিয়াঘাটার গীর্জ্জার জমি নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। হাতীবাগানের জমিও নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট নামক রাস্তাটি সমস্তই নবকৃষ্ণের ব্যয়ে নির্ম্মিত। পূর্ব্বযুগে যেমন নকুড় ধর ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে পরস্পর মিল করাইয়া দিতেন, এ যুগে রাজা নবকৃষ্ণও ঠিক তেমনি ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কোন অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে নবকৃষ্ণের উমেদারী করিতে হইত। নবকৃষ্ণ অনেক লোকের চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন। রামবাগানের দত্তেরা নবকৃষ্ণের কেরাণীর বংশ। নবকৃষ্ণের এক পকরত্ন সভা ছিল, জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন তাহার প্রধান রত্ন। কলিকাতার প্রাচীন তত্ত্ব বলিতে গিয়া আমরা নবকৃষ্ণের এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, নবকৃষ্ণই কলিকাতার এই তৃতীয় যুগের প্রধান ব্যক্তি। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস সাহেব সুতানটির তালুক মৌরসী দিয়া তাঁহার পদমর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেন।

। মাঘ সংখ্যার একটি আকর্ষণ সম্পর্কে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।

গল্পভারতীতে বিভিন্ন রসের গল্পকাহিনী প্রকাশিত হয়। সে সম্পর্কে আমরা নানা চিঠিপত্র পাই। সম্প্রতি অনেক পাঠক পাঠিকা আমাদের জানিয়েছেন যে তাঁরা গল্পভারতীর মাধ্যমে উৎকর্ষ সম্পন্ন রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে চান। এ সব কাহিনীরও বিশেষ আবেদন আছে। পাঠক-পাঠিকার অনুজ্ঞা রক্ষায় আমরা সচেষ্ট হয়েছি এবং আগামী সংখ্যায় একটি পূর্ণাঙ্গ চমকদার, রুদ্ধশ্বাস-গোয়েন্দা উপন্যাসের প্রথম অংশ পরিবেশন করবার ব্যবস্থা করেছি। শেষাংশ (প্রথম অংশের সার সহ) প্রকাশিত হবে পরবর্তী (ফাল্গুন) মাসে। উপন্যাসটির নাম : নরমেধ যজ্ঞ। লিখেছেন, রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী রচনায় সিদ্ধহস্ত নিপুণ লেখক—**জয়ন্ত ভট্ট**।

উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে পাঠক পাঠিকাদের খুশী করবে।

যুগান্তর

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসলো লাবণ্য। ক'দিন থেকেই বাড়িতে নাপিত আর পুরোহিত, আত্মীয় আর প্রতিবেশীদের ঘনঘন আসা যাওয়া চলছিল। আর সব সময়েই একটা ফিসফিস্। ওকে দেখলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল সে কানাকানি। সত্যি কথা বলতে কি, এই আনাগোনার কারণটা বেশ কয়েকদিন বুঝতেই পারেনি লাবণ্য। তারপর শুনেছে সব। বুঝেছে তার চেয়েও বেশী। শুধু বুঝতে পারেনি, সে নিজে যে হিসেব রাখেনি, রাখতেও পারেনি, আত্মীয় আর প্রতিবেশীরা তার নির্ভুল হিসেব রাখলো কেমন করে? তারিখটাও ওরা নির্ভুল মনে রেখেছে।

তারিখটার কথা অবশ্য লাবণ্যও ভোলেনি। ভুলতে পারে না। এ তারিখ তো শুধু বিয়োগের নয়, যোগেরও যে। শুধু চরম হারানোর নয়, পরম পাওয়ারও। ফাল্গুনের ষোলই। কিন্তু এর মধ্যে এক যুগ হয়ে গেল? ওরা তো যুগ-যুগই বলছে বারবার। কতদিনে এক যুগ? সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি! না, সে যুগ নয়, বারো বছরের যুগ। জীবিত থাকলে সর্বত্যাগীকেও এর মধ্যে জন্মভূমিতে আসতেই হ'বে নাকি অন্ততঃ একবার। যুগান্তরেও ফিরলো না যে, তার জন্মান্তর হয়েছে, এ সন্দেহাতীত। তোমার মনের যুক্তি শুনবে না ওরা। ওরা তো জানে না, শংকর তোমাকে বলে গিয়েছে—

কিন্তু কি বলে গিয়েছে? সে তো এক যুগ আগের কথা। অত পুরানো কথা ভাববার সময় কোথায়? আজ রাত্রি শেষ হ'লেই তো সেই যুগান্তরের সন্ধিক্ষণ। কিন্তু এখনো তো যুগ শেষ হয়নি। আজ তো পনেরোই ফাল্গুন। আজকার আকাশের চাঁদের হাসি শেষ হওয়ার আগেই তো লাবণ্যর মুখের হারিয়ে যাওয়া হাসি ফিরে আসতে পারে আবার।

মালবিকা ঘুমুচ্ছে। মায়ের কান্না দেখেই নাকি কে জানে একটু আগেও মালবিকাও কেঁদেছে খানিক। মালবিকা মাকে শুধু কাঁদতেই দেখেছে। ও জানে না, ওর মাও একদিন হাসতো, ওর মায়ের হাসিতেই মুগ্ধ হয়েছিল একজন আজ থেকে তেরো বছর আগে। ওর প্রাইভেট্ টিউটর শংকর ঘোষাল।

বাবার বদলীর চাকরীতে স্কুলে ভর্তি হবার সুবিধা হ'ত না। তাই, সব সময় প্রাইভেট্ টিউটরেরাই পড়াতো লাবণ্যকে। বাবার বদলীর সংগে সংগে টিউটরও বদলী হ'ত। শংকরই ওর শেষ টিউটর। ম্যাট্রিকের ছাত্রী সতেরো বসন্তের লাবণ্যর হাসিতে মুগ্ধ হয়েছিল যে মানুষ। কিন্তু মোহ কি শুধু টিউটরেরই হয়েছিল? ছাত্রীর হয়নি? তা যদি না হ'বে, তবে আজকার এই মালবিকা কেমন করে লাবণ্যর 'তরুণ অংগে অংগে' জড়িয়ে গেল ছ'মাস না যেতেই।

দারুণ দুঃসাহসী ছিল ছেলেটা। হ্যাঁ, ছেলেটা ছাড়া কি? একুশ-বাইশ বছরের এ্যাপ্রেন্টিসকে আবার এর চেয়ে কি ভদ্র বিশেষণ দেওয়া যায়?

এ খবর লাবণ্যর কাছে শুনে চমকেও ওঠেনি, ভয়ও পায় নি। তাকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে সোজা হাজির হয়েছিল মায়ের কাছে। 'কাজটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে মাসীমা, যাই হোক আমি লাবণ্যকে বিয়ে করবো এবং সেটা যত শিগ্রী সম্ভব। আমি চাই না, বাইরের কেউ অথবা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরও কোনদিন আমাদের নিয়ে হাসিঠাসি করে।'

মা স্তম্ভিত হয়েছিল, বাবা রাগতে ভুলে গিয়েছিলেন—কিন্তু তবু কন্যা সম্প্রদানের অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন কোন এক ষোলই ফাল্গুন। ভ্রূণহত্যায় রাজী হয়নি শংকর-লাবণ্য।

কতদিন আগে? তেরো বছর? এক যুগ আর এক বছর? বাবারই প্রেস্টিজ নষ্ট হবার ভয়ে সেদিনের এ্যাপ্রেন্টিস, বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে সংগ্রহ করা শিক্ষানবিশিটুকু ছেড়ে দিয়েছিল ফাল্গুন শেষ না হ'তেই।

আর লাবণ্য শ্বশুরবাড়ি এসেছিল। পাড়াগাঁয়ে ছোট মেটে বাড়ি, আর বিঘেকতক ধানীজমি নিয়ে বাস করতেন বিধবা শাশুড়ী। তাঁর কাছেও অকপটে সব বলেছিল তাঁর ছেলে। নিজের দুর্বলতার কথা, সে দুর্বলতার ফলে তাদের সম্ভাব্য সন্তানের অগমনের কথা আর সেই কারণেই এই আকস্মিক বিয়ের কথা।

যেমন ছেলে, তেমনি মা। মা অনায়াসেই সব দোষ ক্ষমা করেছিলেন ছেলের। আদৌ দোষ বলেই ধরেন নি তিনি এটাকে। এমনটি যে শুধু নাটকেই হয় না, বাস্তবেই হয়; আর সেই বাস্তবকে নিয়েই যে নাটক আর উপন্যাস তা বোধ হয় বুঝতেন তিনি। বুঝতেন, এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির ফলে সংসারে ভাঙনই ধরে। আর 'ভাঙা সহজ—গড়া কঠিন' এ তো কথামালা পড়া ছেলেটাও জানে। কিন্তু তবুও কি ভাঙন রোধ করতে পেরেছিলেন মা?

অবশ্য অদ্ভুত ওঁর মনের জোর। ক'দিন আগেও বলেছেন—শংকর ফিরে আসবেই। ওদের বংশের রক্তেই বাইরের আকর্ষণ। ওর বাপ ঠাকুর্দা সবাই বাইরে বাইরেই কাটিয়েছে প্রায় সারাজীবন। তাই ভেবেছিলাম—সুরুতেই মায়ার বাঁধনে পড়লে হয়তো ও আর বাইরে যাবে না। কিন্তু রক্ত বিশ্বাস ঘাতকতা করে না বউমা, করলও না। তবু আমি বলছি, ফিরে ওকে আসতেই হবে। তোমার সিঁদুর টকটক করছে যে মা। ও সিঁদুর মিছে কথা বলে না। ও ফিরিয়ে আনবেই ওর মালিককে।

আয়নাটার দিকে তাকায় লাবণ্য। সিঁদুর তো এখনো টক্‌টক্ করছে। আজ যেন বেশী করছে সব দিনের চেয়ে। কিন্তু সবারই কানাকানি তো একটা কথাই বলছে ও সিঁদুর মিছে কথা বলছে। অথবা নিভবার আগে শেষবারের মত—জ্বলে উঠেছে সিঁদুরটাই নিবু নিবু প্রদীপেরই মত!

রাত শেষ হয়ে আসছে। সেদিনও শেষ হয়ে এসেছিল। প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর রাত। মালবিকা তখন পাঁচ মাসের। সারাটা রাত আবোল তাবোল কথা। 'আচ্ছা আমি যদি হারিয়ে যাই জন্মের মত, আমার কথা মনে থাকবে তোমার?'—'ও আবার কি অলক্ষুণে কথা আজকার দিনে?'

কিন্তু হারিয়েই গেল শংকর ভোরের অন্ধকারে লাবণ্যর কালঘুমের সুযোগে বালিশের নীচে একটা চিঠি মাত্র রেখে।

"তুমি কোন অনুযোগ কর না, সে তোমার মহত্ত্ব। কিন্তু আমি এই একটা বছর অবিরত জীবিকার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কেবল চিন্তা করেছি, তোমার এ দৈন্যদশার জন্য দায়ী তো আমিই। মালবিকাকে তোমার মধ্যে আসতে দেখে আমি যে কাপুরুষের মত পালিয়ে যাইনি অথবা দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করিনি, তোমার মতে এটাই নাকি আমার মহান প্রেমের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু মালবিকাকে আনতে পারলাম, অথচ তাকে অস্বীকার করবো, এতটা ছোট না হতে পারাকেই মহত্ত্ব বলে আমি অন্ততঃ মানতে পারবো না। একটু আগে হারিয়ে যাবার কথা বলছিলাম তোমাকে। সত্যি সত্যিই হারিয়ে যাবো না। ফিরে আমি আসবোই। তবে তোমার উপযুক্ত হয়ে। জানোয়ারের মত নয়, মানুষের মত বাঁচার অধিকার অর্জন করে, তবেই। মাকে আর মালবিকাকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। কথা দাও, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে।"

তা—সেই অপেক্ষাই তো করছিল লাবণ্য। করতোও অনন্তকাল। এর মধ্যে যুগান্তরের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে?

কিন্তু ভুললে চলবে না, এটা সহর নয়। বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের শেষাশেষি হলেও এটা বাংলার এক ক্ষুদ্র পল্লী, যেখানে শিথিল হ'তে হতেও সমাজের বজ্রমুষ্টি—একেবারে খুলে যায়নি। আর সেই মুষ্টিই রেখে ধরেছে প্রতিবেশী আর আত্মীয়ের আকারে। যুগান্তরের পরোয়ানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা চারিদিক ঘিরে। অব্যর্থ শিকারী তীর উঁচিয়ে আছে এক লক্ষ্যে। এক চিলতে সিঁদুর। দু'হাতে সিঁথিটা ঢেকে চীৎকার করে ওঠে লাবণ্য—'না—না—না।'

কিন্তু 'না' বললেও মানবে না। ওর প্রাপ্য ওকে দিতেই হবে। তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি সারাজীবন এমন কি জন্মান্তরেও অপেক্ষা করতে পারো। সমাজ করবে না।

সন্তর্পণে ট্রাঙ্কটা খুলে ফটোটা বের করে লাবণ্য। না, বিয়ের দিনে অথবা ফুলশয্যার রাতে জাঁক-জমকে তোলা ছবি নয়। এ এক অদ্ভুত ছবি। বিয়ের কিছু আগে, বোধ হয় সম্ভাব্য পাত্রপক্ষকে দেখাবার জন্যই লাবণ্যর একটা ফুল সাইজ ফটো তোলানো হয়েছিল। আর ঠিক ঐ সাইজ-এরই ছিল শংকরের একমাত্র ফটো, তার কনভোকেশনের ছবিটা। ঐ দুটোর নীচে একটা পিচবোর্ড দিয়ে জুড়ে রেখে ওরা দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছিল।

ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত নরম হয়ে আসে লাবণ্যর চোখ। মনও যেন স্থির হয়ে যায়। এই ভালো।

মালবিকার কষ্ট হবে? বাপ-মা-হারা বারো তেরো বছরের মেয়েটা মা হারালে মারা নিশ্চয় যাবে না। শাশুড়ীর কষ্ট? তা—কি আর করবে লাবণ্য? ও যা পারবে না—তা পারবে না। তার চেয়ে এই ভালো। সমাজের শাসনও বজায় থাকলো, লাবণ্যর কাছে যে কথা চেয়েছিল শংকর চিঠিতে সে কথা না রাখার দায়িত্বও থাকলো না তার।

ভোর হয়ে এসেছে। লাবণ্য দৃঢ় সংকল্প। সিঁদুর ও মুছবে না। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর কুশপুত্তলিকা দাহ করতে হবে। তাই যদি সমাজের বিধান হয়, তাই করবো, তবে আরেকটু বেশী করবো। বেশীর সঙ্গে মাথাটাও দেবো। রামমোহন রায় মাথার ওপর থাকুন! লর্ড বেন্টিঙ্ক ক্ষমা করুন! এছাড়া আমার উপায় নেই।

সূর্য উঠছে। যুগান্তরের সূর্য। এবার পুরোহিত আসবেন, নাপিত আসবে। আত্মীয় প্রতিবেশীরা আসবে। আজ যে যোলই ফাল্গুন। শেষবারের মত পুরুষের দিকে এগিয়ে যায় লাবণ্য। সমস্ত গ্লানি, সমস্ত মালিন্য ধুয়ে এসে সুরু হবে বহ্নি বাসর।

কিন্তু এত ভোরে কে আসছে হন্‌হন্ করে ষ্টেশনের দিক থেকে? অনেক দূরে? বিন্দুর মত? এখনো তো যুগান্তরের কয়েক দণ্ড বাকী। ভোরের ট্রেনটা গাঁয়ের ষ্টেশন পাশ করেছে মিনিট দশেক আগে তবে কি—তবে কি? কিন্তু না, ওতো নারীমূর্তি। মূর্তি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'এটা কি পলাশ গ্রাম?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?'

'আপনার বাড়ি কি এই গ্রামেই? শঙ্কর ঘোষালকে চিনতেন আপনি?'

লাবণ্য কি জেগে আছে অথবা স্বপ্ন দেখছে? কিন্তু চিমটি কাটলে তো লাগছে বেশ।

'আপনি কে?' লাবণ্য স্বপ্নের মধ্য থেকে যেন কথা বললে।

'শঙ্কর ঘোষাল এ্যাপ্রেন্টিস অবস্থায় একটা পাঁচ হাজার টাকার ইনসিওরেন্স করেছিলেন কম টাকা প্রিমিয়ামে। আমি সেই পলিসিটার খোঁজেই এসেছি।'

'তারমানে উনি কি—?'

'হ্যাঁ, উনি মারা গেছেন দু'মাস আগে। আমি ওঁর স্ত্রী। আসামে আমাদের বিয়ে হয়। এখন আসছি কলকাতা থেকে। মরার আগে বলে গেছেন—ওর বাড়ীতে পলিসিটা আছে। ওটা নিয়ে এসে আমি যেন টাকাটা তুলি। আমিই নমিনি। টাকাটা আমার ভীষণ দরকার। সত্যি কথা বলতে কি, আমি অন্য জায়গায় engaged এবং বিয়ের আগেই তাই টাকাটা তুলে ফেলতে চাই, যাতে পরে কোন ঝামেলায় না পড়তে হয়। ওকি—কি হল আপনার?'

না, কিছুই হয়নি লাবণ্যর। নিজের অজ্ঞাতসারেই সিঁথিটা ঘষতে থাকে সে। তার অনেক কাজ বাকী। ঐ অদ্ভুত ভাবে জোড়ানো ফটোটা থেকে নিজের ছবিটা খুলে ফেলতে হ'বে। কুশ-পুত্তলিকার সঙ্গে ঐ কনভোকেশনের পোষাক পরা বিশ্বাসঘাতকের ছবিটাকেও পুড়িয়ে ছাই করতে হ'বে। আর, বাঁচতে হ'বে।

নিজে বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে কচি মেয়েটাকে আর বুড়ী শাশুড়ীকে। যুগান্তরের বার্তা এসে পৌঁছেছে সূর্যের আলোর সঙ্গে! সে বার্তা তাকে মুক্তি দিয়েছে এক বিশ্বাসঘাতকের জন্য চিরকাল অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি থেকে।

মন্থর প্রহর

নারায়ণ চক্রবর্তী

সন্ধ্যার রঙ ঘন হয়নি তখনো, পশ্চিম আকাশে ছড়ানো ছিটানো বিচ্ছিন্ন মেঘের গায়ে সূর্যের শেষ আদরের মতো অল্প অল্প আলোর রেশ লেগে ছিল। পাড়াগাঁ হ'লে হয়তো এতক্ষণে এটুকু অন্ধকারই বিষণ্ণ ঝিল্লিরবে স্পন্দিত হ'তে পারতো, কিন্তু মহানগরীর চোখ ধাঁধানো তীব্র বিদ্যুৎ-আলো আসন্ন রাত্রিকে সহরের দূর উপান্তে রুখে রেখেছিল।

মেট্রোর সামনে চওড়া ফুটপাথের এককোণে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল সুচেতনা, যেন চারদিকের ধ্বনি-মুখর ব্যস্ততার মাঝেও একটু নিরালা খুঁজে পেতে চেয়েছিল। তার চোখ দূর থেকে কাছে আসা, কাছে থেকে দূরে সরে যাওয়া মানুষগুলির মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ কি মনে ক'রে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ভেতর দিকে আটকানো ছোট্ট আয়নায় মুহূর্তের জন্য নিজের মলিন হ'য়ে আসা মুখ দেখে নিল সুচেতনা, হালকা, ছোট্ট, বিস্মৃত, সুগন্ধের স্বপ্ন মাখা রুমালটি বার ক'রে সাবধানে, হালকা হাতে কপালে, গালে আর ঘাড়ে বুলাল। তার চঞ্চল চোখ দুটি বার বার চৌরঙ্গীর দ্রুত ধাবমান মানুষের মিছিলে একটি চেনা মুখ খুঁজছিল। বারেবারেই বিফল হওয়ার জন্য তার গভীর কালো চোখের তারায় বিরক্তির ঘাঘা মেঘ ঘনাচ্ছিল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরল সুচেতনা। ছোট্ট হাতঘড়িটি চোখের সামনে তুলে ধ'রে সময় দেখল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল।

দাঁড়াবার আর উপায় ছিল না, কেননা বেশ কিছুক্ষণ ধ'রেই চোখের কোণে সুচেতনা লক্ষ্য করছিল যে একজন মাঝবয়সী লোক সিনেমার পোস্টার দেখবার ছুতো ক'রে মাঝে মাঝে আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছিল। সে দৃষ্টির নোংরা, জঘন্য ইঙ্গিত বুঝবার মতো যথেষ্ট বয়েস হ'য়েছিল সুচেতনার।

রাগ হ'চ্ছিল সুচেতনার, ভীষণ রাগ। মনে মনে নচিকেতার মুণ্ডপাত করছিল সে।

কয়েক পা এগিয়ে যেতে না যেতেই পেছনে ছোট্ট হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সুচেতনা, চোখাচোখি হ'য়ে গেল মৃদু মৃদু হাসতে থাকা নচিকেতার সঙ্গে। নচিকেতা বলল,—"চলে যাচ্ছিলে যে বড়ো?"

সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো সুচেতনার মনের যতো বিরক্তি, যতো অসন্তোষ, ক্ষোভ আর হতাশা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল, খুশীর প্লাবনে তার সারা শরীর কেঁপে উঠল, ঠোঁটের কোণে, চোখের তারায় হালকা হাসির ঝিকিমিকি ছড়িয়ে পড়ল।

তবু ক্রত্রিম ক্রোধের ছদ্ম গাম্ভীর্যে উচ্চস্বরে বলতে ছাড়ল না সুচেতনা,—"ক'টায় আসবার কথা ছিল তুমি?"

"সাড়ে ছ'টায়,—" নিজের হাতঘড়িতে চট ক'রে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নচিকেতা বলল।

"মিথ্যুক কোথাকার—" ক্রুদ্ধভঙ্গী ক'রে বলে উঠলো সুচেতনা,—"ছ'টায় না?"

রেগে ওঠা সুচেতনার বাঁকানো ভ্রূ যেন আর মুহূর্ত করবার মতো বাঁকা ভ্রূর শাসন উপভোগ করতে করতে নচিকেতা বলল,—"মোটেই না,—কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায়,—ঘড়ি বলছে যে ঠিক সময়েই এসেছি আমি—"

"আবার মিথ্যে কথা? যাও, জীবনের যদি তোমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলি আমি—"ব'লে মুখ ফিরিয়ে নিল সুচেতনা।

অভিমানের কথা। বেশ একটু জোরেই বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে। শালোয়ার পাঞ্জাবি ওড়না পরা দু'টি মেয়ে গল্প করতে করতে পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, মুখ ফিরিয়ে সকৌতুকে ওদের দেখে কী যেন মন্তব্য করল একজন, উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল আর একজন। দূরে গিয়েও ঘাড় ফিরিয়ে সুচেতনাকে দেখল ওরা।

নচিকেতার ইচ্ছা হ'ল হাত বাড়িয়ে সুচেতনার মুখ তার দিকে ফেরায়, কিন্তু চারিদিকে অগুণতি লোক, তাই তার সাহসে কুলাল না, পরিবর্তে কণ্ঠস্বরে অনুতাপ মিশিয়ে কুণ্ঠার সঙ্গে বলল,—"তুমি যখন বার বার বলছ, তা'হলে হয়তো ছ'টাই—"

"তা হলে এত দেরী করলে কেন?"

"একদম মনে ছিল না সু—"

মনে ছিল না? কথাটা কানে যেতেই হঠাৎ তাতা বারুদের মতো দপ্ করে জ্বলে উঠলো সুচেতনা। ঘৃতাহুতি অগ্নির মতো একটা জ্বালা তার কথার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ল, বলল,—"আজকাল দেখছি কোনো কথাই মনে থাকে না তোমার। গত রোববার সারাটা সন্ধ্যা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের উত্তর পূব কোণে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম তোমার জন্য,—এলেই না। পরদিন দেখা হ'লে একটা বাজে অজুহাত দেখালে—"

আহত স্বরে নচিকেতা বলল,—"বাজে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাজে। একশো বার বাজে—" ব'লে হাঁপাতে লাগল সুচেতনা।

"সত্যি কথাটাও বাজে হ'য়ে গেল তোমার কাছে? কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি যে আমার কোনো কথাই তুমি বিশ্বাস করতে চাও না সু—"

"বিশ্বাসযোগ্য কথা হ'লে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব,—বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমা দেখে ফুর্তী ক'রে এসে আজেবাজে কথা বললে কার বিশ্বাস হয় শুনি?"

"বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমা? হাসালে তুমি সু। বান্ধবী বলতে তো একমাত্র তুমি, আর বাড়ি-ডাক্তার, ডাক্তার-ওষুধের দোকান, ওষুধের দোকান-বাড়ি করে পা যার ধরে যায় সে সিনেমা দেখবে কখন?"

"আগে থেকে জানিয়ে দিলেই হ'ত যে আসতে পারবে না,—কয়েকটা ড্রেন-পাইপ পরা কচ্‌কে ছোঁড়া ঠারে ঠোরে যা অসভ্যতা করছিল।"

"আচ্ছা তুমিই বলো সু, আগে থেকে কী ক'রে জানবো যে ঠিক বেরুবার মুহূর্তেই মা-র বুকের ব্যথাটা অমন বেড়ে যাবে? আর জানোই তো বাড়িতে আমি ছাড়া মা-কে দেখবার দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই—"

আবার মা? দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা জোর চেপে ধরল সুচেতনা। মা অন্তপ্রাণ, পরম মাতৃভক্ত সুবোধ সুশীল ছেলে? এসব ছেলেরা কেনই বা সঙ্গিনী খোঁজে, কেনই বা প্রেম করতে আসে?

তাদের দু'জনের প্রেমের জগতে অদৃশ্য প্রেতছায়ার মতো নচিকেতার মা একটা অশুভ অন্ধকার ছায়া ফেলেছে। সেই ছায়াতে নচিকেতার প্রেমের দীপ্তি ম্লান হ'য়ে আছে। তাদের যুগল প্রেমের সূর্য সেই রাহুর গ্রাস থেকে আর মুক্ত হ'তে পারছে না।

নচিকেতার সেই রাশভারী মা-কে মাত্র একবার দেখেছে সুচেতনা। লক্ষ্য করেছে যে তাঁর চোখে ত্রিশ বছরের যুবক নচিকেতা এখনো যেন খোকাটিই হ'য়ে আছে, তার বয়স যেন ষোলো পেরোয় নি এখনো। অস্ত্র সিংহ-অবতার নচিকেতাও মার সামনে একেবারে জড়োসড়ো, কাঁচুমাচু। সে বুঝেছে যে মা-কে নচিকেতা যতো না ভালোবাসে, ভয় করে তার চেয়েও অনেক—অনেক বেশী।

নচিকেতার মনের সেই বিপুল, গভীর, অন্ধভয় লক্ষ্য ক'রে এক নামহীন অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিল সুচেতনার মন। নচিকেতার সেই ভয় মিশ্রিত অদ্ভুত ভালোবাসার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি সে।

একই নদীতে বিপরীত মুখী স্রোতের মতো সারা ফুটপাথ জুড়ে লোকজনের আনাগোনার আর বিরাম ছিল না। মনের ভেতর আবর্তিত ভাবনাগুলো চাপতে গিয়ে আনমনা ভাবে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুচেতনা। তারপর হঠাৎ চমক ভেঙে ব'লে উঠলো, "কি? এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি সারাক্ষণ?"

কী যেন ভাবছিল নচিকেতা, চারদিকের অজস্র বিদ্যুৎ বাতি থেকে উপচে পড়া প্রখর আলোয় কেমন একটু বিমনা দেখাচ্ছিল তাকে, মনে হচ্ছিল যে তার মনের ভেতরে দুই বিপরীতমুখী আবর্ত পাক খেয়ে চলেছে। সুচেতনার কথায় সচকিত হ'য়ে বলল,—"আজ তার সিনেমা দেখা হবে না সু—"

"কেন?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুচেতনা বলল।

"শো শুরু হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে—"

"এর জন্য দায়ী তুমি। আমি ঠিক সময়েই এসেছিলাম—" সুচেতার দুই চোখে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো,—"তোমার এই বিরক্তিকর গড়িমসী স্বভাবের জন্য সব কিছুই পণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে—"

"কী আর করা যাবে—" কাঁধের একটা হালকা ভঙ্গী ক'রে নচিকেতা বলল,—"মার জন্য এই ওষুধটা কিনতেই দেরী হ'য়ে গেল। চার পাঁচ দোকান ঘুরে তবে পেলাম—"

"থাক। আর ব্যাখ্যা করতে হবে না তোমাকে—"

অপ্রস্তুতের মতো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো নচিকেতা, চৌরঙ্গীর চওড়া রাস্তায় প্রাইভেট কার আর ট্যাক্সির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ দেখল, তারপর আড়চোখে সুচেতনার মুখ দেখল, আস্তে আস্তে বলল,—"চলো, কোথাও বসে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক—"

ঝলসে উঠে সুচেতনা বলল,—"না—"

"তবে কি কফি আর পাকৌড়ি?"

"তা-ও না—"

সরাসরি সুচেতনার মুখে তাকাল নচিকেতা, গাঢ় কণ্ঠে বলল,—"দোষ স্বীকার করে নেওয়ার পর এমন ব্যবহারের কোনো মানে হয় না সু,—দেরী হয়ে গেছে বলে ছুটতে ছুটতে আসছি···ঠিক আছে, আমি চলে গেলেই যদি তুমি খুশী হও, তাহ'লে চলেই যাচ্ছি—।"

মনের মেঘ কেটে গেল। হালকা হাসির আলোতে ঝলমলিয়ে উঠলো সুচেতনার মুখ, একটু ঘন হ'য়ে দাঁড়িয়ে বলল,—"বড্ড গরম আজ, চলো ময়দানের দিকে যাই, বেশ একটু দূরে, বেশ একটু নিরিবিলিতে —ফেরার পথে কফি খাবো, কেমন?"

সুচেতনা যা-বলে-তাতেই রাজী নচিকেতা। বলল,—"বেশ তো, তাই চলো—"

ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে সাবধানে চৌরঙ্গীর মৃত্যুপথ অতিক্রম ক'রে ট্রাম লাইন পার হ'ল ওরা দু'জন, তারপর দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি।

সারাদিনের ওমোট কেটে গঙ্গার দিক থেকে অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল, সুচেতনার শাড়ির আঁচল উড়ছিল, চলার ছন্দে দুলছিল তার কোমর-ঝোলা মিশকালো বেণীর শেষপ্রান্ত। ঘামে ভেজা ব্লাউজ-ব্রেসিয়ারে হাওয়া লেগে প্রথমটায় একটু গা-শিরশির ভাব এসেছিল সুচেতনার, তারপর স্নিগ্ধ মধুর আবেশে সারা শরীর জুড়িয়ে গিয়েছিল।

প্রকৃতির সামান্যতম দাক্ষিণ্যও মানুষের মনকে কত সহজেই না নাড়া দেয়, জীবনের কর্কশতার ওপর মখমল মসৃণ আবরণ পরিয়ে দেয়। কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। মনের ভেতর চেপে রাখা হাজার অভিযোগের বিষাক্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলী হাজার পাকে বেরিয়ে আসতে চায়, ঈর্ষা, ঘৃণা, ক্ষোভ আর বঞ্চনার আগুনে জ্বলে উঠতে চায়।

মনের ভেতর জেগে থাকা অস্পষ্ট, কিন্তু তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় ছটফট করছিল সুচেতনা।

হাঁটছিল ওরা পাশাপাশি, কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছিল না, কেউ কারুর হাত ধরছিল না। যেন দুটি অচেনা যুবক যুবতী ঘটনাচক্রে কাছাকাছি হ'য়ে আপন আপন পথে হাঁটছে।

মুখ ঘুরিয়ে নচিকেতার মুখ দেখল সুচেতনা, কী যেন ভাবছে সে, সেই অসুখকর চিন্তার বিষণ্ণ ছাপ তার মুখে ফুটে উঠেছিল।

জনপূর্ণ রাজপথ অনেক পেছনে ফেলে নির্জন ঘাসের সবুজ সমুদ্রের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ওরা। আলোকদজ্জিতা মহানগরীর বিষাক্ত আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে এসে রাত্রি তার অন্ধকারের শয্যাটি নিপুণ নিভাঁজ ভাবে পেতে রেখেছে এখানে। তার কোমল পেলবতা যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

জায়গাটা পছন্দ হ'ল সুচেতনার, তার মনের ভাবনাগুলোর সঙ্গে এর একটা সাদৃশ্য যেন খুঁজে পেল সে, মৃদুস্বরে বলল,—"এখানেই বসা যাক, বেশ নিরিবিলি, নিরালা জায়গাটা—কী বলো?"

"বেশ তো, বোসো—"

পাশাপাশি বসে পড়ল ওরা দু'জন। সুচেতনা তার পা দুটো লম্বা করে মেলে দিল। ঠাণ্ডা ঘাসের ছোঁয়ায় পায়ের জ্বালা আস্তে আস্তে জুড়িয়ে এল।

দূর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কুহেলি মাখা অস্পষ্ট অবয়বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুঝি আর এক সন্ধ্যার বিফল প্রতীক্ষার কথাই মনে পড়ছিল সুচেতনার, মনে পড়ছিল আরও অনেক কথা। ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবনা ছিল তার।

নচিকেতা মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, যেন ছায়াপথের বাঁকখান দিয়ে নিত্য প্রবহমান আকাশ গঙ্গার যাত্রাপথ আবিষ্কার করতে চাইছিল সে।

প্রতীক্ষা ক্লান্ত সুচেতনা ক্লান্তস্বরে বলল,—"সত্যি আর ভালো লাগে না—"

লঘুগুরু থেকে চোখ নামিয়ে এনে নচিকেতা বলল,—"কী ভালো লাগে না সু?"

"ভালো লাগে না এই দুঃসহ প্রতীক্ষা, নিঃসঙ্গ একাকীত্বের এই অরিন্দম—"

"তুমি কি এরই মধ্যে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে সু?"

"হ্যাঁ, আমি ক্লান্ত। বিচ্ছিন্নতার ক্লান্তি আমাকে বিবশ ক'রে তুলেছে নচিকেতা—" গুণ গুণ ক'রে

ভিজে ভৈরবীর স্বরে বলছিল সুচেতনা,—"অনিশ্চয়ের জ্বালা আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এ যন্ত্রণার হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও তুমি—বাঁচতে দাও আমাকে—"

বলতে বলতে নচিকেতার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরল সুচেতনা।

তার মনে পড়েছিল তার অন্যান্য বান্ধবীদের কথা। পূর্বরাগের পালা শেষ করে তাদের অনেকেই প্রিয়া থেকে জায়া হয়েছে। কিন্তু সেটাই বড়ো কথা নয়, বিয়ের আগে ওদের ভালোবাসার যেসব গল্প শুনেছে তার সঙ্গে নিজের জীবনের প্রথম প্রেমের কোনো মিলই দেখতে পায়নি সুচেতনা। মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে যে যৌন উন্মাদনাশূন্য কোনো এক পুরুষকেই বুঝি ভালোবেসে ফেলেছে সে, কখনো মনে হয়েছে যে সে নিজেই বোধহয় নচিকেতার রক্তে ঝড় তুলতে পারছেনা, তার এই অক্ষমতাই বুঝি নচিকেতাকে অমন শীতল, দ্বিধাগ্রস্ত ক'রে তুলেছে। বহু নির্জন প্রহর ব্যর্থ হয়েছে, তাকে বুকে টেনে নিতে পারেনি নচিকেতা, পারেনি তার যৌবনের ফুল দুটি স্পর্শ করতে। ক্বচিৎ কখনো চুমু খেয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যে সেই শ্বাসরোধী উন্মাদনার ছোঁয়া ছিল না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নচিকেতা বলল,—"প্রতীক্ষার মধ্যে যে একটা সুন্দর স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে, তাকে কি তুমি দেখতে পাও না সু?"

"না পাই না—" প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলো সুচেতনা, "আমি পাথরের মূর্তি নই, রক্ত-মাংসের মানুষ, তোমার মতো নপুংসক নই—"

উত্তেজিত সুচেতনার গলা কাঁপছিল, বুক ও ধড়পড় করছিল।

নচিকেতার রক্তের গভীরে যে যৌন চেতনা ঘুমিয়ে ছিল, সুচেতনার কথা আর তার দেহের ঘন উষ্ণ স্পর্শ তাকে জাগিয়ে দিল, উত্তাল ক'রে তুলল। কিন্তু তা শুধু পলকের জন্যই একটু পরেই গ্লানিকর অবসাদের স্তূপ ভারী হ'য়ে তার মনের ওপর চেপে বসল।

তার খুব ছেলেবেলায় বাবা মারা গেছেন। কাকা জ্যাঠাদের গ্রাস থেকে তাদের ছোট্ট বাড়িটা বাঁচাতে গিয়ে কোর্ট কাছারী ক'রে ক'রে তার মাকে যে পুরুষালী মুখোশটা পরতে হয়েছিল, ক্রমে সেটাই স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। নচিকেতার বাল্য, কৈশোর ও যৌবন কেটেছে সেই মায়ের আঁচলের ছায়াতে। তার কখন কী প্রয়োজন তা ঠিক করে দিতেন তার মা, কোথায় যাবে, কার সঙ্গে মিশবে, কতক্ষণ বাইরে থাকবে সে সব ঠিক করবার ভার ছিল তার মা-র ওপর। এইভাবে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেবার কি স্বাধীনভাবে কোনো কিছু ভাববার কথা চিন্তাই করত না সে। ভাবতো যে মা আছেন, মা-ই সবকিছু করবেন, তার কাজ শুধু তাঁর নির্দেশ মতো চলা।

তা-ই চলছিল যে। তারপর অনেকটা আকস্মিক ভাবেই সুচেতনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। নচিকেতার এই পরিচয় একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল তার চোখের সামনে, বুঝেছিল যে মা ছাড়াও অন্য নারী আছে এ পৃথিবীতে; আর তার সঙ্গ, কথা, হাসিগান মন ভরিয়ে তোলে। এ অভিজ্ঞতা তার পক্ষে নতুন ব'লেই কিছুদিনের মধ্যে সুচেতনার সঙ্গে গাঢ় হয়েছিল তার পরিচয়। মা-র কাছে কোনো কথা লুকিয়েও যে আনন্দ পাওয়া যায় তা লক্ষ্য করে সত্যি সত্যিই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। অবাক আর বিষণ্ণ, কুণ্ঠা আর অপরাধবোধের গ্লানি সব মিলে গিয়েছিল।

বেশীদিন চেপে রাখতে পারে নি কথাটা। একদিন বলে ফেলেছিল যে সুচেতনা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। মা এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর মুখ থেকে একটা কথাও

যায় হয়নি প্রথমটায়, নচিকেতা যে আর স্কুলে পড়া খোকাটি নেই, সে যে এখন একটা নামী বেসরকারী আপিসে ভালো পোস্টে কাজ করে সে সব কথা মনে ভাবেন নি তার মা। প্রথমেই মনে ভয় জেগেছিল যে ঐ টাইপিষ্ট মেয়েটা বুঝি নচিকেতাকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে।

কড়া ভাবে তিনি ছেলেকে নিষেধ করেছিলেন সুচেতনার সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে।

কয়েক সপ্তাহ তা-ই করেছিল নচিকেতা, চিরকালের অভ্যাসের বাইরে পা বাড়াতে পারেনি। কিন্তু মনের ভেতর যে ইচ্ছাটা সব সময়ে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে তা যে কোনো বদ্ধমূল সংস্কারের ভিত আলগা ক'রে দিতে পারে। সুচেতনার অপ্রতিরোধ্য-আকর্ষণ সেই প্রথম নচিকেতাকে মায়ের কথার অবাধ্য হতে শিখিয়েছিল।

সুচেতনাকে ভালো লাগে তার, ভালো লাগে তার সব কথা, হাসি, গান,—সব। সুচেতনার শরীরের একটা বিচিত্র আকর্ষণ আছে, তার তীব্রতা সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করে নচিকেতা, হাত বাড়াতে চায়, কিন্তু ঠিক তখনি মনের ভেতরেই একটা বাধার প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেই আকর্ষণের আর সেই বাধার স্বরূপ বুঝতে পারেনা সে।

নচিকেতাকে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখে অস্থির হয়ে উঠলো সুচেতনা, সে বুঝতে পারছিল যে ইদানীং নচিকেতা যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে, অদ্ভুত নির্লিপ্ততা এসেছে তার ব্যবহারে ; আর এটা বেশী ক'রে প্রকট হয়েছে তার আর নচিকেতার মা-র সঙ্গে দেখা হবার দিন থেকেই।

নিজে থেকে কোনোদিনই বলেনি নচিকেতা, সুচেতনাই জোর করেছিল, বলেছিল,—"তোমার মা র সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া খুব দরকার নচিকেতা। আমি এখানে লেডি'জ হোষ্টেলে থাকি, অনাত্মীয় পরিবেশে—আর যা-ই থাক, মায়ের স্নেহ সেখানে নেই।"

নিজের মনে মাতৃ মূর্তির যে ছবি একেছিল, নচিকেতার মা-র সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পায়নি সুচেতনা, বরং তার মনে হয়েছিল যে কোনো এক যাদুনীর সামনে বসে আছে সে, যে তার সদ্য প্রস্ফুট শাবককে পাহারা দিচ্ছে অতন্দ্র, অক্লান্ত। সেই মায়ের সামনে চিরখোকা—নচিকেতার হাব ভাব কথা-বার্তা দেখে শুনে একদিকে যেমন তার হাসি পেয়েছিল তেমনি ভয়ও হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল যে মা-র কাছে এলেই নচিকেতার স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্ত হ'য়ে যায়, সে হ'য়ে ওঠে একটি সজীব পুতুল।

আজই ব্যাপারটার একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে ফেলবার ইচ্ছা হ'ল সুচেতনার, আরও কাছে সরে এলো সে, আরও ঘন হ'য়ে বসল, যেন তার দেহের সবটুকু তাপ নচিকেতার শরীরে সঞ্চারিত করতে চাইলো। মুখখানা নচিকেতার মুখের খুব কাছে নিয়ে বলল,—"চুরি ক'রে পাওয়া এই দুর্লভক্ষণটুকু কি এভাবেই বয়ে যেতে দেবে নচিকেতা ?"

সুচেতনার গা থেকে ভেসে আসা যৌবনের গন্ধ নচিকেতার নাকে এসে লাগছিল, তার দুই চোখের আমন্ত্রণ অনুভব করল, কিন্তু সাড়া দিতে পারল না সে। রাত্রির মতোই গম্ভীর কণ্ঠে বলল,—"সময়কে স্তব্ধ ক'রে রাখবার কায়দাটা যদি জানা থাকতো তা'হলে এই মুহূর্তটিকে নিশ্চয়ই হারিয়ে যেতে দিতাম না সু, কিন্তু—"

"কিন্তু কী ?"

আমাদের ইচ্ছাই পৃথিবীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাই মনে হয় যে আমাদের দেখা না-দেখাই বরং সব থেকে ভালো হ'ত—"

নচিকেতার কাঁধে-মাথা রেখেছিল সুচেতনা, তার কথা শুনে তীরের মতো সোজা হ'য়ে বসল সে, অজানা আশঙ্কায় ওর বুক দুলে উঠলো, রক্তহীন পাংশু মুখে বলল, "তার মানে ?"

"মানে—এই পরিচয়, এই ঘনিষ্ঠতা আমাদের জীবনে দুঃখকেই ডেকে আনবে—"

ফিসফিস ক'রে সুচেতনা বলল,—"এ কথা কেন বলছ নচিকেতা ? আমার সঙ্গ কি তোমাকে আনন্দ দেয় না ?"

"নিশ্চয়ই দেয় সু,—আর দেয় বলেই তো দুঃখের নেপথ্য ভূমিকাটা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে—"

ব্যাকুল হয়ে সুচেতনা বলল,—"হেঁয়ালী রাখো,—স্পষ্ট ক'রে বলো কথাটা—"

"মা-কে আজ সকালেই বলেছিলাম তোমার কথা, মানে তোমার-আমার কথা—" যেন কোনো এক শোক প্রস্তাব পাঠ করছে এমনি নিষ্প্রাণ সুরে নচিকেতা বলল,—"কিন্তু মা কিছুতেই রাজী হ'লেন না—"

শরীরের সবটুকু রক্ত এসে সুচেতনার মুখে জমল, শরীরশক্ত হ'য়ে গেল, কোনোমতে বলল—"কেন ? আমাকে কি তোমার মা-র পছন্দ হয়নি ?"

"না না,—সে কথা নয়—" দ্রুত কণ্ঠে নচিকেতা বলল,—"বিশেষ ক'রে তোমাকেই যে তাঁর অপছন্দ তা নয়, হয় তো আমার স্ত্রী হিসেবে কাউকেই তাঁর পছন্দ হবেনা, তাঁর মতে আমার এখনো বিয়ের বয়সই হয় নি—"

চোখ কপালে তুলে সুচেতনা বলল,—"সে কি তিরিশ পার করেও কি বিয়ের বয়েস ছুঁতে পারলে না তুমি ?"

"ঐটিই তো মা-র মনের রোগ সু,—আমাকে এখনো ছোট্টটিই ভাবেন। মার চোখে আজ আঠারো বছর ধ'রে আমার বয়েস আর বাড়ছে না—" ব'লে একটু থামল নচিকেতা, পরে বলল,—"আঠারো বছর আগে আমার ছোট ভাই নবারুণ—রাস্তা পার হ'তে গিয়ে ট্যাক্সি চাপাপড়ে মারা গিয়েছিল—"

"সেকি কী করে ?"

"নবারুণ তখন সাত বছরের বাচ্চা ছেলে, মা-ওকে সঙ্গে নিয়ে উকিলের বাড়ি গিয়েছিলেন পথে ওর হাত ধরে রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ কী জানি কেন মা-র হাত ছাড়িয়ে চকল নবারুণ একছুটে রাস্তার মাঝখানে। একটা চলন্ত ট্যাক্সি আসছিল, ব্রেক কষতে কষতে সব শেষ। একেবারে মা-র চোখের ওপরে। মা চীৎকার ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে কালচক্র থেমে গেছে তাঁর কাছে—"

"চিকিৎসা করলে কি এ রোগ সারে না ?"

"কী জানি.—সাইকিয়াট্রিষ্ট হয়তো বলতে পারেন, কিন্তু, কিন্তু মা সেখানে—কিছুতেই যেতে চান না—"

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো সুচেতনা। নচিকেতার কথাগুলো অন্ধকার মাঠের বাতাসে ভর ক'রে কোথায় মিলিয়ে গেল।

একটা ঘাসের শীষ ছিঁড়ে আঙুলে পাকাতে পাকাতে সুচেতনা বলল,—"মা-র যখন মত নেই তখন জোর করবার দরকার নেই। এসো আমরা রেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়েটা সেরে ফেলি,—কথাটা মা-র কাছে আপাততঃ গোপন রাখি—"

"তাতে লাভ ?"

"অনিশ্চয় সংশয়ের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে,—তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া ?"

সুচেতনা নচিকেতার কানে কানে বলল,—"হয়তো নবারুণের শোকে মগ্ন তোমার মা-র মন আমাদের সন্তানকে পেয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে—"

"কিন্তু যদি তা না হয় ? মা-র দুর্বল হার্ট সেই আনন্দের আঘাতকে যদি সহ্য না করতে পারে ? বউ ঘরে তুলে কি শেষকালে মা-কে হারাতে বলো সু ?"

"মা মা আর মা—মা-ই তোমার সব।" রেগে উঠলো সুচেতনা,—"অতই যদি মাতৃভক্ত ছেলে তুমি তবে, এসেছিলে কেন আমার সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতে, প্রেম করতে।"

সুচেতনার মর্মর স্বর সহসা কলহতীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, তার চীৎকার মাঠের হাওয়ার পেছনে পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করল।

নচিকেতার মুখ ছাই হ'য়ে গেল, বলল,—"আমাকে ক্ষমা করো সু। বিশ্বাস করো, তোমার মনে দুঃখ দেবার কোনো ইচ্ছা কোনোকালেই ছিল না আমার। ভেবেছিলাম যে মা-কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে পারব—"

দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠা উত্তেজনা ঝিমিয়ে পড়ল। অনুতপ্ত হ'ল সুচেতনা, নচিকেতার হাত ধ'রে বলল,—"আজকাল কথায় কথায় কেন যে এত রেগে উঠি ! ভারি বিচ্ছিরি লাগে। রাগ করলে না তো ?"

নচিকেতা বিব্রত বোধ করছিল। কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে অসহায় বোধ করছিল। কী বলবে হঠাৎ ভেবে পেল না সে। সুচেতনার আঙুলের ছোঁয়া ভালো লাগছিল তার।

আস্তে আস্তে নরম, ঠাণ্ডা সুরে নচিকেতা বলল, "মা-র বয়েস হয়েছে, হার্টও দুর্বল, বেশীদিন বাঁচবেন না তিনি। আমার জন্য কয়েকটা বছর কি অপেক্ষা করতে পারবে না সু ?"

অপেক্ষা ! শুধু অপেক্ষা ! অনেকক্ষণ মনে মনে ভাবলো সুচেতনা। নচিকেতার ভালোবাসায় বিশ্বাস আছে তার, কিন্তু তাকে সফল ক'রে তুলবার জন্য তাদের অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে একটি মৃত্যুর জন্য। হয়তো প্রতিমুহূর্তে নচিকেতার মা-র মৃত্যু কামনা করবে সে, আর তা করতে গিয়ে তার বিবেক তার সংস্কার দগ্ধ হ'তে থাকবে।

আর মা-কে যতোই ভালোবাসুক নচিকেতা, তাঁর মনে ব্যথা না দেবার জন্য যতো চেষ্টাই করুক, যৌবন জ্বালার অস্থির কোনো মুহূর্তে সে-ও কি ঠিক সুচেতনার মতোই মায়ের মৃত্যু চাইবে না।

সেই বিবেক রিক্ত দগ্ধ ভুবনে কোন সুখের সংসার পাতবে তারা ?

মনকে শক্ত করল সুচেতনা, নচিকেতার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল, সরে বসল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুকনো গলায় বলল,—"না। অনির্দিষ্ট আশায় থাকতে আমি পারব না। তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম নচিকেতা—"

আনন্দের যে আলোটা এতদিন নচিকেতার চোখে জ্বলছিল তা হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল।

অন্ধকার মাঠে নচিকেতার লম্বা শরীরটাকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে দেখল সুচেতনা। মাতালের মতো হাঁটছিল সে, তার মধ্যে মুক্তির আনন্দ ছিল কি ?

দেখতে দেখতে সুচেতনার চোখে জল ভরে উঠলো।

প্রেম নামক অভিজ্ঞতা

অশোক দত্ত

"তুমি তো অনেক পড়াশোনা করেছ, বলত প্রেম কাকে বলে? এত যে যন্ত্রণা পাই তোমার জন্য তাই কি ভালবাসা?" রেষ্টুরেন্টের পর্দা ঘেরা কেবিনে বসে প্রশ্ন শুনে হাসলাম।

কিছুদিন হল একটি মেয়ের সংগে যত্রতত্র দেখা যাচ্ছে আমাকে। প্রেমে পড়েছি বলে ধরে নিয়েছে পাড়া প্রতিবেশী সবাই। আমি নিজে অবশ্য এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। তবে খারাপ লাগছে না। নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। তাছাড়া একজন মেয়ে বন্ধু না থাকলে আজকালকার দিনে আমার মত স্মার্ট ছেলেকে ঠিক মানায় না। মেয়েটি দেখতেও খারাপ নয়। একুশ বছরের পরিপূর্ণ শরীর। চেহারায় বুদ্ধির ছাপ।

"তোমার তো হৃদয় নেই। heartless, আমার হৃদয়টি নেবে?"

"দাও", বলে হাত বাড়ালাম, বলাবাহুল্য দৃশ্যমান হৃদয়ের দিকে। রেষ্টুরেন্টের রীতিনীতি এতদিনে প্রায় মুখস্থ আমাদের। বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেছে। এখন মিনিট কুড়ি নিশ্চিন্ত। এরপরে এসে যখন খাবার সাজিয়ে পর্দাটা ভাল করে টেনে টুনে চলে যাবে তখন আবার আধ ঘন্টার সুযোগ পাওয়া যাবে। চুমু না খেয়ে কি কাটলেট খাওয়া যায়।

"তোমায় দেখলেই বোঝা যায় অনেক পেঁয়াজ রসুন খাওয়া অভ্যেস আছে। বল না, অনেক মেয়ের সংগে মিশেছ? কেউ সত্যি ভালবেসেছে? মনে হয় না। তাহলে ছাড়তে পারত না। আমাদের যদি কোনদিন ছাড়াছাড়ি হয় জেনো তোমার জন্যই হবে। যতদিন না জোর করে তাড়াচ্ছ, আমি আছি তোমার সংগে।"

"ভাল। তবে কিনা, ভালবাসার নামে তো বাজারে অনেক কিছুই চলছে?"

মাঝখানে নানা কাজে আটকে পড়ায় কয়েকদিন দেখা হয়নি। চিঠি এসে গেল একটা। 'আশীষ, দু'দুটো ছুটির দিন গেল, তুমি এলে না। আশ্চর্য! আমি যে এত ব্যাপারে তোমায় নিষেধ করি তা কখনোই শোনবা। কিন্তু এ নিষেধটা ঠিক শুনলে। এ কয়েকদিন খালি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছি নানান্ কাজে স্বস্তি পাইনি। আমি ক্ষমা চাইছি। আর কোনদিন এরকম বলব না। তুমি এসো।'

কি মুস্কিল! মেয়েটা সত্যিই আমায় ভালবাসে না কি? কিন্তু আমায় কি কাজ করতে নিষেধ করেছিল? কিছুই তো মনে পড়ছে না।

ট্যাক্সি চলেছে গংগার পাশ দিয়ে। নির্জন রাস্তার লাইট পোষ্টগুলো মুহূর্তের জন্য আমাদের রাঙিয়ে দিয়ে আবার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে।

হঠাৎ মিটারের দিকে নজর গেল। সাতটাকার উপর এর মধ্যে উঠে গেছে! আর কিছুদূর গেলে তো ঘড়ি বাঁধা দিতে হবে!

"সর্দারজী, ট্যাক্সি ঘুমা লিজিয়ে। ওয়াপাস চলিয়ে।"

সর্দারজী হেসে সুন্দর বাংলায় উত্তর দিল "ফুর্তি করতে বেরিয়ে কি বাবু মিটারের দিকে তাকালে চলে?"

কঠিন জবাব এসেছিল মুখে! অনেক কষ্টে সংবরণ করলাম। ট্যাক্সিতে বিশেষ কিছু ব্যাপার আমরা ঘটাই নি। কিন্তু সামান্য যেটুকু ঘটেছে তাকে হয়ত ফুর্তি বললেই ঠিক হয়, প্রেম বলা চলে না। বাড়ী যখন ফিরলাম তখনও মুখে তেতো স্বাদ লেগে রয়েছে।

বিকেলে লেকের রাস্তায় হাঁটছি। পড়ন্ত আলোয় সোনালী রঙ ধরেছে লেকের জল। রোয়িং বোটগুলো যেন উড়ে চলেছে জলের উপর দিয়ে।

একটু আড়াল খুঁজে বসতে না বসতেই প্রশ্ন বিদ্ধ হলাম।

"তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর না। কমিউনিষ্ট নাকি?"

"কেন? কমিউনিষ্ট ছাড়া সবাই কি ভগবান বিশ্বাস করে?"

"কি জানি বাবা! আমরা কিন্তু ভগবানকে অবিশ্বাস করা ভাবতেই পারি না। বাবা তো পুজো-আচ্চা নিয়েই থাকেন।"

শুধু পুজো-আচ্চা নয়, খুব নিয়েও—মনে মনে আওড়ালাম। ভগবান ছাড়া উপায়ই বা কি?

"আচ্ছা, ছেলেপিলে হয় কেন? বিচ্ছিরি জিনিষ।" বান্ধবীর প্রশ্নটি বেশ ইংগিতবহ মনে হল।

"ঠিক বলতে পারছি না। যতদূর জানি ঘনিষ্ঠভাবে ভালবাসলে ছেলেমেয়ে হয়। তোমার অনুসন্ধিৎসা প্রবল হলে তা যে নিয়ন্ত্রন করা যাবে না তা নয়। বল তো চেষ্টা চরিত্র করি। আমার নিজেরও এ প্রশ্নটির উত্তর বিশদভাবে জানা দরকার।"

"থাক্, অজ্ঞানতাই শ্রেয়ঃ। অন্ততঃ যতদিন না বিয়েটা হয়ে যাচ্ছে…।"

শীতের দুপুরে বেড়াতে এসেছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। গাছের ফাঁক দিয়ে নরম রোদ্দুর এসে পড়েছে গায়ে। দূরে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। বেশ লাগছে চুপচাপ বসে থাকতে। কিন্তু বেশীক্ষণ কি চুপ করে থাকার উপায় আছে!

"তুমি আমায় একদম ভালবাসো না। ভালবাসা বলতে আমি প্রেম বোঝাচ্ছি না। একটা কুকুর বেড়ালের প্রতি মানুষের যে দরদ থাকে আমার প্রতি তোমার তাও নেই।"

"আচ্ছা, তুমি আমায় ভালবাসো?"

"অসম্ভব ভালবাসি তোমায়। প্রতি মুহূর্তে তোমার কথা মনে পড়ে, প্রতি মেকেণ্ডে ভাবি তুমি এখন কি করছ, কখন তোমার সংগে আবার কখন দেখা হবে।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। ছেলেরা ক্রিকেট খেলে ফিরছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় একজন বলল, 'প্রেম করা ভাল না। Vitamin B deficiency হয়।' হেসে ফেললাম দুজনে। আমার থেকে বয়স কমই হবে। কিন্তু বলেছে ঠিক।

"সেদিন পাশের বাড়ীর মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে একসঙ্গে চাকরি করছিস্, ছেলেরা কেউ বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি?' বললাম 'আজকালকার ছেলেরা কি কেউ বিয়ে করতে চায়? সবাই চায় বন্ধু জুটতে।"

"কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, তোমরা মেয়েরা কেবল বিয়ে করতেই চাও, ভালবাসতে চাও না। মুখে যতই ভালবাসার কথা বল না কেন। আসল উদ্দেশ্য থাকে বিয়ে করা। ছেলেরা চায় ভালবাসা, তা পায় না বলেই মরা লোটে।"

"বাজে কথা। বরং ছেলেদের ম্যানেই হচ্ছে যাকে ভালবাসবে তাকে বিয়ে করবে না। বিয়েতে নতুন মুখ নতুন শরীর চাই।"

"সত্যি, মাধুকরী বৃত্তি ছেলেমেয়ে দু দলের মধ্যেই আছে। হয়ত ছেলেদের ভেতর একটু বেশী। তার কারণ ছেলেদের প্রত্যাশাও বেশী। তোমাদের কাছে আমরা নতজানু হয়ে বসতেই চাই, তোমরাই দিচ্ছ না। মেয়েরা আমাদের ভালবাসার উপযোগী এখনও হয়ে ওঠেনি বলেই ক্ষণিক আনন্দ খুঁজি। তাছাড়া, ক্ষণিক আনন্দে তোমাদের যে বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা আছে, তা কখনই মনে হয় না। তোমাদের শরীর তো সেতার হয়েই আছে, কখন কোলে তুলে নিয়ে মীড় দেই নিটুর করে, সে প্রত্যাশায়।"

বখন উঠে এলাম, শীতের সন্ধ্যার বিষণ্ণতার আভাস ফুটে উঠেছে।

একবছর পর। ইতিমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন রাস্তায় মুখোমুখি পড়ে গেলাম।

"আরে তুমি! কেমন আছ? কি করছ আজকাল? প্রেম-ট্রেম কিছু হচ্ছে? আশ্চর্য! জানো, আশীষ, তোমাকে না ভুলেই গেছি।"

• • •

অনেকদিন আগের কথা। সারা লণ্ডনে কুয়াসা আর বরফের রাজত্ব, এমন শীত অনেক বছর পড়েনি।

গরীব বস্তীর একটা নোংরা ঘরে রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে মা জেগে বসে আছেন।

ছেলেটি কেবল কাঁদছে! বয়স তের চোদ্দ হবে,—মুখে তার বুলি,—মা, আমি আর বাঁচব না।

মা চোখের জলে ভাসেন, বলেন, ওরে আমার সোনা,—তোর মুখে কবে হাসি দেখব? ডাক্তার বলেছেন,—তোর মুখে হাসি ফুটলেই তুই বাঁচবি।

মায়ের একথা শুনতে পেলেন রাস্তা থেকে এক ভদ্রলোক। দরজায় টোকা মারতেই মা দিলেন দরজা খুলে।

আশ্চর্য। লোকটা ঘরে ঢুকেই এমনই কৌতুকপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলেন, যে ছেলেটি ও হেসেই খুন। মা কৃতজ্ঞচিত্তে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—আপনি আমার ছেলের প্রাণদাতা,—আপনার নামটি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—চার্লস্ চ্যাপলিন,—হেসে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক।

নার্সিং হোম

গোরাচাঁদ নন্দী

[নার্সিং হোম একটি ব্যঙ্গ-রসাত্মক রম্য-কাহিনী। লেখক ডাক্তার গোরাচাঁদ নন্দী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। এই রচনাটি ঘিরে আধুনিক সমাজ বিশেষ করে, চিকিৎসা-সমাজের যে চিত্রটি পরিস্ফুট তা যেমনই উপভোগ্য তেমনই বাস্তব। ডাক্তার নন্দীর রচনায় তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার একটি সুর ধ্বনিত—সে সুরের সঙ্গে পরিচিত আমাদের আধুনিক মন। আধুনিক পাঠক, পাঠিকাদের কাছে এ-লেখাটির মূল্য তাই অকিঞ্চিৎকর হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। সঃ গঃ ভাঃ]

সি. আই ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশন ছিল। বুড়োদের ক্লাব কিনা তাই বক্তৃতার চাইতে চোষ্য চোষ্য লেহ্য পেয়রই ব্যবস্থা বেশী ছিল। কাজেই দিনের শেষে যখন বাড়ী ফিরছিলাম, অন্তর বাহির একেবারে টইটুম্বুর। একা ফিরতেও মন চাইছিল না, সকলকে ছেড়ে। না ফিরেও উপায় নেই, নার্সিং হোমে যেতে হবে। বাড়ী গিয়ে ডাক্তারী পোষাক পরতে হবে। একা একা রাজপুত্তুর আবার কি অপাট করে বসে আছেন সে ভাবনাও ছিল। ড্রাইভার পুরাণ লোক, মনিবকে হাড়ে হাড়ে চেনে, গন্ধ পেলেও হজম করে, কাজেই সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে চেপে বসলাম। গাড়ীটিও অনেকদিনের পুরনো বন্ধু, মায়া পড়ে গেছে—সুখে, দুঃখে সম্পদে, বিপদে—এই আর কি—লোকে অবশ্য বলে হাড় কিপ্পন।

এই সব নানাকথা ভাবতে ভাবতে বুড়ো গাড়ীর সর্দিকাশি, গোঙানি শুনতে শুনতে বাড়ী মুখো রওনা হলাম। সোনারপুরে রাস্তার মোড়ে কামালগাছীর সামনে, বহুদিন থেকে ট্যাক্সিওয়ালারা আর লরীওয়ালারা সু-যাত্রার মানত ক'রে একটা করে পয়সা দিয়ে যায়। যেখানটা প্রকাণ্ড বুড়ীসমেত বটগাছ; সেখানে সব গাড়ীই একটু থামে—পয়সা না দিলেও মনে মনে প্রণাম জানিয়ে যায় এখনো। আমরা যখন পৌঁছালাম সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মুখ বাড়িয়ে দেখি—চাদর জড়ান, চটী পায়ে এক প্রাচীন ভদ্রলোক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। দেখে কেমন চেনাচেনা মনে হল। গাড়ী থামাতে বললাম।

সারাদিন আনন্দে কাটিয়ে মনটা বরাজ ছিল—গাড়ী থেকে নেমে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি কি কলকাতা যাবেন?'

মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলাম। সি. আই-এর কল্যাণে দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে—চিনলাম—আমাদের কমলাকান্ত দাদু।

বললাম, 'দাদু, এমন সময় আপনি এখানে দাঁড়িয়ে? কোত্থেকে আসছেন কোথাইবা যাবেন?'

চুলুচুলু চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তোমায় ঠিক চিনতে পারলাম না ভায়া, তুমি আমাকে চিনলে কি করে? এখনত সব নতুন, আমিও চিনি না, আমাকেও চেনে না। একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তুমি আমাকে চিনলে কি করে ভায়া?'

—'আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, তবে কথা শুনত করেছি, পরীক্ষাও দিয়েছি, আকাশবাণীতেও অনেক শুনেছি—তাই চিনতে পারলাম। তা আমার সঙ্গে আসুন না দাদু, বেড়ানও হবে, আমিও অনেকদিন বাদে আপনার বাণী শুনব।'

—'বাণী! সেটা আবার কি? সব কথাবার্তার ধরণই আজকাল বদলে গেছে—বাংলাভাষাই বদলে গেছে।'

—'দাদু, বাণী হচ্ছে আপনার শ্রীমুখ নিঃসৃত কথা।'

—'বেশ মজার দিয়ে কথা বলতে তোমরা আজকাল ; বলতে বলতে গাড়ীতে উঠে এলেন। ড্রাইভার নিবিকার চোখে দেখল, কিছু বলল না, গাড়ী ছেড়ে দিল—সাহেবের বেয়াল খুশী ওর সয়ে গেছে।

দাদু বললেন—'তোমার নামটী কি ভায়া, পরিচয়টা জেনে নেই।'

নাম বললাম—'বললাম পেশা ডাক্তারী—এদিকে অবশ্য ডাক্তারী করতে যাইনি আজ আমাদের বুড়োদের বৈঠক ছিল—মৌতাতের বৈঠক। মৌতাতও ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। আপনাদের সময় একরকম ছিল—তারপরে আমাদের সময়ে একরকম চল—আজকাল আবার অন্য রকম হয়ে গেছে।'

—'তাইত দেখতে বেরিয়েছি—কতটা বদলেছে—দেশ কতটা এগিয়েছে। শুনেছি আজকাল দেশ স্বাধীন হয়েছে—এখন নিজেদেরই রাজত্ব শুনতে পাই। সত্যতা অনেক এগিয়েছে মেয়েরা এখন চাকরী করছে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পেয়েছে! মেয়েরা এখন আর স্বামীদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। তাদের হাতের পাচণের জোর এখন অনেক বেড়েছে। আরও শুনলাম- এখন নাকি ইচ্ছামত বিয়ে নাকচ করা যায়। একেবারে নাকি বিলেতের মত হয়ে গেছে।'

—'দাদু সবই ঠিক ঠিক শুনেছেন। এবার নিজে চোখে দেখে যান। আপনারা ত ওপার থেকে সবই দেখেছেন। আপনাদের খবর ত আমরা পাই না। আর খবর নেই বা কখন। যা সব সময়ে ছুটতে হচ্ছে—পৃথিবী হু-হু করে ছুটে চলেছে—মানুষ তার চাইতে জোরে ছুটেছে। এখন আয়ুষ্কালটা কাবার যাওয়া যায়—একমাস সময় লাগে না। এই যে গাড়ীতে উঠলেন চোখের পলকে পাঁচকোশ পথ নিয়ে যাবে। আপনার পুরান খবর একটু জানতে ইচ্ছে করে।'

তিনি বললেন, 'কি জানতে চাও বল।'

—'আপনার মৌতাতের কি হল?'

—'ওখানে মৌতাত লাগে না—মনে করলেই মৌতাত। মৌজ হয়ে থাকি।

—'আর দুধ? প্রসন্ন গোয়ালিনী?'

—'ওখানে কামধেনু আছে—দরকার, লাগে না—হাঁ করে গিয়ে দাঁড়ালেই হল।'

—'তা এখানে এলেত মৌতাত লাগবে।'

—'তাইত ভাবছি। এখনকি রকম কি রকম লাগছে। চিনতে যখন পেরেছ, জোগাড় করে দিতে পার।'

—'এখন ঐ মৌতাত পাওয়া বড় শক্ত—হাকিমের হুকুম নিতে হয়—তারপরে পিঁপড়ের সারির মত লাইন দিতে হয়—যেহেতু সোযায় না। তবে নতুন মৌতাতও বেরিয়েছে। এটা অনেক ভাল, দুধ লাগে না, শুধু পিঁপড়ের কামড়ের মত ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেই হল। আমাদের বাড়ী চলুন –দিয়ে দেব পরখ করে দেখবেন।'

—'আচ্ছা, নন্দীভায়া প্রসন্ন গোয়ালিনীর খবর বলতে পার—তাকে ত ওপারে দেখতে পাই না—অনেক দিনের আলাপ,—আপদে-বিপদে অনেক করেছে, খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে।'

—'দাদু আমার যতদূর মনে হয়—প্রসন্ন দিদি এখন আর দুধ বেচে না—কেউই দুধ বেচে না—সরকারই এখন দুধ দেয়—বলে হরিণঘাটার দুধ। দুধের পাউডার আসে বিলেত থেকে—তাই জলে গুলে টোন্ করে দেয়। তাছাড়া গাছের দুধও আছে। প্রসন্নদি বোধহয় এখন সিনেমায় নেবে গেছে। চোখ কপালে তুলবেন না দাদু। আপনাদের সময়কার থিয়েটার আর এখন নেই। থিয়েটারের ছবি তুলে নেওয়া হয়—অন্ধকার ঘরে পর্দায় সেটা দেখান হয়। কথাও শোনা যায়। একবার নাচলেই বহুবার দেখা

যায়। প্রসন্নদিরা সেই পথের পাঁচালী থেকেই চিত্র-তারকা হয়ে গেছেন। অত কষ্ট করে দুধ দুইবারই দরকার কি, বেচবারই বা দরকার কি ?'

—'বেশত খবর শোনালে—তা তারা গাই গরুরা তাহলে এখন কি করছে ? ওরাও, কি কিনে, বললে, সিনেমায় নেমে পড়েছে।'

—'আজ্ঞে ওরা রত্নগর্ভা বলে—কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। ওদের বংশধরেরা এখন কংগ্রেসের অর্থাৎ রামরাজ্যের প্রতীক। লাঙ্গলটানা, গাড়ীটানা, এখন উঠে গেছে—এখন ট্রাক্টার লরী, টেম্পোর যুগ। সবই আপনি আপনি তেলে চলে। গো-জাতিকে এখন দেশ সেবাতেও লাগান হয়েছে—তারা বিদেশে চালান হয়ে—অনেক বিদেশী মুদ্রা আনছে। তাতেও আবার গো-ভক্তেরা মহা গোলমাল, আন্দোলন আরম্ভ করেছে। আর বেশুন দাদু, দুধের ব্যবহারই এখন চলে গেছে—ছোট ছেলেরা এখন আর দুগ্ধপোষ্য নেই—তারা বোতলপোষ্য, ফুডপোষ্য হয়ে গেছে। বুড়োদেরও দুধ খাবার দরকার হয় না—তারা এখন হরমোন্ খায়। আর বলব কি দাদু, আজকাল চিকিৎসাশাস্ত্র কত যে ভাল হয়েছে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। নেহাৎ মরে ঠাণ্ডা না হয়ে গেলে আমরা ছাড়ি না। কেটে ছিঁড়ে সেলাই করে একজনের যন্ত্র আরেকজনের দেহে লাগিয়ে দেওয়া যায়। মৃত্যুহার এত কমে গেছে যে আমরা এখন জন্ম বন্ধ করতে মন দিয়েছি। মানুষ অনেক বেড়ে গিয়েছে কিনা। আরও বেড়ে গেলে পা ফেলবার জায়গা থাকবে না, না খেতে পেয়েই মানুষ মরে যাবে।'

দাদু বললেন—'তাই হবে বোধ হয়। এর মধ্যে যমের বাড়ী একদিন মহা গোলমাল হয়েছে শুনলাম। যম ঠাকুর কাজে ইস্তফা দিয়েছিলেন আর যমদূতেরা ধর্মঘট করেছিল। তখন ব্যাপারটা বুঝিনি, দেবতাদের কথা বলে বেশী আমল দিইনি। এখন মনে হচ্ছে—এই জন্যেই বোধহয় গোলমাল। তোমাদের ডাক্তারী ব্যাপারটা একটু দেখে গেলে হত। মৌতাতের কি উন্নতি হয়েছে তাও শিখে নেব, যমকে কলা দেখানোটাও শিখে যাব। আমাদের কালে বড় বাড় বেড়েছিল। যমকে আর মানুষকে মানুষ জ্ঞান করত না। হ্যাঁ, জন্ম হয়েছিল বটে সাবিত্রী ঠাকরুণের কাছে।'

—'বেশত চলুন না, আগে বাড়িতে গিয়ে আপনার নতুন মৌতাতের ব্যবস্থা করি, তারপরে কলকাতার সেরা নার্সিং হোমে আপনাকে নিয়ে যাই—দেখবেন চিকিৎসা কি রকম উন্নত। মানুষ ভগবানকে ধরে ফেলল বলে। কোন জড়তা নেই, হা হুতাশ নেই, কান্না নেই, অভাব অভিযোগ নেই, ঘড়ির কাঁটার মত চন্দ্র সূর্যের মত কাজ করে যাচ্ছে।'

—'নরসিং আর হোম দুটোই সংস্কৃত কথা—ধর্মমূলক কথা, এর সঙ্গে চিকিৎসার কি সম্বন্ধ আছে বুঝলাম না। নরসিংহ ত মৃত্যুর অবতার আর হোমও পূজোয় লাগে।'

—'শুনতে একরকম হলেও আমি যে কথা বললাম সেটা ইংরিজি কথা। আজকাল বাংলাভাষায় অনেক ইংরিজি কথা ঢুকে গেছে, কাকের বাসায় কোকিলের ডিমের মতন। কথাটার বাংলা মানে হল—যেখানে রোগীর সেবার সঙ্গে বাড়ীর আরামও পাওয়া যায়। হাসপাতালেও চিকিৎসা হয় বটে তবে বাড়ীর আরাম নেই। তাই বড় লোকেরা যারা পয়সা খরচ করতে ভয় পায় না বা হিসাব করে না—তারা এখানে ভাল করে আরাম করে চিকিৎসা করায়।'

—'তাহলে তারা ধনী গরিবের পৃথক্ ব্যবস্থা।'

—'তাত হবেই, চিরকালই আছে। গরীবরা হেঁটে যায়—বড়লোকেরা গাড়ীতে যায়। টাকাই ত

পৃথিবীকে চালাচ্ছে তবে এরও শুধু বেরিয়েছে—এদেশে এখনো আসেনি—তাতে ছোটবড় প্রভেদ ঘুচিয়ে সব একাকার হয়ে যাবে। তার চিহ্ন হল লাল—তাই নাম হয়েছে লালপন্থী। এই মতে সব মানুষই সমান। সকলেই একরকম খাবে, একরকম পরবে। এক ব্যবস্থায় জীবন কাটাবে। লাল দেশে নার্সিংহোম নেই—শুধু হাসপাতাল আছে। আর সেগুলো লোহার নিয়মে বাঁধা।'

গাড়ী থামল—বাড়ি এসে গেছে।

বললাম, 'হাত নেড়ে আসুন, আপনার মৌতাতের ব্যবস্থা করি। পোষাক বদলে চলুন নার্সিংহোমে যাই। আপনারও ত পোষাক বদলাতে হবে।'

দাদু বললেন—'সে কী! আমি পোষাক কোথায় পাব? আমার ধুতি চাদর চটীজোড়া ছাড়া ত আর কিছুই নেই।'

—'তাতে আটকাবেনা, আমি পোষাকের ব্যবস্থা মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। গাড়ীতে আসতে আসতে সে কথা ভাবছিলাম। একে দাদুকাল বলে পরিকল্পনা—পরিকল্পনা ছাড়া আজকাল একপা এগুবার যো নেই।'

—দাদু বললে—'ভায়া সবই বদলে গেছে দেখছি, যেন কোন বিদেশে এসে পড়েছি। চারিদিক এত ভীড় এত হুস্ হুস্ করে গাড়ী ছুটছে—.তামাকে না পেলে ত ওখান থেকেই ফিরে যেতে হত। যাক তোমার পত্নী জাতীয় কি একটা দেখাবে বলছিলে—কই?'

—'পত্নী দেখাব না পরিকল্পনা শোনাব—পরিকল্পনা মানে প্ল্যান। কি করে কি উপায়ে আমরা সব করিটরি মনে মনে ভাঁজছিলাম আপনাকে বলি শুনুন। যেখানে যাব, সেটা সাহেবদের নার্সিংহোম। গোরা সাহেবরা সব এদেশ ছেড়ে চলে গেছে তবু ব্যবসাটা ছাড়েনি—ব্যবসাদারের জাত তো। ব্যবসা দিয়েই সুরু করেছিল—ব্যবসাটা এখনো বজায় রেখেছে। ব্যবসা কোম্পানির লোকেদের চিকিৎসার জন্যে নিজেদের ডাক্তার এনে—নিজেরাই ব্যবস্থা করে রেখেছে। আপনারাও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কথা জানেন। এরাও সেই নাম এখনো চালাচ্ছে। সহরতলিতে বেশ বড় বাড়ী কেঁদেছে, সব রকম সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে—সাহেব ডাক্তার, মেমসাহেব নার্স, হৈ-হৈ ব্যবস্থা। কোম্পানীরাই খরচা চালায়। ইদানীং তাতে খরচা ওঠে না দেখে, দেশী সাহেব মেমদেরও ওখানে যেতে দিয়েছে। সাহেব ডাক্তার মরে হেজে যাবার পর আর কেউই আসতে চায়না—দেশে টাকা নিয়ে যেতে দেয় না কিনা —বেশির ভাগই কেটে নেয়। তাই দেশী ডাক্তারও ওখানে ঢুকেছে। বিলিতি ছাপ মারা দেশী ডাক্তার—বেশির ভাগই তরুণ। আবার কোন কোন দেশী ডাক্তার নামটাকে বিলিতি করে নিয়েছে। আমি মাঝে মাঝে পথ ভুলে ওখানে গিয়ে পড়ি—যখন মেমসাহেব ডাক্তারা কিংবা কোম্পানীর রোগীরা ওখানে ভর্তি হয়। তাই তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তবে সাহেবী জায়গা বলে সাহেবী পোষাকে যেতে হয়।'

দাদু আঁৎকে উঠলেন—'আমি ওসব পারবো টারবো না—কোনদিন আমাই গায়ে দিইনি!—তা তা তোমাদের ঘাঘা গলার সার্ট, প্যান্ট, টাই, গলায় ঘড়ি, এসব পারব না—দম বেটে মরে যাব। তাছাড়া আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, একটা কথা বুঝতে পারবো না, বলতে পারবো না—আদব কায়দা জানিনা—আমাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি বিপদে পড়ে যাবে। হয়ত বা মারধোর করে কোমরে দড়ি দিয়ে কাঁড়িতেই নিয়ে যাবে।'

—'দাদু, আসল কথাই ভুলে যাচ্ছেন যে আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি—এখন ওরাই বাংলা শিখছে—এখন আর গুড্‌মর্নিং, হাডডু করতে হয় না—এখন ওরাই হাত জোড় করে নমস্তে করে। আপনার ভয় কি?

আপনি আমার যেহ্‌মন বাংলায় যাকে বলে অতিথি, আজকাল সবার মুখে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বেরিয়ে পড়ে। আমি আপনার জন্যে যেসব পরিকল্পনা করে রেখেছি তাতে আপনাকে কিছু করতেও হবে না, বলতেও হবে না—শুধু দেখে যাবেন। আগেকার দিনের মত "জবানবন্দীর" কোন ভয় নেই।'

দাদু অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। বললেন,'তুমি যখন ভরসা দিচ্ছ! তোমাকে ত বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছে, অনেক খবরই মুখস্ত করে রেখেছ দেখছি—শুনে বেশ ভাল লাগল। এখন তোমার পরিকল্পনাটা কি তাই বল দেখি।'

—'আসলে আপনাকে একটু অভিনয় করতে হবে—এমন শক্ত কিছু নয়। আপনাকে তুর্কিস্থানীয় পোষাক পরিয়ে নিয়ে যাব। আমার ছেলে, রাজার কাছে আছে—তাদের স্কুলে সম্প্রতি ফ্যান্সি ড্রেস্ হয়েছিল কিনা। ওখানে গিয়ে বলব, আপনি ইস্তাম্বুলের মস্ত বড় ডাক্তার এদেশে এসেছেন কালকে সকালের প্লেনেই ব্যাঙ্ক্ চলে যাবেন। কলকাতার চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখতে চেয়েছেন বলে ওদের নার্সিংহোম দেখাতে নিয়ে এসেছি। দেখবেন ওরা বর্তে যাবে আর দম আটকাবার কথা বলছিলেন—দেখবেন বেশ ঢিলে ঢালা পোষাক কোনই কষ্ট হবে না। কথাবার্তা সব বাংলাতেই বলবেন। ওরাত আর বাংলা জানে না—আমি দোভাষা হয়ে সব ইংরেজী করে বুঝিয়ে দেব। আপনার মৌতাতী চেহারা দেখে ওরা কিছু মনে করবে ভাবছেন? তারও ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি। বলব, আপনার বয়স ১০৫ বছর। শুধু হাসিসের জোরে বেঁচে আছেন। তর সন্ধ্যেবেলা মিছে কথাও বলা হবে না।'

—'সেটা আবার কি? আমার কি রকম সবগুলিয়ে যাচ্ছে ভায়া!'

—'হাসিস্ চিনতে পারলেন না বুঝি মৌতাতের আর এক রকম নাম।'

দাদু এতক্ষণে গুম হয়ে গেছেন—ঘরে ঢুকে, বিচানার ওপর বসতে বললাম। আস্তে আস্তে বললেন—'একটু ভিরিয়ে নিই।'

—'মৌতাতের ব্যবস্থা কি করবে? আর একটু দুধ।'

—'ও মৌতাতে দুধ লাগে না—তাহলেও অভ্যেসমত একটু দিচ্ছি, আধাধটা কিন্তু অশ্বত্থামার পিটুলি গোলার মত হবে—নাক টিপে খেয়ে নেবেন। আপনি একটু বিশ্রাম করুন আমি সব ব্যবস্থা করি।'

রান্নাঘরে গিয়ে নটবরকে এক কাপ চা আর একগ্লাস দুধ। —গোয়ালিনী মার্কাতে গরম জল মিশিয়ে বেশ করে চালা উপুড় করে দিয়ে যেতে বললাম, আর বললাম—'যেখ রাজাবাবুকে একবার ডেকে যে, শিগ্‌গির আসতে বলবি।'

রাজা আমার ছেলের নাম—রাজা হবার সাধও মিটল না তাই রাজপিতা হয়ে সাধ মেটাচ্ছি।

নটবর মুখ টিপে হাসে?

—'কি হল রে হাসছিস্ কেন?'

—'রাজাবাবুর ঘরে পার্টি হউচি দু'তিনটা। দিদিমণি আসুছি, নাচগান হউচি দরজা বন্ধ করুচি।'

—'তোর নিমুচি করুচি—শিগ্‌গির গিয়ে ডাক, বল—বাবু ডাকুচি, চলত আস।'

চা দুধ দিয়ে যাবার আগেই দাদুকে একটা পেথিড্রিন্ ইনজেকসন্ দিয়ে বললাম, 'কি রকম মৌতাত হয় বলবেন।' ছুঁচ ফোটাতে একটু দাঁত মুখ খিঁচুলেন।

—বললাম, 'এইটুকুই লাগবে। এইবারে দুধটুকু খেয়ে ফেলুন। দেখুন না পাঁচ মিনিটেই কেমন মৌজ হয়ে যান।'

দাদুকে ইনজেকসান দিয়ে, দুধ খাইয়ে, পোষাকের চেষ্টায় নিজেই রাজাবাবুর আস্তানায় গেলাম।

এখনকার ছেলেরা অতি বুদ্ধিমান হয়েছে ত! দরজা খোলবার আগেই বললে, 'চেক চাইত। আমি সই করে দিচ্ছি তোমার এত তাড়া দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

বললাম, 'না রে না, দরজাটা খোল একটু অন্য কাজ আছে।'

রাজাবাবু দরজা খুললেন না, ফাঁক করে বললেন—'তুমি যখন তখন বড্ড জ্বালাতন কর বাবা, দেখচ, আমরা এখন ক্যানিভ্যাল্ ড্যান্স প্র্যাকটিস্ করছি।'

অনেক করে ধস্তাধস্তি করে তুকি পোষাকটা আদায় করে ওপরে এসে দেখি দাদু পদ্মাসনে বসে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছেন। ততক্ষণে টেলিফোনটা সেরে নিলাম। নার্সিংহোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্ণেল্ গ্যাণ্টকে ডেকে বললাম, 'আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু অনারেবল্ ভিজিটার ডাক্তার কামাল্-এ-কাণ্ট ইস্তাম্বুল থেকে এসেছেন, অন্ হিজ ওয়ে টু ব্যাঙ্কক। তাকে একবার নার্সিংহোম দেখাতে নিয়ে যাব। তুমি থাকতে পারবে?'

কর্ণেল বললে—'দেখ আজ রবিবার, কাল এলে হোত না—একটু ছুটি উপভোগ করছি।'

বললাম—'তাহলে একটু কষ্ট করতে হবে। মুস্তাফা সাহেব ভোরের প্লেনেই যে চলে যাবেন।'

কর্ণেল বলল—'আচ্ছা, তাড়াতাড়ি এসো।'

বললাম, 'এখুনি যাচ্ছি।'

ফিরে দেখি দাদু পিট্ পিট্ ক'রে তাকাচ্ছেন, বললেন, 'কার সঙ্গে গল্প করছিলে—ইংরেজি বলছিলে বুঝি একবর্ণও বুঝলাম না—মুস্তাফা নাকি বললে। তা তোমার মৌতাতটা মন্দ নয় হে, চট্ করে ধরে, তবে বেশীক্ষণ থাকে না।'

বললাম—'আপনাদের পাকা হাড় কিনা, সাপে কামড়ালে সাপ মরে যায়। এরপরে আর একটু কড়া করে দেব।'

দাদু এইবারে চট্ করে পোষাকটা চড়িয়ে নিলেন। ধুতি চাদর কিছুতেই ছাড়লেন না, তার ওপরেই পায়জামা আর ব্রোকেডের আলখাল্লা চড়িয়ে নিলেন, মাথায় দিলেন ফেজ্ ক্যাপ্। টুপিটা একটু বড় হল চোখের ওপর পর্যন্ত। নাগরা আর কাবুলে দুই মিলিয়ে এক ধরণের জুতো ছিল সেই জোড়াটা পায়ে একটু চিলে হওয়াতে একজোড়া মোটা উলের মোজা পরিয়ে দেওয়া গেল। বললাম, 'একটু নড়েচড়ে দেখে নিন্।'

এদিক ওদিক পায়চারী করে দাদু বললেন—'বেশ সং সাজিয়েছো ভায়া। তবে যাবৎ না ভাষতে—মুখ খুলিব না তাহলেই ধরা পড়ে যাব।'

—'দেখা যাবে, আপনি যা মনে আসে বাংলায় বলবেন, মাঝে মাঝে সংস্কৃত ছাড়বেন. আমি টিপ্পনি দিয়ে ম্যানেজ করে নেব।'

যাবার সময়ে একটা হাতীর দাঁতের ছড়িও দিলাম দাদুর হাতে।

যখন নার্সিংহোমে গিয়ে নামলাম—তখন সবে "নো ভিজিটারস্" টাঙাচ্ছে আর দলে দলে দেশী বিলিতি মেমসাহেবরা বেরুচ্ছে।

দাদু বললেন—'এ কোন পরীর রাজ্যে নিয়ে এলে ভায়া? এত কল্পনা নয় একেবারে বাস্তব পরী।'

—'পরী দেখে ভুলবেন না দাদু—আড়ালেই যম দাঁড়িয়ে হাসছে. ভেতরে গিয়ে দেখবেন—রেশুলার ক্রমে মানুষে লড়াই।'

গাড়ী থেকে নেমে অতি যত্নে ধরে ধরে ডাঃ কাণ্ট্কে নিয়ে চললাম। ফুলের গোছা নিয়ে উবে মালী দাঁড়িয়েছিল, লম্বা সেলাম করল।

গ্যানটক্ সাহেব লিফ্‌টের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। লম্বা চওড়া ফর্সাই চেহারা বিরাট গোঁফ, হাতে ছয় ইঞ্চি লম্বা হোলডারে পাঁচ ইঞ্চি সিগারেট। পরিচয় করিয়ে দিলাম—'কর্ণেল গ্যান্‌টক্—ওস্টর কামাল্-এ-কাণ্ট্।'

দুজনেই সামনে হুয়ে পড়লেন—দাদু মৌতাতের ঝোঁকে একটু বেশী—আমি ধরেই রইলাম।

দাদু, মিটিমিটি তাকিয়ে বললেন, 'কি গোপ রে বাবা।'

আমি ইংরিজিতে বুঝিয়ে দিলাম—'ডাক্তার বলছেন, মনে হচ্ছে আলিবাবার গুহায় এলাম।

গ্যান্‌টক্ সাহেব একগাল হেসে বলল—'থ্যাঙ্ক্ ইউ থ্যাঙ্ক ইউ।'

লিফ্‌টে উঠতে উঠতে কামাল সাহেবের সেন্স ইণ্ডাস্ট্রুস, বংশপরিচয়—কামাল আবুবকের মামতুতো ভাই বয়স ১০৪, হাসিসের কথা সবই বলে দিলাম। এখন পৃথিবীর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। আমার সঙ্গে গ্যালিপোলিতে আলাপ। উনি মেণা সম্বন্ধে স্পেশালিষ্ট। ইংরাজী জানেন না ফ্রেঞ্চ্ একটু একটু জানেন। এসব এক নিঃশ্বাসে বলে গেলাম। তিনতলায় অপারেশন হচ্ছে শুনলাম।

কর্ণেল সাহেব বললেন—'একটা সিজারিয়ান হচ্ছে—দেখবেন চলুনজানালা দিয়ে। এ ডাক্তার আবার বড় কড়া, নতুন শিখে এসেছে কিনা—কাউকে ঢুকতে দেয় না। এর নাম ডাক্তার বন্‌ভ্রু। সম্প্রতি ডিহুভিয়াস্ ইউনিভারসিটির প্রফেসর গোরিলার কাছে কাজ শিখে এসেছে।'

কামাল সাহেব জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন—'আজকাল বাঁদর, হনুমান, গোরিলারাও মানুষ হয়ে গেল দেখছি।'

দোভাষীর ভার ছিলাম—'হেম্যানের মিউজিক হলে একদিন গোরিলাকে ইনি গুডমর্নিং করেছিলেন। ইনি সারা ইউরোপ চষে ফেলেছেন কিনা।'

জানলার ভেতর দিয়ে তিনজনে উঁকি মেরে চলেছি—পেট কেটে ছেলে বার করে ঝোলান দেখা যাচ্ছে।

দাদু বললেন— আলথাল্লারা বাচ্চাটাকে গিলে খাবে নাকি ?'

গ্যানটক্‌কে বোঝাই—'তুর্কীতে ছেলে জন্মালেই আল্লা আল্লা করতে হয় ওঁরা খুব ডিভাউট্ মুসলিম কিনা।'

দেখতে দেখতে অপারেশন শেষ হয়ে গেল—আমরাও সার্জেন্‌রুমে গিয়ে বসলাম।

গ্যান্‌টক্ বললেন—'এক্সকিউজ্ মি, আমি একটু ফোন করে আসি। আপনি ওঁকে একটু এনটারটেন্ করুন।' বুঝলাম উনি এবার কেটে পড়ার তালে আছেন।

দাদু বাকেট চেয়ারে গা এলিয়ে একটা ছবির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন 'আদীৎ কল্যাণকটক-বাস্তব্যো ভৈরব নাম ব্যাধিঃ।'

মনে পড়ে গেল বলেছিলাম মাঝে মাঝে সংস্কৃত ছাড়বেন।

গ্যানটককে বললাম—ওঁর হাসিসের সময় হয়েছে। সঙ্গে আনেননি, ব্যাগেজরুমে ফেলে এসেছেন। জিজ্ঞাসা করছেন গ্যানটক্ কি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে ?'

—'ও ইয়েস্, ও ইয়েস্ আই উইল টাই মাই বেষ্ট্ উইল মরফিয়া ডু ?'

বললাম—'এক রকম করে চালিয়ে দেব—যাবার সময় মেট্রনকে ওষুধ আর সিরিঞ্জ দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।'

দাদুকে বললাম—'দাদু, মৌতাত আছে না চলে গেছে—আমি আবার আনতে বলে দিয়েছি।'

—'বেশ বয়েছ ভায়া, আমিই তোমাকে বলবভাবছিলাম।'

—'আপনি কিন্তু এবার থেকে বেবভাষাটি ছাড়বেন—এখানকার ডাক্তার নার্সরা বাংলা শিখে ফেলেছে।'

বেয়ারা খুব সিরিঞ্জ দিয়ে গেল। চা আনতে গেল। বলল, 'ডাঃ বনস্তরের কাজ শেষ হয়ে গেছে—তিনি আসছেন।'

ডাঃ বনস্তর এলেন—খালি গায়ে তোয়ালে দিয়ে পা মুছতে মুছতে।

দাদুর বিচিত্র পোষাক দেখে বললেন—'হোয়াইস্ দিস্ প্যান্টোমাইন্?'

দাদু ততক্ষণে বিড়িবিড়ি করে বলে চলেছেন—'তোমাদের বাবর ত বেশ সুপুরুষ হে।'

বনস্তরকে বললাম, 'ইনি ডাঃ কামাল-এ-কার্ট্ উস্তাদুল থেকে এসেছেন—আপনার অপারেশন দেখেছেন—আপনাকে বলছেন সুপারম্যান্'। দাদুকে বললাম, 'উনি এখন প্যান্ট্ ছাড়বেন—আমরা একটু আড়ালে যাই বলে ওঁকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। সেখানে রোকেডের ওপর দিয়েই ইন্জেকশন্ দিয়ে দিলাম। একটু ধস্তাধস্তি করতে হল—খানিক দেরী হল।'

দাদু চোখ পাকিয়ে বললেন—'ওষুধটা বড় কড় হে—বড্ড কন্কন্ করছে।'

—'মৌতাতটা কেমন হয়েছে তাই বলুন।'

—'একটু বসি'—বলে কমোডের ওপর বসে পড়লেন। বেরিয়ে এসে দেখি ভোঁতা নাউজে কেউ নেই। ডাক্তার সরে পড়েছে। চায়ের পেয়ালারা ধোয়াটা দেওয়া টিপটের পাশে, দুধের পাত্র আর চিনির পাত্রের সঙ্গে আলাপ করছে।

দাদুকে এনে বাকেটে বসালাম—এক পেয়ালা গরম দুধ খাওয়ালাম।

দাদু একটা মস্ত হাই তুলে বললেন 'মৌতাতটা খাসা হে—এই বেলা চল বেলতলায় যাওয়া যাক।' বুঝলাম নেশা বেশতালুতে চড়ে গেছে।

ফিরে দেখি দাদু বাকেটের ওপর এলিয়ে পড়েছেন—মাথার পেছনে একটা কুশান্ দিয়ে পা দুখানা আর একটা বাকেটে তুলে দিলাম। নার্সিং হোম দেখা মাথায় উঠে গেল। চোখে সরষের ফুল দেখতে লাগলাম।

ইমারজেন্সি এলার্ম বেলটা টিপে দিয়ে—দাদুর কাছেই এক কাপ কড়া চা বানিয়ে গিলে ফেললাম। ঘিয়েটার সিস্টার ছুটে এলে তাকে বললাম—'ওল্ড্ ম্যান, অপারেশান দেখে মাথাটা ঘুরে গেছে—কি করা যায় বলত?'

'ওঁকে অ্যালকহলিক আনোনিমাসে নিয়ে যাওয়া যাক। সে ঘরটা কাছেই সেখানে সব ব্যবস্থা আছে—অক্সিজেন প্রান্তিও আছে।' ধরাধরি করে ডাঃ কামাল এ-কার্ট্কে অ্যালকহলিক আনোনিমাসে নিয়ে গেল।

* * * *

তার পর থেকে আর কোন খবর পাইনি। খবর নেবার অবস্থাও ছিল না কারণ আমার গাড়ী যখন বাড়ীতে এসে পৌছল তখন আমাকেও নাকি ধরাধরি করে তুলতে হয়েছিল। ড্রাইভার বলে সে নাকি সি. আই ক্লাব থেকে অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে সোজাই বাড়ীতে এনেছিলেন।

বিঃ দ্রঃ সি, আই মানে ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা।

মৃত্যুর স্বাদ

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

হ্যাঁ এই জায়গাটিই আত্মহত্যার প্রশস্ত স্থান।

শঙ্করলালের বাড়ি থেকে বেশি দূরের পথ নয়।

শহরতলীর বাইরে গঙ্গা এখানে স্রোতস্বিনী। এইখানে ডুবে মরে কত হতাশ প্রেমিক-প্রেমিকা। হাত দু'খানি পরস্পরের রুমালে বাঁধা।

আর তাই নিয়ে খবরের কাগজের স্তম্ভে সংবাদের কী বিচিত্র পরিবেশনা! এইতো মাত্র কিছুদিন আগেকার ঘটনা, জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সংসার প্রতিপালনে অক্ষম এক প্রৌঢ় তার জীবনের সমস্ত নৈরাশ্যকে আখড়ার কাছাকাছি গঙ্গার এই ঘাটটিই আত্মহত্যার শ্রেষ্ঠ স্থান বলে নির্ধারিত করে নিয়েছিলো। তার আগে আরো কয়েকজন।

অথচ আশ্চর্য,—তবুও পুলিশের তেমন পাহারাদারি-নজর এ জায়গাটিতে নেই।

অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে,—ওখানে এসে দেখ, দেখবে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ দু'একজন নিশ্চয়ই এধারে ওধারে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। শঙ্করলালও ইদানীং আসতে সুরু করেছে।

শঙ্করলাল অবিশ্যি গঙ্গার জলে ডুবে মরে সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে আসে না। আসে অন্য কারণে।

দেনায় জর্জর—জীবনে আর তার কোন স্বাদ নেই। এ-জীবনকে পাল্টে আর এক জীবনে যদি প্রবেশ করা যায়। সে-জীবনে সে আর বঞ্চিত শঙ্করলাল নয়। সে অন্য একজন। অন্য একজন আত্ম-প্রতিষ্ঠায় তৎপর প্রৌঢ়।

দেনাদারের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় তাকে। যে-সামান্য কাজটুকু করে,—আর তার জন্যে তার যে মাস-মাইনে, তার অর্ধেক কাটা যায় কিস্তিবন্দী দেনা পরিশোধে। এই বাগ্যি-গণ্ডার দিনে তাহ'লে সংসার চলে কেমন করে? সংসারের লোক কী তা বোঝে? না, বোঝে না। দাও আরো দাও! যেখান থেকে পারো দাও! না দিতে পারো যদি,—ধার করো। ধার শোধ করতে না পারার লাঞ্ছনা সংসার বুঝতে নারাজ। শক্ত সামর্থ জোয়ান পুরুষ—একটা কাজ কেন, আরো কাজ করো।

না, শঙ্করলালেরও সংসারের প্রতি আর অনুরাগ কিংবা আকর্ষণ নেই।

পয়সা রোজগারের জন্যে নানা পথ সে অবলম্বন করেছে। লটারির টিকিট কেনা, রেসকোর্সের ঘোড়ার টিপ ধরা; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বরঞ্চ এতে কাবুলীর কাছে আরো দেনা বেড়েছে। এখন বাকী শুধু ছুরি ভাকাতি।

একটা মতলব তার মাথায় এসেছে।

সেদিন খবরের কাগজে প্রৌঢ়টির আত্মহত্যার সংবাদই তাকে প্রেরণা জুগিয়েছে।

আচ্ছা, এমন যদি করা যায়! যদি আত্মহত্যাকারীর সঙ্গে বেশভূষা পালটানো যায়! তা হলে তো সে মৃত বলে পরিচিত হবে। তারপর? তারপর আর সে শঙ্করলাল লায়েক নয়। সে আর একজন।

শঙ্করলাল লায়েক মৃত। চব্বিশপরগণার আখড়ার কাছাকাছি গঙ্গায় অমাবস্যার কালো রাতে আত্মহত্যা করে মরেছে।

শঙ্করলালের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দাসী অতঃপর বিধবা। পুত্র-কন্যা জনকহীন। হেমাঙ্গিনী সংসারটি নিয়ে কী করবে? কেন? দাসীবৃত্তি করুক। না হয় আরো সম্মানজনক কাজ করুক না কেন! লোকের বাড়ি ঝিঁঝুনিগিরিতে এখন খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও ভালো মাস-মাইনে পাওয়া যায়। কিংবা স্বামী-স্ত্রীর আধুনিক শহরে ফ্লাটে তত্ত্বাবধায়িকার কাজ করুক।

স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনেই চাকরি-বাকরি করে। ছোট সংসারটি তাদের দেখাশুনা করা, বাচ্চা-কাচ্চাদের সামলানো,—এ-কাজ শহরে আজকাল হেমাশাই মেলে। মেয়েগুলো অভাবের সংসারে যাইহোক কাজ করতে পারে—বেকার ছেলেগুলো ব্লাক মার্কেটে হিন্দি-সিনেমার ছবি বেচতে পারে। পাউরুটির লাইনে দাঁড়িয়ে পাউরুটি সংগ্রহ করে ব্ল্যাকে ছাড়তে পারে।

পারে,—অনেককিছুই পারে।

পারে না কিছু করতে শুধু শঙ্করলাল জীবিত থাকতে।

কিন্তু শঙ্করলাল প্রকৃতপক্ষে না মরেও মরতে পারে।

আখড়ায় গঙ্গার স্রোতে কে তার মৃতদেহ খুঁজে পাবে? শুধু জামা-কাপড়ের একটি অংশ ঘাটের কাছে থাকলেই যথেষ্ট! আর একখানি স্লিপ্: "আমার মৃত্যুর জন্যে সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া আর কেউই দায়ি নয়।" ব্যস্!

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে গঙ্গার এ-ধারটা সত্যিই নির্জন। জলের স্রোতে কালো ছায়া। অন্ধকার শুধু অন্ধকার। কিছুদূরে আখড়ার ইটখোলা। তার পাশে পাশে রাস্তার টিমটিমে আলো। শঙ্করলালের ভয় করে। কাবুলীর শক্ত বজ্র-মুষ্টি অপেক্ষাও কালো অন্ধকার-রাত্রের আক্রমণ যেন আরো ভয়ঙ্কর।

কিন্তু কই? কেউই আসে না এখানে।

অথচ গত সপ্তাহে দু'দুটি আত্মহত্যা এখানেই সংঘটিত হয়ে গেছে। এক ব্যর্থ প্রেমিক প্রেমিকা তরুণ-তরুণী পরস্পরের হাতে রুমাল বেঁধে এখানেই ডুবে মরেছে। তাদের লাশও খুঁজে পাওয়া গেছে। অবিবাহিত মেয়েটি নাকি সন্তান-সম্ভবা ছিলো।

ভীরু, কাপুরুষ! রাগে দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে শঙ্করলালের। পানের লালচে ছোপলাগা দু-পাটি দাঁতে কিসের সংঘর্ষ।

আর একজন প্রৌঢ় গৃহস্থ সংসারী। তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার পরিত্যক্ত কাপড়-জামা দেখে সনাক্ত করা গেছে এইখানে জলে ডুবে দুঃখের জ্বালা থেকে সে রেহাই পেয়েছে। প্রৌঢ়ের তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী প্রৌঢ়েরই এক যুবক আত্মীয়ের সঙ্গে ব্যভিচারিনী হয়েছিলো।

'দূর শালা!—ছোঁড়াটাকে মেরে মরতে পারিস নি!'

শঙ্করলালের জীবনে এ-সব সমস্যা নেই। তার মৃত্যুতে বরঞ্চ সমাজ-বিজ্ঞানীদের চোখ খুলবে। সংবাদসেবীরা দেশের সমাজ-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ধিক্কৃত করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপবে।

শঙ্করলাল মরে বাঁচবে। পাড়ার মুদি, গয়লা, ধোবা,—পাওনাদার দল বেকক—শালারা কাকে ধরবে। কাবুলীওয়ালা শালা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাড়ার মোড় আগলে থাকুক দাঁড়িয়ে।

হেমাঙ্গিনী জোয়ান মদের বাহাদুরী দেখে যাক্ না কেন চমকে ! শঙ্করলাল কী আর এ-তল্লাটে থাকবে ?

এ-সপ্তাহের প্রথমদিকে যে-প্রৌঢ়টি অফিসের কাজ থেকে সদ্য রিটায়ার করে দেনা জর্জর জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে ভাগীরথীর এই ঘাটেই আত্ম-বিসর্জন দিয়েছে,—যার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সবাই 'হায়' 'হায়' করেছে—শঙ্করলালের কাছে সেই বয়স্ক আদর্শ পুরুষ।

কিন্তু শঙ্করলালের পন্থা ভিন্নতর। মরে গিয়ে আত্মহত্যা নয়,—বেঁচে থেকে আত্মহত্যা।

অন্ধকারে কার যেন ছায়া দেখা যায়।

শঙ্করলাল এগিয়ে যায়।

আখড়ার রাস্তার আলোর একটু বিচ্ছুরিত রেখা। অস্পষ্ট হতে স্পষ্ট করে এইবার চেনা যায় মূর্তিটিকে।

একটি নারী তারই দিকে এগিয়ে আসে। কিন্তু চোখে-মুখে এ কী ভাব তার ? বেশভূষায় এ কীসের ইঙ্গিত ? এতো জলে ডুবে মরার মতন মেয়ে নয়।

শঙ্করলাল থম্‌কে দাঁড়ায়।

'এসো না বাবু !'

মেয়েটি কণ্ঠের সম্ভাষণে শঙ্করলালের বুক টিপটিপ করে ওঠে।

'কোথায় যাবো ?'

'কাছাকাছিই আস্তানা আছে।'

'মানে ?'

শঙ্করলালের চোখের দিকে চোখ রেখে মেয়েটি বললে 'আহা, যাদুসোনা আমার, যেন কিছুই জানেন না। ন্যাকা ! তাজা মাছটাও উল্‌টে খেতে শেখেন নি যেন !'

শঙ্করলাল বিমূঢ় হয়ে পড়ে। যেখানে লোকে মরতে আসে সেখানে একী জীবনের আহ্বান ?

'বেশি লাগবে না। পাঁচটি টাকা দিও !'

'পাঁচ টাকা ?'

'হ্যাঁ গো নাগর, হ্যাঁ, মাগ্যি-গণ্ডার দিনে পাঁচটাকা আবার টাকা নাকি ?'

কিন্তু শঙ্করলালের পকেটে কী পাঁচ টাকা আছে ?

না, নেই। শঙ্করলাল দ্রুতপদে এগিয়ে চলতে চায়। মেয়েটি কাংসকণ্ঠে বলে, 'পালালে চিৎকার করে লোক জড় করবো কিন্তু ! পাঁচটাকা না দাও এইখানেই না হয় এসো। একটু কাছাকাছি বসা যাবু ! দু'টাকায় হবে।'

'দু'টাকা ?'

'হ্যাঁ, দু'টাকা।'

না, দু'টাকা খেসারৎ দেওয়ার সামর্থ্যও শঙ্করলালের নেই। অগত্যা শঙ্করলালকে ছুটে পালাতে হয়।

'ছুরো।'

কাংস-কণ্ঠের তীর্যকধ্বনি পিছন থেকে শোনা যায় শুধু।

এ-ঘাট ছেড়ে অন্য ঘাট।

আখড়া থেকে আরো দক্ষিণের শহরতলী আরো নির্জন। অমাবস্যার অন্ধকার রাত। অন্ধকারের কামড় সর্বাঙ্গে শঙ্করলালের।

এ-ঘাটও জনবিরতিপূর্ণ নিঃসাড়। শুধু স্রোতোদ্বিনা অমাবস্যার জোয়ারের ডাক।

ঘাটের সিঁড়িতে দুটি ছায়ামূর্তি। পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যরত। মৃত্যু? না জীবন?

শঙ্করলাল কী দার্শনিক হয়ে উঠছে?

না, একটা মতলব তাড়াতাড়ি তার মাথায় এসে গেলো। ছায়ামূর্তি দুটির সামনে এগিয়ে এসে সে বড় গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দিলে, 'কী হচ্ছে?'

ছেলেটি এবং মেয়েটি দু'জনেই চমকে উঠলো।

'কে?'

'থানায় চলো। সেখানে গেলে জবাব পাবে— কে?'

'মানে?' ছেলেটি ঘুঢ় হতে চাইলে।

শঙ্করলাল বললে, 'মানে আবার কী?'

'থানায় যাবো কেন?' ছেলেটি এবার একটু ভয় পেয়েছে।

মেয়েটি স্খলিত বেশ-বাস সংযত করে নিয়ে পাশে একটা গাছের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

শঙ্করলাল দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'মেয়েটি তোমার কে হয়?'

'আমার স্ত্রী!'

'স্ত্রী?'—একটা অশ্লীল গালাগাল মুখ থেকে বার হলো শঙ্করলালের।

'খবরদার!' ছেলেটি রুখে উঠলো।

শঙ্করলালের রোখ চেপে গেলো। সজোরে সে তার জামার কলারটা চেপে ধরলে। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে একটু এগুতে মেয়েটি ও-পাশের গাছের অন্ধকার ছায়ার কাছ থেকে এগিয়ে আসতেই শঙ্কর লালের দৃষ্টি পড়লো তার মুখের দিকে।

এ কী?—শঙ্করলাল কী জীবিত?

'পাচি,—তুই এখানে?'

'হ্যাঁ বাবা, রতনকে তুমি চিনতে পারছো না। ওকে ছেড়ে দাও। ও আমার স্বামী। আমরা গঙ্গা-সাক্ষী করে দু'জনে দু'জনকে বিয়ে করেছি।'

শঙ্করলালের হাত স্খলিত। তার বজ্রমুষ্টি আর নেই।

ও-পাড়ার রতনলাল। ইট খোলার ম্যানেজারের ছেলে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। ছেলেটি তাদের বাড়ি আসে। সময় অসময়ে তাদের পরিবারের দেখাশুনোও করে বটে। তবে জাতিতে ভিন্ন।

শঙ্করলাল কী সত্যিই এবার জলে ডুবে মরবে?—না, মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘরে ফিরবে?

ধর্মঠাকুরের কাহিনী

ডক্টর অমলেন্দু মিত্র

ধর্মঠাকুর রাঢ় অঞ্চলের প্রধান গ্রামদেবতারূপে পূজিত হন। এই দেবতার পূজাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করলে ধর্মঠাকুরের অবৈদিক স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কালেকালে বৌদ্ধ এবং আর্যধর্মের প্রলেপ পড়ার ফলে ধর্মঠাকুর এক মিশ্র দেবতা বলে প্রতীয়মান হন। মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার যুগে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য আরও বেশী করে কীর্তিত হতে থাকে এবং তিনি আদিদেব নিরঞ্জনে পরিণত হন। ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে লাউসেন ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী সুবিদিত এবং বহুল প্রচারিত ও আলোচিত বস্তু; যদিও এই কাহিনীদ্বয়ের ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি পাওয়া যায়নি। নিছক কাহিনী রূপেই এই প্রবাদগুলির স্থান। তবে এগুলির সাহিত্য মূল্য নিশ্চয়ই আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ব্যাপক প্রচার ও ব্যাপক হারে বিভিন্ন কবির কাব্য রচনার ফলে এককালে বাংলাদেশে ধর্মঠাকুর বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন। পাঁচশো থেকে দুশো বছর আগে পর্যন্ত এই পূজার পর্যাপ্ত প্রসার ঘটেছিল বলে মনে করা যেতে পারে। এর আগে ধর্মঠাকুরের পীঠ বা মন্দির নির্মান করে পূজা হত তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাঢ় অঞ্চলে বহু গ্রাম আমি ঘুরেছি, তার থেকে এই বিশ্বাস করার মত কারণ আমি পেয়েছি যে আদিম অনগ্রসর সমাজে অনাবৃষ্টির দেবতারূপে এবং সূর্যের প্রতীকরূপে ধর্মঠাকুরের পূজা হত আকারহীন শিলাখণ্ড ব্যবহার করে। কেউ rain charm হিসাবে ব্যবহার করত সূর্যকে। ভিন্ন ভিন্ন অনুন্নত জাতি মিলে ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসব পালন করার ফলে ভিন্ন ভিন্ন যাদুবিশ্বাস এসে ধর্মঠাকুরের পূজায় মিলিত হয়েছে। তারপর স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমাজের হাতে ধর্মপূজা গৃহীত হওয়ার পর থেকে বহুবিধ কিংবদন্তী ও কাহিনী ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে জন্মলাভ করেছে। এই সব কিংবদন্তী সংগ্রহ ও প্রকাশ হয়নি। আমি রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজাবিধি সংগ্রহ সম্পর্কে পর্যটনকালে কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করেছি। তার কয়েকটা প্রকাশ করছি—

সুরথ রাজা ও ধর্মঠাকুর

(গ্রাম তাতুলিয়া, থানা খয়রাশোল, জেলা বীরভূম থেকে সংগ্রহ)

বর্তমান বোলপুর গ্রামের পূর্বনাম ছিল বলিপুর। এই গ্রামে রাজা সুরথ বেরী দুর্গার পূজা করেন লক্ষ ছাগ বলিদান সহ। সুরথের প্রাসাদ ছিল নিকটস্থ সুপুর গ্রামে। (এই গ্রাম এখনও আছে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুরথেশ্বর শিবমন্দির এবং সুভিক্ষা দেবীর মন্দির বর্তমান। দুইটি মন্দিরই সুউচ্চ ঢিবির উপর অবস্থিত। অনুমান করা যেতে পারে প্রত্নতত্ত্বগত দিক থেকে স্থানগুলি মূল্যবান) সপ্তমী থেকে

অষ্টমীর দিন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে ঘাতক নিযুক্ত করে তিনি ছাগ বলি দেন। ঠিক অষ্টমীর মধ্যাহ্নে ছাগ মুণ্ডটা, ধাড়া স্বর্ণময় হয়ে ওঠে এবং দেবী দুর্গা সশরীরে আবির্ভূতা হন। তিনি রাজার উপর তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। রাজা এই বর প্রার্থনা করেন যে, তিনি যখনই দেবীকে স্মরণ করবেন তখনই যেন দেবী প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে রাজার কর্ম সিদ্ধ করে যান। দেবী, "তথাস্তু" বলে অন্তর্হিতা হলেন। সেইদিন রাত্রে রাজা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন যে লক্ষ ছাগ লক্ষ খড়্গ নিয়ে তাঁকে বধ করবার জন্য ছুটে আসছে। তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে মা, মা, বলে চীৎকার করতে থাকেন। দেবী আবির্ভূতা হয়ে স্মরণের কারণ জানতে চাইলে রাজা বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। দেবী বলেন, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু লক্ষ ছাগ হত্যার জন্য লক্ষ জন্ম তোমাকে ছাগলের হাতে বধ হতে হবে। কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। তবে আমার বরে এক জন্মেই তুমি মুক্তি পেতে পার যদি আমার আদেশমত কর্ম কর। রাজা সম্মত হলেন। দেবীর ইচ্ছায় রাজা লক্ষ হাত দীর্ঘ হলেন। একলক্ষ ছাগ একহাত অন্তর তাঁকে বলি দিয়ে রাজাকে পাপমুক্ত করল। এই লক্ষ বলির জন্য বলিপুর বা বোলপুর নাম হয়েছে। বোলপুরের সন্নিকটে অজয় নদীর তীরে দেওলি নামক স্থানে অদ্যাবধি দুর্গাদেবীর ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি বর্তমান। কিংবদন্তী এই যে কালাপাহাড় এই দেবী মূর্তি ধ্বংস করেন। সুরথ নাকি এই দেবীরই পূজা করেছিলেন। (বর্তমান দেওলির দুর্গামূর্তি প্রায় ছয়ফুট একটি দেওয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে আরও কতকগুলি মূর্তি তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শুরুসদয় দত্ত মশাই নিয়ে গেছেন। দেওলিতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ সভ্যতার নিদর্শন পেয়েছেন। উক্ত দুর্গামূর্তিটির বয়স অন্তত হাজার বছর।)

এখন সুরথ রাজার আটজন ঘাতক মায়ের কাছে করজোড়ে নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করে, আমরা আট ভাই ঘাতকের কর্ম করেছি, আমাদের মুক্তির উপায় কি? এই আট ভাই-এর নাম—ধর্মরায়, কালো রায়, চাঁদরায়, সিন্দুর রায়, রাজ রাজেশ্বর রায়, বুড়ো রায়, বাঁকা রায় ও শ্যাম রায়। দেবী তাদের বর প্রদান করেন যে কলিযুগে তোমরা নীচ লোকদের দ্বারা পূজিত হবে এবং মদ্যমাংস ও অনার্য জাতির ভোজ্যবস্তু তোমাদের আহার হবে। সেই অবধি নাকি নীচে লোক তাদের পূজা করে আসছে। ঐ আটজন ঘাতক রায় বংশসম্ভূত এবং তারা নানাস্থানে নিজ নিজ নামে পরিচিত এবং পূজিত। সুপুর গ্রামে সুরথ রাজা সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রবাদ চলতি আছে—রাজা সুরথ নিজ রাজ্য বিস্তার করে বহু লোক হত্যা করেন। পরে একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, কে তাঁকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাচ্ছে এবং পথি মধ্যে সহস্র সহস্র নরকঙ্কাল তাঁকে একযোগে তাড়া করছে। এইরূপ স্বপ্ন দর্শনে তিনি বড়ই ভীত হন এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুর্গাপূজা করে লক্ষবলি দেন। এরপর তিনি স্বপ্ন দেখেন যে তিনি সশরীরে স্বর্গযাত্রা করছেন; কিন্তু মধ্যপথে লক্ষ লক্ষ বলি প্রদত্ত জীব প্রাণবন্ত হয়ে তাঁর পথ অবরোধ করে তরবারির আঘাতে তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্যুত করছে। শেষ পর্যন্ত তিনি দেবীর অনুগ্রহে স্বর্গযাত্রা করেন। আটজন ঘাতকের কথা আর কোনো প্রবাদে পাওয়া যায় না।

খুজুটিপাড়ার খুজুটেশ্বর (থানা নাহুর)

খুজুটিপাড়ার অধিকাংশ স্থানই প্রাচীনকালে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একটি সুপ্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ সেই জঙ্গলের শেষ চিহ্নস্বরূপ এখনও বিদ্যমান আছে। নিকটেই ধর্মঠাকুরের পূজার সাবেক আটন। তার চিহ্ন এখন নেই। সেখানে একটি নিমগাছ ও অন্যান্য লতাগুল্ম জড়াজড়িভাবে বিদ্যমান। কিংবদন্তী আছে যে বর্তমান দেয়াশীর পূর্বপুরুষ একজন বণিক নুন মশলা ইত্যাদি মাথায় নিয়ে গ্রামে গ্রামে বিক্রী করতেন। একদিন সেই জঙ্গলের পথ অতিক্রমকালে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁকে কলা ও চিঁড়ের জন্য অনুনয় করেন। বণিক কলাকে অযাত্রা জ্ঞান করে রুষ্ট হয়ে ওঠেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ জানান যে তাঁকে তুষ্ট করলে বণিক লাভবান হবেন। বণিক পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করতে বলেন। সেদিন প্রচুর বিক্রী হওয়া সত্ত্বেও বণিকের মাল পূর্ববৎ মজুত রয়েছে দেখে বণিক কলা চিঁড়ে এনে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করেন। কলা চিঁড়ের সঙ্গে মিষ্টান্ন আনা হয়নি। ব্রাহ্মণ মিষ্টান্নের ইচ্ছা প্রকাশ করায় বণিক কিছুটা লবণ চিঁড়ায় দিয়ে সেবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণ বললেন ; "নুন দিয়ে আমাকে বন্দী করলি।" দিন কয়েক পর ব্রাহ্মণের উপর স্বপ্নাদেশ হয়, "আমি ধর্মরাজ। এখানে আবির্ভূত হলাম, তুই আমাকে সেবা কর।" তারপর বণিক ঐ স্থান থেকে পান একটি কূর্মমূর্তি ও একটি শালগ্রাম শিলা।

এরপর একটি ঘটনা ঘটে। নিকটবর্তী নবগ্রাম গ্রামের কোনো প্রভাবশালী মুসলমানের একটি কপিলা গাভী প্রত্যহ দেবতার কাছে ক্ষীর ধারায় শিলাটিকে নিষেক করত। একদিন মুসলমান ব্যক্তি সেই সংবাদ পেয়ে গাভীটিকে ঐ স্থানেই হত্যা করে। ফলে শিলাখণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। স্বপ্নাদেশে দেবাংশী জানতে পারেন 'বড়া' গ্রামে এক মোড়লের বাড়ীতে দেবতা খুদের হাঁড়িতে অবস্থান করছেন। সেখানে এসে তত আবেদন নিষ্ফল হওয়ায় সেখানকার জমিদারের শরণাপন্ন হন। জমিদার প্রমাণ চান যে ধর্মঠাকুর প্রকৃতই তাঁর। দেবাংশী স্নানান্তে আঁচল পেতে ঠাকুরকে আহ্বান করায় ধর্মঠাকুরের শিলা হাঁড়ি থেকে লাফিয়ে উঠে আঁচলে আসেন। এই অভাবনীয় ব্যাপারে জমিদার চমকিত হয়ে ওঠেন এবং তিনি দেবাংশীকে বলেন যে তাঁর কুষ্ঠ ব্যাধি যদি আরোগ্যলাভ করে এবং স্বহস্তে লিখবার শক্তি পান তবে একরাত্রিতে তপশীল চৌহদ্দীর যত বিঘা ভূসম্পত্তি লিখতে পারবেন, তাই দান করবেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় জমিদার রোগমুক্ত হন এবং ১০৮ বিঘা জমি লিখে দেন। তখন থেকে বড়া গ্রামে উক্ত দেবোত্তর আয় থেকে পূজাদির ব্যয় নির্বাহ হয়।

বড়া গ্রাম থেকে জানতে পারা যায় যে মুসলমান রাজত্বের প্রথমদিকে ধর্মঠাকুর নিজেই খুজুটিপাড়ার পাট ছেড়ে এসে উপস্থিত হন এবং এক সদ্গোপের বাড়ীতে খুদের হাঁড়িতে লুকিয়ে থাকেন। এরপর খুজুটিপাড়ার দেবাংশীরা সংবাদ পেয়ে তাঁদের ঠাকুর নিয়ে গেলেও মূল পূজা বৈশাখী পূর্ণিমা ও নবান্নের সময় বড়ায় আসেন।

ঐসময় বড়া গ্রামের জমিদার ছিলেন এরুয়ালির (মুর্শিদাবাদ) রায়চৌধুরী বাবুদের পূর্বপুরুষ। তাঁর কাছে ধর্মপূজার সুষ্ঠু বন্দোবস্তের জন্য চাটুয্যেরা আবেদন করলে জমিদার ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য পরীক্ষার জন্য বলেন, এক কলম কালিতে যাদের যত চৌহদ্দী ভূসম্পত্তি লিখতে পারবে, তাই পাবে। শতাধিক বিঘা চৌহদ্দী লেখা হওয়ার পর জমিদারবাবু লেখকের হাত চেপে ধরেন।

রায়রামেন্দ্রপুরের কাহিনী (জেলা বর্ধমান)

বহুকাল পূর্বে ঐ গ্রামে মুচিপাড়ায় ছেলেরা মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রবালের মত রক্তবর্ণ একটি শিলাখণ্ড পায়। তারা এক দোকানে ঐ পাথরটির পরিবর্তে মিষ্টান্ন প্রার্থনা করে। দোকানীও পাথরের ওজনের অনুরূপ মিষ্টি দেবার জন্য পাল্লায় মিষ্টি চড়াতে থাকে। কিন্তু ঐ পাথরটির ওজন এত বেশী ছিল যে প্রচুর মিষ্টান্ন চড়িয়েও পাল্লা সমান করা গেল না। তখন দোকানী গ্রামের প্রধানদের নিকট গিয়ে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করে। তাঁরা তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে এসে ঐ অভিনব প্রস্তরখণ্ডটির অলৌকিক মহিমা দর্শন করে বিস্মিত হন এবং ঐ স্থানেই ধর্না দেন। ভোররাত্রে সকলে স্বপ্ন দেখেন বিগ্রহের মধ্য হতে আশ্বাঢ় এক অমিততেজা দেবমূর্তি নির্গত হয়ে তাঁদের বলছেন, অভিনব বলিদানে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।

সেই থেকে রায়রামচন্দ্রপুরে একটি খুঁটায় একসঙ্গে নয়টি, তারপর আটটি, তারপর সাত এইভাবে ক্রমান্বয়ে বলি দেওয়া হয়। বলিদানের এই তাণ্ডবতা দেখবার জন্য ধর্মপূজার সময় বহু দূর দূরান্তর থেকে শত শত দর্শক সমবেত হয়ে থাকেন।

গত সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী

'ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদনায় বাঙালী মনীষীবৃন্দ'

এই রচনাটি অনিবার্য কারণে এ সংখ্যায় দেওয়া গেল না—

আগামী সংখ্যায় (মাঘ) প্রকাশিত হবে।

রত্নাকর

নাট্যকলার উন্নতির সঙ্গে জাতীয় জীবন জড়িত। জাতির উদ্ভবের সঙ্গে নাট্যকলার উদ্ভব হইয়াছে, জাতীয়ত্বের প্রথম পবিত্র সমুজ্জ্বল বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-সাহিত্য কুসুমও দেশব্যাপী সৌরভ লইয়া বিকশিত হইয়াছে।··· নাটক ও নাটকাভিনয় একরূপ অভিন্নাত্মক। নাটক ক্রিয়াচিত্র। নটচর্যায় সেই ক্রিয়াচিত্রের উপলব্ধি।···জাতীয়তাবোধকে উদ্বুদ্ধ করিতে নাটকের শক্তি ও আবেদন অপরিসীম। আমাদের দেশের নাট্যশালায়, যাত্রায়, কবিগানে জাতীয়তাবোধক সুর শোনা গিয়াছে এবং সেই সুরে দেশ মাতিয়াছে—এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাট্যশালার বিশেষ ভূমিকা আছে।

ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

নাটক ও নাট্যশালার সংগ্রামী ভূমিকা

॥ নাট্যকার মন্মথ রায় ॥

দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন আমাদের দেশের প্রতিটি নাট্যকার সুযোগ পেলেই পর-শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছেন। প্রতিটি নাট্যশালা দেশপ্রেম জাগ্রত করার মত নাটক অভিনয় করে দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নাটক ও নাট্যশালার এই গৌরবোজ্জ্বল অবদান অবিস্মরণীয়। সেটা ছিল রোমান্টিক নাটকের যুগ। স্বাধীনতা লাভ করার পর আজ আমাদের নাটক ও নাট্যশালা রোমান্টিকধর্ম পরিত্যাগ করে বাস্তবানুগ ও সত্যনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। নাট্য-সাহিত্যের এবং নাট্যপ্রয়োগ-রীতির এটা স্বাভাবিক বিবর্তন। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যে সমাজব্যবস্থা আজ প্রত্যক্ষ তাতে ভীত চকিত এবং চমকিত হচ্ছি অহরহ। এই কী আমাদের সেই স্বাধীনতার স্বর্গ? যে স্বর্গের ধ্যান করেছিল কোটি কোটি ভারতবাসী? এই কী সেই ধ্যানের ভারত, কল্পনার কল্পলোক?

স্বাধীনতার পর বিশটি বৎসর অতিবাহিত হতে চলেছে, কিন্তু এই বিশটি বৎসর আমাদের কী দিয়েছে? দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, বেকারসমস্যা—একি দূর হয়েছে? হয়নি, বরং বেড়েছে। তা দূর করবার চেষ্টা হচ্ছে না, একথা বলতে চাই না, কিন্তু সে চেষ্টার ফল যা হয়েছে তাতে দেখছি দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে, ধনী হচ্ছে আরও ধনী। কোনো একটা গলদ কোনোখানে লুকিয়ে রয়েছে যার ফলেই এই অঘটন ঘটন হচ্ছে। দোষ কার এবং কোথায়, এটা বিবেচনা করে দেখতে গেলেই মনে হবে প্রকৃত গলদ রয়েছে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। কিন্তু তাই বা বলি কেমন করে! রাষ্ট্র তো আজ লোকায়ত্ত। আপনার আমার ভোটেতেই গড়ে উঠেছে আমাদের রাষ্ট্র। আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করার জন্য যারা নির্বাচিত হয়েছেন, (এই সেদিন যারা নির্বাচিত হলেন) আমাদেরই ভোটে তাঁরা সেই দায়িত্ব লাভ করেছেন। সুতরাং যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো হবে সেই সরষেতেই যদি ভূত থাকে—তবে তার এই বিষময় ফলই অনিবার্য। আজ আমাদের দেশের গোটা সমাজই ভূতগ্রস্ত। মোহাবিষ্ট এই সমাজকে, আত্মচৈতন্যলুপ্ত এই সমাজকে প্রকৃতিস্থ করতে হলে যে চিকিৎসা আবশ্যক, ব্যাপক শিক্ষাই হচ্ছে সেই চিকিৎসা।

স্বাধীনতা লাভের পর এই বিশ বৎসর আমাদের ভাত কাপড়ের সমস্যা দূর হয়নি এতে আমি শঙ্কিত নই। একটা জাতির জাগরণের পক্ষে, জাতীয় জীবনকে মহাজীবনরূপে গড়ে তোলার পক্ষে বিশ বৎসর এমন কিছু বেশী সময় নয়। শঙ্কা সেখানে নয়। শঙ্কা সেইখানে, যেখানে দেখি আজ আমাদের জীবন থেকে দেশাত্মবোধের বিলুপ্তি ঘটেছে। তা যদি না হ'ত তবে কেন আজ সব খাদ্যেই, এমনকি ওষুধেও ভেজাল, কেন এতো কালোবাজার, কেন স্বার্থপর ব্যবসায়ীর চক্রান্তে কৃত্রিম অনটন সৃষ্টি? শঙ্কা সেইখানে, যেখানে দেখি আমাদের জীবন থেকে জীবনাদর্শ ক্রমে ক্রমে সরে যাচ্ছে। শঙ্কা সেইখানে, যেখানে দেখি আমরা জীবন ধারণের মূল ভিত্তি, নীতিবোধ, সত্যবোধ বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতি ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করছি, বঞ্চনা ও আত্ম-প্রবঞ্চনাকে বরণ করছি। এই মোহান্ধ সমাজে আমরা যখন সংস্কৃতি ও সভ্যতার বড়াই করি তা যেন 'ভূতের মুখে রাম-নামের' মত শোনায়। এমন একটি যুগ সন্ধিক্ষণে আমরা এসে পড়েছি যখন রবীন্দ্রবর্ণিত 'সভ্যতার সংকট' পুনরায় ভিন্নরূপে দেখা দিয়েছে। শিক্ষার প্রসারই এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায়। কিন্তু স্বাধীন ভারতে শিক্ষার জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয়িত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিতের সংখ্যা এখনও নৈরাশ্যজনক এবং নগণ্য। জনশিক্ষার আর একটি ধারক ও বাহক নাটক ও নাট্যশালা। আজ তাই একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই নাটকের যে নাটক চোখে আঙুল দিয়ে দর্শককে দেখিয়ে দেবে, আমরা আজ কোথায়। জাতীয় সংকটে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা চিরদিনই এগিয়ে এসেছে পথ নির্দেশ করতে। তাই আজ আবার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই নাটক এবং নাট্যশালার, যা শাণিত বাক্যে, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বা বলিষ্ঠ বিদ্রোহে জ্ঞানাঞ্জন শলাকারূপে এই মোহগ্রস্ত সমাজকে আত্মচৈতন্যালোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। তাতে যদি আমাদের নাটক প্রচারধর্মী হয়ে যায়, তা হোক। জাতি বাঁচলেই তবেই আর্ট। আর এ আশাই বা কেন করব না, যদি ইবসেন, বার্ণাড-শ, গিল্স, ওকে-সী, ব্রেখট প্রভৃতি নাট্যকারগণ প্রচারধর্মী নাটক রচনা করেও মহৎ নাটক সৃষ্টি করতে পারেন, তবে বাংলা নাটকেও তা সম্ভব হবে না কেন একদিন?

• • •

বাঙালীর জীবনে জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ১৮৬৭ সালে প্রবর্তিত হিন্দু মেলায়। এই মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন চিন্তানায়ক নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

স্বদেশী শিল্প সংস্কৃতি, চিন্তা ও মনীষাকে উৎসাহ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই মেলার উদ্দেশ্য। এই মেলায় দেশের নানাপ্রান্ত থেকে আসতেন শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, মল্লযোদ্ধা, জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক মনীষী। তাঁদের এই মহান মিলনে চিত্তের আদান প্রদানে সাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, সাধারণ মানুষ আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছিল। এই মেলায় ১৮৭৩ জাতীয় নাট্যশালার অভিনেতৃগণ "ভারতমাতার বিলাপ" নাটকের অভিনয় করেন। তদানীন্তন অমৃতবাজার পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, অভিনয় দর্শনে "শ্রোতৃবর্গমাত্র অশ্রুপাতন করেন।"

১৮৭৭ সালে জাতীয় মেলায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ যে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সেটি বিশেষ মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাটির আবেদন এত গভীর হয়েছিল যে পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ তাঁর স্বপ্নময়ী নাটকে কবিতাটির 'বৃটিশ' শব্দ স্থলে 'মোঘল' লিখে সম্পূর্ণ কবিতাটির ব্যবহার করেন।

১৮৭৭ সালে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড লিটন দিল্লীতে দরবারের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে শিক্ষিত সমাজের অনেকে আনন্দে অধীর হোয়ে পড়ায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ বেদনাহত চিত্তে এই কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটির কিছু উদ্ধৃতি গ্রহণ করলে আমরা সেদিনের রবীন্দ্রনাথের মনকে অনুসরণ করতে পারবো—

এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরী স্বর্ণ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়ধ্বজা
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা!
বৃটিশ রাজ্যের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া বৃটিশ চরণে লোটাতে শির
ওই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর।

প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি অক্ষরে প্রবাহিত জাতীয় অবঃপতনের মর্মস্পর্শী বেদনা।

১৯০৩ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটকের জোয়ার এসেছিল। নাট্যকাররা যে প্রায় সকলেই দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তার পিছনে নাট্যশালাগুলির মালিক ও অধ্যক্ষদের দানও কম ছিল না। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নাট্যপ্রযোজনা করলেও মালিক বা লেসীরা সাধারণের দাবীকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁদের এই কাজ দুঃসাহসিক ছিল এই জন্য যে, যেকোন সময়েই তাঁরা রাজরোষে পড়ে দণ্ডিত হোতে পারতেন। ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকাও ছিল। তৎসত্ত্বেও কলকাতায় এই দশকে দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। মিনার্ভা, ক্লাসিক, গ্র্যাণ্ড, কোহিনুর, স্টার প্রভৃতি থিয়েটারে সিরাজদ্দৌলা,

মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, মেবার পতন, দুর্গাদাস, চাঁদবিবি, পলাশীর প্রায়শ্চিত, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ অভিনীত হতে থাকে। প্রহসন রচনার মধ্যেও এই জাতীয়তা বোধের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙালী'-তে চরকা, বিলাতি বর্জন, স্বদেশী প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

জনজাগরণে জাতীয় নাট্যশালা

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি জীবনে যাকিছু করেছি, দেশমাতৃকার সেবার জন্যেই করেছি। দুর্বৃত্ত দলিত দেশের বেদনায় আমি মর্মাহত হয়েছি, তাই আমি চেয়েছি নাটকের মাধ্যমে, মঞ্চের মাধ্যমে, দেশের সেবা করতে, দশের মুখে হাসি ফোটাতে। আমি যা চেয়েছিলাম তা পারিনি, নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে আমাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে।

যে পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি তাঁদের মধ্যে নাট্যপ্রীতি ছিল। তাই আমি নাট্যপরিবেশের মধ্যেই পরিবর্ধিত হয়েছি। তারপর ছাত্রজীবনে আমি অনুপ্রেরণা পাই স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য মন্মথ মোহন বসু ও সেই সময়কার আরও দু-একজন শিক্ষাব্রতীর কাছে। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেনও আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁর গুরুদাস ছেলেদের দ্বারা নাট্যাভিনয় খুব ভাল বাসতেন। তবে স্ত্রী-পুরুষ মিলে একত্র অভিনয় করলে তাঁর নীতি বোধে আটকাতো। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে সে সময় যে সব নাট্যাভিনয় হোত তা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হতাম এবং পরে সেখানে আমি অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছি।

তারপর ডাক আসে মদন (ম্যাডান) কোম্পানির কাছ থেকে অভিনয়ের জন্য। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে মদন কোম্পানি আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার প্রস্তাব করে। কোম্পানির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আমি বুঝতে পারলাম যে, সমস্ত থিয়েটার বাড়ী হাত করে থিয়েটারের একচেটে ব্যবসা চালানোই মদন কোম্পানির আসল উদ্দেশ্য। আমি তখন অপরেশ বাবুকে (অপরেশ মুখোপাধ্যায়) এই বিষয়ে সাবধান করে দিই। মদন কোম্পানি এক কোটি টাকার মূলধন নিয়ে ব্যবসায়ে নামে। নাটক নির্বাচিত হল—'অপরাধী' কে?' সে এক অদ্ভুত নাটক, স্থূল রুচির আকর্ষণ স্থূল বললেও চলে—বোম্বাই মার্কা ভিটেকটিভধর্মী নাটক। আমি তাতে ভূমিকা গ্রহণ করতে অসম্মত হলাম। তারপর মদন কোম্পানির উদ্যোগে যখন আলমগীর অভিনয়ের ব্যবস্থা হল, তখন রূপসজ্জার দৃশ্যপট নিয়ে ঘটলো এক হাস্যকর ব্যাপার। রাজপুতানার ছোট এক কুঠীর বাড়ী যেমন সাধারণ হওয়া উচিত আমি শিল্পীকে নির্দেশ দিয়ে তেমনি আঁকালাম এক দৃশ্যপট। কোম্পানির মালিক কর্তৃমশী দেখে বললেন, "একি। আমি এককোটি টাকা মূলধন নিয়ে যে থিয়েটার চালাতে যাচ্ছি তার দৃশ্যপট হবে এরকম। এ হবেনা, এ হবেনা, সোনা লাগাও।" অর্থাৎ সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। আমি তখন বুঝেছিলাম এঁদের হাতে বাংলা থিয়েটারের ভার থাকলে তার পরিণতি কি হবে।

১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে আমি মদন কোম্পানির থিয়েটার ছেড়ে যোগ দিলাম এক ফিল্ম কোম্পানিতে। সেখানে কাজ করবার সময় ঘটল এক মোটর দুর্ঘটনা। তাতে আমি আহত হয়ে কিছুদিন ভুগলাম। তারপর ওল্ড ক্লাবের একদল বন্ধুবান্ধব আমাকে ধরলেন ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে অভিনয় করবার জন্য। আমি সম্মত হলাম। সেখানে অভিনয় করে সাতহাজার টাকা বাঁচলো। এরপর এলাম র‍্যালফ্রেড থিয়েটারে। তার বাড়ী-ভাড়া আঠাশশো টাকা। সেখান থেকে গেলাম মনোমোহন থিয়েটারে। তার বাড়িভাড়া চড়তে চড়তে গিয়ে ঠেকলো ৩৬৮৫৲ টাকাতে, এত বাড়ি ভাড়া দিয়ে থিয়েটার চালানো অসম্ভব আমি এটা ভালভাবেই উপলব্ধি করলাম। এই সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার থিয়েটার নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। দেশবন্ধু প্রায়ই আমার থিয়েটার দেখতে আসতেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন, নিজস্ব বাড়িতে থিয়েটার করতে যে পাঁচ-সাত লাখ টাকা লাগবে, তা তিনি যোগাড় করে দেবেন। এবং দার্জিলিং থেকে ঘুরে এসেই তিনি সকল ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দার্জিলিং থেকে তিনি আর জীবিত ফিরে এলেন না—এলো তাঁর মৃত নশ্বর দেহ।

এরপর আমি এলাম কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে। তারপর এলো আমেরিকা যাবার আমন্ত্রণ। ১৯৩০ সালে সদলবলে আমি আমেরিকা গেলাম। দুখানা জাহাজ শুধু আমাদেরই জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে হোল আমার নূতন অভিজ্ঞতা। গিয়ে দেখি, আমি যাবার দুমাস আগে থেকেই সেখানে প্রচার করা হয়েছে ভারতের লোক অসভ্য, অশিক্ষিত, সেখানে শিল্প-সাহিত্য বলে কিছু নেই, মেয়েদের সে দেশে তালাচাবি বন্ধ করে ঘরে আটকে রাখা হয়, একদল নাচওয়ালি নিয়ে শিশির ভাদুড়ী এখানে নাচতে আসছেন—তিনি রাজপুত মেয়ে বিয়ে করেছেন - নাটক হবে রাজা সাড়ম্বী (বোড়ম্বী) ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এ ধরণের প্রচারের প্রতিবাদ করলাম। আমন্ত্রণকারীরা ত্রুটি স্বীকার করে বললেন যে তাঁরা এরপর ঠিক ভাবে প্রচার কার্য্য চালাবেন। কিন্তু কোম্পানির প্রচার-সচিব কিছুদিন ভারতে ছিলেন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে কথা বলতে পারতেন। তিনি আমাকে তুম, তুম, বলে সম্বোধন করে কথা বলতেন। তাতে আপত্তি করায় তাঁর সঙ্গে আমার বচসা হয়ে যায় এবং কোম্পানি বেঁকে বসে বললে যে তাঁরা আর কোন দায়িত্ব নেবেন না। চুক্তি-ভঙ্গের দায়ে মামলা করা যায় কিনা আমি ভাবলাম। শ্রীসতু সেন তখন আমেরিকায় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে পরামর্শ করলাম।

এই সময়ে একজন ইহুদী এগিয়ে এলেন আমাকে সাহায্য করতে। তাঁর সহায়তায় আমি আমার নাটক আমেরিকায় মঞ্চস্থ করতে পারলাম। আমেরিকার The Sun পত্রিকায় আমার সম্প্রদায়ের অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরুল। সে কাগজে বলা হোল মস্কোর আর্ট থিয়েটার ছাড়া এত ভাল অভিনয় আর কোন সম্প্রদায় করতে পারে বলে তাদের জানা ছিল না।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আমি আমার সম্প্রদায় নিয়ে দিল্লী যাই। সেখানে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য তখন ছিলেন বীরেন্দ্র কুমার লাহিড়ী চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। দিল্লীতে ভাইসরিগাল হাউসের নিজস্ব মঞ্চে অভিনয়ের আয়োজন হয়। এবং বড়লাট সেই অভিনয় দেখে খুশি হন। তিনি আমাকে ইংলণ্ডে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আমেরিকা থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলাম তাতে ইংলণ্ড যাবার উৎসাহ আর আমার হয়নি।

বাংলাদেশে ফিরে এসে দেখি যে, যে থিয়েটার আমি রেখে গিয়েছিলাম সে থিয়েটার ভেঙ্গে গেছে। তারপর আবার নতুন করে আমাকে সব গড়ে নিতে হোল। বাঙালী জাতি মরে নি, মরবে না,

মরতে পারে না, যে জাতির culture আছে সে বাঁচবেই। আমাদের নাটকের ভিতর দিয়ে জাতীয় ভাব প্রকাশ পেয়েছে। মুঘল পাঠানের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী উপস্থিত করে বাংলার নাট্যকারগণ, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জাতির মনে যে অসন্তোষ জমে উঠেছিল, তাকেই রূপ দিয়েছেন, হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, স্বদেশ প্রেমই তাঁদের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

থিয়েটার চালাতে গেলে টাকা চাই, নিজস্ব বাড়ী চাই। কেবল ছাত্রদের বেতন দিয়ে যেমন বিদ্যালয় ভালভাবে চলে না—তেমনি টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়েও থিয়েটার ভালভাবে চলতে পারে না। থিয়েটার সমস্ত চারুশিল্পের মিলনকেন্দ্র—জাতির সংস্কৃতির দর্পণ, সুতরাং থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে জাতিরই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিদেশের বড় বড় থিয়েটার রাজশক্তির সহায়তায়ই গড়ে উঠেছে। কিন্তু এদেশের সরকার থিয়েটার সম্বন্ধে উদাসীন। আজ চাই জীবনে বিশ্বাসী, সংগ্রাম বিশ্বাসী নায়ক নিয়ে লেখা নূতন নাটক। ঘোমটের মতন একটুতেই ভেঙ্গে পড়ে, পিতা কন্যার মৃত্যু কামনা করে, এমন সংগ্রামবিমুখ নৈরাশ্যবাদী নায়কের প্রয়োজন আজ নেই। সংগ্রাম করে যে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাকেই এ যুগে নাটকের নায়করূপে চিত্রিত করতে হবে।

যাত্রা থেকে যদি আমাদের থিয়েটার গড়ে উঠতো তবে তার রূপ হোত অন্য রকম। তা সত্যি হয়ত আমাদের জাতীয় নাট্যশালা হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু এ থিয়েটার গড়ে উঠেছে বিদেশীর প্রভাবে। যাই হোক, যা গড়ে উঠেছে তাকে ফেরাবার উপায় হয়তো নেই। আমি চেয়েছিলাম জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তুলতে, কিন্তু তা পারি নি। আমার পক্ষে যা সম্ভব হয়নি, এ যুগের লোক তা সম্ভব করে তুলুক, এই আমার একান্ত অভিলাষ।

নাট্য চিন্তা

আশ্বিন (পূজা) সংখ্যা সম-ভারতীয় নাটমঞ্চ বিভাগে আধুনিক কালের নাটক সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছিলাম। অন্যান্য কথার মধ্যে বলেছিলাম, নাটককে অবশ্যই দেশ ও সমাজের সমকালিন দর্পণ হতে হবে। দর্শক যুগে যুগে নাটকের মধ্যে দিয়ে তাদেরই জীবনযাত্রার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছে। এবং যেসব নাটকে সেই চিত্র তারা পেয়েছে সেইসব নাটক তেমনি বেশী জনপ্রিয় হয়েছে। এখানে অবশ্য আমি সমাজিক নাটকের কথাই বলছি।

আজ সারা দেশে এই যে সঙ্কট, এই যে প্রাণান্তকর জীবনযুদ্ধ, এই যে ব্যাপক মূল্যবোধহীনতা এবং উন্মার্গগামিতা, এই যে বৈকল্যের প্রতিক্রিয়ার দেশের মানুষের বিক্ষুব্ধ চতুরাশা—এসবের কোনো প্রতিফলন আজকের নাটকগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। না সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটকে, না বা অগণিত অবনাট্য সংস্থার অভিনীত নাটকে। কোথায় সেই কালজয়ী নাটক আর কোথায় সেই নাট্যকার, ভবিষ্যতের দর্শক যাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

আমাদের এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা গেল একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের নাট্যবিভাগে দিন ১৫ আগের একটি সংখ্যায়। সুন্দর একটি আলোচনার অবতারণা করেছেন লেখক। উপসংহারে বলেছেন—

"শুধু দর্শক সাধারণই নয়, সমগ্র জাতি নাট্যকারদের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন যাঁরা দেবেন সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছবার মন্ত্র। এখন জাতি চায় আজকের নাটক। কিন্তু কোথায় সেই নাট্যকার; যিনি এগিয়ে আসবেন এই মহান কর্তব্য পালনে!"

অসংখ্য নাট্য সম্প্রদায়। বহুতর নাটক। অনেক নাট্যকারের দেখা মিলছে। কিন্তু তাঁদের রচনার মধ্যে জীবন দিয়ে দেখা অভিজ্ঞতার কোনো ছাপ নেই। অন্যের দেখা, অন্যের অভিজ্ঞতা ধার করে তাঁরা যে নাটক তৈরী করছেন তার মধ্যে শাশ্বত বস্তু হয়ত আছে কিন্তু তার রূপের পালা বদলের ফলে সে নাটক দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

উক্ত দৈনিক পত্রের আলোচনা কিয়দংশ উদ্ধৃত করে বলি :

"আগের চেয়ে অনেক বেশী নাটক লেখা হলেও বা অনেক বেশী নাট্যকার থাকা সত্ত্বেও আমাদের ক্ষয়িষ্ণু জীবনের এই মুহূর্তের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করতে কোন ক্ষমতাশালী নাট্যকার এগিয়ে আসেন নি। আর আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে বা তা প্রকাশে আমাদের নাট্যকারেরা যতটা উদ্‌গ্রীব জাতীয় স্বার্থ বা প্রয়োজনের কথা প্রকাশে ঠিক ততটাই যেন বীতস্পৃহ।

ফলে দেখা যাচ্ছে দর্শকরা যেন কি রকম একটা হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। তাঁদের সামনে দেশী-বিদেশী, গভীর-অগভীর হাজারটা সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে; জীবন সংগ্রামের নানা ছবিও দেখান হয়েছে কিন্তু তা থেকে উত্তরণের সামান্যতম ইঙ্গিতটুকুও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।"

নব নব রূপে

সাঁতরাগাছিতে শিশির নাট্যমঞ্চ

সাঁতরাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী

উক্ত লাইব্রেরীর সাহিত্য বিভাগ বাণী নিকেতনের উদ্যোগে একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির নামে একটি নাট্যমঞ্চ স্থাপন করে তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের তো বটেই সারা দেশের শিশির অনুরাগীদের তথা নাট্যমোদীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন সন্দেহ নেই। এই কর্মোদ্যমের পিছনে যাঁর নিরলস চেষ্টা গত কয়েকমাস ধরে এই পরিকল্পনাটিকে রূপায়িত করতে প্রভূত সাহায্য করেছে সেই উদ্যোগী ব্যক্তি বাসুদেব লাহিড়ী আমাদের জানান যে সাঁতরাগাছিতে শুধু যে শিশিরকুমারের আদিনিবাস তাই নয়, এই স্থানে তিনি বহুদিন বাস করেছেন, বলতে গেলে, তাঁর নাট্যজীবনের সূত্রপাত এইখান থেকেই। তাই স্থানীয় নাট্যানুরাগীদের মনে এইরূপ একটি পরিকল্পনা অনেকদিন ধরেই জেগে ছিল। কিন্তু তাকে রূপ দেওয়ার পথে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে বহু সময় কেটে যায়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত নিজস্ব ভূমিতে তাঁরা একটি স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় হাজার দর্শকের আসনযুক্ত এই নাট্যালয়টি শুধু যে স্থানীয় নাট্য সংস্থাদের চাহিদা মেটাবে তাই নয় (সাঁতরাগাছিতে চৌদ্দটি নাট্যসংস্থা আছে যাঁরা নিয়মিত নাট্যচর্চা করেন), আশেপাশের বহু প্রতিবেশী নাট্যসংস্থাদেরও নাট্যচর্চাকে সাহায্য করবে।

উক্ত লাইব্রেরীর স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে গত ১৩ই নভেম্বর নিখিল নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন হয় এবং অভিনেতৃ সংঘের সহযোগিতায় 'আলমগীর' অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন, তরুণ গাঙ্গুলী, মহেন্দ্র গুপ্ত, কেতকী দত্ত, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীরা।

আলমগীর নাটকের অভিনয় ছাড়া নিম্নলিখিত উৎসবসূচী প্রতিপালিত হয়—

১২ই নভেম্বর—বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন।
১৪ই " —লোকরঞ্জন শাখার 'চণ্ডালিকা।'
১৫ই " —শৌভনিকের 'এবং ইন্দ্রজিৎ।'
১৬ই " —উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত : এ কানন, ভি, জি, যোগ, একরাত খান, শংকর ঘোষ প্রভৃতি।
১৭ই " —নবনাট্যমের 'পাহাড়ী বাবা।'
১৮ই " —চতুর্মুখের 'জনৈকের মৃত্যু।'
১৯শে " —রঘুনাথ গোস্বামীর পরিচালনায় 'পাপেট শো।'

চক্রবৈঠক। দক্ষিণ কলকাতার এই অভিজাত অপেশাদার নাট্যসংস্থাটি মাঝে মাঝে সুনির্বাচিত নাটকের অভিনয় করে তাঁদের অনুরাগী নাট্যামোদীদের আনন্দ বিধান করেন। ইতিপূর্বে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্বাস্তিকী' নাটকটির অভিনয় করে চক্রবৈঠক দর্শকদের বিমোহিত করেন। সম্প্রতি তাঁরা হিন্দি হাইস্কুলের মঞ্চে অভিনয় করলেন সুশীল মুখোপাধ্যায়ের আর একটি নাটক—'তিন অঙ্ক।' এই নাটকে তুখলী নাট্যকার সুশীল মুখোপাধ্যায় এক অভিনেতার জীবনের উত্থান পতন ও ঘাত প্রতিঘাতকে চিত্রিত করেছেন। নাটকটির বিন্যাস যেমন সুসংবদ্ধ, এর সংলাপ ও চরিত্র চিত্রণও তেমনি নিপুণ। ফলে সমগ্র নাটকটির মূল বক্তব্য সহজেই দর্শকচিত্তকে আলোড়িত করে।

তিন অঙ্ক নাটকটি তিনটি অঙ্কে বিভক্ত এক সার্থক ট্রাজেডি। নাটকের নায়ক কেমন করে একটা সাম্রাজ্য পেয়েও নিজের দোষে তা হারাল তারই বাস্তব রূপায়ন এই বলিষ্ঠ নাটকটিতে। সেই সঙ্গে আর একটি জীবনও নষ্ট হল। সে জীবন নায়কের স্ত্রী হিমানীর, যে চিরদিন নীরবে সবসহ্য করে গেছে। শিল্পীর প্রতিভার আগুন তার সবচেয়ে প্রিয়জনকে বারবার এমনি করে পুড়িয়ে মেরেছে, বলেছেন মোহনলাল, হিমানীর বাবা, যিনি একদা বড় অভিনেতা ছিলেন কিন্তু আজ একান্ত দরিদ্র। ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে, হাসি অশ্রুর অপূর্ব সংমিশ্রণে, বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত সংলাপে রসোত্তীর্ণ এই নাটকটিতে সু-অভিনয় করেছেন—চারুপ্রকাশ ঘোষ (মোহনলাল), রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় (রজত রায়), শীলা পাল (হিমানী), শচীন মল্লিক (মলয়), রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী (অনিমেষ), সরল মুখোপাধ্যায় (ইন্দ্রনীল), দেবী মুখোপাধ্যায় (শ্রীরূপা), এবং তুষারিকা চক্রবর্তী (চিত্রিতা)। দলগত অভিনয়, প্রযোজনা এবং অন্যান্য বিভাগের কাজও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

আগামী সংখ্যায় : নাটমঞ্চ বিভাগে : যাত্রা-র চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও চরিত্র ॥ চৌষট্টি-কলার বিবরণ ॥

চলতি দুনিয়া

একটি মর্মান্তিক কাহিনী

'ক মাস হয়েছে ?' কোনো কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো।

'দু মাস', বললো মেয়েটি।

কণ্ঠস্বর বললো, 'ডলার নগদ নিয়ে আসবেন। কোনো চেক নয়। বৃহস্পতিবার রাত আটটার সময় 'এক্স' হোটেলের সামনে অপেক্ষা করবেন। অবশ্যই রোপালী রঙের পোশাক প'রে আসবেন। আমাকে যাতে চিনতে পারেন তার জন্য আমি কোটের একদিকে প'রে আসবো লাল গোলাপ।'

ঘটনাটা ঘটেছিলো জুলাই মাসে। ওয়াশিংটন শহরে। চারদিকে একটা স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়া। মনে হয় এতটুকুও বাতাস নেই।

কী ক'রে এমন বিপদে মেয়েটি পড়লো ? কে জানে ? অবিবাহিতা মেয়ের কি সন্তান হতে আছে ?

ডিটেক্টিভ গল্পে যেমন হয় তেমনি এক রহস্যময় পরিবেশে মেয়েটি একা হাজির হলো। শেষপর্যন্ত সে উদ্ধার পেলো কুমারী জীবনের কলঙ্ক থেকে। কিন্তু তার পরিবর্তে দিতে হলো প্রচুর অর্থ। আর মনের অবস্থা যা হলো তা তো বলাই বাহুল্য। এ-রকম ওদেশে ঘটছে, প্রায়ই ঘটছে।

হাতী শেষে ছিঁচকে চোর

লণ্ডনের পশুশালার কর্তৃপক্ষ একটা মজার খবর দিয়েছেন। গতবছর বহু দর্শক হাতী দেখতে যায়। কেউ আবার খুব কাছে যায় হাতীগুলিকে খাওয়াতে। আর তখন সঙ্গেরা শুরু করে আশ্চর্য কাণ্ড। শুঁড় দিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় নানা জিনিষপত্র। গত বছর হাতীদের দখলে আসে সবশুদ্ধ ১৪টি কোট, ১২টি হাতব্যাগ, ১০টি ক্যামেরা, ৮টি ঘড়ানা এবং লিসেস্টার যাবার ৬ খানি রিটার্ণ টিকেট।

হ্রস্ব-দীর্ঘের লড়াই

লণ্ডনে এখন লড়াই চলেছে হ্রস্ব দীর্ঘের মধ্যে। মানে মেয়েদের স্কার্ট হাটুর নিচে পড়বে, না কি উপরে উঠবে, সুগোল শাদা উরু অনাবৃত রাখবে এই নিয়ে শুরু হয়েছে লড়াই। যে-সব দরজী লম্বা স্কার্ট বানাচ্ছে তারা অবশ্য এখনো খাটো স্কার্ট নির্মাতা দরজীদের সঙ্গে পেরে উঠছেনা। কারণ খাটো স্কার্ট নির্মাতাদেরই পৃষ্ঠপোষক বেশির ভাগ মেয়েরা। তবু দীর্ঘতার সমর্থক দরজীরা হতাশ হয়ে পড়েনি। লড়াইয়ে তারা পিছ পা হবে না।

যমজদের শোভাযাত্রা

সপ্তাহান্তে একবার পূর্ব য়ুরোপের দেশ অজিয়াতে কিছুদিন ধরে' এক মজার দৃশ্য দেখা যায়। এ সপ্তাহেও দেখা গেছে। এক জায়গায় জমায়েৎ হয়েছিলো প্রায় দু'শ যমজ শিশু। পুরোভাগে ছিলো সাত বছরের ম্যারী মানানা আর লামরা কাকাকুরিজ। পশ্চিম অজিয়ার ভিরি গ্রাম থেকে তারা 'নিজস্ব' যানে চেপে হাজির হয়।

অদ্ভুত দান

ইংল্যাণ্ডের চেস্টার শহরের মেয়েরা এক অভিনব উপায়ে টাকা তুলছে। দানের উদ্দেশ্যে ওই টাকা তোলা হবে। শিক্ষায়তনের প্রিফেক্ট নিয়ম ক'রে দিয়েছেন হাটুর দু'ইঞ্চির বেশি উপরে স্কার্ট মেয়েরা পরতে পারবে না। যদি পরে তবে যত ইঞ্চি জানু অনাবৃত থাকবে তত পেনী জরিমানা মেয়েটিকে দিতে হবে। টাকা তুলবার জন্য মেয়েরা নিজেরাই ওই উপায়টি ভেবেচিন্তে বের করেছে। ৭২০ ইঞ্চি অনাবৃত জানুর জন্য এ-পর্যন্ত আদায় হয়েছে ৩ পাউণ্ড।

কিডনী স্থানান্তরিত

কিছুদিন আগে ৫৬ বছর বয়স্ক ব্যক্তির বুকে স্থান পেয়েছে ২৫ বছর বয়স্কা এক মৃতা যুবতীর হৃদয়। সেই ব্যক্তি নাকি এখন বিছানা ছেড়ে উঠে হাঁটাচলা ক'রে বেড়াচ্ছে। টরণ্টো জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তাররা তেমনি আরেকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন। আঠারো বছরের একটি মেয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলো। ওই অষ্টাদশী তরুণীর কিডনী বসানো হয়েছে এক মুমূর্ষু পুরুষের দেহে। রোগীর নাম অবশ্য ডাক্তাররা এখনো প্রকাশ করেননি।

মালয়েশিয়ার আইন

মালয়েশিয়ার হিন্দুদের মধ্যে এতদিন এক বিচিত্র নিয়ম ছিলো। স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ক'রেই যে কোনো লোক স্ত্রী ত্যাগ করতে পারতো। ওখানকার হিন্দু পুরুষেরা এতদিন বেশ মজায় ছিলো। যতবার খুশি স্ত্রী ত্যাগ ক'রে আবার নতুন ক'রে বিয়ে করতে পারতো। ত্যাগ করার কারণ থাকুক কি নাই থাকুক। বাড়িতে সামান্য কাপড়া হলো, কি স্ত্রী মুখে মুখে একটু তর্ক করলো অমনি পরদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ক'রে তার সঙ্গে স্বামী সব সম্পর্ক শেষ ক'রে দিলো। কিন্তু মালয়েশিয় সরকার বোধ হয় এবার তাদের সুখে বাদ সাধছেন। একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে ভারতীয় হিন্দুদের মতো মালয়েশীয় হিন্দুদের মধ্যেও এক বিবাহ প্রথা কঠোরভাবে প্রবর্তিত করা হবে। কথায় কথায় সম্পর্ক ছেদ করতেও আর স্বামীরা পারবেনা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মালয়েশীয় হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই তামিল দেশীয়।

সেতারের বাজার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে আর একটি ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের রপ্তানির বাজার এখন খুবই সম্ভাবনা পূর্ণ। এটি হল ভারতীয় সেতার।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন আমদানিকারক কয়েকটি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিমানযোগে কয়েক হাজার সেতার পাঠাত নির্দেশ দিয়েছেন। দিল্লির একটি প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে দশ হাজার সেতার পাঠাবার অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি মাসে মাত্র পঞ্চাশটি সেতার করতে পারেন। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছেন এত বিরাট অনুজ্ঞার সরবরাহ করার ক্ষমতা তাদের নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ভারতীয় সেতারের দাম পড়ে প্রায় ৩০০ ডলার। একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান একারণে একধরণের পাঁচটি তার বিশিষ্ট সস্তা সেতার তৈরি করতে সুরু করেছেন। তার দাম পড়ছে মাত্র ৪৫ ডলার।

এই সংবাদ জানিয়েছেন 'স্পান' পত্রিকা। এই পত্রিকা লিখেছেন, সেতারের এই জনপ্রিয়তা পণ্ডিত রবিশঙ্করের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের হিপিদের অনেকের কুরতা, পায়জামা আর চপ্পল পরে হাতে সেতার নিয়ে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে।

ফিরিয়ে নেওয়া যায় না

"প্রতিশ্রুতি, নারী ও দান ফিরিয়ে নেওয়া যায় না—যেমন রাজা মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে রাজ্যপালের আদেশও ফিরিয়ে নেওয়া যায় না"—সংসদ সদস্য শ্রীটি বিশ্বনাথন আজ 'নারদ স্মৃতি' উদ্ধৃত করে লোকসভায় এই মন্তব্য করেন।

অন্ধ্রের আইন বিশেষজ্ঞ সদস্য লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের সময়, সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালের ক্ষমতার ওপর মন্তব্য করেছিলেন।

ডঃ সুশীলা নায়ার জোর করে উঠে শ্রীবিশ্বনাথনকে প্রশ্ন করেন ভারতের নারীদের বিলিয়ে দেওয়া যায়—এই কি আপনার ধারণা?

শ্রীআনন্দম নাম্বিয়ার (বাম কমু:) ডঃ নায়ারের প্রশ্নের জবাব দেন "বিয়ের সময় মেয়েদের সম্প্রদান করা যায়।"

রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রাঙ্গণে অগ্নিতে আত্মাহুতির চেষ্টা

এই ডিসেম্বর কেনেথ ডি এলিয়া নামে এক বিশ বছরের যুবক রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে নিজের দেহে অগ্নিসংযোগ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এলাকায় গত দু' বছরের মধ্যে এটি দ্বিতীয় ঘটনা।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে যুবকটি ক্ষীণকণ্ঠে জানায় যে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ জানাতেই সে আত্মাহুতির সংকল্প নেয়।

আই এ্যাম সরি!

বারানসীর ইলেকট্রিক লাইট এণ্ড পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানীর আবাসিক এঞ্জিনিয়ার শ্রীএম, এল, পাটনের মোটর গাড়ীর পথ রোধ করে ইংরেজী হঠাও আন্দোলনকারী একদল ছাত্র। তারা গাড়ীর ইংরেজী নম্বর প্লেট সরিয়ে ফেলতে চায়। শ্রীপাটনে সবিনয়ে জানান তিনি নিজেই সরিয়ে ফেলবেন।

কিছু পরে ষ্টেশনের কাছে একই স্থান দিয়ে গাড়ী চালাবার সময় তাঁর গাড়ীর নম্বর প্লেটটি হিন্দিতে লেখা রয়েছে দেখে একটি ছাত্র বলে ওঠে "আরে! হিন্দি করেছে দেখছি, ভেরি গুড!" ভেরি গুড! শ্রীপাটনে স্থির থাকতে পারেন না; তিনি ছেলেটিকে বলেন, "ইংরেজী ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করছো?" ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে "ও! আই অ্যাম সরি! আই এ্যাম সরি!"

প্রথম মার্কিন দ্বিতীয় রাশিয়া

১৯৬৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত যে-সব বিদেশী রাষ্ট্র ভারতকে আর্থিক ঋণ দিয়েছেন, তাঁদের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রদত্ত ঋণের টাকার অঙ্ক হল ২৩৭৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন সোভিয়েট রাশিয়া- ঋণের অঙ্ক ১০২১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

অন্যান্য যে-সব দেশ মোটা টাকার অঙ্কের ঋণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন, পশ্চিম জার্মানী (৭৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা), বৃটেন (৬৬০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা), জাপান (৩০৭ কোটি ৯ লক্ষ টাকা),

কানাডা (১১৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা), ইতালী (১৪৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা), ফ্রান্স (১০২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা) চেকোশ্লোভাকিয়া (৯৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং যুগোশ্লাভিয়া (৯৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা)।

মস্তিষ্ক বদলের অস্ত্রোপচার সম্ভব হবে

"আমাদের নাতি-নাতনীদের আমলে অস্ত্রোপচার দ্বারা মস্তিষ্ক বদল সম্ভব হবে!" —এ কথা সাংবাদিকদের নিকট বলেছেন পশ্চিম এশিয়া নিউরোসার্জিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডাঃ বি রামমূর্তি।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "একজনের ব্যাধিগ্রস্ত মস্তিষ্ক বাদ দিয়ে সে জায়গায় আর একজনের মস্তিষ্ক এনে স্থাপন করা খুবই শক্ত কাজ। বহু স্নায়ু-উপস্নায়ু জোড়া দিতে হবে। একচুল এদিক-সেদিক হলে সমস্ত অস্ত্রোপচারই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

শ্রীরামমূর্তি বলেন, 'যাই হোক শল্যবিদ্যার যে অগ্রগতি হচ্ছে তাতে আমাদের নাতি-নাতনীর আমলে মস্তিষ্ক বদলের অস্ত্রোপচার সম্ভব হবে।"

বিনা টিকিটে ভ্রমণের দায়ে দুই ম্যাজিস্ট্রেট

সম্প্রতি দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট রেলে টিকিট ফাঁকি দেবার দায়ে ধরা পড়েছেন।

ওই দু'জন 'টিকিট বিহীন' ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটি বরযাত্রী দলের নেতৃত্ব করছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বরযাত্রীদের কারুরই টিকিট ছিল না। সেনট্রাল টিকিট চেকিং স্কোয়াডের হাতে তারা ধরা পড়েন।

এ মাসের গোড়ায় দিল্লীতে আঞ্চলিক রেলগুলির জেনারেল ম্যানেজারদের সম্মেলনের সময় ওই ঘটনাটি জানা যায়।

অপরাধী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের গোচরে আনা হয়েছে।

• • • •

ফরাসী বিপ্লবের সময় একটি ইংরেজ রণপোত একটি ফরাসী রণতরী দখল করে। ওই তরীতে ছিলেন মার্কুইস অফ মন্ট্রেও। রণপোতের ক্যাপ্টেন মার্কুইসকে মাধ্যাহ্নিক ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। নিজের ডানদিকে বসিয়ে মদের গ্লাস অতিথির দিকে এগিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, "ফ্রান্সে এখন যণ্ডা-গুণ্ডার রাজত্ব চলেছে, তবে," অতিথির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "অবশ্য এর ব্যতিক্রম হিসেবে দু একজন ভালো লোকও আছেন।"

মার্কুইস সঙ্গে—সঙ্গে আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন, "ইংরেজ রণপোতে ওঠা মানেই ইংল্যাণ্ডে হাজির হওয়া, তবে," ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে।"

ব্যাপার যা চলছে

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য গল্প-ভারতী সম্পাদক দায়ী নন)

একটি পুরাকালের কাহিনী মনে পড়ছে। পৃথিবীর পূর্বদিগন্তে রামনগর নামে ছিল এক ধনধান্যে পুষ্পে ভরা জনপদ। অন্য সব রাজ্যের অধিবাসীরা রামনগরকে বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখত, রামনগরের অধিবাসীদের বিদ্যা বুদ্ধি শৌর্যবীর্য সবই ছিল অন্যের অনুকরণযোগ্য।

কিন্তু কালক্রমে অতিজ্ঞানী ও অতিবুদ্ধিমান বলে নিজেদের মনে করতে করতে রামনগরবাসীরা আদর্শচ্যুত চরিত্রভ্রষ্ট হল এবং নিজেদের মধ্যে ছুতোনাতলব মনোভাব নিয়ে কলহে প্রবৃত্ত হল। রাজপ্রাসাদে কাদের প্রতিনিধিরা আধিপত্য করবে, তাই নিয়ে দুটো দল হল। তাদের মধ্যে হানাহানি আরম্ভ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রাসাদ-অধিপতিদের বিপক্ষ দল প্রাসাদ অধিকারে ব্যর্থকাম হয়ে জনপদের সর্বত্র আগুন লাগিয়ে দিলে, ক্ষেতের মাঠভরা শস্য নষ্ট করে ফেললে, ধানের গোলা তছনছ করলে, পুষ্করিণী বিষাক্ত হল, অট্টালিকা বাড়ীঘর ভেঙে পড়ল, বহু সংগ্রহশালার অমূল্য সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সারা জনপদ মহা-শ্মশানে পরিণত হল। গৃহহারার দল পথে পথে ঘুরতে লাগল, দেশে অন্নাভাব জলকষ্ট, মহামারী প্রকট হল।

প্রাসাদ অধিপতিরা দেখলেন, তাঁদের সংগঠন শক্তির অভাবেই দেশের এই দুর্দশা ঘটেছে, জনগণের সঙ্গে তাঁরা কোনদিন সংযোগ স্থাপন করেন নি, জনগনের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেন নি। রাজ্য চালনা করা আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। একদিন রাত্রে তাঁরা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন।

পরদিন প্রভাতে জনতার সে কী উল্লাস। শেষ পর্যন্ত তাদের জয় হয়েছে। প্রাসাদ অধিপতিরা পলায়িত। তখন তারা তাদের নেতাদের কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে রাজপ্রাসাদ অধিকার করল, নেতারা বসলেন রাজতক্তে। জনতা সারারাত ধরে উল্লাস করল।

কিন্তু তারপর তারা তাদের অবস্থার দিকে তাকাল। অন্ন নেই, শিক্ষা নেই, সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত, চারিদিকে হাহাকার! তখন তারা তাদের নেতাদের কাছে গিয়ে হাজির হল, তারস্বরে তাদের দাবী জানাল, অন্ন চাই, বাস্ত চাই, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন চাই, শান্তি চাই।

কিন্তু কোথায় বাস্ত? কে দেবে বাস্ত? সব যে জলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। নেতারা জনতাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তোমরা সব পুড়িয়ে ভেঙেচুরে দেশকে ছারখার করলে, নিজেদের দেশের জিনিষ, নিজেদের সম্পদকে তোমরা নিজের হাতে ধ্বংস করলে। এখন কোথায় পাব বাস্ত? শান্ত হোয়ে থাক কিছুদিন। চেষ্টা করছি আমরা।

জনতা ক্ষেপে পড়ল ক্রমরোষে। এসব কাজ তো তারা করেছে নেতাদেরই নির্দেশে। এখন তাঁরা রাজতক্তে বসে সাধু সাজবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা তাদের অনেক বড় বড় আশার কথা শুনিয়ে এসেছেন এতকাল। এখন পিছিয়ে গেলে চলবে না। তারা কোন কথা শুনবে না। তাদের বাঁচবার ব্যবস্থা নেতাদের করতেই হবে।

বেগতিক দেখে একদিন রাত্রির অন্ধকারে এই নেতার দলও আগেকার নেতাদের মতই গা-ঢাকা দিলেন। রাজপ্রাসাদ নেতাশূন্য হয়ে পড়ে রইল। এদিকে জনতার আর্তনাদ আর বিক্ষোভ।

রামনগর থেকে অনেক দূরে ছিল আর একটি রাজ্য—শ্রীপুর। অগাধ ধনঐশ্বর্যের দেশ শ্রীপুর। দারিদ্র্য অন্নাভাব দেশে স্বপ্নেরও অগোচর। শ্রীপুরের শাসকরা বহুদেশেই তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেছেন। সারা পৃথিবীতে নিজেদের প্রতিপত্তি আর ভাবধারাকে সঞ্চারিত করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। রামনগরের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি ছিল বরাবর। সময় বুঝে তাই শ্রীপুরের একদল প্রতিনিধি রামনগরে এসে উপস্থিত হল। এক বিরাট জনসমাবেশে তারা জানাল—একান্ত নিঃস্বার্থভাবে রামনগরবাসীদের কল্যাণ সাধন করবার জন্যেই তারা এসেছে। রামনগরের কোন চিন্তা নেই। শ্রীপুর তাদের সর্বরকমে সাহায্য করবে। কাল প্রত্যূষ থেকে আসবে ভারে ভারে খাদ্যসামগ্রী। রামনগরের অন্নাভাব চিরতরে দূর হবে। শুধু তাই নয়। রামনগরের অধিবাসীরা যাতে অতি-আধুনিককালের উন্নত মানের জীবনযাত্রার শরিক হতে পারে, সেজন্যেও শ্রীপুরের শাসক সম্প্রদায় সর্বরকম ব্যবস্থার আয়োজন করবে রামনগরে।

রামনগরের জনতা ধন্য ধন্য করতে লাগল। শ্রীপুরের প্রতিনিধিদের তারা সাদরে বরণ করে নিলে।

দেখতে দেখতে রামনগরের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ঐতিহ্য, শিক্ষাদীক্ষা, আচার আচরণ জীবনের সুলাবোধ, আহার বিহার সবকিছুর মধ্যেই শ্রীপুরের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সঞ্চারিত হল। রামনগরের লোক শ্রীপুরের দয়ায় শ্রীপুরের বদান্যতায়, কৃতজ্ঞতায় বুঁদ হোয়ে সুখের জীবন যাপন করতে লাগল।

• • •

যুগে যুগে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পুরাকালের উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে আজ?

• • •

রাজনীতির কচকচি, রাজনৈতিক দলাদলির উলঙ্গ নির্লজ্জতা, আর সেই সঙ্গে প্রাণ ধারণের সমস্যা জীবনের চরম সংকট—এসব তো আছেই। এসব নিয়ে যদি চিন্তা করেন তো মাথার গোলমাল হওয়া আশ্চর্য নয়। তার চেয়ে চলুন আমরা এক নতুন রাজ্যের কাণ্ডকারখানা দেখে আসি, ভারতবর্ষে যে নতুন "হিপি"—ধাম স্থাপিত হয়েছে সেখানে ঘুরে আসি। "হিপি" কাদের বলে জানেন তো? পৃথিবীতে এরা নতুনতম এক সম্প্রদায়। এরা ঘরছাড়া, সমাজ সভ্যতা ছাড়া, বাঁধন ছাড়া পাশ্চাত্য দেশের ছেলেমেয়েদের দল—যারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাযাবরহীন জীবনযাপন করছে, কোন নিয়মকানুন বিধিনিষেধ মানছে না। তারা সম্প্রতি এদেশেও এসেছে এবং তাদের একটা ঘাঁটি স্থাপন করেছে, কোথায় জানেন, খাস রাজধানী দিল্লীর এক প্রান্তে। সেখানে গাছগাছালির আড়ালে আছে ভোলি ভাটিয়ারি কা মহলের ধ্বংসাবশেষ। ১৪ শতকের মুসলমান বাদশা ফিরোজ তোঘলক শিকারে বেরিয়ে সেখানে বিশ্রামের ডেরা বানিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ। আজ তার কাঠামোটা আছে—ছাদ খসে পড়েছে। সেই খসে পড়ার ছাদের উপর টিন আর ত্রিপল দিয়ে সেটাকে এখন যুব হোস্টেল সমিতি মাঝে মাঝে ক্যাম্পরূপে ব্যবহার করে। সেইখানে আড্ডা জেঁকেছে পাশ্চাত্যের নানাদেশ থেকে আগত একদল হিপি। সে বড় বিচিত্র ব্যাপার। রংবেরং-এর পোষাক পরা, উস্কো খুস্কো চুল আর প্রাণবিহীন শুকনো চেহারার হিপি মেয়ে-মদ্দ সেখানে দিব্য আরামে গান-বাজনা করছে আর গাঁজা চরস টেনে বুঁদ হয়ে আছে। তাদের একজনকে জিগেস করা হয়েছিল:

তোমরা এখানে এইভাবে সবাই কেমন বোধ করছ? উত্তরে তাদের মুখপাত্র জানিয়েছিল, অন্ত

কোন অসুবিধে নেই, তবে পুলিশের বড় অত্যাচার। দিনে দু'বার করে এসে তারা হিপিদের জিনিষপত্র তল্লাসী করছে, আর মাঝে মাঝে তাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে কুড়িজন হিপি দিল্লীর জেলে বাস করছে। তারা নাকি চোরাই মাদক আর পিস্তল বন্দুক নিয়ে এসেছিল এদেশে।

কিন্তু দেজন্যে হিপিরা দমে যায়নি একেবারেই। মাত্র কুড়িজন তো সরকারী অতিথিশালায়। তার বাইরে আছে তারা আরও অনেকে। তারা এই ভাবেই সারা ভারত পরিক্রমা করবে, এই তাদের সংকল্প। দিল্লীর পর তারা যাবে বারানসী। সেখানে তারা বিশেষ করে দেখবে, গঙ্গার ঘাটে কেমন করে মড়া পোড়ানো হয়।

দিল্লীতে তারা খুবই জ্বালাচ্ছে। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক জানিয়েছেন, হিপিদের উপদ্রবে তাঁরা অস্থির, যখন তখন তারা আসবে, খেতে চাইবে শুতে চাইবে, আরতির সময় অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে নাচগান আরম্ভ করে দেবে।

বিড়লা ধর্মশালার ম্যানেজারও অনুরূপ অভিযোগ করেছেন। হিপিরা কোন নিয়মকানুন মানতে চায় না, হৈহট্টগোল করে, তাদের লজ্জাসরমের বালাই নেই। ধর্মশালায় মদ গাঁজা এসব নিষিদ্ধ, কিন্তু তারা তা মানতে চায় না। একটি ফরাসী মেয়ে-হিপি জোর করে ধর্মশালায় থাকতে চাইলে ম্যানেজার আপত্তি জানান, তাতে রাগে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটা ছোরা বার করে ম্যানেজারকে তাড়া করে।

দিল্লীতে এই হিপির দল মহা সোরগোলের সৃষ্টি করেছে। বিদেশী অতিথিরূপে তারা এসেছে। কিন্তু অতিথি তারা আর নেই। তারা এখন নেই-আঁকড়া জুলুমবাজ রবাহুতের মত চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মুফৎ তাদের খাওয়া চাই, থাকবার জায়গা চাই।

নানাদেশ থেকে তারা এসেছে, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আমেরিকা এবং ইংলণ্ড। এর ভিতর আবার একটা হিপি মেয়ে একজন পাঞ্জাবীকে পাকড়ে বিয়ে করে ফেলেছে। মোটের উপর হিপিদের নিয়ে রাজধানী এখন বেশ সরগরম। দিল্লীবাসীরা নতুনতর মজা উপভোগ করছে।

একজন সাংবাদিক তাদের মুখপাত্রকে জিগেস করেছিল—তারা কলকাতা দেখবে না? এদেশ যারা দেখতে আসে তাদের প্রায় সকলেই কলকাতা ঘুরে যায়।

উত্তরে সেই মুখপাত্র বলেছে, হ্যাঁ, ক্যালকাটা দেখবার তাদের খুবই ইচ্ছে। ক্যালকাটা সম্বন্ধে তারা নানা মজাদার খবর শুনেছে। সেখানে নাকি পথে ঘাটে বাঘ বেড়িয়ে বেড়ায়, দড়ি বেয়ে মানুষ আকাশে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যায়, সেখানে নাকি প্রত্যহ অনেক লোক রাস্তায় মরে পড়ে থাকে, সেখানে এক ভয়ঙ্কর দেবী মন্দির আছে যেখানে নরবলী হয়, সেখানে নাকি যত লোক, তত ভিখারী আর তার চেয়ে বেশি মোটর গাড়ীর ভিড়, সেখানকার লোকেরা নাকি খুব সার্কাস করতে জানে, প্রত্যহ ট্রামে বাসে চড়ে তারা কুলম্ব ট্রাপিজের খেলা দেখাতে দেখাতে আপিস যায়, সেখানে নাকি প্রত্যেক বাড়ির চারদিকেই আঁস্তাকুড়, সেখানকার অর্ধেক লোকেরই নাকি বাড়িঘর নেই, তারা রাস্তায় বসে খায়, রাস্তায় বসে বাহ্যে করে, রাস্তায় শুয়ে রাত কাটায়, সেখানে নাকি রোজ রাত্রে অনেক জায়গাতেই নানা ঢং-এর নাচগান হয়, সেখানকার ছেলেরা নাকি টুইস্টনাচে পাশ্চাত্যদেশের ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, আর ইস্কুল কলেজ ছেড়ে প্রত্যহ রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে আর টুইস্ট নাচ নেচে বেড়াচ্ছে—এইসব মুখরোচক খবর পেয়ে ক্যালকাটা দেখবার জন্যে হিপিরা খুবই উৎসুক।

* * *

সাংবাদিক ঘুঘুদের কাছে বড় বড় তালেবর ব্যক্তিদেরও মাঝে মাঝে কী মুস্কিলেই না পড়তে হয়। ইংলণ্ডের রাণীর স্বামী প্রিন্স ফিলিপ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের কাছ থেকে কয়েকটি বড়ই অসুবিধাজনক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রথম প্রশ্ন হল :

—এই যে ঘরছাড়া সমাজছাড়া, বেপরোয়া হিপি আন্দোলন চলেছে এদেশে এবং অন্য দেশেও, তার জন্যে তিনি কি উদ্বেগ বোধ করেন? মাথা নেড়ে ফিলিপ বলেন, না, ওবিষয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই।

পরের প্রশ্নটি শুনে কিন্তু তাঁর মাথা ঘুরে গেল। প্রশ্ন হল : আইন বাঁচিয়ে আজকাল যেসব মাদক সেবন চলেছে ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় (তাদের মধ্যে গাঁজা এবং চরসও আছে),-ইংলণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারী তাঁর ছেলে প্রিন্স চার্লস যদি সেইসব মাদক সেবন করেন তাতে কি ফিলিপ আপত্তি করবেন?

একটু ভেবে ফিলিপ বলেন, আইনের প্রশ্নটা কিছু নয়। প্রশ্ন রুচিসেনসের। মাদক এবং নারকোটিক ওষুধ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। সেজন্যে তিনি মনে করেন তাঁর ছেলের সেসব না সেবন করাই ভাল।

পরের প্রশ্ন : ধরুন প্রিন্স চার্লস এমন দেশে গেছেন যেখানে চরস খাওয়ার চল আছে এবং তা বেআইনীও নয়। প্রিন্স চার্লস যদি চরস খেতে চান তাতে কি আপনি আপত্তি করবেন?

জবাবে ফিলিপ বলেন—আগেই বলেছি যে জিনিষ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয় তা আমি কখনই অনুমোদন করব না। আচ্ছা আজ এই পর্যন্ত। নমস্কার।

এই বলে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ, ছেড়েছে যা কেঁচে বাঁচি। এর পরের প্রশ্ন হয়ত হত : আপনারা দুজনে মিলে কি কি মাদক সেবন করেন তার ফিরিস্তি দিন।

• • • •

একটি পাঠকের কাছ থেকে এক পত্র পেলাম। পত্রটি লিখেছেন—শ্রীমলয় ঘোষ (৩এ জগন্নাথ সুর লেন, কলিকাতা—৬)। পত্রটি উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না—

"নৃত্যেরই 'তালে তালে···কথাটা একটু ভেবে দেখেছেন কি দাদা? মানে, আমরা সবাই আজকাল বিভিন্ন রকম নাচ প্রাকটিশ করছি, নানা স্থানে, নানা ভাবে, নানা সময়ে, নানা অবস্থায়।

কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না তো? আচ্ছা প্রমাণ দিচ্ছি, দয়া করে শুনুন :

সকালবেলা চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তো সুরু হোল। বিছানা থেকে উঠবেন তো? অত তাড়াতাড়ি করবেন না। পাশেই ভন্টু ওপাশে আবার মিনি। মাথার ঠিক ওপরেই শ্রীমতী রয়েছেন। আর পা টা অসাবধানে পন্টুর গায়ে লাগতে পারে। তা'হলে বুঝতেই পারছেন এত কসরত করে বিছানা থেকে ওঠার আরেক নামই হোল শয্যানৃত্যম! তারপর কোমর পা বেঁকিয়ে দুমড়ে চেপ্টে যেভাবে ঘরের ভেতরই শুধু পা ফেলতে হবে তাকেও ঘুরঘুর নৃত্যম বলা যায় না কি? তারপর শ্রীমতীর মেজাজ অনুসারে আপনাকে শর্টকাট নৃত্যমে তালিম নেবার জন্য তৈরী থাকতে হতে পারে।

বাজারের থলি নিয়ে বেরোচ্ছেন। ধাঁ করে মাথাটা দরজায় ঠুকে গেল। একশো কুড়ির ভাড়া-বাড়ীতে দরজাগুলো অমন রসিকতা করেই থাকে। 'লাইটে' একটু ছোট হলেও সবসময় আপনাকে 'টাইট' দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। আপনার এখানে জর্মান 'বাও' নাচের বিশেষ ভঙ্গীর অনভ্যাসেই এমন হোল। মাথায় ধাঁ হাতটা ঘসতে ঘসতে বেরিয়ে পড়লেন। বাজারে যাবার পথে ও বাজারের মধ্যে সড়াৎ নৃত্যমে আপনার 'অনার্স' না থাকলে কোন 'অনারই' নেই। মানে স্রেফ বাতিল হয়ে যাবেন দুনিয়া থেকে।

বাড়ী ফিরেই দু'বালতি মাথায় ঢেলেই অফিস ছুটলেন। বাস-ট্রামে ওঠার সময় ভারতনাট্যমের মুদ্রায় পরিচয় দিতেই হবে। নইলে জায়গা দূরের কথা পা পর্যন্ত ঠেকাতে পারবেন না।

তারপর সেদিন এক বিয়েবাড়ীতে গিয়ে আমার ধারণা যে ঠিক আরেকবার তার প্রমাণ পেলেন। রিসেপশনের ছেলেগুলো মড, রক অথবা হিপির মত সাজসজ্জা করেছে একজনের গলায় গরুর ঘণ্টার মত কি একটা চোখে পড়লো! মেয়েগুলোর উদাহরণ ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না তো? হতেই হবে। ইরাণী বাসন-ওয়ালী অথবা বুদ্ধদেবের যুগে মেয়েরা যেমন উর্দ্ধাঙ্গে কাঁচুলী ব্যবহার করতেন সেগুলিই আবার ফিরে এলো নাকি? সামনেই আবার ছোঁড়াগুলোও ঘুরঘুর করছে···।···হঠাৎ ওদেরই মধ্যে কয়েকজন উর্বশী বা রম্ভা বা মেনকা চোখে কাজল, কাঁচুলী পরে কয়েক ছড়া মালা নিয়ে সবাইকে নাচুনি খাওয়াচ্ছে। আপনার দিকে যেভাবেতে একছড়া মালা নিয়ে নাচতে নাচতে একজন এগিয়ে এসে একেবারে গায়ে গায়ে ফ্রিকশান লাগিয়ে আপনার 'রিঅ্যাকশন আনার চেষ্টা করলে আপনি তাতে বিশেষ লজ্জিত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ দেখলেন যে ওপাশ থেকে আপনার স্ত্রীমতী এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যে আপনার বরাতে কি আছে সেটা বুঝতে পেরে আপনার বুকে ধকধক নৃত্যম সুরু হয়ে গেল। তারপর খেতে বসলেন। নিমন্ত্রনকর্ত্তা মিষ্টি হাসির ফাঁকে জানালেন নানা 'নিয়ম্ন' দেখে। তাই এই সামান্য ব্যবস্থাটুকু যেন অতিথিরা সানন্দে মেনে তাঁকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেন। প্লেটে ভালপুরী আলুর দম কবরেজী চপ মাছের ফ্রাই আর ওলের কাটলেট। খাবার সময় গলাটা সুড়সুড় করতে টের পেলেন ওলের কোয়াতি। দই আর সন্দেশ নামে যা পাতে পড়লো সেটা না বলাই ভাল। পরিবেশনের ভার যাদের ওপর তাঁরা ট্রে হাতে নাচের ভাইলে চলাফেরা করতে লাগলেন। আপনার প্লেটে আরো কিছু প্রয়োজন কিনা সে বিষয়ে কেমন যেন উদাসীন নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করেন। মুচকি হাসেন। কি সব ইসারা করেন। মনে হোল, তাইতো, পেট ভরা সম্ভব এমন খাওয়া তো এখানে ভদ্রতার আওতায় পড়ে না! তাই সেতো হেসে মনে মনে গাড়ীভাড়া প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি একগাদা খরচার জন্য আফশোষ করতে করতে বাড়ী ফিরলেন।

এদিকে পেটের জ্বালায় (কারণ মুড়িও বাড়ী থেকে মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে বিদায় নিয়েছে !) সারারাত এপাশ ওপাশ করছেন। আর বৌদি ভাবলেন সেই যৌবনবতী বাসনওয়ালী ইরাণী কাঁচুলীপরা মেয়েটির জন্যে এই পঞ্চাশতেও আপনার মন যে কেমন কেমন করছে! তাই, যে বাক্যবান বর্ষন হল তাতে বিজু নৃত্যম করতে করতে রাত্তে কাটলো আপনার।

তাই ভেবে দেখেছেন তো মিথ্যে বলিনি আমি। এ সমাজে বাঁচতে হলে—নাচুন। নিদেন নাচের বেশ কিছুটা রপ্ত করুন। নইলে চলবে কেন? বাঁচতে হলে, যেমন যখন পারেন যার সঙ্গে পারেন নাচুন! একবার ছুটি বাঁধলে তখন ছাড়ায় কে? যদি না "নাচ" আপনাকে পথে বসায়! তাই বলি, নৃত্যম্···নৃত্যম্ কেবলম্।

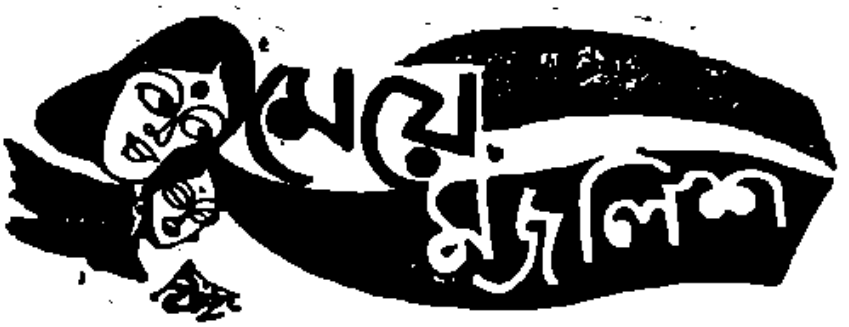

বিকল্প খাদ্যব্যবস্থায় মেয়েরা

বেলা বে

দুনিয়াতে গত পঞ্চাশ বছরে অনেক দ্রুত পরিবর্তন দেখা গেছে, তার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন, সেইটা বোধ হয় সবচেয়ে বিস্ময়কর। এই পরিবর্তন এখনি থেমে যায় নি। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গিয়ে ছোট ছোট স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিবারে এসে দাঁড়িয়েও এর শেষ হয় নি। আরো অনেক অদলবদল করতে হবে। এই ছোট পরিবারগুলির জীবনযাত্রার নিয়ম আরো পাল্টাবে। এখন একটি ছোট পরিবার বলতে মনে হয় মা বাবা দুটি ছেলেমেয়ে, একটি কি একটি দুটি লোকজন। গৃহকর্তা বাইরে কাজ করে টাকা আয় করেন, গৃহকর্ত্রীর কাজ হলো সেই টাকার সদ্ব্যবহার করা। যাতে সংসারটি তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে সবাই সুখে ও শান্তিতে বাস করেন। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ীর গৃহিনীকেও বাইরে আসতে হয় টাকা রোজগারের জন্যে, সেক্ষেত্রে কর্তা গিন্নি দুজনেই বাড়ী রইলেন না কাজেই পারিবারিক জীবনের ছাঁদটাই একটু একটু করে বদলাতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো কিছু নতুন পরিকল্পনা নিয়েই বদলাতে হবে। কারণ ক্রমে ক্রমে এমন সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে যার কথা কয়েকবছর আগেও কেউ কল্পনা করতে পারেন নি। বিশেষ করে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল খাওয়ার সমস্যা। এর জন্য মেয়েদেরই বেশী করে চিন্তা করতে হচ্ছে।

ভবিষ্যতের জন্যে একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সেটি হল প্রত্যেক পাড়ায় একটি করে সমবায় রন্ধনশালার ব্যবস্থা। এ রন্ধনশালার সম্পূর্ণ ভার নেবেন ঐ পল্লীরই মেয়েরা। আজকাল মেয়েরা ঘর সংসারের কাজকে একটা শৃংখলার মধ্যে এনে কাজের সময় অনেকটা কমিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের হাতে কিছু সময় থাকে। পাড়ার যাঁরা শিক্ষিত মেয়ে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনা ভার নেবেন রন্ধনশালার হিসাবপত্রের। বয়স্কারা নেবেন রান্নার সহজ পদ্ধতির ভার। প্রথমে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। পাড়ার প্রত্যেকে যদি সামান্য কিছু অর্থ শেয়ার হিসাবে দেবেন তাহলে সেই টাকাই হবে এই রন্ধনশালার মূলধন। কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি তাঁর বাড়ীর দু'খানি ঘর অন্ততঃ ভাড়া হিসাবে ছেড়ে দেন তাহলে সেই ঘরেই প্রথম সুরু করা যেতে পারে এই সমবায় রন্ধনশালা।

বিদেশে দেখেছি এই সমবায় রন্ধনশালায় সব কাজ মেয়েরাই করেন। যিনি যে কাজে পারদর্শিনী তিনিই নেবেন সেই কাজের ভার। এখানে থাকবে ক্যুপনের ব্যবস্থা। অল্প খরচে কি ভাবে সুস্বাদু রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় এঁরা তাই করবেন। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা তৈরী হবে কয়েকজন রন্ধন পটিয়সীকে

নিয়ে। এখানে ব্যবস্থা থাকবে সকালে অর্থাৎ বেলা ৯টায় যাঁরা খেয়ে অফিস যাবেন তাদের জন্য একরকম। রাত্রের খাবারও কুপন দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন অথবা বসে খাবারও ব্যবস্থা থাকবে। জলখাবার বা টিফিনের জন্য থাকবে খাবারের প্যাকেট।

এই ধরণের রন্ধনশালার কাজকেও সংক্ষেপ করতে হবে। অর্থাৎ ওঁড়ো মশলার ব্যবহার—বাসনপত্র কাঁচের বা ষ্টেনলেস ষ্টিলের এবং রান্নার জন্য থাকবে গ্যাস বা ইলেকট্রিক। সর্বোপরি খাদ্য তালিকায় মাত্র তিনটি পদের বেশী থাকবে না তবে প্রতি সপ্তাহের খাদ্য ব্যবস্থা কিন্তু নতুন ধরণের হবে। এবং এমন খাদ্যবস্তু দিতে হবে যাতে স্বাদ ও পুষ্টি দুইই বজায় থাকে।

আমাদের একটি ধারণা আছে চাল বা গম বাদ দিয়ে অথবা এগুলির পরিমাণ কমিয়ে ঠিক বিকল্প খাদ্য তালিকা করা সম্ভব নয়। এ ধারণা ঠিক নয়। স্বাদের দিকে লক্ষ্য রেখে চিন্তা করতে হবে খাদ্য বৈচিত্র্যের কথা। যা রোজই খাওয়া হচ্ছে তারই মধ্যে নিত্য নতুন পরিবর্তন এনে দিলে একঘেয়েমীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কাজেই সমবায় রন্ধনশালা গড়ে তুলতে পারলে পাঁচজনের পাঁচরকম রান্না খাওয়ার মধ্যেও ঐ একঘেয়েমীটা কেটে যাবে।

আমি সমবায় রন্ধনশালার জন্য কয়েকটি খাদ্য তালিকার কথাও ভেবেছি সেগুলি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করছি।—যেমন ধরুন ভাতের বদলে চারখানি সবজি রুটি ডিম বা সবজির ঝুড়ি, একটু চাটনী। কোনদিন বা খিচুড়ি এবং সপ্তাহে একদিন ভাত ও পোলাও। প্রতিদিন ডাল অবশ্যই থাকবে। রাত্রের খাদ্য তালিকায় আলুর রুটি, রাঙ্গা আলু বা আলুর পায়েস, মাংসের সুপ। এখন তো শাক সবজি যথেষ্ট পাওয়া যায় কাজেই বেশী করে সালাড খাওয়া যেতে পারে। আটার রুটি ছাড়া মাঝে মাঝে লুচ্চা, মাইলো বা রাগীর রুটি দেওয়া যাবে। থালিয়ার কথা তো অল্প বিস্তর সবাই জানেন তবে এই থালিয়ার ব্যবহারও বাড়াতে হবে। তখনো জলখাবার থাকবে। একটি যে কোনো ফল, কলা, পেয়ারা, পেঁপে ইত্যাদি নারকেল বা চালের গুড়ের নাড়ু। মাঝে মাঝে ডিমের ও টমাটোর স্যাণ্ডউইচ দেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে সারা বছরেই যথেষ্ট সবজি পাওয়া যায় কাজেই ডাল আর সবজির পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে চাল বা আটা কম পাওয়া গেলেও খুব অসুবিধায় পড়তে হয় না।

সর্বোপরি আবার বলছি—পাড়ায় পাড়ায় যদি community kitchen বা সমবায় রন্ধনশালার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে খরচের দিক থেকেও কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বিশেষ করে সময়েরও সদ্ব্যবহার করা যায়। সমবায় বা কো-অপারেটিভের মূলমন্ত্রটি হলো 'বহু জনহিতায় চ'।—বস্তুতঃ সমবায়ের সার্থকতা তার জনপ্রিয়তায় ও জনসেবায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্মশক্তিকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্ব সাধারণের জন্য লাভ করা—একেই বলে সমবায় নীতি।" যে কাজ একলার পক্ষে সম্ভব নয় সে কাজ যদি সমবেত হয়ে করা যায় তার আনন্দ ও সার্থকতা কম নয়। আমরাও যদি বিদেশের মত পাড়ায় পাড়ায় সমবায় রন্ধনশালার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে অনেকেই রান্না ও খাওয়ার সুযোগ সুবিধা পাবেন। হয় তো প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হবে কিন্তু সকলের সহযোগিতায় আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।—এজন্য মা বোনেদের সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে—আশাকরি সে সুদিনের আর দেরী নেই।

পৌষ পার্বণ

উষা ভট্টাচার্য

শিশুবেলা থেকে শুনে আসছি কথাটি, পৌষের পর্বণ অর্থাৎ উৎসব।

কথায় বলে বার মাসে তের পার্বণ। একথা শুধু বাঙ্গালীর পক্ষেই প্রযোজ্য নয়। সমগ্র মানব গোষ্ঠীর প্রতিটি আচার ব্যবহারে একথার তাৎপর্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে সেই আদিম যুগ থেকে।

মানুষ সঙ্গপ্রিয় প্রাণী। একা থাকতে মানুষ ভালবাসেনি তাই সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ ঘর বেঁধেছে একত্রে, গ্রাম গড়েছে একত্রে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আতঙ্কিত হয়েছে একত্রে, আবার প্রকৃতির উপচার উপভোগ করেছে একত্রে।

বছরের প্রতিটি ঋতুর পরিবর্তন মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে। নিত্যকার দিনটি থেকে কয়েকটি দিনকে তারা তাই বেছে নিয়েছে আলাদা করে, কিছু নতুন উপচারে নতুন ব্যবহারে উপভোগ করেছে সেই বিশিষ্ট দিনটিকে আলাদা করে নিয়েছে নিতান্ত প্রাত্যহিক অভ্যস্ত আচার বিচার থেকে। এই নতুনত্বের স্বাদই দিয়েছে মানুষের জীবনে আনন্দ। মানুষ নতুনের পিয়াসী তাই নিত্যকার দিন থেকে বেছে তুলেছে তার উৎসবের দিনগুলিকে।

উৎসব মানুষ একক হয়ে উপভোগ করতে পারে না। মানুষ নিজেকে যখন নবসজ্জায় নতুন ছন্দে সজ্জিত করে তুলেছে মন চেয়েছে অপরের চোখে প্রশংসমান জ্যোতি, তেমনি যখন উৎসব সজ্জায় গৃহপ্রাঙ্গন ধারণ করেছে নবরূপে মানবমন স্বভাবতই প্রাঙ্গনে প্রান্তে বন্ধুর আগমন আকাঙ্খায় রয়েছে প্রতীক্ষমান।

এমনি করে গড়ে উঠেছে বহু পার্বণ দিন, আনন্দের দিন, বন্ধুর সংগে সন্ধি বা গ্রন্থি বন্ধনের দিন।

মানুষের মন বৈচিত্র বিলাসী। সে চেয়েছে নিত্যকর্মে বিরাম। খুঁজছে কর্মে বৈচিত্র, দৃশ্যে বৈচিত্র, রুচিতে বৈচিত্র, নিয়মে বৈচিত্র। কল্পনাপ্রবণ মানবমানস অনুসন্ধান করেছে নবনবরূপে রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। নিরন্তর পরিবর্তনে প্রকৃতির ভাণ্ডারে সে খুঁজে পেয়েছে উৎসবের সন্ধান। উৎসবের দিনটি এমনি করেই নির্দেশিত হয়েছিল। ঐ নির্দিষ্ট দিনে প্রকৃতির পরিবর্তন সহায়তা করেছে পার্বণের দিনটিকে বিচিত্র রূপ দিতে। মানুষ পেয়েছে নতুনের আস্বাদ। নতুন এনে দিয়েছে সৌন্দর্য আর সুন্দর থেকেই ফুটে উঠেছে আনন্দ—আনন্দই দিয়েছে শান্তি। আমাদের পার্বণের দিনগুলিতে কিছু কিছু ধার্মিক অনুষ্ঠানের সংমিশ্রনে, সদাচার ও সুরুচি সংযুক্ত হয়।

ফলে দুটি মানস চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ধাবিত হয়। আমাদের পার্বণগুলি তাই প্রাচীনকালে প্রকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হোতো। মাসে মাসে এমন কত না "পালনী" বা পার্বণ পালন করা হোতো। সেকালে কি পুরুষ কি নারী সকলেই অপেক্ষাকৃত নির্মল চিত্ত ছিলেন সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে এমনি করে রূপ মাধুর্য উপভোগ করতে সরল প্রাণ গৃহস্থ এগিয়ে এসেছেন ইষ্ট কুটুম্বের কাছে। এগিয়ে এসেছেন গ্রাম প্রতিবেশীর অন্তরঙ্গ হয়ে। আত্মীয় ও আত্মার তৃপ্তি এমনি করেই আহরিত হোত।

প্রকৃতির পরিবর্তনে ভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব। সুখকর ঋতুর সমাগমেই তাই সাধারণত উৎসব পার্বণের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। জ্যোতিষিক যোগ, বিশেষ করে, স্মরণীয় কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেই কোন বিশেষ পূজা, ব্রত, পার্বণ বা উৎসবের দিনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শারদোৎসবে নবরাত্র ব্রতই দুর্গোৎসব। ব্রতশেষে নতুন শস্যবরণের সূচনা হয়। সেইদিন বিজয়াদশমীর উৎসব, প্রাচীনমতে সেইদিনই হিন্দুর বর্ষারম্ভ।

কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। শ্রাবণী পূর্ণিমায় ঝুলন বা শ্রীকৃষ্ণের দোলন উৎসব। এমনি বিভিন্ন প্রাকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত আমাদের উৎসবের দিনগুলি। ভাদ্র ও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে অরন্ধন বিধি। অতিবর্ষায় সিক্ত পরিবেশে একদিন বা দুদিন বিরতি। খাদ্যদ্রব্যের রুচির পরিবর্তন ও কিছু চিত্ত সংযমের অবকাশ অবশ্যই উপেক্ষনীয় নয়।

প্রখর রৌদ্রতাপে সন্তাপিত শুষ্ক ধরাতলে সামান্য কারণেই যখন দাবানলের আশঙ্কা তখন অগ্নি বা ব্রহ্মা পূজার বিধি প্রশস্ত। দেশেদেশে সেকালে ইষ্টকালয়ের প্রচলন ছিল না সুতরাং এ বিধি সাবধানী পন্থাসম্ভূত সন্দেহ নেই।

শীতে মাঘের হিমভেজে সুঘ্রাণী কন্যার সূর্য দেবের আবির্ভাবের উপাসনায় ব্রতী হওয়া একাধারে যেমন সুশিক্ষার সহায়ক তেমনি চারুকলায় ব্রতিনীর আগ্রহের পরিপোষক। কুয়াশা কেটে আলো আঁধারে ফুল কুড়িয়ে কচি হাতে ফুলের সঙ্গে দুর্বাদলের গোছ বেঁধে ঘাটে ঘাটে সুপুরির খোলায় নৌকো ভাসিয়ে মিষ্টি সুরের ছড়াকাটা যেন সেই রূপ-কথার ছবি গড়ে তোলে। শীতের সাঁঝে সারা উঠোনের গায়ে আলপনা দেখে আকাশের তারায় ব্রত রচনা আর একটি মধুর বৈচিত্র। অগ্রহায়ণের রবিবারে সূর্যোপাসনা ইষু ব্রতিনীকে চিত্ত শুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে। মাসান্তে সংক্রান্তি দিনে ঘট বিসর্জনের সঙ্গে ব্রত সমাপ্তি। এমনি শুভুতে শুভুতে কত না পার্বণ ব্রত করে সেই ভের ছেড়ে তেত্রিশ পেরিয়ে যায়, ধর্ম প্রবণ চিত্ত তার সন্ধান পেয়ে উৎসুক হয়ে ওঠে বরণ করে নেয় উৎসব মুখর নতুন পরিবেশ।

তারপর পৌষে শীতের মরশুম শস্যের মরশুম। ঘরে ঘরে নতুন ফসল উঠবে। সারা বছরের সেরা শস্য আমন শস্য। বাঁচবার প্রধান খাদ্য আমন ধান এবার ঘরে উঠবে।

প্রথমে বীজ বপন হলো তারপর সে ধানের সাধ ভক্ষন উৎসবটিও পালন হলো। চাষীরা প্রত্যুষে কাঁচা হলুদ বাটা সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে হাতে নিয়ে মাঠের প্রান্তে নেমে বলে—

"ধান রে সাধ খা পাক্যা কুল্যা
ঘরে যা।"

ধানের ক্ষেতে তেল হলুদ ছড়িয়ে দিয়ে একমাত্র মঙ্গল কামনা "আমার গোলা যেন ভরে ওঠে।" ঘরে ঘরে গাঁয়ের বধূর কামনা কি বৃথা যায়! ধানের সেই সাধ ভক্ষন দিনে চাষী মাঠে গিয়েছিল আর চাষী বৌয়েরা—গৃহস্থের গৃহিণীরা? ঘরদুয়ার নিকিয়ে চকচকে করেছে। ছড়া কেটে মশামাছি পোকা মাকড় তাড়িয়েছে, "হালের অর্জন ফসল আর জালের তোলা মাছ" সেদিন তারা খায়নি।

শুদ্ধ চিত্তে গোলার মঙ্গল চিন্তায় দিন কেটে যায়। তারপর সত্যি সে দিন আসে। মাঠের নতুন ধানের শীষকে বরণ করা হয় এক পরব দিনে। তারপর ধান পাকে, আসে নতুন ধানের উৎসব নবান্ন।

"নবান্নের পূর্বে নতুন অন্ন কেউ মুখে দিও না।"—সাবধানী চোখ গৃহিণীর গৃহকর্তার। প্রথমে ঐ অন্ন উৎসর্গ হবে পিতৃপুরুষের তৃপ্তিকল্পে, দেবতার আরাধনায়, তবে আত্মীয় স্বজনকে। গাভী কাকাদি পশুপক্ষীও কি বাদ যাবে। তারাও অংশীদার।

এই নতুন শস্যকে অভিনন্দন করতে লক্ষ্মীর পূজো হওয়া আনুষ্ঠানিক। ধান খাও, ধান লক্ষ্মী!

বিভিন্ন শস্য উৎপাদনকালে শস্য উৎসব আরো হয়। আমের দিনে আম দিয়ে প্রথমে নবান্নের "কাসন্দি' দিয়ে, চৈত্রে ছাতু সংক্রান্তিতে। আত্মীয় পরিবারবর্গকে আম কাসন্দি আর ছাতু খাইয়ে তৃপ্তিলাভ এইসব পার্বণের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই।

এই নবান্ন উৎসবের শেষের অংশটি সত্যই লোভনীয়, মুখরোচক নতুন ধান ত উঠলো। পৌষমাস, নতুন চালে নতুন গুড়ের মহাত্মম। ঘরে ঘরে নতুন শস্য, নতুন পণ্য লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখতে হবে। চাই লক্ষ্মীর পূজা। গৃহিণী তাই ধানের গোলা নিকিয়ে পরিষ্কার করেন।

ধানের মরাই, ঘরের পেটরা খড় দিয়ে বাঁধেন।

ছেলেরা বলতে থাকে—

'আওনি, যাওনি, চাওনি. তিন দিন পিঠা খাওনি।' নতুন চালের প্রসাদ হাতে ছোট বুড়ো সবাই অনুমতি নেয় গৃহিনীর কাছে।

"মা নতুন খাব?" "খাও।" ছেলেকে অনুমতি দেন মা তবেই প্রসাদ ভক্ষণ, এমন কি গৃহকর্তাও পত্নীর অনুমতির অপেক্ষায় ব্রতিনীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। "কি নতুন খাব?" উত্তর হয় "খাও", এখানে আজকের দিনে গৃহলক্ষ্মী গৃহিনীরই প্রাধান্য।

লক্ষ্মীর আগমন ও বন্ধন ত হলো। তিনি ঘরে বাঁধা থাকুন চিরকাল এই একমাত্র প্রার্থনা। পৌষের সংক্রান্তিতে পৌষকালী পার্বণ বা পিঠে-পরব। পিঠে···যে সে পিঠে নয়। পুলি পিঠে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, পেট পুরে তার গুড় নারকেলের পুর। কোথাও বা ক্ষীর। নতুন চাল সুস্বাদু, সুস্বাদু নতুন গুড়। আখের আর কোথাও বা খেজুরের নলেন গুড় বা কোলাগুড়। ঘরে ঘরে পিঠা। পিঠা পর্ব। কত রকমের পিঠা! কাউকেও বলতে হয় না এ পিঠা-পার্বণ পালন করতে এলো। এ আবাল-বৃদ্ধ বনিতার পার্বণ। এ পার্বণ হয় প্রথমত গৃহের কল্যাণার্থে। মুখ্যত রসনার তৃপ্তি বিধানার্থে। এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহিনীর তুষ্টি সাধনার্থে।

পূজার প্রসাদে পূজারী ও ইষ্ট কুটুম্বের আনন্দ বিধান আর একটি উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। বৈদিক যুগে "পুরোডাস" পিঠে দিয়ে আহুতি প্রদান করা হতো দেবতার উদ্দেশ্যে। বছরের অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন প্রকার পিষ্টকেও দেবতার পূজা সেকালের রীতি ছিল। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় পিষ্টক পার্বণ প্রচলিত ছিল তবে শীত ঋতুর

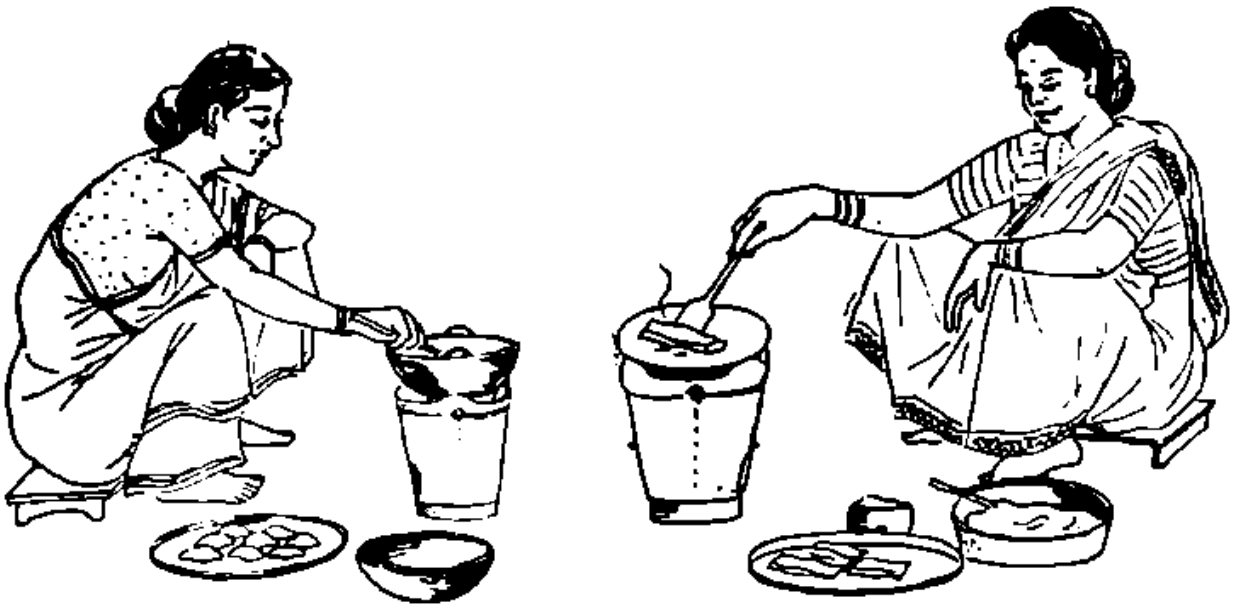

পর্বই প্রাধান্য পায়। ছোট ছেলেরা গ্রামের ঘরে পার্বনী নিয়ে চাল, ডাল, কলা, মূলা সংগ্রহ করে পৌষালা বনভোজন করে আনন্দ করতো।

এই সব পার্বণের প্রায় সব কটিই প্রাচীন কালের মহিলাদেরও একাধিকার ছিল। প্রায় প্রত্যেক পার্বণেই পার্বণের প্রসাদ ভক্ষনেই পুরুষের বা স্বামীর কল্যাণ হত। বিশেষ ক'রে পিঠাপার্বণ বা পৌষ-পার্বণে পুরুষের করণীয়ের প্রধান অংশ হলো নতুন দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করা ও পূজা অন্তে পিষ্টক গ্রহণ করে নিজ রসনা ও রমনীর মানসিক আনন্দ বিধান করা। আর রমণীর আনন্দ, সৃষ্টির—পিষ্টক রন্ধনের। পিষ্টক রচনার কারিগরী রমণীর একক ও স্বাভাবিক নৈপুণ্য। তখনকার দিনে শুধু ধনী গৃহের পর্বই এ নয়। ছোট পল্লীর একটি সাধারণ চাষী বউও এ-গুণের অধিকারিনী। সে বৌ পৌষ মাসে পিঠা তৈরী করতে বসে ছড়া কাটছে উনুনের পাশে—

"কার হাতে গো তেল আমলা
সবার হাতে হাতে দিও।
ঘি দিয়ে আমরা পঞ্চগ্রাস
সরু ধানে ভোলভরে
কালো পুতে কোলভরে।
রসুন কাঠে রেঁধে খায় আড়ি মাপে কড়ি পায়।"

প্রগতির পথে অগ্রসী নারী মহল প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই কারিগরী বিদ্যাকে যত দিন না ভুলে যাবেন ততদিনই ভবিষ্যতের বংশধররা এই পিষ্টক পর্বকে হারিয়ে ফেলবে না। কিন্তু গ্রামের আকাশরেখায় প্রতিদিন যে রূপান্তর ঘটছে, কারখানার ধোঁয়ার জাল ভেদে আর সঙ্কেত বাঁশীর সুর ঠেলে কতদিন আর গ্রামের মেয়ে সূর্য-স্তব করতে পারবে কে জানে।

শীতের দিনের দুটি খাবার

বকুলা মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন জাতের মানুষ বাস করে বিচিত্র অভিরুচি নিয়ে। তাদের খাদ্য রুচিও বিচিত্র।

আমরা যে সব খাদ্য প্রত্যহ খাই তার মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র, কিছুটা নতুনত্ব থাকা দরকার। খাওয়ার ব্যাপারে বাঁধাধরা নিয়ম অপ্রীতিকর। একরকম জিনিষ একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মনের মত রান্না করলে তা খেতেও ভাল লাগে, যারা খায় তারাও তারিফ করে। শীতের মরশুমে এই জন্যে উপযোগী দুটি খাবারের কথা বলছি।

ফুলকপির কাটলেট :—

উপকরণ : বড় ফুল কপি একটি। ভিনিগার এক ছটাক, আদা এক তোলা, রসুন ছয় কোয়া। কাঁচা লংকা দুটি, নুন পরিমাণ মত। এরারুট বড় চামচের দু চামচ, বিস্কুটের গুড়ো এক পোয়া, ঘি আধ পোয়া। রসুনের গন্ধ যদি ভালো না লাগে তার বদলে পেঁয়াজ দেওয়া চলে।

প্রণালী : কপির ডাঁটা লম্বা রেখে এক একটি ফুল কেটে নিন, পরে ডাঁটা একটু চিরে নিন। আদা, কাঁচা লংকা, রসুন বেশ মিহি করে বেটে নিন। প্রথমে কপির টুকরো নুন জলে সিদ্ধ করতে হবে অল্প করে। তারপর জল থেকে তুলে নিয়ে ছুরির উল্টো দিক দিয়ে চেপে চেপে কাটলেটের মত করে তৈরী করতে হবে। আদা, রসুন ও লংকা বাটার সঙ্গে নুন ও ভিনিগার মিশিয়ে কাটলেটগুলোতে বেশ করে মাখিয়ে রাখুন। এরারুট জল দিয়ে গুলে রাখুন। এখন কাটলেটে এরারুট গোলা লাগিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো বেশ করে নিন মাখিয়ে। ফ্রাই প্যান ঘি দিয়ে চড়ান, ঘি গরম হলে কাটলেটগুলো লাল করে ভেজে তুলে রাখুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

কড়াইশুটির ঘোঁকাকারি—

উপকরণ : কড়াইশুটি তিন পোয়া, আলু চারটে। দই এক ছটাক, আদা দু' তোলা, পেঁয়াজ দু'টি। ধনে বড় চামচের এক চামচ, জিরে চায়ের চামচের এক চামচ, হলুদ দু'গিরে, শুকনো লংকা দুটি। ছোট এলাচ দু'টি, লবঙ্গ চারটি, দারচিনি এক টুকরো, চিনি মাঝারি চামচের এক চামচ, নুন আন্দাজ মত, তেজ পাতা চারটি, ঘি তিন ছটাক।

প্রণালী : কড়াইশুটি ছাড়িয়ে বেটে নিন। ধনে, জিরে হলুদ, লংকা, আদা, পেঁয়াজ সব আলাদা করে বেটে রাখুন। এখন বাটা কড়াইশুটিতে অর্দ্ধেক পেঁয়াজ বাটা, একটু আদা বাটা, চায়ের চামচের এক চামচ ধনে বাটা, অর্দ্ধেক জিরে বাটা, একটু লংকা বাটা আর একটু নুন ও চিনি দিয়ে বেশ করে মেখে নিন। কড়াতে এক ছটাক ঘি চাপান, ঘি গরম হলে এই মশলা মাখা কড়াইশুটি বাটা ছেড়ে কসে নিন। তারপর একটি থালায় ঢেলে, হাত দিয়ে চেপে চেপে বেশ করে জমিয়ে নিয়ে, ছুরি দিয়ে চৌকো করে কেটে নিন। ফ্রাইপ্যানে এক ছটাক ঘি দিয়ে এইগুলো লাল করে ভেজে তুলে নিন। আলু চারফালি করে কেটে এই ঘিয়ে কসে রাখুন।

একটি হাঁড়িতে আর এক ছটাক ঘি চাপান, গরম হলে তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে, পেঁয়াজ, আদা, ধনে, জিরে, হলুদ, লংকা বাটা, সব দিয়ে কষুন। তারপর দই দিন। বেশ লাল করে কষা হলে আলু ছেড়ে দিয়ে সের পোয়া আন্দাজ জল দিন। ফুটলে গরম মশলা চিনি ও নুন দেবেন। আলু সিদ্ধ হয়ে গেলে হাঁড়ি নামাবার আগে কড়াইশুটির ঘোঁকাগুলো দিয়ে হাঁড়ি নামিয়ে রাখুন।

অঙ্গনা-সংবাদ

দেবযানী

শ্রীমতী নিনা কারসো-র জন্মভূমি ইউরোপের পোল্যাণ্ড দেশে। বয়স ছাব্বিশ। বিবাহিতা। বড় পরিচয় হল—ইনি একজন লেখিকা। কিন্তু একটি দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শারীরিকভাবে ইনি আংশিক অপঙ্গু, পঙ্গু! অবশ্য তার জন্যে লেখনীচালনায় কোন বাধা বা অসুবিধা নেই, লেখিকা হিসেবে অনেকেই জানেন তাঁর নাম।

কিছুদিন আগে জানা গেল, শ্রীমতী কারসো তিন বছরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন নিজের জন্মভূমিতেই। শুনে অনেকেই দুঃখিত হলেন। কেউ-কেউ হলেন ক্ষুব্ধ। খবরটি ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশেও প্রচারিত হল।

কিন্তু কী ব্যাপার? পঙ্গু লেখিকার প্রতি এ দণ্ডাদেশ কেন? সেকথা জানা গেল শ্রীমতী কারসো-র প্রতিপালিকা মাতার একটি পত্রে। এই মা গর্ভধারিনী মায়ের চাইতে কোন অংশেই কম নন নিনার কাছে। কন্যার শাস্তিবিধানে তাই তাঁর পক্ষে বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই তিনি চিঠি লিখলেন পোল্যাণ্ড-রাজধানী ওয়ারস-এর বিভিন্ন সংস্থার কাছে, সব কথা জানিয়ে কন্যার তরফে তাঁদের সহানুভূতি ও হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন।

তিনি সপ্তাহব্যাপী একটি গোপন বিচারশালায় আসামী হিসেবে হাজির করা হয়েছিল নিনাকে। অভিযোগ করা হয়েছিল: দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে এমন কিছু রচনার পাণ্ডুলিপি নিনা বিদেশে পাঠিয়ে সেখানে প্রকাশ করবার নাকি মতলব এঁটেছেন। বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে নিনাকে কারাদণ্ড দেওয়া হল তিন বছরের জন্যে।

শ্রীমতী কারসো-কে নাকি গ্রেপ্তার করা হয় বছরখানেক কি তারো বেশি আগে। দেশের কর্তৃপক্ষ নাকি আবিষ্কার করেন, কারসো একটি বই লিখছেন সেসময়ে—সাম্প্রতিককালের পোল্যাণ্ডীয় গোপন রাজনৈতিক বিচারসমূহ সম্পর্কে।

এই ব্যাপারে পোল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের বাইরে লেখক ও চিন্তাবিদ্ মহলে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল বলে শোনা গেল।

• • • •

সেবার ইংলণ্ডের ফাইনাল আইন পরীক্ষার ফলাফল বেরোলে দেখা গেল, মোট যে সাতশো পঞ্চাশ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন কুমারী লেস্‌লি অ্যাপ্‌লবি নামে এক তরুণী। পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজের বাইরে ও অবসরে এই তরুণীটি ক্যাশন মডেল হিসেবে কাজ করতেন।

কিন্তু মুশকিল হল কী, আইন পাশ করবার পরে একদিকে যেমন অ্যাপ্‌লবিকে আইনজ্ঞ দলে যোগ দিতে ও 'প্রাকটিস' আরম্ভ করতে আহ্বান জানানো হল, অন্যদিকে তেমনি ফতোয়া দেওয়া হল, মডেলের

কাজ তিনি আর করতে পারবেন না। কাজেই হিসেবে ব্যারিস্টার 'ইন্ অব কোর্ট' জানালেন, মডেলের কাজ হচ্ছে জীবিকা সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনবিশেষ; বিশেষতঃ, এতে ক'রে ব্যারিস্টারদের রীতি ও নীতি আহত এবং ব্যাহত হয়।

অথচ ফ্যাশন মডেলের ঐ 'পার্টটাইম' পেশাটি কুমারী লেস্‌লির নেশাও নয়, শখের ব্যাপারও নয়। তিনি লণ্ডনের বিভিন্ন ফ্যাশন প্যারেডে অংশ গ্রহণ করা আরম্ভ করেন যেদিন থেকে আইনের ছাত্রী হলেন, সেই সময় থেকে মাত্র। এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রথম বছরের পড়ার খরচ সংগ্রহ করা। কারো গলগ্রহ না হয়ে বা মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের চেষ্টায় ব্যারিষ্টার হবেন, এই ছিল লক্ষ্য।

তবে মডেলগিরি বন্ধ হলেও আরেক দিক থেকে অ্যাপ্‌লবি ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। নতুন কোন ব্যারিষ্টার লণ্ডনের মত শহরে বাস ও প্র্যাকটিস করতে গেলে খরচের যে ঠেলাটি আসে তার তাল সামলাবার মত রোজগার কি আর প্রথম দিকে হয়? পশার জমলে তবেই না! অথচ ঠাটটি বজায় না রাখলেই নয়।—একথাটা বিলেতের "গ্রে'জ ইন্" নামীয় আইনজ্ঞ-সংস্থার মোটেই অজানা নয়। এবং তা বিবেচনা ক'রেই তাঁরা কুমারী লেসলির জন্যে একটা বিশেষ মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন যাতে ক'রে এই তরুণীর ব্যারিষ্টার পর্বের দ্বিতীয় বছরের খরচপত্র নির্বাহ করা যাবে।

• • • •

স্বর্গতা রাণী মেরী, গ্রেট-ব্রিটেনের ইতিহাসে যাঁর নামটি সুপরিচিত,—মার্লবরো হাউস হচ্ছে তাঁর লণ্ডন নিবাসের নাম (বাড়িটি এখনও বর্তমান)।

এখানে, অর্থাৎ এই প্রাসাদে, একটি 'কমনওয়েলথ চ্যারিটি ফ্যাশন শো'-এর ব্যবস্থা হয়েছে। প্রদর্শনীতে আফ্রিকার 'কামিং-য়্যাণ্ড-গোয়িং' নামক পোষাক, এশিয়ার নানা অলঙ্কার, ইত্যাদি নানা জিনিস দেখানো হবে। বিকলাঙ্গ শিশুদের এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ এর উদ্দেশ্য। টোরোরো নামক স্থানের রাজকুমারী এলিজাবেথ বাগায়া, যিনি হচ্ছেন ওখানকার সর্বশেষ স্বর্গত রাজার ব্যারিষ্টার দুহিতা, তিনি উগাণ্ডার 'কামিং-য়্যাণ্ড-গোয়িং' পোষাকের 'মডেল' হচ্ছেন। (এই পোষাকটির বৈশিষ্ট্য—কাপড়ের ওপর নানা লোককাহিনী ছাপা থাকে। কাহিনী শুরু পোষাকের সম্মুখভাগে, শেষ পিছনদিকে।) অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রীর স্ত্রী তাঁর দেশের ডিজাইন প্রদর্শন করেছেন। সিঙ্গাপুর থেকে আসছেন পিয়ের-কাডিন-মডেল শ্রীমতী আনক। জামাইকা থেকে সিলভানা হেনরিক্‌স্। অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসছেন আরো একজন: নাম পামেলা স্যেল্‌টন।

যেসব মহিলারা দেশবিদেশ থেকে আসছেন এই প্রদর্শনীতে ফ্যাশন মডেল হয়ে, তাঁরা প্রায় সকলেই নিজের নিজের দক্ষিণা দান করেছেন চ্যারিটির কল্যাণব্রতে। যাতায়াত ও ঐ জাতীয় সামান্য কিছু খরচ কেবল নেবেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

• • • •

ব্রহ্মদেশের একটি চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকায় একটি লেখা বেরোবার পর চিত্রজগতে আর দর্শক সমাজে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। ঐ লেখায় একটা খবর ছিল যা নাকি 'মুখরোচক' এবং 'অজ্ঞাতপূর্ব'। কাজেই বিস্মিত হল অনেকেই। খবরটা হচ্ছে জনৈকা জনপ্রিয় বর্মী সিনেমা-অভিনেত্রী সম্পর্কে: তিনি নাকি জনৈক ফুটবল খেলোয়াড়কে গোপনে বিবাহ করেছেন এবং পরে জননী হতেও চলেছেন।

অভিনেত্রীও পড়লেন এই কাহিনী। তখন ঐ পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে জানানো হল যে, খবরটি

সর্বৈব মিথ্যা ও আপত্তিকর, এবং এই রকম একটা মানহানিকর খবর ছাপার অভিযোগে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা আনা হবে।

তখন এক সংখ্যায় পত্রিকাটির পক্ষ থেকে ঐ অভিনেত্রীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া হল—ছাপার হরফে। কর্তৃপক্ষ একথাও জানিয়ে দিলেন পাঠক সাধারণকে, যে, এই সম্পর্কে পত্রিকায় এর আগে যে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল তা ভুল ও ভিত্তিহীন—রচনাটি ও 'খবর'টি তাঁদের অনেক 'ফ্রীলান্স' লেখকের কাণ্ড, এবং এই ব্যাপারের পর থেকে দায়িত্বজ্ঞানহীন সংবাদদাতার সঙ্গে পত্রিকা পুরোপুরি কাটান-ছেঁড়ান ক'রে দিয়েছেন।

• • • •

তিন সন্তানের জননী ছিলেন মিসেস রাইট। বয়স ত্রিশ। নিবাস লণ্ডনের কাছাকাছি লিউটন নামক স্থানে। আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে, অর্থাৎ ওঁর বয়স যখন ষোল, নেহাৎ শখ ক'রেই ছবি আঁকতে শুরু করেন। মিসেস রাইটের আঁকা, একখানি ছবি সম্প্রতি লণ্ডনের এক আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনীর জন্যে মনোনয়ন করা হয়েছে। প্রদর্শনীটির একটু বিশেষত্ব আছে: যাবতীয় গৃহিনীদের আঁকা ছবি স্থান পাচ্ছে রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস-আয়োজিত এই 'জাতীয় আর্ট গ্যালারি'তে। সারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে হাজার হাজার ছবি এসেছিল এই চিত্র প্রদর্শনীর জন্যে, তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হয় শ্রীমতী ইভার ছবিখানিই। ছবিটি তেলরঙে আঁকা একটি বিমূর্ত শিল্পকর্ম, নাম বা 'ক্যাপসান'—"দি সান" অর্থাৎ "সূর্য"।

• • • •

আমেরিকার মানুষেরা মিসেস মার্গারেট আন্নার বার্ণসের নাম ভালই জানেন, নামকরা উপন্যাস লেখিকা এবং নাট্যকার বলে। এই ভদ্রমহিলা সম্প্রতি হৃদ্‌রোগের আক্রমণের ফলে পরলোকগমন করেছেন কেম্ব্রিজ শহরে। বিংশ শতাব্দীর বিংশ দশকে প্রকাশিত "ইয়ার্স অফ গ্রেস" নামক তাঁর উপন্যাসখানি পাঠক সমাজে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগায়। এই গ্রন্থখানির জন্যে মার্গারেটকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পুলিট্‌জার প্রাইজ দেওয়া হয়। উপন্যাস ছাড়া এঁর অনেকগুলি নাটক মঞ্চে সাফল্য অর্জন করে। এগুলির মধ্যে "জেনী", ভিজ্‌ অনার্ড লেডী", ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

• • • •

মেয়েটির নাম প্যাট্রিসিয়া হার্পার। কুমারী। বয়স বর্তমানে মাত্র তেরো বছর। আজ থেকে পাঁচবছর আগে যখন ওর বয়স আট, সেই সময় ওর খুব একটা শক্ত অসুখ করেছিল। অসুখ সারল বটে মেয়ে প্রায় পক্ষাঘাতাক্রান্ত হয়ে পড়ল। স্বাভাবিক নড়াচড়া, খেলাধুলো ওর কাছে অসাধ্য হয়ে উঠল। হাত-পা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াতেই পারত না তো ওসব করবে কী!

কী হয়েছিল বলি। আট বছরের মেয়ে প্যাট্রিসিয়া সহজ স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় এক রাত্রে ঘুমোতে গেল। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে আর নড়তে পারে না। শরীরের অস্থিগ্রন্থিগুলোয় একসঙ্গে খিল ধরে যেন 'জ্যাম্' মেরে গেছে। কী ক'রে হল, কেন হল, তা বোঝা গেল না—কিন্তু মেয়ে আর নড়াচড়া চলাফেরা কিচ্ছুটি করতে পারে না—যাকে বলে পঙ্গুদশা। ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ অনেক দেখান হল, কেউ কিছু হদিশ বা প্রতিকার করতে পারলেন না! ছ'মাস ধরে ওকে বয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হত সবখানে।

সবাই ধরে নিলে, চিকিৎসাবিদ্যা হার মেনেছে যখন, তখন এর আর কোন প্রতিকার অসম্ভব।

এ সময় একজন পরামর্শ দিলেন, হার্পারকে দিয়ে কোনপ্রকারে যদি স্কেটিং করান যেত—জোর ক'রেও—হয়ত বা সুফল দর্শাতেও পারত। তাই করা হল শেষে। আঃ, সে কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! স্কেটিং এক ধরণের চাকাওয়ালা পা-গাড়ি বিশেষ নিয়ে খেলা। যার প্রচলন বরফজমার দেশগুলোতেই বেশি। প্যাট্রিসিয়ার পক্ষে যে কী কষ্ট, কী সাধনা। ক্রমশঃ স্কেটসহ নড়তে পারল মেয়ে অল্পে অল্পে। আরো অনুশীলন উত্তরোত্তর সাফল্য। সম্প্রতি বার্মিংহামের এক স্কেটিং প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় প্যাট্রিসিয়া প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান লাভ করতে পেরেছে। ওর এখন বিশ্বাস, স্কেটিংএর শরণ না নিলে চিরপঙ্গুই হয়ে থাকতে হত ওকে। পড়াশুনো শেষ ক'রে ও বোধহয় স্কেটিংএই পেশাদার হবে।

ভ্রমণ-সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
যশস্বী লেখক শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তীর
নূতনতম অবদান
"অন্ধের মন্দির"
আগামী মাস থেকে ধারাবাহিক ভাবে চলবে।

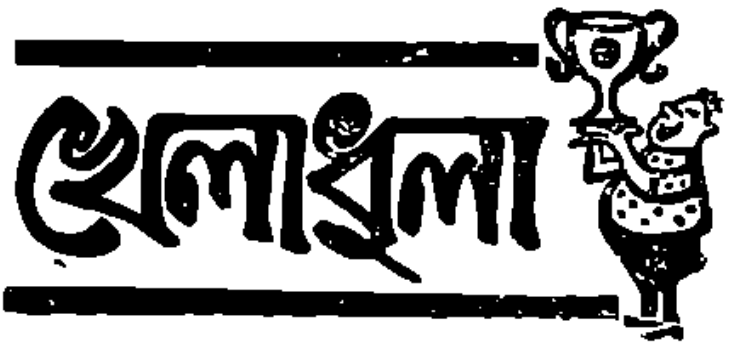

শ্রীজ্যোতির্ময়

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া-নিউজীল্যাণ্ড সফর

এই সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হবে তখন ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অনেকগুলি খেলায় যোগদান করেছে। এবং সে সব খেলার খবর আমাদের পাঠকরা নিত্য সংবাদপত্রে পাচ্ছেন। এই সুযোগে আমাদের যে সব খেলোয়াড় সফরে গেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম :—

পাতৌদির নবাব মনসুর আলি খান (হায়দারাবাদ, দক্ষিণাঞ্চল)। জন্ম ভূপালে ১৯৪১ সালের ৫ই জানুয়ারী। পিতা ইফতিকার আলি পাতৌদিও ক্রিকেটে ভারতের নেতৃত্ব করেছেন। বাঁ চোখ জখম হওয়া সত্ত্বেও মনসুর ব্যাটিং ও ফিল্ডিং করেন চমৎকার। ১৯৬২ সালে বার্বাডোজে অধিনায়ক কন্ট্রাক্টর ত্রিকিখের বলে আহত হওয়ার পর পাতৌদির ওপর ভারতের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তখন বয়স তাঁর মাত্র ২১। টেস্টে খেলে (দুবার অপরাজিত) ১৬১০ রাণ করেছেন (সর্বোচ্চ রাণ ২০৩ অপরাজিত, দুটি সেঞ্চুরী), রাণের গড় ৪০·০৭।

চন্দ্রকান্ত গুলাবরাও বোরে (মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমাঞ্চল)। জন্ম ১৯৩৪ সালের ২১শে জুলাই। ব্যাটসম্যান। স্পিন বলও করতেন কিন্তু পিঠের ব্যথার জন্য বল করা ছেড়ে দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ১৯৫৮ সাল থেকে। গত বছর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট পর্যায়ে দুটি সেঞ্চুরী করেছেন কিন্তু ইংলণ্ড সফরে তেমন কিছু করতে পারেন নি। (৬টি ইনিংসে মাত্র ৬০ রাণ)। ৪৬টি টেস্টের ৮০টি ইনিংসে ১৬০৪ (৯'বার অপরাজিত) রাণ করেছেন। সর্বোচ্চ রাণ ১৭৭ অপরাজিত, ৫টি সেঞ্চুরী. গড় ৩৭'০৯ রাণ।

নাদকার্ণী, রমেশচন্দ্র (বাপু) (বোম্বাই, পশ্চিমাঞ্চল)। ১৯৩০ সালের ৪ঠা এপ্রিল নাসিকে জন্ম। ছোটা চৌকস খেলোয়াড়। গত বছর ইংলণ্ড সফরে বাদ পড়ে গিয়েছিলেন। টেস্টের হিসেব : ৩৬টি ম্যাচ, ৫৬টি ইনিংস ১১ বার অপরাজিত, ১২৭৪ রাণ ; সর্বোচ্চ রাণ ১২২২ অপরাজিত, গড় ২৮-৩: ; বোলিং : ১২৩২-৩।৫৫৪।২৯৫১।৭১ ; গড় : ৪১'৪৬।

দেশাই, রমাকান্ত (বোম্বাই, পশ্চিমাঞ্চল)। জন্ম ১৯৩৯ সালে ২০শে জুন। মিডিয়াম ফাষ্ট সুইং বোলার। ২৬টি টেস্ট খেলেছেন ১৯৫৮ সাল থেকে। টেস্টের হিসেব : ৮৮৭-৫।১৭৫।২৬২৩।৭২ ; গড় ৩৬'৪১।

ইঞ্জিনীয়ার মানেকজী ফারুক (বোম্বাই, পশ্চিমাঞ্চল)। ১৯৩৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে জন্ম। উইকেটরক্ষক ও আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান ; টেস্টের হিসেব : ১৫টি টেস্টে ২৭টি ইনিংস খেলে ৭৪৯ রাণ করেছেন, সর্বোচ্চ রাণ ১০৯ অপরাজিত ; গড় ২৮'৮০।

চন্দ্রশেখর, ভগবৎ সুব্রহ্মণ্যম : (মহীশূর, দক্ষিণাঞ্চল)। জন্ম বাঙ্গালোরে ১৯৪৫ সালের ১৮ই মে। লেগস্পিন ও গুগ্‌লি বোলার। পোলিও রোগাক্রান্ত ডান হাতের দুর্বলতার জন্য বল স্পিন করাতে পারেন, প্রায় মিডিয়াম পেসেই বল দেন। টেস্টের হিসেব ৭২৭'৬—২১৮—১৭৬৮—৬৭ গড় ২৮'৯৮।

দিলীপনারায়ণ সরদেশাই (বোম্বাই, পশ্চিমাঞ্চল)। মারগাওয়ে ১৯৫০ সালের ৮ই আগষ্ট জন্ম। নির্ভোরযোগ্য ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান। ১৯৬২ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে সুরু করেন। ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক ইংলণ্ড সফরে মাত্র একটি টেস্ট খেলেছেন কেননা আঙুলে চোট লাগায় তাঁকে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। টেস্টের হিসেব ১৮টি টেস্ট, ৩৩টি ইনিংস, ২ বার অপরাজিত সর্বোচ্চ রাণ ২০০ অপরাজিত, মোট রাণ ১১৪৮ ; গড় ৩৭'০৩।

প্রসন্ন, ই এ এস (মহিশূর, দক্ষিণাঞ্চল)। জন্ম ১৯৪০ সালের ২২শে মে। অফ স্পিনার ; টেস্টের হিসেব ৩০৩'৩/৭১।৮১৪।১৮ ; গড় ৪৫'২৭।

মূর্তি, রুসি ফ্রাক রোজ (গুজরাট পশ্চিমাঞ্চল)। জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৫শে মে। স্লাটা চৌকস খেলোয়াড়। টেস্টের হিসেব ১৫টি ম্যাচ, ২৬টি ইনিংস, অপরাজিত ৩টিতে, মোট রাণ ৫২৫, সর্বোচ্চ রাণ ৬৪, গড় ২২-৮২ ; বোলিং : ৩৬°।৭১।১০১।২৮ ; গড় : ৬১'১৬।

ইন্দ্রজিৎ সিং, কুমারশ্রী (সৌরাষ্ট্র, পশ্চিমাঞ্চল) জন্ম ১৯০৭ সালের ১৫ই জুন জামনগরে। ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান ও উইকেটরক্ষক। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ ১৯৪৪-৪৫। ১৯৬৪ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩টি টেস্টে খেলেছেন। ৫টি ইনিংসে মোট ৪০ রাণ করেন।

ওয়াদেকর, অজিত (বোম্বাই পশ্চিমাঞ্চল)। জন্ম ১৯৩১ সালের ৪ঠা আগষ্ট, বোম্বাইয়ে। স্লাট ব্যাটস্‌ম্যান, পেস বোলার। গত বছর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ম্যাচে প্রথম আবির্ভাব। ৫টি টেস্ট ম্যাচে দশটি ইংনিংস খেলে ৩২১ রাণ করেছেন। সর্বোচ্চ রাণ ৬৭; গড় ৩২'১০।

বিষেন সিং বেদী (পাঞ্জাব, উত্তরাঞ্চল)। জন্ম অমৃতসরে ১৯৪৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর স্লাটা লেগ স্পিন বোলার। টেস্ট রেকর্ড ১৮০'২—৫৭—৪৬৪—১৪ ; গড় হিসেব ৩৩'১৪।

সৈয়দ আবিদ আলি : (হায়দারাবাদ, দক্ষিণাঞ্চল)। জন্ম ১৯৪৭ সালের ২১শে জুলাই ভারতীয় দলে নবাগত। ওপেনিং বোলার ও ব্যাটসম্যান। ভাল ফিল্ডার। এই মরশুমে রনের গড় ছিল ৪৫—৫৭ (সাতটি ইনিংস : ২টি সেঞ্চুরী।

সুরেশ, সাকলেনা (বিহার, পূর্বাঞ্চল)। জন্ম দিল্লীতে ১৯৪৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। মাত্র একটি টেষ্ট খেলেছেন বিগত সফরে ইংলণ্ডে। ঐ ম্যাচে ৯ রাণ করেছেন।

সুব্রহ্মণ্যম, ভেঙ্কটরাম (মহীশূর, দক্ষিণাঞ্চল)। ১৯৩৫ সালের ১৬ই জুলাই বাঙ্গালোরে জন্ম বলে ও ব্যাটে সমান কুশলী। ১৯৬৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন। টেস্টের হিসেব ৫টি টেস্টে, ৯টি ইনিংস, ১৩২ রাণ, সর্বোচ্চ রাণ ৩১, গড় হিসেব ১৪'৬৬।

কুলকার্নি, উমেশ নারায়ণ (বোম্বাই, পশ্চিমাঞ্চল)। জন্ম ৭ই মার্চ ১৯৪২, আলিবাগে স্লাটা মিডিয়াম ফাষ্ট বোলার। ১৯৬৪ সালে সিংহলের বিরুদ্ধে বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফর

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বরাবরেষু,—ভারতীয় ক্রিকেট বীরদের অস্ট্রেলিয়া সফর সম্বন্ধে সেদিন আপনার সঙ্গে ফোনে যে কথা হল, আপনার সেই নির্দেশ অনুসারে ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের কাছে এক জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরোধ জানিয়েছি, "অবিলম্বে ভারতীয় দলকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরিয়ে আনুন। ঢের হয়েছে। আর নয়। বাছাদের আর কত কষ্ট দেবেন।" আমার বিশ্বাস, সেনগুপ্ত মশাই, নবাব সাহেবও বোর্ডের কাছে এস ও এস পাঠিয়ে বলেছেন, "দয়া করে ফিরে যাবার ডাক দিন। আমরা আর পারছি না।"

সত্যিই, ভারতীয় খেলোয়াড়রা ওখানে গিয়ে কেঁদে কূল পাচ্ছে না, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছের অবস্থা, কাউন্টি দলের সঙ্গে খেলাতেই পর পর ইনিংস-এ হার, অস্ট্রেলিয়ানরা তাদের খেলা দেখে হাসাহাসি করছে। বোরদে—ছোড়দে! দাদা, ওরা বড্ড জোরে বল করছে, পালিয়ে আয়—গোছের অবস্থায় পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারবৃন্দ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে।

আর বোর্ডকেও বলি, বিলাতে গিয়ে তো যাচ্ছাই হালকিল মারাত্মক খেলা দেখিয়ে এসেছিল। তাই আবার তাদের অস্ট্রেলিয়ায় না পাঠালেই কী চলছিল না! অনর্থক এরকম উপহাসাস্পদ হবার প্রয়োজন কী ছিল। গত সংখ্যায় এই বিভাগে রাজস্থান ক্লাবের সম্পাদকের অভিযোগ উল্লেখ করেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন—"গত ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেটের সমাধি হয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়নি। আবার অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংলণ্ডে চিত্রই দেখবো আশা করি।" তাঁর কথা ফলেছে। কাউন্টিদের সঙ্গে খেলাতেই এই হাল, টেস্ট খেলায় কী হবে—তা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে! ভারতীয়দের এই সফর সম্বন্ধে "ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা" বলে কিছু আশা করবার নেই। ভারতীয় ক্রিকেটের মান এত নীচে নেমেছে যা তা দিয়ে সাফল্য অর্জন করা যাবে না!

সাম্প্রতিকতম সংবাদে প্রকাশ কেন্দ্রীয় সরকার ভারত থেকে কোন বিভাগের খেলোয়াড়দের বিদেশ পাঠাবার আগে তারা উপযুক্ত কি না, এবং কয়েক বছর সফর বন্ধ রাখা যায় কি না, সে সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। এই সম্পর্কে ডঃ ত্রিগুণা সেনের সাম্প্রতিক উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—বিদেশে সফরে গিয়ে আমাদের খেলোয়াড়রা লোক হাসিয়েছে।

স্বাধীনতা পাবার পর বিশ বছরে আমাদের যে বিশ হাল হয়েছে, ক্রিকেটেও তার চিহ্ন প্রকট। এই সূত্রে মনে পড়ছে, বিশ বছর আগেকার ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা। তখন অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দাপটের তুঙ্গে! কী দল! কী সব খেলোয়াড়! ব্র্যাডম্যান, হ্যাসেট, হার্ভে, মরিস, মিলার, বার্ণস, লিন্ডোয়াল, টোশাক, জনসটন, ম্যাককুল প্রভৃতি! কাউন্টি দলগুলোও ছিল তেমনি দুর্ধর্ষ! সে-দিনের তুলনায় আজকের অস্ট্রেলিয়া নক্সই ভাগ হীনবল! বিশ বছর আগেকার সেই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের সম্মুখীন হয়ে লালা অমরনাথ আর দলের অন্য অনেকে কৃতিত্বের যে নজীর রেখে এসেছিলেন, তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মনে রাখতে হবে, সেবারের ভারতীয় দল ভাঙা দল ছিল। তখনকার দিনের চারজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় মঞ্জরেকার, মার্চেন্ট, মুস্তাক, ফাদকর মোদি ও বাংলার মানুষ দলের সঙ্গে যান নি। ডাহুমান

এই প্রসঙ্গে স্পষ্টই স্বীকার করেছেন—"পূর্ণশক্তি নিয়ে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ায় এলে ফলাফল অন্য রকম হ'তে পারতো। অস্ট্রেলীয় বা ইংলণ্ড দলে যদি তাদের দলের চার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় অনুপস্থিত থাকে তাহলে তাঁদের পুঁজিতে টান পড়তে বাধ্য।"

টেস্টে হারলেও, ব্যক্তিগত গৌরব সেবার কম ছিল না। এডিলেড টেস্টে হাজারের দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরি (১১৬ ও ১৪৫), ফাদকারের সেঞ্চুরি (১২৩), মেলবোর্ণের দুটি টেস্টে মানকাদের যুগল সেঞ্চুরি (১১৬ ও ১১১), ভিকটোরিয়ার বিরুদ্ধে অমরনাথের অপরাজিত ১২৮, মানকাদ অমরনাথের বোলিং, গুলমহম্মদ ও হেমু অধিকারীর ফিল্ডিং—এই সব দেখে তামাম অস্ট্রেলিয়া ভারতীয় দলকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিল। টেস্ট ম্যাচে ভাল খেলতে না পারলেও শক্ত শক্ত কাউন্টির বিরুদ্ধে অমরনাথ চার পাঁচটি দর্শনীয় সেঞ্চুরি করেছিলেন।

সেই বিশ বছর আগেকার তুলনায় আজকের দলের যে সূচনা দেখছি—তাতে স্বতঃই মন অত্যন্ত হতাশ এবং বিক্ষুব্ধ হচ্ছে! বিশ বছরের এই কী অগ্রগতির নমুনা?

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় খেলাধূলা বিভাগে সি. কে. নায়ডু সম্পর্কে রচনাটির শেষে, কলকাতায় ভারত বনাম ইংলণ্ডের টেস্ট খেলার আলোচনায় ভুলক্রমে বলা হয়েছিল যে ইংলণ্ডের বডি লাইন বোলিং-এ মহম্মদ নিসার আহত হয়েছিলেন। মহম্মদ নিসার নন, আহত হয়েছিলেন, ভারতীয় দলের উইকেট রক্ষক দিলওয়ার হোসেন। অনবধানজনিত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—শ্রীজ্যোতির্ময়

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ক্ষুধা—প্রেম—মৃত্যুর পটভূমিকা আঁকা

সুনীল সরকারের বিস্ময়কর উপন্যাস

"চাতকের মেঘ"

দাম—৫'০০ টাকা

এন, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
৪নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১২

গীতা দে—সহঃ সম্পাদক 'ইতিকথা'
৬সি, গোপাল ব্যানার্জী লেন, কলি-২৬

সদ্য প্রকাশিত

* বাংলা স্মৃতিকথা-সাহিত্যের এক অপূর্ব সংযোজন
* প্রাণরসপূর্ণ বৈঠকী-গল্পের সমারোহ

সাহিত্যস্রষ্টা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তাঁর ব্যক্তি জীবনকে ঘিরে কয়েকজনের সমাবেশ। স্মৃতি কাহিনীতে উদ্ভাসিত বহু কাহিনী, বহু চিত্র, বহু দুর্লভ সাহিত্য সঙ্গের বিবরণ

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

একজন আর কয়েকজন

বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের বার্তা এনেছে। প্রত্যেক লাইব্রেরী এবং সাহিত্য রসিক পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য। দাম : চার টাকা।

ডি. এম.-লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বহু প্রশংসিত রচনাবলী

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

চার্লি চ্যাপলিন (আশ্চর্য আত্মকাহিনী) ৩'০০
গল্প-ভারতীতে প্রকাশকালে যে রচনা পাঠক-মহলে বিপুল উৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল।

অন্যান্য গ্রন্থ :

যাত্রা হ'ল শুরু (উপন্যাস : চলচ্চিত্রে রূপায়িত : ৩য় সংস্করণ) ৩'৭৫
নব নব রূপে (সুখভোগ্য রম্য কাহিনী) ৩'৫০
বীরবল রঙ্গ (আকবরের সভারত্ন বীরবলের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার কাহিনী) ৩'০০
আগুনের পরশমণি (উপন্যাস) ... ৩'০০
যে মহাজীবন (মনীষীদের গল্প) ... ৩'০০
স্মৃতির প্রদীপ (রহস্য উপন্যাস) ... ২'৫০
তারকার মৃত্যু ও কালরাত্রি (দুটি রহস্য উপন্যাস একত্রে) ২'০০
মায়াজাল ও মরণাভিসার (") ... ২'০০
কালো করাল ছায়া (রহস্য উপন্যাস) ... ১'৫০
তিন সর্গ (শিরানদেলো, মলেয়ার, স্ট্রিন্ড্‌বার্গ) (নাটক) ... ২'০০
নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের মায়াবসান (নাটক) ২'৫০
নবনাট্যরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা প্রতাপ (") ৩'০০
Carey's Good Old Days (সম্পাদনা) ১৫'০০
Glimpses of the Olden Times (") ১০'০০

: যন্ত্রস্থ :

কেরী সাহেবের কলকাতা (কোম্পানী আমলের কাহিনী-রূপে গল্প-ভারতীতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত)
Echoes from Old Calcutta (সম্পাদনা)

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্ডার পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে।

গল্প-ভারতী

ত্রয়োবিংশতিতম বর্ষ । অষ্টম সংখ্যা । মাঘ ১৩৭৬

CALCUTTA UNIVERSITY

এই সংখ্যার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

স্বাধীনতার বীজমন্ত্র (সচিত্র)
ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব রচনা।

স্মৃতিচারণ
—নরেন্দ্র দেব

অজন্তার মন্দির (ভ্রমণ কাহিনী)
—সুবোধকুমার চক্রবর্তী

মধুপর্ক (স্মৃতি : প্রমথেশ বড়ুয়া)
প্রভাত মুখোপাধ্যায়

নরমেধ যজ্ঞ (নতুন উপন্যাস)
—[illegible]

সাধনা বিউটি ক্রীম

শুধু আপনার ত্বকের যত্ন নেয় না, তাকে লাবণ্যময় করে

সৌন্দর্য বিকশিত হয় ত্বকের পরিচর্যায়। সাধনা বিউটি ক্রীম মেয়েদের ত্বক সৌন্দর্যের গোপন রহস্য।

ত্বক কুসুম-কোমল, পাপড়ি-পেলব যৌবন-সুলভ ও লাবণ্যময় করে শীতের প্রকোপ থেকে ত্বককে রক্ষা করে ও সজীব রাখে।

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

১৯৬৭

ভারতীয়-বাটার রপ্তানি বাণিজ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বছর

৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

বিদেশী বহু দেশে সাধারণভাবে অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও ১৯৬৭ সাল ভারতীয়-বাটার রপ্তানি বাণিজ্যে একটি ঐতিহাসিক বছর। এ বছর যতো জুতো তাঁরা বিদেশের বাজারে বিক্রি করেছেন, অতো আর কখনো হয়নি। এবং এই রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছেন ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি।

জাপান, হল্যান্ড, ইতালি এবং আরো অনেক বড়ো বড়ো রপ্তানিকারক দেশের ক্রমবর্ধমান তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে অর্জিত এই সাফল্য। শুধুমাত্র প্রতিযোগিতাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মধ্য-প্রাচ্যের পরিস্থিতির দরুণ মালবাহী জাহাজের পথ-পরিবর্তন এবং পণ্যের সরবরাহ-সূচি বজায় রাখার জন্য উৎপাদন পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের সমস্যা।

ভারতীয়-বাটার জুতো পশ্চিম ইওরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অন্যান্য সম্প্রান্ত বাজারে সমাদৃত।

পৃথিবীর সর্বত্র সকলের সেবায়—ভারতীয়-বাটা।

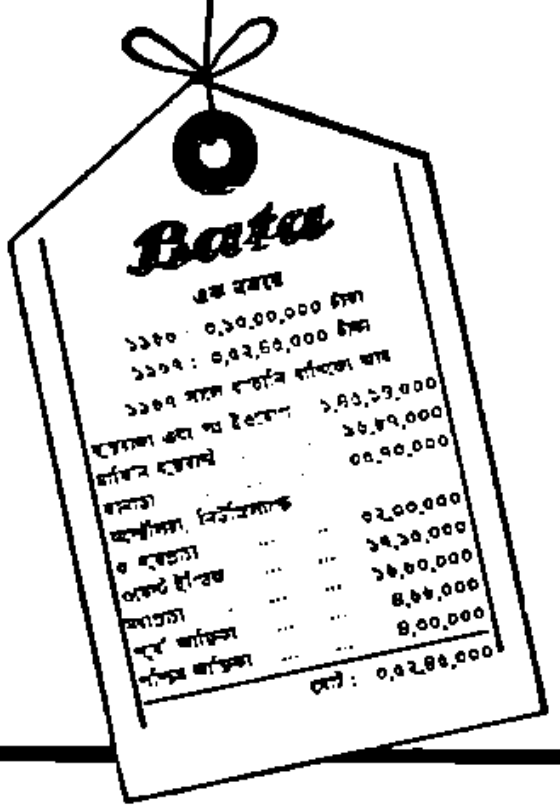

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

মাঘ ১৩৭৪, FEBRUARY, 1968

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ—৮ম সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা

বার্ষিক পনের টাকা

জেনারেলের কিশোর সাহিত্য
জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত
বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত
বাজীকরের ঝাঁপি
॥ ষোলজন সেরা লেখকের ষোলটি মনমাতানো গল্পের সঙ্কলন বই ॥

- লীলা মজুমদার
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- শিবরাম চক্রবর্তী
- মনোজিৎ বসু
- শক্তিপদ রাজগুরু
- আশাপূর্ণা দেবী
- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- স্বপনবুড়ো
- ধীরেন্দ্রলাল ধর
- জয়ন্ত চৌধুরী
- আশা দেবী
- নরেন্দ্র দেব
- ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
- সুকুমার দে সরকার

আর আছে পরলোকগত
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুটি অনবদ্য রচনা
উৎকৃষ্ট কাগজে চমৎকার ছাপা : তিনরঙের মলাট
। শক্ত বোর্ড বাঁধাই মূল্য তিন টাকা ।
• আরও কয়েকখানি কিশোর গ্রন্থ •
দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের : **একলা যাত্রার বিজয় সেনানী** ২·০০ গোপাল ভট্টাচার্যের : **করে দেখ** ২·০০
বাণী রায়ের : **হাসিকান্নার দিন** ২·০০ চণ্ডী লাহিড়ীর : **মানুষ কি করে মানুষ হল** : ২·০০ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের : **ছোটদের বুদ্ধ** ১·৫০ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের : **সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার** ৫·০০
স্বামী শ্রদ্ধানন্দের : **পৌরাণিকী** ১·৫০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের : **ছোটদের আরণ্যক** ৩·০০
হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের : **শিবাজী মহারাজ** ১·৫০ তারাপদ রায়ের : **স্বামী বিবেকানন্দ** ০·৫০
ছোটদের জন্য ইংরেজী-বাংলা অভিধান COMMON WORDS (৫ম সং) ২·০০
জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য,
অম্ল, অক্ষুধা
কোন্‌টী থেকে ভুগছেন ?
আমাদের
ভাস্কর লবণ
খেলে নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।
যাঁরাই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্

পোড়া ···· কাটা ···· পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

এ্যাগ্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
ক্ষত আরোগ্যকারক

ব্যবহার করে
জানুন

ওবিডি

আমি বেতন পঞ্জীভুক্ত সঞ্চয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সঞ্চয় করি

আমার কেবলমাত্র এইটুকু করতে হয় যে আমি যত টাকা নিয়মিত ভাবে সঞ্চয় করতে চাই সেই পরিমাণ টাকা আমার মাইনে থেকে কেটে রাখার জন্য আমার নিয়োগকারীকে অধিকার দিয়ে দিই। নিয়োগকারীই বাকি সব কাজ করেন।

অফিসের কর্মীগণও এই রকম ঘুরিয়ে পেতে পারেন।

আপনার নোট অফিসেই আপনি সম্পূর্ণ বিবরণ পেতে পারেন।

কারণ এটা খুব সহজ

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

। মিত্র-ঘোষের আগামী সাহিত্য-সম্ভার ।

আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙালী জীবনে রমণী ৮৲

প্রবোধকুমার সান্যালের চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

নগরে অনেক রাত ৪৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

আধি ৭৲

লীলা মজুমদারের মরমী লেখনী রচিত হেঁয়ালির কথা

আর কোনখানে ৬৲

রমাপদ চৌধুরীর রোমান্টিক উপন্যাস

জরির আঁচল ৪৲

জরাসন্ধের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

বন্যা ৪৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস

রাধা ৮৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস

অন্য দেশ অন্য দাহ ১২৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নবতম ভ্রমণকাহিনী

কুয়ারী গিরিপথে ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিলেও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিংয়ে পত্রিকা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে সম্ভ্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

গল্প-ভারতী
২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা—৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৪

LET US HELP YOUR SMALL SCALE INDUSTRY

However 'small' you may be, YOU are NOT too 'small' for us

For setting up new units or modernising or expanding existing ones, please consult our INDUSTRIAL FINANCE DEPARTMENT at our Head Office in Bombay or our nearest Branch.

We can assist you in various ways.

THE BANK OF INDIA LIMITED.

T. D. KANSARA
General Manager.

R. GERSAPPE
Regional Manager.
Calcutta Circle Branches.

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় —		৪৯৫
বন্যা বন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৪৯৯
মন যেতো যেথা ছুটে	—নরেন্দ্র দেব	৫০৯
নরমেধ যজ্ঞ (রহস্য উপন্যাস)	—জয়ব্রত	৫১৬

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে,
মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে
নিম এর উপকারিতা
হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে হিতকর বহুগুণ পরীক্ষিত মহোপকারী নিম-এর মৃদু অথচ সক্রিয় উপাদান-গুলি নিম টুথ পেস্ট-এ আছে। তাছাড়া নিম টুথ পেস্ট-এ রয়েছে 'ফ্লুরাইড' এবং আধুনিক দন্ত বিজ্ঞান সম্মত অন্যান্য উপাদান। নিম টুথ পেস্ট-এর হিতকর ফেনা মাড়ী সবল করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁতের ক্ষয় ও পায়োরিয়া নিবারণে সাহায্য করে ও দাঁত ঝকঝকে করে।

নিম টুথ পেস্ট-এর সর্বগুণ সমন্বিত মার্গোক্রিস পাউডারও পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কর্তৃক প্রস্তুত

এই সংখ্যায়

অশ্রের মন্দির (ভ্রমণ কাহিনী)	—সুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী	৫৩৯
মধুপর্ক : মানুষ প্রমথেশ বড়ুয়া	—প্রভাত মুখোপাধ্যায়	৫৪৮
পিছনের জানালায়	—রামপদ মুখোপাধ্যায়	৫৫৫
বিশেষ প্রতিনিধি	—সুবোধ বসু	৫৬০
পরিবার পরিকল্পনা	—ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়	৫৬৫

কোমল ত্বকের নিত্য পরিচর্য্যায়

হিমানী গ্লিসারিন সাবান

নির্খুঁত ও মসৃণ ত্বক সৌন্দর্য্যের অপেক্ষাটি। বছরের প্রতিটি দিনেই এর পরিচর্য্যা করা উচিৎ। উপযুক্ত উপাদানে প্রস্তুত হিমানী গ্লিসারিন সাবান ত্বকের লাবণ্য ও মসৃণতা বাড়ায়।

হিমানী
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-২

THE HOUSE OF
NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS
OF INDUSTRIAL RUBBER
PRODUCTS IN INDIA

NATIONAL RUBBER
MANUFACTURERS LTD.

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED
AUTOMOBILE TYRE COMPANY

Inchek Tyres
Limited

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

এই সংখ্যায়

সে যুগের সংবাদ পত্র	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৭১
যেখানে বাঙালী সেখানেই বাংলা বিন্দু	—দ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল	৫৭৪
চলতি দুনিয়া		৫৭৯
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)		৫৮২

LIPTON'S YELLOW LABEL

Lipton's Yellow Label is specially blended for those who like a good, strong cup of tea. It gives a richer, creamier liquor with lots more flavour and lots more taste.

LIPTON

LIPTON'S MEANS GOOD TEA

LYC-39

Sulekha
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32
erdeeyer

এই সংখ্যায়

মেয়ে মজলিশ		
শ্রীপঞ্চমী	—বেলা দে	৫৮৫
শীতকালীন পোষাক পরিচ্ছদ	—আভা পাকড়াশী	৫৮৭
অঙ্গনা সংবাদ	—দেবযানী	৫৮৯
নাট মঞ্চ	—রত্নাকর	৫৯৩
ছায়াবাণী	—চিত্রমিত্র	৬০০
সাহিত্য ও সাহিত্যিক		৬০৫
খেলাধূলা	—শ্রীজ্যোতির্ময়	৬০৫

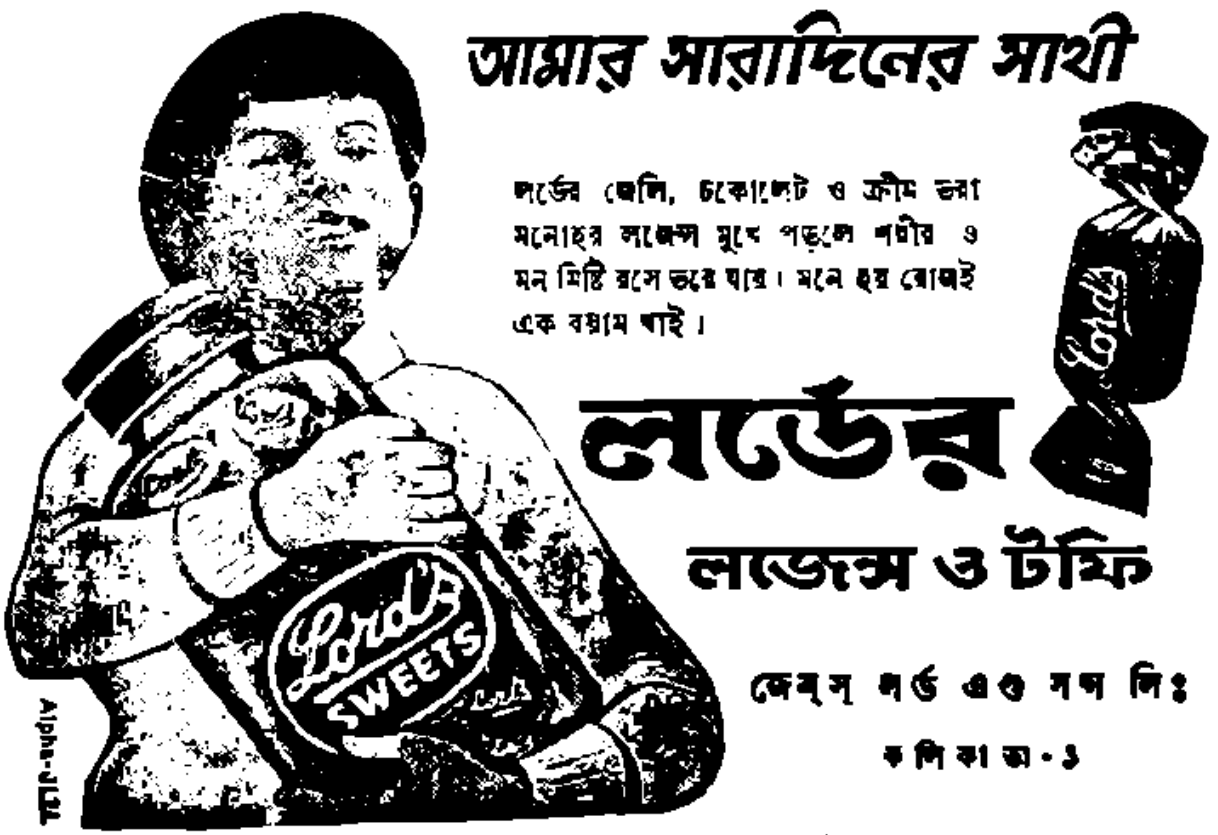

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এগ মার্কা দেওয়া জিনিস কেন কিনবেন?

যে সব জিনিসের ওপর এগ মার্কার মোহর থাকে, সেগুলি যে ভালো সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। ঘি, মাখন, ডিম, মধু ইত্যাদি কৃষিজাত ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা ক'রে তারপর এই সরকারি মোহর দেওয়া হয়। আপনি যখন এগমার্কা দেওয়া কোন জিনিস কেনেন তখন আপনি নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন যে সুকঠোর বৈজ্ঞানিক মান অনুযায়ী সেগুলির শ্রেণীবিভাগ ক'রে প্যাক করে, বাজারজাত করা হয়েছে।

এগমার্কা হ'ল
বিশুদ্ধতার
মাপকাঠি

পাইওনীয়ারের
• গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের
উপযোগী।

ভেইট • ফেভারিট • রেনী • লাভলি • পাইওনীয়ার স্পেশাল • হাফ আর্ম • 'স্লিভলেস আর্ম' • 'ব্রাইটেক্স' • সিমলিফ • সুপার ম্যাসিটেক্স • ইন্টারলক • টুইন-টেক্স • 'পাইওটেক্স' ও অন্যান্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের পাওয়া যায়।

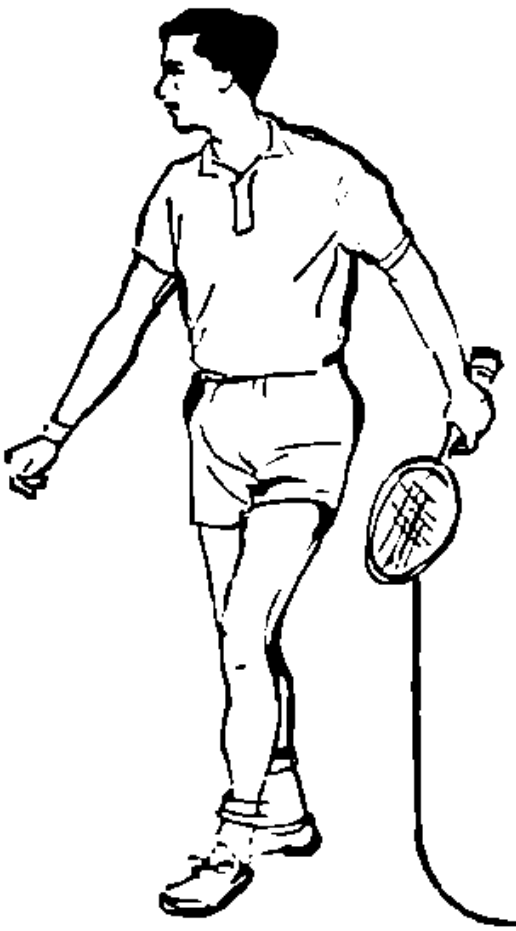

* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেবিস সার্ট • চেন সার্ট • ড্রয়ার ও ভীক প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে
ধৌত ও প্রস্তুত।

ফোন : ৪৬-২১৮৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

UNIVERSITY

গল্প-ভারতী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি।

আমি তখন গল্প লিখি, উপন্যাস লিখি। সবাই বলে ভাল লেখা। নাম পেয়েছি, খ্যাতি পেয়েছি। পাইনি শুধু পয়সা।

যে-পয়সা পেলে দুবেলা খেয়ে পরে নিশ্চিন্ত মনে লিখতে পারি—তাও তখন জোটাতে পারছি না।

লেখাকে উপজীবিকা করলে চলে না জানতাম।

কিন্তু নামের মোহ আর লেখার নেশা—দুটোই তখন পেয়ে বসেছে।

লেখার নেশায় আর আনন্দে মশগুল হয়ে গল্পের পর গল্প লিখে চলেছি। তার ওপর আছে খ্যাতির বিড়ম্বনা। নানান সভায় সভাপতিত্ব করবার ডাক পড়ছে। সসম্মানে গাড়ী করে নিয়ে যাচ্ছে। একগাছি ফুলের মালা হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরছি।

যৎসামান্য যা পেয়েছি তাইতেই খুশী হয়ে আনন্দ করেছি। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা কাউকে জানতে দিইনি।

ঠিক এমনি দিনে প্রভুদয়ালের সঙ্গে আমার পরিচয়।

প্রভুদয়াল খেমকা। জাতে মাড়োয়ারী। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পাকা আমের মত গায়ের রং। পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবী পরে সুন্দর একটি গাড়ী থেকে নামলেন আমার বাড়ীর দরজায়।

ভেবেছিলাম কোনও সভা-সমিতি থেকে এসেছেন বুঝি।

কিন্তু না, সভাও নয়, সমিতিও নয়, এসেছেন আমার সঙ্গে পরিচিত হতে।

এমন সুন্দর বাংলা বলেন যে অবাঙালী বলে মনেই হয় না।

—আপনার লেখা আমি পড়েছি। আমার কাজই হলো বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়া।

বললাম, আমার তো ধারণা ছিল—আপনারা শুধু ব্যবসাই করেন।

প্রভুদয়ালবাবু বললেন, হ্যাঁ করি। আমিও করেছি। এখন সে-সব আমার ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছি।

এই বলে তিনি হো হো করে বড় সুন্দর প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগলেন।

খুব ভাল লেগেছিল মানুষটিকে।

তাঁরা আজ তিন পুরুষ ধরে বাস করছেন এই বাংলাদেশে। প্রভুদয়ালবাবু জন্মেছেন এই কলকাতা শহরে। এইখানেই লেখাপড়া শিখেছেন। ব্যবসাও করেছেন এইখানে।

—আপনিও ব্যবসা করেছেন?

—করেছি বই-কি! এইটিই তো আমাদের জাতির ধর্ম। প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে হলে ব্যবসা করতে হয়।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনিও কি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন?

জবাব দিতে গিয়ে তিনি আমার মুখের পানে তাকিয়েছিলেন। অভাবী মানুষ আমি—লজ্জায় মরে গিয়েছিলাম। তবে কি তিনি ভাবলেন—আমি তাঁর ঐশ্বর্য্যের দিকে হাত বাড়াচ্ছি?

কিন্তু না, আমারই বুঝবার ভুল।

প্রভুদয়ালবাবু বললেন, প্রচুর বলতে আপনি কি বলতে চান আমি বুঝতে পারছি না। প্রচুরের তো সীমা-সংখ্যা নেই। শতের পর হাজার, হাজারের পর লাখ, লাখের পর কোটি।—আমার বাপ-ঠাকুর্দা—

কথাটাকে আমি পাল্টে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, না, আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। আপনি সাহিত্যের কথা বলুন।

—সেই কথাতেই আসছি। শুনুন। অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে দেখলাম অনর্থকে কিছুতেই এড়ানো যাচ্ছে না। লোভ আর স্বার্থপরতা হয়েছে অঙ্গের ভূষণ। আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে গেলাম কারবার করতে। খুব কম সময়ের ভেতর সে লোকটি বড়লোক হয়েছে। সবাই বলে সে খুব বুদ্ধিমান। গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। দেখলাম, কেমন করে কি অপরূপ কৌশলে পরস্ব অপহরণ করতে হয় তা সে জানে। আইনকে ফাঁকি দিয়ে বে-আইনী কাজ করতে সে এতটুকু কুণ্ঠিত নয়। দেখলাম, নির্বিবাদে সে তার ঐশ্বর্য্য বাড়িয়ে চলেছে।

সে আমাকে একদিন বললে, রাজ্য জয় করতে অনেক সৈন্যকে জীবন দিতে হয়, অনেক রক্তপাত হয়। আর এখানে ভাখো—বিনা রক্তপাতে রাজ্য জয়।

আমি বলেছিলাম, এখানে রক্তপাত হয় না, কিন্তু প্রচুর অশ্রুপাত হয়।

এই কথা শুনে আমার সেই আত্মীয়টি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। বলেছিল, চোখের জলে বিচলিত হলে চলবে না। তুমি পারবে না কারবার করতে।

কারবার করতে পারিওনি।

কেন পারিনি শুনবেন? আমার যে-আত্মীয়টি বলেছিল, চোখের জলে বিচলিত হলে চলবে না। হঠাৎ সে একদিন তার মার্বেল-দেওয়া সিঁড়ির ওপর পা পিছ্‌লে পড়ে গেল। আঘাত লাগলো কোমরে। যন্ত্রণা আর থামে না কিছুতেই। বড় বড় ডাক্তার এলেন। বললেন, অপারেশন করতে হবে। নার্সিং হোমে অপারেশন হলো, আর তার দুদিন পরেই তার সেই রাজার ঐশ্বর্য্য ছোট ছোট দুটি নাবালক ছেলের জন্যে রেখে দিয়ে মরে গেল। স্ত্রী ভাসতে লাগলো চোখের জলে। লক্ষ লক্ষ টাকা তাকে সান্ত্বনা দিতে পারলে না।

আমার মন গেল খারাপ হয়ে। অস্থির হয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমার একটি মাত্র ছেলে। বাপ-ঠাকুর্দা যা রেখে গেছেন তাইতে আমাদের ভালই চলে যাবে। আমার বাবার ছিল একটি কাগজের কারবার। ছেলেকে সেইখানে বসিয়ে দিয়ে বললাম, আমাকে ছুটি দাও।

ছেলের কাছ থেকে মানে সংসারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে একটুখানি আনন্দের সন্ধানে ছুটতে ছুটতে

প্রথমে একদিন টিকিট কিনে ঢুকে পড়লাম আপনাদের থিয়েটারে। তারপর সিনেমায়। তারপর আপনাদের এই ভাবের জগতে। প্রথমেই পড়লাম শরৎচন্দ্রের বই। তারপর রবীন্দ্রনাথ। তারপর আপনারা। ভেবেছিলাম বুঝি বইগুলো ফুরিয়ে যাবে। তখন কি করবো? কিন্তু এখন দেখছি তার আগে আমিই ফুরিয়ে যাব।

এই বলে প্রভুদয়ালবাবু তাঁর হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, কল্পনা দিয়ে আপনারা স্বর্গ সৃষ্টি করতে পারেন। বেশ আছেন আপনারা। আপনাদের প্রণাম!

প্রভুদয়ালবাবু প্রায়ই আসেন আমার কাছে।

আগে ঘন ঘন আসতেন। এখন আসেন মাসে একবার, কিংবা তারও কিছু পরে। যখনই আসেন কিছু ফল নিয়ে আসেন হাতে করে।

'কিছু' মানে নেহাৎ কম নয়। ঝুড়িভর্তি ফল।—গাড়ী থেকে নামিয়ে এনে ড্রাইভার তুলে দেয় বাড়ীতে।

বলি, এ-সব কেন?

প্রভুদয়াল বলেন, আমার খুশী। প্রসন্নমনে গ্রহণ করুন। আমি আনন্দিত হব।

—কিন্তু আমি তো এক পেয়ালা চা ছাড়া কিছু খাওয়াতে পারি না আপনাকে।

প্রভুদয়ালবাবু বললেন, খেতে পারলে খেতাম। দেখছেন তো, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বয়েসটাকে ধরে রাখতে পারছি না।

অনেকদিন আসেননি প্রভুদয়ালবাবু।

যেদিন এলেন, দেখলাম গাড়ী নেই, হেঁটে হেঁটে এসেছেন। হাতে একটি লাঠি।

জিজ্ঞাসা করলাম, গাড়ী কোথায়?

প্রভুদয়ালবাবু বললেন, ছেলেকে দিয়েছি। এখন আমার হাঁটতে ভাল লাগে। পায়ে হেঁটে যারা পথ চলে তাদের সঙ্গে মিশে যাই। সবাইকে ভাল লাগে। সবাইকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। হাত তুলে প্রণাম করি না—পাছে লোকে পাগল ভাবে। যাকিছু দেখি সবাইকেই মনে-মনে প্রণাম করি আর মনের আনন্দে পথ চলি।

এখন কি পড়ছেন? জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ—শুধু রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আমাকে পাগল করে দিয়েছে। আমার কি মনে হয় জানেন? চুপিচুপি বলি। অন্য কেউ শুনলে হাসবে। আমার আর বুদ্ধি কতটুকু! রবীন্দ্রনাথ পূর্বজন্মে বাল্মীকি ছিলেন। সেইজন্যেই বাল্মীকি-প্রতিভা দিয়েই তাঁর কবি-জীবনের সূত্রপাত।

তারপর ক্রমাগত তিনি তন্ময় হয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

বড় ভাল লাগলো তাঁর কথাগুলি।

প্রায় বছর-খানেক তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

একদিন ইডেন্-গার্ডেনে গেছি কি একটা কাজের জন্যে। দেখি না একটি গাছের তলায় লাঠি হাতে নিয়ে প্রভুদয়ালজি বসে আছেন। সুমুখে প্রসারিত উদাস দৃষ্টি। প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখচ্ছবি। আমাকে দেখেই

হাসতে হাসতে একটি নমস্কার করে বললেন, আসুন আসুন, অনেকদিন দেখিনি আপনাকে। বসুন এইখানে।

বসলাম তাঁর পাশে।

প্রভুদয়ালবাবু বললেন, বড় আনন্দে আছি বাবুজি।

তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম সত্যই আনন্দে আছেন তিনি।

কথায় কথায় বললেন, একটুখানি আনন্দ পাবার আশায় ঢুকেছিলাম আপনাদের ভাবের জগতে। সেইখান থেকে নিজের জগতটাকে খুঁজে পেলাম বাবুজি। আপনাকে একটি প্রণাম করি।

এই বলে হাত বাড়িয়ে আমার পায়ে হাত দিতে যাচ্ছিলেন।

আমি তাঁকে নিবৃত্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

প্রভুদয়ালবাবুর চোখদুটি কেমন যেন এক অপার্থিব আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একাগ্র নিষ্ঠায় আনন্দের সন্ধান করতে গিয়ে মনে হলো যেন তিনি জীবনের দেবতা সেই চির আনন্দময়ের করুণার স্পর্শ পেয়ে গেছেন।

বললাম, আপনার আনন্দের সন্ধান এতদিনে মনে হচ্ছে যেন সার্থক হয়েছে প্রভুদয়ালজি।

প্রভুদয়াল বললেন, হ্যাঁ বাবুজি। বাইরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়ে যেন ভেতরের দুয়ারটা খুলে গেছে। খুব আনন্দে আছি বাবুজি, খুব আনন্দে আছি। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন আমাকে কৃপা করেছেন। সব সময়েই তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলি। তিনি আমার কথার জবাব দেন বাবুজি। তাঁর ভালবাসার অন্ত নেই। একথা কাউকে বলবেন না যেন। লোকে বলবে লোকটা বুঝি পাগল হয়ে গেছে।

বলেই তিনি হো হো করে হাসতে লাগলেন।

পবিত্র সুন্দর সে হাসি!

এখন তাঁকে আর আমার কাছে আসতে হয় না। আমিই মাঝে মাঝে যাই তাঁর বাড়ীতে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

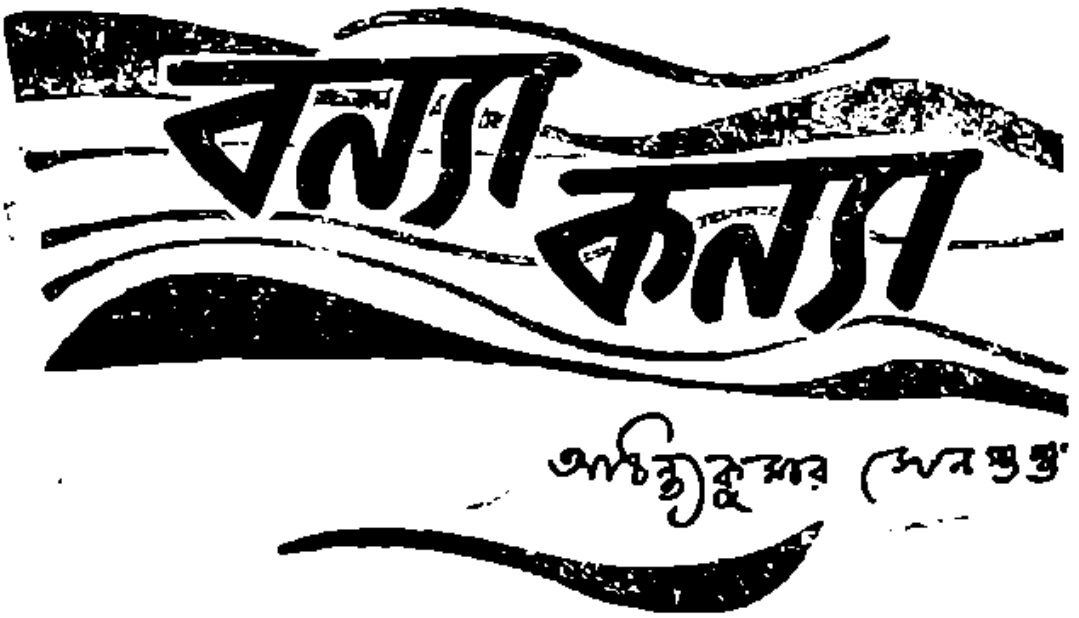

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

[**পূর্বকথা :** সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে পরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু ঘোষ নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়ার মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার ফার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে।

হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই বোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছে থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না।

একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—স্বামীকে জানবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে দর্পিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বর দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপট্যেরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের মুখে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেলনা এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।]

॥ চোদ্দ ॥

সুবীরকে অমনি তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলাটা কেমন বিসদৃশ হল। সে নিশ্চয়ই আশা করছিল হিমাংশু আনন্দ প্রকাশ করবে, তার বদলে হিমাংশু কিনা রীতিমত ক্রোধ প্রকাশ করল! ভৌমিককে এ নিয়ে শাসন করতে যাবারই বা অর্থ কী। মুহূর্তের পীড়নে হিমাংশুর তাল-মাত্রা ছুট হয়ে গিয়েছিল বোধহয়।

'শুনুন।'

সুবীর ফিরে আসতেই প্রতিক্রিয়ার সুন্দর একটা ব্যাখ্যা রাখল হিমাংশু। বললে, 'আপনার স্ত্রীর মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে মিস্টার ভৌমিক আমার বিপদ বাধালেন দেখছি।'

'বিপদ!'

হাসিতে মুখ ভরে তুলল হিমাংশু। বললে, 'তাহলে যে আমাকেও আপনার মাইনে বাড়িয়ে দিতে হয়।'

অপ্রতিভের মত মুখ করল সুবীর। প্রতিক্রিয়ার যে একটা কুয়াশা মনের মধ্যে জমে উঠেছিল তা এক ঝাপটায় উড়ে গেল।

'বসুন।' হিমাংশুর কথা এখনো শেষ হয়নি। মুখোমুখি চেয়ারে সুবীর কুণ্ঠকুঞ্চিত হয়ে বসবার পর হিমাংশু বললে, 'স্ত্রীর মাইনে স্বামীর মাইনে থেকে বেশি হওয়া উচিত নয়। আজকালকার স্ত্রীরা এমনিই স্বামীকে মানতে চায় না, তারপর যদি দেখে স্বামীর আয় স্ত্রীর আয়ের চেয়ে কম, তাহলে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আসা স্বাভাবিক। কী বলেন, ঠিক বলিনি?'

সুবীর আর কী বলবে, তবে এমন বোধিতের মত হাসল যেন হিমাংশু ঠিকই বলেছে। যদি এই ফিকিরে তার মাইনেও কিছু বেড়ে যায় তো চমৎকার!

'স্ত্রীকে সব সময়ে নিচে রাখা দরকার। পায়ের জোরে, ব্যক্তিত্বে, বিদ্যায়, টাকা-রোজগারে।' হিমাংশু তার অন্তরের ক্রোধটা যুক্তির দৃঢ়তায় স্থানান্তরিত করতে চাইল: 'স্বামী যদি স্ত্রীর চেয়ে ছোট হয়, দুর্বল হয়, তাহলে স্বামীর আর সংসার করা চলেনা। মনে চলে যেতে হয়।'

'আজকাল তো ছোট-বড় উপর-নিচ বলে কিছু নেই। আজকাল সব সমান-সমান, পাশাপাশি।' কুণ্ঠকুঞ্চিত মুখে সামান্য হাসল সুবীর: 'আজকাল সখাই কমরেড, সখা-সখী—'

'সে শুধু নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। বিয়েটাকে টেঁকসই করতে হলে স্ত্রীকে, মানে স্ত্রীলোককে হারিয়ে রাখা দরকার। আর কিছুতে না হোক, অন্তত টাকার অঙ্কে। স্বামীর মাইনে যদি কম হয়, স্ত্রী ছেড়ে যেবে না, স্বামীকে হারিয়ে রাখবে। আর্দালি বানাবে।' সরল হবার চেষ্টায় হিমাংশু হেসে উঠল: 'ফরমাস খাটাবে। হেনস্তার একশেষ করে ছাড়বে।'

সুবীরের যদিও প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছিল তবু বুদ্ধিমানের মত সে চুপ করে রইল। প্রথমত, হিমাংশুর মতের বিপক্ষে কথা বলা অনুচিত, দ্বিতীয়ত যদি এই মতের জোরে তার প্রাপ্য কিছু বেড়ে যায় তো কথা কে বলে? কথা বললেই তো আপত্তির মত শোনাবে। তাই সুবীর শুধু চুপ করেই থাকল না, সমর্থনে সু-উচ্চে একটু হাসল।

সে-হাসির অন্যরকম মানে করল হিমাংশু। তাড়াতাড়ি গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে, 'আপনাদের কেস্ অবশ্যি আলাদা। আমার মনে ছিল না, আপনাদের ভালোবাসার বিয়ে।'

সুবীরকেও তাড়াতাড়ি মুখে গাম্ভীর্য টেনে প্রতিবাদ করতে হল। নইলে মাইনে বাড়াবার কেসটা বুঝি কেঁসে যায়। পায়ে এসে বুঝি নৌকো ডোবে।

'ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলেও টাকার দরকার। তাছাড়া,' সুবীর মুখে আরো এক পোঁচ কালি বুলোল: 'তাছাড়া আত্মসম্মানের প্রশ্ন তো একটা আছেই।'

'ঠিক বলেছেন—আত্মসম্মান।' হিমাংশু প্রায় টেবল চাপড়াবার ভঙ্গিতে জোর দিয়ে বললে, 'শুধু আপনার সম্মান নয়, আমাদের কার্যের সম্মান। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী তো খুব বড়লোকের মেয়ে।' প্রস্তুতের ব্যবধানটা হঠাৎ বন্ধুতার দাঁকো ফেলে হিমাংশু ছোট করে আনল: 'বাপের বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে আসতে পারেনি?'

'কিছু মানে—'

'কিছু মানে নগদ টাকা, গয়নাগাটি—অন্তত ভারি একটা ব্যাঙ্কের পাশ-বই—'

'না।' একটু বুঝি বিষণ্ণ শোনাল সুবীরকে : 'একেবারে একঘরে বেরিয়ে এসেছে।'

'তাহলে কী ছাই তার ভালোবাসা?' হিমাংশু কথার সুরে বাঙ্গের ঝাঁজ মেশাল : 'সে তো জানে আপনি গরিব, একটা ফুটহোল্ড পাবার জন্যে আপনার কত ব্যাকিং দরকার আর তার বাপ টাকার একটা তিমি মাছ। তারই তো উচিত ছিল ছলে বলে কৌশলে বাপের কাছ থেকে বেশ-কিছু বার করে আনা! উপোস-করা শুঁটকো ভালোবাসা আমি বিশ্বাস করিনা। আমি হলে তো বেশ কিছু-হাতাতাম।'

'আপনি হলে মানে?' সরলতা মাখানো প্রশান্ত মুখে জিজ্ঞেস করল সুবীর।

'মানে, আমার যদি এমনি কোনো কেস হত—এমনি এক প্রেমের বিয়ে। আমি স্ত্রীকে বলতাম, বাপের থেকে মোহন করে কিছু নিয়ে এস। খালি পেটে প্রেম করা চলতে পারে কিন্তু সংসার করা চলে না।'

'আর তুমি মোহন করে আনবে বলেই তো তোমার আরেক নাম দুহিতা।' সখ্যভাবে উন্নীত হয়ে স্বচ্ছকণ্ঠে দিব্যি হাসতে পারল সুবীর।

'ঠিক বলেছেন। আপনিও তাই চাপ দিন। প্রেসার ট্যাকটিকসটা আসল কৌশল। দেখবেন সরসিজ মজুমদারের হাতের মুঠও শিথিল হয়ে গিয়েছে—'

'তার আশা কম। মেয়ের মুখের উপর বাবা তার সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

'রাখুন। সব মেয়ের বাপই নাটকের প্রথম দৃশ্যে ওরকম একটা অভিনয় করে, পরে যখন নাভি-নাতনি হয় তখন সদর দরজায় কাটল ধরে, বাপের বুকের পাথর দাদুর বুকে এসে বরফ হয়ে যায়। কী বলেন, ঠিক বলিনি?'

মুখ টিপে একটু হাসল সুবীর। বললে, 'তার এখনো দেরি আছে।'

'না, না, দেরি নয়, প্রথম ফসল ঝটপট উতুল করে নেওয়া দরকার। উদ্ভুদ্ধ স্ত্রীকে ঘরে ধরে রাখতে হলে সন্তানই একমাত্র বন্ধন।' হঠাৎ কৌতূহলে তীক্ষ্ণ হল হিমাংশু : 'কেন, দেরি কেন? প্রিকশানস্ নিচ্ছেন বুঝি?'

এ সব গোপনীয় বিষয় নিয়ে কি বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করা চলে?

সুবীর ধীরে মুখ ফেরাল।

সুবীরের মনের ভাবটা আন্দাজ করতে পারল হিমাংশু। বললে, 'উপরওলা মনে করে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না, আমাকে বন্ধু বলে ট্রিট করুন। কি, তাতে কিছু অসুবিধে আছে?'

'কী যে বলেন আপনি!' সুবীর শুধু বাধিত নয়, প্রায় বিগলিত হয়ে গেল। বললে, 'আপনার বন্ধুতা তো আমার জীবনের প্রকাণ্ড সম্পদ।'

'খুব ভালো কথা। উই আর ফ্রেন্ডস। সেই বন্ধু ভাবেই বলি, গোড়াগুড়ি থেকেই কড়াকড়ি করবার দরকার নেই। একটি ত্রুটি হোক, পরে না হয় আটঘাট বাঁধবেন। আর প্রিকশানস কী নেবেন না-নেবেন সব সময়েই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। দেখে হিতে যা বিপরীত ঘটে।'

'সে তো ঠিকই।' সব জড়িয়ে একটা ভাসা-ভাসা সায় দিল সুবীর।

'তা এখুনি ডাক্তার ডাকবার দরকার নেই। প্রথম কদিন তো সমুদ্রে অবগাহন স্নান করে নিন, পরে দেখা যাবে লাইফ বেল্ট লাগবে কিনা। তা যা আপনাদের একঘরের সংসার, সব সময়েই ঘেঁষাঘেঁষি

মাথামাখি, মনে হয় প্রিকশানস ভেঙে যাবে।' নিজের কল্পনা নিজেই সম্ভোগ করে হেসে উঠল হিমাংশু।

'তবু কমপক্ষে বছর খানেক অপেক্ষা তো করতেই হবে।' সাহস করে বললে সুবীর।

'হাঁ, অন্তত দশমাস।' হিমাংশু আরো একটু মুখর হল।

'তারপরে, আপনি বলছেন, বনছায়া বাপের বাড়ির দরজা খোলা পাবে, তার বাপের মন গলবে। দৌহিত্রের মায়ায় বনছায়ার আঁচলে সরসিজ মজুমদার টাকা ঢেলে দেবেন।'

'নিশ্চয়ই দেবেন। তাই তো হয়ে আসছে। হয়তো দেখা যাবে সরসিজের উইলে একটা বড় ভাগ এই দৌহিত্রের। তাই, বলি' অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে গলা নামাল হিমাংশু: 'বুড়ো বেঁচে থাকতে থাকতেই দৌহিত্রের ব্যবস্থা করুন।'

'কিন্তু সে টাকা তো বাপের বাড়ি থেকে বনছায়াই আনবে।' সুবীর কথাটাকে অন্য দিকে ফেরাল: 'সে টাকায় আমি কোথায়? আমার আত্মসম্মান কোথায়?'

'ঠিক বলেছেন।' লাফিয়ে উঠল হিমাংশু: 'সে টাকায় বনছায়াই তো প্রভুত্ব খাটাবে। ঠিক। তার বাপের বাড়ির টাকা। আপনাকে ছুঁতেও দেবে না, আর আপনি তা ছুঁতে যাবেনই বা কেন? ও তো আপনার দিক থেকে আসছে না, ওতে আপনার কর্তৃত্বের কোনো অধিকার নেই। আপনি ঠিক বলেছেন। সকলের চেয়ে বড় হচ্ছে আত্মসম্মান। তাছাড়া নাতি-নাতি সব ভবিষ্যতের কথা, চাটাইয়ে শুয়ে নাতী হবার স্বপ্ন—আর এদিকে আপনার স্ত্রীর মাইনে যে এক্ষুনিই বেড়ে গেল—সুতরাং আপনার ব্যবস্থাও তো এক্ষুনিই কিছু করা দরকার। হাঁ, সম্মান—আমি ভুলিনি—আত্মসম্মান। শুধু স্বামীর নয়, তার বস-এর। মাইনেটা বাড়িয়ে দেবার আগে মিস্টার ভৌমিক যদি আমাকে একবার জিজ্ঞেস করে নিতেন। আচ্ছা, দেখি, কী করতে পারি। আপনি এখন—'

ইঙ্গিত পেতেই সুবীর উঠে দাঁড়াল।

'আচ্ছা আমি ভেবে পাই না ঐ ছোট্ট ঘরটাতে আপনারা দুজনে থাকেন কী করে?'

অপরাধীর মত মুখ করল সুবীর। বললে, 'হাঁ, ঘরটা খুব ছোট।'

'বিয়ের আগে একটা ভালো দেখে বাসা ঠিক করে নিতে পারেননি?' স্নেহে তিরস্কারের মতো করে বললে হিমাংশু।

'তার সময় ছিল না।'

'সময় ছিল না? কেন, কোনো জরুরি অবস্থা ছিল নাকি?'

হেসে ফেলল সুবীর: 'না, তেমন কিছু নয়।'

'বুঝেছি। ও পক্ষ অধির হয়ে উঠেছিল। যাকে বলে হুড়ে হয়ে ওঠা। কী, ঠিক বলিনি?'

'প্রায় তাই।' দ্বিধা সায় দিল সুবীর। যেন বুঝল সায় দিলেই বস্ খুশি হবে।

'কিন্তু আপনার অত সহজে ঘাড় পেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। আপনার বলা উচিত ছিল, একটু সবুর করো, আগে একটা ভালো দেখে ফ্ল্যাট জোগাড় করি, তারপর বিয়ের কথা ভাবব। নইলে এ একটা খাঁচার মধ্যে দুটো জ্যান্ত মানুষের থাকা চলে না। আপনি ভালোমানুষ, বুঝতে পারছি,' বঙ্কিম মুখে হাসল হিমাংশু: 'তাড়াহুড়োটা অন্যায় জেনেও ঠেকাতে পারেননি। যাকগে, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন থেকে [illegible] নিজের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে অসম্মত হোন অর্থাৎ—'হিমাংশু

হাসির হাওয়ায় গাম্ভীর্যের বোঝাটা সরিয়ে দিয়ে সহসা সহজ হয়ে গেল : 'অর্থাৎ একটা ভদ্র মতন বাড়ি দেখুন। ওহার ঘরো খাতাটা কোনো কাজের কথা নয়।'

'দু জনে কতক্ষণই বা থাকি ঐ ওহায়!' হিমাংশুর প্রশ্রয়ে সুবীরও সরল ছেড়ে তরল হল : 'সকাল হতে না হতেই অফিসের বেলা, সারাদিন তো দুজনে বাড়ির বাইরেই কাটিয়ে দিই, সন্ধের অফিস থেকে ফিরে দুজনে একটু একত্র হই, তারপর চা-টা খেয়ে আবার বেরিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে আসতে রাত নটা-দশটা হয়ে যায়—'

'ফিরে এসে?' প্রায় লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাল হিমাংশু।

'ফিরে এসেই বিছানা।' টুক করে নিজেকে সংশোধন করে নিল সুবীর : 'মানে ফিরে এসেই শুয়ে পড়ি, আর শুতে না শুতেই ঘুম। বাড়ির অস্বিত্বটা আর বিশেষ চেতনার মধ্যে জেগে থাকে না।'

'বসুন, বসুন, আরো একটু শুনি।' আগ্রহ করে হিমাংশুই চেয়ারটা টেনে দিল। বললে, 'বেশ ভালো লাগছে শুনতে। রোজ সন্ধেবেলা তিন-চার ঘণ্টা বাইরে কাটান? যান কোথায়? করেন কী?'

'ঘুরি। বেড়াই। কখনো কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে যে চানা না দিই তাও নয়।' চারদিকে আনন্দের আবির ছড়িয়ে বলল সুবীর : 'মাঝে মাঝে কোনো সাহিত্যিক আড্ডাতেও চুঁ মারি। দেখবার মত হলে সিনেমাও দেখি যদি অবশ্যি ইভনিং শোর মাপাল পাই। তারপর হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বাড়ি ফিরি।'

আনন্দের কথাগুলি শুনতে হিমাংশুর বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। সে তাই ওসব কথায় না ঢুকে শেষের কথাটাকে তেড়ে ধরল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন, আপনার স্ত্রী রাঁধতে পারে না?'

'পারে।' সলজ্জ মুখে হাসল সুবীর : 'সকালবেলা ওই তো দুটো ফুটিয়ে দেয়।'

'সকালবেলা দেয় তো রাত্রে কী দোষ করল?'

'অফিস থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে আসে তো, তাই আর রান্না নিয়ে বসতে দিই না।' মায়া ঢেলে বললে সুবীর।

হিমাংশু আবার একটা ধাক্কা খেল। উপদেষ্টার মত নিরুপায় মুখ করে বললে, 'কিন্তু রোজ রোজ হোটেলে খেলে স্বাস্থ্য নষ্ট হবে। আপনি আমার কার্যের কর্মচারী, আপনার স্বাস্থ্য আমাকে দেখতে হবে। রাতেও বাড়িতে খাবার বন্দোবস্ত করুন। শরীরের কখন কী মেজাজ হয় কিছু বলা যায় না।'

'হ্যাঁ শুধু আমার স্বাস্থ্য নয়, ওরও স্বাস্থ্য।'

'মেয়েরা তো বিয়ের পরে মোটা হয়। ওদের স্বাস্থ্য অত সহজে ভাঙে না।' হিমাংশু আবার সুবীরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাল।

সুবীর যেন কথাটা মানতে চাইল না। স্বরে অনুতাপ মিশিয়ে বললে, 'একটা লোক রাখা দরকার।' কিন্তু বাড়িটার যা অবস্থা একটা বাড়তি লোক রাখার সুবিধে নেই। তাই প্রথমেই একটা ভাল ফ্ল্যাট দরকার।

'সে তো আমারও কথা।' হিমাংশু প্রায় টেবল চাপড়াল : 'আমার মতে তো সর্বাগ্রে বাড়ি জোগাড় করে নিয়ে বিয়ে করা উচিত ছিল। যতদিন বাড়ি না জোটে ততদিন উচিত ছিল বিয়েটাকে স্থগিত রাখা। কিন্তু, না,' হিমাংশু আবার স্বভাবে ফিরে এল : 'আপনি কী করবেন, ওপক্ষই যখন অধীর—কী বলেন প্রেমোন্মত্ত—আপনাকে সাকার করতেই হবে। তা ও ওর বড়লোক বাপকে বলুক না, যৌতুক তো কিছু দেয়নি, একটা অন্তত বাড়ি খুঁজে দিক।'

'হ্যাঁ, ওর বস বলেছেন একটা ফ্ল্যাট দেখে দেবেন।'

দারুণ বিরক্ত হল হিমাংশু। প্রাণপণে মনের ভাব চেপে রেখে মুখে কাঠহাসি টেনে, বললে, 'ফ্ল্যাট তো একটা আমিও দেখে দিতে পারি কিন্তু সেটা কি আপনার স্ত্রীর পছন্দ হবে?'

'বা, কেন হবে না?' সুবীর ঠিকরে উঠল।

'অন্য কোনো কারণে নয়—মানে, নিজের বস-এর দেখে দেওয়া ফ্ল্যাটটাই তার কাছে 'অ্যাকসেপ্টেবল' হবে। মিস্টার ভৌমিককে কিছুতেই সে 'ডিসঅবলাইজ' করতে পারবে না। তা যাক গে, বাড়ি একটা পাওয়া নিয়ে কথা, তা সেটা যেখান থেকেই আসুক। কিন্তু আমি ভাবছি, ভৌমিকের দেখে দেওয়া বাড়িটার 'টেনান্সি' কার নামে হবে?'

সুবীর প্রায় হাঁ করে রইল। কথাটার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত যেন অনুধাবন করতে পারল না।

'নিশ্চয়ই আপনার নামে হবে না, আপনার স্ত্রীর নামে হবে। কারণ—'

হিমাংশুর কথার উপরেই সহাস্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুবীর: 'একজনের নামে হলেই হল।'

'কারণ—'কথাটা উপযুক্ত গাম্ভীর্যে সম্পূর্ণ করল হিমাংশু: 'কারণ আপনার স্ত্রী ভৌমিকের ফেভরিট এমপ্লয়ি', তা ছাড়া সে বিবাহিত হলেও তার স্বামীর চেয়ে তার মাইনে বেশি।' বলে যেন একটা কী গভীর রসিকতা করেছে এমনি সকল তৃপ্তিতে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল সুবীর। পরে প্রার্থীর মত কাঙাল মুখ করে বললে, 'তা আপনি বলছিলেন আমার মাইনে বাড়িয়ে দেবেন—'

'হ্যাঁ, এসম্বন্ধে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। কেননা এ অসামঞ্জস্য থাকতে দেওয়া উচিত নয়। আপনি ছোট যাবেন, অপমানিত হবেন এ আমি হতে দিতে পারি না। আমি সিনসিয়রই আপনার জন্যে কিছু একটা করছি—আপনাকে বলতে হবে না।' শিথিল শুক্তিটা সহসা গুটিয়ে নিল হিমাংশু: 'হ্যাঁ, আপনি এখন যান—'বলে একটি পরিপূর্ণ আশ্বাসের হাসি হাসল।

এরই জন্যে, এই প্রতিশ্রুতির জন্যেই তো এতক্ষণ বসে ছিল সুবীর, এত সব অবান্তর কথার খেলায় মেতেছিল। দূর থেকে আকস্মিক 'কিক' করেই হোক বা 'বল' কাটিয়ে নিয়ে বিপক্ষকে ফাঁকি দিয়েই হোক তার 'গোল' করা নিয়ে কথা। অভ্যুক্তিতে হোক বা চাটুক্তিতে হোক, তার মাইনে যদি কিছু ফোকটে বাড়িয়ে নেওয়া যায় তো মন্দ কী। টাকাই তো আসল মনিব। টাকাই কথা বলে, টাকাই কথা বলায়। টাকাই আগুন করে, টাকাই আবার আগুনের পাশে বসিয়ে রাখে।

সুবীর যখন ঘর ছেড়ে চলে গেল, হিমাংশুর মনে হল সে বুঝি তাকে সজোরে ধাক্কাধাক্কা দিয়ে ঘরের বার করে দিয়েছে। শুধু অফিসের বারান্দায় নয়, সিঁড়ি দিয়ে নিচে ঠেলে ফেলে, একেবারে খোলা রাস্তায়।

হ্যাঁ, এখুনি এক কলমের আঁচড়ে সুবীরের চাকরিটা সে নাকচ করে দিতে পারে—মাইনে বাড়াবার স্বপ্নের মধ্যে না রেখে তাকে এখুনি নিয়ে যেতে পারে অমিত্র নিঃস্বতায়। তার চাকরির সর্তে ন্যূনতম নোটিশেরও অবকাশ নেই। শুধু গেট আউট, ভাগ যাও, বলে দিলেই ফর্সা। কিন্তু তা হলে কী হয়? তা হলে শুধু সুবীরকেই শাস্তি দেওয়া হয়, বনছায়াকে শিক্ষা দেওয়া হয় না।

তা ছাড়া দরাসরি বরখাস্ত করে দেওয়াটা কেমন খুন দেখাবে, সহজেই বনছায়া বুঝতে পারবে কেন এই দণ্ড। তার ফলে সে তো একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, ঘুচ করে টেনে দেবে যবনিকা। আর কোনদিন দেখাও হবে না, কালক্রমে হিমাংশুও তাকে ভুলে যাবে। কী দুঃসহ সেই ভুলে যাওয়া! শুধু

জনব এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকেও জানাব, নিজে ভুলব না, তাকেও ভুলতে দেব না—এরই মধ্যে তো এই বঞ্চনার পরিশোধ। নইলে আর কী পথ আছে? আরাম তো সব সময়েই চায় সম্ভোগটা দীর্ঘস্থায়ী হোক, তেমনি হিমাংশুর প্রতিহিংসাটাও দীর্ঘস্থায়ী হলেই তার চিত্তের উপশম।

সেদিন নম্র ভঙ্গিতে মৃদুকণ্ঠে বলেছিল বনছায়া, ওকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেবেন না। না, ওকে ছাঁটাই করতে যাব কেন, ও কী করেছে? হিমাংশু আশ্বাস দিয়েছিল। উত্তরে বনছায়া তাকে মহানুভব বলেছিল। নিশ্চয়ই মহানুভব। ছাঁটাই করে দিলে আবার কোথাও না কোথাও একটা চাকরি ঠিক জুটিয়ে নিত সুবীর, এ নাটক মাঝ হয়ে যেত, এমন সুন্দর মহানুভব আখ্যাটা অর্জন করা যেত না। হাঁ, হাজারবার মহানুভব। সুবীরকে সে বরখাস্ত করবে না, বরং তার চাকরিতে উন্নতি করিয়ে দেবে। বনছায়া যদি তিনশো টাকা পায় সুবীরকে সে সাড়ে তিনশো পাইয়ে দেবে। বনছায়া বুঝবে যে সে সুবীরের অধীন আর সুবীর বুঝবে যে সে হিমাংশুর অধীন।

দুঃখ করে খেলতে না পারলে খেলা খেলাই নয়। একটা 'ফুল-টস' বলকে ড্রাইভ করে বাউণ্ডারিতে পাঠানোর কোনো কৃতিত্ব নেই, একটা 'গ্রাস-কাটার'কে স্লাশ করে, দাঁড়িয়ে চার রান নেওয়ায় অনেক বেশি কেরামতি।

শত্রুতাতেই এখন হিমাংশুর শান্তি। প্রেমের আরেক পিঠেই তো প্রতিহিংসা। সমৃদ্ধ করে যে সুখ, বিধ্বস্ত করেও সেই সুখ। সুবীর তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হতে পারে, হিমাংশু তার ঘনিষ্ঠতম শত্রু। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে—অশ্বখমা হত ইতি গজে।

কী সুখেই আছে দুজনে! সুখের পায়রা হয়ে! অফিস থেকে বাড়ি ফিরে রোজ সন্ধ্যায় তিন চার ঘণ্টা বাইরে কাটায় একসঙ্গে। রাতে রান্নার পাট নেই। একটা চাকর ছাড়াই চলে যাচ্ছে। ইভনিং শো ধরতে না পারে রাতের শোতে গেলেই বা তাদের ঠেকায় কে। যখনই ঘরে ফেরে তখনই সেই একটা ঘর। ছোট একটা ঘরের মধ্যেই যেন সমস্ত বোহিমিয়া! সেদিন এমনি একটা চেউ তুলল বনছায়া, যেন সেই দে-রাজ্যের একচ্ছত্র রানী। এক নিমেষে কী সম্পদ তার হতে পারত, কী বিপুল সৌভাগ্য, তার জন্যে তার বিন্দুমাত্র আপশোষ নেই। যেন সুবীরই তার সর্বস্বদাতা, তার সুখস্বামী।

এ হেন সুবীরের মাইনে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তার কম বাহাদুরি নয়, বড়লোকের এক চাকুরে মেয়েকে ঐ একটা হীনহীন ঘরের মধ্যে আটকাতে পেরেছে। কত মানুষের শুধু ঘরের জন্যে বিয়ে হয়না, ঘর খোঁজবার বা বদলাবার প্রয়োজনে বিয়েটাকে মুলতুবি রাখে। কিন্তু কত বড় বাহাদুর সুবীর, একটা এঁদো ঘরের মধ্যে রাজনন্দিনীকে শুধু বন্দীই করলনা, তাকে একেবারে তপ্ত উনুনের ধারে ঠেলে দিল। এমন দক্ষ কর্মচারীর উন্নতি হবে না তো কার হবে?

অন্তত সেই স্বপ্নে সুবীর তো রঙ্গিন থাক। হিমাংশুতে আরো সংলগ্ন হোক।

কিন্তু সেদিন সুবীর তার স্বপ্নের উপর বড় একটা আঘাত পেল। অফিস ফেরৎ বাড়ি এসে দেখল দরজা তালাবন্ধ। বনছায়া এখনো ফেরেনি।

এটা আবার কী সমস্যা! ডুপ্লিকেট চাবি তো তার সঙ্গেই আছে, তাই দিয়ে খুলে ঢুকে পড়লেই তো চলে। কিন্তু না, বাধা দেল, বনছায়া কেন আগে ফেরেনি?

কত কাজকর্ম পড়ে যেতে পারে, অফিস-টাইমের ভিড়, জ্যাম হয়ে যেতে পারে রাস্তায়, তার জন্যে চিন্তার কী আছে? না, এ স্বামীর অস্বস্তি নয়, এ গৃহস্থের অস্বস্তি। সুবীর বোধহয় আশা করে রোজ

বনছায়াই আগে ফিরবে, আগে ফিরে ঝাঁটপাট দিয়ে ঘর-দোর গোছগাছ করে রাখবে, বিছানার উপর সুজনিটা টান করে রাখবে, যাতে ফিরেই বিছানায় সে টান হতে পারে। চায়ের ডিস-কাপ কেতলি সাজানো থাকবে, ওর আশামাত্রই স্টোভ ধরিয়ে জল বসিয়ে দেবে আর বিছানায় একটু গড়িয়ে নেবার পরেই শুনতে পাবে, এই নাও। সে চোখ চেয়ে দেখবে বনছায়া, তার এক হাতে এক পেয়ালা সোনালি চা আরেক হাতে অল্প কোনো খাবারের প্রস্তুততম বিস্কুট।

এটাই যেন সমীচীন দৃশ্য। এই দৃশ্যেই যেন দুচোখ অভ্যস্ত হতে চায়। অন্তত এ দৃশ্যের স্বপ্নই যেন উত্তরাধিকার সূত্রে রক্তে পাওয়া।

কিন্তু আজ দেখল বিপরীত। ভাগ্য আজ সুবীরকেই আগে ডেকে এনেছে।

ভাবল ঢুকবে কিনা, না, কি আরো একটু ঘুরে-টুরে দেরি করে আসবে। এমন দেরি, যাতে ঘরের সংস্কারের কাজটা ইত্যবসরে বনছায়ার হাতে হয়ে যায়।

না, বিবেক বুঝি ছোট একটু দংশন করল। বনছায়াও বুঝি তার কাছে কিছু আশা করতে পারে। কিন্তু সে আশা কতটুকু, সে আশা কতদূর?

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে অসংস্কৃত বিছানায়ই শুয়ে পড়ল সুবীর।

কতক্ষণ বেশ কতক্ষণ পরে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বনছায়া আলো জ্বালল: 'এ কি, শুয়ে আছ? ঘরদোরটা ঝাঁটপাট দিয়ে রাখোনি?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে সুবীর প্রশ্ন করলে: 'ফিরতে এত দেরি হল কেন?'

'বলছি। কিন্তু তুমি কী! সকাল বেলার প্লেট কটাও ধুয়ে রাখতে পারলেনা? আমারটা বলছিনা, তোমার নিজের প্লেট-গ্লাস ধুয়ে রাখতে কী দোষ হয়েছিল! আগে-আগে বাড়িতে ফিরেও তুমি অকেজো হয়ে থাকবে? আমাকে সাহায্য করবে না?'

'এবার থেকে না হয় আগে ফিরব না। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব কই? আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। ফিরতে দেরি হল কেন?'

'বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম।'

'তোমার বস-এর বাড়ি?'

'বস-এর বাড়ি হবে কেন? তাঁর খোঁজ দেওয়া বাড়ি। শোনো, দোতলায় তিনটে ঘর—ছোট-ছোট হলেও তিনটে। বাথরুম কিচেন আলাদা, রাস্তার দিকে বারান্দা। তুমি কাল নিজে গিয়ে দেখে এস। তোমার খুব পছন্দ হবে।'

'ভাড়া কত?'

'দুশো।'

'দু-শো?' সুবীর উৎসাহিত হতে চেয়েছিল, আবার স্তিমিত হয়ে পড়ল।

'তা হোক। তবু তিন-ঘরের বাড়ি অনেক ভালো। আমাদের দুজনের আলাদা আলাদা ঘর থাকবে, বেশ লেখাপড়া করা যাবে। আর তৃতীয় ঘরটা ড্রয়িং রুম হবে, বন্ধু-বান্ধব এলে গল্প করা যাবে নিশ্চিন্তে। কখাইও হাও থাকে রাখব সেও শুতে পারবে ঐ ঘরে। সব দিক থেকে নিখুঁত হবে।'

'কিন্তু অত ভাড়া দিলে খাব কী?'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি ঠিক ম্যানেজ করব।'

'কী করে করবে ?'

'তোমার টাকাটা দিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দেব আর আমার টাকায় সংসার-খরচ। আমার টাকা শুধু তিনশো ভাবছ কেন ? লিখে টিখে শ'খানেক উপায় করতে পারব। তোমার কবিতায় পয়সা নেই, দরকার হলে তুমি টিউশানি করবে। তা ছাড়া মিস্টার ভৌমিক আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর অফিসের লোক বলে আমার জন্যে বাড়িওয়ালাকে ধরে পঞ্চাশ টাকা কমাবার চেষ্টা করবেন। যদি কমে, বা যেটুকু কমে, তুমি রিলিফ পাবে। তুমি একবার দেখে আসবে চলো কেমন সুন্দর ফ্ল্যাট। যদি থাকবার জায়গা ভালো হয়, যদি আমার পরিশ্রম-সাধ্যের উপায় জোটে, তবেই তো আমি লিখতে বসতে পারি, তবেই তো বাড়াতে পারি রোজগার।'

গুণীর পাশ ফিরল। ক্লান্তের মত বললে, 'দরকার নেই। আমার এই ছোট ঘরই ভালো।'

(ক্রমশঃ)

• • • •

খুব ঝড় হচ্ছে। ইংলণ্ডে এমন ঝড় অনেক দিন দেখা যায় নি। খবর এসেছে সমুদ্রের উপকূলের কাছে একখানা বিদেশী জাহাজ ডুবে গেছে। তার কতক কতক যাত্রী উদ্ধার পেলেও সব যাত্রীর সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছেনা।

সাহিত্যিক কবি জর্জ চ্যাপম্যান বেরিয়েছিলেন একটু কাজে। তিনিও ঝড়ের মুখে পড়ে গেলেন। একটা ফুল-বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হোল তাঁকে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, আর একজন লোক আশ্রয়ের জন্য সেখানে এসেছে। কিন্তু লোকটি অন্ধ।

লোকটি এসেছিল সেই ডুবে-যাওয়া জাহাজ থেকে উদ্ধার-বোটে। তার বাড়ী আলেকজান্দ্রিয়া। জাতিতে মিশরী।

তার জীবনের সব কাহিনী শুনলেন চ্যাপম্যান। আশ্চর্য্য সে কাহিনী।

কোথা থেকে কি হয় বলা যায় না। তিনি সেই কাহিনী উপন্যাসাকারে লিখে বিখ্যাত হয়ে গেলেন, আর নাম দিলেন "The Blind Beggar of Alexandria."

মন যেতো যেথা ছুটে

নরেন্দ্র দেব

কোথা যেতো ছুটে ?

আড্ডায় ! মানুষ মাত্রেই কম বেশি আড্ডাধারী।

'আড্ডা' বলতে বোঝায় পাঁচজন যেখানে বসে মিলেমেশে নানা আলোচনায় সময় কাটায় বা খেলাধুলায় অবসর যাপন করে।

আড্ডার আবার একটা কদর্থও আছে। যেমন, 'গাঁজার আড্ডা', 'গুলির আড্ডা', 'জুয়ার আড্ডা' !

নির্দোষ আড্ডারও একটা নিজস্ব নেশা আছে স্বীকার করি। আমি এখানে যেসব আড্ডার কথা শোনাতে বসেছি, তারও একটা নেশার টান থাকলেও কোনটাই কিন্তু 'নেশাখোর'দের আড্ডা নয়।

এই আড্ডা দেওয়ার অভ্যাসটা আমাদের ছাত্রাবস্থা থেকেই হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বরাবর আমরা একটু মাথায় বেড়ে উঠে উঁচু ক্লাসে ঢোকবার পর অভিভাবকদের শাসন কতকটা শিথিল হয়েছিল। স্কুল থেকে ফিরে বৈকালিক জলযোগ সেরেই রোজ আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তুম 'গোলদীঘি'র পাড়ে বসে আড্ডা দিতে। আমি ছিলুম তখন ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে আমাদের পৈতৃক বাসভবনে। গোলদীঘি ওখান থেকে খুব কাছে। ক্লাসের আরও কয়েকজন সহপাঠী বন্ধু, গোলদীঘির কাছে-পিঠেই যাঁরা থাকতেন তাঁরাও আসতেন এই আড্ডার আকর্ষণে। আমরা আড্ডাবাজ হ'লেও প্রত্যেকেই ছিলুম ক্লাসের 'শুভ বয়'। প্রতিবছর এই আড্ডার ছেলেরাই স্কুলের পরীক্ষায় 'ফার্স্ট', 'সেকেণ্ড' স্থান অধিকার করতেন। এঁরা ছাড়া আরও দু'চার জন ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চের তুখোড় ছেলেরাও আসতো আমাদের আড্ডায় যারা ভালো ছেলেদের ভালোবাসতো এবং তাদের বিশেষ অনুগত ছিল। এর কারণ বোধহয় বুঝতেই পারছেন ! আমরা তাদের অঙ্ক কষে দিতুম। 'ট্রান্সলেশান' ক'রে দিতুম। 'হোমটাস্ক' ক'রে না নিয়ে গেলে আমাদের সময়ে ক্লাসের মধ্যে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রাখতেন শিক্ষকরা। আমরা তাদের সাহায্য ক'রে সে শাস্তি থেকে রক্ষা করতুম। তারা এজন্যে আমাদের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ ছিল। শুধু তাই নয়, ওরা ছিল আমাদের 'বডি-গার্ড'—যাকে বলে 'দেহরক্ষী'। আমাদের ছাত্রাবস্থায় স্কুলে স্কুলে খেলাধুলায় হারজিত নিয়ে প্রায়ই মারামারি বাধা হোতো। নিরীহ ভালোছেলেরা এতে যোগ দিতেন না। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুলের পক্ষপক্ষীয় তিন চারজন গুণ্ডা গোছের ছেলে এই নিরীহ ছেলেগুলোর ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে ঠিক তাগ বুঝে স্কুল যাওয়া আসার পথে ঝুপ করে কোন্ গলি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে ঘুষোঘুষি করে ঠেঙিয়ে

পালাতো। আমাদের সহপাঠী বন্ধুছেলেরাই আবার তাদের ঠেঙিয়ে সে মারের প্রতিশোধ তুলতো। কাজেই, ওদের আমরা কখনো অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখতুম না। কারণ আমরাও এদিক দিয়ে ওদের কাছে ঋণী ছিলুম।

আমাদের কারুর ওপর রাগ থাকলে ওদের লাগিয়ে দিতুম।

গোলদীঘির আড্ডা কিন্তু আমাদের বেশিক্ষণ চলতো না। গ্যাস জ্বললেই বাড়ী ফিরতে হবে। অভিভাবকদের হুকুম ছিল। স্কুলের পড়াশুনোরও তাগিদ বোধ করতুম আমরা। কারুর কারুর আবার হয়ত 'প্রাইভেট টিউটর' বা 'মাস্টার মশাই' এসে বসে থাকলে বাড়িতে বকুনি খাবার ভয়ও ছিল। কাজেই, আড্ডার আকর্ষণ যতই দুর্বার হোক, মন্থরগতিতে সন্ধ্যা নামলে যে যার বাড়ি ফিরতে হোতো। তবু সেই দেড়ঘণ্টা দু'ঘণ্টার আড্ডার জন্যই আমাদের বিকেলের প্রাণটা যেন ছট ফট করতো। ছাত্রাবস্থায় সেই ক্ষণকালের আড্ডাটুকু আমাদের নিতান্ত নিরামিষ ছিল না। পড়াশুনার আলোচনা, ক্লাসের গল্প, মাস্টার মশাইদের ও বিভিন্ন ছাত্রদের চরিত্রানুশীলন, 'স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট' 'হেডমাস্টার', 'পণ্ডিতমশাই', 'অফিসের কেরাণী বাবু', 'দারবান', 'বেহারা', 'সিপাই', আমাদের আড্ডার আলোচনা থেকে কেউ বাদ পড়তেন না। ছেলেদের মধ্যেও যারা ধনীর সন্তান, কান্তিমান, সুদর্শন তারাও কাদের সঙ্গে বেশি মেশামিশি করে সে আলোচনাও আমাদের মুখরোচক ছিল। 'রামপ্রসাদী' থেকে 'টপ্পা' গান, কবিতা, গল্প গুজব, শ্লীল অশ্লীল ছড়া, সামাজিক কেচ্ছাকাহিনী কিছুই বাদ যেতনা। আমাদের সঙ্গে উঁচু ক্লাসে দাড়ি গোঁফওয়ালা বিবাহিত ছাত্রেরাও পড়তেন। অল্প বয়সে বিবাহ তখনও প্রচলিত ছিল। এঁচড়ে পাকা ছেলেদের মতো যৌন-বিজ্ঞান, ধর্ম ও সমাজের আচার-আচরণ এবং অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার নিয়ে আমাদের মধ্যে চীনেবাদাম, চানাচুর, ঘুগনিদানা, সাড়েবত্রিশভাজা ও আলু-কাবুলি খেতে খেতে তুমুল তর্ক বিতর্ক চলতো।

বলা বাহুল্য যে এখনকার ছাত্রদের তুলনায় সেদিনকার ছাত্র হিসাবে আমরা খুবই নিরীহ ছিলুম। আমাদের বাপ খুড়োদের উপর 'ডিরোজিয়োর' প্রভাব এবং 'হিন্দুকলেজের' পাণ্ডিত্যাভিমান' তখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের ছাত্রজীবনেই স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত হয়ে পড়েছিলুম সবাই। সিস্টার-নিবেদিতার প্রভাব সেই তরুণ বয়সেই আমাদের উপর খুবই প্রগাঢ় হ'য়ে উঠেছিল। ছুটি-ছাটায় আমরা কয়েকজন দল বেঁধে নৌকো ভাড়া করে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও বেলুড়মঠে তীর্থযাত্রা করতুম। সেয়ারে নৌকো ভাড়া তখন বেশ সস্তা ছিল। সারাদিন মহানন্দে কাটিয়ে সন্ধ্যের আগেই সবাই বাড়ি ফিরে আসতুম। সিনেমার আকর্ষণ তখনও ছাত্রদের মধ্যে আসেনি। কারণ ও ব্যাপারটা শহরে তখন ছিল না।

পালপার্বনে ছুটি ছাটায় গঙ্গাস্নান করতে যাওয়াও ছাত্রজীবনে আমাদের একটা প্রবল ঝোঁক হয়ে উঠেছিল। এরমধ্যে পুণ্যার্জনের লোভের চেয়ে প্রধান আকর্ষণ ছিল স্ফূর্তি আর আড্ডা যতটা না লোক অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণী তরুণী স্নানার্থীদের দর্শনের আনন্দ আর স্কুলের পড়াশুনোর চাপ থেকে খানিকটা রিল্যাক্সেশান অর্থাৎ বিরামের আরাম! 'ছেলে ডুবে যাবে' 'জলে নামতে দেব না' এসব সেদিনের মায়েদের ছিল না। কারণ, তাঁরা সবাই প্রায় খিড়কীর পুকুরে নাইতে নেমে সাঁতার কাটতেন। গঙ্গাস্নানও তাঁরা বাদ দিতেন না। চৈত্র-সংক্রান্তি, জন্মাষ্টমী, দশহরা, চন্দ্রগ্রহণ, প্রভৃতি কোনও পালপার্বণ বিনা গঙ্গাস্নানে উদ্‌যাপিত হতনা। তাই, পরবর্তী জীবনেও মাতৃকোত্তর হ'তে পারিনি আমি। মা, ঠাকুমা, দিদিমা, জ্যাঠাইমা, এমনকি বৌদিদিরেও পুরুষ অভিভাবক হ'য়ে গঙ্গাস্নানে যেতে হোতো আমাকেই। কারণ, বাড়ির আর

কোনো ছেলেরাই মেয়েদের নিয়ে যেতে চাইতেন না। স্নানের পর তাঁরা ডাব, চিনি, কলমূল কিনে ঘাটে যাতায়াতের পথের দু'ধারে যত সব ছোট বড় ঠাকুর, ঘট অশথের তলায় স্তূপি, পাথর, সিঁদুর মাখানো শিলা, সবগুলিকে পুজো দিয়ে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে তুষ্ট মনে বাড়ি ফিরতেন। যাওয়া আসার ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ি সমানে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো।

আমার আজ গঙ্গার দিকে পা হ'লেও গঙ্গাস্নানে বহুদিন আর যাওয়া হয়না। আর, আশ্চর্য হই দেখে যে এখনকার মেয়েরা শিক্ষার আলো পেয়ে কেউ আর গঙ্গাস্নানে যান না। ভগবতী ভাগীরথীর জলকে পুণ্যোদকেষু বলেন না। বরং সভ্যতার গর্ব করে বলেন "মাগো! ছিঃ ছিঃ! অত লোকের চোখের সামনে কি স্নান করা যায়? না ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে ঘাটে ওঠা যায়?" অথচ এই মেয়েদেরই দেখি পুরীর সমুদ্রকে হাজার লোকের অপলক চোখের সামনে, সুইমিং-কস্টিউম পরে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দিব্যি লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে স্নান করেন। আমি অবশ্য এর নিন্দা করছি নি, শুধু প্রশ্ন করছি—ঘরের পাশের 'গঙ্গা' কী দোষ করলে?

কাল এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে চলেছে জীবনযাত্রার সব রীতিনীতি। আজ আর আগের মতো রান্নাঘরের সামনের দালানে পিঁড়ি পেতে বসে কাঁসার থালা বাটিতে মাছের ঝোল ভাত খাই না। হস্তর মতো ডাইনিং রুমে টেবিলে বসে 'ফ্রায়েড রাইস' আর 'কাউলরোস্ট' খাই, কাঁচেরপ্লেটে কাঁটা চামচে নিয়ে। ধুতি চাদর আর বিদ্যাসাগরী চটির বদলে এখন চোঙা-প্যান্ট আর ছুঁচলো মুখ জুতো পায়ে আমাদের সোনার চাঁদেরা ঘুরে বেড়ান কোন আজ্ঞায় নয়, 'ক্লাবে' 'রেস্তোঁরা' 'ককি হাউস' 'পিকিং' বা 'চুকিঙে'।

আমাদের যৌবনকাল কেটেছে সম্পূর্ণ নারী বর্জিত হ'য়ে। তখন পথে ঘাটে একটাও ভদ্র মেয়ের মুখ দেখতে পেতুমনা। আগেই বলেছি তাঁরা ছিলেন অসূর্যম্পশ্যা, অন্তঃপুরচারিণী। কোথাও যেতে হ'লে ঘোড়ার গাড়ির সব ধরজা জানলা বন্ধ করে 'হাজতগামী কয়েদীদের' মতো যেতেন তাঁরা। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পর্দা আজ নিশ্চিহ্ন। মেয়েদের ভীড়ে আজকাল বাবুদের দোকানে, বাজারে ঢোকা যায়। ট্রামে বাসেও ওঠা যায়। থাকগে। যে কথা বলছিলুম তার খেই হারিয়ে ফেলছি।

দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞারও রূপান্তর ঘটে চলেছে দেখছি। আমাদের স্কুল জীবন শেষ হল বিংশতকের প্রথম দশকের প্রারম্ভেই। সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার আজ্ঞার পাটও উঠে গেল। কারণ, কে কোন কলেজে গিয়ে ঢুকলো আর কে যে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে উপার্জনের ধান্ধায় কোথায় ছড়িয়ে পড়লো তাদের মধ্যে দু'চারজন ছাড়া আর কারুর খবরই পাইনি। এঁরা কেউ ডাক্তার, কেউ এটর্নী, কেউ উকিল, কেউবা সরকারি বা সওদাগরী অফিসে কেরাণী কিংবা ডিপার্টমেন্টাল হেড হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই আমাকে সারাজীবন মনে রেখেছিলেন। অথচ পত্রালাপ ও দেখা সাক্ষাৎ ক্বচিৎ কখনো হত। আজ আর তাঁদের কেউই জীবিত নেই। আছেন তাঁরা শুধু আমার মনের স্মৃতির কোঠায়। মনে পড়লে কষ্ট হয়।

কিন্তু ইংরিজীতে একটা সেই কথা আছে না—Men may come and men may go but —আজ্ঞা আমাদের অমর! It will ever remain green! দিনে দিনে অবশ্য তার স্থান কাল পরিবর্তন হচ্ছে, তার রূপ ও প্রকৃতিও বদলাচ্ছে, কিন্তু আজ্ঞা চাই। আজ্ঞা ছাড়া কি মানুষ টেঁকতে পারে? পাড়ার ছেলেরা তো আছে! চোরবাগান, কালীতলা, শংকর ঘোষের লেন, বেচুচাটুয্যের স্ট্রীট, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, বামাপুকুর, মেছোবাজার স্ট্রীট, পটলডাঙা, সব তো শূন্য হ'য়ে যায়নি! প্রায় আমার সমবয়সী পাড়ার 'আউট বয় যারা তারা নিখরচায় একটি তোফা আজ্ঞা পেড়েছিল বিদ্যাসাগর স্কুলের পাশে 'পাণ্ডির ঘাটে।'

পান্তির মাঠেরও মৃত্যু হয়েছে। আজ সেও নেই। তার বুকে 'বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেল' উঠে দাঁড়িয়েছে। আর যারা তার কোলে বসে আড্ডা দিত একদিন তারাও দু'একজন ছাড়া সবাই আজ লোকান্তরে। এদের কথা মনে হ'লে আজও মনটা টন্ টন্ করে ওঠে। এই পান্তির মাঠে আমরা সবাই মিলে 'ফুটবল' খেলতুম 'ক্রিকেট' খেলতুম। মাঝে মাঝে 'কবাডি' খেলাও হ'ত। এ খেলা তো শহরের শিক্ষিত ভদ্রসমাজ থেকে এখন উঠেই গেছে। এ খেলায় আমার কিন্তু খুবই খ্যাতি ছিল। দম রাখতে, ঝোড় করতে আর 'কাঁইচি' মারতে আমার না কি জুড়ি ছিল না। কতকটা আমার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারতো আমাদের সহপাঠী আহেরীটোলার ছেলে অতুল গোস্বামী। সে একবার এই খেলায় আমাকে ধরতে গিয়ে আমার ডান হাতের কনুই মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছিল। সে হাত নিয়ে ভুগেছিলুম অনেকদিন। তবু কিন্তু অতুলের ওপর একটুও রাগ হয়নি। আমাদের Sporting Spirit ছিল। অতুল ক্লাসের একজন ভাল ছেলে ছিল।

খেলার পর পান্তির মাঠে বসে অনেকক্ষণ আমরা আড্ডা দিতুম। 'চিনে বাদাম', 'চানাচুর', 'কুলপী বরফ' খাওয়া হ'তো। সে সময় 'আইসক্রীম' প্রচলিত হয়নি। পান্তির মাঠের বন্ধুরা সবই একে একে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন। কেবল, একজন এখনও আছেন শ্রীপ্রভাত গাঙ্গুলী। বিশিষ্ট সাংবাদিক, ঐতিহাসিক ও জীবনীকার। কিন্তু, তিনি অনেকদূরে চলে গেছেন। একেবারে হুমহুমে। আর আমি এসে পড়েছি একেবারে দক্ষিণধারে রবীন্দ্রসরোবরখ্যাত লেকের ধারে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এই সেদিন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করেছেন। কিন্তু, একদা তিনি পান্তির মাঠের আড্ডাধারী হলেও তাঁকে কি কেউ ভুলতে পারবে? "মহাস্থবির জাতকের" পৃষ্ঠায় সে অমর হয়ে থাকবে একথা বলাই বাহুল্য। যেমনি রসিক তেমনি কথাশিল্পী। জমিয়ে রাখতো আড্ডা তাঁর গল্পে। ওরই টানে সূর্যাস্ত হ'তে না হ'তে ছুটে যেতুম আমরা পান্তির মাঠের আড্ডায়। মাঠটা আমরাই যেন রিজার্ভ করে নিয়েছিলুম আমাদের নিজস্ব বলে। অন্য কোনো দল এসে ওখানে আড্ডা গাড়বার চেষ্টা করলে, আমাদের দলের দুঃসাহসী দুটি বন্ধু ছিলেন 'বিরু' (ভীম)! আর 'গদাই'। ভীমের গদার মতই তাঁরা সেই নবাগতদের তাড়া করে বিতাড়িত করতেন। বাধা যে আপত্তিকরা দিতেন না তা নয়, কিন্তু, হেরে যেতেন লড়াইয়ে। পেরে উঠতেন না আমাদের সঙ্গে কিছুতেই। কাজেই—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

পান্তির মাঠে আমাদেরই একচ্ছত্র অধিকার ছিল। এখানকার আড্ডায় কোনও কোনও বন্ধু এমন সব গান গেয়ে শোনাতেন যা ছাপার হরফে লিখলে আমাদের দেশে অশ্লীলতার দায়ে সাজা পেতে হবে। কিন্তু একথা আমি অকপটে স্বীকার করবো, যে, সে সব গান যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই অবিসম্বাদী প্রতিভাবান ও শক্তিশালী কবি ছিলেন। পাশ্চাত্যদেশে এই শ্রেণীর কবিতার বিশেষ সমাদর দেখা যায়। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর প্রচ্ছদপটে সুচারু ভাবে মুদ্রিত এই Ribald Poems Songs সংগ্রহ-গ্রন্থ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় বিক্রয় হয়। কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগা দেশে এসব 'মণিমুক্তা' মাটিতে ছড়িয়ে গিয়ে, ধূলায় চাপা পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। দু'একটি গানের এক আধ লাইন উদ্ধৃত করে দিচ্ছি এখানে রসজ্ঞদের বিচারের জন্য, আমাদের যৌবনোন্মেষিত জীবনের অবদমনক্ষণে বন্ধু সংগমে গাওয়া এ গানগুলিকে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, কুৎসিত ও জঘন্য রচনা বলে রায় দেওয়া চলে কিনা? যদি "গোরচনা গোরী নবীনা কিশোরী নাহিতে দেখনু ঘাটে" অথবা "চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিতমোর" এসব Sublime lines হয়; "রতি সুখ সারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম!" যদি কবি জয়দেবের মাথায় যশের মুকুট পরিয়ে থাকে, "শ্রোণী ভারাদলস গমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম" যদি কালিদাসকে মহাকবি কয় থাকে তবে এসব শক্তিমান অজ্ঞাত অখ্যাত কবিদের

অবহেলার মধ্যে বিলীন হ'তে দেওয়া কি বাংলাসাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়? ধরুন, ননদ-ভাজের এই দ্বৈত-সঙ্গীতটি আপত্তিকর অর্থবাচক হলেও, কাব্যের বিচারে কিন্তু অপূর্ব। ননদ জিজ্ঞাসা করছেন:—
"পেলি বউ সন্ধ্যেবেলা কোথায় চাঁপাফুল?" বউ বললে ঘাটের ধারে বেড়াতে গিয়ে চাঁপাফুল পড়ে আছে দেখে কুড়িয়ে খোঁপায় পরেছি। ননদ বিশ্বাস করে না। বলে, খোঁপা তোর চিলে দেখছি, সিঁথের সিঁদুরও ঠিক নেই তা-ছাড়া—

"গাল কেন তোর লাল দেখিলো? চাল কেন বেচাল?
ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে, ঘেমেছে কপাল!—ও বউ সন্ধ্যেবেলা!"

চতুরা ভ্রাতৃবধূ সমানে ননদিনীর সমস্ত আপত্তিকর প্রশ্নের কাটান দিয়ে যাচ্ছে! কী চমৎকার কলা-কৌশল পূর্ণ সে সরল রচনা। শক্তিশালী ও সুরজ্ঞ কবি ছাড়া সাধারণ কোনও লেখকের পক্ষে এ ধরণের উচ্চাঙ্গের গান বাঁধা অসম্ভব। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এর মধ্যে পরোক্ষে একটু যৌনলীলার সামান্য ইঙ্গিত আছে বলে বাংলাসাহিত্যে এ অপূর্ব রচনা উপেক্ষিত হয়ে গেছে।

আরও এমন অনেক উৎকৃষ্ট গান আছে উঠতি বয়সের ছেলেদের আড্ডায় পরম উপভোগ্য মনে হ'ত, কেবলমাত্র তার যৌন-আবেদনের জন্যই নয়, সাহিত্যরস সম্পৃক্ত অমৃত আস্বাদের জন্যও। এসব কিছু নীতিবাগীশদের রক্তচক্ষুর ভয়ে আজ বিলুপ্ত হতে বসেছে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'কে আমরা শিরোধার্য করে নিয়েছি, কিন্তু, তার চেয়েও নিরীহ নিরাপদ কাব্য ও সঙ্গীতমালাকে অশ্লীলতার দুর্নাম দিয়ে বর্জন করেছি। অশ্লীলতা তাঁদের রচনায় নেই, অশ্লীলতা আছে প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই মনে। স্বামী মারা গেছে, অনাথা বিধবা দরিদ্রা যুবতী। অন্ন-সংস্থান নেই। হতাশ হয়ে কাঁদছে। পড়শিনী এক বান্ধবী, যে তাকে বৌদি বলে ডাকে –প্রবোধ দিয়ে বলছে—

"অত ভাবনা কী লো 'ভাবী'? (বৌদি)!
তোর নাভির নিচেয় মোহর আছে
ভাঙাবি আর খাবি!"

এর মধ্যে একটাও দুর্নীতিপূর্ণ কদর্য শব্দ খুঁজে পাবেন না। দিব্যি পরিচ্ছন্ন ভাষা! কিন্তু, কী প্রচণ্ড Suggestive!

এমনিতর অনেক গানই আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় হোতো যেগুলো সে বয়সে আমাদের কাছে খুবই উপভোগ্য মনে হ'ত। অবশ্য বয়সের ধর্মে। সাহিত্যের নীতি দুর্নীতির বিচারে নয়। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে আক্ষেপ হচ্ছে কেন সেই সাহিত্যের রত্নকণাগুলি সংগ্রহ করে খাতায় লিখে রাখিনি! তা'হলে আমরাও আজ বিশ্ববাসীকে দেখাতে পারতুম যে তোমাদের Ribald Rhymes এর চেয়ে আমাদের রচনা কত Subtle, কত sublime, কত Artistic in expression!

আমাদের পাড়ার মাঠের আড্ডার বন্ধুদের কারুর কারুর পাড়ার মধ্যে 'বখাটে' 'বদ্‌মাইশ'-'গুণ্ডা' ইত্যাদি বদ্‌নাম রটলেও আমরা জানি সেটা কত মিথ্যা, কত কাল্পনিক। স্বীকার করি, তারা স্কুল পালিয়ে আড্ডা দিয়েছে। লেখাপড়া ভালো শেখেনি। ক্লাসে উঠতে পারতো না। সিগারেট বিড়ি টানতে শিখেছিল। তাদের পরস্পরকে আদরের সম্বোধনই ছিল 'শালা!' কিন্তু তারা কেউ অভদ্র বা অশিষ্ট ছিল না। কোনও ইতরতা দেখিনি তাদের মধ্যে। ভদ্রবংশের ছেলে তারা। রক্তের গুণ যাবে কোথা? পাড়ার আপদে বিপদে তারাই ছুটে যেতো। রাত জেগে রোগীর সেবা করতো। শ্মশানঘাটের সঙ্গী হ'ত। আনন্দে উৎসবেও

তারাই এসে কাজ তুলে দেবার ভার নিত! আর, আমরা ভালোছেলের দল ছিলুম—good for nothing! এক পংক্তি লোককে পরিবেশন করেই হাঁপিয়ে পড়ে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে কোমর থেকে তোয়ালে গামছা খুলে ফেলতুম। শেষ রক্ষে করতো তারাই। চাকর-বাকর লোকজন সবাইকে খাইয়ে সবশেষে তারা পাতপেড়ে বসতো অবশিষ্ট যা কিছু থাকতো তাই গুছিয়ে নিয়ে সোনামুখ করে খেতো। আজ সে ছেলের দল কোথায়? কোনও আড্ডায় এখন যেন আর প্রাণ নেই।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম। আমাদের আড্ডাধারী বন্ধুদের মধ্যে যাত্রা থিয়েটার দেখার প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল প্রায় সবারই। আমি তো বলতে গেলে দশবারো বছর বয়স থেকেই থিয়েটার দেখছি। কারণ থিয়েটারে আমায় পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে যেতে হ'ত না। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার এবং ক্লাসিক থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন আমার সেজবৌদির দাদা। সেজবৌদির থিয়েটার দেখার বেজায় সখ ছিল। দাদাকে লিখে পাঠালেই সঙ্গে সঙ্গে 'একগাড়ি পাশ'। অর্থাৎ এক গাড়িতে যত লোক ধরে ঠেসেঠুসে এলেও সবাইকেই ঢুকতে দেওয়া হত। এই বোনটিকে অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর অনুরোধে অনেক সময় 'স্টার' 'মিনার্ভা' প্রভৃতি থিয়েটারেরও পাশ আনিয়ে দিতেন। ওখানে ভালো নাটক অভিনয় হলেই সেজবৌদির টনক নড়তো।

কিন্তু একগাড়ি মেয়েকে সামলে নিয়ে যাবে কে? আবার গাড়ী ডেকে বাড়ি নিয়ে আসবেই বা কে? তখন সারারাত অভিনয় হ'ত। একাধিক নাটক ও গীতিনাট্য একরাত্রেই দেখবার সুযোগ পেতো দর্শকেরা। মেয়েরা তো সব শেষ না হলে উঠবে না। কাজেই পুরুষ অভিভাবক কেউই তাঁদের নিয়ে যেতে চাইতেন না। আমার নাটকে নেশা ছিল। কাজেই আমিই মেয়েদের থিয়েটারে নিয়ে যেতুম ও নিয়ে আসতুম। এছাড়া বন্ধুদের সঙ্গী হয়েও বহুবার যেতুম। থিয়েটার দেখতে যাবার বেলা আমার অবস্থা ছিল সেই—"সেদো? ভাত খাবি? না, হাতধোবো কোথা?" এই অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সেও নাটক দেখবার সখ আমার আজও অক্ষয় আছে।

অল্প বয়স থেকেই ঘন ঘন থিয়েটার দেখার ফলে শেষে নিজেদেরই থিয়েটার করবার ভীষণ ঝোঁক চাপলো। আমাদের পাড়ায় অবশ্য দু'দুটো এ্যামেচার থিয়েটার ক্লাব ছিল। একটা চোরবাগানে স্বর্গীয় নট ও নাট্যকার ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "ক্রেওস্ ড্রামেটিক ইউনিয়ন"। অধিকাংশই পাড়ার ছেলে আর ভূপেন বাবুর বিদ্যাসাগর কলেজের ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা এর সদস্য ছিলেন। কিন্তু, এখানে ঢোকার উপায় ছিলনা আমাদের, কারণ, আমাদের বাড়ীর ন্যাঠাজুতো খুড়তুতো দাদাদের সহপাঠী বন্ধুরাই অধিকাংশ এখানে আড্ডা দিতেন।

আর একটি 'এ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাব' ছিল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পাশেই প্রায়। এটির নাম ছিল 'ভারত সঙ্গীতসমাজ'। এই ভারত সঙ্গীতসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শুধু কলকাতার লক্ষপতিরাই নন, বাংলাদেশের সমস্ত নামকরা সৌখীন জমিদার রাজা, মহারাজারাও এর সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এটি ছিল ধনকুবেরদের নাট্যানুশীলনের আড্ডা। সুতরাং আমাদের মতো বেকার চ্যাঙড়া ছোকরাদের পক্ষে 'ভার সঙ্গীতসমাজে' ছিল "No Admission".

অথচ নিজেদের একটি ক্লাব ক'রে থিয়েটার করবার সখ তখন আমাদের আড্ডার প্রত্যেকেরই মনে এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে আমাদের আর সবুর সইছিলনা। চেয়ে-চিন্তে, ভিক্ষা করে, কেউ বা পড়ার বইও কিছু 'ওল্ড বুকশপে' বেচে টাকা যোগাড় করে আমরা মেছোটোলা লেনে একখানা ঘর ভাড়া নিলুম মাসিক পাঁচটাকায়। চোরবাগান, কাঁসারিপাড়া, সিমলের কাছাকাছি থাকতে সাহস হলনা। যদি ধরা পড়ে যাই।

ঘর পেয়েই ক্লাবের নাম দিলুম আমরা "ইয়ং ড্রামাটিক ক্লাব।" ডোনেশনের টাকা থেকে শতরঞ্চি, হারমোনিয়ম, ডুগি-তবলা কেনা হল। একটা চাবি-কুলুপ আর 'ভিক্টর লণ্ঠন'ও কেনা হ'ল। ঘর ঝাঁট দেবার ঝাড়ু, ঝাড়-পোঁচ করবার ঝাড়ন নিঃশব্দে বাড়ি থেকেই সরিয়ে আনা হ'ল। সে কী আনন্দ ও উৎসাহ।

সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই সবাই এসে জুটতুম আমাদের এই নিজস্ব নতুন আড্ডায়। প্রেমাঙ্কুর নাটক লেখবার ভার নিলে। আমি 'প্রম্পটার' আর 'ড্রামাটিক ডিরেক্টর'। কারণ ছেলে বয়স থেকে থিয়েটার দেখে দেখে আমি সব স্বনামধন্য যশস্বী অভিনেতাদের স্বর ও ভঙ্গী হুবহু অনুকরণ করতে পারতুম। স্টারে অমৃতলাল মিত্র, ক্লাসিকে অমরেন্দ্র নাথ দত্ত, মিনার্ভায় 'ধানী বাবু' যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠতেন এই হরবোলার কণ্ঠে।

প্রেমাঙ্কুর এলেই নাটক যতটুকু লেখা হ'য়েছে তাই নিয়েই মহড়া শুরু হত। পার্ট নিয়ে অবশ্য বেশ একটু মুস্কিল হয়েছিল। সবাই 'হীরো' সাজতে চায়। কাজেই সবাইকে trial দেওয়া হ'ল। কিন্তু পারলেনা কেউ। আরও একটা মুস্কিল হ'ল কেউ কাটা সৈন্য সাজতে রাজি নয়। কাজেই, নাট্যকারকে বলা হ'ল সৈন্য কাউকে যুদ্ধে না মেরে Strategic retreat করিয়ে দাও। অগত্যা তাই করা হল। নিজস্ব নাট্যকার হ'লে এই একটা মস্ত সুবিধে। আজকাল তাই প্রত্যেক সাধারণ রঙ্গমঞ্চেই দেখা যায় তাঁরা নিজস্ব নাট্যকার রেখেছেন। তাঁরা Staff এর অনুকূল নাটক রচনা করে দেন।

আমাদের ইয়ংড্রামাটিক ক্লাব অল্পদিনের মধ্যেই বেশ জমে উঠেছিল। সবাই আমরা আড্ডাটির মতো রোজই ধরে ধরে নতুন নতুন মেম্বার করতুম। চাঁদা তো মাত্র 'চারআনা'! দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। জেলেটোলার আড্ডা জম জমাট!　　[ক্রমশঃ

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

'মধুপর্ক' পর্যায়ে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের

বড়বাবু

কলিকাতা রেডিওর প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা

নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের

অন্তরঙ্গ চরিত্রচিত্রণ। তখনকার দিনের রেডিওর অনেক নেপথ্য কাহিনী।

● এক ●

নরেশ মাইতি লোকটাকে দেখলে মনে হবে যেন নিতান্ত গোবেচারা, বোকার মত চাহনি, এলোমেলো কথাবার্তা। কিন্তু আসলে তার মত ধূর্ত খুঁজে পাওয়া শক্ত। বোধ হয় তার এই গুণের জন্যেই সে কিছু দিন পুলিশের আই বি-তে ইনফরমারের কাজ করেছিল আর অনেক চোর ডাকাতের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দিন তো সমান যায় না। একবার সে এক দুর্দান্ত গুণ্ডার হাতে পড়ে অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেল আর তারপর পুলিশের কাজে গড় করে ইস্তফা দিল। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। পুলিশের ওই কাজে দু'পয়সা পাওয়া যায় বটে কিন্তু ঝক্কি বড্ড বেশি। মারধোর তো লেগেই আছে তার ওপর প্রাণ যাবার ভয়। দরকার নেই অমন কাজে। তার চেয়ে পানবিড়ির দোকান ঢের ভাল।

কয়েক বছর আগেকার কথা বলছি। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের সামনে কমুলিয়াটোলার পাশে ছিল ফুলবাগান বস্তি। সেই পল্লীর একটা কানা গলির মধ্যে নরেশের টিনের বাড়ি। গলিটায় যারা থাকে তারা প্রকাশ্য সমাজের মানুষ নয়। চোরাপথে তাদের কারবার। অসামাজিক তাদের জীবনযাত্রা।

নরেশ লক্ষ্য করেছে, সেই গলির ২৬নং মাঠকোটার সামনে কয়েকদিন ধরে রাত্রে একটা ছোট মোটরগাড়ী এসে দাঁড়াচ্ছে। ব্যাপারটা তাকে কৌতূহলী করেছে। ২৬ নম্বরে যারা থাকে তাদের বাপ চৌদ্দ পুরুষের সাধ্য নেই অমন মোটরগাড়ী পুষতে পারে। আর অমন মোটরওয়ালা বাবুর সঙ্গে তাদের দোস্তি থাকবারও কথা নয়। সুতরাং···

সুতরাং ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার।

একে শীতকাল, তায় বৃষ্টি! দিনটা যাকে বলে যাচ্ছেতাই। কিন্তু তাতে নরেশের কৌতূহল বাধা পাবার নয়। এরকম অবস্থার সঙ্গে সে অভ্যস্ত। হুমায়ুনীতে খেদা গুণ্ডার পিছনে সে যখন চারদিন ধরে ঘুরেছিল তখন ঘোর বর্ষার মধ্যেই তাকে কাটাতে হয়েছিল সারা দিন রাত। সেজন্যে সে গোয়েন্দাকর্তা ঘোষাল সাহেবের কাছে বাহবা পেয়েছিল প্রচুর।

মাথায় একটা কম্বল জড়িয়ে নরেশ পথে নামল। দেখা যাক, এই ব্যাপারে কোন লটকানো খবর জোগাড় হয়ে দু'পয়সা রোজগার করা যায় কিনা।

২৬ নং বাড়িটায় থাকে শীতলপ্রসাদ। মোড়ের মাথায় তার একটা বিড়ির দোকান আছে। ভাল চলেনা। তার অবস্থা নরেশের চেয়েও খারাপ। কিন্তু নরেশ লক্ষ্য করেছে হঠাৎ যেন শীতলপ্রসাদ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। সিল্কের পাঞ্জাবী পরছে, পায়ে লপেটা, চুলে বোধ হয় আতরও লাগায়। এ সব আসে কোথেকে? ওই মোটরখানাই কী তার হেতু? সুতরাং সন্ধান করতে হবে বৈকি। চাই কি, এই মওকায় নরেশেরও ভোল বদলাতে পারে।

২৬ নম্বরের পাশে একটা দুর্গন্ধ পগার, তার পাশ দিয়ে গিয়ে পশ্চিম টপকে নরেশ বাড়ির মধ্যে নামল। এসব কাজে সে বিলক্ষণ দক্ষ। উপরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। সেই ঘরেই আছে সেই মোটরওয়ালা বাবু আর শীতলপ্রসাদ। উপরের ঘরের জানলাটা খোলা। সেদিককার দেওয়ালের একটা পাইপ বেয়ে নরেশ জানলার কাছ বরাবর উঠল।

ঘরের মাঝখানে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনের ধোঁয়ায় ঘরটা ঝাপসা ঝাপসা দেখাচ্ছে। তার একপাশে শীতলপ্রসাদ। অন্যধারে জানলার দিকে পিছন করে বসে সেই মোটরওয়ালা বাবু। নরেশ তার মুখ দেখতে পেল না। কিন্তু কথাবার্তা শুনতে লাগল স্পষ্ট। ··গুরুতর চক্রান্ত · সাংঘাতিক সলা পরামর্শ···মানুষের জীবন নিয়ে খেলা · শুনতে শুনতে নরেশের পোড়খাওয়া বুকও গুর গুর করতে লাগল।

ঘণ্টা খানেক পরে সে নিজের ডেরায় ফিরল। সে রাতে তার ঘুম হল না, মাথা গরম হোয়ে উঠল। ভাবতে লাগল, কাজটা যদি কৌশলে হাসিল করা যায় তাহলে নির্ঘাৎ মোটা টাকা বাগানো যাবে।

● দুই ●

হেস্টিংস স্ট্রীটের করনজা রায়কত কোম্পানী বহুদিনের পুরনো এটর্নী আপিস। আজকাল পসার তেমন না থাকলেও কয়েকঘর বাঁধা মক্কেল আছে। তাতেই বেশ চলে যায়। করনজা রায়কতের রায়কত অনেককাল গত হয়েছেন। বর্তমানে কৃপানাথ করনজাই ষোলো আনা মালিক। আর্মের মাটা অবিশ্যি বহাল আছে।

কৃপানাথ করনজা প্রৌঢ় হয়েছেন। কথাবার্তায় চালচলনে অতিশয় অমায়িক। কিন্তু হিসাবপত্রে বড় বেসামাল। বহু মক্কেলের টাকা তিনি গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু সেসব টাকার যদি হিসাব চাওয়া যায় তাহলে কৃপানাথকে মাথায় হাত দিতে হবে। সেজন্যে কৃপানাথের মনে সুখ নেই। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। মক্কেলের টাকা তছরূপ, এটর্নীর পক্ষে এ যে ঘোর অপরাধ। কিন্তু উপায় কী? কোন্ পথে প্রতিকার? একমাত্র পথ আছে, যদি এক থোকে লাখ খানেক টাকা জোগাড় করা যায়। কিন্তু এই মন্দার বাজারে এত টাকা দেবে কে?

কিন্তু টাকা চাই। যেমন করেই হোক মাস খানেকের মধ্যে এই টাকা তাঁকে জোগাড় করতেই হবে। অন্যথায়, ইজ্জত নষ্ট, বদনাম এবং সম্ভবত জেলর।

• • • •

করনজা রাইফেড কোম্পানীর আপিসে দু'জন মাত্র কর্মচারী। একজন বুড়ো বড়বাবু, অপরজন মেয়ে-টাইপিস্ট মিনতি রায়। বড়বাবু হিসাব রাখে, মফেলদের নামে বিল তৈরী করে, টাকা আদায় করে, দরকার হলে চিঠি বিলি করতেও বেরোয়। মিনতি টাইপ করে, ফাইল রাখে এবং বাংলা চিঠি আর দলিলপত্র সামলায়। ভারী বুদ্ধিমতী শান্তস্বভাবের রাশভারী মেয়ে। কৃপানাথ তার খুব তারিফ করেন। তারিফ করেন বড়ো বড়বাবুর কাজেরও। মনিবের সদয় ব্যবহারে বুড়ো কেরানী ও তরুণী কেরানী দু'জনেই সন্তুষ্ট। কাজের যখন চাপ থাকে না তখন কৃপানাথ তাদের সকাল সকাল ছুটি দিয়ে দেন। তিনি অবশ্য নিয়মিত সন্ধ্যা পর্যন্ত আপিসে থাকেন। কী জানি, বলা তো যায় না, যদি কোন মক্কেল সন্ধ্যার ঝোঁকে এসে পড়ে।

আসলে কিন্তু কোন মক্কেলের জন্যে কৃপানাথ বসে থাকেন না। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের গা-ঢেকে যে লোকটি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে, মক্কেল সে নয়। দু'জনের মধ্যে যে সব বিষয়ের আলোচনা হয়, কোন মামলার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নেই, আলোচনা হয় এক গোপন চক্রান্তের, কেমন করে রাতারাতি লাখ দু'লাখ টাকা কামানো যায় তারই গুপ্ত পরামর্শ।

• • • •

নরেশ মাইতি যে রাত্রে শীতলপ্রসাদের বাড়ীতে ঢুকে দু'জন মানুষের গোপন আলোচনা শুনে এসেছিল তার এক সপ্তাহ পরে এক সন্ধ্যায় কৃপানাথের সঙ্গে তার আপিসে এক ব্যক্তি দেখা করতে এসেছিল। মিনতি আর বড়বাবু অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। চাকরটাকে অবধি কৃপানাথ ছুটি দিয়েছেন।

দু'জনের মধ্যে বোধকরি কোন গূঢ় পরামর্শ চলছিল। দু'জনেরই মুখ গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন। দু'জনেই যেন অনাগত দুর্দিনের আশংকায় বিচলিত।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আগন্তুক বললে—সামনে যে বিষম সর্বনাশ তাতে আর সন্দেহ নেই। আপনি যে মতলব ঠাউরেছেন তা মন্দ নয়। কিন্তু একাজ করবে কে?

ধীরে ধীরে কৃপানাথ বললেন—সেও আমি ভেবে রেখেছি। আমার আপিসের টাইপিস্ট মিস রায়ের সঙ্গে একটা ছোকরা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে। তার নাম বরেন হালদার। তাকেই একাজে লটকাতে হবে। ছোকরার অবস্থা খুব খারাপ। অনেকদিন বেকার। আমার কাছে চাকরির জন্যে এসেছিল। টাকার লোভ দেখালে সে বোধ হয় টোপ গিলবে।

মাথা নেড়ে আগন্তুক বললে—বেশ কথা। এই রকম লোকই আমাদের চাই। শীতলপ্রসাদকে কাজে লাগিয়ে দিন। দু'দশ টাকার জন্যে যেন না আটকায়। ঠিক সময় আমায় খবর দেবেন।

নিশ্চয় দেব। বলে কৃপানাথ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে গোপন পরামর্শ চলল। মানুষের প্রাণ নিয়ে সে পরামর্শ·· মানুষের বুকের তাজা রক্ত নিয়ে সে চক্রান্ত···নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন।

● তিন ●

মাঝে মাঝে বরেন ভাবে, আধুনিক জগতে শিক্ষাদীক্ষা, নৈতিক আদর্শ, মূল্যবোধ—এসবের কোন দাম নেই। টাকা। টাকাই সব। আর টাকা রোজগার করবার জন্যে কোন আদর্শ-ফাদর্শ কোন কাজে লাগে না। টাকা না থাকলে, আদর্শ নিয়ে ধুয়ে জল খেয়ে পেট ভরে না। দুনিয়ায় মান-ইজ্জতও থাকে না। সুতরাং

টাকা উপার্জন করবার জন্যে যে কোন পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। টাকা থাকলেই মান। টাকা থাকলেই সম্ভ্রম। দুনিয়াটা কার? দুনিয়া টাকার। বাড়িওলার তিনমাসের ভাড়া বাকি। লোকটা অবশ্য ভাষায় তাগাদা সুরু করেছে। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটবার যো নেই। মনিহারি দোকানে বিস্তর দেনা। দেখা পেলেই দোকানি তাড়া করে আসে।

এই নিদারুণ দারিদ্র আর বুকচাপা নিরাশার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা আর প্রেরণা মিনতি। সে বেকার, সে গরীব বলে মিনতি মুখ ফিরিয়ে নেয় নি, বরং তাকে ভরসা দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু মিনতির কাছেও বুঝি আর মুখ দেখানোর উপায় নেই। মুখে সে যতই বলুক, বরেনের এই একটানা দারিদ্র্য আর বেকারিত্ব তার মনে কি লাগছে না? বেশি কথা কি, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভদ্র সমাজে বেরুবার উপায় নেই। দু'খানা ধুতি আর একটা পিরান ডাইং ক্লিনিং-এ দেওয়া হয়েছে অনেকদিন, পয়সার অভাবে আনা হয়নি, এদিকে পরনের জামা আর পিরান থেকে ময়লার আর ঘামের দুর্গন্ধ বেরুতে সুরু করেছে। সুতরাং টাকা চাই। যে কোন উপায়ে হোক অন্তত সম্ভ্রম বজায় করবার জন্যে কিছু টাকা তার চাই।

—টাকা রোজগার করবেন? শ' পাঁচেক টাকা?

হঠাৎ যেন দৈববাণী হল—টাকা রোজগার করবেন। শ' পাঁচেক টাকা।

সন্ধ্যার পর ঘুরতে ঘুরতে বরেন সেদিন দেশবন্ধু পার্কের এক কোণে গিয়ে একটা ঢিবির ওপর বসে বসে ভাবছিল, এমন সময় ওই কথাগুলো যেন আকাশ থেকে তার কানে এসে ঢুকলো।

চমকে ঘাড় ফেরালো বরেন। দৈববাণী নয়। সামনে একজন রক্তমাংসের মানুষ দাঁড়িয়ে। বরেন বিমূঢ়ের মত বললে—আপনি কি আমায় কিছু বললেন?

লোকটা মাথা নাড়ল—হ্যাঁ, আপনাকেই তো বললাম। টাকা রোজগার করবেন? পাচশো টাকা? ইচ্ছে করলেই টাকাটা পাবেন।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বরেন বললে—তামাসা করবার আর জায়গা পেলেন না?

লোকটি এবার পিছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। বললে— তামাসা আদপে নয়। সত্যি বলছি।

লোকটার চেহারা দেখলে বিশ্বাস হয় না, সে সত্যি কথা বলছে। কিন্তু পাঁচশো টাকা. বরেন বললে—ব্যাপারটা খুলে বলুন তাহলে।

—তা তো বলবই।

লোকটি তার পাশে বসল। একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বললে—শাইকপাড়ার ওধারে পাতিপুকুর চেনেন তো? সেখানে থাকেন জমিদার ঈশান মজুমদার। বাগান ঘেরা মস্তবড় বাড়ি। রাস্তার ওপর প্রকাণ্ড লোহার গেটের মাথায় দু'ধারে দুটো সিংহ বসানো। ও তল্লাটে ওরকম বাড়ি আর নেই।

বরেন বললে—এ পর্যন্ত কিছুই বুঝলাম না। আমাকে কি করতে হবে, যার জন্যে···

—আপনাকে পাচশো টাকা দেওয়া হবে? সে কথাই এবার বলছি শুনুন। আমি একটা বেসরকারী গোয়েন্দা আপিসের তরফে কাজ করছি। তাদের একখানা চিঠি ঈশান মজুমদারের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। খোদ তাঁর হাতে দিতে হবে। অন্য কাউকে দিলে চলবে না। এর বেশী আমি আর কিছু জানি না। কোন বিশেষ কারণে আমার সেখানে যাবার উপায় নেই। তাই এমন একজন

বিশ্বাসী লোক চাই যে ফাঁকী না দিয়ে চিঠিখানা ঈশান বাবুর হাতে পৌঁছে দেবে। আজ রাত্রেই দিতে হবে।

বরেন বললে—এই সামান্য কাজের জন্যে এত টাকা! এ তো যে কোন লোকই পারতো। যেকোন ছোকরা বা রাস্তার মুটে মজুর।

—উঁহু! বাজে লোককে দিয়ে একাজ করানো আমাদের কর্তাদের ইচ্ছে নয়। চাই শিক্ষিত ভদ্রলোক, যে নাকি এ নিয়ে পাঁচকান করবে না, আর টাকা নিয়ে বেইমানিও করবে না। আপনি যদি রাজী থাকেন তো পাঁচশো টাকা পাবেন।

—কে দেবে এই টাকা?

বরেনের প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বললে—আমিই দেব। আগাম দেব দু'শো। কাজ শেষ করে এইখানে ফিরে আসবেন, হাতে হাতে আর তিনশো।

বরেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ব্যাপারটা সন্দেহজনক নিশ্চয়ই। কিন্তু সে তো কোন কুকর্ম করছে না, একখানা চিঠি একজনকে পৌঁছে দেবে। তার জন্যে যদি এখনি দুশো এবং পরে তিনশো পাওয়া যায়···

বরেন বললে—বাকি তিনশো যে পরে পাবো তার গ্যারাণ্টি কি?

—বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই। আমরা যে আপনাকে বিশ্বাস করে এখনি দুশো দিচ্ছি।

—এই দুশো নিয়ে আমি যদি কেটে পড়ি। চিঠি যদি না দিই।

—তাহলে আপনাকে বেশিদিন জিন্দা থাকতে হবে না।

বরেন বললে—ঠিক আছে। আমি রাজী। বলুন, কিভাবে কাজ করতে হবে।

লোকটি খুশী মুখে বললে—সব বুঝিয়ে দিচ্ছি, শুনুন। ঈশানবাবু এই চিঠির জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি ঠিক রাত বারোটার সময় তাঁর বৈঠকখানায় আসবেন এই চিঠির জন্যে। বাগানের উত্তর ধারে বৈঠকখানা। বাগানের দিকে দুটো বড় জানলা আছে। একটা জানলা খোলা থাকবে। সেই জানলা দিয়ে আপনি ঘরে ঢুকবেন। বুঝতে পারছেন?

—জলের মত। জানলায় শিক নেই?

—নেই। বিলিতি কায়দার ঘর। জানলায় গরাদ নেই। আপনি কিন্তু ঠিক সময়ে ঘরে ঢুকবেন, মানে, ঠিক যেমন বারোটা বাজবে তখন, তার আগেও না, পরেও না। সময়টা মনে রাখবেন।

—তা তো রাখবো। কিন্তু জানবো কেমন করে? আমার তো ঘড়ি নেই।

লোকটি বললে—সেজন্যে ভাবতে হবে না, একটু আগে পৌঁছোবেন। তারপর অপেক্ষা করবেন। ঈশানবাবুর বাড়ির বড় ঘড়ি বাজবে। জোর আওয়াজ। খুব শুনতে পাবেন। সেই ঘড়িতে যেমন বারোটার ঘন্টা বাজবে···

—অমনি জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকবো?

—হ্যাঁ। সামনেই ঈশানবাবুকে দেখতে পাবেন। চিঠিখানা তাঁর হাতে দেবেন। কোন কথা নয়। নিঃশব্দে কাজ সেরে আবার জানলা দিয়েই বেরিয়ে আসবেন। ব্যস।

—কাজ বিশেষ শক্ত বলে তো মনে হচ্ছে না।

বরেনের মন্তব্য শুনে লোকটি বললে—মোটেই শক্ত নয়। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে করলেই হল।

—বেশ। আমি রাজী আছি। দিন চিঠি।

—এই যে। বলে মহা উল্লসিত হোয়ে লোকটি তার পকেট থেকে একটা সীলমোহর আঁটা লম্বা খাম বার করে বরেনের হাতে দিলে। তারপর কোঁচার খুঁট থেকে মণিব্যাগ খুলে নিয়ে তার ভিতর থেকে এক তাড়া নোট বার করে বরেনের হাতে দিয়ে বললে—গুনে নিন। কুড়িখানা দশটাকার নোট আছে।

বরেন বললে—হ্যাঁ, দেখছি দুশো টাকা।

—বাকি তিনশো পাবেন কাল সকালে এইখানে। রাতের মধ্যেই আমরা খবর পাব চিঠি ঠিকমত মিলি হয়েছে কিনা। কাজ ঠিকঠাক হলে কাল সকালেই বাকিটা পাবেন।

—সকালে কোন্ সময় এখানে আসবো?

—সকাল ঠিক দশটায়।

—বেশ তাই হবে।

—তাহলে আমি চলি?

—আসুন।

লোকটি হেসে ঘাড় নেড়ে যেন বরেনকে উৎসাহ দিয়ে চলে গেল। আর বরেন বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে। পকেটে দুশো টাকা! মনের মধ্যে গভীর আলোড়ন। এই টাকাটায় (আর বাকি তিনশো পাওয়া গেলে) সে যে এ যাত্রা বাঁচবে তাতে সন্দেহ নেই। অনেক ইচ্ছে সে পূর্ণ করতে পারবে। উপস্থিত তার ভয়ানক খিদে পেয়েছে। অনেকদিন ভাল খাওয়া জোটে নি। আজ সে প্রাণভরে ভাল ভাল জিনিষ খাবে। তারপর কাজ সারতে পাতিপুকুর যাবে। টাকা হাত পেতে নিয়েছে, বেইমানি করবে না। আর বেইমানি করলে সে যে নিস্তার পাবে না, তা তো লোকটা জানিয়েই দিয়ে গেছে।

• • • •

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। বারোটা বাজতে দেরী নেই। বরেন পাতিপুকুরে ঈশান মজুমদারের বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে যখন সময়ে। সিংহদরজা বাগান বাড়িটাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এইবার যেন বুকটা কাঁপছে। যদিও সে জানে যে সে কোন কুকর্ম করতে আসেনি, তাহলেও তার মনের মধ্যে যেন অজ্ঞাত ভবিষ্যতের ছায়া।

কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। আকাশে মেঘের সমারোহ। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। বোধ করি অমাবস্যার রাত। বরেন সন্তর্পণে পা ফেলে এগুতে লাগল···ওই যে দূরে একটা ঘর থেকে আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে···ওই ঘর···হাঁ এটাই উত্তর দিক···তাহলে ওই ঘরেই তাকে ঢুকতে হবে। ঢং ঢং ঢং···বাড়ির ভিতর থেকে ঘড়ির শব্দ আসছে···বারোটা বাজছে···বরেন কান পেতে শুনতে লাগল···ক্রমে ঘড়ির শব্দ শূন্যে মিলিয়ে গেল।···ওই জানলাটা···খোলা রয়েছে···বরেন জানলার কাছে গেল··· জানলাটা একটু উঁচুতে···তা হোক, তার কানিস ধরে উপরে উঠতে তাকে বেশি বেগ পেতে হল না। জানলা টপকে সে সহজেই ঘরের মধ্যে নামল।

কিন্তু ও কি ও! হঠাৎ সে যেন পাথর হোয়ে গেল। ঘরের মধ্যে একটি মাত্র লোক। লোকটি চিৎ হোয়ে মাটিতে পড়ে আছে আর তার শরীরের পাশে মেঝের ওপর টাটকা রক্তের রেখা। বরেন কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর এগিয়ে গেল লোকটির দিকে।

সর্বনাশ! যা ভেবেছে তাই। ভদ্রলোক মারা গেছেন। তাঁর মুখটা বিবর্ণ···খোলা দু'চোখের নিষ্পলক উর্ধ্ব দৃষ্টি···বরেন শিউরে উঠে চোখ বুজল। লোকটিকে খুন করা হয়েছে···

ভীত অভিভূত বিহ্বল বরেন কয়েক সেকেণ্ড কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর সেই খুনে ঘর থেকে বেরুবার জন্যে পিছু হটে এল···সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তে তার মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল··· কে যেন তার মাথায় মারলে, ভীষণ জোরে কোন শক্ত জিনিষ দিয়ে · মাথা ঘুরে গেল তার···দু'চোখের সামনে অসংখ্য তারা যেন ঝিকমিক করে উঠল···পরক্ষণেই চেতনা হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

● চার ●

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম শব্দ · চোখের সামনে ঘন কুয়াসা···সারা দেহ বেদনায় আড়ষ্ট·· ধীরে ধীরে বরেন চোখ মেলে চাইল। কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল তা ঠিক বুঝতে না পারলেও বেশীক্ষণ যে নয় তা নিশ্চয় বলে তার মনে হল।

সে দেখল, ঘরের প্রান্তে একটা দরজা খুলে গেল এবং একজন লোক ঘরে ঢুকল। বরেন ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, পায়ে যেন বিশ মণ বেড়ী।

মাথাটা টলছে···দু' চোখে অন্ধকার···কারা যেন কথা বলছে·· একটি তরুণীর ভীতকাতর মুখ··· আরও উত্তেজিত কথাবার্তা···তারপর আবার সব অন্ধকার ·····

কে যেন তার দুহাত ধরে টানছে। বরেন কতকটা চমকে উঠে পড়ল। তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হল। দু হাতে চোখ দুটো রগড়ে ভাল করে তাকিয়ে সে দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশের লোক, ইনস্‌পেকটার হবে বোধ করি।

তার প্রতি প্রশ্ন হল—তোমার নাম কি ?

—বরেন হালদার। অস্ফুটে সে বললে।

—ঠিকানা ?

—১৩২ নম্বর ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট, কুমারটুলী।

মাথার ভিতর তখনও দপদপ করছে। ভারি অবসন্ন লাগছে তার। বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কি ঘটে গেল।

পুলিশ অফিসার হুঙ্কার দিয়ে উঠল—তোমার কি বলবার আছে বল। খুন করলে কেন ?

বরেন কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর তার মাথার মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুত খেলে গেল। পায়ের কাছে লাশ মাথায় আঘাত···চিঠি···

স্খলিত স্বরে বললে—আমি, কিছুই জানি না। আমি যখন এখানে আসি তার আগেই লোকটি মারা গেছে।

পুলিশ অফিসারের পাশে যে লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল সে এবার রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল—মনসেল ! আমি যখন ঘরে এলাম তখন তুমি খুন করে ঐ লোহার ডাণ্ডাটা হাতে করে মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে। খুনে কোথাকার।

বিহ্বল কণ্ঠে বরেন বললে—কিন্তু আমি খুন করিনি। আমি এঘরে ঢুকে দেখলাম লোকটি ওইভাবে মেঝের পড়ে আছে।

পুলিশ অফিসার বললে—এর বক্তব্য শুনে নেওয়া যাক যতীশবাবু। অবিশ্যি আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই। আমি বুঝতে পারছি অপরাধী আমাদের সামনেই রয়েছে।

তারপর বরেনের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা বল দেখি বাছাধন, রাত বারোটার সময় এঘরে এসে ঢুকেছিলে কেন?

—একখানা চিঠি নিয়ে এসেছিলাম। চিঠিখানা এই বাড়ির খোদ মালিক ঈশান বাবুর হাতে দেবার নির্দেশ ছিল।

—চিঠি! কার কাছ থেকে চিঠি?

—এক বেসরকারী গোয়েন্দা অফিস থেকে। এই বলে, কেমন করে কত টাকার আশায় সে চিঠিখানা পৌঁছে দিতে রাজী হয়েছিল তার বিবরণ দিলে।

পুলিশ অফিসার কিছু মন্তব্য করবার আগেই যতীশ নামে লোকটি বলে উঠল—একদম বাজে কথা। মিঃ মজুমদার কস্মিনকালে কোনো বেসরকারী গোয়েন্দা অফিসের সঙ্গে কোনো কারবার করেন নি। আমি তাঁর দশবছরের সেক্রেটারী। আমার মনিবকে এই লোকটা খুন করে এখন মিছেকথা বলে ধম্ দেবার চেষ্টা করছে।

পুলিশ অফিসার মাথা নেড়ে বললে—তা আমিও বেশ বুঝতে পারছি। (বরেনের প্রতি) চিঠি এনেছিলে না? কোথায় চিঠি, দেখি।

বরেন পকেট হাতড়ালো। পকেট খালি। পায়ের কাছে এদিক ওদিক দেখলো, না চিঠি, না মনিব্যাগ। দুটোই উধাও। বরেনের বুক কেঁপে উঠল। একি ফ্যাসাদ! একি ষড়যন্ত্র! সভোরে বললে—চিঠি ছিল আমার হাতে। যে লোকটা পিছন থেকে আমার মাথায় মেরে আমায় অজ্ঞান করে ফেলে, নিশ্চয় সে-ই নিয়েছে চিঠিখানা। আমায় বিশ্বাস করুন আপনারা। আমি মিছে কথা বলছি না।

—শাট্ আপ। চিঠি আর মাথায় বাড়ি মারা লোক, দুটোরই অস্তিত্ব কোনোকালে ছিলনা।

যতীশের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে বরেন প্রথমটা যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর উত্তেজিতভাবে বললে—কিন্তু ঘরে ঢুকে আপনি তো দেখলেন আমি মেঝেয় পড়ে আছি।

ঘাড় নেড়ে যতীশ বললে—হ্যাঁ তা ছিলে বটে। (দারোগার দিকে ফিরে) আমার বিশ্বাস ইন্সপেকটর, খুন করবার পর পালাতে গিয়ে লোকটা পা পিছলে পড়ে যায়। আর তাতেই মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বোধহয় ঐ বড় টেবিলটার কোনে ওর মাথা ঠুকে গিছল।

দারোগা মাথা হেলিয়ে বললে—তাইই। মেঝের একটা লম্বা দাগ দেখতে পাচ্ছি। বোধহয় পড়ে যাবার সময় জুতোর ঘসা লেগেছিল। যাই হোক, যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে সেই লোহার শিক তো সামনেই আছে। তার ওপর আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। এ কেসে বিশেষ কিছু নেই। সহজেই মামলা শেষ হবে।

এই বলে একবার কঠিন দৃষ্টিতে বরেনের দিকে তাকিয়ে দারোগা তার নোটবই বন্ধ করল। বরেন কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দারোগার প্রচণ্ড ধমকে তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।

নোটবই খুলে আরও দু-চারটে কথা লিখে নিয়ে দারোগা যতীশকে বললে—আমি আসামীকে নিয়ে থানায় চললাম, যতীশবাবু। লাশ যেমন আছে তেমনি থাকবে। আর একবার তদন্ত করবার পর লাশ পোস্ট মর্টমে চালান দেওয়া হবে। মৃতব্যক্তির মেয়েকে আমাদের সমবেদনা জানাবেন। তিনি নিশ্চয়ই খুব ভেঙে পড়েছেন।

মাথা নেড়ে ষতীশ বললে—খুব। তবে একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, তার বাপের মার্ডারার হাতে নাতে ধরা পড়েছে।

বরেনের মনে হল সে যেন পাগল হয়ে গেছে···বাকি রাতটা যেন দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল হাতে হাতকড়ি পরল ··তারপর পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে নিকটস্থ থানায় গিয়ে ঢুকল লকআপে।

• • • •

ভোর হল। সঙ্গে সঙ্গে বরেনের মনে হল, দুঃস্বপ্নের রাত বুঝি কাটল। এইবার সে ছাড়া পাবে।

কিছুক্ষণ পরে বন্ধ দরজার শিকল নড়ে উঠল। তালা খুলে লকআপে ঢুকল এক পুলিশ অফিসার। সঙ্গে কতকগুলো কাগজপত্র। পিছনে দোয়াত কলম হাতে একজন কেরাণী।

বরেনের হাতের হাতকড়ি খুলে পুলিশ অফিসার বললে—আমি তোমার আঙুলের ছাপ নিতে এসেছি। দেখি ডানহাতখানা।

বরেন ডানহাত বাড়িয়ে দিলে। কেরাণী এগিয়ে এসে একটা ছোট শিশি থেকে তুলি ডুবিয়ে কালি তুলে বরেনের পাঁচ আঙুল লাগিয়ে দিলে, তারপর একটা কাগজের ওপর তার পাঁচ আঙুলের ছাপ নিতে লাগল। বরেন খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল।

ছাপ নেওয়া শেষ হলে পুলিশ অফিসারটিকে একটি আতসী কাঁচ দিয়ে বরেনের আঙুলের ছাপগুলি পরীক্ষা করল তারপর অন্য একটা কাগজের উপরকার ছাপের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দেখল অনেকক্ষণ ধরে। পরীক্ষা শেষ করে কাগজপত্রগুলো সাবধানে মুড়ে কেরাণীর হাতে দিয়ে বরেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে—তুমি এখনো নিজেকে নির্দোষ বলতে চাও?

সঙ্গে সঙ্গে বরেন বললে—নিশ্চয়। আমি যা বলেছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

মাথা নেড়ে পুলিশ কর্মচারী বললে—কিন্তু তা তো মনে হচ্ছে না। আদালত তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। যে লোহার শিক দিয়ে ঈশান মজুমদারকে খুন করা হয়েছে সেই শিকের গায়ে কয়েকটা আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।

—তাতে কি?

—তাতে এই যে সেই ছাপ তোমার আঙুলের।

—কিন্তু সে অসম্ভব।

পুলিস অফিসার হেসে বললে—অসম্ভব কিনা তা জানা আমাদের কাজ নয়। কিন্তু ছাপ সত্যিই তোমার আঙুলের। আর এই একটা প্রমাণের ওপরেই তোমার বিচার হবে।

বরেন কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো চুপ করে রইল। তারপর বললে—আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পাব না?

—নিশ্চয় পাবে।

—তাহলে আমার উকিল ঠিক করতে হবে। আমায় একটা ফোন করতে দেবেন?

—দিতে পারি। তবে কাকে ফোন করবে এবং কি কথা হবে তা আমরা শুনবো।

—শুনবেন। টেলিফোন করব দশটার পরে।

—বেশ। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

দুপুরবেলা বরেন মিনতিকে ফোন করল তার অফিসে। এবং সেই টেলিফোনের ফলে সমস্ত ব্যাপারটা অচিরে আরও জটিল এবং ভয়াবহ আকার ধারণ করল।

● পাঁচ ●

বরেনের টেলিফোন পেয়ে মিনতি যেমন অবাক তেমনি আর্ত বোধ করতে লাগল। বরেনের সঙ্গে তার মনের মিতালী অনেকদিনের। অনেক স্বপ্ন অনেক আশা তার বরেনকে ঘিরে। দুঃখের দিন কাটিয়ে উঠবে বরেন, সে কাজ পাবে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে—মিনতির এই আশা, এতদিনের প্রতীক্ষা কী শেষ পর্যন্ত বরেনের চরম বিপদের মধ্যে সমাধি লাভ করবে? দু'জনের কারুরই কোন আত্মীয়স্বজন নেই। তাই দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন গুণছে, সুদিনের অপেক্ষা করছে। তাই তো এই চরম বিপদে বরেন মিনতিকেই জানিয়েছে সে কথা। কিন্তু মিনতি কি করবে? কার সঙ্গে পরামর্শ করবে?

ভাবতে ভাবতে তার রমলার কথা মনে হল। রায় সাহেব হেমচন্দ্র সরকারের মেয়ে রমলা। খুব বড়লোক তারা। তাহলেও রমলা তার সহপাঠিনী মিনতিকে কোনদিন ভোলেনি। নিজেদের বাড়ীর যে কোন অনুষ্ঠানে সে মিনতিকে নেমন্তন্ন করেছে, গাড়ি পাঠিয়ে তাকে আনিয়েছে, তার সঙ্গে গল্প করে অনেক সময় কাটিয়েছে। একবার এই রকম ছোট একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল কলকাতা আই বি পুলিশের বিখ্যাত অপরাধতত্ত্ববিদ ও গোয়েন্দা রণদেব ঘোষাল। রমলা মিনতিকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল—কাকা, আপনি মাঝে মাঝে মেয়ে অ্যাসিসটাণ্ট খোঁজেন। মিনতিকে নিন না আপনার দলে। খুব চাপা আর চালাক মেয়ে আমার এই বন্ধুটি।

রণদেব হেসে বলেছিল—আচ্ছা, দরকার হলে বলব।

হঠাৎ মিনতির মনে হল, রণদেব ঘোষালের কাছে গেলে কেমন হয়? ভদ্রলোকের কথাবার্তা আর সহজ ব্যবহার ভারী ভাল লেগেছিল মিনতির।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সে রণদেবের কাছে উপস্থিত হল। এবং প্রথম দু'চার কথার পর তাকে বরেনের বিপদের কথা জানিয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করল। বরেনের সঙ্গে তার ঘনিষ্টতার কথা, তার প্রতি বরেনের ভালবাসার কথা—সব কিছুই সে প্রকাশ করে বললে।

শুনে রণদেব বললে—আমি তো কিছুদিন হল রিটায়ার করেছি। এখন আর সরকারী ভাবে তো কাজ করি না। তবে মাঝে মাঝে এক আধটা কেস হাতে নিই বটে। তোমার সব কথাই আমি শুনলাম। তুমি যে অকপটে বরেন নামে ছেলেটির সম্বন্ধে তোমার মনের কথা বললে তাতে খুশী হয়েছি। আচ্ছা, আমি তোমার জন্যে এ কেসটা নেব। এখন আমার প্রশ্নগুলির জবাব দাও দিকি।

—বলুন।

—দাঁড়াও। তার আগে আমার নোটবইখানা বার করি। এই বলে রণদেব দেরাজ থেকে একটি মোটা বাঁধানো খাতা আর কলম বার করে বললে—এইবার বল, হাজত থেকে বরেন বাবুর টেলিফোন পেলে কখন?

—আজই দুপুরে। আমার আপিসে।

—তোমার আপিসের কর্তারা জেনেছেন?

—না, আমি কিছু বলিনি। সে সময় আমার মনিব আপিসে ছিলেন না।

মিনতির কথা শুনে মনে হয় বরেন নির্দোষ। কিন্তু মিনতি কি বরেনের সমস্ত পরিচয় জানে? তাছাড়া ঘটনাটা বড় বিচিত্র। তদন্ত করে দেখবার মত ব্যাপার সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে রণদেব বললে—আমি তোমার সাহায্য করতে রাজী আছি, মিনতি, কিন্তু একটি সর্তে।

—কি সর্ত বলুন।

—তদন্ত করে যদি আমি বুঝতে পারি যে তোমার বন্ধু যতেন হালদার নির্দোষ নয়, তাহলে সেকথা আমি পুলিশকে জানাবো। অর্থাৎ প্রকৃত অপরাধী যাতে সাজা পায় তাই হবে আমার এই তদন্তের উদ্দেশ্য। তোমার বন্ধুটি যদি নিরপরাধ হয় তাহলে সে ছাড়া পাবে, অবিশ্যি আমি যদি রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হই, তবেই।

মাথা নেড়ে মিনতি বললে—এতে আমার একটুও আপত্তি নেই। আমার স্থির বিশ্বাস, যতেনবাবু নির্দোষ, চক্রান্ত করে, তাঁকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

—বেশ। তোমার কথাই সত্যি হোক, একজন নির্দোষ মানুষকে সাহায্য করতে পারলে আমিও কম চরিতার্থ বোধ করব না।

● ছয় ●

ব্রেকের যেমন টিংকার, রিপ কার্বির যেমনি ডেনমও, রণদেবের তেমনি ছোটাই মল্লিক। রণদেবের মূক ভক্ত এই ছেলেটি অনেক বছর ধরে তার তদন্ত কাজে তাকে সহায়তা করে চলেছে। অনুচর রূপে ছোটাই-এর তুলনা নেই।

মিনতি চলে যাবার পরেই রণদেব ছোটাইকে ডেকে পাঠাল। কিছুক্ষণের মধ্যে ছোটাই এসে হাজির।

—কি খবর সার! নতুন কোন পিকনিক-এ যাবেন নাকি?

পিকনিকে যাওয়া মানেই কোন রহস্য-তদন্তে নিযুক্ত হওয়া। গুরু শিষ্যের মধ্যে এমনি অনেক রকমের সাংকেতিক বাক্য চলে।

—হ্যাঁ। তাইতো মনে হচ্ছে ছটুদেব। এবার কিন্তু প্রাণিযোগ নেই। নেহাৎ বেগার।

রণদেব মাঝে মাঝে ছোটাইকে ছটুদেব বলে ডাকে। বলে, পরে আমার পোস্টটা তোমাকেই তো নিতে হবে। তখন রণদেবের উত্তরাধিকারীর নাম হবে ছটুদেব।

ছোটাই বললে—বেগারে তো আপনার অরুচি নেই কোনদিন। তা এবার ব্যাপারটা কি?

রণদেব বললে—চল বেরিয়ে পড়ি। পথে যেতে যেতে বলব। দাঁড়াও, আগে একটা ফোন করেনি।

• • •

ছোটাইকে সঙ্গে নিয়ে রণদেব যখন দমদমার থানায় পৌঁছল, তখন শীতের রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে। থানার দরজায় সিপাই দাঁড়িয়েছিল। রণদেব ও ছোটাই মোটর থেকে নামতেই সেলাম করে বললে—দারোগা সাহেব আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

রণদেব আর ছোটাই ভেতরে ঢুকল। টেলিফোনে আগেই কথাবার্তা হয়ে গিছল, সুতরাং একেবারে কাজের কথা আরম্ভ হল। দারোগার নাম বংশীবদন। লম্বা নাকের ওপর নিকেলের চশমাটি ঠিক করে লাগিয়ে বংশীবদন বললে—কিন্তু রণদেববাবু, আসামীর জন্যে আপনি যতই চেষ্টা করুন, তার বিরুদ্ধে প্রমাণ এমনি অকাট্য যে কিছুই করবার নেই।

শান্তস্বরে রণদেব বললে—দেখা যাক। না পারি আমার দুর্ভাগ্য। প্রথমে আমি আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করব, তারপর বরেনের মুখ থেকে শুনব সে কি বলতে চায়। আগে আপনার বক্তব্য শুনি।

দারোগা হেসে বললে—সে তো শুনবেনই। তার আগে একটু চা?

—থ্যাংকস্। এখন নয়। আপনি বরং বলতে সুরু করুন।

—বেশ, তাহলে শুনুন। বলে দারোগা একখানা খাতা টেনে নিয়ে সেটা দেখে বললে—কাল রাত বারোটা দশ মিনিটে টেলিফোন পাই। টেলিফোন আসে ঈশান মজুমদারের বাড়ী থেকে। টেলিফোন করছিলেন ঈশান মজুমদারের মেয়ে মিস্ আহুতি মজুমদার। টেলিফোনে তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন যে তাঁর বাবা খুন হয়েছেন এবং বৈঠকখানাঘরে তাঁর বাবার সেক্রেটারী যতীশবাবু, তার বাবার হত্যাকারীকে ধরে রেখেছে, আমরা যেন শিগগির যাই। দশ মিনিটের মধ্যে আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, বৈঠকখানার মেঝেয় মিঃ মজুমদার মরে পড়ে আছেন এবং যতীশ বরেনের পথ আটকে তাকে ধরে রেখেছে। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাদের ডাক্তারকে নিয়ে এলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললে, বেশীক্ষণ মৃত্যু ঘটে নি, শরীরে তখনো উত্তাপ ছিল। যে-অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়, সে অস্ত্রও ঘরের মেঝেয় পাওয়া গেছে। যতীশবাবু সব-প্রথম এই ব্যাপার আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে, রাত বারোটা পাঁচ মিনিটের সময় তিনি বৈঠকখানা ঘরে আসেন। তাঁর মনিব যে তখন ঐ ঘরে ছিলেন, তা তিনি জানতেন। প্রকৃতপক্ষে মনিব এবং সেক্রেটারী সে রাত্রে কয়েকটা জরুরী চিঠি এবং কনট্রাক্ট তৈরী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং সে-কারণে অত রাত পর্য্যন্ত দু'জনে নীচে কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। যতীশবাবু নিজের আপিস কামরায় বসে কয়েকখানা চিঠি টাইপ করে সেগুলি মনিবকে দিয়ে সই করাবার জন্যে বৈঠকখানায় আসেন। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখেন, তাঁর মনিব রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে এবং বরেন কাছে দাঁড়িয়ে। তিনি তক্ষুনি চীৎকার ক'রে ওঠেন এবং বরেনকে জাপটে ধরেন। কিছু পরেই মিস মজুমদার আমাদের ফোন ক'রে দেন।

রণদেব জিজ্ঞাসা করল—আসামী পালাবার চেষ্টা করেনি?

ঘাড় নেড়ে দারোগা জবাব দিল—না। মোটেই তা করেনি। খুন করবার পর লোকটা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিছল এবং বোধহয় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল।

রণদেব বললে—কোন অজ্ঞাত লোকের হাতে মাথায় আঘাত পাওয়ার জন্যেই সে হয়ত ঐভাবে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল।

দারোগা বললে—মাথায় তার আঘাত লেগেছিল সত্যিই, কিন্তু তা কোন লোকের জন্যে নয়। সে-কথা পরে বলছি। আমি বরেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। উত্তরে সে বললে যে, একজনের কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে সেই চিঠি মিঃ মজুমদারের হাতে দেবার জন্যে সে এসেছিল। চিঠি যার কাছ থেকে পেয়েছিল, তাকে সে ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি—চেনা-শোনা তো দূরের কথা। নামও জানেনা, ঠিকানাও জানেনা। সেই চিঠি নিয়ে সে ঠিক রাত বারোটার সময়ে জানলা দিয়ে ঈশানবাবুর ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকে দেখে যে, ঈশানবাবু ঘরের মেঝেয় প'ড়ে আছেন। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সে নাকি কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে এবং সেই সময়ে কোন এক অজ্ঞাত লোক পিছন থেকে তার মাথায় আঘাত ক'রে তাকে অচেতন ক'রে ফেলে। সে লোকটাকে সে দেখতে পায়নি। এই হ'ল বরেনের বক্তব্য। তার কথা শোনবার পর আমি তার পকেট খানাতল্লাস করলাম, কিন্তু কোন চিঠি পেলাম না। তার মাথার একটা জায়গা ফুলে উঠেছিল বটে, কিন্তু যতীশবাবুর মতে খুন করবার পর পালাতে গিয়ে বরেন পা পিছলে প'ড়ে

যায় এবং টেবিলের কোনে মাথা লেগে অজ্ঞান হয়। শুধু এ-সবই নয় রণদেববাবু, যে লোহার আঙন খোঁচানো শিক দিয়ে ঈশানবাবুকে মারা হয়েছে, সেই শিকের গায়ে বরেনের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, অন্য কোন ছাপ তাতে নেই!

অস্ফুটে রণদেব মন্তব্য করল—তাই নাকি? কিন্তু বরেন খুন করল কি উদ্দেশ্যে?

—তা ঠিক এখনো জানা যায়নি। হ'তে পারে, হয়ত টাকার জন্যে কিম্বা আর কোন কারণ যা এখনো প্রকাশ পায়নি।

রণদেব বললে—যাই হোক, কেসটা তদন্ত ক'রে দেখবো। আমার মনে হচ্ছে, লোহার শিকের ওপর বরেনের আঙুলের ছাপ বরেনের পক্ষে বিশেষ সুবিধের কারণ হবে।

দারোগা সবিস্ময়ে বললে—কেমন ক'রে! সেইটাই তো তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ।

মৃদু হেসে রণদেব বললে—সেটা বিচার এবং তদন্ত সাপেক্ষ। কাল রাত্রে শীত ভাঙানো চুল্লিতে আগুন জ্বলছিল কিনা তা জানলে···

দারোগা বললে—জ্বলছিল। কিন্তু তার সঙ্গে এ-ব্যাপারের সম্পর্ক কি?

—আছে বৈকি। পরে বুঝিয়ে দেব। রণদেব বললে—এখন একবার বরেনের সঙ্গে দেখা করব। তারপর পাতিপুকুরে গিয়ে ঘটনার জায়গাটা দেখে আসব।

• • •

থানার হাজতে বরেন বন্ধ ছিল। কেউ তার পক্ষে জামিন হয়নি।

রণদেব যখন নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল যে সে মিনতির অনুরোধে বরেনের পক্ষে তদন্ত করতে স্বীকৃত হয়েছে তখন তার ম্লান কাতর মুখে আশার ও আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল। রণদেবের অনুরোধ অনুসারে সে ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করল।

তার কথা শেষ হলে রণদেব বললে—ঘরের মধ্যে যে-লোকটা পিছন থেকে আপনার মাথায় মেরেছিল তাকে একেবারেই দেখতে পাননি?

উত্তরে বরেন বললে—একেবারেই না। হঠাৎ দেখলাম একটা ছায়া। তার পরেই মাথায় ভীষণ লাগল, মাথা ঘুরে গেল। আর কিছু মনে নেই। লোকটা হয়ত ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল।

—যখন আপনি ঘরে ঢুকলেন তখন চিঠিখানা আপনার পকেটে ছিল, না, হাতে?

—চিঠিখানা হাতে করেই ঢুকেছিলাম।

—লোহার শিকটায় আপনি হাত দিয়েছিলেন কখন্?

বরেন বললে—মৃত লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, শিকটা তার গায়ের ওপর রয়েছে, আমি বোধ হয় নীচু হয়ে সেটা সরিয়ে মাটিতে রেখেছিলাম। ঠিক মনে নেই।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রণদেব বললে—আমি আশা করব, আপনি যা বললেন তা সত্যি। তা যদি হয়, আমি সাধ্যমত আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। আজ চললাম। আবার দেখা হবে।

● সাত ●

আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সুরু হয়েছে। সেই বৃষ্টি আর ঘোঁয়াটে অন্ধকার ভেদ করে রণদেবের মোটর পাতিপুকুরে সম্প্রতিহত জমিদার ঈশান মজুমদারের বিরাট অট্টালিকার ফেউন্ডিতে এসে থামল।

মোটরের শব্দ শুনে বাড়ীর পুরনো খানসামা গোষেশ বাইরে এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নামল বংশী দারোগা, তার পিছনে রণদেব আর ছোটাই।

গোষেশ সেলাম জানাতেই বংশী দারোগা বললে—যতীশ বাবুকে খবর দাও আমরা এসেছি।

—তিনি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন। আসুন। এই বলে গোষেশ তাদের পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল।

অদূরে মিষ্ট মৃদু নারীকণ্ঠ শোনা গেল—কে এলো গোষেশ?

মুখ তুলে রণদেব দেখল, একটি সুশ্রী তন্বী তরুণী সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামছে। তার মুখে ক্লান্ত বিষাদের ছায়া, চলার ভঙ্গীতে অবসন্ন শিথিলতা।

বংশী দারোগা টুপী খুলে বললে—আসুন মিস মজুমদার।

আহুতি ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল। দারোগা তার কাছে রণদেবের পরিচয় দিলে।

আহুতি বললে—রণদেব ঘোষাল? নাম শুনেছি বহুবার। বিখ্যাত লোক। নমস্কার। কিন্তু আর কি তদন্তের প্রয়োজন আছে? পুলিশ তো মার্ডারারকে ধরেছে।

দারোগা বললে—রণদেববাবু মনে করেন এর মধ্যে হয়ত আরও কিছু রহস্য আছে, আরও লোক হয়ত এই খুনের সঙ্গে জড়িত আছে। তাদেরও সন্ধান করা দরকার। তাই আবার এসে আপনাদের বিরক্ত করতে হল।

—না, না, বিরক্ত কিসের। আপনাদের কাজ করবেন বৈকি।

আহুতির কথায় রণদেব বললে—আপনাকে এখনি বিশেষ বিরক্ত করবার দরকার হবে না মিস মজুমদার। আমরা শুধু একবার যতীশবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

—আচ্ছা, তাহলে আমি চললাম। নমস্কার। বলে আহুতি ধীরে ধীরে বাড়ীর অন্দরের দিকে চলে গেল।

রণদেব বললে—দারোগা সাহেব, চলুন, আগে বৈঠকখানাটা একবার দেখে আসা যাক।

—চলুন। এইদিকে। চাবী দিয়ে রেখেছি। চাবী আমার কাছেই আছে।

তিনজনে বৈঠকখানায় ঢুকল। যেখানকার জিনিষ যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর খানিকটা কালো দাগ, রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। এক পাশে দেওয়াল সংলগ্ন ফায়ার প্লেস। তার সামনে কালো চামড়া মোড়া আরাম কেদারা। দেওয়ালের ধারে ধারে আরও চেয়ার। দেওয়ালে লাগানো সেলফগুলোতে নানা ধরণের বই। একধারে ছোট একটি লেখবার টেবিল। টেবিলের ওপর ব্লটিং প্যাড, দোয়াতদানি, কলম, পেনসিল প্রভৃতি। সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রণদেব এক মনে চারিদিক দেখতে লাগল। টেবিলের উপর একখানি মোটা ইংরাজী বই। তার পাতা খোলা। সে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে কি যেন দেখল। তারপর বললে—হুঁ। তাই তো।

—কি দেখছেন? দারোগা প্রশ্ন করল।

ধীরে ধীরে রণদেব বলতে লাগল—নিহত ভদ্রলোক এইখানে বসে যখন বইটা পড়ছিলেন তখন তাঁকে প্রথম আঘাত করা হয়। সে আঘাত তাঁকে বিহ্বল করেছিল কিন্তু একেবারে শেষ করতে পারেনি। তিনি সম্ভবত শত্রুকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। টেবিলের ধার থেকে তিনি ছিটকে ওই দিকে গিয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় তাঁর বুকে শেষ আঘাত করা হয়।

—কেমন করে বুঝলেন?

—এই চেয়ারখানা আর ওই বইটা দেখে। বইএর পাতায় রক্তের ছিটে শুকিয়ে রয়েছে। দেখুন।

বংশী এবং ছোটাই দু'জনে বইটার দিকে ঝুঁকে দেখল, সত্যিই, তার পৃষ্ঠায় রক্তের দাগ।

বংশী দারোগা বললে—কিন্তু তাতে কি! এর দ্বারা বরেনের পক্ষে কি কিছু প্রমাণ হচ্ছে?

রণলাল বললে—তা এখনই ঠিক বলা যাচ্ছে না, কিন্তু বরেন কেমন করে ঈশানবাবুকে খুন করলে বলে আপনার মনে হয়?

দারোগা বললে—এ বলা আর শক্ত কি। ঈশানবাবু বই পড়ছিলেন, সেই সময় বরেন পিছনকার জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে লোহার শিক দিয়ে···

রণদেব তাকে বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু চেয়ার আর টেবিলের পোজিসন দেখে বোঝা যাচ্ছে, আগুনের চুল্লি ছিল ঈশান বাবুর সামনের দিকে, সুতরাং বরেন সেই চুল্লির কাছ থেকে আগুন-খোঁচানো শিকটা নিতে গেলেই তো ঈশানবাবু তাকে দেখতে পেতেন। একথা ভাবাই যায় না যে একজন অপরিচিত লোক ঘরে ঢুকে তাঁর সামনে দিয়ে গিয়ে লোহার শিক তুলে নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করল, আর ঈশানবাবু সারাক্ষণ চুপ করে টেবিলের ধারে বসে রইলেন।

ছোটাই বললে—কিন্তু ঈশানবাবু যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকেন?

রণদেব বললে—তা অসম্ভব নয়! তাহলেও লোহার শিকের ওপর আঙুলের ছাপ - তাও বরেনের স্বপক্ষে।

—কেমন করে?

দারোগার প্রশ্নের জবাবে রণদেব বললে—আপনাকে জিগেস করেছিলাম, মনে আছে বোধ হয়, কাল রাত্রে চুল্লিতে আগুন জ্বালানো হয়েছিল কিনা। আপনি বলেছিলেন, আগুন জ্বালানো হয়েছিল। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে লোহার শিকটাকে ব্যবহার করা হয়েছিল, আর যদি হয়ে থাকে তাহলে অন্য লোকের আঙুলের ছাপ তার গায়ে পাওয়া যাবার কথা। কিন্তু আর কোন ছাপ নেই। এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে এই যে ঈশানবাবু খুন হবার পর শিকের গা থেকে অন্য সমস্ত আঙুলের ছাপ মুছে ফেলা হয়েছিল।

দারোগা কি যেন বলতে গেল, তাকে থামিয়ে রণদেব বললে—এর মধ্যে আর অন্য কথা নেই দারোগা সাহেব। ব্যাপার অত্যন্ত জটিল!

● আট ●

কিছুক্ষণ বংশী দারোগার মুখে কথা সরল না। ছোটাই উসখুস করছিল কিছু বলবার জন্যে। রণদেব বুঝতে পেরে বললে—তুমি কিছু বলবে নাকি, ছট্টুদেব ?

ছোটাই বললে—আমার তো মনে হয়, এক্ষেত্রে দারোগা সাহেব আর আপনি—দুজনের একযোগে কাজ করা দরকার।

দারোগা সঙ্গে সঙ্গে বললে—আমিও তাই ভাবছিলাম।

রণদেব হেসে বললে—ওটা আমারও মনের কথা। আমাদের খুব সাবধানে এগুতে হবে দারোগা সাহেব। এ কেস যদি আপনি ঠিকমত চালাতে পারেন তাহলে আপনার দারুণ সুনাম হবে। অতএব আমরা দু'জনে একযোগে কাজ করব।

বিগলিতকণ্ঠে বংশী দারোগা বললে—তাহলে তো খুবই ভাল হয়।

ছোটাই ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল। অর্থাৎ এই তো চাই।

রণদেব বললে—আমাদের এখন এমনভাবে এগুতে হবে যাতে কেউ মনে করতে না পারে যে আমরা যতেনকে নির্দোষ মনে করছি আর অন্য অপরাধির সন্ধান করছি। একাজটা আমাদের খুব গোপনে গোপনে করতে হবে। ছোটাই, তোমার টর্চটা দাও। দেখি একবার ঘরের আশপাশ, কিছু পাওয়া যায় কিনা।

টর্চের আলো ফেলে এদিক ওদিক দেখে রণদেব জানলার দিকে এগিয়ে গেল। জানলাটা খোলা ছিল। তার ছিটকিনিটা পরীক্ষা করে রণদেব বলে উঠল—কাল ছিল দারুণ শীতের রাত তার ওপর বাদলা, তাই জানলা নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল। জোর করে জানলাটা খোলা হয়েছে। একি···

—কি দেখতে পেলেন ? দারোগা আর ছোটাই একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

—বন্ধ জানলাটায় দামিতে হাতের ছাপ। বাইরে থেকে কেউ ভিতর দিকে উঁকি মেরে দেখছিল। সেই সময় দাগির গায়ে সে হাত রেখেছিল। ভিজে কাঁচের ওপর তারই স্পষ্ট ছাপ।

দারোগা মন্তব্য করলে—বোধ হয় যতেনের হাতের ছাপ।

—তা প্রমাণ সাপেক্ষ। থানায় ক্যামেরা আছে ?

দারোগা বললে—আছে। ফ্ল্যাশবাল্বও আছে। আনতে পারি।

রণদেব বললে—আসুন। ছোটাইকে সঙ্গে নিয়ে যান। রমজানের মোড়ে একটা বড় ধরণের ফটোর দোকান আছে। সেখানে গিয়ে ছোটাই বলে আসবে, আজ রাত্রেই এক রোল ফিল্ম ডেভেলাপ করতে হবে। চার্জ যত লাগে দেওয়া হবে। ছোটাই, তোমরা যাও। আমি ততক্ষণ যতীশ বাবুর সঙ্গে কথা কইব। দারোগা সাহেব, একটা কথা। কেউ যেন না জানতে পারে যে আমরা কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছি।

দারোগা সায় দিয়ে ছোটাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। রণদেব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গোমেশকে দিয়ে যতীশকে ডেকে পাঠাল।

একটু পরেই যতীশ এলো। বললে—আমাকে ডেকেছেন, মিঃ ঘোষাল ?

রণদেব বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিরক্ত করলাম বলে মার্জনা করবেন। আপনিই প্রথম খুনের ব্যাপারটা জানতে পারেন, তাই আপনাকে দু'একটা কথা জিগেস করতে ইচ্ছে করি।

যতীশ বললে—তাতে খুশীই হব। যদি কোন সাহায্য করতে পারি সে তো আমার পক্ষে আনন্দের কারণ হবে। একটা দাঙ্গার কথা এই যে অপরাধী হাতে নাতে ধরা পড়েছে।

রণদেব একটু থেমে বললে—হ্যাঁ, তা হয়ত পড়েছে। কিন্তু অপরাধটা নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করা চাই। তবেই তো…

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা তো বটেই। তবে এক্ষেত্রে প্রমাণের অভাব নেই।

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে রণদেব বললে—যাই হোক, উপস্থিত কিছু অন্য আলোচনা করা যাক। গতকাল রাত ক'টা নাগাদ আপনাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছিল?

উত্তরে যতীশ বললে—রাত দশটা নাগাদ। ঐ সময়েই প্রত্যহ আমাদের আহারাদি চোকে।

—কাল রাতে সে সময় কে কে ছিলেন?

যতীশ বললে—কর্তা ছাড়া মিস্ মজুমদার, আমি আর কর্তার এক ভায়ে।

—ভায়ে? তাঁর নামটি কি?

—নিশীথ রায়।

রণদেব প্রশ্ন করল—তিনি কি এই বাড়িতেই থাকেন?

—না। তিনি ভবানীপুর অঞ্চলে একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। কাল সন্ধ্যায় নিজের মোটরে এসেছিলেন। রাত্রেই চলে গিছলেন।

—কখন চলে গিছলেন?

—খাওয়া দাওয়ার একটু পরেই। ঠিক টাইম বলতে পারবো না, আমি তখন নিজের ঘরে ছিলাম।

রণদেব প্রশ্ন করল—আচ্ছা, আপনি নিশ্চয় জানবেন, মিঃ মজুমদারের এমন কোন বন্ধু কি ছিলেন যিনি অনেক রাত্রে তাঁর কাছে আসতেন?

ঘাড় নেড়ে যতীশ জবাব দিলে—না! এ ফ্ল্যাটে তাঁর কোন বন্ধু ছিল না। প্রকৃত পক্ষে তাঁর কোন বন্ধু বলতে কেউ ছিল না। লোকের সঙ্গে তিনি খুব কমই মিশতেন।

—এইবার বলুন, কাল রাত্রে আপনার মনিব সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ ছিলেন তো, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কোন রকম বৈলক্ষণ আপনি কি দেখেছিলেন?

—একদম না। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আর প্রকৃতিস্থ ছিলেন।

—কোন বিষয়ে কিছু উৎকণ্ঠিত?

—না। অন্তত আমার নজরে পড়েনি।

—আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর কি হল?

যতীশ বললে—খানা টেবিল থেকে প্রথমে উঠলেন মিস্ মজুমদার। তিনি দোতলায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। ঈশানবাবু আর নিশীথবাবু রাজনীতি নিয়ে তখন জোর আলোচনা করছিলেন।

—খাওয়া দাওয়া বুঝি বরাবরই ইংরেজি কেতা অনুসারে হয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরো বিলাতি কায়দায়। বরাবর। মিঃ মজুমদার যখন থেকে গোনেশ খানসামাকে নিয়ে এসেছিলেন। ওর মত মসকুক এদেশে বেশি নেই।

বলতে বলতে যতীশ আর রণদেব বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরের ওধারের চুল্লীটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে যতীশ বললে—ওটা দেখে আর ঘরের আসবাব পত্র দেখে বোধ করি কতকটা আন্দাজ করতে পারছেন যে আমার মনিব ইংরাজী কেতা কতটা পছন্দ করতেন।

এই বাড়ির প্ল্যান, এর সমস্ত ফিটিংস ব্রেথওয়েটের বড় সাহেব করে দিয়েছিলেন। বাড়ি তৈরীর সময় আমার মনিব ওই ফায়ার-প্লেসটি সখ করে অনেক টাকায় তৈরী করিয়েছিলেন।

রণদেব বললে—তা দেখছি বটে। সাধারণত কোন বাঙালীর বাড়িতে এ ধরনের ফায়ার প্লেস বা এত দামী আর সৌখিন আসবাবপত্র আর সাজসজ্জা দেখা যায় না। হাঁ, তার পর যা বলছিলাম। আপনি খাওয়া দাওয়ার পর সোজা আপনার ঘরে চলে গেলেন?

—না। কয়েকটা ফাইল নেবার জন্যে এঘরে একবার এসেছিলাম।

—তখন সময় কত?

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করে যতীশ জবাব দিলে—ঠিক বলতে পারবো না। সাড়ে দশটা হবে।

—মনে আছে কি, যখন ঘরে ঢুকেছিলেন, তখন জানলা দুটো বন্ধ ছিল, না, খোলা ছিল?

—বন্ধ ছিল।

—ঠিক মনে আছে?

—তা আছে। বৃষ্টি পড়ছে দেখে আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, জানলা দুটো ঠিকমত বন্ধ আছে কিনা।

—ফাইল নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তারপর কখন্ আবার এলেন?

—বারোটা বাজবার পরেই। কাজ শেষ করে কাগজপত্র গুলো এঘরে রাখবো বলে ঘরে ঢুকে দেখি, মিঃ মজুমদার মাটিতে পড়ে আর বরেন নামে লোকটা তাঁর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে।

একটু ভেবে নিয়ে রণদেব আবার প্রশ্ন আরম্ভ করল—নিজের ঘরে বসে যখন কাজ করছিলেন তখন কোন চিৎকার বা শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?

—না।

—আপনার ঘর কোন্ জায়গায়?

—দোতলার সিঁড়ির পাশেই।

—মামা আর ভাগনে, অর্থাৎ ঈশানবাবু আর নিশীথবাবু, এঁদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কে কেমন ছিল? মানে, ঝগড়াঝাঁটি ছিল না তো?

—আমি যতদূর জানি, সম্পর্ক ভালই ছিল। তবে আমার মনিব খুব চাপা লোক ছিলেন, পরম শত্রুর প্রতিও তাঁর মনের ভাব কেমন, তা জানবার উপায় ছিল না।

রণদেব বললে—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যতীনবাবু। আর একটা কথা। ঈশানবাবুর উইল আপনি জানেন?

ক্ষণকাল নীরব থেকে যতীশ বললে—আমি যতদূর জানি, চাকর বাকর আর কর্মচারীদের কিছু দাতব্য ছাড়া সমস্ত বিষয় আশয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর মেয়ে পাবে। তাঁর এটর্নীরাও সবই জানেন।

—কোন্ এটর্নী?

—করনুজা রায়কত কোম্পানী।

—আচ্ছা। এবার আপনি যেতে পারেন। দয়া করে গোমেশকে ডেকে দিয়ে যাবেন।

যতীশ চলে গেল। একটু পরেই বংশী দারোগা ফিরে এলো। তার পিছনে গোমেশ এসে ঘরে ঢুকলো।

—আমায় ডেকেছেন সার ?

—হ্যাঁ গোমেশ, তোমায়···

রণদেবের কথা শেষ হল না। অকস্মাৎ জানলার বাইরে বন্দুকের শব্দ হল...

বন্ বন্ বন্···

একটা জানলার সার্সির কাচ সশব্দে ভেঙে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের গুলি ঘরের দেওয়ালে এসে লাগল···

দারোগা চিৎকার করে উঠল—সর্বনাশ ! গুলি চলছে···

রণদেব বললে – সে গুলি আমারই মাথা লক্ষ্য করে।

এই বলে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

● সন্ধ্যা ●

মিনিট দুই তিন দারোগা আর গোমেশ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রণদেব ঘরের বাইরে থেকে বললে—গুলি যখন ছোঁড়া হয় তখন বাড়ির সকলে কে কোথায় ছিল, আমি জানতে চাই। চলে আসুন দারোগা সাহেব। গোমেশ, তুমিও এসো।

দারোগা আর গোমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

—রণদেব বাবুর গলা শুনলাম না ! বলতে বলতে ভিতরকার একটা ঘরের দরজা খুলে যতীশ বাইরে এলো। রণদেবকে সামনে দেখে বললে—কিসের শব্দ হল ? মনে হল যেন পিস্তলের আওয়াজ।

রণদেব বললে—হ্যাঁ, বাগান থেকে পিস্তল ছোঁড়া হয়েছে। শব্দ যখন হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন ?

—ওই ঘরে ছিলাম। ভিতরে মিস্ মজুমদার রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ঘরের দরজায় আহুতিকে দেখা গেল।

—কি হয়েছে ?

আহুতির ভীত কণ্ঠস্বর শুনে রণদেব বললে—বিশেষ কিছু নয়। বাগান থেকে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।

—বলেন কি ? আহুতি ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

রণদেব সেকথায় কান না দিয়ে বললে—বাড়িতে আর কে কে আছে ?

জবাব দিল যতীশ, বললে—দু'জন চাকর, রাঁধুনি, আর মিস মজুমদারের ঝি। ড্রাইভার বাড়িতে থাকে না। একটা মালী আছে। সে ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

রণদেব বললে—চাকর দুজন, রাঁধুনি আর ঝিকে ডেকে পাঠান।

বিস্মিত কণ্ঠে আহুতি বললে—আমাদের বাড়ীর লোকদের কাউকে সন্দেহ করেন নাকি ?

রণদেব বললে—আমি কাউকেই সন্দেহ করি না। আবার সবাইকেই করি।

যতীশ বললে—কিন্তু আপনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়বার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

রণদেব জবাব দিলে—উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আমি যাতে এ রহস্য সম্বন্ধে তদন্ত করতে না পারি তারই চেষ্টা। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, ঈশানবাবুর হত্যাকারী বা হত্যাকারীরা এই বাড়ীর আশেপাশেই আছে।

দু'চোখ বড় করে আহুতি বললে—কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বাবার মার্ডারার কি ধরা পড়েনি? বেলোকটাকে ধরা হয়েছে···

সঙ্গে সঙ্গে রণদেব বললে—সে হয়ত একা নয়। এ কাজে তার হয়ত দোসর আছে। আর সেই লোকটা এখনো বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকটা হয়ত একটা ভয়ংকর দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

—ভয়ঙ্কর দল আছে এর মধ্যে? আহুতির কণ্ঠস্বর কম্পিত।

—হ্যাঁ, তা থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। মানুষের রক্ত নিয়ে যাদের খেলা, নরমেধ যজ্ঞে যাদের আনন্দ, এমনি কোন দল।

রণদেবের কথা শুনে আহুতির কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুট ভয়ার্ত স্বর নির্গত হল।

··· ··· ··· ···

কি চাকর এবং বাঁধুনিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, কাজকর্ম শেষ করে তারা সকলেই নিজের নিজের ঘরে বা কাজে ছিল। বাগানে তারা কেউ যায়নি।

একটু পরে আহুতি নিজের মহলে চলে গেল।

দারোগা আর যতীশকে নিয়ে রণদেব বৈঠকখানায় এসে বসল।

বাইরে মোটরের শব্দ। ছোটাই ফিরে এলো। সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফার।

রণদেবের নির্দেশমত ফটোগ্রাফার ঘরের দেওয়ালের, জানলার গ্রিলের এবং আরও কয়েক জায়গায় কয়েকটি ফটো তুলল।

রণদেব বললে—ছোটাই, তুমি এঁর সঙ্গে যাও। দারোগা সাহেব, আপনিও যান। এখনি ফিঙ্গার ডেভেলাপ করে খানকয়েক করে প্রিন্ট চাই।

দারোগা, ছোটাই আর ফটোগ্রাফার চলে গেল।

যতীশ বললে—ব্যাপারটা কি আপনার খুব ঘোরালো বলে মনে হচ্ছে?

রণদেব বললে—একটা মার্ডারের পিছনে অনেক সময়েই দেখা গেছে, একজনের বেশি লোক কাজ করেছে। যাকে ধরা হয়েছে সে ছাড়া হয়ত আরও লোক আছে এর পিছনে। তদন্ত এমন ভাবে হওয়া উচিৎ যাতে সব দলটা ধরা পড়ে।

যতীশ সায় দিয়ে বললে—তা একশো বার। আমারও তাই মনে হয় রণদেববাবু। বরেন নামে লোকটা হয়ত খুন করেছে, কিন্তু তার পিছনে নিশ্চয়ই আরও লোক আছে।

রণদেব বললে—তাইতো এইভাবে কিছু সন্ধান পাবার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, এবার তাহলে যতীশবাবু, মিস্ মজুমদারের সঙ্গে কিছু আলোচনা করব। দয়া করে যদি তাঁকে ডেকে দেন তো বাধিত হব।

যতীশ বললে—নিশ্চয়। আমি এখনি গিয়ে তাঁকে ডেকে দিচ্ছি। আমাকে কি আর প্রয়োজন হবে?

—না। আপনাকে আর দরকার নেই। অনেক ধন্যবাদ।

যতীশ চলে গেল।

একটু পরে আহুতি এসে ঘরে ঢুকল।

রণদেব দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আসুন, মিস্ মজুমদার। বসুন। আপনাকে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করব। কষ্ট দিলাম বলে মার্জনা করবেন। বুঝতেই পারছেন, আমাদের কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন।

দু'চোখ তুলে আহুতি বললে—কি জানতে চান, বলুন।

একটু ভেবে নিয়ে রণদেব বললে—আপনার বাবার আগেকার জীবন সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। এসব রহস্যময় ব্যাপারে মৃত মানুষটির পূর্ব জীবনের যতখানি জানা যায়, তা আমাদের জানা দরকার। অনেক সময় সেই সব খবর থেকে অনেক সূত্র পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে আহুতি বললে—কিন্তু এ বিষয়ে আমি আপনাকে কিছু মাত্র সাহায্য করতে পারবো বলে তো মনে হয় না।

—কেন ?

—তার কারণ, আমি তাঁর আগের জীবনের কোন কথাই জানি না। আমার বাবা অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

কথা বলতে বলতে আহুতির চোখে জল দেখা দিল।

নম্রকণ্ঠে রণদেব বললে—আপনার পিসতুতো ভাই নিশীথবাবুর সম্বন্ধে দু'একটা কথা জানতে চাই।

আহুতি বললে—কী কথা ?

—তাঁর সঙ্গে আপনার বাবার মনের মিল ছিল তো ?

মাথা নেড়ে আহুতি বললে—হ্যাঁ, তা ছিল। যদিও অনেক বিষয়ে মতের মিল হত না, তাহলেও বাবা নিশীথদাকে ভালই বাসতেন।

—নিশীথবাবু ছাড়া আর কে আত্মীয় আছেন আপনাদের ?

একটু নীরব থেকে আহুতি উত্তর দিলে—আর বিশেষ কেউ নেই। নিশীথবাবুর এক ভাই মানে আমার আর এক পিসতুতো ভাই আছে। কিন্তু···

আহুতি থামল, রণদেব বললে, কিন্তু কি ? থামলেন কেন ?

অনিচ্ছাভরে আহুতি বললে—তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তার নাম আমরা কেউ করি না। সে আমাদের বংশের, মানে, বাবা বলতেন সে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কলঙ্কের মত। আমায় মাপ করবেন···আমি···

রণদেব বললে—বুঝতে পারছি, আপনাদের ফ্যামিলি সংক্রান্ত এই সব কথা আমায় না শোনাই ভাল। মাপ করবেন। নিতান্ত বাধ্য হয়েই এসব কথা আমাদের জিজ্ঞেস করতে হয়। আচ্ছা, তাঁর নামটা···

—অসিত রায়।

রণদেব বললে—ব্যাপার খুবই গুরুতর, তাই আমাদের জানতে হবে, যে ধরা পড়েছে, সে ছাড়া আর কে কে এই ব্যাপারে জড়িত আছে।

আহুতি বললে—না না, বাবার খুন সম্বন্ধে অসিতদাকে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। অনেকদিন সে আমাদের বাড়ি আসেনি। শেষবার যখন আসে তখন বাবার সঙ্গে তার খুব ঝগড়া হয় অবশ্য। তাহলেও···

—ঝগড়া হয়েছিল কেন ?

—টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে। বাবা অনেকবার অসিতদাকে টাকা দিয়েছেন। কিন্তু শেষবার কিছুতেই দিলেন না। অসিতদা টাকা না পেয়ে বাবাকে যা-তা বলতে লাগল। শেষে বাবাও রেগে গিয়ে

তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। অসিতদা নাকি অত্যন্ত খারাপ পথে চলছিল, তাই বাবা তাকে বলেছিলেন, তুমি আমাদের বংশের কলঙ্ক, তোমার মুখ দেখতে চাই না।

—অসিতবাবু থাকেন কোথায় ?

মাথা নেড়ে আহুতি বললে—তা আমি জানি না। তবে বাবার এটর্নীরা জানেন। তার কারণ বাবা অনেকদিন আগে থেকেই যে উইল করে রেখেছিলেন, সেই উইল অনুসারে মাসে মাসে কিছু টাকা অসিতদাকে দেওয়া হয়; সে টাকা এটর্নীরা দেয়, তাই তাঁরা নিশ্চয়ই অসিতদার ঠিকানা জানেন।

রণদেব আহুতিকে ধন্যবাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল।

কথায় কথায় জেনে নিল, আহুতি শৈশবেই মাতৃহীন। তার বাবা যখন বর্মা, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসা করে বেড়াচ্ছিলেন তখন ছ'মাসের মেয়েকে রেখে আহুতির মা বিদেশে মারা যান। পত্নীর শোকে অভিভূত হয়ে মাতৃহীনা শিশুকন্যাকে নিয়ে বিদেশে থাকা অসঙ্গত মনে করলেন ঈশানবাবু। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দেশে ফেরেন আর তখন থেকে আহুতি এক নার্সের কাছে মানুষ হতে থাকে। নার্সের নাম কিরোজাবালা। অনেকদিন কাজ করেছিল বলে তাকে এখন কিছু কিছু মাসোহারা দেওয়া হয়। সে কাছাকাছি থাকে। মাঝে মাঝে এসে আহুতির খোঁজ খবর নিয়ে যায়।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রণদেব আর এক দফা আহুতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

• • • •

ঈশানবাবুর ঘরের দামিতে যার হাতের ছাপের ফটো তোলা হয়েছিল তাকে সনাক্ত করা গেল।

পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরে অনেক অপরাধী এবং অন্যান্য লোকের হাতের ছাপের রেকর্ড আছে। দেখা গেল, নরেশ মাইতি নামে এক পুলিশ ইনফরমারের হাতের ছাপের সঙ্গে তার হুবহু মিল।

রণদেবের বিশেষ বন্ধু ডিটেকটিভ-ইনসপেকটার কবীরের সহায়তায় রেকর্ড আপিস থেকে সেই তথ্য জানা গেল।

ইনসপেকটর কবীরের আপিস ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। কবীর বললে—রণদেববাবু, আপনার মুখে সমস্ত ঘটনা তো শুনলাম। হাতের ছাপও দেখলাম। আমার ধারণা, নরেশ মাইতি খুনের রাত্রে ঈশান মজুমদারের বাড়ী গিছল।

রণদেব বললে—কিন্তু সে কি মানুষ খুন করার মতো সাংঘাতিক লোক ?

উত্তরে কবীর বললে—অবস্থা অনুসারে যে কোন মানুষই খুন করতে পারে। তবে নরেশকে যতদূর জানি, জোচ্চুরী আর ব্ল্যাকমেল—এর ওপরে সে কখনো ওঠেনি।

রণদেব বললে—ধন্যবাদ! উপস্থিত এর বেশি জানবার আমার দরকার নেই। আবার দেখা হবে। চলে এসো ছোটাই।

বাইরে বেরিয়ে ছোটাই বললে—ভারী ভাড়া দেখছি। কোথায় যাবেন এখন ?

—নরেশ মাইতির বাড়ী।

কলুলিয়াটোলার ফুলবাগান। যেমন নোংরা তেমনি শ্রীহীন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর নরেশ মাইতির বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ কড়া নাড়বার পর একজন স্ত্রীলোক দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে খনখনে গলায় বললে—কে গা তোমরা। কী চাও ?

রণদেব বললে—নরেশ মাইতি আছে ? তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রমণী উত্তর দিলে—কোথায় সে হাড়হাভাতে ! পরশু থেকে বাড়ি আসেনি।

—তাই নাকি ! কোথায় গেছে জান ?

—না বাপু। তা জানি না। গেছে বোধ হয় যমের বাড়ী !

এই বলে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ছোটাই বললে, এখন কি করা ?

—যেমন করে হোক নরেশকে খুঁজে বার করা। সে খুনের দৃশ্যটা হয়ত নিজের চোখে দেখেছে। আমাদের তদন্তের পক্ষে সে অত্যন্ত মূল্যবান। হেড কোয়ার্টার থেকে সহরতলীর ঘাঁটিগুলোতে খবর দিতে হবে। চলে এসো।

দু'জনে হেডকোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হল। ইনসপেক্টর কবীরও এলো। কিছুক্ষণ পরামর্শের পর ঘণ্টাখানেক ধরে নানা স্থানে টেলিফোন বার্তা পাঠান হল।

রাত্রিশেষে রমরমার ওদিককার একটা ছোট থানা থেকে খবর এলো। নরেশকে পাওয়া গেছে। জীবিত নয়, মৃত। রাস্তার ধারে একটা পুরনো ট্যাকসির মধ্যে একটা লাশ পাওয়া গেছে এবং বর্ণনা যা মিলছে তাতে সে ব্যক্তি যে নরেশ মাইতি সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নেই।

খবরটা পেয়ে রণদেব কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। নরমেধ যজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে। প্রথমে ঈশান মজুমদার ...ফাঁসীর অপেক্ষায় বরেন হালদার ..রণদেবকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ...তারপর নরেশ মাইতি।

অতঃপর আর কে কে ? এবার কার পালা ?

রণদেব চিন্তিত হল। রহস্য ক্রমেই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে।

দেখা যাক, পরবর্তী অংকে কি ঘটে ! [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

পরবর্তী সংখ্যায় এই রহস্য-উপন্যাসের শেষ অংশে
পাঠকরা পাবেন বিস্ময়কর উদ্‌ঘাটন এবং বিচিত্র উপসংহার।

ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী

অন্ধ্রের মন্দির

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

এক

মাদ্রাজ মেলে চেপে দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। মামাবাবুরা ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে একটা কামরায় কোন রকমে রাত কাটিয়েছি।

শ্রীকাকুলম রোডে গাড়ির ভিতরটা কিছু হাল্কা হয়ে গেল। বেলা তখন সাড়ে সাতটা হবে। হাত-পা ছড়াবার জায়গা পেয়ে উৎসাহ পেলুম প্রচুর, প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে নেমে মামাবাবুদের একবার দেখে এলুম।

ফিরে এসে দেখলুম সহযাত্রী মৈত্র মশাই শ্রীনিবাসুলুর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন: আসুন আসুন, অনেক কিছু জানতে পারবেন এঁর কাছে।

বলে আমাকেও একটু জায়গা দিলেন ওঁর পাশে।

আমি এসে পাশে বসতেই শ্রীনিবাসুলু বললেন: আপনাদের কথাই বলছিলুম। মন্দির দেখতে আপনারা পুরী যান, তা না হলে একেবারে রামেশ্বর। এ ছাড়াও যে দেশে আরও মন্দির আছে, এ কথা আপনারা ভাবতেই চাননা।

আমি বললুম: আপনি কি শ্রীরঙ্গম বা মাদুরার কথা বলছেন?

হা-হা করে হাসলেন শ্রীনিবাসুলু, বললেন: আপনিও যে দেখছি মৈত্র মশায়ের মতো কথা বলছেন!

আমি লজ্জা পেলুম, তাই আর কোন কথা বললুমনা।

শ্রীনিবাসুলু বললেন: দক্ষিণ ভারতে তিরুপতির চেয়ে বড় তীর্থ আর কিছু নেই, আর এমন ধনী ব্যবস্থাও নেই সারা ভারতবর্ষে। শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে তিরুপতি দেবস্থান ইচ্ছাকরলে একটা লোহার কারখানা কিনতে পারে।

চোখ কপালে তুলে মৈত্র মশাই বললেন: সত্যি নাকি!

শ্রীনিবাসুলু গম্ভীর ভাবে বললেন: মাদ্রাজ পৌঁছবার আগে গুডুরে নামবেন। সেখান থেকে রেনিগুন্টা হয়ে তিরুপতি। নিজের চোখে না দেখলে আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস হবেনা।

তারপর বললেন: ওয়ালটেয়ারে নিশ্চয়ই বেড়াতে এসেছেন! সীমাচলমের মন্দির দেখেছেন?

আমি বললুম: দেখিনি।

মৈত্র মশাই বললেন: আমি এর আগে ওয়ালটেয়ারে কখনও আসিনি।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও অনেকে দেখেন নি। দেখলে বুঝতে পারতেন যে সুন্দর মন্দির দেখবার জন্যে ভারতের শেষ প্রান্তে যাবার কোন দরকার নেই।

মৈত্র মশাই আমার দিকে তাকালেন। আমি বললুম : ওয়ালটেয়ারে নেমে আপনি দেখে যাননা!

মৈত্র মশাই উদ্বিগ্নভাবে বললেন : আপনি তাই বলছেন! কিন্তু তারপর উঠতে পারব তো গাড়িতে!

এতো পাওড়া নয়। কেন পারবেন না!

বলে শ্রীনিবাসুলু তাঁকে সাহস দিলেন। বললেন : আমি আপনাকে গাড়িতে তুলে দেব।

মৈত্র মশাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি নামবেন তো?

বললুম : না, আমার নামবার উপায় নেই।

কেন?

আমি যাঁদের সঙ্গে যাচ্ছি, তাঁরা মাদ্রাজে গিয়ে নামবেন।

খানিকটা অপ্রসন্নভাবে মৈত্র মশাই বললেন : আপনি যেন কোন মন্দিরের কথা বলছিলেন?

বলে শ্রীনিবাসুলুর মুখের দিকে তাকালেন।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : শ্রীকাকুলম রোড ষ্টেশনে নামলে আপনারা দুটো বিখ্যাত মন্দির দেখতে পাবেন। একটা আরনা ভল্লীর সূর্য মন্দির, আর একটা শ্রীকৃষ্ণের কূর্ম অবতারের মন্দির।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : সূর্যের মন্দির।

সূর্যের মন্দির শুধু কোনারকেই আছে ভাবছেন! কিন্তু সে তো ভাঙা মন্দির। আরনাভল্লীর সূর্য মন্দিরে গিয়ে আপনি সূর্যের পূজা দেখতে পাবেন।

আমি জানি যে সূর্যের মূর্তিপূজা এদেশ থেকে একরকম উঠে গেছে। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রে আছে সূর্যের স্তুতি, আর নবগ্রহের পূজার সময় সূর্যেরও বন্দনা করি। কিন্তু সূর্যের স্বতন্ত্র মন্দির আমরা আর প্রতিষ্ঠা করিনা। সূর্যের পূজা ছিল সভ্যতার প্রথম যুগে মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় আমরা সূর্য পূজার কথা শুনেছি। পার্শীরা এখনও সূর্য পূজা করেন। আর বিহার ও উত্তর প্রদেশবাসী এখনও যে ছট্ পূজা করে থাকে তা সূর্যেরই আরাধনা। ভারতবর্ষে আমি তিনটি সূর্য মন্দিরের নাম শুনেছি। প্রথমটি কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দির, দ্বিতীয়টি আমেদাবাদের নিকট মঠেরায়। আর কোনারকের তৃতীয় মন্দির। এ সবই ভগ্ন মন্দির। সূর্য পূজা আর বোধহয় হয় না। শ্রীনিবাসুলুর কথায় আমার ভাই কৌতূহল জাগল। বললুম : এই সূর্য মন্দির কি খুব কাছে?

শ্রীনিবাসুলু বললেন : বললুম তো শ্রীকাকুলম রোড ষ্টেশনে নেমে শ্রীকাকুলমের বাস ধরবেন। আরনা-ভল্লীর আর শ্রীকাকুলম প্রায় একই জায়গা। শ্রীকূর্মম্ সেখান থেকে বারো মাইল দূরে। বাসেই যাতায়ত করতে হয়। চেষ্টা করলে একদিনেই এই মন্দির দুটি দেখে আপনারা ফিরে আসতে পারবেন।

মৈত্র মশাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম : সে ষ্টেশন তো আমরা পেরিয়ে এসেছি। ফেরার পথে না হয় নামবার কথা ভাবা যাবে।

সেই ভাল।

বলে মৈত্র মশাই আবার শ্রীনিবাসুলুর মুখের দিকে তাকালেন।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : সূর্যের পূজা শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয়, বৌদ্ধদের মধ্যেও প্রচলিত আছে বলে শুনেছি। তাদের সূর্যের নাম হল মরীচি, চতুর্ভুজ মূর্তি। তাঁর তিনটি মুখ পূর্বাহ্ণ মধ্যাহ্ণ ও সায়াহ্ণের প্রতীক। সাতটি শূকর বাহিত তাঁর রথ। পদ্মহীন এক দেবী এই রথের সারথি।

পৌরাণিক কল্পনার কথা আমার মনে পড়ল। সপ্তাশ্ব বাহিত সূর্যের রথের সারথি হলেন অরুণ। কশ্যপ ও বিনতার পুত্র অরুণ বিষ্ণুর সারথি গরুড়ের অগ্রজ। মাতা বিনতা অধৈর্য হয়ে অসময় ডিম ভেঙেছিলেন বলে দেহের নিম্নাংশ অরুণের অসম্পূর্ণ। বৌদ্ধরা বোধহয় এই কল্পনারই রূপ দিয়েছেন সূর্যের সারথির। সারথিকে দেবী করেছেন কেন তা জানিনে।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : আয়নাভল্লীর মন্দিরে সূর্যের মূর্তিটি বড় সুন্দর। কালো কষ্টিপাথরের দণ্ডায়মান মূর্তি, তাঁর দুহাতে দুটি পদ্ম, মাথার উপরে আদিশেষের ফণা ছত্রের মতো বিস্তৃত। অন্য দিকে তাঁর তিন পত্নী উষা, পদ্মিনী ও ছায়া।

বাধা দিয়ে আমি বললুম : উষা ও পদ্মিনী তো সূর্যের পত্নী নন। তাঁর পত্নীদ্বয়ের নাম সংজ্ঞা ও ছায়া।

শ্রীনিবাসুলু একটু বিব্রত বোধ করলেন, বললেন : আমরা তো সূর্যের তিনজন স্ত্রী আছে বলে জানি। রাত্রির কন্যা উষাকে অনুসরণ করেন সূর্য। ঋগ্বেদেও নাকি এই কথা আছে।

এ তো সত্য কথা। এই ঘটনা আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু উষাকে বিবাহ করার কথা কি বেদে আছে?

বেদ তো পড়িনি, কাজেই বেদে কী আছে আর কী নেই তা বলতে পারবনা।

আমি বললুম : উষার কথা থাক, আপনি এবারে পদ্মিনীর কথা বলুন।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : বোধহয় লক্ষ্য করেছেন যে সূর্যোদয়ের আগে পদ্ম তার মুকুলদল খোলেনা। পদ্ম ফোটে সূর্যের আলোর ছোঁয়ায়। সেইজন্যেই বোধ হয় পদ্মিনীকে সূর্যের স্ত্রী বলা হয়।

আমি বললুম : এতো কবির কথা। ছায়াকেও বোধহয় এই কারণেই সূর্যের স্ত্রী বলা হয়। যেখানে আলো, সেইখানেই ছায়া। ছায়াকে বাদ দিয়ে আলোর কল্পনা করতে আমরা পারিনে।

মৈত্র মশাই এবারে আমাকে প্রশ্ন করলেন : আপনি যেন সূর্যের স্ত্রীর কী নাম বললেন?

সংজ্ঞা ও ছায়া। এঁরা দুজন নন, একজন। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার বিবাহ হয়েছিল সূর্যের সঙ্গে। যম ও যমুনা তাঁদের পুত্র কন্যা। সূর্যের তেজ অসহ্য হওয়ায় সংজ্ঞা তাঁর দেহের ছায়াকে রেখে গৃহত্যাগ করেছিলেন। পুরাণে এই গল্প আছে। কিন্তু থাক এসব কথা। আপনি মন্দিরের কথা বলুন।

মৈত্র মশাই এবারে শ্রীনিবাসুলুর দিকে তাকালেন। শ্রীনিবাসুলু বললেন : দণ্ড পিঙ্গল তাঁর দুই ধারপাল; চামর হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সনক ও সনন্দ ঋষি।

মৈত্র মশাই প্রশ্ন করলেন : দণ্ড ও পিঙ্গল কে?

শ্রীনিবাসুলু বললেন : কঠিন প্রশ্ন আপনার।

আমি বললুম : থাক তবে। আপনি অন্য কথা বলুন।

থাকবে কেন! ভবিষ্য পুরাণের গল্পে আছে দণ্ড ও পিঙ্গলের কথা। ভবিষ্য পুরাণে পড়েননি? বলে শ্রীনিবাসুলু আমার দিকে তাকালেন।

আমি সংক্ষেপে বললুম : না।

ভদ্রলোক সোৎসাহে বললেন : ভবিষ্য পুরাণের মতে সূর্যের ডানদিকে থাকবেন অগ্নি ও স্কন্দ বাম দিকে কেন এই নিয়ম হয়েছিল সে সম্বন্ধেও একটি কাহিনী আছে। অসুরেরা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সূর্য তার প্রবল তেজে তাদের ধ্বংস করতে আরম্ভ করেন। অসুরেরা তখন সূর্যকে আক্রমণ করে, আর নিগৃহীত দেবতারা এসে আশ্রয় নেন সূর্যের সাহায্যে। অগ্নি দাঁড়ালেন সূর্যের ডান দিকে। আর বামে দাঁড়ালেন স্কন্দ

সেনাপতি স্কন্দ। স্কন্দ হলেন দণ্ডনায়ক। দুষ্টকে দমন করেন তিনি। আর পিঙ্গল বর্ণ অগ্নিই পিঙ্গল নামে পরিচিত। আজও তাঁরা সূর্যের দুধারে রত ও পিঙ্গল নামে প্রতিষ্ঠিত।

আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন : সূর্যের রথের নাম জানেন ?

আমি বললুম : না।

ভদ্রলোক তখনই বললেন : মকরধ্বজ। তাঁর রথের ধ্বজায় মকরের মুখ আছে। ভবিষ্যপুরাণের মতে আরও দুজন দেবতাকে সূর্যের দুধারে থাকা উচিত। তাঁরা হলেন অশ্বিনী কুমার দ্বয়। এরা তাঁর পুত্র। স্বর্গের বৈদ্য। সূর্যের মন্দিরে চন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহেরও প্রতিষ্ঠার নিয়ম আছে।

অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের কল্পনা আমার কাছে যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হল। সূর্যের আলোয় আছে রোগ-মুক্তির আশ্বাস। এই জন্যেই বোধহয় স্বর্গের বৈদ্যদ্বয়ের কল্পনা করা হয়েছে সূর্যের দুই পাশে।

আমি বললুম : আরণ্যাভন্তীর মন্দিরটি কিন্তু আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলনা।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : বর্ণনা দিয়ে কি কিছু বোঝানো যায় !

যায় বৈকি ! যদি বলেন পুরীর মন্দিরের মতো কিংবা—

আমার চোখে কোন মন্দিরের মতোই নয়। আর দক্ষিণ ভারতে আপনারা মন্দির দেখতে যাচ্ছেন। মন্দিরের সম্বন্ধে ধারণা আপনাদের প্রথমেই বদলাতে হবে। মন্দিরের বদলে এখন আপনাদের গোপুরমের বর্ণনা দিতে হবে।

গোপুরম !

বলে মৈত্র মশাই তাকালেন শ্রীনিবাসুলুর মুখের দিকে।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের গেট, তারই নাম গোপুরম্। এটি সংস্কৃত শব্দ। নগর বা দুর্গের দ্বার। এমন কি যেকোনও দ্বারকেই গোপুরম বলা চলে। মন্দিরের চেয়ে গোপুরের বৈশিষ্ট্যই এ দেশে বেশি। কিন্তু এই সূর্য মন্দিরের গোপুর একেবারে ভিন্ন রকমের। এ গোপুর দেখলে দক্ষিণ ভারতের গোপুরের সম্বন্ধে কোন ধারণাই হবেনা।

মৈত্র মশাই জিজ্ঞাসা করলেন : কেন ?

শ্রীনিবাসুলু বললেন : এই গোপুর একটি দোতলা বাড়ির মতন। মাঝখান দিয়ে ভিতরে যাবার পথ। তার ছাদের উপরে সামান্য কিছু কারুকার্য। কতকটা আধুনিক আকার এই গোপুরের কিন্তু তাই বলে মন্দিরটি আপনারা আধুনিক ভাববেন না। স্থানীয় লোকেরা বলে যে, দেবরাজ ইন্দ্র এই মন্দির নির্মাণ করে সূর্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কন্দপুরাণে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে।

মৈত্র মশায়ের চোখে অনেক কৌতূহল দেখা গেল।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : দেবরাজ ইন্দ্র একসময়ে এসেছিলেন কোটীশ্বরের মন্দিরে। জোর করে মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করতেই দ্বাররক্ষী নাকী তাঁকে এক লাথি মারেন। অজ্ঞান হয়ে দেবরাজ ছিটকে পড়লেন মাইল দুয়েক দূরে। অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি সূর্যকে দেখতে পেলেন নিজের অন্তরাত্মায়। সূর্য তাঁকে বললেন যে, এক মন্দির নির্মাণ করে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলে সকল যন্ত্রণার অবসান হবে। জ্ঞান হবার পরে ইন্দ্র তাই করলেন। এই আরণ্যাভন্তীতেই ইন্দ্র ছিটকে পড়েছিলেন। এইখানেই তিনি সূর্যের মন্দির নির্মাণ করে নিজের যন্ত্রণা মুক্ত হলেন।

চোখ বড় বড় করে মৈত্র মশাই বললেন : এত পুরনো মন্দির। ভেঙে পড়েনি আজও।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : সে মন্দির কি আর আছে! আজ আমরা যে মন্দির দেখি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তা নির্মাণ করে দিয়েছেন পদ্মলু নামে এক ভক্ত। মন্দিরের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। নতুন কিছু দেবতারও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। শাস্ত্রবিধানে পঞ্চায়তন পূজার বিধি তাদেরতো?

বলে মৈত্র মশায়ের দিকে তাকালেন। মৈত্র মশাই মাথা নাড়লেন উত্তরে।

শ্রীনিবাসুলু বললেন: প্রতি মন্দিরে পাঁচজন দেবতা থাকবেন—আদিত্য অম্বিকা বিষ্ণু গণেশ ও মহেশ্বর। এঁদের মধ্যে একজন হবেন প্রধান। আরনাভল্লীতে আদিত্য হলেন প্রধান। নাম তাঁর সূর্য নারায়ণ। অন্যান্য দেবতারা অপ্রধান। তাঁদের সঙ্গে ইন্দ্রও আছেন।

আমি প্রশ্ন করলুম: এই মন্দিরের প্রাচীনতা সম্বন্ধে ইতিহাসে কী বলে!

ইতিহাস?

শ্রীনিবাসুলু তাকালেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন: কিছু শিলালিপি আছে বলে শুনেছি। তার থেকে অনুমান করা হয় যে মন্দিরটি সত্যিই প্রাচীন।

আমি বললুম: প্রাচীন তো নিশ্চয়ই। তা না হলে সূর্যের মন্দির বিষ্ণু মন্দিরে পরিণত হত, সূর্য নারায়ণ হতেন সত্য নারায়ণ।

শ্রীনিবাসুলু এবারে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বলনাম ঋগ্বেদের মতে সকালের সূর্য হলেন ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নের সূর্য শিব, আর বিষ্ণু হলেন সায়াহ্নের সূর্য। বিষ্ণুকে আমরা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তি বলে মনে করি। তাই সূর্যকে বলেছি সূর্যনারায়ণ, তারপর সূর্য বাদ দিয়ে শুধু নারায়ণ বলেই পূজো করেছি সেই একই মূর্তিকে। এক হাতের পদ্ম কেড়ে নিয়ে দিয়েছি শঙ্খ, তারপরে যোগ করেছি গদা ও চক্র।

মৈত্র মশাই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন: সত্যি নাকি?

আমি বললুম: এ আমার অনুমান।

রামায়ণের কথা আমার মনে পড়ল। রাবণ বধের প্রাক্কালে মহর্ষি অগস্ত্য রামকে শিখিয়েছিলেন সূর্যস্তব আদিত্য হৃদয়। মহাভারতেও আমরা সূর্য পূজার কথা পেয়েছি। কৃষ্ণের শাপে তাঁর পুত্র শাম্বের কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। দীর্ঘদিন সূর্যের পূজা করে তিনি নিরাময় হয়েছিলেন। এ যুগের কবি ভবভূতির নাটক 'মালতি মাধবে' আমরা সূর্যের বন্দনা দেখি। সপ্তম শতাব্দীর সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাকবি ময়ূর রচনা করেছেন সূর্যশতক। এর পরেও আমরা সূর্য পূজার প্রমাণ পাই। কাশ্মীরে মার্তণ্ড মন্দির নির্মিত হয়েছিল নবম শতাব্দীতে। মঠেরা ও কোনারকের সূর্য-মন্দির একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে। এদেশে প্রথম সূর্য মন্দিরের উল্লেখ পেয়েছি খৃষ্টের জন্মের চারশো বছর আগে। মাউন্ট আবু থেকে ছদিনের পথ হাঁটলে এই মন্দিরে পৌঁছনো যেত। মন্দিরটিই মঠেরার মন্দির কিনা তা জানবার উপায় নেই।

শ্রীনিবাসুলু বললেন: আরনাভল্লীর দেবতা বড় জাগ্রত। দেশ বিদেশ থেকে বহু যাত্রী আসে নানা রকমের প্রার্থনা নিয়ে। অন্ধ আসে, কুষ্ঠ রোগী আসে, আর আসে বন্ধ্যা নারী। উপকার পায় বলেই তারা আসে।

মৈত্র মশাই আবার বললেন: সত্যি নাকি!

সত্যি কিনা জানিনা লোকে বিশ্বাস করে বলেই তো আসে!

একটু থেমে শ্রীনিবাসুলু বললেন: একেবারে হাল আমলের একটি গল্প বলি আপনাদের। সত্যি

গল্প। গোদাবরী জেলার একটি ছেলে. বছর কুড়ি বয়েস। সারা গায়ে তার কুষ্ঠ হয়েছিল। কাশীতে মরবে বলে সে কাশী গিয়েছিল। সেখানে এক সাধু তাকে এই আরনাভল্লীতে চল্লিশ দিন ধর্মাচরণ করতে বলে। সেই ছেলেটি এখানে এসে পুকুরে স্নান করে রোজ একশো আটবার মন্দির প্রদক্ষিণ করত। ত্রিশ দিন পরে সে ভাল হতে আরম্ভ করে আর চল্লিশ দিনে সম্পূর্ণ সেরে যায়। ছেলেটি এখন বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। কিন্তু প্রতি বছর বৈশাখ মাসে সপরিবারে এসে পূজা করে যায়।

মৈত্র মশাই শ্রীনিবাসুলুর মুখের দিকে তাকালেন অভিভূত হয়ে। 'সত্যি নাকি' বলতেও ভুলে গেলেন। আমিও কোন অবিশ্বাসের কথা বললুমনা।

গাড়িতে আর যাত্রীর ভিড় নেই। কখন কে কোথায় নেমে গেছে খেয়াল করিনি, হাত-পা ছড়িয়ে বসবার জায়গা এখন পেয়েছি। কিন্তু সহযাত্রী ভেঙ্কটাইয়ার ঘুরে পরে গেছেন। আমরা বসেছি শ্রীনিবাসুলুর দুপাশে। পরিচ্ছন্ন আলোয় পৃথিবী এখন ঝলমল করছে। ভাল লাগছে এই পৃথিবীকে। যতক্ষণ এই গাড়িতে আরাম করে বসতে পারব ততক্ষণই পৃথিবীকে ভাল লাগবে।

নীরবে আমি মানুষের বিশ্বাসের কথা ভাবছিলুম। কত গভীর হয় মানুষের বিশ্বাস তা না দেখলে ধারণা করা যায়না। শ্রীনিবাসুলু একটু আগে যে গল্পটি আমাদের বললেন, তা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তেমনি বিশ্বাস করেন আরও অনেক ভক্ত। কিন্তু আমি এত সহজে এমন অবৈজ্ঞানিক কথা বিশ্বাস করতে পারিনে। কৃষ্ণের পুত্র শাম্বের গল্প আছে পুরাণে। দেবর্ষি নারদ এসে কৃষ্ণকে বলেছিলেন শাম্বের পদস্খলনের কথা। কৃষ্ণ পরীক্ষা করে দেখেছিলেন এই অপবাদের কথা। তারপর সত্য জেনে শাপ দিয়েছিলেন, কুষ্ঠ হয়েছিল শাম্বের। রোগমুক্ত হবার জন্য শাম্ব তপস্যা করেছিলেন দীর্ঘকাল। তিনি নিরাময় হয়েছিলেন। তারপরে সূর্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি মন্দিরে। এই ঘটনা নাকি ঘটেছিল উড়িষ্যার কোনারকে।

পুরাণে এই রকম গল্প আরও অনেক আছে। দক্ষ প্রজাপতি শাপ দিয়েছিলেন তাঁর জামাতা চন্দ্রকে। চন্দ্র তাঁর সাতাশটি কন্যা বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু সব পত্নীকে সমান চোখে দেখতেন না। রোহিনীর প্রতি ছিল তাঁর পক্ষপাতিত্ব। এই অপরাধেই দক্ষ প্রজাপতি শাপ দিয়েছিলেন, চন্দ্রের যক্ষ্মা হয়েছিল। শিবের তপস্যা করে চন্দ্র রোগমুক্ত হয়েছিলেন। তারপরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সোমনাথ শিবের। সেই সোমনাথ আছেন সৌরাষ্ট্রের প্রভাসে।

এ সমস্ত গল্পই আমরা বিশ্বাসে বাঁচিয়ে রেখেছি। কিন্তু এ সবের পিছনেও কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে বলে মনে হয়। সূর্যের আলোয় যে নানা রোগ নিরাময় হয়, তার প্রমাণ হয়ে গেছে। শিবকে আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি।

মৈত্র মশাই নীরবে থাকতে পারলেন না। বললেন, আপনি আর একটা কী মন্দিরের নাম করেছিলেন?

গম্ভীর ভাবে শ্রীনিবাসুলু বললেন: শ্রীকূর্মম।

কূর্ম মানে তো কাছিম!

শ্রীনিবাসুলু বললেন: হুঁ।

কূর্মের আবার মন্দির হয় নাকি?

বলে মৈত্র মশাই গভীর বিস্ময়ে তাকালেন শ্রীনিবাসুলুর দিকে।

শ্রীনিবাসুলু বললেন: কূর্মের মন্দির নয়, বিষ্ণুর—কূর্মাবতারের মন্দির। যেমন সীমাচলমে নৃসিংহ অবতারের। কূর্মাবতারের গল্প জানেন তো?

মৈত্রমশাই বললেন : অবতারের গল্পগুলো ছেলে বেলায় পড়েছিলুম।

কূর্মাবতারের গল্প আমার মনে আছে। সমুদ্র মন্থনের সময় বিষ্ণু কূর্মরূপ ধারণ করেছিলেন। সমুদ্র মন্থনের প্রয়োজন কেন হয়েছিল, সে কথাও আমার মনে পড়ল। দুর্বাশা মুনি শাপ দিয়েছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রকে। সস্ত্রীক বনে বেড়াবার সময় বিদ্যাধর বধূরা তাঁকে একখানি পারিজাতের মালা দিয়েছিলেন। ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে তিনি সেই মালা তাঁকেই উপহার দেন। কিন্তু ইন্দ্র নিজের গলায় না পরে মালাটি রাখলেন ঐরাবতের কুম্ভের উপরে। ঐরাবত সেই সুগন্ধি মালা শুঁড় দিয়ে মাটিতে নামাল। মালার দুর্দশা দেখেই দুর্বাশা ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন, তোমার কিসের অহংকার বলব। আজ থেকে তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে—শ্রীহীন হবে তোমার স্বর্গ।

দুর্বাশার শাপে লক্ষ্মী স্বর্গ পরিত্যাগ করে পাতালে নেমে গেলেন। দেবতারা শ্রীহীন হলেন। যাগযজ্ঞ লোপ পেল, দেবতারা পরাজিত হলেন পরাক্রান্ত অসুরদের কাছে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বিষ্ণু দিলেন সমুদ্র মন্থন করে লক্ষ্মীকে উদ্ধারের পরামর্শ। তাতে অমৃতও উঠবে, অমৃত পান করে অমর হবেন দেবতারা।

কিন্তু এতো দেবতাদের একার কাজ নয়। অসুরদের সাহায্যেরও দরকার। দেবরাজ ইন্দ্র গেলেন দৈত্যরাজ বলির কাছে, সমুদ্র মন্থনের প্রয়োজনীয়তা তাঁকে ভাল করে বোঝালেন। দু'দলে সন্ধি হল। দেবাসুর মিলিত হয়ে সমুদ্র মন্থন করবেন।

মন্দর পর্বতকে এনে মন্থন দণ্ড করা হল, আর বাসুকি হলেন রজ্জু। দেবতা ও অসুর দুদিকে ধরে মন্থন শুরু করলেন। কিন্তু মন্দর পর্বত নিজের ভারে সমুদ্রের গর্ভে ডুবে যেতে লাগল। বিষ্ণু তখন কূর্মরূপে মন্দরকে ধারণ করলেন। নির্বিঘ্নে হল সমুদ্র মন্থন।

বিষ্ণুর এই রূপের নাম কূর্মাবতার।

শ্রীনিবাসুলু বোধ হয় ভাবলেন যে মৈত্র মশায়েরও গল্পটি মনে আছে। তাই বললেন : শ্রীকূর্মমে বিষ্ণু শ্রীকূর্মনাথ নামে পূজিত হচ্ছেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠারও একটা ইতিহাস আছে।

রাজা সুত ছিলেন শ্বেতাচলের রাজা। তাঁর রাণী ছিলেন ধর্মপ্রাণ, ব্রত পূজা নিয়ে তিনি দিন কাটাতেন। এক শুক্ল একাদশীর দিনে রাজা এসেছিলেন রাণীর কাছে। রাণীর সেদিন ব্রত পালনের দিন। রাজাকে দেখে রাণী চোখ বুজলেন, মনে মনে হরির কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তাঁর ব্রত ভঙ্গ না হয়। অন্তর্যামী হরি তাঁর কথা শুনলেন। দুজনের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেল গঙ্গাতীর্থ। রাণী এপারে রইলেন, আর রাজা রইলেন ওপারে।

একদিন দেবর্ষি নারদ এলেন রাজার কাছে। দেখলেন যে রাজা বংশধারা নদীর ধারেই কালাতিপাত করছেন। তিনি রাজাকে বললেন যে ঠিক মতো তপস্যা করলেই হরির দেখা পাওয়া যাবে। এই কথা শুনে রাজা নারদের সঙ্গে চললেন সমুদ্র সঙ্গমে। সেখানেই দেবর্ষির কাছে কূর্ম মন্ত্র পেয়ে কঠিন তপস্যায় রত হলেন। যথা সময়ে হরি দেখা দিলেন কূর্মাবতারের রূপে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে। তারপরে তাঁরা দেশের দিকে অগ্রসর হলেন। এক জায়গায় একটি পবিত্র স্থান দেখে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে কীর্য সমুদ্র নামে একটি সরোবর খনন করলেন, নিজেও অধিষ্ঠান করলেন সেইখানে। এই স্থানই শ্রীকূর্মম নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : স্থল পুরাণে আরও অনেক কাহিনী আছে, অনেক অলৌকিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী। অনেক শিলালিপিও আছে, তা থেকেও ইতিহাসের অনেক কথা জানা যায়।

মৈত্র মশায়ের কৌতূহল লক্ষ্য করে শ্রীনিবাসুলু বললেন : শ্রীকূর্মনাথের সামনে নাচতে আসতেন স্বর্গের অপ্সরা তিলোত্তমা। একদিন আনন্দপুরীর রাজকুমার এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে গেলেন। রাজকুমার

মৃগয়ায় এসেছিলেন, স্বর্ণমুখ হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে এই অঞ্চলে এসে পড়েছিলেন। তিলোত্তমাকে দেখে তিনি মৃগের কথা ভুলে গেলেন। মুগ্ধ হলেন অপ্সরার রূপে। কিন্তু নিজের মনের কথা বলতে গিয়ে বিপদ হল, তিলোত্তমা শাপ দিলেন রাজকুমারকে। দেবতার দাসী তিনি তাঁর উপরে মানুষের লোভ কেন হবে! শাপগ্রস্ত রাজকুমার আর নিজের রাজ্যে ফিরলেন না, রয়ে গেলেন সেইখানেই। দেবতার মন্দিরে দীর্ঘ দিন তপস্যা করে শাপমুক্ত হলেন।

পরম কৌতূহলে মৈত্র মশাই প্রশ্ন করলেন; কী শাপ দিয়েছিলেন তিলোত্তমা?

শ্রীনিবাসুলু এই প্রশ্ন শুনে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। উত্তরটা বোধহয় তাঁর জানা ছিলনা, অথচ সরাসরি জানিনা বলতেও পারলেন না। আমি তাঁকে আরাম দেবার জন্যে বললুম: শাপটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল তপস্যা। রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন রাজকুমার, অপ্সরার উৎসনায় তাঁর-অন্তর্দৃষ্টি জাগল, দেবতার পায়ে তিনি আত্মসমর্পণ করতে পারলেন।

শ্রীনিবাসুলু এবারে জোর পেয়ে গেলেন, বললেন: পুরাণের প্রতিটি গল্পের এই রকমের এক একটি মানে আছে। লেখা পড়া শিখে আপনাদের অবিশ্বাস জন্মেছে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই আসল মানেটা বুঝতে পারবেন।

মৈত্র মশাই এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন? কলকাতায় বসে আমরা এসব তীর্থস্থানের নামও শুনিনি। জগন্নাথের পর শুনেছি রামেশ্বরের নাম।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে শ্রীনিবাসুলু বললেন: বলেনকি, সীমাচলমের নৃসিংহদেবের নামও শোনেননি নাকি?

মৈত্র মশাই আমার দিকে তাকালেন বিজ্ঞের ভাবে।

আমি বললুম; সীমাচলম ওয়ালটেয়ারের কাছে।

শ্রীনিবাসুলু বললেন: আমার সঙ্গে আজ নামুন না ওয়ালটেয়ারে, বাসে করে দেখিয়ে আনব। ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা একেবারে জাগ্রত। মনে মনে যা চাইবেন, তাই পেয়ে যাবেন।

মৈত্র মশায়ের মুখ এবারে করুণ হল। বললেন: সত্যি নাকি?

শ্রীনিবাসুলু বললেন: সত্যি কিনা পরীক্ষা করেই দেখুন।

মৈত্র মশাই এবারে আরও করুণ চোখে তাকালেন আমার দিকে। বললেন: কী বিপদ, আপনিই দেখুন। বারোদিন মাত্র ছুটি, এরই মধ্যে রামেশ্বর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যেতে হবে। যেখানে সেখানে নামো বললেই কি নামা যায়!

শ্রীনিবাসুলু চটে উঠলেন: বললেন এত বড় তীর্থস্থানকে আপনি যেখানে সেখানে বলছেন! ভক্ত প্রহ্লাদের চেয়ে কি বিষ্ণুর বড় ভক্ত পৃথিবীতে জন্মেছে? তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির—বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: উনি যখন বলছেন তখন নেমে পড়ুন না একদিনের জন্যে। তারপর এই ট্রেনই ধরবেন কাল দিনের বেলায়।

মৈত্র মশাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনিও কি নামছেন নাকি?

বললুম: আমি তো আপনার মতো স্বাধীন নই, ইচ্ছা থাকলেও আমার নামবার উপায় নেই।

কেন?

এ কথার উত্তর দিলেন শ্রীনিবাসুলু, বললেন ; উনি কি আর আপনার মতো একা যাচ্ছেন !

বলে রহস্যময় চোখে তাকালেন আমার দিকে।

গাড়ির গতি মন্থর হয়েছিল অনেকক্ষণ থেকে। এইবারে একটা স্টেশনে এসে দাঁড়াল। আমি বললুম : মামাবাবু যদি আমাকে এইখানে নামতে বলেন তো এইখানেই নামতে হবে।

এখানে ? কোন্ স্টেশন এটা ?

মৈত্র মশায়ের প্রশ্নের উত্তর দিলেন শ্রীনিবাসুলু বললেন : এ হল বিজয়নগরম। ক্রিকেটের ভিজিকে জানেন ?

মৈত্র মশাই আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু আমি কোন কথা বলবার অবকাশ পেলুম না। জানালার কাছে স্বাতিকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হলুম। স্বাতি বলল : একটু নেমে পড়ুনতো গোপালদা।

ব্যস্ত ভাবে আমি উঠে পড়লুম।

মৈত্র মশাই জিজ্ঞাসা করলেন : সত্যি সত্যিই নামছেন নাকি এখানে ?

দেখি কী হুকুম হয়।

বলে আমি প্ল্যাটফর্মে গিয়ে পড়লুম।

স্বাতি বলল : ওয়ালটেয়ারে নামবেন কিনা বাবা ভাবছেন। এক কথায় রাজী হয়ে যাবেন গোপালদা। শুনেছি ভারি সুন্দর এই ওয়ালটেয়ারের সমুদ্র। কিন্তু মাকে বলবেন সীমাচলমের মন্দিরের কথা।

বলে তরতর করে স্বাতি নিজেদের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

আমি তাকে অনুসরণ করলুম।

দরজার হাতলধরে মামাবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন : স্বাতির কথা শুনেছ গোপাল ?

আমি হাঁ বললুমনা, না-ও বললুমনা তাঁকে। নীরবে তাঁর নিকটে এসে দাঁড়ালুম।

মামাবাবু নিজেই বললেন : গাড়ির এই ভদ্রলোক আমাদের ওয়ালটেয়ারে নামতে বলছেন। ওয়ালটেয়ার আর সীমাচলম নাকি একদিনেই দেখা হয়ে যাবে।

আমি বললুম : বেশ তো, তাতে আর আপত্তির কী আছে ?

তুমিও তাই বলছ ! কিন্তু তোমার মামী—

মামী বসেছিলেন জানালার ধারে। তাঁর দিকে চেয়ে আমি বললুম : সীমাচলমে নৃসিংহদেবের মন্দির শুনেছি ভক্ত প্রহ্লাদের তৈরি। একেবারে জাগ্রত দেবতা। মনে মনে কিছু চাইলেই তা পাওয়া যায়।

স্বাতি বলল : কে বলল আপনাকে ?

বললুম : শ্রীনিবাসুলু বলছিলেন মৈত্র মশায়কে। ওঁরা বোধহয় ওয়ালটেয়ারে নামবেন, তারপরে কাল আবার এই ট্রেনই ধরবেন।

তাহলে কি আমরাও নামব ? বলে মামাবাবু একটু পিছিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

মামী বললেন : যা ভাল বোঝ তোমরা।

পরম কৌতুকে স্বাতি আমার দিকে তাকাল। বলল, গাড়ি ছেড়ে দেবে গোপালদা, নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠুন। আর নেমে পড়বেন ওয়ালটেয়ারে। আমি আর তাকতে যেতে পারবনা।

বলে নিজেও গাড়িতে উঠে পড়ল।

আমি ফিরে এলুম প্রসন্ন মনে।

[ক্রমশঃ

মধুপর্ক

মানুষ প্রমথেশ বড়ুয়া

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

পাছে কেউ শিরোনামা দেখে ভুল ক'রে ধরেন তাই শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে আমি বড়ুয়া সাহেবের জীবনী লিখতে বসিনি, আমার জীবনে তাঁর স্মৃতি-সৌরভগুলো, সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভেবে নিতে চেষ্টা করছি, যে, যে চোখ দিয়ে তিনি জীবনটাকে দেখেছিলেন আর যে মন নিয়ে চিত্রসৃষ্টির সাধনাকে সার্থক করতে চেয়েছিলেন, আজকের পটভূমিকা, অমত জোড়া নামের পেছনে তার ছায়াটুকুও পাওয়া যায় কিনা। তাই বলে, তুলনায় লাইন টানব না কিংবা আলোচনার আসরও বসাব না। ও দুটোই হবে সময়ের অপব্যবহার। আমি, অবাধ স্বাধীনতায় আর এলোমেলো ছন্দে ওঁর সঙ্গে সংযুক্ত আমার অতীতটাকে ইচ্ছে মতন উলটে পালটে দেখে যাব। শুরু থেকে আরম্ভ ক'রে শেষের দিকে এলে অনুক্রম বজায় থাকলেও নিয়ম অতিক্রমের আনন্দ এতটুকুও থাকে না। তাছাড়া, ইতিহাস যখন লিখতে বসিনি তখন তার প্রয়োজনই বা কোনখানে? আশা আছে যে এই ভাবেই ঐ মানুষটাকে বোঝা সহজ হবে, ওঁর জীবন-দর্শনটা জানা যাবে আর ওঁর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ওঁর সৃষ্টির মূল্যও কিছু নির্দ্ধারিত হবে। যে মানুষ আসল শিল্পী, সে শুধু শিল্পেই সার্থক নয়। তার দৈনন্দিন জীবনেও সে সুন্দর এবং প্রতি পায়ে পায়ে সে নিজের অজ্ঞাতসারেই, জীবনকে সৃষ্টি করতে করতে চলে।

প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রথমোল্লেখেই বলা উচিত ছিল যে ব্যক্তিগত ভাবে, আমার জীবনে ওঁর পরোক্ষ পদক্ষেপ যৌবনের সূচনায় এবং আমার প্রথম প্রেমের শেষে। আমার সেই কিশোর মনের কাকলি, ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় 'কাফ-লাভ' বা বাচ্চুর প্রেম, তার কোন রকম প্রভাব আমার বাকি জীবনে না পড়লেও, সেই বাচ্চুরানীর বিয়ের ভিত্তিতে আর সেই প্রসঙ্গে আমার বিরহের বিলাসে দেবদাসরূপী বড়ুয়া, আমার চিন্তাধারায়, একদিকে যেমন হিরো, অন্যদিকে তেমনি জীবনজোড়া হয়রানি। ওঁকে আমার আদর্শের নায়ক ভেবে জীবনটাকে দেখতে শিখলাম ভাব-বিলাসের ভঙ্গিমায় অথচ দাসনগরের আপৈশব মূল্য বোধে মনটাকে গড়তে হল বস্তিবাসীর আঙ্গিকে। একেবারে বিপরীত ধর্মী এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বে জীবনটা প্রথম থেকেই পায়ে পায়ে জড়াতে আরম্ভ করল।...

আমার প্রথম যৌবনের এই সব ছোটখাটো কথা নিয়ে যখন রেডিও দপ্তরের তিনতলায় আমার কোনের ঘরে আলাপ জমে উঠত রিহার্সালের আগে কি নাটকের পর, উনি ছেলে মানুষের মতন হাসতেন ঠিকই কিন্তু ছায়াচিত্রের এই সুদূর প্রসারি প্রভাবকে হেসে উড়িয়ে দিতেন না। দেবদাস এবং কিশোর মনের ওপর তার কঠোর প্রভাবের কথা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম দিনের চা পানের পর আর সেই কথা নিয়ে

আলোচনা হয়েছিল ঠিক তিন বছর পর, ঢাকায়. দেবদাস নাটকটা রেডিওতে অভিনয় করার ব্যাপারে। 'ওঁর থাকার ব্যবস্থা ছিল তাজ বাংলোতে, কিন্তু প্রিমিয়ের কেমিনটা এমনই পছন্দ হল যে কিছু খোসামোদ করে, অনেক টাকার খেসারত দিয়ে আর ছবিতে একটা 'চান্স্' বরবাদ করে সেইখানেই থেকে গেলেন। আমি ওঁকে পৌঁছে দিয়ে চ'লে আসছিলাম, উনি পথ আটকে বললেন,

● তাও কি হয়?···আমরা আপনার অতিথি!

তারপর বিলেতি বোতল দেখিয়ে বললেন,

● সখ না থাক, সৌজন্যের খাতিরেই না হয় বইলেন!

বইলাম। উনি স্বখাত সলিলে মগ্নপ্রায় হয়ে বললেন,

● সখ না করলে, সুখ্যাতি হয় না!

● যেমন দেবদাস?

গেলাস ধরা হাতখানা থমকে গেল। তারপর গোগ্রাসে পুরো গেলাসটা গলাধঃকরণ ক'রে বললেন,

● কেন মনে করিয়ে দেন আমার ঐ কলঙ্কের কথা?

কেবিন থেকে বেরিয়ে উনি এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। অন্ধকার গঙ্গার বুকে আলো ছিল না, ওপারের গাঁয়ের ইশারাও ছিল না। সামনের ডেক থেকে আমি বসলাম চেয়ারে. উনি বসলেন রেলিংয়ের ওপর পা ঝুলিয়ে, আর বললেন,

● মনে আছে আমার ছেলেবেলার করুণ কাহিনী আর কিশোর মনের ওপর আমার কলঙ্কের কালো ছায়া। কি জানেন? যখন ওটা করেছিলাম তখন জীবনটা ছিল যৌবনে ভরা আর মনটা ছিল কাদামাটির মতন নরম। নতুন কিছু করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু সে নতুনকে নিয়ে ভাববার অভিজ্ঞতা ছিল না।

যে মানুষটাকে জলের মতন মদ খেতে দেখেছি আজ তাকে শূন্য গেলাস হাতে আনমনা ব'সে থাকতে দেখে আমার নিজেরই কেমন যেন বেশ একটু আনোয়াস্তি লাগল। আমি উঠে গিয়ে গেলাসটা ওঁর হাত থেকে নেব ব'লে হাত বাড়াতেই উনি ওটা নদীতে ফেলে দিয়ে বললেন,

● ব্যাপারটা, বলতে গেলে, অনেকটা. নিতান্ত নিরীহ পাড়ায় মদের দোকান করার মতন। অর্থোপার্জনের আনন্দে দোকান হল আর আদর জমানোর জন্যে আনুষঙ্গিক বাসরও সাজানো হল কিন্তু পাড়ার ওপর এর কি পরিমাণ প্রভাব পড়ল সেটা কেউ ভাবল না!

থেমে বললেন,

● দেবদাস নিয়ে আমারও হয়েছিল ঠিক তাই। "বাংলা ১৩৩৩" ক'রে যখন বেধড়ক গালাগালি খেলাম আর প্রথম শোর পরই বইখানা পুড়িয়ে বাড়ী ফিরলাম তখনই মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে আমার চিন্তা সরিয়ে রেখে অন্যের চিন্তা নিজের ক'রে নেব। দেবদাস সাফল্য আনল, কিন্তু সার্থকতা পেলাম না, আর যখন আপনার মতন মানুষদের মনে ওর ফুফলটা দেখলাম তখন মর্মে মরে গেলাম।

কথাটা ওঁর মিথ্যে নয়। সে অনুতাপের বোঝা যে ওঁর মন থেকে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নামেনি, একথা আগেই বলেছি। আসলে, বিরহের বিলাসে নিজেকে ধ্বংস করার যে দেবদাসীয় উন্মাদনা, ওঁর মনে, তারই বিপরীতার্থক সৃষ্টির স্বপ্ন ছিল সাহজাহান—সম্রাট নয়, তাজের স্রষ্টা, কবি, প্রেমিক, শিল্পী এবং নাবক সাহজাহান। যারা যাবার বছর ছয়েক আগে উনি যখন চিকিৎসার জন্যে বিলেত যান তখন ওঁর এই পরিকল্পনা নিয়ে প্রভূত আলাপালোচনা করেছিলেন বিলেতের অন্যতম বিশ্ববিখ্যাত প্রযোজক স্যার আলেকজাণ্ডার

কোড়ার সঙ্গে এবং তার আলেকজাণ্ডারের কাছ থেকে আমার শোনা যে "ড্রিম ইন মার্বেলস" মর্মর স্বপ্নের আসল উদ্দেশ্যই ছিল বিরহকে সৃষ্টি মূলক সাধনায় রূপান্তরিত করা অর্থাৎ প্রেমে বিফল হ'য়ে, মদ খেয়ে মৃত্যুর পথে না গিয়ে, মহত্তর কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে সেটাকে মহীয়ান করা। এ নিয়ে ওঁদের মধ্যে বহু দিন এবং বহু রাত আলোচনা হয় এবং এও ঠিক হয় যে সুস্থ হ'য়ে উঠলেই উনি ঐ ছবি করার কাজে হাত দেবেন। মৃত্যু সে সুযোগ ওঁকে দেয়নি। কেউ কেউ অবশ্যই বলেন যে উনি নিজেই সে সুযোগ নেন নি; কারণ, স্মৃতির স্বপ্ন যতই মনে থাক, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওঁর ঔদাসীন্যের সীমা ছিল না। এ বিষয় ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল দিল্লীতে, ওঁর বড় ছেলের বিয়ের সময়। ওঁর মদ্য পানের বহর দেখে একদিন বলতে বাধ্য হলাম,

● শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখেন না কেন একবার?

হেসে বললেন,

● মন ছুটি দেয় না!

খেমে আবার বললেন,

● আর শরীর যখন চোখ টানে তখন অভাবের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠি আর মনটা মদের দিকে ছুট মারে।

কখন কখন বলতেন বেশ রাগ করেই

● শরীর সামলাবে সাধ্য কি তোমার যাদের মনের বালাই নেই!!

মনটাই ছিল ওঁর সব, আর ছিল সত্তেজ, সবল আর শিশুর মতন সহজ এবং সরল।

ছোট্ট করে মনে আছে, একদিন রেডিওতে শেষের কবিতার রিহার্সালের ঠিক মাঝখানে যখন প্রবল জোরে বৃষ্টি নাবল, উনি প্রসন্ন আনন্দে স্ক্রিপট্ পড়তে পড়তেই বললেন,

● বাঃ, এমন বিষ্টি নাবলে, তোমার কি ইচ্ছে করেনা বই বন্ধ করে জানলার ধারে পাড়াই আর চাকরকে হুকুম করি আন্ চা আর ভাজা ফুলুরি।

মিলিদি ছিলেন ওঁর লাবণ্য। সমান সুরে তিনিও ডায়লগ বললেন,

● ইচ্ছে তো করে মিতা। কিন্তু দিচ্ছে কে?

সারা ষ্টুডিও হেসে গড়াগড়ি আর সারা ছায়া ডিপার্টমেণ্ট ওঁর গাড়ীতে উঠে ভিজতে ভিজতে গিয়ে হাজির হল ওঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের রাজপ্রাসাদে। সেখানে চা হল, ফুলুরি হল আর মাঝরাত বরাবর খিচুড়ি আর ডিম ভাজা খাওয়া হল। আরও ঠিক হল পরের রবিবার আমরা সবাই যাব ডায়মণ্ডহারবার, পিকনিক করতে। অবশ্য যাওয়া হয়নি, কারণ ঠিক তার আগের শনিবারে ওঁর রেসের ঘোড়া শেষের দিক থেকে প্রথম হয়ে রীতিমত সর্বনাশ ঘটিয়ে দিল!!

রেসের ব্যাপারে উনি যেমন ছিলেন বিশেষজ্ঞ, অন্যান্য খেলার ব্যাপারে তেমনি ছিলেন একেবারে আনাড়ি ব্যাপারি। চ্যারিটি ম্যাচের আগে ছেলেরা ছটফট করলেও সাহেবের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নেবে এমন সাহস কারো হতনা—অথচ ছুটি না হ'লেও নয়। অতএব ওরা আবিষ্কার করে বসল, 'আরসোলা'। সাহেবের অমোঘ ঔষধ! কখন যদি ধারে কাছে কোথাও আরসোলা দেখা গেল তো ব্যস্, বড়দা সাহেব আর তার ত্রিসীমানায় নেই! বড় খেলা কি ঐ ধরণের কিছু থাকলেই ওরা লাঞ্চের পরই ষ্টুডিওতে সেটের মধ্যে দিত খান দুয়েক আরসোলা ছেড়ে আর সবাই সজাগ দৃষ্টি রাখত, সেগুলো যেন আবার সাহেব আসার আগেই না পালিয়ে যায়! উনি আরসোলা দেখলেই হৈ হৈ দিতেন আর ছুটির ভাবনা মুহূর্তে সকলের।

একবারকার একটা ঘটনা কিন্তু ভারি মজার। শনিবার লিগের মস্ত খেলা, মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গল, আর যদি কোন রকম ভাবে ড্রও করতে পারে তাহ'লেও মোহনবাগান লিগ পায়। সারা সপ্তাহ ঘোরাঘুরি ক'রে সবাই টিকিট করেছে আর শনিবার সকাল থেকে বলতে গেলে এক পায় দাঁড়িয়ে সময়মত ছুটি পাওয়ার অপেক্ষা করছে। বড় শিল্পী মারফৎ কথাটা বড়ুয়াসাহেবের কানে তুলে দেওয়া হয়েছিল আর উনি সময় মত স্যুটিং বন্ধ করার একটা মৃদু আভাষও দিয়েছিলেন। তিনটে নাগাদ দেখা গেল, উনি সট নিয়ে এমন মেতেছেন যে ছুটির কথা মনেই নেই আর কেউ বলতে গেলে মারধোর অবশ্যম্ভাবি। অগত্যা, আন আয়রোলা! আয়রোলা এল—এল একটা নয় দুটো, আর সেগুলো বেশ সদর্পণে ছাড়া হল ওঁর পায়ের কাছে। সবাই উৎসুক হ'য়ে অপেক্ষা করছে কখন সাহেবের নজর যাবে সেই দিকে! কিন্তু এমনই ওঁর কাজে মন যে একটা আয়রোলা কাঁধ থেকে বেড়ে ফেললেন অথচ নজরই গেল না! তারপর কোন এক সময় ক্যামেরার ধারে দিলেন দুটোকে এক সঙ্গে ছাড়িয়ে। সবাই তো মাথায় হাত দিয়ে বসল। টিকিটগুলো নষ্ট আর ম্যাচও পণ্ড! সেদিন কাজ শেষ হল সন্ধ্যার পর, মোহনবাগান জিতল আর উনি সবাইকে খাওয়ালেন—ছুটি দেননি বলে নয়, মোহনবাগান জিতেছে বলে নয়, আর কাজ ভাল হয়েছে বলেও নয়—আয়রোলা মাড়িয়ে জানতে পারেন নি বলে!!

আয়রোলার ভয়ে যে মানুষ ছুটে পালাতেন, সেই মানুষই আবার বাঘ শিকার করতেন পায়ে হেঁটে। তখন জানতাম যে উনি শিকারী। আরও জানতাম যে ওঁর হাতি বাহাদুর নাকি মোতলার মতন উঁচু আর উলটো রামধনুর মতন দাঁতাল। বহুবার ওঁর সঙ্গে শিকারে যাওয়ার আমন্ত্রণও পেয়েছি কিন্তু কোনবারই সেটা সম্ভব হয়নি। ওঁর সঙ্গে বন্দুক ছিল কিন্তু ওঁর মতন রাইফেল ছিলনা, তাই রাইফেলের দস্তার থেকে কিছু সরেই থাকতাম।

পরে জানা গেল যে উনি শুধু শিকারীই নন, অনৈক্য শিকারী। গৌরীপুরে গিয়েছিলাম ওঁর মারা যাবার প্রায় এক যুগ পর 'মাহুত বন্ধুরে' ছবির উপন্যাসক হ'য়ে। প্রযোজিকা ছিল প্রিয়ম হাজারিকা আর পরিচালক ছিল ভূপেন। ওদের দুজনের মতামত মিললে তবে আমাদের কাজ শুরু হবে বলে আমার ছিল অনন্ত অবসর আর আমি প্রায় সারাদিনই কাটিয়ে দিতাম পাহাড়ের ওপর টোপর প্রতীম প্রাসাদের কোনের ঘরে, যেখানে তখনও সাজান ছিল ওঁর বই আর কিছু নোটবইতে ওঁর জীবনের কিছু তথ্য তালিকা। তারই একটায় ছিল রাজবাড়ীর নিয়ম মাফিক উনি কবে কি শিকার করেছেন তারই অনুক্রমিক বিবরণ। তাতেই জানা যায় যে সাত বছর বয়সে প্রথম গাইশ মারার পর বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত উনি মেরেছিলেন সাতাশটা বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি। ওঁর ছোট ভাই লালজীর কাছে শুনেছি যে ঐ সাতাশটা বাঘ মারার পর হঠাৎ একদিন বড়ুয়া সাহেব হাতির পিঠ থেকে নেবে হাঁটতে আরম্ভ করলেন বাঘকে ধাওয়া করে। কি ব্যাপার? উনি বললেন,

● হাতির পিঠে বসে আর হাতিয়ার বাগিয়ে বাঘ মারা অন্যায়! মারবার আগে তাকেও সমান সুযোগ দেওয়া উচিৎ শিকারীকে মারবার। মানে, খেলাটা যখন জীবন ও মৃত্যুর তখন যুদ্ধটা হওয়া উচিৎ সমানে সমানে।

এই সাতাশ নম্বরের পর একশো তেইশ নম্বর পর্যন্ত যত বাঘ শিকার অর্থাৎ প্রায় সত্তরটা তার সবগুলোই পায়ে হেঁটে এবং বলতে গেলে বাঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সারা আসামে সকলেরই মত যে লালজীর মতন শিকারী নাকি হয়ই না। আবার সেই লালজীর মত যে ওঁর দাদার মতন শিকারী নাকি সহস্রের মধ্যেও একটা সহজে মেলে না।

এমন মানুষকেও আমি কাঁদতে দেখেছি। ব্যাপারটা ঘটেছিল ঢাকার রেডিও ষ্টেশনে। উনি ষ্টুডিওতে এলেন সকাল বেলায় রিহার্সাল করতে আর ঘরে ঢুকেই জানতে চাইলেন পরিচালকটি কে?

বললাম,

● কেন, আপনি।

উনি হতবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন,

● সর্বনাশ। তাও কি সম্ভব না কি? রেডিওর আমি র জানিনা। পরিচালক হব কোন সাহসে? থেমে বললেন,

● সাধারণতঃ কে পরিচালনা করেন?

মাথা চুলকে বললাম—

● আমি।

স-উৎসাহে উনি হাত বাড়িয়ে যেন স্বর্গই ধরে ফেললেন, বললেন,

● হয়ে যাক শুরু!

হল। নিতান্ত নাবালক শিল্পীর মতন উনি এই নতুন মাধ্যমকে জানতে চাইলেন। রেডিওতে নাটক করার টেকনিকটা শিখতে চাইলেন এবং সারা স্ক্রিপ্টে পেনসিলের দাগ টেনে উনি সমস্ত জিনিষটা যেন নখদর্পণে করে ফেললেন। দুদিনের রিহার্সালের দু দশটা নাটক রেডিওতে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা আমার আছে আর নাম পাওয়ারও সৌভাগ্য বহুবারই হয়েছে কিন্তু ওঁর মতন অমন নিঃস্ব করে কখন নিজেকে হারাতে পারিনি। আমার ষোল বছরের বেতার অভিজ্ঞতা, উনি একক এবং অদ্বিতীয়ম। নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন বাজতে আরম্ভ করল আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই সারা সহর ভেঙে পড়ল রেডিও যন্ত্রের গেটে ওঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। উনি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় অভিনন্দন গ্রহণ করলেন আর পরিচালক হিসেবে আমার পরিচয় সবার আগে দিলেন। বেতার অধ্যক্ষ ডঃ অমূল্য সেনকে বললেন,

● যা শুনেছেন তার সবটাই এঁর সৃষ্টি। আমি বাহক মাত্র!

অভিনন্দনের পালা শেষ ক'রে আমরা অফিস ঘরে এসে বসলাম। উনি পরম নিশ্চিন্ততায় একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন,

● এবার শোনা যাক তাহ'লে!

অবাক হলাম।

● কি?

উনি আরও অনেকখানি অবাক হলেন।

● কেন? নাটকটা।

● কি করে?

● কেন? রেকর্ড হয়নি?

হাসলাম। ছোট্ট করে বললাম,

● কৈ না।

নিরাশায় ওঁর কণ্ঠ রোধ হ'য়ে গেল।

● কেন ?

বাধ্য হয়ে পরিষ্কারেই বোঝাতে হল।

● রেকর্ডিংয়ের যে ব্যবস্থা আমাদের তাতে এক সঙ্গে পনেরো মিনিটের বেশী রেকর্ড করা সম্ভব নয়। তাছাড়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় ডিলক্স পাওয়া বলতে গেলে অসম্ভব।

● আপনার খারাপ লাগছে না ?

● কৈ ; না ; কেন ?

হঠাৎ মনে হল উনি রেডিওতে নেই, ঢাকায় নেই ; আমাদের কাছে নেই অন্য জগতে, অন্য সময়, অন্য কারোর সঙ্গে। অবাক হয়ে জানতে চাইলাম,

● কি হল ?

মাথা নাড়লেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের অন্ধকারে আরো কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে গেলেন। তারপর, ওঁর বন্ধন মুক্ত ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বললেন,

● আপনারা কোন জগতের মানুষ ?

হেসে বলি,

● কেন বলুন তো ?

● আমরা যে সৃষ্টি করি তার স্থায়ী মাফর আছে। আজ ছবি করি, কাল সেটা দেখা যাবে। বিশ বছর পর, মন চাইলে আবার দেখা যাবে। আর আপনারা ? সৃষ্টি করেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা শেষও হয়ে যায়। মন চাওয়া তো দূরের কথা, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও আর দেখা যাবেই না !

● না।

● অথচ তবু সৃষ্টির সাধনা করেন ?

● করি।

● কি সৃষ্টি করলেন তা জানেন না ? লোকের মন পান অথচ বুঝতে পারেন না, কেন পেলেন ?

হেসে বলি,

● না।

আমার কাঁধ দুটো ধরে আর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ভিক্ষা চেয়ে বললেন—

● আপনারা মানুষ নন, সত্যিকারের শিল্পী। বোধহয় তার চেয়ে বড় সাধক। ফলের আশা না ক'রে কাজ ক'রে যাওয়ার যে অনুশাসন আছে, আপনারাই তার অনৈক্য উদাহরণ।

থেমে বললেন,

● ইচ্ছে করছে আপনার পায়ের ধুলো নি।

লজ্জায় মরে গেলাম, আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম, আজ গরিমায় বেশ কিছুটা স্ফীতকায় হ'য়ে উঠলাম। যে বেতারটা এতদিন ছিল স্রেফ কেরানীগিরি, ওঁর কথায় এবং ব্যাখ্যার তাৎপর্যে এক নিমেষে সেটাই হয়ে উঠল সাধনার স্বপ্ন। আমারও মনে হল যে সত্যিই তো, এমন ভাবে তো কখন ভাবিনি ! ওঁর মূল্য-বোধের মানদণ্ডে আমার মনের একটা নতুন দরজা হঠাৎ যেন হাট হ'য়ে খুলে গেল আর আমার কাজের মধ্যে জীবনটাকে নতুন করে জানার রং লাগল। শিল্প জগতে ওঁর সৃষ্টির মূল্য যাচাই করার মন আমার নেই, আর ঐ দুরূহ কাজ করতে পারে এমন নিরপেক্ষ মানুষ আজকের ছায়াচিত্র জগতে আছে বলে আমার জানা [illegible] আমার মনেও আর একটা স্বাক্ষর আঁকি নিজে।

আর একদিনের ঘটনা বলি। দাদা দুপুর বেডিওতে রিহার্সাল দিয়ে, বিকেলের শেষ প্রান্তে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি জানতাম উনি বাড়ী গিয়ে বোতল খুলবেন, তাই সঙ্গে যাবার কোন বাসনাই আমার ছিলনা, কিন্তু উনি নাছোড়বান্দা। পার্ক সার্কাস রেসের খোলা গলি থেকে বেরিয়ে ডাইনে না গিয়ে উনি বাঁয়ে ঘুরলেন। এটা ওঁর বাড়ীর পথ নয় আর এদিকে কোন বার নেই কিন্তু বারবার প্রশ্ন করতে, প্রসন্ন হাসি ছাড়া কোন সহজ উত্তর পাওয়া গেল না। আউটরাম ঘাট পেরিয়ে গাড়ী থামিয়ে উনি গাছের তলায় দাঁড়ালেন আর অস্তমিত সূর্যটাকে দেখিয়ে বললেন,

● দেখুন। একদিন না উঠলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে অথচ যাওয়ার সময় এগিয়ে দেওয়ার মতন মানুষ নেই একটা!

অস্তমিত সূর্যকে অস্তাচলে এগিয়ে দেওয়ার কথা যে মানুষটা ভাবল, সে নিজে যখন গেল তখন একলাই গেল, সাহারা তো দূরের কথা সামান্ত সহানুভূতির সান্ত্বনাটাও পাবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।

না হওয়ার কারণও আছে। মন আছে এমন মানুষ এই ছায়াচিত্র জগতে অল্পই আছে। পয়সা-ওয়ালা পেছনের মানুষ, কি নামওয়ালা নন্দিত তারকা, মানুষ হিসেবে বলতে গেলে প্রায় সবাই মন হারিয়ে মনোমোহন। প্রায়তঃ অন্ত সব ব্যবসাতেই যাদের ওপর আদের অন্ত কিন্তু রেসের ময়দানের মতন ছবির জগতে সবটাই ভাগ্যের ভরসায় তাই অল্পায়াসে পাওয়া উথ অর্থ মানুষের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থটাকে যত প্রকট করে মনুষ্যত্বটাকে তত করে দৈন্যন। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য্যে অন্তের হিসেব যখন হারায়, চরিত্রের বাজাইও তখন ঘোচে। কালো টাকা আর কাগজের নামের, সেইটাই সবচেয়ে বড় কলঙ্ক।

বড়ুয়া সাহেব তাঁর শেষের কয়াদে কৃতঘ্ন শিল্পী সমাজ থেকে কিছুই পাননি আর আজ তাঁর সবটাই মুছে গেছে। কলকাতায় ছিদাম মুদির নাম আছে, চণ্ডি ঘোষ কে ছিলেন তা কেউ না জানলেও ষ্টুডিওর সব কটাই প্রায় চণ্ডিঘোষ রোডে। ওঁর বাড়ী 'মলেন' ষ্ট্রীটে, রাওবাড়ী 'বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে' আর যে ষ্টুডিওতে ওঁর বহু ছবি হয়েছে তা 'আনোয়ার শাহ' রোডের ওপর! আমরা রবীন্দ্র সদনের রং নিয়ে শোভাযাত্রা করে বক্তৃতা দি আর হাততালি কুড়োই, কিন্তু অতীতের ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করি। সিনেমা জগতের আমরা কি? সৌন্দর্য্যের সাধক, না, স্বার্থের সায়ক?

পরবর্তী লেখায় : বড় বাবু

পিছনের জানালায়

(হাফ ঘোষ)

"রামপদ মুখোপাধ্যায় বাংলার সাহিত্যের একজন যশস্বী লেখক। গল্পভারতীর প্রতি তাঁর একান্ত অনুরাগ ছিল। গোড়া থেকেই তাঁর বহু রচনা গল্পভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে। পরলোকগমনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে এই গল্পটি তিনি নিজে এসে দিয়ে যান। তাঁর স্মৃতি-স্মারক এই রচনাটি প্রকাশ করে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি।"

ছেলেবেলায় এক সময়ে কেমন একটা ঝোঁক চেপেছিল প্রাতঃস্নানের। অবগাহন স্নান। খালবিল পুকুরিণী কিংবা স্রোতস্বিনীতে নয়, একেবারে গঙ্গায়। উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য-সঞ্চয়, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে পুণ্যসঞ্চয়ই বা নয় কেন? কথাটা স্পষ্ট করার জন্য কিঞ্চিৎ ভূমিকা আছে। আমাদের গ্রামটা বারো মাসে তেরো পার্বণের পীঠভূমি। এখন অবশ্য পার্বণগুলি লায়শায়া গোছ করেই হয়—উপকরণ আনুষঙ্গিকে টান পড়ে। আমাদের বাল্যকালে প্রতিটি সন্ধ্যায় কোন গৃহস্থবাড়ীতে, কি দেবালয়ের নাটমন্দিরে রামায়ণ গান ও শ্রীভাগবতের আসর বসতো; পালে পার্বণে যাত্রা, পাঁচালী, মনসার ভাসান, তরজা, বাইনাচ, পুতুল নাচ এসবও বাদ যেতো না। তরজা, পাঁচালী কিংবা বাইনাচের আসর বসতো অনেক রাতে; সেই আসরে কিশোর ছেলেদের প্রবেশাধিকার ছিল না—এগুলিতে গল্পরস না থাকাতে আমাদের ভালও লাগত না। মনসার পালায় চমৎকার একটি গল্প ছিল, কিন্তু অধিক রাত্রিতে বসার দরুণ—পাঠাবস্থায় আমরা যেতে পারতাম না। আমাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করতো যাত্রার আসর। তখনকার দিনে এই আসর প্রায়ই খাওয়াদাওয়ার পর দিনের বেলাতেই বসতো এবং পূজা উপলক্ষ্যে বসতো বলে ইস্কুলের ছুটি থাকতো, সুতরাং যাত্রা শোনায় বাধা কখনো আসেনি। রামায়ণ গান বা ভাগবত কথা স্বল্পক্ষণের ব্যাপার। গোধূলি বেলায় বসে সন্ধ্যা উত্তরে এক প্রহর রাতের মধ্যেই শেষ হতো আর এই আসরগুলোই বছরের অধিকাংশ সময় জুড়ে থাকতো। সেই আসর ছেড়ে পড়াশোনা করতে খুব অসুবিধা হতো না। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, কার্তিক এবং মাঘ মাসে এই আসরগুলির ছিল বাঁধা বরাদ্দ, কখনও বা দশ পনেরো দিন জেরটানা হতো। তা হোক, এই সময়ে বাণ্মাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার চাপও উদ্বেগ না থাকাতে আমরা খুশি মনেই যোগ দিতে পারতাম। এই সব আসরে গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য-কীর্তন শুনে আমাদের কিশোর মনে সহজ-পন্থায় পুণ্য সঞ্চয়ের দুরভিলাষ হয়তো বা জেগে থাকবে। ক্রমে সেটা নেশার মত পেয়ে বসলো। এমনই প্রবল সে নেশা

যে রাত চারটের সময় উঠে দু' মাইল দূরের গঙ্গায় স্নান সেরে সকাল ছ'টার মধ্যে ইস্কুলে হাজিরা দিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয়নি। স্নানপর্বটা অবশ্য দল বেঁধেই সারা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যেমন লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্যটা হয় বড়, এখানেও তেমনি স্নানের নেশার সঙ্গে দল বেঁধে পথ চলা ও গান গল্প জমানোর আকর্ষণই ছিল বেশি। যাইহোক, সেই শেষ রাতের স্নানার্থী আমরা ছাড়া আরও যে দু' একজন ছিলেন—তাঁরা পঞ্চাশোর্ধের মানুষ, কোন যুবক ক্বচিৎ অরুণোদয়ে স্নানে আসতেন।

পঞ্চাশোর্ধ দলের একজনকে নিত্য দেখতে পেতাম যাত্রা, রামায়ণ গান অথবা কথকতার আসরে। এই, আসরগুলিতে উনি কোনদিন অনুপস্থিত থাকতেন না। খুবই সাধারণ মানুষ অথচ আমায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এর একটি মাত্র কারণ—পঞ্চাশোর্ধের এই মানুষটি দেখা হলেই আমার পায়ের ধুলো না নিয়ে ছাড়তেন না। তা কিবা পথে ঘাটে, গঙ্গাস্নানের পথে অথবা কথকথার আসরে নামবার আগে। খুবই সঙ্কুচিত হতাম, লজ্জা পেতাম। পঞ্চাশ বছরের এক বৃদ্ধ যদি পনেরো ষোল বছরের এক কিশোরে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ও মাথায় ঠেকায় তাহলে তার অবস্থা কেমন হয় কল্পনা করুন। হলই বা এই সন্তান যজ্ঞোপবীতধারী উচ্চবর্ণের প্রাপ্য-কয় বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম সঙ্কোচ যাবে কোথায়!

সঙ্কোচবশত পা সরিয়ে নিতে গেলেই লোকটি 'হা হা' করে উঠতো—আহা, করেন কি ঠাকুর মশায়, আপনাদের পায়ের ধুলো না পেলে তরবো কি করে—

আপনি বয়েসে বড়—

আমার সঙ্কোচকে আমল না দিয়ে তালুতে জিভ ঠেকিয়ে টক্ করে একটি শব্দ তুলে ও বলতো, কী যে বলেন! জাত সাপের আবার বয়স বিচার। ছোবল মারলেই বিষ।

ওর উপমা শুনে হাসি আসতো, ও কিন্তু গম্ভীর মুখে বলতো, হাসেন আর যাই করেন আপনারা ভৃগুমুনির জাত। নারায়ণের বুকে ওনার পায়ের ছাপ নেই? কথকঠাকুরের মুখে শোনেন নি?

সে উপাখ্যান শুনেছি বটে, গল্পের চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়নি। বয়সটা ভক্তিরস পরিপাকের অনুকূল ছিল না তো।

লোকটির নাম হারাধন—পদবী ঘোষ। ডাক নাম হাবু ঘোষ। পেশা তন্তু বয়ন—অর্থাৎ বৃত্তিতে তাঁতী। লেখাপড়া শেখেনি, বাংলায় নামসই করতে পারত না—একেবারে পুরোপুরি নিরক্ষর। কিন্তু আলাপ আলোচনায় ধরা যায় না। তার তাঁতঘরে আট ন' খানা তাঁত চলতো পাশাপাশি। দক্ষিণে জড়ানো সুতোর মাকুখান দিয়ে মাকু চালনার সময়ে মোলায়েম শব্দ উঠতো—তেমনি মোলায়েম গলায় গুন্‌গুন্ করে বেহুতরের সুর তুলতো তাঁত বুনিয়েরা। হাবু নিজে গান গাইত না—তাঁত ঘরে অল্পবয়সী যে ছেলেরা তাঁত চালাতো তাদেরই কণ্ঠ শোনা যেত। উৎসাহ ছাড়া হাবু। বলতো, হাতে কাজ করবি মুখে করবি ভগবানের নাম। আজে বাজে কচিকলি করে আখের নষ্ট করবিনে। খবরদার, আমার তাঁতঘরে ওসব চলবে না।

এই এক কড়ারে ওদের তাঁতঘরে বসতে দিত হাবু। বলত ঠাকুর মশায়, লেখাপড়া তো ইহজীবনে হলনা এখন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছি। জানেন দুটো কিরি (ক্লি শিপ) দিয়েছিলাম ইস্কুলে—গরীব ঘরবোর ছেলেগুলো তবু মানুষ হবে গাঁয়ের ইজ্জত বাড়বে।

কোনদিন বলতো, এই ছোঁড়াগুলোকে পই পই করে যদি—না'লে মনুষ্য জন্ম বিফলে যাবে। তা কে শোনে কার কথা! ঘরে ভাত নেই টো-টো করে ঘুরছে যত বয়খোয়াল আর বাঁদরামি! এখন ভাবছে ভারি মজা ভারি আরাম। আমরাও ওই বয়েসে তাই ভাবতাম। বাবা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে হাড়

এক ঠাই মান এক ঠাই করে দিতো—তবু কি মশায়ের পাঠশালায় গিয়েছি। যৌবনে কত যে বদ খেয়ালি করলাম কত টাকা অপব্যয় করলাম! থাকলে সে গুলো সৎকাজে যায় হতো। অদৃষ্ট! বুকলেন ঠাকুর মশায় অদৃষ্ট। না'লে অমন মতিগতি হবে?

শুনেছি চল্লিশের আগে পর্যন্ত হাক অপ্রতিহতভাবে দুর্গাস্তবনা চালিয়েছে। পৈতৃক টাকা কিছু ছিল মাথার উপরে ছিলনা অভিভাবক—আশে পাশে প্রলোভনের অভাব ছিলনা; বড়বাজারে মদ্য পল্লীতে ঘন ঘন যাতায়াত করার সঙ্গী সাথীও জুটেছিল, তবুও নারীর প্রভাব এড়াতে পারেনি হাক। বাড়ীতে এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে নিত্য কলহ কচকচি—ফলে মেজাজ ঠিক থাকত না। খারাপ মেজাজকে সুস্থ করতে এই পথটিই সার বুঝেছিল হাক। ছেলে ছিল না—দু'টি মেয়ে সংসারে এসেছিল, তবু স্বভাব শোধরাতে পারেনি।

এদিকে মেয়েরা বড় হচ্ছে সংসারে টাকার টান ধরছে। ওরা বিয়ের যোগ্য হচ্ছে, হাক বে-পরোয়া। এই নিয়ে একদিন স্বামীস্ত্রীতে তুমুল বচসা। বচসার শেষ রুপ স্ত্রীকে উত্তম মধ্যম দিয়ে হাক নিরুদ্দেশ হয়ে রইলো সেই ফু-পল্লীতে। কাটল এক সপ্তাহ। তারপর কে একজন খবর নিয়ে এলো তোমার পরিবারের শক্ত ব্যামো ডাক্তার বদ্যি না দেখালে বাঁচবে না—এই বেলা ব্যবস্থা করগে।

হাক যাব যাবই করছিল। কারণ এখানেও মনের পয়সা না দেখলে খাতির যত্ন মেলে না। হাতের কড়ি ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, মুখের লোহাগেও ধরেছিল টান। গরম গরম বাঁকা কথায় দুষ্টিও দুই এক পশলা হয়ে গেছে। নিজের মান বাঁচিয়ে হাক বাড়ী ফিরে এলো। বাড়ী এসে কি দেখলো? বৌ শয্যাগত, মেয়ে দুটো আধপেটা খেয়ে রোগা হয়ে গেছে, ভুঁকছে, আর দুই এক সপ্তাহ না খেতে পেলে মরে যাবে। দেখে হাকর মনটা হু-হু করে উঠলো। উপার্জনে মন দিলে। কিন্তু বউকে বাঁচাতে পারল না। আত্মানুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগল হাক—আমার অন্তর এমন হলো। আমিই মেরে ফেললাম বউটাকে।

শোককাতর হাক কেমন যেন হয়ে গেল। স্ত্রীর শ্রাদ্ধের সময় ওর অবস্থা দেখে পুরোহিত বললেন, এত কাতর হলে চলবে কেন বাবা। ভগবান তোমাকে যে কর্তব্য দিয়েছেন তাই করে যাও—এখন মেয়ে দুটোকে মানুষ মুনুষ করে পাত্রস্থা কর।

তিনিই উপদেশ দিলেন, কাজকর্ম শেষ হলে সন্ধ্যের সময় ভাগবতের আসরে গিয়ে বসবে! ভগবানের লীলার কথা শুনলে মন ঠাণ্ডা হবে, শান্তি পাবে।

তাঁরই উপদেশ মত কথকতার আসরে বসতে লাগল হাক। কী পরিমাণ পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে সে হিসাব করেনি কোনদিন—কিন্তু প্রাণে যে শান্তি এসেছে সে কি কম লাভ। কথক ঠাকুরের মুখে আরও অনেক সৎকর্মের কথা শুনলো -তার মধ্যে নিত্য গঙ্গাস্নান একটি। দানে পরমপুণ্য একথাও জানল। আরও জানল দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠদান হল—বিদ্যাদান। এই বিদ্যা না হলে প্রকৃত জ্ঞান হত না—ভাল মন্দ বিচার শক্তি জন্মায় না। অন্নদানও মহৎ দান, দেহের পুষ্টিবর্দ্ধক, কিন্তু তার চেয়েও উত্তম দান বিদ্যা—যা মনকে করে পরিপুষ্ট। বিদ্যালাভে অবহেলা করেছে হাক—তারই ফলে জীবনে বহু দুর্ভোগ হল—এখন বিদ্যাদানে তৎপর হল। মেধাবী গরীব ছেলেরা অর্থের অভাবে লেখাপড়া করতে পারে না—হাক তাদের পাঠ্যবই কিনে দিয়ে সাহায্য করতে লাগল। ওদের ইস্কুলের মাইনে দেওয়ার কথা চিন্তা করে এককালীন মোটা টাকা ইস্কুল কাণ্ডে জমা দিয়ে স্কলারশিপের ব্যবস্থা পাকা করলে। একটা স্কলারশিপ মায়ের নামে একটা স্ত্রীর নামে। তবুও

হারুর মনে সুখ নেই। কি করলে ছেলেরা অল্প বয়স থেকে সৎপথে আসবে, মতিগতি ভাল থাকবে সেই চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলো।

তখন আমি চাকরি করছি—সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-কর্মে মনোনিবেশ করেছি—সন্ধান পেয়ে হারু একদিন আমার কাছে এসে মনোভাব ব্যক্ত করল, ঠাকুর মশায়, একটা চিন্তা খালি মনে উঠছে কি করা যায় পরামর্শ দান তো।

একটু থেমে বলল, ছেলেদের জন্যে একটা কিছু করা যায় না—যাতে ওরা ভাল শিক্ষা পায়?

বললাম, ছেলেদের শিক্ষার জন্য তো ইস্কুল রয়েছে।

সে তো রয়েছেই—তা ছাড়া আর কি করা যায় যাতে বিকেল বেলাটা বাঁদরামি না করে এক জায়গায় থির হয়ে বসে পাঁচটা ভাল কথা শুনতে পায় ভাল আলোচনা করে। আমাদের কালেতে যেমন কথক ঠাকুর ভাগবত পাঠ করতেন—এখন তো সে সব উঠে গেছে তেমনি কিছু। একটা কিছু না করলে ওরা যে বকাটে হয়ে যাচ্ছে।

তুমিই বল না—কি করলে ভাল হয়? বললাম।

এই দেখুন মুখ্যু সুখ্যু মানুষ কি বলব বলুন তো। মনা বলছিল—ছেলেদের জন্যে লাইবেরী করলে ভাল হয়। কি বলেন আপনি?

চমৎকার কথা। উৎসাহে লাফিয়ে উঠলাম—বল কি হারু একথা তুমি ভেবেছ? বাঃ—এখনে তো খুব ভালই হয়। আমরাও ভাবছিলাম একটা লাইব্রেরী করব—

হারু বলল, সে তো আপনাদের জন্যে বড়দের জন্যে। ছোটছেলেদের জন্যে একটা করুন না।

বললাম, সে হলে তো ভালই হয়, কিন্তু বড়রা কি টাকা দেবেন তেমন। ওদের পড়ার মত বই যা থাকলে—

হারু বলল—তা'লে শুনুন—টাকা যা পারি আমিই দেব। আমার এই বাড়ীঘর সব লেখাপড়া করে দেব। পোষ্টাপিসে নগদ আছে হাজার টাকা সবটাই দেব। ঘরে বাসনপত্তর যা আছে—

ওর কথা শুনে আমি তো অবাক। বলে কি হারু, একেবারে যথাসর্বস্ব দান। এখন ওর বয়স হয়েছে—উপার্জনের শক্তি কমছে—তাঁতে মাকু ঠেলতে গেলে হাত কাঁপে সুতো ছিঁড়লে যেই ধরতে পারে না। এক সপ্তাহেও একখানা কাপড় বুনতে পারে না—সঞ্চিত অর্থদান করলে খাবে কি? ছেলে নেই, মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীতে যে যার সংসার নিয়ে মশগুল—হারুর উপায় কি হবে? হারু কার উপরে নির্ভর করবে?

আমার ভাবনার সূত্রটা আন্দাজ করে নিয়ে হারু হাসল। বলল, ঠাকুর মশায়, ভাবছেন সর্বস্ব দিয়ে দিলে আহার জুটবে কোত্থেকে, বয়স জোটাবো কি করে, অসুখ বিসুখ হলে ওষুধ পথ্যি হবে কি দিয়ে?

বললাম, না হারু ঠিক তা ভাবছিনে—তোমার দুটি মেয়ে রয়েছে হয়তো তাদের কাছে গিয়ে থাকবে—

সজোরে হেসে উঠলো হারু, বলেছেন ভাল ঠাকুর মশায়! মেয়ের শ্বশুরবাড়ী জামাই-এর ভাতে থাকব। কেন, কি দুঃখে? গ্রামের লোক আপনারা রয়েছেন তো—আমাকে চারটি পেসাদ দিতে পারবেন না একবেলা? সত্তর পেরিয়েছে আর ক'টা দিনই বা বাঁচব। এই গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাব না—ঠাকুর মশায়।

বললাম, হাক আমরা তো নতুন ছেলেমানুষ, আমাদের হাতে বিশ্বাস করে যথা সর্বস্ব দিতে পারবে তার চেয়ে ইস্কুলে আরও কয়েকটা ফ্রীশিপ দাও।

না ঠাকুরমশায়, ওখানে আর নয়। যাতে একসঙ্গে অনেক ছেলের উপকার হয় তাই করে দিন। আপনাদের ওপর আমার বিশ্বাস আপনারা ছেলেমানুষ বলেই বিশ্বাস করি, করতে পারবেন আপনারাই। বড়রা কাজ করে না—ভাঁওতা দিয়ে টাকা নেবার তাল খোঁজে। ওদের বিশ্বাস নেই।

আমি মুগ্ধ হয়ে বললাম, আচ্ছা—চেষ্টা করব। যাতে তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় সেই চেষ্টা করব।

সেই সপ্তাহে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে পরামর্শ করে একজন উকিলকে দিয়ে মোটামুটি একটা খসড়া ঠিক করিয়ে নিলাম। স্থির হল—পক্ষকাল মধ্যে ওটা যথারীতি পাকা করে নিয়ে কাজ সুরু করা যাবে।

কিন্তু মানুষের চিন্তার সঙ্গে বিধাতার অভিপ্রায় প্রায়ই মেলে না। পরের সপ্তাহে অসুখ হয়ে কলকাতায় যেতে হল, সেখান থেকে হাসপাতাল। একমাস কাটল হাসপাতালে। আরও একমাস পরে সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে শুনলাম—হাক ঘোষ মারা গেছে। তার স্ত্রীর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে দুই কন্যা। এবং তা নিয়ে রীতিমত কাড়া মারামারি চলছে। ব্যাপারটা নাকি শেষই আদালত পর্যন্ত গড়াবে যেহেতু দুপক্ষেই হিতৈষী পরামর্শ দাতা জুটে গেছে অনেকগুলি।

• • •

বাঘ যখন শিকারীর উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে মেরে ফেলে তখন বলা হয় এ পশুর হিংস্রতা, এই হিংস্রতার জন্যে বাঘ দেখলেই গুলি করে মারো। আর যখন মানুষ মানুষকে মারে যুদ্ধক্ষেত্রে বা বিপ্লব দমনে, সময় সময় অন্যায় যুদ্ধে অন্যায় ভাবে মারে, তখন বলা হয়, এই হচ্ছে মানুষের বীরত্ব।

বারনার্ড শ'

বিশেষ প্রতিনিধি

সুবোধ বসু

তিনদিন পরে তবে সত্যই সুযোগ এলো! বলা যেতে পারে, এর জন্যই বসেছিলাম। দশ ছেড়ে আর কালগুণে। দেখা পাবার কথা সতেরোই ফাল্গুন, গোধূলি সাতটায়। এখনও পুরো এক হপ্তা বাকি। তবু হৃদয়তন্ত্রীগুলি বাজতে শুরু করেছে, রক্ত চঞ্চল হয়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। কোনও প্রেমিক বোধহয় প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের আশায় এমন কম্পিত বোধ করেন নি। কারণ সতেরোই তারিখে মুকুল সুসজ্জিত বসন্ত সন্ধ্যায় যার সঙ্গে মিলন হবে তিনি একজন সাধারণ প্রেয়সী নন। তিনি লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রাণের আশার মুকুল ফুটিয়ে তোলেন তাঁর বিলোল কটাক্ষে, তাঁর যৌবনোচ্ছল সাবলীল দেহ ভঙ্গিমায়, তাঁর বিদগ্ধ শিল্পচাতুর্যে। দেশবিখ্যাত তারকা মন্দালিকা দেবীর কথা বলছি।

আমি প্রসিদ্ধ 'ছায়াভুবন' কাগজের জনৈক সহকারী সম্পাদক। প্রুফ সংশোধন আমার প্রধান কাজ হলেও মন্দালিকা দেবী ও অন্যান্য বহু চিত্র তারকার প্রতিভার প্রচারের কোনও সুযোগই আমি ছাড়ি নাই। প্রধান সহকারী সম্পাদক নিবারণ বাবুর সঙ্গে আমার এ নিয়ে রীতিমত রেষারেষি ছিল। নিরপেক্ষ পাঠক ও বন্ধুরা প্রায় সবাই স্বীকার করতেন যে আমার ব্যবহার করা বিশেষণগুলি অনেক বেশি বর্ণাঢ্য ও জমকালো হতো। কিন্তু তা হলে কি হবে, আমার পেছনে মুরুব্বির ছিল না। তাই নিবারণ বাবুই খাতির পেতেন বেশি. বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সর্বদাই নামী তারকাদের সঙ্গে ইন্টারভ্যুতে যেতেন তার বিবরণ তার স্বনামে বের হতো 'ছায়াভুবনের' বহুপঠিত পৃষ্ঠাগুলিতে। আমার ভাগ্যে বড়জোর চুনোপুঁটি জুটত—যাদের সম্বন্ধে পাঠকদের আগ্রহ সামান্যই। ফলে সেগুলি ছোট ছোট খবর হিসেবে বের হতো, সংগ্রহকারকের নাম বাদ দিয়ে।

নববর্ষ সংখ্যা বের হবার মাত্র দু'মাস বাকি। এদিকে নিবারণবাবু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অন্য সহকারীদের কাজ আগে থাকতেই নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া আছে। ফলে, বেড়ালের ভাগ্যে শিঁকে ছিঁড়ে পড়ল। মন্দালিকা দেবীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো।

ইতিমধ্যে আমার 'স্টোরী'র ভূমিকা আমি তিনবার লিখে তিনবার সংশোধন করেছি, তবু মনঃপুত হচ্ছে না। বিশেষণ দিয়ে কি পুষিব তোমারে, চিত্রজগৎই তোমারই বিশেষণ! গানের লাইনগুলি সামান্য পাল্টে নিজের মনে আবৃত্তি করতে থাকলাম বারবার। আমি বিশেষণের উপর মাত্র ভরসা না করে মন্দালিকা দেবীর আর্টিস্ট জীবনের বিভিন্ন উৎকর্ষ আবিষ্কার করবার অন্যত্র চেষ্টায় নিযুক্ত হলাম। কোনও রিসার্চ স্কলার তার অনুসন্ধানের বিষয়ে অধিকতর নিষ্ঠা সংগ্রহ করতে পারতেন না। তাদের কারও বিষয়ই আমার বিষয়ের মত আকর্ষণীয় নয়।

নিছক ইন্টারভ্যুর মুখবন্ধ আগে থাকতে তৈরি করে ইন্টারভ্যুর রিপোর্টটি যথাযথ তাতে জুড়ে দেব, এই প্ল্যান নিয়েই আমি কাজ করে যাচ্ছি। দর্শনের গোড়াতেই হোক বা ইন্টারভ্যু শেষেই হোক, আমার মুখবন্ধটি তাঁকে পড়ে শুনিয়ে দেব, তাও স্থির ক'রে রেখেছি। এজন্যই এটি রচনায় এতটা যত্ন নিতে হচ্ছে।

আমার চতুর্থ খসড়া থেকে প্যারাটি আমি একটু জোরে আবৃত্তি করেই পড়তে লাগলাম: "মন্দালিকা দেবী শুধু অপরূপ নিন্দিত রূপ ও কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী নন। তাঁর স্বপ্নালস চোখের দৃষ্টিতে অপূর্ব জগতের নানারহস্যময় ইঙ্গিত ভেসে আসে। অভিনয় কলায় নব নব ভঙ্গিতে হিস্টিরনিক আর্টের নতুন কর্ম যেন আত্মপ্রকাশ

করছে তাঁর প্রতিভার প্রদীপের কম্পমান আলোকরেখায়···এই অনিন্দিতা অভিনেত্রীর নব নব অবদানে কিন্নরিণ্ণি যে অচিরেই নতুন উৎকর্ষ, নতুন ব্যঞ্জনা ও বিভঙ্গ লাভে সমর্থ হবে তাতে আমার সন্দেহ মাত্র নেই।"

ভাবছি এতে আরও দু একটা বাক্য যা রহস্যগর্ভ কল, জুড়ে দিয়ে প্যারাটাকে আরও উত্তেজক ও প্রত্যাশিত করে তোলা যায় কিনা। হাতে আর দু'দিন মাত্র সময়। এর মধ্যেই যা করবার করতে হবে।

'আপনি এলেন কি করে এখানে? দারোয়ান আটকায় নি? না ব্যাটা গেটে ছিল না?'

কার্পেটে মোড়া মজা-আঁকা টাইল্‌স বসানো সিঁড়ি দিয়ে একতলার সুসজ্জিত লবী থেকে দোতলার দরবারী খাসের সামনে হাজির হওয়া মাত্র বারো আনা চার-আনা চুলছাঁটা বাটার-ফ্লাই গোফ-শোভিত এক বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মোটাসোটা কালো ভদ্রলোক তার বসন্তের দাগ ভরা মুখে বিরক্তি এবং চোখে উদ্যত প্রশ্ন নিয়ে আমার হাত দুয়েকের মধ্যে হাজির হলেন।

'আমি ছায়াভুবন থেকে আসছি। মন্দাকিনী দেবীর সঙ্গে ইন্টারভ্যু করতে।'

'ওঃ মিঃ চাকলাদার। মাফ করবেন। আপনাকে কখনও মীট করিনি, তাই চিনতে অসুবিধা হয়েছে।' ভদ্রলোকের মুখের বিরক্ত ভাব বিনীত আপ্যায়নে ভরে উঠল।

'আপনি কি মন্দাকিনী দেবীর' তাঁর পরিচয়টা জানবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে প্রশ্ন শুরু করেছিলাম, কি বলে সমাপ্ত করব, ঠাহর করতে পারছিলাম না: মন্দাকিনী দেবীর এক বুড়ো বাবা আছে শুনেছি। ইনি সেই বাবা হওয়ার মত যথেষ্ট বুড়ো নন। কিন্তু ডাইরেক্টর হরিৎ চৌধুরীর সঙ্গে মন্দাকিনী দেবীর বন্ধুত্বের কথা সুবিদিত; কিন্তু হরিৎ চৌধুরীকে আমি চিনি।

'আমি মন্দাকিনীর সঙ্গে থাকি।' ভদ্রলোক আমার দ্বিধা দূর করে দিলেন। 'মানে থাকি। আমার টাকার তার দু দুটো ছবি, হচ্ছে—'বিজয়িনী' আর 'শুচিস্মিতা'। আপনাদের কাগজে তো দুটোরই বহু ফ্রীল ছাপা হয়েছে···'।

'হয়েছে বৈকি।' আমি বললাম। কিন্তু আপনিই যে প্রডিউসার গুপ্তসাধক সাহা তা বুঝতে পারিনি। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে বড় আনন্দ হলো···'।

'আসুন। ভেতরে এসে বসুন।' গুপ্ত সাধক খাতির করে বললেন। 'মন্দাকে খবর পাঠাচ্ছি। এতক্ষণে বোধহয় তৈরি হয়ে গেছে। মেয়ে মানুষের কথা আর বলবেন না মশায়। যতই নাম খ্যাতি হোক স্বভাব বদলাবে না। দুপুরে সেনেটি গিয়েছিলাম। দুটো গঙ্গার ইলিশ নিয়ে আসি ব্ল্যাক মার্কেটের দামে। সেই ইলিশ নিজের হাতে না কেটে ছাড়বে না। মোক্ষদা ঝিয়ের ওপরও ভরসা নেই। পেটিগুলো পাতলা করে কেলবে।···বেয়ারা, বেয়ারা—মেম সাহেব কোথায় আছেন? বলো, ছায়াভুবন কাগজ থেকে মিঃ চাকলাদার এসেছেন···।'

সিনেমার সেটের উপযুক্ত করে সজ্জিত উপর তলার বসা-কামরায় স্টেনলেস্ স্টিলের কৌচের রেক্সিনে ঢাকা গদীতে গুপ্ত সাধকবাবু আমাকে প্রায় ঠেলে বসিয়ে দিলেন। অভ্যর্থনার ত্রুটিতে খুশি না হয়ে উপায় নেই। ছায়াভুবন কাগজের সার-এডিটরী যে কতটা মূল্যবান, তা হাড়ে হাড়ে গদির আরামে টের পেলাম।

'চা না কফি?' গুপ্ত সাধক জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি ব্যস্ত হবেন না।' আমিও বিনয় করে বললাম। 'মন্দাকিনী দেবীর সঙ্গে ইন্টারভ্যুর জন্যই আমি ব্যস্ত···আগে তারই ব্যবস্থা করে দিন···।'

'সেটা তো আছেই। তবে কি জানেন, মেয়েদের দেওয়া সময়ের ওপর ভরসা করবেন না। ছটায় সময় দিয়েছেন বলে সেটা যে আটটায় পৌঁছাবেন', তার কিছু নিশ্চয়তা নেই। বরঞ্চ পানাহারের দিকে মনোযোগ দিলে অপেক্ষাটা আর অসহনীয় মনে হবে না।···বেয়ারা, বেয়ারা··· ।

গুপ্তসাধক যতটা ভয় দেখিয়েছিলেন, অপেক্ষা কিন্তু ততটা দীর্ঘ হলো না। মাত্র মিনিট চল্লিশেক পরেই বেশ নাটকীয় ভাবে মন্দালিকা দেবীর প্রবেশ হলো কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত অবস্থায়। কুকুরটি পোষা ল্যাপ-ডগ্ আর আক্রমণও নেহাৎই ভালবাসার আক্রমণ। দুজনেই প্রচুর আওয়াজ করছে। 'দেখুন তো কি অত্যাচার। বলে ভয়ের ভঙ্গিতে মন্দালিকা দেবী আমার বাঁ দিকের কৌচটার কাছে ছুটে এটে এলেন এবং দু'বার হিল্লোলিত পাক খেয়ে তাতে একেবারে যাকে বলে ছিন্নমূলদ্রুমের মতো ধপাস করে বসে পড়লেন। 'দেখেন তো আপনাদের কাগজে টেবীর বিরুদ্ধে দু লাইন লিখে। তবেই যদি ওর শাস্তি হয় ···'

ইতিমধ্যে টেবী কুকুর আহ্লাদে ছেলের মতো পেছন পেছন ছুটে এসে একলাফে দেবীর কোলে চড়ে বসেছে। চোখ মিট মিট করে লক্ষ্য করছে আমাকে—যেন ভাবছে অপরিচিতের প্রতি একটা প্রতিবাদধ্বনি ছাড়বে কিনা। আমার কিন্তু টেবীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। ওরই কৃপায় সূচনাতেই দেবীর এই মনোহর মূর্তি দেখতে পেলাম, যে মূর্তি যে কোনও চলচ্চিত্রের দৃশ্যকেই সুষমান্বিত করে তুলত।

'বড় আস্কারা দাও তুমি এটাকে।' গুপ্তসাধক একটু আক্রোশের সঙ্গেই বল্লেন। 'আমার হাতে ছেড়ে দাও। উচিত শিক্ষা আমিই দিয়ে দেব···'

'তার আগে ওকে নিচে থেকে একটু ঘুরিয়ে আনো।' মন্দালিকা দেবী হুকুম করলেন। 'অনেকক্ষণ ঘরে বাইরে যায় নি। এর পর কার্পেট নষ্ট করবে···' চোখে দুষ্টু চাউনি, কণ্ঠস্বরে আদর।

গুপ্তসাধক কুকুরসহ বিদায় হবার পরই আমাদের সত্যিকারের ইন্টারভ্যু শুরু হলো। ইতিমধ্যে বেয়ারা ককি কেক্ পেস্ট্রি পকৌড়া প্রভৃতি নিয়ে এলো। দেবী স্বহস্তে তা আমাকে পরিবেশন করলেন।

'ছেলেবেলায় কি আপনি সবচেয়ে পছন্দ করতেন? গান, কবিতা, অভিনয়?···'

'কি পছন্দ করতাম মনে নেই। কি অপছন্দ করতাম, বেশ মনে আছে। মানে বাসন মাজা!'

'বাসনও মাজতে হতো আপনাকে!' আহত ও স্তম্ভিত হয়ে বল্লাম। এই গৌরব হাতে তা যে করা যায় তা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

'সে কি একটি দুটি বাসন। কাড়ি কাড়ি! তাছাড়া দোতলায় শেষ ঘরে কাপড় কাচা, ঘর মোছা···'

'কাগজে পড়েছি, আপনি খুব অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলি থেকে এসেছেন। সংসার কাজ করাত কি?'

'নিজের বাই ছিল। কিন্তু সে বেচারি বা করে কি। এগারোটি ছেলে মেয়ে। তিনি কোন্ দিক সামলাবেন। তবে হ্যাঁ, ফ্যামিলি অ্যারিস্টোক্রেটিকই ছিল। সব সিনেমা অ্যাকট্রেসই অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলি থেকে আসে। বাবাও একজন অ্যারিস্টোক্রেট ছিলেন। জজ কোর্টের কেরানীরা চার আনা আট আনা ইঙ্গিতেই লম্বা হয় তিনি এক টাকার কমে কথা বলতেন না···'

চোখে আবার সেই দুষ্টু হাসির ঝলক। এমন আকর্ষণীয় দৃষ্টি আমি আর দেখিনি। তাঁর অ্যারিস্টোক্রেসি সম্বন্ধে উচ্চধারণা চুরমার হলে কি হবে। এই অপূর্ব অবর্ণনীয় চাউনিই আমাকে তাঁর প্রতি উচ্চধারণা অটুট রাখায় সাহায্য করল।

'আটের প্রতি আমার আশৈশব আকর্ষণ ছিল নিশ্চয়ই।' পটলাও দেখার বাতা বাঁ হাতে উঁচু

করে বললাম। জবাব আসার আগেই পাশের কামরায় আবার কিং কিং কিং করে' টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। গত পঁচিশ মিনিটের সাক্ষাৎকারের মধ্যে এই নিয়ে মন্দালিকা দেবীকে চতুর্থবার টেলিফোন ধরতে উঠে যেতে হলো। এটা তাঁর জনপ্রিয়তাই সূচিত করে মনে মনে হাসলাম। প্রতিবারই তিনি দু'তিন মিনিট পরেই ফিরে এসেছেন এটা তাঁর দৌজন্য এবং অন্যের প্রতি বিবেচনারই পরিচয় দিল।

'হাঁ, কি বলছিলেন', ফিরে এসে নিজের কৌচে আসীন হয়ে তিনি বলেন, 'আর্ট! না বাবা, আর্ট টার্ট কিছু বুঝতাম না। সব চেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল, তেঁতুলমাখা আর কুলের আচার। মাছও খুব ভালবাসতাম···'

'অভিনয় করতে নিশ্চয়ই পছন্দ করতেন···'

'অভিনয়ের অ-ও জানতাম না। একবার মজুর সঙ্গে চুপে চুপে পাড়ার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম বলে বাবা যা গড়মপেটা করেছিলেন।'

'তবে অভিনয়ের লাইনে এলেন কি করে'? আমি মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলাম। 'আপনি নিশ্চয়ই পরিহাস করছেন।'

'এলাম আবার কি করে,' দেবী উদাসদৃষ্টিতে চেয়ে বলেন। 'এই সব বাবুরা টেনে এনেছেন, তা ছাড়া আর কি!' বলে নিচের বাগানে যেখানে গুপ্তসাধক তাঁর সাথের ঋত্বিককে নিয়ে হাঁটাচ্ছিলেন সেদিকে সহাস্য ইঙ্গিত করলেন।

'আশ্চর্য! আপনি নিজেই জানতেন না কত বড় আর্টিষ্ট আপনার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।' আমি বিস্মিত বিমুগ্ধ হয়ে বললাম। 'আপনার অতুলনীয় অভিনয়-কলায় আপনি সকলের চিত্ত জয় করে নিয়েছেন···'

'বটে! তবে এরা শাসায় কোন্ সাহসে বলুন তো?' বলে বেশ দুষ্টুমি ভরা সুরে আমার দিকে সহাস্যে তাকালেন দেবী। (এমন মধুর হাসি আমি তাঁর ছবিতে নায়কদের প্রতি বর্ষিত হতে দেখেছি।)

'শাসায়! কারা? কি শাসায়?' তাঁকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত আছি এই রকম একটা কণ্ঠস্বর প্রায় অজ্ঞাতসারেই আমার গলা দিয়ে বের হয়ে এলো।

'কারা আবার। এরাই। এদের দল।' আবার গুপ্তসাধকের দিকে ইঙ্গিত করলেন মন্দালিকা। 'বলেন। পপুলারিটি! একদিনে উড়িয়ে দিতে পারি। বুড়ো আঙুল টিপ্‌লে প্রচার বন্ধ হবে, বিজ্ঞাপন বন্ধ হবে, ছবিতে হিরোয়িন হবার সুযোগ হাওয়া হয়ে যাবে। মন্দালিকা দেবী আবার মানদাবালা হয়ে বাসন-মাজা শুরু করবেন···'

স্তম্ভিত হলাম। যেন ছুরিকাঘাত পেলাম। এত বড় সাধ্য এদের যেশবন্দিতা এত বড় আর্টিস্টকে এরকম পশুসুলভ হুমকি দেখাতে সাহস করে!

'এরাই একমাত্র প্রডিউসার নয়।' আমি প্রতিবাদের কণ্ঠে বললাম। একবার ছেড়েই দেখুক না। শত শত প্রডিউসার আপনাকে লুফে নেবার জন্য ছুটে আসবে। প্রডিউসার যাবে আসবে, উঠবে, ফতুর হবে। কিন্তু আপনি চিরকালের···

'নিন। এটা খান। চকোলেট।' মোড়ক খুলে দেবী একটা চকোলেট আমার হাতে গুঁজে দিলেন। 'আপনিও দেখছি হরিতের মত কথা বলেন। ডিরেক্টর হরিৎ চৌধুরি। সে-ও বলে, এরা ক' জনই তো ফিল্মপ্রডিউসার নয়। আরও অনেক আছে। এরা ছাড়লে তোমার অভাব লুফে নেবে। অথচ সে নিজেই

সব সময় ভয়ে ভয়ে আছে এদের চটাতে সাহস করে না। ওর সুযোগ, ওর খ্যাতিও এদের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে…'

কিছুটা প্রসঙ্গের মোড় ফেরাবার জন্য এবং কিছুটা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, 'কিছু যদি মনে না করেন। তবে একটা প্রশ্ন করব। স্টুডিও মহলে জোর গুজব, আপনি হরিৎবাবুকে বিয়ে করছেন। কথাটা কি সত্যি? হলে অন্তত আমি খুব খুশি হবো। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন হবে…'

'ও হরি!' মন্দালিকা কৌতুক বোধ করে বলেন, 'আপনি দেখি আবার ওরই মত বোকা! এমন চট্ করে কেউ বিয়ে করে—মানে পুরুষের সঙ্গে যাদের মেলার সুযোগ হয় তারা? দেখব, পরখ করব, যাচাই করব, তবে তো বিয়ের প্রশ্ন। তার উপর কেরীয়ারের কথাও বিবেচনা করতে হবে। আগে যে সমস্যার কথা বলেছি, এখানেও সেই সমস্যার উদয় হবে—অনেক শক্তিশালী ব্যক্তিকে চটাতে হবে। তাতে স্টারের স্টারত্ব নিয়েই টানাটানি! তা ছাড়া বাবা মা'র কথাও ভাবতে হয়। তারাই কি চাইবেন, এমন চট্ ক'রে বিয়ে করে নিই…'

'বলেন কি।' আমি আবার স্তম্ভিত হয়ে বললাম। 'বাপ-মা তো মেয়ের বিয়েই চান।'

'যারা আমার মত এত টাকা উপার্জন করে না, তাদের বাপ মা চান। সবাইকে এক কোঠায় ফেলেন কেন? কিন্তু দাঁড়ান, টেলিফোনটা ধরে আসি। তারপর এসে বলছি।'

রাত সওয়া নটারও পরে যখন বাড়ী ফিরে এলাম তখন মাথাটা রীতিমত গুলিয়ে উঠেছে। শহরের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে উত্তরপ্রান্ত পর্যন্ত দোতলা বাসের সামনের আসনে প্রায় একঘণ্টা কাল কাটিয়ে এসেও তা ঠাণ্ডা হয় নি। মন্দালিকা দেবী রূপ ও ভক্তির তরঙ্গে মাথার এই বিপর্যয় ঘটান নি। তাঁর বিনয়, ভদ্রতা এবং আন্তরিকোচিত ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। চলে আসবার আগে তিনি গরম গরম দু টুকরো ইলিশ মাছ ভাজা পর্যন্ত খাইয়ে দিয়েছেন। (এগুলি তাঁর নিজের পেলব আঙুল দিয়ে কাটা মনে করে গঙ্গার ইলিশমাছের স্বাদ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল)। কিন্তু তবু কোথায় যেন খটকা।

তাঁকে আমি, আমাদের কাগজের পাঠক পাঠিকা এবং বাংলাদেশের সিনেমা-ফান্ সাধারণ রোমাঞ্চদের রোমান্টিক তরুণী হিসাবেই জানি। এখন তাঁর অ-রোমান্টিক মতামতগুলি যদি যথাযথ লিখতে চেষ্টা করি, বা তাঁর গার্হস্থ্যজীবনের মানদা নামটি যদি ছাপার হরফে প্রকাশ অথবা তাঁর ইলিশমাছ কাটার কাহিনীটি যদি সমস্ত খাঁশ এবং রক্ত সহ পরিবেশন করি, তবে তার ফলাফল শুভ হবে কি? কর্তারা কুপিত হবেন, পাঠক ও দর্শকেরা রূঢ় আঘাত পাবেন এবং হয়তো বা দেবীর নিজের স্বার্থও বিপন্ন হয়ে উঠবে। সাংবাদিক হিসেবে এ বিষয়ে আমার গুরুদায়িত্বের কথা ভেবেই মাথা গরম হয়ে উঠেছে। এখন কি কর্তব্য?

কালই সম্পাদক মশাইয়ের পদে এই বিশেষ সাক্ষাৎকারের বিবরণী পেশ করতে হবে। মাত্র একটি রাত আমার হাতে। এরই মধ্যে কাট-ছাঁট করে কপি রেডী করতে হবে। সুতরাং, হে মা ভারতী, দয়া করো। বিশেষণের ভাণ্ডার আজ এই হীন সেবকের কলমের তলায় উজাড় করে দাও। দেবী মন্দালিকার যেন এমন একটি কণ্টকবিবর্জিত স্নিগ্ধ মোহিনীমূর্তি বিশেষণ অলঙ্কার বিভূষিত করে পাঠক সাধারণের পদে ফেলে ধরতে পারি যা থেকে তারা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। প্রকৃত মন্দালিকার সঙ্গে তা যদি পুরাপুরি না মেলে তবে ক্ষতি কি? এ-জগতে সবই তো মেকী।

পরিবার পরিকল্পনা

ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়

সারা অফিসময় সরগোল। চলেছে আজ কদিন ধরেই। পরিবার পরিকল্পনার নূতন অফিসার অজয় সেন যেদিন থেকে এই ক্ষুদ্র বিভাগটির অধিকর্তা নিযুক্ত হয়ে এসেছে, সরগোল শুরু হয়েছে সে দিন থেকেই। কেরাণীকুল সব আকুল হয়ে পড়েছে এর নিত্য নতুন বিধানে। দু-তিন ধাপ ডিঙিয়ে অফিসারের পদে প্রমোশন—একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ। এতখানি সম্ভাবনা অজয় সেন কল্পনা করেনি। তাই সুরু থেকেই সে হয়ে উঠেছিল একটু বেশী সতর্ক, একটু বেশী নিয়ম তান্ত্রিক। মন্ত্রীর ভাষণ অথবা বড় কর্তাদের অনুশাসন সে মেনে চলত অক্ষরে অক্ষরে। কেরাণীকুলের আকুলতা এইখানেই। গভর্ণমেণ্টের চাকুরে তারা, বাঁধন কোনখানে নাই। হঠাৎ অজয় সেনের আটনে সব হক চকিয়ে পড়ে গিঁড়িতে। করিডোরে অথবা ফটকের সামনে দেখা হলেই তারা নিঃশব্দে বাঁকা হাসি হেসে তর্জনী তুলে দেখায়-কেউ দুটা আঙুল, কেউ তিনটা আবার কেউ বা হতাশ ভঙ্গীতে মুখ বিকৃত করে দেখায় চারটা। ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। পরিবার পরিকল্পনার অফিস। মন্ত্রীমহোদয়ের নির্দেশে এদেরও পদোন্নতি বা অবনতি নির্ভর করছে পরিবার পরিকল্পনার উপর। দুটা আঙুল যারা তুলে ধরে তারা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় তাদের সন্তান সন্ততির সংখ্যা দুই, তিনটা আঙুলের ইঙ্গিত তিন। এদের মুখ হাসি হাসি। যাদের চার, বিকৃত মুখ তাদেরই। ভবিষ্যৎ তাদের অন্ধকারময়। এই নাকি মন্ত্রীমহোদয়ের নির্দেশ। এই কথাটাই অজয় সেন জানিয়ে দিয়েছে তার অবশিষ্ট কর্মচারীদের। তিন নম্বরদের ডেকে ইঁসিয়ার করে দিয়েছে—জাস্ ফার এণ্ড নো ফার্দার দ্যাট স্টেপ। অর্থাৎ এইখানেই তোমাদের থতম করতে হবে বন্ধু। আর এক পা এগিয়েছ কি বিপদ।

অফিসের সিনিয়র ক্লার্ক বিভূতি বাবু অবসর গ্রহণ করেন। তার জায়গায় প্রমোশন দিতে হবে একজনকে। এখানে পারদর্শিতা, কর্মজীবনের প্রবীনতা বা যোগ্যতা প্রধান বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য সন্তান সন্ততির সংখ্যা এবং বংশানুগতিক ধারা। পিতৃকুল বা মাতৃকুল স্ফীতায়তন বা অস্ফীতায়তন এমন কি তাই ভগ্নীদের কুলও সম্প্রসারণশীল কি অ-সম্প্রসারণশীল এই সব সমীক্ষা সুরু হয়ে গেছে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এ প্রমোশনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা অফিসের কর্মী গণেশ ঘোষের। কিন্তু তাকে ডেকে সেদিন জানিয়ে দিল অজয় সেন, আপনার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে মিঃ ঘোষ। কিন্তু উপায় নেই। এক্ষেত্রে আমি অপারগ।

গণেশ ঘোষ চকিত হয়ে প্রশ্ন করে, কেন স্যার, আমি ত তিন নম্বরের দলে আপনাদের আইনে 'জাস্ ফার' ত এই পর্যন্ত। তবে প্রমোশন আটকাবে কেন?

অজয় সেন স্মিত মুখে বলে, তিন নম্বরের দলে হলে আমি খুশিই হতেম মি ঘোষ। কিন্তু আপনি না তিন না চার।

—তার মানে?

—মানে আপনার পারিবারিক ইতিহাস। সম্প্রতি আপনি তিন নম্বরে অন্তর্ভুক্ত হলেও খবর যা পেয়েছি তাতে চার নম্বরের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে আপনার বিলম্ব হবেনা। হাজিম যখন আমাদের তখন সব দিক বিবেচনা করে কাজ করতে হবে আমাকে।

গণেশ ঘোষ খোঁৎ খোঁৎ করতে করতে বলে, এ অন্যায় স্যার, ঘোরতর অন্যায়। পারিবারিক গোপনীয়তা এভাবে পাঁচ কানাকানি হওয়া আমি পছন্দ করি না। এর আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। এ নিশ্চয়ই বক্সা হতভাগার কাজ। দিন রাত ঘুর ঘুর করছে আমার বাড়ীর আনাচে কানাচে। সেই লাগিয়েছে এসব কথা। পা-র মাথা যদি না ভাঙি তা কি বলেছি আমি। বলতে বলতে সে উত্তেজিতভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এর পর ডাক পড়ে বক্সা মিত্রের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের। দু নম্বরের অন্তর্ভুক্ত সে। গণেশ ঘোষের পরই দাবী তার। সেই লাগিয়েছে গণেশ ঘোষের কথা। শ্রীমতী ঘোষের মাতৃসদনে যাবার কথা। নিজের পথ পরিষ্কার করতে গিয়েছিল সে। কিন্তু জল ঘোলা করাই হ'ল সার।

ঘরে ঢুকে মিনিটারী কায়দায় শুভ মর্ণিং করে সে দাঁড়ায় অজয় সেনের সামনে। অজয় সেন মুখ তুলে আপাদমস্তক একবার দেখে নিল তাকে। তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, সরি মিঃ মিত্র, আপনার কেসকেও রেকমেণ্ড করতে পারলাম না আমি।

বঙ্কিমের মুখ শুকিয়ে আসে। ঢোক গিলে বলে, কেন স্যার?

—অন্তরায় হয়েছে আপনার পারিবারিক ইতিহাস। এক বিরাট স্ফীতায়তন এবং সম্প্রসারণশীল পরিবার। রেকর্ড থেকে দেখতে পাচ্ছি, আপনার পিতৃব্যের সংখ্যা দশ, পিতৃস্বসা তিন। মাতুল বংশও দেখছি সাত মামা, চার মাসী। আপনারাও সাত ভাই পাঁচ ভগ্নী। বড় ভাইয়ের পুত্র কন্যার সংখ্যা নটি। মেজ ভাইয়ের দেখছি আটটি। উপস্থিত আপনার দুই বটে কিন্তু আপনার স্ত্রীর দিক দিয়ে অবস্থাটা বিশেষ স্বস্তিকর বলে মনে হয় না। তাঁর পাঁচ ভগ্নীর মধ্যে বড় ভগ্নীর আন্ত্রিক ইতিমধ্যেই সাতটি। মেজ একজের ঘরে এখনও টিকে আছেন বটে কিন্তু মনে হয় দশকের ঘরে পৌঁছুতে বিশেষ বিলম্ব হবে না। আপনার তিন বছরে দুটি, এর পর সামনের বছরগুলিতে কি যে হবে। অজয় ঠোঁট উল্টে মুখ বিকৃত করে হাতের তালু দুটিকে এক সঙ্গে চিতিয়ে দেয়।

বঙ্কিম অসহায় ভঙ্গীতে হাত জোড় করে বলে, স্যার—।

—না, না, এ অসম্ভব। এ কেস কোন মতেই বিবেচনাধীন হতে পারে না। বুঝতে পাচ্ছেন না মিঃ মিত্র, জাতির কি দুর্দিন আজ। দেশে অন্ন নাই, অথচ পেটের সংখ্যা বেড়ে চলেছে দিন দিন। বেড়ে চলেছে বলে বেড়ে চলেছে। একেবারে জ্যামিতিক হার অনুপাতে বেড়ে চলেছে। ছিলাম তেত্রিশ কোটি, হয়েছি পঞ্চাশ কোটি। অচিরেই দাঁড়াবে একশো কোটিতে। একবার ভাবুন ত কি ভয়াবহ অবস্থা হবে আমাদের। আমরা দাঁড়াব কোথায়? তারপর সবেগে ঘাড় নেড়ে বলে, না, না, এ অসম্ভব। আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। ইট্‌স্ মাষ্ট বি ইণ্ড্। বলে বিরাশি সিক্কার একটা চাপড় মারে টেবিলের উপর। তারপর বঙ্কিমকে বলে, আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন। আমাকে ভেবে দেখতে দিন। উঃ!' কোথায় চলেছি আমরা। সঙ্গে সঙ্গে যে দু কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দেয়। এমন একটা ভাব দেখায় যেন একশো কোটি ভারতবাসীর বোঝা তার দুটি কাঁধের উপর এসে চেপে বসল বলে।

সেই দিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হয়ে যায় অজয় সেনের। স্ত্রী সুস্মিতা অপেক্ষা করে

বসেছিল সেফেণ্ডলে। স্বামী কিরতেই বলল, কেমন করে কিরলে যে আজ? তখন থেকে বসে আছি অপেক্ষা করে।

অজয় সহাস্যমুখে বলে, কি ব্যাপার আজ বলত?

—একটা সুখবর দেব তোমায়। বড়দির ছেলে হয়েছে। আটম গর্ভের ছেলে খুব পয়মন্ত ছেলে। জন্মেছেও ভাল লগ্নে।

অজয়ের পা দুটি যেন অকস্মাৎ মাটির মধ্যে গেঁথে বসে যায়। চোখ দুটি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। কোন মতে প্রশ্ন করে, কি বললে? আটম গর্ভের? কটি ছেলে মেয়ে তোমার দিদির?

—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই নিয়ে আটটি। পাঁচ মেয়ে, তিন ছেলে। ছেলেরাই সব ছোট।

—আটটি! তা-ও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে! এঁ্যা বল কি?

—আশ্চর্য হচ্ছ? আমার মেজদির কটি জান? নটি। সেজদির সাতটি। যার মানে আর একটি আসবার সম্ভাবনা আছে নির্ঘাৎ—।

—থাম। বল ত বোনদের মধ্যে তুমি কজনের পর

—আহা জান না যেন। পাঁচ বোনের পর এক ভাই। তারপর আমি। আমার কোলে সুধি অর্থাৎ সুধন্যা। তারপর পান্না আর সব শেষ আন্না। আন্না আমার মেজ মেয়ে শীলার বয়সী।

অজয় মনে মনে কি যেন হিসাব করে। তারপর প্রশ্ন করে, তোমার বড়দির বয়স কত?

সুস্মিতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কেন?

—এমনিই। নিছক কৌতূহল।

—বলছি। ধর, আমার যদি হয় পঁচিশ, দিদির হবে চল্লিশ কি একচল্লিশ। তার কম নয়।

—আমারও তাই মনে হয়। তবে দেখে বোঝা যায় না। আচ্ছা তোমার বড়দির বাড়ীর কাছেই তোমার এক মামার বাড়ী না?

—ন মামার।

—ভদ্রলোক বিশিষ্ট বড়লোক। ও অঞ্চলে নামডাক আছে বেশ।

সুস্মিতা একটু গর্ব ভরে বলে, ন মামা কি এমন বড় লোক। ফুল মার্কীদের ধারে কাছেও যান না। আমার পাঁচ মামা আর চার মাসীর মধ্যে তাঁরাই সব চাইতে বড় লোক। কিন্তু কেন বলত এসব কথা?

—বলছি। কিন্তু সেফেণ্ডলে কোথাও বেরুচ্ছ না কি?

—হুঁ! তবে একা নয়। তুমিও সঙ্গে যাবে। বড়দির ছেলেটাকে একবার দেখে আসি চল।

অজয় দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে না।

—না? না কেন?

—সবে প্রমোশন পেয়েছি। চাকরীটা আমি খোয়াতে পারব না।

—তার মানে? সুস্মিতা ভ্রু কোঁচকায়।

—তুমি বুঝতে পারছ না মিতা, যে অন্যায়ের ধারে অপরকে আমি শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছি সে অন্যায়ের উৎস আমারও ঘরে। কি এক্সপ্যাক্ট; মানে সম্ভ্রান্তবংশীয় তোমাদের বংশ। সকলেই প্রায় তখন ঐশ্বর্যের অধিকারী।

—অন্য ঐশ্বর্য? সে আবার কি?

—তখন কীপার মানে রক্ষকের ঘর। যদি তোমাদের বংশের সকলকে একত্র করা যায় তা হলে দেখা যাবে ভারতের লোক সংখ্যার স্ফীতীকরণের জন্য এ বংশ অনেকখানি দায়ী।

সুস্মিতা বলে, এত গৌরবের কথা।

—গৌরবের কথা! অজয় ফিরে হয়ে উঠে। বলে, সে আজ একশো বছর আগে হলে বলতে পারতে গৌরবের কথা। তখন বংশ বৃদ্ধি করতে পারতে বছরে বছরে। কিন্তু আজ? হায় মাতঃ ভারতবর্ষ! কে যোগাবে অন্ন এতগুলি প্রাণীর ক্ষুধার্ত আস্যে?

সুস্মিতা রাগ করে বলে, কেন, এরা কি কারোর গলগ্রহ অপরে কেউ যোগাচ্ছে অন্ন এদের মুখে? এদের অভাব কিসের?

অজয় বলে, অভাব অন্য কিছুর নয় তবে! অভাব শুধু অন্নের। তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি, কিভাবে এদের মুখে অন্ন যোগাচ্ছে সরকার। এরা ভিক্ষাবৃত্তি করে। পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি করে, পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তবে এক মুঠি অন্ন তুলে দিচ্ছে আমাদের মুখে। এ অবস্থায় বংশ বৃদ্ধি মহাপাপ। তাই সরকার আজ বাধা দিয়েছেন পত্নী টেনে দিতে তিনটিকে ঘিরে। তিনের বেশী সন্তান যেন না হয় কারো। তাই তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি মিতা, তোমাদের বংশে অপরে যাই করে থাকুক না কেন, তোমার কিন্তু তিন্ কার এর বেশী নয়। তিন কন্যার জননী তুমি, এইখানেই তোমাকে থামতে হবে। দিদিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে চলবে না।

সুস্মিতা বলার ধরন, থামতে হবে মানে?

—মানে সোজা। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের একজন অফিসর আমি। আমাকে অন্তত: নিয়মটা মানতে হবে।

—তুমি একা মানলেই হবে? তোমার উর্ধতন অফিসরের দল? তাদের খবর তুমি রাখ? যে সব উর্ধ মস্তিষ্ক থেকে এ নিয়ম বেরিয়েছে তাদের হাড়ির খবর কিছু রাখ? দেখবে যাও তাদের উঠানে ক জন কাঁথা রোজ শুকোতে দেওয়া হয়।

অজয় বলে, সে কথা বলার প্রয়োজন নেই। চাকরী বাঁচাতে গেলে চুনোপুঁটি আমরা, আমাদের নিয়ম কানুন মেনে চলতেই হবে। এবং সেই সঙ্গে তোমাকেও।

সুস্মিতা মুখ বেঁকিয়ে বলে, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমার ভাগ্যে ভগবান যদি আরও কন্যা দিয়ে থাকেন খণ্ডাবে কে?

—গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্ট সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অপারেশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে মেয়েদের জন্যে। লুপেরও ব্যবস্থা করেছে তাদেরই জন্যে। নির্বীজনের ব্যবস্থা করেছে পুরুষদের জন্যে। সুতরাং ভাববার কিছু নেই।

সুস্মিতা ফুঁসিয়ে উঠে। বলে, যারা তোমার মত নিরেট তাদের ভাববার কিছুই নেই। কিন্তু সবাই ত নিরেট নয় গো। জোরার ওপর জোরজারী চলবে না। তুমি জান ও সবের অপকারিতা? নদীর মুখ জোর করে রুদ্ধ করে দিলে যেমন অনিষ্ট হয় এ-ও তেমনি। স্বাভাবিক জীবন ধারার গতিরুদ্ধ করলেই পঙ্গিলতার সৃষ্টি হবে। আর তার বিষময় প্রতিক্রিয়া হবে সামাজিক জীবনে আর পারিবারিক জীবনে। আমি জানি আমার কয়েকজন বান্ধবীর কথা। অথবা তোমাদের পরিকল্পনার বলি হয়ে আজ তারা আধ্যাত্মিক, মানসিক শক্তি হারা। দিন দিন কেউ হচ্ছে যেন বৈরাগ, কেউ বা ভুগছে অন্য কোন ব্যাধিতে। মনে সুখ কারো নেই। এখন আপশোষ করছে সকলেই।

অজয় অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, কিন্তু মিতা, বন্যার স্রোতের মত জনস্রোত যদি ক্রমশই বেড়ে চলতে থাকে, তাহলে এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ কি? আজ দেশে যেখানে পঞ্চাশ কোটি লোক, কাল সেখানে হবে একশো কোটি লোক। এত লোকের মুখে অন্ন জুটবে কোথা থেকে? চিরকাল কি বিদেশের কৃপাপ্রার্থক দানের ওপর নির্ভর করে একটা জাতি বেঁচে থাকতে পারে?

—জানি না। তবে এইটুকু বুঝি তোমার ঐ পঞ্চাশ কোটি নরনারী মধ্যে যদি অন্ততঃ দশ কোটি পারফেক্ট স্বামী স্ত্রী থাকে তাহলে এই বিরাট বাহিনীকে অপারেশন বা নির্বীজন অথবা লুপের সাহায্যে অপারগদম করা সম্ভবপর হতে পারে না। তার চেয়ে অন্য পথের খোঁজ কর। তাতে দেশের স্বাস্থ্য এবং সম্পদ দুই-ই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

—ভাল কথা। কিন্তু সে পথটা কি শুনি?

মুস্মিতা হাসে। বাঙ্গ করে বলে,—

হাতী-ঘোড়া গেল তল
ব্যাং বলে কত জল।

যারা যারা রথীরা যেখানে পথের নির্দেশ দিতে দ্বিধা-দ্বিত থাকছে, সেখানে পথ নির্দেশ দেব আমি? তবে আমার এক অধ্যাপিকা বান্ধবীর কথা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। তার মতে, সে দেশে অজ্ঞানতার স্তূপ পর্বত প্রমাণ, আকাশস্পর্শী বললেও অত্যুক্তি হয় না সেখানে এই অত্যাধুনিকতা প্রচার দেওয়া ভস্মে ঘি ঢালা ছাড়া কিছু নয়। আগে জাতির চেতনাকে উদ্বুদ্ধ কর, লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্তরে জ্ঞান দাও। বুঝতে দাও এর উপকারিতাকে, এর সুদূর প্রসারী ফলকে, তবেই ত সার্থক হবে এ পরিকল্পনা। শুধু বক্তৃ বক্তানি, কচ-কচানীতে কাজ হবে না চাই অন্ন, চাই পথ্য, চাই স্বাস্থ্য। তেরাল দেওয়া দু-বাস্ত ভোজী স্বাস্থ্যহীন দেশে পরিবার পরিকল্পনা হাস্যকর ব্যাপার।

অজয় বলে, এ আমি বিশ্বাস করি না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তখন আমরাই বা গ্রহণ করব না কেন? মুস্মিতা বলে, করবে কর। সরকারকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারোর নেই। তবে অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের তুলনা না করাই ভাল। আমার বান্ধবী বলে, সব সুসভ্য দেশে ভোগ-উপভোগের পথ একাধিক এবং বিচিত্র রকমের। কিন্তু আমাদের দেশে মাত্র একটি যা অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকের আয়ত্বের মধ্যে। সুখ লাভে এরা চিরবঞ্চিত, ভোগ উপভোগেও এরা চিরবঞ্চিত কয়ন যেয়ে অর্দ্ধপুষ্ট দেহ, অর্দ্ধপুষ্ট মন ঐ একটি মাত্র উপভোগের মধ্যে বারবার আনন্দের স্বাদ পেতে চেষ্টা করে। এ থেকে এদের নিবৃত্ত করবে কি করে! জীবনে ঐ একটি মাত্র বিলাসিতা এর ফলাফল যত অনিষ্টকরই হ'ক জাতিকে তা ভোগ করতে হবে যদি না বিভিন্ন সুখ ভোগের পথ এদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে না দেওয়া হয়। যে জাতির ভোগ উপভোগের ধারা যত বিভিন্ন তাদের বংশবৃদ্ধির উর্দ্ধগতিও তত-মন্থর।

অজয় কিছুক্ষণ স্ত্রীর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, তোমার ঐ বক্তৃতার যুক্তি জাল আমাকে চাকরী চ্যুত হবার আশঙ্কা রক্ষা করতে পারবে না জন্যে। অতএব মেনে নিতে পারলেম না তোমার কথা, তোমার অধ্যাপিকা বান্ধবীর কথা।

মুস্মিতাও ঠিক তেমনি ভঙ্গীতেই উত্তর দেয়, আমিও গ্রহণ করতে পারলেম না যে যাদ, তোমার ঐ ভগ্নদার এত নো লার্নার বাইটিকে।

— মানে ?

—মানে কি জান, খোকার ওপর খোকাকারীতে আমি রাজি নই। কোষ্ঠীর ফলাফল তুমি বিশ্বাস কর কি না জানি না, কিন্তু আমি করি। আমার কোষ্ঠীর ফল, পঞ্চ সন্তানের পিতা হবে তুমি আমি অবশ্য যাতা। এ অবশ্যম্ভাবী বড়চড় হবার কোটি নেই।

অজয় আর্ত্তনাদ করে উঠে, ওঃ মিতা ! অসহ্য। কিছুতেই সহ্য করতে পারব না আমি। কালই এর বিহিত করছি।

—না। পাগলামি ক'র না। সুস্মিতা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, তুমি ভেবে দেখছ না কেন আমাদের অবস্থাটা। আমাদের তিনটেই মেয়ে। যখন তারা একের পর এক পরের ঘরে চলে যাবে তখন কি নিয়ে থাকব আমরা। কে রক্ষা করবে তোমার বংশ ? আমার মরণের পর মুখে দেবে আগুন ? আদেশ জারি ত করে বসে আছ সব তিনটের বেশী আর নয়। কিন্তু আমাদের যত যাদের তিনটিই কন্যা, কি গতি হবে তাদের ? পুত্র সন্তান না হ'লে বংশ যে লোপ পেয়ে যাবে সব ?

এতক্ষণে অজয়ের হুঁস হয়, বাস্তব বুদ্ধি জাগে। সত্যইত ত তিনটিই তার কন্যা। তাই স্ত্রীর কথাটা এ ক্ষেত্রে অসমীচীন মনে হয় না। সে বোকা-বোকা মুখ করে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময়ে বলে উঠে, তা হলে ?

—তা হলে ঈশ্বরের সৃষ্টির ওপর আর ছুরি চালাতে যেও না। তাতে জাতির মঙ্গল হবেনা। যে দেশ-মাতৃকা সন্তানের মুখে অন্ন দিতে অপারগ তার প্রতিষ্ঠা নেই, ইষ্টও নেই। শত-পরিকল্পনায় সে দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবেনা। সন্তানের মুখে অন্ন যোগাতে না পেরে যারা সন্তান নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেয় তারা ভ্রান্ত। তাদের ভুল নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে তুমিও ভুল ক'র না।

সহসা অজয়ের অন্তরে যেন সাড়া পড়ে যায়। সুপ্ত চেতনা যেন জাগরিত হয়ে উঠে। সত্যই ত যে জাতি অন্ন উৎপাদনে অক্ষম, তার ত ইষ্ট নাই। যারা সক্ষম তারাই সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্তা। তারা যা বলে আমরা যেনে নি তাই। সমস্যা বসুন্ধরা এর উর্বরা শক্তিকে পঙ্গু রেখে পরমুখাপেক্ষী থাকতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি বলেই না আজ নিয়ন্ত্রণের এই অভিযান। কোটি কোটি মানুষকে এক অপ্রাকৃত এবং অস্বাভাবিক উপায়ে এ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা কি সম্ভব। সুস্মিতা ঠিকই বলেছে, ভোগ-উপভোগের পথ যত বিচিত্র হবে, এক কেন্দ্রিক জৈব উপভোগের পথ ততই সীমিত হবে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে গণবৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতিও হবে মন্থর। সুস্মিতার যুক্তি মেনে নেয় অজয়। ঘাড় নেড়ে বলে, তোমার যুক্তির ধার আছে মিতা, সারও আছে এ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু —

সুস্মিতা বাধা দিয়ে বলে, যদি-স্বীকার কর, তা হলে আর কিন্তু নয়। সত্যের অমর্যাদা করতে গেলে ঠকবে। কিন্তু আর দেরী নয়। এরপর দেরী করলে বড়দির বাড়ী থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। তখন দোষ দেবে আমাকেই।

অজয় বলে, দোষ কাউকে দেব না মিতা, এমন কি অষ্টম গর্ভের সন্তানকেও নয়। দোষ যদি কাউকে দি, জাতির ভাগ্যকে আর তার এই পরমুখাপেক্ষী পঙ্গু খাদ্য নীতিকে।

ইংরেজী ও বাংলা সাংবাদিকতায় বাঙালীর অবদান

সেযুগের সংবাদপত্র

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত পূর্ব সংখ্যায় বাংলা সাংবাদিকতা সম্পর্কে আমার যে রচনাটি প্রকাশ হয়েছিল সে সম্বন্ধে অনুরাগী পাঠকরা অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি যেন সেই সময়কার বাঙালী সংবাদপত্রসেবীদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানাই। এবং সেই সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলা দেশে প্রথম সংবাদপত্র কবে দেখা দিল সে সম্বন্ধে আলোকপাত করি।

কেরির গুড ওল্ড ডেজ, বাসটিডের ইতিহাস অফ ওল্ড ক্যালকাটা এবং বিনয়কৃষ্ণ দেবের আদি হিস্ট্রি অফ ক্যালকাটা, এই তিনখানি বই থেকে যে উপকরণ পেয়েছি তা সংক্ষেপে নীচে লিপিবদ্ধ করলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই বিষয়ে প্রমাণ্য বইগুলি পড়লে বিস্তারিত তথ্য জ্ঞাত হবেন।

জগতে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় জার্মানীতে ১৪৯৮ সালে। তারপর ১৬ শতকে ভেনিসে এর অঙ্কুর বিকশিত হোতে দেখা যায়। সে বিবর্তন বড় বিচিত্র। হাটের মাঝখানে একটি লোক তার হাতের কাগজ দেখে খবর পড়ত আর জনতা দক্ষিণা দিয়ে তা শুনত। ঐ সময়েই ইংলণ্ডে ব্যবসায়ীরা এদেশ থেকে ওদেশে যাবার সময় NEWSLETTER বহন করে নিয়ে যেতেন। বিলাতের প্রথম সংবাদ পত্রের নাম Weekly News। সম্পাদক রবিনসন ক্রুশোর লেখক ড্যানিয়েল ডিফো। ভারতে মুসলমানযুগে 'আখবর' প্রকাশিত হত। তাতে নবাব দরবারের খবর থাকত।

সহর কলকাতায় প্রথম সংবাদপত্র বেরোয় ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারী শনিবার—বেঙ্গল গেজেট। বিলাতে দি টাইমস পত্রিকার আট বছর আগে গেজেটের প্রকাশ। জেমস অগসটাস হিকি ছিলেন এই পত্রিকার মলিক ও সম্পাদক। তিনি তাঁর পত্রিকায় প্রায়ই ইংরাজ সরকার ও ইংরাজ রাজপুরুষদের আচার আচরণের তীব্র সমালোচনা করতেন। সময় সময় তাঁর বাঙ্গ বিদ্রূপ রীতিমতো মানহানিকর হোত। ফলে তাঁকে রাজরোষে পড়ে জেলে যেতে হয়েছিল।

ঐ সময় ক্যালকাটা জার্নাল নামে যে পত্রিকা বেরোয় তার সম্পাদক জেমস বাকিংহাম তদানিন্তন গভর্নর জন আডামের কার্যকলাপের সমালোচনা করেছিলেন বলে তাঁকে এদেশ থেকে বার করে দেওয়া হয়।

সেই সময়কার কয়েকটি ইংরাজী পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নীচে দেওয়া হল।

জনবুল। ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয়। পরে এর নাম হয় ইংলিশম্যান।

এছাড়া আরো অনেক আরো অনেকগুলি আদি ইংরেজী সংবাদ পত্রের প্রকাশ তারিখ হচ্ছে :—

ইনডিয়ান গেজেট—নভেম্বর ১৭৮০

ওরিয়েনটাল অ্যাডভারটাইজার—ফেব্রুয়ারী ১৭৮৪। সম্পাদক—ফ্রান্সিস ব্যাকটন।

বেঙ্গল জার্নাল—ফেব্রুয়ারী ১৭৮৫

ক্যালকাটা অ্যামিউজমেণ্ট—এপ্রিল ১৭৮৫

ক্যালকাটা ক্রনিকল—জানুয়ারী ১৭৮৬। এদের সম্বন্ধে বিশদ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

স্টেটসম্যান—১৮১৮ সালে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নামে যে মাসিকপত্র বেরোয় পরে তাই হয় স্টেটসম্যান ১৮৭৪ সালে রবার্ট নাইট তিরিশ হাজার টাকায় ফ্রেণ্ডঅফ ইণ্ডিয়ার স্বত্ব কিনে নেন এবং দি ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যানের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দেন। পরে নাম হয় শুধু 'দি স্টেটসম্যান'। রবার্ট নাইট প্রকৃতই ছিলেন ভারত বন্ধু। তাঁর সম্বন্ধে বহু ভারতীয় মনীষী বহু প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করেছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ—জেমস উইলসনের সম্পাদকত্বায় এই দৈনিক পত্রিকা সকলকার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৭৪ সালের ৮ই আগস্ট এই পত্রিকার সঙ্গে বেঙ্গল হরকরা সংযুক্ত হয়।

সেই সময়কার শিক্ষিত বাঙালীরাও ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন একাধিক এবং তাঁদের সম্পাদকীয় নৈপুণ্যও ইংরাজ সম্পাদকদের চেয়ে কম ছিল না। তাঁদের মধ্যে অগ্রণীর হোয়ে আছেন শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ (শিমলার ঘোষ বংশ), হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রেঃ কে. এম. ব্যানার্জি, কেশবচন্দ্র সেন, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেইলাস পাল, কালীপ্রসাদ ঘোষ, এবং রেঃ লাল বিহারী দে। কালীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৫০ সালে হিন্দু ইন্‌টেলিজেনসার নামে ইংরাজী পত্রিকা বার করেন। সেটিই প্রথম বাঙালী সম্পাদিত ইংরাজী পত্রিকা। রামবাগান দত্তপরিবারের নবগোপাল দত্ত হিন্দু পাইওনীয়ার প্রকাশ করেন ১৮৫০ সালে। বাঙালী সম্পাদিত ইংরাজী শত্র পত্রিকার মধ্যে সবচেয়ে জোরদার ছিল হিন্দু পেটরিয়ট। প্রতিষ্ঠাকালে এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ। ১৮৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলাকার ষ্ট্রীট থেকে এটি প্রকাশিত হয়। পরে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। হরিশচন্দ্রের মত তেজস্বী সাংবাদিক এবং সংগঠনকারী সেকালে অতি অল্পই ছিলেন। সর্বস্বান্ত হয়েও তিনি তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। কিন্তু তাঁর অকাল প্রয়াণে পত্রিকাটি চালান দুষ্কর হয়ে পড়ে। মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচহাজার টাকা দিয়ে কাগজটি কিনে নেন এবং কেইলাস পালকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৮৮৩ সাল থেকে সাপ্তাহিক প্রকাশের পরিবর্তে এটিকে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা হয়।

১৮৬৩ সালে ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়ান মিরর। প্রথমে এটি ছিল সাপ্তাহিক। পরে কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় ১৮৭৮ সালে মিরর দৈনিক প্রকাশিত হতে থাকে। সেই সময় ব্রাহ্ম নেতা প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি আমরা। এই পত্রিকার আদিকথা ও গৌরবময় ঐতিহ্য আমরা সকলেই জানি। লর্ড লিটনের সংবাদপত্র দমন আইনকে নস্যাৎ করে কিভাবে অমৃত সাহসে মহাত্মা শিশির কুমার এবং এবং তাঁর ভায়েরা বিপুল স্বার্থত্যাগ করে এবং অপরিসীম ঝুঁকি নিয়ে পত্রিকাটিকে সেই সময় বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তা বোধকরি বাঙালীর সাংবাদিকতার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও গৌরবময় অধ্যায়। সেই সময় এই পত্রিকাটিকে যাঁরা নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা হলেন, রাজা দিগম্বর মিত্র, মহারাজা কমলকৃষ্ণ, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বেঙ্গলী দৈনিক পত্রিকা যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা সে যুগের পক্ষে অভূতপূর্ব। ১৮৬১ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে এর প্রকাশ। সম্পাদক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মী বেচারাম চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটির সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার স্বত্ব কিনে নেন। ১৯০০ সাল থেকে বেঙ্গলী দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সূত্রে আর একটি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য—ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার। সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। ১৮৮২ সালে এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ।

বিংশশতকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ফরোয়ার্ড, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সারভেণ্ট, শরৎচন্দ্র বসুর নেশন—এই সব দৈনিক পত্রিকাগুলির ইতিবৃত্ত আমরা অল্পবিস্তর সকলেই জানি।

আগামী সংখ্যায় সেযুগের বাংলা পত্র পত্রিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করব।

নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অজ্ঞানতার মত অজ্ঞান আর তো কিছু নেই। ঈশ্বরকে যে জানিনে, তাঁকে যে পাইনি এইটে যখন অনুভব মাত্র না করি তখনকার যে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা সেইটে থেকে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। সেই অসাড়তাকে বিচলিত করে গভীরতর বেদনা জেগে উঠুক।

—রবীন্দ্রনাথ

যেখানে বাঙালী সেখানেই বাংলা

এই পর্যায়ে লকনৌ-এর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল এই সংখ্যায় একটি চরিত্র চিত্র উপহার দিয়েছেন। চিত্রটি তাঁর আপন মামার। মামা ছিলেন এক বিখ্যাত মনীষী যাঁর নাম লেখক উহা রেখেছেন।

বিন্দু

দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল

মামার বাড়ি গিয়েছি।

মামা মামীর কিছু গল্প ইতিপূর্বে শুনিয়েছি। এবারে মামার মুখে শোনা কিছু রসকথা পরিবেশন করলাম।

দুপুরবেলা মামা বিশ্রাম করেন।

বেলা চারটের আগে তাঁর ঘরে যাবার হুকুম নেই। যখন তিনি খেতে বসেন তখন "পাচু" হুলকো ছিলিম দিয়ে যায় যার মেয়াদ আধ ঘণ্টা, ঐ মৌতাতে তাঁর ঘুম এসে যায়। ঠিক পৌনে চারটে বাজলে আসে তাওয়া দেওয়া বড় ছিলিম (কল্‌কে) ওপরে থাকে চাপোস বা সরপোশ—মেয়াদ দু ঘণ্টা।

পাচু পা টিপে টিপে ঘরে আসে, কলকে পাল্টানো হুঁকাটির উপর সাজা কলকেটি বসিয়ে দেয়—পনের মিনিট পরে হুঁকাটি উঠে মামার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—কলকেটি ধরাতে নাকি অত্যন্ত ধৈর্য্যের প্রয়োজন, একটু তাড়াহুড়ো করলেই উনি "ভোড়কে" যান, তাতে মেজাজ বিগড়ে যায়।

অগত্যা, ঠিক চারটের সময়ে, ঘড়ি দেখে, উপস্থিত হ'য়ে বললাম, "মামা আসব"। খোলা প্রশ্নের উত্তর এলো, "আয়ে এসো এসো"। সামনে গিয়ে বসতেই বলে উঠলেন, "এটি আমার প্রকৃত পক্ষ এর সঙ্গে প্রেমালাপ দশ জনের সামনেই বিধেয়। নির্জন বাসেরও এটি চমৎকার সাথী, আদর করলেই, আবেশে গুড়্-গুড়্ করে উঠে।"

আরো মিনিট দশেক পর বেশ গোল ধোঁয়া দেখা দিল। মামা একবার আনন্দে "আ···হ্" বলে আরম্ভ করলেন "নব্যরা এর মর্ম বুঝলো না—জর্দা ইত্যাদি শুধু চর্ব্য, অন্যদিকে সিগার, সিগারেট ইত্যাদি, চর্ব্য, চোষ্য এবং লেহ্য। আমার প্রেয়সী মাত্র চোষ্য হ'য়েও নির্মলা, নিরিষ, আর্দ্র ও পরম তৃপ্তিদায়িনী—স্বয়ং ব্রহ্মা এর সুখ্যাতিতে চতুর্মুখ।" প্রশ্ন করলাম, "ব্রহ্মা"?

"হ্যাঁ হে হ্যাঁ, স্বয়ং ব্রহ্মা! অবশ্য যদি শাস্ত্র মানো। তবে শোন পুরাতত্ত্বের কথা। একদিন নারায়ণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন—হে সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে সারবস্তু কি? চার মুখে ব্রহ্মা বললেন, তামাক, তামাক, তামাক, তামাকি!

"মামা, এও শাস্ত্রে স্থান পেয়েছে"?

"আজ্ঞে হ্যাঁ—উদ্ধৃতি শুনতে চাও, শোন—

বিড়ৌজা পুরা পৃষ্ঠবান পদ্মযোনিম্
ধরিত্রীপরে সারভূতম্ কিমস্তি
চতুর্ভিমুখৈ স্বয়ংবোধত বিরিঞ্চি
তমাকু, তমাকু, তমাকু, তমাকুঃ"

"এটা কোন শাস্ত্রে আছে"?

"শ্রুতি শাস্ত্রে! অর্থাৎ শুনে শেখা। লেখাপড়া ক'রে লোকে আর কটা জিনিস শেখে, পৃথিবীময় ঐ শোনা আর বলারই প্রাধান্য। একটু আধটু বিকৃতি এসে পড়া স্বাভাবিক, তবে তাতে বড় একটা কিছু এসে যায় না, মোদ্দা কথাটা ঠিক থাকলেই হোল। আর একটা শ্রুতিবাক্য শোন—

পুস্তকস্থা যদা বিদ্যা পরহস্তগতম্ ধনঃ
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সাবিদ্যা, নতদ্ধনঃ

অনুস্বার বিসর্গর স্থূল ভ্রান্তি থাকতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, যে বিদ্যা বইয়ের পাতায় আছে এবং যে অর্থ পরের কাছে রইল তা কাজের সময়ে ফাঁকী দেয়। অতএব শোন, শেখ ও মুখস্থ বল।

আজকাল বই না পড়লে লোকে তাকে বিদ্বান বলে না, পুরাকালে লোকে শুনে শিখত কিনা, তাই বিদ্যাকে "শ্রুতম্" বলতে দেখা যায়, যথা "শীল বৃত্ত ফলং শ্রুতম্" অর্থাৎ বিদ্যার ফলে মানুষ সুশীল ও সদ্বৃত্ত হবে।

একি! তোমার মুখ দেখে মনে হ'চ্ছে, তুমি এই সব জ্ঞানের কথা মন দিয়ে শুনছ না—"বোর" মনে হ'চ্ছে বুঝি?" বললাম, "আজ্ঞে না", মামা যেন বিশ্বাস করলেন না! "বল কি শুনতে তোমার ভালো লাগবে, তাই বলি। বলার তো অন্ত নেই, কিন্তু শুনতে চায় কে, তবে বাংলা ভাষাতে শতকরা সাত জন লেখা পড়া জানে তার মধ্যে হয়ত একজন বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ প্রভৃতিকে জীর্ণ করতে পারে তাঁদের প্রকাশ ও খ্যাতি ঐ বলা, শোনা, মানে এক কথায় চর্চ্চার মাধ্যমেই হ'য়েছে প্রধানতঃ।"

আমি আম্‌তা আম্‌তা করে জানালাম যে সে কথা ঠিক এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করে গিয়েছেন যে তিনি শব্দ বা চোখের ভাষাকে লিপিবদ্ধ করতে অসফলকাম হয়েছেন। তবে আমার মনে একটি প্রশ্ন ও একটি জিজ্ঞাসা সর্বদাই উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল, তাই একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম।

মামা হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি তামাকের ধোঁয়া জেগে মামা বিষম খেলেন। পরে বেগ সামলে বললেন, "ঐ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার পৃথক স্বরূপ প্রকাশ করতে আজ্ঞা হোক"।

আমি নিবেদন করলাম যে, প্রশ্ন মামীমা সংক্রান্ত, তিনি যাতে বিরক্ত হোয়ে পড়েন এমন কাজ মামা করেন কেন, বা এমন কথা বলেন কেন? আর জিজ্ঞাসা, সেই "আসলী কিস্‌সা" বিষয়ক, যা তাঁর বোধপুরী সহযাত্রী তাঁকে শুনিয়েছিলেন ট্রেনে যেতে যেতে।

মামা বললেন, "বেশ, তবে প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা হোক। তবে ব্যাপারটা বড় গভীর, তোমার

ভালো নাও লাগতে পারে তবু বলি রামায়ণে রামচন্দ্র থেকে বঙ্কিম পর্যন্ত আমরা ক'একটি রূপে স্ত্রীকে আরাধনা করবার নির্দেশ পাই। কিন্তু উপযুক্ত বয়সে তাঁর দু একটি রূপ বিলীন হ'য়ে যাবে এটা স্বাভাবিক। তখন ত্যাকুয়ম পূরণ করবার জন্য এক আধটি নূতন রূপের উদ্ভব আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। শরৎচন্দ্রের প্রেসক্রিপশন একটু রদবদল করে তাঁকে বৌদি রূপেন সংহিতা বলে আরাধনা করাই শ্রেয়, মানে ধরা ছোঁয়ার বাইরে অথচ রহস্য রসিকতা চলে। বিপদ হয় এই যে তাঁরা তাতেও প্রায়শঃই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় লয়েল্‌টীকে নিভীলন মনে করেন, উপরন্তু বুঝদার স্বামী যখন এটা বুঝে নেন যে স্ত্রীর বয়সোপযোগী বৈলক্ষণে মেজাজ খারাপ হোতেই পারে, তখন স্বামী আগে যাই হোন, প্রায় শান্ত হ'য়ে পড়েন। এইবার দুষ্টচক্রের আবির্ভাব হয়, ওরা পেয়ে বসেন। অনুযোগ, বিলাপ, বুদ্ধির পথে ধাবমান হয়। প্রতিবাদ করলে আর রক্ষা নেই, কান্না, মাথা খোঁড়া, আত্মহত্যার ভয় দেখানো, না বলে বাড়ী থেকে চলে যাওয়া ইত্যাদি হ'তেই থাকে। অবশ্য এটা আমাদের ধান ভানাভানা স্ত্রী-সম্বলিত বৃত্তের অভিজ্ঞতা। সারা দুনিয়ার খবর তো রাখি না। ওটা আমাদের স্বীকার ক'রে নিতেই হয়েছে অসুবিধের চেয়ে লাভ এখনও অনেক বেশী সহিষ্ণুতা দিয়ে বহু মাত্রায় সেবা যত্ন অক্লান্ত পরিশ্রম, গোছ গাছ ইত্যাদি প্রতিদান মেলে। মনে হয় এটি গেলে জীবন দুর্বহ হ'য়ে যাবে। বুঝলে ভদ্রলোক, তোমার প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ গূঢ় তত্ত্ব ?"

মামা পুনর্বার হুঁকায় মন দিলেন, একবার বললেন, দাঁড়াও, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নিই। কিছুক্ষণ পরে আরম্ভ করলেন, "হ্যাঁ এইবার ট্রেনযাত্রীর গল্পটি বলি। সকালে যখন কাটীহার এলো, তখন চা, ডিম ইত্যাদি দিয়ে প্রাতরাশ শেষ করা গেল। তার পর সে ভদ্রলোক গল্প আরম্ভ করলেন, কিন্তু তাঁর বলার বৈশিষ্ট কি তুমি লেখায় উদ্ধার করতে পারবে। তোমার পাঠকরা পদে পদে তোমার বানান ভুল হয়েছে ভাববেন। যাক তোমার কাজ তুমিই বুঝে করবে আমি তোমার জিজ্ঞাসার পূর্তি করি। তবে আগেই বলে রাখি যে ভদ্রলোকের বাংলা কথায় যতই উচ্চারণ ইত্যাদির মিশ্রন থাকুক না কেন, তিনি, হিন্দী অনুবাদ মাধ্যমে প্রায়, সমুদয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত।

মেইয়াটির নাম তো আসলে বিঁদিয়া, মানে বিন্দু, ফোঁটা বা ফুটকী কিন্তু তার মহিমা সাগর প্রমাণ আছে। বাংলায় কত লেখক কত নারী রূপ বর্ণনা করেছেন. বঙ্কীম, রবীন্দ্র, শরৎবাবু বঙ্গের (ইত্যাদি) বহু বহু তিরিয়া চরিত্তর (স্ত্রী চরিত্র) রূপ দান করেছেন, কিন্তু এ মেইয়া তো উপন্যাসে নেই, এর জায়গা তো হোবে ইতিহাসে। ছোট করে বলি শুনুন—তন্ময় ঘরের মেইয়া, নাম হোল এক বৃন্দাবনী পণ্ডিতের ছেলিয়ার সঙ্গে। যেমন কার্তিকের মত দেখতে তেমনি শক্তিশালী, লাঠি চালানো, সাঁতার জিম্‌নাষ্টিক খেলা সবের মাষ্টার, তবে 'ক' অক্ষর গোমাংস।

বিন্দিয়ার রূপ তো নিরালা, গুণ ততোধিক। সবটা বাৎস্যায়ন বা ভারতচন্দ্রও লিখে যাননি তবে মনে হয় যেন তাঁরা বিঁদিয়া কে দেখে ও চিনেই হুবহু লিখেছেন (শুদ্ধ বাংলায় লিখছি)

চুল কলেবর, চুল পয়োধর
চুল পদ কর, ঘোর নাগিনী।
আহার বিহার নিদ্রা ঘোরতর
রমনে প্রখর, পরগামিনী।
ধর্মে নাহি ভয়, দম্ভ নিরন্তর
কর্মেতে তৎপর, মিথ্যাবাদিনী।

মদন আলয় বহু লোয় চয়
মরগন্ধ সয়, সেই হরিনী।

উপরন্তু রং কালো আবলুশ, বেঁটে ও বিবেকের জায়গায় তো আছে এক পুঁটলী স্বার্থ। এক জন রসিক এক দিন বললেন—

বীরে রেঙ্গে (চলে), জোর সে কাটে
ন জানে পর পীড়া।
তুনিয়া সে তুই কুটুম্ জাত রহ
বিঁদিয়া ঔর খটকীড়া (ছারপোকা)

(দ্রষ্টব্য—মানুষ যখন কামড় অনুভব করে তখন ছারপোকা দূরে চলে গিয়েছে)

ছোট বয়সেও বিঁদিয়াকে দেখেছি, সাঁট ঘন বেঁটে চুল, শাতলা ঠোঁট, অল্পস্বল্প নাসা, নোলক ঝুলছে। তখন থেকেই লোকের বাড়ী গিয়ে যেচে কারো পাকা চুল বেছে দিচ্ছে, কোথাও গিয়ে তরকারী কুটে দিচ্ছে, কোনো গিন্নীর হাতে জোগান দিচ্ছে। এমনি ক'রে গল্পে, কাজে বিঁদিয়া সকলের প্রিয় হ'য়ে উঠলো। কাজে কর্মে অপরিচিত লোকের ভীড় হ'লে, সে তাদের মধ্যে ভিড়ে, নতুন পরিচয় বাগাতে, সবার দিকে চুলু চুলু চোখে চাইত।

এক প্রৌঢ় গিন্নী বললেন, তোর বিয়ে দেব, সেই কবির সঙ্গে যে লিখেছে—

অমী (অমিয়) হলাহল মদভরে
শেত সার রতনার (লাল ছড়া)
জীওরত, মরত ঝুক ঝুক পরত (পড়ে)
জোঁও চিতওরে (তাকায়) ইকবার।

এ হেন কলি যখন ফুটলো, তখন স্বভাবতই চারিদিক আমোদিত হোয়ে উঠলো। বিঁদিয়া বাংলা পড়া শিকলো ইংরাজীও কিছু করল। যেখানে যাও সেখানেই দেখবে বিঁদিয়া হাজির। কোথাও ঠাকুরমার ঝুলি পড়ে শোনাচ্ছে কোথাও রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলছে, আবার তাদের বৈঠকে কোথাও গ্রাব্ কোর্টশীপ্, সোলাম চোর্, টোয়েন্টী-এট নিয়ে মেতেছে। পূজার দোচালা রাত রাত জেগে যগ্সী-বাড়ীর তরকারী কোটা, রান্নায় তদ্বীর করা, যেখানে দেখ সেখানেই বিঁদিয়া।

কিন্তু হায়, কেউই বুঝলো না যে বিঁদিয়া এক বিরাট জাল বিস্তার করছে। সেই প্রকৃতঃ সরল, কাজের মেইয়া যে শেষ পর্যন্ত এক মহা ধূর্ত, কুটীল, স্বার্থপর ও নোংরা জীউ (জীব) হোবে, এ বুঝতে কারো ৪০ বরিস লাগলো, কেউ বুঝেও নিরুপায়, আবার কেউ বুঝেও বুঝলো না। ইতিবৃত্ত শুনুন"—এইবার যেন বিদ্যায় নিতে, মামা একটু নীরব হ'লেন। চিন্তাকুল মুখভঙ্গীতে ঘন ঘন তামাকের নলে টান দিয়ে ধূম উদ্গীরণ করতে লাগলেন—কিছুক্ষণ পরে বললেন—

"আমার বন্ধুটি এরপর যা বিবৃত করলেন তার খানিকটা আমি বাদ দিচ্ছি, কারণ তোমার কাছে ঐসব আদিরসাত্মক কথা বলতে আমার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে—এবার বল, বন্ধুটির ভাষায় বলি, না সরল বাংলায় বলব। আমি অবশ্য নির্বাচনের ভার তাঁকেই দিলাম। মামা বললেন—তবে শোন—

বিঁদিয়া বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশে, বোধহয় আত্মীয়দের লুকিয়েই, মাছ মাংসাদি ভক্ষণ বেশ রপ্ত করে নিয়ে ছিল, বিবাহ হোল বৃন্দাবনী পণ্ডিতের বাড়ী, সেখানেও নিরামীষ! এদিকে সকলের প্রিয়পাত্রী বিঁদিয়া

শ্বশুর বাড়ীতে মানিয়ে চলতে পারলো না এবং শেষ পর্যন্ত স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ী এসে উপস্থিত হোল। তার ঠাকুরদার মাত্র ১২৫৲ টাকা পেন্‌সন। বিদিয়ার বাবা আড্ডা দিয়ে বেহালা বাজিয়ে দিন কাটান। কাকা অল্প মাইনের সরকারী চাকুরে। বছর খানিক পরে দেখা গেল বিদিয়া দম্পতি একটি দোতালা ভাড়াটে বাড়ীতে উঠে গিয়েছে। নীচের অংশে সেকরার দোকান, সাইন বোর্ডে লেখা 'সোর এণ্ড কোং।'

বছর দশেক বেশ কাটল এদের, তারপর অনন্ত তৈরীর কী এক গণ্ডগোলে বিদিয়া-পতি দোকান তুলে দিতে বাধ্য হ'ল। আরম্ভ হোল বাড়ী কেনা-বেচার ব্যবসা ও সুদী কারবার। ফলে বড় রাস্তার উপর ছোট একটি দোতলা বাড়ী হোল নীজস্ব এবং মোটা টাকা ব্যাঙ্কে। এদের ছেলে মেয়ে হয়নি। দুজনের সংসারে কোনো অভাব হবার কথা নয়—তবু—দুজনে বসে পরামর্শ করে, জীবনের তৃতীয় অঙ্ক অভিনয় আরম্ভ করল।" গল্প শেষ করতে মাষ্টার আরো দু ঘন্টা লেগেছিল, এবং আমিও সবটা লিপিবদ্ধ করেছি। তবে পাঠকমণ্ডলির ধৈর্যচ্যুতির ভয়ে তা এখানে সংক্ষেপে নিবেদন করলাম।

১। বিদিয়া এবার নিয়মিত ভাবে বেলা তিনটায় এ বাড়ী ও বাড়ী যায়, বলে উনি তাগাদায় বেরিয়েছেন, একা বাড়ীতে কী করব। দাও দু পেয়ালা চা আর দুটো টোস্ট খেয়ে চলে যাই। বস্তুত নানা গল্পে ও ছলনায় সন্ধ্যে ভোজনটিও সারে এবং পতি-দেবতার জন্য ছাঁদা বাঁধে—ক্রমশঃ গৃহস্থরা সতর্ক হয়েছে বুঝে অন্য পথ অবলম্বন করে—তা পরে বলছি। কর্তা সোনার গহনা রেখে টাকা ধার দেন। অ্যাসিড দিয়ে কিছু সোনা আদায় করেন। ছাই বা সিঁদুর মাখিয়ে পুঁটলীতে আবার রেখে দেন এবং নিকৃতীতে বলা "ভরী" ব্যবহার করে ওজন বুঝিয়ে দেন। বিদিয়া আগেই সকলকে শিখিয়ে রেখেছে তাকে "বুলদি, বুলপিসী" ইত্যাদি বলতে, কিন্তু আসলে সেই সকলকে ফুল (fool) করে দীর্ঘদিন কাজ চালিয়ে নিল।

২। মন্ত্র নেওয়ার এক উৎসবে বহু ভীড়, তার মধ্যে উক্ত দম্পতি উপস্থিত। মতলব, নতুন গুরু ভাই ভগ্নীরূপে নতুন মক্কেল সংগ্রহ। এখন বিদিয়া পরমভক্ত। মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ ইত্যাদি ছেড়েছে, অন্যের বাড়ীতে গিয়ে এখন সে মাত্র ১৬ খানি পরোটা ও শুদ্ধ ঘৃতে প্রস্তুত তরকারী দাবী করে। পূজা কর্মে বিধান দেয়, প্রসাদ সংগ্রহ করে বিশেষতঃ বাতাসা। ওতে তার নাকি চিনির সাশ্রয় হয়। কালী বাড়ীতে নিয়মিত যায় মেয়েদের সিন্দুর পরায়। তাদের সন্তান কল্যাণে তাদের সঙ্গে ষষ্ঠী, অষ্টমী ভোগে তাদেরই বাড়ীতে নিজেকে নিমন্ত্রণ করে। পুরুষরা আপত্তি করে, স্ত্রীরা নিষেধ করে, কারণ—

৩। এক সময়ে কালীবাড়ীর পুরোহিত ভক্তদের জানিয়ে দেন, এ মহিলার ডাইনীর চোখ ও সাপের জীভ। এর প্রসন্ন দৃষ্টিতেই ভরা ক্ষেত শুকিয়ে যাবার কথা, ওকে বিরক্ত করবেন না। বিদিয়ার কানেও একথা এলো, কিন্তু হাড় বেহায়া ও স্বার্থপর সে, তার অভিযান গতিরুদ্ধ হোল না।

হায় রে! এই পরিণতি! দেবা ন জানন্তি!

চলতি দুনিয়া

ভাসমান হাসপাতাল

পৃথিবীর যে সব দেশ এতদিন অনুন্নত ছিলো, তারাও এখন দ্রুত উন্নতির পথে। কিন্তু সে সব দেশে এখনো অনেক অঞ্চল আছে যা রীতিমতো দুর্গম। সেই সব অঞ্চলেও মানুষ বাস করে। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই মারা যায়। সারা তল্লাটে না আছে ডাক্তার, না আছে ওষুধ, না আছে হাসপাতাল। নেহাৎই ভাগ্যের ওপর নির্ভর ক'রে বেঁচে থাকতে হয়। ওই সব অঞ্চলের নর-নারীর দুর্গতি লাঘবের জন্য ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী সম্প্রতি এক নতুন ধরণের হাসপাতালের কথা ভাবছেন। ওই হাসপাতাল আধুনিক চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক সাহায্য নিয়ে যাবে খুব দুর্গম এলাকায়। নতুন হাসপাতালটি হবে আসলে একটি জাহাজ। নদী, হ্রদ ইত্যাদি জলাশয়ের উপর দিয়ে এই ভাসমান হাসপাতালটি চলাচল করবে পীড়িতের সেবা ক'রে। হাসপাতালে ডাক্তার নার্স সবই থাকবে। প্রয়োজনে কোনো বিশেষ অঞ্চলের সুবিধার জন্য দু এক মাস নোঙর ক'রে হাসপাতালটি রোগ নিরাময়ের কাজে লেগে যাবে। রোগ বিশ্লেষণ, দাঁতের চিকিৎসা, ছোটখাট অপারেশন, এক্সরে পরীক্ষা, টীকা দেওয়া, সন্তান প্রসব করানো ইত্যাদি যত প্রয়োজন মেটাবে ওই হাসপাতাল। কেবিনগুলি হবে শীততাপনিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া ওই হাসপালে থাকবে ৬ থেকে ৮ শয্যা বিশিষ্ট একটি ওয়ার্ড। গুরুতর ভাবে পীড়িত রোগীদের বড়ো হাসপাতালে স্থানান্তরিতও করবে ওই 'হাসপাতাল'। হাসপাতাল জাহাজটির দৈর্ঘ্য হবে ২৭০ গজ আর প্রস্থ ৬ গজ। দূষিত জলকে বীজাণুমুক্ত করার যন্ত্র থাকবে এতে। স্বয়ংক্রিয় সাইকেল জাতীয় কিছু বাহন থাকবে যাতে ক'রে ডাক্তাররা ডাঙায় উঠে বিভিন্ন জায়গায় রোগী দেখতে পারেন।

এ-রকম দু'টি ভাসমান হাসপাতাল ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। এরা কাজ করছে ইন্দোনেশিয়া এবং কলোম্বিয়াতে। গভীর এবং আদিম অরণ্যের অধিবাসীদের কাছেও এরা আজ নিয়ে যাচ্ছে আরোগ্যের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি।

ভাসমান হোটেল

চলন্ত রাইন নদীর বুকে ভাসছে একটি আধুনিক হোটেল। সৌখিন পর্যটকরা যা চান সবই পাবেন এখানে, যে কোনো আরাম, যে কোনো স্বাচ্ছন্দ্য, যে কোনো বিলাস। এই প্রমোদ সৌধগুলি ইতিমধ্যেই যেন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে যারা জার্মানীতে বেড়াতে আসেন তাদের অনেকেই এই 'হোটেল'গুলিতে চ'ড়ে রাইন নদীর দু'পাড়ের অপরূপ প্রকৃতির দৃশ্য দু চোখ ভ'রে উপভোগ করেন।

দুটি জাহাজে রয়েছে সুইমিং পুল। এর কথা পর্যটকরা কোনদিনও ভুলতে পারেন না। ওই পুলের ধারে যে-সব তরুণ-তরুণীরা ভিড় করেন তারা যে সব মানের পোশাক পরেন তা আধুনিক, উগ্র

আধুনিক, বিচিত্র। সেও এক দেখবার জিনিস। মেয়েদের দেহ-সৌষ্ঠবকে প্রকট করার জন্য ধরণিদের নিত্য নতুন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় ওখানে। সেই সব পোষাকের শুধু নক্সা বা আকৃতি নয়, রংয়ের বাহারই বা কত!

জার্মানী আর পশ্চিমের দেশগুলিতেও আমাদের দেশের মতোই সাঁতার খুবই জনপ্রিয়। বহু কলেজ এবং স্কুলের আছে নিজস্ব সুইমিং ক্লাব। ছেলে মেয়ে দুই-ই এর সভ্য। আনন্দের সঙ্গে-সঙ্গে দেহ-চর্চার সুযোগ মিলে এখানে।

শেষের দিনটি এলো না

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনেহেগেনের কাছে এক নিউক্লিয়ার সেন্টার থেকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে মাথা তুলে বাইরে বেরিয়ে এলো হত-বিহ্বল পঞ্চাশটি লোক। তারা অবাক হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো না পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে যায় নি; পৃথিবী তো আগের মতোই চলেছে। লোকগুলি সত্যি অবাক হলো।

ওই পঞ্চাশজন লোক একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী। তাদের আরাধ্য দেবতা অর্থন। তারা শুনেছিলো ক্রিসমাসের দিন নিউক্লিয়ার যুদ্ধ শুরু হবে। যারা ধার্মিক এবং সৎ তারাই শুধু ওই যুদ্ধের পরেও বেঁচে থাকবে, পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে নতুন জীবনের।

দুষ্ট ওঝার হাত থেকে শিশুকে রক্ষা

একটি শিশুর আর্তনাদে আকৃষ্ট হয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং শিশুটিকে রক্ষা করে। মাত্র ৪৪ ডলারের জন্য ওই শিশুটিকে বিক্রি করা হয়েছিলো। পুলিশ আবিষ্কার করে বস্তিবাসী এক ওঝা শিশুটিকে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে এক স্ত্রীলোকের মৃত প্রেমিককে পৃথিবীতে আবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলো।

পুলিশের খবরে জানা যায় ৬ বছরের শিশুটির হাত-পা তপ্ত জলে ১২ দিন ডুবিয়ে রাখা হয়। তার গায়ে ওঝা জলন্ত সিগারেট চেপে ধরে। সপ্তাহে মাত্র তিনবার তাকে খেতে দেয়া হতো। পুলিশ ওই সময়ে না গিয়ে পড়লে ছেলেটিকে যে মেরে ফেলা হতো এতে সন্দেহ নেই।

ঝাড়-ফুঁক মন্ত্র-তন্ত্রের প্রচলন ব্রাজিলে, বিশেষ ক'রে বস্তীর লোকদের মধ্যে খুবই বেশি। এই কুসংস্কার ওখানে আমদানী হয় আফ্রিকা থেকে আগত ক্রীতদাসদের মাধ্যমে। শিশুটির মা বাবা নিজেরাই ছেলেটিকে উৎসর্গের জন্যে বিক্রি ক'রে।

খুনীদের সোয়া বারো

ভবিষ্যতে এক ভয়ংকর দিন আসছে। ভবিষ্যদ্বাণী করছেন দি নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা। এই পত্রিকা আশংকা করছে কিছুদিন পরে সংঘবদ্ধ খুনীর দল শুরু করবে হৃৎপিণ্ড, লিভার ইত্যাদি মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রত্যঙ্গের কালোবাজারী। মুমূর্ষু রোগীর দেহে বিকল প্রত্যঙ্গের পরিবর্তে সুস্থ প্রত্যঙ্গ স্থাপনে উৎসুক সার্জনদের কাছে ওই সব প্রত্যঙ্গ বিক্রি করবে কালোবাজারীরা। কারণ, স্বাভাবিক ভাবে ওই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করতে সময় লাগবে। বহু ধনী রোগী হয়তো একটুও অপেক্ষা করতে চাইবে না। তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য শুরু হবে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড।

তাছাড়া মরো-মরো অনেক গরীব লোক হয়তো মোটা টাকার লোভে নিজেরাই স্বেচ্ছায় বেচে দেবে তাদের হৃৎপিণ্ড, লিভার প্রভৃতি। কিছুদিন পরে হয়তো খবরের কাগজে এই সব অঙ্গের কেনা-বেচার বিজ্ঞাপন বেরুতে শুরু করবে।

সর্প দংশন ও মন্ত্র

জয়পুরের রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাশনী বিভাগের পরিচালক এইচ. এস ব্যানার্জীর পরিচালনায় ভারতের নানা স্থানে সর্প-দংশন সম্পর্কে এক ব্যাপক গবেষণা চালানো হয়েছে। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গবেষক সংস্থা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মন্ত্র বা মানসিক শক্তির সাহায্যে সর্পদষ্ট রোগীকে বাঁচানো সম্ভব নয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের মাইও সায়েন্স ফাউণ্ডেসান সংস্থার আনুকূল্যে ডাক্তার ব্যানার্জী ১৯৫৮ সালে এই গবেষণা প্রথম শুরু করেন। তিনি বিখ্যাত ওঝাদের ডেকে সর্পদষ্ট ছাগল, ভেড়া, খরগোশকে বাঁচাতে বলেন। কিন্তু তারা পারে নি। ডাক্তার ব্যানার্জী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, ওঝাদের চিকিৎসায় কোনো ক্ষেত্রে রোগীরা বেঁচে ওঠতে পারে; তবে সেই সব ক্ষেত্রে হয় সাপটা ভালো ক'রে দাঁত বসাতে পারে নি, নয়তো সাপটা ছিলো নির্দোষ। সাধারণত, বিষাক্ত সাপে কামড়াবার পর রোগী ৩০ মিনিটের বেশি বাঁচেনা। এর পরে যদি কেউ বেঁচে থাকে তবে হয় কামড় ভালো ক'রে লাগে নি, নয় তো সাপ বিষাক্ত নয়। গবেষণা করতে গিয়ে ডাক্তার ব্যানার্জী অনেক মন্ত্রপূত মন্ত্রার কথা শুনেছেন। উত্তর ভারতের এক ওঝা দাবী করেছেন তিনি রোগীর পায়ে চড় মেরে এবং সঙ্গে কিছু মন্ত্র আউড়ে তাকে সুস্থ করতে পারেন। আর দক্ষিণ ভারতের এক ওঝা দাবী করেছেন তার মন্ত্রশক্তি এমনই কার্যকরী যে টেলিগ্রাম মারফৎ পর্যন্ত তিনি রোগীকে ভালো করতে পারেন। ডাক্তার ব্যানার্জী বলেন কয়েকজন বিখ্যাত ওঝা নিজেরাই স্বীকার করেছেন সর্প দংশনের সত্যি কোনো অলৌকিক চিকিৎসা নেই। তিনি আরো বলেন চিকিৎসকরা মনে করেন সত্যিকারের বিষাক্ত সাপে কামড়ালে বাঁচানো আদৌ সম্ভব নয়।

গণৎকারের দাবী

ভারতীয় ভগুন বালসারা একজন হস্তরেখাবিদ ও জ্যোতিষ। তিনি দাবী করেছেন মাছ ধরতে গিয়ে যিনি সমুদ্রে নিখোঁজ হয়েছেন সেই অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী হারল্ড হল্টের দেহ খুঁজে বার করতে তিনি সক্ষম। দিল্লীতে অবস্থিত অষ্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনারের সঙ্গে তিনি দেখা ক'রেছেন। উত্তর তিনি কী পেয়েছেন জানি না।

প্রেমের জন্য আত্মহত্যা

পশ্চিম জার্মানীর ডেক কলস্টেন শহরে এক ভিড়াক্রান্ত রাজপথে এক তরুণী নিজের শরীরে নিজে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কয়েকবছরের ঘনিষ্টতার পর প্রেমিক সম্পর্ক শেষ করার বাসনা প্রকাশ করে। তাতেই ওই বিপত্তি। মেয়েটি যখন আত্মহত্যা করে তখন দর্শকদের মধ্যে তার প্রেমিকও উপস্থিত ছিলো। যে মুদীর দোকানে প্রেমিকটি কাজ করতো তার সামনে গিয়ে মেয়েটি কেরোসিনের কাঠি জেলে নিজের পোশাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার আগে দোকানের জানালায় ঢোকা দিয়ে সে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলো। পুলিশের মতে, গায়ে আগুন দেবার আগে নিশ্চয়ই সে কিছু দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করেছিলো। হাসপাতালে যাবার পথে সে মারা যায়।

স্টেরয়েড ব্যবহারের বিপত্তি

আমাদের দেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে স্টেরয়েডের ব্যবহার চলেছে। কিন্তু লণ্ডনে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ স্টেরয়েড ব্যবহারে একটা কুফল দেখা দিতে পারে; এর ফলে মেয়েদের দেহে রক্তাল্পতা ঘটতে পারে। লণ্ডনে প্যাডিংটন জেনারেল হাসপাতালের তিনজন ডাক্তার ২১৯ জন স্ত্রীলোককে পরীক্ষা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে স্টেরয়েড গ্রহণের সাত থেকে ১২ মাস পরে বেশির ভাগ মেয়েদের দেহে লোহের অভাব জনিত রক্তাল্পতা ঘটার সম্ভাবনা। অবশ্য এক বছর ব্যবহারের পর অবস্থার উন্নতি ঘটতেও পারে।

অন্তরীক্ষে

আমরা বেশ আছি!

আজকের নেতা

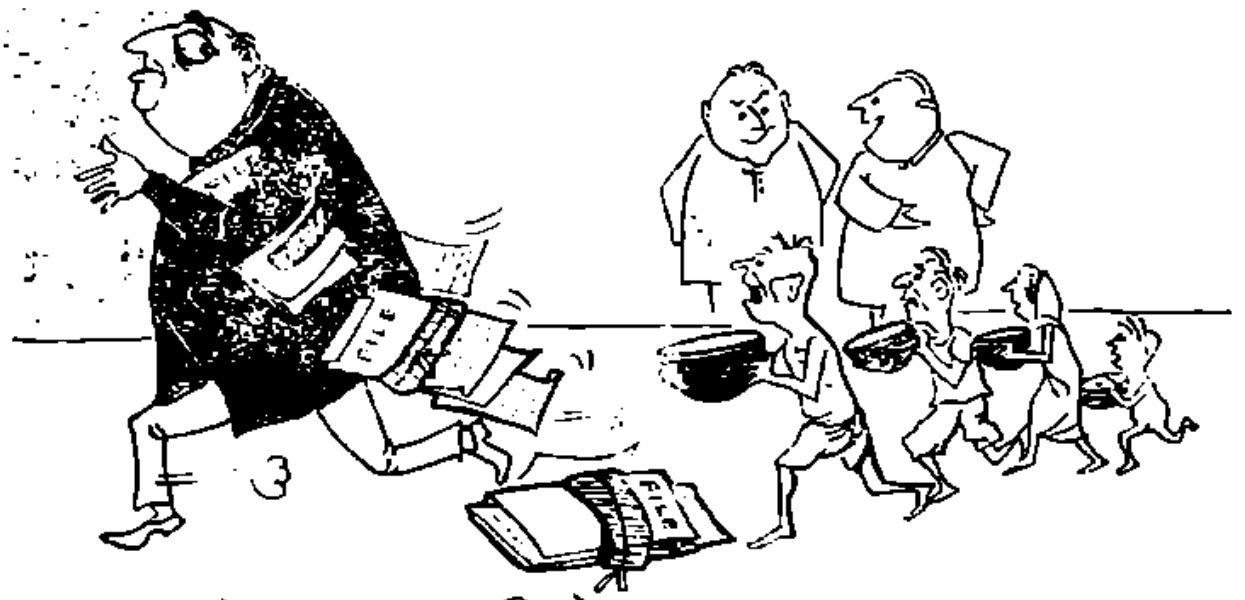

ইচ্ছে তো অনেক কিছুই ছিল.....

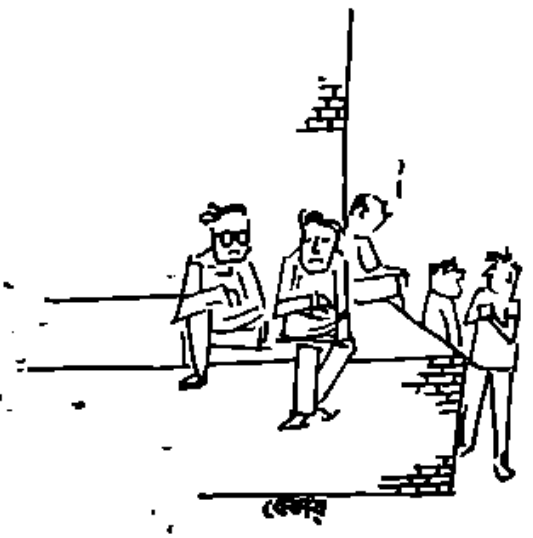

কিন্তু শেষে দাঁড়াল.....

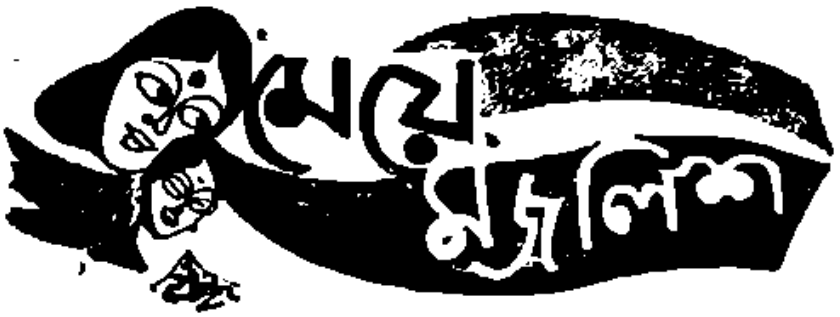

শ্রীপঞ্চমী

বেলা দে

শীত বিদায় নিল। এবার বসন্তের পালা। একটা আবর্তের ক্লান্তি থেকে যেন বসুধা মুক্তি পেলো। প্রকৃতি ও মানুষ এই দুইয়ের মধ্যেই এলো একটা আনন্দ ঋতুর আবর্তনের দিন। শীত বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাই গাছে গাছে, পাতায় পাতায় লেগেছে সবুজের ছোঁয়া। নবমঞ্জরীতে ভরেছে আমের ডাল। পলাশে আর শিমুলে চারদিক রাঙা!

তবুও কিন্তু বসন্ত ক্ষণিকের অতিথি। ক্ষণিকের অতিথির আবির্ভাবে তাই তো এত আয়োজনের সম্ভার। এই বসন্তের সুরু কিন্তু বসন্ত পঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমীতে। এই দিনেই বসন্ত-লীলার প্রথম আনুষ্ঠানিক উৎসবের সূত্রপাত। মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বাংলার বিদ্যার্থী বালক বালিকা মহাসমারোহে দেবী সরস্বতীর বন্দনা করে। সরস্বতী পূজা বৈদিকযুগে বিদ্যাসাধনার পূজা, বর্তমানে ছাত্রদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। প্রায় প্রতিটী বিদ্যালয়ে, কলেজে, সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে। আবার অনেকের বাড়ীতেও প্রতিমা এনে অথবা শুধু বই ও দোয়াত পূজার প্রচলনও দেখা যায়। শ্রীপঞ্চমীর অপর নাম লক্ষ্মী-পঞ্চমী। ঋগ্‌বেদে সরস্বতী দুটী, একটী স্বর্গে অপরটী মর্ত্যে।—মর্ত্যের সরস্বতী একটী নদী। স্বর্গের সরস্বতী শুভ্রা জ্যোতির্ময়ী নদী। ইনি দিব্য সরস্বতী। পুরাণে স্বর্গের সরস্বতীর নাম সুরগঙ্গা, আকাশ গঙ্গা মন্দাকিনী। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ দিব্য সরস্বতী দেখে শীতঋতুর ও বর্ষাঋতুর আগমন নির্ণয় করতেন। সে কালে পাঞ্জি ছিল না নক্ষত্র দেখে ঋতু নির্ণয় করা হোত। পুরাণের সরস্বতী ও লক্ষ্মী একেরই দুইভাগ। সুরগঙ্গা দুইয়েরই প্রতিমা। রামায়ণে ও পুরাণে ভগীরথ স্বর্গ থেকে সুরগঙ্গাকে মর্ত্যে এনেছিলেন। সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র তাঁর জলে প্লাবিত হয়ে তারারূপে বিদ্যমান আছেন। সুরগঙ্গা দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রা। একবার দেবাসুর মিলিত হয়ে দুগ্ধসাগর মন্থন করে তার ফলে শিবগঙ্গায় লক্ষ্মী আবির্ভূতা হয়েছিলেন। পুরাণে বিষ্ণুগঙ্গার দক্ষিণভাগের নাম বৈতরণী। সুরগঙ্গা দক্ষিণে পাতালে প্রবেশ করেছেন। অতএব লক্ষ্মী সরস্বতী একই। উভয়েই বেদের দিব্য সরস্বতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী যাঁর কৃপায় ধন, সম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, মেধাশক্তি লাভ করা যায়। তাই শীত ঋতুর আরম্ভে লক্ষ্মী-সরস্বতীর অর্চনা বৈদিক কালের স্মৃতি।

এ তো গেল পুরাণের কথা। কিন্তু বাইরের প্রকৃতিতে যখন সাজ বদল তখন আমাদের অন্তঃপুরেরও কিছু রূপ বদল হলে ঋতুর আবর্তনকে আমরা আরো ভালভাবে উপভোগ করতে পারি। প্রথমে ধরা যাক্ খাওয়া-বদলের কথা। আমাদের দেশে যেমন বারো মাসের তেরো পার্বণ আছে তেমনি আছে ঋতুভেদে আহারাদির ব্যবস্থা। সেই যে বারো মাসের পরাতনী চড়ায় আছে—

"আশ্বিনে অম্বিকা পূজা বলি পড়ে পাঠা,
কার্ত্তিকে কালিকা পূজা ভাই দ্বিতীয়া কোটা।
অঘ্রাণে নবান্ন নেব নূতন ধান কেটে,
পৌষমাসে বাউনি বাঁধবে ঘরে ঘরে পিঠে।
মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি,
ফাল্গুনেতে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।
চৈত্রেতে শ্রীফল মিঠে খেয়েছিলেন রাম
বৈশাখেতে খেতে মজা পোলখাছে আম।
জ্যৈষ্ঠেতে আম জাম আষাঢ়ে কাঁটাল,
শ্রাবণেতে খই দই ভাদ্রে পাকা তাল।
আশ্বিনেতে ঝুনো নারকোল
কার্ত্তিকেতে ওল।
অঘ্রাণে খেতে মজা
চিংড়ি মাছের ঝোল।
পৌষমাসে মূলো মুড়ি,
মাঘমাসে শিম বড়ি।"

ইত্যাদির উল্লেখ আছে--

আবার এই ধরণের ছড়া আছে খাদ্যতালিকায়
যেমন—"মাঘেতে মকর মিঠে কুর্ত্ত আলু শিম
ফাল্গুনেতে দু-গুণ মিঠে ধার্ত্তাকুতে নিম।

প্রভৃতি ছড়ার মধ্যে দিয়ে ঋতুভেদে একটা খাদ্য ব্যবস্থার কথা বিশেষ ভাবে জানতে পারা যায়। এগুলি সময় উপযোগী এবং এইসব খাদ্য ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি পালনের কথাও চিন্তা করা যায়।

তাই দেখি, শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রতিমাকে নিবেদন করা হয় শাঁকালু, পেয়ারা, কলা, কুল, কমলালেবু, শসা, বীরখণ্ড, পাটালী, কদমা ও নবান্নগুড়ের সন্দেশ। সরস্বতী পূজার পরদিন ষষ্ঠীতে পশ্চিমবঙ্গে পূর্বদিনের রাঁধা অন্নব্যঞ্জন খাবার রীতি আছে। বিশেষ করে 'পোটা সেদ্ধ'। এটা একটি উপাদেয় খাদ্য। আলুসুদ্ধের সঙ্গে শিম, আলু, বেগুন, শীতকালের যাবতীয় তরকারী আলু ডালের সঙ্গে রান্না করে খাওয়া হয়। আর থাকে কুলের অম্বল। পুত্রবতী মেয়েরা বাটনা বাটা শিলে পিটুলীর জলে বাটটি মানুষের মূর্তি লিখে হলুদে রংকরা একখানি কাপড় ঢেকে দেয়। ব্রাহ্মণ তাঁকে শীতলাষষ্ঠী নামে পূজা করে থাকেন। আগের দিনের রান্না পোটা সেদ্ধ ও ভাত পুত্রবতীরা খেয়ে থাকেন। এইদিন কোনো গরম জিনিস খাওয়া হয় না।

এরপর ঋতুভেদে সাজপোষাকের অদলবদলের কথাও মনে পড়ে বসন্তকালে গাছে গাছে, পাতায় যখন নিত্য সবুজের পরশ লাগে তখনই তো ইচ্ছে করে হাল্কা কচি কলাপাতা রংয়ের একখানি শাড়ী পরতে অথবা বাসন্তী রংয়ের শাড়ী গলায় হাতে সবুজ বা হলদে রংয়ের পুঁতির গয়না কপালে টিপ—বেশ মানায়! শ্রীপঞ্চমীর দিনটীতে বাংলার পূজাপ্রাঙ্গণে মুখর হয়ে ওঠে বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পরিহিতা মেয়েরা যখন প্রতিমার কাছে পুষ্পাঞ্জলি দেন।

বাংলাদেশে এক সময় এই বসন্ত পঞ্চমীতে প্রচুর ঁাক জমত হোত। আজ অবশ্য সর্বক্ষেত্রে সর্বজনীন উৎসব সেই স্থান অধিকার করেছে।

শীতকালীন পোষাক পরিচ্ছদ

আভা পাকড়াশী

শীতের সময় সাধারণতঃ সিল্কের শাড়ীই ব্যবহার করা ভাল! প্রথমতঃ শীত করবেনা দ্বিতীয়তঃ সিল্কের শাড়ী পরার এই তো মরশুম! উজ্জ্বল রংও বেশী ভাল লাগে শীতের দিনে। একটু পুরু সিল্কের শাড়ীই ভাল, এর সঙ্গে কলকাতার মত শীতে কনুই পর্যন্ত হাতের ভেলভেটের জামা করান, হাতে গলায় দিন সেসের বাহার বেশ গ্রেসফুল দেখাবে আপনাকে এই জামায়। বড় গোর একটি শাল জড়ান এর ওপরে।

এছাড়া লাইলন জর্জেট বা টেরিকটের মোমছাড়া শাড়ীগুলিও বেশ মনোরম! এগুলি পরেও সকালে বিকেলে যে কোন সময়ে বেরুতে পারবেন। ইস্ত্রি নষ্ট হবার বা টস্নি করারও প্রয়োজন হবেনা! এর সঙ্গে একটি কাডিগান বা হাফকোট সুন্দর লাগবে!

কোন পার্টিতে যেতে হলে পরুন তসর বেনারসী বা অ্যাডাপ্টার শাড়ী! এইসব শাড়ীর উজ্জ্বল রং আর মোনোগ্রামা পাড় সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর সঙ্গে ব্যবহার করুন সোনার গয়না। কিম্বা পাথর সেটিং-এর গয়না? গলার থেকেও কানের গয়না আর হাতের আংটির দিকে বেশী নজর দিন। শাড়ী বেশী দামী হলে আর পাড় চওড়া হলে গলার গয়নার ভারী অলঙ্করণ দেখায়, সেটি সুরুচীর পরিচয় নয়। এর সঙ্গের ব্লাউজ পরবেন এ শাড়ীরই সেড মিলিয়ে; কিন্তু একবারে সাদামাটা নেবেন! এতে করেও শাড়ীটিকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হবে, গায় দিন ভালো কাশ্মিরী শাল আর নয়তো ভালো উলের সাদা বা ঘিয়ে রংএর কাডিগান! পায়ের জুতোটি যেন বেশ রুচিপূর্ণ হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

যেসব দেশে বেশী ঠাণ্ডা সেসব জায়গায় পোষাকেরও তারতম্য হয়। উত্তর প্রদেশের মত জায়গায় বা কলকাতার একটু বাইরেই তো যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়ে। তাঁরা শাড়ীর নীচে সব প্রথমে ফ্লানার পরেন। সেজির তৈরী লম্বা পাজামার মত তারপর নরম গেঞ্জি ব্যবহার করুন। এগুলি ওপর থেকে দেখাও যাবেনা অথচ যথেষ্ট আরাম দেবে! বেশী শীতের জায়গায় মাথায় সিল্কের রুমাল বাঁধলে বা ঘোমটা দিলেও মানায় না, তাঁরা উল দিয়ে ঘোমটার আকারে মস্তক আবরণী বুনে নিন। কিম্বা পাতলা রঙিন জর্জের রুমাল বাঁধুন মাথায়। তাছাড়া মোজা আর বন্ধ জুতোও চাই শীতের হাত এড়াতে। তাহলে পাও কাটবেনা, বেশ নরম থাকবে।

আজকাল আবার লংকোটের খুব ফ্যাসান হয়েছে! যাঁর যেমনই চেহারা হোক তিনি লংকোট পরছেন। কিন্তু বেশ একটু লম্বা চেহারা ছাড়া ঐ হাঁটু পর্যন্ত নীচু লংকোট মানায়না! যাঁদের বেশ ভালো হাইট অথচ দোহারা চেহারা তাঁরাই এমনি টাইট ফিটিং এর লং কোট পরুন, তার নীচে পায়ে পরুন নাগরা। সুন্দর মানাবে। আর যাঁদের একটু ছোট গড়ন তাঁরা হাফকোট পরুন তাতে মানাবেও সুন্দর তাছাড়া যে

শাড়ীটি পরেছেন সেটিও কয়েকখানি রেখা হবে। নীচে ড্রয়ার পকন ঠাণ্ডাও লাগবেনা। মোজার তলায় জুতোটিতে যদি ছিদ্র থাকে তাহলে তো বেশ লজ্জাই দেখাবে।

চতুর্দশী আর পঞ্চদশীদের আর ভাবনা কি! তাঁদের জন্ম তো খুলে—আর পোষাক রয়েছে। পঞ্চদশ এর সালোয়ার কামিজ বা মোগলিনীর চুড়িদার পাজামা আর কাশ্মিরী মেয়ের ঢিলা কামিজ, কি নয়, এই শীতকালই আসলে সাজগোজ করার সময়টা যেন। মেকআপ করলে তা ঘামে গলে যাবেনা! চুলও বেশ পরিপাটি থাকবে বর্ষার জলে বিপর্যস্ত হবেনা! এই শীতের মরশুমে প্রাণভরে সাজা যায়। চতুর্দিকে যেমন নানারংএর গোপাল গাঁদা আর মরশুমি ফুলের মেলা তেমনি এই ছোটরাও তাদের সাজের বৈচিত্রে জীবনের আঙ্গিনায় রংএর বাহার আনবে। তাই এদের জন্ম চাই গরম কাপড়ের বা কটন উল এর রঙিন চুড়িদার; তার সঙ্গে ঝুমকো দেওয়া বোতাম লাগান কালো কাশ্মিরি কাজের বা সাদা কাঁচ বসান কাথিওয়াড়ি কাজের কাশ্মিরা মোজার তলায় সুন্দর নাগরা বা ছিল তোলাও। গায়ে হয় হাফকোট নয় একটি কার্ডিগ্যান যথেষ্ট। এরা তো আপন গন্ধে 'ম ম' করছে, এদের তো বেশী শীত করেনা। সব সময় ব্যবহারের জন্ম শীতের দেশ হলে সালোয়ার কামিজই ভাল। মাথায় বড় জোর একটি সুন্দর সুদৃশ্য রুমাল বাঁধবেন শুধু তাহলেই এদের পক্ষে যথেষ্ট।

এই শীত শুধু ভাল খাবারই সঙ্গে আনেনা আনে স্বাস্থ্যও; তবে সেই স্বাস্থ্য আহরণ করতে হবে ঘরে বসে কফি বা নতুন গুড় খেলেই হবে না। রোদের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়াতে হবে। তবেই আসবে দেহে লাবণ্য। মুখশ্রীতে পড়বে সহজ মেক-আপ। চুলে আসবে সজীব কোমলতা। অবশ্য মনও আনন্দে ভরে উঠবে! স্বাস্থ্যই হল আসল সৌন্দর্য, সেটি থাকলেই, আপনি যেমন সাজবেন সেই সাজই হবে আপনার উত্তম সাজ! শীতের রোদ খুবই স্বাস্থ্যপ্রদ! তার আলো ঝল মল রংএর সঙ্গে রং মিলিয়ে আপনার শাড়ী বাছুন।

———

অঙ্গনা-সংবাদ

দেবযানী

ফ্রান্সের রিপাবলিক এবং জার্মানীর খৃশ্চান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টের সম্প্রতি নির্বাচিত সদস্য হচ্ছেন শ্রীমতী ডঃ হেল্‌গা ওয়েস্ত্র। ফেডারেল চ্যান্সেলার ডঃ কনরাড আডেনহ্যারের মৃত্যুর ফলেই ডঃ ওয়েস্ত্রের এই নির্বাচনপর্ব। ইতঃপূর্বে দলের রিজার্ভ তালিকায় তাঁর নাম ছিল সবার উপরে।

ডঃ ওয়েস্ত্রের বর্তমান বয়স ৪৩ বছর। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ বছর বয়সে তিনি ডি. ফিল. ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ বছরেই ডঃ কনরাড প্রথম চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে ডঃ আডেনহ্যারের মৃত্যু হবার ফলে পার্লামেন্ট 'বুণ্ডেস্টাগ'-এ প্রবেশাধিকার পাওয়ার ব্যাপারটাকে কিন্তু শ্রীমতী হেল্‌গা খুব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি, কেননা তিনি মনে করেন যে এটা হল মরণের 'একনায়কত্ব' বা 'ডিক্টেটর শিপ' অতএব অবাঞ্ছনীয়।

১৯৬১ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ছ'বছর আগে যখন শ্রীমতী হেল্‌গা একটি জেলা থেকে খৃশ্চান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন তখন তাঁর দল যেমন বিস্মিত হয়েছিল, তিনি নিজেও তার থেকে কিছু কম অবাক হন নি। আজ ১৯৬৭ সালে পার্লামেন্ট সদস্য হয়ে কার্যকলাপ প্রধানতঃ সংস্কৃতিক ব্যাপার সমূহে সীমাবদ্ধ থাকবে—বিশেষ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে—বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন। এই ধরণের কাজের জন্যে তিনি সবিশেষ উপযুক্ত বলে সবাই মনে করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে খৃশ্চান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের রাইনল্যাণ্ড প্ল্যাট অ্যাসোসিয়েশন-এর সাংস্কৃতিক পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি।

ডঃ হেল্‌গা ওয়েস্ত্র দুটি সন্তানের জননী। স্বামী আইনজীবী, কিন্তু রাজনীতিতে অত্যন্ত আসক্ত, রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাঁরও আছে স্ত্রীর মতই। দম্পতির মধ্যে স্ত্রীই প্রথমে রাজনৈতিক কর্মধারা সুরু করেন বলে স্বামী তাঁকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

• • •

মিস্ আলেকজাণ্ড্রা (স্যাণ্ডি) ইয়ংসন এবং মিস ইসোবেল টার্ণার হচ্ছেন স্কটলণ্ডের মেয়ে, আর আর মিস্ মারিয়ানে ক্রুগার পশ্চিম জার্মানীর। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজনের বয়স যথাক্রমে তেইশ ও বাইশ, তৃতীয়ার বয়স জানা যায়নি। এঁরা তিনজনে মিলে ঠিক করেন, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক অঞ্চল থেকে সুরু ক'রে ল্যাটিন আমেরিকা, আটলান্টিক, আফ্রিকা, মধ্য-প্রাচ্য ও ইয়োরোপ এই অঞ্চলের ৪৫,০০০ মাইল বিস্তীর্ণ পথ পাড়ি দেবেন এবং তারপরে নিজের নিজের দেশে ফিরে যাবেন। সঙ্গে ওরা নেন টিজো-নামীয় কোস্টারিকা প্রদেশীয় একটি বাদুর, যাহন হিসেবে ব্যবহার করেন একটি ল্যাণ্ডরোভার গাড়ি এবং একটি

স্লোগান গ্রহণ করেন : "থ্রী মীলস এ্যাওয় দি ওয়ার্ল্ড"। গাড়িতে বোঝাই করা হয় স্লিপিং ব্যাগ, রান্নার সরঞ্জাম, খাবারদাবার, পেট্রোল, জলের পাত্র, ফার্স্ট-এড্ সরঞ্জাম, মশারি, কয়েকটা ক্যামেরা (২০০ রোল ফিল্মসহ), কতকগুলো জিনিস ভর্তি সুটকেস। ১৯৬৭-র ৫ই আগস্ট এই অভিযান আরম্ভ হয়েছে, আশা করা হয় ১৯৬৮-র জুন মাসের গোড়ায় সমাপ্তি হবে বিরাট প্রোগ্রাম।

• • •

লণ্ডন শহরের অধিবাসী ডেভিড হার্ট। স্ত্রী ডরোথীর বয়স বাইশ বছর। কিছুদিন ধরেই ডেভিড ডরোথীর পিছনে লাগতেন এই বলে : "মোটর গাড়ির মতন তোমার শরীরের সঙ্গেও বাড়তি টায়ার লাগিয়েছ যে, "বেশ ভুঁড়ি বাগাচ্ছো দেখছি দিন দিন,' ইত্যাদি। ডরোথী মহা জ্বালাতন হয়ে শেষে ঠিক করলেন, 'ডায়েট কণ্ট্রোল' ক'রে রোগা হতে হবে, 'ভুঁড়ি' কমাতে হবে। সেই অনুসারে তিন মাস চললেন, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হলনা। একদিন হঠাৎ পেটে এবং তলপেটে দেখা দিল তীব্র ব্যাথা, প্রচণ্ড বেদনা। ডাক্তার ডাকতে হল। ডাক্তারবাবু খুব ভাল করে মনোযোগের সঙ্গেই দেখেশুনে বললেন, 'দেখুন, আপনি তো মা হতে চলেছেন—খুব শিগগির, আজই, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে—তাই এই যন্ত্রণা।' বলে ডাক্তারবাবু ডরোথীকে হাসপাতালে চালান ক'রে দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই। সেখানে গিয়ে ডরোথী সত্যি সত্যিই মা হল—এই প্রথমবার। নবজাতকের ওজন দেখা গেল সাত পাউণ্ড। এই ঘটনার পরে পরম আশ্চর্যান্বিত ডেভিড হার্ট বলেন : 'এই আমাদের প্রথম সন্তান, কিন্তু ডাক্তারবাবু বলার আগে আমরা কোন লক্ষণই লক্ষ্য করিনি—আমাদের দুজনের কেউই ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারি নি যে ডরোথী অন্তঃসত্ত্বা—কী তাজ্জব।'

• • •

কিউবায় অবৈতনিক কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছড়াছড়ি দেখা যাবে শিগগিরই, তার তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের তথাকথিত ঝামেলা থেকে সে দেশের মায়েদের রেহাই দেবার জন্যে হয়ত এই ব্যবস্থা—এ কথা প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়।

পাঁচ দিন বয়স্ক থেকে ছ'বছর বয়স্ক শিশুদের দেখাশোনা সেবাযত্ন করবে এই কে-জি প্রতিষ্ঠানগুলো। ওখানে ইতঃমধ্যেই ২১৭টি নার্সারি কেন্দ্র আছে, আরো চল্লিশটি কেন্দ্র সমাপ্তির পথে। নতুন ব্যবস্থায় মোটমাট বহু শিশু অব্যাহতি পেয়ে তাদের মায়েদের, দিনের মধ্যে একটা বড় সময়াংশের জন্যে। আর এই 'ছাড়া পাওয়া মায়েরা' কী করবেন জানেন? তাঁদের কাজে লাগান যেতে পারবে দেশের শ্রম-শিল্প-সম্পর্কিত নানা প্রকল্প ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে। বাচ্চার ঝামেলামুক্ত মায়েরা আরো বেশি ক'রে কৃষিকর্মে ও অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থায় অবদান করতে পারবেন। নারী-প্রগতি ও পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দেবার প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হতে পারবেন। এখনকার প্রথা অনুসারে যেসব মায়েরা ঘরের বাইরে কাজকর্ম করেন, তাঁরা কাজের শেষে রাতে বাড়ি ফেরার সময় নার্সারি থেকে বাচ্চাদের বাড়ি নিয়ে যান সঙ্গে। নতুন ব্যবস্থায় বাৎসল্য রসটির ঝালাই আরো দূরে সরে যেতে পারবে—একাদিক্রমে কয়েকদিন ধরে মা যখন নিশ্চিন্তে দূরে ক্ষেতখামারে বা কলকারখানায় দেশোন্নয়ন করতে থাকবেন, সেই সময়ে সন্তান অপরের হাতে সুখে মানুষ হতে থাকবে।

ব্যবস্থা ভালই, নিঃসন্দেহে।

• • •

শ্রীমতী সুসান সোনট্যাগ হচ্ছেন বত্রিশ বছর শ্রীযুক্ত সোনট্যাগ—যিনি বিখ্যাত দার্শনিক বায়ট্রাণ্ড

রাসেলের মার্কিনী সেক্রেটারী—তাঁর সহধর্মিনী। সুলানের বয়স পঁচিশ এবং তিনিও মার্কিন মুলুকের মেয়ে। সম্প্রতি সুলান রালফ সাহেবের নামে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এনেছিলেন দুটি কারণ দেখিয়ে: এক স্বামীর যৌন অসামর্থ্য এবং দুই, স্বামীর অনীহা। এই দুটি কারণে শ্রীমতী সুলান নাকি বিব্রত, বিপর্যস্ত প্রায় এমর্মে শোনা গিয়েছিল। আদালতের রায় গিয়েছে স্ত্রীর পক্ষে এবং স্বামীর নিষ্ক্রিয়তার বিপক্ষে। বিচারকের মতে, ক্বচিৎ কদাচিৎ ছাড়া শ্রীরালফ নাকি দেহপ্রকাশন বা স্নান করতে রাজি হতেন না, যার ফলে শ্রীমতী সুলানের হত মহা মুশকিল ও বিড়ম্বনা।

• • •

আমেরিকার মেয়ে এলিজাবেথ স্পেন্সার। তিনি সুপরিচিত সাহিত্যিক হিসাবে। ওঁর লেখা উপন্যাসের পাঠক অনেক, অনেক গুণগ্রাহী। সেইসব বইয়ে যেমন থাকে বৈচিত্র্যের খেলা তেমন থাকে চরিত্রায়ণের কৃতিত্ব। তার ফলে বইগুলি সাধারণতঃ 'ঝুলে' পড়ে না, বিরক্তি বা একঘেয়েমির উদ্রেক করে না। আর বাজারে কাটতিও বেশ ভাল, নতুন বই বেরুলে চাহিদা পড়ে যায় পাঠকদের মধ্যে। উপন্যাস ছাড়া এলিজাবেথ গল্পও লিখে থাকেন, গল্পের বইগুলিরও সমাদর খুব। এঁর সাম্প্রতিকতম যে বইখানি বাজারে ছাড়া পেয়েছে সেটি একটি উপন্যাস, মার্কিন পটভূমিতেই লেখা নাম 'নো প্লেস ফর য়্যাান এঞ্জেল'—মাতৃত্বদয়ের এক বিশেষ দিগন্তের উন্মোচন বইটির উপজীব্য। উপন্যাসখানি এলিজাবেথের জনপ্রিয়তা আরো বাড়িয়ে দেবে বলে অনেকেই মনে করেন।

• • •

আমেরিকার আরেক মেয়ে মেরিয়ান মূর। ইনিও সুপরিচিত একজন সাহিত্যিক। তবে ইনি কলম চালনা করেন গদ্যে নয়, পদ্যে, ছন্দে। আধুনিক আমেরিকার যত জন খ্যাতনাম্নী মহিলা কবি আছেন তাঁদের সবার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা—যতদূর জানা যায়—ইনিই। এই তো সেদিন ইনি আশী বছরে পা দিলেন।

শ্রীমতী মূর জাতিতে নিগ্রো। নিগ্রো মহিলা কবিদের মধ্যে তিনি তো শীর্ষস্থানীয়া বটেই, অ-নিগ্রো মহিলা কবিদের মধ্যেও অগ্রগণ্যা। খ্যাতি প্রচুর পেয়েছেন এই দীর্ঘ জীবনে। আধুনিক ইংরেজি ভাষার কাব্য-জগতে মেরিয়ান এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এবং এই উজ্জ্বলতা নিয়ে তিনি বিরাজ করছেন চল্লিশ বছর ধরে। আশী বছর বয়সে আজ তাঁর মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু মনের সবুজ আর আত্মার আভিজাত্য অটুট। কাব্যসাধনার স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন অনেকবার, বার বার নিউইয়র্ক (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র) শহরের কবি শ্রেষ্ঠ বা 'পোয়েট লরিয়েট'-এর সম্মান তিনি পেয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ জন্মদিনে 'পোয়েট্রি সোসাইটি অব আমেরিকা' একটি বিশেষ সোনার পদক দিয়ে তাঁকে ভূষিত ও অভিনন্দিত করেছেন। ইং ১৯৫১ সালে মেরিয়ান লাভ করেন 'বলিঙ্গেন প্রাইজ' ১৯৫২ সালে বিখ্যাত 'পুলিট্জার প্রাইজ' আর ১৯৫৩ সালে 'ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব আর্টস য়্যাণ্ড লেটার্স'-এর স্বর্ণপদক। ১৯৫২ সালে 'ন্যাশন্যাল বুক য়্যাওয়ার্ড' ও তিনি লাভ করেন। এবং এ সবই কাব্য রচনার স্বীকৃতিসূচক। ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউটের সভ্যপদেও তিনি মনোনীত হয়েছেন। মিস্ মূরের হালের কবিতার বইটির নাম 'টেল মি, প্র্যানাইট, স্টীল য়্যাণ্ড আদার টপিক্স্'—তাঁর অন্তরচিত্র, জীবনদর্শন ও আনন্দ-বেদনার দর্পণ এই বইখানি।

• • •

ইংরেজ দুহিতা মিস্ মার্গোরেট ক্লিড-এর বয়স আঠারো বছর। দোকান এবং অন্যান্য স্থান থেকে জামাকাপড় চুরি করা এবং বিভিন্ন গ্যাস মিটার থেকে পয়সাকড়ি নিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তার জেল হয়ে

যায়। সম্প্রতি এই মেয়েটির বিয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এবং সেই বিয়ে উপলক্ষ্যে যৌতুক বা উপহার হিসেবে কারাকর্তৃপক্ষ তাকে দান করেছেন তার স্বাধীনতা অর্থাৎ মার্গারেটকে এবার (কারাকাল শেষ হবার আগেই) ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এবার বিয়ের ব্যাপারটা বলি: অনেক বাদ প্রতিবাদের বহর ডেইল, বিচারকদের কাছে আর্জি পেশ করেছিলেন মার্গারেটকে ছেড়ে দেবার জন্যে, কারণ তিনি ওকে বিয়ে ক'রে সংসার পাততে চান। বিচারকরা নরম হয়েছেন, রাজি হয়েছেন এই প্রস্তাবে। তাঁদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেছেন এই বলে যে, বিয়ে জিনিসটাই মানুষকে স্থিতিশীল হতে, সুস্থির হতে প্ররোচিত করে। সেই বিয়ে যদি কোন সৎ বিচারশীল, স্থিরমস্তিষ্ক পুরুষের সঙ্গে হয়, তাহলে যে কোন কলহপ্রিয়া মেয়েরই শান্ত, বিবেচক ও সংযত হয়ে যাবার কথা। অতএব আশা করা যায় যে মার্গারেট ক্লিভও অতঃপর 'ভাল মেয়ে' হয়ে ঘরকন্না করবে।

* * *

বেটি গ্র্যাবল্ হলিউডের অন্যতমা নায়িকা ছিলেন। এঁর নাম আমাদের মধ্যেও অনেকেরই জানা। এঁর সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা যাক।

সারাদিনে কিন্তু ষ্টুডিওতে গ্র্যাবলের কাজের ধারাটা যে খাতে বইত এবং যে সুরে বাজত, তারই প্রতিফল ফুটে উঠত রাত্রে শুতে যাবার সময়—তাঁর শয়নপোষাকের ধরণে ও পরিবর্তনে। অর্থাৎ বিশেষ রকমের কর্মসূচী, (সেই সঙ্গে মেজাজের প্রশ্নও অবশ্যই জড়িত) অনুসারে বিশেষ বিশেষ নৈশপরিধান ব্যবহার করতেন এই নায়িকাটি।

ষ্টুডিওতে যেদিন খুব ধকল যেত, বিরক্তির কারণ ঘটত, সেদিন বেটি দর্জির হাতের তৈরি মিহি কালো রঙের এক ধরণের কাপড়ের পায়জামা পরে শুতে যেতেন রাত্রে। স্টুডিওর কাজ যেদিন মোটামুটি হালকা থাকত, কোন অস্বস্তিকর ঘটনা না ঘটত, দৃশ্যের 'রি-টেক' বেশি নেওয়া হত না—সেদিন ব্রেক একটি নাইট গাউন পরতেন, মাঝবরাবর একটি সাটিনের ফিতে বেটির ২৩ ইঞ্চি মাপ কোমরের কোমরবন্ধনীর কাজ করত।

সুদৃশ্য পালঙ্কের অধিকারিনী গ্র্যাবল্-এর শোবার পোষাক সম্বন্ধে রঙের কোন বিশেষ বাধ্যবাধকতা ছিল না। শাদা রক্তরাঙা, কালো—যখন, যেমন খুশি বা হাতের কাছে যা থাকত, প'রে শুয়ে পড়তেন—খাটটি কিন্তু বিরাট আকারের, প্রমাণ সাইজের চেয়েও মাপে বড়। মাথার নীচে বালিশ থাকত না, অমনিই শুতেন। গায়ের ওপরে কিন্তু চাপা দিতেন সাটিনের খোলের তৈরি নরম তুলোর তুলতুলে লেপ। একেকদিন রাত্তিরে বেটি গ্র্যাবল্ পরণের সমস্ত পোষাক খুলে ফেলে দিয়ে পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় শুয়ে থাকতেন—এটা ঘটত যখন দৈহিক বা মানসিক কোন অস্বস্তি বা চাঞ্চল্য অনুভব করতেন। ঘুমন্ত অবস্থায় এই ধরণের কোন অনুভূতি হলে তিনি জেগে উঠে পোষাক ত্যাগ ক'রে ফের শয্যাগ্রহণ করতেন।

* * *

কয়েকমাস আগে আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইস্রেল-এর যে লড়াই হয়ে গেল, তাতে ইস্রেলী জেনারেল মোশে ডায়ান নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনানায়ক হিসেবে। সেকথা আমরা সকলেই জেনেছি। কিন্তু আমরা একথা জানতাম না যে, তাঁরই কন্যা ইয়েল ডায়ান ইস্রেলী সাহিত্যে অত্যন্ত সুনামের অধিকারিনী। ওদেশে এই মহিলাটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয়। সম্প্রতি উনি দুখানি বই লিখেছেন। একটির নাম 'ডেথ হ্যাড্ নো সন্স্।' অন্যটির নাম 'ইস্রেল জার্নাল, জুন, ১৯৬৭'—উপরি উক্ত আরব-ইস্রেল যুদ্ধকে ভিত্তি করে তিক্ততা, নিষ্ঠুরতার ও ভয়ানকতার একখানি ছবি এঁকেছেন ইয়েল এই বইটিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে।

———

রত্নাকর

"If the government really wished to honour me and through myself, the cause I have served for nearly forty years, a more befitting tribute would have been the gift of a public stage to the city of Calcutta."

Sisir Kumar Bhadury.

যাত্রাদলের কথা

নাটারস পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দিতে বাংলাদেশে যাত্রার ঐতিহ্য ও অবদান অনস্বীকার্য। গিরিশচন্দ্র থেকে সুরু করে শিশিরকুমার—সকলেই যাত্রাকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু থিয়েটারের শিল্পী, তাঁদের জীবন ও কর্মকৃতি সম্বন্ধে আমরা যতটা অনুসন্ধিৎসু ও আগ্রহশীল, যাত্রাশিল্পীদের সম্পর্কে ঠিক তেমনই উদাসীন। কিন্তু তাঁদের জীবনেও এমন সব ঘটনা ও কাহিনী আছে যেগুলি নিঃসন্দেহে বলবার মত। এইখানে যাত্রা শিল্পীদের সম্পর্কে কয়েকটি টুকরো কাহিনী পরিবেশিত হল। কাহিনীগুলি সংকলন ও গ্রথন করেছেন শ্রীরবিশঙ্কর। এই কাজে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। যাত্রার ইতিহাস নামে শ্রীরবিশঙ্করের প্রামাণ্য গ্রন্থটি শিগ্রই প্রকাশিত হবে। সেই গ্রন্থ রচনার সময়ে শ্রীরবিশঙ্কর কয়েকজন নামী যাত্রা শিল্পীদের কাহিনীগুলি সংগ্রহ করেছেন। এ মাসের রচনাটি যদি পাঠকদের ভাল লাগে তাহলে এর পরেও শ্রীরবিশঙ্কর আরো কাহিনী শোনাবেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যাত্রাওয়ালা বীরভূমের রামবাটীর পরমানন্দ অধিকারী যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। ইনি কালীয় দমন যাত্রার প্রবর্তক শিবরামের (১৭৪০) শিষ্য।

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম সঙ্গীতে পরমানন্দ সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে নানা মুখরোচক গল্প চালু রয়েছে।

শোনা যায় পরমানন্দের দেহের ওজন হাতীর সমান ছিল। আকৃতি দানবের মতো।

পূর্বে যাত্রাগান হতো দিনের বেলায়। পরে অবশ্য যাত্রার আসর বসতো সন্ধ্যার পরে। আলো বলতে বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন আর বাতিদান, যাতে আলো নিভে না যায় সে জন্য কাঁচের ঢাকনি থাকতো।

পোষাক পরিচ্ছদ বলতে সেকালে কোন বালাই ছিল না। যেখানে যাত্রাগান হতো যাত্রাওয়ালারা ঐ অঞ্চল থেকে পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করতেন। অলংকার ও সোনার গহনা তাঁরা চোর ডাকাতের

ভয়ে সংগে রাখতেন না। এমন কি টাকা পয়সাও নয়। ঠগী ও ঠেঙাড়েদের ভয়ে দিনের বেলাতেও কেউ একাকী বাঠ পেরিয়ে গন্তব্যস্থলে যেতে সাহসী হতেন না।

একবার এক জমিদার বাড়ী থেকে যাত্রা গান করে দলবলসহ পরমানন্দ বাড়ী ফিরছেন। পথে এক নির্জন স্থানে তাঁবু খাটিয়েছেন পরমানন্দ এবং একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে মনের সুখে তামুক সেবন করছেন। স্তব্ধ নির্জনতা নেমেছে পথে প্রান্তরে, দুপুর গড়িয়ে পড়েছে, বিকালের মিঠে রোদ রক্তিম হয়ে উঠেছে দিগ্‌দিগন্তে।

দুজন অপরিচিত লোক ঘুর ঘুর করছে। তাদের ভাব ভঙ্গি, গতিবিধি পরমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করল। পরনে আধময়লা জামা কাপড়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে, কোটরাগত চোখ, ভোবড়ানো গাল, সব মিলিয়ে অদ্ভুত মূর্তি।

হাতের ইসারায় দলের একজনকে ডাকলেন পরমানন্দ, তার কানে কি যেন বললেন। দলের লোক চলে গেল, ফিরে এল টিনের পাতের তৈরী তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে।

গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বেশ স্বাভাবিক গলায় পরমানন্দ বললেন, "ওরে, এগুলো ভাল করে পরিষ্কার করে রাখ। রাতে ওস্তাদ বাড়ীতে যেতে হবে যে।"

দূরে দাড়িয়ে অপরিচিত লোক দুটো যা দেখল তাতে তাদের চক্ষু স্থির। এক বাক্স হাতিয়ার! কত রকমের অস্ত্র। তারা লক্ষ্য করলো দলকর্তার চোখ দুটো যেন হিংস্র নেকড়ের মত জ্বল জ্বল করছে।

বিকালের শেষ রোদ অনেক আগেই পালিয়ে গেছে, চারিদিকে একটা ছায়া ছায়া ভাব। অস্পষ্ট আলো এসে পড়েছে তাঁবুর সামনে। তাঁবুর ভেতর বসে আছেন পরমানন্দ। তাঁবুর বাইরে কোলাহল হয়েছে বড় বাতি দান, আলোয় ঝলমল করছে সারা জায়গাটা।

তাঁবুর বাইরে সামান্য কোলাহল শুনে বাইরে এলেন পরমানন্দ, দেখলেন সেই অজানা দুজন লোকের সঙ্গে রয়েছে এক যমদূত। পরমানন্দকে দেখতে পেয়েই যমদূত এগিয়ে এসে তাঁর দু পা জড়িয়ে ধরলো, বলল, "তোমাকে সর্দার মানছি, তুমি কিছু মনে করোনা, মাখম ডাকাত আর কারো কাছে মাথা নত করেনি।"

পরমানন্দের মূর্তিটা তখন ঠিক শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ বজ্রভরা মেঘের মত স্থির। ক্রোধ আর বিতৃষ্ণা যেন ফুটে উঠছে চোখের দৃষ্টিতে।

—"তোমার এত লোকজন, এত অস্ত্র শস্ত্র, আর আমি কিনা তোমারই উপরে ডাকাতি করার মতলব করছিলাম।"

মাখম ডাকাত তাকালো ব্যাকুল আকুতি ভরা চোখে। দৃষ্টিতে অসহায় ভাব, পরমানন্দ মাখম ডাকাতের গায়ে প্রবল ঝাঁকি দিয়ে বললেন—"যা, তোকে ক্ষমা করলাম, মনে রাখিস আমার নাম পরমা।"

মাখম ডাকাত চলে যাবার পর আসল ঘটনা যখন দলের লোকজন শুনতে পেল তখন সবাই ভাবলো এ যাত্রায় সবাই বেঁচে গিয়েছে শুধু মাত্র কর্তাঠাকুরের উপস্থিত বুদ্ধিতে।

সেকালে পরমানন্দের মত যাত্রাওয়ালা খুব কমই ছিল। 'মানের' পালায় পরমানন্দ যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তাতে তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে সেকালের সেরা যাত্রাকর বলে স্বীকার করেছিলেন।

• • •

করাস ডাঙ্গায় থাকতেন যাত্রাকর গুরুপ্রসাদ বল্লভ, চণ্ডী যাত্রায় গুরুপ্রসাদ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। গুরু বল্লভ সাধারণত কবি কঙ্কন বিরচিত 'চণ্ডিকা মঙ্গল' গ্রন্থের মশানের পালা গাইতেন।

১২৮৮ সনের মাঘের ভারতী পত্রিকায় চণ্ডী যাত্রা সম্পর্কে এক চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

একবার কোন ধনীর প্রাসাদে গুরু প্রসাদ বহুতের চণ্ডীযাত্রার গান হয়েছিল। গুরু বল্লভ যখন শ্রীমন্তের বিদায় এবং রাজার নিকট শ্রীমন্তের আত্মপরিচয় ও দক্ষিণ মশানের বনিক তনয়ের কাতরোক্তি প্রভৃতি বিষয় করুণাপূর্ণ সুরে এবং উপযোগী তাল মান সহকারে প্রকাশ করতেন তখন দর্শকরা কেঁদে লুটিয়ে পড়তো। আসরে সবাই কাঁদছে। বাড়ীর কর্তা মশাই শ্রীমন্তের বন্ধন দশা দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। শ্রীমন্তের আর্তনাদ ও কাতরোক্তি সহ্য করতে না পেরে গৃহকর্তা সেই কোটাল বেশধারী রাজদূতদের কাছে গিয়ে শ্রীমন্তের বন্ধন খুলে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন, এমন কি একতাড়া নোট তাদের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'শ্রীমন্তকে ছেড়ে দাও।'

* * *

বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা স্বর্গত ফণীরায়ের প্রকৃত নাম পণ্ডিত পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন। পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন ছিলেন যাত্রার বিখ্যাত পালাকার, অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক। যাত্রাজগতের অনেকেই তাঁর কাছে ঋণী আছেন।

স্বর্গত নবদ্বীপ হালদার পরবর্তীকালে চিত্রজগৎ ছেড়ে যাত্রা জগতে যোগ দিয়েছিলেন 'তরুণ অপেরায়'। নবদ্বীপ বাবুকে ফণীরায় একবার একটি গল্প করেছিলেন। গল্পটি নকল করে নবদ্বীপবাবুর রেকর্ড করেছিলেন। ঘটনাটি সত্য কাহিনী।

এক বার এক গ্রামে গোকুল কৃষ্ণের 'সীতাহরণ' পালা হচ্ছে। রাবণ সেজেছেন গোষ্ঠ পাল। গোষ্ঠ পাল পূর্বে মধুর সার দলের অভিনেতা ছিলেন, পরে নিজে দলের বীণাপাণি অপেরা খুলেছিলেন।

স্বর্ণমৃগ ধরতে রামচন্দ্র গেছেন। সীতার তিরস্কারে অতিষ্ঠ হয়ে লক্ষ্মণও চলে গেছেন, কুটীরে সীতা একা রয়েছেন। সন্ন্যাসীর বেশে এসেছেন রাবণ। রাবণের কথায় যখন গতি পেরিয়ে সীতা ভিক্ষা দিতে উদ্যত হলেন, এবং নিজ মূর্তি প্রকাশ করে রাবণ সীতাকে যখন চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সীতার চিৎকারে গ্রামের মোড়ল আসর ছেড়ে দাঁড়িয়ে পথরোধ করে বলে উঠল, 'পালা রাবণ, আমার গ্রামে সীতা চুরি করতে এসেছো।'

মোড়লকে কেউই বোঝাতে পারলনা, যে এটা অভিনয় হচ্ছে। বেচারা রাবণ মারের ভয়ে পালিয়ে বেঁচেছিলেন।

নানা প্রসঙ্গ

চৌষট্টি কলা

প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে দেখা যায় কাব্যকে নাট্য শাস্ত্রের মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীনকালে কাব্য বলতে নাটকই বোঝাতো। কাব্যের অর্থ রসাত্মক বাক্য। কাব্য দু' প্রকার—দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্য কাব্য। নাটক দৃশ্য কাব্য। চৌষট্টি কলার প্রায় প্রত্যেক অংশই নাটকে কাজে লাগে। তাই এখানে চৌষট্টি কলার বিবরণ (যা কয়েকজন পাঠক জানাতে অনুরোধ করেছেন) দেওয়া হল। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের এই তথ্য আনন্দ দেবে।

১। নৃত্য—কৌশল যুক্ত বিবিধ নর্তন। ২। গীত—গান শেখা, গান বাঁধা, তালমাত্রা রচনা করা। ৩। বাদ্য—বোল তৈরী করা, বাজনা, সুরজ্ঞান। ৪। নাট্য—অভিনয়। ৫। আলেখ্য—বর্ণজ্ঞান, ছবি

আঁকা। ৬। বিশেষকচ্ছেদ্য—নানারকম তিলক রচনা। ৭। তণ্ডুল কুসুম বলিবিকার—তণ্ডুল ফুল ইত্যাদি দিয়ে নানারকম পূজার উপকরণ তৈরী করা। ৮। পুষ্পাস্তরণ—ফুল দিয়ে শয্যা রচনা। ৯। দশন বসনাঙ্গ রাগ—দশন বসন ও অঙ্গের রঞ্জন ভেদ। ১০। মণি ভূমিকা কর্ম—ময়দানব নির্মিত পাণ্ডব সভার মত মণিবদ্ধ ভূমিক্রিয়া। ১১। শয়নরচনা—পালঙ্ক নির্মাণ কৌশল। ১২। উদক বাদ্য—জলতরঙ্গ। ১৩। উদক ঘাত—জলস্তম্ভ বিদ্যা। ১৪। চিত্রাযোগ—নানা অদ্ভুত ক্রিয়া দেখাবার উপায়। ১৫। মাল্যগুন্থন বিকল্প—ফুলতোলা, মালাগাঁথা। ১৬। শেখরাপীড় যোজন—মাথায় চূড়, কিরীট, প্রভৃতি তৈরী করা। ১৭। নেপথ্য-যোগ—বেশ রচনাচাতুরী। ১৮। কর্ণপত্রভঙ্গ—কর্ণভূষণ রচনা। ১৯। গন্ধযুক্তি—গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা। ২০। ভূষণ যোজন—অলংকার তৈরী করা। ২১। ঐন্দ্রজাল—মায়া বিদ্যা। ২২। কৌচুমার যোগ—বহুরূপীর খেলা। ২৩। হস্তলাঘব—অঙ্গের অলক্ষ্যে নিজেকে সুন্দর করে দেখাবার কৌশল। ২৪। চিত্র পাক ক্রিয়া—নানারকম রান্না করা। ২৫। পানকরসরাগাসব যোজন—পানীয় বস্তুতে নানা রস রচনা। ২৬। সূচীবাপকর্ম—শানিত অস্ত্র দিয়ে দাড়ি কামানো। ২৭। সূত্রক্রীড়া—সুতো দিয়ে পুতুল নাচ। ২৮। প্রহেলিকা—কথা দিয়ে ধাঁধা সৃষ্টি করা। ২৯। প্রতিমালা—জড়বস্তুর প্রতিকৃতি আঁকা। ৩০। দুর্বচক যোগ—অসাধ্যসাধন করবার উপায় নির্ধারণ করা। ৩১। পুস্তক রচনা—বানিয়ে বানিয়ে তাড়াতাড়ি পড়া। ৩২। নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন—নাট্যশাস্ত্রে জ্ঞান ও নাট্যে পরিচ্ছন্নতা। ৩৩। কাব্য সমস্যা পূরণ—কাব্যের গুপ্ত পদ পূরণ করার কৌশল। ৩৪। পট্টিকাবেত্র বানবিকল্প—পাতলা প্রভৃতিতে নানা রকম ছক কাটবার উপায়, বেতের কাজ। ৩৫। তক্ষ্ণকর্ম—টাকু ঘোরানো। ৩৬। তক্ষণ—সূত্রধরের কাজ। ৩৭। বাস্তুবিদ্যা—বাড়ী তৈরী করার বিদ্যা। ৩৮। রূপ্যরত্ন পরীক্ষা—জহুরীর জ্ঞান। ৩৯। ধাতুবাদ—রসায়ণ বিদ্যার জ্ঞান। ৪০। মণিরাগ জ্ঞান—মণিতে রাগ তৈরীর জ্ঞান। ৪১। আকরজ্ঞান—ভূতত্ত্বজ্ঞান। ৪২। বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ—মৃতপ্রায় গাছে ঔষধ দেওয়ার জ্ঞান। ৪৩। মেষ কুক্কুটাদি যুদ্ধবিধি—মেড়া মুরগীদের লড়াই করা শেখানো। ৪৪। শুক-সারিকা প্রলাপন—শুক সারি পাখীদের পড়ানো। ৪৫। উৎসাদন—বাস্তুচ্যুত করার কূটবিদ্যা। ৪৬। কেশমার্জন—চুল বাঁধা। ৪৭। অক্ষরমুষ্টিকা কথন—এক প্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা, হাতের মুঠোর মধ্যে কী আছে তা বলে দেবার কৌশল। ৪৮। ম্লেচ্ছকবি কল্প—ম্লেচ্ছদের ভাষা ও শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান। ৪৯। পুষ্প শকটিকানির্মিত জ্ঞান—একপ্রকার বিশেষ বিদ্যা যার দ্বারা মানুষকে বশীভূত করা যায়। ৫০। দেশভাষা জ্ঞান—নানা দেশের ভাষা জ্ঞান। ৫১। যন্ত্রমাতৃকা—পূজার জন্য যন্ত্রনির্মান। ৫২। ধারণ মাতৃকা—ঐ সব যন্ত্রের ব্যবহার জ্ঞান। ৫৩। সম্পাট্য—হীরের পল তোলা। ৫৪। মানসীকাব্য ক্রিয়া—অপরের মনের কথা শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ করা। ৫৫। ক্রিয়া বিকল্প—এক একটা কাজ নানাভাবে করা। ৫৬। ছলিতক যোগ—অপরকে ঠকাবার কৌশল। ৫৭। অভিধান কোষ ছন্দো জ্ঞান—শব্দের অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা। ৫৮। বস্ত্রগোপন—সুতোর কাপড়কে রেশমী কাপড়ে রূপান্তরিত করবার চাতুরী। ৫৯। দ্যূতবিশেষ—পাশাখেলা। ৬০। আকর্ষক্রীড়া—মায়া বিদ্যা বিশেষ। ৬১। বালক ক্রীড়নক—খেলনা তৈরী করা। ৬২। বৈনায়িকী বিদ্যাজ্ঞান—শাস্ত্র জ্ঞান। ৬৩। বৈজয়িকী বিদ্যাজ্ঞান জয়লাভ করার বিদ্যা। ৬৪। বৈজ্ঞানিকী বিদ্যাজ্ঞান—যে বিদ্যা দ্বারা বেতাল প্রভৃতি অপদেবতাদের বশীভূত করা যায়।

প্রাচীনকালে মুনিঋষি পণ্ডিত শাস্ত্রকারদের জ্ঞান ও দৃষ্টি কত গভীর ও ব্যাপক, মানুষের জীবনে যা কিছু জানার থাকতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁদের নির্দেশের মধ্যে ও পাঠ্যসূচির মধ্যে কী বিস্ময়কর সীমাহীন ব্যাপ্তি, তার পরিচয় পেয়ে অবাক লাগে।

আন্তর্জাতিক　　আজকের সোভিয়েত মঞ্চ

রুশ বিপ্লবের ৫০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে সে দেশে আজ অভূতপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্য। শুধু সে-দেশে নয়, পৃথিবীর যেখানে যেখানে রুশদূতাবাস বা ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠান আছে সেসব দেশেও সাড়ম্বরে বিপ্লব বার্ষিকী প্রতিপালিত হচ্ছে।

রাশিয়ার আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে আনন্দ এবং সার্থকতার প্লাবন এসেছে, সে দেশের মঞ্চেও তার স্রোত বয়ে চলেছে। নাটমঞ্চকে রাশিয়ানরা জীবন-সম্প্রসারণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বলে মনে করে। অন্য সকলপ্রকার অগ্রগতি সূচক কর্মোদ্যমের সঙ্গে নাটমঞ্চও সমানতালে পা ফেলে চলেছে। রাশিয়ার নটনাট্যকার থেকে শুরু করে নাটমঞ্চের সকল বিভাগের কর্মী এবং কলাকুশলীরাও সমানভাবে সমাদৃত।

বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোভিয়েত নাটমঞ্চ একটি বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখেছে: সোভিয়েত মঞ্চ শিল্পের গতি ও প্রকৃতি দেশের শিক্ষা বিস্তারে নাটমঞ্চের অবদান, দেশের মানুষকে মহত্তর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করার কাজে এবং দেশের বর্তমান অবস্থাকে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াস সোভিয়েত নাটমঞ্চে কতখানি সাফল্য অর্জন করেছে তা নিরূপণ করা—এই লক্ষ্যগুলি সামনে রেখে সোভিয়েত নাটমঞ্চ দেশবাসীর জন্যে যে বিরাট ব্যাপক ও সার্বজনীন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা সার। জগতের নাট্য ও শিল্প সমালোচকদের বাহবা আদায় করেছে।

মস্কোয় ৩টি রঙ্গমঞ্চে ৮৫টি নতুন পুরোনো নাটকের অভিনয় চলেছে পালা করে। অনেকগুলি নাটকেই অক্টোবর বিপ্লবকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। কয়েকটি নাটকে বিগত ৫০ বছরের কর্মোদ্যম চিত্রিত। অনেকগুলির মধ্যে জীবনের আদর্শবাদ ঘোষিত।

বলশয় থিয়েটার দুটি নাটক দিয়ে মরশুম শুরু হয়েছে। একটি অপেরা, নাম 'নাচওয়ালী'। অপরটি গভীরভাবের নাটক, নাম 'অজ্ঞাত সৈনিক'।

মেলি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছে দুটি নাটক, একটি অক্টোবর বিপ্লবের পটভূমিকায় অপরটি এক কূটনৈতিক কাহিনী নিয়ে রচিত।

মস্কো আর্ট থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে একটি জীবনী নাটক। প্রথম সোভিয়েত মহিলা-কূটনীতিবিদ আলেকজান্দ্রা কল্লোন-টাইন-এর ঘটনাবহুল জীবনী এই নাটকে বিধৃত।

মায়াকোভস্কি থিয়েটারে যে নাটক শুরু হয়েছে তার মুখ্য চরিত্র হলেন লেনিন।

"টেন ডেজ দ্যাট শুক দি ওয়ার্ল্ড"—আমেরিকার লেখক জন রীড রুশ বিপ্লবের উপর ঐ নামে যে বইটি লিখেছিলেন সেই বই এবং তার লেখক সারা সোভিয়েতে বিশেষ সমাদৃত। রীডের জীবনী নিয়ে নাটক লিখেছেন সেখানকার উদীয়মান নাট্যকার সিমোনোভ। সেই নাটক মেলি থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে।

পুরাতন নাটক, ক্লাসিক নাটক, অন্যান্য দেশের নাটক—এসবেরও অভিনয় চলেছে। থিয়েটার অফ ন্যাশন্স মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে শেকসপীয়ারের কিং হেনরী। পরবর্তী আকর্ষণ ডনচয়ভস্কীর ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট।

বিপ্লবের সুবর্ণ জুবীলি বছরে সোভিয়েতের প্রতি শহরে, জনপদে, গ্রামে হাজার হাজার মঞ্চে নতুন

দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সৃষ্টি করে নাট্যকার একে একটি বিশিষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন যা অভিনন্দনযোগ্য। নাটকের গতি আগাগোড়া দ্রুত। দর্শকদের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত জাগ্রত থাকে। ফলে নাটকটি ইপ্সিত সার্থকতা লাভ করতে সমর্থ হয়।

নাটকটির সুষ্ঠু প্রযোজনার জন্যে পরিচালক কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ভূয়সী প্রশংসা দাবী করতে পারেন। কয়েকটি বিশেষ নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় তাঁর কর্মকুশলতা বিশেষ লক্ষনীয়। আবহ সঙ্গীতে চিত্ত মুখোপাধ্যায় শুধুমাত্র সেতার ব্যবহার করে যথোপযুক্ত এফেক্ট্ সৃষ্টি করেন। নীরেন ঘোষের মঞ্চ পরিকল্পনা সুন্দর।

দলগত অভিনয় উচ্চাঙ্গের বলতে দ্বিধা নেই। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন নীরেন ঘোষ, আশিস সান্যাল ও কমলেন্দু ব্যানার্জি। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন, শংকর বিশ্বাস, সুজন ব্যানার্জি, সমরেন্দ্র চক্রবর্তী, অমল ঘোষ, বুলা সেন গুপ্তা, আলোক ভট্টাচার্য, পান্না দত্ত, তুলসী চৌধুরী, অরুণ দাস ও অমিয় দাস।

লকসাইড স্টক অ্যাসোসিয়েশন

পোর্ট কমিশনর অফিসের এই বিভাগীয় নাট্য সংস্থাটি সম্প্রতি তাঁর মঞ্চে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় পরিবেশন করেন। গিরিশচন্দ্রের এই নাটকটি এত অভিনীত এবং খুলনী ও দিকপাল অভিনেতাদের দ্বারা রূপায়িত যে এই নাটক অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করা সহজ কথা নয়। কিন্তু বলতে আনন্দ বোধ করছি, উক্ত সংস্থার শিল্পীরা সেদিন যে অভিনয় করেন তা দর্শকবৃন্দকে অবিমিশ্র আনন্দ দান করে। এর জন্যে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব যিনি দাবী করতে পারেন, তিনি এই নাট্যের পরিচালক যশস্বী অভিনেতা-পরিচালক অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, যিনি ইতিপূর্বে বহু সার্থক নাট্য পরিচালনায় স্বাক্ষর রেখেছেন। ছোট বড় সকল ভূমিকাই সু-অভিনীত হয়। তন্মধ্যে যোগেশ রূপে ক্ষেত্রমোহন দাশ, বাড়ীওয়ালারূপে শিবনাথ চৌধুরী, ভজহরিবেশে মাখন রায় চৌধুরী, রমেশ রূপে বীরেন চক্রবর্তী, প্রফুল্লর ভূমিকায় হিমানী গাঙ্গুলী, জ্ঞানদারূপে মানসী ব্যানার্জী সবচেয়ে বেশী দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। ছোট ছোট অংশগুলিতে শিল্পীদের অভিনয়ও দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

শিল্পীদল

বেহালার এই সুখ্যাত নাট্যসংস্থা ২৯শে ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে সুনীল চক্রবর্তীর "শুরুতেই শেষ" নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। এই রোমাঞ্চকর হাসির নাটকটির অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন—অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিলাস মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ দাশগুপ্ত, চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল বর, দীপালী চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা গুহ। পরিচালনার দায়িত্ব অনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের।

চিত্রমিত্র

ছোট্ট মুখ-এর অভিযান

(জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের একটি অনবদ্য শিশু-চিত্রের কাহিনী)

এক যে ছিলো ছোট্ট ছেলে। নাম তার মুখ। তার পিঠে ছিলো কুঁজ। বড়ো হয়েও চেহারায় সে রয়ে গেলো ছোট। তাই তাকে সবাই ডাকতো 'ছোট্ট মুখ'। যাদের বাড়িতে থাকতো সেই আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে দিলো তাড়িয়ে। মুখ-এর বাবার সম্পত্তি থেকে ওকে বঞ্চিত করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। মুখ ভারী গরীব। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে শুধু বাবার পোশাক। তাই সে পরে। অবশ্য পোশাকগুলি এত বড়ো যে তার গায়ে বেমানান হয়। বিনা পয়সায় কি সুখ কিনতে পাওয়া যায় না? সেই আশায় একদিন গেলো মরুভূমিতে। হতাশ হয়ে ফিরে এলো। সুখ এতো সহজে মেলে না।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মুখ অস্থির। তবু থামে না তার যাত্রা। শেষ-পর্যন্ত হাজির হয় একটা বাড়ির সামনে। যারা ক্ষুধার্ত ভিতরে গিয়ে তাদের খাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলো এক বুড়ি। মুখ-এর পেটে বহুদিন কোনো ভালো খাবার পড়েনি। তাই অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে ঢুকে পড়লো ভিতরে। কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখে শুধু বেড়াল আর কুকুর। তা সংখ্যায় প্রায় শ' খানেক হবে। বুড়ি কিন্তু তাকে খাদ্য পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করলো। ওকে রাখলো ভৃত্য হিসেবে। কাজটা অদ্ভুত। বেড়াল কুকুরগুলিকে খাওয়াতে হবে, এই ওর কাজ। আর ঝামেলা কি কম! প্লেট, থালা, পাত্র এটা সেটা ভাঙছে তো ভাঙছেই। ফলে বুড়ি ভীষণ বিরক্ত হয়। কাজের জন্য এক পয়সাও দেয় না মুখকে। ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে মুখ। কিন্তু ওই বাড়ি থেকে চলে আসার সময় একটি গুপ্তকক্ষ থেকে নিয়ে আসে একটা লাঠি আর এক জোড়া বড়ো মাপের চটি। পরে স্বপ্নে সে আবিষ্কার করে ওই দুটি জিনিসের আছে আশ্চর্য জাদু শক্তি: ওই চটি পায়ে দিয়ে যত জোরে খুশি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া চলে, এমন কি ওড়া পর্যন্ত যায়। লাঠির গুণও কম নয়। গুপ্তধন আবিষ্কার করা মাত্র হাতের মধ্যে কাঁপতে থাকবে লাঠি। মুখ তো আনন্দে আত্মহারা। এবার নিশ্চয়ই সে সুখের নাগাল পাবে।

মুখ রাজার সঙ্গ গিয়ে দেখা করলো। জানালো সে হতে চায় রাজার প্রধান দৌবারীর। তার মতো এক রক্তি লোকের এই ইচ্ছার কথা শুনে রাজা এবং তার পাত্রমিত্ররা তো হেসেই অস্থির। কিন্তু রাজার প্রধান দৌবারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুখই হলো প্রথম। সত্যি সে পেলো রাজার প্রধান দৌবারীর মর্যাদা। তাছাড়া জাদুদণ্ডের সাহায্যে সহজেই নিচে থেকে মুখ আবিষ্কার করলো গুপ্ত ঐশ্বর্য। অনেকে

তার বন্ধু হবে এই আশায় আবিষ্কৃত সোনা বিতরণ করলো সভাসদদের মধ্যে। ফল কিন্তু হলো বিপরীত। রাজা এবং রাজকন্যার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠায় সভাসদদের অনেকেই ঈর্ষা করতে শুরু করেছিলো। তারা রাজার কাছে অভিযোগ করলে, মুখ রাজকোষ থেকে সোনা চুরি করেছে। শুনে রাজা ওর পর্দায় নিতে চাইলেন। মুখকে তখন খুলে বলতে হলো জাদুদণ্ড আর চটির রহস্য। রাজা তার কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য চটিজোড়া পায়ে দিলেন। দিয়ে তো তাঁর প্রাণান্তকর অবস্থা। চটি তাঁকে নিয়ে ছুটতে লাগলো। কিন্তু থামাতে তো জানেন না। অনেক কষ্টে রাজা রক্ষা পেলেন। চটি খামতেই রাজা রেগে অস্থির। চটি আর জাদুদণ্ড আটক রেখে তাড়িয়ে দিলেন মুখকে।

মুখ আবার একা। হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পৌঁছয় এক সহীন অরণ্যে। মানুষের অসৎ ব্যবহার দেখে দেখে আর জীবনে তিক্ত ব্যবহার পেয়ে পেয়ে আজ সে ক্লান্ত। তাই সে স্থির করেছে ওই অরণ্যের নির্জনে সে আত্মহত্যা করবে।

কিন্তু পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে টের পায় ভীষণ খিদে পেয়েছে। তাই আত্মহত্যা করা আর হয় না। সন্ধান শুরু করে খাদ্য এবং পানীয়ের। হঠাৎ দেখতে পায় সামনে দুটো ডুমুর গাছ। আর তাতে পেকে আছে রসে টইটুম্বুর ডুমুর ফল। প্রথম গাছটির ফল এত মিষ্টি আর সুস্বাদু। মুখ পেট ভ'রে ডুমুর খেয়ে নিলো। সামনেই কুলু কুলু শব্দে বয়ে চলেছে এক স্বচ্ছ-সলিলা নদী। তার জল পান করলো আঁজলা ভ'রে। কিন্তু ও কী! নদীর জলে নিজের যে ছায়া পড়েছে তাতে দেখতে পায় মুখ, তার কান দুটি আর নাক হয়ে গেছে অসম্ভব লম্বা। "তাহলে আমি কি সত্যি-সত্যি গাধা, যে আমার গাধার মতো কান গজিয়েছে!" মন খারাপ হয়ে গেলো মুখ-এর। আর খারাপ হবারই তো কথা। সুধা মেটেনি। তাই দ্বিতীয় ডুমুর গাছ থেকে ফল পেড়ে খেলো। অমনি মিলিয়ে গেলো সেই বিদঘুটে লম্বা নাক আর কান। "সত্যি অবাক কাণ্ড!" প্রথম গাছটির ফলে পকেট বোঝাই ক'রে মুখ হাজির হলো বাজারে। রাজার পাচক এসেছিলো বাজারে। রাজার জন্য সে কিনে নিয়ে গেলো ওই ডুমুর ফল।

কয়েকদিনের মধ্যেই মুখ শুনতে পেলো রাজা এবং রাজপরিবারের সকলের দুর্দশা দেখা দিয়েছে। রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, সভাসদ সকলেরই মাথার দুপাশে গজিয়েছে গাধার মতো লম্বা কান আর লম্বা নাক। কত ডাক্তার কবরেজ এলো; কিন্তু কেউ রোগ সারাবার উপায় বের করতে পারলো না। দাড়ি আর পরচুলা পরে ছদ্মবেশী মুখ হাজির হলো রাজসভায়। সহজেই রোগ সারিয়ে দিলো রাজপুত্র আর রাজকন্যাদের। রাজা তো দারুণ খুশি। রাজকোষের দরজা খুলে মুখকে বললেন, "যে সম্পদ তোমার পছন্দ খুশি মতো তুলে নাও।" মুখ রাজকোষে ঢুকেই দেখতে পেলো একধারে রয়েছে তার পরিচিত জাদুদণ্ড আর চটি। চটি পায়ে দিয়ে, জাদুদণ্ড হাতে নিয়ে বললো, "নিষ্ঠুর রাজা, অকৃতজ্ঞ রাজা! তোমার নিষ্ঠুরতা আর অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসেবে ওই লম্বা কান আর নাক থাকবে তোমার সারাজীবন।" ব'লেই সে উধাও হলো রাজসভা থেকে।

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞানী হয়েছে মুখ। সে জেনেছে সোনা-রূপো সম্পদ মানুষকে সুখী করতে পারে না। দুঃখ মানুষকে সাহায্য ক'রে, প্রকৃত বন্ধুর লাভ ক'রেই কেবল সুখী হতে পারে মানুষ।

মরুভূমিতে গিয়ে চটি আর জাদুদণ্ড ফেলে দিয়ে আসে মুখ। এই সব জিনিসের সাহায্য ছাড়াই সে সুখী হতে চায়। সত্যি সুখী হয় মুখ।

অভিনেত্রী হেইলী মিলসের প্রেম

"আমাকে ঘুম থেকে জাগাতো ভোরে আর ঘুম পাড়াতো রাত্তিরে।" বললে হেইলী মিলস।

একুশ বছরের উদীয়মানা চিত্রতারকা। বলছিলো তার প্রেমিক রয় বুল্‌টিং-এর কথা।

'প্রেটি পলি' ছবিতে অভিনয় করার জন্য হেইলী তখন সিঙ্গাপুরে।

"মনে হলো দিনে দু'বার ফোন করাই যথেষ্ট নয়। তাই সপ্তাহ শেষে যেতুম ওর কাছে," বললো রয়।

রয়-এর বয়েস ৩৩; কিন্তু তাকে দেখায় ১৬।১৭ বছরের ছেলের মতো। পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসাহ উদ্দীপনা সব দিক থেকেই। পরে সে লাল সোয়েটার আর লাল মোজা।

ফোটোতে যেমন দেখা যায় তার চাইতেও ছিমছিমে পাতলা চেহারা হেইলীর। ও বলে, "যদি কোনো মেয়ে কোনো পুরুষকে না ভালোবাসে তবে ওই মেয়ের প্রতি পুরুষটি যত বেশি মনোযোগী হবে, মেয়েটি ততই বিশ্রী হয়ে উঠবে।" হেইলী কিন্তু রয়কে সত্যি ভালোবাসে, পছন্দ করে তার মনোযোগ।

হেইলী প্রখ্যাত অভিনেতা জন মিলসের কন্যা। সে বলে, "প্রেমে পড়াটাই একটা মজার ব্যাপার। হাবুডুবু খাবার পরেও আমি অনেকদিন পর্যন্ত তো টেরই পাইনি যে প্রেমে পড়েছি। প্রথম টের পেয়ে রোমাঞ্চিত হলুম। পৃথিবীও তখন তুচ্ছ।"

—"ইচ্ছে ক'রে প্রেমে পড়তে চাইলেই যত ঝামেলা। যখন 'দি ফেমিলী ওয়ে'তে অভিনয় করি তখন আমার বয়েস মাত্র কুড়ি। তখন আমার খুবই স্পর্শকাতর অবস্থা। তখন মনে হতো আমি সব পারি। প্রেম-ট্রেম এই সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা এতটুকুও ছিলো না। যে ছবিতে অভিনয় করছি সেই ছবিই তখন আমার ধ্যান-জ্ঞান। হঠাৎ পরিচয় হলো রয়ের সঙ্গে। তারপর নিজের অজান্তেই কখন ভালোবেসে ফেলুম।"

রয় একদিন বললো, "এর আগে তো তুমি কয়েকজনের সঙ্গে প্রেম করেছো!"

উত্তরে হেইলী বললো, "ওরকম প্রেম স্কুলের সব মেয়েরাই ক'রে থাকে। হৃদয়ে সাড়া জেগেছে কেবল এ-বার।"

রয় বলেছে, "ওকে আমি প্রথম দেখি 'দি পেরেন্ট ট্রাপ' ছবিতে বছর ছয়েক আগে। ছবিটি আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। ওই ছবিতে ওকে যা সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তখন থেকেই আমি বোধহয় হেইলীকে ভালোবেসেছি।"

হেইলী বলেছে, "আমার বয়সী মেয়েরা প্রায়ই হতাশায় ভোগে। ক্রমে বিষন্নিমুক হয়। উদীয়মান প্রতিভাকে নষ্ট করতে ইংল্যাণ্ডের জুড়ি দেশ খুব কমই আছে। এইদিক থেকে আমেরিকা অনেক ভালো।"

হেইলীর পরবর্তী ছবি রোমাঞ্চ চিত্র 'টুইস্টেড নার্ভ।' নিজের বয়সের উপযোগী ভূমিকায় অভিনয় করতেই সে আগ্রহী।

বয়সের অভ্যাসে মাত্র পনেরো বছর বয়সে হেইলী ধূমপান করতে শুরু করে। কিন্তু পরে এর

অভিনয় দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে। হেইলী বলে, "ধূমপানে মেয়েদের ত্বকের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।"

বয়েস মতে হেইলী একজন উঁচু দরের অভিনেত্রী। নিজেকে প্রকাশ করা যায় এমন চরিত্র রূপায়িত ক'রে সে আনন্দ পায়।

জীবন সম্পর্কে ওর দৃষ্টিভঙ্গী: "প্রতিটি দিন আমি ভালোভাবে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করি। আমি নানা রঙের, নানা গন্ধের ফুল কিনি পুষ্পপাত্র সাজাতে; প্রস্তুত হই নতুন কাজের জন্য।"

এর আগে বব দু দুবার বিয়ে করেছে। তার ছটি ছেলেমেয়ে। এই শীতেই তার বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রার্থনা আদালত মঞ্জুর করবে। দেরী না ক'রে সে বিয়ে করবে হেইলীকে।

ছায়াবাণী সংবাদ

সত্যজিৎ রায়ের হিন্দী ছবি

বোম্বে থেকে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ শ্রীসত্যজিৎ রায় শীগগিরই নাকি একটি হিন্দী ছবি পরিচালনা করবেন। ছবির প্রযোজক রাজকাপুর আর নির্মাতা আর. কে. ফিল্মস। এ-বছরের গোড়ার দিকে কলকাতায় যখন এসেছিলেন তখনই শ্রীকাপুর শ্রীরায়ের কাছে ওই প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত ছবিতে অভিনয় করবেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর এবং শাম্মু কাপুর। ওই প্রস্তাবিত ছবিটি হবে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত প্রথম হিন্দী ছবি।

রোমান হলিডে-র নতুন সংস্করণ

রোম্যান্টিক কমেডি 'রোমান হলিডে' ছায়াছবিতে রূপায়িত হয়ে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। এই ছবিটির নতুন একটি সংস্করণ নির্মাণের পথে। এবার ছবিটি আত্মপ্রকাশ করবে প্রচুর সঙ্গীত সহযোগে। ছবির প্রযোজক হিনোস্ত লরেন্টিস, পরিচালক ফ্রাঙ্কো জেফ্রেলি। সঙ্গীত পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন রিচার্ড এম. এবং রবার্ট বি. শেরম্যান। 'রোমান হলিডে'-র বেশির ভাগ দৃশ্যই গৃহীত হবে খাস রোমে; চিরন্তন মহানগরীর কালজয়ী স্থাপত্য শিল্পের পটভূমিকায়।

এই মনোহারী গল্পের নায়ক এক মার্কিনী সাংবাদিক এবং নায়িকা এক রাজকন্যা। আগের সংস্করণে এই দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে গ্রেগরী পেক এবং অড্রে হেপবার্ন। তখন এই ছবিটি তিনটি অ্যাকাডেমী পুরস্কার লাভ করে। এই ছবিতে অভিনয় ক'রেই মিস হেপবার্ন রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন; ১৯৫৩ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী রূপে ভূষিত হন অসকার পুরস্কারে।

হাই কমিশনার গ্রেপ্তার

বেটি ই বল—রালফ টমাস প্রডাকসন প্রযোজিত 'নো বডি রানস ফরএভার' ছায়াছবিতে ক্যামেরার চোখ দিয়ে দর্শকরা স্পষ্ট দেখতে পাবেন লণ্ডনের ফুটনৈতিক মহলের গোপন দৃশ্য। যার ও এর

পাত্র দুইই চরিত্রের দিক থেকে আন্তর্জাতিক। এতে অভিনয় করবেন অস্ট্রেলিয়ার রড টেইলর, কানাডা-র ক্রিস্টিকার প্লামার, অস্ট্রিয়ার লিলি পামার, ইজরায়েলের ডালিয়া লাভি, এবং সুইডেনের ক্যামিলা স্পার্ড।

জন ক্রিয়াবী-র লেখা 'দি হাই কমিশনার' অবলম্বনে ছায়াছবিটি নির্মিত হবে। নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রধান মন্ত্রীর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার এক সুন্দরী গোয়েন্দা লণ্ডনে যাচ্ছেন নিউ সাউথ ওয়েলসের হাই কমিশনারকে গ্রেপ্তার করতে—এই হলো মূল গল্প।

নট-নটী

অভিনেত্রী রাজশ্রীর প্রেমে প'ড়ে তাঁকে বিয়ে করেছেন গৌতম চ্যাপম্যান। শুধু তাই নয়, আমেরিকান ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। মার্কিনী নাম গ্রেগরী চ্যাপম্যান বদলে গিয়ে নাম হয়েছে গৌতম চ্যাপম্যান। প্রেমের জাদুতে কী না হয়। ডাকুও হয় সাধু। আর মার্কিন মুলুকের লোক নাম বদলাবে এ তো সাধারণ কথা।

• •

বার্বারার স্বামী ক্ষিপ্ত

রূপসী ইহুদী অভিনেত্রী বার্বারা স্ট্রেইস্যাণ্ডকে নিয়ে আরব দেশের প্রখ্যাত অভিনেতা ওমর শেরিফ গিয়েছিলেন এক ফ্যাশন পার্টিতে। জানতে পেরে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হন বার্বারার স্বামী। ফোন মারফৎ তিরস্কার করলেন স্ত্রীকে। স্বামী এলিকট গোল্ড নিজেও একজন অভিনেতা। তিনি রাগত স্বরে স্ত্রীকে জিগেস করলেন, "কেন ওমর শেরিফের সঙ্গে ফ্যাশন পার্টিতে গিয়েছিলে?"

বার্বারা উত্তর দিলো, "তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম, কারণ নিজে টিকেট ক'রে গেলে খরচা পড়তো ২৫০ ডলার।"

বার্বারার বয়েস ২৫। অভিনয় ক'রে সে লক্ষ-লক্ষ ডলার রোজগার করেছে। বর্তমানে সে হলিউডে ওমর শেরিফের সঙ্গে অভিনয় করছে 'ফানি গার্ল' ছবিতে। গোল্ডের বয়েস ২৯।

FILM BOX

অভিনেত্রী ক্যাথরিন হেপবার্ন তাঁর শানিত উক্তির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু জীবনের প্রথম দিকে তাঁর মতো মেয়েও মুখের উপরে উচিত জবাব পেয়েছিলেন একজনের কাছ থেকে। 'বিল অব ডাইভোর্সমেন্ট' ছবিতে অভিনয়ের শেষে হেপবার্ন ছবির নায়ক অভিনেতা জন বেরীমোরকে বলেন: "ঈশ্বরের দোহাই আপনার সঙ্গে আর যেন আমাকে অভিনয় করতে না হয়।" উত্তরে বেরীমোর বলেন: "আমার সঙ্গে সত্যি যে তুমি কখনো অভিনয় করেছো এ তো জানতুম না।"

ফাল্গুন সংখ্যার আকর্ষণ

বন্ধন শেষ হলো: হলিউডের কয়েকজন রূপসী অভিনেত্রীর বিচিত্র-বিবাহ-বিচ্ছেদ কাহিনী।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

নিতাই সাহারায়

কোন আঁকজমক নেই তবুও ছবিটিতে যে বাস্তব মুহূর্তটাকে ধরে রাখা হয়েছে তা মনে লাগার মত। এক পুরানো বইয়ের দোকানের চিত্র। তাকভর্তি বই: তাছাড়া এপাশ ওপাশ কিছু। একাংশে ছোট্ট একখানা শো-কেস্ তারের জালে ঘেরা। ভিতরে খোলা অবস্থায় একখানা বই ষ্ট্যাণ্ডের উপর রাখা। জালের ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে দিব্যি পড়া চলে। শো-কেসের বইখানার খোলা পৃষ্ঠা দু'টি পাঠরত এক যুবা তারের জাল ঘেঁষে বাইরে দাঁড়িয়ে। পোষাক পরিচ্ছদে রীতিমতো দারিদ্র্যের ছাপ। দোকানের বৃদ্ধ মালিক একপাশে বই হাতে দাঁড়িয়ে; মনে হয় কোন তাক গুছাতে নিচ্ছেন। কিন্তু বৃদ্ধের দৃষ্টি অন্যত্র: অবাক হয়ে লক্ষ্য করছেন বাইরের পাঠরত সেই ছেলেটির একাগ্রতাকে। শুভ্রকেশ বৃদ্ধের মুখে স্মিতহাসি: "তাইতো। ছেলেটি ভারি মনযোগী দেখছি।"

ছবিটির এই সারল্যের মধ্যে যে মুহূর্তটাকে ধরে রাখা হয়েছে তা এক শুভ-পরিণতির প্রথমক্ষণ। ঘুরঘুরি সহায়তা আর নিষ্ঠার এই গ্রুপ ছবিখানা নিসন্দেহে দেশকালের উর্দ্ধে—এক কথায় চিরন্তন।

শত বৎসরেও পূর্ব্বের কথা। ইংলণ্ডে তখন শিল্পবিপ্লব চলছে। চাকুরীর বাজার বড্ড আকরা। এ হেন অবস্থায় গ্রাম থেকে ছেলেটি সহর লণ্ডনে উপস্থিত হয় চাকরীর ধাঁধায়। অনেক ঘুরাঘুরির পর, দৈনিক বার ঘণ্টা খাটুনীর সর্ত্তে এক ছাপাখানায় তার একটি কাজ জোটে। মাইনে নাম মাত্র। তিরিশ দিনের আহার জোটানোই কষ্টকর। তবুও এই সুযোগ নিতে হলো তাকে: চাকরী বড্ড দুর্লভ কিনা!

পড়াশুনার প্রতি ছেলেটির ছিল প্রবল আকর্ষণ। শত দারিদ্র আর অসুবিধার মধ্যেও যেন উন্মুখ হয়ে থাকতো বই পড়ার জন্যে। কিন্তু বই কিনে পড়ার সাধ্যি কোথায়। ছাপাখানায় যাওয়ার পথে পড়তো পুরানো বইয়ের দোকানটি। তারের জালে ঘেরা দোকানের মালিক শো-কেস্এ মাঝে মাঝে দু'একখানা বই খোলা অবস্থায় রাখতেন। উদ্দেশ্য, বইয়ের বিষয়বস্তু ও আভ্যন্তরীন অবস্থার উপর ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ছেলেটি যাতায়াতের পথে এরূপ দু' একটি পৃষ্ঠা সযত্নে পড়ে নিত বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অসুবিধে হলেও, রোজ রোজ তো আর বিনেপয়সায় আরাম চাওয়া যায় না। তাছাড়া জানাটাই সেদিন তার কাছে মুখ্য: আরামের দিকটা নেহাতই গৌণ। এভাবেই দু'চার দিনে কাটে। এ বই সে বইয়ের কিছু কিছু পড়ে। এরপর একদিন দোকানে হাজির হয়ে তার ভারী আনন্দ হলো আগের

দিনের পড়া বইখানার ঠিক পরের দুটি পৃষ্ঠা খোলা পেয়ে। পরের দিনও এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মহানন্দের মধ্যে পড়াও এগিয়ে চলে। এমনিভাবে একদিন বইয়ের শেষ দু'টি পৃষ্ঠাও তার পড়া হয়ে গেল। দোকানের বুড়ো মালিক সেদিন তাকে ডেকে বললেন, "তাখ বাছা, এখন থেকে আমার বইয়ের দোকানের যাবতীয় বই তুমি নিঃসঙ্কোচে পড়তে পার। এজন্য এক কানা কড়িও তোমায় দিতে হবে না।" বৃদ্ধ মালিকের সদিচ্ছায় সেদিন থেকে ছেলেটির জুটে গেল পড়াশুনার এক অকল্পনীয় সুযোগ। একখানা গোটা বইয়ের দোকান নাগালের মধ্যে—এ যেন সেদিন তার কাছে ছিল স্বর্গ পাওয়া। নির্ধারিত বৈনিক কাজ ঘন্টা খাটুনী সত্ত্বেও তাই অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে থাকে। এই জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা ও আকর্ষণ কালে তাকে পৌঁছে দেয় যোগ্যপদে। ছাপাখানার সেই অতি-সাধারণ কর্মী কালে হলেন নিউজিল্যাণ্ডের অন্যতম এক দৈনিক পত্রিকা-সম্পাদক। শুধু কি তাই? ১৮৬৮ খৃঃ নাগাদ সেই সাধক যখন লণ্ডন ফিরে যান, ততদিনে বিশ্বের সেরা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি একজন।

এই সকল কর্মযোগী পুরুষটি হলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। বেঞ্জামিনের সাফল্য সম্পর্কে যে কথাটা বিশেষ করে মনে পড়ে সেটা তাঁর দুর্ব্বার জ্ঞানাসক্তি। আকাঙ্খা তীব্রতর হলে তবেই যে কাজে চরম অনুপ্রেরণা সম্ভব একথা ফ্রাঙ্কলিনের কর্মময় জীবনে খুব স্পষ্ট।

পরবর্তী আকর্ষণ : প্রখ্যাত মার্কিণী ঔপন্যাসিকের সঙ্গে হেমিংওয়ের একটি আশ্চর্য সাক্ষাৎকারের কাহিনী

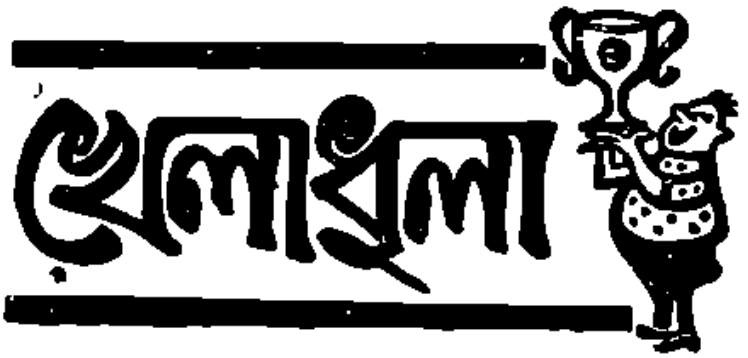

শ্রীজ্যোতির্ময়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীর

ভারতে কুস্তিগীর পালোয়ানের অভাব কোন দিন ছিল না। এখনো নেই।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ মহিমায় পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীরের গৌরব নিয়ে আজীবন বিরাজ করেছেন একজন মাত্র লোক, একমেবাদ্বিতীয়ম, তাঁর নাম গামা।

গামা, এই নামের যাদু ভারতের এবং বহির্বিশ্বের মানুষ বহু দিন ধরে অনুভব করেছে, তাঁর সম্পর্কে অবিশ্বাস্য কীর্তি কাহিনী শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে। পৃথিবীর অপরাজিত মুষ্টিযোদ্ধা, যিনি কখনো মাটিতে শুয়ে কারুর কাছে হার মানেন নি।—গামা।

গামার আসল নাম—গোলাম হোসেন। জন্ম ১৮৮২ সালে ঝাঁসির কাছে দাতিয়া রাজ্যে।

পালোয়ানের ঘরানা বংশ। বাপ আজিজ পালোয়ান ছিলেন রাজ-কুস্তিগীর। দাতিয়া রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর সংসার স্বচ্ছল ভাবেই চলত। গামার ছোট ভাই ইমাম বকসও ছিলেন বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা।

ছেলেবেলা থেকেই গামার কুস্তিতে ঝোঁক পড়েছিল। গুরু মাধো সিংহের কাছে তালিম নিয়ে তিনি যৌবনেই দুর্মদ মল্লবীর রূপে পরিগণিত হলেন।

শুরু থেকেই শক্ত শক্ত লড়িয়েদের সঙ্গে তাঁকে হাত মেলাতে হয়েছিল। ১৯০৯ সালে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ মল্ল পান্না সিং মুনিওয়ালাকে হারিয়ে দিলেন। ১৯১০ সালে দাতিয়া রাজ্যের কস্তমহিন্দ রহিম মুলতানি-ওয়ালার সঙ্গে লড়লেন। সে লড়াই সমান সমান হল।

১৯১০ সালে লণ্ডনে আহূত ওপন বুল বিশ্বমল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় চারশ' দিগগজ দিগগজ মল্ল সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত চারজন স্তিবিস্কো, হ্যাকেনস্মিড, মরিস লেম ও জেরিয়াম।

শ্যামবাজারের ধনকুবের শরৎ কুমার মিত্র ছিলেন মল্লযুদ্ধের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। তিনি উদ্যোগী হোয়ে নিজে সব খরচ বহন করে গামা আর ইমাম বকসকে সেই প্রতিযোগিতায় লড়বার জন্যে লণ্ডন পাঠালেন।

কিন্তু কালা আদমির দেশের পালোয়ানদের লণ্ডনের উদ্যোক্তারা আমল দিলেন না। তাঁদের নাম প্রতিযোগিদের তালিকাভুক্ত করা হল না। এই বিরাট প্রতিযোগিতায় ভারতীয়রা আবার লড়বে কি!

গামাকে অত সহজে দমানো সম্ভব ছিল না। তিনি সঙ্গে দুটি চ্যালেঞ্জ জানালেন। এ রকম চ্যালেঞ্জ পৃথিবীতে আর কখনো হয়নি। প্রথমটি হল: তিনি একঘণ্টার মধ্যে একটানা পর পর চল্লিশজন কুস্তিগীরের সঙ্গে লড়বেন এবং তাঁদের হারাবেন। দ্বিতীয়টি হল: যদি কেউ তাঁর সঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় না টেকে লড়তে পারেন তাহলে তিনি তাঁকে পাঁচ পাউণ্ড দেবেন।

প্রথমরাত্রে তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কাউকেই এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জে সম্মতি জানাতে তিনজন এগিয়েছিল, কিন্তু কেউই দু'মিনিটের বেশি তাঁর সামনে খাড়া থাকতে পারেনি। দ্বিতীয় রাত্রে প্রথম চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বারোজন মল্ল পর পর তাঁর সঙ্গে লড়েছিল এবং অল্পসময়ের মধ্যেই প্রত্যেকেই চিৎ হয়ে পড়েছিল।

দর্শকরা আর প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা গামার পরাক্রম দেখে হতবাক। বাধ্য হয়ে উদ্যোক্তারা আসল প্রতিযোগিতায় তাঁর অংশ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করলেন এবং জিবিস্কোর সঙ্গে লড়বার জন্য তাঁকে আহ্বান জানালেন। জিবিস্কো তখন বিশ্বের চ্যাম্পিয়ন মল্ল বলে স্বীকৃত।

তিনঘণ্টা ধরে সেই অবিস্মরণীয় লড়াই চলেছিল। কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারেনি। পরদিন আবার লড়াইএর আয়োজন হল। কিন্তু জিবিস্কোর দর্শন পাওয়া গেল না। উদ্যোক্তারা তখন গামাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলে স্বীকৃতি দিলেন।

দেশে ফিরে গামা বিপুল সম্বর্ধনা পেলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর যশ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। পাতিয়ালার মহারাজা তাঁকে সভামল্লের সম্মান দিয়ে তাঁর বাসস্থান এবং গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিলেন। মোটা মাসিক ভাতারও বন্দোবস্ত হল সেই সঙ্গে। গামা মনের আনন্দে শরীর চর্চায় দিন কাটাতে লাগলেন।

জিবিস্কো এলেন ভারতে গামার সঙ্গে লড়তে ১৯২৮ সালে। সেই ঐতিহাসিক লড়াই সারা বিশ্বের আগ্রহ এবং কৌতূহল জাগ্রত করেছিল। পাতিয়ালায় মহা সমারোহে লড়াইএর আয়োজন হল। এবং নির্ধারিত দিনে যথাসময়ে দুই মল্ল ক্রীড়াঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন।

তারপর? তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে খেলা খতম। জিবিস্কো চিৎপাৎ।

গামা জয়ী বলে ঘোষিত হলেন।

তারপর ১৯২৯ সালের বিশালকায় দানবাকৃতি সুইডিস মল্লবীর পিটারসন গামার সঙ্গে লড়বার জন্য পাতিয়ালায় এলেন। লড়লেন। ধরাশায়ী হলেন এক মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে।

শরীরের তাগদ ঠিক রাখবার জন্যে গামা কঠিন পরিশ্রম করতেন। রাত তিনটায় ঘুম থেকে উঠতেন। তারপর ৪০০০ বৈঠক এবং ২০০০ ডন দিতেন প্রত্যহ। ব্যায়াম শেষে প্রত্যহ অনেকদূর পর্যন্ত হাঁটতেন এবং আখড়ায় গিয়ে অনুশীলন করতেন।

তাঁর প্রাত্যহিক আহারের তালিকায় থাকত ২০ সের দুধ, আড়াই সের ঘী, তিনসের বাদাম, ১২ সের মাংসের সুপ, তাছাড়া প্রচুর সব্জি এবং মাখন। যদিও তাঁর উচ্চতা ছিল মাত্র ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, তাঁর ওজন ছিল ২৬০ পাউণ্ড, বাইসেপ ১৭ ইঞ্চি, উরু ৩০ ইঞ্চি।

শেষ জীবনে পাকিস্তানে চলে গিয়ে গামা বড় কষ্টে পড়েছিলেন। যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁর সব সঞ্চয় শেষ হয়ে যায়। তারপর একে একে তাঁর পাঁচটি ছেলেই মারা যায়।

১৯৫৩ সালে আফ্রিদা সফর শেষ করে পাকিস্তানে ফিরে তিনি হাঁপানি ও রক্ত-চাপে শয্যাগত হয়ে পড়েন এবং সাত বছর ধরে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁর বিশাল শরীর অস্থিচর্মসার হয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার তাঁকে একালীন পাঁচহাজার টাকা এবং মাসিক ভাতা হাজার টাকা বরাদ্দ করে তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল।

১৯৬০ সালের ২৩শে মে গভীর রাতে পাড়ায় গোলমাল শুনে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। মনে করলেন, পাড়ায় চোর পড়েছে। কিন্তু গামা তো তা সহ্য করবেন না। তাঁর পাড়ায় চোর! সে-চোরকে ধরতেই হবে।

অসুস্থতা অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু মাথা ঘুরে গেল। লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়। চেতনা হারালেন। সে চেতনা আর ফিরে এলো না।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে জিবিম্বো স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বলেছিলেন—গামা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীর। তাঁকে আমার শেষ সেলাম।

• • • •

খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের অভব্য আচরণ, দর্শকদের উন্মৃঙ্খলতা, আমাদের খেলার জগতে আজ অত্যন্ত প্রকট। এনিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে, এমনকি তদন্ত পর্যন্ত হয়ে গেল। খেলা যাচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পৃথিবীময় যে একটা অশান্ত অধৈর্য অস্থিরতার প্রকাশ ঘটছে তার অশুভ ছায়া পড়েছে খেলার মাঠে, শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং খেলার অন্যতম পীঠস্থান খাস বিলাতের মাঠে মাঠেও।

কিছুদিন আগে কেরালার এক ফুটবল মাঠে উত্তেজিত দর্শকরা রেফারীকে ধোলাই করে রেখেছিলেন। দিল্লী এবং বোম্বাই এর মাঠ থেকেও অনুরূপ ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। ইউরোপেও এমন ঘায়া কাণ্ডের অভাব নেই। মাসখানেক আগে ভিয়েনায় অষ্ট্রিয়া বনাম গ্রীস-এর ইউরোপীয় ফুটবল কাপের খেলায় শত শত ক্রুদ্ধ দর্শক খেলা শেষ হবার আগেই মাঠে নেমে রেফারীর উপর হামলা চালায়। ফলে বেচারী রেফারীর একটি চোখ জখম হয়। বিশ্বফুটবল উপলক্ষে আর্জেন্টিনা বনাম গ্রীসগো কেলটিকের খেলাকে কেন্দ্র করে বেশ খণ্ডরকমের দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে আমাদের দেশের বিলাতী-ভাবাপন্ন ইংরাজী দৈনিকের লণ্ডনস্থ সাহেব সংবাদদাতা ইউরোপে অনুরূপ সব ঘটনার উল্লেখ করে মূচের মত তার হেডলাইন দিয়েছেন—Calcutta spirit. যেন কলকাতাতেই হয়, এসব গোলমাল আর কোথাও হয়না। অথচ তাঁর বর্ণনাতেই দেখা যাচ্ছে সে দেশের খেলার মাঠের বিশৃঙ্খলা চের বেশী কুৎসিৎ। কলকাতা তার কাছে শিশু। তিনি লিখছেন—"পেশাদারী ফুটবল অত্যন্ত জঘন্য হয়ে উঠেছে। এমন একটি শনিবারও যায়না যেদিন খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের মধ্যে মারামারি না হয় এবং দর্শকরা তাণ্ডব নৃত্য না করে।" তিনি এ বিষয়ে লণ্ডনের ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রতি দোষারোপ করে বলেছেন এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে উক্ত সংস্থা বিশেষ কোনো পন্থাই অবলম্বন করেনি। ক্লাবের কর্তৃপক্ষরাও নিজনিজ দলের গোঁয়ার দাঙ্গাকারী খেলোয়াড়দের শোধরাবার জন্যে বা তাদের শাস্তি দেবার জন্যে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। ফলে মাঠের মধ্যে খেলোয়াড়রা গুণ্ডার মত আচরণ করে, দর্শকরা যথেচ্ছো বোতল ছোড়ে এবং সময় সময় রেফারী বেচারীদের জীবন হানির সম্ভাবনা ঘটে। এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে কেলটিক ফুটবল ক্লাব আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলার সময় নিজ দলের খেলোয়াড়দের ছোটলোকমির জন্যে তাদের প্রত্যেককে ২৫০ পাউণ্ড করে জরিমানা করেছেন। এরকম ফাইন ফুটবল খেলার ইতিহাসে এই প্রথম। টেলিভিসনে এই খেলা অনেকেই

দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। খেলা ছেড়ে দু দলের খেলোয়াড়রা ঘুসোঘুসি লাথালাথি করছে, কেউ কাকুকে মাটিতে চিৎকরে ফেলে তার বুকের ওপর বসে তার গলা টিপে ধরছে, কেউ কারুর চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়াচ্ছে, এইরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য। আর সেই সঙ্গে দর্শকদের গেলারী থেকে বোতল বৃষ্টি। মনে হচ্ছিল যেন সারামাঠে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড লেগে গিয়েছে।

সাংবাদিক রেমন কাউলের বর্ণনাটি রসালো করে লেখা। তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আপত্তি ওই শিরোনামায়—Calcutta spirit! আমরা তো বলব আমাদের খেলার মাঠের ঘটনা সম্পর্কে—Overseas spirit! ক্রিকেট ফুটবল দুটো খেলাতেই ওদের দেশের অনেক দাঙ্গার খবরই আমরা পাই।

* * *

বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা হ্যারল্ড লয়েডের ছবি দেখতে গেছেন ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ।

ছবি দেখে ফেরবার সময় হ্যারল্ড লয়েড এগিয়ে এসে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন: কেমন দেখলেন? আপনার ভাল লেগেছে কোনখানটায়?

প্রধানমন্ত্রী হেসে বললেন: ভাল লেগেছে এই দেখে যে, কথাটা অবশ্য আমাদের মধ্যেই One thing is common.

হ্যারল্ড লয়েড একটু হতভম্ব হলেন, বল্লেন common টা কোথায় দেখলেন?

লয়েড জর্জ হেসে বল্লেন: তা' আর বুঝতে পারলেন না? common thing আছে শুধু একটা।

—কোন্‌টা?—আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হ্যারল্ড লয়েড।

—ঐ লয়েড কথাটা,—আমি লয়েড জর্জ আর আপনি হ্যারল্ড লয়েড,—হো হো করে হাসলেন দুজনেই।

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

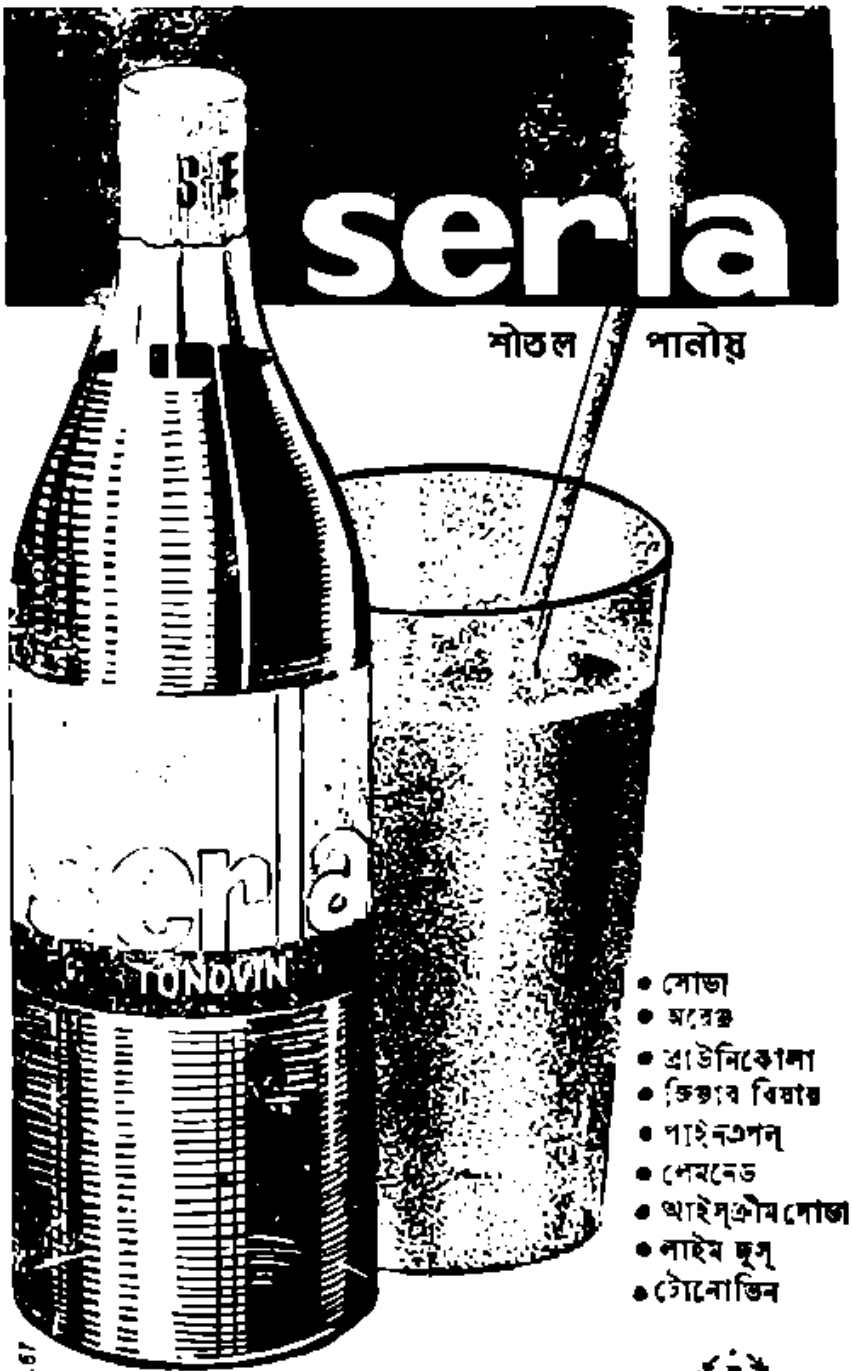

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে পাওয়া যায়

Sulekha
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32
adeyar

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা খাঁটি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিস।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ অচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

THE HOUSE OF
NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS
OF INDUSTRIAL RUBBER
PRODUCTS IN INDIA

NRM

NATIONAL RUBBER
MANUFACTURERS LTD.

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED
AUTOMOBILE TYRE COMPANY

Inchek Tyres
Limited

আনন্দ উৎসবে

কে,হোড়ের

প্রসাধন সামগ্রী

গল্প-ভারতী

ত্রয়োবিংশতিতম বর্ষ ॥ নবম সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৩৭৩

বিশিষ্ট স্বাদের জন্যে

লিলি বিস্কুট

আজ সকলেরই প্রিয়

LB 27/67A

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩

যৌবনসুলভ
কমনীয়তা ও
অপরূপ
লাবণ্য

প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য।
সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ।

সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশ পত্র

সাধনা বিউটি ক্রীম

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

৪ S.Ph. 7/68

মাড়ী সুস্থ ও সবল রাখতে,
মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে

নিম এর উপকারিতা
হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে হিতকর বহুগুণ পরীক্ষিত মহোপকারী *নিম*-এর মৃদু অথচ সক্রিয় উপাদান-গুলি *নিম* টুথ পেস্ট-এ আছে। তাছাড়া *নিম* টুথ পেস্ট-এ রয়েছে 'ফ্লুরাইড' এবং আধুনিক দন্ত বিজ্ঞান সম্মত অন্যান্য উপাদান। *নিম* টুথ পেস্ট-এর হিতকর কেনা মাড়ী সবল করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁতের ক্ষয় ও পায়োরিয়া নিবারণে সাহায্য করে ও দাঁত ঝকঝকে করে।

নিম টুথ পেস্ট-এর সর্বগুণ সমন্বিত মার্গোক্রিস টুথ পাউডারও পাওয়া যায়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় —		৬২১
অমৃতকথা		৬২৩
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)		৬২৪
কন্যা কন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৬২৬
মনের পাতায় লেখা (গল্প)	—দীপঙ্কর	৬৩৫
পুরাতন পাতা		৬৪৬
জলদস্যুর কাহিনী	—গৌরীশংকর দে	৬৫০
মধুপর্ক (স্মৃতিকথা)	—প্রভাত মুখোপাধ্যায়	৫৫৫

THE CENTRAL BANK OF INDIA LTD.

India's Largest Bank in the Private Sector

Head Office : MAHATMA GANDHI ROAD, BOMBAY-1.

FIGURES THAT TELL—

AUTHORISED CAPITAL	...	Rs. 10,00,00,000/-
PAID-UP CAPITAL	...	Rs. 4,77,44,580/-
RESERVED FUND & OTHER RESERVES	...	Rs. 7,15,09,047/-
DEPOSITS AS AT 31. 12. 1966	...	Rs. 3,59,87,65,315/-

Branches and Pay Offices in all important Commercial Centres of India

London Office : ORIENT HOUSE, 42/45, New Broad Street, London EC-2

New York Agents : MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
THE CHASE MANHATTAN BANK.

Sri Homi Mody K. B. E.
Chairman

B. C. Sarbadhikari
Chief Agent, Calcutta.

V. C. Patel
General Manager

শিক্ষাক্ষেত্রে তাণ্ডবলীলা

এখন শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত, শিক্ষকগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই চরম দুর্দিনে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইলে শিক্ষা সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে।

- বিশ্বভারতীর অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের
  রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ... ... ৫·০০
- প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ তারাসরঞ্জন রায়ের
  বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা ... ... ৪·০০
- আশৈশব শিক্ষানুরাগী অনিল বিশ্বাসের
  আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা ... ... ৫·০০
- অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষের
  শিক্ষার কথা ... ... ২·০০

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ

প্রকাশিত গ্রন্থচতুষ্টয় একত্রে লইলে ডাক খরচ লাগে না।

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

এই সংখ্যায়

দুয়োরাণী (গল্প)	—তথাগত	৬৬৩
এখনও ওঠে চাঁদ „	—বাণী রায়	৬৬৭
স্টাফ রুম „	—অমলেন্দু মিত্র	৬৭৪
নরমেধ যজ্ঞ (রহস্য উপন্যাস)	—চক্রব্রত	৬৭৯
খেলাধূলা	— শ্রীজ্যোতির্ময়	৭০২
অক্রের মন্দির (ভ্রমণ কাহিনী)	—সুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী	৭০৪
অঙ্গনা সংবাদ	—দেবযানী	৭১৪
সাহিত্য ও সাহিত্যিক	—নীলাদ্রি সোম	৭২০
সাহিত্য সংবাদ		৭২
নাট মঞ্চ	—রত্নাকর	৭২
চলতি দুনিয়া		৭৩

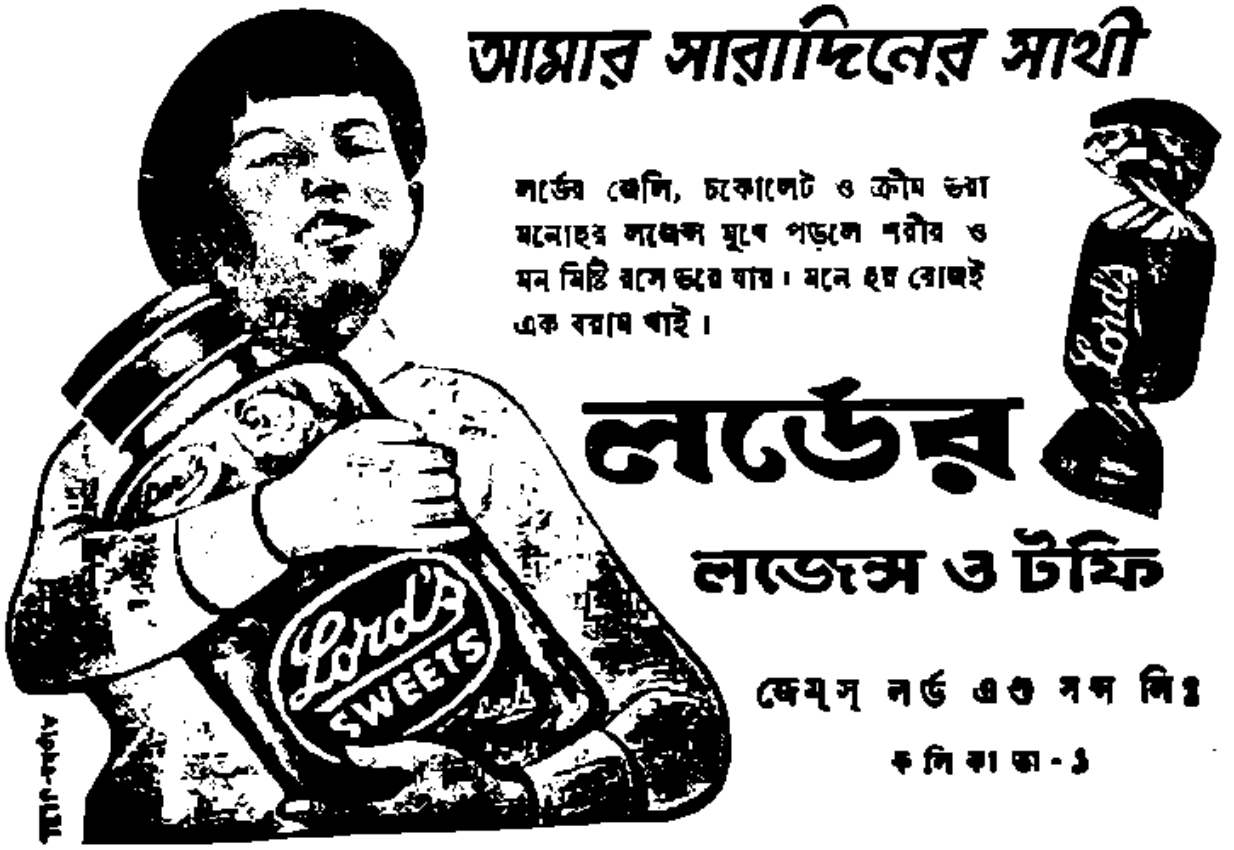

পোড়া ···· কাটা ···· পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরোগ্যদায়ক

ক্ষতের কারে
ব্যবহার

এবেল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

ইনি একটি রেল কারখানার সহকারি ফোরম্যান। এই কারখানাটির গবেষণাগারে একজন সহকারি হিসেবে যোগ দিয়ে, সাত বছরের মধ্যে তাঁর এই পদোন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি যে উন্নতি করেছি, চেষ্টা ও যত্ন থাকলে অন্যেও অবশ্য এই রকম উন্নতি করতে পারেন। তবে আমি যখনই যে কাজ করি, তা নিষ্ঠার সঙ্গে করি। আমার কয়েকজন সহকর্মীর, ছেলেমেয়ে বেশী আর তাঁদের দুরবস্থা আমি সব সময়েই দেখছি। আমার

মাত্র দুটী সন্তা
এবং তাদের আ
আমার সাধ্যানুসা
মানুষ ক'রে তোল
চেষ্টা করছি। যে
জন্যই আমি সুখী

ইনি সুখী।

আপনি ?

দ্বিবিধ গুণসম্পন্ন
আয়ুর্বেদীয় সুবাসিত

মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল

চিঠি লিখলে ভৃঙ্গল-এর
বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত
পুস্তিকা পাঠান হয়।

ভৃঙ্গল

- *মাথা ঠাণ্ডা রাখে*
- *স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশ বর্দ্ধনে সাহায্য করে*

ছোট শিশির জন্যই আপাততঃ এই নতুন বাক্স। ছোট ও বড় দুই রকম শিশিতেই এখনও পুরানো লেবেল চলবে। পরে আসবে নতুন লেবেল।

ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

CBF-1a 0-69

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, নবম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

নবীন আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমাকে বলে, দাদু।

কি সম্পর্কে দাদু বলে তা সে-ই জানে।

এক পাড়ায় বাস করি—এই সম্পর্ক।

সেদিন আমার সঙ্গে দেখা হতেই নবীন এক গাল হেসে একটি নমস্কার করলে।

আমিও বললাম, নমস্কার।

নবীন থমকে দাঁড়ালো। বললে, নমস্কার নয় দাদু, আশীর্বাদ করুন!

আমি বলি, কেন মিছে ছলনা করছো ভাই? আশীর্বাদ, অভিশাপ, কিছুই তো তোমরা বিশ্বাস কর না!

সে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা বোধকরি চাপা দেবার জন্যই নবীন অন্য কথা পেড়ে বসলো। বললে আপনারা যে গল্প-উপন্যাস লেখেন তাকেই তো সাহিত্য বলেন?

—বলি।

নবীন বললে, আমিও আজকাল সাহিত্য করছি। অনেকগুলো গল্প লিখে ফেলেছি। আমার লেখা আপনাকে একদিন শুনিয়ে আসবো। শুনবেন তো?

ভয়ে ভয়ে বললাম, নিশ্চয়ই শুনবো।

সেই নবীন এলো একদিন তার গল্প শোনাতে।

ভেবেছিলাম বুঝি-বা তার সব গল্পগুলিই এনেছে সঙ্গে করে।

কিন্তু না, পকেট থেকে দেখলাম মাত্র একটি গল্পই সে বের করলে। বললে, বেশি কষ্ট আপনাকে দেবো না, বেশি সময়ও নেবো না।

বললাম, পড়।

পড়বার আগে সে আবার বললে, আপনারা যাকে অশ্লীল বলেন এ-লেখাটা হয়ত তাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, অশ্লীল মানে জানো?

নবীন বললে, জানি। আগে শুনুন। পরে আলোচনা করা যাবে।

শুনলাম। আগাগোড়াই শুনলাম তার গল্পটি।

নবীন বললে, বলুন এবার—লেখাটা কেমন হয়েছে বলুন।

কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। বলা খুব শক্ত। তবু বললাম, লেখাটা লেখা হয়েছে, কিন্তু সাহিত্য হয়নি।

নবীন আশা করেনি আমি তাকে এই শক্ত কথাটা বলে বসবো। তার মুখ চোখ দেখে মনে হলো সে বেশ উত্তেজিত হয়েছে। হয়ত-বা তার মোহগ্রস্ত মন এই লেখাটিকে খুব ভালবেসে ফেলেছে।

গম্ভীর হয়ে বললে, আমাকে বুঝিয়ে দিন।

আমাকে একটু ভাবতে হলো। কি বলি?

আমাদের নিজেদের অতীত দিনের কথা মনে পড়লো। আমি তখন তরুণ যুবক। আমার 'কালি-কলম' মাসিক সাহিত্য-পত্রিকায় অশ্লীল লেখা ছাপার অপরাধে আমি নিজে একবার অভিযুক্ত হয়েছিলাম। আমি একা নয়। আরও অনেকে।

আমার 'কেস্'টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

অনেকগুলি তরুণ ব্যারিষ্টার এবং উকিল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (স্বর্গত নরেশদা) আমাকে একটি 'ষ্টেটমেন্ট্' লিখে দিয়েছিলেন। সেটিই ছিল আমার জবাব।

জবাব শুনে মহামান্য বিচারক বোধকরি-বা একটু বিপদে পড়েছিলেন।

আমার জবাবে ছিল অশ্লীলতার সীমা নির্দ্ধারণের জটিল প্রশ্ন।

এবং সম্ভবতঃ তারই জন্য আমি সসম্মানে মুক্তি পেয়েছিলাম।

মুক্তি পাবার পরেও কিন্তু আমার মন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিল না। ক্রমাগত ভেবেছি—কোথায় এর সীমা। আমরা কতদূর পর্য্যন্ত যেতে পারি।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম রবীন্দ্রনাথকে।

তিনি বলেছিলেন, 'এটা হচ্ছে গিয়ে মানুষের শরীর-ঘেঁষা সংস্কার। জীবসৃষ্টির ইতিহাসে অনেকদিনের পুরনো। প্রথম অধ্যায় থেকেই এর আরম্ভ। একটু ছুঁতে না ছুঁতেই ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে। এর প্রকাশ সাহিত্যে জায়গা পাবে না সেকথা আমি বলবো না, তবে কিনা নিতান্ত সস্তা জিনিস এটা। লেখা খুব সহজ। একে একটুখানি বেআব্রু করে দিতে পারলেই ব্যাপারটা দুঃসাহসিক হয়ে ওঠে। সেই রকম দুঃসাহস দেখিয়ে বাহবা পাবার লোভটাকে সম্বরণ করতে পারলেই যেন ভাল হয়।'

রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি বলেই নবীনকে সেদিন বিদায় করেছিলাম।

নবীন কিন্তু খুশী হয়নি।

বোধকরি-বা নবীনেরা কোনোদিনই খুশী হবে না। তারপর নবীনেরা যখন প্রবীণ হবে, তখন হয়ত বুঝবে এর মূল্য কতটুকু। কত ক্ষণস্থায়ী এর পরমায়ু।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অমৃতকথা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা

সংসার প্রেম

—"একজন কোন সময়ে ভ্রমণ করতে করতে খুব বড় মাঠে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। পথে রোদে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য একটি গাছের তলায় বসল। মনে মনে ভাবল যে, এই সময় একটা ভাল বিছানা পাই, তাহলে তাতে শুয়ে ঘুমুই। সে যে কল্পতরুর নীচে বসেছিল তা সে জানতো না। মনে মনে যেই এই বাসনা হ'ল, তখনই একটি উত্তম বিছানা এসে পড়ল। তখন সে খুব আশ্চর্য্য হয়ে তাতে শুলো, আর মনে মনে ভাবতে লাগল, এই সময় একটি স্ত্রীলোক এসে আমার পদসেবা করে, তাহলে খুব সুখে নিদ্রা যাই। এই মনে হওয়াও যেমন, অমনি তখনই এক যুবতী এসে তার পদসেবা করতে লাগল। তখন তার আর আনন্দের পরিসীমা রইল না। তারপর তার ক্ষুধা পেল। তখন সে মনে ভাবল, যা চাইনুম, তাইত পেনুম, তবে কিছু খাবার পাব না। বলতে না বলতে তার কাছে অমনি নানা রকম খাবার এসে জুটল। সে সেইগুলো খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, এই সময় যদি একটা বাঘ এসে পড়ে তাহলে কি হয়? যেমনি এই মনে হওয়া অমনি একটা প্রকাণ্ড বাঘ লাফ দিয়ে এসে তাকে মেরে ফেল্লে। এই সংসারে জীবেরও ঠিক এইরূপ দশা ঘটে থাকে। ঈশ্বর-সাধন করতে গিয়ে বিষয় ধন, জন অথবা মান যশ ইত্যাদি কামনা করলে তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে। কিন্তু শেষে বাঘেরও ভয় থাকে, অর্থাৎ রোগ শোক তাপ অপমান ও বিষয় নানারূপ বাঘ স্বাভাবিক বাঘ হতেও লক্ষ গুণে কষ্টদায়ক।"

জ্ঞানযোগ

—"আমি, আমি করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাহুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে। বাহুর 'হাম্-মা, হাম্-মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে; রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাই কেটে ফেলল। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে; সেই চামড়ায় জুতো এইসব তৈরী হবে। আর লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় না। চামড়ায় ঢাক তৈরী হয়। আর ঢাকের কাঠি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ীভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈরী করে। যখন ধুনুরীর তাঁত তৈরী হয়, তখন ধুনবার সময় 'তুঁহু তুঁহু' বলে। আর 'হাম্-মা, হাম্-মা' বলে না। 'তুঁহু তুঁহু' বলে; তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। কর্ম্মক্ষেত্রে আর আসতে হয় না। জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা—আমি আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী' তখনই জীবের সংসার যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।"

অন্তরীক্ষে

মন্ত্রী সভা লোপ পাবার পর

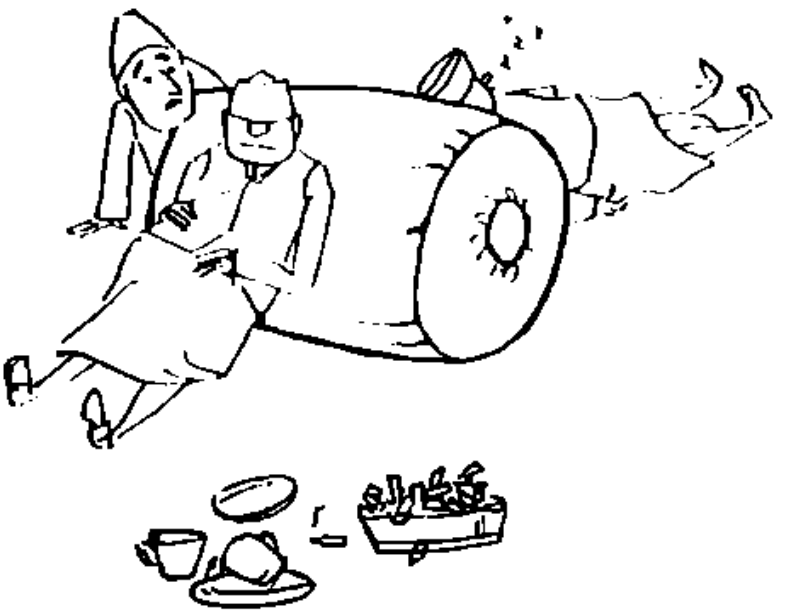

নানাদলের সলাপরামর্শ

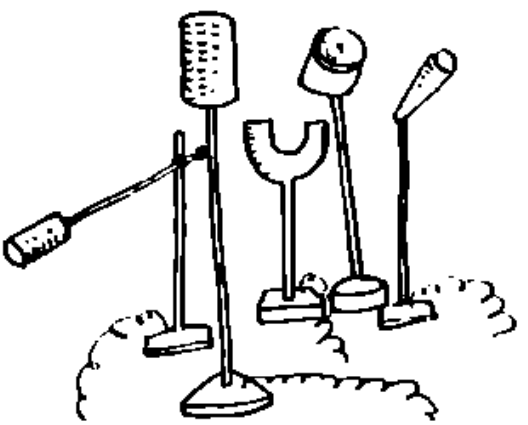

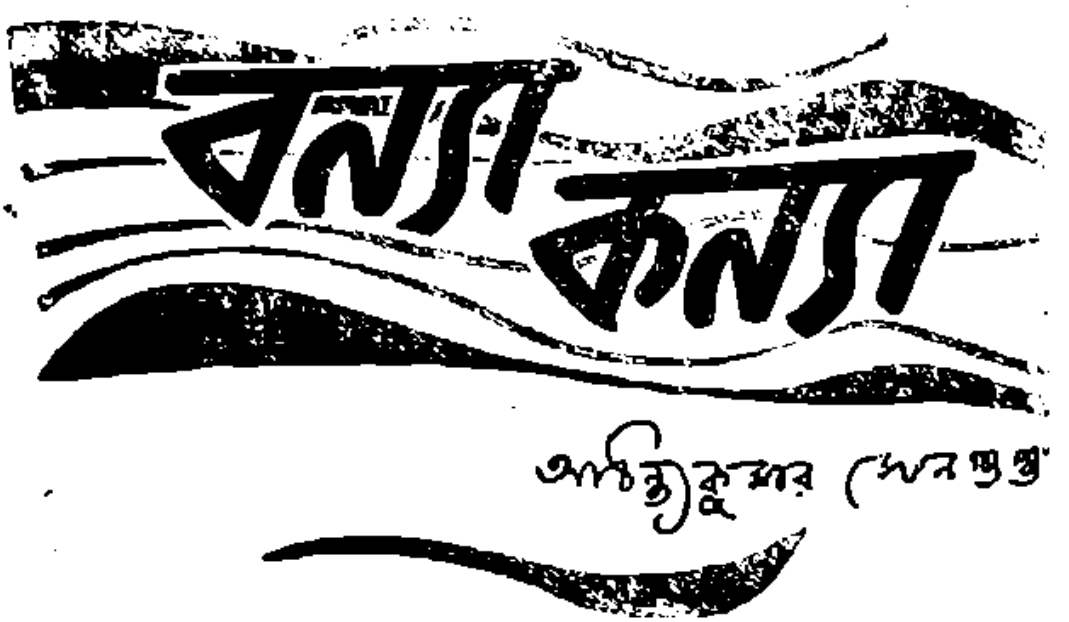

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

[**পূর্বকথা :** সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার কার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে।

হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই মোটিভের বেরার অজুহাতে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছে থেকে মিথ্যা অজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না।

একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে ঘর্ষিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেলনা এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সাহিত্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সুকৌশল কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।]

॥ পনেরো ॥

এক বোঝা ক্লান্তি—শরীরটা বনছায়া এখন কোথায় রাখে, কোনখানে ঢেলে দেয়? ঐ একটা খাট, ঐ একটা বিছানা ছাড়া তারও বা গতি কী? তবে কি সে রাগ করে মেঝেতে শোবে? মেঝেতে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করবে? না, সে অত পলকা নয়, অত সহজে সে ছিন্ন হবার নয়। রাগ করে কথার তিলকে ঝগড়ার তালে ফাঁপিয়ে তুলে নতুন-পাতা সংসারকে সে নয়-ছয় করে দিতে পারবে না। সে সুবীরের পাশে ঐ বিছানাতেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

ঠিক শোয়া নয়, বিশ্রামের চেউয়ে দেহটাকে ছেড়ে দিল। বুকের নিচে বালিশ নিলনা, জোড়া হাতের উপর মাথা রেখেই টান হয়ে পড়ল—পায়ের খানিকটা খাট ছাড়িয়ে বেরিয়ে রইল। সমর্পণের ভঙ্গিটা এমন নিটোল যেন বলতে চাইল তোমার কাছে এই একটা ধরাই যদি ধরেছ হয় তবে, দরকার নেই, আমারও তাতে কুলিয়ে যাবে।

সুবীর যেন আশা করেনি বনছায়া এমনি হঠাৎ ছায়াটির মতই তার পাশ ঘেঁসে এসে শোবে। ঠিক পাশ ঘেঁসে নয়, খানিকটা বাঁকা হয়ে, বলা যায় আধখানা হয়ে—তবু কেন কে জানে, তার কেমন মায়া হল। সারাদিনের ক্লান্তির ধুলোতে গা মলিন হয়ে আছে, ধোয়া-পাখলা করেনি, বেশবাসে বাহারো পারিপাট্য নেই—এই দীনহীন ভাবটাই তারি নতুন, তারি মধুর লাগল। যেন নিয়মের বাইরে, নির্দেশের বাইরে, পঞ্জিকার বাইরে। অসহায়ের মত নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে। শুধু অসহায় নয়, বনছায়া এখন অসতর্ক। অসংকৃত তো বটেই, অসতর্ক। তাই বুঝি তাকে সুবীরের এখন এত রমণীয় লাগল, এত লোভনীয়।

হাত বাড়িয়ে বনছায়ার ঘাড়ের নিচে সস্নেহ হাত রাখল সুবীর। আশাতীত ভালো লাগল, বনছায়া প্রত্যাখ্যান করলনা। হাতের স্নেহ আরো একটু নিচে পাঠাল, তবুও না। সুবীর তাকিয়ে দেখল দরজার ছিটকিনি দেওয়া আছে। সে যখন প্রথম ঘরে ঢুকেছিল দরজা ভেজিয়ে রেখেছিল আরেক জনের আসা তখনো বাকি ছিল বলে। কিন্তু বনছায়া যখন ঢুকল তখন আর কারো আসা বাকি নেই জেনে ছিট-কিনিটা তুলে দিয়েছিল। আলোটাও জ্বেলেছিল অবশ্য। তা আলো জ্বলছে তো জ্বলুক।

আলো যদি নিবিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো অসময়ের এই আদুরটা আর থাকেনা, থাকেনা এই অনিয়মের সুবাস। আলো নিবিয়ে দিলে সবই তো আবার সেই বিধিবদ্ধ হয়ে গেল। বনছায়ার সমস্ত শৈথিল্য লোপ পেয়ে গেল। সে যেমন সাবধান তেমনি আবার আঁটসাঁট হয়ে উঠল।

না, তৈরি হতে দেওয়া নয়। বনছায়ার এই অমনোযোগকেই অভিনন্দন জানাতে হবে।

দুহাত বাড়িয়ে সুবীর বনছায়াকে বুকের উপর খানিকটা টেনে আনল। ধীরে ধীরে স্নেহে নিবিড় ও ক্রমে-ক্রমে আদরে উতরোল হয়ে উঠল।

বনছায়া আদুরে গলায় বললে, 'আলো।'

এখন উঠে আলো নেবাতে গেলে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অন্ধকারের স্পর্শেই অভিসন্ধিটা প্রকট হয়ে উঠবে। আর তার আভাস পেতেই বনছায়া সচেতন হবে, উঠে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আসবে। ফলে নাটক আর পূর্ণাঙ্গ হতে পারবেনা।

'জ্বলুক আলো। কে আর দেখতে আসছে!' সুবীর আশ্বস্ত করতে চাইল।

সন্দেহের কিছু ছিলওনা কোথাখানে। সময়টা সন্ধ্যা, জানলা ছুটি। খোলা, শরীর ক্লান্ত অপরিচ্ছন্ন,

মন নিরুৎসুক। বনছায়া ভেবেছিল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেই সাহিত্য স্নিগ্ধ হয়ে উঠবে, আর সামান্য প্রশ্রয়ে স্নিগ্ধতর হতে দিলেই ঘরের মধ্যেকার বন্ধ বাতাসটা সরে যাবে। মনের মধ্যে কোথাও আর কুটিল জট পাকাবেনা। সরল, সহজ হয়ে যাবে সমস্ত।

কিন্তু এ যে 'ভর' নয়, এ যে 'ভয়'—দুর্দামতম। এ যে আয়তি নয় এ যে আক্রমণ।

'তুমি কী!' কটকা মেরে উঠে পড়ল বনছায়া। চোখে ভর্ৎসনা পুরে বললে, 'ভর সন্ধেবেলা, চারদিক খোলামেলা—'

'খোলামেলাই তো ভালো।' সুবীরও উঠে পড়ল।

'না, ভালো নয়।' গম্ভীর হয়ে, যেন অন্য অর্থে বললে বনছায়া। 'অন্তত এক্ষুনি-এক্ষুনি নয়।' তারপর কথার সুরে একটু আর্দ্রতা মেশাল: 'কী ভীষণ ক্লান্ত হয়েছি বাড়ি দেখতে গিয়ে। স্নেস না টেরেস, রোড না এভিনিউ—গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে ঘুরেছি। এক পেয়ালা চা খেতে পারিনি! 'উঃ, তারপর তুমি কিনা—'

সুবীর আবার পরাস্ত হয়েছে। কোথায় নিজেকে গৌরবে বহন করে নিয়ে যাবে, তা নয়, নির্লজ্জ বলে প্রতিপন্ন হল! অনুভব করল এর কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত দরকার।

ব্যস্ত হয়ে মায়ামাখানো স্বরে বললে, 'তুমি উঠো না, তুমি শুয়ে থাকো।'

'আর তুমি?'

"আমি চা করি।'

'সত্যি?' খুশিতে উজ্জ্বল হল বনছায়া: 'পারবে করতে?'

'দেখ না পারি কিনা। আমি স্বামী। আমি সব করতে পারি।'

চোখের মধ্যে দুষ্টুমির হাসি ফোটাল বনছায়া: 'কিন্তু সব সময়ে পারো না। অন্তত আমি যখন—'

'হ্যাঁ, তুমি যখন অরক্ষিত।

'না, ওভাবে বলাটা ঠিক হবে না। বলবে, আমি যখন অনিচ্ছুক।'

এর উপরে তর্ক চলে না। সহযোগিতার কথা, সহবসিতার কথাটাকে খণ্ডন করবে কী দিয়ে? তবু পুরুষের অভিমান ছাড়তে পারল না সুবীর। বলে ফেলল, 'তোমার ইচ্ছা দিয়েই তো সমস্ত কিছু হবে।'

'কেন, আমার ইচ্ছাটা কি অযৌক্তিক?' বনছায়ার আর শোয়া হলনা, শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল।

'না, তা কে অস্বীকার করছে?' সঙ্গে আবার একটু স্বামিত্বের টিপ্পনী কাটল সুবীর: 'সংসারের চাইতে তোমার কাছে তোমার কেরিয়র বড়।'

'সংসার! সংসারের চাইতে?'

'অন্তত সন্তানের চাইতে তোমার কেরিয়র বড়।'

'সন্তান যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ চাকরিটা বড় বইকি।' স্থির শান্ত স্বরে বললে বনছায়া, 'কেননা চাকরি ছাড়া সংসার চলবেনা। কিন্তু সন্তান এসে গেলে কে বড় হয়—সন্তান, না, কেরিয়র, তা বলা কঠিন।'

'আমিও তো তাই বলছি। যতদিন ঐ অন্তত উৎপাতটাকে রাখা যায় ঠেকিয়ে।'

সুবীরের কথার শেষটুকু মর্মে এসে পৌঁচা মারল—মুখের হাসি দিয়ে সে দাহ সম্পূর্ণ মুছতে পারল না বনছায়া। বলে উঠল, 'তুমি বলতে চাও এই মুহূর্তে এই একচিলতে ছোট ঘরে আমাদের সন্তান ডেকে

'ওরে বাবা:, অসম্ভব।' সুবীর একটা নাটুকে ভঙ্গি করল: 'তারপর ও এলে তো একা আসে না, দলবল আসে।'

'তবে তখন বলছিলে কেন আমার এই ছোট ঘরই ভালো?'

'তখন বুঝিনি, এখন বুঝছি ঘর বড় হলেই আমার ভবিষ্যৎ বড় হবার সম্ভাবনা। চলো, তোমার বস-এর বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নি এক্ষুনি। দেরি হলে না হাতছাড়া হয়ে যায়।'

সুবীর যেন এখুনি যাচ্ছে বাড়ির সন্ধানে! তবু-তার কথার সুরে আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে বনছায়া মিষ্টি করে হাসল। বললে, 'এখুনি রাতে যাবে কী। কাল আফিসের পর দুজনে একসঙ্গে যাব। দেখে তোমার ভীষণ পছন্দ হবে দেখো। তিন-তিনটে ঘর—ভাবা যায় না - সব আমাদের একলার।'

যেন কত বড় আবিষ্কার! তবু টাকার সংস্থানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে নতুন করে তর্ক জুড়ল না সুবীর। কার দাবি অগ্রগণ্য সে-ইঙ্গিতও আর তুলল না। বনছায়ার আনন্দে সক্রিয় অংশ নিল। বনছায়া যদি চা-য়ে মন দিল, সুবীর ঘর-পরিষ্কারে হাত লাগাল। ঝাঁটাগাছটা কুড়িয়ে এনে মেঝেতে তুলি বুলতে লাগল। তারপর বিছানার চাদরটা ঝাড়তে ঝাড়তে কবিতা আওড়ে উঠল: 'আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে, মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে—'

'কিন্তু মাটিতেই যে ঘর গড়ে তুলব তারও চারধারে সুরক্ষিত দেয়াল দেব।' তৃপ্তিতে চোখ বিশাল করে তাকাল বনছায়া: 'স্বাধীনতার সঙ্গে সংযম মেলাব, আনন্দের সঙ্গে শ্রী, অধিকারের সঙ্গে অপরের প্রতি বিবেচনা। হাতের সঙ্গে হাত, মাথার সঙ্গে মাথা আর কখনো-সখনো—' বনছায়া নিজেই উদ্যোগ করে সুবীরের গলা জড়িয়ে ধরে অধরের সঙ্গে অধর মিশিয়ে দিল।

সুবীরের মধ্যে যে অপরাধের ভাবটা ছিল মুছে নিল বনছায়া।

মনের খোলা হাওয়ায় বসে দুজনে তারপর চা খেল—আর সহসা এমন একটা সরল পরিবেশ তৈরি হয়ে উঠল যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে রসিকতা করতে পারল।

'তুমি দেখতে পাচ্ছ তুমি আর কবিতা লিখতে পারছ না।' বললে বনছায়া, 'আগে পারতে, তখন তোমার এই একার একটা ঘর ছিল। এখনই এই লেখবার জন্যেই তোমার একটা ঘর দরকার।'

'তুমিও তো পারছনা উপন্যাস লিখতে।' সুবীর কণ্ঠস্বরে মমতা আনল।

'সেও তো ঐ ঘরের অভাবে।'

'ঠিক বলেছ লেখার জন্যেই ঘর দরকার। চলো আর দেরি নয়।' উঠে পড়ে গায়ে জামা চাপাল সুবীর।

বনছায়া চোখের কোণে বিলোল করে একটু হাসল। বললে, 'কবিতাই তো কবির আসল সন্তান।'

'আর উপন্যাস? ইয়া ইয়া আঁদরেল উপন্যাস?'

'যাও। জানিনা।'

'আমি জানি।' সুবীর বনছায়ার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'কী?'

কানে-কানে বলার মত করে সুবীর অস্ফুটে বললে, 'সন্তান নয়—গর্ভস্রাব।'

দুজনে খিলখিল করে হেসে উঠল।

তারপর এঘরটি তালাতে চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুটিতে। এখানে সেখানে কোথাও ঘোরাঘুরি করবে, তারপর যথাসময়ে নিয়মিত হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

তারপর দুজনে টেবিলে বসে বই-টই নিয়ে নাড়াচাড়া করবে। কতক্ষণ পরে তুমি কিন্তু লেখবার চেষ্টা করো—বলে বনছায়া শুয়ে পড়বে। আর ক্লান্ত মানুষের কী অগাধ ঘুম এর আগে কোনোদিন আর দেখেনি সুবীর। বিরক্ত করতে মায়া হয়। তারপর সুবীর যখন শুতে যায় তখন স্থান সংকুচিত হয়েছে বুঝে ঘুমের মধ্যেই বনছায়া পাশ ফেরে, একেবারে দেয়ালের মুখোমুখি হয়ে কুঁকড়ে থাকে। তারপর যদি মধ্যরাতে তার কখনো ঘুম ভাঙে!

সমস্তই যেন বনছায়ার ইচ্ছা দিয়েই নিয়ন্ত্রিত। যদি সুবীর দুর্বার হয়ে উঠতে চায় বনছায়া তার প্রতিষেধে তন্ত্র-মন্ত্রের অনুষ্ঠান করতে বসে। উন্মুক্ত আনন্দের মধ্যে বিজ্ঞানের বন্ধন আনে।

সব সময়ে তারই ইচ্ছা তারই চাকরি তারই নিরাপত্তা প্রধান হয়ে ওঠে।

'তাই তো হওয়া উচিত।' বনছায়া সুবীরের বিচারবুদ্ধির কাছে আশ্রয় খোঁজে। বলে, 'এখন আমি তো আর আমি নই, আমি এখন তোমার—সংক্ষেপে তোমারই একমাত্র। আমার দিকটা তো তুমিই এখন ভালো করে দেখবে, বেশি করে দেখবে।'

'হ্যাঁ, হয়েছে, এখন চলো। নতুন বাড়িতে আগে একবার যাই না—'

'উঃ, নতুন বাড়ি—তিন-তিনটে ঘর, ভাবা যায়না।' বনছায়া আনন্দের ঢেউ তুলল।

'তুমি যে বললে মাঝখানের ঘরটা ড্রয়িং রুম হবে সেটা হবেনা। মাঝখানেরটা আমাদের বেডরুম হবে।' সুবীরকে বুঝি একটু গম্ভীর শোনাল, 'পাশের ঘর দুটো আমাদের আলাদা-আলাদা বসবার ঘর হবে মানে লেখবার-পড়বার ঘর, কখনও শোবার ঘর হবে না। বন্ধুবান্ধব এলে যার বন্ধু তারই বসবার ঘরে গতি হবে।'

'কিন্তু আমি যদি পড়তে পড়তে আমার একা ঘরে ঘুমিয়ে পড়ি!'

'তা হলে আমি নিজে এসে তোমাকে কোলে করে আমাদের মাঝের ঘরে নিয়ে যাব।'

'উঃ, আমাকে পারবে কিনা তুলতে!'

'তুলতে না পারি, ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাব।'

'তার মানে নতুন বাড়িতেও শান্তিতে ঘুমুতে দেবে না।'

'মোটেই তা নয়, বরং পুরোপুরি শান্তির ঘুমের ব্যবস্থা করব। যাতে একবিন্দুও না কম পড়ে।

কথা হল, পরদিন অফিস-টাইমের পর সুবীর বনছায়ার অফিসে গিয়ে দেখা করবে। যদি দেবজ্যোতি তৌমিক উপস্থিত থাকে তার সঙ্গে সুবীরের আলাপ করিয়ে দেবে। বনছায়া আসলে ভাড়া নিলেও সে আর সঙ্গে থাকবে, আসলে সেই ধুরন্ধরটি কে, দেখতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তারপর দেবজ্যোতিকে নমস্কার করে তার আশীর্বাদ নিয়ে তারা দুজনে বাড়ি দেখতে চলে যাবে। এর আর দেখাদেখি কী, দোতলার উপর তিনখানা ঘর, রান্না ও স্নানের ঘর আলাদা, রাস্তার দিকে আবার টানা বারান্দা—এ তো প্রায় নন্দনকাননের কাছাকাছি। আর ভাড়া এমন কিছু মারাত্মক নয়। তাদের সংযুক্ত সাধ্যের মধ্যে।

কিন্তু বনছায়া অফিস-টাইমের পর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, প্রথমত তার ঘরে, পরে অফিস গেটের সামনে, শেষে বাস-স্টপে কিন্তু সুবীর এলনা। মানে কী? ভুলে গেছে, না, কোনো বাধায় আটকেছে? তেমনবার মত এ একটা বিষয় নাকি, আর তার বাধাই বা কী হতে পারে? বনছায়ার খুব রাগ হতে লাগল

কিন্তু তার নিষ্ফলনের কোনো উপায় খুঁজে পেলনা। সব চেয়ে রাগ হতে লাগল নিজের উপর, এমনি দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার উপর। কিন্তু গত্যন্তর কী?

গত্যন্তর হচ্ছে বাড়ি ফিরে যাওয়া।

বাড়ি ফিরে ভেবেছিল দরজা খোলা পাবে, পরিচিত আলস্যে ঘূর্ণীকৃত দেখবে সুবীরকে। কিন্তু না, ঘর অন্ধকার, দরজায় সেই আদিম তালা ঝুলছে।

এবার বুঝি দুশ্চিন্তায় গিয়ে পড়ল বনছায়া। কিন্তু কী করবে কোথায় যাবে কিছু ভেবে পেলনা। এমন একটা অবস্থার মুখোমুখি সে পড়তে পারে সে-কখনো ভেবে দেখেনি, আর পড়লে প্রতীকার কী তাও বুঝি তার জানা নেই।

দরজা খুলে আলো জ্বালল বনছায়া। জানলা দিয়ে বারে বারে চেয়ে দেখল এই বুঝি সুবীরের ছায়া, কান খাড়া করে বারে বারে শুনল এই বুঝি সুবীরের পদ—কিন্তু না, নয় জেনে তাকিয়েও আশাভঙ্গের চমক লাগল না। যেমন না তেমনি না হয়েই রইল।

কী করবে, একে একে সমস্ত গৃহকৃত্য সাঙ্গ করল। অনেক দেরিতে চা করল যাতে চা খেতে-খেতে এসে পড়তে পারে। এক কাপ দু কাপ শেষ করল বনছায়া, তবু সুবীরের দেখা নেই। হাতের ঘড়িটা খুলে রেখেছিল আবার পরল অন্যমনস্কের মত। বাড়িতে বসে থাকাটা দুর্বহ ভারের মত মনে হচ্ছে, বসে থেকে কী হবে, বাইরে খোঁজাখুঁজি করিগে। কিন্তু কোথায় খুঁজবে? কে হদিস দেবে? সুবীরের অফিসের কাউকে সে চেনে না। না, একজনকে চেনে। সেই হিমাংশুকে তার বাড়িতে গিয়ে এত রাতে সে জিজ্ঞেস করবে, আমার স্বামী কোথায় বলতে পারেন? উত্তরে সে কী বলে বলে তার ঠিক কী। ভাবতেও লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশতে চাইল বনছায়া। কিন্তু যদি রাতভোরই সুবীর না ফেরে তবে হিমাংশু ছাড়া আর কার কাছে সে যাবে সংবাদের জন্যে?' আর সে কী সংবাদ তা কে জানে। তবে কি সে তার পিতৃগৃহের জনবলকে আকর্ষণ করবে? ভাবতেও মাথা কাটা যাচ্ছিল বনছায়ার। যে পতির জন্যে আমাকে তোমরা পথে ঠেলেছ সেই পতিরই পথের সংবাদ এনে দাও আমাকে। ছিঃ, তার আগে যেন বনছায়ার আত্মহত্যায় মতি হয়।

কিন্তু, ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে, সুবীরের দেখার নাম নেই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে গিয়ে না পৌঁছুলে হোটেলে খাওয়া জুটবে না। নিজে কোথায় বন্ধুদের দলে পড়ে ফুর্তিফার্তি করছে তার ঠিক কী, তাই বলে তার নিজের উপোস করে থাকার কোনো মানে হয়না। কে জানে নির্ধারিত হোটেলে গিয়ে দেখবে খাবার টেবিলে বসেই সুবীর তার প্রতীক্ষা করছে। সেটাই বুঝি একটা প্রকাণ্ড উপঢৌকনের মত দেখাবে। কিন্তু হাতে ঘড়ি বাঁধলেও মন বিশ্বাস করতে চাইল না বনছায়াকে ফেলে সে শুধু দেরির অজুহাতে একা একা হোটেলের খাবার-টেবিলে গিয়ে সামিল হয়েছে। আসলে বিয়ের পর বনছায়াকে ছেড়ে সে একা হয়নি, বনছায়াও না, যেখানেই তারা গিয়েছে একসঙ্গে গিয়েছে, যেখানেই তারা থেকেছে একত্র থেকেছে—প্রণয়ের সেই সাদ্ধ্য অভ্যাস পরিণয়েও বিধারিত হয়নি। তবে আজ এই ব্যতিক্রম কেন? আজ কী এমন সুবীরের উপভোগ জুটল যাতে বনছায়ার ভাগ নেই? কী বা এমন বিপদ যাতে বনছায়াকেও সমাংশে শিরি হতে দেবে না?

যাই হোক, মুখে কিছু দিয়ে আসতে হয়, নইলে সারা রাত্রির উদ্বেগ সইবার মত শক্তি পাবে কোথায়?

ভাবাবেগে মানুষ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে লাভ নেই। সে শুধু বিপদের উপর বিপদ বাড়ানো। শোক করতে হলেও শরীরে শক্তি দরকার—থানা পুলিশ হাসপাতাল করতে হলে আরো দরকার।

হোটেলের উদ্দেশে বেরুচ্ছে, আনলা দুটো বন্ধ করে আলো নেবাতে যাচ্ছে এমনি সময় হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল সুবীর।

কী ব্যাপার—বিমূঢ় বনছায়াকে একটা প্রশ্ন করতেও সময় দিলনা। ঘরের দুর্বল আলোটাকে সহস্রগুণ সতেজ করে উল্লাসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: 'খুব ভালো খবর।'

ঘরের ছেলে শুধু ঘরেই কেরেনি একেবারে ভালো খবর নিয়ে ফিরেছে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বনছায়া।

'আমার ওভারটাইম হয়েছে।'

'কী হয়েছে? বনছায়া যেন সহসা বুঝে উঠতে পারল না।

'ওভারটাইম হয়েছে—ওভারটাইম। বল কী নিদারুণ ভালো,' সুবীর পঞ্চমুখ হয়ে উঠল: 'দুঘণ্টা তিন ঘণ্টা চারঘণ্টা ওভারটাইম। যত বাড়তি খাটনি তত বিগুণ পয়সা। পেয়েন্ট উইকলি। আমার আয় এখন অনেক বেড়ে যাবে। দুশোটাকার বাড়িভাড়া নিতে আর বেগ পেতে হবে না।'

'তার মানে সন্ধের আগে তুমি আর বাড়ি ফিরবেনা?' বনছায়া হঠাৎ যেন কেমন হতাশ হয়ে গেল।

'এমনি সময় ফিরব, কোনোদিন বা এরও পরে। যতক্ষণ খাস ততক্ষণ আশ শুনেছিলে—এ যতক্ষণ থাকা ততক্ষণ টাকা।'

'তার মানে সন্ধেবেলা তোমাকে আর কাছে পাবনা। আমাকে একা একা থাকতে হবে!'

'দূর! এ আবার একটা সমস্যা কী। কত কেরানিই তো জীবনভোর ওভারটাইম করছে।

'তার মানে তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখা হবে না, যাওয়া যাবে না কোনো মজলিশে, থিয়েটারে, একজিবিশনে, সাহিত্যসভায়।'

'আমি না গেলে কী, তুমি একা একা যাবে।'

'আমি যাই, গিয়েছি কোনোদিন!'

'দূর! রোববার তো আছে।'

'সেদিন তো ঘুমুবে। সমস্ত অনিদ্রার শোধ তুলবে।'

সুবীর হাসল। বললে, 'শত ঘুমিয়েও অনিদ্রার শোধ হবে না। একমাত্র শোধ মৃত্যুতে। কিন্তু তাই বলে যতদিন বেঁচে আছি' সুবীর মুখে গাম্ভীর্য আনল: 'টাকা রোজগারের সুযোগ পেয়ে তা ষোলআনা সদ্ব্যবহার করব না এ অসম্ভব।'

বনছায়ার ম্লানতা তবু যায় না। অনেক্ষণ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে বললে, 'আমাদের রাত্রে আর একসঙ্গে খাওয়া হবেনা।'

'দূর! এ আবার একটা কথা!' সুবীর উড়িয়ে দিতে চাইল: 'এখন নতুন বাড়ি হবে, রান্নাবান্না কাজকর্ম করবার লোক রাখব। তুমি সময়মত খেয়ে নেবে, আমার খাবার ঢাকা থাকবে। বেশি বেলি দেখলে তুমি শুয়ে পড়বে, কাজের লোকটা জেগে থাকবে। এই তো কেরানির ঘরের সাধারণ চেহারা। এ নিয়ে ভাবার ভাবনা কী।'

শত ব্যাখ্যা বিস্তার করেও বনছায়া তার শূন্যতাকে স্পষ্ট করতে পারবে না। একাএকা আমি কী করব, কী নিয়ে থাকব, তাকে নিয়ে!'

'কেন, তুমি লিখবে।' সুবীর সজোরে বলে উঠল : 'বরং আশেপাশে কেউ থাকবেনা তোমাকে বিরক্ত করতে এ তো তোমার বিরাট শান্তি।'

'কিন্তু তোমার লেখা?' তুমি লিখবে কখন? তোমার ওভারটাইম যে তোমার লেখবার সমস্ত উৎসাহকে গিলে খাবে।'

'দূর! আমার তো কবিতা লেখা। আমি তো এক ফ্যাশে লিখি। একটা আধুনিক কবিতা লিখতে কতক্ষণ সময় লাগে? বড় জোর পাঁচ মিনিট। হাস্যির কত কম।'

'কই তাও তুমি লিখছ কই?'

'দাঁড়াও, আগে টাকা পরে কবিতা। সুযোগ এসেছে কদিন কিছু কামিয়ে নি। টাকা ছাড়া কিছু হবার নয়।'

'বাড়িটা তো দেখলে না।'

'আসছে রোববার দেখব। সম্ভব হলে সেদিনই লিফট করব। বস নিদারুণ ভালো, বললেই অফিসের লরি দেবে। এমন সহৃদয় লোক হয় না। লোকে এমনি ওভারটাইম পায় না, আমাকে স্পেশাল রেট দিলে।'

সহৃদয় সন্দেহ কী! বনছায়ার রঙিন মদির সন্ধ্যাগুলি হরণ করে নিল। টাকার টানে সুবীরকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিল। তাকে দিয়ে গেল নিষ্ফল নিঃসঙ্গতা।

রবিবার নতুন বাড়িতে যাবে তারই স্বপ্ন দেখছিল বনছায়া কিন্তু শনিবার নতুন সংবাদ নিয়ে বাড়ি ফিরল সুবীর।

'তোমার ও বাড়িতে যাওয়া হবেনা।'

'কেন?'

'আমার বস আমার জন্যে নতুন বাড়ি ঠিক করেছেন।'

'তোমার জন্যে?'

'আমার জন্যে মানে আমার পরিবারের জন্যে।'

'বাড়িটা কোথায়?'

'আফিস থেকে তোমার ও বাড়ির চেয়ে সামনে। দোতলায় দুখানা ঘর। ভাড়া দেড়শো।'

'ও বাড়ির ঘর তো তিনখানা ছিল, ভাড়াও ভৌমিক বলছিল, দেড়শোই হবে।'

'না। আমার বসএর বাড়িই আমাকে নিতে হবে।'

'তুমি কী যে বলো! একই ভাড়া. কিন্তু তিনখানা ঘর। তিনখানা ঘর!' প্রায় স্বপ্নের সুরে কথা বলে উঠল বনছায়া : 'কত সুখ কত স্বাধীনতা!'

'না, আমাকে আমার বসএর কথা রাখতে হবে। তাতেই আমার লাভ। আমার উন্নতি।'

'কিন্তু—'

'না।' আরো গম্ভীর হল সুবীর। দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমার জন্যে এ আমার অফিসের কোয়ার্টার। এ আমাকে নিতে হবে। তাই আমার বসএর আদেশ। আমি যেমন আমার বসএর কথা শুনছি, তোমারও তেমনি আমারই কথা শোনা উচিত।' :

(ক্রমশঃ)

মনের পাতায় লেখা

দীপঙ্কর

মণির ডায়েরী

২১শে ডিসেম্বর :

যাগো! দীপক-দা যেন কি! আজ প্রায় উনিশটা বছর পাশাপাশি বাস করছি তবু ঐ অতি-কম কথা বলা লোকটির মনের তল পেলাম না।

আমার রূপটা কি এতই তুচ্ছ? যে রূপের উপর সহস্রলোক মুগ্ধ দৃষ্টির পরশ বুলিয়ে আমার মাথায় রাণীর মুকুট পরিয়ে দিয়েছে ওঁর কাছে কি তার কোন দামই নেই?

উনি যে সাহিত্য চর্চা করেন কোন্ শক্তি নিয়ে, আমি তাই ভাবি। সৌন্দর্য প্রশংসা করবার মত যাঁর দৃষ্টি নেই, তাঁর কাব্য আসে কেমন করে? উনি পাষাণ না নির্বোধ, সে প্রশ্নের সমাধান ত' আজও হল না।

• • • •

শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দীপকদার স্টাডির কাছে গিয়ে বাইরে থেকে দেখলাম, উনি তখন আপনার মনের ভাব খাতার পাতায় বন্দী করে রাখতে ব্যস্ত। ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যেও ওঁর মুখের উপর যে স্বল্প আলোটুকু পড়েছিল তাতে দেখলাম যেন মধুর তৃপ্তির এক প্রলম্ব প্রলেপ ওঁর সারা মুখে মাখান। সৃষ্টির আনন্দে ওঁর দীপ্তোজ্জ্বল চোখ দুটি যেন ভাষাময় হয়ে উঠেছিল। বিকেলের প্রার্থনাটা সেদিন অনেক আশা নিয়েই সম্পন্ন করেছিলাম।

একটু অপেক্ষা করে ঘরে ঢুকে বললাম—এই! আজ একটু রবীন্দ্র সদনে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে আমাদের কলেজের একটা ফাংশান হচ্ছে। তোমায় যেতেই হবে।

দীপক-দা একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কি বলছ?

বললাম - মা গো! তুমি কি কালা! তার পর গলায় মিনতির সুর ঢেলে দিয়ে বললাম—চলনা দীপক-দা আমার সঙ্গে।

তেমনি উদাস সুরে উনি বললেন—কেন কাকা বাবু নেই? হঠাৎ আমার ওপর ভার পড়লো যে?

বললাম—না, বাবা আজ যেতে পারবেন না। উনি তোমার কথাই বললেন। ওঠ, ওঠ, সাড়ে পাঁচটা বাজে। এই বলে ওঁর খাতাপত্রগুলো বন্ধ করে দিলাম।

হতাশ সুরে দীপক-দা বললেন—সে কেমন করে হবে? আমি তো যেতে পারব না, মেয়েদের নিয়ে ফাংশানে যাওয়া আমার অভ্যাস নেই মণি।

বললাম—সে তোমায় কিছু করতে হবে না। আমি সব ঠিক করে নেব। তুমি শুধু আমার সঙ্গে যাবে।

দীপক-দা কথা বললেন না। ওঁকে নীরব দেখে বললাম—না, দীপক-দা, আজ তোমায় যেতেই হবে। আজ আমি বুধীদি'দের কথা দিয়ে এসেছি। আজ তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমার মান থাকবে না।

—কেন?

বললাম—বুধীদি'র সুকুমার-দা, ছবিদি'র সমর-দা কেমন ওদের প্রায়ই সিনেমা, পার্টিতে নিয়ে যায়। আমার মত কিন্তু তাদের সাধাসাধি করতে হয় না। তুমি কোথাও যাওনা বলে ওদের কাছে আমায় কত কথা শুনতে হয়। ওরা কি বলে জান? ওরা বলে তোর দীপকদা একটি আস্ত কুনো।

দীপক-দা বললেন—তাই বুঝি?

বললাম—হ্যাঁ। তাই আজ বড় মুখ করে এসেছি। আজ তোমায় নিশ্চয় নিয়ে যাব। আজ যদি না যাও তাহলে আমি ওদের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবো না। সত্যি দীপক-দা, আজ তোমায় যেতেই হবে। তুমি না গেলে বুধীদি যা হাসবে!

দীপক-দা গম্ভীর ভাবে বললেন—তুমি তো জান মণি, আজকের এই আধুনিক যুগেও মেয়ে পুরুষে সমান তালে মেলে বেড়ান আমি পছন্দ করি না। সেজন্যে তোমার বন্ধুরা যদি আমায় কুনো বলেন, তাঁদের বোলো তারা ঠিকই অনুমান করেছেন।

বললাম—আমার খাতিরে তুমি কি একদিনও যেতে পারনা?

দীপক-দা মাটির দিকে চেয়ে তেমনি অন্যমনস্কভাবে বললেন—আজ ত' আমি যেতে পারব না। আজ আমার শরীর ভাল নেই। লক্ষ্মীটি। আজ যাও। এই বলে উনি ঘাড় গুঁজে বসে রইলেন।

খুব রাগ হ'ল মনে মনে।

ভাবলাম—কি এই পৌরুষের গর্ব? উনি ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্ন, হ'ন বা সাহিত্যিক। আমার এত সাধের লজ্জা, একটা মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তার পুরস্কার দিতে পারলেন না? এমনি কৃপণ?

তবু মুখে বললাম—আজ যাবার জন্য যে একেবারে সেজে এসেছি। চলনা দীপক-দা।

খাতার প্রতি তেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উনি বললেন—লক্ষ্মী মণি, আজ আমি যেতে পারব না। যদি একান্তই না ছাড় অন্যদিন যাব। তুমি যাও, আজ যাও—এই বলে উনি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

মনে মনে অভিমান হ'ল।

ভাবলাম, উনিশটা বসন্ত আমার গলায় অশোকের মালা পরিয়ে আমায় অভিনন্দন জানিয়েছে কিন্তু একটা তরুণকে মুগ্ধ করবার মত সামর্থ এই দেহটায় নেই।

নিজের প্রতি একটা উৎকট বিতৃষ্ণায় আমার মনটা বিষিয়ে উঠল।

আমার সযত্ন-রচিত লাজ-লজ্জা পরাজিত সৈনিকের অঙ্গের বর্মের মত নিরর্থক মনে হ'ল। নিজের ঘরে এসে ওগুলো খুলে বাঁচলাম।

দীপকের ডায়েরী

২৭শে ডিসেম্বর:

নাঃ, আমার এই নিরর্থক লজ্জাটাকে নিয়ে আর পারা গেলনা। কতবার ভেবেছি মণির সামনে সহজ

ভাবে কথা বলব, কিন্তু পারি না। লুকিয়ে কতদিন ওর রূপ দেখেছি, কিন্তু ওকে সামনে পেলে কি জানি কেন আমার বুদ্ধিবৃত্তিগুলো এলোমেলো হয়ে আসে।

ভাবি, মনের মণি-কোঠার সঙ্গোপনে যে কথাটি লুকিয়ে রেখেছি তা বুঝি ওর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

আমি ত দিবানিশি আপনাকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করে চলেছি কিন্তু বিশ্বজনের মনের অগোচরে বারবার ঐ একটি কথাই আমার মনে জেগে ওঠে, আমি বুঝি ওকে ভালবাসি: আমি বুঝি ওকে ভালবাসি!

মণিও বোধ করি আমাকে ভালবাসে। ওর আচরণে ভালবাসার কত লক্ষণই পেয়েছি, কিন্তু তবুও ত' আমি ওর কাছে আত্মপ্রকাশ করতে পারিনি।

হয়ত সারাজীবনই পারব না। এমনি করেই হয়ত কস্তুরী মৃগের মত চিরদিন নিজের গোপন গন্ধে আকুল হয়ে থাকতে হবে। কে জানে—

• • • •

মনস্তত্ত্ববিদদের বলতে শুনেছি, আত্মপ্রকাশের সংঘাত প্রবৃত্তিটি নর-নারীর মনে সমানভাবে থাকে। ওটা মণির মধ্যেও দেখেছি। সে সাজ সজ্জা করে কত ছলে আমার কাছে এসেছে শুধু মুগ্ধ প্রশংসার বাহবা নিতে। কিন্তু আমি তাকে তা দিতে পারিনি। মনে পড়ে ছেলেবেলায় কত রঙরহস্যের মধ্যে আমাদের জীবন কেটেছে, কিন্তু যেদিন ওর শান্ত চোখ দুটিতে কৈশোরের বিচিত্র দীপ্তি দেখেছি সেই দিন থেকে আমার চিন্তাধারা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে বসে একটা কবিতা লিখছিলাম, মণি এসে বলল—এই!

ওর দিকে চেয়ে দেখলাম—বিশ্ববিজয়িনী রূপ নিয়ে ও আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই!

ওর বিচিত্র ডাক শুনে হাসি এল। দেখলাম, বিশেষ প্রিয়জনের নাম উচ্চারণ করবার যে লজ্জা সেই নিদারুণ দুর্বলতার হাত থেকে ও মুক্তি পায়নি।

মণি কত কি বলে গেল, মনে হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বলছ?

মণি বলল—মাগো! তুমি কি কালা হয়েছ? তারপর রবীন্দ্র সদনে নিয়ে যাবার জন্য কত অনুনয় করলো, কিন্তু পারলাম না।

একটা গোপন আশঙ্কা মনকে উৎকণ্ঠিত করে তুলল। ভাবলাম সেদিনের সেই চঞ্চল মুহূর্তে হয়তো আমার মনের দুর্বলতাটুকু প্রকাশ হয়ে পড়বে। প্রাণপণে আত্মসংযম করে ওকে বিমুখ করলাম।

মণি চলে গেল।

যাবার বেলায় দেখলাম ওর মুখে অতৃপ্তির একটা ম্লান রেখা ফুটে উঠেছে।

একটা মৌন বেদনায় সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এমনি অহেতুক লজ্জায় জীবনের সুযোগগুলোকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে দেব না।

• • • •

২৮শে ডিসেম্বর :

ঘরে বসে অসমাপ্ত গল্পটি লেখা শেষ করছিলাম, এমন সময় মণি এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াল।

ওর সদ্যস্নাত শুচি শুভ্র মুখখানির দিকে চেয়ে দেখলাম। মন চঞ্চল হয়ে উঠল। হঠাৎ আগেকার দিনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম কিছুতেই আজ আমার মনের লজ্জার কাছে আত্ম-সমর্পণ করব না।

কিছুক্ষণ পরে ওর মুখের উপর দৃষ্টি রেখে রহস্যের সুরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললাম—কি গো! ব্যাপার কি! আজ সকালেই দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছ না কি?

মণি হেসে বলল—তা আর হল কই? যাত্রাতেই ত' পরাজয়। এই বলে সে আবার হেসে উঠল।

বললাম—উঁহু, তাত' মনে হয় না।

মণি তাড়াতাড়ি বললে—তোমার মনে হওয়াটাই কি জগতের সব দীপক-দা? তোমার মনের বাইরে কি পৃথিবীর কিছুই থাকতে নেই? তারপর কথার সুর বদলে বললে—আজ তোমার হল কি দীপক-দা, হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন হল কি করে? তোমার গল্পের কোন নায়িকা কি তোমার কল্পনা রাজ্য ছেড়ে নেমে এলেন তাঁর নিরব ভক্তটিকে ধন্য করতে। ধন্য সেই অপরূপাকে যিনি তোমার মনের বাঁধন এমনি শিথিল করে দিয়েছেন। এই বলে সে আরও হেসে উঠল।

আমি বললাম—না, তোমার অনুমানটা ঠিক হলনা মণি। তুমি বোধ হয় জান না, আমার অরূপা সম্প্রতি মূর্ত্তিমতী হয়েছেন।

মণি ভ্রূভঙ্গি করে বললে—তাই নাকি? এই বলে সে এক রহস্যময় দৃষ্টি তুলে আমার দিকে চেয়ে রইল।

ওর চাপা হাসির সুরে মনটা মুসড়ে পড়ল। সেই চিরন্তন দুর্বলতায় মনটা কেঁপে উঠতে লাগল—মনকে শাসন করেও আর আমি ওর দিকে চাইতে পারলাম না।

মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। কেমন একটা সঙ্কোচ এসে আমার কণ্ঠ রোধ করে ধরল।

এমন সময় বন্ধু অনিল এল।

অনিলকে দেখে মণি চলে যাচ্ছিল।

অনিল বললে—একি? আপনি চলে যাচ্ছেন? আমার আসায় যদি আপনাদের আলাপে বাধা দেয় তা হলে আমি সত্যিই বড় দুঃখিত হব।

মণি উত্তর দিল না।

তাকে নীরব দেখে অনিল আবার বললে—এমনি করে মানুষকে লজ্জা করলে তাকে যে অপমান করা হয় সে কথা কি আপনারা বোঝেন না?

ওর কথায় মণি ধীরে ধীরে ফিরে এল। তারপর সামনের একখানি খালি চেয়ারে বসে বললে—মানুষকে লজ্জা করলে তাকে শুধু অপমান-ই করা হয় এমন কথা আপনারাই বা ভাবেন কেমন করে বলুন ত?

অনিল বললে—সবসময় মনে হয় না বটে, কিন্তু দেখুন, মেয়েদের দিক থেকে অহেতুক লজ্জা বড় অস্বস্তিকর লাগে অনেক সময়েই।

মণি বললে—নির্লজ্জতাটাই কি মেয়েদের সত্যিকারের রূপ বলে আপনি মনে করেন?

অনিল বললে—না, শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে বৈকি! তবে অকারণ জড়তা আনন্দ দেয় না।

মণি আমার দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু আপনার বন্ধুতো তা বলেন না। আপনার বন্ধুর মত দেখছি আপনার মতের বিরোধী।

অনিল বলল—ওর কথা ছেড়ে দিন। ও ত' নিজেই লজ্জায় বাঁচেনা। পুরুষ হয়ে জন্মানটাই ওর ব্যর্থ হয়েছে। এই বলে সে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল।

ওদের আলাপে আমার মনের গুড়তা অনেকটা কেটে গেল। ওদের মধ্যে নিজের একটু স্থান করে নেবার জন্যে ওদের আলোচনায় তাকে বললাম—আজ এমন সময় এসেছ যে মণি! কিছু দরকার আছে?

প্রশ্নটা নিজের কানেই কেন বিশ্রী রূপছাড়া শোনাল।

মণি প্রথমে কথা বলল না। কিছুক্ষণ পরে যেন কিছুটা ইতস্তত করে বলল—একটা অনুরোধ। তুমিত' আমার কোন অনুরোধ রাখনা, তাই ভয় হয় পাছে তোমার মর্যাদার হানি হয়। এই বলে সে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল।

স্তব্ধ হয়ে রইলাম। উত্তর দেবার মত ভাষা বোধ করি আমার হারিয়ে যাচ্ছে।

বিস্ময়ের ভান করে অনিল বলল—বলেন কি? মেয়েদের অনুরোধ রাখবার মত chivalry ওর নেই? ওটা একটা আস্ত পাষণ্ড।

অনিলের কথায় মনটা তেতে উঠল। হেসে বললাম—এ তোমার অন্যায় অভিযোগ মণি। কই, এখনও তো কিছু বলনি।

মণি বলল, বাবা বললেন কদিন ধরে তাঁর মোটেই সময় হবেনা। তুমি যদি কলেজে পড়িয়ে ফেরার পথে আমার এই কখানা বই কিনে এনে দাও—এই বলে সে একখানা লিষ্ট আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমার উত্তর দেবার আগেই অনিল বিস্ময়ের সুরে বলল, এই? এর জন্য আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন?

ওর কথার উত্তর দিলাম না। মণির কথার সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করলাম—বইগুলো কি তোমার জরুরী দরকার?

মণি বলল—হাঁ, তুমি ত জান আমার পরীক্ষার আর কদিন মাত্র বাকী। কিন্তু কতকগুলো বিষয় এখনও আমার মোটেই পড়া হয়নি। তাই ওগুলো খুব দরকার।

ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললাম—তবেত সত্যিই জরুরী দরকার। তারপর অনিলের দিকে ফিরে বললাম, জান অনিল, মণি একটি ছাত্রী। Degree first part-এ first হয়েছে। আশা করি ফাইনালেও হবে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অনিল বলল—গ্রাণ্ডো! কনগ্রাচুলেশন। রূপের সঙ্গে গুণের এমন সমন্বয় লাখে একটা দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

অনিলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মৃদু হাসির রেখায় মণির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এ প্রশংসাটুকু যে রূপের পাদমূলে বিমুগ্ধ ভক্তের অঞ্জলি সেটা বোধ হয় ওর বুঝতে বিলম্ব হয়নি। সে সুমধুর ভ্রূভঙ্গি করে বলল—তাই বইকি? পরীক্ষকরা ত' সবাই আপনার মত কবি নন।

অনিলের এই অশোভন উচ্ছ্বাস আমার ভাল লাগল না। ভাবলাম, এতদিনের পরিচয়ে আমি আজো রহস্য করতে সঙ্কোচ বোধ করি, আর ও আজ এক মুহূর্তের পরিচয় দিব্যি জমিয়ে তুলল।

নিজেকে যেন অতিশয় ছোট বলে মনে হতে লাগল। মনে ঈর্ষা হল। ভাবলাম, আজ মণির সঙ্গে ওর পরিচয়ের সুযোগ দিয়ে হয়ত অন্যায় করেছি। তাই মণিকে তাড়াতাড়ি বিদায় দেবার জন্যে বললাম, [illegible] তুমি এখন যাও। আমি অনিলের সঙ্গে····

মণি বলল—বইগুলো তুমি আনতে পারবে ত?

আমার সাড়া দেবার আগেই অনিল আমার হাত থেকে লিষ্টটা নিয়ে বলল, আচ্ছা দীপক-দা, তোমার যদি কিছু অসুবিধা হয়, ওটা কেন আমাকেই দাও না। আমি এনে দেব'খন।

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ওটা পকেটের মধ্যে রেখে দিল।

মণি কথা বলেনা। অনিলের প্রতি একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টির মৃদু পরশ বুলিয়ে ও ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে গেল।

সমস্ত অন্তরটা একটা প্রচ্ছন্ন বেদনায় আকুল হয়ে উঠল। মনে হল আমার একটি মাত্র সামান্য সম্বল থেকে বঞ্চিত করে কে যেন আমার সারা হৃদয়কে অন্ধকারে পূর্ণ করে দিয়েছে।

মণির ডায়েরী

২৮শে ডিসেম্বর :

অনিলবাবু লোকটি মন্দ না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওঁর কোন লজ্জা নেই। দীপক-দার সঙ্গে ওর কত প্রভেদ! একজন অন্তঃশীলা ফল্গুর মত আপনার মনটিকে সযত্নে ঢেকে রেখেছে আর একজন তাদের প্রাবনের মত সামনের সকল কিছুকে ভাসিয়ে নৃত্যের তালে ছুটে চলেছে। ওঁর সঙ্গে আমার একদিনের আলাপ তবু উনি আমার সঙ্গে কেমন সঙ্কোচহীন স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করলেন। দীপক-দার অবহেলায় আমার মন রিক্ততায় পূর্ণ হয়েছিল। অনিল বাবুর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে কিন্তু তৃপ্তি পাইনি। মনে হয় সহজকে জয় করার ত' কোন উন্মাদনা নেই, যে অপরাজেয় তাকে জয় করাই ত' সত্যিকারের আনন্দ!

আজকের সকালটুকু খুব মধুর লাগছিল। চির-রিক্ত শীতের কানে বসন্তের নূপুর ধ্বনি যেমন অনুরাগে তাকে আকুল করে তোলে—কালকের দিনের স্মৃতিটুকু তেমনি আমার মনকে উন্মত্ত করে তুলেছে।

এমন সময় ছোট ভাই শিশির এসে বলল—দিদি, একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। নাম বললেন—অনিল বাবু।

বললাম—ও! তাঁকে বসতে বল।

কি জানি কিসের লজ্জায় মনটা কেঁপে উঠল। এমনি করে আজ যে অনিলবাবু আমাদেরই বাড়িতে চলে আসবেন তা কল্পনাও করতে পারিনি। ভাবলাম একদিনের অল্পক্ষণের সামান্য মাত্র পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করা হয় তো শোভন হবেনা। কিন্তু ওঁকে ফিরিয়ে দিতেও ত' পারলাম না।

কিছুক্ষণ পরে অতিরিক্ত কেশ, বেশ, একটু ঠিক করে নীচে আসতেই উনি বললেন—আসুন মিস্ রায়; নমস্কার। তারপর আমার দিকে একগোছা বই বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—দেখুন ত' এগুলো ঠিক হয়েছে কিনা।

বললাম—আপনি কেন কষ্ট করে এগুলো এখানে বয়ে এনেছেন। ওগুলো দীপক-দার কাছে রাখলেও ত' পেতাম।

অনিল বাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—সে কি? তারপর গলার স্বর বদলিয়ে বললেন—এতদূর যখন এনেছি তখন ওগুলো যথার্থ মালিকের হাতে দেওয়াই সমীচীন বলে মনে হল। কি বলেন—

আমি ওঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—আমার জন্যে যে কষ্ট করেছেন, তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আর দীপক-দার কষ্ট লাঘব করবার জন্য দীপকদার তরফ থেকে আপনাকে আরও ধন্যবাদ।

কিছুক্ষণ অন্যান্য কথার পর অনিলবাবু বললেন—কই মাকে দেখছিনা যে ?

একটু ইতস্তত: করে বললাম—আজকালকার আধুনিক যুগে তিনি এখনও সেকেলে হয়ে আছেন। তিনি সাধারণত কারও সামনে বার হন না।

অনিলবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন—সেকি ? উনি কি নিজের ছেলের সঙ্গেও কথা বলেন না ? তারপর একটু থেমে বললেন—এখানে যখন এসেছি তখন মাকে প্রণাম না করে যাচ্ছিনা। এই বলে তিনি একটু ভিতরের দিকে এগিয়ে ডাকলেন—মা, মা কৈ, মা।

মা সামনে একজন অপরিচিতকে দেখে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলেন। উনি বল্লেন—মা, আপনি কি নিজের ছেলেদের, দীপকদাকে এমনি এড়িয়ে চলেন ? আমি দীপকের বন্ধু. আমাকে দীপকের মতই মনে করবেন।

এর পরে বোধকরি মানুষের আর লজ্জা থাকেনা। মা সামনে এসে বললেন—এই যে বাবা।

অনিলবাবু মাকে প্রণাম করে বললেন—মা, আজ এসেছি আপনার চরণ দর্শন করতে। জানি, মার কাছ থেকে ছেলে কখনও শুধু মুখে ফেরে না।

ওঁর কথায় স্নেহময়ী মাতৃহৃদয় বুঝি আকুল হয়ে উঠল। তিনি কোমল কণ্ঠে বললেন—সেকি বাবা, এও কখন হয় ? তুমি বস ? আমি এখনি আসছি।

একটু পরেই মা একটি রেকাবিতে খাবার সাজিয়ে এনে দিলেন।

উনি সেগুলো শেষ করে বললেন—এমনি করে যদি আমায় লোভী করে তোলেন মা, তাহলে কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি অত্যাচার সহ্য করতে হবে।

মা হেসে বললেন—বেশ ত' বাবা। সে তো আনন্দের কথা।

এমনি করে অনিলবাবু মার স্নেহের মধ্যেও আপনার স্থান করে নিলেন।

• • • •

অনেকক্ষণ পরে ওঁকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় দেবার সময় বললাম—বইগুলি আনতে আপনাকে যে কষ্ট দিলাম সেজন্যে আমায় মাপ করবেন।

অনিলবাবু হেসে বললেন—কিছু না। কষ্ট কি ? বরং এতে আমার আনন্দই হচ্ছে। এবং সেটাকে আরও সপ্রমাণ করবার জন্যে এমনি মাঝে মাঝে আমার আবির্ভাব হবে। তাই ত' মার কাছে এই নিমন্ত্রণ ভিক্ষা। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

চোখের সমনের উজ্জ্বল আলোগুলো সমস্ত একেবারে নিভে গেলে চোখের অবস্থা যেমন হয়—উনি চলে যাবার পর আমার সারা মনটা তেমনি অন্ধকারে ভরে গেল।

ছায়াছবি যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ছবিগুলি যেমন মনের অস্থি-সন্ধি অধিকার করে থাকে, কিন্তু শেষ হলে সে ছবি যেমন ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে যায়—ওঁর ব্যবহারটুকুও ঠিক সেই রকম করেছিল।

মনকে তন্নতন্ন করে দেখলাম—উজ্জ্বল আলোর মত ওঁর ব্যবহার মনের উপর সামান্য একটু রেখাপাত করেছে মাত্র, কিন্তু তলদেশ পর্যন্ত খুঁজে দেখলাম এখনও ঐ স্বল্পভাষী দীপকদাই তার সবটুকু অধিকার করে [illegible]

দীপকের ডায়েরী

২৭শে অক্টোবর :—

মণি দেখছি অনিলকেই ভালবাসে। অনিলটাও তাই। মণির কথা উঠলে সেও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

যাক্, এ ভালই হল। অনিল আর মণি পরস্পরকে ভালবাসে—ওরা সুখী হক। আজ আমার মনের গোপন কামনায় এই খানেই ইতি দিই। একটা অনিশ্চিত কল্পনার চেয়ে আজকের এই নিদারুণ নিশ্চিত ব্যর্থতা আমার কাছে বেশী কাম্য বলেই মনে হচ্ছে।

উঃ কি দুর্নিবার লজ্জার হাত থেকেই না বেঁচে গেছি। ভাগ্যে আমার দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলিনি। নইলে—

ভাবতেও আমার সর্বশরীর কণ্টকিত হয়ে উঠছে।

এখন ভাবি—আমি যদি আমার অন্তর উন্মুক্ত করে আমার ভালবাসার কথা জানাতাম, মণির কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান ত' পেতামই, তার ওপর ওদের ভাবী বিবাহিত জীবনের মুখর বিজল্পালাপের সময় কতদিন হয়ত ওরা আমার ক্ষণিকের দুর্বলতার কথা স্মরণ করে বার বার হেসে উঠত।

• • • •

এক-একবার অনিলটার সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা হয়। ভাবি, ওই আমার এতদিনের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে রিক্ত করে দিয়েছে। সেই ত' ওর সঙ্গে মণির প্রথম আলাপ হয় আমাদেরই বাড়িতে। এই কটা মাসের মধ্যে ও কত দূর অগ্রসর হয়ে গেছে! আর আমি ওর পিছনে, কত পিছনে পড়ে আছি! আজ মণি ওর আপনার, একান্ত আপনার হতে চলেছে। কিন্তু আমি? যাক্, সে কথা আর নাই ভাবলাম।

কখনও মনে হয়—আমি ভুল বুঝেছি। কিন্তু না। অনিল মণি যে পরস্পরকে ভালবাসে আমার সে বিশ্বাসের অলঙ্ঘ্য প্রমাণও ত আজই পেলাম।

• • • •

মণিরা পিরিভিতে এসেছে। অনিলটাও এসে উঠেছে ওদেরই বাড়িতে। আমাকেও ওরা ছাড়ল না।

কি করি—আমাকেও আসতে হল। কিন্তু অনিলের মত আমি ওদেরই বাড়িতে এসে উঠতে পারলাম না। অনিল মণির দৃষ্টির সামনে বাস করা—সেকি ভয়ঙ্কর। তাই আমার বাড়িতে এসে উঠলাম।

আজ সকালে মণিদের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম—

পথে দেখলাম অনিল আর মণি গল্প করতে করতে পাশাপাশি এগিয়ে আসছে। দূর থেকে দেখলাম অনিলের কথা বলবার ভঙ্গিতে যেন ওর ভবিষ্যৎ দাবীর কথা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

একটা অস্পষ্ট বেদনা আমার মনে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল।

ওদের কাছে আসতেই মণি বলল—এই যে দীপুদা, আমরা তোমার বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—কেন?

মণি বলল—আজ উটী দেখতে যাব। অনিলবাবু বলছিলেন। তুমি যাবে তো?

ওর কথা শুনে মনটা কেমন তিক্ত হয়ে উঠল।

মণি বলল—চলনা দীপুদা।

সাড়া দিলাম না।

অনিল বলল—দীপুকে নিয়ে জগতের কোন কাজ চলবেনা। ও ওর সাহিত্য আর অধ্যাপনা নিয়েই থাকুক। তারপর মণির দিকে চেয়ে বলল—ও না যায়, চলুন আপনি আর আমি যাব।

মণি আমার মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকাল। তারপর হতাশ সুরে বলল—থাক্, আজ আর গিয়ে দরকার নেই। তারপর অনিলের দিকে চেয়ে বলল—দেখলেন আপনার বন্ধুর কীর্তি? এমন যে হবে তা আমি আগেই জানতাম।

অনিল বলল—তবে চলুন বাড়ি ফেরা যাক।

ওরা ফিরে চলল।

মনে মনে বললাম—অনিল সুখী হোক, ওই হোক মণির জীবনের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। আমি কে? অপরিচিতের মত এসেছি, অপরিচিতের মতই ওদের মনের অন্তরালে মিলিয়ে যাব।

ভাবলাম—আজ আমি রিক্ত, আমার মনের সকল দুর্বলতা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার ব্যর্থতার কথা মুহূর্তের জন্যও কারও কাছে প্রকাশ করে নিজেকে খর্ব করব না।

মণির ডায়েরী

৫ই জানুয়ারী—

অনিলবাবুর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি যে তিনি ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের মধ্যে আপনার স্থান করে নিতে পারেন। ওঁকে না হলে শিশিরদেরও চলত না। ওদের সকল কাজে ওঁকে না পেলে যেন ওদের আনন্দ অসম্পূর্ণ থাকত।

সেদিন শিশিরের জন্মতিথি উৎসব। অনিলবাবু সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওর বন্ধুদের আপ্যায়িত করলেন। সন্ধ্যায় শিশির বলল—চলুন অনিলদা, আজ একটু exhibition-এ যাওয়া যাক।

ওঁর এতটুকু অবসাদ ছিলনা, সমান উৎসাহিত হয়ে বললেন—চলনা ভাই, আমার আপত্তি নেই।

আমার কেমন ভাল লাগল না। শিশিরকে ধমক দিয়ে বললাম—হ্যাঁ শিশির তোর কি এতটুকু ভদ্রতা বোধ নেই? এই সমস্তদিন ভদ্রলোককে এত পরিশ্রম করালি, আবার এখনি ওঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিস—একটু বিশ্রাম করতেও দিবি না। তারপর অনিলবাবুর দিকে চেয়ে বললাম—না, না, সে কখন হবেনা। বসুন, বিশ্রাম করুন।

অনিলবাবু আমার কথায় সাড়া দিলেন না। তিনি শিশিরের দিকে চেয়ে বললেন—যাও ত' ভাই শিশির, তৈরী হয়ে এস। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

উৎসাহিত হয়ে শিশির চলে গেল।

উনি বললেন—তুচ্ছ শরীরের কথা কি বলছ মণি, আজ আমি যে পুরস্কার পেয়েছি তাতে আর জীবনের কোন দুঃখকে গ্রাহ্য করিনা। এই বলে তিনি হঠাৎ আমার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন।

ওঁর এই দুর্বোধ্য ব্যবহারের অর্থ খুঁজে পেলাম না। রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে উঠল।

মুহূর্তে হাতখানা টেনে নিলাম। ভাবলাম বলি,—কে আপনাকে আমার নাম ধরে ডাকবার, অঙ্গ স্পর্শ করবার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

এমন সময় শিশির এসে পড়ল। উনি চলে গেলেন।

• • • •

রাত্রে—

বাবা আর দীপুদা গল্প করছিলেন। আমি ওঁদের খাবার নিয়ে যাচ্ছিলাম। দরজার পাশে এসে শুনলাম বাবার কথা। বাবা বললেন—জান দীপক, তোমার বন্ধু অনিল—

ওঁর কথা কানে যেতেই কৌতূহল হল—খাবারের থালা হাতে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাবা বললেন—অনিল মণিকে বিয়ে করতে চায়। আজ সে আমায় সেই কথা বলছিল। অনিল ছেলেটি মন্দ নয়। আমি ত' তাকে মত দিয়েছি। তুমি কি বল দীপু?

সন্ধ্যায় অনিলবাবুর যে ব্যবহার দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছিল, বাবার কথায় এখন তা দিনের আলোর মতই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাবলাম—এই অধিকারে?

একটা অজানা ব্যথায় মনটা আকুল হয়ে উঠল।

—দীপুদাকে নীরব দেখে বাবা আবার বললেন,—উত্তর দিলেনা যে দীপু?

দীপুদা বললেন—আপনি মত দিয়েছেন?

বাবা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন? একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ বাবা দীপু?

উনি তাড়াতাড়ি বললেন—না। এমনই! আমি যেন শুনেছিলাম অনিল এখন বিয়ে করবেনা। তারপর একটু থেমে বললেন—তা ভালই হল। অনিলের সঙ্গে মণির বিয়ে—এতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এই বলে তিনি হেসে উঠলেন।

আর শুনতে পারলাম না। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। শিথিল হাত থেকে খাবার শুদ্ধ থালাটা পড়ে গেল।

শব্দ শুনে বাবা আর দীপুদা বেরিয়ে এলেন। বাবা বললেন—কি হল রে?

বললাম—মাথাটা ঘুরে গেল।

বাবা কি বুঝলেন জানিনা। বললেন—তুই কেন এসব আনতে গেলি মা? সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছিস—যা একটু বিশ্রাম করগে যা।

আমার মুখে কি তখন অন্তরের ভাষা ফুটে উঠেছিল?

তাড়াতাড়ি সামনের ডিভানের উপর বসে পড়লাম।

বাবা বললেন—বাবা দীপু, তুমি একটু এখানে বস, আমি চাকরটাকে ডেকে অভিকলন্ পাঠিয়ে দি। এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললাম না। মনে হল দু'জনে এত কাছে রয়েছি তবু আজ কত দূরে। আমার হয়ত আরও কত দূরে চলে যাব, যেখানে দুজনের মাঝে দুর্ভেদ্য বাধার প্রাচীর গড়ে উঠবে, কে জানে?

অনেকক্ষণ পরে উনি আমার কপালের অবিন্যস্ত চুলগুলি দুহাতে ঠিক করে দিয়ে বললেন—একটু সুস্থ হয়েছ কি মণি?

ওঁর কথার কোমল সুরে আমার উদ্গত অশ্রু আর বাধা মানল না। বললাম—আমার ভাল মন্দে কার কি আসে যায় বলত?

উনি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—একি মণি, তুমি কাঁদছ?

ওঁর কথার সুরে হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলো এক অপূর্ব সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। আত্মগোপন করতে পারলাম না। বললাম—তুমি এত নিষ্ঠুর, তবে কেন এমনি করে এসে আমার সামনে দাঁড়ালে? তোমার

বুকে কি এতটুকু মমতা নেই? আমি কি তোমার কাছে এত তুচ্ছ, এত হীন? এমনি করে পরের কাছে আমায় বিলিয়ে দিতে তোমার মনে কি এতটুকু কষ্ট হয় না? তুমি কি পাষাণ?

উনি বললেন—মণি, তুমি কি বলছ?

বললাম—বলে যাও, এর পরেও আমার আর কি বলবার আছে? ভালবেসেছি—আত্মপ্রকাশ করেছি তবুও তোমার প্রাণে দয়া নেই। তোমার অন্তরে এতটুকু ভালবাসা নেই। তুমি পাষাণ, তুমি পাষাণ।

—ভুল মণি, তুমি ভুল বুঝেছ।

তপ্তকণ্ঠে বললাম—ভুল বুঝেছি!

উনি বললেন—হ্যাঁ। তাই। আমায় ভুল বুঝ না মণি। তোমায় আমি ভালবেসেছি, তাইত আমি এমনি করে তোমাকে এড়িয়ে চলি। আমি তুচ্ছ, আমি সামান্য, তোমার মত অসামান্যাকে পাবার স্বপ্ন দেখাও তো আমার দুরাশা মণি! তারপর একটু থেমে বললেন—তোমায় ভালবাসিনি একথাও যেমন মিথ্যে, তোমাকে চাওয়াও তো আমার তেমনি দুরাশা। মণি, তোমায় ভালবেসেছি, কিন্তু কখনও ভাবতেও পারিনি যে কোন দিন তোমায় পাওয়া সম্ভব হবে। তাই আমি এতদিন আমার অন্তরকে এমনি করে গোপন করে রেখেছিলাম। তুমি আমায় ভালবাস, সেইত আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

কি জানি কেমন করে ওঁর হাত দুটি চেপে ধরে বললাম—নিষ্ঠুর! এমনি করে তুমি আমায় ঠকিয়ে এসেছ। এতদিন একটুও জানতে দাওনি।

উনি বললেন—ঐত' বললাম। আজকের এই মুহূর্তে নীরব থাকতে পারলে সারাজীবনেও হয়তো আর তোমাকে এ কথা বলা হত না। কিন্তু আজ আর আমি আত্ম-সম্বরণ করতে পারলাম না। তাই আজ তোমার ওপর আমার ভালবাসার দাবী জানিয়ে গেলাম। তারপর……

একটা আত্মহারা শিহরণে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

বললাম—এই আমার যথেষ্ট, আর কিছু চাই না।

উনি চলে গেলেন।

আমি মাটির উপর মাথা রেখে মনে মনে বললাম—সারাজীবনের অবহেলার বিনিময়ে আজকের এই অতর্কিত মুহূর্তে তোমার কাছে যে দান পেয়েছি, শুধু তাই সম্বল নিয়ে জীবনে আর নিঃস্ব হবার ভয় নেই আমার।

পুরাতন পাতা

(১৩০৯ সালে অগ্রাহয়ণ মাসের 'সাহিত্য' থেকে সংকলিত)

দক্ষিণাপথ

উড়িষ্যার একটি চিত্র

মলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

(সবার সমুদ্রপথে উৎকলে আসিয়াছিলাম। ভাস্করশিল্পমণ্ডিতা উড়িষ্যা, পথিকজনের চির আনন্দদায়িনী। অপরূপশ্রী পাষাণ প্রতিমার সৌন্দর্য্যে উৎকলভূমি চির উজ্জ্বল। কতশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের সৌন্দর্য-লালসার মনোরম কাহিনী উৎকল পাষাণ স্তম্ভে খোদিত। সংস্কৃত নাটকে ও পুরাতন ভাস্কর শিল্পে প্রাচীন হিন্দু জীবনের অস্ফুট আলোকরশ্মি বিকীরিত।

বারিপাদা রোড ষ্টেশন হইতে পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে। কটকের যত নিকটে আসিতেছিলাম, পশ্চিমের এই পর্বতমালা ক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছিল। পর্বতস্তরের উপর পর্বতস্তর উঠিয়াছে। এই সকল পর্বতের ভিতর দিয়া পুণ্যতোয়া মহানদী, ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী প্রবাহিতা। পর্বতের উপত্যকায় উড়িষ্যার করদরাজ্য সমূহ। সন্ধ্যার কুসুমরাগ শূন্য হইতে শূন্যান্তরে নামিতেছিল।

হিউয়েন সাঙ ওড্র বা উড়িষ্যা দেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে উৎকলে মহাযান শাখাভুক্ত দশ সহস্র ভিক্ষু-পরিপূর্ণ একশত বৌদ্ধ মঠ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ম্লান হইলে, উৎকল হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। উৎকলে চারিটি পুণ্যক্ষেত্র বর্ত্তমান। শঙ্খক্ষেত্র বা পুরী; অর্কক্ষেত্র বা কনারক, বীরজাক্ষেত্র বা যাজপুর ও পদ্মক্ষেত্র বা ভুবনেশ্বর। মহানদী উৎকলের গঙ্গা। প্রবাদ আছে, সুকান্তি নামক ঋষির তপস্যায় তুষ্ট হইয়া জহ্নুতনয়া বিন্ধ্য হইতে নির্গত হইয়া মহানদীরূপে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিতা হন।

উড়িষ্যা এক সময় রূপনারায়ণ হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্রীকদিগের বর্ণিত ডিলারিয়ম প্রদেশ, উৎকল। এইখানেই পূর্ব্বে হাতদন্ত প্রচুর পরিমাণে মিলিত। কেহ কেহ এই গ্রীক কথা দশার্ণের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মেঘদূতের বিকশিত কেতকী কুসুমে পাণ্ডুবর্ণ ও পরিণত "ফলশ্যাম জম্বুবনান্ত" দর্শনে বোধ হয়, উড়িষ্যা নয়। রামগিরি হইতে কৈলাসের পথে যাইতে হইলে উৎকলে আসিবার আবশ্যক কি? বিশেষতঃ রঘুবংশে উড়িষ্যা দেশ উৎকল বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। হস্তিসেতু দ্বারা কলিঙ্গা নদী পার হইলে উৎকলভূপতিরা রঘুর পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন। রঘু উৎকল হইতে কলিঙ্গাভিমুখে প্রয়াণ করেন।

তখন উড়িষ্যার ভূপতিরাও সৌর্য্যে ও বীর্য্যে মহিমান্বিত ছিলেন। পুরীর একজন নৃপতি কাঞ্চীপুরের

রাজতনয়ার অসামান্য সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। রাজকুমারী বিদ্রূপ ও গর্বের সহিত এই প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান করেন। উৎকলাধিপতি সসৈন্যে কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইয়া সমরান্তে রাজকুমারীকে বন্দিনী করিয়া লইয়া আসেন। সচিবের গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়, এবং তাঁহার গর্বিত উন্নত শির ধূলাবলুণ্ঠিত করিবার জন্য রাজদ্বারের সহিত বিবাহ দিবার আদেশ হয়। কিন্তু সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়। সচিব রাজার আদেশ প্রতিপালন করিলেন না। পুরীর রাজা জগন্নাথের সেবায়েত। দেবতার নিকট মানব-জীবনের লঘুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য রাজারা আপনাদিগকে জগন্নাথ দেবের দাস বলিয়া অভিহিত করেন। বৎসরের একদিন পুরীর রাজা অতি সামান্য দীনহীনবেশে সম্মার্জনী হস্তে মন্দির সংস্কারের জন্য জগন্নাথের নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের সৌর্য্য আছে, তাঁহারা দেবতার নিকট নত হইতে কুণ্ঠিত হন না। বৎসরের সেই দিনে রাজা পুরীর মন্দির প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ সচিব রাজতনয়াকে সঙ্গে লইয়া সেখানে পূর্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজাকে প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি রাজকুমারীকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। রাজা মুক্তনেত্রে দেখিতেছিলেন। সচিব বলিলেন, "আপনি ইহাকে জামাতৃদ্বারের সহিত পরিণীত করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন,—আজ আপনিই জামাতৃদ্বার, এই কন্যাকে আপনার হস্তে সমর্পন করিলাম। প্রভুর আদেশ সেবকের সর্বদা পালনীয়।" বলা বাহুল্য সেকালের রাজারা নারীরত্নে কখনই বিশেষ বীতস্পৃহ ছিলেন না।

পুরী হইতে ওয়ালটেয়ার, তারপর বিজয়নগ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ঘুরিয়া আমরা সিমাচলম্ এ উপস্থিত হইলাম।

সিমাচলম এর মন্দির প্রায় ছয় শত হস্ত উচ্চে পর্বতের উপর। প্রায় বারো শত সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিতে হয়। প্রস্তরনির্মিত প্রশস্ত সোপান শ্রেণী দেখিয়া আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে ভাবিলাম। দশ বারটি সিঁড়ির পর এক একটি চাতাল। চাতালের পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী। উপরে উঠিতে উঠিতে ক্লান্তিবোধ হইলে চাতালে বসিয়া বিশ্রাম করা যায়। উপরের চাতাল হইতে সমুদ্র-বেলা-বলয়িত পর্বত শ্রেণী দৃষ্ট পথে পড়ে। কিয়দ্দূর উপরে উঠিতেই জলের ঝর ঝর শব্দ শুনিতে পাইলাম। প্রথম তোরণের নিকট শিলাতল প্রতিঘাত হেতু ঝরণার পতন ফেনিল জলকণা শিলা হইতে শিলান্তরে পড়িয়া লৌহ পাইপের ভিতর দিয়া নীচে আসিতেছিল। মন্দিরে উঠিতে চাতালের পাশে আরও কয়েকটি ঝরণা। ঝরণার মুখে কোন স্থানে প্রস্তরনির্মিত সর্পমুখ, কোন স্থানে ব্যাঘ্রমুখ শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছিল। নিকটস্থ ভিত্তির কুলুঙ্গীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব-দেবীর প্রতিকৃতি।

মন্দির প্রাকারের বাহিরে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। বন্ধুবর তাহাতে নিতান্ত অসম্মত, কিন্তু উপায় নাই। আমার দেখী নাগরা, সুতরাং আমি একপ্রকার নিশ্চিন্ত—কিন্তু বন্ধুবর নিজের পঞ্চমুদ্রা মূল্যের বিনামার ভাবী বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। একজন খোঁড়া ভিক্ষুকের জিম্মায় আমাদের জুতা রাখিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। বন্ধুবরের জুতার ভাবনায় কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। আমরা একবার কলিকাতার নিকট এক বরযাত্রায় গিয়াছিলাম। উপরে বরযাত্রীদিগের আহারের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। নীচের বারান্দায় আমরা পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া উপরে গিয়াছিলাম। আহারান্তে প্রত্যাবর্তনের সময় একজন বৃদ্ধ বরযাত্রী ভুলিয়াই হউক বা ইচ্ছা করিয়াই হউক, এক জোড়া নূতন চটিজুতা পায়ে দিতেছিলেন। যাহার জুতা, তিনি বারান্দায় জুতা রাখিয়া নিম্নে প্রাঙ্গনে ভোজন করিতেছিলেন।

"দোহাই মহাশয়! ব্রহ্মহত্যা করিবেন না। জুতা জোড়াটি সবে কাল কিনিয়াছি, শোকটা বড়ই লাগিতেছে।" আমরাও ছেলে বেলায় যাত্রা শুনিতে গিয়া হৃতপাদুক হইয়া বাটী ফিরিবার সময় তিরস্কারের ভয়ে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতাম। সেই সমস্ত কথা মনে করিয়া সুভদ্রবরের উদ্বেগে আশ্চর্য্য হই নাই। বন্ধুবর অবশেষে তোয়ালের ভিতর করিয়া জুতা জোড়াটি মন্দিরের ভিতর আনয়ন করিয়া সুস্থ হইলেন।

আমরা ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের মেঝে কষ্টি পাথরের। মধ্যে মন্দির ও চতুর্দ্দিকে বারান্দা। তখন নরসিংহদেবের ভোগ হইতেছিল। উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন, কষ্টি পাথরের উপর স্তূপাকার ভোগ ঢালা হইয়াছে। অন্য পাত্রের আর আবশ্যক হয় নাই। এই মন্দিরে প্রতিপালিত কয়েকটি বালক সুললিত স্বরে গান করিতেছিল। সঙ্গীত তেলেগু ভাষায় রচিত, সুতরাং তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলাম না। মন্দিরটি এখন বিজয়নগ্রামাধিপতির। মন্দিরে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় ও অনাথ নিবাস আছে।

ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপকের সহিত ভাঙ্গা সংস্কৃতে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি আমার সংস্কৃত শুনিয়া বোধ হয় অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। অনেক ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতবর্ষীয় যুবক পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাঁহাদের অদ্ভুত সংস্কৃত ভাষার ও প্রাচ্য-দেশ-বিরুদ্ধ অসামাজিক ব্যবহারের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন।

এ ক্ষেত্রে আমাদের দায়ে পড়িয়া সংস্কৃতে কথা কহিতে হইতেছিল। যে পদ ব্যবহার করিব, দুই এক মিনিট পূর্ব্বে তাহা অনেক কষ্টে মনে মনে রচনা করিতেছিলাম। সুতরাং অধ্যাপকের অনেক কথা মনোযোগ দিয়া শুনিবার অবসর ছিল না। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণ শব্দ কি করিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, আমি তখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলাম। শুনিলাম মন্দিরটি মহারাজ পুরুষবা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। সীমাচলখণ্ড নামক একখানি তেলেগু পুস্তকে মন্দিরের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কথাটা বিশ্বাস হইলনা। মন্দিরের চূড়ার নিম্নে দিব্য এক বুদ্ধ মূর্ত্তি। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ মন্দির হিন্দুমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। ভোগের সময় অনকয়েক লোক মশাল জ্বালিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অনকয়েক লম্বা পিত্তলের বাঁশী বাজাইতেছিল। পুরোহিত দেবতার আরতি করিতেছিলেন। যাত্রীরা যুক্তকরে দাঁড়াইয়াছিল। ধূপ দীপের গন্ধে মন্দির আমোদিত। মন্দির প্রকোষ্ঠের সম্মুখে এক বৃহৎ ঘৃতপূর্ণ প্রস্তরপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। এই দৃশ্যে মধ্যযুগের বেশ একটা চিত্র বর্ত্তমান। মনে হইতেছে ভুটানের কোন কোন বৌদ্ধমন্দিরে আরতির এই রকম একটা বর্ণনা পড়িয়াছি। কিন্তু ভোগ হইতেছিল অন্য দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে। আমাদের আসল নরসিংহ দেবের দর্শনসৌভাগ্য ঘটে নাই। বৎসরের মধ্যে একদিন নরসিংহ দেবের মূর্ত্তি যাত্রীরা দেখিতে পায়। সেই দিন নরসিংহ দেবের পঞ্চ নখর দিয়া বারিধারা নিঃসৃত হয়। ব্যাপারটা কি, ভাল বুঝা গেল না। আসল দেবমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, দুই পয়সা দর্শনী দিয়া এক নকল নরসিংহ দেখিলাম। হিরণ্যকশিপুর মুণ্ড ছিল না। একটি মুণ্ড যোড়া দিয়া দেবতাকে সম্পূর্ণ করা হইল। হেনরী হায়নে ভগ্ন মর্ম্মর প্রতিমার গলায় প্রেমমাল্য পরাইয়াছিলেন; কিন্তু আমরা কবিও নহি, ভক্তও নহি, সুতরাং আমাদিগের ভক্তি স্রোত সেই ভগ্ন দেবমূর্ত্তির দিকে কিছুতেই প্রবাহিত হইল না। মন্দির গাত্রে সেকালের দৈনিক জীবনের অনেক ছবি খোদিত। অত্যন্ত অশ্লীল যুগল মূর্ত্তিরও অভাব ছিল না। অনেক মূর্ত্তি মুসলমান কর্ত্তৃক অঙ্গহীন হইয়াছে। পবিত্র মন্দিরগাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তি খোদিত হইবার কারণ কিছুই বুঝা যায় না। কথিত আছে, একজন বৌদ্ধরাজা নিজের চরিত্রহীনতার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মধ্য ভারতে অনেক বৌদ্ধবিহার গাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তি খোদিত

করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কিম্বদন্তী মাত্র। কেহ কেহ বলেন, মন্দিরের ভিতর পবিত্র, বাহিরে জগতের যাহা কিছু অপবিত্র ও কুৎসিত। বহির্জগতের ও দেবমূর্ত্তিশোভিত পবিত্র মন্দির গর্ভের পার্থক্য প্রদর্শনই এই সমস্ত অশ্লীল ভাস্কর্য্যের উদ্দেশ্য। ভক্ত বাহিরের অপবিত্রতা বাহিরে রাখিয়া ভক্তিপূত হৃদয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন।

এই কারণও বিশেষ গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়না। মন্দিরের বারান্দার স্তম্ভে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য। বারান্দার ছাদের নিম্নভাগ চিত্রিত ছিল। কিন্তু এখন প্রায় তাহা মুছিয়া গিয়াছে। একস্থানে বিষ্ণুর বামবিধৃত অনন্ত নাগের বিস্তৃত ফণার নিম্নে শয়নের এক ছবি বর্ত্তমান। শয়নের অশ্লীলতার এই আধুনিক ছবিটি একালের হিন্দুদের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক।

আমরা নিকটস্থ গ্রামটি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই নরসিংহ দেবের পাণ্ডা। পাহাড়ের উপর সমতলক্ষেত্রে গ্রামটি স্থাপিত। গ্রামের আরও উর্দ্ধে আর একটি ইষ্টক নির্ম্মিত গ্রাম সীতার মন্দির। সেখানেও যেন একটি মনোরম ঝরণা। মৃত্তিকা অত্যন্ত সরস। এত উচ্চ ভূমির উপরও কদলীর অভাব নাই। একপ্রকার রক্তাভ কদলী ও আনারসের জন্য সীমাচল বিখ্যাত। পাহাড়ের গায়ে আনারসের ক্ষেত। কোনও স্থানে ঝরণার ধারে শিলাতলে কদলী রাখিয়া কুমারীরা হাস্য পরিহাসে মগ্ন। ঝরণার জলের শব্দের সহিত সুন্দরী যুবতীদের হাস্যের তরল তরঙ্গ মিশিতেছিল। এক গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে সেতার বাজাইয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে একজন ভিক্ষুক গান গাহিতেছিল। পরিচিত সুর শুনিয়া সেখানে দাঁড়াইলাম। গানের শেষে একজন বিজয়নগ্রাম কবির ভণিতা। বিজয়নগ্রাম তেলেগু সাহিত্যে জগতের কেন্দ্রস্থল।

* * *

ক্লাবে তর্ক চলিল বন্ধুদের মধ্যে। কালা লোক কি সঙ্গীতের মর্ম্ম বুঝতে পারে?

"কক্ষণো নয়"—একবাক্যে সকলে উচ্ছ্বসিত মত প্রকাশ করলেন।

হঠাৎ একজন লোক সেই ক্লাব ঘরে এসে ঢুকলেন,—নূতন লোক,—মাথায় কোঁকড়ানো চুল,—চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি।

সকলে অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। ওঁদের মধ্যে একজন তাঁকে চিনতে পেরে উচ্চৈঃ কণ্ঠে বললেন—"এ কি! আপনি এসেছেন আমাদের ক্লাবঘরে?" তিনি উত্তর দিলেন না। কারণ তিনি কালা।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সেই ভদ্রলোক ক্লাব ঘরের অর্গান নিয়ে বাজাতে বসলেন। সে কী মূর্চ্ছনা! সে কী ঝঙ্কার!

জগৎবিখ্যাত সুরশিল্পী বিটোভেন সেদিন দেখিয়ে দিলেন, কালা হলেও সুরসাধনা ব্যর্থ হয় না।

গৌরীশংকর দে

জলদস্যু মানেই তো পুরুষ জলদস্যু? অনেকটা তা-ই। তবু, আমাদের দেশের দেবীচৌধুরাণীর মতো ওদেশেও দেখা গেছে অনেক নারী জলদস্যু যারা গোলা তরোয়াল আর উদ্যত পিস্তল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রু-জাহাজে। পুরুষদেরও হার মানিয়েছে দুঃসাহসিকতায়। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র-বর্ণিত দেবীচৌধুরাণীর দেশপ্রেম ও মহান আদর্শ তাদের মধ্যে দেখা যায়নি।

মেয়ে জলদস্যুদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তার জন কিলিগ্রু-র স্ত্রী লেডি কিলিগ্রু-র নাম। ১৫৮২ সালে তার জন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত কর্নওয়ালের সহকারী নৌ-অধ্যক্ষ ও পণ্ডেনিস দুর্গের শাসক। স্বামী স্ত্রী দুজনেরই পূর্ব পুরুষদের অনেকেই ছিলেন জলদস্যু। বেশি হৈ চৈ না ক'রে এবং রক্তপাত না ঘটিয়ে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে গেলে সেকালের য়ুরোপের বেশির ভাগ দেশের সরকার কোনো-রকম বাধা দিতেন না। লেডি কিলিগ্রু তা-ই উদ্দীপনার সঙ্গেই গ্রহণ করেন পারিবারিক বৃত্তিটি। ইংল্যাণ্ডের সৈকতে বহু লুণ্ঠন—অভিযানে হন স্বামীর সঙ্গী।

১৫৮২ সালের বসন্তকালে মূল্যবান সওদায় বোঝাই একটি জার্মান জাহাজ নোঙর ফেললো গ্রীমাউথ বন্দরে। লেডি কিলিগ্রু-র নজরে পড়তেই তিনি স্থির করলেন ওটা লুঠ করবেন। নিজের দলের লোকদের একত্র ক'রে রাতের অন্ধকারে হাজির হলেন জাহাজটার কাছে নৌকোয় ক'রে। তরবারি নাচাতে-নাচাতে সকলের আগে জাহাজ ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর নির্দেশে নিহত হলো হতভম্ব অপ্রস্তুত বহু নাবিক। কাল বিলম্ব না ক'রে মৃতদেহগুলি ফেলে দেয়া হলো সমুদ্রে। লুটের জিনিস নিয়ে দলবল সহ লেডি কিলিগ্রু ফিরে গেলেন তীরে।

রাণী এলিজাবেথ কিলিগ্রু কীর্তি জানতে পেরে ভয়ানক চটে গেলেন। লেডি কিলিগ্রুর বিচার হলো, প্রমাণিত হলো দস্যুবৃত্তির অপরাধ। দলের দুজন সহকারী এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা

হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাণী তার মৃত্যুদণ্ড মকুব করলেন। পরিবর্তে দীর্ঘকালের জন্ত কারাদণ্ড দে'য়া হলো।

কেন্ডি কিলিগ্রুর নাম হয়তো আজ অনেকের কাছে অপরিচিত। সব চাইতে নামকরা নারী জলদস্যু মেরী রীড আর অ্যান বণী।

মা আর বাবা দুজনেই ইংরেজ। বাবা নাবিক। একবার সমুদ্রে লম্বা পাড়ি দিয়ে আর ফিরে এলেন না। কী যে তার হলো কেউ বলতে পারে না। ইতিমধ্যে মিসেস রীডের একটি মেয়ে হলো। নাম রাখলেন মেরী।

স্বামী একদিন ফিরে আসবেন এই আশায় মিসেস রীড অপেক্ষা করলেন দীর্ঘ চার বছর। ঘরের টাকা ভেঙে খেলে আর ক'দিন চলে! সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে গেলো। স্থির করলেন লণ্ডনে যাবেন শাশুড়ীর কাছে সাহায্য চাইতে। জানতেন বৃদ্ধা শাশুড়ী মেয়েসন্তান অপছন্দ করেন। তাই মিসেস রীড মেয়েকে পরালেন ছেলের পোশাক। শাশুড়ীর কাছে ছেলে ব'লেই মেরীর পরিচয় দিলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে শাশুড়ী ছেলেটির ভরণ-পোষণের জন্ত সপ্তাহে এক ক্রাউন অধিক সাহায্য দিতে শুরু করলেন। জীবিতকালে দিদিমা একবারও জানতে পারেন নি ছেলে নয়, মেরী আসলে মেয়ে। দিদিমা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রাউন আসাও গেলো বন্ধ হয়ে। এবার মা এক ফরাসী মহিলার বাড়িতে মেয়ের কাজের যোগাড় করলেন। ফুট-ফরমাস খাটবার কাজ। এবারও ছেলের পরিচয়ে।

কিন্তু এই ধরণের নিরীহ, নিরামিষ কাজে মেরীর মন বসবে কেন? ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ও কাজ নিলো এক যুদ্ধ জাহাজে। শিক্ষানবিশী সৈনিকরূপে কাটলো কিছুকাল।

সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও মেরী অফিসার হতে পারলো না। অথচ সে মনে প্রাণে চাচ্ছিলো ওই পদ। তখনকার দিনে সওদাগরী জিনিষের মতো সেনাবাহিনীর উচ্চপদ মূল্য দিয়ে কিনে নিতে হতো; শুধু যোগ্যতার জোরে পাওয়া সম্ভব ছিলো না।

পদোন্নতি হলো না। কী হয়েছে তাতে? যুদ্ধের প্রতি আকর্ষণ মেরীর রয়ে গেলো আগেরই মতো। কাজ নিলো অশ্বারোহী বাহিনীতে। এবারও তার দুঃসাহসিকতা আর সামরিক নৈপুণ্যে উর্ধ্বতন অফিসাররা ধন্ত-ধন্ত করলো।

পুরুষদের মধ্যে ও ঘুরে বেড়াতো অবাধে, স্বাধীনভাবে। তবু কেউ একদিনের জন্তেও সন্দেহ করতে পারে নি ও মেয়ে।

কিছুদিন পরে এক ওলন্দাজ যুবক যোগ দিলো সেনাবাহিনীতে। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি সুন্দর তার স্বভাব। মেরী তো তাকে দেখেই প্রেমে পড়ে গেলো।

মেরী যুবকটিকে জানালো ও পুরুষ নয়, মেয়ে। বলতেই দেখা গেলো যুবকটিও তাকে ভালোবাসে। মেরীকে সে বিয়ে করতে চাইলো। মেরী তো রাজী হবেই। যুদ্ধ শেষ হতেই সেনাবাহিনীর লোকেরাই তার জন্ত নিয়ে এলো মেয়ের পোশাক। বিয়ে হলো ওলন্দাজ যুবকের সঙ্গে মেরীর।

কিন্তু মেরী দুর্ভাগা। কিছুদিন পরেই স্বামী মারা গেলো। স্বামীর শোক ভুলবার জন্ত মন চাইলো জায়গা বদল করতে। চুল ছোট ক'রে কেটে, নাবিকের পোশাক প'রে কাজ নিলো এক ওলন্দাজ জাহাজে ওই জাহাজ পাড়ি দিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অভিমুখে। জাহাজ গন্তব্য-স্থানের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে এমন সময় নিউ প্রভিডেন্স থেকে আগত একদল ইংরেজ জলদস্যু হঠাৎ হানা দিয়ে জাহাজটা দখল ক'রে

নিলো। অবিকৃত জাহাজে ইংরেজ বলতে কেবল মেরী রীডই ছিলো। তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলো ইংরেজ জলদস্যুরা।

আশৈশব মেরীর মানসিক প্রবণতা ঘটনা, সংঘাত আর উত্তেজনার দিকে। দুর্ধর্ষ, কর্কশ জলদস্যুদের মধ্যে এসে মেরী সেই বহুআকাঙ্ক্ষিত জীবন পেয়ে ও'রে আস্বাদন করলো। জলদস্যুদের সকলেই তাকে বেশ সমীহ করতো।

ইতিমধ্যে নিউ প্রভিডেন্সে হাজির হয়েছেন নতুন গভর্নর, ক্যাপ্টেন উডস রোজারস। ব্রিটিশ সরকার তাকে ভার দিয়েছেন জলদস্যুদের উৎখাত ক'রে বাহামা দ্বীপপুঞ্জ-সংলগ্ন সমুদ্রে নিরাপত্তা বিধানের জন্য। সেখানে সৎ ইংরেজ নাবিকেরা যেন নির্ভয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারে। ১৭১৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরের আগে যে সব জলদস্যু আত্মসমর্পণ করবে তাদের ক্ষমা করা হবে এই মর্মে নতুন গভর্নর রাজার আদেশ ঘোষণা করলেন।

মেরীর জাহাজের অনেকেই আত্মসমর্পণ সমীচীন মনে করলো। অবশ্য এতদিন পরে বেশি বয়সে ভালো চাষী বা জেলে হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মাটি অনুর্বরা। বৃষ্টিপাত বিরল। জলে অবশ্য মাছ প্রচুর। কিন্তু এত বেশি সংশোধিত দস্যু মৎস্যজীবি হয়ে পড়েছে যে মাছ ধ'রে জীবিকা নির্বাহ করা নতুন কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবু জাহাজের অনেকে স্থির করলো রাজার ক্ষমাপ্রার্থী হবে।

মেরী রীডের পক্ষে ওই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া কঠিন হলো। খবর এলো ক্যাপ্টেন রোজারস স্পেনের বিরুদ্ধে জল-যুদ্ধের আয়োজন করছে। শুনে চঞ্চল হয়ে ওঠলো মেরীর রক্ত।

প্রাক্তন কয়েকজন জলদস্যুকে দলে টেনে মেরী দখল ক'রে নিলো একটা জাহাজ। শুরু হলো রীতিমতো জলদস্যুর জীবন।

অ্যান বনী আর "ক্যালিকো জ্যাক" র‍্যাকাম-এর সঙ্গে মেরী রীডের প্রথম সাক্ষাৎ কোথায় তা স্পষ্ট ক'রে জানা যায় না। তবে র‍্যাকাম তখনই বেশ অভিজ্ঞ জলদস্যু। কুখ্যাত জলদস্যু ক্যাপ্টেন জন আর্ভেরীর অধীনে বহুকাল শিকানবিশী ক'রে এসেছে। রঙিন ক্যালিকো কাপড়ের শার্ট প্যান্ট পরতো ব'লে নাম হয় ক্যালিকো জ্যাক। রাজার কাছে আত্মসমর্পণের সে ঘোরতর বিরোধী। পুরোদমে দস্যুতা আরম্ভ করে দিলো ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে।

অ্যান বনীও পুরুষের পোশাক পরতো। র‍্যাকামের নাবিকেরা তাকে পুরুষ ব'লেই জানতো। দলের লোকদের কাছে মেরীর প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে ক্যালিকো জ্যাক উপযুক্ত দলপতিরই কাজ করলো। কিন্তু আবার প্রেম এসে জটিলতার সৃষ্টি করলো মেরীর জীবনে।

র‍্যাকাম জামাইকার কয়েকটা জাহাজ দখল করে। লড়াই শেষ হতে মৃতদেহগুলি ফেলে দে'য়া হলো সমুদ্রে আর ব্যবস্থা করা হলো আহতদের শুশ্রূষার। শত্রুপক্ষের বাকিদের বলা হলো দস্যুর দলে যোগ দিতে। তাহলে আর তাদের হত্যা করা হবে না। র‍্যাকাম নিয়ম ক'রে দিয়েছিলো কোনো কারিগর, যেমন ছুতার, কর্মকার, হাতে এসে পড়লে তাকে দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হবে। জামাইকার জাহাজ দখল করবার সময় ছিয়ছাম চেহারার সুদক্ষ এক কারিগর ধরা পড়ে, দস্যুর দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়। মেরী রীড তাকে দেখেই তো প্রেমে প'ড়ে গেলো।

দিন কয়েক পরেই মেরী একদিন গোপনে কারিগরকে জানালো সে পুরুষ নয়। মেয়ে তরুণ কারিগর

প্রেমের গোপন প্রতিজ্ঞান দিতে কসুর করলোনা। ওরা দুজনে ঠিক করলো সামনে যে নিরাপদ বন্দর পড়বে সেখানে নেমেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

তরুণ কারিগরের চেহারা আর ভাব-ভঙ্গী অনেকটা মেয়েলী। তাই ওকে নিয়ে শুরু হলো ঠাট্টা-মস্করা। কারিগর প্রথম প্রথম ঠাট্টাকে নেহাৎই ঠাট্টা ভেবে মুখ বুজে হজম ক'রে নিতো। কিন্তু একদিন জলদস্যু সীমা ছাড়িয়ে গেলো। কারিগর মুখের মতো জবাব ফিরিয়ে দিতেই দস্যু তো রেগে আগুন। বললো, "মুখে তড়পাবার দরকার কী? যদি মানুষের বাচ্চা হোস তো কাল সমুদ্রের পাড়ে তরবারি নিয়ে আমার সঙ্গে লড়তে আসিস। দেখবো কত তোর হিম্মত।"

ঘটনাটা শুনে শংকিত হলো মেরী রীড। ও তো ভালো করেই জানে ওর প্রেমিক অস্ত্র-চালনায় অপটু। তাই, কালকের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আবার, ওর প্রেমিককে কেউ কাপুরুষ বলবে এ-ও যে অসহ্য। কী করা যায়? মেরী রীড যে মেয়ে জানে কেবল দলের তিনজন: অ্যান বনী, ক্যালিকো জ্যাক, আর তার প্রেমিক। বাকি সবাই জানে ও পুরুষ। যে ভাবে লড়াই করে তাতে মেয়ে বলে সন্দেহ করা সত্যি কঠিন।

মেরীর সারারাত কাটলো ছটফট ক'রে। ভোরের দিকে মাথায় একটা মতলব এলো। প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে কোনোরকমে একটা ঝগড়া বাধালেই তো হয়, তাহলেই তো শয়তানটাকে খতম করা যায়।

ঘুম থেকে উঠে মেরী তা-ই করলো। রগচটা লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মেরীকে জানালো দ্বৈত যুদ্ধের আহ্বান। মেরী তো এই চাচ্ছিলো। ওর প্রেমিকের সঙ্গে লোকটার যে সময় লড়বার কথা মেরী নিজের লড়বার সময় দিলো তা দু'ঘণ্টা আগে।

চোখ-ঝলসানো প্রবাল-সৈকত। মাথার উপরে মধ্যদিনের সূর্য। নানা রঙের পোশাক পরে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে দস্যুরা। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে, হাসছে, বাজী ধরছে মেরী অথবা তার প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুর পক্ষে। অ্যান বনী চিন্তিত হয়ে পড়েছে বন্ধু মেরীর জন্য। ক্যালিকো জ্যাক কোমরে বাঁধা পিস্তলটা নাড়াচাড়া করছে অন্যমনস্ক ভাবে। যদি দস্যুটির গুলিতে মেরী মারা যায় তাহলে তাকে হত্যা করবে কিনা ভাবছে।

প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে মাত্র দশ পা দূরে মেরী দাঁড়িয়েছে পা দুটো সামান্য ফাঁক ক'রে। তার হাতে পিস্তল। চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন এতটুকুও নেই। ভয়ের কী আছে। এর আগে কত যুদ্ধে সে লড়েছে।

ক্যালিকো জ্যাক উপরের দিকে হাত তুলে চিৎকার ক'রে সংকেত জানালো। সঙ্গে-সঙ্গে দুজন গুলি করলো দুজনের দিকে। গুলি-বিদ্ধ দস্যুর রক্তাক্ত দেহ বুঁকে পড়লো সামনের দিকে। মেরী এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হিংস্র তরবারি আমূল চালিয়ে দিলো দস্যুর দেহের ভিতর দিয়ে।

ক্যালিকো জ্যাকের দিন ফুরিয়ে এলো। 'কিংস্টন' নামে একটি ব্রিটিশ জাহাজ লুট করবার পর তাকে ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠলেন ইংরেজ সরকার। এক নির্জন দ্বীপে ব'সে ওই জাহাজের লুটের মাল যখন জ্যাক ভাগ বাঁটোয়ারা করছিলো, ইংরেজ সৈন্যরা দ্বীপ ঘেরাও ক'রে তাকে আটক করলো।

যে ক্যালিকো জ্যাক এতদিন ছিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আতংক, ধরা পড়বার পর দেখা গেলো সে একটি কাপুরুষ। বিনাবাধায় ধরা দিলো তো বটেই, উপরন্তু মেরী রীডের বিচারের সময় সাক্ষী দিলো তার বিরুদ্ধে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য। বেচারা মেরী এই সময়ে সন্তানসম্ভবা।

বিচারের সময় মেরী জানালো জলদস্যুর জীবন সে ঘৃণা ক'রেই এসেছে। তবে বাধ্য হয়ে এই জীবন গ্রহণ করেছে। মনে-মনে ইচ্ছা থেকে গেছে সুযোগ পেলেই সৎ জীবনে ফিরে যাবে। কিন্তু র‍্যাথাম এবং তার জন কয়েক সহচর শপথ ক'রে বললো মেরী সম্পর্কে বরং এর বিপরীত কথাই সত্য। বললো তাদের দলে মেরীর মতো হিংস্র আর রক্তপিপাসু জলদস্যু একটিও ছিলো না।

মেরী জানালো ওই সব অভিযোগ মিথ্যা। চাইলো স্বামীর মুক্তি। জানালো যদি নিজে মুক্তি পায় তবে স্বামীকে নিয়ে ঘর বাঁধবে, শান্তিতে কাটাবে জীবনের বাকি ক'টি দিন।

বিচারের পর ১৭২০ সালের ২৮ শে নভেম্বর আদালত মেরীকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে ফাঁসীর হুকুম দিলো। কিন্তু তখন সে মা হতে চলেছে। তাই মুলতবী রাখা হলো মৃত্যুদণ্ডাদেশ। কিন্তু সন্তান প্রসবের আগেই মেরী আক্রান্ত হলো জ্বরে। ওই জ্বরেই মারা গেলো।

নিজের দলের লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েও র‍্যাথাম রক্ষা পেলোনা। গ্যালোজ পয়েন্ট-এ দলের আরো অনেকের সঙ্গে প্রাণ দিতে হলো ফাঁসীর দড়িতে। অ্যান বনী কারাগার থেকে আক্ষেপ ক'রে বললো, "র‍্যাথামকে এই ভাবে প্রাণ দিতে হলো জেনে আমি দুঃখিত। যদি সে ধরা না দিয়ে পুরুষের মতো লড়াই করতো তবু কুকুরের মতো এমনি ক'রে মরতে হতো না।"

মেরী রীডের মতো অ্যান বনীও আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হলো। কিন্তু তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো না। পরে তার জীবনের পরিণাম কী হয়েছিলো পুরনো নথিপত্র সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব।

• • •

সমুদ্রের তীরের স্বাস্থ্যনিবাসে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনকে। সারাদিন শুধু সমুদ্রের হাওয়া খাওয়া আর বালুর উপর বেড়িয়ে আসা। ভালই লাগছিল তাঁর দিনগুলি।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক এলেন সেই স্বাস্থ্যনিবাসে। চমৎকার মিশুকে লোক। সকলের সঙ্গে যেন আন্তরিকভাবে মিশতে লাগলেন। সকলে ভাবলো লোকটি অতি মহৎ, অতি উদার।

কিছুদিন পরে পাশের স্বাস্থ্যনিবাসে একজন চোর ধরা পড়ল। কি ভীষণ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির সেই চোর। অনায়াসে দু'চারটা খুন করে পালাবার চেষ্টা করছিল।

লোকটিকে দেখে ষ্টিভেনসন অবাক্! এ সেই উদার মহৎ ভদ্রলোক। ভাবতে লাগলেন তিনি, তা'হলে প্রত্যেক লোকের দু'রকম রূপ থাকে।

এবার সৃষ্টি হোল তাঁর "Dr. Jekyll and Mr. Hyde,"—বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস।

মধুপর্ক

রেডিওর বড়বাবু

(৺শ্রীনৃপেন মজুমদার)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

(পটভূমিকায় মানুষ ভাগ করলে দেখা যাবে যে সারা ভারতবর্ষে বহু সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেমন উকিল, মাস্টার, দালাল, মোক্তার, মুচি, শেঠ, সাধু ইত্যাদি, আর একটু চোখ মেলে থাকলেই লক্ষ্য করা যাবে যে ভাষার তারতম্যে নামের অল্প বিস্তর হেরফের হলেও আসল রূপ বড় একটা বদলায় না। কলকাতার মোক্তার মজঃফরপুরে মুক্তিয়ার হতে পারে কি গুজরাটে মুকিতর, কিন্তু খুঁজলে পাওয়া যাবেই। তাদের ভাষা আলাদা, কিন্তু ভাব এক ভঙ্গি এক এমন কি ভূজংভাজাংও প্রায়তঃ এক—কিন্তু বড়বাবু নামীয় সম্প্রদায়টি বাংলা দেশের একেবারে এক চেটিয়া সম্পত্তি। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে আসুন আর আর ধৈর্য্য থাকলে প্রতিটি অফিসে খুঁজে আসুন, সরকারি দপ্তরে সুপারিনটেনডেনট্ পাবেন, ব্রাঞ্চ অফিসার পাবেন, বেসরকারি মহলে এবং ব্যবসা মহলে শেঠ মিলবে, হেড ক্লার্ক মিলবে কিন্তু বড়বাবু নাম তো মিলবেই না ঐ নামের পেছনে যে বৈশিষ্ট্য আছে এবং ভাল হক আর মন্দ হক, যে বিরাট ঐতিহ্য আছে সেটা দুশো বছর সাহেবী দপ্তরের আওতায় গড়ে উঠেছে, তার ইশারাটুকুও কোথাও দেখতে পাবেন না। 'বড়বাবু' হলেন বাংলা দেশের নিজস্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম সম্প্রদায়।

কোন এক কালে বড়বাবু কথাটা ছিল সওদাগরি দপ্তরের নিজস্ব সম্পত্তি। কেরানীবাবুদের মধ্যে থেকে একটা মানুষকে আলাদা করে নিয়ে, তার মাথায়, সাধারণের চেয়ে অল্প বেশী টাকা আর অনেক বেশী কৃপার মুকুট পরিয়ে তাকে রাজা সাজানোর পরম রীতি ছিল সাহেব বানিয়াদের রাজত্ব করার সহজ পদ্ধতি। অলিখিত এবং সর্ব-সমাদৃত এই নিয়মে যাঁরা রাজা সাজতেন, সাহেবদের খোসামোদ ক'রে খুশী রাখতেন আর কেরানীদের হাতে মাথা কাটার শক্তি রাখতেন তাঁদেরই বলা হত বড়বাবু। ছোট্ট করে বলা যায় যে বড়বাবু হলেন কেরানী কুলের দলপতি আর সাহেবকুলের শ্রৌপদী। আমাদের বড়বাবু অর্থাৎ রেডিওর ৺নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন ঠিক উলটো, সাহেবকুলের দলপতি আর নিম্নতম কর্মচারিদের শ্রৌপদী।

কুড়িতে পা দিয়েই যখন আমার প্রথম কর্মস্থল কলকাতা বেতার কেন্দ্রে পা দিলাম তখন বড়বাবু ছুটিতে ছিলেন কিন্তু তাঁর নামের প্রতিধ্বনি চারিদিকে ছিল। কোন কিছু করা উঠলেই শুনতাম বড়বাবু এলে হবে কিম্বা 'বড়বাবুর ইচ্ছে' কিম্বা 'আসুক বড়বাবু'। আসলে, দিল্লীর বেতারের প্রধান অধ্যক্ষ ল্যাঙনেল কিলডেন আমায় চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন বলে, আমার কিছু দম্ভ ছিল আর কলকাতা-কর্মীরা

আমায় দেখে কিছু হতভম্ব ছিল। মনে প্রাণে যতই গেরস্ত বাঙালী হইনা কেন, ওরা সবাই আমায় জোর ক'রে সাহেব বানিয়ে মোসাহেবদের দলভুক্ত করতে চাইত আর আমি কিছু বললেই "বড়বাবুর" লাঠি খাগাত'। এই সময় ছোট্ট করে বলে রাখা দরকার যে বড়বাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁর কার্য্যভার দেখাশুনা করতেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। "বড়বাবু" কথাটার প্রচলিত ভাবার্থ ধরলে সাময়ীকভাবে বীরেনদার ঐ নামটা পাওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু পাননি। উনি ছিলেন সকলের বীরেনদা। আজ আমি স্বচ্ছন্দে বীরেনদা বলছি বটে কিন্তু সেদিন ওঁর ধারে কাছে যাওয়ার সাহস ছিল না। ওঁর গোঁফ জোড়া ছিল আমার ভয়ের সঙ্কেত, ওঁর ব্যক্তিত্বের প্রহরী আর জর্মান সম্রাট কাইজারের ঈর্ষার বস্তু। সকলের কথা শুনে আর বীরেনদাকে দেখে, মাসখানেকের মধ্যে "বড়বাবু" লোকটা সম্বন্ধে আমার ধারণাটা এমন ধ্বংসকারী হ'য়ে উঠল' যে ওঁকে ছুটির শেষে ওঁর অফিসে আসার দিন আমি ছুটি নিয়ে ডুব দিলাম।

পরদিন আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার কথা সকাল সাড়ে দশটায় মিটিংয়ে। ভয়ে আতঙ্কে মনটাকে সাহসের গান দিচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম কি করে বড়বাবু নামীয় বিভীষিকার মুখোমুখি হব, ঘরের দরজা ঠেলে ছফুট লম্বা লোকটি আস্তে ঢুকে আরও আস্তে বললেন—

● কি খোকা? কাল আসনি কেন?

হকচকিয়ে গেলাম; খোকা ডাকটার মধ্যে খুব সুন্দর একটা স্নেহের বিস্তার ছিল কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে ছিল সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা সন্দেহ। উনিই যে বড়বাবু এটা এখনও আমার জানার কথা নয়, তবু কি রকম যেন সন্দেহ হল তাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—

● এমনি!

সিগারেট একটা দুই আঙুলের ডগায় ধরা ছিল। সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন—

● সত্যি কথাটা শুনি।

● আপনার ভয়ে।

ছেলেমানুষের মতন হোহো করে হেসে উঠলেন।

● তোমার সঙ্গে তো আমার দেখাই হয়নি। ভয়টা দেখালো কে?

● সারা অফিস।

আবার এক চোট হেসে বললেন

● ভুল বুঝেছ। ওরা ভয় দেখায়নি: তোমার কায়দাকানুনে ভক্তকে গিয়ে নিজেদের ভয়ডর কথা তোমায় শুনিয়েছে।

সিগারেটের কেসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন,

● নাও, খাও।

খেতাম কিন্তু নিলাম না। বড়বাবু বললেন,

● খবরটা জানি। নাও একটা।

খেয়ে বললেন,

● দেখ হে বাপু, ষোলোর পর সবাই সমান। দিচ্ছি যখন নাও।

তবুও যখন নিলাম না তখন কেসটা গুটিয়ে রাখতে রাখতে বললেন,

● তা ভালো। সম্মান যখন দেখিয়েছ তখন আর সাধব না কিন্তু ইচ্ছে হলে নির্দ্বিধায় খেতে পার। কেসটা থাকে আমার ডান দিকের দেরাজে আর দেরাজটা থাকে খোলা। বুঝলে?

আমি হাসলাম। উনি আমাকে হাসালেন। বললেন,

● চল, মিটিংটা সারা যাক।

আমি উঠে দরজাটা খুলে ধরলাম। বড়বাবু আমার কাঁধের ওপর হাতটা একটু ভারি করেই রাখলেন আর চলতে চলতে বললেন,

● এতদিনে একটা কাঁধে হাত দিয়ে আরাম করে হাঁটার মতন লোক পাওয়া গেল।

কথাটি উনি নেহাৎ ভুল বলেন নি। বাঙালীর পক্ষে বড়বাবু ছিলেন রীতিমত লম্বা আর ওঁর পাশে সকলকেই মনে হত সিলিপুট। আমার স্পষ্ট মনে আছে উনি ছিলেন প্রায় ছ-ফুট তিন ইঞ্চি আর বলতে গেলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উনি সর্বদাই সোজা মাথায় হেঁটেছেন।

বড়বাবুর প্রথম জীবনের ইতিহাস কেউ জানে না আর আমার মতনও বোধহয় নয়। ওঁর প্রথম আবির্ভাব শিশির কুমার ভাদুড়ীর নাট্য সম্প্রদায়ে ক্লারিনেটের বক্তার জন্য এবং সাধারণভাবে সঙ্গীত পরিচালনার সাহায্যের জন্য। ক্লারিনেটই ছিল ওর সাধনা এবং বাঁশী হাতে নিলে উনি বিশ্ব ভুলতেন। এমনিতে সঙ্গীত সম্বন্ধে উনি খুব যে পারদর্শী ছিলেন তা নয় কিন্তু ওর ভুঁড়ের মধ্যে যেমন সুরের সরস্বতী মনের মধ্যেও তেমনি সুন্দর একটা সুর সর্বদাই নাচানাচি করত। একথা অবশ্যই ঠিক যে ওঁকে নিয়ে আর বিশেষ করে প্রাক্-রেডিও যুগের ওঁর অতীত নিয়ে অনেক কথা আর অজস্র কানাকানি একটু কান পাতলেই শোনা যেত কিন্তু সে যন্ত্রণা থেকে তো জহরলালও নিস্তার পান নি। ভালোবাসা যদি অপরাধ হয়, স্নেহাধিক্যে সাহায্য করা যদি অপরাধ হয়, দান কাল পাত্র নির্বিশেষে দয়া এবং দাক্ষিণ্য এবং কারো প্রয়োজনে যদি দান করা অপরাধ হয় তাহলে বড়বাবু নিশ্চয় বহুবার এবং বহুভাবে অপরাধী। কিন্তু মানুষটাই ছিলেন তাই। প্রথম দিনের মিটিংয়ে আমার কথা তুলে উনি বললেন,

● দেখ হে বাপুরা! ছেলেমানুষ পেয়ে তোমরা একে ভয়ে একবার শেষ ক'রে দিয়েছ। ভালো হবে না। আজ থেকে এ আমাদের সকলের খোকা। এর যত ভুল চুক সব তোমরা ভাগ করে নেবে।

এগুলো মনরাখা কথা নয়, প্রাণের ভাষা, আন্তরিকতার সুরে ভরপুরে এবং একবার নয় বহুবার উনি শুধু আমার নয় অনেকের অনেক গুরুতর অপরাধের বোঝা অম্লানবদনে নিজের মাথায় নিয়েছেন, কাউকে জানতেও দেন নি।

মানুষটা কিন্তু তাই বলে যে একেবারে সোজা বা শান্তশিষ্ট ছিলেন তা কিন্তু একেবারেই নয়। আমাদের আমলে সাহেব ছিলেন একজন এবং মোসাহেব ছিলেন কম করে একডজন। সাহেবের সঙ্গে কাজ করা সোজা আর ক্যাপলটনের তো কথাই নেই। বিপদ ঘটল ঐ মোসাহেবদের নিয়ে আর আমাদের সকলের হয়ে ওঁদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সব দায়িত্ব ছিল বড়বাবুর। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই ওর দরাজ দিল আর দরদে দিলের ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ওপর থেকে নাবতে হলে প্রথমেই পড়ল ক্যাপলটন।

ক্যাপলটন এক মস্ত পাগল। তিনি অফিসে আসতেন ঠিক নটায় আর বেরিয়ে যেতেন ঠিক বারোটায়। বাঙালীবাবুরা (৺নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, ৺সুরেশ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নলীনি সরকার ইত্যাদি প্রায় সকলেই) অফিসে আসতেন আন্দাজ সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটা। সাহেব একদিন রেগে মেগে নোটিশ জারি করলেন, সবাই দপ্তরে আসবে দশটার মধ্যে আর না এলে তিনদিন পর্যন্ত কাইন আর তারপরই সুবসৎ অর্থাৎ ডিস্‌মিস্। সারা দপ্তরে রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে গেল। কেরানীকুল সময় মতনই আসতেন, বিপদ হল তাঁদের যাঁরা মগজ খাটিয়ে মানুষ যেমন নলীন দা—বেতার জগতের সম্পাদক। একাধারে উনি ছিলেন

সাহিত্যিক, গায়ক, কবি, সম্পাদক এবং মজলিসদার সঙ্গে সাধক। উনি কিছুতেই বারোটার আগে অফিসে আসতেনই না। হুকুম জারির পর দিন কয়েক এলেন কিন্তু তারপরই যথা পূর্বং।

একদিন ঠিক বারোটায় ষ্টেপলটন গাড়ী করে বেরিয়ে যাচ্ছেন আর উনিও অফিসে ঢুকছেন। পাছে, দেখলেই সাহেব ওঁর চাকরিটা খেয়ে বসেন, তাই সামনাসামনি হওয়া মাত্রই নলীনদা মাথার ছাতাটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে মুখের সামনে আড়াল দিলেন এবং গাড়ীটা পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে সোজা বড়বাবুর ঘরে ঢুকে বললেন,

● বু-বু-বু-বলেন ব-ব-ব-বড়বাবু খু-উ-উব বেঁ···এ-এ-এ-চে গেছি···।

ওঁর কথা শেষও হয়নি (অল্প তোতলা ছিলেন তবে উত্তেজিত হলে অল্পটাই হয়ে যেত অত্যাধিক) ষ্টেপলটন এসে হাজির আর রাগে একেবারে চিতার আগুন। নলীনদাকে কিন্তু বললেন না, হুমকি দিলেন বড়বাবুকে.

● বড়বাবু সরকার লেট করে আসে আমি জানি এবং তাতে আমার কোন রাগ নেই কিন্তু আমার ছাতা কেন দেখলো? ডিসমিস কর।

বড়বাবু বহুবার বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে চাকরির ভয়ে সরকার ছাতায় মুখ আড়াল করেছে. সাহেবকে অপমান করবার জন্য নয় কিন্তু ষ্টেপলটনের এক কথা।

● হ্যাঁ! হ্যাঁ! তাতো বুঝছি কিন্তু আমার ছাতা কেন দেখালো! ওকে ডিসমিস কর। এক্ষুনি।

বড়বাবু প্রমাদ গুণলেন। ষাঁড় খেপলে যেমন সিং বাগিয়ে ছোটে আর না মেরে ছাড়ে না, ষ্টেপলটনও ঠিক তাই। ও পাগল একবার যখন ক্ষেপেছে তখন আর সরকার মশাইর রক্ষে নেই। কি করা যায়? দু মিনিট ভাববার সময় চাই তাই ভড়কি দিয়ে বললেন,

● দাঁড়াও সাহেব সরকারকে ডাকি। সে বলবে।

উনি নিজেই বেরিয়ে গেলেন ডাকতে আর যাওয়ার আগে সিগারেট ধরালেন বেজায়ে। সাহেবও বাধ্য হয়ে পাইপ ধরালেন আর আধেক বেজায় সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা। মিনিট দুয়েক পরে বড়বাবু ঢুকলেন সঙ্গে নাকে রুমাল দিয়ে হাঁচতে হাঁচতে নলীনদা। স-উৎসাহে বড়বাবু বললেন,

● সাহেব নাউ আই নো! সরকারের বেজায় সর্দি আর জ্বর আস' আস। ও তোমার ছাতা দেখায়নি, পাছে গাড়ীর ধুলো নাকে যায় তাই ছাতাটা নাবিয়েছিল! ●

সাহেবের রাগটা এবার সরকারের ছাতা ছেড়ে ওঁর সর্দিটাকে ধরল।

● এমন সর্দি নিয়ে অফিসে এসেছে কেন? সারা দপ্তরে সর্দি না ছড়ালে বুঝি খুশী নও?

বড়বাবু সমান তালে নলীনদাকে বললেন—

● ঠিক! এই সর্দি নিয়ে তোমার কিছুতেই আসা উচিৎ হয়নি।·····না! না! ছুটির যদি দরকার হত সাহেব নিশ্চয় দিতেন!

সাহেব সজোরে মাথা নেড়ে বললেন—

● ইয়েস্! ইয়েস্! ছুটি তুমি তিনদিন নাও কিন্তু এখনই বাড়ী যাও।

বড়বাবু বললেন—

● ইয়েস এক্ষুনি। এই নাও টাকা। টাক্সিতে যাও

সাহেব বললেন—

● না। চল। আমার গাড়ীতে। আমি পৌঁছে আসছি। মলীনদা সাহেবের গাড়ীতে বাড়ী গেলেন, তিনদিন ছুটি পেলেন আর পেলেন দশটা টাকা দুধের জন্যে। বড়বাবু হাঁক ছেড়ে বললেন,

● সাহেব চাকরি খাচ্ছিল! আমি ওর মাথা খাব!!

বড়বাবু মানুষ বুঝতেন, মন বুঝতেন আর কেউ মুখ খুললেই বুঝতেন মোদ্দা কথা। বড়বাবুর ওপরে ছিলেন ছোটসাহেব আর তাঁর এক অদ্ভুত স্বভাব ছিল মুখে এক কথা বলা আর কাজ ঠিক তার উল্টো করা। একবার তিনি বড়বাবুর পিঠ চাপড়ে বড়সাহেবের কাছে বেশ বড় ধরণের একটা নালিশ করলেন বড়বাবুর বিরুদ্ধে। ষ্টেপলটন আবার তেমনি স্পষ্ট বক্তা আর রীতিমত চাণক্য। ভাগ করে ভাঙন ধরানোয় তিনি ছিলেন খাঁটি বিলেতি। দুতিন সপ্তাহ তিনি কিছুই বললেন না তারপর হঠাৎ একদিন ছোট সাহেব আর বড়বাবুর সামনেই বলে বসলেন,

● ওহে বড়বাবু তুমি নাকি আর ছোটসাহেবের পরোয়াই কর না?

● হঠাৎ?

● ছোটসাহেব যে বলল—তুমি না কি আজকাল সব কাগজ নিজেই সই করে দাও ওর কাছে আর কিছু পাঠাও না?

বড়বাবু একটু অবাক হয়েই তাকালেন ছোটসাহেবের দিকে। ছোট সাহেব একটা ঢোক গিলে বললেন,

● না, মানে

বড়বাবু হাসলেন। ছোটসাহেব হাঁ করার আগেই উনি হাওড়া বুঝে গেছেন। আসলে ব্যাপার হয়েছিল মিসেস এলিন প্যালটকে নিয়ে। মহিলা ছিলেন অতীব সুন্দর। আর মেডিওতে ছিলেন রাজ্যের ইংরেজি অনুষ্ঠানের অ্যানাউনসার। দিনের বেলায় দেখা হওয়ার কারণ থাকত না আর কেরাণীদের ভীড়ে এবং কানাকানির ভয়ে ছোটসাহেব সেটা পছন্দও করতেন না। তিনি মাঝে মাঝেই চলে আসতেন সন্ধ্যার পর এবং ইংরেজি অনুষ্ঠানের শেষে এলিনকে ট্যাক্সি করে দিতেন বাড়ী পৌঁছে। এ নিয়মটা প্রাত্যহিক ছিল না, ছিল ছোট সাহেবের প্রয়োজনীয়। এক সন্ধ্যায় এসে তিনি শুনলেন এলিন আসবে না, ছুটি নিয়েছে। এই হল তাঁর রাগ আর পরদিন যখন শুনলেন যে এলিন নিজে এসেছিল ছুটির দরখাস্ত নিয়ে তখন রাগটা তাঁর একেবারে মাথায় উঠে গেল আর বড় সাহেবের কাছে নালিশটা সেই কারণেই।

বড়বাবু বললেন,

● বেশ তো এবার থেকে সব কাগজেই না হয় তোমার কাছেই পাঠিয়ে দেব।

বড়সাহেব পায়ের ওপর পাইপটুকে বললেন,

● ঠিক আজ থেকে সব কাগজ ওকেই পাঠিয়ে দিও।

আর ছোটসাহেবকে বললেন,

● আর তুমি টেবিল পরিষ্কার না করে উঠবে না।

তিনদিনের মধ্যে ছোটসাহেব একেবারে কাৎ। বাঙালী হলে কি হবে, ছোটসাহেব বাঙলা ভাষা পড়তেই পারেন না আর সব কাগজের সঙ্গে আধছাড়া কাগজ গেল বাঙলায় লেখা ছুটির দরখাস্ত, মেয়ের বিয়েতে অর্থ সাহায্যের আবেদন, বাইসনে বাড়ানোর অনুরোধ পত্র, সঙ্গীত অনুষ্ঠান ভালো না লাগার জন্যে অকথ্য গালাগাল আর প্যালট মেমসাহেবকে লেখা ছোট সাহেবের প্রেমপত্র যেটা প্যালট সাহেব নিজে এসে বড়বাবুর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন!!

বড়বাবুর লেখাপড়ার যে ঘাটতি ছিল সেটা পুরোপুরি পুষিয়ে দিয়েছিলেন প্রখর বুদ্ধির প্রাচুর্যে। একবার এক শিখ ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে যতদূর মনে আছে গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মানুষ্ঠান উঃ সন্ত নিহাল সিংয়ের রেডিওতে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। উঃ নিহাল সিং যে ভাষণ পাঠালেন তাতে এমন কয়েকটা লাইন ছিল যা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ। বড়বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে লাইনগুলো কাটা হল কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও উঃ নিহাল সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হল না। উনি অনুষ্ঠানের ঠিক আগে এলেন এবং তাঁর ভাষণ কাটা হয়েছে জেনে বক্তৃতা না দিয়েই ফিরে গেলেন এবং পরদিন লম্বা এক টেলিগ্রাম পাঠালেন দিল্লী। সঙ্গে সঙ্গে এলো ট্রাঙ্ককল আর জবাব দিহির জোর তলব।

আমি প্রমাদ গুণলাম, বড়বাবু তাঁর অভ্যাস মত সিগারেট ধরিয়ে আঙুল গুনলেন তারপর মিনিট খানেকের মধ্যে লম্বা পায়ে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন আর কেনই বা গেলেন কিছুই বলে গেলেন না, কেবল ঘণ্টা খানেক পর ফিরে এসে বললেন, সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে. উঃ নিহাল সিং আমাদের একটা চিঠি দেবেন যাতে উনি নিজের অপরাধ স্বীকার করে আমাদের দোষমুক্ত ক'রে দেবেন। আমার ওপর হুকুম হল ইচ্ছে মত চিঠির খসড়া ক'রে আন।

আমি যে চিঠির খসড়া দিলাম তা বড়বাবুর পছন্দ হল না। চিঠিটা ছোট্ট এবং লেখা ছিল যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবোঝির ফলেই ব্যাপারটা ঘটে গেছে এবং ও নিয়ে উঃ সিংয়ের আর কোন ক্ষেদ নেই। বড়বাবু বললেন, এমন বড় ব্যাপার এতটুকু চিঠিতে সমাধান হওয়ার নয় অতএব উনি নিজে খসড়া করলেন তিন পাতা লম্বা এক চিঠি এবং বলতে লজ্জা করছে বহু জায়গায় ভুল ইংরেজিতে ভরা! বড়বাবুর হুকুম অমান্য করব এমন সাহস নেই আর ঐ ভুল ইংরেজি ভরা চিঠি অতবড় একটা বিধানকে দেখাব এমন মূর্খতাও নেই। কি করা যায়? বড়বাবু তাগাদা মারলেন :

● ঝট করে যাও নইলে দেরি হ'য়ে যেতে পারে।

গেলাম আর আমারটাই সই করিয়ে আনলাম।

উঃ নিহাল সিং খুব খুশী মনে চিঠিখানা সই করতে করতে বললেন,

● তুমি যদি তখন বলতে তোমার চাকরি যাবে তাহ'লে আর এত হাঙ্গামা হত না। সত্যি, গুরু মহারাজের জন্মদিনে ··

বাকি কথা আর বোধহয় বিষদভাবে বলার প্রয়োজন নেই। কোথায় ক্ষমা চাইবেন, তা নয় গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মদিনের দোহাই দিয়ে এমন শুভদিনে আমার চাকরি খাওয়ার মতন ঘোর পাপের এমন বোঝা বড়বাবু ওঁর মাথায় চাপিয়েছিলেন যে উঃ নিহাল সিং নিজেই আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে রাজি হয়েছিলেন!

ওঁর সই করা চিঠিখানা বড়বাবুকে দিতেই, উনি অবাক হলেন আর জানতে চাইলেন উনি যে চিঠির খসড়া দিয়েছিলেন তার কি হল - মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হলাম। মাথা চুলকে বললাম :

● চিঠিটা দেখে উঃ নিহাল সিং বললেন, ম্যান বড্ড ইংরেজি ভুল!

● হুম্।

বড়বাবু সিগারেট ধরালেন। আমি উঠে আসছিলাম, কারণ ওঁর 'ইংরেজি ভুল' কথাটা বলতে যত খারাপ লেগেছিল তার চেয়ে আরও অনেক বেশী খারাপ লাগল' সেই কথাটা শুনে ওঁর মুখ চোখের অবস্থা দেখতে। উনি হঠ করে বললেন—

● আচ্ছা, খোকা, ও বিদের ডাক্তার বলত' ?

● আজ্ঞে ডক্টর অব লিটারেচর !

এক গাল হেসে বড়বাবু বললেন,

● আহা আগে বলবে তো !

হক চকিয়ে গেলাম, মুখে আর কথা জোগাল' না। বড়বাবু নিজেই বুঝিয়ে দিলেন—

● বুঝলে না ? আমি ভাবলাম বুঝি এমনি ডাক্তার—মানে, একে সর্দার তায় ডাক্তার সে কি ঠিক ইংরেজি লিখতে পারে ? বড়সাহেব ধ'রে ফেলবে না—যে সমস্ত ব্যাপারটা গট আপ কেস্ ! তাই, ইচ্ছে করে ভুল ইংরেজি লিখেছিলাম ! বুঝলে না ? —যদি বলতে যে উনি ডক্টর অফ্ লিটারেচর তাহ'লে চিঠিটা তেমনি চোস্ত ইংরেজিতে লিখতাম !

চিঠিটা আবার পড়লেন, বার কয়েক উলটে পালটে দেখে আবার বললেন,

● ব্যাটা ইংরেজি লিখেছে যেন বাঘের বাচ্চা ! এক একটা কথা যেন এক একটা মুক্তো ! বুঝলে খোকা—ইংরেজি যদি লিখতে হয় তো এই চার লাইনে চারশো কথা !

আমি পালিয়ে বাঁচলাম।

ইংরেজিতে ওঁর যতই ভুল থাক আর মনে আমাদের জন্যে যতই থাক ভাবনা, কি ভালোবাসা, কি সত্যি মিথ্যার বালাই চুকিয়ে উপস্থিত বুদ্ধি ; বড়বাবুর আসল মন ছিল বাড়ীর জন্যে, আর পূর্ণ প্রাণ ছিল বাঁশীর মধ্যে। ক্লারিনেট হাতে নিয়ে উনি যখন স্টুডিও ঢুকতেন আর কীর্তনের সুরে বাঁশীতে তান দিতেন তখন, আমার জানা মহলে, এমন মানুষ ছিল না যে মুগ্ধ মনে না শুনতো আর মুক্ত কণ্ঠে না কাঁদতো। এমন বহুদিন হয়েছে যে উনি ভাবে বিভোর হয়ে বাজিয়ে গেছেন আর আমরা সুরে তন্ময় হ'য়ে হারিয়ে গেছি আর অনুষ্ঠানের সময় কখন যে পেরিয়ে গেছে তার হিসেবও কারো থাকেনি। বাঁশীর পর উনি স্টুডিওর পেছনের দিকে খোলা ছাদে গিয়ে কখন কখন বসতেন আর উদাস নয়নে কোথায় যে হারাতেন তা উনিই জানতেন।

আমার ঘর ছিল তিনতলায়। ওখানে ভূত আছে এই ধরণের একটা ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল ছিল বলে সন্ধ্যার পর আর সহজে কেউ ওপরে উঠত' না। আমার ঘরের নিঃসীম নীরবতায় একদিন ওঁর বাঁশী শোনার পর অকোর আবেগে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখি বড়বাবু নিচের বারান্দায় চুপটি করে বসে আছেন। কেন জানিনা, হঠাৎ মনে হল উনি মানুষ নন, একটা বিরাট ভয়স্তূপ। মায়া হল, মনটা বোধহয় মনে মনেই কেঁদে উঠল'। নিচে নামলাম, বারান্দায় গিয়ে ওঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে ডাকলাম :

● বড়বাবু।

উনি তাকালেন। মনে হল না যে উনি বেঁচে আছেন।

● চা খাবেন ?

মাথা নাড়লেন। হেসে বললাম

● অপূর্ব বাজালেন।

● বাড়ী যাওনি এখনও ?

● আপনার বাঁশী শোনার জন্যে বসে ছিলাম। সত্যি, কি যে বাজান আপনি !

● সুর বাজাই না। স্মৃতি বাজাই। বস।

বসলাম। অখণ্ড নীরবতা। থেমে থেমে বললেন,

● বয়স যখন আমার মতন হবে তখন বুঝবে।

● কি?

হাসলেন।

● স্মৃতির মূল্য আর তার বোঝা।

তারপর বুঝিয়ে বললেন।

● অল্প বয়সের যত অপরাধের বোঝা, যৌবনের উদ্দীপনায় মানুষ যা নিঃশেষে ভুলে যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। যখন মন চায় ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পেতে তখন দেখা যায় হয়ত' সে মানুষটা মরেই গেছে। বৃদ্ধ বয়সের এইটাই সব চেয়ে বড় বোঝা। বুঝলে না?·· আজ মনে প্রাণে আমার যে সব অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নেব' তারও উপায় নেই। মন আছে উন্মুক্ত হয়ে, কিন্তু মানুষগুলোই নেই।

থেমে গেলেন; মাথায় হাত দিয়ে বললেন,

● দোষ যদি কর কারো কাছে, ক্ষমা চেয়ে নিও। তার চেয়ে বড় শক্তি মানুষের আর নেই। ওর চেয়ে বেশী সাহস আর কিছুতে দরকারও হয়না।

আজ বড়বাবুর কথা বার বার মনে পড়ছে। আমার জীবনে ওঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পাঁচ বছরের কিন্তু পঁচিশ বছর পরও মনে হচ্ছে গত কালের। ওঁর দয়ালীলতার মধ্যে অনেক দায় ওঁকে বহন করতে হয়েছিল আর বেশ বড় অপমানও সইতে হয়েছিল কিন্তু কখন তার জন্যে অনুতাপ করতে দেখিনি। একদিন বলেছিলেন:

● বুঝলে না—আমিও থাকব' না আর ইসমাইলও থাকবে না আর ক'রো স্মৃতিতে এসব জঞ্জালও থাকবে না। থাকেই যদি কিছু তো সে স্নেহ, সে ভালোবাসা, সে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ, তোমাদের সকলের কাছে।

আজ তিরীশ বছর পর বলতে পারছি! ঠিক তাই।

পরবর্ত্তী: লাওনেল ফিলডেন

দুয়োরাণী

তথাগত

আসার সময় মাথাটা আর চৌকাঠে লাগল না। আর আশ্চর্য্য, সেটা খেয়াল হল চৌকাঠ পেরিয়ে গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে সন্তকেনা এ্যামবাসেডারটায় চড়তে গিয়ে। কিন্তু ঢোকার সময় তবে মাথার চোটটা লাগলো কেমন করে? দরজার মাপ তো বেড়ে যায়নি ও বেরোবার সময়।

নিজের অজান্তেই বোধহয় গাড়ীটা হাজির হয়েছে নার্সিং হোমের দরজায়। ডক্টর সিনহা ছিলেন অফিসেই। সব শুনে বল্লেন না মিসেস রায়, আমাদের কোন হাত নেই। এ ব্যাপারে আমরা অভিমন্যু, ঢোকার কৌশলই জানি বেরোতে জানি না। তাই আমরা সন্তকে রাজীও হই না এ ব্যাপারে এবং আপনাকেও বারবার নিষেধ করেছিলাম আমি। I am extremely sorry.

আজ গায়ত্রীর ইচ্ছে হচ্ছিল, নিজের শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে রাস্তার মাঝখানে। গাড়ীতে ওঠার সময় মনে হল, নিজের গলাবেচা টাকায় কেনা সতেরো হাজার টাকার ঐ গাড়ীটার চেয়ে অনেক অনেক বেশী দামী ঐ সতেরো টাকা দামের স্প্রিং দেওয়া মোটরটা।

কিন্তু শুধু কি টাকাকেই ভালোবেসেছিল ও? টাকার মোহেই কি নিজের এমন সর্বনাশ করেছে মিসেস রায়? মিসেস রায় নয় আজও গায়ত্রী মুখার্জী নামেই যাকে এক ডাকে চেনে বাংলার নরনারী। যে গলার গান শোনার জন্য পূর্ববাংলার রেডিওকে অনুরোধ জানায় পশ্চিম বাংলার জনগণ পশ্চিম বাংলার আকাশবাণী যার গান শোনাবার আগে অনুরোধকারীদের নামের সঙ্গে ঠিকানা জানায় যশোহর, খুলনা, বরিশালের।

না টাকা নয় খ্যাতি। দুনিয়াতে সব থেকে বেশী মোহ মোধহয় খ্যাতিরই। অর্থ অনর্থের মূল, এ বিদ্রোহী শ্লোগান আজকার দিনে। টাকাতে মানুষের ক্ষতি করে না। টাকার মোহও নয়। ক্ষতি করে খ্যাতির মোহ। টাকায় প্রিয়জনকে কাছে নিয়ে আসে, খ্যাতি দূরে সরিয়ে দেয়। খ্যাতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কখন যে প্রিয়জনের সঙ্গে সংযোগ কমতে থাকে আস্তে আস্তে বোঝাই যায় না। শেষে একদিন যখন বোঝার সময় আসে, তখন অনেক দেরী হয়ে যায়। অনেক কেন, একেবারে চরম দেরীই তো হয়ে গেছে তার খ্যাতির শীর্ষে উঠতে গিয়ে।

অরূপ রায়। তরুণ গীতিকার। অখ্যাত কিন্তু অপরূপ। হ্যাঁ, অপরূপ শুধু দেহ সৌষ্ঠবেই নয় ওর গানের বাণীও। আর কি অদ্ভুত যোগাযোগ। বয়স পঁচিশ না পেরোতেই গায়ত্রী মুখার্জী যখন খ্যাতির প্রায় মধ্য গগনে পৌঁছে গেছে, তখনই এলো ঐ অদ্ভুত চিঠিটা আর সঙ্গে দুটি গান।

দুটি গানের স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছে ওরই বয়সী এক অখ্যাত নগণ্য গীতিকার, নিজেকে গীতিকার ভাবতেও যে সঙ্কোচে এতটুকু। সঙ্গের চিঠিটায় লিখেছে একটু সুযোগ যদি করে দেন চিরকৃতজ্ঞ থাকবো আপনার

কাছে। অবশ্য অস্বীকার আবদারও করতে চাই না, গানের কথাগুলি সত্যিই যদি ভালো লাগে আপনার, আপনার কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রচার করুন তবে বাংলার ঘরে ঘরে।

হ্যাঁ, অস্বীকার করে লাভ নেই, ভালো লেগেছিল চিঠিটা। ভালো লেগেছিল গানের কথাও, আর ভালো লেগেছিল না দেখা সেই তরুণ গীতিকারকেও। মনে হয়েছিল, এত সুন্দর কথা যে সৃষ্টি করতে পারে সে সুন্দর হতে বাধ্য। প্রথম গানটার শুরু ছিল এইরকম—

'আমি সহকারশাখা, তুমি যে মাধবীলতা,
তুমি সুর দিও, আমি দেব সাথ কথা।'

সে বছর ঐ গানটাই হিট হয়েছিল গায়ত্রীর। শুধু সে বছর কেন আজো তো অনেকের মুখেই ঐ গান শুনতে পাওয়া যায় এখানে সেখানে। আজো যে কোন জলসায়, দুখানা গান গাওয়ার পরই ঐ গানটা গাওয়ার জন্য অনুরোধ আসে উচ্ছ্বসিত শ্রোতাদের কাছ থেকে গায়ত্রী মুখার্জীর কাছে। কিন্তু গায়ত্রীও কম নভেলটি করেনি। গীতিকারকে মোটেই না জানিয়ে গানটি রেকর্ড করে (অবশ্য রেকর্ডে গীতিকারের নাম ঠিকই ছিল) এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছিল তাকে। আর দিন তিনেক পরেই স্বতঃসিদ্ধের মত অরূপ রায় এসে হাজির হয়েছিল ওর দরজায়।

আর গায়ত্রী দেখেছি অরূপ, শুধু সুন্দর নয় অপরূপ। ওর পঁচিশ বছরের কুমারী দেহমন, যা গান ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসেনি কোনদিন, মুগ্ধ হয়েছিল প্রথম দর্শনেই। কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়া অরূপ রায়ের দিকে তাকিয়ে সাম্রাজ্ঞীর মত হেসেছিল সেদিন গায়ত্রী মুখার্জী।

আর গায়ত্রীকে এরপর নিজে থেকেই প্রস্তাব করতে হয়েছিল একবছর না যেতেই, অরূপ তার জীবনে আসুক সহকার শাখা হয়ে। তারপর সে কথা সৃষ্টি করুক আর সুরে সুরে সে কথা গায়ত্রী পাঠাক বাংলার ঘরে ঘরে। এত বড় সৌভাগ্যেও চোখ বড় বড় হবে না যার, সে আর যাই হোক, মানুষ নয় নিশ্চয়। কিন্তু অরূপ মানুষই। তাই তার চোখ বড় বড় হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তবু সে যেন কি বলতে গিয়েও বলতে পারেনি।

খ্যাতির মোহ বড় সাংঘাতিক। সে খ্যাতি ফুটবল, ক্রিকেট খেলারই হোক রাজনীতিরই হোক আর সুস্থ শিল্পজগতেরই হোক। শুধু তাই কেন, 'লোকটা বড় ভালো' মাত্র এই কথাটা শোনার জন্য অথবা একথাটা বহাল রাখবার জন্য কত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় মানুষকে। অরূপও পারেনি সে মোহ এড়াতে।

তারপর যথারীতি রেজিষ্ট্রারের খাতায় দুটো সই। একটা মাঝারি রকমের পার্টি আর শুধু গান আর গান। কিন্তু রেজিষ্ট্রির দিনেই আবার অমন কাজ করে নাকি কোন মেয়ে মানুষ? কিন্তু অন্তে কি করে না করে গায়ত্রী মুখার্জীর তা দেখার কথা নয় গায়ত্রী মুখার্জী কি করে, কেমন করে হাসে, কি পরে কেমন করে কাঁদে, জানবার জন্য সাংবাদিকদের কিউ দিতে হয়।

অবশ্য ডক্টর সিনহা প্রবল আপত্তি করেছিলেন। বার বার ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, আজ বোধ হচ্ছে অরূপ কেন কোন আপত্তিই করেনি। বরঞ্চ তোমার ইচ্ছের বাধা দেব আমি? বরণের মুখ করে বলেছিল ট্যাক্সিতে চড়ে। হ্যাঁ, তখনো ট্যাক্সিতেই চড়তে হত গায়ত্রীকে।

তারপর একই দিনে বার্থ রোমের খাতায় দুটি সই পড়েছিল। অরূপ রায় আর অন্য রূপান্তরিতা গায়ত্রী রায়ের। ওরা সন্তান চায় না। আইন আর বিবেক বার বার চোখ রাঙালেও সেদিন দু হাজার টাকার

চেকটাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি ডক্টর সিনহা। বাচ্চা হলে গলা নষ্ট হ'বে, আর গলা নষ্ট হলেই জীবন, এ বিশ্বাস কাল পর্য্যন্ত আজ সকাল পর্য্যন্তও ছিল গায়ত্রীর।

কিন্তু এখন ভাবছে, সমস্ত অর্থ, এমন কি জীবনের বিনিময়েও কি একবারের জন্যও না হওয়া যায় না? ছায়াছবির গল্পের মত ও নার্সিং হোমের সেবারুদ্ধমে অচেতন হয়ে আছে, বাইরে অরূপ অস্থির হয়ে পায়চারী করছে আর চুল ছিঁড়ছে মাঝে মাঝে। এমন সময় ডাক্তার গিয়ে বল্লেন—মা কিংবা ছেলে একজনকেই বাঁচানো সম্ভব, আপনি কাকে চান মিঃ রায়?

এইখানে কিন্তু আবার নভেলটি করতে চায় গায়ত্রী। চিরাচরিত ভাবে মাকেই বাঁচান বলা চলবে না। বলতে হবে অরূপকে গায়ত্রী যাক কিন্তু ওর বংশধরকে বাঁচানো চাই-ই। তার মধ্যেই তো গায়ত্রী বেঁচে থাকবে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। কিন্তু এতো কল্পনা, বাস্তব যা তা তো ডক্টর সিনহা বলেই দিলেন একটু আগে ওঁরা অভিমন্যু, চক্রব্যূহ গমনের পথ জানেন, নির্গমনের নয়। গাড়ীটায় ষ্টার্ট দিল গায়ত্রী। ঘর ঘর শব্দ হল একটা। এত মৃদু অথচ ঘর ঘর শব্দ গাড়ীর? হ্যাঁ গাড়ীই তো। সতেরো টাকা দামের স্প্রীংয়ের মোটর গাড়ী। যে গাড়ীটার কথা কালও জানতো না গায়ত্রী মুখার্জী।

কালই যদি জানবে, তবে চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীর অমন জবরদস্ত আয়োজন করে কখনো বোকার মত অরূপকে ওর মফঃস্বলের বাড়ীতে যাবার সময় বার বার করে মনে করিয়ে দিয়েছিল গায়ত্রী কোনমতেই যেন বিবাহবার্ষিকীর দিন পর্য্যন্ত না থাকে সেখানে। সেদিন পার্টির পর সারারাত চলবে শুধু গান আর গান।

আর সব আয়োজন যখন সম্পূর্ণ প্রায় তেমনি এলো চিঠিটা। 'আমাকে ক্ষমা কর গায়ত্রী, কিন্তু খ্যাতির মোহ তোমার মত আমাকেও বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। তাই বুঝতে পারিনি কি পাপই না করছি' বিবাহবার্ষিকীর দিন যাওয়া সম্ভব নয়। কেন নয় তা জানতে হ'লে তোমাকে আসতে হয় একবার এখানে! কিন্তু এসলির মধ্যে তোমার এ্যামব্যাসেডার ঢুকবে কি?'

না, এ্যামব্যাসেডার ঢোকেনি। বড় রাস্তায় গাড়ী রেখে গলি পেরিয়ে বাই লেনের মধ্যে ছোট্ট বাড়ীটার সদরে ঢোকার নীচু চৌকার মাথাটায় দারুণ চোট লেগেছিল। লেগেছিল আর গায়ত্রী ভেবেছিল যে বাড়ীতে ঢুকতে গেলে মাথা নীচু করতে হয় সেখানে থাকে কি করে অরূপের মত শিল্পী, গীতিকার, সাহিত্যিক?

আর বসার ঘরের বাইরে নক করতে গিয়েই থমকে যেতে হয়েছিল মিষ্টি সুরের কবিতা আবৃত্তি শুনে। আবৃত্তি করছে একটি নারীকণ্ঠ—

"মনের বাহিরে লাল পথ সে পথে সকাল থেকে রোজ
হাটে যায় দেশের ব্যাপারী, দল বেঁধে মাঠে যায় চাষা—
দুয়োরাণী থাকে যে কুটীরে তাহার জানে না তারা খোঁজ
দুয়োরাণী সেই গান গায়, শোনে না তাহারা তার ভাষা।"

তার পরের লাইনগুলো যে বলে যাচ্ছে আদর করার মত সুরে কান্নার মত সুরে, সেই কি আজকার শ্রেষ্ঠ গীতিকার অরূপ রায় নয়?

"শুধু ঘরে রাজার দালানে নিভে যায় আলোর উৎসব
দুয়োরাণী ঘুমায় যখন অন্ধকার প্রমোদ ভবনে

রাজারে জাগায়ে দেয় যবে নক্ষত্রের শুভ কলরব
দুয়োরাণী ছিল একদিন সে কথা রাজার পড়ে মনে।"

আর দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো যে একবছরের বাচ্চাটা, তারই তো জন্মবাসরিকী আজ। ও আজ একবছরের হ'ল।

ফিরে যাবে ভেবেছিল গায়ত্রী পাটিপে টিপে। কিন্তু ফেরা হ'ল না। দেখতে ইচ্ছে হ'ল দুয়োরাণীর সেই ঐশ্বর্য যা রাজাকে জাগিয়ে রাখে রাতের পর রাত দুয়োরাণীর সাতমহলা প্রাসাদের ঐশ্বর্যের পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে।

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকলো যখন, তখন দুয়োরাণী রাজার সতেরো টাকা দিয়ে কেনা মোটরটার চাবি খোয়াচ্ছে তাদের সাতরাজার ধন মানিককে খেলাবার জন্য।

দু'ঘণ্টা পরে যখন ফেরার জন্য বেরিয়ে এল বাড়ীর ভেতরে থেকে শিল্পী শ্রেষ্ঠা গায়ত্রী মুখার্জী গীতিকার অরূপ রায়ের দুয়োরাণী মাথাটা এমনিতেই নীচু হয়ে গেল ওর দুয়োরাণীর ঐশ্বর্যের কাছে। দুয়োরাণীর কাছে হেরে গেল ও! মাথাটা এবার আর চৌকাঠে লাগলো না।

• • •

সহরের শেষপ্রান্তে গল্‌ফ্ খেলবার মাঠের একপাশে বেদের দল এসে তাঁবু ফেলেছে। ম্যাথু আরনল্ড প্রাতঃভ্রমণে গেছেন সেদিকে। একজন আধবুড়ো বেদে তাঁকে দেখে সহাস্য মুখে বললেন—"আচ্ছা মশাই, এখানে লাইব্রেরী কোথায় আছে বলতে পারেন? আমার একখানা বই পড়বার খুব ইচ্ছা।"

—'কি বই?" প্রশ্ন করলেন ম্যাথু আরনল্ড।

—"এমন কিছু নয়,—সেকস্‌পীয়ারের জুলিয়াস সীজার।"

আশ্চর্য হলেন আরনল্ড। কিন্তু আরও আশ্চর্য হলেন তিনি যখন সেই বেদে অনর্গল সেক্সপীয়ার মিলটন আবৃত্তি করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আলাপের পর আরনল্ড বাড়ী ফিরে এসে নূতন একখানা উপন্যাস লিখতে বসলেন, নাম দিলেন তার—The Scholar Gipsy."

এখনও ওঠে চাঁদ

বাণী রায়

বাড়ীটি বড় রাস্তার পাশ দিয়ে একটা সরু গলির মুখে। গলি নয়, ট্যান্‌ডার্ড প্লটে বাড়ী।

নিত্যমার্জিত পিতলের নেমপ্লেটে লেখা ডাক্তার ত্রিগুণা চন্দ, নানাবিধ স্বদেশী বিদেশী ডিগ্রীর উল্লেখ আছে।

কিন্তু উল্লেখ নেই ডাক্তারের কানের পাশে ঈষৎ কুঞ্চিত চুলের গুচ্ছের, উল্লেখ নেই উজ্জ্বল বিদ্যুৎপ্রভ দৃষ্টির চমকের। উল্লেখ নেই মনোহারী বাচনভঙ্গির।

'ত্রিগুণা' নামে প্রতীয়মান হয় একটি প্রায়-প্রৌঢ় গুরুগম্ভীর ব্যক্তি; অধরে কাঠিন্য, বসনে বিন্যাস। কিন্তু তা নয়। একহারা মলাক্কা বেতের ছড়ি ডাক্তার ত্রিগুণা চন্দ।

প্রকৃতপক্ষে সাধারণিক পরিমণ্ডলের রত্ন মরাল ব্যানার্জি ডাক্তার চন্দকে উক্ত নামেই ডেকে থাকেন।

স্ত্রী এষণা ব্যানার্জি মনোজ্ঞ সজ্জায় বহির্গমন করছেন, মরাল প্রশ্ন করলেন, "যাচ্ছ কোথায়?"

এষণা ঘাড় বেঁকিয়ে পশ্চাৎভাগে বসনের বিন্যাস দেখে নিতে নিতে বললেন, "শরীরটা খারাপ লাগছে ক'দিন থেকে।"

বাকীটা উহ্য। মরাল চোখ টেনে বলে উঠলেন, "ওঃ, মলাক্কা বেতের ছড়ির কাছে? বুঝেছি।"

যখনই পত্নীদের পোষাকে, প্রসাধনে সূক্ষ্ম যত্ন দেখা যায়, পতিরা ধরে নেন ডাক্তার ত্রিগুণা চন্দের ভিজিটের অঙ্ক বেড়ে গেল। অথচ নিষেধ করাও যায়না। ডাক্তার চন্দ অতিশয় ভালো ডাক্তার। গগনভেদী প্রশংসা তাঁর। চিকিৎসার হাত অব্যর্থ। তিনি আবার গাইনোকোলজিষ্ট, মেয়েলী রোগের চিকিৎসক। সুতরাং তাঁর কাছে যাওয়ার বাধা দেওয়া চলেনা। পতিকুল বিরক্ত হন মনে মনে। কিন্তু গৃহশান্তি বজায় রাখতে গেলে অনেক সইতে হয়, বইতে হয়।

সুতরাং ডাক্তার চন্দের পশার বেড়েই যায়। ডাক্তার চন্দের জীবন সম্বন্ধে রোগিনীদের কৌতূহলের অন্ত নেই। ডাক্তার তাঁদের নিরাময় করার পরেও তাঁদের আগ্রহের নিবৃত্তি থাকেনা। তাঁরা সর্বদা ডাক্তারের গল্প করতে ভালবাসেন।

ডাক্তারের পার্ক স্ট্রীটের একতলার ফ্ল্যাট আয়ত্তাধীনে আছে কোনও গুরুতর নীরব দাসীশ্রেণীর প্রৌঢ়ার হাতে। মুখ তার দৃঢ়রূপে বন্ধ, যেন কথাগুলো ফাঁসির আসামী। কনভেন্ট, সেলের লোহার খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিঃশব্দ ফ্ল্যাটটির পরিধি বেপে এক ভদ্র শালীন দিনযাত্রার ছায়া খণ্ড খণ্ড রূপে ভাসে। বোঝা যায় একক জীবন ডাক্তারের।

কিন্তু বিয়ে করেননি কেন ?

এমন মনোহারী মলাক্কা বেতের ছড়িরও যে বেলা হয়েছে অনেক, ধরা যায়। অর্থ অতি প্রচুর। কেন তিনি আজও অকৃতদার ?

স্ত্রীবিদ্বেষী নন ত্রিগুণা চন্দ। তাহলে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের এত প্র্যাক্‌টিস হত না। মোলায়েম ব্যবহার, সহৃদয় আচরণের মাধুর্য্যে মক্কিণীর দল ভিড় বাড়ায়। হাতযশ তো আছেই।

রহস্যময় ডাক্তার জীবন নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। নিকটবন্ধু তেমন কেউ নেই ডাক্তারের। অতি-ব্যস্ত জীবনে বন্ধুত্বের অবকাশ মেলেনা। সোজা-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়না। মৃদু হাস্যের মধ্যে নীরবতার বর্ম্ম অঙ্গে ওঠে ডাক্তারের।

মহিলা সঙ্গে দেখাও যায়। সান্ধ্যপার্টিতে নিমন্ত্রিত ডাক্তার পুরাতন রোগীর বাড়ী রাত্রি দশটায় দেখা দিয়ে একমিনিটি হাস্য বিতরণ করে বিদায় নেন। জন্মতিথি ও বিবাহে উপহার যায়। পিক্‌নিকে সময় থাকলে দেখা মেলে।

কোনও মহিলার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা দেখা গেলে কিছুদিন জল্পনা চলে। কিন্তু অচিরাৎ দেখা যায় উক্ত মহিলা একটু ওজন কমিয়ে, একটু অনিদ্রা বাড়িয়ে একাই আছেন। ডাক্তারের মোহন হাস্য একটু মলিন হয়নি।

দেখা গেল কুন্তী মিত্রের সঙ্গে লাল স্পোর্টস্ কারে ডক্টর চন্দ। পাশাপাশি চারখানি হাতে স্টীয়ারিং হুইল। গাড়ী চালানোর শিক্ষা দিচ্ছেন অতিব্যস্ত ডাক্তার চন্দ রোগিনীকে। কুন্তী মিত্রের হর্‌মোন্ কম পড়ায় কিছুদিন ত্রিগুণা চন্দের চিকিৎসায় ছিলেন তিনি।

আর দেখতে হবেনা। কুন্তী মিত্রের বাবা ফ্যাক্টরির মালিক, একমাত্র কন্যা কুন্তী। পরন্ত-যৌবনা হলেও রূপসী।

মরাল ব্যানার্জ্জি স্ত্রীকে বললেন, "মলাক্কা বেতের ছড়ির বিয়েতে কি যেবে ? আবার আমাকে ইন্‌সল্‌ভেন্সি নিতে না হয় তোমার আতিশয্যে ! তুমি না বলেছিলে, মলাক্কা চিরকুমার রইবে ? অবশ্য, আশা করি, তোমার জন্যে নয়।"

এবণা ঠোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন, "এবার তো দেখছি চন্দের নিস্তার নেই। ছিনেজোঁকের পাল্লায় পড়েছেন কিনা।"

মরাল টিপ্পনি কাটলেন, "ছিনেজোঁক মানে কি ? তোমরা, মেয়েরা ডাক্তারের দোষ দেখনা ? ডাক্তার প্রশ্রয় না দিলে কার সাধ্য এগোবার ? দিনরাত মেয়েটির পেছনে ডাক্তারই লেগে আছে। হবেনা ? অত টাকার মালিক !"

তপন সোম অফিস থেকে বাড়ী ফিরে দিদিকে খবর দিল, "আজ ডাক্তার ত্রিগুণা চন্দকে দেখলাম বড় বিষম অবস্থায়।"

দিদি অমলা নিকটবর্তী মেয়েস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। মধ্যে ডাক্তার চন্দের রোগিনী ছিলেন জরায়ুঘটিত দোষে। তার পরেই চাঁদের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস, ঘরে রজনীগন্ধা রাখা সুরু হয়েছে।

অমলা স্কুল থেকে ফিরে বেগুনভাজা ও খেজুরের গুড় দিয়ে রুটী খেতে বসেছিল। মুখের গ্রাস রেকাবে নামিয়ে প্রশ্ন করল সাগ্রহে, "কোথায় ? কেমন অবস্থায় ?"

"রেড রোডে রেড রোড্‌টার। রেডগ্রেভ সওয়ার।"

"মানে ?"

"একখানা লাল গাড়ী চালাচ্ছেন ডাক্তার চন্দ। পাশে গা ঘেঁষে বসে এক লালপাড়ীপরা মহিলা। গালে রুজ, ঠোঁটে রঞ্জনী লালে-লাল। হাতের লম্বা নখ লাল। মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের গায়ে হেলে-হেলে ফ্লীরাবিং ধরছেন।"

অমলা নীলমূর্ত্তি হয়ে কোনমতে বলল, "হয়তো আত্মীয়া।"

"রাখো তোমার আত্মীয়া। দেখলেই বোঝা যায়। তুমি না বলেছিলে ত্রিগুণা চন্দ ভীষ্ম-অবতার ?" তপন টিট্‌কারি দিল।

আমার কাছে তো তাই। মনে মনে ভাবল অমলা। বৈকালিক জলখাবার সেদিন কুকুর বেড়ালের পেটে গেল।

পনেরো বছরের দুন্দুভি সরকার ড্রেন পাইপ নাচাতে নাচাতে মা'কে শোনাল, "বুড়ো লম্পট লট্‌কেছে এবার।"

"সেকি কথা ? ছিঃ, দুন্দুভি, অমন ল্যাঙ্গোয়েজ ব্যবহার করেনা।"

"রাখো তোমার ল্যাঙ্গোয়েজ। বুড়ো ত্রিগুণা ছোকরা সেজে বনবিহারী মিত্রের মেয়েকে নিয়ে লট্‌রপট্‌র করছে, দেখে এলাম।"

"কী বলছিস ?" জলদবরণী সরকার মেনোপজের রোগী হিসাবে ডাক্তারের বাঁধা।

"রেবলুর লেকের ধারে বসে দুজনে · হাঃ, হাঃ,···চীনে বাদাম খাচ্ছে। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।!"·

জলদবরণীর মাথা ঘুরে উঠল, মুখচোখ লাল, কানে আগুন। মেনোপজের যত উপসর্গ ডাক্তারের চিকিৎসায় বিদূরিত হয়েছিল, ক্ষের ত্রিগুণ তেজে আবির্ভূত হল। তিনি শুয়ে পড়লেন।

এদিকে ডাক্তারের দিন চলছে।

মুখশ্রেখার মত পরিষ্কার মেজের ওপর ছোট ডিম্বাকৃতি টেবিলে ডাক্তার প্রাতরাশে বসেছেন। হাউস্‌কীপার জাতীয়া স্ত্রীলোকটির নির্দ্দেশে রান্নার লোক খাদ্যাদি দিয়ে যাচ্ছে।

সম্মুখে কারুকরা কাঠের পরদা। হলের ওপাশে ক্রমাগত টেলিফোনের শব্দ। পাশের ছোটঘর থেকে একজন ইউনিফর্মপরা নার্স বা'র হয়ে এসে ধরছে। প্যাডের ওপর পেন্সিলে লেখা হচ্ছে। কখনও বা স্ত্রীলোকটিকে ডেকে পরদার ওপার থেকে কোনও জরুরী নির্দ্দেশ জেনে নিচ্ছে।

ডাক্তার এখন হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। আজ একটি বড় অপারেশন আছে।

কর্ণফ্লেকে দুধের জাগ্ থেকে দুধ ঢেলে চিনি দিয়ে নাড়ছেন তিনি। এগ্‌কাপে একটি ডিম এনে রেখে গেছে পরিবেশক।

ডিমের খোলায় চামচের মৃদু ঘা দিচ্ছেন ডাক্তার, কপালে চিন্তারেখা।

মলিনা ভৌমিকের জরায়ুতে টিউমার, এধারে রক্তের চাপের রোগী। স্বাস্থ্য খারাপ। অপারেশনের টেবিলে প্রাণ না যায় ?

কি করবেন ডাক্তার! যত্ন-চেষ্টা এবং হাতের কৌশল ভিন্ন আর কি করে জীবন দিতে পারবেন ?

হাউস্‌কীপারকে নার্স হাতছানি দিয়ে ডেকে কি যেন বলল। সে ভাবলো শূন্যমুখে, এগিয়ে এসে [illegible] আপনার জিজ্ঞাসা করছেন ওঁর বাড়ীর টেলিফোনে আজ বিকেলে আপনি যাবেন কি ?"

ডাক্তারের দুর্লভ স্বল্প বন্ধুর একজন মল্লিক। ডাক্তার একটু চিন্তা করে বলে দিলেন, "বলে দাও, যদি পারি নিশ্চয় যাব।"

নার্স সংবাদটা নিয়ে গেল টেলিফোনে বলে দিতে। ইতিমধ্যে আবার জরুরী টেলিফোন: অমুক রোগিনীর বমি হচ্ছে। সদ্য অপারেশন করা হয়েছে, ষ্টীচ্ কেটে যেতে পারে।

ডাক্তার নার্সকে আহ্বান করলেন এবার। সে প্যাড-পেন্সিল নিয়ে দাঁড়াল কাছে। একটা ঔষধের নাম লিখিয়ে দিলেন। আপাততঃ সেটি দিয়ে ওঁর অপেক্ষায় রাখা হোক।

কোনমতে খাওয়া শেষ হল। ন্যাপ্‌কিনে আঙুল মুছে দাঁড়াতেই প্রৌঢ়া এসে আরও একটি মেসেজ্ দিয়ে।

"মিস মিত্রকে আপনি যেতে বলেছেন বলায় উনি জানতে চাইছেন যে, কখন টেলিফোন করবেন?"

ডাক্তার ন্যাপ্‌কিন ছুঁড়ে অস্পষ্ট গলায় বলে দিলেন, "আজ একটা অপারেশন নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত আছি।"

আর দাঁড়ালেন না তিনি। বাইরে ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলে প্রস্তুত। লাফিয়ে গাড়ীতে উঠলেন ডাক্তার চন্দ।

প্রৌঢ়া কুলুপ আঁটা মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার দুর্লভ নীরবতার মধ্যেই এক নিঃসঙ্গ ডাক্তারের রহস্য নিহিত আছে গুহাশায়ী সত্যের মত।

ডাক্তার প্রফুল্লমুখে গাড়ীতে চলেছেন। কারণ অপারেশন সফল, রোগিনী প্রাণ ফিরে পেয়েছেন।

হাসপাতালের ঔষধি-গন্ধকটু করিডোরে করিডোরে ত্রিগুণা চন্দের জয়ধ্বনি। ক্যাবিনের রোগিনীরা ডাক্তারের দর্শন আজ না পেলেও ক্ষুব্ধ নন। পথ চাওয়ার ব্যাকুল প্রতীক্ষা অন্তে পেসিং বেডের রোগিনী ডাক্তারের আবির্ভাবে পুলকিত হলেও ধরে রাখতে চান্‌নি ওঁকে। মলিনা ভৌমিক আবার সুস্থ হবেন। ডাক্তারের দান তাঁর প্রাণ।

কয়েকটি প্রাইভেট রোগীর বাড়ীর কল্ দ্রুত সেরে নিতে হবে। আহারাদির পরে দ্বিপ্রহরে অন্ততঃ ঘণ্টাখানিক বিশ্রাম না নিলে অপরাহ্নের চেয়ার একটু ভারী লাগে। অথচ যাদের প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র অর্থব্যয়ের জন্য ঘনঘন টেলিফোনের ডাকে তারাই উত্যক্ত করে তোলে।

অভিজাতপল্লীতে ডাক্তার এলেন এবার। সুমিত্রা দেবী আজ তিনদিন যাবৎ টেলিফোনে বারে বারে ডাকছেন, যেতেই হবে একবার। নিউরাল্‌জিয়া রোগ।

নিরোগী বাড়ীর বিরাট কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করল গাড়ী। সাদা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ডাক্তার ওপরে উঠলেন। চাতালে বসার ব্যবস্থা, ফুলের গন্ধে বাতাস মদির।

আঁচল উড়িয়ে উঠল সোফা থেকে এক সুন্দরী; অপাঙ্গে কটাক্ষ হেনে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "এত্‌তো দেরী?"

ডাক্তারের মুখেচোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল ক্ষিপ্র একঝলক হাসির আভায়, "একটা বড়, একটা ছোট; দুটো অপারেশন ছিল। চলো।"

আসল রোগিনীর দেখা মিলল পরম কক্ষের অভ্যন্তরে।

পা ডুবে যাচ্ছে কার্পেটে, দেওয়ালে রংকরা। লেসের ধারদেওয়া বালিশে অসন্তুষ্ট মুখ, অতিক্রান্ত-যৌবনা অভিজাত মহিলার।

"এতক্ষণে আসা হল!" বয়স্ক পুরাতন রোগিনীর জোর কণ্ঠে তাঁর, "সকাল থেকেই বুক ধড়ফড় করছে।"

"বাবলু, ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রটা গাড়ী থেকে এনে দাওনা।" ডাক্তার মধুর কণ্ঠে বললেন।

বাবলু ছুটে গেল।

সুমিত্রা দেবী শিথিল শীর্ণ শুভ্র হাত বাড়ালেন। পাশে লাল মখমল মোড়া ছোট একটি লৌহিন চেয়ার ছিল। ডাক্তারবাবু সন্তর্পণে বসলেন।

সুমিত্রা ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্র আনবার আগেই হাতখানা ডাক্তারের জানুর ওপরে রাখলেন। ক্লান্ত করুণ চোখ দুটি তুলে কেমন করে যেন তাকালেন।

চট্‌করে ডাক্তারের নার্স সুব্রতা যন্ত্রের কথা মনে হল। হাসপাতালে এমন সমস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব করলে নার্স সদা পাশে থাকেন, সামলে নেন। নমনীয় কণ্ঠে, কমনীয় ভঙ্গির পশ্চাতে বস্তুতান্ত্রিক জগৎকে ধরে থাকেন মিস দত্ত।

পাকিস্তানের মেয়ে। শক্তপোক্ত চেহারা, মাথায় সযত্নে শাদা টুপী আটকানো, কাপড়ের ভাঁজে অটুট ইস্ত্রি। সজাগ দিয়ে সুতীব্র ঔষধিগন্ধ আগমনবার্তা সূচিত করে দেয়। যেখানে মিস দত্ত, সেখানে যোগাড়া, সেখানেই একটা নির্ভর।

সাধারণ ঘরের মেয়েটির জন্য এই ধনীগৃহে অভিজাতপাড়ায় বসে ডাক্তারের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

মন সংযত করে ডাক্তার ফিরে তাকালেন রোগিনীর দিকে। দু'একটা কথায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি কাটিয়ে দিতেই বাবলু এল। নিজেই ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রটা হাতে এনেছে বয়ে। একটু হাঁপিয়ে পড়েছে দ্রুত সিঁড়িওঠার শ্রমে। ডাক্তারের সঙ্গ একমুহূর্ত ছাড়া তার উদ্দেশ্য নয়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তার একবার ওর মুখের দিকে তাকালেন। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। ভরা দুপুরেও ওর সাজের ঘটায় উর্বশী পরাভূতা। সমস্ত মুখ চিত্রিত। ঠোঁটের কোথায় কালো জড়ুলটি অধররঞ্জনীর রংএর পাশে আরও কুচ্‌কুচে কালো।

একটু বেশীক্ষণ চেয়ে রইলেন ত্রিগুণা চন্দ। পেশা ও পরিক্রমায় রমণীমণ্ডলে তাঁর সদা-সজাগ দিষ্টি। কখনও বাধ্য হয়ে। সেখানেও কি বাবলুর মত সুন্দরী দেখেননি?

"ব্লাডপ্রেসার নরমাল" একমাত্র মন্তব্য করলেন ডাক্তার। এই রোগিনীকে ভাল আছেন বললে তিনি চটে ওঠেন। মোটা টাকার রোগী। কাজেই চুপ করে থেকে টাকাটা পাবার ব্যবস্থা করলেই ডাক্তারের পক্ষে ভালো। টাকার ভরাবহ প্রয়োজন ডাক্তারের। অথচ কোথায় যে এতটাকা যায় কেউ জানেনা। ঘরের দেনা নেই, পোষাকে বাহুল্য নেই। পরিবার বলতে একজন মাত্র।

"মিষ্টার নিয়োগী কোথায়?" ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্র তুলতে তুলতে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

"এ সময়ে বাড়ী থাকেনই না উনি," সুমিত্রা দেবীর গলায় অভিযোগ। পূর্বে কয়েকবার ডাক্তারের আসার সময়ে চা-বাগানের মালিক মিষ্টার নিয়োগী হাজিরা দিতেন। এখন স্ত্রীর সখের বারমেসে রোগে আর উৎসাহ পান না।

ডাক্তার আবার বাবলুর দিকে চাইলেন। আজ আর মায়ের দিকে মন নেই।

সুমিত্রা অনুভব করেই বোধহয় মেয়েকে কঠিন তিরস্কার করলেন, "আজ বাদে কাল পরীক্ষা। এখানে হা করে দেখছ কি? সময় নষ্ট কোরনা।"

বাবলু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "বারে! ডাক্তার কাকা আমার কান দেখবেন না? কান কট্‌কট্‌ করছে।"

"ডাক্তারবাবু কান দেখেন না। দেখছেন মেয়ের বুদ্ধি।"

ডাক্তার মৃদু কণ্ঠে বললেন, "পরে টেলিফোনে একটা কথা বলব, সুমিত্রা দেবী।"

বিগতা অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী প্রীত হয়ে উঠলেন।

পার্ক ষ্ট্রীটের নির্জন ফ্লাটে।

ডাক্তার দুপুরের খাওয়ায় বসেছেন। সম্মুখে প্রৌঢ়া। একগাদা স্লিপ্। নার্স সমস্ত সংবাদ টুকে রেখে গেছে। আবার বিকালবেলায় আসবে। তখন ডাক্তারের চেম্বারে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত রোগীর ভিড়।

সংবাদে বৈচিত্র্য নেই। প্রাত্যহিক দিনযাত্রার পরিধির মধ্যেই। শুধু বারবার কুন্তী মিত্রের টেলিফোন : মিস মিত্র ফোন করেছিলেন। আবার করবেন।'

খেতে-খেতেই ঘণ্টা বেজে উঠল। এখন ধরার কাজ প্রৌঢ়ার। সে তাড়াতাড়ি পরদার ওধারে চলে গেল। ডাক্তার পায়েসের বাটী শেষ করলেন।

স্ত্রীলোকটি রেখে ব'লে রান্নাখাওয়া ভালভাবে হয় ওঁর।

মুখটেপা প্রৌঢ়া সংবাদ দিল, কুন্তী মিত্র টেলিফোনে।

ডাক্তারের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। উঠে যেয়ে তিনি ধরলেন, একটুক্ষণ দ্বিধার পরে। জোর হয়ে উঠল গলা ওঁর।

"কুন্তী, তুমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর আমাকে তোমার দরকার নেই। তুমি নার্ভে ভুগছিলে। বলেছিলে আমার সঙ্গ ছাড়া ভাল হবেনা। চিকিৎসক হিসাবে আমি তোমাকে সঙ্গ দিয়েছি, বন্ধু হিসাবে নয়। না, আমার বাধা আছে। হ্যাঁ, সত্যই ধরেছ। অন্তদিকে আমার মন আছে। এবার লক্ষ্মী মেয়ে, বিয়ে করে ফেলো। সুখ হবে আরও। শুভবাই।"

রিসিভার রেখে ডাক্তার রুমালে ললাটের ঘর্মবিন্দু অপসারিত করলেন। প্রৌঢ়া নিঃশব্দে সব শুনছে। শুনুক, ডাক্তারের জীবনের কিছু তার অজানা নেই।

এবার মনে থাকতে থাকতে সুমিত্রা দেবীকে জানানো দরকার। যদি মিটার নিয়োগীর জন্ম অপেক্ষা করতে হয়, দেরী হয়ে যাবে।

নাম্বার খুঁজে ডায়াল সুরু করলেন ত্রিগুণা চন্দ। বাবলুকে বলা চলবেনা আর। বাংলুর সৌন্দর্য্যচিহ্ন ঠোঁটের পাশের কাল জড়ুলটির যথার্থ স্বরূপ আজ ডাক্তারের চোখে ধরা পড়েছে। টিউমার ম্যালিগন্যাণ্ট! সাড়ে চারটায় ডাক্তার চেম্বারের সময় দিলেও সকলে জানে পাঁচটার আগে ডাক্তারকে পাওয়া যায়না। চারটে থেকে পাঁচটা তিনি কোথায় থাকেন কেউ জানেনা। গাড়ী নিজেই চালিয়ে যান।

আরও চারটের কয়েকমিনিট আগে ডাক্তার ত্রিগুণা চন্দ এলেন অপেক্ষমান গাড়ীর কাছে ফটকের বাইরে। ড্রাইভার নেমে চলে গেল বাড়ীর মধ্যে।

গাড়ীতে উঠে বসা মাত্র রাস্তার গাছের পাশ থেকে একজন আধবয়সী লোক উঠে এল এগিয়ে। একমাথা রুক্ষচুল, ময়লা জামাকাপড়।

"আবার এসেছ তুমি?"

"কি করি, বলুন? পেট চলেনা যে।" লোকটি হাত কচলাতে কচলাতে বলল। ধূর্ত্ত চোখের ভাবে কিন্তু অসহায়তা নেই।

"নাও, ধরো। ছিঁড়ে খেয়ে ফেললে তোমরা আমাকে।" ডাক্তার পকেট থেকে কিছু টাকা বা'র করলেন।

"আরও কিছু চাই এবারে।"

ডাক্তারের চোখে বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে উঠেই নিভে গেল। তিনি অসহায় আত্মসমর্পণে পকেটে হাত দিলেন আবার।

গাড়ীর ছোটার পথে এবার বাধা রইলনা। ছুটে চলে এল গাড়ী শহরের প্রান্তে। একটা বাগান-বাড়ীর হাতায়।

অনেক লোক। ডাক্তার সাগ্রহে ছুটে এলেন বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে। একটা ঘরে বসলেন তিনি। ব্যাকুল আগ্রহে বারবার দরজার দিকে চাইতে লাগলেন। প্রতীক্ষাটুকুও যেন সহ্য হচ্ছেনা।

একটু পরেই একজন নার্স, সঙ্গে আর একজন।

সমস্ত মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল ডাক্তারের। মলাটা বেতের ছড়ি যেন নেচে উঠল পরম আনন্দে। ছুটে গেলেন ডাক্তার। আগন্তুককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

দশবৎসরের পদ্মু শিশুপুত্র। আশায় বুক বেঁধে নার্সিং হোমে রেখে জলের মত অর্থব্যয় করে চিকিৎসা চালাচ্ছেন। মাতৃপরিত্যক্ত শিশু। ধাত্রীচরিত্রা কুলত্যাগ করেছে। পাছে সেকথা প্রকাশ পেয়ে সন্তানের কলঙ্ক হয়, এই ভয়ে ভীরুধী, দূরদর্শী ডাক্তার ত্রিগুণা চন্দ টাকা ঢেলে কলঙ্কের মুখ বন্ধ করেছেন। তাঁর আশা সন্তান একদিন সুস্থ হবে, সংসার করবে।

দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রুগ্ন দুর্বল ফ্যাকাশে ছোট্ট ছেলেটি ডাকল করুণ স্বরে, "বাপি, বাপি!"

"এই যে বাবা, আমি এসেছি। কেমন আছ আজ, বলো?"

হ্যাঁ, সহস্রনারীর ঈপ্সিত, রমনীকুলপরিবৃত ডাক্তার ত্রিগুণা চন্দের জীবনের এই একমাত্র প্রেম

• • •

হিসাবের ভুল

এডিসন যখন স্কুলে পড়তে গেলেন, মাষ্টাররা একবাক্যে বল্লেন, এ ছেলের কিছু হবে না ·····এক লাইনও এর মনে থাকে না।

এডিসন ক্লাসের সব শেষে বসে থাকতেন।

ডাক্তারেরা বল্লো, মাথার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, মাথার ভেতর কোন গোলমাল আছে ··

তিনমাসের চেষ্টার পর তাঁর মা তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। এডিসন জীবনে আর স্কুলে পা দেননি।

কিন্তু পরে সেই সব স্কুলমাষ্টাররা ও ডাক্তারেরা কি বলেছিলেন জানি না।

মেয়ে মজলিশের একটি চিত্র

স্টাফ রুম

অমলেন্দু মিত্র

পরীক্ষার কামেলা চুকেছে। শেষ হয়েছে ওদের পালা, সুরু হয়েছে এদের। এখন নিয়মের নেই বাড়াবাড়ি, বালাই নেই ঘণ্টাবাজার। নাম ডাকায় পরই ছুটি। বড়দের পায়ে পায়ে দ্রুত ছন্দ। যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতা। কে কত আগে ছুটে এসে কাজে বসতে পারে, বড় টেবিলটার চারপাশ জুড়ে।

অন্যদিন রুমপাউণ্ডে ঝিরিঝিরি হাওয়ায় দুলতে থাকা অশোক গাছটার আলো ছায়ার বেষ্টনী জুড়ে চেয়ার টেনে বসত ওরা। বসত আর গল্প করত। হাসত। ফাঁকে ফাঁকে চলত খাতা দেখা। অথচ আজ ব্যাপারটা একটু ঘোরালো। কি একটা আশঙ্কায় মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে।

স্টাফ রুমে যেন ঝড় বইছে আজ। কেউ কারো পানে তাকাচ্ছে না। রাশি রাশি খাতা পত্তর। সবাই খাটছে। ফস্ ফস্, কড়্ কড়্ শব্দ। বাইরে দরজার ফাঁকে ফাঁকে দু'একজন ছাত্রী উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের তাড়াবার আজ কারো গরজ নেই। সবাই ব্যস্ত, নিদারুণ ব্যস্ত। কেউ কাউকে চেনে না যেন।

অনীতার উসখুসানি একটু বেশী। চাপা গলায় ডাকে এই শুনছো?

—চুপ। চাপা গর্জে ওঠে সতী।

—কেন ভাই খুব কাজ বুঝি! আমার তো কখন হয়ে গেছে!

সতীর মুখখানা একটা কেলে হাঁড়ির মত হয়ে উঠ্‌ল। ও কাঁদবে না বমকাবে কে জানে, বুঝতে পারল না অনীতা। বেচারা চুপ্‌সে গেল। ঘুণী ওধার থেকে উঠে এসে সতীর পাশে বসল;—জানো আমার হয়ে গেছে। দেবো গিয়ে জমা?

সতী চারিদিকে একবারক চোখ বুলিয়ে নেয়;—সর্বনাশ! কক্ষনো না! একেবারে 'ইলেভেন্থ মোমেন্ট' পর্যন্ত চেপে বসে থাক। বলবে, কিছু হয়নি, সবই বাকী।

—তাহলে এগুলোই নাড়াচাড়া করি? কি বল?

—হাঁ, হাঁ। চুপ! বড়দির ভাইঝি তাকাচ্ছে এদিকে।

বড়দির ভাইঝি জবা সত্যিই তাকাচ্ছিল। চোখো-চোখি হতেই হাতের কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে নিরুচ্ছ্বাস পরিবেশটাকে চুরমার করে দেয়; আর পারিনে বাবা ভণ্ডামি করতে! দেখা জিনিষ বারে বারে কত দেখব! খাতা গছাবে তো গছাবে। মুখ বন্ধ করে থেকে হাঁফ ধরে গেল।

ইভা ফোড়ং কাটলে;—আহা নেকু আর কি! শিলী আপনাকে বাড়তি খাতা চাপাবে কি না, চাপাবে, জানেন না বুঝি?

জবা নাকিসুরে কাঁই কাঁই করে উঠল :—আমার পিসী হেড বলে কি আমি সব জানি নাকি! সব তাতেই তোমরা আমার পিছনে লাগ!

শুভা চুক চুক করে ওঠে :—আহা জবাদি নাকে কাঁদলে তোমাকে কি মানায় মাইরী, গ্রাণ্ড! কর্তাটি থাকলে আদর পেতেন কিন্তু এখানে শুধু খাতা আর প্রগ্রেস রিপোর্ট।

—জীবন বরঝরে করলে বাবা; চার চারজনে ছুটি নিয়ে বসলে: প্রবীণা রমাদি একদাদা খাতা বগলে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকলেন :—বল দেখি, আজ হোল গিয়ে উনিশ তারিখ, এখুনি রেজাল্ট বেরুবে, এখন তিন চারে বারোশো খাতা স্ক্রিসট্রিবিউটই হয়নি। দেখ, কার কার ঘাড়ে চাপে!

আমুদে শুভা জবাকে ছেড়ে রমাদিকে নিয়ে পড়ল। বলল ফস করে :—আপনারা প্রবীণার দল আছেন বলেই আমরা ভরসা পাই। কতকালের অভ্যাস, খচাখচ্ দেখে ফেলবেন।

—কি! আমার এই হাতে ব্যথা নিয়ে কত কষ্ট তা জানো?

—কিন্তু দিদি, আমাদের এই খাতার পাল্লায় পড়ে আড্ডা, গল্প, সিনেমা, সব বাদ দিয়ে কত কষ্ট তা আপনি জানেন?

সবাই এবার একসঙ্গে হেসে উঠ্‌ল।

—যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্মা, খাতা দেখা হোক আর না হোক, শমন আসছে। ফট্ ফট্ করে চটির শব্দ তুলে রেখা এসে সোজা দাঁড়াল স্টাফ রুমের টেবিলের সামনে। বগলে তার এক বিশাল বাণ্ডিল: এই দেখো, পাক্কা দুশো। পঁচিশ খানা নবীন সংযোজন!

হাসিটা এক ধমকায় থেমে যায়। সবারই চোখে অফুরন্ত বিস্ময়। আতঙ্কে খিরখির করছে চোখের মণি। অর্থাৎ জানার ইচ্ছা, কোন্ নিয়মের বশে রেখার ঘাড়ে আবার খাতা চাপল। নিজেদের নিরাপত্তা যাচাই করার জন্য এ সংবাদের বিশেষ প্রয়োজন।

মলিনী তার ক্ষীণ স্বিইশ্বরে বলে :—কেন ভাই কত খাতা পেয়েছিলে তুমি?

—ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান—অল টকুয়েল। মো পার্সিয়ালিটি।

—তবে, তবে তোমার ফের চাপল কেন?

—সারা বছর পিছু পড়ে পড়ে পেনাল্টি কিক করতে শেখাম। দেখি আজ মার্কস্ জমা দেবার কথা আছে—অথচ কেউই দেয়নি এখনও। বড়দি একেবারে বাইসনের মত তেরিয়া হয়ে বসে আছেন। সাতদিন ছুটি কাটিয়ে এসেছেন তো—নিজের জন্য নাকি পাত্র দেখতে গিয়েছিলেন……

প্রবীণা রমাদি ককিয়ে উঠলেন :—না না নিজের নয়, বোনের…

—অল টকুয়েল, রেখা হাত নেড়ে বলে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকো আর মাছ দিয়ে শাক ঢাকা দাও—জিনিষ একই…

জবাকে ঠেলে দেয় শুভা: দেখেছো, নিজের বিয়ে হয়নি বলে রমাদির হিংসেটা!

—সব জানি, তোমরা দেখো।

—দেখা, প্রিজ কনটিনিউ…

—ইয়েস, পড়ছি তো পড় সেই তিরিক্ষি মেজাজের সামনে। এই কাটে তো সেই মারে, "দেখেছো কাণ্ড, কারও মার্কস্ জমা দেবার নাম নেই, কি করে রেজাল্ট বেরোয় বলতো?" বাহাদুরী দেখাতে গেলাম, আমার হয়ে গেছে বড়দি—এই নিন। ব্যস কৃতার্থ বড়দি, পুলকিত বড়দি, আমার প্রতি অসীম করুণাবশে

পাশের র‍্যাক থেকে এই বাণ্ডিল দিয়ে বললেন, পরশু চাই। যা বাবা! দেখি এবে ইংরাজী—ভালোই হোল, বড়দি নিজে আই হ্যাস, ইউ ইজ লেখেন, আমার আর ভয় কি!

শুভা মুখিয়ে উঠ্‌ল :—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, ধর ছেলেকে দে মাটি!

রেখা ঘুরে দাঁড়াল :—অর্থাৎ?

—খাতুন দিদিমণি, আপনাকে বড়দি : খি এসে দাঁড়ায়।

—খ্রি চিয়ার্স কর খাতুনদি। খ্রি চিয়ার্স কর বেড়ালো খাতা : শুভা চেঁচায়।

কেউ হাসে, কেউ আড়চোখে তাকায়, কেউ গোমড়া মুখে রগ দুটো টিপে ধরে। সমাজ বিপ্লবী লীলাদি কেবল অগ্নিবর্ষী চোখ মেলে চেয়ে রইলো দরজার পানে। তাকে একবার বলুক খাতা নিতে তারপর সে দেখবে। সেই প্রতীক্ষাই সে করছে। নন্দিতাদি এ্যাসিসটেন্ট হেড। বোধ হয় বড়দির ঠেলায় তাগাদায় এলেন এতক্ষণ পর :—কি, তোমাদের সব ব্যাপার কি বলতো? কেউ কি নম্বর দেবে না?

কোনো জবাব মিলল না। যেন শোনেইনি কেউ।

—কিগো মেয়েরা, এতদিন কি ঘাস কাটছিলে?

মুখরা শুভাই জবাব দেবার সাহস রাখে। বলে :—নিশ্চয়ই। ছাগলের ঘাস, গোরুর ঘাস, নিজের ঘাস। বর বেচারা পর্যন্ত হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে অফিসে যাচ্ছে, ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। আপনাদের এই খাতার জন্ত বেচারা একঘরে।

বরের প্রসঙ্গে নন্দিতাদি গম্ভীর হয়ে যান চিরকালই। পুরুষ জাতটাকে তিনি সইতে পারেন না। বললেন :—তোমার একটু সিরিয়স হওয়া উচিত শুভা!

রেখা চিমটি কাটে রেণুকে :—ইস্ দিদির কী নিষ্ঠা!

নন্দিতাদি উঠে গেলেন। রেখা আবার বলে :—জানো সেই গল্পটা, জানো, দিদির কী নিষ্ঠা?

—না ভাই।

—আচ্ছা বলবখন…

খাতুনদি হাসিমুখে ফিরে আসে :—যাক বাবা বাঁচা গেল। নিষ্ঠাভরে বোজা করছি তার তো একটা ফল আছে!

রেখা এবার হেঁকে উঠল :—উঃ দিদির কী নিষ্ঠা!

খাতুনদি হাসি হাসি মুখে চোখ পাকায় :—এই ভালো হবে না বলছি!

বোঝা গেল গল্পটা তারও জানা আছে। শুভা চোখ নাচাতে নাচতে হাসতে লাগল :—সত্যি মাইরী বেড়ে গল্পোটা।

যারা জানে না, তারা চোখ তোলে গল্পের গন্ধে :—কি বলনা?

রেখা রুমাল চাপা দেয় মুখে :—ছি শুভা, ছিঃ! নন্দিতাদি তোমাকে সিরিয়স হতে বলে গেলেন না! কি হচ্ছে কি?

শুভাকে থামায় কে! অকুতোভয়ে দুলাইনের গল্পটা শেষ করে হেঁকে উঠল :—উঃ দিদির কী নিষ্ঠা!

হাসির তুফান উঠ্‌ল। প্রবীণা রামাদি পর্যন্ত হেসে ফেললেন :—শুভা তুমি বহুকাল আগে আমাদের ছাত্রী ছিলে তা বুঝি ভুলে গেছো! নাঃ এখানে আর কাজ করা যাবে না· তিনি পাতাড়ি গুটিয়ে উঠলেন অন্ত ঘরের সন্ধানে। কেবল বিপ্লবী লীলাদি আগুনঝরা চোখে শুভাকে লক্ষ্য করে ঠোঁট কামড়ে বসে রইলেন নীরবে।

রমাদি বেরিয়ে যেতেই শুভা মন্তব্য করলে : বাঁচলাম বাবা। বুড়ি-হাবড়িরা সামনে থাকলেই যত বিপদ! এখানে কি বাবা। বড়দির কাছে ঘুঘুর ঘুঘুর করলেই পারে।

আবার উইংসের পাশ দিয়ে মহাকাল দূতের প্রবেশ। নিস্পৃহভাবে বললে :—মণিদিদি ডাকছেন!

—চিন্তার আপ মণিদি. আমি বলেছিলাম কপালে আপনার খাতা নাচছে।

হিংসুটে মণিদীপা চোখ দিয়ে ছোবল দিতে চাইল শুভাকে। শুভা খর খর করে উঠল :—আহাতা মরে যাই! আপনারা পরীক্ষা দেবার নামে মজা লুটবেন। আর আমরা খাতা দেখে মরব। ঐ অছিলায় মাত্র এক বান্ডিল খাতা ম্যানেজ করে ছিলেন, এদিকে ইনভারসিটির ডামাডোলে পরীক্ষা হোলই না, তাহলে খাতা দেবেন না! যান, যান, আহা যান না বড়দির নেকনজরের লোক আপনি!

মণিদীপা ভয়ানক একটা উদ্ধতভঙ্গীতে উঠে গেল। তাপসী গজগজ করে উঠল :—শুভা, তুমি বাবা আর কাউকে কাজ করতে দেবে না। সবাইই পিছনে লাগছ! বলি ব্যাপারটা কি! বেচারাকে ধাপিয়ে দিলে তো?

—রাগে কেন? খাতা নেয় না কেন?

—আহাহা, খাতা নেয় না কেন? ভেংচিয়ে ওঠে বেবু : পায়ে পড়ে খাতা নেবে নাকি, তোমাকে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে টিট করা উচিত ছিল।

শুভা বাঁ হাতে নিজের ঠোঁট দুটো টিপে ধরেছে। হাসবে না, কথাও বলবে না। কিন্তু ওর বাঁকা মুখ দেখে সবাই ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। নতুন বিয়ে করেছে রেবতী। সে বেচারা চোরের মত ভয়ে ভয়ে থাকে। তার কোনো কথা বলাই বিপদ। অবা বলে :—রেবু কত বাকী তোমার?

—দর, ধ-ব! কি করে যে আপনারা খাতা দেখলেন ভাই, বুঝি না!

শুভা ঠোঁট ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল :—কিবরে বেপি জান? যেদিন থেকে বাড়ীতে খাতা গেল, সেদিন থেকে একেবারে আলাদা বিছানা, আলাদা ঘর।

রেবতী অদ্ভুতভাবে তাকায় :—তাই বুঝি?

—হাঁ তাই না তো কি? তুমি কি উল্টো কাজ করছো নাকি? এই মরেছে! তোমার এ জন্মেও খাতা দেখা শেষ হবে না। হবে না, হবে না, বলে দিলাম।

—আহে না, না রেবু অত কাঁচা মেয়ে নয়। কাল ওর বর জানলার ধারে বসে খাতা দেখছিল নিজে দেখেছি : অনীতা ফাঁস করে দেয়।

রেবতী আমতা আমতা করে :—টোটেলটা শুধু!

—বাস্ বাস্ রেবু, তুমি মানুষ হয়ে গেছ। শুভা বলে :—আমি তো ভাই নম্বর বসিয়েই খালাস, কর্তা টোটেল দেয়, মেলায়, মার্কশীটে তোলে। কত ঝোসামুদি। যাও না আলাদা ঘরে, দেখবে বলতে হবে না, আপ বাড়িয়ে সব করবে।

সতী এবার পেনসিল ছুঁড়ে মুখ তুলে তাকায় :—ছিঃ ছিঃ শুভা, মিষ্টার রেবুর কপালে ভেতুল গুলছ শুধু শুধু।

—শুধু ভেতুল, আমের আচার গুলব

হঠাৎ শুভার যেন হুঁশ হয়। মণিদীপার প্রসঙ্গটা অনেকদূরে চলে গেছে যেন। হারানো খেইটা

ধরবার চেষ্টা করে :—অয়ি পুরোবর্ত্তিনী, তুমি কি কহিতে পারো মণিদীপা, কোন্ শ্রেণীকক্ষের দ্বারপ্রান্তে ?

—পারি হলা সখি, পারি। আর্য্যা মণিদীপা অষ্টম শ্রেণীকক্ষে মহামাণ্ডলিকা।

শুভা হাত তুলে খৈই খেই করে নাচতে লাগল :—এই মরেছে! এইটের প্রগ্রেস কার্ড যখন জয়ন্তীদি করেছেন তখন নির্ঘাত মণিদি মরেছে, যাই দেখে আসি মুখখানা।

বাড়ীতে যার তিন তিনটি বাচ্চা সেই শুভা নিজেই ছোট বাচ্চা মেয়ে তিড়বিড়িয়ে ছুটল মজা দেখতে। তার পর মুহূর্তেই কচি ছাগলের মত লাফাতে লাফাতে স্টাফরুমে এসে ঢুকল :—কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে—শুধু মুখখনা দেখো তোমরা হি··হি··। হাসি চাপতে চাপতে চোখে জল এসে গেল শুভার। তাড়াতাড়ি কলের দিকে এগিয়ে যায় সে।

করুণ মুখে বগলে একগাদা খাতা নিয়ে মণিদীপা ফিরে এলো। কারো পানে তাকায় না সে। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল জয়ন্তীদির পাশে :—যদ্দি বললেন, আপনি যখন রেজাল্ট তৈরী করছেন, তখন আমাকে খাতা দেখতে হবে। আমিই না হয় রেজাল্টটা করি, আপনি··।

জয়ন্তী ফুঁসে উঠ্‌ল :—খাতা দেখা বা রেজাল্ট করা কোনোটাই আমার করণীয় নয়।

—তবু তো করছেন। নাকি সুর টানতে থাকে মণিদীপা।

--না না যা করছো তাই করগে, আমার সময় নেই, বিস্তর কাজ আছে জানো! আমি সংসারী লোক। ছেলে আছে, মেয়েছানী আছে। তোমার মত আই-ফুল-ফুল করে বেড়ালে চলবে!

—আমি আই ফুল-ফুল করে বেড়াই ?

—জানিনে যাও!

খাতা বগলে রমাদি ঘরজার বাইরে থেকে বলেন :—তোমরা এসো এবার সবাই মার্কস জমা দেবে। বাড়তি খাতা ডিসট্রিবিউট হয়ে গেছে। খচর খচরে আর কাজ নেই। চলো। বাবাঃ! ভয়ে মরছিলাম!

—এঁ্যা রমাদি, আপনিও আমাদের দলে!

তুমুল কলরোল উঠ্‌ল আর চক্ষের পলকে সবার অসমাপ্ত কাজ যেন শেষ হয়ে টেবিল সাফ্, ঘর। শুধু চড়োহড়ি।

আটশো মিটার রেস।

যড়দি ফিতে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

কেবল মণিদীপা আর জয়ন্তী ভাঁকা স্টাফ রুমে রৌদ্র-করুণরসের মন্দাকিনী ধারা বহাতে লাগল তখনও।

(গত সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

শেষাংশ

পূর্বকথা : এক ষড়যন্ত্রকারী দলের কবলে পড়ে বরেন হালদার নামে একজন যুবক খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে পাতিপুকুর থানায় আটক আছে। খুন হয়েছেন পাতিপুকুরের ধনাঢ্য নাগরিক ঈশান মজুমদার। ঈশান মজুমদার যে ঘরে যে সময়ে খুন হন, সেই ঘরে সেই সময়ে বরেন ঢুকেছিল তাঁকে একখানি চিঠি দেবার জন্যে। সেই সময় ঈশান বাবুর সেক্রেটারী যতীশ সমাদ্দার তাকে ধরে ফেলে। বরেন যদিও বলছে যে সে নির্দোষ, কিন্তু তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঈশানবাবু সাহেবি কেতায় বাস করতেন। শীতের দিনের জন্যে তাঁর ঘরে আগুন জ্বালাবার চুল্লী দেওয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। সেই চুল্লীতে আগুন জ্বেলে তিনি শীতকালের সেই রাত্রে সেই ঘরে বসে যখন বই পড়ছিলেন, তখন তাঁকে খুন করা হয়। চুল্লীর জ্বলন্ত কাঠ খোঁচাবার জন্যে যে ধারালো লম্বা লোহার শিক ব্যবহার করা হয় সেই শিক দিয়ে ঈশানবাবুকে খুন করা হয় এবং সেই শিকের গায়ে বরেনের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। পুলিশ বরেনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

করুনজা রায়কত কোম্পানী নামে এক এটর্নীর আপিসের লেডী টাইপিস্ট মিস মিনতি রায়। তার সঙ্গে বরেনের বহুদিনের ঘনিষ্ঠতা। বরেনের কোন কাজকর্ম ছিল না। বেকার বলে সে অত্যন্ত মনোকষ্ট ভোগ করছিল। তাই সে স্থির করেছিল যে যতদিন পর্যন্ত না সে ভালভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, ততদিন মিনতির কাছে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করবেনা। মিনতি তা জানত এবং সে অপেক্ষা করছিল। বরেনের বিপদের কথা শুনে সে তাকে উদ্ধার করবার জন্যে কলকাতার বিখ্যাত গোয়েন্দা ও অপরাধতত্ত্ববিদ্ রণদেব ঘোষালের শরণাপন্ন হল। এবং রণদেব তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহকারী ছোটাই মল্লিককে নিয়ে তদন্তে নিযুক্ত হল।

কাঁসুলিয়া টোলা অঞ্চলে বাস করত নরেশ মাইতি। সে আগে ছিল পুলিশ ইনফরমার। এখন সে-কাজ করেনা। তারই পাড়ায় থাকত শীতলপ্রসাদ নামে এক বিড়িওয়ালা। হঠাৎ একদিন তার ঘরের সামনে এক মোটরওয়ালা বাবুর সঙ্গে শীতল প্রসাদের গোপন পরামর্শ আঁড়ি পেতে শুনল নরেশ। এবং তারপর

ব্যাপারটা জানবার জন্যে এবং সেই জানাকে কাজে লাগিয়ে টাকা রোজগার করবার জন্যে নরেশ সেদিন সেই শীতের রাত্রে ঈশানবাবুর বাড়িতে হাজির হল এবং পাঁচিল-লাগানো জানলার বাইরে থেকে ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করল। কিন্তু কোন কাজ হল না। অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নরেশ খুন হল।

রণদেব বিমূঢ়। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে অথচ হত্যারহস্যের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে সে জেনেছে নিহত ঈশানবাবুর উইল মতে করনজা রায়কত কোম্পানীর একমাত্র মালিক কৃপানাথ করনজার কাছে। তাই সে কৃপানাথের সঙ্গে দেখা করবে স্থির করেছে।

মৃত ঈশানবাবুর বাড়িতে থাকে তাঁর একমাত্র মেয়ে আহুতি, আর সেক্রেটারী যতীশ সমাদ্দার। তাছাড়া খানসামা, মালী, দাসদাসী। ঈশানবাবুর এক ভাগ্নে আছে, তার নাম নিশীথ। নিশীথ সেই হত্যার রাত্রে ঈশানবাবুর বাড়িতে এসেছিল এবং খাওয়া দাওয়ার পর চলে গিছল। আর এক ভাগ্নের নাম অসিত। ঈশানবাবুর মেয়ের কাছে রণদেব জেনেছে, অসিতের প্রতি ঈশানবাবু অত্যন্ত বিমুখ ছিলেন। অসিত বদ সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে গিছল এবং মাঝে মাঝে ঈশানবাবুর কাছে এসে টাকা চাইত। কিছুদিন আগে ঈশানবাবু তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে অসিত আর আসেনি। কিন্তু সে ঈশানবাবুর কাছ থেকে মাসোহারা পেত। সে মাসোহারা দিতেন তাঁর এটর্নী কৃপানাথ। আহুতি অসিতের ঠিকানা বলতে পারেনি। কিন্তু কৃপানাথ অবশ্যই তাঁর ঠিকানা জানেন। তাই রণদেব কৃপানাথের সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রস্তুত হল। অসিতের সন্ধান করা দরকার।

আহুতির কাছ থেকে আর একটি খবর রণদেব জেনেছিল। বিদেশে যখন আহুতির মা মারা যায়, তখন আহুতি ছিল নিতান্ত শিশু। সেই শিশুকন্যাকে নিয়ে ঈশানবাবু দেশে ফেরেন এবং পাতিপুকুরে বাস করতে থাকেন। ছোট বেলায় আহুতি এক ধাত্রীর কাছে মানুষ হয়েছিল। তার নাম ক্ষিরোদাবালা। ক্ষিরোদাবালা পাতিপুকুরের কাছাকাছি থাকে এবং মাঝে মাঝে আহুতির সঙ্গে দেখা করতে আসে।

পাতিপুকুর থানার বংশী দারোগা এবং হেডকোয়ার্টারের ডিটেকটিভ ইনসপেক্টার কবীর দুজনেই রণদেবের বিশেষ পরিচিত। এবং এই তদন্তের ব্যাপারে তারা রণদেবকে সাহায্য করছে। রণদেব কিছুদিন হল সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে। তাই তার এই তদন্ত বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত। তাহলেও তার এই সব তদন্তে সে বরাবরই পুলিশের সহায়তা পায়।

॥ দশ ॥

পরেশ মাইতিকে গুলি করে মারা হয়েছে। ট্যাকসির মালিকের সন্ধান পেতে দেরী হল না। জানা গেল, সন্ধ্যার সময় সে যখন গাড়িটা গ্যারেজের সামনে রেখে খাবার জন্যে কাছাকাছি একটা হোটেলে ঢুকেছিল, সেই সময় তার গাড়িটা চুরী যায় আর সঙ্গে সঙ্গে সে থানায় খবর দেয়।

রণদেব যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করতে লাগল। নরেশকে খুন করা হল কি উদ্দেশ্যে? কারা বা কে এই কাজ করল? অনেক চিন্তা করেও সে কোন সন্তোষজনক সূত্র নিজের মনে খুঁজে পেল না।

পরদিন সকালে সে উপস্থিত হল হেস্টিংস স্ট্রীটে করনজা রায়কত কোম্পানীর আপিসে। কৃপানাথ করনজা তখনো আসেন নি। রণদেব মিনতির কাছে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

দু'চার কথার পর রণদেব প্রশ্ন করল - আচ্ছা, মিনতি, তোমাদের এই কার্মই যে ঈশান মজুমদারের এটর্নী, তা কি তুমি জানতে না?

মাথা নেড়ে মিনতি জবাব দিলে—না। কর্তার এমন দু'চারজন মক্কেল আছেন যাঁদের কাগজপত্র তিনি নিজের কাছে রাখেন। তাই তাঁদের খবর আমরা জানতে পারিনা। মিঃ মজুমদার বোধ হয় সেই রকম একজন মক্কেল ছিলেন।

বেহারা এসে জানাল, কৃপানাথবাবু আপিসে এসেছেন। রণদেব তার হাত দিয়ে নিজের কার্ড পাঠিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক এলো।

—আসুন, মিঃ ঘোষাল।

রণদেব ঠেলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই কৃপানাথ বললেন—বসুন। আপনি কি জন্যে আমার কাছে এসেছেন, তা আমি কতকটা অনুমান করতে পারছি।

রণদেব সংক্ষেপে বললে—যেট মিঃ মজুমদারের বিষয়ে আমি আপনার কাছ থেকে কিছু খবর চাই।

কৃপানাথ বললেন - বুঝেছি। কিন্তু আমি তো আমার মক্কেলদের সম্বন্ধে বাইরের কোন লোকের সঙ্গে কোন আলোচনা করি না। আমায় মাপ করতে হবে।

ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে রণদেব বললে—কিন্তু আপনার মক্কেল সাধারণভাবে মারা পড়েন নি। তিনি খুন হয়েছেন এবং রহস্য অত্যন্ত জটিল বলে মনে হচ্ছে। সেই কারণেই পুলিশের তরফ থেকে তদন্ত করা হচ্ছে।

মাথা নেড়ে কৃপানাথ বললেন—তা আমি জানি। আর আমি এও জানি, যে লোকটা খুন করেছে সে ধরা পড়েছে।

রণদেব বুঝল, এবার শক্ত লোকের সঙ্গে তার পালা। বললে—আপনি যা জেনেছেন তা ভুলও হতে পারে, অর্থাৎ খুনের দায়ে যে ধরা পড়েছে সে প্রকৃত অপরাধী নাও হতে পারে। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আসল রহস্য এখনো হয়ত জানা যায়নি।

—তাই নাকি! আমার কাছে এ একটা নতুন খবর বটে। তা, আমাকে কি করতে হবে?

কৃপানাথের কথা শুনে মনে মনে হেসে রণদেব বললে—করতে হবে না কিছুই। আমি শুনেছি, ঈশানবাবু উইল করে গেছেন এবং সেই উইল আপনিই করেছেন। সেই উইলের মর্ম জানতে চাই।

—আপনার জানবার অধিকার?

—সে তো আমার ভিজিটিং কার্ডের ওপর স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছি।

সামনে রাখা কার্ডটির উপর চোখ বুলিয়ে কৃপানাথ বললেন—উইলের মর্ম শিগগিরই আদালতে প্রকাশ করতে হবে। তাই এখন বলতে বাধা নেই। কয়েকজন পুরণো চাকরদাসী আর দু' তিনজন গোত্র আত্মীয়দের কিছু কিছু দান করা ছাড়া তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পাবে তাঁর একমাত্র সন্তান, কন্যা আহুতি। নগদে এবং জমিজমায় সম্পত্তির ভ্যালুয়েশন হবে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

টাকার অঙ্ক শুনে রণদেবের মুখ দিয়ে আপনা আপনি বেরুলো—এত টাকা! ঈশান বাবু এত বিরাট ধনী ছিলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

রণদেব বললে—গোত্র আর চাকরদাসী যারা টাকা পাবে তাদের নামধাম উইলে আছে নিশ্চয়ই।

কৃপানাথ বললেন—তা তো আছেই। এই যেমন, আমার নামে দিয়ে গেছেন, পাঁচ হাজার টাকা,

পুরণো খানসামা গোমেশ বহুদিন তাঁর কাছে আছে, সে পেয়েছে দু'হাজার টাকা। দুই ভাগে, নিশীথ রায় আর অসিত রায়, দু'জনে পেয়েছে, পাঁচ পাঁচ হাজার। তাঁর সেক্রেটারী যতীন সমাদ্দার পেয়েছে তিন হাজার। এইভাবে মোটর ড্রাইভার, দু'জন চাকর, একজন ঝি—সবশুদ্ধ মিলে হাজার পঁচিশেক টাকা তিনি দান করেছেন।

একটু ভেবে নিয়ে রণদেব বললে—উপেনবাবুর যে ভাগ্নের নাম অসিত রায় তার ঠিকানা আপনার জানা আছে নিশ্চয়?

—হঠাৎ তার ঠিকানা কেন? তাকে কি কোনরকম সন্দেহ···

মৃদু হেসে রণদেব বললে—এসব ব্যাপারে কাকে যে সন্দেহ করি আর কাকে যে করি না, তা আমরা অনেক সময় নিজেরাই বুঝতে পারি না।

তার মন্তব্য শুনে কৃপানাথ আর কোন কথা না বলে দেরাজ থেকে ছোট একটি ডায়েরী বার করে তার পাতা উল্টে দেখে নিয়ে বললেন—অসিতের ঠিকানা হল বেহালা, হরিসভা রোড, ১০৪ নম্বর।

—ধন্যবাদ! আর একটা কথা···

রণদেবের বক্তব্য শেষ হবার আগেই হঠাৎ দরজার বাইরে নারীকণ্ঠের তীব্র কাংস কণ্ঠ শোনা গেল। কৃপানাথ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন। রণদেব শুনতে পেল কে যেন উত্তেজিত ভাবে বলছে—সরে যাও আমার সামনে থেকে। ঘরে যে-ই থাক, আমি ঢুকবো। তোমার কথায় আমি ভড়কাবো ভেবেছো! তুমি যে কে তাতো জানতে আমার বাকি নেই। ফাঁসীকাঠে ঝোলা বাপের মেয়ে তুমি। সরে যাও···

মিনতির স্বর শোনা গেল—উনি এখন ব্যস্ত আছেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন··

—না, না, অপেক্ষা টপেক্ষা নয়। আমি এখুনি যাব। বলতে বলতে একজন লম্বা চওড়া জোয়ান স্ত্রীলোক যেন ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকল।

আর, রণদেব দেখলো, স্ত্রীলোকটিকে দেখেই কৃপানাথের চোখ মুখ বিবর্ণ শংকাতুর হয়ে উঠল।

॥ এগারো ॥

হাতে একটা শতছিন্ন লেডিজ ছাতা, চওড়া পাড় শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়ানো, মুখময় মেছেতার দাগ, কাঁধকাটা একটা ব্লাউজ আর হিল উঁচু জুতো পরে যে রমণী ঘরে ঢুকল, তাকে এক নজর দেখেই রণদেব বুঝলো, এ স্ত্রীলোক সহজ সাধারণ নয়। তার সেই রণ-দেহি মূর্তির সামনে এটর্নী কৃপানাথ করনজা যেন বলির পাঁঠার মতো কেঁপে কুঁচকে এতটুকু হয়ে গেছেন।

ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে ভাঙা গলায় স্ত্রীলোকটি বললে—তোমার ওই মেয়েটা আমার পথ আটকাচ্ছে। কী আস্পর্দা! এ লোকটা আবার কে? আঁ্যা। একে এখন ভাগিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় এটর্নী বললেন—তুমি এখন কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা কর। এঁর সঙ্গে আমার দরকারী কথা এখনো শেষ হয়নি।

কালো ঠোঁট উল্টে বিকৃত কণ্ঠে রমণী বলে উঠল—হ্যাঁ। ভারী তো দরকারী কথা। রাখো তোমার কথা…

সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কৃপানাথ তাড়াতাড়ি তেপায় থেকে উঠে তার কাছে গিয়ে, রণদেব শুনতে না পায় সেইরকম নীচু গলায়, স্ত্রীলোকটিকে কি যেন ফিসফিস করে বললেন। শোনামাত্র রমণীর ভাবভাব বদলে গেল। চকিত নেত্রে রণদেবের দিকে একবার তাকিয়ে কুণ্ঠিতস্বরে বললে—

—আমি জানতুম না যে আপনারা কাজের কথায় ব্যস্ত। আচ্ছা, আমি বাইরে গিয়ে বসছি।

মাথা নীচু করে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ রণদেব কি ভেবে বললে—না, না। আপনি থাকুন। আমার কথা শেষ হয়েছে। মিঃ কবলজা, আমি বরং এখন চলি। দরকার হলে আবার আসবো।

কৃপানাথ যেন বেঁচে গেলেন। রমণী ঘরের মধ্যেই রইল। রণদেবকে বার-দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্যে কৃপানাথ তার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। বিদায় নেবার আগে হঠাৎ রণদেব প্রশ্ন করল—স্ত্রীলোকটির নাম কি যেন বললেন, মিঃ কবলজা?

কৃপানাথ চোঁক গিললেন—ওর নাম…

—হ্যাঁ, কি যেন নাম?

কৃপানাথ উত্তর দিলেন—ফিরোজাবালা।

ভুরু কুঁচকে রণদেব বললে—ফিরোজাবালা! ইনিই কি একসময়ে ঈশানবাবুর মেয়ের নার্স ছিলেন?

—হ্যাঁ।

রণদেব আর কোন কথা না বলে নমস্কার করে কৃপানাথের কাছে বিদায় নিল।

ফিরোজাবালা এস্টনীর কাছে এলো কেন, এবং ওই রকম উদ্ভ্রান্তভাবে কথাই বা বললে কোন্ সুবাদে? তার সঙ্গে কি এই রহস্যের কোন সম্বন্ধ আছে?

ভাবতে ভাবতে রণদেব নিজের মোটরে গিয়ে উঠল।

• • •

সেই দিনই সন্ধ্যার কিছুর পরেই সে অসিত রায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেহালায় গিয়ে হাজির হল।

হরিসভা রোড আর বাড়ীর নম্বর খুঁজে নিয়ে সে সোজা দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজা খুলে গেল। এই কী অসিত রায়ের ঘর? কোন সাড়া নেই। কোথায় অসিত? ঘর শূন্য। জিনিষপত্র লণ্ড-ভণ্ড। বন্ধ ঘরের রুদ্ধ বাতাসে ক্লোরোফর্মের গন্ধ তখনো মিলিয়ে যায়নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পল্লীর আশেপাশে ঘণ্টা খানেক অনুসন্ধানের পর রণদেব জানল, সন্ধ্যার ঠিক পরেই, অর্থাৎ তার এখানে আসার কিছুক্ষণ আগেই অসিত রায়ের ঘর থেকে জন তিনেক লোক একটি মানুষকে ধরাধরি করে একটা মজুরদের কিরাট গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে গেছে।

॥ বারো ॥

পরদিন আর একটা খুনের খবর পাওয়া গেল।

ইলপেক্টার কবীর রণদেবকে জানাল, পাতিপুকুরের কাছে বস্তবাগানের এক বস্তীর একটা পাকা ঘরের মধ্যে একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোককে মৃতঅবস্থায় পাওয়া গেছে। তার নাম জানা গেছে ফিরোজাবালা।

খবরটা শুনে রীতিমত চমকে উঠল রণদেব। ঘটনাটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। সে স্থির করেছিল, অবিলম্বেই সে ফিরোজাবালার সঙ্গে দেখা করে ঈশান মজুমদারের আগেকার জীবনের কথা জানবার চেষ্টা করবে।

একটা বিষয় যা রণদেবকে ভাবিয়ে তুলেছিল তা এই যে, এই রহস্যময় তদন্তে লিপ্ত হবার পর থেকেই সে লক্ষ্য করছে, যখনই কোন সূত্র ধরে সে এগোতে চায়, ঠিক তখনই বিপক্ষ পক্ষ তা পণ্ড করে দেয়। তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, নরমেধ যজ্ঞের লোকেরা তার গতিবিধির উপর সব সময় নজর রাখছে।

প্রথমে ঈশান মজুমদার, তারপর নরেশ মাইতি, এখন ফিরোজবালা। এদিকে আবার অমিত রায় গুম্। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ব্যাপারগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য। কিন্তু রণদেবের বিশ্বাস সেগুলো একই সূত্রে গাঁথা। কিন্তু কারা এর পিছনে আছে, কীই বা তাদের উদ্দেশ্য—তার কোন ধারণাই সে করতে পারছে না এখনো।

ছোটাইকে সঙ্গে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রণদেব হস্তবাগানে গিয়ে উপস্থিত হল। স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছিল। বংশী হালোপাও হাজির। রণদেবকে দেখে বললে—আসুন মিঃ ঘোষাল। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। গলা টিপে স্ত্রীলোকটিকে মারা হয়েছে। এই মেয়েলোকটিই এক সময় ঈশান মজুমদারের মেয়ের নার্স ছিল।

—ঘর খানাতল্লাসী হয়েছে নাকি?

রণদেবের প্রশ্নের উত্তরে বংশী বললে—না, কবীর সাহেব বলে দিয়েছেন, আপনি এলে হবে।

রণদেব আর কোন কথা না বলে লাশ চালান দেবার অনুমতি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ছোট একতলা বাড়ী। পাশাপাশি দুখানি ছোট ছোট ঘর। একটাতে হাঁড়িকুড়ি, বাসনপত্র, উনুন প্রভৃতি। পাশের ঘরে নীচু তক্তার বিছানা। আশেপাশে ছোটখাটো সস্তা দামের আসবাব। এককোণে জলচৌকির ওপর একটা টিনের তোরঙ্গ। রণদেব চারিদিক দেখতে লাগল। তারপর তোরঙ্গটা খুলে ফেলল। সেটার ভিতর তল্লাসী করে দেখা গেল, স্ত্রীলোকটিকে যত অশিক্ষিত বা অভব্য ভাবা গিয়েছিল, তা সে ছিল না। একটা হিসাবের খাতা, কয়েকখানা চিঠি এবং সামান্য কাগজপত্র দেখে বোঝা গেল, ফিরোজাবালা অল্পবিস্তর ইংরেজি এবং বাংলা লেখাপড়া জানতো। একটুকরো ন্যাকড়া বাঁধা পুঁটলি থেকে একতাড়া কাগজ বেরুলো। কয়েকটা বহুকালের পুরনো খবরের কাগজের কাটা টুকরো। রণদেব কৌতূহলী হয়ে দেখল, বিশবছর আগেকার এক নরহত্যার মামলার বিবরণ ছাপা কাগজ সব। শক্তিপদ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশী এক মুদীকে খুন করবার অপরাধে ফাঁসী যায়, তারই খবরটা সযত্নে রাখা হয়েছে।

রণদেব বিমূঢ় বোধ করল। তার পরমুহূর্তেই তার মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল·· কৃপানাথ করমজার আশিস···মিনতিকে লক্ষ্য করে ফিরোজা বলছে, ফাঁসীকাঠে ঝোলা বাপের মেয়ে তুমি··মিনতি···মিনতি কি এই শক্তিপদর মেয়ে? কিন্তু···তাই বা যদি হয় তাহলে তার সঙ্গে ফিরোজার কিসের সম্পর্ক?

খবরের কাগজের টুকরোগুলো দেখে বংশী বললে—ঘটনাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার এলাকাতেই বেশী রকম তদন্ত হয়েছিল। শক্তিপদকে আমি চিনতাম।

রণদেব উৎসুককণ্ঠে বললে—তাই নাকি! তার সংসারে কে ছিল? স্ত্রী? ছেলে মেয়ে?

মাথা নেড়ে বংশী বললে—স্ত্রী ছেলে মেয়ে ছিল কি না বলতে পারিনা। অন্তত কাউকে আমরা দেখিনি।

বংশী একটা লম্বা খাম হাতে নিয়েছিল, রণদেব বললে—ওর মধ্যে কি আছে ?

—দেখছি, বলে বংশী খামখানা খুলল, ভিতর থেকে বেরুলো একখানা ছোট সাইজের ফটোগ্রাফ। লম্বা চুলওলা টেরিকাটা এক ছোকরার ছবি। ছবির ধারে লেখা—'তোমারই শীতলপ্রসাদ।' ছবিটার পিছনে ইংরাজীতে লেখা—শীতলপ্রসাদ, ফুলবাগান, কম্বুলিয়াটোলা।

কাগজপত্র এবং ছবিখানা পকেটস্থ করে রণদেব বললে—এগুলো আমার কাছেই রইল। আশা করি এতে আপত্তি হবে না ?

বংশী বললে—আপনার কাছে থাকবে তাতে আর আপত্তি কি ?

॥ তেরো ॥

গোপনে গোপনে কলকাতা এবং শহরতলীর পুলিশ সেই সবুজরঙা ক্রিম্যাট গাড়ীখানার সন্ধান করতে লাগল, কিন্তু কোন ফল হল না। এদিকে অমিত রায়েরও কোন সন্ধান নেই। রণদেবের নির্দেশে ছোটাই আর একজন পুলিশ ইনফরমার রূপানাথের গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে। কিন্তু সন্দেহের কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত ব্যাপারটা যেন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যজালে আবদ্ধ হয়ে বুদ্ধির অগোচরে চাপা পড়ে গেছে।

হতবুদ্ধি রণদেব। ইনসপেক্টার কবীর হতাশ। একঘেয়ে পাহারা দিয়ে দিয়ে ছোটাই ক্লান্ত।

রণদেবকে আর এক সপ্তাহের সময় দেওয়া হয়েছে। তারপর বরেনকে বিচারের জন্যে চালান দেওয়া হবে। এই সাত দিনের মধ্যে রণদেব যদি এই রহস্যের মীমাংসা না করতে পারে তাহলে তার সুনামের গায়ে যে কালী লাগবে তা আর ইহজীবনে মুছবে না—এই চিন্তায় তার মাথা গরম হোয়ে উঠেছে।

সেদিন অনেকক্ষণ চিন্তার পর রণদেব স্থির করল, আজ সে দুজন লোকের সঙ্গে দেখা করবে। প্রথমে যাবে নিশীথের কাছে। তার কাছ থেকে আর কোন খবর পাওয়া যায় কিনা, দেখবে। তারপর যাবে পাতিপুকুরে ঈশানবাবুর মেয়ে আহুতির কাছে। তার সঙ্গে আর একবার ভাল করে আলাপ করতে হবে। কথায় কথায় জানতে হবে, ঈশানবাবুর আগেকার জীবনের অন্য কোন খবর পাওয়া যায় কিনা। রণদেবের স্থির বিশ্বাস, ঈশান মজুমদারের পূর্ব জীবনের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

সন্ধ্যা নাগাদ ছোটাইকে নিয়ে রণদেব নিশীথের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হল। জানা গেল, সে বাসায় নেই, বিকালে মামার বাড়ী অর্থাৎ পাতিপুকুরে গিয়েছে।

রণদেবের মোটর পাতিপুকুরের অভিমুখে ছুটল।

কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ধোঁয়াটে অন্ধকারে পথঘাট দেখা যায় না। বেলগাছিয়া পার হোয়ে রণদেব একটা শর্ট রাস্তা ধরল। বড় রাস্তাটা সারানো হচ্ছে বলে যানবাহন এই পথ দিয়েই যাতায়াত করছে। তাছাড়া এই পথ দিয়ে গেলে ঈশানবাবুর বাড়ী অল্প সময়ে পৌঁছোনো যায়।

খানিক দূর গিয়ে পথ দুদিকে বেঁকে গেছে। বাঁ দিকের রাস্তার শেষে ঈশানবাবুর বাড়ী। রণদেবের মোটর বাঁ দিকে ঘুরল। নিস্তব্ধ নির্জন পথ। গাড়ী ঘোড়া বা মানুষজনের চিহ্ন নেই। অন্ধকারে চারিদিক যেন থমথম করছে।

মিনিটখানেক···তারপরেই একটা শব্দ···সঙ্গে সঙ্গে মোটর হেলে পড়ল। রণদেব বলে উঠল—সামনের বাঁদিকের টায়ার ফাটল।

—টায়ার ফাটল! এই নির্জন রাস্তায়। বলতে বলতে ছোটাই দরজা খুলে চলন্ত গাড়ী থেকেই নেমে পড়ল। মোটরও সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল।

—সঙ্গে বাড়তি টায়ার নেই। মুস্কিল হল তো। রণদেবের কণ্ঠস্বর চিন্তাকুল।

টর্চ জেলে গাড়ীর ভাঙা চাকাটা পরীক্ষা করতে গিয়ে ছোটাই বলে উঠল—এ কী ব্যাপার!

—কি হে?

—নেমে এদিকটায় আসুন না।

রণদেব গাড়ী থেকে নেমে ছোটাইএর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পথের উপর টর্চের আলো ফেলে ছোটাই বললে—দেখুন।

দেখা গেল, মোটরের সামনে পিছনে আশেপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে আকীর্ণ হয়ে আছে ছোটবড় অসংখ্য কাঁচের টুকরো। টুকরোগুলোর আকার এমনি যে, তাদের সূচাগ্র ফলা ব্যর্থ হবার নয়, অর্থাৎ তাদের উপর দিয়ে যা যাবে তাকে তারা বিঁধবেই।

রণদেব বললে—বুঝতে পারছো ছোটাই। আমাদের জন্যেই এই ব্যবস্থা। যাতে আমাদের মোটর এইখানে এলেই টায়ার ফেটে যায় আর এগুতে না পারে, তারই জন্যে এই আয়োজন। বুদ্ধি খাটানো হয়েছে মন্দ নয়।

—অর্থাৎ আমরা যাতে ঈশানবাবুর বাড়ী পৌঁছোতে না পারি?

রণদেব বললে—শুধু তাই কি?

ছোটাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—এখন কি করবেন? ঈশানবাবুর বাড়ি এখনো দেড় মাইল রাস্তা। এতখানি পথ হেঁটে·····

—পাগল হয়েছো। সনজঙ্গল, কাদা নর্দমার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। তার চেয়ে এক কাজ কর। বংশী দারোগার থানা বেশীদূর নয়। তুমি সেখানে চলে যাও। তার বড়বড়ে মোটরখানা আর তাকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

—আপনি?

ছোটাইএর প্রশ্নের উত্তরে রণদেব বললে—আমি এইখানেই অপেক্ষা করব। আমার মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই কোন ইনটারেসটিং ব্যাপার ঘটবে এখানে।

—আপনি একা থাকবেন?

ঘাড় নেড়ে রণদেব জবাব দিলে—হ্যাঁ। আমার জন্যে তুমি চিন্তা কোরো না। যা বললাম কর।

ছোটাইএর মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। কিন্তু আর কোন কথা বলবার সাহস তার হল না। রণদেবকে সে বিলক্ষণ জানে। একবার সে যা বলে, বা স্থির করে, তার আর নড়চড় হবার জো নেই। অগত্যা ছোটাই চলে গেল।

আর রণদেব সেই জঙ্গলাকীর্ণ কর্দমাক্ত পথের প্রান্তে মোটরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দু'চোখের দৃষ্টি ফেলে যেন কোন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

॥ চৌদ্দ ॥

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রণদেবের কাছে ফিরে আসার জন্যে ছোটাই প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে বংশী দারোগার ডেরায় হাজির হল।

ব্যাপার শুনে বংশীও চঞ্চল হয়ে উঠল। দ্রুত তার গাড়িখানাকে গ্যারেজ থেকে টেনে বার করলে। এবং ছোটাইকে নিয়ে মোটর ছুটিয়ে দিলে।

মিনিট কুড়ি কেটে গেছে···ছোটাই ছটফট করছে রাস্তায় কাঁচ ছড়িয়ে যারা তাদের গতিরোধ করেছে তারা কি এতক্ষণ নিশ্চেষ্ট আছে···রণদেব জানে এরকম অবস্থায় কাছাকাছি বিপদ লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। তবুও সে একলা রইল···এখন যত তাড়াতাড়ি তার কাছে পৌঁছনো যায় ততই মঙ্গল।

—বাঁয়ে।

ছোটাইএর চিৎকারে বংশী গাড়ীর স্টিয়ারিং ঘোরালো। ছোটাই হাত ঘড়িতে সময় দেখলো। তার যাওয়া আসায় আধ ঘন্টা সময় চলে গেছে···সুদীর্ঘ তিরিশ মিনিট।

হেডলাইটের আলোয় সংকীর্ণ রাস্তা আলোকিত হল। অদূরে রণদেবের গাড়ী।

বংশী গাড়ী থামাল।

—মিঃ ঘোষাল বোধ হয় গাড়ীর মধ্যেই আছেন।

—তাই হবে। বলতে বলতে গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে ছোটাই এগিয়ে গেল।

—আমরা এসেছি সার।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মোটরের মধ্যে রণদেব নেই। কাছাকাছি কোথাও কি গিয়েছেন? ছোটাই জোরে জোরে মোটরের হর্ণ বাজালো।

কিন্তু কোথায় কে? গভীর রাত ঝিমঝিম করছে। চারদিকে অপার্থিব নিস্তব্ধতা।

—একি! বংশীর চকিত কণ্ঠস্বর।

মোটরের গায়ে বংশীর হাতের টর্চের তীব্র আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোয় দেখা গেল, দরজার হাতলে রক্তের দাগ।

ওদিকে ওকি···পিছনের পরদার কাঁচ ফুটো···গুলি লাগার ছ্যাঁদা···দুজনেরই অন্তর চমকে উঠল।

—গুলি চলেছে। বংশীর কথা শুনে ছোটাইএর সর্ব অঙ্গ যেন শিথিল হয়ে পড়ল।

—কিন্তু মিঃ ঘোষাল গেলেন কোথায়?

ছোটাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে রণদেবের নাম ধরে ডাকতে লাগল।

কিন্তু সাড়া দেবে কে?

দু'জনে টর্চ ফেলে চারদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু বৃথা।

বংশী বললে···তাহলে ডাকাতরা কি তাঁকে ধরে নিয়ে গেল?

—কিন্তু রক্ত কেন? ছোটাইএর কণ্ঠস্বর ব্যাকুল ও কম্পিত।

—হয়ত পিছন থেকে কেউ তাঁকে গুলি করেছে। তারপর দু'তিনজন মিলে তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে।

ছোটাই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল···চারিদিকে ঘন জঙ্গল···রাস্তার মাঝখানে একাকী রণদেব··· গাছের আড়াল থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য করে পিস্তল চালালো···আহত হল রণদেব···তারপর তারা তাকে টেনে নিয়ে গেল···কোথায়? কে জানে?

॥ পনেরো ॥

আপিসে যাবার জন্যে মিনতি বাড়ী থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় ডাকপিওন এসে একটা রেজিষ্টারি চিঠি তার হাতে দিয়ে গেল।

খামখানা নেড়েচেড়ে দেখে সেটা হাত ব্যাগটায় ভরে নিয়ে মিনতি ট্রামে উঠল। রাস্তায় চিঠিটা খুলে পড়ার অসুবিধা হবে, আপিসে বসে ধীরেসুস্থে পড়লেই চলবে। কিন্তু তাকে এতবড় একটা খামে এত ভারী চিঠি লিখল কে?

আপিসে পৌঁছে সে দেখল, কর্তা কৃপানাথ সেদিন আগেই এসেছেন। বেয়ারা জানাল, মনিব তাকে ইতিমধ্যে দুবার খুঁজেছেন।

টেবিলের উপর হাতব্যাগটা রেখে মিনতি মনিবের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং প্রথামত নমস্কার করল।

—নমস্কার! তোমায় খুঁজছিলাম।

মিনতি নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল। কৃপানাথ বোধ হয় কোন চিঠির খসড়া করছিলেন। অর্ধসমাপ্ত খসড়াটা ছিঁড়ে ফেলে বললেন—পরে হবে। তার আগে

বলতে বলতে তিনি ড্রয়ার থেকে একটা শিলমোহরকরা বড় কাগজের পুলিন্দা বার করে সেটা মিনতির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন—এর মধ্যে কতকগুলো খুব দরকারী কাগজপত্র আছে। এগুলো আলমারিতে চাবী বন্ধ করে রাখ। পরে দরকার হলে চেয়ে নেব।

পুলিন্দাটা হাতে নিয়ে মিনতি বললে—কোন চিঠিপত্র পাঠাবার···

—চিঠিপত্র? না, নেই। আজ আর কোন চিঠি লিখবো না। আজ বেশিক্ষণ আপিসে থাকবো না। আমি চলে যাবার পর যদি কেউ দেখা করতে আসে, বলে দিও, দু'তিনদিন আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আচ্ছা, এবার যাও। তোমার কাজ করগে। বড়বাবু বেরিয়েছে। সে এলে তোমায় বিল টাইপ করতে দেবে। সেগুলো করে রেখো।

মিনতি নিজের জায়গায় ফিরে এলো। হাতে কোন কাজ ছিলনা। তাই সে ব্যাগ থেকে রেজিষ্টারি চিঠিখানা বার করে নিয়ে খামের মুখ সাবধানে ছিঁড়ল।

বড় খামের ভিতর থেকে বেরুলো আর একটা ছোট খাম এবং একটি বাংলা চিঠি। খামের উপর লেখা:

"শ্রীমতী মিনতি রায়ের হস্তে পৌঁছে।"

বাংলা চিঠিখানা মিনতি পড়তে লাগল:

"মহাশয়া, অল্প কয়েকদিন আগে শ্রীমতী ফিরোজাবালা দাসী এক শিলমোহর আঁটা খাম আমাদের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশ ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই খাম যেন আপনার নিকট প্রেরণ করা হয়। আপনার বাসার ঠিকানা তিনি আমাদের জানাইয়াছিলেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী এক্ষণে সেই খামটি আপনার নিকট পাঠানো হইল। একথা আপনাকে জানাইয়া রাখিতে চাই যে, আমরা কেবলমাত্র আমাদের মক্কেলের নির্দেশ পালন করিতেছি, উক্ত খামের মধ্যে কী আছে তাহার কিছুই আমরা অবগত নহি। সেই সঙ্গে একথাও আপনাকে জানাইয়া দিতে চাহি যে এই খাম যে আপনার কাছে পাঠানো হইল সেকথা আমরা পুলিসকে জানাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। কারণ আমাদের মক্কেল সাধারণভাবে ইহলীলা সম্বরণ করেন নাই। তিনি নিহত হইয়াছেন এবং

পুলিশ সেই হত্যারহস্যের তদন্ত করিতেছে। কাজেই, উক্ত গ্রামের মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যাহার দ্বারা তাঁহার হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা জানা পুলিশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ইতি, আপনার বিশ্বস্ত—

শ্রীরমানাথ সিকদার
উকিল, আলিপুর জজকোর্ট।"

বিস্মিত অন্তরে উকিলের চিঠিখানা পড়া শেষ করে মিনতি দ্বিতীয় খামখানা তুলে নিল। কী আছে এর মধ্যে? খামের ভিতর তিনখানা বড়বড় কাগজ। তাদের উপর বাংলায় টানা টানা বড় বড় আঁকা বাঁকা লেখা। মিনতি রুদ্ধ শ্বাসে পড়তে লাগল অদ্ভুত সব কথা···পড়তে পড়তে বারবার মিনতি রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগল · কল্পনাতীত ঘটনার জাল · ভয়ঙ্কর উদ্ঘাটন · ঈশান মজুমদারকে খুন করার উদ্দেশ্য ·· সেই হত্যার পিছনে ভীষণ ষড়যন্ত্র সমস্ত গোপনীয় কথা লেখা হয়েছে কে লিখেছে?

ফিরোজাবালা। কিন্তু পড়তে পড়তে মিনতি এমন আত্মহারা হয়েছিল যে ইতিমধ্যে তার পিছনে একজন লোক যে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে টের পায় নি।

হঠাৎ পিছনে একটা অর্ধস্ফুট হুঙ্কার শুনে সে চমকে উঠে ঘাড় ফেরালো এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম আতঙ্কে তার সর্বশরীর হীম হোয়ে গেল।

মুখোসপরা লোকটার বাঘের মত দুটো হাতের থাবা নেমে এলো মিনতির গলায়···নিমেষের মধ্যে তার দম আটকে গেল · কোন কথা মুখ দিয়ে বেরুলো না।

—জানতে পেরেছো সব কথা। কিন্তু কোন ফল হবে না। তোমার গলা দিয়ে কোন কথা বেরুবে না···তার আগেই···

মিনতি চিৎকার করবার চেষ্টা করল; প্রাণপণে কিছুক্ষণ জুঝলো, কিন্তু পারলো না·· নিষ্পেষিত কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে একটা রুদ্ধ আর্তনাদ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনা লুপ্ত হল।

॥ ষোলো ॥

বিখ্যাত অপরাধতত্ত্ববিদ ও ডিটেকটিভ
রণদেব ঘোষালের মৃত্যু!
অজানা অস্ত্র কর্তৃক নিহত!
বনের মধ্যে মৃতদেহ প্রাপ্তি!
শোচনীয় ও রহস্যময় ঘটনা!

বড় বড় হরফে উপরের সংবাদ নিয়ে পরদিনের খবর-কাগজগুলো যখন বেরুলো তখন শহরের নানা অঞ্চলে যে বিষম উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, তা বলাই বাহুল্য।

রণদেব ঘোষাল খুন হয়েছে!

কথাটা যেন বিশ্বাস হয়না। কিন্তু সংসারে প্রতি দিনই তো কত রকমের অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটছে। এ দুর্ঘটনাও তাদের মধ্যে একটা। অনেক দুর্দান্ত গুণ্ডা বদমায়েসের সারেস্তাকারী পোয়েন্দা শেষ পর্যন্ত তাদেরই কারুর আক্রোশের কবলে পড়ে খুন হল! দুঃখের ব্যাপার সন্দেহ নেই। যে সমস্ত লোকের কাছে রণধীর পরিচিত, তাদের মনে খবরটা নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। যারা তার অনুরাগী তারা ব্যথিত হল। যারা শত্রু তারা পুলকিত বোধ করল। যারা তার পরিচয় জানে না, তারা বুঝল, পুলিশের একজন দক্ষ কর্মচারী গুণ্ডার হাতে প্রাণ হারিয়েছে। এমন আর কি বিচিত্র ব্যাপার।

কাসন্ডয়ালাদের রিপোর্টাররা ছোটাইকে ছেঁকে ধরল। কিন্তু চতুর্বুদ্ধি চতুরাক ছোটাইয়ের কাছে কোন সংবাদ পাওয়া গেলনা। এদিকে পুলিশ মহলে কর্মচাঞ্চল্য বেড়ে গেল।

... ...

এই প্রকাণ্ড কাণ্ডের যে ব্যক্তি আসল নায়ক, সেও খবরটা শুনল। রণধীর মরেছে, এবং তার মৃত্যুর খবর শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। লোকটার কদাকার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

যে ঘরে লোকটার বাসা সে ঘরটাও তার মালিকের মতোই নোংরা। একপাশে একটা পুরনো খাটিয়ায় ময়লা বিছানা। তার পাশে একটা জলের সোরাই। একটা তক্তার উপর ঘেনো মদের বোতল ও গেলাস। ওধারে একটা চেটাই পাতা। তার উপর কতকগুলো হাড়গোড় এঁটো-কাঁটা। বোধ হয় কাল রাতের বা সকালের ভুক্তাবশিষ্ট তখনো বাইরে ফেলা হয়নি।

লোকটার নাম নাহুম। তার আসল পরিচয় কেউ জানে না। যারা তাকে কাজে নিযুক্ত করেছে তারাও বোধ হয় তার পূর্ব ইতিহাস সবটা জানে না।

রাত বেড়েছে অনেকখানি। একটা ধোঁয়া ওঠা হ্যারিকেনের সামনে নাহুম বসে আছে।

হ্যারিকেনের কাপসা আলোয় তার কুৎসিত মুখটা যেন আরো বীভৎস দেখাচ্ছে। সেই কদাকার মুখে প্রফুল্লতার বিকৃত দীপ্তি। কাল রাতে যে কাজ সে সম্পন্ন করেছে তা তার জীবনের সেরা কাজ, তাতে আর সন্দেহ নেই। কম ঝুঁকি নিয়ে তাকে সে কাজ সারতে হয়নি।

যে-ঘরে তার বাসা সে ঘরটা ঈশান মজুমদারের অট্টালিকার বিস্তৃত এলাকার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। নাহুম ঈশান মজুমদারের মালীরূপে কিছুদিন আগে কাজে ভর্তি হয়েছে। কৃপানাথ করমকার সুপারিশে ঈশান মজুমদার তাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছে। কৃপানাথ নাহুমের প্রকৃত পরিচয় জানেন কি না, বলা যায় না। তবে নাহুম তাঁর অনেকদিনের পরিচিত। কৃপানাথ যখন বর্মায় গেছিলেন তখন নাহুম তাঁর কাছে কিছুদিন বেয়ারার কাজ করেছিল। সম্প্রতি সে বর্মা থেকে কলকাতায় এসেছে। বর্মায় তার কাজের অনেক রেকর্ড আছে, যার ফলে সে জেল খেটেছে বার ছয়েক—রাহাজানি ডাকাতি, খুনোখুনি, কোন কাজেই সে পিছপাও নয়। মানুষের পেটে ছুরি চালাতে সে ওস্তাদ।

নাহুম বসে বসে ভাবছে। কাল রাতের কাণ্ডটা শেষ করে সে অনেক ঘুরপথে নিজের ডেরায় এসে পৌঁছেছে। আজ সারাদিন সে ঘরের মধ্যেই আছে। বাইরে বেরোয়নি একবারও। কাজ তো শেষ হয়েছে। কিন্তু তার চিন্তা কমছে না। হাতের কাছে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র সর্বনাশ সাধনের শেষ ধাপে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে…যে দল এই ষড়যন্ত্রের পিছনে রয়েছে, তাদের সে চেনে বটে, কিন্তু গোপন রহস্যের সবটা সে এখনো জানতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জানতেই হবে। না জানতে পারলে, সমস্ত পণ্ড, এত পরিশ্রম, এতখানি ঝুঁকি, সব বৃথা যাবে।

তার ভাবনার সূত্র ছিন্ন করে বাইরে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নাহম সতর্ক সজাগ হয়ে বসল। কোমরের পিস্তলটাকে একবার স্পর্শ করে নিয়ে বললে—কৌন্‌রে ?

বাইরে রুদ্ধ স্বর—ঘরে আছ ?

ঘড় ঘড় স্বরে নাহম জবাব দিল—আছি।

—বেরিয়ে এসো।

হাতের কাছে একটা ছেঁড়া র‍্যাপার ছিল। সেটাকে বেশ করে মাথায়, গলায়, বুকে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দি মেশানো বাংলায় নাহম বললে—ভিতরে আসতে আজ্ঞা হোক না।

—না। তোমার ঘর বড় নোংরা। এদিক এসো।

নাহম বাইরে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। উত্তেজিত চাপাকণ্ঠে আগন্তুক প্রশ্ন করল—কাজ হতে ?

—হতে। তেসরা গুলিটা লোকটার মাথার খুলি ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

—কাল কত রাত্রে ফিরলে ?

—তা অনেক রাতে। খেয়াল নেই।

—তোমার গলার আওয়াজ অমন ভেঙে গেছে কেন ?

—আর মশায়। জাড়াটা কীরকম পড়েছে, দেখছেন না। কাল বহৎ ঠাণ্ডা লেগে বুকটা ঘড়ঘড় করছে, গলাটা ভেঙে গেছে ! ও কালই ঠিক হোয়ে যাবে। আজ রাত ভোর বোতল চালাবো, তাহলেই সকালে সব ঠিক···

—তিনবার পিস্তল চালাতে হয়েছিল ! কেউ শোনেনি তো ?

মাথা ঝাঁকিয়ে নাহম বললে—পাঁচ কোসের মধ্যে লোক ছিল না। মিছে ভাবনা করবেন না। কাজ ঠিকঠাক হাসিল করেছি। গলতি নেই। টিকটিকির লাশ এখন পুকুরের তলায়। বলেন তো তুলে এনে দেখিয়ে দিই।

—না, না, থাক। আগন্তুক বললে—তোমায় কেউ দেখতে পায় নি তো ?

—সে রকম কাজ করি না মশায়।

—বেশ। তুমি অনেক ইনাম পাবে। বহৎ আচ্ছা কাজ করেছো। কাল রাত্রে আর একটা কাজ করতে হবে। বনের মধ্যে কাজটা শেষ করতে হবে। খুব সাবধান। কেউ যেন না দেখতে পায়।

—এবার আবার কে ?

নাহমের প্রশ্নের উত্তরে আগন্তুক ফিসফিস করে যা বললে তা শুনে নাহমের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। সে নীরবে আগন্তুকের নির্দেশাদি শুনে নিল।

কিছুক্ষণ পরে আগন্তুক চলে গেল। নাহম তার ঘরে ফিরে এল। তার মুখে গভীর চিন্তার ছায়া। একটা জীবন্ত মানুষের সমাধির জন্যে তাকে কবর খুঁড়তে হবে।

॥ সতেরো ॥

যে উকিল মিনতিকে ফিরোজাবালার লিলমোহর-আঁটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তিনি তাঁর কথামত কাজ করতে ভোলেন নি। অর্থাৎ তিনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন এবং পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে ফিরোজাবালার চিঠির মর্ম জানবার জন্যে মিনতির সন্ধানে বেরিয়েছিল।

কিন্তু কোথায় মিনতি?

বাড়ীতে তাকে পাওয়া গেল না। আপিসেও নেই। কৃপানাথ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। ফিরোজাবালার চিঠি মিনতির নামে? আর সে চিঠি পাবার পর মিনতিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা? এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার। কৃপানাথ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। পুলিশকে বারবার বললেন, এবিষয়ে তদন্তের যেন ত্রুটি না হয়। না, তিনি কিছুই জানেন না। মিনতি তাঁকে কোন কথা বলে নি।

পুলিশ চতুর্দিকে সন্ধান করেও কোন সূত্র না পেয়ে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে গেল।

• • • •

যে ক'জন দারোগা এই কাজে লেগেছিল তারা অত্যন্ত হতাশ বোধ করতে লাগল। অনেক হত্যারহস্যের তদন্ত তারা করেছে কিন্তু এমন ভাবে এর আগে বহু দরজায় মাথা ঠুকতে হয় নি। এত বড় একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার খুন হল, কিন্তু সেই হত্যার কোন কিনারা হল না।

পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হলেও ইনস্‌পেক্টার কবীর হতাশ হয়নি। বরং সে যেন এক চাপা উৎসাহে ফুলে উঠেছে। সকালবেলা অফিস কামরায় বসে সে হাজত থেকে সদ্যধৃত এক ব্যক্তিকে তার কাছে নিয়ে আসতে বললে।

লোকটিকে তার ঘরে আনা হলে কবীর সেপাইকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে দাঁড়াতে বলে বললে, কেউ যেন না এখন তার ঘরে ঢোকে।

ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে পায়চারী করতে লাগল কবীর। তার সেই থমথমে রুদ্রমূর্তি দেখে লোকটা বোধ করি মনে মনে ত্রস্তবোধ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর চাপাকণ্ঠে আগন্তুককে লক্ষ্য করে কবীর বললে—সত্যি কথা বলবে, না, ঠাণ্ডাঘরে পাঠাবো?

—সত্যি কথা বলব।

কাছের টেবিলের দেরাজ থেকে একখানা কাগজ বার করে কবীর পড়তে লাগল। পড়া শেষ করে বললে—ঠিক আছে?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তাহলে সই করে দাও। বলে কাগজখানা টেবিলের উপর রেখে কবীর লোকটিকে ইসারা করল—দাও, দোয়াত কলম আছে সামনেই। কাগজটার নীচে পুরো নাম লিখে দাও।

বারেক ইতস্তত করে লোকটি কবীরের নির্দেশমত টেবিলের কাছে গিয়ে কাগজটার নীচে সই করে দিলে।

ছটমনে ইনসপেকটার ঘণ্টা বাজালো। ঘরে ঢুকল একজন জমাদার। কবীরের ইঙ্গিত পেয়ে সে লোকটিকে নিয়ে চলে গেল।

ইনস্পেকটার কবীর এইবার ঘড়ি দেখল। সময় হয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে টেলিফোন তুলে নিল।

অপর প্রান্ত থেকে সাড়া এলো। এ-প্রান্ত থেকে ইনস্পেকটার বললে—আমি কবীর বলছি।

তারপর যতক্ষণ ধরে কথা চলল। সে সব কথার তাৎপর্য অতিশয় গুরুতর।

টেলিফোন শেষ করে কবীর গেল ছোটাইএর কাছে। বেচারা ছোটাই। রণধীরের মৃত্যুতে সে যেন ভেঙে মুচড়ে দুমড়িয়ে শেষ হয়ে গেছে।

॥ আটাশ ॥

ঈশান মজুমদারের বাড়ীর দোতলার এক প্রান্তের একটা ঘরে বসে একাকী নিশীথ মনে মনে অতিশয় অস্বোয়াস্তি বোধ করছিল।

আহুতির অনুরোধে সে এখানে এসেছে। ইচ্ছা আছে কয়েকদিন এখানেই থাকবে। উইলের মর্ম জানবার জন্যেই সে এসেছে।

এদিকে তার ভাই অসিত নিরুদ্দেশ। যদিচ অসিতের সঙ্গে তার বনিবনা ছিল না, একসঙ্গে বসবাসও ছিল না, তাহলেও ভাই তো বটে!

তারপর হঠাৎ এই চিঠি।

চিঠি মানে এক চিলতে ভাঁজ করা কাগজ। ভিতরে এক লাইন লেখা। সকালবেলায় এই কাগজের টুকরো যে তার ঘরে এলো কেমন করে তা সে জানে না। ঘরের এক পাশে যে ছোট টেবিলটা ছিল তার উপর কাগজখানা রাখা ছিল এবং যাতে তার নজরে পড়ে তাই তার ওপর তার রিষ্টওয়াচটা চাপা দেওয়া হয়েছিল। বোধ করি সে যখন বাথরুমে গিছল তখনই কেউ এসে চিঠি রেখে গেছে।

সে চিঠিতে তাকে ডাকা হয়েছে। আজ রাত এগারোটার সময় বাগানের দক্ষিণপূর্ব কোণ বরাবর গিয়ে বড় আমগাছটার তলায় তাকে অপেক্ষা করতে হবে। পত্র-প্রেরক তার সঙ্গে সেইখানে দেখা করবে। এ চিঠি অবহেলা করলে ঘোর বিপদ।

প্রথমে নিশীথ পত্রখানার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি। কিন্তু যতই সময় কাটতে লাগল ততই তার মনে হোতে লাগল, এচিঠি উপেক্ষা করা উচিৎ নয়। তাকে যেতেই হবে।

... ...

চারিদিকে একটা থমথমে আবহাওয়া। সারাদিন গম্ভীরমুখে যতীশ তার কাজ করে চলেছে। ফাইল দেখছে, চিঠি লিখছে, ফোন করছে।

আহুতি তার নিজের মহলেই আছে। বাপের মৃত্যুর শোক সে কতকটা সামলেছে বটে, কিন্তু আগের প্রফুল্লতা এখনো ফিরে পায়নি।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর কিছু সময় নীচে নেমে নিশীথ যতীশের ঘরে গিয়ে বসল। সাধারণভাবে নানা বিষয়ের কিছু আলোচনা হল। নিশীথ দেখলো যতীশ আজ যেন কিছু [illegible] আর কাজে ব্যস্ত।

যথারীতি রাত্রের আহার শেষ হল। আহতি তার নিজের মহলে চলে গেল। দু-পাঁচ মিনিট পরে যতীশও নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান করল। নিশীথ কিছুক্ষণ একটা বই টেনে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল।

রাত বাড়ল! সময় হয়েছে এবার। সকলের অগোচরে পিছনকার খিড়কি দিয়ে নিশীথ বাগানের মধ্যে এগিয়ে গেল। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল।

গভীর রাত যেন পৃথিবীর গায়ে কালী ঢেলে দিয়েছে। কোনদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই। গাছের মাথায় কি কি পোকার ডাক। ঘুঘু একটা পেঁচা ডেকে উঠল।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন চাপা গলায় বললে—এসেছো! ধন্যবাদ।

চমকে উঠল নিশীথ। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বললে—কে তুমি?

লোকটা কাছে এসে দাঁড়াল।

—চিনতে পারো?

নিজের হাতের টর্চটা জেলে নিজের মুখে ফেলল লোকটা। পরক্ষণেই টর্চ নিবিয়ে দিলে।

নিশীথ বললে—চিনতে পারছি না। তবে তোমায় যেন দেখেছি এবাড়ীতে। বোধ হয় বাগানের কাজে…

—হ্যাঁ। তোমার ভুল হয়নি। আমার নাম নাহম। আমি এ বাড়ীর হেড মালী।

—কি বলতে চাও তুমি? চিঠি কি তুমিই…

নিশীথকে থামিয়ে দিয়ে নাহম বললে—বলতে চাই অনেক কথা। বোসো এইখানে।

স্তম্ভিত বিহ্বল নিশীথ সেইখানে সেই অপরিচ্ছন্ন গাছতলায় বসল। বাগানের মালীটা অবলীলাক্রমে তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে। আশ্চর্য কাণ্ড।

—কি বলতে চাও, চটপট বল। নিশীথ বললে।

—বলছি। শোন মন দিয়ে।

নাহম ধীরে ধীরে বলতে লাগল। আর শুনতে শুনতে নিশীথ ভয়ে বিস্ময়ে যেন কাঠ হয়ে গেল।

নাহম থামল। কম্পিত কণ্ঠে নিশীথ বললে—আমি এখন কি করব?

—আমি যা বলছি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবে। কালকের মধ্যেই কাজ শেষ করতে চাই। খুব সতর্কভাবে প্রস্তুত থাকবে। আর কিছু করতে হবে না।

—আমি রাজী আছি।

• • • •

সেইদিনই গভীর রাতে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কলকাতার এক পুরোনো এটর্নীর বাড়ীতে হানা দিল।

কৃপানাথ করনজা তখন ঘুমুচ্ছিলেন।

চাকর গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বিরক্ত স্বরে বললেন—কে?

—দরজা খুলুন। লোক এসেছে।

লোক এসেছে। এমন অসময়ে!

—কে এসেছে?

—পুলিশের লোক।

সংবাদ শুনে কৃপানাথের দাদা হেহ কেঁপে উঠল। এদিক ওদিক তাকালেন বার কয়েক। ঘরভার খালি! কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন—আসছি। তাদের অপেক্ষা করতে বল।

গায়ে পাতলা একটা কোট চাপিয়ে ঘরটা খুলে বেরুলেন কৃপানাথ। সামনে দাঁড়িয়ে দু'জন সন্ত্রী নিয়ে ইনসপেক্টার কবীর।

মাথা নুইয়ে কবীর বললে—কঠিন কর্তব্য আমাদের, মিঃ কৃপানাথ। আপনাকে থানায় যেতে হবে।

কঠোরস্বরে ইংরাজীতে কৃপানাথ বলে উঠলেন—এর মানে কি?

—মানে, আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করলাম।

—কি অপরাধে?

গম্ভীর স্বরে কবীর জবাব দিলে—ষড়যন্ত্র এবং নরহত্যার সহায়তা।

কৃপানাথ কয়েকটা আর সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। মাথা ঘুরে টলে পড়লেন।

॥ উনিশ ॥

রাত্রি প্রভাত হল আকাশের বুকে মেঘের বোঝা নিয়ে। সূর্যের মুখ দেখা গেল না।

পাতিপুকুরে ঈশান মজুমদারের বাড়ীতেও সকাল হল। এবং যথাসময়ে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে আহুতি যতীশ আর নিশীথকে দেখা গেল।

চা পর্ব চলল নিঃশব্দে। কারুর মুখেই কথা নেই। আহুতি যেন বিষাদে আচ্ছন্ন, যতীশ গম্ভীর অন্যমনস্ক, নিশীথের চোখে মুখে ভয় আর উৎকণ্ঠার ছায়া।

কিছুক্ষণ পরে আহুতি নিশীথকে লক্ষ্য করে বললে—নিশীথদা, তুমি এখন কয়েকদিন এখানেই থাকবে তো?

হঠাৎ এই প্রশ্নে থতমত খেয়ে নিশীথ জবাব দিলে—হ্যাঁ, তাই তো মনে করছি।

আহুতি বললে—থাকো। তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল। যতদিন না মামলাটা শেষ হয়, তুমি এখানেই থাকো। তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

নিশীথ কোন জবাব দিলে না। আহুতি বললে—আজ এটর্নী কৃপানাথ বাবু আসবেন বাবার উইল শোনাতে। সে সময় তোমার থাকা তো একান্ত দরকার।

—কখন্ আসবেন? প্রশ্ন করল নিশীথ।

যতীশ জবাব দিলে—কাল চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিকালের দিকে আসবার কথা বলেছি।

মাথা নেড়ে নিশীথ বললে—ও তাই বুঝি। তা বেশ।

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। তারপর কথায় কথায় যতীশ বললে—আমাদের অসিত বাবুর খবর কি নিশীথ বাবু? অনেকদিন তাঁর কোন খবর পাই নি।

ঢোঁক গিলে নিশীথ বললে—আমিও পাইনি। বোধ হয় ভালই আছে। আমার সঙ্গে তো বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই।

ব্রেকফাষ্ট শেষ হল। আহুতি চলে গেল নিজের ঘরে। যতীশ তার আপিস কামরায় ঢুকল। নিশীথ সেই খানেই বসে রইল। তার চোখমুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন সে কোন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটল। তারপর বাইরে কাঁকর-বিছানো পথে মোটর গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল।

পর পর দু'খানা মোটর এসে পোর্টিকোর নীচে থামল। ক্ষণকাল পরেই গোবেশ এসে ভীতমুখে নিশীথকে বললে—পুলিশের সাহেব এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ঘরা গলায় নিশীথ বললে—এসেছে। চল। যাচ্ছি।

খানাকামরা থেকে বেরিয়ে নিশীথ বারান্দার দিকে এলো। ভারী জুতোর আওয়াজের সঙ্গে এগিয়ে এলো ইনস্পেকটার কবীর। দু'জন সার্জেন্ট বারান্দার দু'দিকে দাঁড়াল। বাইরে গেটের মুখে আরও দু জন। কবীরের সঙ্গে ছোটাই।

নিশীথকে সামনে দেখে কবীর বললে—আপনার নাম কি নিশীথ রায়?

ঘাড় নেড়ে নিশীথ জবাব দিলে—হ্যাঁ। আপনি?

—আমি ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার আই, বি,। আমার নাম কবীর।

—আমার কাছে কি চাই?

—অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপারে এসেছি মিঃ রায়। আপনাকে বলা দরকার মনে করি।

—বলুন। আমি শুনতে প্রস্তুত।

কবীর বললে—তার আগে এখানে মিঃ যতীশ সমাদ্দার আর এই বাড়ির মালিকের মেয়ে আহুতি দেবীকে উপস্থিত দেখতে চাই। দয়া করে তাঁদের এখানে আসবার ব্যবস্থা করুন।

নিশীথ গোবেশকে ডেকে বলে দিলে। তারপর কবীরকে সম্বোধন করে বললে—আপনি বসতে পারেন ইনস্পেকটার।

—ধন্যবাদ। কবীর জবাব দিলে—কাজের সময় আমি দাঁড়িয়ে থাকাই পছন্দ করি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

দরজার বাইরে চটির আওয়াজ।

—নিশীথ দা; ডাকছ? বলতে বলতে আহুতি ঘরে ঢুকল। তার পিছনে যতীশ।

আহুতির দিকে চেয়ে কবীর বললে—নমস্কার মিস মজুমদার। আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে মার্জনা করবেন। কিন্তু ব্যাপার গুরুতর। তাই···

—গুরুতর ব্যাপার! আবার কি হল?

আহুতির চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠল।

কবীর বললে—আপনার বাবার মার্ডারারের সন্ধান আমরা পেয়েছি।

—তা তো জানি। তার নাম যেন কি, ধরেন চালদার বোধ হয়।

আহুতির কথার উত্তরে ঘাড় নেড়ে কবীর বললে—না, সে নয়। তাকে মিথ্যা আটক করা হয়েছে। আসল হত্যাকারী অন্য লোক।

—অন্য লোক! কে সে?

ঘরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ইনস্পেক্টার কবীর হঠাৎ তার ডান হাতখানা যতীশের কাঁধের উপর রাখল, তারপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললে—যতীশ সমাদ্দার, মিঃ ঈশান মজুমদারকে খুন করবার অপরাধে আমি তোমায় গ্রেপ্তার করলাম।

আর এক লম্ফে ঘরের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেল।

হিংস্র ক্রুর কণ্ঠে যতীশ চীৎকার করে উঠল—আপনি পাগল নাকি! কি প্রমাণের জোরে আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করেন!

শান্তকণ্ঠে কবীর বললে—তোমার দুই সহচর শীতলপ্রসাদ এবং কপানাথ করনজা, দু'জনেই তাদের স্বীকারোক্তি লিখে দিয়েছে। আরও প্রমাণ দেবে ওই ব্যক্তি।

এই বলে কবীর দরজার দিকে তাকাল।

দেখা গেল, দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে নাহুম। তার অসুন্দর মুখে মৃদু তীক্ষ্ণ হাসি।

—তুই! নেমকহারাম…

যতীশ ক্ষিপ্ত নেকড়ের মত নাহুমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ধেয়ে যেতেই ছোটাই তার পথ রোধ করে বললে—গোলমাল করে কোন ফল হবে না যতীশ সমাদ্দার। আমরা সকলেই প্রস্তুত।

ছোটাই তার হাতের পিস্তল উদ্যত করল।

ধীরে ধীরে নাহুম বললে—হ্যাঁ, প্রস্তুত বৈকি। কোন আশা নেই যতীশবাবু। আমরা সব জেনে ফেলেছি।

নাহুমের মাথার পরচুলা খসে পড়েছে। তার গলার স্বর আগেকার মত আর ভারী ও ভাঙা নয়। নাহুম অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে।

যতীশের মুখ দিয়ে বেরুলো—সর্বনাশ! এ যে রণদেব ঘোষাল।

মৃদু হেসে রণদেব বললে—রণদেব তো মরে গেছে। আমি তার ভূত। তোমাদের নিরাশ করলাম বলে ভারী দুঃখিত। তোমাকে আর তোমার ওই স্ত্রীকে সেলাম জানাচ্ছি।

এই বলে রণদেব আহুতির দিকে তাকাল। তারপর বাইরে থেকে একজন সার্জেন্টকে ডেকে এনে বললে—এই স্ত্রীলোককেও গ্রেপ্তার কর। এর আসল নাম মতিবিবি ঘোষ। এ ঈশান মজুমদারের মেয়ে নয়। ঈশান বাবুর আসল মেয়ে মিনতি রায়, প্রকৃতপক্ষে যার নাম মিনতি মজুমদার। মিনতি, ঘরের মধ্যে এসো।

রণদেবের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মিনতি এসে ঘরে ঢুকল।

। কুড়ি ।

এক নিমেষে আহুতির সরল সুন্দর মুখখানা হিংসায় আর ক্রোধে কুৎসিত আকার ধারণ করল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে উঠল—ধূর্ত শয়তান! কেমন করে জানলি তুই…

প্রশান্ত স্বরে রণদেব বললে—অনেক খুঁকি নিয়েই জানতে হয়েছে আহুতি ঘোষ! নাহুমকে দিয়ে তোমরা আমাকে সাবড়াবার যে আয়োজন করেছিলে তা মন্দ হয়নি। কিন্তু লোকটার টিপ ভাল নয়। বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস নেই তো। প্রথম গুলিটা আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার পরেই আমি ছুটে গিয়ে তার পিস্তল সমেত হাতটা চেপে ধরি। তখন দ্বিতীয় গুলিটা আমার হাতের পাশে লেগে বেরিয়ে যায়। তারপর তাকে কাবু করে ফেলতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। প্রথমে ভেবেছিলাম, তাকে সোজা থানায় নিয়ে যাব। তারপর হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। তারই ফলে আমাকে এই বেশে এই রূপে এখানে দেখছো। নাহুম এখন

টনসপেক্টার কবীরের হেপাজতে লালবাজারে আছে। আমার মৃত্যুর খবর কবীর সাহেবের মারফতে রটনা করা হল, আর আমি এদিকে নারদের বেশ ধরে এইখানেই রয়ে গেলাম। সেই রাত থেকেই কবীর সাহেবের সঙ্গে আমার যোগাযোগ চলছিল।

ছোটাই এতক্ষণ অভিনয়ের মতো দাঁড়িয়েছিল। এবার ছুটে রণদেবের কাছে গিয়ে বললে—দাদু···

তার উদ্বেল কণ্ঠস্বরে তার মনের আবেগ উপলব্ধি করতে পেরে রণদেব সস্নেহে তার পিঠ চাপড়ে দিলে।

যতীশ আর আরতি, দুজনেই বিহ্বল এবং নির্বাক। ক্ষণকাল পরে যতীশ বললে—পরশু রাত্রে বাগানের মধ্যে আমি তাহলে আপনার সঙ্গে কথা বলে এসেছিলাম?

—তাতে কোন সন্দেহ নেই! মিনতির জন্যে কবর আমি খুঁড়ে রেখেছিলাম। তারপর কাল রাত্রে যখন তুমি তাকে হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় আমার কাছে দিয়ে এলে তখন তাকে কবর চাপা না দিয়ে আমার ঘরে বসিয়ে রেখেছিলাম। বেচারাকে সারারাত সেই অন্ধকার ঘরে বসে মশার কামড় সইতে হয়েছে।

এই বলে রণদেব নিশীথের দিকে তাকিয়ে বললে—নিশীথবাবু, এবার আপনার ভাইকে নিয়ে আসুন। নাটকের সব পাত্র-পাত্রী এক জায়গায় জড় হোক। যবনিকা পড়বার সময় হল।

নিশীথ দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল এবং ক্ষণকাল পরেই অসিতকে নিয়ে পুনরায় ঘরে এসে ঢুকল।

রণদেব বলতে লাগল—যতীশ সমাদ্দারের চক্রান্ত ছিল বড় গভীর। বরেনকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার পর আরও যে দুটো খুন হল তার জন্যে যাতে অসিতবাবুর ওপর লোকের সন্দেহ জাগে, যাতে লোকের মনে এই ধারণা হয় যে অসিতবাবু এই সব ব্যাপারে একজন সহকারী অপরাধী সেই উদ্দেশে তাঁকে লোক দিয়ে তাঁর ঘর থেকে ঘরে এনে এই বাড়ীর একটা চোর কুঠুরিতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সম্ভবত ওঁকেও ওরা অবাই করত। সেই কিডন্যাপার দু'জন ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে। এবং তারাও স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

রণদেবের কথা শেষ হবার পর কবীর বললে—তাহলে, মিঃ ঘোষাল, এদের চালান দি?

—হ্যাঁ। তা দিতে হবে বৈকি! রণদেব বললে—খানায় দিয়ে হাঙ্গামা করে বরেনকে হাজত থেকে বার করে তাকে আমার বাড়ী পৌঁছে দেবেন। মিনতি আমার সঙ্গেই যাবুক।

॥ এক্সপ ॥

রণদেবের বৈঠকখানায় সকলে সমবেত হয়েছে। বরেন, মিনতি, নিশীথ, অসিত এবং বলা বাহুল্য ছোটাই। তার আনন্দই যেন সবচেয়ে বেশী।

কিছুক্ষণ কলকাকলীর পর নিশীথ বললে—রণদেববাবু, সে রাত্রে আমার বনের মধ্যে ডেকে পাঠিয়ে যা বলেছিলেন, তার সব কথা আমি বুঝতে পারিনি। দয়া করে গোড়া থেকে বলুন।

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে রণদেব বললে—বলব বলেই তো আপনাদের এখানে এনেছি। এ এক দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রের কাহিনী। সুরু করতে হয় মতিবিবিকে দিয়ে। মতিবিবি হল শক্তিপদ ঘোষের মেয়ে, যে লোকটা কিছুদিন আগে মানুষ খুন করার অপরাধে ফাঁসী যায়।

সকলে উৎসুক হোয়ে রণদেবের কথা শুনতে লাগল।

রণদেব বলতে লাগল—কিন্তু শক্তিপদর ফাঁসী হবার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন যোগ নেই। যাই হোক আসল কথায় আসি। শক্তিপদর স্ত্রী আর ফিরোজাবালা দু'জনে ছিল বৈমাত্র বোন। ফিরোজার এক ভাইঝির

সঙ্গে আবার শীতলপ্রসাদের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ফিরোজা, শীতলপ্রসাদ আর শক্তিপদর স্ত্রী, এই তিনজনের মধ্যেই ছিল জন্ম-অপরাধীর রক্ত। সংপথে জীবনধারণ করার চেয়ে, অসৎ ভাবে অন্যায় পথে টাকা রোজগার করে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করাই যেন তাদের মজ্জাগত হোয়ে গিছল। চোরাই কারবারে শক্তিপদর স্ত্রী দুবার ধরা পড়েছিল। দু'বারই অবশ্য প্রমাণ অভাবে ছাড়া পায়। ফিরোজাও ছিল সেই দলের দলী, কিন্তু তার স্বভাবটা অতখানি নোংরা ছিল না। তার মধ্যে কিছু বিবেক ছিল, তাই সে নিজের বিপদ বুঝতে পারা মাত্র এক চিঠি লিখে মিনতির কাছে তার কাগজপত্রগুলো পাঠিয়ে তাকে সমস্ত কথা জানিয়ে দিয়েছিল। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে ঘাতকরা তাকেও রেহাই দেবে না। ফিরোজার সেই চিঠি অনুসারেই আমি আপনাদের এই কাহিনী বলছি।

রণদেব থামল। ছোটাই বললে—এ যেন বিলেতি থ্রিলারের কাহিনী! তারপর কী হল সার?

—তারপর? দু'ঘরে দুই মেয়েই বড় হল। কিন্তু মেয়ে বড় হবার কিছুদিনের মধ্যেই শক্তিপদর স্ত্রী মারা যায়। তখন অতটুকু মেয়েকে কে দেখাশোনা করে এই ভেবে ফিরোজা আর শীতলপ্রসাদ মিনতিকে শক্তিপদর এক মামাতো ভাইএর বাড়ী রেখে এলো। সে ভদ্রলোকের নাম ভবতোষ রায়। লোকটি ছিল নিঃসন্তান। মিনতিকে ভবতোষ আর তার স্ত্রী দু'জনেই সাদরে গ্রহণ করল। ভবতোষের জন্যেই মিনতি লেখা পড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিল এবং স্টেনোগ্রাফী শিখে কৃপানাথ করনজার আপিসে চাকরি জোগাড় করেছিল।

একটু থেমে রণদেব আবার আরম্ভ করল—এবার এদিককার কথা বলি। অজস্র অর্থ-প্রাচুর্য আর বিলাসিতার মধ্যে আহুতি বড় হোতে লাগল। তার যখন বছর দশেক বয়স তখন যতীশ ঈশানবাবুর সেক্রেটারী রূপে কাজে নিযুক্ত হয়। কাজকর্মের দিক থেকে যতীশ ছিল খুব দক্ষ। ঈশানবাবুকে সে রীতিমত হাত করে নিয়েছিল। আসলে কিন্তু যতীশ ছিল এক জেলফেরত আসামী। এলাহাবাদে থাকার সময় জালিয়াতির অপরাধে সে এক বছর জেল খেটেছিল। এদিকে ক্রমে আহুতি যৌবনে পা দিল। যতীশের নজর পড়ল আহুতির ওপর। আহুতিও যতীশের প্রতি আকৃষ্ট হল। এই সময় ফিরোজা আহুতিকে সব কথা জানিয়ে তাদের মতলবের কথা বললে। কিন্তু আহুতি তখন যতীশের সঙ্গে মশগুল। তার যৌবন আর লোভ দুই-ই ভয়ানক বেড়ে উঠেছিল। ফিরোজার প্রস্তাবে সে রাজী হল না। যতীশকে সে জানিয়ে দিলে ফিরোজাদের চক্রান্তের কথা। তখন যতীশ এক উল্টো চাল চাললে। সে আহুতিকে গোপনে বিয়ে করলে আর দু'জনে স্থির করলে, ঈশানবাবুকে জন্মের মত সরিয়ে দিয়ে তারা নিষ্কণ্টকে রাজ্যপাট ভোগ করবে।

ঈশানবাবুকে তাড়াতাড়ি না সরালে, আসল তথ্য তাঁর চোখে পড়ে মনে করে যতীশ আর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে লাগল। কৃপানাথ করমজা ছিল ঈশানবাবুর এটর্নী, ঈশানবাবুর টাকা খাটানোর ব্যাপারে কৃপানাথ যে জুয়াচুরী চালিয়েছিল চতুর যতীশ তা জানতে পারে এবং কৃপানাথকে গোপনে সেকথা জানায়। ফলে কৃপানাথ যতীশের মুঠোর মধ্যে চলে যায়। যতীশ কাজ হাসিল করবার জন্যে কৃপানাথকেও দলে নিলে এবং কী করে ঈশানবাবুকে মারা যায় সে সম্বন্ধে কৃপানাথের পরামর্শ চাইলে। হাজার হোক এটর্নীর বুদ্ধি তো। কৃপানাথ মতলব দিলে, যতীশ তাঁকে খুন করবে আর সেই খুনের দায়ে অন্য কাউকে ফাঁসাতে হবে এমনভাবে যাতে সে ছাড়ান না পায়; এই পন্থাই সবচেয়ে ভাল হবে। তখন কৃপানাথের কথামত বরেনকে এই কাজে শিকার ধরা হল। টাকার লোভ দেখিয়ে শীতলপ্রসাদ বরেনকে ভোলালো।

আবার থামল রণদেব। কয়েক মিনিট ধরে ভেবে নিয়ে কের সুরু করল—এবার নরেশ মাইতির কথা বলি। যতীশ মাঝে মাঝে শীতলপ্রসাদের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করত। সেই সময় একদিন নরেশ শীতলপ্রসাদের বাড়ীতে ঢুকে ষড়যন্ত্রের কথা শোনে আর শীতলপ্রসাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সে বরেনের ফাঁদে পা দেওয়া জানতে পারে আর তারপর সেই খুনের রাতে বরেনের আগেই সে পাতিপুকুরে গিয়ে ঈশানবাবুর খুন স্বচক্ষে দেখে। বরেন বারোটার সময় ঈশানবাবুর ঘরে ঢোকবার আগেই যতীশ তাঁকে খুন করে, তারপর বরেন ঘরে ঢুকতে তাকে পিছন থেকে মাথায় লোহার হাতুড়ির বাড়ি মেরে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। আগুন খোঁচানো লোহার শিকে, যা দিয়ে ঈশানবাবুকে মারা হয়েছিল, তার গায়ে যতীশের হাতের কোন ছাপ ছিল না, তার কারণ খুন করবার পর শিকটার গা মুছে ফেলা হয়েছিল এবং বরেন অজ্ঞান হবার পর কৌশলে অচৈতন্য বরেনের আঙুলের ছাপ তার ওপর লাগিয়ে নেওয়া হয়েছিল। চিঠি আর টাকা বরেনের কাছ থেকে যতীশ যে নিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। বরেন অভিযুক্ত হল। তারপর এলো নরেশের পালা! নরেশ মনে করলে, এই ফাঁকে সে মরলক দাও মারবে। খুনের পরদিন সকালেই সে যতীশের সঙ্গে দেখা করলে, জানাল, তার কিছুই অজানা নেই, সুতরাং তার মুখ বন্ধ করতে হলে চাই টাকা। যতীশ ভয়ে ভয়ে তাকে কিছু টাকা দিলে। কিন্তু তাতে নরেশের মন উঠল না। তখন আরও টাকা দেবার জন্যে তারিখ আর জায়গা ঠিক হল। কিন্তু টাকার বদলে নরেশ ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিলে। নরেশকে সরিয়ে ফেলবার পর নরমেধ যজ্ঞের হোতারা মনে করলে, এবার তারা নিশ্চিন্ত, কিন্তু আবার গোলমাল বাধলো ফিরোজাকে নিয়ে। সে কৃপানাথের কাছে গিয়ে টাকা চাইলে। অনেক টাকা চাই তার। তা না হলে··· সে কৃপানাথকে ভয় দেখালো। কৃপানাথ সে কথা যতীশকে জানালো। ফলে ফিরোজাও মারা পড়ল। ফিরোজার চিঠি, কৃপানাথ আর শীতলপ্রসাদের কবলুতি আর শেষবেশ নাহমের কাছে যা শুনেছি তার ওপর ভিত্তি করেই তোমাদের এই কাহিনী শোনালাম। আমাকে মারবার জন্যেও ওরা চেষ্টার কসুর করেনি। প্রথম দিনেই আমাকে মারতে চেয়েছিল যতীশ। যতীশ আমাকে বিলক্ষণ চিনত। বাগান থেকে গুলি সে-ই ছুঁড়েছিল। তারপর নাহমকে লাগিয়েছিল আমার পিছনে। রাস্তায় কাঁচের টুকরো বিছিয়ে আমার মোটরকে বনের মধ্যে অচল করে দিয়ে সেইখানে আমায় মারবার যে প্ল্যান করেছিল যতীশ, তার মধ্যে তার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন খুব অল্পের জন্যেই রক্ষা পেয়েছিলাম।

রণদেব থামল। অমিত প্রশ্ন করল—খবরের কাগজে আপনার যে মৃত্যু-সংবাদ বেরুলো তা কি পুলিশ সত্যি ভেবে বার করেছিল, না, তারা আসল ব্যাপার জানত?

মৃদু হেসে রণদেব বললে—শুধু ইনস্পেক্টার কবীর জানতো, আর কেউ নয়। সেদিন রাত্রে

নাহমকে কাবু করে ফেলে একটা গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে রেখে আমি কবীরকে ফোন করে দিই। কবীর ঘটনাস্থলে আসার পর দুজনের মধ্যে পরামর্শ করে আমি কবীরের সাহায্যেই সেই রাত্রে পরচুলা প্রভৃতি সংগ্রহ করে নাহমের রূপ ধরে ঈশানবাবুর বাগানে ফিরে যাই। অবশ্য যাবার আগে নাহমের সঙ্গে কথা বলে তার গলার স্বর নকল করে নিই।

ছোটাই এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। এইবার সবেগে চেঁচিয়ে উঠল—আপনি অতি সাংঘাতিক লোক। আমাকে পর্যন্ত জানান নি।

রণদেব হেসে উত্তর দিল—তুমি যে মনের ভাব চেপে রাখতে পারো না। সেবার আমাকে কী রকম বিপদে ফেলেছিলে মনে নেই?

—কোন্‌বার মিঃ ঘোষাল?

রণদেব বললে—সে এক বিষম পাকচক্র। আর একদিন সেকাহিনী আপনাদের শোনাবো। এখন আসুন, আমরা সবাই মিলে বরেন আর মিনতিকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং তাদের কাছে শিগগিরই একটা নেমন্তন্ন দাবী করি! আমাদের দাবী অবশ্যই তাদের মানতে হবে।

সকলে সমস্বরে রণদেবের প্রস্তাবকে সমর্থন করল। মিনতি আর বরেন সলজ্জ স্মিতমুখে সকলকে নমস্কার জানাল।

---

* * * *

হাজার হাজার পাঠক বিখ্যাত লেখক জোসেফ কনরাড্‌কে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, তাঁর Typhoon নামক উপন্যাসটিতে ঝড়ের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেটি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল কি না।

কনরাড্‌ বললেন—"না, মোটেই নয়। আমি ও রকম কোন ঝড়ের মুখে পড়ি নি।"

—"কিন্তু আশ্চর্য আপনার বর্ণনা শক্তি! কী নিখুঁতভাবে আপনি উন্মত্ত ঝড়ের বর্ণনা দিয়েছেন। ধন্য আপনার কল্পনা শক্তি!"

কনরাড্‌ এবার মৃদু হেসে বললেন—"ও রকম ঝড়ের মুখে সত্যি সত্যি পড়লে কি আর আমার উপন্যাসখানা ছাপতে পারতাম।"

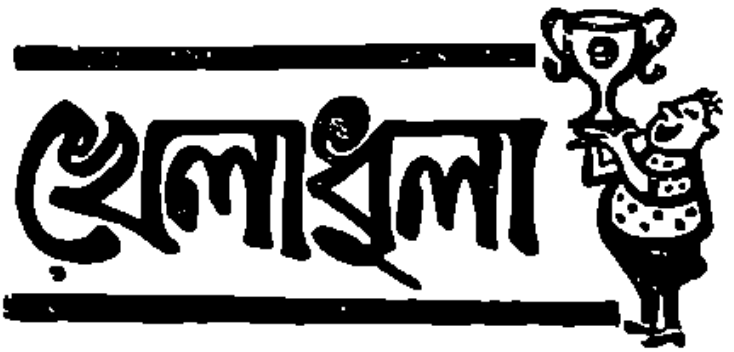

শ্রীজ্যোতির্ময়

ভারতের এক শত টেস্ট (১৯৩২—১৯৬৭)

অস্ট্রেলিয়া গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলার বিবরণ আপনারা সকলেই জেনেছেন। সে বিষয়ে অধিক আর কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। নানা কাগজেই এই নিয়ে লেখালেখি চলছে। অনেকেই যা আশা করেছিল সেই মতোই শোচনীয় ফল দেখিয়েছে ভারতের খেলোয়াড়রা। যাক সে কথা। এ সংখ্যায় আমরা অন্য কিছু তথ্যের অবতারণা করছি। ইংলণ্ড সফরে গিয়ে সেখানে শেষ টেস্ট খেলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শততম টেস্ট খেলা সম্পন্ন হয়। ১৯৩২ থেকে টেস্ট খেলা সুরু করে ১৯৬৭তে ইংলণ্ডে শেষ টেস্ট খেলে ভারতের একশো টেস্ট খেলা হল। অতএব এই একশ টেস্টের ফলাফল ও গতিয়ান পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সেই একশো খেলার কয়েকটি পরিসংখ্যান নীচে লিপিবদ্ধ হল।

অধিনায়ক অনুসারে	বছর	বিপক্ষ	জয়	হার	সমানসমানা	মোট খেলা	দেশে বা বিদেশে
সি কে. নায়ডু	১৯৩২	ইংলণ্ড	—	১	—	১	বিদেশে
"	১৯৩৩/৩৪	"	—	২	১	৩	দেশে
ভিজিয়ানাগ্রাম	১৯৩৬	"	—	২	১	৩	বিদেশে
পাতাউদি (বড়)	১৯৪৬	"	—	১	২	৩	"
অমরনাথ	১৯৪৭/৪৮	অস্ট্রেলিয়া	—	৪	১	৫	"
"	১৯৪৮/৪৯	ওয়েস্টইণ্ডিজ	—	১	৪	৫	দেশে
"	১৯৫২/৫৩	পাকিস্তান	২	১	২	৫	"
হাজারে	১৯৫১/৫২	ইংলণ্ড	১	১	৩	৫	"
"	১৯৫২	"	—	৩	১	৪	বিদেশে
"	১৯৫৩	ওয়েস্টইণ্ডিজ	—	১	৪	৫	"
মানকড়	১৯৫৪/৫৫	পাকিস্তান	—	—	৫	৫	"
"	১৯৫৮/৫৯	ওয়েস্টইণ্ডিজ	—	১	—	১	দেশে

অধিনায়ক অনুসারে।	বছর।	বিপক্ষ।	জয়।	হার।	সমান।	মোট খেলা।	দেশে বা বিদেশে
পোলার আমেদ	১৯৫৫/৫৬	নিউজীল্যাণ্ড	—	—	১	১	দেশে
"	১৯৫৮/৫৯	ওয়েস্টইণ্ডিজ	—	১	—	২	"
উমরিগড়	১৯৫৫/৫৬	নিউজীল্যাণ্ড	২	—	২	৪	"
"	১৯৫৬	অসট্রেলিয়া	—	২	১	৩	"
"	১৯৫৮/৫৯	ওয়েস্টইণ্ডিজ	—	—	১	১	"
অধিকারী	" "	"	—	—	১	১	"
গাইকোয়াড়	১৯৫৯	ইংলণ্ড	—	৪	—	৪	বিদেশে
পি রায়	"	"	—	১	—	১	"
রামচাঁদ	১৯৫৯/৬০	অসট্রেলিয়া	১	২	২	৫	দেশে
কনট্রাকটর	১৯৬০/৬১	পাকিস্তান	—	—	৫	৫	"
"	১৯৬১/৬২	ইংলণ্ড	২	—	৩	৫	"
"	১৯৬২	ওয়েস্টইণ্ডিজ	—	২	—	২	বিদেশে
পাতাউদি (ছোট)	"	"	—	৩	—	৩	"
"	১৯৬৪	ইংলণ্ড	—	—	৫	৫	দেশে
"	১৯৬৪/৬৫	অসট্রেলিয়া	১	১	১	৩	"
"	১৯৬৫	নিউজীল্যাণ্ড	১	—	৩	৪	"
"	১৯৬৬/৬৭	ওয়েস্টইণ্ডিজ	—	২	১	৩	"
"	১৯৬৭	ইংলণ্ড	—	৩	—	৩	বিদেশে
			১০	৪০	৫০	১০০	

ভারতের পক্ষে সেঞ্চুরি

নাম।	রান।	বিপক্ষ।	স্থান।	বছর/সন
এইচ আর অধিকারী	১১৫০	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	নিউ দিল্লী	১৯৫৮/৫৯
এল অমরনাথ	১১৮	ইংলণ্ড	বোম্বাই	১৯৩৩/৩৪
এম এল আপটে	১৬৩০	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	পোর্ট স্পেন	১৯৫৩
এ বেগ	১১২	ইংলণ্ড	ম্যানচেস্টার	১৯৫৯
সি জি বোরদে	১৭৭০	পাকিস্তান	মাদ্রাজ	১৯৬০/৬১
"	১২৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	"	১৯৬৬/৬৭
"	১২১	"	বোম্বাই	"
"	১০৯	"	নিউ দিল্লী	১৯৫৮/৫৯
"	১০৯	নিউজীল্যাণ্ড	বোম্বাই	১৯৬৫

নাম।	রান।	বিপক্ষ।	স্থান।	সময়
এন কনট্রাকটর	১০৮	অসট্রেলিয়া	-	১৯৫৯
এস ডুরানি	১০৪	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	পোর্ট স্পেন	১৯৬২
এস ঈনজিনিয়ার	১০৯	-	মাদ্রাজ	১৯৬৬/৬৭
হনুমন্ত সিং	১০৫	ইংলণ্ড	নিউ দিল্লী	১৯৬৩/৬৪
ভি এল মাঞ্জরেকর	১৯৪০	-	-	১৯৫১/৫২
-	১৫৫	-	বোম্বাই	১৯৫১/৫২
-	১৪৬৩	পাকিস্তান	-	১৯৫২/৫৩
-	১৪৫	অসট্রেলিয়া	অ্যাডিলেড	১৯৪৭/৪৮
-	১৩৪৩	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	বোম্বাই	১৯৫৮/৫৯
-	১২২	-	-	-
-	১৬৬	অসট্রেলিয়া	অ্যাডিলেড	১৯৪৭/৪৮
এম এল জয়সিমা	১২৯	ইংলণ্ড	কলকাতা	১৯৬৩/৬৪
-	১২৭	-	নিউ দিল্লী	১৯৬১/৬২
কৃপাল সিং	১০০	নিউজীল্যাণ্ড	হায়দরাবাদ	১৯৫৫/৫৬
বুধি কুন্দেরন	১৯২	ইংলণ্ড	মাদ্রাজ	১৯৬৩/৬৪
-	১০০	-	নিউ দিল্লী	- -
ভি মানকড়	২৩১	নিউজীল্যাণ্ড	মাদ্রাজ	১৯৫৫/৫৬
-	২২৩	-	বোম্বাই	- -
-	১৮৪	ইংলণ্ড	লর্ডস	১৯৫২
-	১১৬	অসট্রেলিয়া	মেলবোর্ণ	১৯৪৭/৪৮
-	১১১	-	-	- -
ভি এল মঞ্জরেকর	১৮৯০	ইংলণ্ড	নিউ দিল্লী	১৯৬১/৬২
-	১১৭	নিউজীল্যাণ্ড	-	১৯৫৫/৫৬
-	১৩৩	ইংলণ্ড	লীডস	১৯৫২
-	১১৮	নিউজীল্যাণ্ড	হায়দরাবাদ	১৯৫৫/৫৬
-	১১৮	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	কিংসটন	১৯৫৩
-	১০৮	ইংলণ্ড	মাদ্রাজ	১৯৬৩/৬৪
-	১০২০	নিউজীল্যাণ্ড	-	১৯৬৫
ভি এম মার্চেন্ট	১৫৪	ইংলণ্ড	নিউ দিল্লী	১৯৫১/৫২
-	১২৮	-	ওভ্যাল	১৯৪৬
-	১১৪	-	ম্যানচেস্টার	১৯৩৬
আর এস মোদি	১১২	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	বোম্বাই	১৯৪৮/৪৯
মুস্তাক আলি	১১২	ইংলণ্ড	ম্যানচেস্টার	১৯৩৬

নাম।	রান।	বিপক্ষ	স্থান	মরশুম
মুস্তাক আলি	১০৬	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	কলকাতা	১৯৪৮/৪৯
আর জি নাদকার্নি	১০২	ইংলণ্ড	কানপুর	১৯৬৩/৬৪
নবাব পাতাউদি (ছোট)	২০৩*	-	নিউ দিল্লী	১৯৬৩/৬৪
-	১৫৩	নিউজীল্যাণ্ড	কলকাতা	১৯৬৪
-	১৪৮	ইংলণ্ড	লীডস	১৯৬৭
-	১২৮*	অস্ট্রেলিয়া	মাদ্রাজ	১৯৬৪
-	১১৩	নিউজীল্যাণ্ড	নিউ দিল্লী	১৯৬৪
-	১০৩	ইংলণ্ড	মাদ্রাজ	১৯৬১/৬২
ডি জি কাদকর	১১৩	অস্ট্রেলিয়া	অ্যাডিলেড	১৯৪৭/৪৮
-	১১৪	ইংলণ্ড	কলকাতা	১৯৫./৫১
জি এস রামচাঁদ	১০৯	অস্ট্রেলিয়া	বোম্বাই	১৯৫৬
-	১০৪*	নিউজীল্যাণ্ড	কলকাতা	১৯৫৫/৫৬
পি রায়	১৭৩	-	মাদ্রাজ	১৯৫৫/৫৬
-	১৫০	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	কিংসটন	১৯৫৩
-	১৪০	ইংলণ্ড	বোম্বাই	১৯৫১/৫২
-	১১১	-	মাদ্রাজ	- -
-	১০০	নিউজীল্যাণ্ড	কলকাতা	১৯৫৫/৫৬
ডি সারদেশাই	২০০*	-	বোম্বাই	১৯৬৫
-	১০৬	-	নিউ দিল্লী	১৯৬৫
ডি শোধন	১১০	পাকিস্তান	কলকাতা	১৯৫২/৫৩
পি আর উমরিগড়	২১৩	নিউজীল্যাণ্ড	হায়দরাবাদ	১৯৫৫/৫৬
-	১৭২*	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	পোর্ট স্পেন	১৯৬২
-	১৪৭*	ইংলণ্ড	কানপুর	১৯৬১/৬২
-	১৩০*	-	মাদ্রাজ	১৯৫১/৫২
-	১৩০	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	পোর্ট স্পেন	১৯৫৩
-	১১৮	ইংলণ্ড	ম্যানচেস্টার	১৯৫৯
-	১১৭	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	কিংসটন	১৯৬৩

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, মঞ্জরেকর, হাজারে এবং উমরিগড় প্রত্যেকে ৭ বার সেঞ্চুরি করেছেন। তবল সেঞ্চুরি করেছেন একমাত্র উমরিগড় নিউজীল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-৫৬র মরশুমে। এক টেস্টের দু'ইনিংসএই সেঞ্চুরি করেছেন একমাত্র হাজারে। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড টেস্ট-এ ১৯৪৭-৪৮-এর মরশুমে।

---

* অর্থে নট আউট।

ভারতের পক্ষে বোলিং-এর কৃতিত্ব : মরশুম অনুযায়ী

সবচেয়ে বেশি সংখ্যা উইকেট পাওয়ার খতিয়ান।

বোলার।	বিপক্ষ।	মোট রান দিয়েছেন।	মোট উইকেট পেয়েছেন।	মরশুম
নিসার	ইংলণ্ড	১৩৫	৬	১৯৩২
অমর সিং	"	৫৮২	১৪	১৯৩৫/৩৪
নিসার	"	৩৪৩	১২	১৯৩৬
অমরনাথ	"	৩৩০	১৩	১৯৪৬
"	অষ্ট্রেলিয়া	৩৬৬	১৩	১৯৪৭/৪৮
মানকড়	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৭৪৪	১৭	১৯৪৮/৪৯
"	ইংলণ্ড	৫৭১	৩৪	১৯৫১/৫২
গোলাম আমেদ	"	৩৭১	১৫	১৯৫২
মানকড়	পাকিস্তান	৫১৪	১৫	১৯৫২/৫৩
এস. পি. গুপ্তে	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৭৮৯	২৭	১৯৫৩
"	পাকিস্তান	৪৭৬	২১	১৯৫৪/৫৫
"	নিউজীল্যাণ্ড	৬৬১	৩৪	১৯৫৫/৫৬
গোলাম আমেদ	অষ্ট্রেলিয়া	১৯৭	১২	১৯৫৬/৫৭
এস. পি. গুপ্তে	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৯২৭	২২	১৯৫৮/৫৯
"	ইংলণ্ড	৫০৯	১৭	১৯৫৯
জে. এম. প্যাটেল	অষ্ট্রেলিয়া	৩২৭	১৯	১৯৫৯/৬০
আর. বি. দেশাই	পাকিস্তান	৪৯০	১৫	১৯৬০/৬১
দুরানী	ইংলণ্ড	৬২২	২৩	১৯৬১/৬২
"	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬০০	১৭	১৯৬২
"	ইংলণ্ড	৪৭১	১১	১৯৬৩/৬৪
নাইকানি	অষ্ট্রেলিয়া	২৩৩	১৭	১৯৬৪
ভেনকাটারাঘবন	নিউজিল্যাণ্ড	৩৯৯	২১	১৯৬৪
চন্দ্রশেখর	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৪১৩	১৮	১৯৬৬/৬৭
"	ইংলণ্ড	৪০৫	১৬	১৯৬৭

ব্যাটিং ও বোলিংএ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত কৃতিত্ব

যাঁরা সব টেস্ট মিলিয়ে ব্যাটিংএ ৫০০ বা তদধিক রান করেছেন অথবা বোলিং-এ ১০টি বা তদধিক উইকেট পেয়েছেন :—

নাম।	মোট খেলা।	ব্যাটিং-এ রান।	বোলিং-এ উইকেট পেয়েছেন।	রান দিয়েছেন
অধিকারী	২১	৮৭২	—	—
অমরনাথ	২৪	৮৭৮	৪৫	১৪৮১
অমর সিং	৭	—	২৮	৮৫৮
আপ্তে	৭	৫৪২	—	—
বেদী	৫	—	১৪	৪৬৪
বোরদে	৪৬	২৬৩৪	৫২	২৪১৬
চন্দ্রশেখর	১৪	—	৬১	১৭৬৮
কন্ট্রাক্টর	৩১	১৬১১	—	—
ঘোষাই	২৬	—	৭২	২৬২৪
দুররানী	২০	৯৩৫	৬০	২৪৩৬
ইঞ্জিনীয়ার	১৫	৭৪৯	—	—
গোলাম আমেদ	২২	—	৬৮	২০৫২
গুপ্তে	৩৬	—	১৪৯	৪৪০৩
হুসেন সিং	১৩	৬৭২	—	—
হাজারে	৩০	২১৯২	২০	১২২০
জয়সীমা	২৯	১৭৪১	—	—
কৃপাল সিং	১৪	—	১০	৫৮৪
কৃষ্ণেরন	১৮	৯৮১	—	—
মানকড়	৪৪	২১০৯	১৬২	৫২৩৫
মঞ্জরেকর	৫৪	৩২০৯	—	—
মার্চেন্ট	১০	৮৫৯	—	—
মোদি	১০	৭৩৬	—	—
মুস্তাক আলি	১১	৬১২	—	—
নায়কানি	৩৪	১২৭৪	৭১	২০৯১
নিসার	৬	—	২৫	৭০৭
পাতাদৌ (ছোট)	২৪	১৬৪৩	—	—
প্যাটেল	৭	—	২৯	৬৩৬
রামকৃষ্ণ	৩১	১২২৯	৬১	২২৮৫

নাম।	মোট খেলা।	ব্যাটিং-এ রান।	বোলিংএ উইকেট পেয়েছেন।	রান দিয়েছেন
প্রসন্ন	৬	—	১৮	৮১৫
রামচাঁদ	৩৩	১১৮০	৪১	১৮৯৯
রতনে	৭	—	১৯	৬৪৯
পি. রায়	৪৩	২৬৪১	—	—
সারদেশাই	১৮	১১৪৮	—	—
সিন্ধে	৭	—	১২	৭১৭
সুরেন্দ্রনাথ	১১	—	২৩	১০৫৩
স্মৃতি	১৫	৫২৫	১৮	১১০১
উমরিগড়	৫৯	৩৬৩১	৩৫	১৪১৫

ভারতীয় উইকেটরক্ষকের কৃতিত্বের খতিয়ান :—

নাম।	মোট খেলা।	ক্যাচ ধরেছেন।	স্টাম্প করেছেন
দিলওয়ার হোসেন	৩	৬	১
ইনজিনীয়ার	১৫	২০	৩
ইন্দ্রজিৎ সিংজি	৩	৪	৩
বোর্দী	১২	১৮	৯
কুন্দেরন	১৮	২৪	৭
যাকা	২	২	১
পতৌদি	১	৩	১
রাজেন্দ্রনাথ	১	১	৩
পি. সেন	১৪	২০	১১
তামানে	২১	৩৫	১৬

আগামী সংখ্যার

আকর্ষণ

একটি ক্রিকেট সংস্থার শতবার্ষিকী

অন্ধ্রের মন্দির

শ্রীপ্রবোধ কুমার চক্রবর্তী

পূর্বানুবৃত্তি

—দুই—

(ভেঙ্কটাইয়ার গাড়ি থেকে নেমে দরজার সামনেই পায়চারি করছিলেন ব্যস্তভাবে। আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন, বললেন : একটু সাবধানে যাবেন।

কেন ?

এরা সাংঘাতিক জাত মশাই, মুখ আর ব্যবহার এমন মিষ্টি যে সাপকেও বশ করতে পারে। কিন্তু নিজের স্বার্থে আত্মীয়ের গলায় ছুরি চালাতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনা।

আমি আশ্চর্য হলুম তাঁর কথা শুনে, বললুম : আপনি কি বড়লোকের কথা বলছেন ?

গরিব আর বড়লোকে কিছু আসে যায় না, সবাই এই রকম।

আমি মামাবাবুর কথা ভাবছিলুম। বললুম : আমরা তো ঘুরে ঘুরেই থাকি। দেখছেন না, ওঁদের সাথেই এক গাড়িতে তো যাচ্ছিনা।

ভেঙ্কটাইয়ার এবারে আশ্চর্য হলেন, বললেন : এক গাড়িতে যাচ্ছেন না মানে! দিদি তো পাশে এসে ঘেঁষে বসেছেন।

ঠিক এই সময়েই ইঞ্জিনের বাঁশি বাজল। আর ভেঙ্কটাইয়ার লাফিয়ে পড়লেন গাড়িতে।

আমি উঠে দেখলুম যে মৈত্রমশাই এখন শ্রীনিবাসুলুর পাশে আরও ঘেঁষে বসেছেন। গাড়ি অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে, পা ছড়িয়ে এলিয়ে বসবারও জায়গা হয়েছে। মৈত্র মশাই তবু দূরে বসেননি, শ্রীনিবাসুলুর পাশে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বসে গল্প শুনছেন। বুঝতে আমার কষ্ট হলনা যে ভেঙ্কটাইয়ার একটু আগে শ্রীনিবাসুলুর কথাই বলছিলেন। তাঁর অল্প বিরাগের কথা আমার জানা ছিল, তাই তাঁর পরামর্শকে আমি সম্মান করতে পারলুমনা। আমিও এসে শ্রীনিবাসুলুর পাশে বসলুম।

মৈত্র মশাই আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন : বিজয়নগরের রাজার উপাধি শুনেছেন ?

আমি বললুম : না।

মৈত্র মশাই শ্রীনিবাসুলুকে বললেন : বলুন না আর একবার।

তৎপর ভাবে শ্রীনিবাসুলু বললেন : মহারাজা সাহেবা মেহেরবান মুস্তাফু বাদের খান করম করমারী মোখ্‌লেসান মহারাজা মির্জা মুন্না সুলতান শাক বাহাদুর।

শ্রীনিবাসুলুর গম্ভীর বহর দেখে আমি হেসে ফেললুম।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : হাসছেন আপনি! ষোলো বাদশাহেরা মহারাজাকে উপাধি দিয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজা ছিলেন বিজয়রাজ গজপতিরাজ, তার একুশ বছর পরে রাজা হয়েছিলেন তাঁর পুত্র আনন্দরাজ। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, ফেলো ছিলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের। আর প্রথমে মাদ্রাজ সরকারের ওপরে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বার হয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে কে, সি, আই, ই ও জি, সি, আই, ই উপাধি দিয়েছিলেন।

মৈত্র মশাই বললেন : রাণীর নামটা বলুন।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : আনন্দরাজার মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র ছিলেন নাবালক। নিজের হাতে মহারাণী নিয়েছিলেন রাজ্যশাসনের ভার। তাঁর উপাধি ছিল মির্জা মুন্না সুলতান সাহেবা শ্রীমহা রাজ্যলক্ষ্মী দেবদেবী শ্রীঅলকরপেশ্বরী মহারাণী। এ ঘটনা কিন্তু এই শতাব্দীর।

এবারেও আমি কিছু না বলে হাসলুম।

শ্রীনিবাসুলু বিরক্ত হলেন, বললেন : বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাস আপনি জানেন?

বললুম : প্রাচীন কিচকিন্ধ্যার যে বিজয়নগর রাজ্য, তার সম্বন্ধে কিছু জানি।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : এখন আপনারা জমিদারী বলে চালাতে পারেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্বেও এ একটি করদ রাজ্য বলে গণ্য হত। রাজারা রাজপুত ছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁরা কৃষ্ণানদীর উপত্যকায় এসে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তিনশো বছর আগে তাঁরা বিশাখাপত্তনমে এসেছিলেন চাকরি করতে। তারপরে ধীরে ধীরে রাজ্যজয় করে রাজা হয়ে বসেছেন। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে গোপ বিজয়রাম রাজু এই বিজয়নগরকে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

আমি বললুম : বিজয়নগরকে কি রাজধানী করেছিলেন?

প্রশ্নটি বুঝতে না পেরে শ্রীনিবাসুলু আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : রাজধানী স্থাপন করে বোধহয় এই স্থানের বিজয়নগর নাম করেছিলেন নিজের নামে।

সত্যি নাকি!

বলে মৈত্র মশাই তাকালেন শ্রীনিবাসুলুর দিকে।

সে ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন : হুঁ।

আমি বললুম : বলুন তারপরে।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : গত শতাব্দীতে রাজা বিজয়রাম গজপতির আমলে এই রাজ্যে ও এই সহরের অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি শুধু নিজের রাজ্যে নয়, মাদ্রাজ কলকাতা কাশী এমনকি লণ্ডনেও অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন।

আমি বললুম : আমরা বিজয়নগরের নাম জানি অন্য কারণে।

কেন?

মহারাজকুমার অব ভিজিয়ানাগ্রামের কণ্ঠস্বর আমার খুব প্রিয়। তাঁর ক্রিকেট খেলা আমি দেখিনি কিন্তু তাঁর কমেনটারি আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : ক্রিকেটের জগতে তিনি ভিজি নামে পরিচিত।

গাড়ির জানালা দিয়ে আমি বাহিরের দিকে তাকালুম। পরতের সোনালি রৌদ্র তখন প্রখর হয়ে উঠেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা ওয়ালটেয়ার পৌঁছব, নামব সেইখানে।

কেন জানিনা, এক অদ্ভুত ভাবনায় মন আমার দুলে উঠল। মামাবাবুরা রামেশ্বর দর্শনে যাচ্ছেন। মাদ্রাজে বড় লাইনের ট্রেন থেকে নেমে ছোট লাইনের গাড়িতে উঠলেন। সে যাত্রায় রইল অনেক দূরে, একদিন এক রাত্রির যাত্রা আরও বাকি রয়ে গেল। সহসা মত বদলে আমরা ওয়ালটেয়ারেই নেমে পড়ছি। নূতন জায়গা দেখবার ইচ্ছাতেই যে পুরাতন মনের পরিবর্তন হল তাতে আমার সন্দেহ নেই। শুধু স্বাতির একার ইচ্ছাতেই এ সম্ভব হয়নি। পরিবারের সকলেরই সমর্থন ছিল। এরই নাম কি প্রগতি নয়। পুরাতন যান বাহনকে আমরা ক্রমাগত পিছনে ফেলে চলি! নূতনকে স্বাগত জানিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাই সগৌরবে।

ওয়ালটেয়ারে পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই মৈত্র মশাই ছটফট করতে লাগলেন। দুধারে পাহাড় দেখতে লাগলেন কিন্তু অবিশ্বাসের সংকল্প নিয়ে।

বললুম : ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মৈত্র মশাই?

মৈত্র মশাই বললেন : কাছেই কোনও পাহাড়ে শুনেছি নৃসিংহ ক্ষেত্র।

শ্রীনিবাসুলু হাসলেন, বললেন : সীমাচলম পাহাড়ের কথা যে আপনাকে বললুম তারই উপরে তো নৃসিংহের ক্ষেত্র। কিন্তু গাড়ি থেকে দেখতে পাবেননা। সীমাচলম স্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে পাহাড়ের অন্য ধারে।

ছেলেমানুষের মতো মৈত্র মশাই বললেন : কী আছে সেখানে?

শ্রীনিবাসুলু বললেন : বলেছিতো, দেখবার সখ থাকলে দুর্গা বলে নেমে পড়ুন ওয়ালটেয়ারে। একটা দিন খরচ হলে আপনার ক্ষতি হবেনা। সবকিছু দেখবার পর একটা দিন নষ্ট হয়েছে বলবেন না।

মৈত্র মশাই ইতস্তত করছেন দেখে বললেন : সাতমাইল পথ বাসে যাতায়াত করবেন। সিংহগিরি পাহাড়ের নিচে আপনাকে নামিয়ে দেবে। তারপর একহাজার সিঁড়ি।

মৈত্র মশাই চমকে উঠে বললেন : এক হাজার!

শ্রীনিবাসুলু বললেন : আপনি বুঝতেও পারবেন না। বস্ত্র রাণী অহল্যাবাই এই হাজার সিঁড়ি বাঁধিয়ে দিয়ে হাজার যাত্রীর আশীর্বাদ পাচ্ছেন প্রতিদিন।

হাজার সিঁড়ির কথা শুনে আমিও ভয় পেলুম। নিজের জন্য নয়, ভয় পেলুম মামাবাবু ও মামীর জন্য। তাঁরা এই প্রস্তাব স্বীকার করতে পারবেন কিনা জানিনা।

—আপনিও ভয় পেলেন কি?

বলে শ্রীনিবাসুলু আমার দিকে তাকালেন।

আমি হাসলুম তাঁর প্রশ্ন শুনে।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : পাহাড়ের উপরে নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছে শুনছি। গাড়িতেই হয়তো উঠতে পারবেন। সীমাচলমের দেবস্থানম বাস চালাবেন। যাত্রীদের তখন পাহাড়ের নিচে বাস বদল করতে হবে, পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে হবে না। আশ্বস্ত হয়ে মৈত্র মশাই বললেন : তাহলে সেই সময়েই আসা যাবে, কী বলেন।

আপনার মর্জি।

বলে শ্রীনিবাসুলু নীরব হলেন।

মৈত্র মশাই বললেন : আপনি রাগ করছেন কেন? এক যাত্রাতেই কি সবকিছু দেখা সম্ভব। দেখবার সখ থাকলে ঘুরে ঘুরে আসতে হয়। আপনি বলুন না কী আছে দেখবার?

শ্রীনিবাসুলু নীরব থাকতে পারলেন না। বললেন : পুরাণে আপনি ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনী পড়েছেন ?

মৈত্র মশাই বললেন : ছেলেবেলায় পাঠশালায় পড়েছিলুম।

তার মানে, এখন সব ভুলে গেছেন।

মৈত্রমশাই একথার প্রতিবাদ করলেন না দেখে বললেন : প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ছোট ছেলে। সত্য যুগে দেবতা অসুর ও মানুষে কতটা প্রভেদ ছিল জানেন তো! সবাই সেই কশ্যপ মুনির সন্তান। এক মায়ের ছেলে ইন্দ্রাদি দেবতা আর এক মায়ের ছেলে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু। এই দৈত্যেরা যেমন বলবান ছিলেন, ধার্মিকও ছিলেন তেমনি। কিন্তু হিরণ্যকশিপু দেববেষী হয়েছিলেন। বিষ্ণুর নাম শুনলেই চটে উঠতেন। বরাহ অবতারের গল্প জানেন তো ?

মৈত্র মশাই বললেন : ও সব ভুলে গেছি।

এও বোধহয় কবে ছেলেবেলায় পাঠশালায় পড়েছিলেন !

বলে শ্রীনিবাসুলু বললেন বরাহ অবতারের গল্প।

অনেকদিন চুপ করে বসে থেকে হিরণ্যাক্ষের বিরক্তি এসেছিল। একদিন ভাবল : যাই একবার দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আসি। কিন্তু স্বর্গে গিয়ে দেখল যে দেবতারা কেউ কোথাও নেই, ভয় পেয়ে সব পালিয়ে গেছেন। হিরণ্যাক্ষ ভাবল যে তাঁরা পাতালে গেছেন। সেখানে গিয়ে শুধু বরুণকেই দেখতে পেল। ভয় পেয়ে বরুণ বললেন, আমার সঙ্গে কেন, বিষ্ণু পাতালে এসেছেন বরাহের রূপ ধরে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে, তুমি তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধ কর। বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে হিরণ্যাক্ষ প্রাণ হারাল, আর হিরণ্যকশিপু এই সংবাদ পেয়ে দেবতাদের উপর চটে গেল।

তারপর ?

হিরণ্যকশিপুর চার ছেলে, সবচেয়ে ছোট প্রহ্লাদ। সে ছিল বিষ্ণু ভক্ত, লুকিয়ে লুকিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করত। সেই খবর পেয়ে হিরণ্যকশিপু বলল, খবরদার, আমার ছেলে হয়ে তুমি আমার শত্রুর পূজা করবেনা। কিন্তু প্রহ্লাদ সে কথা শুনল না। যেমন আগে তেমনি পরেও বিষ্ণুর পূজো করতে লাগল। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বলল, এই ধৃষ্টতা আমি সইব না। প্রহ্লাদকে সমুদ্রের জলে ফেলে দাও, আর একটা পাহাড় দিয়ে চাপা দাও তাকে। যেমন হুকুম, তেমনি কাজ। প্রহ্লাদকে যখনতখন সমুদ্রে ফেলে সেই সীমাচল পাহাড়টা তার ওপরে চাপা দেওয়া হল। কিন্তু বিষ্ণু হলেন ভক্তবৎসল। তিনি তখনি নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করে এলেন, আর সেই পাহাড়ের একটা ধার তুলে ধরলেন। প্রহ্লাদ রক্ষা পেয়ে গেল।

বিষ্ণু পুরাণে আমরা যে গল্প পড়েছি তা একটু অন্যরকম। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বধ করবার জন্য সবরকম চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু তাকে প্রতিবার রক্ষা করেছিলেন। শেষে ব্যর্থ হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কে তোমাকে বার বার রক্ষা করে ? প্রহ্লাদ বলেছিল, হরি। হিরণ্যকশিপু প্রশ্ন করেছিলেন, কোথায় তোমার হরি ? প্রহ্লাদ বলেছিল, তিনি সর্বত্র আছেন। এই স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে আছে ? প্রহ্লাদ কোন চিন্তা না করেই বলল, আছেন। তবে দেখি তোমার হরিকে। বলে হিরণ্যকশিপু সেই স্ফটিক স্তম্ভ পদাঘাতে ভেঙে ফেললেন। দু চোখ বন্ধ করে প্রহ্লাদ তখন বিষ্ণুকে স্মরণ করছিল, হে নারায়ণ, তুমি আমার মুখ রক্ষা কর। ভক্তের মুখ রক্ষা করলেন নারায়ণ, তিনি সেই স্ফটিক স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী প্রসন্ন মূর্তিতে নয়, অর্ধেক নর ও অর্ধেক সিংহের মতো ভয়ঙ্কর মূর্তিতে। নৃসিংহ অবতার। ব্রহ্মার কাছে হিরণ্যকশিপু বর পেয়েছিলেন, যে কোন দেবতা মানুষ বা পশুর হাতে তাঁর মৃত্যু হবে না, দিনে বা

মাটিতে নয়, জলে স্থলে ও আকাশে নয়। বিষ্ণু তাই সায়াহ্নের অন্ধকারে নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়ে হিরণ্য-কশিপুকে নিজের কোলের উপরে রেখে বধ করলেন।

আমি এই গল্প শ্রীনিবাসুলুকে বললুম না। ভদ্রলোক মৈত্র মশাইকে বললেন। সীমাচল পাহাড়ে নৃসিংহ অবতারের এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ভক্ত প্রহ্লাদ তাঁর শেষ জীবন এইখানেই অতিবাহিত করেছিলেন।

মৈত্র মশাই বললেন : আশ্চর্য! সেই কোন্ সত্য যুগের মন্দির আজও আছে।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : সে মন্দির কি আর আছে। তবে বিগ্রহ যে পুরাকালের তাতে সন্দেহ নেই। লোকে ভুলে গিয়েছিল এই বিগ্রহের কথা। দীর্ঘদিন পরে চন্দ্রবংশের রাজা পুরুরবা স্বপ্নে এই বিগ্রহের সন্ধান পেয়ে আবার দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। উর্বশী পুরুরবার গল্প আপনার জানা আছে?

মৈত্র মশাই মাথা নেড়ে বললেন : পাঠশালায় ও গল্প পড়িনি।

শ্রীনিবাসুলু খুশী হলেন, বললেন : স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী বহু বৎসর সংসার করেছিলেন পৃথিবীর রাজা পুরুরবার সঙ্গে। একবার তাঁরা এই লীলাবনের পাহাড়ে বেড়াতে এসেছিলেন। আর এইখানে এসেই উর্বশীর একটি পুরনো কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, রাজা নৃসিংহদেবের মন্দির তো এখানে দেখছি না। তারপর বলেছিলেন যে অনেকদিন আগে এই মন্দিরে দেবতার সামনে তিনি নাচতে আসতেন। দুজনে মিলে অনেক খুঁজলেন, কিন্তু দেখতে কিছুই পেলেন না। হতাশ হয়ে তপস্যায় বসলেন দুজনে। তিন দিন তিন রাত্রি পরে দেবতা স্বপ্নে রাজাকে দেখা দিয়ে নিজের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিলেন। পরদিন দেবতাকে খুঁজে পেলেন রাজা, আবার প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁকে। আজও তাই প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ায় দেবতার বড় উৎসব।

আমি শুনেছি যে লীলাবনের মন্দির উড়িষ্যার কোন রাজা নির্মাণ করেছেন। কিন্তু সে কতদিন আগে তা আমার জানা ছিল না।

আমি বললুম : ইতিহাসের কথা কিছু বলবেন না?

শ্রীনিবাসুলু বললেন : ইতিহাসের কথা মানে তো শিলালিপির কথা। মন্দিরে তার অভাব নেই। সবচেয়ে পুরনো শিলালিপি শুনেছি রাজা কুলোত্তুঙ্গ সোলের, কলিঙ্গ দেশ জয় করে একটি শিলালিপি রেখেছেন ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। কলিঙ্গের গঙ্গা রাজাদেরও অনেক শিলালিপি আছে। তারই একটাতে জানা যায় যে মন্দিরের মুখমণ্ডপ ও নাট্যমণ্ডপও নির্মাণ করেছেন রাজা প্রথম নরসিংহদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। রাজা মন্ত্রীর অন্য রাজারাও এই মন্দিরে অনেক কিছু দান করেছেন। আর একজন নাকি দেবতার বিগ্রহ সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা কৃষ্ণদেবরায়ও এসেছিলেন দুবার। তিনি যে ধনরত্ন দিয়ে গেছেন, মন্দিরে তা এখনও আছে।

সীমাচলম ষ্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায় না। বিজয়নগরের পর সোজা গিয়ে দাঁড়ায় ওয়ালটেয়ারে, সীমাচলম ষ্টেশন আমরা কখন পেরিয়ে গেছি খেয়াল করিনি। পথের ধারের পাহাড় খানিকটা দূরে তার কোল ঘেঁষে রাজপথও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে।

মৈত্র মশাই শ্রীনিবাসুলুর দিকে চেয়ে বলেছিলেন। এমনিই ভোতাই চান শ্রীনিবাসুলু। বললেন : মন্দিরের মুখমণ্ডপে একটি পাথরের থাম আছে, তার নাম কম্পম স্তম্ভম। হিরণ্যকশিপু নাকি লাথি মেরে এই থামটি ভেঙেছিলেন, তারই প্রতীক এটি। এখানে মানৎ করে সন্তান পাওয়া যায় বলে বহুযাত্রী এসে এখানে ভিড় করে। পঙ্গু রোগ আরোগ্য হয়। আর বন্ধ্যা নারীর হয় সন্তান।

আর কিছু দেখবার আছে ?

প্রবল কৌতূহল নিয়ে মৈত্র মশাই তাকিয়ে আছেন।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : মন্দিরের কাছাকাছি আছে একটি ঝর্ণাধারা। তার নাম গঙ্গাধারা। উপরে নিচে গ্রানাইট পাথর দিয়ে বাঁধানো, লোকে বলে যে ত্রিধারা স্নানের পুণ্য হয় এই গঙ্গাধারায় স্নান করে। নানাদেশের যাত্রী এসে মাথা মোড়াচ্ছে স্নানের আগে। কিছুদিন আগে নাকি এই চুল বিক্রি করে মন্দিরের আয় হত হাজার তিনেক টাকা।

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছিল। শ্রীনিবাসুলু নিচু হয়ে একবার বেঞ্চির তলায় তাঁর টিনের বাক্স আর শতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানাটা দেখে নিলেন। তারপরে বললেন : এখানকার ফুলের মালা কখনও দেখেছেন কি ?

উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল না, তবু মৈত্র মশাই তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বললেন—না।

শ্রীনিবাসুলু বললেন : সেও এক অপূর্ব জিনিষ। সুতোর গোছ নিশ্চয়ই মারওয়াড়ীর চাঁাকে দেখেছেন ! এ হল করির গেঁজে, তার ভেতরে টাকার বদলে নানান রকম ফুল।

গাড়ির গতি আরও মন্থর হল। শ্রীনিবাসুলু তাঁর তোয়ালের রুমাল দিয়ে নিজের কাঁধ ও মুখখানা পরিষ্কার করতে করতে বললেন : আর একটি অলৌকিক জিনিষ দেখতে পাবেন সীমাচলমে, নিজের চোখে না দেখে এ কথাটা বিশ্বাস করবেন না।

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : সে আবার কী ?

শ্রীনিবাসুলু বললেন : বালি ধানের চালে সিংহদেবের ভোগ হয় না।

মানে ?

মানে রোজ ধান কাটা হয়, আর সেই ধানের চালে ভোগ হয় দেবতার। এর জন্যে সীমাচলমের এক বিশেষ এলাকায় রোজ ধান রোপণ করা হচ্ছে, ধান কাটাও হচ্ছে রোজ। আমি নিজের চোখে দেখিনি, আপনারা গেলে জিজ্ঞাসাবাদ করে জিনিষটা জেনে নেবেন।

শ্রীনিবাসুলু উঠে দাঁড়াতেই মৈত্র মশাই বড় বিমর্ষ হলেন। বললেন : আপনি কি এখানেই নেমে যাবেন ?

আমার বাড়ি এইখানেই।

বলে শ্রীনিবাসুলু তাঁর বাক্স বিছানা হাতে তুলে নিলেন।

গাড়ি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াচ্ছিল আমিও আমার চাদর ও বালিশটা বগলে চেপে উঠে দাঁড়ালুম।

মৈত্র মশাই যেন আর্তনাদ করে উঠলেন : আপনিও নামছেন নাকি !

আমি সংক্ষেপে বললুম : হ্যাঁ।

আপনারা সবাই নামছেন !

বড় করুণ দেখাল মৈত্র মশায়ের মুখখানা। তাই দেখে শ্রীনিবাসুলু বললেন : আপনিও নামুন না, আমি আপনাকে সব দেখিয়ে পরে এই গাড়িতেই আবার তুলে দেব।

মৈত্র মশাই আর দ্বিধা করলেন না। তাঁর সঙ্গে একটা বড় ব্যাগ আর কাপড়ের ঝোলা ছিল একটা। সেই দুটো সংগ্রহ করে তিনিও আমাদের সঙ্গে ওয়ালটেয়ারে নেমে পড়লেন।

—তিন—

নূতন ওয়াল্টেয়ার স্টেশন তৈরি হচ্ছে পুরনো স্টেশনের ঠিক পিছনেই। প্ল্যাটফর্ম থেকে সরাসরি বেরবার পথ নেই। বাহিরে যাবার অস্থায়ী পথ এক প্রান্তে। যাত্রীরা সেই দিকেই চলতে লাগলেন।

মৈত্র মশাইকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনিবাসলু এগোলেন। আমার দিকে তাকালেন রহস্যময় চোখে। নমস্কার করে আমি তাঁদের পিছু নিলুম।

স্বাতি এগিয়ে আসছিল, আমাকে দেখতে পেয়ে থেমে পড়ল। মামা মামীও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন, কুলিরা নামাচ্ছিল মালপত্র।

আমি কাছে আসতেই মামা বললেন : নামাতো গেল, কিন্তু তারপর ?

স্বাতি উত্তর দিল, বলল : ভাবছ কেন বাবা, ভাল ব্যবস্থাই হবে।

মামাবাবুকে খানিকটা বিচলিত দেখলাম। বললেন : জানিনা কী ব্যবস্থা হবে।

এই শহরে আমাদের একটি রাত বাস করতেই হবে। তার জন্যে একটা আশ্রয় চাই।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে বলল : এই স্টেশনে রিটায়ারিং রুম নেই গোপালদা !

বললুম : দেখে আসি।

প্ল্যাটফর্মের একজন রেলের কর্মচারী বললেন, রিটায়ারিং রুম আছে, আর একজন বললেন নেই। শেষ পর্যন্ত স্টেশনে জিজ্ঞাস করে খবর পেলুম যে নতুন স্টেশন তৈরী শেষ না হলে যাত্রীরা এসব সুবিধা পাবেনা, টাণীর যৌন্ট্রিতে যাবার পরামর্শ দিলেন তিনি।

যৌন্ট্রি কি হোটেল ?

না, ধর্মশালা।

আমি বললুম : ধর্মশালায় আমাদের সুবিধা হবে না।

ভদ্রলোক বললেন : যৌন্ট্রির ভিতরে আছে হোটেল বিশাল, সেটা আপনাদের পছন্দ হবে।

স্বাতি যে আমাকে অনুসরণ করে চলে এসেছিল তা দেখতে পাইনি। তার প্রশ্ন শুনে ফিরে দেখলুম। সে জিজ্ঞাস করল : সমুদ্রের ধারে কোন হোটেল নেই ?

ভদ্রলোক বললেন : তাও আছে। পুরনো বাড়ির মধ্যে সাহেবদের হোটেল। যাঁরা বেশি পয়সা খরচ করতে চান, তাঁরাই যান সেখানে।

ভালো করে আমাদের একবার দেখে বললে : আপনাদের বোধহয় পছন্দ হবেনা।

স্বাতি বলল : কেন ?

ভদ্রলোক এ কথার উত্তর দিতে চাইলেন না, বললেন : ট্যাক্সি পাবেন, রিক্সাও আছে অনেক, কোন জায়গায় ওঠবার আগে একটু ঘুরে দেখে নিন। হোটেলের অভাব নেই ওয়াল্টেয়ারে।

সেই ভাল।

বলে আমরা ফিরে এলুম। তারপরে আমার বড় কাজের কথাটি মনে পড়ে গেল। আমার কাছে থেকে টিকিটগুলো চেয়ে এনে আমি পথে নেমে পড়ার কথাটি লিখিয়ে নিলুম। কয়দিনের রিজার্ভেশানের জন্যেও অনুরোধ করলুম তাকে।

মালপত্র মাথায় নিয়ে কুলিরা দাঁড়িয়ে ছিল। মামা ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। আমাকে ফিরতে দেখেই মামা বলে উঠলেন : হবে ব্যবস্থা ?

তৎপরভাবে স্বাতি বলল : হয়েছে। গোপালদা ধর্মশালায় ব্যবস্থা করেছেন।

বলে সকৌতুকে তাকাল আমার দিকে।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : ধর্মশালায়!

স্বাতি বলল : এস এস, দেখিনা গোপালদার ব্যবস্থা।

বলে কুলিদের ডেকে নিয়ে এগিয়ে গেল।

চলতে চলতে মামা বললেন : সত্যি নাকি গোপাল?

বললুম : ধর্মশালার এলাকার মধ্যে নাকি ভাল হোটেল আছে। পছন্দ না হলে সমুদ্রের ধারে বিলিতি হোটেলে যাওয়া হবে।

মামী বললেন : নানা, বিলিতি হোটেলে যাবার দরকার নেই। একটা রাত ঐ ধর্মশালাতেই কাটানো হবে।

মামীর আপত্তির কারণ আমি বুঝি। অপত্যের কারণ বুঝি মামারও। তাই কথা না বলে আমি তাঁদের সঙ্গে অগ্রসর হলুম নীরবে।

স্টেশনের বাহিরে বেরিয়ে স্বাতির বিপদ দেখতে পেলুম। একটা ট্যাক্সিতে মালপত্র যাবেনা। দুটো ট্যাক্সিতেও অসম্ভব। রিক্সাওয়ালারা তাকে ছেঁকে ধরেছে। বলছে : আমরা সব মাল পৌঁছে দেব।

স্বাতি করুণভাবে তাকাল আমার দিকে। আমি তার সমস্যার সমাধান করে দিলুম। বললুম : অল্প কিছু মালপত্র নিয়ে তোমরা ট্যাক্সিতে যাও টার্গার বৌটি। আমি মালপত্র নিয়ে রিকশায় যাচ্ছি।

এরা বোধহয় বাঙলা কথা বোঝে। চক্ষের নিমেষে সেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটা রিকশায় তুলে মাল উঠল। আর একটায় কিছু মালের সঙ্গে আমি। ট্যাক্সির পিছনে ও সামনে আমি মালপত্র নিয়ে মামাবাবুরা চলে গেলেন। স্বাতি বলে গেল : ভয় পাবেন না গোপালদা, টার্গার বৌটিতে আমরা অপেক্ষা করব।

মালবোঝাই রিক্সাটা আমি এগিয়ে দিলুম, নিজে চললুম পিছনে। সামনে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। তারই মধ্যে সহরটাও দেখছি। সরু পথ, সরল ভাবে যায়নি। দুধারের ঘর বাড়ি আকর্ষণীয় নয়। কোন ভাল শহরে এসেছি বলে এসময়টায় মনে হচ্ছিলনা। অনেকটা ঘুর দিয়ে পরিবেশের পরিবর্তন হল। পথ হল প্রশস্ত। ঘরবাড়ির চেহারাও পাল্টাল। যানবাহন দোকানপাট ও লোকজন দেখে আর সন্দেহ রইলনা যে আমরা ভুল জায়গায় নামিনি।

সহসা সামনে আমার রিক্সাওয়ালাকে দেখতে পেলুমনা। সচকিতে চারিধারে চেয়ে দেখলুম। না, সে নেই। সামনে পাশে বা পিছনেও নেই। একটা মোড়ের কাছে এসে পড়েছিলুম, ডানে বা বাঁয়ে কোন দিকেই তাকে দেখতে পেলুমনা। লোকটা পালিয়ে গেল নাকি! লজ্জার তাহলে সীমা থাকবেনা। রিক্সার নম্বরটা দেখে রাখলে একটা বিহিত হত। এই লোকটা কি আমাকে সাহায্য করবেনা!

তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে মোড় দিয়ে সদর রাস্তা থেকে একটা বাঁধানো এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ল। পাশ দিয়ে ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল একটা। আর হাসি মুখে স্বাতিকে দেখলুম এগিয়ে আসতে। বলল : আমরা ভেবেছিলাম, আপনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন।

ভয়ে ভয়ে আমি চারিধারে তাকালুম। মামা মামী নেই। কোন জিনিষপত্র দেখলুমনা। তাঁদের জন্যে আমার দুশ্চিন্তা ছিলনা। দুশ্চিন্তার কথা স্বাতিকে বলবার আগেই সে তার ব্যাগ থেকে রিক্সার ভাড়া

বার করল। একজনকে নয়, দুজনকে দিল তাড়া। তারা ধরাধরি করে আমার রিকসার মালপত্র নামিয়ে রাখল। তখন আমি দেখতে পেলুম যে দামনের রিক্সাটা অনেক আগেই পৌঁছে গেছে।

হোটেলের দোতলায় পাশাপাশি দুখানা ঘর নেওয়া হয়েছিল। হোটেল শুধু ঘর ভাড়া দেয়, খাবার ব্যবস্থা নেই। তার জন্যে অসুবিধা আমাদের হলনা। এক বাঙালী ভদ্রলোক হোটেলেরই এক ধারে রান্নার অনুমতি পেয়েছেন। বোর্ডারদের তিনি খাদ্য সরবরাহ করেন। তাঁরই বেহারা আমাদের ঘরে দুপুরের খাবার দিয়ে যাবে স্থির হয়েছিল।

স্বাতি বলল : তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন গোপালদা, খাবার দিতে বেশি দেরি করবেনা বলেছে।

আমি বললুম : তোমরা তৈরী হয়ে নাও, আমি এখুনি আসছি।

বলে আর অপেক্ষা করলুম না। হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা বাজারে চলে এলুম। শহরের বুকের মাঝখানে এই টার্গার বৌটি। চারিদিকেই দোকানপাট। তাড়াতাড়ি একজোড়া ধুতি জামা গেঞ্জি প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিষ কিনে একটা নতুন ব্যাগে ভরে ফেললুম। চুল কাটার সেলুনে ঢুকে দাড়িটাও চেঁচে নিলুম। ফেরার পথে দুটো তালা কেনার কথা মনে পড়ল। বিদেশে হোটেল ধর্মশালায় নিজেদের তালা ব্যবহার করাই নিরাপদ।

যাত্রীদের কাছেই এ সব উপদেশ পাওয়া যায়।

হোটেলের নিচের তলায় একটা খালি বাথরুমে আমি স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিলুম। উপরে উঠে দেখলুম যে সবাই আমার অপেক্ষা করছেন। স্বাতি আমার পরিচ্ছন্ন পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হল, বলল : গোপালদাকে যে আর চেনাই যাচ্ছে না।

মামী বললেন : তুমি এরই মধ্যে বাজার হাট সব সেরে এলে!

মামা চিন্তিত ভাবে বললেন : কই টাকা পয়সাতো নিলেনা গোপাল!

একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বললুম : আমরা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে। সংসার আমাদের সঙ্গে : যতক্ষণ পকেট খালি না হচ্ছে ততক্ষণই বাহাদুরী।

বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে স্বাতি বেহারাকে ডেকে দিল। অল্পক্ষণ পরেই খাবার এল। দুবারে আনল সব জিনিষপত্র। নিজেদের ঘরে বসে আমরা খেয়ে নিলুম।

মামা পাইপ বার করলেন পকেট থেকে। তারপর তামাক ভরে পাইপে আগুন দিলেন। ধোঁয়া মুখে বেরতেই প্রসন্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন : গোপাল এখন কী করবে বলছ?

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : গোপালদার সমুদ্রের ধারে যাবার ইচ্ছা।

আমি আশ্চর্য হলুম তার এই কথা শুনে। বললুম : কী করে জানলে?

স্বাতি হেসে বলল : কিন্তু এখন কোথাও বেরনো চলবেনা। সারা দুপুর আমরা বিশ্রাম করব। আসুন আমার সঙ্গে।

বলে আমাকে ঘরে নিয়ে এল। বলল : এটি আপনার বিছানা, শুয়ে পড়ুন লক্ষ্মী ছেলের মতো।

পরম কৌতুকে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

সে বলল : রাতে ঘুমোতে পারিনি। সে তো সকলেই দেখেছে। আর দেরি করবেননা।

বলে দরজার পর্দাটা টেনে দিল।

অঙ্গনা-সংবাদ

দেবযানী

আমেরিকার মেয়ে কুমারী বারবেট হানিশ এক বছরের জন্যে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ-প্রাপক হয়ে বর্তমানে আমাদের দেশে এসেছেন। ইনি গুজরাট প্রদেশে ঘুরে ঘুরে 'মিটিং' ও 'এমব্রয়ডারী' সম্পর্কে গবেষণা করছেন এবং করবেন। এই মার্কিন ছাত্রীটি ১৯৬৯ সালে "মিটি অ্যাণ্ড এমব্রয়ডারী ইন গুজরাট অ্যাণ্ড কাশ্মীর" বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী অর্জন করেন।

জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এই বিষয়টি বিশেষ ক'রে কেন তিনি পছন্দ করলেন। তার উত্তরে কুমারী হানিশ বললেন যে, ভারতীয় সেলাই, পশম বোনা ও এমব্রয়ডারীর নানা নমুনা নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান একজিবিশনে দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তখন তিনি এ বিষয়ে আরো গবেষণা করতে ইচ্ছুক হন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই মর্মে দরখাস্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

কিন্তু বিশেষভাবে কাশ্মীর আর গুজরাট কেন? বারবেট বললেন, "কাশ্মীর বহন করছে মুসলমানী সভ্যতার নিদর্শন আর গুজরাট হিন্দু সভ্যতার—তাই।" ভারত ভ্রমণে বারবেট প্রথমে এসেছেন গুজরাটে, এখানকার কাজ শেষ ক'রে সামনের গ্রীষ্মকালে তিনি কাশ্মীরে যাবেন।

• • • •

গত সেপ্টেম্বরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে এগারো জন তরুণ কৃষক দিল্লী এসেছেন এদেশের কৃষকদের সঙ্গে থেকে কাজ করবার উদ্দেশ্যে। এঁদের একজন হচ্ছেন কুমারী বীভারলি, কে, ফেরিস। এঁরা ছ' মাস ধরে ভারতবর্ষে থাকবেন ও নানা জায়গায় ঘুরবেন। ফেব্রুয়ারী-মার্চে এঁদের দেশে ফিরে যাবার কথা। এঁদের এই সফর ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক তরুণ কৃষক বিনিময় পরিকল্পনার অন্তর্গত। ১৯৬৪ সালে ওদেশ থেকে ষোল জনের একটি দল এসেছিল। উদ্দেশ্য—মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন।

কুমারী ফেরিসের এখনকার বয়স চব্বিশ। লম্বা, সুদর্শনা এই মেয়েটি মিচিগানের এক কৃষক পরিবারের কন্যা। গবাদি পশু নিয়ে কাজ করতে ইনি খুব ভালবাসেন। সেলাই, রান্না, খাদ্য সংরক্ষণ, উদ্যান রচনা প্রভৃতি কাজেও এঁর উৎসাহ প্রচুর। আবার, গত দশ বছর ধরে কাজের পাশাপাশি পড়াশুনাও চালিয়ে আসছেন সমানে।

"ভারতবর্ষ আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়," ফেরিস বলেন। এদেশের বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি পড়াশুনা করেছেন এরই মধ্যে কিছু কিছু। ভারত-থেকে-যাওয়া দুজন ভারতীয় কৃষকের সঙ্গেও তাঁর কথাবার্তা হয়েছে। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় রীতি-আচরণ-সম্পর্কিত আলোচনা সভায় তিনি যোগ দিয়েছেন। এসব সত্ত্বেও কুমারী ফেরিস বলেন, "এদেশে ও এদেশীয় আমার অনেক কিছু দেখবার আছে। ছ'মাসের ভ্রমণে এখানে আমি নিশ্চয়ই অনেক কিছু দামী অভিজ্ঞতা ক'রে নিতে পারব।"

• • • •

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা হচ্ছে অন্যতম পাঠ্য বিষয়, যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জার্নালিজ্‌ম্ ডিপার্টমেণ্ট' আছে। সম্প্রতি দেখা গেছে, সাংবাদিকতা বিষয়ে যাঁরা ডিগ্রী নিতে চান তাঁরা কিন্তু পেশা বা 'কেরিয়র' হিসাবে সাংবাদিকতায় বিশেষ আগ্রহী নন—অন্তত বেশির ভাগই তাই। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, জন-সংযোগ, বিজ্ঞাপন, বিক্রয়-বর্ধন ইত্যাদির দিকে উক্ত ছাত্রছাত্রীদের ঝোঁক বেশি। মেয়েদের বেলায় দেখা গেছে, রেডিও-জার্নালিজ্‌ম্ অনেকেই পছন্দ করেন, বোধহয় সবচেয়ে বেশি।

এবছরের স্নাতকোত্তর সাংবাদিকতা পাঠবিভাগে অন্যান্যবারের চাইতে অস্বাভাবিকভাবে অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্রী ভর্তি হয়েছেন বলে জানা গেল—মোট বাইশ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ঐ বিষয়ে আছেন ষোল জন ছাত্রী, ছ'জন ছাত্র—অর্থাৎ মেয়েদেরই যাকে বলে, 'অ্যাবসোলিউট মেজরিটি'।

• • • •

শখ নানা মানুষের নানা রকম। মূল্য জমান, ডাকটিকিট জমান, পুরানো জিনিষপত্র সংগ্রহ, বই কেনা, অটোগ্রাফ সংগ্রহ, বাগান করা ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার। পরমাসুন্দরী অভিনেত্রী ব্রিজিত্তা বার্ডিল-এরও একটি শখ আছে এবং সেটা কী জানেন?—মোটর গাড়ি সংগ্রহ করা। চক্ষুদান ক'রে গাড়ি যোগাড় করা নয়, হস্তরমত পাঁটের পয়সা খরচা ক'রে খরিদ করা গাড়ি। সংখ্যায় একটি-দুটি নয়, অনেক। ঠিক কতগুলি গাড়ি উনি এযাবৎ কিনেছেন, অথবা সেইপথে মা লক্ষ্মী কতখানি গলে বেরিয়ে গেছেন, তা অবশ্য আমরা জানতে পারিনি, তবে দুটিই যে প্রচুর ও প্রভূত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটুকু আমরা জানি যে বার্ডিলের সংগ্রহের মধ্যে আছে একটি জাগুয়ার, একটি হাসেরাটি ও একটি বেন্টলী গাড়ি। ওর মতে, বিশ্বজগৎ থেকে অবসর নেবার পর ওকে একটি ট্যাক্সি-পরিবহন-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। হয়ত এতদিনের কেনা ও জমান মোটর গাড়িগুলোই ট্যাক্সিতে পরিণত হবে তখন। একটা আয়ের পথও খোলা হবে।

এত গাড়ি কেনার শখ যখন, তখন কি ধরে নিতে হবে যে ব্রিজিত্তা নিজে এক জন ওস্তাদ চালক—গাড়ি চালানোটা ওর একটা শখ, যেমন অনেকেরই থাকে? যখন যেটা খুশি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া, আর উদ্দাম গতিতে উধাও হয়ে যাওয়া—? না, না, মোটেই তা নয়—বার্ডিল নিজে একটুও জানেন না গাড়ি চালাতে।

• • • •

ফ্রান্সের বিয়ারিট্‌জ্‌ শহরের পুলিশ মহলে একই সকালে একদা অনেকগুলো টেলিফোন এসে কর্তাদের তাক্ লাগিয়ে দেবার যোগাড় করল। বারোটা ফোনের জন্যে না—সেটা কিছুই নয়—তাক্ লাগাটা এই জন্যে যে, সবকটা ফোনই অজানা মহিলাদের কাছ থেকে, যাদের সকলকারই মূল বক্তব্য, 'সন্দেহ করছি, কতকগুলো বোমা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার কাছে, কিন্তু কিছু হদিশ মিলছে না।' পুলিশ বেরিয়ে পড়ল হদিশ করতে। তন্নতন্ন ক'রে 'বোমার প্যাকেট'-গুলোর ঠিকুজি চর্চা ক'রে শেষ পর্যন্ত জানা গেল, এক জুতা প্রস্তুতকারক উক্ত মহিলাদের নামে জুতোর 'ডেলিভারী' দিয়েছিলেন এবং সেই জুতোর প্যাকেটগুলোই আতঙ্কের স্রষ্টা। প্যাকেটগুলোর প্রতিটার গায়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে ছিল একটা ক'রে ফিতে, এবং ঐ ফিতেগুলোই মহিলাদের কাছে বোমার পলতে হিসেবে দেখা দিয়েছে। এটা একটা 'স্টাণ্ট', অন্তত ব্যবসায়িক দিক থেকে, ঠিকই, কিন্তু এই হৈ-চৈ-এর পরে পুলিশের কর্তারা আর জুতোর কোম্পানী একমত হয়ে ঠিক করেছেন যে, অতঃপর জুতোর প্যাকেট অন্যভাবে তৈরি করা হবে।

আসল রহস্য জানবার পর মাননীয়া মহিলারা কী করেছেন তা জানা যায় নি।

• • • •

রাইফেল শুটিংএ পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাও নেহাৎ পিছিয়ে নেই। ঘোড়া-বেড়ির সঙ্গে বন্দুক-রাইফেলও ধারণ ও চালনা করতে পারেন যাঁরা, শ্রীমতী শোভিতা চাটার্জি তাঁদের একজন। শুধু একজন নন, সারা ভারতে তিনি বিখ্যাত। বহুদিন ধরে তিনি রাইফেলচালনা ক'রে আসছেন—প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রগুলিতে। জাতীয় রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় ইনি দীর্ঘকালের অংশগ্রহণকারিণী। ইং ১৯৬৩ থেকে

১৯৬৯ সাল অবধি একটানা চার বছর শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় রাশফ্রান রাইফেল্‌ শুটিং কম্পিটিশনের মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান থেকেছেন এবং এই সম্পর্কে আটটি জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছেন—সে রেকর্ড আজও অটুট। ১৯৬৮ সালে পশ্চিম জার্মানীর উইজবাডেন শহরে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড শুটিং ইভেন্টে তিনি অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছেন।

এহেন শোভিতা দেবী কিছুদিন হ'ল ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্রতিযোগিতামূলক রাইফেলচালনা আর করবেন না, অবসর নেবেন এবার। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, মান ও দক্ষতা আরো বৃদ্ধি করতে গেলে আধুনিক ধাঁচের যেসব রাইফেল ও কার্তুজ দরকার লাগে, তা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ এবং সেসব যোগাড় করে ওঠাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাই এই সিদ্ধান্ত। ফলে অবশ্য মস্ত জাতীয় ক্ষতি আমাদের, কিন্তু কী আর করা যায়।

• • • •

কালিম্পঙ থেকে এসেছিলেন কলকাতায় শিল্পীদলটি। এরা নাচ ও গানের শিল্পী। পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সমভূমিতে নেমে এসেছিলেন এঁরা, কালিম্পঙের ডঃ গ্রাহামস্‌ হোম নামক সেবাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য। সিকিমী, ভুটানী, লেপচা ও নেপালী—এঁদের নিয়ে ন'দেড়েক পুরুষ ও মহিলার এই দলটি নাচে গানে তিনদিন মাৎ ক'রে রাখলেন কোর্ট উইলিয়ম বক্সিং এরিনাটি। এই সঙ্গে ছিল ম্যাজিক প্যারেড—আঠারো জন মহিলা যার প্রধান আকর্ষণ। সারা দলটির যিনি প্রধান, তিনি একজন মহিলা—শ্রীমতী ইউডিন লাম্পা হিসে।

• • • •

হলাণ্ডের গৃহিণীদের গড়পড়তা (দৈহিক) ওজন ১০ স্টোন ৬ পাউণ্ড, উচ্চতা ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৬০ ঘণ্টার মত পরিশ্রম ও কাজ করতে হয় এঁদের। সাধারণত ঘুমোতে যান রাত্রির এগারোটায়, ওঠেন পরের দিন সকাল ৭ টায়। কাপড়চোপড় কাচাকাচির জন্যে এঁদের প্রায় সবারই সময়ের পড়তা পড়ে পঞ্চাশ মিনিট।

ধূমপান : বয়স যাদের পঁয়ত্রিশের নিচে, তাদের মধ্যে শতকরা চল্লিশ জন চুরুট-সিগারেট-পাইপ খান না; যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ, তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চান্ন জন খান না; আর পঞ্চাশের ওপরে যাঁরা তাঁদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জন খাননা। ধূমপায়িনীদের মধ্যে হপ্তায় গোটা পঁচিশের বেশি সিগারেট খাবার প্রচলন বড় একটা দেখা যায় না। ও-দেশের গৃহিণীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের লাইসেন্স আছে ও তাঁরা তা ব্যবহার করে থাকেন।

সুখী বা অসুখী : শতকরা তিনজন জানিয়েছেন তাঁরা 'বরং অসুখী,' ষোলজন জানিয়েছেন 'মোটা-মুটি সুখী,' একান্নজন 'সুখী,' উনত্রিশজন 'খুব সুখী'। 'খুব অসুখী' একথা একজনও বলেননি, আর দশজন কোন জবাব দেননি।

এসব তথ্য জানা গেছে ওখানকার মেয়েদের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে।

আরো জানা গেছে যে, ওলন্দাজ বধূদের মধ্যে শতকরা ৯ ভাগ এযাবৎ গৃহকর্ম থেকে ছুটি পাননি আদৌ, আর শতকরা তিরিশ জন তো কখনই স্বামীসমভিব্যাহারে বেড়াতে যাবার সময় পান না। শতকরা ১০ জন কোন সময়েই কেশচর্চার দোকানে যান না। আর একটা মজার কথা কী জানেন?—এঁদের শতকরা ১৩ ভাগ মোজা রিপু করতে জানেন না মোটে।

পশ্চিম জার্মানীর সিনেমা জগতের প্রথম ও একমাত্র মহিলা চিত্রপরিচালিকা হচ্ছেন যে শ্লিস—সুন্দরী ছিপছিপে চেহারার এক তরুণী। কিছুদিন হল তিনি যেন একরকম হঠাৎই বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন দেশে দেশে। মহিলা পরিচালিকা হিসেবেই অবশ্য। তিনি এর আগেই কয়েকটা ছোট ছবি পরিচালনা করেছেন—দ্বিতীয় ছবিটি দেখে ওখানকার নায়করা প্রযোজক ও পরিচালক পিটার শিমনি মেকে ভার দেন: স্বরচিত একটি গল্পের সিনেমা করতে হবে মে'কে। শ্লিস তাতে এক পায়ে খাড়া। দেখা যাক ছবি কেমন হয়।

• • • •

ফিনিয়া-র এক জনপ্রিয় গায়িকার নাম ইরমা সোখাড্‌জে। ওর পিতার নাম আণ্ডলি সোখাড্‌জে, যিনি টেকনিক্যাল সায়েন্সেস বিষয়ে 'মাস্টার' ডিগ্রীর অধিকারী। ইরমার মা বিদেশী ভাষা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞা। ইরমার বয়স যখন আড়াই বছর, ভাল ক'রে কথাই ফোটেনি মুখে, আধ-আধ বুলি কপচায়, সেই সময়েই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে ওর গানবাজনার 'কান' অতি তীক্ষ্ণ ও সংবেদনশীল। আশ্চর্য হয়েছিলেন অনেকেই এই দেখে যে, মেয়েটি যে গান হয়ত একবার মাত্র শুনেছে, সেই গানই কী নিখুঁতভাবে ও নির্ভুল সুরে ফিরিয়ে শোনাতে পারে। গানের সেই 'কান' ও ঝোঁক ওর আজও পুরোপুরি বজায় আছে। ট্বিলিসি মিউজিক স্কুলের পিয়ানো সেক্সানের ছাত্রী ইরমা বর্তমানে। তা' বলে ও যে লেখাপড়া ভালবাসে না তা নয়, স্কুলে যথারীতি পড়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতই এবং ওর পড়াশুনোর রেকর্ডও বেশ চমৎকার।

ফেরো অর্কেস্ট্রাদলের সঙ্গে ইরমা মস্কো, ট্বিলিসি, ফ্রান্স ও বুলগেরিয়া ঘুরে এসেছে এবং প্রতি জায়গাতেই গান গেয়ে ও প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। ওর ভাঁড়ারে নানা ধরণের ও বিভিন্ন ভাষার—যেমন, জর্জিয়ান, রাশিয়ান, ইটালিয়ান, ইংরেজি ও ফরাসী—দুশোটিরও বেশি গান আছে।

দেশবিদেশ-ঘোরা বহুজনের পরিচিতা এই মেয়েটি কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুতুলখেলা করতে ভালবাসে। যেমন গান তেমনি পুতুল ওর অত্যন্ত প্রিয়। সেজন্যে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই, কেননা ইরমা সোখাড্‌জের এখনকার বয়স মাত্র এগারো বছর।

• • • •

রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বিতীয় বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন ('আংটাড্'), যা কিছুদিন হল দিল্লীতে বসেছে ওখানকার বিজ্ঞান ভবনে, বিদেশাগত প্রতিনিধি, হোমরাচোমরা ও সাংবাদিকদের পক্ষে একটা বিপদের (ব্যক্তিগত) সম্ভাবনা এনেছে বলে জানা গেছে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞানভবনটির মেঝেগুলোর বিশেষ পালিশ দেওয়া হয়। ফলে মেঝেগুলো এতই চকচকে হয়ে ওঠে যে, চামড়া-সোলের জুতোপরা এবং ছুঁচলো-গোড়ালি জুতোপরা স্ত্রী-পুরুষেরা প্রায়ই পা হড়কে পড়ে যেতে লাগলেন দেখা গেল,—বিশেষ ক'রে বাঁক নেবার সময়। লাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিদলের জনৈকা তরুণী সেক্রেটারীর বেলায় হল কী—দু'হাত বোঝাই ক'রে কাগজপত্র-ফাইল ইত্যাদি নিয়ে তিনি চলেছিলেন। এক অসাবধান মুহূর্তে গেলেন পা হড়কে: ফলে সামনের দিকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেলেন সোঁ করে, তারপরেই ধপাস—মাটির ওপর বেবড়ে বসে পড়লেন। সেখানেও থামা নেই: নিজেকে সামলাতে না পেরে পিছনদিকে চিৎপাত—মানে যাকে বলে পপাত ধরণীতলে—আর ওদিকে দুটি পা-ই খাড়াভাবে সোজা উঠে পড়েছে শূন্যপানে।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

হেমিংওয়ের সঙ্গে দরাদরি

নীলাদ্রি সোম

(বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আশ্চর্য কাহিনী)

পঁচিশ বছর আগে চীন দেশের চুংকিয়াং-এ এক গানবোটে কাজ নিয়েছিলাম। আমি তখন সামান্য একজন জুনিয়র লেফটেন্যান্ট। কিন্তু এক সামান্য কারণেই হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে গেলাম। একটা চীনা নীলামের দোকানে নীলমোহর আঁটা একটা কাঠের বাক্স ক্রয় করলাম। জানতাম না বাক্সের ভিতরে কী আছে। বাক্সটা পাথরের মতো ভারী। নীলামের দোকানে যারা হাজির ছিলো সবাই বললো ওটার ভিতরে আছে কতগুলি নুড়ি পাথর। খদ্দেরদের নিয়ে দোকানের মালিক তো এই ধরণের রসিকতা হামেশাই ক'রে থাকেন।

ত্রিশ ডলার দাম বলতেই নীলাম-আলা ওই দামে আমার কাছে বাক্সটা বিক্রি ক'রে দিলো। একজন লোক ব'লে উঠলো, "এই রে, আরেকজনকে বোকা বানালো রে।" কিন্তু কেনার পরে বাক্সের ডালা খুলতেই সকলের মুখে ফুটে ওঠলো হতাশা আর ঈর্ষার ছাপ। হুইস্কির দু দুটো কেস। যুদ্ধের সময়কার এক মহার্ঘ জিনিস।

ব্রিটিশ দূতাবাসের একজন কেরাণী এক বোতলের জন্যই ৩০ ডলার দিতে চাইলো। আরো লোভনীয় বহু প্রস্তাব এলো। কিন্তু কোনো প্রস্তাবেই আমি রাজী হলাম না। আমার বদলীর সময় হয়ে এসেছিলো। স্থির করলাম যাবার বেলা কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে একটা আসর বসাবো। সেখানেই ওই হুইস্কির সদ্ব্যবহার করা যাবে।

ঠিক এমনি সময়ে চুংকিং-এ এলেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। অনেকের মতো তিনিও এক বিশেষ তৃষ্ণায় ভুগতেন। তৃষ্ণাটা অ্যালকোহলের, বিশেষ ক'রে যখন তা পাওয়া যায় না। একদিন তিনি এলেন আমার গানবোটে। বললেন, "শুনলাম আপনি নাকি দু কেস হুইস্কি পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ছ বোতল কত দামে বিক্রি করবেন?"

"মাফ করবেন, এগুলি তো বিক্রির জন্য নয়। এখান থেকে আমার বদলীর আদেশ যখন আসবে তখন একটা আসর বসাবো, তার জন্যই ওই বোতলগুলি রেখে দিয়েছি।"

হেমিংওয়ে মোটা এক গোছা নোট বের ক'রে বললেন, "ওই ছ বোতলের জন্য আমি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি।"

"যে কোনো মূল্য?"

"হ্যাঁ, বলুন।"

একটু ভেবে বললুম, "ঠিক আছে, আমি আপনাকে ছ বোতলই দেবো, তার বদলে কী ক'রে লেখক হওয়া যায় এই বিষয়ে আমাকে ছ'টি পাঠ দিতে হবে।"

তিনি বললেন, "খুবই কঠিন ব্যাপার। লেখার বিদ্যা আমি আয়ত্ত করতে পেরেছি বহু বছরের চেষ্টায়।"

"আমিও বহু বছর ধ'রে নীলামে দরাদরি করতে-করতে তবে এবার দাঁও মারতে পেরেছি।"

হেমিংওয়ে হেসে বললেন, "দর কষাকষিটা বেশ ভালোই মনে হচ্ছে।"

তাঁর হাতে ছ'টা বোতলই তুলে দিলুম। পরের পাঁচদিন আমাকে দিলেন পাঁচটি পাঠ। শিক্ষক হিশেবে তিনি অনন্য। ভালোবাসেন রসিকতা করতে। হুইস্কি নিয়ে মাঝে মাঝে আমিও রসিকতা করতুম। একদিন বললুম, "জানেন মিস্টার হেমিংওয়ে, ওই দিন নীলামে সাহস ক'রে যে দর হেঁকেছিলুম তাতে লাভই হয়েছে। প্রথম চীনা নীলাম-আলাটাকে বোকা বানাতে পেরেছি। যারা সেদিন ভরসা ক'রে দর হাঁকতে পারে নি তাদের উপরেও এক হাত নে'য়া গেছে। একজন বড়ো লেখক বহু কষ্টে যা শিখেছেন সেই লেখার রহস্য এখন শিখতে পাচ্ছি মাত্র ছ বোতল হুইস্কির বদলে।"

তিনি চোখ টিপে বললেন, "আপনি বেশ পাকা ব্যবসায়ী। কিন্তু একটা কথা জানতে চাই, এ-রকম আর ক'টি বোতল নিজে চেখে দেখেছেন?"

বললুম, "একটাও নয়। বিদায় আসরের জন্য রেখে দিয়েছি।"

"বৎস, আমি তোমাকে একটা ব্যক্তিগত উপদেশ দিতে চাই। সুন্দরী মেয়ে পেলে তখনি চুমো খেতে দেরী করবে না; আর হুইস্কির বোতল পেলে না খুলে রেখে দেবে না। দুই ব্যাপারেই অত্যন্ত তৎপর হওয়া দরকার।"

আরো কয়েকদিন থাকতে চেয়েছিলেন, তবু দিন কয়েক পরেই হেমিংওয়েকে চুংকিং থেকে চলে যেতে হলো। ছ নম্বর পাঠ নেবার জন্য তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে বিমান-বন্দরে গেলুম।

বললেন, "ভুলি নি। এখনি তোমাকে শেষ পাঠ দিয়ে যাবো।"

এরোপ্লেনের এঞ্জিন তখন গর্জন করতে শুরু করেছে। তিনি আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, "বিল, মানুষের সম্পর্কে লিখবার আগে নিজের সভ্য হওয়া দরকার। সভ্য হতে গেলে দুটো জিনিস দরকার সহৃদয়তা এবং পরাজিতের প্রতি সমবেদনা। কোনো লোকের দুর্ভাগ্য দেখে হাসবে না। আর নিজে যদি ভাগ্যহত হও তবে অন্যকে আঘাত কোরো না, আঘাত সইতে হবে, আবার উঠে দাঁড়াতে হবে।"

তাঁকে বুঝতে না পেরে বাধা দিয়ে বললুম, "কিন্তু লেখক হওয়ার সঙ্গে এ সবের কী সম্পর্ক?"

তিনি শান্ত গলায় বললেন, "জীবনে তুমি যা-ই হতে চাও না কেন, তারই সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।"

কুলীরা জিনিষপত্র তুলছিলো। হেমিংওয়ে বিমানের দিকে পা বাড়ালেন। পেছন ফিরে বললেন, "বন্ধু, বড়ো আসর বসাবার আগে নিজে বোতলগুলির স্বাদ একবার পরীক্ষা ক'রে দেখো।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানখানি উধাও হলো আকাশে। বাড়ি ফিরে বোতলগুলি বের করলুম। একটার পর একটা বোতল। সবগুলিই চা-এ ভর্তি। চীনা নীলাম-আলাটা তো আমাকে আচ্ছা বুদ্ধু বানিয়েছে!

হেমিংওয়ে নিশ্চয়ই প্রথম দিনেই ব্যাপারটা জেনেছিলেন। কিন্তু কখনো বলেন নি, কখনো তা নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করেন নি, যে শর্ত স্থির হয়েছে তা পালন ক'রে গেছেন আনন্দের সঙ্গে। তিনি সত্য

সাহিত্য-সংবাদ

ডিলান টমাসের নোটবই

রালফ্ মড্ সম্পাদিত · পৃঃ ৩৬৪ প্রকাশক : নিউ ডিরেকসন্স।

মূল্য : ৮.৫০ ডলার।

আধুনিককালের খ্যাতনামা ইংরেজ কবি ডিলান টমাস অনেক অসাধারণ কবিতা লিখেছেন। কবিতা লেখার সঙ্গে-সঙ্গে নোটবইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন কবিতা লেখার ইতিহাস। ভাবটি যখন প্রথম এলো সেই থেকে শুরু ক'রে সংশোধন, বর্জন ও পরিণত রূপ সবই ধ'রে রাখার চেষ্টা করেছেন নোটবইয়ের পাতায়। কবিতার জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে এ-রকম বিস্তৃত আলোচনা হয়তো সাধারণ পাঠককে ক্লান্ত করবে; কিন্তু যারা টমাসের কবিতার অনুরাগী পাঠক তাদের কাছে তাঁর কবিতা বুঝবার পক্ষে এই নোটবুক আলোক-দিশারী।

ডিলান টমাস বলেছেন, "আমার পদ্ধতিটা হলো এই যে আমি অসংখ্য টুকরো কাগজের উপরে একটি কবিতা লিখি। অনেক সময়েই উল্টা পাল্টা, এলোপাথাড়ি ভাবে। কমা ফুলস্টপের বালাই থাকে না। লেখার চারপাশে থাকে ন্যাপোস্ট আর সেন্ড ডিমের ছবি। এই নোংরা অবস্থা থেকে কবিতাটি পরিষ্কার ক'রে টুকে ফেলি একটা খাতায়, তারপর টাইপ ক'রে ফেলি। টাইপ করার পর আগেকার খসড়াগুলি সব পুড়িয়ে ফেলি।" ওই পুড়িয়ে ফেলা খসড়াগুলির জন্যে টমাসের রচনার সংগ্রাহকেরা আজো আক্ষেপ করেন। টমাসের মাত্র চারটি নোটবই রক্ষা পেয়েছে। ২৬ বছর বয়সে তিনি ১০১ ডলারের বিনিময়ে ওই নোটবই চারটি বিক্রি ক'রে দেন নু-ইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটির লকউড গ্রন্থাগারের কাছে। আগামী দিনে তাঁর আরো নোটবই আবিষ্কৃত হবে। ওই চারটি নোটবই থেকে প্রমাণিত হলো অনায়াসে, বিনা পরিশ্রমে টমাস তাঁর চমৎকার কবিতাগুলি লিখতে পারেন নি। সেগুলি মোটেই মদের ঘোরে পাওয়া লেখা কবিতা নয়। প্রত্যেকটি কবিতার পেছনে রয়েছে বহু পরিশ্রম এবং বিনিদ্র রাত্রি।

টলস্টয়

লেখক : হেনরী ট্রয়াট। অনুবাদ : নাসী আহুজা। পৃঃ ৭৬২। প্রকাশক : ডাবল-ডে। মূল্য : ৭ ডলার ৯৫ সিন্টস।

টলস্টয় সম্পর্কে নতুন কোনো কিছু লেখা খুবই কঠিন। তবু সমালোচকরা চুপচাপ থাকার লোক নন। তাঁর সম্পর্কে নতুন বই লিখেছেন হেনরী ট্রয়াট। হেনরীর জন্ম রাশিয়ায়। ঔপন্যাসিক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এর আগে তিনি রচনা করেছেন ডস্টয়েভস্কী ও পুশকিনের জীবনী।

'টলস্টয়' গ্রন্থে চূড়ান্ত কোনো মতামত লেখার ব্যক্ত করেন নি। চেষ্টা করেছেন মানুষ টলস্টয়কে নিবিড় ক'রে তুলতে। বিষয়বস্তুর জন্য নয়, লেখার নৈপুণ্যের জন্যই বইটি আমাদের কাছে পরম আকর্ষণীয়।

'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' আর 'আনা করেনিনা' প'ড়ে যাঁরা টলস্টয়ের একটা মূর্তি মনে মনে কল্পনা ক'রে নিয়েছেন তাঁরা হেনরীর বই প'ড়ে আশ্চর্যই হবেন। কারণ এই বই থেকে যে টলস্টয়কে পাওয়া

যাচ্ছে তিনি সর্বাংশে আকর্ষণীয় নয়। এই দুই গ্রন্থে বিপরীত ভাবধারার যে সংঘাত আমরা দেখি তার প্রকৃত রণক্ষেত্র ছিলো তাঁর নিজেরই মন। কখনো তিনি আরোহণ করেছেন সফল-আনন্দের তুঙ্গ শিখরে, আবার কখনো ডুবে গেছেন চরম হতাশায়।

টলস্টয়ের মনে সর্বদাই কাজ করেছে সন্দেহ আর অতৃপ্তি। যৌবনে তিনি ডেকার্তের চিন্তাধারাকে গ্রহণ ক'রে তা আরো সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। ডেকার্তে বলেছিলেন, "আমি ভাবছি, তাই আমি আছি।" টলস্টয় ওই কথাটিকে একটু বদলে বললেন, "আমি চাই, তাই আমি আছি।"

বিরাট জমিদারীর মালিক টলস্টয়। যৌবনে কামনা-বাসনা নিবৃত্তির সুযোগ পেয়েছেন অকৃপণ, কিন্তু ভোগের পরক্ষণেই অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে মন। এই টানা পোড়েন চলেছে সারা জীবন ধ'রে।

ভোগ-জীবনের অতৃপ্তি এবং শুচি-শুদ্ধ জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষাই টলস্টয়ের সাহিত্য জীবনের মূল উৎস।

ককেসাস অঞ্চলে থাকবার সময় টলস্টয় লিখলেন 'স্টোরী অব মাই চাইল্ডহুড'। লেখার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশক তা লুফে নিলে। প্রকাশিত হবার পর টুর্গেনিভ এবং ডস্টয়েভস্কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

ক্রিমিয়াতে টলস্টয় গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার হিসেবে কাজ করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে 'সেভাস্তোপোল স্কেচেস' গ্রন্থে। যুদ্ধের এমন প্রামাণিক চিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ।

টলস্টয় তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পারিবারিক জীবন অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে দেখিয়েছেন। অথচ তাঁর নিজের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন ছিলো খুবই অসুখী। তাঁর নিজের অবহেলাও এইজন্য অনেকখানি দায়ী। বিয়ের প্রথম রাতেই টলস্টয় তাঁর স্ত্রী সোনিয়াকে দেখতে দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরী যেখানে ছিলো তাঁর লাম্পট্যের নানা ইতিহাস। ফলে সারাজীবনের মতো ব্যবধান সৃষ্টি হলো স্বামী-স্ত্রীর জীবনে। মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর মনের তিক্ততা প্রকাশিত হয়েছে ক্রুৎসার সোনাটা গ্রন্থে।

টলস্টয়ের পরিণতিও মর্মান্তিক। ১৯১০ সালের ৩১শে অক্টোবর আস্টাপোভো রেলষ্টেশনে তাঁর মৃত্যু নিতান্তই নিরান্ধব অবস্থায়। ট্রয়াটের জীবনী প'ড়ে টলস্টয়কে পাওয়া যাবে নতুন করে।

* * *

বহু বছর আগে বহু আন্দোলনের পর আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাগচাষীরা রাজার কাছ থেকে জমি কিনে নেবার অনুমতি পায়। দাম দিতে প্রায় অনিচ্ছুক চাষীদের কাছ থেকে জমির দাম রাখবার দায়িত্ব পড়ে একজন ইংরেজ কর্মচারীর উপর। মোটামুটি তিনি ভালোই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যতিক্রম দেখা দিলো একদিন। এক চাষী কাউন্টারে এসে বন্-বন্ করে বহু পেনি ফেলে এক-এক ক'রে সব গুণে দিলো। শেষ পেনিটা দেবার সময় ডেস্ক চাপড়ে চেঁচিয়ে বললো, "নিন আপনাদের নোংরা টাকা! আজ থেকে স্বর্গের প্রভু ছাড়া আর কোনো প্রভু আমার উপরে থাকবে না।'

ইংরেজ অফিসার একটুও রাগ না ক'রে হেসে বললেন, "আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি তাঁর সঙ্গে যেন তোমার বনিবনা হয়। তবে কিনা তিনিই তো তাঁর প্রথম ভাড়াটেদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

রত্নাকর

এত সব নাটক লিখিলাম, অসংখ্য ভূমিকায় রূপদান করিয়া মঞ্চজগতে প্রভূত প্রশংসা পাইলাম, কিন্তু মঞ্চের বাহিরে আমার 'নোটো গিরিশ' নাম ঘুচিল না।

কিন্তু বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের এই অখ্যাতি চিরস্থায়ী হইবে না, আমাদের মঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীরাও একদিন ও-দেশের মত বিদগ্ধ সমাজে প্রতিষ্ঠার আসন পাইবে, তাহাদের যশোগৌরবে ভারতের আকাশ উদ্ভাসিত হইবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাট্য চিন্তা

রঙ্গমঞ্চ দেশ এবং জাতির বিচিত্র যাদুশালা। বহুরূপী মানুষের মনের পরস্পর প্রতিঘাতী জাতীয় জীবনের, সমাজ জীবনের, রাষ্ট্রীয় জীবনের উদ্ভাসনীশক্তির সক্রিয় সূতিকাগার। শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি বহুবিধ শিল্প ও কৃষ্টির অভিনব সংমিশ্রণে রঙ্গমঞ্চ জীবন্ত। রঙ্গমঞ্চের এই জীবন্ত প্রতিকৃতির আবেদন মানুষের মনে এবং জীবনে ভূমিষ্ঠার। বিশেষতঃ দেশ এবং জাতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের পটভূমিকারও যদি পট-পরিবর্তন হয় তবে রঙ্গমঞ্চকে জাতীয় সম্পত্তিরূপেই পরিগণিত করা যেতে পারে। এবং এই কারণেই অন্যান্য স্বাধীন দেশে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ জাতীয় সরকারের একটি প্রধান সম্পত্তিরূপেই পরিপোষিত হয়ে আসছে। ইউরোপীয় দেশসমূহে নবজাগরণের যে আন্দোলন সুরু হয় তার মধ্যে রঙ্গমঞ্চকে ঐ নবজাগরণের ভাবধারার প্রচারকরূপে নিযুক্ত করা হয়েছে। জাতীয়তার তাগিদেই দেশে বিপ্লব হয়। এবং এই বিপ্লব আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতির গায়ে নতুন রূপ দিয়ে যায়। এই নবরূপী নতুন রঙ-এর রূপায়ণ হয় রঙ্গমঞ্চে। ফরাসী বিপ্লব, আইরিশ বিপ্লব, জার্মান বিপ্লব, রাশিয়ান বিপ্লব, জাপানের বিপ্লব, রঙ্গমঞ্চের মুখে দিয়েছে নতুন বাণী, অন্তরে দিয়েছে নাটক ও অভিনয়শিল্পের নতুন উর্বরতা। সে সব দেশে বিপ্লব আসার চরম মুহূর্তের আবাহন রঙ্গালয়ই গেয়েছিল। ঘণ্টা বাজিয়ে জাতিকে সচেতন করেছিল—আর নীরব থাকার সময় নয়, এবার সম্মুখ-সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আমাদের দেশে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যুগপরিবর্তনের কোন পরিচয় কি আমরা পাচ্ছি? সুখের বিষয়, অনেক সৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের সন্ধান আমরা পেয়েছি, যাদের মধ্যে আদর্শ আছে উদ্দীপনা আছে—নতুন সৃষ্টি ক্ষমতার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যে আন্দোলন তাঁরা সুরু করেছেন তার ধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে? বলতে বাধ্য হচ্ছি, বর্তমান যুগের নাট্যকাররা এত বেশী বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠেছেন যে, মনে হয় তাঁদের নাটকে জনচিত্ত উপেক্ষিত হচ্ছে। তাই বর্তমান নাটক দেখে জনসাধারণ সুখী হয় না। কারণ তাদের অন্তরের আবেদন সে সব নাটকে থাকে না।

মন্মথ রায়

নাট্যকার ও নাট্যশালা

শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমাদের দেশের যাত্রা ছিল আমাদের দেশের মাটির জিনিস। দেশের লোকের প্রাণের সাড়া পেয়েছিল এবং দেশের লোকের প্রাণে সাড়া দিয়েছিল যাত্রার গীতাভিনয়। ঠিক সেভাবে যাত্রা আমাদের দেশের মাটিতে শিকড় নিয়েছিল, আমাদের অভিনব থিয়েটার ঠিক সেইভাবে দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছে কিনা সেটা ভেবে দেখবার জিনিষ। ভালই হোক, মন্দই হোক, আমাদের দেশে একটা রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছে এবং দেশের সংস্কৃতি, দেশের জীবনধারা তার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। দেশের যাঁরা ধনপতি, যাঁরা কর্মী তাঁরা এবং দেশের আপামর সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে অস্বীকার করতে পারে না, অবহেলাও করতে পারে না। সমগ্র বাংলাদেশ এবং বাঙলার বাইরে যেখানে বাঙালী আছে, আজ সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ে ভরে গেছে। আমাদের রসবোধ ও রসানুভূতি রঙ্গাভিনয়কে বাহন করে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত এবং উদ্‌গ্রীব। এরূপ অবস্থায় রঙ্গমঞ্চকে অনাদর করলে বা তাকে অপাঙক্তেয় করে রাখলে জাতীয় জীবনের বিশিষ্ট ক্ষতি হবে, এই কথাটা যেন আমরা কিছুতেই না ভুলে যাই।

পূর্বকালে অর্থাৎ যাত্রার যুগে যখন মঞ্চ ছিল না, তখন হোত গীতাভিনয়, সাধারণ লোক বলত 'পালা'। বড় বড় নামজাদা কবিরা গান বাঁধতেন আর সাধারণত শক্তিমেরা বা শক্তিশালী অধিকারীরা (বর্তমান যুগের প্রযোজকর্তা বা producer) পালা লিখতেন। কিন্তু যখন আসর ঘুচিয়ে ইংরেজি এলিজাবেথীয় যুগের পদ্ধতির অনুকরণে বাংলাদেশে ইংরেজি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হোল, তখন প্রয়োজন হোল পঞ্চাঙ্ক নাটকের। এই আসরকে মঞ্চে গড়ে তুলতে, গীতাভিনয়কে নাটকে পরিণত করতে, এক কথায় বাংলার ব্যবসাদারী থিয়েটারে প্রতিষ্ঠা করতে যে কয়জন শক্তিশালী পুরুষ আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল। বাগবাজারের নবীন বসু বা বেলগাছিয়ার রাজাদের সৌখিন প্রচেষ্টা থেকে যখন সাধারণ রঙ্গালয় জন্মগ্রহণ করলো, তার নাম হলো "গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার"। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতারা নাট্যকার হিসাবে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন দীনবন্ধু ও মাইকেলের কাছে। নাট্যবস্তু আহরণ করবার জন্য বঙ্কিমের উপন্যাসকেও বাদ দেওয়া হয়নি। নাটক নইলে রঙ্গমঞ্চ চলে না, অথচ নাট্যকারের বিশেষ অভাব। এই অভাববোধ থেকেই জন্ম হোল গিরিশচন্দ্রের বিস্ময়কর নাট্যপ্রতিভার। পরবর্তী যুগে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল—এঁদের নিয়ে পেশাদারী থিয়েটার জমে উঠলো। স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলা সাহিত্যে নাট্যবিভাগে অনেকখানি স্থান এঁরা অধিকার করে আছেন।

বাংলাদেশে শক্তিশালী নটের কোন দিন অভাব হয়নি। কিন্তু প্রতিভাবান সৃষ্টিধর্মী নাট্যকারের অভাব হয়েছে। যাঁরা পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তাঁরা লক্ষ করবেন যে সোফোক্লিস, শেক্সপিয়র থেকে শুরু করে আজকালকার দিনে নোবেল কাওয়ার্ড পর্যন্ত সমস্ত নাট্যকারেরই রঙ্গমঞ্চের ব্যাকরণ সম্বন্ধে ভেতরদিককার জ্ঞান আছে। এঁরা অনেকেই নট, কেউ বা প্রযোজকর্তা অথবা মঞ্চব্যবসায়ী। বাংলাদেশে একমাত্র গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল ছাড়া রঙ্গমঞ্চের ভেতরদিককার অভিজ্ঞতা বিশেষ কোন নাট্যকারের নেই। সেইজন্য তাঁদের নাটক অভিনয় করতে গেলে কাটতে ছাঁটতে হয়, অভিনয়ের

[illegible]

লোকশিক্ষার জন্য যত রকম প্রয়োজন সকল তাহার মধ্যে আছে তার মধ্যে রঙ্গমঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কথা গ্রীক সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, রোমক সভ্যতা, জগতের সকল সভ্যতার যুগে, এমন কি বর্তমানের কম্যুনিষ্ট রাশিয়াতে পর্যন্ত অবিসম্বাদী ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। যুরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যের সঙ্গে যাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তাঁদের বলে দিতে হবে না যে, গ্রীক আর্টের আরম্ভ যাগযজ্ঞ, দেবায়তন, চার্চ ও মসজিদ নির্মাণ কৌশল থেকে এবং এর পূর্ণ পরিণতি নাটকে। নাট্যমঞ্চকে বাদ দিয়ে নাটক হয় না, নাটক লেখা চলে না। আমাদের হিন্দু আলঙ্কারিকরা বলেন, নাটক দৃশ্যকাব্য। সুতরাং যে নাট্যকার তিনি যিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁকে নটের সঙ্গে সাহচর্য করতে হবে।

অতীতের মঞ্চ কৌতুক

অনেক পুরানো আমলের থিয়েটার-প্রিয় ব্যক্তিদের মুখে মাঝে মাঝে শুনতে পাই, আরে আজকালকার এসব কী অভিনয়, কিছু না কিছু না, সব গুষ্টি নষ্টি। হ্যাঁ, থিয়েটার দেখেছি আমরা। অমুক নাটক, অমুক অমুক অভিনেতা। কী অভিনয়, কী বলা, কি কেসচার পসচার।

অর্থাৎ তাঁরা যা দেখেছেন তার তুলনা হয় না। এখনকার অভিনয় তার কাছে কিছু নয়। কিন্তু তখনকার দিনেও এমন দর্শক ছিলেন যাঁরা সেইসব অভিনয়ের অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করতেন। এমনি একজন পঞ্চাশ বছর আগেকার দর্শক, নাম রাধাকিশোর কর, "নাট্যমন্দির" পত্রিকায় একটি দীর্ঘ ছড়া লিখেছিলেন। ছড়াটি তুলে দিলাম। ছড়াটি পড়ে আজকের পাঠক কিছু আমোদ পাবেন—

আজকাল দেখি সব নূতন একটার
বিকট চিৎকার সার ভীষণ হুঙ্কার।
পায়তাড়া কসে আর তুড়িলাফ খায়
কি যে বলে মাথামুণ্ড বোঝা নাহি যায়।
একটারের মুখ যবে করি নিরীক্ষণ
নাহি দেখি তাহে কোন ভাবের স্ফুরণ।
কাঁদিছে হাসিছে কিম্বা করিয়াছে ক্রোধ
মুখ দেখি কোন মতে নাহি হয় বোধ।
তারপর নৃত্যরঙ্গ—কি বা চমৎকার।
কেমনে বর্ণিব বল কি তার বাহার।
সার্কাস দেখিতেছি কিম্বা থিয়েটার
পদে পদে এই ভ্রম ঘটে অনিবার।

ধপাধপ দপাদপ নাচের কি ধাপ
ধুলায় আঁধার সব একি হল বাপ।
সম্মুখ আসনে বসে হেন সাধ্য কার
নাকের রুমাল সেথা খোলা হয় ভার।
তামবেল ভাঁজে কেহ, কেহ খুসি ছাড়ে
লাফ দিয়া ওঠে কেহ অপরের ঘাড়ে।
কলাবিদ্যা শিখিবার প্রধান মন্দির
তার অধোগতি দেখি হয়েছি অধির।
প্রাণের আবেগে তাই দু'কথা বলিনু
আরো বলিবার আছে ভয়ে সম্বরিনু।
কথা কোরো নাট্যশালা-কর্তৃপক্ষগণ
বড় দুঃখে একাহিনী করিনু বর্ণন।

ইতিমধ্যে পথে যদি না পাই প্রহার
প্রকাশিব আগে যাহা আছে বলিবার।

রসিক দর্শক ছিলেন রাধাকিশোর কর। কিন্তু তিনি তখনকার দিনের ওঁচা অভিনয়গুলিই দেখেছিলেন বলে মনে হচ্ছে। গিরিশ, অর্ধেন্দু, অমৃতলালের প্রযোজিত অভিনয় সম্বন্ধে বোধ করি এমন ধারা কথা বলা চলত না।

গত মাসের নানা অভিনয়

নব নব রূপে

শিল্পীদল

বেহালার সুখ্যাত নাট্য-সংস্থা শিল্পীদলের সভ্যরা গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়মে সুনীল চক্রবর্তীর নতুন নাটক "শুরুতেই শেষ" অভিনয় করলেন। এই নাটকের পরতে পরতে একদিকে ছিল অফুরন্ত হাসির খোরাক, অন্যদিকে আধুনিক যুবজীবনের ব্যর্থতা আর হতাশার ছবি। নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এবং সেজন্যে এর পরিচালক অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় সবিশেষ প্রশংসা দাবী করতে পারেন। দলগত অভিনয়ের গুণে নাটকটি আগাগোড়া দর্শকদের আকৃষ্ট করে রাখে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন, পরিচালক অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিলাস মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ দাশগুপ্ত, চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদি রায় চৌধুরী, পরিমল ধর, দীপালী চট্টোপাধ্যায়, রুকা গুহ, অসুতোষ চক্রবর্তী, শিশির ঘোষ, সুধীর পাল, উমেশ মজুমদার ও অমর দাস।

শিল্পীদলের সম্পাদক দেবিন জানালেন, তাঁদের পরবর্তী নাট্য-নিবেদন সুনীল মুখোপাধ্যায়ের 'তিন অঙ্ক' প্রস্তুতির পথে।

কল্লোল থিয়েটার গ্রুপ—সম্প্রতি এ ডি পি স্পোর্টস অ্যাণ্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের (দুর্গাপুর) সৌজন্যে বিশিষ্ট নাট্য-সংস্থা কল্লোল থিয়েটার গ্রুপ শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'বৌদির বিয়ে' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে ক্লাব হলে মঞ্চস্থ করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত, সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, বিজেন ঘোষ, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, পুষ্পেন রায়, অসিত বাগচি, অমল মুখোপাধ্যায়, হেমী ঘোষাবলী এবং উমা প্রামাণিক।

নাট্য প্রতিযোগিতা—লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির 'প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি নাট্য প্রতিযোগিতায়' মোট ২০টি সংস্থা যোগদান করে। ফলাফল—

অমাত্রিক (চিত্তরঞ্জনের) 'লালমাটি'—শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনার ১ম পুরস্কার। 'আমরা দিল্লীর' এবং ইগ্রজিৎ—শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনার ২য় পুরস্কার।

সুনীল ভট্টাচার্য (লাল মাটি) শ্রেষ্ঠ পরিচালক। অনোডা মুখার্জী (শততম রজনীর অভিনয়ে। মিলনী লক্ষ্ণৌ, তাপসের ভূমিকায়)—শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। পুতুল দত্ত (লাল মাটির তুকানীর ভূমিকায়) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। উৎপল মুখার্জী (যাযাবর গোষ্ঠী দিল্লীর—'টাকার রং কালোর' দিগম্বরের ভূমিকায়) শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা। কল্যাণী সরকার (নন্দন সংঘ কানপুর কর্তৃক 'কলকাতার ইলেকট্রীক সপ্তার ভূমিকায়)—শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রী এবং সুনীতি মুখার্জী (গীতি চক্রম, বালীর, কাবুলীওয়ালার মিনির (ছোট) ভূমিকায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

বিচারকের আসন গ্রহণ করেন কিরণ মৈত্র, বিমল রায় (কলকাতা) ও কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ)।

প্রতিযোগিতাটিতে আলোক সম্পাত করেন কলকাতার আশুতোষ বড়ুয়া।

রঙ্গম সম্প্রদায়—সম্প্রতি এঁরা শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাট্যরূপ 'নতুন গোঁসাই' অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শ্যামু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে চারটি অঙ্কে এবং

সতেরোটি দৃশ্যে সমাপ্ত এই নাটকটির মূল সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্যে যে-সব শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হচ্ছেন ছন্দাদেবী (কমল মিত্র), শচীন মুখোপাধ্যায় (মহুয়), শ্যাম চট্টোপাধ্যায় (ধারিক ঘাস) নির্মল চট্টোপাধ্যায় (শ্রীকান্ত), কেতকী মুখোপাধ্যায় (নতুন চাঁদ) ও বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় (রাজলক্ষ্মী)।

বিশ্বরূপার 'আগন্তুক'—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর যুগ্ম লিপি নৈপুণ্যের ফলশ্রুতি আগন্তুক নাটক সুপার-হিট রূপে দর্শক ও মকানুরাগীদের মনে বিপুল ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। অভিনয়ের প্রতিরাত্রেই পূর্ণ প্রেক্ষাগারে দর্শকবৃন্দ এক নতুনতর চরিত্র সৃষ্টির চমকে আন্দোলিত হচ্ছেন। মঞ্চের উপর দর্শকদের চোখের সামনে একই অভিনেতা একসঙ্গে দুটি ভূমিকার অভিনয় করছেন, এ যেন সত্যিই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অভিনেতা-পরিচালক তরুণ রায় অনন্যসাধারণ কৌশলে ও নৈপুণ্যে সেই অবিশ্বাস্যকেই বিশ্বাস্য করে তুলেছেন। তাঁর কর্মকৃতির অসাধারণত্ব অনস্বীকার্য। ফলতঃ অভিনয়ের উৎকর্ষও এই নাটকের বড় আকর্ষণ। নাটকটি যে ভাবে সর্ব-শ্রেণীর দর্শকের চিত্তজয় করেছে তাতে এর জয়যাত্রা যে আরো বহু মাস ও একাধিক বছর অব্যাহত থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। আমরা আশা করব তরুণ রায় ও তাঁর সম্প্রদায় বিনা প্রতিবন্ধকতায় বিশ্ব-রূপা মঞ্চে তাঁদের অভিনয় প্রদর্শন করবার সুযোগ পাবেন আগামী কয়েক বছর ধরে।

ক্যালকেথিকো সেলস অ্যাণ্ড অ্যাডভারটাইজিং ক্লাব—এই ক্লাবের সদস্যগণ সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস মঞ্চে ক্লাবের অন্যতম সদস্য সুনীল চট্টোপাধ্যায় রচিত "ছিল, আছে, থাকবে" নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। সবীরের ভূমিকায় মিহির রায়, মিঃ মজুমদারের ভূমিকায় সুকৃতি মোহন ভৌমিক, নিত্যানন্দরূপে উদয়তপন দাশগুপ্ত এবং মেজদার ভূমিকায় তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রাণোজ্জ্বল অভিনয় দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দান করে। অন্যান্য ভূমিকায় সত্যব্রত মৌলিক, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, শিশির চট্টোপাধ্যায়, অসীম নিয়োগী, ও অমিতাভ সান্যাল চরিত্রানুগ অভিনয় করেন। স্ত্রী ভূমিকায় সীমা রায় চৌধুরী ও কল্যাণী অধিকারীর অভিনয় মর্মস্পর্শী হয়েছিল। বঙ্কিম ঘোষের পরিচালনা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। আলোকসম্পাত ও আবহ সঙ্গীত নাটকটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

রঙমহলে 'নহবৎ'—রঙমহলে প্রখ্যাত অভিনেতা-নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নতুন নাটক নহবৎ তার যাত্রা শুরু করেছে। অভিনয়াংশে এবং পরিচালনায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। তা ছাড়া আছেন রঙমহলের বাঁধা শিল্পীগোষ্ঠি। আগামী সংখ্যায় নহবতের আলোচনা করা হবে।

চলতি দুনিয়া

পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ

ইয়োকোহামাতে পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজটিকে সম্প্রতি জলে ভাসানো হয়েছে। এর ওজন ২৭৬,০০০ টন। ইয়োকোহামার জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রেই এটি তৈরী! এর দৈর্ঘ ৩১৬ গজ প্রস্থ ৫৩৩ গজ এবং উচ্চতা ৩২ গজ। জাপানে এই ধরণের আরো ছ'টি জাহাজ তৈরী হবে। ওই জাহাজ একবারে ৩১০,০০০ কিলোলিটার তৈল বহন করতে পারবে। এর ডেকে প্রায় ৬০টি টেনিস খেলার মাঠের জায়গা রয়েছে। ৩০ মাস আগে এর নির্মাণ শুরু হয়, কাজ শেষ হতে আরো ৩ মাস লাগবে। এর নামকরণ এখনো হয়নি।

ভুয়া শিশু

সাও পাওলো-র অলগা পেরেইরা ডস সাণ্টোস নামে এক তরুণী অভিযোগ করে যে হাসপাতাল থেকে তার চোখের সামনে তার একই বারে ভূমিষ্ঠ চার শিশুকে কে বা কারা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। অমনি শুরু হলো ব্যাপক খোঁজাখুঁজি। পুলিশ, দমকলের লোক, প্রতিবেশীরা মিলে এক সপ্তাহ ধ'রে খুঁজে চললো অলগা-র হারানো সন্তান।

কিন্তু ওই ভুয়া শিশু, তিন ছেলে আর এক মেয়ে আসলে জন্মায় নি।

অলগার বয়েস কুড়ি। চার বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে; কিন্তু সন্তান হয় নি। অশ্রুসজল চোখে অলগা স্বীকার করে স্বামীকে খুশী করার জন্যেই সে তাকে বলে যে সে গর্ভবতী হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং সন্তান চুরি গেছে জানিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

গো-দুগ্ধে অনীহা

গো-দুগ্ধে যে স্বাভাবিক শর্করা রয়েছে তা সহ্য করার ক্ষমতা অনেকের নেই ব'লে এশিয়াবাসীদের অনেকের পক্ষে দুগ্ধপান ক্ষতিকর। নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি এই সত্য আবিষ্কার করেছেন। ব্রিটিশ সাময়িকী 'নেচার'-এ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে তাঁরা বলেছেন যে মোট ২০ জন এশিয়াবাসী ছাত্রকে তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। এদের মধ্যে ১৫ জন চীনা আর পাঁচজন ভারতীয়। বাকি ছাত্রদের সকলেরই দুগ্ধ পানের পর অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

স্ত্রী-র কর্তৃত্ব ভালো!

মেয়েদের হাতে কর্তৃত্ব থাকা ভালো। তা থাকলে এবং স্বামীরা তাদের জন দিলে তবেই সংসারের [illegible] ইন্দিরা। এই অভিমত প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা। [illegible]

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ওই কথা বলেন। তিনি বলেন, "আমরা এখন অনেকখানি স্ত্রীর বাধ্য যদি তাদের কথা না শুনি তাহলে আশংকা করা যায় তারা হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ ক'রে বসবেন।"

স্বয়ংবরা

প্রাচীন ভারতের রাজকন্যারা স্বয়ংবরা হতেন। সম্প্রতি এই প্রাচীন প্রথা নতুন রূপে পৃথিবীর নানা দেশে আত্মপ্রকাশ করছে। ভারতে দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় মা-বাবার সামনে ছেলে-মেয়েরা নিজেদের জীবন-সঙ্গী বা সঙ্গিনী মনোনীত করছে। জার্মানীতে এই মনোনয়ন চলেছে স্বয়ংবরা কম্পিউটর যন্ত্রের সাহায্যে।

নিউ দিল্লীর 'দি হিন্দুস্থান' টাইমস কাগজ থেকে জানা গেলো প্রায় ১২০ জন ছেলে-মেয়ে মা-বাবার সামনে বিবাহের সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করবে।

সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনের জন্য জার্মানীর হাজার-হাজার ছেলে-মেয়েরা সাহায্য নিচ্ছে কম্পিউটর যন্ত্রের।

অ্যালকোহল রোগ সারায় না

অল ইণ্ডিয়া প্রহিবিশন কাউন্সিল এবং ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে সম্প্রতি দিল্লীতে তিনদিন ব্যাপী একটি সেমিনার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ক'রে রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন বলেন, অ্যালকোহল যে টনিকের কাজ করে কিংবা শরীর ভালো করে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কোনো নিরাময় ক্ষমতা, ব্যাধি দূরীকরণের ক্ষমতা অ্যালকোহলের নেই। বরং তা পান করার পরিণতি দুঃখ অশান্তি, ব্যাধি এবং অকাল-মৃত্যু। অ্যালকোহল পানের ফল হিসেবে আধুনিককালে বেড়ে গেছে দুর্ঘটনার সংখ্যা, নষ্ট হচ্ছে অনেকের স্বাস্থ্য, হ্রাস পাচ্ছে কর্ম-ক্ষমতা ও উদ্যম। পানাসক্তরা হয়ে পড়ছে অলস, কর্ম-বিমুখ ও চরিত্রহীন। অ্যালকোহল ক্ষতি করে লিভার, হৃৎযন্ত্র, কিডনী, প্রায় সমস্ত শরীরের।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ

দি আয়োয়া সুপ্রিম কোর্টের কাছে এক ভদ্রমহিলা দুজন ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেন ওই ডাক্তারদের কাছ থেকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য সেবনীয় ঔষধ ব্যবহার করার পরে তিনি গর্ভবতী হন ও সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু বিচারক তাঁর অভিযোগ অগ্রাহ্য ক'রেছেন। তিনি বলেছেন গর্ভবতী হওয়ার ফলে কিংবা সন্তান-প্রসবের ফলে মহিলার যখন দৈহিক বা মানসিক কোনো-রকম ক্ষতি হয়নি তখন ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

গর্ভপাত আমেরিকার "উভয় সঙ্কট"

জুয়াখেলা আর মাদকদ্রব্য বিক্রি করার পর অবৈধভাবে গর্ভপাত ঘটানোই এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বে-আইনীভাবে অর্থোপার্জনের পথ।

আমেরিকার পরিকল্পিত পিতৃ-মাতৃত্ব সম্মেলনের সভাপতি ডঃ অ্যালান এফ গাটম্যাচার আজ এখানে এ কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের গর্ভপাত আইন মোটেই কঠোর নয়।

গর্ভপাতকে তিনি আমেরিকার উভয়সঙ্কট আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর দশ লক্ষ অবৈধ গর্ভপাত হয়—যেখানে বছরে জনসংখ্যা চুয়াল্লিশ লক্ষ আর বৈধ গর্ভপাত মাত্র দশ হাজার।

তিনি সুপারিশ করেছেন, মা যদি অবিবাহিত হন : মা'র যদি তিনটি কি চারটি সন্তান থাকে এবং আর যদি সন্তান না চায় ; এবং মা কিংবা বাবা যদি ওষুধে অভ্যস্ত হয় কি শারীরিক হয় কি ভাবাবেগে বিতাড়িত হয় তাহলে গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করা উচিত :

ট্রেন সার্জারির উপকরণ

ওয়েলসের একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী একটি ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার উদ্ভাবন করেছেন। এই স্ক্রু-ড্রাইভারটি ট্রেন সার্জারির সহায়ক। স্ক্রুগুলি খুলির বহিঃস্তরে প্রবেশ করবে। এই স্ক্রু এখন ইলেকট্রনিকস রেডিয়ো ও বিমান শিল্পেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সমুদ্রে পড়া তেল পরিষ্কারের জন্য ব্যাকটেরিয়া

লণ্ডনের টেলসি কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজিতে কোনরকম পরিশোধক পদার্থ ব্যবহার না ক'রে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সমুদ্রে-পড়া তেল পরিষ্কারের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণা শুরু হয়েছে।

কলেজের ডাঃ এন পিলপেল জানিয়েছেন তেলের ওপর ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ চালিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে এই কাজ করা হবে। এ-কথা জানা গেছে যে বিশেষ ধরণের ব্যাকটেরিয়া সমুদ্রে-পড়া তেল নষ্ট ক'রে দিতে পারে, তবে ধীরে-ধীরে।

ব্যবসায়ীদেরজন্য পুশ-বাটন টেলিভিশন লিংক

ব্রিটেনে ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে দূরবর্তী শহরে বাসকারী সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ পাবেন ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন লিংকের মধ্য দিয়ে। এমন কি তাঁরা হয়তো একদিন অন্য দেশের সঙ্গে এই ভাবে সহজে যোগাযোগ করতে পারবেন। টেলিফোনে কথা বলার মতোই এই যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হবে। ব্রিটেনের ডাক বিভাগ মনে করেন শুরুতে এর বড় রকমের চাহিদা হবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য যে অভিনেত্রীরা বিখ্যাত

ছায়াছবির দর্শক মাত্রই হলিউডের চিত্র-তারকাদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী। তাঁরা চান নিত্য-নতুন খবর। অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রেম, বিবাহ, আর বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত খবর তাঁরা জানতে চান। আর সত্যি কথা বলতে কি, হলিউডের চিত্র-তারকারা প্রায়ই বিবাহ করছেন, এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদও। আবার কয়েকজন অভিনেত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা খুবই বিখ্যাত। চারবার, পাঁচবার, এমনকি ৮ বার এঁরা বিয়ে করেছেন।

পাকি ডেবি রেনোল্ডস, লানা টার্নার, আভা গার্ডনার, লিজ টেইলর, জিঞ্জার রোজার্স, মেরিলিন মনরো, ইনগ্রিড বেরম্যান প্রমুখ অভিনেত্রীদের কপালী পর্দার জীবনের চাইতে বাস্তব জীবনই হাজার-হাজার দর্শকদের মনে বেশি কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। এরা প্রত্যেকেই বহুবার বিবাহ করেছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ।

এবার উইলিয়ম বিয়ে করেছিলো তার স্বপ্নের নায়ক বেনগেজকে। দশবছর সুখী দাম্পত্য জীবন যাপনের পর ভেঙ্গে গেলো বিবাহিত জীবনের সেই শান্তি। সে আকৃষ্ট হলো আরেকজন পুরুষ জেফ চাওদারের প্রতি। চাওদারের সঙ্গেও তার স্বামীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

ডেবি রেনল্ডস দুই সন্তানের জননী হওয়ার পর তাকে ত্যাগ করলো এডি ফিশার। ফিশার যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে লিজ টেলরের দিকে। টেলরকে সে বিয়ে করতে চায়। অথচ ডেবি বলতে তখন শহরের সব পুরুষেরা অজ্ঞান। তাকে সকলেই চায়। সাধারণ লোক তো বটেই, রাজা-বাদশরা পর্যন্ত। এর মধ্যে একজন বেলজিয়ামের যুবক রাজা। আবার ইতিমধ্যে রেন কোর্ডকে ত্যাগ করেছে তার স্ত্রী। ডেবিকে বিয়ে ক'রে রেন কোর্ড চায় তার একটা উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে।

লোকে দেখছে কি দেখছে না কিংবা তারা কী বলছে হলিউডের চিত্র তারকারা এ বিষয়ে একটুও ভ্রুক্ষেপ করে না। নাহলে এমন বেপরোয়া প্রেম, বিবাহ, এবং বিবাহ-বিচ্ছেদে মেতে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। বরং যে অভিনেত্রীকে নিয়ে যত বেশি কেলেঙ্কারী হবে তুর্ণার রটবে তত্তই তার সুন্দর মুখ দেখবার জন্য প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের ভিড় বাড়বে। কেলেঙ্কারী আর অপরাধের যে ব্যবসায়িক মূল্য আছে! তাই যৌবন উন্মাদনায় মেতে উঠেছে তারা। ওদেশের অভিনেত্রীদের জীবনে তাই অবিরাম রূপমুগ্ধ পুরুষের আনাগোনা। তাদের জীবন-দর্শন যেন এই 'ভালোবেসেই তো প্রথম বিয়েটা করেছিলুম তাতে যখন সুখী হওয়া গেলো না এখন থেকে শুধু মজা ক'রে আর মজা লুটে যাবো।'

• • • •

শহরের শেষপ্রান্তে গল্‌ফ্ খেলবার মাঠের একপাশে বেদের দল এসে তাঁবু ফেলেছে।
ম্যাথু আরনল্ড প্রাতঃভ্রমণে গেছেন সেদিকে। একজন আধবুড়ো বেদে তাঁকে দেখে সহাস্য মুখে বললেন—"আচ্ছা মশাই, এখানে লাইব্রেরী কোথায় আছে বলতে পারেন? আমার একখানা বই পড়বার খুব ইচ্ছা।"
—"কি বই?" প্রশ্ন করলেন ম্যাথু আরনল্ড।
—"এমন কিছু নয়,—সেকস্‌পীয়ারের জুলিয়াস সীজার।"
আশ্চর্য হলেন আরনল্ড। কিন্তু আরও আশ্চর্য হলেন তিনি যখন সেই বেদে অনর্গল সেক্সপীয়ার মিলটন আবৃত্তি করতে লাগলেন।
কিছুক্ষণ আলাপের পর আরনল্ড বাড়ী ফিরে এসে নূতন একখানা উপন্যাস লিখতে বসলেন, নাম দিলেন তার—"The Scholar Gipsy."

ক্ষুধা—প্রেম—মৃত্যুর পটভূমিকা আঁকা

সুনীল সরকারের বিস্ময়কর

উপন্যাস

"চাতকের মেঘ"

দাম—৫·০০ টাকা

এন, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

৭নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১২

গীতা দে—সহঃ সম্পাদক 'ইতিকথা'

৬সি, গোপাল ব্যানার্জী লেন, কলি-২৬

সদ্য প্রকাশিত

• বাংলা স্মৃতিকথা-সাহিত্যের এক অপূর্ব সংযোজন

• প্রাণরসপূর্ণ বৈঠকী-গল্পের সমারোহ

সাহিত্যস্রষ্টা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তাঁর বাকি জীবনকে ঘিরে কয়েকজনের সমাবেশ।

স্মৃতি কাহিনীতে উদ্ভাসিত বহু কাহিনী, বহু চিত্র,

বহু দুর্লভ সাহিত্য সঙ্গের বিবরণ

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

একজন আর কয়েকজন

বাংলা সাহিত্যে এক নতুন বিষয়ের বার্তা এনেছে।

প্রত্যেক লাইব্রেরী এবং সাহিত্য রসিক পাঠকের

পক্ষে অপরিহার্য। দাম : চার টাকা।

ডি. এম লাইব্রেরী

৪২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বহু প্রশংসিত রচনাবলী

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

চার্লি চ্যাপলিন (আশ্চর্য আত্মকাহিনী) ৩·০০

গল্প-ভারতীতে প্রকাশকালে যে রচনা পাঠক-মহলে বিপুল ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল।

অন্যান্য গ্রন্থ :

যাত্রা হ'ল শুরু (উপন্যাস : চলচ্চিত্রে রূপায়িত : ৩য় সংস্করণ) ৩·৭৫

নব নব রূপে (সুখভোগ্য রম্য কাহিনী) ৩·৫০

বীরবল রঙ্গ (আকবরের সভারত্ন বীরবলের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার কাহিনী) ৩·০০

আগুনের পরশমণি (উপন্যাস) ··· ৩·০০

হে মহাজীবন (মনীষীদের গল্প) ··· ৩·০০

স্মৃতির প্রদীপ (রহস্য উপন্যাস) ··· ২·৫০

তারকার মৃত্যু ও কালরাত্রি (দুটি রহস্য উপন্যাস একত্রে) ২·০০

মায়াজাল ও মরণাভিসার (,,) ··· ২·০০

কালো করাল ছায়া (রহস্য উপন্যাস) ··· ১·৫০

ভিন্ন স্বর্গ (শিরানদেলো, মলেয়ার, স্ট্রিন্ডবার্গ। (নাটক) ··· ২·০০

নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের মায়াবসান (নাটক) ২·৫০

নবনাট্যরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা প্রতাপ (,,) ৩·০০

Carey's Good Old Days (সম্পাদনা) ১৫·০০

Glimpses of the Olden Times (,,) ১০·০০

: যন্ত্রস্থ :

কেরী সাহেবের কলকাতা (কোম্পানী আমলের কাহিনী-রূপে গল্প-ভারতীতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত)

Echoes from Old Calcutta (সম্পাদনা)

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্ডার পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে।

দুটি বা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট

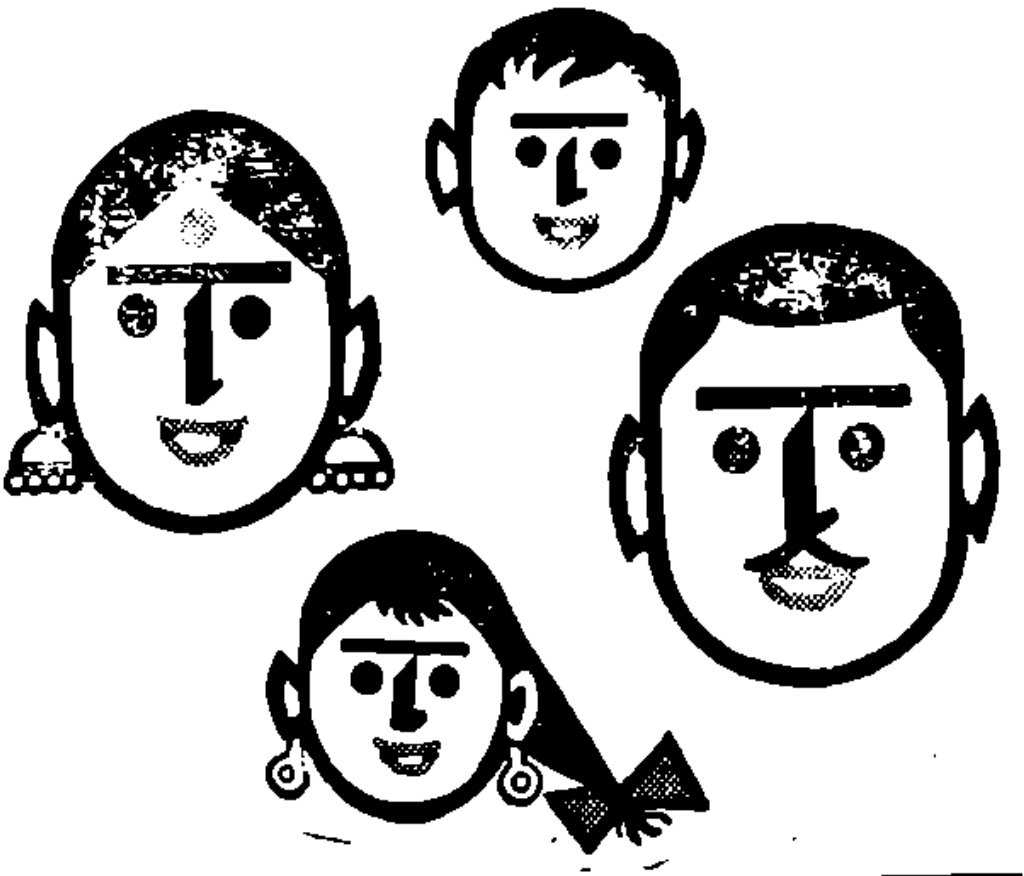

পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলির পরিচায়ক **লাল ত্রিকোণ**

নবযোবিংশতিতম বর্ষ।
দশম সংখ্যা — চৈত্র, ১৩৭৮

গল্প-ভারতী

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ :

মন যেথা যেতে ছুটে (স্মৃতি কথা)
—নরেন্দ্র দেব

অন্ধের মন্দির (ভ্রমণ কাহিনী)
—সুবোধকুমার চক্রবর্তী

বন্যাকন্যা (ধারাবাহিক উপন্যাস)
—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নাট মঞ্চ	ব্যাপার যা চলছে
খেলাধুলা	পুরাতন পাতা
মেয়ে মজলিশ	চলতি দুনিয়া
চলচ্চিত্রের কাহিনী	বিশ্ব সাহিত্য

ব্যঙ্গ চিত্র এবং

৬টি সুনির্বাচিত বিভিন্ন স্বাদের সুখপাঠ্য গল্প

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
ফাল্গুন ১৩৭৪, FEBRUARY, 1968
ত্রয়োবিংশতি বর্ষ—৮ম সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

[illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • পাইওনীয়ার ফুল • পাইন আই • সিলভার আই • 'হাইটেক্স' • 'সুপ্রিম' • সুপার বাস্টিক্স • ইকোনমিক • ফাইন-টেক্স' • 'পাইওটেক্স' ও অন্যান্য প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রেড-এর পাওয়া যায়।

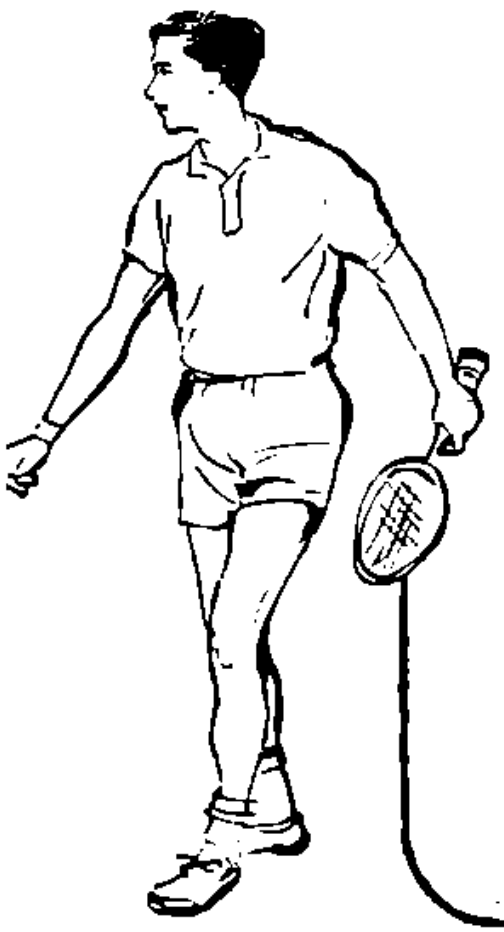

* দেখতে সুন্দর
* আরামপ্রদ
* টেকসই

টী-সার্ট • টেনিস সার্ট • ভেস্ট সার্ট • ড্রয়ার ও ব্রীফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধৌত ও প্রস্তুত।

ফোন : ৫৪৬-২২৮৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

যৌবনসুলভ
কমনীয়তা ও
অপরূপ
লাবণ্য

প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে এনে দিয়েছে যৌবনসুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য।
সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ।

সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশ পত্র

সাধনা বিউটি ক্রীম

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

G.P. 7/68

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

প্রেইন • রেগাটৈ • রেসী • লাইনি • পাইওনীয়ার ফুল • হাই কাই • হিলার কাই • 'হাইটেক্স' • সিল্কফিল • সুপার বাস্টিক্স • ইকোনোমিক • ইয়ং-টেক্স • 'পাইওটেক্স' ও অন্যান্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রাণ্ড-এর পাওয়া যায়।

* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেনিস সার্ট • চেক সার্ট • ড্রয়ার ও ব্রীফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধৌত ও প্রস্তুত।

ফোন : ৫৬-২৯৮৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

চৈত্র, ১৩৭৪, APRIL. 1968

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ—১০ম সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা

বার্ষিক সনের টাকা

শ্রীদোল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ

৯ [illegible] কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি ডাকে দিন তাহলে সেই দিনের ডাকেই যাবে

দিনের শেষে অফিস বন্ধ হওয়ার সময় এতো বেশী চিঠিপত্র ডাকে দেওয়া হয় যে পোষ্ট অফিসগুলির পক্ষে তা একটা বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। এতে কাজ খুব বেশী বেড়ে যায় ফলে সেগুলি বাছাই ক'রে পাঠাতে দেরী হয়।

চিঠিপত্র তাড়াতাড়ী ডাকে দিলে সেগুলি সে দিনই পাঠানো যায় এবং সেগুলির গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দেরী হয় না।

এখনই ডাকে দিব। বিকেল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাবেন কেন?

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

৮১৮৮ ৩০/৩৩৭ ৪

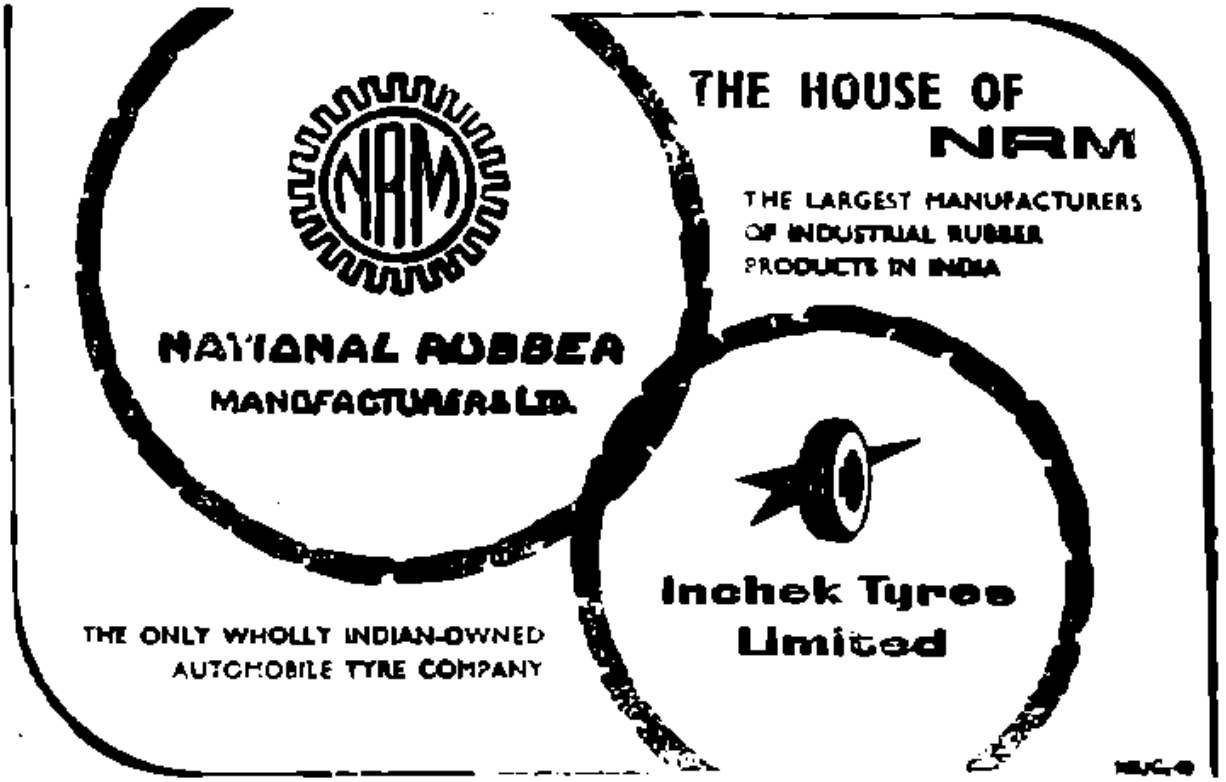

সঙ্গীতরসিকদের জন্য

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

সুরসুধাকর দিলীপকুমার রায় কৃত স্বরলিপি সহ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

দ্বিজেন্দ্র-গীতি ৮·· হাসির গান ৩··

●

সঙ্গীতবিশারদ স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত স্বরলিপিসহ

সাধন সঙ্গীত ৬·৫· দিব্য গীতি ৮··

●

সঙ্গীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত দিনের বেলার রাগসমূহের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ

রাগ-রূপায়ণ ৮··

●

জেনারেল বুক্‌স

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা-১২

Sulekha
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32
ardeeyar

রেলপথগুলি একতা ও জাতীয় সংহতি বাড়ায়

ভারতীয়
রেলপথের
১১০ বছর পূর্ণ হ'ল।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিংয়ে পত্রিকা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

গল্প-ভারতী
২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা—৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৪

। মিত্র-ঘোষের নূতন সাহিত্য-সম্ভার।

আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক
শ্রীনীরোদচন্দ্র চৌধুরীর
বাঙালী জীবনে রমণী ৮·৫০

প্রবোধকুমার সান্যালের চাঞ্চল্যকর উপন্যাস
নগরে অনেক রাত ৪·৫০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস
আঁধি ৭·৫০

লীলা মজুমদারের মধুকরা লেখনীর নূতন অবদান
আর কোনোখানে ৫৲

রমাপদ চৌধুরীর রোমাঞ্চিক উপন্যাস
জরির আঁচল ৪৲

জরাসন্ধের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস
বন্যা (নূতন মুদ্রণ) ৪৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
একদা কী করিয়া ১৩৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃহৎ উপন্যাস
রাধা (নূতন মুদ্রণ) ৮৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বৃহৎ উপন্যাস
অন্য দেশ অন্য দাহ ১২৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নবতম ভ্রমণকাহিনী
কুয়ারী গিরিপথে ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

একতাই শক্তি

সাধারণতন্ত্র দিবস এল এক চলে গেল। সাধারণতন্ত্র দিবসের উৎসবগুলির কথা মনে করার সময় আমাদের এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে ঐক্যের মধ্যেই আমাদের শক্তি নিহিত রয়েছে এবং একমাত্র একতার মাধ্যমেই আমরা আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি। এই মহান দেশের অধিবাসী বলে আমরা যখন গর্ব অনুভব করি তখন আমাদের সম্মুখে যে কর্তব্য রয়েছে তা সফল ক'রে তোলার জন্য আসুন আমরা সকলে আবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। সেই কর্তব্য ও লক্ষ্য হ'ল: এক মহান দেশ, এক মহান জাতি।

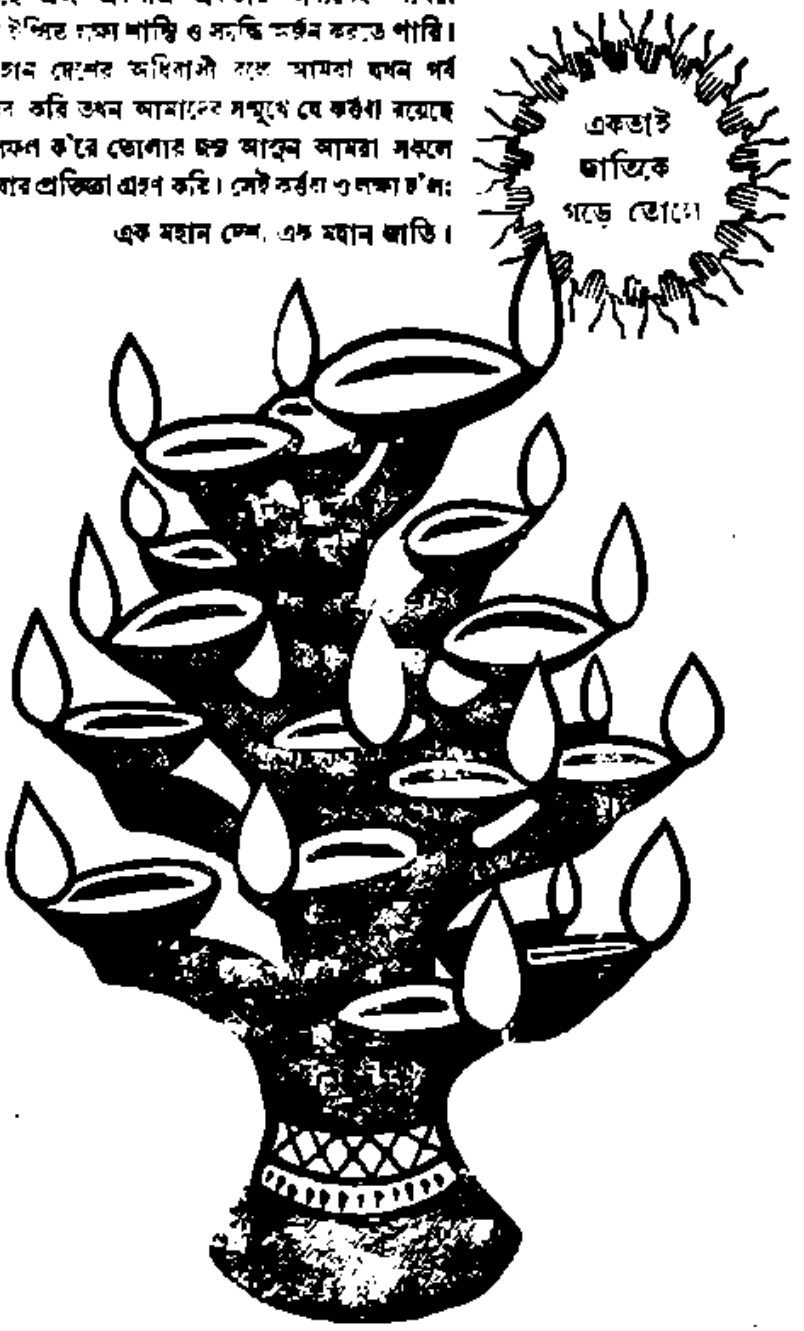

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় —		৭৩৫
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)		৭৩৯
বন্যা কন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭৪১
অগ্রের মন্দির	—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী	৭৫১
সমীক্ষা	—উষা ভট্টাচার্য	৭৬১
সেদিন সন্ধ্যায় সেই লোকটী (গল্প নয়)	—মলয় ঘোষ	৭৬৪
স্বস্তি (হাসির নক্সা)	—সুনীল চক্রবর্ত্তী	৭৬৭
দক্ষিণের জানালায় (এই প্রথম)	—সন্ধ্যা রায়	৭৭৫
মেয়ে মজলিশ		
বর্ষশেষ	—বেলা দে	৭৭৯
হাতের কাছেই অমোঘ ঔষধ	—নীলিমা দে	৭৮৩
ইথিওপিয়ার মিনি-স্কার্ট	—শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৮৪
অঙ্গনা সংবাদ	—দেবযানী	৭৮৫
রাত্রির সংলাপ	—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	৭৯২
মন যেতো যেথা ছুটে	—নরেন্দ্র দেব	৮০২

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার কেশ-ভোগের ও টাক চুলের গোড়া শক্ত ও সুস্থ রাখবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

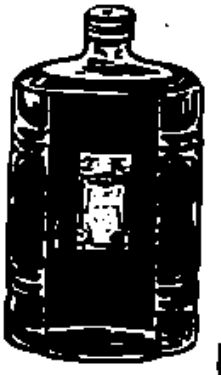

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

আমার সারাদিনের সাথী

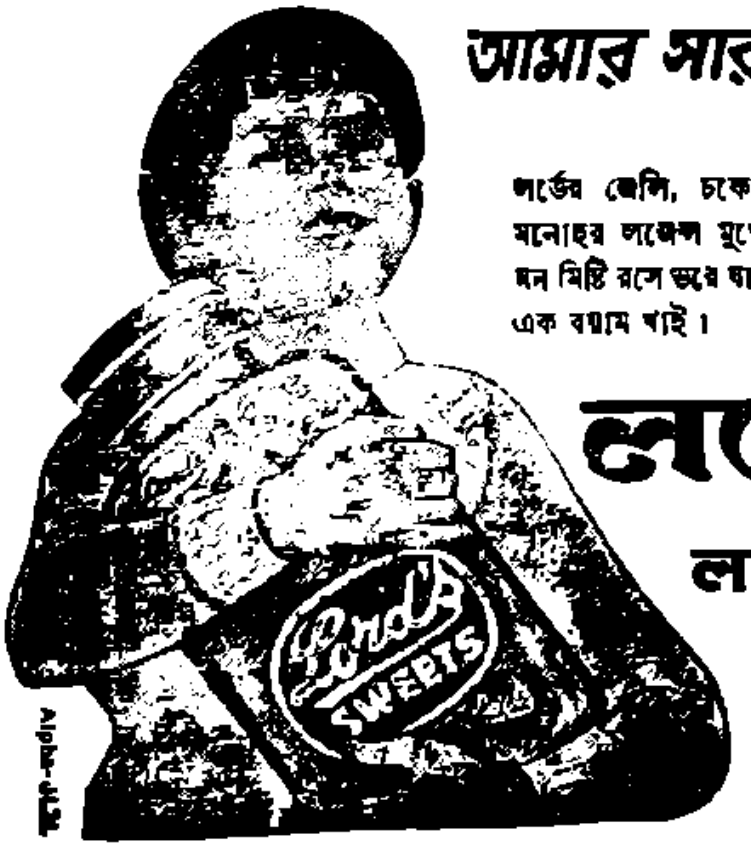

লর্ডের জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা মনোহর লজেন্স মুখে পড়লে শরীর ও মন মিষ্টি রসে ভরে যায়। মনে হয় রোজই এক বয়াম খাই।

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স্ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ

কলিকাতা-১

এই সংখ্যায়

বিশ্ব-সাহিত্য		
দেবতার উপহার	—মূল-কাথলিন রোডস্	
	অনুবাদ—গৌরী শংকর দে	৮০৯
সাহিত্য ও সাহিত্যিক		৮১৪
সাহিত্য সংবাদ		৮১৫
জলদস্যুর কাহিনী		
ক্যাপটেন কিড	—রমেন দে	৮১৬
দ্বিতীয় চিঠি (গল্প)	—মায়া বসু	৮১৯
পুরাতন পাতা		৮২৭
চলতি দুনিয়া		৮৩০
ব্যাপার যা চলছে	—চক্রপাণি	৮৩৩
সেদিনের সেই এক বাঙালী	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৮৩৬
নাটমঞ্চ	—রত্নাকর	৮৪০
খেলাধূলা	—শ্রীজ্যোতির্ময়	৮৪৯

পোড়া ---- কাটা ---- শোকার কারণ

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকে
পক্কেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
ক্ষত অরোমদায়ক

শুভের কাছে
জানুন

ওভারসীজ ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড

OBL

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিংয়ে পত্রিকা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

গল্প-ভারতী
২৭১ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা—৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৪

। মিত্র-ঘোষের নূতন সাহিত্য-সম্ভার।

আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক
শ্রীনীরোদচন্দ্র চৌধুরীর
বাঙালী জীবনে রমণী ৮·৫০

প্রবোধকুমার সান্যালের চাঞ্চল্যকর উপন্যাস
নগরে অনেক রাত ৪·৫০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস
আঁখি ৭·৫০

লীলা মজুমদারের মধুকরা লেখনীর নূতন অবদান
আর কোনোখানে ৫৲

সুবাপদ চৌধুরীর রোমান্টিক উপন্যাস
জরির আঁচল ৪৲

জরাসন্ধের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস
বন্যা (মূল্য মূল্য) ৪৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
একদা কী করিয়া ১৩৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস
রাধা (মূল্য মূল্য) ৮৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস
অন্য দেশ অন্য দাহ ১২৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নবতম ভ্রমণকাহিনী
কুয়ারী গিরিপথে ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

বিবিধ গুণসম্পন্ন
আয়ুর্বেদীয় সুরভিত

মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল

ভৃঙ্গল

- *মাথা ঠাণ্ডা রাখে*
- *স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশ বর্দ্ধনে সাহায্য করে*

ছোট শিশির জন্যই আপাততঃ এই নতুন বাক্স। ছোট ও বড় দুই রকম শিশিতেই এখনও পুরানো লেবেল চলবে। পরে আসবে নতুন লেবেল।

ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

ছিট্টি শিবলে ভৃঙ্গল-এর বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা পাঠান হয়।

CBF-1.0.60

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, দশম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি।

বাগবাজার ষ্ট্রীটের ওপর তখন ছিল ট্রেনের লাইন। ঘন-ঘন সিটি বাজিয়ে ইঞ্জিন চলতো বড় বড় মালগাড়ী নিয়ে। শহরের জঞ্জাল পরিষ্কার করবার এইটেই বুঝি ছিল প্রশস্ত উপায়।

মানুষও চলতো, ট্রেণও চলতো।

সে এক ভারি মজার অভিজ্ঞতা।

নন্দলাল বোস লেনের মুখেই যে লাল বাড়ীটা সেইটেই ছিল আমাদের হোষ্টেল।

মাত্র সাত দিনের ছুটি নিয়ে নজরুল (কবি নজরুল ইসলাম) এসেছিল করাচি থেকে। দিন-তিনেক থেকেই সে চলে গেছে তার দেশের বাড়ীতে। সেখান থেকে ফিরে যাবে করাচিতে।

'মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় তার একটি গল্প ছাপা হয়েছে। আমার কোনও লেখা তখনও পর্যন্ত কোনও পত্রিকায় ছাপা হয়নি।

লিখতাম তো কবিতা।

নজরুল লিখতো গল্প, আমি লিখতাম কবিতা।

কিন্তু নজরুলের লেখা গল্প কাগজে ছাপা হলো। আমারও ইচ্ছে হলো গল্প লিখতে।

কিন্তু কেমন করে লিখবো?

রাত্রে সেদিন একটি গল্প লিখবার চেষ্টা করলাম।

পারলাম না লিখতে। অনেকগুলো কাগজ লিখে লিখে নষ্ট করলাম শুধু। লিখি আর মনে হয়—কিছুই হচ্ছে না। এ-লেখা মানুষ পড়বে কেন? যা দেখেছি—হুবহু তাই যদি লিখে যাই—তাহলে তো গল্প হবে না। সেরকম লেখা হয়ত অনেকেই দেখেছে, সেরকম লেখা হয়ত অনেকেই লিখেছে।

গল্প কেমন করে লিখতে হয় জানি না। ইস্কুলে পড়বার সময় লিখেছি দু'-একটা গল্প। কিন্তু নিজেরই তা' ভাল লাগেনি। কলকাতায় এসে ভাল ভাল গল্পের বই পড়ে নিজেই তা বুঝতে পারছি।

কারও অনুকরণ আমি করবো না—এই ছিল আমার দৃঢ় সঙ্কল্প।

বাগবাজারের গঙ্গায় সেদিন স্নান করতে গেলাম।

মনের মধ্যে একটা অশান্ত উত্তেজনা। শুধু গল্পের কথা ভাবছি। গঙ্গার ঘাটে না বসে একটু ঘুরে গিয়ে একটা গাছের তলায় বসলাম।

গঙ্গার ঘাট তখন ফাঁকা হয়ে গেছে। দেখছি মাত্র একজন লোক একবুক জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্তবপাঠ করছেন।

চুপ করে বসে বসে দেখছিলাম। বেশ লাগছিল দেখতে।

হঠাৎ মনে হলো কে যেন কাঁদছে।

পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম একজন বর্ষীয়সী মহিলা একটি মেয়েকে ধরে ধরে নিয়ে আসছেন ঘাটের দিকে।

মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী।

সে কী বুকফাটা কান্না মেয়েটির! যুবতী মেয়েটি কান্নায় ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

তা দেখে কোনও মানুষ বিচলিত না হয়ে পারে না। যেখানে যত লোক ছিল ছুটে গিয়ে তাদের ঘিরে দাঁড়ালো।

মেয়েটি যদি অপরূপ সুন্দরী না হতো তাহ'লে বোধকরি এত লোক ছুটতো না। ঘাটের ওদিক থেকে কয়েকজন মেয়ে ভিজে-কাপড়েই এসে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে একজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, সরো বাছা, সরো। ওদের পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ো না। দেখতে পাচ্ছো না—ওদের কত দুঃখু হয়েছে। আ-মর্, ধাড়ি ধাড়ি মিন্‌বেরা সব—লজ্জাও করে না হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে? এসো মা এসো—এই দিকে এসো। কি হয়েছে বাছা? মেয়েটি কাঁদছে কেন?

বর্ষীয়সী মেয়েটি এতক্ষণ পরে যেন কথা বলবার লোক পেলেন।

—ছ' মাস আগে বিয়ে হয়েছিল মা, এখনও বছর ঘোরেনি। এরই মধ্যে ভাখো কেমন কপাল পুড়লো। আজ তার ছেরাদ্দ করতে নিয়ে এলাম গঙ্গার ঘাটে।

আর কিছু শোনবার প্রয়োজন হলো না। শুনতে পেলামও না। তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নামলাম স্নান করবার জন্যে।

ঘাট থেকে আবার দেখলাম সদ্যোবিধবা সেই নাম-না-জানা মেয়েটিকে।

সিঁড়ির একটা ধাপের ওপর তখন সে বসেছে ভাল করে। কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপর। মুখখানি যেন আরও সুন্দর মনে হচ্ছে।

আহা বেচারা! ছ'টি মাস ধরে স্বামীসঙ্গসুখের যে আনন্দ-উন্মাদনা এই রূপবতী নারীকে সুখের সপ্তম স্বর্গে তুলে ধরেছিল, আজ অকস্মাৎ সেখান থেকে একবারে শক্ত মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়েছে সে। কোনও দোষ নেই তার—কোনও অপরাধ নেই।

তবু তার এই দুর্ভোগ।

কেউ বলবে—তার অদৃষ্ট।

কেউ বলবে—বিধির এই পৃথিবীতে এমনিই হয়।

কিন্তু যে-মানুষটির অভাবে আজ তার এই দুঃসহ মনোবেদনা, সে-মানুষটিকে ভুলিয়ে দেবার মত সহস্র উপাদান আছে এই পৃথিবীতে।

বিধবা মেয়েটির স্বামীর কোনও ফটো আছে কি না জানি না।

যদি না থাকে তো আরও ছ'মাস পরে তার সেই মৃত স্বামীর মুখখানি কেমন ছিল সেকথা এই মেয়েটি ভাল করে স্মরণ করতেও পারবে না।

সবই সে ভুলে যাবে, শুধু ভুলবে না সেই আনন্দের স্মৃতি—যে-আনন্দ সে তার সর্ব্ব দেহমন দিয়ে অনুভব করেছে। তার জাগ্রত ইন্দ্রিয় তাকে ভুলতে দেবে না।

যুবতী নারী সে, একটি সহজ-সুন্দর জননী-জীবনের প্রতি তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে উন্মনা করে তুলবে।

হয়ত বা লোকে বলবে—এ তার দুর্বলতা। জীবনের এই দুর্বল মুহূর্ত্তগুলিকে জয় করবার সাধনাই হওয়া উচিত তার সারা জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।

কিন্তু আনন্দসন্ধানী মানুষের মন—বঞ্চনার দুঃখকে শিরোধার্য করে সারাজীবন শুধু বিধাতাকে অভিশাপ দিয়েছে—তাও যেমন দেখেছি, আবার ঠিক তার উল্টোটাও তেমনি আমার নজর এড়ায়নি।

গল্পের খোরাক্ পেয়ে গেলাম।

মনে হলো যেন এই মেয়েটির হৃদয়-বেদনাকে আমি যদি আপামর-সাধারণের বুকে সঞ্চারিত করে দিতে পারি তবেই হবে আমার গল্প-লেখা সার্থক। কিন্তু তাকে যদি রূপে এবং রসে সঞ্জীবিত করে তুলতে না পারি তাহ'লে সে শুধু আমারই কাছে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। লেখা হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না।

মানুষের হৃদয়ের এমনি-সব হৃদয়-ভাব, এমনি-সব আনন্দ-বেদনাই হলো সাহিত্যের উপাদান।

এই হলো আমার অপরিণত সাহিত্য-জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

• • •

"—যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই; যে জয় করে ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না; তাহাকে উচ্ছিষ্ট মাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর, মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা ভুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহার সবলে ত্যাগ করিতে পারে তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা কৃপণতা ঘৃণ্যতা গাড়ি ভুড়ি এবং তকমা-চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাস বিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব। এই দুই রাস্তা আছে—এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে পৃথিবীর সুখসম্পদ তাহাদেরই। যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।"

—রবীন্দ্রনাথ

অন্তরীক্ষে

বর্ষ শেষে...

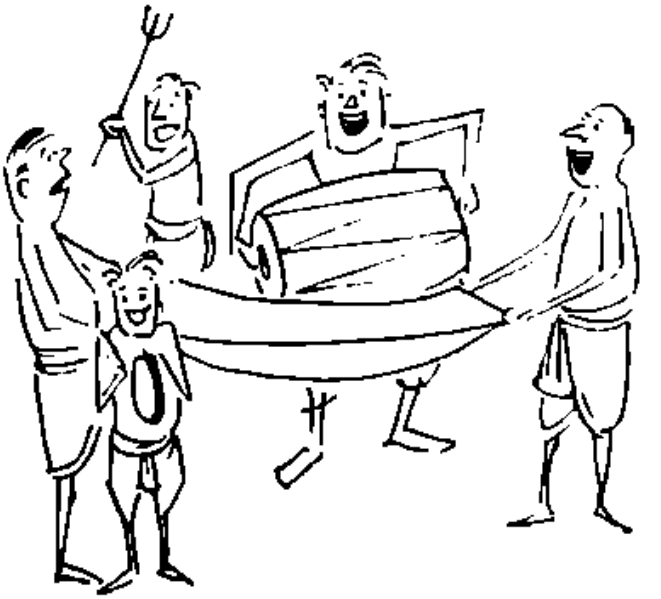

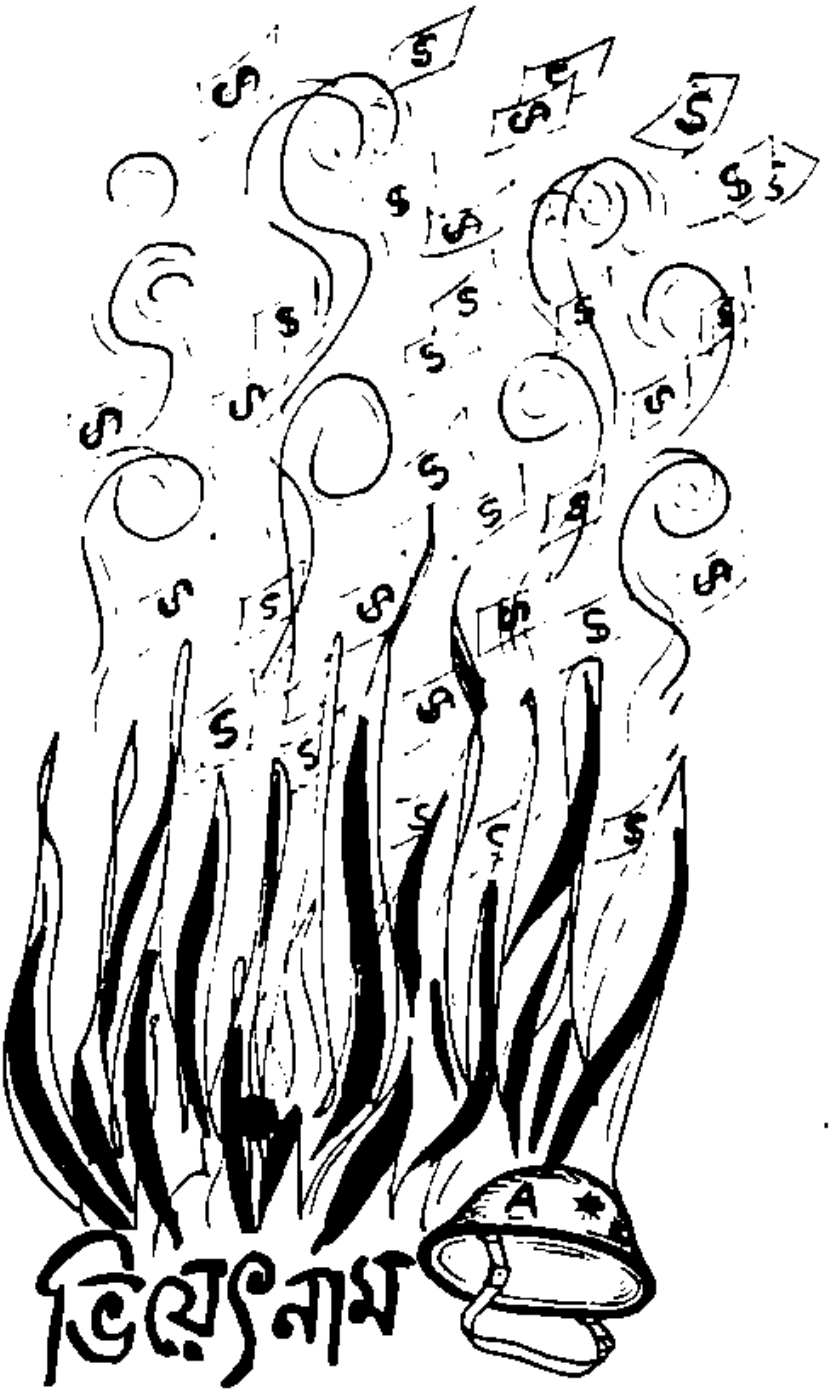
ভিয়েতনাম

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার ফার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে।

হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই মোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছে থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না।

একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে দলিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুধাংশুকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেলনা এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে আফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে

আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর রাজি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বসএর হুকুম মানছে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

॥ ষোলো ॥

আমি যেমন আমার বসএর কথা শুনছি, তোমারও তেমনি আমারই কথা শোনা উচিত।

বনছায়ার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। সুবীরের স্বরে কেমন একটা বন্ধুতার সুর। যেন সে এখন বনছায়ার বস। সে যেমন তার বসএর কাছে নতজানু বনছায়াও তেমনি তার কাছে বশীভূত হোক।

জ্বালাটা গলায় ফুটতে দিল না বনছায়া। বললে, 'তবু ও তিন-ঘরের বাড়িটা একবার দেখে আসতে তোমার আপত্তি কী।'

'আপত্তি ও-বাড়ি দেখার প্রশ্ন আর ওঠে না।'

'কিন্তু,' চোখে-মুখে লঘুতার লাস্য আনল বনছায়া: 'কিন্তু আমার মনে হয় ও-বাড়িটা দেখলেই তোমার পছন্দ হয়ে যাবে।'

'শুধু দেখেই পছন্দ করাতে আর আমি বিশ্বাসী নই।' কী রকম কাঠ-কাঠ গলায় যেন বললে সুবীর।

বনছায়ার হৃদয়ের কোন এক অজানা মাঠে এই কথার বাণটা উড়ে এসে পড়ল। গম্ভীর হবে না ভেবেও অভিমানে মন্থর হল কণ্ঠস্বর। বললে, 'কিন্তু আমার সামান্য একটা অনুরোধ তুমি রাখবে না কেন? শুধু একবার দেখে আসতে দোষ কী।'

'কী আশ্চর্য, বললাম তো, ও প্রশ্ন আর ওঠে না।' সুবীর বুঝি আরো একটু নির্মম হল: 'প্রাণ গেলেও আমার সেখানে যাবার উপায় নেই। শত দেখিয়ে মন ভোলালেও নয়।'

'এর মধ্যে কোনো যুক্তি নেই।' এবার বনছায়াও কিছুটা কঠিন হল: 'একই ভাড়ার বাড়ির মধ্যে বেছে মন্দ বাড়িটা নিতে হবে এ পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।'

'এ পাগলামি কেন এটুকু না-বোঝার মত বোকামিও অসহ্য।'

এবারের ঘা-টা বুঝি আরো একটু রূঢ় হল। এক মুহূর্ত বনছায়া কথা বলতে পারল না।

সুবীর এগিয়ে না এসে, দূর থেকেই চাইল একটু নরম হতে। বললে, 'এ সামান্য কথাটা তোমা মাথায় ঢুকছে না কেন? আমার বস যখন আমার জন্যে বাড়ি ঠিক করে দিয়েছেন, আমি কিছুতেই ত অস্বীকার করতে পারি না।'

'ভালো বাড়ি পেলে কেন করবে না?' বনছায়াও যুক্তির স্বচ্ছতার মধ্যে থাকতে চাইল: 'বলে ঐ ভাড়াতেই বেশি-ঘরের একটা বাড়ি পাওয়া গেছে—তাতে অনেক বেশি সুবিধে, অনেক বেশি এমিনিটিস—'

'না। পারব না বলতে। বলার কোনো মানে হয় না। বস বলে দিয়েছেন, ওটা আমার অফি কোয়ার্টার।'

হেসে উঠল বনছায়া। বললে, 'বাজে কথা।'

সেই হাসির মধ্যে সুবীর বুঝি বা প্রচ্ছন্ন বাঙ্গের আভাস পেল। বললে, 'তোমার কাছে যাহা কথা হতে পারে কিন্তু আমার কাছে ওটাই একমাত্র কাজের কথা।'

'অফিস-কোয়ার্টার তো, ভাড়াটা তোমার মাইনের বিল থেকে কাটা যাবে না কেন? কেন তার জন্যে বাইরের বাড়িওলার সঙ্গে আলাদা সর্ত করতে হবে?'

সুবীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল: 'আমার খুশি।' যেন মনে করল এই একটা দৃপ্ত ঘোষণাই সমস্ত যুক্তি-আপত্তির উত্তর। কিন্তু তার পক্ষেও যুক্তি নেই এ হতে পারে না। তাই ঐ একাধিপত্যের ধ্বজটাকে সে যুক্তির আলোতে স্বচ্ছ করতে চাইল। বললে, 'তুমি এটা বুঝছ না কেন, আমার নতুন চাকরি, তাও টেম্পোরারি, যে কোনো মুহূর্তে ছাঁট হয়ে যেতে পারি। এই অবস্থায় আমি আমার বসকে ডিসঅবলাইজ করতে পারি না।'

'অযৌক্তিক হলেও না?' বনছায়া ঝট করে উঠে দাঁড়াল: 'বেশ, আমিই গিয়ে তোমার বসএর সঙ্গে দেখা করব। তাঁকে বলব সব বুঝিয়ে। তিনি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবেন।'

'খবরদার, না।' সুবীর প্রায় আগুন হয়ে উঠল: 'বসএর কাছে স্ত্রীকে পাঠাব তদবির করতে, এ অসম্ভব।'

'এ আবার তদবির কী!' বনছায়ার আপাদমস্তক ঘিন ঘিন করে উঠল। স্বরটাকে বাঁকা না হতে দিয়ে পারল না। বললে, 'চাকরি পাবার বেলায় কিন্তু পাঠিয়েছিলে।'

'তখন তুমি তো একটা উদ্ভূত মেয়ে, গায়ে কাদা লাগলেও কিছু বিশেষ এসে যেত না। কিন্তু এখন তুমি আমার স্ত্রী—তোমাকে ওভাবে ব্যবহার করতে পারি না। আমার একটা সম্মান আছে।'

'আর আমার নেই?' বনছায়া লেলিহান হয়ে উঠল।

'প্রত্যেক মানুষেরই আছে। তারই জন্যে তো তোমার গিয়ে হাত কচলাবার দরকার নেই। তাছাড়া আমার বস যেন একটু প্রাচীনপন্থী—' একটা বিশ্রী কথা বলে ফেলে সুবীর আবার চাইল তা ঢেকে দিতে: 'স্ত্রীকে পাঠিয়েছি দেখলে হয়তো চটে যাবে। কে জানে চাকরি থেকেই ডিসচার্জ করে দেবে। তুমি কি তাই চাও যে বসকে চাটিয়ে, বসএর অবাধ্যতা করে আমি চাকরি খোয়াই? চাকরি খুইয়ে বাড়িতে বেকার হয়ে বসে থাকি? ওয়াইফ দ্বারা মেনটেও হই?'

খুব ঘুরন্ধর! যেন বনছায়ার সাহায্য ছাড়া ঐ মাইনেতে বাড়িভাড়া দিয়ে নিজেই নিজের পেট চালাতে পারবে! কিন্তু অসন্তোষের পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে চললেও রসাতলের খাদের মধ্যে পড়বে না এই সংকল্পে স্থির আছে বনছায়া। তবু আচমকা এমন এক-একটা ধাক্কা আসে যে মনে হয় এই বুঝি স্খলিত হয়ে পড়ে যায় নিচে।

আবার সামলাল বনছায়া। স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'ঈশ্বর না করুন, তেমন দুর্দিন যদি আসে তবে স্ত্রীর টাকায় মেনটেও হতে স্বামীর অগৌরব নেই।'

'স্বামিত্বের অগৌরব না থাকতে পারে, পুরুষত্বের অগৌরব আছে।' সুবীর দৃঢ় হল: 'সেটা পরিহার করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই প্রাণপণে চাকরিটাকে মজবুত করে তোলাই আমার প্রধান কাজ। সুতরাং আমার বস আমাকে যে বাড়িতে যেতে বলছেন আমি সে বাড়িতেই যাব। আমি তাঁকে ক্ষুণ্ণ করতে পারব না।'

এ আবার আরেকটা ধাক্কা। পাশটা বদলে ফেলল বনছায়া: 'কিন্তু আমার বস যদি ক্ষুণ্ণ হন?'

সুবীর প্রায় আকাশ থেকে পড়ল : 'তোমার বস ! তিনি এ ব্যাপারে আসেন কী করে ?'

'যা', বনছায়াও কম চমকাল না : 'তিনি একটা তিন-ঘরের ফ্ল্যাট ঠিক করে দেননি ?'

'বাড়ি নেব আমি, তিনি ঠিক করতে যাবেন কোন আইনে ? আমি তো তাঁকে বাড়ি দেখে দিতে রিকোয়েস্ট করিনি। তিনি কে ? আমার দু-ঘরের ফ্ল্যাট দরকার, তিনি তিন-ঘরের ফ্ল্যাট ঠিক করতে যান কেন ? তাঁর কী মাথাব্যথা ?'

কতক্ষণ সুবীরের মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল বনছায়া। পরে তাকাল মাটির দিকে। বললে, 'তোমার বাড়ি পাবার আগেই তাঁকে বলেছিলাম। আর সেটা ঐ দু-ঘরি ফ্ল্যাটের চেয়ে অনেক ভালো বলে সেটাতেই যান বলেছিলাম—তিনি হোয়াইটওয়াশ করিয়ে রেখেছেন। এখন যদি—'

মুখের কথা কেড়ে নিল সুবীর। বললে 'বেশ তো, তিনি, যদি খুশি হন তবে সে বাড়িতে তুমি গিয়ে থাকো, আমি আমার দু-ঘরের ফ্ল্যাটেই দিব্যি থাকতে পারব।' বলে প্রসঙ্গে পূর্ণ ছেদ টানবার ভঙ্গিতে উঠে পড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল সুবীর।

সেই প্রসঙ্গ অফিসেও টেনে নিল। ভাবল এতে বোধহয় সে হিমাংশুর আরো বেশি প্রিয়পাত্র হতে পারবে।

অবশ্য তাড়া দিল হিমাংশুই। সুবীরকে ডেকে পাঠিয়ে ঘরে আনিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে, 'নতুন ফ্ল্যাটে কবে সিফ্ট করছেন ?'

'আপনিই বলুন—' বিনয়াবাধা ভঙ্গিতে সুবীর বেশ কাছে এসে দাঁড়াল।

'যা, যত শিগগির হয়—হোয়াইটওয়াশ হয়ে গেছে। আর দেরি করার মানে হয় না।'

'এদিকে এক ঝামেলা বেধেছে, ভাই—'

'ঝামেলা ! কেন, কী হল। বসুন—' কাছাকাছি চেয়ারটাতেই বসতে ইশারা করল হিমাংশু।

মিস্টার ভৌমিক দুশো টাকা ভাড়ায় তিন-ঘরি ফ্ল্যাট ঠিক করেছেন শুনেই তো হিমাংশু পড়ি-ঘরি করে দেড়শো টাকায় দু-ঘরি ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিয়েছে। যাতে বনছায়ার ইচ্ছাটাকে পল্লবিত করে সুবীরের দাবি জয়ী হতে পারে, আর এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাধতে পারে শত্রুতা। আর এ শত্রুতায় বনছায়া পরাস্ত হলেই তো হিমাংশুর তৃপ্তি।

'আপনার বাড়িটা দেখে যাবার পর ভৌমিক হঠাৎ তাড়া পঞ্চাশ টাকা কমিয়ে দিয়েছে। এ আর কিছু নয়, আপনার সঙ্গে রিডিমিডি টক্কর দেবার চেষ্টা।' কী ভাবে বললে হিমাংশুর মনঃপূত হবে যেন বুঝতে পেরেছে সুবীর : 'আর একই ভাড়ায় তিন-ঘরি ফ্ল্যাট পাচ্ছে দেখে বনছায়া তারই জন্যে ঝুঁকেছে।'

হিমাংশু সামলাবার চেষ্টা করল। বললে, 'তাই তো স্বাভাবিক। তা ওর যখন ভৌমিকের ফ্ল্যাটটাই পছন্দ, তবে সেটাতেই নিয়ে নিন না।'

'না কক্ষনো না।' সুবীর গর্জে উঠল : 'আমি বলে দিয়েছি আমার বস আমার জন্যে যে বাড়ি দেখে দিয়েছেন তাই আমার শিরোধার্য। আসলে এক হিসেবে ওই আমার অফিসিয়্যাল কোয়ার্টার। তা ঘর সংখ্যায় কম হোক, ছোট হোক, ঘুপচি গলির মধ্যে হোক, কোনো যুক্তিতর্ক খাটবে না, আমি আমার কোয়ার্টারেই থাকব।'

'বনছায়া রাজি হবে ?'

[illegible] তো আছে তোমার ?

বিকল্পে কোথায় যাবে, সুবীর তাকে কোথায় যেতে বলেছিল উল্লেখ না করলেও হিমাংশু বুঝি তা আন্দাজ করতে পারল। বললে, 'বড়লোকের মেয়ে—বলা যায়না, হয়তো আপনাকে গ্রাহ্য না করেই ভৌমিকের ফ্ল্যাটটাতে থাকতে গেল।'

'অসম্ভব। তাছাড়া আরো পঞ্চাশটাকা কমিয়ে দিলেও নয়।' 'দৃঢ়তাব্যঞ্জক আর কোন ভাষা প্রয়োগ করা যায় ভেবে না পেয়ে সুবীর বলে বসল : 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আচ্ছা ভৌমিক, যে ফ্ল্যাটটা ঠিক করেছে সেটা কি তার বাড়ির কাছে?' হিমাংশু সদর রাস্তা ছেড়ে একটু গলিতে-গলিতে ঢুকতে চাইল।

জানিনা বলেই সুবীর আবার ঘুরে গিয়ে বললে, 'হবে হয়তো।'

'আচ্ছা, আপনার বাড়ির জন্যে ভৌমিকের ইন্টারেস্ট কেন?' আবার বাঁকা করে চোখ ফেলল হিমাংশু।

'কে জানে কেন। মিছিমিছি গোলমাল পাকানো!'

'হাঁ, সাবধানে থাকবেন। এবার আপনার স্ত্রীর মাইনে আরো পঞ্চাশ টাকা না বেড়ে যায়!' এবার বাঁকা চোখের বানের ভগায় মিষ্টি করে একটু বিষ মেশাল হিমাংশু।

বাড়ির প্রসঙ্গ বনছায়াকেও ভৌমিকের কাছে নিয়ে যেতে হল।

বিষণ্ণ মুখে বললে, 'আপনার দেখে দেওয়া সুন্দর বাড়িটাতে যাওয়া হল না। ওঁর বস, মিস্টার বোস ওঁর জন্যে একটা বাড়ি ঠিক করেছেন—'

'কে, হিমাংশু! সে তো খুব ভালো কথা। সাবঅর্ডিনেট স্টাফ-এর প্রতি সিমপ্যাথেটিক হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়।' দেবজ্যোতি উদার দৃষ্টিতে তাকাল।

এ যে কী ধরনের সহানুভূতি বনছায়া জানে। শুধু মনের জ্বালা মনে চেপে রেখে বললে, 'কিন্তু আপনার ফ্ল্যাটে তিনখানি ঘর ছিল আর মিস্টার বোসের ফ্ল্যাটে মোটে দুখানি। আমার নিজের জন্যে একখানা একলা ঘরের এত সখ ছিল,' পরে অস্ফুটে বললে, 'এত দরকার ছিল—'

'আপনার স্বামী কোনটা নিতে চান?'

'উনি বসএরটা।' মুখে আবার ক্লান্তির ছায়া ফেলল বনছায়া : 'দুখানা ঘরের একটা হবে বসবার ঘর, আরেকটা শোবার। বসবার ঘরে তো আমার স্বামী লেখাপড়া করবেন, আমি করব কোথায়?'

'কেন, শোবার ঘরে!' উদার কণ্ঠে হেসে উঠল দেবজ্যোতি।

'আমার যদি একলার একটা বসবার ঘর থাকত! আপনার ফ্ল্যাটটা হলে—'

'তা আপনার ভাবনা কী! আপনার হাতে তো ভালোবাসার জাদুদণ্ড আছে। যাদের হাতে ও জিনিস থাকে তারা তো নরককেও স্বর্গ করে তুলতে পারে। আপনিও তেমনি আপনার ভালোবাসার ছোঁয়া দিয়ে দুখানা ঘরকেই তিনখানা করে তুলবেন—চাই কি, তারও বেশি। যারা ভালবাসে, শুনেছি নাকি তাদের কোনো অভাব থাকেনা, কোনো কিছুতে টান পড়েনা। তাই আপনার ভয় কী, আপনার ভালোবাসাই আপনাকে অঢেল করে দেবে।'

'তাই বলে বিচার বিবেচনা থাকবে না?'

'সে সব পরে হবে—আগে ভালোবাসা। ভালোবেসে স্বামীর সঙ্গে প্রথমে এক ঘরের বাসিন্দে হয়েছিলেন, এবার দু'ঘরের বাসিন্দে হতে যাচ্ছেন, পরে অবস্থা বাড়লে তিন ঘরে প্রমোশন হবেন—জিনিসটা

অপ্রতুল হবে না আপনার।' সুন্দর করে হাসল দেবজ্যোতি। 'আগে প্রেমকে জয়ী করেছেন, এখন আনন্দকে জয়ী করুন। পতাকা যেন কখনো নত না হয়।'

আশ্চর্য, তার নির্বাচন নাকচ হয়ে গেলেও দেবজ্যোতি এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হলনা। হিমাংশুর অবয়বশ্রীর সমালোচনা করল না। তার মধ্যে কীটদষ্ট কুটিল অর্থেরও পাঠোদ্ধার করতে চাইল না। সুবীরের একগুঁয়ে নির্বুদ্ধিতাকেও কটাক্ষ করল না। একমাত্র বনছায়ার ভালোবাসাকেই বিশ্বাস করল। বিশ্বাস করল ভালোবাসাকেই অন্যকে অনেক করে দেবে। কোথায় কী কম পড়েছে তাই দেবে পরিপূর্ণ করে।

বিষাদ-বিশাল চোখ তুলে তাকাল বনছায়া। বললে, 'যাবার গাড়ির সেই গৃহপ্রবেশের সময় আপনি একটি কথা বলেছিলেন তা ভারি সত্যি আর সুন্দর।'

'হ্যাঁ, সত্যিই তো সুন্দর। কিন্তু আমি আবার কী বলেছিলাম?'

'আপনার হয়তো মনে নেই। আমি আপনাকে বলতে বলেছিলাম—আপনি বলেছিলেন, বসাটা বড় কথা নয়, আসাটাই বড় কথা। ভালোবাসার বেলাতেও বোধহয় তাই। ভালোবাসারও আসাটাই বড় কথা—' বাকিটুকু আর উচ্চারণ করল না বনছায়া, শুধু নিঃশব্দে চোখ নামাল।

'না, না, ও এমন এক বস্তু, একবার উড়ে এসে একেবারে জুড়ে বসতে চায়। শত চেষ্টা করেও তাড়ানো যায় না—'

'শুনুন,' হঠাৎ কণ্ঠস্বরের সমস্ত আর্দ্রতা মুছে ফেলে বনছায়া বললে, 'আপনার সেই বাড়িওয়ালার হোয়াইটওয়াসের খরচটা আমি দিয়ে দি।' হাতের ব্যাগ খুলে তার ভিতরে চোখ পাঠাল বনছায়া: 'আমার জন্যে মিছিমিছি কেন ওঁর লোকসান হবে?'

ধরাট গলায় হেসে উঠল দেবজ্যোতি। বললে, 'ঠিক বলেছেন। জীবনে চুনকামটাই আসল লোকসান। সত্যই একমাত্র উপার্জন। তা ঐ খরচের জন্যে আপনাকে ভাবতে হবেনা। বাড়িওয়ালার কোনো ক্ষতি নেই—এক ভাড়াটে যায়, এক ভাড়াটে আসে। তা এখন—'

তাড়াতাড়ি উঠে নিজের কাজে চলে গেল বনছায়া।

সুবীর চেয়েছিল বনছায়া বুঝি আরো খানিকক্ষণ আস্ফালন করবে। ভেবেছিল সে কিছুই উত্তর-প্রত্যুত্তর করবে না, নিস্তব্ধ থেকে নিজেই গোছগাছ করে জিনিষপত্র গাড়িতে তুলে দেবে। তারপর চরম মুহূর্তে শেষবারের মত বলবে, আমার সঙ্গে যেতে হয় তো চলো—তারপর বনছায়া জানে যাবে কিনা, কিংবা কোথায় যাবে।

আশ্চর্য, বনছায়া একেবারেই নাটকের মধ্যে গেল না—কী আর কথা এমনি সমর্পণের ভঙ্গিতে সুবীরের ইচ্ছাতেই সম্মত হল। মনে মনে হাসল সুবীর—তার বল ঠিকই বলেছে, শক্তেরই ভক্ত—শক্তেরই সিংহাসন - নরম হয়েছে কি মাটি আঁচড়াবে। কিন্তু বনছায়ার অমন নির্লিপ্ত মুখও আবার ভালো লাগে না। যন্ত্রের মত গোছগাছে সে হাত চালাচ্ছে বটে কিন্তু তার মন যেন অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছে কিংবা তার মন বলে কিছুই যেন কোথাও নেই, সে বুঝি বেড়াতে যেতেও ভুলে গেছে।

তবু তাকে একটু নাড়াচাড়া দিতে ইচ্ছে হল সুবীরের। বললে, 'তোমার বল আশা করি জিনতিকটিত নয়। তার বাড়িটা ভাড়া না নিলেও আশা করি তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তাছাড়া তোমার চাকরি পার্মানেন্ট চাকরি।'

নির্লিপ্ত মুখে বনছায়া বললে, 'আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।'

'করেছিলে? কী বললে তৌমিক?'

'ঐ তুমি যা বললে, তাই। বললেন, আপনার স্বামীর টেম্পোরারি চাকরি, যে কোনো মুহূর্তেই চাট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া তার বল খুব ডিসক্রিডিটিড, তাকে ওটানো ঠিক হবে না।'

কীরকম কেটে কেটে যেন কথাগুলি বললে বনছায়া। সুবীরের এমনি স্পষ্ট মনে হল। কিন্তু প্রকাশ্যে আপত্তি করার তার মুখ কই? তার অযোগ্যতা, তার দুর্বলতাকেই তো সে যুক্তিরূপে দাঁড় করিয়েছে। এখন মুখ তার করলে চলবে কেন?

তবু সুবীরের একটু খোঁচা দিতে ইচ্ছে করল। বললে, 'তাই তোমার বসএর কথায় বুঝি আমায় সঙ্গে যেতে রাজি হলে?'

'তোমার সঙ্গে যাব তাতে বসএর পরামর্শ লাগবে কেন? কারুর পরামর্শের অপেক্ষা না রেখেই তো বেরিয়ে এসেছি। এখন তো আর যাবার প্রশ্ন নেই, এখন শুধু থাকবার প্রশ্ন। বস বুঝিয়ে দিলেন, তুমি বুদ্ধিমান হতে পারো কিন্তু বলবান নও। আমি সঙ্গে না থাকলে তোমার দু-ঘরের সংসারেও চলবে না, শত ওভারটাইমেও না। তাই তোমাকে রক্ষা করবার জন্যেই আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে হবে।'

কী স্পর্ধার মত বলছে কথাগুলো! কিন্তু প্রতিবাদ করবার মত কিছু খুঁজে পেল না সুবীর। তাই শেষে নিরুপায় হয়ে প্রশ্ন করলে: 'তোমার বদলে ঐ তিন-ঘরের ফ্ল্যাটে এখন কে থাকবে?'

প্রশ্নটার মধ্যে কোনো নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে কিনা তলিয়ে দেখতে চাইল না বনছায়া। সরল মুখে বললে, 'আর কেউ থাকবে। এক ভাড়াটে যায় এক ভাড়াটে আসে।'

দেবজ্যোতির কথাটাই পুনরাবৃত্তি করল বনছায়া। কিন্তু সুবীরের তা জানবার কথা নয়। সে যেন শুনল, এক ভালোবাসা যায় এক ভালোবাসা আসে।

নতুন বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ভয় ঠেলে নতুন সংসার সাজাল বনছায়া। দুখানা ঘর—তিনখানা ঘরের চেয়ে কম হলেও একখানার চেয়ে তো বেশি—তাই বা কে দেয়? তিনের দিকে তাকালে কষ্ট, কিন্তু একের দিকে তাকালে?

সুতরাং দুয়েতেই স্থির থাকা সমীচীন।

কিছু ফার্নিচার কেনা হল—নিচু একটা খাট, একটা আলমারি। প্রথমে ঢুকেই বসবার ঘর, পুরোনো তক্তপোশটাই সোফা-সেটির কাজ করবে, সতরঞ্চির উপর চাদর-পাতা আরামে যতজনি মেজাজে বসতে পারবে অতিথিরা—যদি কেউ আসে—আর ওপাশে টেবল-চেয়ার-সেলফে ঘেরা লেখবার নিরিবিলি। দরজায় পর্দা ফেলা। পাশের ঘরটাই শোবার, আলমারি খাট সেখানেই। দু'ঘরের মাঝখানেও পর্দার আড়াল। দুঘর ছুঁয়ে ভিতরের দিকে টানা বারান্দা, শেষে রান্নাঘর, আর বাথরুম। সব মিলিয়ে তেমন কিছু অশোভন নয়। শুধু তিনের কথা ভাবতে গেলেই অশান্তি।

'এই তোমার জন্যে লেখবার ঘর সাজিয়ে দিলাম- এবার থেকে সাহিত্যে মন দাও। একটু বুঝি বা সস্নেহ প্রশ্রয়ের কথা বলল বনছায়া। বললে, তুমি যে একজন কৃতী কবি এ যেন তুমি ভুলে গেছ। একটি সার্থক কেরানি হবার আনন্দেই তুমি এখন মেতে উঠেছ মনে হচ্ছে। কতদিন কবিতা লেখনা খেয়াল আছে কিছু?'

'না, না, এবার লিখব।' সুবীরের পুরোনো তারে মধুরের ঘা লাগল। পর্দা সরিয়ে শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু তুমি লিখবে কোথায়?'

তুমি লিখবে কোথায়! একরাশ অভিমান বুকের মধ্যে ঠেলে উঠতে চাইল—বনছায়া তা মুহূর্তে দমন করে বললে 'আমার আবার লেখা। আমি লিখবো না।

'কেন খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে লিখবে। বুকের নিচে বালিশ দিয়ে। শুনেছি মেয়েরা নাকি ঐ ভঙ্গিতেই নভেল লেখে আর ঐ ভঙ্গিটার দরুণই তাদের নভেল নাকি দারুণ জমে। তোমারও তো গল্প উপন্যাসেরই লাইন—মন্দ কি, তুমি ঐ ভঙ্গিটাই প্র্যাকটিস কর না। তাই কি তুমিও উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী হয়ে যাবে।'

'তুমি নিজের চরকায় তেল দাও। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমার তো আবার আফিস করে এসে রান্না করা, আমার সাহিত্যও ঐ ভাতের হাড়িতেই শেষ হবে।'

'না, তা কেন? রান্নার লোক ঠিক করেছি। কথাটও রাখ। তোমাকে বুটোটিও নাড়তে হবে না।'

'কই সেই লোক?'

'দু'একদিনের মধ্যেই আসছে। আমার বস ঠিক করে দিয়েছেন।'

এখানেও বস! বনছায়ার সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল। সেই লোক এখন যে রকম হোক, যত অপদার্থ, যত অকর্মণ্য—তাকে রাখতেই হবে, যেহেতু সে বস-এর ঠিক করা। তা না হলে যে চাকরি বিপন্ন হবে, টেম্পোরারি পার্মানেন্ট হবে না।

'মাইনে কত?'

'সে আফিস থেকে ম্যানেজও হবে।'

'তার মানে?'

'তার মানে অভিরাম আফিসের পিওন—সে উনুন ধরিয়ে বাজার করে এনে রান্না করে আমাদের খাইয়ে দশটার মধ্যে আফিস পাঠিয়ে দেবে। তারপর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাসন-টাসন মেজে ঝাঁটপাট দিয়ে সে এগারোটায় আফিস চলে যাবে। পাঁচটার মধ্যে ফিরে এসে আবার কাজে লাগবে।'

'তারপর রাত্রে বাড়ি চলে যাবে?'

'না, না, তার বাড়ি কোথায়? সে এখানেই থাকবে। কলকাতায় তার মাথা গোঁজবার জায়গা নেই বলেই তো সে সবকিছুতে রাজি হয়েছে। আসলে সে দিন রাত্রেরই লোক, মাঝখানে শুধু ঘণ্টা ছয়েকের ফাঁক।'

'তার মানে ঐ লোকেরও একটা চাবি থাকবে?'

'হ্যাঁ, ট্রিপ্লিকেট চাবি। অভিরাম নইলে যাওয়া-আসা করবে কী করে?'

বিপদের গন্ধ শুঁকল বনছায়া। অভিরাম কখন কাকে চুপি চুপি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে তা কে বলতে পারে?

তবু আগে থেকেই তার পাথার অর্থ নেই। অভিরাম আগে কাজে লাগিয়ে নিক।

অভিরাম যেমন অভিজ্ঞ তেমনি বিনয়ী। বাজারের হাত শুকনো, রান্নার হাত পাকা। দুদিনেই কর্তা-গিন্নিকে সে খুশি করে তুলল। কিন্তু বনছায়ার মনের মধ্যে কেবলই খুঁতখুঁতুনি, এত দক্ষতার মাইনে কে দেবে?

আবার প্রশ্ন করাতে সুবীর বিরক্ত হল। প্রায় ধমকের সুরে বললে, 'তোমার এ নিয়ে মাথাব্যথা

'তোমার ঐ তো মুস্কোল, তুমিই যা দেবে কোত্থেকে ?' বনছায়া ফিরিয়ে না দিয়ে পারল না।

'বলেছি তো আফিস দেবে। ওটা আমার কোয়ার্টারেরই একটা য়্যামিনিটি।' সুবীর এবার ব্যঙ্গে প্রখর হয়ে উঠল : তোমার ভৌমিক দিত এই সুবিধে ? কি, কথা বলছ না কেন ? দিত ?'

স্তব্ধ হয়ে গেল বনছায়া। তার মানে অভিরামের বাড়তি বাইনেটা হিমাংশু দেবে। কেন, কী অতিসন্ধিতে দেবে ? অভিরাম এখানে গুপ্তচরবৃত্তি করবে, তার জন্যে ? ভিতর থেকে হিমাংশুকে খুদে দেবে বলা—তার জন্যে ?

কিন্তু অভিরামকে দেখলে মনে হয় না সে কোনো কুটিলের কারবারি। ভদ্র, সরল, পরিশ্রমী—অল্প কথায় মানুষ, এক কাজে হাজির। কী করে কর্তা-গিন্নিকে সেবা করবে, আরাম দেবে, তারই জন্যে ব্যস্ত। কাজ শুধু তাড়াতাড়িই করে না, নিখুঁত করে করে, এটা শুধু শরীরেরই বিশ্রাম নয়, মনেরও বিশ্রাম।

বনছায়া আফিস থেকে ফিরে কতক্ষণের মধ্যেই অভিরামের হাতে তৈরি গরম চা ও খাবার পায় এ প্রায় স্বর্গসুখের কাছাকাছি। কিন্তু তারপর ? তারপরেই সুরু হয় নরকযন্ত্রণা। নিঃসঙ্গতার নির্যাতন। তখন যে বনছায়া কী করে ভরে উঠবে ভেবে পায় না। শুয়ে বসে বই পড়ে কতক্ষণ কাটাবে ? সুবীর লিখছে না বলে সে অনুযোগ দেয়, কই সেও তো লেখবার মন খুঁজে পাচ্ছে না ? এখন তো অফুরন্ত জায়গা, ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফেরে তার ঠিক নেই। কিন্তু কলমই তো লেখে না, লেখে যে মন সে কেন এত বীতরাগ ? একদিন জোর করে অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসল, খানিকটা বাড়ানো যায় কিনা—কিন্তু লাভের মধ্যে হল এই, আগের কটা পৃষ্ঠা বিশ্রী হয়েছে ভেবে রাগ করে কেটে ছিঁড়ে বাতিল করে দিল।

না, সেও বেরিয়ে পড়বে, বাড়ি থাকবে না। সুবীর বাড়ি ফিরে দেখবে বনছায়া ঘরে নেই। একা-একা তারও সময় কাটাবার পথ আছে। সঙ্গী আছে।

'সন্ধের সময় চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকবার কী হয়েছে ? শরীর ভালো থাকে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসুন না।'

কথাটা অভিরাম সহৃদয় অভিভাবকের মত বললে বটে কিন্তু বনছায়ার কেমন ভালো লাগল না। আবার ভাবল, ভালো না লাগবার কী হয়েছে ? তার মত মেয়ে সন্ধেতেও যে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকবে এটাই তো অস্বাভাবিক।

'হ্যাঁ, বেরোচ্ছি। সাবধানে থেকো।'

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল বনছায়া। তাবল কোথায় যায় ? সন্দীপ ছাড়া আর কাউকে সে সে-মুহূর্তে ভাবতে পারল না।

[ক্রমশঃ]

অন্ধ্রের মন্দির

শ্রীবোধ কুমার চক্রবর্তী

পূর্বানুবৃত্তি

—ছাব্বি—

প্রাতঃরাশ সেরে আমি সীমাচলম পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলুম। গভীর অরণ্যে আবৃত পাহাড় জনশূন্য, পথ নেই উপরে উঠবার। কিন্তু এক মধুর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি মন্দিরার মতো। নৃসিংহদেবের মন্দিরে কি আরতি হচ্ছে! না, এতো মন্দিরার শব্দ নয়, এ যে নূপুরের নিক্কণ। আবার কী উর্বশী এসেছে অমরাবতী থেকে!

নিজের দিকে আমি তাকালুম। কে আমি। কার জন্যে আমি এখানে এসেছি! দেবতায় টানে না—

সচকিতে আমি উঠে বসলুম। আর স্বাতি হেসে উঠল খিলখিল করে। আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। স্বাতি বলল: ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম তো!

নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছি। বললুম: তার জন্যে দুঃখ নেই, দুঃখ হচ্ছে একটা বড় সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করলে বলে।

কী রকম?

উর্বশী এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু আমি পুরূরবা হতে পারলুম না।

গভীর বিস্ময়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

হেসে বললুম: স্বপ্ন দেখছিলুম।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল: তাহলে তো আপনার খুব ক্ষতি হয়ে গেল! তাড়াতাড়ি চলে আসুন পাশের ঘরে, তা না হলে আরও ক্ষতি হবে। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে, বেলাও পড়ে আসছে।

বলে স্বাতি ফিরে গেল।

আমিও দেরি করলুম না। মুখে জল দিয়ে চুল ফিরিয়ে পাশের ঘরে চলে এলুম।

মামা বললেন: যতক্ষণ তুমি ঘুমোলে, ততক্ষণে আমাদের সব প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে গেল। স্বাতি আমাদের সব দেখাবার ভার নিয়েছে। আজ দেখবে ওয়ালটেয়ার আর বিশাখাপত্তন, কাল সকালে সীমাচলম ঘুরিয়ে এনে ট্রেনে তুলবে। সোজা মাদ্রাজ।

মামী চা তৈরি করছিলেন। একটা পেয়ালা মামার হাতে দিলেন, আর একটা দিলেন আমার দিকে এগিয়ে। আমি হাত বাড়িয়ে সেই পেয়ালাটি নিয়ে মামার পাশের একখানা চেয়ারে বসলুম।

মুখে এক চুমুক চা নিয়ে মামা বললেন : পারতে তুমি এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করতে ?

গাড়িতে আপনারা শোবার জায়গা পেলে একথা মেনে নেব।

মামা যেন চমকে উঠলেন, ছলকে গেল খানিকটা চা। বললেন সত্যিই তো, আরও একটা রাত যে আমাদের ট্রেনে কাটবে।

বলে স্বাতির দিকে তাকালেন কতকটা অসহায় ভাবে।

স্বাতি ঘমল না, বলল : সে ভার গোপালদার ওপরে। ট্রেনের কথা আমরা ভাবব না।

আমি বললুম : তাহলে তো ব্যবস্থা খুব সহজ হয়ে যাবে। ঘুম পেলে একটা বড় ষ্টেশন দেখে নেমে পড়ব! রাতে ওয়েটিংরুমে ঘুমিয়ে আবার সকালের ট্রেন ধরব।

স্বাতি বলল : রাত আটটার পরে তো আমরা বিজয়ওয়াড়ায় পৌছব।

তাহলে তো আরও ভাল। অমরাবতী আর নাগার্জুনকোণ্ডাও দেখা হয়ে যাবে।

মামা বললেন : টক্সের অমরাবতী ?

আমি বললুম : বৌদ্ধ অমরাবতী। শুনেছি, বিজয়ওয়াড়ার খুব কাছে এই জায়গা।

স্বাতি একটা ম্যাপ খুলতে যাচ্ছিল। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম : থাক এখন, বেড়িয়ে ফেরার পর ওসব দেখব।

ঘর ছেড়ে বেরুবার সময় মামী দরজায় তালা দিচ্ছিলেন। হোটেলের তালা। আমি বললুম : ও তালা দেবেন না মামী। নিজেদের জিনিষপত্র রেখে যাচ্ছি, পরের তালায় বিশ্বাস না করলে দোষ হবে না।

মামী বললেন : এতবড় তালা তো আমাদের সঙ্গে নেই।

আমি আমার ব্যাগ থেকে বড় তালাদুটো বার করে আনলুম, বললুম : তালা নিয়ে নিশ্চয়ই বেরোননি ভেবে এ দুটো কিনে এনেছি।

সপ্রশংসদৃষ্টিতে মামা তাকালেন তালার দিকে।

হোটেলের ম্যানেজারকে বলে স্বাতি একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করেছিল। সে আমাদের ওয়ালটেয়ার আর বিশাখাপত্তন দেখাবে আজ, আর কাল সকালে সীমাচলমের মন্দির দেখিয়ে আনবে। দরকার হলে স্টেশনেও পৌছে দেবে। পয়সা অনেক নেবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কৃপণতা করলে নাকি খরচ বেশি হত, আর একটা দিন থাকতে হত ওয়ালটেয়ারে। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে আমরা নিচে নামলুম।

• • • •

ওয়ালটেয়ার সহরটি খুবই অদ্ভুত ধরনের। এর আগে এমন সহর আমি আর দেখিনি। সমুদ্র আছে, পাহাড় আছে, আবার সবই সমতল বলে মনে হচ্ছে। পথে এমন অগণিত সাইকেল রিক্সা চলছে যে মনে হচ্ছে না কখনও উপরে উঠছি, কখনও নামছি নিচে। সমুদ্র যে এত নিকটে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

গাড়িতে উঠবার আগে ড্রাইভারকে মামা বললেন : উর্ধশ্বাসে ছুটবে না, চলবে ধীরে ধীরে। আর সবকিছু চিনিয়ে দেবে ভাল করে।

ড্রাইভার মাথা নাড়ল দক্ষিণী কায়দায়। হাঁ বলল, না না, তা বোঝা গেল না। মামা বললেন : আক্সেলটা দেখলে তো, নিজের মর্জিমাফিক চলবে।

স্বাতি বলল : সে ভয় নেই। ওকে ভাল করে তালিম দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু পথে বেরুতেই বোঝা গেল যে তালিম দেওয়া বৃথা হয়েছে। হুড়মুড় করে পথে বেরিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল।

আমি ড্রাইভারের পাশে বসেছিলুম। পিছন থেকে মামা বলে উঠলেন : চেপে ধর গোপাল, অমন বেপরোয়া ভাবে ছুটতে দিও না।

আমি বললুম : আস্তে, সাবধানে চল।

মামী বললেন : দুর্গা, দুর্গা।

কিন্তু ড্রাইভার কোন নির্দেশ মানল না। কোন লক্ষণই দেখলুম না তার আস্তে চলবার। মামা বললেন : কী করছ গোপাল, চেপে ধরনা ওর হাতখানা।

আমি বললুম : স্পীড তো ওর পায়ে। হাত চেপে ধরলে দুর্ঘটনার ভয় আছে।

কিছু একটা কর।

মামার কাতর কণ্ঠস্বর শুনে আমি বললুম : রোকো স্টপ।

গাড়ি একটা ঝাঁকানি দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গেল।

বললুম : আরেস্তা, স্লো, ধীরে। ডোণ্ট্ গো ফাস্ট।

ড্রাইভার বুঝতে পারল আমার কথা। চলতে চলতেই বলল : এদিকে দেখবার কিছু নেই, তাই জোরে যাচ্ছি।

পরিষ্কার হিন্দী কথা বলতে পারে। বলল : এখন ইউনিভার্সিটির দিকে যাচ্ছি। অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি, আপল্যাণ্ড্ বলে ঐ দিকটাকে।

আপ্‌ল্যাণ্ড্ কেন বলে তা একটু পরেই বুঝতে পারা গেল। প্রশস্ত পথ ক্রমে উপরের দিকে উঠেছে। সাইকেল রিক্সাও চলছে এই পথে। রিকসাওয়ালাকে মাঝে মধ্যে নামতে হয়, ঠেলে তুলতে হয় রিক্সা। তবে তাদের ধরণ দেখেই বোঝা যায় যে এই কাজে তারা অভ্যস্ত। একটুও সময় নষ্ট করছে না।

প্রথমে যে বড় বাড়িটি আমাদের চোখে পড়ল সেটি দণ্ডকারণ্য রেলের প্রধান অফিস। ডি. বি. কে. রেলওয়ে। পুরো নাম আমার জানা ছিল না। শুধু এইটুকু জানতুম যে দণ্ডকারণ্য ও পূর্বঘাট পাহাড়ের কয়েকটির অরণ্যময় স্থানে এই নতুন রেলপথ পাতা হয়েছে। লোহা ও অন্য খনিজ পদার্থ বিশাখাপত্তন বন্দরে আনবার জন্যেই এই পথ খোলা হয়েছে। যাত্রী চলাচল আছে কিনা জানি না, কিন্তু মাল চলাচল হচ্ছে।

আমার এক বন্ধুর কাছে এই পথের বর্ণনা শুনেছিলুম। সে এই রেলপথ নির্মাণের সময় কিছুদিন কাজ করেছিল। অপরূপ সুন্দর পথ। দুই পাহাড়ের মাঝখানে খরস্রোতা নদী বয়ে গেছে বহু নিচে দিয়ে। তারই উপরে সেতু নির্মাণের সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। বড় বড় ক্রেন দিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়নি, মানুষের দক্ষতার উপরেই বেশির ভাগ নির্ভর করতে হয়েছে। এই কাজের জন্যে নাকি এগিয়ে আসে কেরালার একটা জাতি। দার্জিলিঙে তাদের দক্ষতা আমরা দেখেছি।

দেখতে দেখতেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছে গেলুম। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল : ভিতরে যাবেন কি ?

আমি পিছন ফিরে মামার দিকে তাকালুম।

মামা বললেন : দেখবার কিছু আছে ?

ড্রাইভার তার গাড়ির গতি আরও মন্দ করেছিল। বললুম : আমরা নামব না কোথাও, ঘুরে দেখাতে পারলে দেখিয়ে দাও।

বাম হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রবেশ দ্বার। সেই পথে গাড়ি আমাদের ভিতরে ঢুকে গেল। বিরাট এলাকা জুড়ে অনেকগুলি বড় বড় বাড়ি। চওড়া রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে গেলুম, তারপর ডানহাতে বেঁকে কতগুলো ছাত্রাবাসের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলুম।

স্বাতি বলল : এ আমাদের কলকাতার মতো একটুও নয়।

সত্যি কথা। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমরা দুতিনখানা বাড়ি বুঝি। বিশ্ববিদ্যালয় যে এমন একটা বিরাট ব্যাপার হতে পারে, এ ধারণা এখানে এসেই প্রথম হল।

আর একবার ডান হাতে ঘুরে আমরা সদর রাস্তায় এসে গেলুম। তারপরে ধরলুম বাঁ হাতের পথ। শান্তিনিবাস নামে একটা আশ্রমে আমরা নামলুম না। এই আশ্রমের কথা ড্রাইভার আমাদের ভাল বোঝাতে পারল না। মনে হল যেন যৌগিক প্রথায় এখানে রোগের চিকিৎসা হয়। কাউন্সনের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেলে সমুদ্রের ধারে পৌঁছনো যায়। আমরা সোজা পথে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছলুম। বিশাল সমুদ্র দেখলুম চোখের সামনে, উত্তাল তরঙ্গ শ্রেণী অবিরত মাতামাতি করছে।

উত্তপ্ত সমুদ্র সৈকতে এখন জনমানব নেই। পরিত্যক্ত শূন্য এখন সৈকত-সংলগ্ন একটি সুন্দর উদ্যান। নব নির্মিত রেস্তোরাঁতেও কোন অতিথি দেখলুম না। বেলা শেষে এই সব জায়গা যে কলরবে মুখর হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

অনেকটা এগিয়ে আমাদের পথ ঘুরিয়ে গেল। সামনে যেন একটা দুর্গের মতো বাড়ি পথিকদের বাধা দেবার মতো মাথা উঁচু করে আছে। ড্রাইভার ডান দিকে মোড় নিয়ে চড়াই পথে উপরে উঠে এল। এই জায়গার নাম বোধহয় মহারাণী পেটা, বিশাখাপত্তনের একটি জমাট পাড়া। বড় বড় বাড়ি আছে, আছে পোষ্ট অফিস আর কালেক্টর অফিস, কিং জর্জ হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ। বাঁ দিকে ঘুরে আরও কিছুদূর যাবার পরে মিসেস এ. ভি. এল. কলেজ।

সমুদ্রের ধারে পৌঁছে আমরা একটা জেলে পাড়া দেখেছিলুম। তাদের কুঁড়ে ঘরগুলি এক অদ্ভুত ধরণের। আমাদের দেশের মতো চারকোণা ঘর নয়, ঘরগুলি সব গোলাকার, তার তালপাতার ছাদ উঠেছে খুব নিচু থেকে, উপরে একটা শলাকার মতো চূড়া। মেয়েরা ধান ভানছে, আর অলসভাবে গল্প করছে পুরুষেরা। ড্রাইভার আমাদের বলেছিল যে এরা বিদেশী মালও, চোরাকারবারও করে। সৌখিন লোকেরা এদিকে আসে ভাল মদের লোভে, ট্রানজিসটার, টেপ রেকর্ডার ও ক্যামেরার খোঁজেও আসে অনেকে। আমরা দূর থেকেই এই গ্রামটি দেখেছিলুম।

এখন আমরা শহরের মধ্যে এসে পড়েছি। স্বাতি বলল : সমুদ্র শেষ হয়ে গেল, কিন্তু জাহাজ তৈরির কারখানা তো দেখতে পেলাম না !

ড্রাইভার বুঝতে পেরেছিল তার কথা, বলল : সমুদ্র শেষ হয়ে যায়নি, একটুখানি ঘুরে আমরা আবার সমুদ্রের ধারে পৌঁছতে পারতাম। একখানা বাড়ির জন্যে ওয়াল্টেয়ারের সমুদ্র দুটো ভাগ হয়ে গেছে।

স্বাতি বলল : সেদিক দিয়ে আমরা গেলাম না কেন ?

ফেরার পথে আসব সে দিকে, এখন আমরা বাজারের মধ্যে দিয়ে ভাইজাগে যাব।

ভাইজাগ !

ভিজেগাপটম। দেশ স্বাধীন হবার পরে নাম হয়েছে বিশাখাপত্তন। বন্দর ও জাহাজ তৈরির কারখানা দুইই সেই দিকে। আগে ওয়ালটেয়ার থেকে ভিজেগাপটম ট্রেনে যাত্রী চলাচল করত, এখন শুধু মালবহনের ব্যবস্থা আছে।

ওয়ালটেয়ার শহরের সকল পথ যে সমতল নয়, মোটরে চেপে তা ঠিক বোঝা যায় না। পায়ে হাঁটলে বোঝা যেত, কিংবা রিক্সায় চাপলেও বুঝতে কষ্ট হত না। উপরে উঠবার সময় রিক্সা চালানো সম্ভব নয়, আবার নিচে নামবার সময়েও বেগে নেমে আসে। কিং জর্জ হাসপাতালটি একটি মালভূমির উপরে অবস্থিত মনে হল। সমুদ্রের ধার থেকে উপরে উঠে আবার নিচে নামতে হয়।

ড্রাইভার এবারে শহরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হল। তার কাছে বাজারের দুটি নাম শুনলুম। একটির নাম পূর্ণ মার্কেট, টার্মিনাল পৌঁছবার কাছে এই বাজার। দ্বিতীয়টা এগিয়ে কুরুপা মার্কেট, একই পথের উপরে অবস্থিত। লোকজন যানবাহন যে কোন বড় শহরের মতো। তবে মনে হল যে যানবাহন একদিকেই চলেছে, ফিরবার পথ বোধ হয় অন্য।

এই পথের শেষ পর্যন্ত আমরা যাইনি। তার আগেই ডান দিকে ফিরে বন্দরের দিকে চলে গেলুম। খোলামেলা জায়গা, ফাঁকা ফাঁকা পথ, জনবিরল নিঃশব্দ। অনেক দূর এগিয়ে পৌঁছলুম বন্দরে। কতগুলো বন্ধ গেট পেরিয়ে একটা জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড়াল। ড্রাইভার নিচে নামল, আমাদেরও নামতে বলল।

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু আমি কোন কথা না বলে নেমে পড়লুম। বেলা পড়ে এসেছে, অন্ধকার নামতে আর দেরি নেই। ইতস্ততঃ করবার সময় এখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমার দেখাদেখি স্বাতিও নেমে পড়ল।

মামা বললেন : এখানে আবার নামতে হবে নাকি !

নিজে নামতে নামতে মামী বললেন : দেখতেই তো পাচ্ছ !

মামা বললেন : তোমাদের নামতে তো দেখছি, কিন্তু কেন নামছ সেই কথাটি জানতে চাই।

ড্রাইভার তাঁর কথা বুঝতে পেরেছিল কিনা জানি না, বলল : সামনে একটু এগিয়ে যান, বড় বড় জাহাজ আর ক্রেন দেখতে পাবেন।

স্বাতির কাঁধে ক্যামেরা ছিল, তাই দেখে বলল : ছবি তুলবেন না যেন, ছবি তোলার এখানে নিষেধ আছে।

স্বাতি ফিরে এল, বলল : ক্যামেরাটা তাহলে গাড়িতেই রেখে যাই।

আমি বললুম : সেই ভাল। তা নাহলে অকারণে টানাটানি করতে পারে।

ততক্ষণে মামাও নেমে পড়েছিলেন, বললেন : টানাটানি করবে কেন ?

বললুম : ছবি তুলিনি বললেও অনেক সময় মানে না।

তারপরে এক বন্ধুর গল্প শোনালুম তাঁকে। নাগপুরে একটি দুর্গ আছে পাহাড়ের উপরে, তাতে এখন ভারতীয় সেনানিবাস। কী একটা উৎসবের দিনে এই দুর্গের দ্বার খুলে দেওয়া হয়, জনসাধারণ সেদিন অবাধে দুর্গ দেখতে আসতে পারে। আমার এক বন্ধুও কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে উপরে উঠেছিল। তার ইচ্ছা

ছিল উপর থেকে নাগপুর শহরের একখানা ছবি তোলবার। কিন্তু ক্যামেরা খোলবার আগেই এক রক্ষী তার ক্যামেরাটি কেড়ে নিল। বলল, অফিসে এটি জমা হয়ে যাবে। ক্যামেরাটি উদ্ধারের জন্য অনেক বেগ পেতে হয়েছিল তাকে। অ্যাসিস্টেন্টের সঙ্গে দেখা করে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। জড়ানো ফিল্মটা খুলে নিয়ে দয়া করে তিনি ক্যামেরাটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এগোতে এগোতে মামা বললেন : যত সব বাড়াবাড়ি!

ততক্ষণে আমরা একটি খোলা জায়গায় পৌঁছে গেছি। সামনে সমুদ্রের জল শান্ত স্তব্ধ। অকূল সমুদ্র নয়, উঁচু পাহাড়ে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হচ্ছে। এ যেন পাহাড়ে ঘেরা কোন হ্রদ, তারই মাঝে মাঝে সমুদ্রগামী জাহাজগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘডানার ক্রেনগুলিও এখন অচল। দিনের কাজ শেষ হয়ে গেছে, বিশ্রাম করছে বন্দর।

আমি শুনেছিলুম যে সমুদ্র থেকে যেখান শহরের ভিতর ঢুকেছে তার নাম ব্যাকওয়াটার। এই খালের ধারে বন্দর, আর জাহাজ নির্মাণের কারখানাও শুরু হয়েছে এইখান থেকে। ধারে কাছে কোন লোক থাকলে তাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারতুম।

অন্ধকার নামছে দেখে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে গাড়িতে বসলুম। ড্রাইভার আমাদের পুরনো পথে গেল না। সামনের দিকেই নিয়ে চলল। খানিকটা এগিয়ে একটা কারখানার সামনে দাঁড়াল, বলল : ইচ্ছা করলে এ জায়গাটা দেখে আসতে পারেন।

এবারে আমি আর নামলুম না, বললুম : কী আছে দেখবার?

ড্রাইভার বলল : বরফের কারখানা, আর মাছের কোল্ড স্টোরেজ। সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ধরে এইখানে রাখা হয়, তারপরে চালান হয় এইখান থেকে।

মামা বললেন : থাক থাক। বরফের কারখানা আর দেখতে হবে না।

স্বাতি বলল : সমুদ্রে মাছ ধরা হচ্ছে!

ড্রাইভার বলল : মাছ ধরার নৌকো এখন ঘাটে বাঁধা আছে।

মামা বললেন : চল চল, এগিয়ে চল।

ড্রাইভার বুঝল যে এখানে আমরা নামব না, তাই এগিয়ে গিয়ে একেবারে সমুদ্রের ধারে এসে থামল। বলল : এইখানে নেমে ডলফিন্‌স্ নোজ দেখুন।

মামা বললেন : সে আবার কী?

স্বাতি ততক্ষণে নেমে পড়েছে। বলে উঠল : কী সুন্দর দৃশ্য দেখ মা।

মামী নামলেন, আমি নামলুম, কাজেই মামাকেও নামতে হল।

সাহেবরা এই শহরকে বলত ইণ্ডিয়ান ব্রাইটন, আর সামনের ঐ পাহাড়ের নাম দিয়েছিল ডলফিন্‌স্ নোজ। বিলেতের ব্রাইটন আমরা দেখিনি। হয়তো এই শহরের সমুদ্র ও মনোরম দৃশ্যের জন্য কিংবা চমৎকার আবহাওয়া দেখে তারা এই নামকরণ করেছিল। কিন্তু ডলফিন্‌স্ নোজ্ নামটা যে সার্থক হয়েছে তা এক নজরেই বোঝা যায়। সমুদ্রের মাঝে একটি পাহাড় যেন নাকের মতো উঁচু হয়ে আছে। শহরের অনেক জায়গা থেকে এটি দেখা যায়, আর সামনের খাল নৌকোয় করে পেরিয়ে ঐ পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উঠলে চারদিক শহরটি দেখতে পাওয়া যাবে। লোকে ছুটির দিনে পিকনিক করতে ওখানে যায়।

এই পথের ধারেই বড় পোস্টঅফিস আর পুরনো লাইট হাউস। নূতন লাইটহাউস তৈরি হচ্ছে সামনের পাহাড়ের উপরে। যাদের উৎসাহ বেশি তারা নাকি সেদিকেও বেড়াতে যায়।

সহরের বাসগুলো এসে স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে দাঁড়ায়। সেখান দিয়েই একটা পথ বাজারের প্রধান সমান্তরালভাবে টার্মিনাল চৌমুহ্নির দিকে চলে যায়। আমাদের নাকি সেই রাস্তা দিয়ে ফিরতে হবে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাতি জ্বলছে চারিধারে। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল: আপনারা কি এখন সমুদ্রের ধারে হেঁটে বেড়াবেন, না ফিরে যাবেন হোটেলে?

মামা বললেন: সমুদ্র তো দেখতেই পাচ্ছি হেঁটে আর দেখব কী!

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম, কিন্তু স্বাতি নীরবে রইল। মামী বললেন: হোটেলেই ফিরে চল।

একবার ইচ্ছা হল বলি: আমি এইখানেই থেকে যাই। এমন সৌন্দর্যের সামনে থেকে আমার সরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কিন্তু কেন জানিনা, সে কথা আমি বলতে পারলুম না। ফিরে গেলুম সকলের সঙ্গে।

—পাঁচ—

হোটেলে ফিরে মামা ট্যাক্সিকে বিদায় দিলেন, বললেন: কাল ভোর বেলাতেই আসবে। দেরি যেন না হয়।

ড্রাইভার বলল: সাতটায় তো!

না, না, অত দেরি করলে আমাদের গাড়ি ফেল হয়ে যাবে। ঘুম ভাঙলেই চলে এসো।

ড্রাইভার হেসে বলল: যে আজ্ঞে।

মামার বাঙলা কথার উত্তর হিন্দীতে দিয়ে ড্রাইভার চলে গেল।

আমি বললুম: এবারে আমাকে একটু ছুটি দিন।

কিসের ছুটি!

বললুম: দুপুরের ভাত এখনও হজম হয়নি, একটুখানি হেঁটে আসি।

উদ্বিগ্ন ভাবে মামা বললেন: এই অন্ধকারে, আবার বেরবে নাকি!

বেশি দূরে নয়, কাছেই একটু ঘুরে আসব।

স্বাতি যেন শুনতেই পায়নি, এমনি ভাবে বলল: চল মা, আমরা ওপরে যাই। বলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

মামা বললেন: এখন তোমার না বেরলে কি নয়!

মামী বললেন: ওকে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন? যেতে চাইছে, যাক না একটু ঘুরে আসুক।

মামা বললেন: বেশি দেরি কোরোনা যেন।

বলে তিনিও সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমার মন টেনেছিল সমুদ্রের দিকে। হোটেল থেকে বেরিয়ে আমি বাজারের রাস্তা ধরে সোজা চলতে লাগলুম।

বড় বড় দোকানগাট এখন আলোয় ঝলমল করছে। খানিকটা এগিয়ে সেই পূর্ণ মার্কেট। তিন দিকে তার বড় রাস্তা, আর একদিকেও বোধহয় রাস্তা আছে। যে কোন দিক থেকেই বাজারের ভিতরে ঢোকা যায়। সারি সারি দোকান। শাক-সবজি ফলমূল সবই এখানে পাওয়া যায়। এসব দেখে আমি সময় নষ্ট করলুম না। পুরপা মার্কেটের ভিতরেও ঢুকলাম না। সমুদ্রের ধারে পৌঁছবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম।

এর আগে সমুদ্র আমি দেখিনি। খানিকক্ষণ আগে যে সমুদ্র দেখলুম, তাকে ঠিক দেখা বলে না। আমার ধারণা যে সমুদ্র দেখতে হলে সারাদিন বসে থাকতে হয় বালির উপর। শেষ রাত থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত। একটু একটু করে অন্ধকার ফিকে হবে, পুব আকাশে আলো ফুটবে একটু একটু করে। চাঁদ ডুববে, তারা নিববে, তারপর সূর্য উঠবে লাল থালার মতো। সমুদ্রের কালো জল নীল হবে, আকাশ আর জলে কোন প্রভেদ থাকবে না। তারপর দুপোলি রোদে ঝকমক করে উঠবে সমুদ্রের বুক, তখন সাধা মনে হবে জলের রঙ। তরঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে সবুজের আভা দেখতে পাওয়া যাবে।

রাতের সমুদ্র নিশ্চয়ই অন্য রকম। অন্ধকারে কি তার রূপ দেখতে পাব না।

একখানা রিক্সা আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে স্বাতি নেমে পড়ল সেই রিক্সা থেকে। তারপর রিক্সাওয়ালার হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে আমাকে বলল, চলুন।

একেবারে নির্বিকার ভাব। যেন এ একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার :

আমি বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলুম না, বললুম : তুমি একা বেরিয়ে এলে ?

স্বাতি বলল : কী হয়েছে তাতে !

কিছু হয়নি। আমি মামা মামীর কথা ভাবছি। তাঁরা তোমায় একা বেরতে দিলেন ?

বেশ ! দিল্লী বা কলকাতায় কি ঘরের ভেতর বন্দী থাকি !

তাও না। তবে একেবারে, নতুন জায়গা তো !

স্বাতি বলল : হারিয়ে যাব বুঝি ! না চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে !

আমি গম্ভীরভাবে বললুম : সে ভয়ও যে নেই তা নয়।

স্বাতি আরও গম্ভীর হয়ে বলল : আপনাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়।

কেন ?

পুরোনো ঘুসটাকে এখনও আঁকড়ে থাকতে চাইছেন। মেয়েরা কি এখনও আপনাদের কৃপার পাত্র কিছুমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ তো প্রাচীন কবি, আধুনিকদের কথা তিনিও জানতেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : বলব তাঁর কথা ?

বলুন।

আমি সুর করে বললুম :

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে—
হেন বীর নারী আছে কি সৌড়ে
নারী প্রগতির মহাদিনে আজি
নারী পদগতি জিনিল এ বাজি।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : আধুনিকাদের উত্তর পেয়ে কবি কী বলেছিলেন তা বুঝি ভুলে গেছ ?

এবারে আমি তাকালুম স্বাতির মুখের দিকে।

স্বাতীও সুর করে বলল :

কবিগিরি ফলাবার উৎসাহ-বন্যায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়।

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম : চমৎকার।

স্বাতি খুশী হল অপরিমিত, বলল : একটা কথা বলব গোপালদা ?

বললুম : বল।

স্বাতি হেসে বলল : আজ কম করেও হাজার আটবার 'আপনি' বলছি তোমাকে। পরকে এমন আপন বলিনি এতদিন।

আমিও তার জবাব দিলুম হেসে, বললুম : দেবতাকেও লোকে আপনি বলে না। ও তো মান নয়, ও দূরে ঠেলে রাখার ফন্দি। আমারও তা সইবে না।

উত্তর শুনে স্বাতি আবার হাসল। হেসে উঠল দূরের সমুদ্র, পথের ধারে পাথরের ওপর একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে কলকল করে উঠল। তখন আমরা সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেছি।

সমুদ্র কি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করল।

আকাশে চাঁদ নেই। শুধু তারার আলোয় সমুদ্র আলোকিত হয়নি, অন্ধকারেও আবৃত হয়নি তার উচ্ছ্বাস। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি আকাশের সঙ্গে মিশে আছে। আর ডানহাতে সেই পাহাড়টি দেখতে পাচ্ছি—ভল্‌ফিনস্ নোজ্। কাছেই একটি মস্ত জাহাজ, তার আধখানা ডুবে আছে বলে মনে হচ্ছে। খানিকক্ষণ আগেও এই জাহাজটি আমরা দেখেছিলুম।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : জাহাজটা এখনও একভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন গোপালদা ?

আমি বললুম : বন্দরে হয়তো জায়গা নেই।

স্বাতি বলল : বন্দরে তো বেশি জাহাজ ছিল না।

এ কথার উত্তর আমি দিতে পারলুম না। কিন্তু পরে জেনেছিলুম যে ঐ জাহাজখানা চিরকাল ঐখানেই থাকবে অমনি ভাবে। একখানা অকেজো জাহাজকে বন্দর রক্ষার কাজে লাগানো হয়েছে।

সমুদ্রের ধারের অপ্রশস্ত পথ ধরে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেলুম। প্রায় শেষ পর্যন্ত। রাস্তা যেখানে প্রশস্ত হয়েছে ঘরবাড়ি সেখানে বিরল। দূর থেকে সেই বাড়িটি দেখতে পেলুম, যেটি ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রকে দুভাগ করেছে। তারপরেও যে অবারিত সমুদ্র আছে। এধার থেকে তা বোঝা যায় না। এধারে সমুদ্রের শহরে রূপ, ওধারে প্রাকৃতিক। এধারে বেড়াবার সময় নিজেদের কথা বুঝি ভোলা যায় না।

ফেরার পথে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : বসবে কোথাও ?

স্বাতি বলল : না।

কেন, এ প্রশ্ন আমি করতে পারলুম না। কিন্তু স্বাতি নিজেই উত্তর দিল : সময়ের কথা তাহলে আমরা ভুলে যাব।

সত্যি কথা। সমুদ্র এত বড় যে তার সামনে শুধু সময়ের কথা নয় মানুষের কথাও তুল হয়ে যাবে। নিজেদের কথা ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। বললুম : সেই ভাল। এবারে তাহলে ফেরা যাক।

স্বাতি বলল : কিরলেও তো আমাদের চলবে না।

কেন !

আমি চমকে উঠলুম স্বাতির কথা শুনে।

আমার চমকানি দেখে স্বাতি হেসে উঠল, বলল : কাজ নিয়ে বেরিয়েছি যে! স্টেশনে একবার যেতে হবে।

রিজার্ভেসনের জন্যে ?

স্বাতি হাসল।

স্বাতি বলল : তুমি হাসলে কেন ?

আমি বললুম : তোমার ছল দেখে। সমুদ্রের ধারে বেড়াবার ইচ্ছা ছিল, সেকথা বলে বেরুলেই পারতে।

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : তোমাকে সঙ্গে নেবার জন্যে এই দিকে এসেছিলুম।

বুঝেছি।

বোঝনি কিছু।

বলে স্বাতি একটা রিক্সা ডেকে তার উপরে উঠে পড়ল। একপাশে সরে বসে আমাকে ডাকল : এস।

আমিও উঠলুম।

সামনের দিকে চলতে চলতে রিক্সাওয়ালা বলল : কোথায় যাব ?

স্বাতি বলল : টার্ণার পৌন্টি।

সেকি, স্টেশনে যাবে না!

সংক্ষেপে স্বাতি বলল : টেলিফোন করব।

উজ্জ্বল আলো এখানে। ধূলোয় ভরা অপরিচ্ছন্ন পথ। সমুদ্রের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। আমিও কোন কথা বললুম না। [ক্রমশঃ]

• • • •

যাহার বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণ সাঙ্গ করে ফিরে এলেন বাংলা দেশে, রচনা করলেন এক অপূর্ব সঙ্গীত :

যদি প্রেম না দিলে প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে ?

সিন্ধুরাগের সঙ্গে কাফি মিশিয়ে এক মিশ্ররাগিনীর সৃষ্টি করলেন তিনি। মাঘোৎসবে এই গানটি গীত হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন ও শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। এসরাজে ছড় টানতে টানতে অবনীন্দ্রনাথ বললেন দীনেশবাবু আপনি আমি তো অনেকদিন থেকেই লিখি কিন্তু এমন সহজ কথায় এমন বুক ভরান সুর শুনেছেন নাকি ?

সমীক্ষা

উমা ভট্টাচার্য

আমি আইনজীবী, আমার স্বামী সুধার বাবা মসীজীবী। গল্প পদ্য দুই লেখেন, সমাজে মেশেন কম।

আমার মেয়ের নাম সুধা। আমার ভাল লাগেনি, বদলে দিয়েছি। আমি ডাকি মোরী। উনি ডাকেন সুধা। সেবার ফাল্গুনে ওর বয়েস দশ হয়।

বাংলা স্কুলে দিইনি। এ নিয়ে সুধার বাবা রাগ করেন, তর্ক করে তাঁর রাগ কমাতে পারিনি তবে কথা বন্ধ করেছিলাম। তারও চার বছর আগেই সুধা স্কুলে যায়। সুধার বাবার আপত্তি ইংরেজী পরিবেশে, আমি আপত্তি জানাই বাঙালী-মুসলমান মিইয়ে পড়া পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে। যুক্তি দিই—নারীজাতির প্রগতির যুগ এটা। এখন থেকেই শক্ত জমিতে পা দিতে হবে। মৃদু মধুর স্বভাবের অধিকারিণী করতে চাইনি। আমার একমাত্র কন্যাকে বাংলায় শিক্ষা দেওয়া এই ভোরালো স্বভাবের পরিপন্থী।

সুধার বাবা বলেন তাঁর শিশু কালের বন্ধু রমেন চক্রবর্তী, বহু সম্পত্তির মালিক, ভারতীয় আচার বিচারেই অভ্যস্ত, হাজার বিঘে জমির চাষ আবাদ ছিল, এখনো যার বাঁঠ ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, ঘরভরা স্বজন, বিদ্যা, ধন আর ধর্ম হচ্ছে যে সংসারের পত্তন। পল্লীর কোলে সেই ঘরে মেয়ের বিয়ে দেব। বড় ঘরের বউ হয়ে তাত কাপড়ে সুগৃহিণী হবে সুধা, বাঙালীর ঐতিহ্য নিয়ে লক্ষ্মীমন্ত ঘরে গৃহলক্ষ্মী হোক সে এই আমার আকাঙ্ক্ষা।

আমি বিশুণ স্বর চড়িয়ে বলেছিলাম, থাক তোমার হাজার বিঘার ইতিকথা, বিঘা ও সরকারের দয়ায় কাঠায় ঠেকেছে। জমিদারের পাট ও উঠেছে। সুতরাং বেটে খাওয়ার ঘরেই যাবে মোরী। আমার মত দেশের কোণে বসে থাকবে না। মোরীকে দেশের বাইরে পাঠাব। এখন থেকেই ওর দৃষ্টি প্রসারিত হোক। পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে ঘর বাঁধবে কে জানে! স্বামীর রোজগারে বসে খাব এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে স্বপ্ন দেখবে, হায় হায়! তবে আমার হাসিই হবে মোরীর। আমি চাই মোরী আমার নিজের পায়ে দাঁড়াবে। খোঁচা খেয়ে সুধার বাবা নীরব হয়েছিলেন। আইন আদালতে কথা বেচে আনা রোজগারের অঙ্ক আর ওর বই বেচার টাকার সে জৌলুস নেই। তাই ইঙ্গিতটা আমার ইচ্ছাকৃত না হলেও ওকে আঘাত করেছিল।

সেই থেকেই মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে সুধার বাবার কোন অভিমত আর জানতে পারিনি। অবশ্যি জানবার কখনো চেষ্টাও করিনি। নিজের মনের মত করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েই মেয়েকে বাঙালীপনার ছোঁয়াচ মুক্ত করতে লেগে পড়েছি।

আধা বাঙালী ভাষায় মেয়েকে কথা কইতে শিখিয়েছি। স্কুল থেকে ফিরে মোরী এখন ছুটে এসে বাপীকে আলিঙ্গন করে বলে, Hurry up বাপি, কাম্! চলো বাপি Let's go for shopping,

কাল যে আমার friend Joy is celebrating his thirteenth birth day. আমি তাকে একটা দামী Present দিতে চাই।

সুধার বাবা নিবাক। নীরবে তিনি নূতন বইয়ের বায়নার টাকা নিয়ে মেয়ের সঙ্গে বাজারে বেরিয়ে পড়েন। ফিরে আসেন মোরীর বন্ধুর জন্ম মোটা টাকার উপহার নিয়ে। মোরী মায়ের জন্ম কিছু আনে নিজের জন্মে আনে evening dress of the last minute fashion.

পরদিন evening party থেকে কলার ফিরে আসতে বেশ কিছুটা রাত হয়ে গেলে। মেয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে আর আমি কিছু বলতে পারিনি। সুধার বাবা কিন্তু গম্ভীর ব্যবহার করে আমাকে পরাস্ত করবার চেষ্টা করলেন। আমার কিন্তু মোরীকে বলবার কিছুই ছিল না। মেয়েকে স্বাবলম্বিনী হওয়ার অবকাশ না দিলে কাঠামো ওর কাঁচা থেকেই যাবে। এইত গড়বার সময়।

আবার সেদিন স্কুল থেকে বাড়ীতে পা দিয়েই মোরী বলে ওঠে, Hallo mummy, You are already in? So early! Well mummy, give me some money. I shall have to get a dress just now from my tailor. It's only two hundred and fifty mummy. To-morrow is Saturday! I shall go to Mita's house to attend her wedding party mummy! চুপ করে কেন 'মামি' দোকান বন্ধ হয়ে যাবে যে। দাওনা মাত্র ত দু'শো পঞ্চাশ টাকা! তুমি ত কত্ত টাকা ঘরে আন্‌ছো 'মামি'।

একটু চম্‌কে উঠেছিলাম টাকার অঙ্কটা শুনে। টাকাটা বের করে মোরীকে দিয়েছি। সেদিন সন্ধ্যায় মোরীকে সে পোষাকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনের গ্লানি কেটে যায়।

স্কুল স্পোর্টস্-এ মোরী নাম করেছে। ইন্টার স্কুল বাস্কেট বল টিম নিয়ে প্রদেশে প্রদেশে ঘুরে এসেছে। এক মাসে ফিরেছে। Pocket money শ'পাঁচেক। তবে অনেক দেশ দেখেছে ত।

মোরী বি-এ পাশ করেছে নিচের দিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে। কিন্তু এত টাকা ঢেলেও সে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। আইনজ্ঞের অকাট্য যুক্তি দিয়ে দীর্ঘ দশ বৎসর রোজ সুধার বাবাকে বলেছি—দেখ Glory will bring glory to our family; কিন্তু সে তা পারেনি।

এমন কোন নামকরা ইউনিভার্সিটিতে তার ডাক পড়েনি। কোন বিদেশী সংস্থা থেকে চাকুরী নেবার জন্ম তার ডাক আসেনি। অতি সাধারণ মেরিট্-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ম প্রগতিশীল যুগে কিই বা হতে পারে।

মেয়ের জন্ম বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হলো না। সুধার বাবা নীরব। আইনশালায় কাজে নানারকমের ডাইরেক্ট-এর কাছে কাকুতি মিনতি করে বিদেশী কোন কোম্পানিতে একটা রিসেপ্‌শনিষ্টের কাজও জোটাতে পারিনি আমার কেতাদুরস্ত মেয়ের জন্ম। মোরীর বাবা নীরব। আরো লেগে পড়লাম। মোরীর ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। হাল ছাড়লে চলে কি!

মোরীর এক চাল কালো ঝুচ-ঝুচে মাথার চুল কেটে সামনে মাত্র তিন ইঞ্চি করিয়ে দিয়েছি। পেছন দিক থেকে ঘাড়ের ওপরে ছেলের ছাঁট করিয়ে এনেছি পার্ক-ষ্ট্রীটের নেরা দোকান থেকে। ওর দামী ব্লাউজগুলোর হাত ছেঁটে একেবারে সরু ফিতের মত করিয়ে দিয়েছি। খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে। কোমর থেকে ইঞ্চি পাঁচেক কেটে ফেলেছি মোরীর সাধারণ ব্লাউজগুলি। ওর কোমর থেকে ইঞ্চি পাঁচেক অংশ তখন

আবরণমুক্ত। চেহারা যেন আরো খুলেছে। হাতে খুব লম্বা নোখ রাখিয়ে নানান ভঙ্গিতে কর সম্প্রসারণ করতে শিখিয়েছি। চোখের পাতায় ভুরুতে আর ওষ্ঠাধরে লাগাবার জন্য নানাপ্রকার রংএর সংমিশ্রণ প্রণালী শিখিয়েছি এক্সপার্ট রেখে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম না করুক, হাল চালে না হার মেনে যায়। বাড়ীতে পার্টি দিয়েছি, বড় বড় ক্লায়েন্টদের ডেকেছি, কন্‌টাক্ট বাড়াতে চাই মোরীর। সুধার বাবা নীরবে আমার লক্ষ্মীর ঝাঁপির সঙ্কোচন লক্ষ্য করেছেন।

এধার এখানে সেখানে, এর ওর বাড়ীর পার্টিতে ঝাঁকিয়ে বসেছি আমার কন্যাসহ। যখনই আশার ক্ষীণ রেখা দেখেছি তখনই নতুন বেশে মোরীকে 'মোরিয়ান' করে তুলেছি। টান ধরেছে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। আশায় বুক বেঁধে অভিনব পিণ্টির ভূষণে ও আভরণে কন্যাকে লাবণ্যময়ী করে তুলেছি। উৎসব সভায় মোরীকে তুলে ধরেছি সবার চোখের ওপর জলন্ত অগ্নিকণার মত।

কিন্তু ··কোথায় যেন অভাব। কোথায় ওর প্রাণে উচ্ছ্বাস? মোরী এত ম্রিয়মান কেন? ওকে এত মলিন দেখাচ্ছে কেন? সোসাইটীর সব স্তরেই সে মিশেছে। কথা কইতে জানে। পোষাকে ওর সর্বাঙ্গ ঝলমল করে। তবু কোথায় যেন কী নেই।

তবে। তবে কি ভুল হল?

মোরীকেই প্রশ্ন করলাম, কোথায় তোমার দুঃখ ডার্লিং। ইউ লুক আনহ্যাপি।

ঠোঁটের কোণে করুণ হাসির রেখা টেনে মোরী বললে, 'মা, আমায় স্বাভাবিক হতে দাও। এই মেকি পরিবেশ ছেড়ে আমায় সহজ হতে দাও মা। আমি একটা স্কুলে মেয়েদের দেখাশোনার ভার নেব। এই দেশের কোলে, আমার নিজের দেশেই আমি ঘর বাঁধতে চাই মা।'

মোরীর চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা রক্তের মত লাল টুকরো আমার পায়ের পাশে মিলিয়ে গেল।

পাশের ঘরে সুধার বাবার গলা শোনা গেল 'এস, এস ভাই রমেন। আমি ওদের ডাকছি।'

সুধার বাবা বেরিয়ে এসে ডাকলেন 'এসো সুধা, মাকেও ডাকো। রমেনবাবু আমার বন্ধু।'

আমি মোরীকে নিয়ে ওঁর ঘরে যেতেই রমেন চক্রবর্তী বললেন—'আমার ঘরে আপনার মেয়েকে নিতে চাই। আপনার আপত্তি নেই ত? সৌম্যেন গত মাসে আমেরিকা থেকে বাড়ী এসেছে! এগ্রিকালচার পাশ করেছে। দেশেই থাকতে চায়। আমাদের জমিতেই কাজ করবে। তবে সুধাকে কিন্তু আমার ঐ বিরাট সংসারের হালটি ধরতে হবে। আর গ্রামেই থাকতে হবে। কি বলেন?'

"আমার সে যে বড় সৌভাগ্য" নিজের কণ্ঠস্বরে স্বস্তির সুর শুনে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।

গল্প সংগ্রহ

সেদিন সন্ধ্যায় সেই লোকটি

মলয় ঘোষ

মে আই অফার ইউ স্যার—সাম ফ্লাওয়ারস ?

আনমনে পথ চলছিলুম। হঠাৎ ঐকথা শুনে চোখ তুলে তাকালুম। এক বৃদ্ধ বলছে।

কবরখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। রোজই এপথে টিউশানি করতে যাই। নজরে পড়ে রোজই বৃদ্ধ এখানে দাঁড়িয়ে থাকে। ছেঁড়া ময়লা প্যান্ট-কোট, রঙ্ তামাটে, দৃষ্টি ঘোলাটে। চুলও উস্কোখুস্কো। হাতে থাকে ফুলের মালা, স্টিক। ফুল বিক্রী করে।

শহর কোলকাতার এই অঞ্চলে পাঁচ মিশালী লোকের বাস। কবরের উদারতা তাই এখানে মানায় যেন। এক মুহূর্ত দ্বিধা করলুম। মুখের ওপর না বলবো ? অথচ ফুলের মালা নিয়ে এখন কি করবো ?

—এনিথিং স্যার···ফর হেল্প···

একটা কাতর আবেদন যেন ফুটে উঠলো বৃদ্ধের গলার স্বরে। কিনলুম চারছড়া মালা। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে এখন কি করি ? শীতের সন্ধ্যা। কুয়াশার মসলিনটা আস্তে আস্তে নামছে চারদিকে। ভাবছি।

কাঁচ করে শব্দ হোল। দেখি বৃদ্ধ আস্তে আস্তে কবরখানার ভেতর যাচ্ছে গেট ঠেলে। কোন কিছু না ভেবে তার পিছু নিলুম। দেখি, ক'হাত দূরে একটা অতি সাধারণ কবরের ওপর পরম যত্নে বৃদ্ধ একটা মোমবাতি জ্বাললো। তারপর হাতের অবশিষ্ট ফুলের মালা আর স্টিককটা কবরের ওপরটায় দিয়ে অস্ফুটে বললো—মাই সন, মাই বিলাভেড সন, মাই স্যামুয়েল।

উৎকর্ণ হলুম। আমার হাতে চারগাছা মালা। সামনে অনেক কবর ! কাকে দেব, কাকে বঞ্চিত করবো ? আস্তে আস্তে বৃদ্ধের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি বৃদ্ধ কাঁদছে।

চারদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার। কেন জানি না বৃদ্ধের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম। দেখি আমার উপস্থিতি যেন বৃদ্ধ টের পেয়েছে। অবাক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমায় দেখছে। তাড়াতাড়ি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—স্যামুয়েল, মানে—

বৃদ্ধ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—আপনি, মানে তুমি, স্যামুয়েলকে চিনতে ? বন্ধু, ফ্রেণ্ড ছিলে ?

বলেই বৃদ্ধ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

—এক্সকিউজ মী প্লীজ, 'তুমি' বলেছি···ওর বন্ধুদের বলতুম তো তাই হঠাৎ মুখ দিয়ে··· ···

তাড়াতাড়ি বললুম, না না, ঠিকই করেছেন।

চকিতে কবরের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলুম লেখা রয়েছে, স্যামুয়েল বার্টন···জন্ম, ১৯১৭।

তাড়াতাড়ি বললুম—স্যামুয়েলের সঙ্গে আমার···

বৃদ্ধ বললে—জানাশোনা ছিল? কোথায়, প্রথমে যে পার্টিতে ছিল, না ওর মিউজিক পারফরম্যান্সে?

বিদ্যুৎ গতিতে চিন্তা করলুম। যদি পার্টি বলি তা'হলে পার্টির লোকেরা নিশ্চয়ই ওর বাড়ি আসতো। সেক্ষেত্রে তাদের প্রশ্ন এলে বিপদ। তার চেয়ে মিউজিক পারফরম্যান্সে বলাই ভাল। বললুম—পারফরম্যান্সে।

বৃদ্ধ কিছু সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। বললে—কখনও তোমায় দেখিনি তো?

বললুম, ওর সঙ্গে বেশীদিনের আলাপ তো নয়—তাছাড়া···

বৃদ্ধ বললে—তা হবে। তাছাড়া শেষের দিকে বেহুঁশ হয়ে ছিল একেবারে। খালি বক্ত, তাজা বক্ত। আমি জানি না স্যামুয়েল বার্টন কি করে মারা গেছে। এ্যাকসিডেন্ট, না স্বাভাবিক মৃত্যু, না অন্যকিছু।

বৃদ্ধ তাকছে আমাকে—কি নাম তোমার যেন?

বললুম—হীতেন দত্ত, আমল·····।

কথাটা মুখ দিয়ে যেন বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ বললে—হীতেন দত্ত?···

মনে এখনও সন্দেহ হচ্ছে বুঝলুম। কিন্তু কেনই বা এখানে এলুম আর কেনই বা মিথ্যে পরিচয় দিলুম জানি না। বললুম—হ্যাঁ, কোলকাতার বাইরে তো অনেকদিন, সেখানেই খবর পেলুম স্যামুয়েল নেই।

এই বলে হাতের ফুলগুলি সেই কবরের ওপর রাখলুম।

বৃদ্ধ এবার হু-হু করে কেঁদে ফেললো। বললে—শেষকালটা কি করে কেটেছে তা বলার নয়।

দেখি আস্তে আস্তে ওঠবার চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম, বৃদ্ধকে ওঠার সাহায্য করতে। তারপর সেই অন্ধকার নিস্তব্ধ মৃতের জগৎ থেকে আমরা দু'জন বেরিয়ে এলুম। আসার আগে কবরটার পাশে কয়েক মুহূর্ত দু'জনে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে মনে অজানা সেই স্যামুয়েলের উদ্দেশে বললুম—বন্ধু, ক্ষমা কর আজকের এই অভিনয়। কয়েক মিনিট আগেও এই পরিবেশের কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু কি করে কেনই বা এই মুহূর্তে আমি এখানে তা বলা আমার পক্ষে বোধহয় কোনদিনই সম্ভব হবে না। দেখো, ধরা যেন পড়ে না যাই বন্ধু।

তারপর বেরিয়ে এসে কবরখানার বাইরে একটা বেঞ্চে বৃদ্ধকে বসালুম। পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বৃদ্ধ বসতে ইঙ্গিত করলো। বসলুম তার পাশে। বৃদ্ধ আবার শুরু করলে তার স্যামুয়েলের কথা। বললে—জানো তো হীতেন তার সবকথা। লিজিকে ভালবেসে শেষে কি হোল? মেয়েটা শেষকালে চলে গেল কোন এক চার্চে 'নান' হবার ব্রত নিয়ে। আর আমার স্যামুয়েল—স্যামুয়েল সহ্য করতে পারলো না। টি, বি, হোল। অত বাজনার কন্ট্রাক্ট সব এক এক করে ক্যানসেল করতে লাগলো।—কৈ তুমি তো কিছু বলছো না হীতেন?

চমক ভাঙলো। এবার কঠিন পরীক্ষা! বললুম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমল, শুনতে শুনতে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলুম। লিজি যে চলে যাবে একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

বৃদ্ধ এবার আমার দিকে চোখ ফেরালো! তারপর ঘোলাটে দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করে বললে—কিন্তু কেন, লিজি তো শেষকালে ওর ইচ্ছের কথা বলে ছিল প্রায় সবাইকে? তুমি জানতে না, অথচ এত বন্ধুত্ব ছিল তোমাদের মধ্যে?

তাড়াতাড়ি বললুম—হ্যাঁ, স্যামুয়েল বলেছিল সবকথা। তাছাড়া লিজিও বলেছিল। কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। এত গভীর ভালবাসা, বিয়ের ঠিক পরও হয়েছিল, সেটা এমনভাবে—

বৃদ্ধ বললে—ঠিক বলেছ, মেয়েটার যা মারা যাবার পর কি যে হোল। আমাকে বাবার মতো

দেখতো কিন্তু···। স্যামুয়েলও যেন কেমন হয়ে গেল। তারপর ক'টা দিনই বা রইলো? মাত্র তিন মাসেই সবশেষ। তারপর, আমিও চাকরী ছাড়লুম। কার জন্যেই বা আর? এমন এই করে যা হয় তাই দিয়েই কোন রকমে—

বললুম—কিন্তু, আঙ্কল, চাকরী ছেড়ে এই বয়সে এত কষ্ট—

বৃদ্ধ বললে—কেন একাজ করি জানো? তবু তো রোজদিন আমার স্যামুয়েলকে দেখতে পাই। আর ওর আত্মাও নিশ্চয়ই শান্তি পায় আমাকে দেখে। তাই শরীর একেবারে খারাপ না হয়ে পড়া পর্যন্ত—

ঠোঁটে নোনা জলের স্বাদ। চোখে জল এসেছে। ভালবাসার স্বাদ এত গভীর?

ঘড়িতে দেখি ন'টা বাজে। শীতের দিন। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে দিয়েছে। লোক চলাচলও কমেছে অনেক। এবার উঠতে হবে। বৃদ্ধকে একটু বসতে বলে উল্টো ফুটপাথের হোটেল থেকে ভাঁড়ে করে হাফবয়েট মাংস আর রুটি কিনে নিয়ে এলুম। একটা রিক্সা যাচ্ছিল। ডাকলুম তাকে। বৃদ্ধকে বললুম—এবার যাবেন বাড়ী?

বৃদ্ধ চুপ করে বসে ভাবছিল। বোধহয় ছেলের কথা। রিক্সাটাকে ফুটপাথের ধারে দাঁড় করিয়ে বৃদ্ধকে ডাকলুম—আঙ্কল।

বৃদ্ধ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে এসে আমার মুখটা দেখার চেষ্টা করলো। শঙ্কিত হলুম মনে মনে। যদি শেষকালে ধরা পড়ে যাই—। মুখটা পাশ করে নিয়ে বৃদ্ধকে রিক্সার দিকে নিয়ে যাবার জন্যে হাত বাড়ালুম। আমার হাতটা বৃদ্ধ ধরলো। তারপর বললে—রিক্সা কেন, এমনই চলে যাবো ··না···না কোন দরকার নেই। এইতো এইখানে। রিক্সা করলে কেন হীতেন ··?

গলায় আওয়াজে ছিল অনেক না কথা বলার ইঙ্গিত। বুঝতে পারলুম, রিক্সার ভাড়া দেবার চিন্তাই বৃদ্ধকে বিচলিত করেছে। বললুম—সে কি; আপনি ওকথা ভাবছেন কেন?

রিক্সায় উঠিয়ে দিয়ে হাতের খাবারটা দিলুম বৃদ্ধকে।

—না না এসব কেন আবার। এসব ভারী অন্যায় তোমার হীতেন।

পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে বৃদ্ধের হাতে গুঁজে দিলুম। বৃদ্ধ আবার ঘোরতর প্রতিবাদ করে উঠলো—না-না, ইম্পসিবল - এ আমি কিছুতেই নোব না—কিছুতেই না।

শেষ অস্ত্র ছাড়লুম। ভারী গলায় বললুম—আঙ্কল, যদি আজ স্যামুয়েল থাকতো—যদি স্যামুয়েল আজ এটাকা দিতো আপনাকে? আপনি পারতেন ফিরিয়ে দিতে? পারতেন তার মুখের ওপর না বলতে এমনি করে? যদি আমাকে স্যামুয়েলের বন্ধু বলেই জানেন তবে আমার কাছে—

বৃদ্ধ আর প্রতিবাদ করলো না। কোটের পকেটে টাকাটা গুঁজে দিলুম। রিক্সাওলার হাতে ভাড়ার রকম একটা টাকা আগেই দিয়েছি। বৃদ্ধকে বললুম—ভাড়া দেওয়া আছে, ভাববেন না। আমি কালই কোলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছি। আবার পরে দেখা হবে।

বৃদ্ধ অস্ফুটে কি বললে শুনতে পেলুম না।

রিক্সা চলতে সুরু করেছে। রাস্তা নির্জন। কবরখানার গেট বন্ধ হয়ে গেছে। ভিতরে কবরের অন্ধকার, জমাট, ঠাণ্ডা। তবু ওরই মধ্যে কোথায় যেন একটা পরম শান্তির পরম তৃপ্তির সুর রয়েছে—সেটা শোনা যায় না, শুধু একটা নীরব নিবিড় অনুভূতি।

দূরে চলে যাচ্ছে রিক্সাটা। অনেক দেরী হয়ে গেছে! আজ আর পড়াতে যাবার সময়ও নেই, মনও নেই। বাড়ীর দিকে পা বাড়ালুম। কিছুক্ষণ আগেই পকেটের শেষ টাকাটা রিক্সাওলার হাতে দিয়ে দিয়েছি।

স্বস্তি

সুনীল চক্রবর্তী

ভোরবেলা টেলিফোনের ক্রিং—ক্রিং শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল গদাইবাবুর। আর, গদাইবাবুর—'কেলুবাবু—কেলুবাবু' ডাকে আমার। আমি হকচকিয়ে উঠে সাড়া দিতেই চেঁচিয়ে বললেন, আপনার ফোন্—

অথচ সত্যিই ফোন্‌টা আমার নয়। ফোনের কানেক্‌শন্ গদাইবাবুর। আর আমি কানেক্‌শন্ রেখেছি গদাইবাবুর সঙ্গে। অর্থাৎ, আমার জানাশোনা সকলকে গদাইবাবুর ফোন্ নাম্বারটা দিয়ে রেখেছি। আর যখনই ফোনে আমার ডাক আসে—তখনই গদাইবাবু আমাদের ডেকে দেন। আর আসেও যখন তখন। এতে অবশ্য গদাইবাবুর বিরক্ত হবার কথা, কিন্তু তিনি মোটে বিরক্ত হন না। তার কারণ—গদাইবাবুর ফোন্ আছে সত্যি—কিন্তু তাঁকে ফোনে ডাকবার লোক বড় বেশি কেউ নেই। আর তিনিও ডাকেন না। অথচ আশ্চর্য—তাঁর একটি ফোন্ আছে। তাই ফোন্ থেকেও যদি—দিনে দু'চারবার অন্ততঃ ক্রিং—ক্রিং—মিউজিক্ না বাজে—তাহলে তার মানে হয় কিছু? অতএব তিনি আমাকে ফোনে 'ডাক' শুনবার অধিকারটা দিয়েছেন—আর ফোনটা রেখেছেনও সাধারণের সুবিধার জন্যে—তাঁর সামনের ঘরের টেবিলের ওপর। অবশ্য ফোনের ডায়ালের অংশটি ঘিরে একটা মজবুত কাঠের বাক্স তৈরী করে—তার ঢাকনার রূপে একটা রুমালই ভালো ঝুলিয়ে দিতে ভুল করেননি এবং বাক্সের গায়ে লিখে দিয়েছেন—"ফোন্ করিতে হইলে তিরিশটি পয়সা দিতে হইবে।" তার তলায় ইংরেজী অনুবাদ। বাক্তি হিসেবে গদাইবাবু অতি পরিপক্ক!

যাই হোক্, দ্রুতপদে গিয়ে দেখি, গদাইবাবু সমানে ফোনে মুখ রেখে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন—আরে বলছি—আমি গদাইবাবু—এ আমার ফোন্—আমি গদাই—

এমন সময় আমাকে দেখেই গভীর বিরক্তির সঙ্গে ফোনটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—দেখুন দেখি—কী ক্যাচাং! তখন থেকে আমি বলছি—আমি গদাইবাবু—আর ওধার থেকে একটানা বলে চলেছে—আমি গদাই-ফদাই বুঝি না—শীগ্‌গির এসো—। তাই আপনাকে ডাকলাম।

আমি ততক্ষণে ফোনটা কানের কাছে ধরতেই, সত্যিই শুনলাম—ওধার থেকে উদ্বেগাকুল কণ্ঠিকণ্ঠে কে যেন একটানা বলে যাচ্ছে—আমি গদাই-ফদাই বুঝি না—শীগগির এসো—।

আমি বললাম—তা না বোঝো—ক্ষতি নেই—এখন বলো—তুমি কে—কে কথা বলছ—কাকে চাই—কোথায় যেতে হবে?

—আমাদের বাড়িতে। ভীষণ বিপদ!

—আরে, কথা বলছ কে ?

—আমার বাবা যেন কেমন করছেন !

—আরে ম'ল ! কে—

- না—না—মরেন নি—

—না—না—আমি তা বলছি না—। মানে—কে—

—আমার বাবা—।

—তুমি কে ?

—আমি তাঁর মেয়ে। শীগ্‌গির এসো—। বাবা যেন কেমন করছেন—!

—ডালরে—আলা - আরে যাব কোথায় ?

—বলছি তো—আমাদের বাড়িতে—।

—তোমাদের বড় কাউকে ফোন্ ধরতে বলো—।

—বড়রা সব ঘাবড়ে গেছেন—ছোটরা সব 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে আছে—এক আমি সবার ছোট্ট—তোমাকে বুঁচীদের বাড়ি থেকে ফোন্ করছি—মা তোমার নম্বর ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

—তোমার মাকে ফোন্ ধরতে বলো—

—মা নম্বর ঘুরিয়ে দিয়েই—বাড়ি গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন। তুমি শীগ্‌গির এসো।

—তুমি কোত্থেকে কথা বলছ ?

—বললাম তো বুঁচীদের বাড়ি থেকে—।

—না—মানে—কোন্ জায়গা থেকে—

—বুঁচীর বাবার ঘর থেকে—

—তুমি কি—

—হ্যাঁ—আমি মিঠু—

—ওঃ—তুলুদার—

—ছোট্ট মেয়ে— ঐ যে একটুখানি দেখতে—ঐ যে বেশ পাকা পাকা কথা বলে—ঐ যে যার মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—ঐ যে যাকে তুমি খুব ভালবাসো, লেবেনচুস দাও, আদর করো—মা মণি বলে ডাকো—

তৎক্ষণে আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—বুঝেছি—বুঝেছি—।

অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে ওধার থেকে বললে মিঠু—কিন্তু বোঝোনি ! তা না হলে এতক্ষণ তুমি গদাই-ফদাই বলছিলে কেন—আমাকে চিনতে পারনি কেন ?

—তুমি যে আমাকে কোনোদিন ফোন্ করতে পারো—এ আমি ভাবতেই পারিনি বলে তোমাকে প্রথম চিনতে পারিনি। সে কথা যাক্—তা তুলুদার কী হয়েছে ?

—কী হয়েছে জানিনা। তবে কাল রাত থেকে বাবা ঘরময় দৌড়ে—দৌড়ে—পায়চারি করছেন—আর পানের বাটা—পিকদানী—দোয়াত, মায়ের ভ্যানিটি ব্যাগ—যা হাতের কাছে পেয়েছেন আছড়ে—আছড়ে—মাটিতে ফেলেছেন। তারপর হাতের কাছে কিছু না পেয়ে আমার পুতুলটা আছড়ে

ফেলেছেন। সেই পুতুলটা—যেটা তুমি আমার জন্মদিনে দিয়েছিলে—যেটা কোলে নিয়ে আমি শুতাম—। তা যাক্—আমার পুতুলটা যাক্—কিন্তু এখন যে বাবা নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছেন—! বাবার মাথায় তো টাক। চুল বেশি ছিল না তো! যে-ক'গাছা ছিল—প্রায় সবই ছিঁড়ে ফেলেছেন! তা, টাক পড়ে ভালই হয়েছে—কী বলো কাকু? তা হলে মাথায় যত বেশি চুল থাকত—তত বেশি ছিঁড়তেন—আর বাবা তত বেশি কষ্ট পেতেন। চুল ছিঁড়লে ব্যথা লাগে না—বলো? খুব ব্যথা লাগে—তুমি নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে দেখো—সত্যি কিনা? আমি বলেছিলাম—জানো, কাকু— বলেছিলাম—বাবা তোমার মাথায় ঐ ক'গাছা চুল তো মোটে রয়েছে, ও ছিঁড়লে আর থাকবে কী? তার চেয়ে—আমার মাথায় তো অনেক চুল, তুমি বরং আমার মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ফেলো, তা আমার কথা বাবা কানেই তুললেন না। তুমি শীগ্‌গির এসো কাকু—। এখনও বাবার মাথায় দু'এক গাছা চুল যা বাকী আছে, দেরী করলে—সে ক'গাছাও থাকবে না কাকু—। তুমি শীগ্‌গির এসো—বলে কাঁদতে আর আরম্ভ করল মিঠু।

—এক্ষুনি আসছি—তুমি কেঁদ না। বলে তক্ষুণি ছুটলাম ভুলুদার বাড়ির দিকে। তবু যদি এখনও ভুলুদার মাথায় বাকী চুল ক'গাছা বাঁচাতে পারি—কিন্তু—কী—হ'ল হঠাৎ—?

ভুলুদা—মানে ভোলানাথ ঘটক। সত্যিই নামেও যেমন—কাজেও তেমন—কথাবার্তাতেও তেমন। যাকে বলে সদাশিব। তাঁর শরীরে রাগ বলতে আজ পর্যন্ত কিছু দেখিনি। শত বিপদেও তাঁকে অচল—অটল—ধীর দেখেছি। সম্প্রতি ভুলুদা—কিছু আর্থিক কষ্টে পড়েছেন বটে—আর কিছু ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তা নিয়ে—তাঁকে কাল পর্যন্তও কোনো হা হুতাশ করতে দেখিনি। কালও আমাদের সেই চিরকালের মিলনস্থল—কেলোর চায়ের দোকানে দেখা হয়েছিল। ভুলুদা তেমনি চিরাচরিত সরস কথায় আমাদের সঙ্গে রঙ্গই করেছিলেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে বলেছিলেন—স্যার্, ক্যালা—, মানুষের অভাব যত বাড়বে—ততই মানুষ লটারীর টিকেট কিনবে। এক টাকায় একটা টিকেট কিনে—অন্ততঃ তিন মাস সময় পাওয়া যায়—একটা উত্তেজনার মধ্যে—পরিকল্পনা করে কাটাবার। এই লাভটাই বা মন্দ কী?

আমি হেসে বলছিলাম—তা যা বলেছ দাদা। আমাদের অফিসের দুই বন্ধু আলাদা দুটো কোম্পানীর দু'খানা লটারীর টিকেট কিনে—দুজনেই বসেছিল—পরিকল্পনা করতে—ফার্স্ট প্রাইজ পেলে—কী কী করা যাবে? কিন্তু গোড়াতেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেল!

—কেন?

—কারণ দুজনেই বললে—ধর হঠাৎ যদি সংবাদ আসে আমরা দু'জনেই ফার্স্ট প্রাইজ একলাখ পনের হাজার টাকা পেয়েছি—তাহলে? দুজনেই সমস্বরে বলে উঠল—তাহলে প্রথমেই আমরা—হার্টফেল্ করব। বুঝতেই তো পারছ—হার্টফেল করার পর—আর তাদের পরিকল্পনা একটুও এগোয়নি। এই কথায় ভুলুদার সেকি প্রাণখোলা হাসি!

যাই হোক যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি ভুলুদার বাড়ি গিয়ে হাজির হ'লাম। গিয়ে দেখি—টেলিফোন্ মারফৎ মিঠুর সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন ছিল না। সত্যিই সোবার ঘরখানাকে—ভুলুদা—যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছেন। ভুলুদার চোখ মুখ বসে গেছে। ভুলুদা ঘরময় দ্রুত পায়চারি করছেন আর টাকের ওপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাত চালিয়ে ছেঁড়বার জন্যে—চুলের খোঁজ করছেন। ভুলুদার স্ত্রী দরজার পাশে পা ছড়িয়ে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছেন—ছেলেমেয়েরা একপাশে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে

বাবার দিকে। এক মিঠুই শুধু বাবার পিছু পিছু দ্রুত পায়চারী করে—মানে দৌড়ে দৌড়ে ঘুরছে। উদ্দেশ্য—বাবার এই দুঃখে সে যদি কিছু সান্ত্বনা দিতে পারে।

আমাকে দেখেই বৌদি জোরে কেঁদে উঠলেন। বললেন—কী হবে ঠাকুরপো?

আমি বললাম—আগে বলো—কী হয়েছে?

—কিচ্ছু জানি না ঠাকুরপো, কাল রাতে—খেয়ে শুতে গেলেন—তারপর থেকেই—এই অবস্থা। সংসারের চিন্তায় ভাবনায়—মানুষটা—আর বলতে পারলেন না। কান্নায় কথা বন্ধ হয়ে গেল!

বুঝলাম—সংসারের ভাবনায় চিন্তায়—ভুলুদা পাগল হয়ে গেছেন। এ আর নতুন কথা কী! সেই হিসেবে তো আমাদের মত লোকের সকলেরই পাগল হবার কথা! অথবা—আমরা পাগল হয়েই গেছি তফাতের মধ্যে কারো বা অল্প আক্রোশে মাথার চুল ছিঁড়তে শুধু ইচ্ছে করে—কেউ বা সেটা ছিঁড়েই বসেছে। যাই হোক্—ভুলুদার পাগলত্ব সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার আগে—লঘু কারণটা—যাকে বলে ইমিডিয়েট কজ্—টা জানা দরকার। আমি জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা—বৌদি— কাল রাতে—ভুলুদা—শুতে এসে কি সোজা শুয়ে পড়লেন?

উত্তর দিল মিঠু। বললে—না কাকু, বাবা তো কোনোদিন সোজা হয়ে শো'ন না—, বরাবর বাঁ কাৎ হয়ে শো'ন। আমি বাবার সঙ্গে ঘুমোই তো—!

—না—না—আমি বলছিলাম—শোবার আগে উনি কি খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসেছিলেন—
—বা পায়চারি বা কোনো কাজ—মানে লেখাপড়া—হিসেব—

এমন সময় মিঠু আর্ত চীৎকার করে বলে উঠল—কাকু—কাকু—ছিঁড়ল—ছিঁড়ল—বাকী ক'গাছাও ছিঁড়ল—।

অর্থাৎ ভুলুদার সন্ধানী হাত তার টাকের পেছনের অবশিষ্ট চুল ক'গাছার সন্ধান পেয়েছে—। আর পাওয়ামাত্র তা ছিঁড়তে উদ্যত হয়েছে। আমি দৌড়ে গিয়ে ভুলুদার হাতটা ধরে নিয়ন্ত্রণ করলাম। চুল ক'গাছা বাঁচালাম। বললাম—কী হয়েছে ভুলুদা—কী হয়েছে? তুমি ওরকম করছ কেন?

এমন সময় ভুলুদার বড় ছেলে হারু—ডাক্তার নিয়ে এসে ঢুকল। হারুর হাতে ডাক্তারী ব্যাগ্—আর ডাক্তারবাবুর গলায় ঝোলানো। দু'মুখো সাপের মত ট্রেডমার্ক স্টেথিস্কোপ, হাতে ব্লাড্ প্রেসার মাপবার যন্ত্রটা। ঘরে ঢুকেই পায়চারিরত ভুলুদাকে লক্ষ্য করে হুকুম দিলেন—ওঁকে শুইয়ে দিন।

হারু বললে—অসম্ভব। কাল সারারাত আমরা চেষ্টা করে করে নাজেহাল হয়েছি। শোয়ানো যাবে না। আপনি ঐভাবেই পরীক্ষা করুন। টাকার জন্যে ভাববেন না ডাক্তারবাবু। আমরা যেভাবে পারি—আপনার টাকার ব্যবস্থা করব। আপনি আমার বাবাকে সুস্থ করে দিন।

রোগীর বাড়ি থেকে টাকা সম্বন্ধে এমন উদার প্রস্তাব পাওয়াতে—ডাক্তারের উদরেও বোধহয় টাকার ক্ষুধা পাক দিয়ে উঠল। আর ভিজিটের টাকা নিতে হলে—যখন রোগীকে পরীক্ষা করাই বেওয়াজ—তখন ডাক্তারবাবুও কোমরের বেল্টটা একটু আটকে প্যাণ্টটা ঠিক করে নিয়ে স্টেথোর নলটা বাগিয়ে প্রস্তুত হলেন। তারপর কী যেন একটু ভাবলেন। হয়তো পদ্ধতিটা ঠিক করতে লাগলেন। কারণ—দ্রুত পায়চারিরত ভুলুদার বুকে স্টেথোর নল ঠেকিয়ে—তাঁকেও দ্রুত পিছু ছুটতে হবে। তারপর পিঠে ঠেকিয়ে—অনুরূপ বেগে সঙ্গে ছুটতে হবে। তারপর এইভাবে বহুৎ কসরৎ মেহনত করে যদিও বা হৃদ্‌স্পন্দন পরীক্ষা করা সম্ভব হয়—কিন্তু ব্লাড প্রেসারের যন্ত্রটার আয়ু ও মূল্যটা সম্বন্ধে চিন্তা করার আছে বৈকি। অতএব অতঃপর

ঝুঁকি নেবার আগে শেষ চেষ্টা করবার জন্যে—ডাক্তারবাবু পুনরায় হুকুম দিলেন—ধরুন তো—সকলে মিলে চেপে—!

সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন ভূলুদা—বললেন—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—।

তাঁর ঐ অবস্থা দেখে আমরা তো বটেই—ডাক্তারবাবুও ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্য হারালেন না। বিজ্ঞ চিকিৎসক-জনোচিত কণ্ঠে বললেন—সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত—রোগী পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। এই বলে হারুকে তাঁর ডিস্‌পেন্সারীতে যেতে বলে—ভিজিটের টাকা নিয়ে—গম্ভীরভাবেই চলে গেলেন।

হারু গেল এবং ফিরে এলো দু'হাত ভরতি শুচ্ছের পাউডার, ট্যাবলেট আর প্রমাণ সাইজের এক শিশি লাল রংয়ের মিক্‌শ্চার নিয়ে। রোগীর রোগই যখন নির্ণয় করা গেল না—তখন ঘামাঘা—এই ওষুধের শিশি কেন গিলতে হবে—এ প্রশ্ন আমরা কেউ করলাম না। করে লাভ নেই বলেই হয় তো করলাম না। কারণ ডাক্তারকে যখন একবার ডাকা হয়েছে—তখন তাঁকে ভিজিটের টাকাও দিতে হবে—আবার তাঁর ডিস্‌পেন্সারী থেকে ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেসেন্টেটিভদের দেওয়া ট্যাবলেট্‌সহ পাউডার ও মিক্‌শ্চারও আনতে হবে। ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেসেন্টেটিভরা ডাক্তারবাবুদের পরিশ্রম অনেক লাঘব করে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের কোম্পানীর ওষুধগুলোর গুণাগুণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি যেরকম যেরকম বলে যান—ডাক্তারবাবুরাও তা যথাযথ রোগীদের উপর প্রয়োগ করেন মাত্র। তাতে রোগী সারলে—ডাক্তারের হাত যশ—না সারলে—রোগীর কপাল। সত হলেও ডাক্তার তো আর ভগবান নন।

হঠাৎ—দুম্—ঝন্—ঝনাৎ। শব্দ শুনে— চমকে চেয়ে দেখি—এক কাণ্ড! হারুর হাতের উপর—ভূলুদা ডান পা দিয়ে জোরে কিক্ করেছেন—আর হারুর হস্তধৃত ওষুধের শিশি, ট্যাবলেট, পাউডারগুলো—গজ দুই দূরে ছিটকে পড়ে—ভেঙেচুরে ছত্রখান। আর তার ফলে—শিশির ওষুধ, ট্যাবলেট, পাউডার, কাঁচের টুকরো মিলে—সেখানে আর এক নূতন ধরণের মিক্‌শ্চার তৈরী হয়েছে। ভূলুদা এককালে ভাল ফুটবল প্লেয়ার ছিলেন—জানি। কিন্তু তাঁর এই খেলোয়াড়ী মনোভাবটা অকস্মাৎ ফিরে এলো কেন বুঝতে না পেরে—আমি লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ভূলুদার উপর। এবং তাঁকে জাপটে ধরে—জোরে কয়েকটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম—কী হয়েছে ভূলুদা—বলো—ওরকম করছ কেন? ভূলুদা—

ঝাঁকানি খেয়ে মাথার এলোমেলো নার্ভগুলো বোধহয় স্বাভাবিক হ'ল। ক্লান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—ঐ ভাখ—। বলে মেঝের দিকে আঙুল দেখালেন।

আমি বললাম—ও তো কতগুলো ছেঁড়া কাগজ—।

মিঠু বললে—হ্যাঁ, বাবা কাল রাতে শোবার আগে—তাঁর সুটকেস্ থেকে কতকগুলো কাগজ বের করে এইভাবে ছিঁড়ে ফেলেছেন—আর তারপরই নিজের চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করলেন কাকু—।

বুঝলাম—ঐ ছেঁড়া কাগজগুলোর মধ্যেই—ভূলুদার চুল ছেঁড়ার কারণটা লুকিয়ে আছে। আমি কাগজগুলো বাছতে বাছতে—একখানা লটারীর টিকেটের কিছু অংশ পেয়ে বললাম—এতো দেখছি—

হঠাৎ যেন ডুকরে উঠলেন ভূলুদা। বললেন—আজই ড্রইংয়ের তারিখ। কাল আমি সুটকেসের বাজে কাগজ সাফ করতে গিয়ে ওই টিকেটটাকেও—গলাটা রুদ্ধ হয়ে এলো ভূলুদার। সেই রুদ্ধ কণ্ঠেই বললেন—অথচ—জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিলেন—এবার আমি নির্ঘাৎ—আর বলতে পারলেন না। গলাটা তাঁর একেবারে ধরে গেল।

দেখলাম—টিকেটের নম্বরের জায়গাটাই একেবারে ফুটোফুটি হয়ে গেছে।

ভুলুদা একটু সামলে নিয়ে বললেন—তুই তো জানিস ক্যালা—, আমি কি অগাধ জলে ডুবে আছি। মেয়ে দুটোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—অথচ হাতে টাকা নেই। বড় ছেলে হাবুটা—ছাত্র ভাল, বাধ্য হয়ে তাকেও কলেজ ছাড়িয়ে এনেছি, ছোটগুলোর প্রত্যেকের স্কুলের মাইনে বাকী। সংসারে অঢেল খরচ। যে ক'টা টাকা মাইনে পাই—তা ব্লাকে চাল কিনতেই বেরিয়ে যায়—তার ওপর মাথার ওপর একরাশ দেনা—আমি কী দিয়ে যে কী করব—! আমার শেষ ভরসা ছিল ঐ লটারীর টিকেটখানা। এবার যাতে পাই—সেজন্যে মা কালীকে কত ডেকেছি—কত মানত করেছি—টিকেটের নম্বর ডিগ্রোম্‌ও দিয়েছিলাম—'মা কালী', যদি মা দয়া করেন। কিন্তু—।

—তা—এবার ড্রইং লিস্টে তোমার নামটা নাও তো উঠতে পারে।

অকূলে যেন কূল দেখতে পেলেন ভুলুদা। আকুলভাবে বললেন ভুলুদা—তাই যেন হয় ক্যালা—তাই যেন হয়—। মা কালীকে ডাক ক্যালা—এবার যেন আমার নামটা ড্রইং লিস্টে না ওঠে। হাতের কাছে এসে ফসকে গেলে—আমি হার্টফেল করব। আমি কালী বাড়ি ডালি দেব ক্যালা, ডালি দেব।

তারপর যে লটারীর টাকা পাবার জন্যে ভুলুদা—মা কালীকে ডালি মানত করেছিলেন—সেই লটারীর টাকা যাতে এবার ভুলুদা না পান—তার জন্যে আমরা সবাই মিলে সারাদিন বসে—মা কালীকে ডেকেছি আর বলেছি—হে মা কালী—এবার যেন ভুলুদার নামটা ড্রইং লিস্টে না ওঠে—আমরা তোমাকে ডালি দেব।

আমাদের সমবেত আকুল আবেদনে কাজ হ'ল। টাকা দেবার বেলায় আমাদের আকুতি না শুনলেও—এর বেলা মা কালী দীনতারিণী—আমাদের প্রতি সদয় হলেন। বিকেলে—একখানা ড্রইং লিস্ট কিনে এনে ভুলুদাকে দেখালাম—তিনি তাঁর নোট বইতে টুকে রাখা টিকেটের নম্বরটা দেখলেন—সত্যিই—তাঁর নামটা ওঠেনি।

ভুলুদাও সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেলেন।

ক্ষতির মধ্যে ভুলুদার মাথার টাকের চুল ক'গাছা গেল। আর মিঠুর পুতুলটা। অবশ্য মিঠুর ক্ষতিটা আমি পূরণ করে দিয়েছিলাম আর একটা নূতন পুতুল কিনে দিয়ে। কিন্তু ভুলুদার টাকের চুল ক'গাছা—?

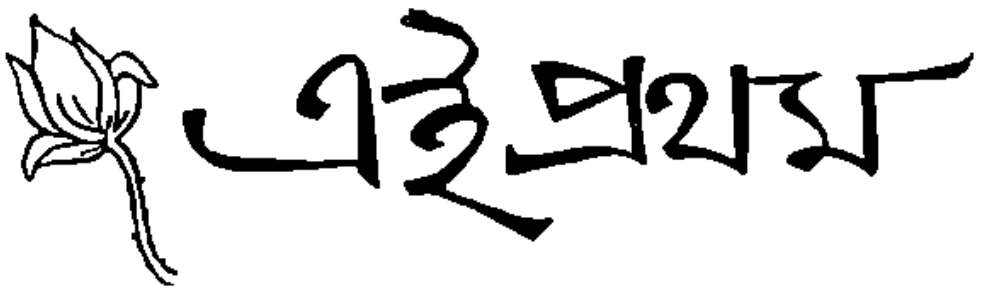

দক্ষিণের জানালা

সন্ধ্যা রায়

রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা লঘু সুর বাজছে পীটারে। সুরটা যেন খুবই পরিচিত শ্যামলীর। দক্ষিণের খোলা জানালাটা দিয়েই ভেসে আসছে সুর-রেশ। একটা কেমন যেন মাদকতা সেই সুরে। একটা তীব্র আকর্ষণ যেন। যেন একটা চাই পাওয়ার ম্যাগনেট আকর্ষণ করছে একটা ছোট্ট লোহার টুকরোকে।

অনেকদিন আগের বিস্মৃতপ্রায় একটা ঘটনায় ফিরে যায় শ্যামলী। তখন কলেজে পড়ে সে। সেকেণ্ড ইয়ার সায়েন্স। আঠারোটা বসন্ত পেরিয়ে এসেছে সে সবেমাত্র। কলেজের একটা ফাংশনে পরিচয় হয় গৌতমের সঙ্গে। একটা রিসাইটেশন ছিলো শ্যামলীর। গৌতম বাজিয়েছিলো পীটারে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর। অবাক হয়েছিলো শ্যামলী গৌতমের আঙুলের কৌশল আর অনুশীলন দেখে। রেডিওতে পীটার বাজনা অনেক শুনেছে শ্যামলী কিন্তু সে যেন গৌতমের কাছে কিছু নয়। এমন প্রাণ নেই সে সুরে! এমন সাড়া নেই। কেবল শ্যামলী নয় অতিথি আর অভ্যাগতেরাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলো গৌতমের। সেদিন সবচেয়ে ভালো আর দামী পুরস্কারটা পেয়েছিলো গৌতম।

শ্যামলী এগিয়ে গিয়েছিলো গৌতমের কাছে। বলেছিলো: "চমৎকার।"

—"কে? আমি না আমার পীটার?" জিজ্ঞেস করেছিলো গৌতম। দুষ্টুমি ভরা চোখদুটো মেলে ধরেছিলো শ্যামলীর পটলচেরা চোখ দুটোর সামনে।

—"দুজনেই।" স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলো শ্যামলী। তারপর চোখদুটো নামিয়েছিলো নীচে। একটু লজ্জা পেয়েছিলো যেন উত্তরটা দিয়েই।

সেই আলাপের শুরু। তারপর দু'জনে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছিলো। শ্যামলীদের বাড়ীতেও আসতো যেতো গৌতম। গৌতমের কাছে পীটার শিখছিলো শ্যামলী।

সেই বছরেই ডিষ্টিংশন পেয়ে বি. এ, পাশ করে গৌতম।

তাদের মন দেওয়া-নেওয়ার পালাও শেষ হয়েছিলো একসময়: গৌতমকে বাদ দিয়ে শ্যামলীর নিজস্ব সত্তাও ছিলোনা যেন কিছু।

একদিন গৌতম বললে: "এবারে তোমার বাবার কাছে আমাদের বিয়ের কথাটা প্রোপোজ করা যাক একদিন কেমন? আপত্তি নেই তো?" গৌতমের হাতে অর্ধ প্রস্ফুটিত একটা লাল গোলাপ। লাল গোলাপ ভালোবাসে শ্যামলী।

মুখে কিছুই বলতে পারেনি শ্যামলী। সম্মতিসূচক মাথা হেলায় শুধু। তারপর হাত বাড়িয়ে লাল গোলাপটা হাতে নেয়। নাড়াচাড়া করে।

পরের দিন সন্ধ্যা।

বাবার সঙ্গে গৌতমের কথাবার্তার কাটা কাটা অংশ কানে আসে শ্যামলীর। পাশের ঘরে আত্মগোপন করেছিলো সে। আনোয়ারের মতো কান খাড়া করে গিলছিলো সে কথাগুলো।

—"Strange! এতো আস্পর্ধা তোমার হোল কোত্থেকে গৌতম? আমার মেয়ের একটা শাড়ির দাম কতো সেটা জানো? বিয়ে! আর কোনদিন তুমি আমার এখানে আসবে না, এলে অপদস্থ হবে—যাও, Get out."

বাবার গলা। বাবা যেন ফেটে পড়েন রাগে। বিক্ষিপ্তভাবে পায়চারি করেন সারাটা ঘরময়। মুখে অর্ধদগ্ধ চুরুট।

—"কিন্তু···।" কি যেন বলবার চেষ্টা করে গৌতম।

—"No, nothing more. I tell you get out." বজ্রনির্ঘোষ স্বরে বাবাকে আজ অত্যন্ত অচেনা আর নিষ্ঠুর মনে হয় শ্যামলীর। গৌতমের জন্যে দুঃখ হয়। বেচারি, তার জন্যেই আজ এতোগুলো কথা হজম করলো। মিথ্যে অপমানিত হোল সে।

মাথা নীচু করে বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় গৌতম। গেট পেরিয়ে সোজা বড় রাস্তায় গিয়ে নামে।

সারাটা রাত ঘুমুতে পারেনি শ্যামলী। বিছানায় পড়ে ছটফট করেছিলো শুধু। মাথার উপরের সিলিং ফ্যানটা যেন মুঠো মুঠো আগুন ছড়াচ্ছে সারাটা ঘরময়। কেবল ভাবে, একি হোল? আচমকা আঘাতে গৌতম কিছু একটা না করে বসে আবার! যা সেন্টিমেন্টাল!

পরের দিন কলেজে যাবার পথেই গৌতমের সঙ্গে দেখা করে শ্যামলী। গৌতমের মেসে। একটা রাত্রের মধ্যেই কেমন যেন শুকিয়ে গেছে গৌতম। কেমন যেন শ্রীহীন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে গৌতমকে। বিজিত সেনাপতি যেন একটা।

—"কি, কথা বলবে না আমার সঙ্গে?" গৌতমের টেবিলের উপর রাখা সিগারেট কেসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে শ্যামলী।

—"সবই তো শুনেছো।" গৌতম বলে। কেমন যেন করুণ শোনায় কথাগুলো।

—"হ্যাঁ"। উত্তর দেয় শ্যামলী।

—"তোমার বাবা চান বড় চাকুরে জামাই, যেমন সব বাবাই চায়। তাঁরা প্রেমপ্রেমের মূল্য বুঝতে চাননা বড় একটা।" একটু থামে গৌতম। —"তুমি কথা দাও শ্যামলী, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে কিছুদিন তুমি···" কথা শেষ করতে পারেনা গৌতম। গলার স্বরটা জড়িয়ে আসে তার। এগিয়ে গিয়ে শ্যামলীর একটা হাতে চাপ দেয়।

—"করবো। আমি তোমার জন্যে যুগ যুগ অপেক্ষা করবো গৌতম। আমি কথা দিচ্ছি আমি···" অশ্রুর ধারা নামে শ্যামলীর চোখে।

—"বেশ।" একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ে গৌতম।

• • •

—"আরে তুমি যে এখনও বিছানা থেকেই ওঠোনি দেখছি। শরীর ভালো আছে তো?" ক্যাপ্টেন সমীর সেন এগিয়ে এসে স্ত্রীর কপালে আলতো ভাবে হাত রাখেন।

বিছানার উপর উঠে বসে শ্যামলী। কটাক্ষ হানে। —"যা জ্বালাও তুমি সারাটা রাত বাব্বাঃ!"

মৃদু হেসে গলার টাইটা সেট করেন সমীর সেন। —"আমার কিন্তু ফিরতে দেরী হতে পারে কটা জরুরী কেস রয়েছে হাতে। সময় মতো খেয়ে নিও। এ সময়টা খুব সাবধান থেকো।" এগিয়ে এসে স্ত্রীর টুকটুকে গাল দুটো একটু টিপে দেন।

—"আচ্ছা চলি কেমন?" জুতোর মসমস আওয়াজ তুলে বেরিয়ে যান ক্যাপ্টেন সেন। বাইরে বেরুবার গাড়ীর শব্দ আসে কানে।

গীটার অনেকক্ষণ আগেই থেমে গেছে। কিন্তু এখনও যেন তার একটা সুর বাজছে কানে। সারাটা ঘরময় যেন ভেসে বেড়াচ্ছে সেই সুরটা।

দক্ষিণের জানালাটার কাছে এগিয়ে যায় শ্যামলী। আর চমকে ওঠে হঠাৎ। গৌতম। গৌতম এসে উঠেছে পাশের খালি বাড়ীটায়!

একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে গৌতম। পরনে পুরা হুজুর সাহেবী পোষাক। চোখে কালো গান গগলস্। সামনের ছোট একটা টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে গীটার যন্ত্রটা। শ্যামলীর খোলা জানালাটার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গৌতম। সিগারেট টানছে।

শব্দ করে জানালাটা বন্ধ করে দেয় শ্যামলী। এতো ছোট গৌতমের মন? এতো নীচ সে? আজ শ্যামলী পরস্ত্রী জেনেও ছুটে এসেছে প্রেম নিবেদন করতে? এসেছে নিজের আভিজাত্যের আর টাকার বড়াই দেখাতে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কিংবা হয়তো গৌতম চায় তার স্বামীর কাছে তাকে হীন প্রতিপন্ন করতে—ছোট করতে! ছেলেবেলাকার সেই সব ঘটনা প্রকাশ করতে চায় গৌতম? যদি তাই হয় তবে?

নিজের মনেই জবাব দেয় শ্যামলী: "ক্যাপ্টেন সমীর সেন গৌতমের মতো নীচ নয় এতো। গৌতমের পক্ষে যা সম্ভব ডাক্তার সমীর সেনের পক্ষে তা সম্ভব নয় কিছুতেই।"

আর বেশী চিন্তা করতে পারেনা শ্যামলী। মাথার মধ্যেটা কেমন যেন গরম হয়ে ওঠে হঠাৎ। না গৌতমকে সে এখানে থাকতে দিতে পারেনা কিছুতেই না। গৌতম তার অনিষ্ট করতে পারে; তার সাজানো সংসার হয়তো বা ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে পারে। সব পারে ওরা।

তাওালে পা দুটো গলিয়ে তাড়াতাড়ি নীচের তলায় নেমে যায় শ্যামলী। সেখান থেকে সোজা পাশের বাড়ীতে। গৌতমের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ায় সে। শ্যামলীকে সামনে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে গৌতম। শ্যামলীর মুখোমুখি চাইতেও পারেনা আজ। তাই লজ্জায় মুখ ফিরিয়েছে সে।

—"কেনো তুমি এখানে এসেছো? তুমি জানো আমি আজ পরস্ত্রী; তা জেনেও তুমি এসেছো আমার সংসারে আগুন লাগাতে? এতো সাহস তোমার? এতো নীচ এতো ছোট তুমি গৌতম? ছিঃ। আমার স্বামী বিলেত ফেরত ডাক্তার; বেশভোড়া তাঁর নাম। তোমার মতো এতো ছোট এতো নীচ তাঁর মন নয় যে তোমার আজেবাজে কথায় বিশ্বাস করবেন কিছু। তুমি চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে এই মুহূর্তে।" একটানা কথাগুলো বলে যায় শ্যামলী। রাগে আর প্রচণ্ড অভিমানে তার সারা শরীরটা থরথর করে কাঁপে।

—"শ্যামলী!" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় গৌতম।

—"Shut up. ও নাম আর তোমার উচ্চারণ করার কোন অধিকার নেই আজ। আমি আজ

কুমারী নই, আমি এখন বিবাহিতা মহিলা সে কথাটা ভুলে যেওনা। আমার স্টেটাস আছে, আমার সম্মান আছে একটা সমাজে। তোমাকে আবার আমি বলছি তুমি চলে যাও এখান থেকে—চলে যাও।"

—"শ্যামলী!" পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সৌভিক শ্যামলীর দিকে। সামনের একটা চাওয়ার তালে জোর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে সে। শ্যামলী ততক্ষণে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে।

• • • •

অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে সুইচে হাত রাখেন ক্যাপ্টেন সেন। ফাইভ এম্পস ট্রান্সলার সুইচ। একটা কম পাওয়ারের সবুজ বাতি জলে ওঠে আচমকা। আলো অন্ধকার ঘরটা।

শ্যামলী বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। কেমন অবিন্যস্ত মাথার চুল, বেশবাস শিথিল। কেমন রুক্ষহীন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে যেন শ্যামলীকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যান ক্যাপ্টেন সেন। মাথার চুলে হাত রাখেন শ্যামলীর।

শ্যামলী কেমন যেন উদাস নেত্রে তাকায় সমীরের দিকে।

—"কেমন লাগছে এখন?" স্ত্রীর বিছানার পাশে চেপে বসেন সমীর সেন। এখনও বাইরের ধড়াচূড়া ছাড়েননি তিনি।

—"কতোক্ষণ এসেছো? এতো দেরী হোল আজ?" বিছানার উপর উঠে বসে শ্যামলী।

—"খেয়েছো কিছু?"

—"না।"

—"সেকি! সারাটা দিনের মধ্যে খাওয়াই হয়নি তোমার? তুমি দেখছি একটা অসুখ না বাধিয়ে ছাড়বেনা—কেন একবার গাড়ী নিয়ে চলে আসতে কি হয় তোমার?" একটা প্রচণ্ড অভিমানের সুর শ্যামলীর কণ্ঠে।

—"কি জানো একটার পর একটা কাজ এসেছে হাতে, একটা মিনিট রেষ্ট পাইনি আজ।"

হঠাৎ টেলিফনটা বেজে ওঠে ঝনঝন করে। রিসিভারটা তুলে নেন সমীর সেন।—"হালো। yes speking. expired ও:।" রিসিভারটা নামিয়ে রাখেন আবার।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা ইজি চেয়ারে হেলিয়ে দেন সমীর সেন। ঘূর্ণায়মান সিলিং ফ্যানের নীচে বসেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে সারাটা কপালে। পকেটের রুমাল দিয়ে ঘাম পরিষ্কার করেন তিনি।

—"কি হোলো আবার?" শ্যামলী প্রশ্ন করে।

—"জানো মলি, এক একজন মানুষ এই পৃথিবীতে আসে অভিশপ্ত জীবন নিয়ে। কোন দিনই শান্তি পায়নি তারা। আজ তেমনই একটি মানুষ মরলো। —সারাটা জীবনই ট্রাজেডী। ট্রাগল কর এগজিস্টেন্স। সে মাথা তুলবার জন্যে অনেক লড়াই করেছে বাট ফেলিওর। —গরীব অবস্থার মানুষ কলেজ-জীবনে ভালবেসেছিলো একটি বড় লোকের মেয়েকে। ছেলেটি গরীব সেই অজুহাতে মেয়ের বাবা মত দিতে পারেন নি সেই বিয়েতে। অপমানিত হয়ে ফিরতে হোল তাকে। কিন্তু মেয়েটি বললে সে তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে—প্রয়োজন হলে সে তার জন্যে সারাটা জীবন অপেক্ষা করবে। ছেলেটি স্বপ্ন দেখে টাকার। অনেক টাকা তার চাই। অনেক……।"

একটু থামলেন সমীর সেন। চায়ের ট্রে নিয়ে এসেছে বয়। ধোঁয়া উঠছে চায়ে একটু একটু।

—"কোন অভিনবত্ব নেই এতদূর পর্যন্ত গল্পে তাই না মলি? সেই ছেলে আর মেয়ে? কিন্তু এর পরেই গল্পের শুরু। এয়ার পোর্টে দিয়ে ঢুকলো ছেলেটি, পাইলট হোল একদময়। তারপর ধাপে ধাপে

প্রমোশন পেয়ে উঠতে লাগলো উপরে। বছর চারের মধ্যেই হাজার টাকার গ্রেডে উঠলো সে। তখন হঠাৎ মনে পড়লো সেই মেয়েটির কথা—তার প্রতিশ্রুতির কথা। সে লম্বা ছুটি নিয়ে ছুটলো দেশে। কিন্তু দেশে গিয়েই একটা আঘাত পেলে জোর। একটা হাই ভোল্ট ইলেক্ট্রীক শক যেন। শুনলে মেয়েটি সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। বছর তুয়েক আগেই তার বিয়ে হয়ে গেছে। সেই দিনই কর্মস্থলে ফিরে গেলো ছেলেটি। ছুটি ক্যানসেল করিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো কাজে। হঠাৎ একটা নতুন এনার্জী পেয়েছে যেন। কিন্তু আচমকা একদিন এয়ার ক্রাশ হয়ে গেলো। যান্ত্রিক গোলযোগ একটা। সাত সাতটা লোক মারা গেলো কিন্তু সেই ছেলেটি প্রাণে বাঁচলো। শরীরটা পেলে সত্যিই কিন্তু চোখ দুটো জীবনের মতো হারালে। তারপর প্রায় একবছর নানান চিকিৎসা চলেছে, অনেক টাকাও খরচ হয়েছে জলের মতো; কিন্তু চোখের কোন সুরাহা হোল না।"

একটু দম নেন সমীর সেন। একটা সিগারেট ধরান লাইটার দিয়ে।

—"তারপর?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করে শ্যামলী।

"—তারপর আমার এক বালাবন্ধুর চিঠি নিয়ে আমার কাছে এলো সে। হসপিটালে সিট না থাকায় পাশের ফাঁকা বাড়ীটায় তাকে রাখলাম। মনে আশা ছিলো হয়তো বা কিছুটা সাহায্য করতে পারবো ছেলেটিকে। কিন্তু……। একি! তোমার কি কষ্ট হচ্ছে মলি?" "মলি"? ডাক্তার সেন এগিয়ে যান শ্যামলীর দিকে।

—"তারপর?" জোরে নিশ্বাস টানে শ্যামলী।

—"তারপর হসপিটালে ফোন পেলাম ছেলেটি হঠাৎ পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। অন্ততো, কালো সান গগলসে বিবর্ণ চোখদুটোকে ঢেকে রাখার সে কি মিথ্যে প্রচেষ্টা।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে ক্যাপ্টেন সেনের বুক চিরে।—"ফোন পেয়েই ছুটে এলাম গাড়ী নিয়ে। একটা জোর ষ্ট্রোক হয়ে গেছে আগেই। এম্বুলেন্স আনিয়ে হসপিটালে ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে ভর্তি করলাম। কিন্তু মেডিক্যাল সায়েন্স কি বলে জানো মলি, উইদাউট এনি একসাইটমেন্ট এমন একটা ষ্ট্রোক হতে পারেনা। কিন্তু চাকর বাকরেরা বিশেষ কিছুই বলতে পারলেনা এবিষয়ে। অভিশপ্ত গৌতম রায়!"

হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শ্যামলী। এ কান্নার অর্থ বুঝতে পারেন না সমীর সেন। কেবল ভাবেন—মেয়েরা ভারি সেন্টিমেন্টাল!

বর্ষশেষে

বেলা দে

আমাদের দেশে সাধারণভাবে মঙ্গল বিধান ও অমঙ্গল বিনাশের উদ্দেশ্যেই মেয়েরা সারা বছর ধরে দেবতার আরাধনা করে থাকেন। আবার বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজাও করা হয় দেবতার রোষ থেকে রেহাই পাবার জন্যে। শাস্ত্রে অবশ্য সকল ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায় না। তবে এ বিষয়ে প্রচলিত আচারও একেবারে আধুনিক নয়। সর্পভয় ও কুষ্ঠরোগ নিবারণের জন্য মনসার পূজা, ওলাওঠা এবং বসন্তের সময় যথাক্রমে কালী ও শীতলা পূজা, জ্বরের হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য জ্বরাসুরের পূজা অগ্নিভয়ে ব্রহ্মার পূজা দীর্ঘদিন ধরে এক একটী পর্বের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম বাংলায় সুপরিচিত ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটুঠাকুরের পূজা করা হয় চর্ম রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশায়। কথিত আছে ঘেঁটুঠাকুর মর্ত্যে আগমন করে মর্ত্যবাসীদের খোস চুলকানি প্রভৃতি নানারকম চর্মরোগ দিলেন তখন সবাই ঘেঁটুঠাকুরের আরাধনা করতে বসলেন—বিঘ্ন বিনাশন ওহে ঘেঁটু রাজন—

স্বচন্দনে তুলসী লয়ে করেন পূজনী।
রাগে যত দেবগণ ঘেঁটুরে ডাকিয়া কন,
মর্ত্যেতে করিয়া গমন নরে দিল খোস চুলকানি।

ফাল্গুনের সংক্রান্তির দিনে এই ঘেঁটুপূজার বিশেষ উল্লেখ রঘু নন্দনের তিথিতত্ত্বে পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় নানারকম উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। জানা যায় ঘেঁটুর জন্ম হয়েছিল পিশাচকুলে। হরিনাম তিনি শুনতে চান না; পাছে কখনো তাঁর কানে হরিনাম প্রবেশ করে এই ভয়ে তিনি কানে ঘণ্টা বেঁধেছেন তাই ঘেঁটুর অপর নাম ঘণ্টাকর্ণ।

বছরের শেষে বাংলা দেশের মেয়েরা আজো নানা ধরণের ব্রত অনুষ্ঠান করে থাকেন। যেমন জল সংক্রান্তি, অন্ন সংক্রান্তি, আদর সিংগাসন পৃথিবীব্রত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রীয় উৎসব ছাড়া কিছু কিছু লৌকিক শৈব-উৎসবও বাংলার জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। শিবের চরিত্র নিয়ে প্রাচীন বাংলায় শিবায়ণ কাব্য রচিত হয়েছিল। চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে শিবের গাজন হয়। লোকে মানসিক করে কয়েকদিনের জন্য শিবের সন্ন্যাসী হয়। শিবের গাজন এক বৃহৎ ব্যাপার। ঢাক বাজাতে থাকে, প্রচণ্ড গরমে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ হয়। পাঁচ সাতদিন ধরে গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। কোথাও কোথাও চড়ক ও চড়কের মেলা হয়। পশ্চিমবাংলায় আবার এই দিন মেয়েরা নীলের ব্রত করেন। সমস্ত চৈত্রমাস ধরে সন্ন্যাস

করে শিবপূজা করে তারপর সংক্রান্তির আগের দিন সমস্তক্ষণ উপবাস থেকে মেয়েরা এই নীলের ব্রত করে। সন্ধ্যার পর নীলাবতীর পূজা করে নীলকণ্ঠ শিবের ঘরে বাতি জেলে দিয়ে ব্রতিনীরা জল খাবেন।

এ হলো মেয়েলী ব্রত অনুষ্ঠানের কথা; কিন্তু ঋতুভেদে বেশভূষা ও রান্না খাওয়ার পরিবর্তন ও লক্ষ্যনীয়। চৈত্রমাসে কাঁচা আমের টক মিষ্টি অম্বল। কাঁচা আম আলু, পটল কুমড়োর তরকারী। কাঁচা আম পোড়ার সরষে কিম্বা বেলের সরষে উপাদেয়। এই সময় হালকা খাওয়াই ভাল। ছোটমাছের ঝোল অথবা বাটামাছ ভাজা কলাই ডাল দিয়ে ভাতই ভালো লাগে। সজনে ডাঁটা বেশী শক্ত হয়ে যায় কাজেই সেদ্ধ করে অল্প সরষে কোড়ন আর নুন মিষ্টি দিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রেখে ঋতু পরিবর্তনে বেশভূষা করতে হয়। সমস্ত রংয়ের মধ্যে সবুজ রংয়ের প্রভাব স্নিগ্ধকর। এই রংটী চোখের স্বাস্থ্য ও দৃষ্টিশক্তি রক্ষায় সহায়তা করে। তাই গ্রীষ্মের প্রখর তপন তাপে সবুজ বা হাল্কা রংয়ের পাতলা জামা দেহ মনের স্নিগ্ধতা এনে দেয়। তা ছাড়া খুব উগ্র সেন্টের গন্ধ এই সময় ব্যবহার করতে নেই। তার বদলে সন্ধের দিকে সুগন্ধি কিছু ফুল মাথায় দেওয়া যেতে পারে। হালকা গয়না বা পুঁতির মালা এগুলো এই সময় ব্যবহার করতে হয়।

ভালো কথা, ঋতু পরিবর্তনে ঘরদোরও তো গুছিয়ে রাখতে হয়; বিশেষ করে বছরের শেষ মাস। কাজেই যত কিছু আবর্জনা সরিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিসপত্র দিয়ে ঘর গুছিয়ে রাখুন।

সবশেষে এই কথাই বলি পুরনো বছরের যা কিছু দুঃখ বেদনা সবকিছু ভুলে গিয়ে জীবনটাকে নতুন করে সাজাতে হবে। কবির ভাষায় 'যে কোনো ক্ষতি, যে কোনো অন্যায়, যে কোনো অবমাননা বিগত বৎসরে তোমার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকুক, কার্যে যে কোনো বাধা, প্রণয়ে যে কোনো আঘাত, লোকের নিকট হইতে যে কোনো প্রতিকূলতা যাহা আমাকে পীড়ন করিয়া থাকুক, তবু তাহাকে আমার মস্তকের উপরে তোমারই আশিস হস্তস্পর্শ বলিয়া অদ্য তাহাকে প্রণাম করিতেছি। এই বর্ষশেষের শুভসন্ধ্যায়, হে নাথ, তোমার ক্ষমা মস্তকে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গলভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গলকামনা করি। আগামী বর্ষে যেন ধৈর্যের সহিত দুঃখ করি, বীর্যের সহিত কর্ম করি, আশার প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্বদা সর্বত্র সকলকে বরণ করি।'

• • • •

নতুন বছরে নতুন কামনা, জাতির কল্যাণে নতুন সাধনা, আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সার্থক করে তুলুক!

হাতের কাছেই অমোঘ ঔষধ

নীলিমা দে

আপনার বাড়ির উঠোনে আশে-পাশে, পুকুরের পাড়ে, রাস্তার ধারে যে-সব অতি সাধারণ গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় নিজের থেকেই জন্মায়, বড়ো হয় তাদের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি? একটু পরিচয় করলেই জানতে পারবেন সকলেই এরা অকেজো, বাজে গাছ-পালা নয়। এদের অনেকেরই ফুলে, ফলে, পাতায়, বাকলে, কিংবা শিকড়ে গোপনে সঞ্চিত রয়েছে অপরিমেয় প্রাণ শক্তি, অফুরন্ত এবং অমোঘ আরোগ্য-শক্তি। এক সময় ছিলো যখন অশোক, হর্ষবর্ধন প্রমুখ ভারতীয় সম্রাটগণ মানবের রোগ নিরাময়ে উদ্ভিদের অসাধারণ গুণ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তাই তাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন ঔষধি-বৃক্ষ অনুশীলনের ও রোপণের। দুঃখের বিষয় সেই সচেতনতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই ব্যাধির যন্ত্রণায় ছটফট করছি, বহু দাম দিয়ে বিদেশী ওষুধ কারণে অকারণে গলাধঃকরণ করছি অথচ একবারও তাকিয়েও দেখছি না, হয়তো জানিও না যে আমাদের ঘরের দরজায় যে 'বুনো' গাছটি হাওয়ায় দুলছে তার পাতাতেই আছে ওই ব্যাধি উপশমের উপায়। সর্দি—সহরের বদ্ধ পরিবেশে এবং ঘরের গুমোটে থাকতে গিয়ে প্রায়ই তো আমরা সর্দিতে ভুগি। বর্ষা ও শীতেও সর্দির আক্রমণ হয় যখন তখন। বৃষ্টিতে ভিজেও গৃহের নানা কাজ করতে হয়।

সর্দির সঙ্গে শুরু হয় কাশির উপদ্রব। সর্দি হলেই হাত ও পায়ের তলায় কাঁচা সরষের তেল মাখা ও কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া খুব ভাল। আর সকালে কিংবা সন্ধ্যায় বাগান থেকে বাসকপাতা, শিউলী পাতা, বেলপাতা ও তুলসী পাতা, রাম তুলসী পাতা সামান্য আদাসহ বেটে নিয়ে রস ছেঁকে নিতে হবে। সামান্য জল বাটার সময় ব্যবহার করতে হবে। ওই রসে সামান্য মধু কিংবা চিনি দিয়ে ২।৩ বার খেলেই সর্দি যাবে। পরিমাণ—শিশুর জন্য এক ঝিনুক। বড়দের জন্য যে কোন কাপের তিনভাগ।

এক বৎসরের কম শিশুদের জন্য কেবল বাসক ও তুলসী পাতার রস খাওয়াবেন মধু বা চিনি দিয়ে। কাল আদা না দেওয়া ভাল। এতে শিশুর শুকনো সর্দিও সহজেই তরল হবে।

কাশি থাকলে অল্প প্রদীপের সরষের তেল আঙুলে মাখান। সেই আঙুল প্রদীপের শীষে গরম করে নিয়ে ১০ মিনিট গলায় মাখুন। আশ্চর্য উপকার পাবেন।

শিশুর কাশি যদি অত্যধিক থাকে তবে তেজপাতা পুড়িয়ে ছাইটা যে কোন লোহার জিনিসের ওপর রাখুন। সরষের তেলে আঙুল ডুবিয়ে গরম করে ওই ছাইসহ গলায় ১০।১২ মিনিট মাখালেই কাশি ও গলার ব্যথা কমবে।

এ ছাড়া টাটকা আমপাতা পানের খিলির মতো প্রথমে ভাঁজ করুন। এবারে সরষের তেল গুঁড়ে দিন। এবার ঐ পাতার খিলিটি প্রদীপে গরম করুন। তেলটা পুড়ে যেন না যায়। ওই গরম তেল গলায় মালিশ করলে উপকার পাবেন।

আর যাদের সর্দি কাশিরই ধাত, সহজেই যেন তা আর সেরে যেতে চায় না, একটু অসুখ হলেই সর্দিকাশি এমন কি জ্বরও পর্যন্ত হয়ে বসে। তারাও ওইসব ঘরোয়া পাতার ঘরে তৈরী ওষুধ খেলে উপকার পাবেন।

বাসকপাতের টাট্‌কা ছাল, বাসকের ডগাপাতা, শিউলী ও বেলপাতা, আধা, তেজপাতা, লবঙ্গ ও গোলমরিচ এক সঙ্গে করে নিয়ে ১½ কিলো জলে সিদ্ধ করে, আড়াইশ গ্রাম করুন। ছেঁকে নিয়ে মিশ্রি দিয়ে আধকাপ করে সকালে বিকালে ঈষৎ উষ্ণ খেতে পারেন। চমৎকার উপকার পাওয়া যায়।

শীতে ও বর্ষার এই ঘরোয়া সিরাপ যদি নিয়মিত খান তবে সর্দি-কাশি প্রতিরোধ করা যাবে। মিশ্রি বেশী দিয়ে খেলে খেতেও খারাপ লাগে না।

গা ব্যথা - বর্ষার ভিজলে অনেকের গা ব্যথা হয়। অন্য কারণেও হয়তো গা ব্যথা হয়। সর্দি হলেই গা, হাত-পা ব্যথা করে, মনে হয় জ্বর আসছে।

বাগান থেকে শিউলী, বেল, বাসক ও পুণর্নবা পাতা এবং কইয়ের ওষরা পাতা (এই জাতীয় পাতা গ্রামাঞ্চল ছাড়া পাওয়া যায় না বলে এটি বাদও দেওয়া যেতে পারে) তুলে নিয়ে আসুন। এবার আধাসহ বেটে আধকাপের মতো রস বের করুন। সামান্য জল ব্যবহার করা যায়। এবার উনানে খুন্তি বা ডালের কাঁটা কিংবা যে কোন একটা লোহার জিনিস উত্তপ্ত করে ওই রসে ডুবিয়ে দিন লাল গরম অংশটুকু। রসটা গরম হয়ে যাবে। ইচ্ছা করলে এতে তুলসী পাতার রসও মিশিয়ে নেওয়া যায়। তারপর চিনি বা নুন ঢেলে নিয়ে খেয়ে নিতে হবে। পরপর ২।৩ দিন খেলেই সব গা-ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

এ ছাড়া, জ্বর না থাকলে ঘ্যাটকল পাতা অথবা বনের কচুরী শাক (এক জাতীয় কচুপাতা) বেটে নিয়ে নুন, মিশ্রি ও লংকা বাটাসহ সামান্য একটু ভেজে নিন। ওই দিয়ে ভাত বা রুটি খেলে গা ব্যথা কমতে শুরু করে।

পা ফোলা, সর্দিকাশি, গা-ব্যথা, সর্দিজ্বরের মতো সচরাচর না হলেও কখনো কখনো পা ফুলে যায়। মেয়েদের সন্তান সম্ভাবনার সময় কিংবা প্রসবের পরে এটা প্রায়ই দেখা যায়। ডগা, ডাঁটাসহ পুনর্নবা পাতা সিদ্ধ করে নিয়ে সেই জলটা গরম চিনি দিয়ে খেলে অতি সহজে পা-ফোলা কমে যায়। আবার রস করে নিয়ে ওই রসে গরম লোহা ডুবিয়ে খেলেও উপকার হয়। তবে নুন বর্জন করা একান্ত উচিৎ। শিশুর ক্ষেত্রে ১ বা ২ ঝিনুক। বয়স্কদের ক্ষেত্রে ৪ ঝিনুক।

রাত্রুকের সংকটে

আগেকার মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ ঘরে থেকেই করতো। বাইরে তাদের বের না হলেও চলতো। খাদ্যাভাব তো আর এমনি তখন ছিল না। তাই পুষ্টির অভাব তাদের দেহে দেখা যেতো না। তাই আজকালকার মতো এত গর্ভচ্যুতির প্রকোপ তখন ছিল না বললেই হয়।

কিন্তু আধুনিক চাকুরে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা যেন মহামারীর মতো হয়ে পড়েছে। এই দুর্ঘটনায় নারীর বড় দুর্বল হয়ে পড়ে। দুটি দীর্ঘ দিনের জন্য মহুয়াও হয় না। পৃথিবীর আলো দেখার আগেই কত শিশুর প্রাণ শেষ হয়ে যায়।

অল্পদামী অবস্থায় শুক্‌নো কালো মিরে বাটা খাওয়া ও রসুন ঘি-এ ভেজে ভাতের সঙ্গে খেতে পারলে সহজেই জড়তা দুর্বলতা ভাব কেটে যায়।

তালিম পাতা ভাজার চেয়েও বেশী ভাল চৈ বাটা খাওয়া। যদি চৈ যোগাড় করা যায়। সহজে ও অল্প সময়েই শরীরের জড়তা কাটিয়ে শরীরকে চাঙ্গা করে তোলে।

(প্রস্তুত প্রণালী :—চৈ এক জাতীয় লতা। চৈ এর কাণ্ড অনেকটা গোলমরিচের কালের মতো। চৈ টুকরো টুকরো করে কেটে খুব ভাল করে ছেঁচতে হবে। ৪।৫টি গোলমরিচ তার সঙ্গে দিতে হবে।

উনানে ২।৩ চামচ ঘি দিয়ে ওই গোলমরিচ ভেজে নিতে পারেন। কিংবা চৈ সহ ওই গোলমরিচ ভেজে নিয়ে খাবার থালায় ঢেলে দিন। গরম ভাতের সঙ্গে মেখে খাওয়া যায়)।

এতে শরির ভাবও অন্যান্য উপসর্গ দূর হয়।

এ ছাড়া যে কোন গর্ভপাতিতে আক্রান্ত মহিলার পক্ষে বনকচুরী শাক বাটা খাওয়াও কম উপকার নয়। বনকচুরী এক জাতীয় কচু পাতা। বনে জঙ্গলে হয়ে থাকে। এই পাতা বাটা সুস্থ ও অসুস্থ দুজনের পক্ষেই মূত্ররোচক।

(প্রস্তুত প্রণালী :—এই পাতা সরষে, কাঁচালংকাসহ বেটে নিতে হবে। নুন মিশি দিয়ে ভেজে নিয়ে ভাতের সংগে খাওয়া যায়)।

আমাশায় : আমাশায় ও অজীর্ণ রোগ কষ্টকর ও বিরক্তিকর। শহরে লোকের অপেক্ষা গ্রামবাসীরা আমাশায় রোগে সাধারণত: বেশী ভোগে। এ রোগ হওয়া মাত্রই যদি টুকিটাকি বনজ ঔষধ খাওয়া যায় তা হলে আমাশয় দীর্ঘদিনের বাসা বাঁধতে পারে না।

কচি কাঁচকলা কিংবা কচি ডয়রা কলা (বীজডয়াকলা) খোসা সমেত ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটুন। খোসা সহ কাঁচকলাগুলি এককাপ ঠাণ্ডা সিদ্ধ জলে ২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। তারপর নুন বা চিনি দিয়ে সকালে খেলে আমাশয় কমে যাবে।

বেশী আমড়া পাতার রস নুন বা চিনি দিয়ে ২।৩ দিন খেলে আমাশয় কমে যেতে থাকে।

কচি বেল বর্ষাকালে গাছের তলায় অনাদৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। খোসা না ছাড়িয়েই ওই বেল টুকরো-টুকরো করে এককিলো জলে সিদ্ধ করে ২৫০গ্রাম করতে হবে। ছেঁকে নিয়ে আধ কাপ বেলের জলে পরিমাণ মতো আখের গুড় দিয়ে সকালে কিংবা সন্ধ্যায় খেলে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা যায়। শুধু আমাশয়ই কমে না। পেটের যে কোন ব্যাধিই কমে। এমনকি বায়ু হলে তাও সেরে যায়। রক্তামাশয়ও সহজেই কমে।

আমাশয় গুরুতর আকার ধারণ করলে দিনে দুবার এবং বেশ কয়েক দিন খেতে হবে।

আর বর্ষায় যদি কচি বেল শুকিয়ে রাখা যায় তবে অন্যান্য সময়ে শুকান বেল ভিজিয়ে খেলেই আমাশয় কমে যাবে।

এছাড়া থানকুনি পাতা, সাদা জিরে কয়েকটি এবং কাঁচা বা শুকনা হলুদ একসংগে বেটে ভাতের সংগে খেলেও উপকার পেতে পারেন। আর আমরা তো থানকুনি পাতাসহ সিদ্ধিদাদু রান্নার কথা জানি। আমাশায় রোগীর পক্ষে তা পরম উপকারী।

কান ব্যথা—শিশুর কোন কোন সময়ে হঠাৎ কান ব্যথা হয়। সে পরিত্রাহী চিৎকার শুরু করে। রাত্রির দিকেই বেশি হয়। তখন ডাক্তার পাওয়া তো অসম্ভব। এমনি সময়ে একটুকরো আদা ভাল করে ধুয়ে মুছে নিয়ে বেটে রস বের করুন। জল ব্যবহার করবেন না। আধ চামচ নারিকেল তেলে ৪।৫ ফোঁটা ওই আদার রস মিশিয়ে সামান্য গরমকরে নিতে হবে। ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় ব্যথার কানে ড্রপার দিয়ে ৪।৫ ফোঁটা দিতে হবে। সংগে সংগেই ব্যথা কমে যেতে শুরু করবে।

আবার শিশুর প্রায়ই গা গরম বা ঘন-ঘন জ্বর হতে দেখা যায়। এ অবস্থায় কালমেঘপাতার রস

বড় উপকারী এ যেমন ক্রিমি দমন করে তেমনি ওই ধরনের জ্বর কমায়। প্রতিদিন সকালে এক ছিপুক ওই রস একমাস খাওয়ালেই কমে যায়। ১৫ দিন পরে উপকার দেখা যায়।

আপনি যদি আপনার বাড়ীর মিনিস ব্যবহার করেন, তা হলে অল্পস্বল্প রোগের জন্য ডাক্তার ডাকা কিংবা টাকা খরচের দরকার হয় না। বাগানে ঔষুধের গাছপালা রাখা দরকার। তেমনি একটি ছোট বাক্সে প্রত্যেকের ঘরেই আয়োডিন কিংবা ডেটল, চোখের কোন মলম, চর্মরোগের মলম, তুলো, ব্যাণ্ডেজের কাপড় সুতো ও ছুরি বা ব্লেড ইত্যাদি রাখা নিশ্চয়ই একান্ত দরকার। হঠাৎ কেটে গেলে যাতে ছোট খাটো কোন ব্যবস্থা করা যায়। যাদের বাগানে নেই। তারা কি করবে? টবে করে যেমন ফুল গাছ পুঁতে রাখেন তেমনি তাঁরা টবে ক'রে ওই ধরনের প্রয়োজনীয় কয়েকটি গাছ অনায়াসে পুঁতে রাখতে পারেন। যেমন কালমেঘ গাছ বা পাথরকুচি গাছ, তুলসী গাছ। এরা তো তেমন বড় হয় না। অথচ এদের উপকার যে কি তা ব্যবহার করলেই বোঝা যায়। এরা সত্যেই রোগের যন্ত্রণা হতে রোগীকে মুক্তি দিয়ে থাকে।

———

ইথিওপিয়ায় মিনি-স্কার্ট

শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়

মিনি-স্কার্ট বস্তুটি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এযুগে। মিনি-স্কার্ট কী, জানে না, এমন কোন শহরে এযুগে আছে বলে মনে হয় না, এমন কি কত লোকেই সাক্ষাৎভাবে ব্যবহার করছে এবং ব্যবহার করতে দেখছে। বস্তুটির জন্ম পাশ্চাত্য দেশে, ইউরোপ-আমেরিকায়, কিন্তু ছড়িয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও; যদিও সব জায়গায় সমান সমাদর পায় নি।

ব্যাপারটা তো আর কিছুই না, পশ্চিমের মেয়েরা যে স্কার্ট-ব্লাউজ পরে, এবং আমাদের ভারতবর্ষেও মেয়েরা একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত ফ্রকের পাশাপাশি যে স্কার্ট-ব্লাউজ ব্যবহার করে, সেই স্কার্টই, কেবল তার ঝুলটা খাটো, ফলে পায়ের বেশ কিছুটা অংশ দৃষ্টিগোচর থাকে—এই তো ব্যাপার। কোন কোন দেশে এ নিয়ে কোন কথাই ওঠে না, আবার কোন কোন দেশের সামাজিক ধারা নারীদেহকে এতখানি প্রকাশ করাটা সমর্থন করেনা—অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের অনুশাসনও চোখ রাঙায়। তা সে যাই হোক, আমি এখানে ঠিক মিনিস্কার্ট নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসিনি, আমি শুধু দু'চারটে কথা বলতে চাই আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় মিনিস্কার্টের কী অবস্থা, তার ওপরে।

ওরা মিনিস্কার্টের দিকে বেশ কিছুটা ঝোঁক নিয়েছে। অবিশ্যি আধুনিক যুগে, যেখানে সাহেবী আদবকায়দা অ-সাহেবী দেশগুলোয় ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে, মিনিস্কার্টের প্রভাব আফ্রিকার মেয়েদের ওপর না পড়াটাই আশ্চর্যের হত। তবে একটা কথা কী, ইথিওপিয়ার মাটির মানুষ নয় এমন লোকদের মধ্যেই মিনিস্কার্টের কদরটা বেশি। ফলে এদেশের রাজধানী আডিস আবাবার যেসব ক্যাশনশপ আছে তারা সো-কেসে বস্তুটি রাখতে আরম্ভ করেছে। উদ্দেশ্য প্রদর্শনী ও বিক্রী, দুইই। অনেক দোকানদার তো বলেই দিলেন, "আমার দোকানে মিনিস্কার্ট পড়তে পারনা, এত চাহিদা।"

এরই পরে ভদ্রলোক সাংবাদিকদের হাতে পাকড়াও হয়েছিলেন। তাঁরা এঁকে জিগ্যেস করলেন, "আচ্ছা, এই মিনিস্কার্ট ইথিওপিয়ার সমাজব্যবস্থায় কতখানি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে বলে আপনার ধারণা?" উত্তরে ভদ্রলোক জানালেন, যে মিনিস্কার্ট হাঁটুর দশ সেন্টিমিটার উঁচুতে এসে শেষ হয়, সেই মাপের স্কার্টের ব্যবহার তথা জনপ্রিয়তা অল্প কিছুসংখ্যক মেয়ের মধ্যে। 'সুপার মিনি' (হাঁটুর উপরে ২০ সেন্টিমিটার) ইউরোপ-আমেরিকার মেয়েরাই শুধু পরে। আর 'হুপার সুপার মিনি'—যার স্কুল হাঁটু থেকে ৩০ সেন্টিমিটার ওপরে—ওদেশে সাধারণত কেউই প'রে না।

এই মিনিস্কার্ট কোন্ শ্রেণীর মধ্যে বেশি চালু এ সম্পর্কে জানা গেছে যে, পয়সাওয়ালা মেয়েরা, ধনীর-কন্যারা, ছাত্রীসমাজ, মেয়ে-শ্রমিকেরা, অল্পবয়সী বিবাহিতা মেয়েরা আর ইউরোপীয়ান মহিলাসম্প্রদায়—এরাই মিনিস্কার্টের পৃষ্ঠপোষকতা করে সবচাইতে বেশি। বয়স্ক বা প্রাচীনপন্থী মানুষ, যারা এসব আধুনিকতা পছন্দ করেননা, তাদের এরা কূপমণ্ডূক ও সেকেলে বলে নিন্দে করে।

যারা ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে থেকে দু'একজনের উক্তি তুলে ধরলে মিনিস্কার্ট সম্বন্ধে ওদেশের একটি আংশিক ছবি পাওয়া যাবে।

এক মহিলা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, 'মিনিস্কার্ট ধরবার আগে নিজের চেহারা, গড়ন আর পা সম্পর্কে সচেতন থাকার কথা তো যে মেয়ে ব্যবহার করতে যাচ্ছে, তারই।' একজন দশম শ্রেণীর ছাত্রী জানাল, "কী আশ্চর্য! আমাদের মেয়েদের সুন্দর পায়ের যে সুন্দর শোভা তা জামাকাপড়ে ঢেকে রাখতে যাব কেন? থাক না খোলা, থাক না দেখা, প্রকাশ্যেই লোকে দেখে প্রশংসা করে তো করুক না, তাতে হয়েছেটা কী।' আবার এই মেয়েটিরই জনৈকা সহপাঠিনী কি বলে শুনুন: "মিনি পরা মানে ঠ্যাং বের করে রাখা, কিন্তু সব ঠ্যাংই কি দেখতে সুদর্শন? ফলে, চারদিকে তাকিয়ে দেখ, কুৎসিত ঠ্যাংএর ছড়াছড়ি- এবং এটা একটা জাতীয় ট্র্যাজেডি—ছিঃ! এইসব ঠ্যাংএর যাহার ঢাকা থাকাই ভাল।' আরেকটি মেয়ের বক্তব্য: 'ব্যয়সংক্ষেপ ও মিনিসের খরচ বাঁচাতে মিনির উপযোগিতা যথেষ্ট তাতে সন্দেহ নেই।'

পঞ্চদশী এক তরুণী বলে, এর মধ্যে অভব্য নেই কিছুই। তবে, তার মতে, সব জায়গায় মিনিস্কার্টের ব্যবহার চলেনা, করা উচিতও নয়। আর স্কুলের ব্যাপারটাও ভেবেচিন্তে দেখা দরকার। এই মেয়েটি বলে, 'মিনি এযুগের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে অতএব এর ব্যবহারের অধিকার সব মেয়েরই আছে।'

আবার অন্য ধরণের মেয়েও আছে। তারা তাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের মতটাই সমর্থন করে। দেশের চিরাচরিত প্রথার বিরোধী এই মিনিস্কার্ট—এই হচ্ছে তাদের কথা। এ-পোষাক সম্বন্ধে এদের কেউ বলে "অশালীন", কেউ বলে "দুর্নীতিমূলক", কেউ বলে "আমাদের সমাজের জন্যে নয়।" সমাজসচেতন জনৈকা সপ্তদশীর মতে মিনিস্কার্ট থেকে দেশের সাংস্কৃতিক বা অন্য কোন ধরণেরই উন্নতি বলতে কিছু সম্ভব নয়।

তিরিশজন মেয়েকে একবার 'ইন্টারভিউ' নেওয়া হল। এর মধ্যে উনিশজন মিনিস্কার্টকে ভোট দিল। অবশ্য এই উনিশজনের কারুর পরণেই মিনি ছিলনা। যখন জিগ্যেস করা হল তখন ওরা বললে, 'আমাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের মিনিস্কার্ট আছে, তবে যাদের আছে তারা ওটা ব্যবহার করে কোন প্রাইভেট পার্টিতে বা কোন নাচের আসরে যাবার সময়ে, অন্য সময় নয়—আর স্কুলে তো নয়ই।'

ইথিওপিয়ার ঐতিহ্যের সঙ্গে মিনিস্কার্টের বড়ই গরমিল। প্রাচীনকালে সোমালি দেশে যার এমন পোষাক পরাই নিষিদ্ধ ছিল মেয়েদের ক্ষেত্রে। এ অনুশাসন কোন মেয়ে না মানল তো সে হয়ে গেল একঘরে। এযুগে আধুনিকতার হাওয়া লেগে পুরোনো সেই বাধানিষেধ অনেক ঢিলে হয়ে গিয়েছে বটে, মিনি-

অনুরাগ অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে বটে, তবুও খবরের কাগজ ও জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা ও তর্কবিতর্কের শেষ নেই এ নিয়ে। সনাতনপন্থীরা তো মহা খাপ্পাই। তাদের মতে, 'এ-পাপ যত শিগগির দূর হয়, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল।' তারা বলে, 'দাদাদিদে সাবেকী জাতীয় পোষাকেই ইথিওপিয়ার মেয়েদের সৌন্দর্য ও সম্ভ্রম সবচেয়ে বেশি খোলে।'

ফ্যাশনরসিকারা মুখ বেঁকায় এসব কথা শুনে। বলে, এসব কথার কোন মানে নেই। মিনিস্কার্ট পরা সহজ সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার চিহ্ন। ফ্যাশন ফ্যাশনই, সেখানে নীতিবাদ কি ঐতিহ্যের দোহাই পাড়ার সার্থকতা নেই, যারা পাড়ে তারা ফ্যাশনের বিকৃত অর্থ করে।

অবশ্য এটাও ঠিক, মিনি-ফ্যাশনের উল্টো একটা ধারা এদেশে ধীরে ধীরে বইতে সুরু করেছে বলে মনে হয়। এ ধারাকে ম্যাক্সি-ফ্যাশন বলা যায় কিনা জানিনা, তবে হাঁটুর নীচে ৫৫ সেন্টিমিটার ঝুলওয়ালা স্কার্ট অনেকেই পরতে আরম্ভ করেছে এবার। এছাড়া হাঁটুর নীচে ১০ ও ২১ সেন্টিমিটার ঝুলের স্কার্টও ব্যবহার হচ্ছে খুব।

—মিনি ও ম্যাক্সির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান!

• • • •

১৯২০ সাল।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিগ্‌মণ্ড ফ্রয়েড্‌ তখন অধ্যাপক।

একদিন সকালবেলায় এক সুন্দরী তরুণী এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করল, চোখে তার জল, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

—"কি হয়েছে তোমার?" প্রশ্ন করলেন ফ্রয়েড্‌।

—"ক'দিন আগে আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আমার স্বামী পুরুষ নামের যোগ্য নয়।"

—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তরুণী।

—"তোমাদের পূর্বরাগের সময়ে কি একথা জানতে পার নি?"—প্রশ্ন করলেন ফ্রয়েড্‌।

"না। সে পরিচয় আমার স্বামী আমাকে কিছুতেই দিতে চেয়েনি।

একটু চিন্তা করে ফ্রয়েড্‌ বললেন—"একমাত্র সান্ত্বনা তুমি পেতে পার, যদি তুমি ভাব যে, এ জগতে সকলেই মেয়েমানুষ, পুরুষ একটিও নেই।

অঙ্গনা-সংবাদ

দেবযানী

ন্যুয়র্কিল্লীতে বর্তমানে যে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন ('আংটাড') চলছে, তাতে নানা দেশ থেকে মেয়েরা কী সংখ্যায় এসেছেন জানেন কি?—নারীর সমানাধিকারের দাবী কিন্তু এক্ষেত্রে গৃহীত হয়নি, এ কথাটা আগেই বলে রাখা ভাল।

এই সম্মেলনে পৃথিবীর একশোটিরও বেশি দেশ যোগ দিয়েছেন বলে সরকারী মহলে প্রকাশ। এই দেশগুলি থেকে প্রতিনিধি, উপদেষ্টা প্রভৃতি নিয়ে প্রায় পনেরশ অতিথি এসেছেন—এঁদের মধ্যে মহিলা আছেন—কত বলুন তো?—মাত্র বাইশ জন। তার মানে, হিসেবে দাঁড়ায় শতকরা ১·৪০ এর মত। অবশ্য এখনো কিছু দেশ (দশ-বারোটি হবে) তাঁদের নামের তালিকা পাঠান নি—কিন্তু তাতেই বা কী। শতকরা হার আর কতই বা বাড়বে?

সমানুপাতিকভাবে সবচাইতে বেশি মহিলা প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন বুগোস্লাভিয়া। মোট পনের জনের মধ্যে এঁদের দলে আছেন তিনজন মহিলা। বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানী থেকেও তিন জন ক'রে মহিলা এসেছেন অবশ্য। রুমানিয়ার পঁচিশজনের মধ্যে মহিলা দু'জন। কিউবা, ইসরেল, জাপান, থাইল্যাণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে একজন ক'রে। ভারতের ষাটজনের মধ্যে একমাত্র মহিলা আছেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী।

একটা কথা: বিভিন্ন প্রতিনিধিদলে যেসব সেক্রেটারী আছেন তার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন মহিলা (এঁদের মধ্যে একজনের সম্বন্ধে ছোট্ট একটু ব্যাপার আমরা গত সংখ্যার পল্লভারতীতে দিয়েছি।), আর, এই সম্মেলনের কর্মী ও কর্মচারীদের মধ্যে কিছু রং ও বৈচিত্র্য আনা হয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক শাড়ীপরিহিতা সুন্দরীকে নিযুক্ত করে।

• • • •

বিলেতের এক ছাপাই কারখানায় কিছুদিন আগে একটা 'বিউটি প্যারেড' হয়ে গেল—অবশ্য ওদের ওখানে এটা প্রতি বছরই হয়। এবার এতে বিজয়িনী হলেন যিনি তাঁর নাম লুইজা মারডক, বয়স উনিশ। ফল ঘোষণার পরেই লুইজা নারীর সমানাধিকারের ধুয়ো তুললেন এক বিশেষ ধরণে ও এক বিশেষ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, 'এখানে এবং অন্যান্য সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় দেখা যায় যে পুরুষেরাই বিচারক হন, আর আমরা মেয়েরা স্বল্পবসনে হাজির হই তাঁদের সামনে—কিন্তু আমাদের সামনে ওঁদের দাঁড় করিয়ে বিচার করবার সুযোগ আমরা পাই কি?' তখন প্রতিযোগিতার কর্তারা বললেন যে, বেশ, এবার পুরুষদের একটা 'বিউটি প্যারেড' হবে। তাই হল। বিচারকমণ্ডলীতে সব মেয়ে। যিনি প্রথম হলেন তাঁর নাম পল নিকল্স্, এঁর মাপ দেখা গেল ৪০-৩০-৩৬। পুরস্কার নেবার সময় পল বিচারকারিণীদের উদ্দেশ ক'রে বললেন,

'আপনারা যা-ই করুন না কেন, সেই সেই কাজ যদি আমরা পুরুষরা করি তাহলে বরঞ্চ ভালভাবে সমাধা করি ও করব।'

• • • •

শ্রীমতী লতা ঘোষের নাম সাংবাদিক মহলে অনেকেরই জানা। ইনি একজন প্রবীণা ভারতীয় মহিলা সাংবাদিক, বোম্বাইয়ের 'রিংক্স' পত্রিকার লণ্ডন প্রতিনিধি ছিলেন। শ্রীমতী ঘোষ অনেকদিন ধরেই অসুস্থ অবস্থায় লণ্ডনের একটি হাসপাতালে ছিলেন – গত জানুয়ারী মাসে তিনি পরলোকগমন করেন। ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের সম্পাদক মহাশয়ের সহধর্মিণী ছিলেন তিনি। 'রিংক্স' ছাড়া অন্য আরো কয়েকটি ভারতীয় পত্রিকায়ও শ্রীমতী ঘোষ কর্মী ছিলেন।

• • • •

কার্পে দ্বীপপুঞ্জে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন শ্রীমতী মেরিয়ান বার্ণেস। এই উপলক্ষ্যে তিনি এক বিশেষ ছাঁদে কেশবিন্যাস করিয়েছিলেন নিজের। কিন্তু সেসব পরিশ্রম বেশিক্ষণ টেকসই হলনা—সামুদ্রিক পাখীরা চেঁচামেচি করতে করতে সেই কবরীশোভার ওপর ছোঁ মারতে উদ্যত হল। ভদ্রমহিলার মাথা ঠুকরে রক্তপাতই ক'রে দিত হয়ত তারা, যদি না স্বামী ফ্রেড সাহেব সময়মত সেই মাথার ওপর একটা জ্যাকেট আচ্ছাদন বিছিয়ে দিতেন। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকরা ব্যাপারটার কারণ নির্দেশ করলেন: পাখীগুলো ঐ চুলের কায়দাকে নিজেদের বাসা বলে ভুল করেছিল—ওরা ভেবেছিল যে, মানুষটা ওদের বাসা চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে, ফলে ঐ সমবেত অভিযান ও আক্রমণ।

মেরিয়ান বৃটিশদুহিতা, বয়স চল্লিশ।

• • • •

দিল্লীতে মেয়ে চুরি আজকাল প্রায় মাঝে মাঝেই ঘটছে। সে হিসেবে ওখানকার রামকৃষ্ণপুরম্ অঞ্চলের বাসিন্দা পনর বছর বয়সের নাবালিকা বাঙালী মেয়ে আরতির চুরি যাওয়াটা নতুন বা আশ্চর্যকর তেমন নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এই ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশের ব্যবহার।

আরতির বাবা অল্প মাইনের কেরাণী, সরকারী কর্মচারী। আরতি প্রথমবার চুরি যায় গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। পুলিশে নালিশ করা হল কিন্তু পুলিশ আমল দিলেনা। আরতির বাবা নিজের চেষ্টায় তখন মেয়েকে উদ্ধার ক'রে থানায় নিয়ে গিয়ে বিশদ বিবরণ এমন কি চোর কারা ছিল, সব জানান। তখনও পুলিশ কিন্তু কিছু করলে না। তার পরেই আবার মেয়ে নিখোঁজ হল এবং পুলিশ এক্ষেত্রেও রিপোর্ট পেয়ে চুপচাপ থাকে।

কেরাণী পিতার প্রভাব আর কতটুকু, তিনি তো অসহায়ই। তবু মন্ত্রীদের কাছে ধর্ণা দিয়ে দিয়ে তদন্তের একটা ব্যবস্থা করিয়েছেন যা হোক, তবে মেয়েকে এখনো পাননি। ওঁর বিশ্বাস, পুলিশ জানে চোর কে বা কারা, কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই কিছু করছে না, এবং আরতি দিল্লীরই কোনখানে লুকোনো আছে।

• • •

রেস্তোরাঁ, বার্, হোটেল ইত্যাদি জায়গায় খাবার পরিবেষণ এবং অনেক সময় ফাইফরমাস খাটবার জন্যে, 'বয়' বা 'ওয়েটার' থাকে, অনেক ক্ষেত্রে 'ওয়েট্রেস' অর্থাৎ মহিলা ওয়েটারও দেখতে পাওয়া যায়। এখন হয়েছে কী, বর্তমানে পৃথিবীর নানা জায়গায় যে 'টপ্‌লেস' পোষাক পরার ঢেউ উঠেছে তার ছোঁয়াচ গিয়ে পৌঁচেছে ঐসব 'ওয়েট্রেস'-মহলেও—তারাও আজকাল অনেক জায়গায়ই 'টপ্‌লেস' পরে অতিথি আপ্যায়ন

করতে আরম্ভ করেছে। এ ব্যবস্থা হোটেল-মালিক ও খরিদ্দার উভয়পক্ষেরই স্বাগত সম্ভাষণ পাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আদালতের কথা আলাদা। আদালত অতটা উদার না-ও হতে পারে। নিউ ইয়র্কে দেখাও গেল তাই। ওখানকার কোর্ট অফ অ্যাপীল্‌স্ সম্প্রতি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, অন্ততপক্ষে নিউইয়র্ক শহরে ওয়েট্রেসরা টপ্‌লেস পোষাকে কাজ করতে পারবেনা, পারা উচিত নয়। আর আদালতের সিদ্ধান্ত মানেই তো আইন। অতএব।

• • • •

মিঃ গ্রেভিল উইন ইংলণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী। সম্প্রতি গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে এক কারাগারে আঠারো মাস বন্দীদশায় কাটান। এঁর স্ত্রী মিসেস শীলা মার্গারেট উইন স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনেন। এই ব্যাপারে স্বামী কোন প্রতিবাদ বা অসম্মতি জানাননি। ফলে কিছুদিন হল আদালতের রায় অনুসারে ওঁরা আর স্বামী-স্ত্রী নন। সম্ভবত গুপ্তচরবৃত্তির দায়েই স্ত্রী স্বামীকে আর বরদাস্ত করতে পারেন নি—অবশ্য এটা আমাদের অনুমান মাত্র।

তা যদি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আইনী-আদালতের চাইতে কামিনী-আদালত আরো বেশি কড়া।

• • • •

কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলের খবর। মেয়েদের একটি মিশনারী মাধ্যমিক স্কুল। স্কুলটি পশ্চিম-বাংলার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্-এর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু এখানকার ছাত্রীরা আজ তিন বছর ধরে যথারীতি পর্ষদ্-অনুমোদিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে আসছেন। যারা উত্তীর্ণ হচ্ছেন, সেইসব ছাত্রীরা যথারীতি সার্টিফিকেটও পেয়ে আসছেন। অন্য অন্য যেসব অনুমোদিত স্কুল আছে, ঠিক তাদেরই মত সবকিছু সুযোগ-সুবিধে পেয়ে আসছে এযাবৎ এই স্কুলটিও। তিন বছরে, অর্থাৎ ১৯৬৫, ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে এখানকার ফাইনাল পরীক্ষার্থিনীরা বেশ ভাল হারেই পাস করেছেন বলে জানা যায়। সম্প্রতি ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। পশ্চিমবাংলার শিক্ষা বিভাগের গোচরে যেভাবেই হোক বিষয়টা এসেছে এবং তাঁরা তদন্ত ক'রে জানতে পেরেছেন, ব্যাপারটি এবংপ্রকার। কী ক'রে এদ্দিন এমনটা চলতে পারল সেটাই আশ্চর্যের। রাজ্য সরকারও অবাক্ হয়েছেন।

• • • •

একই সঙ্গে ও একই সময়ে দু'রকম বৃত্তি বা পেশা নিয়ে চলা খুব শক্ত। হলিউডের অভিনেত্রী লোলা অলব্রাইট তা জানেন। দুই মনিবকে খুশি ক'রে চলতে পারা বেশ দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নেই। 'ডুড' আর 'টাবাক' দুটোই একসঙ্গে খেতে গেলে বিষম খাবারই সম্ভাবনা। বিশেষ ক'রে অভিনেতা-অভিনেত্রী-জীবন আর সংসারী জীবন—এ দুয়ের মাঝে বিবাদ নাকি চিরদিনের। লোলাও সেটা বর্তমানে হৃদয়ঙ্গম করেছেন মনে হয়। তাঁরই মত অনুসারে : অভিনয় ও চিত্র-জগৎ যথেষ্ট করা হয়েছে, এবার ক্যামেরা দিলেই হয়। কারণ ক্যামেরা ছাড়াও যে আরেকটি বস্তু রয়েছে সেটির নাম স্বামী—লোলার স্বামী বিল চাড্‌নে। চাড্‌নে এক রেস্তোরাঁর মালিক—তারই সঙ্গে মিলেমিশে যা কিছু করা যায় তাই ভাল, অন্তত স্টুডিয়োর ঘোরপাঁচের চাইতে তা ভাল হবে, এই হচ্ছে এখন লোলার বক্তব্য। অভিনয় ছেড়ে দিয়ে একান্তভাবে স্বামীসোহাগিনী হয়ে সংসার করার কথাই বোধ হয় ভাবছেন লোলা অলব্রাইট।

—অলব্রাইট!

• • • •

অ্যাডিস আবাবায় 'ম্যাক্সি-স্কার্ট' সর্বাধুনিক ফ্যাশন হয়েছে। খবরটা শুনে এই 'মিনি'-স্কার্টের যুগে অনেকেই অবাক হবেন হয়ত। এটা হল, যাকে ইংরেজিতে বলে, 'অ্যান্টি-ক্লাইমাক্স'। এই 'অ্যান্টি-ক্লাই-ম্যাক্স-ই-স্কার্ট' সংবাদ।

আফ্রিকার গ্রাট ইথিওপিয়ার এই রাজধানীতে আধুনিক 'মিনি'-প্রবণতার বিরুদ্ধে এক ঢেউ দেখা দিয়েছে। 'মিনি'-স্কার্টের সাধারণ ঝুল হচ্ছে হাঁটুর ৩৫ সেন্টিমিটার উপর পর্যন্ত, অর্থাৎ পদযুগল তো বটেই, উরুভাগেরও কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হওয়া চাই। মনাতনপন্থীরা এর প্রতিপক্ষ হিসেবে 'ক্যামপেন' করছেন 'ম্যাক্সি-স্কার্টের,' যার ঝুল হবে হাঁটুর নীচে ৩৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত।

—এবং এই 'ম্যাক্সি'-ভিগির ওখানে কার্যকর হয়েছে খুব। প্রমাণ: 'ম্যাক্সি'-স্কার্টের জনপ্রিয়তা বাড়ছে ফ্যাশন হিসেবে। পুরাতনীরা খুশি— বলাই বাহুল্য।

• • • •

পদপ্রদর্শনের এই প্রসঙ্গে বিলেতের একটা খবর জানানো যেতে পারে। চেস্টার শহরের এক হাই স্কুল। মেয়েদের। এই স্কুলের 'প্রিফেক্ট'-রা নিয়ম ক'রে দিয়েছেন যে, মেয়েরা এমন ফ্রক-স্কার্ট পরতে পারবে যা বড়জোর হাঁটুর দু'ইঞ্চি উপরে এসে থেমে থাকবে, তার বেশি উঠবে না। যতদূর বোঝা যায় বা অনুমান করা যায়, সে নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়না সবক্ষেত্রে। এজন্যে মেয়েরা নিজেরা মিলে একটা ব্যবস্থা করেছে।

ওরা ঠিক করেছে যে, স্কুল-নির্ধারিত মাপের চাইতে ফ্রক বা স্কার্টের ঝুল যদি ছোট হয় তাহলে সেই মেয়েকে জরিমানা দিতে হবে। জরিমানার হার: প্রতি আধ ইঞ্চির জন্যে এক পেনি বা একসেন্ট। অর্থাৎ হাঁটু থেকে ২½ ইঞ্চি উঁচু হলে এক পেনি, ৩ ইঞ্চি হলে দু'পেন্স, ৪ ইঞ্চি হলে চার পেন্স—এইভাবে বেড়ে চলবে। এই ব্যবস্থাটা ওরা করেছে টাকা তোলবার জন্যে—সাহায্যমূলক কাজের অর্থসংস্থানের জন্যে। আর এপর্যন্ত কত আদায় হয়েছে তাও বলি: ১২০ ইঞ্চি পায়ের দরুণ (অর্থাৎ বেরিয়ে থাকা পায়ের অংশের দরুণ) জরিমানা তিন পাউণ্ড।

• • • •

রাউরকেলার শ্রী ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির কাজে ওখানকার মেয়েরা সক্রিয় হয়েছেন। এঁরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছেন এবং অনেকেই কার্য উপলক্ষ্যে পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে গেছেন। সে যাই হোক, শান্তিপূর্ণভাবে ও সদ্ভাবে একসঙ্গে বাস করবার প্রেরণাটা নিশ্চয় সবার অন্তরেই সমান জোরালো। এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা জাতিধর্মনির্বিশেষে এক "মহিলা মণ্ডলী" গঠন করেছেন।

এই মহিলা-মণ্ডলীর মাধ্যমে তাঁরা রাউরকেলাকে সুন্দরতর করার সঙ্কল্প করেছেন। নগরের নানা অংশে বাগান রচনা ছাড়াও বোনা, এমব্রয়ডারী, গৃহাভ্যন্তরের সজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা পারদর্শিতার নমুনা দেখাচ্ছেন। তাছাড়া আছে খেলাধূলা—তাতেও দক্ষতা কিছু কম নয়। সম্প্রতি আবার তাঁরা এক বার্ষিক উৎসবের প্রবর্তন করেছেন—"আনন্দ বাজার"—ছবির মত সুন্দর একটি পাহাড়ের মাথায়। এই আনন্দ-বাজারে বাড়িতে তৈরি ও জমান শাকসব্জী, ফুল, মুরগী ইত্যাদি তাঁরা জমা করেছেন প্রদর্শনী তথা বিক্রীর জন্যে।

• • • •

আমাইকে নিয়ে যা-খুশি তাই স্ত্রীর দাবীতে মেয়ে হয়ত বা করতেও পারে, কিন্তু শাশুড়ী যেন আর

না করতে যান। কেননা ওদেশে যা ঘটেছে, এদেশেও তা ঘটতে পারে, অতএব মানে মানে সাবধান হওয়াই ভাল।

কোপেনহেগেনের এক শাশুড়ীর নামে তাঁর জামাই আদালতে অভিযোগ এনেছিলেন এই বলে যে কি-শনিবারে উক্ত শাশুড়ী তাঁকে কারখানার কাজে যেতে দেন না, তার বদলে সেই সময়ে তাঁকে দিয়ে নিজের বাড়ির নানা কাজকর্ম ও ফাইফরমাশ করিয়ে নেন—ঘর সাফ, কাচের বাসন মাজা, কাপড় ধোলাই, ইত্যাদি। আদালত জামাইয়ের পক্ষে রায় দিয়েছেন ও শাশুড়ীটির শাস্তি হয়ে গিয়েছে। (কী শাস্তি, তা অবশ্য জানা যায় নি।)

• • •

শীতের শেষে কিছুদিন আগে কলকাতায় তিনটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 'ইভ্‌নিং উইকলি' পত্রিকার উদ্যোগে যেটি, তাতে প্রথম স্থান পেলেন মালা প্রধান। 'টাইম্‌স্ বিউটি কনটেস্টে' যাঁরা লাবণ্য ও রুচিত্বের ছাপ রাখলেন তাঁরা হলেন গৌরী সাওেল, আর্নাডাস মুখল ও লিলা ঘোষ। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা 'হেলেন কার্টিস' ও 'কেমিনা' পত্রিকা। 'কার্টিস'-'কেমিনা'-র পরিচালনায় আরেকটি যে রূপসী-নির্বাচনপর্ব হল তাতে প্রথম হয়ে 'মিস্ কেমিনা' (অথবা 'মিস্ ক্যালকাটা') হলেন নন্দরীণ আরিফ (পুরস্কার পেলেন পাঁচশ টাকা নগদ, উষা সেলাইকল ও বিবিধ টয়লেট)। দ্বিতীয় হলেন ফ্লোরেন্স এজেকেল ও তৃতীয় হয়েছেন অন্নশ্রী রায়গুপ্ত। এজেকেল টাইপ-শর্টহ্যাণ্ড-শিক্ষার্থিনী, অন্নশ্রী স্কুলে পড়েন। নন্দরীণ স্কুল শেষ করে গৃহসজ্জা শিখছেন—সামনেই যে 'মিস্ ইণ্ডিয়া' প্রতিযোগিতা আসছে, তাতে বাংলা থেকে ইনি যোগ দিচ্ছেন।

ওদিকে দিল্লীবাসিনী ঘুমিতা সেন বোম্বাইয়ে বাজীমাৎ ক'রে ভারতসুন্দরী হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়ার লঙবীচে সামনের এপ্রিলে 'মিস্ ইণ্টারন্যাশন্যাল' প্রতিযোগিতায় নামবেন বলে দিন গুণছেন।

• • •

আমেরিকার একজন প্রবীণা সাহিত্যিকা ক্যাথী হার্স্ট। 'ব্যাক ষ্ট্রীট', হিউমরেস্ক্', 'ইমিটেশন অব লাইফ' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখিকা ইনি। সম্প্রতি ৭৩ বছর বয়সে কয়েকদিনের অসুখে নিউ ইয়র্কের বাড়িতে ইনি পরলোকগমন করেছেন। শ্রীমতী হার্স্ট বহু ছোটগল্পও লিখেছেন এবং তার মধ্যে বহু গল্পই ইতালীয়, জার্মাণ, পোলিষ, হাঙ্গেরীয়, সুইডিশ, জেনীশ, ডাচ, রুষাসী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, হিব্রু ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

• • •

নেদারল্যাণ্ডসের আমস্টার্ডাম শহরের এক খবরে জানা গেল, ওখানে শিক্ষিকা মেরী ট্রুয়াটের অধীনে ছোট ছোট কিছু সংখ্যক মেয়েকে ইংরাজি ভাষার এক 'কোর্স' শিক্ষা দেওয়া হয়। এই মেয়েদের বয়স গড়পড়তা বারো। এদের একবার বলা হল : তোমরা জান, এমন যে কোন একটা ইংরাজি শব্দ লেখ। উত্তরে আঠার জনের মধ্যে আটজন লিখলে "য়ীইস্", সাতজন লিখলে "ওকে (okay)" আর তিনজন লিখলে "কেনেডি"।

• • •

মেয়েটির বাড়ি ক্যালিফোর্নিয়ার কাছাকাছি একটা ছোট শহরে—নগরও বলা চলে। নামটা পরে বলছি—এই মেয়েটিই এবারকার প্রতিযোগিতায় 'মিস ক্যালিফোর্নিয়া' নির্বাচিত হয়েছিল। কথা ছিল,

এরপরে সে 'মিস ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। সম্প্রতি মেয়েটি জানিয়েছে যে সে 'মিস্ ক্যালিফোর্নিয়া' খেতাব ত্যাগ করেছে ও প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছে। কারণ হিসেবে জানিয়েছে, এই ধরণের প্রতিযোগিতায় "প্রতিযোগিনীরা গণ্য হয় পণ্যরূপে ; নিজস্ব জীবন, পছন্দ অপছন্দ, বাস্তবতার মধ্যে নিজের স্বরূপ—এসবের কোন বালাই থাকতে পায় না।"

নামটা এবার বলি : মিস্ শারোন ম্যাকফারল্যাণ্ড। আঠার বছর বয়স, একটু মাজা মাজা রং। আগামী 'মিস ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতায় 'মিস ইউ-এস-এ' হিসেবে যোগ দেবার কথা ছিল তার।

ম্যাকফারল্যাণ্ড বলে : "এই ধরণের জীবনযাত্রায় আমার কোন আগ্রহ নেই। ধরে নিলাম, আমি মিস্ ইউনিভার্স হলাম। কিন্তু তারপর ? একটি বছর ধ'রে আমায় বাড়িঘরদোর ছেড়ে ওদের মনোনীত হোটেলে থাকতে হবে। তাছাড়া ওরা যখনি যেটি করতে বলবে তৎক্ষণাৎ বিনা ওজরে সেটি তামিল করতে হবে। আমি নাচব গাইব চেহারা দেখাব—লোকে দেখবে ও পয়সা দেবে—কিন্তু সে পয়সা আমার নয়, ওদের জন্যে ও ওদের হয়ে আমি সে পয়সা রোজগার ক'রে দেব।" অতএব শারোন এপথ আর মাড়াতে ইচ্ছুক নয়।

শার্লট ব্রন্টির প্রথম যৌবনে যিনি তাঁকে প্রেমে অভিভূত করেছিলেন তিনি একজন তরুণ অধ্যাপক।

কাণাঘুষায় শোনা গেল ওঁদের বিয়েও হতে পারে। কিন্তু প্রোফেসর ভদ্রলোক শার্লটকে বুঝিয়ে বললেন "বিয়ের চেয়েও বড় স্মৃতি মনে রাখা। তুমি কেন তাই করনা।"

নিতান্ত হতাশ হয়ে শার্লট বললেন "আচ্ছা তাই হবে।"

অবশ্য প্রোফেসর ভদ্রলোকটি কোনদিন বিয়ে করেননি।

শার্লট এবার তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনা দিয়ে লিখতে লাগলেন একখানি চমৎকার উপন্যাস। নাম দিলেন তার "The Professor." তাঁর স্মৃতিচরণে অম্লান হয়ে রইলেন যিনি।

রাত্রির সংলাপ

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অফিসের ভেতর কেমন একটা আচ্ছন্নতা নিবিড় হয়ে উঠছিল। কলকাতার পথঘাট এখন অন্ধকার সমাধি ভূমির মত ভয়ঙ্কর নির্জন। কেবল লাইটপোষ্ট গুলো, মুমূর্ষু আলোরশ্মি কোলে করে ভোরের প্রতীক্ষা করছে।

এই রাত্রে আমরা ক'জন সাংবাদিক আমাদের চোখের ঘুমকে, পরের ষ্টেশনে নামিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে কোনভাবে জেগে আছি। ওদিকে ঘরের একধারে কয়েকটা টেলিপ্রিন্টার, অমানুষিক ধৈর্যের সঙ্গে খবর টাইপ করে চলেছে। তার একটানা অস্পষ্ট শব্দ যেন এই রাত্রির স্তব্ধতার নেপথ্য সংগীত।

দেয়াল ঘড়িতে দু'টো বাজল।

আপাততঃ কোন জরুরী খবর নেই। তাই অমরবাবু বিরল, আমি শরৎদাকে ঘিরে বসলাম। কারণ আমরা জানি, রাত্রির এই অলস ঘুমন্ত পরিবেশে শরৎদা নিজেই কখনো কখনো একটি নিখুঁত 'নিউজ এজেন্সি' হয়ে ওঠেন, উঠতে পারেন।

ঘুম জড়ানো চোখে শরৎদা একটা ছোট্ট নিউজ বেয়ারার হাতে প্রেসে পাঠিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'এই যে আসুন'।'

শরৎদার আর যত দোষ থাক্, তিনি কখনও আর পাঁচজনের মত সাধারণ নন। দিন রাত্রি সকল সময় মাতালের মত ঢুলু ঢুলু রক্তিম চোখ, কিঞ্চিৎ স্থূল দেহে গেঞ্জীহীন বোতামহীন অতি মিহি ফর্সা পাঞ্জাবী, প্রায় সর্ববন্ধন হীন পরিচ্ছন্ন দামী ধুতি, ওঠার সময় বাঁহাত দিয়ে কোনভাবে সেই ধুতির সলজ্জ অধঃপতন রক্ষা এবং প্রায় প্রতিদিনই টাকা ধার চাওয়া, শরৎদার এই চরম বোহেমিয়ান চরিত্র সম্পর্কে আমরা সবাই অভ্যস্ত।

শরৎদা এককালে সর্ববিধ নেশা করতেন। অধুনা ধর্ম জগতের অতিথি হয়ে শুধু সিগারেটেই খুশি। তাও কখনো কখনো। যৌবনে সুন্দর ছিলেন। কোন নিষিদ্ধ নায়িকার কুটিরে সারারাত্রি কাটিয়ে ভোরবেলা চলে আসার সময় তার কান্না শুনে এসেছিলেন—'যার ঘরে রাত কাটালে তাকে একবারও চোখ মেলে দেখলে না গা!' না, শরৎদাকে অবশ্য এজন্য খুব একটা দায়ী করা যায়না। কারণ সারারাত নেশার ঘোর না কাটলে, তিনি কি করতে পারেন!

শরৎদা নিজেই এসব কথা আমাদের মত তরুণদের অসঙ্কোচে বলেছেন। অর্থাৎ শরৎদার জীবনে গোপনীয়তা কিছু নেই। সব জানালাই খোলা।

রাত্রি আরও গভীর হচ্ছিল। কিছু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

অমরবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দিন না একটা নিউজ করে—"মধ্যরাত্রে কলকাতায় প্রবল বৃষ্টি। কিংবা এই রকম কিছু একটা।'

আমি বললাম, 'না, ওটার কোন 'নিউজ ভ্যালু' নেই।'

শরৎদা চিরন্তন রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'তা থাকবে কেন? একটি বাড়ী ধ্বসে দশপনের জন মারা যাক্। দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে রেণ্টারী খামিয়ে একটা 'ডবল কলম' নিউজ ঢুকিয়ে দেবেন। পরের সর্বনাশ না হলে আপনাদের মশায় পৌষ মাস হয়না! যতো সব জার্নালিষ্ট!'

শরৎদা এক মুখ কৃত্রিম বিতৃষ্ণা নিয়ে চেয়ারে পা তুলে আরাম করে বসলেন।

এখন আবার বৃষ্টি নামছে। তার একটানা শব্দের মধ্যে একটা অলস, মধুর অনুভবের স্পর্শ পাচ্ছি আমরা। এ মুহূর্তে কোন কাজ নেই। অতএব শরৎদাকে আমরা আরও ঘিরে বসলাম।

শরৎদা মৃদু হেসে বললেন, 'আমার জীবন স্মৃতি? পেয়ারার আবার শক্ত বাড়ী! 'জীবন স্মৃতি হ'ল আপনাদের ঐ রবীন্দ্রনাথের।

এখানে বলে রাখা দরকার, শরৎদা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত নন; অন্ততঃ বাইরে সেইভাব দেখান। তাঁর মুখে মাইকেল আবৃত্তি শুনেছি, ডি. এল. রায়ের নাটকের শাজাহানের ভূমিকা শুনেছি. এমনকি বেয়াড়া বেসুরো গলায় নজরুলের গানও শুনেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কদাপি শুনিনি। শরৎদার মত হ'ল, তোমাদের ঐ 'রবীন্দ্রনাথ' বড্ড মেয়েলি, ওই "সখী ধরো ধরো মালা পর গলে" গোছের। শরৎদা ওসব মেয়েলিপনায় ধার ধারেন না।

চা এসে গেছল। জীবন স্মৃতির কথাটা আমরা আবার মনে করিয়ে দিলাম।

শরৎদার ঢুলু ঢুলু চোখে এবার সত্যি যেন ঘুমের নেশা লাগল।

শরৎদা শুরু করলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আপনাদের বয়স কত ছিল? দুর্ভিক্ষের বছর মনে পড়ে? মড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ চলেছেন সে সময়?

আমরা না বললাম।

শরৎদা একটু থেমে বললেন, তখন আমি একটা কাগজের সাব এডিটার। মাইনে যা পেতাম শুনলে মশায় হাসবেন। এখনকার পিওনরা তার চাইতে অনেক বেশি পায়। তা, সেই দুর্ভিক্ষের দিনে আমার নিজের সংসারে খেতে পাঁচজন। দুটি মেয়ে, একটি ছেলে, আমি, আমার স্ত্রী। ছিলাম কাকার বাসায়। কিন্তু আর বেশিদিন কাকার ঘাড়ে সংসারের বোঝাটা চাপিয়ে রাখা চলছিল না। খুড়ো বলেত তো আর সাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাবখের সংসার টেনে চলা যায় না সারাজীবন। ক্রমশঃ মনোমালিন্য বাড়তে লাগল। টাকা চাই, টাকা। নইলে সত্যি সত্যি না খেয়ে মরতে হবে। অতএব নিরুপায় হয়ে এইটাকার জন্যই একদিন হেষ্টিংস-এর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

অমরবাবু বলল, 'মানে?'

'মানে আর কিছু নয়, মিলিটারীতে নাম লেখালাম।'

আমরা একসঙ্গে কোরাসের মত চিৎকার করে উঠলাম, 'সেকি! আপনি যুদ্ধে গেছলেন!'

শরৎদা রীতিমত গাম্ভীর্য বজায় রেখে পাকা অভিনেতার মত শান্তভাবে বললেন, 'গেছলাম। চেহারাটা তখন ভালই ছিল। কাজেই—'

আমরা কথাটা লুফে নিয়ে বললাম, 'ছিল নয়, ছিল নয়, এখনো আছে।'

শরৎদা কোন মন্তব্য করলেন না। শুধু নিঃশব্দে একটু হাসলেন।

আমরা বুঝলাম, খুশি হয়েছেন!

'হাঁ, শুনুন। ইনটারভ্যু হয়ে গেল। চারদিন পরে এ্যাপয়েন্টমেন্ট হাজির। তিন মাস ট্রেনিং, তারপর সোজা ফ্রন্টে।'

'একেবারে ফ্রন্টে! অর্থাৎ গোলার মুখে, বোমার মুখে! মানে ডেথ সার্টিফিকেট পকেটে নিয়েই এগিয়ে যাওয়া বলুন?'

'হাঁ একরকম তাই। তবে ভগবানের ইচ্ছায় তেমন কিছু হয়নি! শুধু একবার—' বলেই শরৎদা হাসলেন।

আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। বোধ হয় এবার 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট' এর মত কোন কাহিনী শুনতে পাব।

শরৎদা আমাদের মানসিক অবস্থাটা বুঝে আস্তে আস্তে ছাড়তে লাগলেন। বললেন, 'না, কোর্ট মার্শাল হতে যাচ্ছিল। তবে নেহাৎ বাঙালীর বাচ্চা, তায় জার্নালিষ্ট।'

কোর্টমার্শালের গল্প শোনার জন্য ততক্ষণে আমরা হন্যে হয়ে উঠেছি।

শরৎদা বলতে লাগলেন, 'শেষ রাত্রে ট্রেন ছাড়ল হাওড়া থেকে। জানালার ধারে বসে বাংলা দেশের গ্রাম মাঠ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। অন্ধ সকলে ঘুমিয়ে আছে। এই দেশ, মাটি, আমার ছেলে, মেয়ে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কি ফিরে আসতে পারব। আশ্চর্য, আমি যে এদের এতো ভালবাসি, তা বুঝতে পারিনি। পারলে জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোনো চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন যে বড্ড দেরী হয়ে গেছে!'

শেষ রাতের দিকে এক জায়গায় ট্রেন থামল।

ষ্টেশনের নামটা পড়লাম 'রাজখরসোরান'। বাংলা দেশ বহু আগে ছেড়ে এসেছি। উঁচুনিচু ঢেউ তোলা মাঠ, আর ঘুরে ঘুরে সবুজ পাহাড়।

কয়েকদিন পরে বোম্বাই থেকে জাহাজে করে একেবারে নেপলস।

'সে কি একেবারে মুসোলিনীর দেশে?'

শরৎদা ধমক দিয়ে উঠলেন, সাংবাদিকের অতশত বাছবিচার চলেনা। স্থানয় থেকে হনলুলু সব সমান!' হাঁ, শুনুন, এক দিকে সমুদ্র, আঙ্গুরের ক্ষেত, পাহাড়। সুন্দরী মেয়েরা মিলিটারী ব্যারাকের কাছে আঙ্গুর বিক্রী করতে আসত!

বিমল টিপ্পনী কাটল, 'সেত আসবেই। তা আঙ্গুরগুলো টক নয় ত?' অমরবাবু বিমলকে থামিয়ে দিলেন।

তা আমার ছেড়ে আসা ছেলে মেয়ের মুখ মনে পড়ত। চোখে জল আসত তখন। মিলিটারী জীবন কিছু দিনের মধ্যে অভ্যাস হয়ে আসছিল। কিন্তু মনকে ত আর ট্রেনিং দিয়ে বশ করা যায়না। মাস কয়েক যেতেই আমি বাড়ী ফেরার জন্য পাগল হয়ে উঠলাম। আর কিছুতেই থাকতে পারছিলাম না। সেকী যন্ত্রণা, ব্যথা, আপনাদের বোঝাতে পারবনা। কিন্তু কোন উপায় নেই। 'নো ওয়ে আউট'। পালিয়ে গিয়ে ধরা পড়লে কোর্ট মার্শাল। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হবে। একটা মাত্র বুলেটের শব্দ হবে।

তারপর ব্যস্। সব খতম! রইল তোমার ছেলেমেয়ে বৌ। তাছাড়া আর পাবার কোথায় বলুন? অচেনা দেশ অচেনা পথঘাট। না, সে চিন্তা আবোলতাবোল! ওদের কথা ভেবে, ওদের মুখ মনে করে অসহায়ের মত শুধু নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম। শেষকালে একদিন হাসপাতালে গিয়ে হাজির। টিকিট করে বসে আছি। একে একে নাম ধরে ঘরে ডেকে নিচ্ছে, মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্যে। আমার পালা এল। আমি ঘরে ঢুকতেই একজন ডাক্তার ইংরেজীতে বলে উঠলেন, 'আপনি ত বাঙালী।'

স্যালুট করে বললাম, 'হাঁ স্যার',

'ভেরিগুড? কলকাতা থেকে?'

'বিশ্বাস করুন আমি যেন বাঙলা দেশের মাটির ছোঁয়া ফিরে পেলাম!'

'কি, অসুখটা কি?

অসুখের কথাটা বানিয়ে বানিয়ে বললাম।

মেজর আমাকে পরীক্ষা করলেন, 'না, কিছু হয়নি আপনার'।

আমি হতাশ হলাম। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, একটা বড় অসুখ বিসুখ হলে বেঁচে যেতাম। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয়না।

ফিরে আসছিলাম। মেজর আবার ডাকলেন।

'এই আমার কোয়ার্টার নাম্বার। সন্ধ্যায় আসুন গল্প করব।'

সেইদিনই সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি, মেজর আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। দুটো ইজি চেয়ার দক্ষিণের দিকে মুখ করে পাতা। টেবিলে বীয়ারের বোতল, দুটো গ্লাস।

মেজর বললেন, 'কোলকাতার কোথায় থাকতেন?'

'বৌবাজারে।' মেজরকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনার বাড়ী?'

'কালিঘাটে।'

'কদ্দিন মিলিটারীতে এসেছেন?'

'পাশ করার পরে। নাইন্টিন থার্টি এইট'-এ'।

'কে কে আছেন বাড়ীতে?'

'মা, বাবা, ভাই বোন সবই।'

'আচ্ছা, আপনার মন খারাপ হয়না?'

মেজর একটু কি যেন ভাবলেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'মার কথা মনে হয়। তবে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে ছুটিতেও গেছলাম।'

'কিন্তু একটা কথা, মেজর, যুদ্ধে এলেন কেন? অন্যকোন চাকরী?'

মেজর কিছু বললেন না। দূরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ অন্য কথায় ফিরে গিয়ে বললেন, 'আচ্ছা মিঃ চক্কোত্তি, রবীন্দ্রনাথের 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' বলে একটা গান আছে। কথা গুলো মনে আছে আপনার? আপনিত জার্নালিষ্ট ছিলেন। আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি নে।'

বুঝলাম মেজরের জীবনে ভালোবাসার ব্যর্থতার কোন কাহিনী হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে।

মেজর বললেন, 'বড়ো ভালো লাগল মিঃ চক্কোত্তি, কত দিন বাংলা কথা বলিনি, বাংলা দেশ দেখিনি।'

ধীরে ধীরে সংকোচ কেটে যাচ্ছিল। ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলাম। বুঝতেই পারছেন, গল্প করার

আগুন পেলে শরৎ চক্কোত্তি কী মাল হয়ে দাঁড়ায়! একসময় সাহস করে বলে ফেললাম কথাটা! 'স্যার যদি কোনভাবে মিলিটারী থেকে ছাড়া পাইয়ে দেন আমাকে? ছেলে মেয়ে ছেড়ে থাকতে পারছিনা। ওদের মুখ মনে পড়লে চোখে জল এসে যায় আমার! প্লীজ, যদি একটু হেল্প করেন আমাকে।'

মেজর গম্ভীর গলায় বললেন, 'অসম্ভব।'

'একটু দয়া করুন স্যার। আপনি আমার কলকাতার মানুষ। কার কাছে এ দুঃখের কথা বলব, আপনি বলুন? কে আছে আমার এখানে?'

'এসেছিলেন কেন মিলিটারিতে?'

'পেটের জন্য স্যার, একেবারে পেটের জন্য। আপনি কি বাংলাদেশের কেমিন-এর খবর শোনেন নি? যুদ্ধে না এলে হোম ফ্যামিলি না পেয়ে মরত।

'আই সী!

শরৎদা বললেন, হাওয়া কিছু অনুকূল দেখে আমি 'ফিনিশিং টাচ দিয়ে দিলাম। মেজরের হাতদুটো জড়িয়ে ধরে একেবারে কেঁদে ফেললাম।

মেজর বললেন, 'এই জন্যই সেদিন হাসপাতালে এসেছিলেন? বুঝতে পেরেছি তখনি।'

'একটু দয়া করুন স্যার।'

মেজর অনেকক্ষণ কি ভেবে বললেন, 'অলরাইট, আপনাকে আমি 'সিক' বলে হাসপাতালে একটা 'সীট' করে দিচ্ছি। একটু চেষ্টাও হবে। তদ্দিনে ভেবে দেখি, আপনিও একটা ট্রাই নিয়ে দেখুন। অভিনয় টভিনয় করতে পারবেন?'

আমার বুকে সাহস আসছিল। কলেজ জীবনে ত রাম থেকে রাবণের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। বললাম—'তা পারব।'

আসার সময় বললেন, 'অল রাইট, ঐ কথা রইল। আমি একটা 'সীট' ম্যানেজ করে দিচ্ছি বাকিটা আপনি ম্যানেজ করুন, যদি পারেন।'

ক্ষীণ আশা নিয়ে ব্যারাকে ফিরে এলাম।

শরৎদা থামলেন।

টেলিপ্রিন্টারে কোন সীরিয়াস খবর আছে কিনা, আমি দেখে এলাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে বাইরে থেকে। সারাদিনের দুর্ধর্ষ বাগবাজার স্ট্রীট, এখন কেমন শান্ত হয়ে শুয়ে আছে।

শরৎদা বললেন, 'ক্যান্টিন থেকে গরম গরম ভেজিটেবল চপ আনান ত।'

অমর বাবু আমাকে ডাকলেন, 'কি হল মশায়, আসুন। শরৎদা যে হাসপাতালে যেতে পারছেন না।'

শরৎদা আবার বলতে লাগলেন, 'বেশ কয়েকদিন পর হাসপাতালে শুয়ে আছি। সিনটার শিখিয়ে দিয়েছে, সারাদিন যাই করুন, বড় ডাক্তার যখন আসবেন সন্ধ্যা সাতটায়, তখন কিন্তু শুয়ে থাকবেন।'

বিমল বলল, 'শরৎদা খেই হারিয়ে ফেলেছি যে আমরা। সিনটারটিকে যোগাড় করলেন কোত্থেকে?'

[illegible]

বিমল খাবড়ালো না। বলল, 'সেত থাকবেই। আমার কথা হল, সিসটারই বা আপনার সম্পর্কে এত 'ইনটারেষ্ট' দেখাতে গেল কেন? ওইখানেই কিছু কিছু 'ফাক্টস্' গোপন থেকে যাচ্ছে না?'

শরৎদা চিরন্তন বুদ্ধের হাসি হেসে বললেন, 'বিমলটার ব্রেন বড় শার্প। হতভাগা ধরেছে ঠিক। ওইখানেই একটু, কি বলে যেন, আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং হয়েছিল।'

বিমল লাফিয়ে উঠল, 'সেইটিই বলুন শরৎদা নয়ত সব মার্ডার হয়ে যাচ্ছে যে! অমন আঙুরের থেপ, অমন সব সুন্দরী তরুণীদের মিলিটারী ব্যারাকের কাছে ভীড়! আর আপনি কলকাতায় এমন পরম রসিক পুরুষ!'

শরৎদা মুচকি মুচকি হাসছিলেন। বললেন, 'হ'ল কি জানেন, সারা ওয়ার্ডে কেউ এক অক্ষর ইংরেজী বুঝত না, জানতনা। সেই এরও কুলের মধ্যে আমি, অর্থাৎ এই মিঃ চক্কোত্তি-ই একমাত্র বনস্পতি। তাই দু'দিন না যেতেই ভাব হয়ে গেল মেয়েটার সঙ্গে। সে বেচারা এসেছে খাস লণ্ডন থেকে। ইংরেজী ছাড়া আর একবর্ণ কিছু বোঝে না। আর ওয়ার্ডসুদ্ধ আপনাদের বাট্টুলংঘের হাট। তাই আমি হলাম, তার 'ইণ্টারপ্রীটার'।'

বিমল বলল, 'সে আমরা ঠিক বুঝেছি। 'ইণ্টারপ্রীটার' 'টেলিপ্রিণ্টার' যাই হ'ক আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিংটা কেমন কেমন চলছিল সেইটাই বলুন।'

শরৎদা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না তেমন কিছু নয়। 'মাইণ্ড' বলছি। আসলে বাড়ীর জন্ত বড্ড মুষড়ে পড়েছিলাম। তা এই সামান্ত, কি যেন বলে, একটু ভালোলাগা। 'গুরুদের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা, অকারণে কাছে এসে…'

বিমল বলল, 'আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই শরৎদা, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের।'

অমরবাবু তাল সামলাতে উঠলেন। 'থাক্, থাক্ হয়েছে। বিমলবাবুর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, শরৎদাকে ক্ষেপানো শুধু। তারপর বলুন, শরৎদা। সেই সিসটার'—

শরৎদা বিমলের দিকে আর একবার কটমট করে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'সিসটার বলল, চক্কোত্তি, ইউ কাম ফ্রম ইণ্ডিয়া। 'হাত দেখতে পার?'

আমি বললাম, 'কেন পারবনা। ওয়াজ ইট ওয়াজ মাই প্রফেশন।'

চোখের সামনে সেই সুন্দর হাতটা মেলে ধরল সিস্টার। কী করুণ দীর্ঘ দীর্ঘ আঙুলগুলি। আমার করুণ হাতটা বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলাম, একরাশ সোনালীর পাপড়ির ওপর যেন আমি হাত রেখেছি। বিশ্বাস করুন, একটা যেন মিষ্টোল পরাবলী।'

আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, শরৎদা কেমন করে কবি হয়ে উঠছে!

সিস্টার বলল, 'ইউ সী মিঃ চক্কোত্তি, আমার বয় ফ্রেণ্ডকে ছেড়ে এসেছি লণ্ডনে। আর ইউ শিয়োর, সে অন্ত কোথাও এনগেজড হয়নি?'

শরৎদা বললেন, 'আমি হাতটার এদিক ওদিক বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। বললাম, 'নো, নো ডাট ইজ নট পসিবল। তোমাকে ছেড়ে কোথাও সে যাবেনা। ভেরি সীনসিয়ার বয়। ইউ আর সো লাকি সিস্টার!'

'থেনি থ্যাংকস, মিঃ চক্কোত্তি, থেনি থ্যাংকস। তোমাকে খুব 'ট্রাবল' দিলাম তুমি চলে গেলেও সিওরলি আই উইল রিমেমবার ইউ।

সিস্টার চলে গেল। আর আমার চোখের সামনে থেকে যেন বিকেলের সব রোদটুকু এক নিঃশ্বাসে মুছে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ফেলে গেল আমাকে।'

শরৎদা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললেন, 'হুঁ। শুনুন! কদিন পর রাত্রে প্রচণ্ড চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখি, আমার বিছানার চারধারে বিচিত্র সব পাগলের ভীড়। কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে, অবোধ্য ভাষায় কেউ গান গাচ্ছে। কেউ সম্পূর্ণ দিগম্বর। প্রথমে মনে হল, আমি স্বপ্ন দেখছি। তারপর নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলাম। ব্যথা লাগছে। অর্থাৎ আমি জেগে আছি। ওরা ক্রমশঃ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়বে আমার ওপর। আমি ভয়ে গায়ত্রী জপ করতে লাগলাম।

এমন সময় পশ্চিম কোণ থেকে এক পাগল পাঠানের হুঙ্কার শোনা গেল। 'খুন করেঙ্গে, সবকোই খুন করেঙ্গে শালা'—বলছে আর লাথি মেরে এক একটা খাট উল্টে দিচ্ছে। বিশ্বাস করুন, লোকটা প্রায় লম্বায় ছ'ফিট। ইয়া পালোয়ান। এমন তাগড়াই পাগল বাংলা দেশে দেখতে পাওয়া যাবেনা। গায়ে যেন মত্ত হাতীর জোর। লাথি মেরে খাটগুলো উল্টাতে উল্টাতে, ফুঁসতে ফুঁসতে আমার খাটের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। ততক্ষণে অন্যান্য পাগলগুলো সব সরে পড়েছে। আমি ছেলে মেয়ের মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করছি। বুঝেছি, আজই শেষ! ঐ পাগলের এক লাথিতেই ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে যাব। হুঁ। আর তিনটে খাট, মাত্র বাকি! এবার দুটো এবার একটা . এবার··· !

লোকটা আমার খাটের কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি! হঠাৎ একটা শান্ত গলা শুনতে পেলাম। লোকটা ভাঙা ভাঙা উর্দুতে বলল, 'কোই ডর নোই বাবুজী। ও শালা পাগল লোগোঁ কো একদম ভাগা দিয়া। তুমিসে, আপকা মাফিক হুমাডি পাগলা নেহি। ঘর যানে মাংতা, বাল বাচ্চাকোঁ দেখনে মাংতা। আউর কুছ নেই মাংতা বাবুজী। আউর কুছ নেই মাংতা বাবুজী, আউর কুছ নেহি।'

আমি তাকিয়ে দেখলাম, সেই দুর্ধর্ষ পাঠানের দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ছে।

শরৎদা অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারছিলেন না। আমরা বুঝতে পারছিলাম, আর যাহোক এ গল্পটা পুরো বানানো নয়।

যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত শরৎদা আবার শুরু করলেন। পরদিন সিসটার কে বললাম, 'এখানে থাকলে আমি সত্যি মরে যাব। একটা কিছু ব্যবস্থা যদি করে দিতে পারো। অন্ততঃ অন্যকোন ওয়ার্ডে ট্রান্সফার।'

সিসটারের মুখে হতাশার ছায়া। মিঃ চক্কোত্তি মেন্টাল ওয়ার্ডে আর যে কোথাও জায়গা নেই। ইউ আর টু লেট হিয়ার। নো অলটার নেটিভ'।

আমি বললাম, 'তবে কি হবে সিসটার? এখানে থাকলে আমি মরে যাব! আই মাষ্ট ডাই।'

'ভেবে দেখব মিঃ চক্কোত্তি, ইফ দেয়ার ইজ এনি ওয়ে আউট।'

কিন্তু 'আউট' হয়ে যাওয়ার মত কোন রাস্তা আর চোখে পড়ে না। প্রতিরাত্রে সেই পাগলদের জলসা সুরু হয়। মনে হচ্ছে আমিও বোধ হয় একদিন এদের মত সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাব! নার্ভ আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

সেদিন সিস্টার দৌড়তে দৌড়তে কাছে এসে বলল 'ভেরি ব্যাড নিউজ, মিঃ চক্রোত্তি, ভেরি স্যাড নিউজ।' মেজর জেনারেল হসপিটালে ভিজিটে আসছে। রিপোর্ট গেছে, 'ফলস' পাগল থেকে এখানে নাকি বহু ম্যালিংগারার' আছে। বি কলাস। হি ইজ এ ভেরি, ভেরি ক্রেভার ম্যান। ধরা পড়লে কোর্ট মার্শাল। নির্ঘাৎ গুলী করে মারবে।'

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল আমার। এতদিন তবু পাগলদের সঙ্গে বড়জোর পাগল হয়ে যেতাম। এবার আর কোন উপায় নেই। গুলিতেই প্রাণটা যাবে।

সিস্টার আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। বলল, 'বাট মিঃ চক্রোত্তি হি ইজ ভেরি স্পিরিচুয়াল মাইণ্ডেড।'

আমি তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'মানে ঈশ্বর বা তোমাদের 'গড' এসবে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে বোধহয়। খিসিটালীর মধ্যে ত এসব দেখা যায় না!'

'নো, নো। মেজর জেনারেল প্রতি রবিবার চার্চে যায়। প্রেয়ার করে। বাট এক্সট্রিমলি ফ্রিক।'

দেখতে দেখতে সেই দিনটাও এসে গেল। একটু আগে সিস্টার এসে বলে গেছে অফিসে পেসেন্টদের লিস্ট দেখা হচ্ছে, মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখা হচ্ছে।

আমার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। আমি যেন ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি।

চোখ দুটো বাঁধা। দুটো হাতও পেছন মুড়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ঘাতক সোলজারটি বন্দুকের নিশানা নিয়ে টিগারে আঙুল রেখে শুধু অপেক্ষা করছে। একবার, একবার মাত্র হুইশল বাজবে। তারপর প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে একটা উত্তপ্ত কিছু বুকের মাঝখান দিয়ে ভেদ করে চলে যাবে। আমি ঘাড় ভেঙে পড়ে যাব। জামার উপর কিছুটা লাল রক্ত ছুইয়ে উঠবে। শুধু গুলীর আগে একবার ছেলেমেয়ের মুখগুলি মনে করতে চেষ্টা করব। হয়ত পারব না। কিছুতেই পারবনা।

একতালে অনেকগুলি ভারি জুতোর শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। এই এসে পড়েছে! আর সময় নেই। মৃত্যু, তোমাকে বড় কাছ থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি। কোনদিন ঈশ্বরকে ডাকিনি, জীবনে বহু অত্যাচার করেছি, বহু অন্যায় করেছি। আজ তার শেষ বিচারের দিন। হে ঈশ্বর, দয়া কর, দয়া কর!

হোয়াটস য়ং?

একটা অচেনা গলার শব্দ। শব্দটা মৃদু, কিন্তু তা শুনে শরীরের সব রক্ত জমাট বেঁধে আসছে। একবার একটু মিটমিট করে তাকিয়ে দেখলাম, একটা দৈত্যের মত মানুষ। চোখ দুটো যেন কামানের গোলা। হাতে ছোট একটা ব্যাটন। একজন পেসেন্টের পেটে খোঁচা মারছে, আর টেনে টেনে বলছে, 'হোয়াটস য়ং।'

একবার বলল, 'টু বি এপীয়ার্ড বিফোর দ মেডিক্যাল এক্সপার্টস বোর্ড।'

ক্রমশ দৈত্যটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। পেছনে সেই বাঙালী মেজর আর ইংরেজ সিস্টার। আরও অফিসার কয়েকজন। আমি বুঝতে পারছি আমার ঘাটের কাছে এসে দাঁড়াল। আমি হাত পা ছড়িয়ে চোখটোখ উল্টে মড়ার মত শিবনেত্রে পড়ে আছি।

একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে মেজর জেনারেল সেই গলায় বলল, 'হোয়াটস য়ং?'

'একদম পাগল, স্যার!'

'আই সী। ইউ মীন, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং ?'

অমরবাবু, বিমল, আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠছি। মনে হচ্ছে, দিস প্লেট সরিয়ে নেওয়া, ট্রেন লাইনের প্রান্তে এসে যেন ট্রেনটা দাঁড়িয়েছে। এক মুহূর্তের মধ্যে এবার আকাশ কাটানো শব্দ করে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

শরৎদা গম্ভীর গলায় বলল, 'কমুনিকেটিং উইথ ফ্রেন্ড সোলদ।'

'হোয়াট ?'

বুঝতে পারছি মেজর জেনারেল ভয়ে আঁতকে ছুপা পিছিয়ে গেল।

মেজর বলল, 'ভেরি একিউট কেস'।

'ইয়েস, কেস অব রিপ্যাট্রিয়েশন। যেমে পাঠিয়ে দাও ওকে। .ভরি স্যাড, ভেরি স্যাড'। ইণ্ডিয়ানরা এসব মিওরফিক্যাল ব্যাপার করে থাকে জানছি। 'বার্থ'-এর আগের কথাটথাও নাকি বলতে পারে। 'ভেরি ট্রেঞ্চ ভেরি ট্রেঞ্চ কাট্টি।'

শরৎদা থামলেন।

আমরা চিৎকার করে উঠলাম, 'তারপর ? তারপর ?'

শরৎদা বুদ্ধদেবের হাসি হেসে বললেন, 'সাতদিন পরেই জাহাজ। একেবারে বোম্বাই। বোম্বাই থেকে কলকাতা ফার্স্টক্লাসে। সঙ্গে একজন এ্যাটেনডেন্ট, আপ টু ক্যালকাটা।'

বিমল কিছুতেই খুশি হচ্ছিল না। বলল, 'শরৎদা সেই সিস্টার এর কি হ'ল ?'

শরৎদা বিরক্ত হওয়ার ভাণ করল, 'এই তোমাদের দোষ। রোমান্স ছাড়া, এই 'লভ' টভ ছাড়া আর কোন গল্পই শুনতে চাওনা। আশ্চর্য !'

বিমল বলল, 'ঠিক তা না। মানে, আসার সময় কি বলল সিস্টার ?'

শরৎদা বললেন, 'মেজরের কাছে বিদায় নিয়ে জাহাজে উঠতে যাচ্ছি। দেখি একধারে সিস্টার চুপকরে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ছোট্ট বাক্স। আমাকে দেখেই, হাত দুটো জড়িয়ে ধরল আমার। 'মিঃ চক্কোত্তি এটা তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে যাও। এ ভেরি 'হাম্বল প্রেজেন্টেশন' কর দেম।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'তোমার ঋণ কখনো ভুলব না সিস্টার। তুমি যে উপকার করেছ আমার।'

সিস্টার আমাকে বাধা দিয়ে বলল, 'ও নো, নো, মিঃ চক্কোত্তি ! কাল ডানিয়েলের চিঠি পেয়েছি। কি লিখেছে জান ? সে আমাকে ছাড়া জগতের আর কোন মেয়েকে ভালোবাসেনা, ভালোবাসতে পারে না ! সে আমার জন্য কী না করতে পারে ! "হি উইল ক্রল টু মী অন হিজ নীজ ফ্রম দ্য এণ্ড অব দ্য আর্থ"—পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সে আমার জন্য বুকে হেঁটেও যেতে পারে ! মিঃ চক্কোত্তি, হাউ ইওর ব্লীডিং ইজ করেই !' সিস্টার চিঠিটাকে চুম্বন করে বুকে চেপে ধরল।

জাহাজের শেষ সিটি বাজল এবার। আমাদের উঠতে হবে। সিস্টার একটু এগিয়ে এসে থামল। আর যাওয়া যাবে না। সমুদ্র। ওখান থেকেই সিঁড়িটা ক্রমশঃ এগিয়ে গেছে বোটের দিকে।

যেতে যেতে আমি একবার ফিরে তাকালাম। তখনো সিস্টার তার রুমালটা নাড়ছে। বিদায় !

বিদায়! আর কখনো আমাদের দেখা হবে না। কেউ কারুর খবর পাব না। তবু এই দুদিনের পরিচয়, এই ক্ষণিক আতিথ্য।'

শরৎদা হঠাৎ থেমে তারপর বললেন, 'মাঝে মাঝে ওর কথা মনে হয়। জানেন? সেই মনে হওয়াটা কান্নার মত!'

আমরা দেখলাম শরৎদার চোখ দুটো নতি। জল ছল ছল করছে। খুব বড় কষ্টে চোখের জল চেপে রেখেছেন শরৎদা। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে দরজার দিকে এগোতে লাগলেন। পতনোন্মুখ ধূর্তিটা বাঁ হাতে ধরা আছে। আপন মনে কী সব বলছিলেন? শোনা যাচ্ছিল না।

রাত্রি এখন তিনটে। বৃষ্টি সেই কখন থেমে গেছে। কলকাতার আকাশ এখন শিশুর অশ্রুর মত শান্ত। কাছে কোথাও কোন শব্দ নেই। প্রতিদিনের আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের অন্ধ গলিটাকেও এখন যেন ঠিক চেনা যাচ্ছেনা। শুধু আমরা কজন জেগে আছি, আর জেগে আছে টেলিপ্রিন্টারটা, অমানুষিক ধৈর্যের সঙ্গে দূরের পৃথিবীর খবর পৌঁছে দিচ্ছে সে।

দেখলাম, শরৎদা অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন, আকাশের দিকে তাকালেন একবার। ইটালি সেই শান্ত সমুদ্র, সিসটার, সব এখন দূরত্বের ধূসরতায় আবৃত বিষণ্ণ সুর ছাড়া আর কিছু নয়!

রাত্রিটা ক্রমশঃ নিঃশব্দে ভোরের দিকে এগিয়ে চলেছে!

———

মন যেতো যেথা ছুটে

নরেন্দ্র দেব

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আমাদের পাড়ার সমবেত চেষ্টায় ইয়ং ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্য সংখ্যা মাসতিনেকের মধ্যেই বেশ বেড়ে উঠেছিল। সন্ধ্যে না হতে হতেই জমায়েৎ হতেন তাঁরা অনেকেই। উৎসাহও সকলের খুবই ছিল। কিন্তু, চাঁদা সেই যে প্রথম মাসে ঢোকবার সময় চার আনা দিয়েছিলেন, তারপর আর কেউ উপুড় হস্ত হননি। তাগাদা করলেই বলেন মাসকাবারে দেব। এদিকে বাড়ীওয়ালার তাড়ায় তাগাদায় আমরা অস্থির। সকলেই তো নাবালক। বয়স কারুরই ১৬।১৭ বছরের বেশি নয়। সবে গোঁফের রেখা দিয়েছে। দাড়ি তখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

"ভাড়া আসছে সপ্তাহে মিটিয়ে দেবো। মাসকাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। একেবারে দু'মাসের একসঙ্গে পাবেন।" বাড়ীওয়ালাকে রোজই বলি।

বাড়ীওয়ালা বিরক্ত হয়ে বললেন "ভাড়া বাকি পড়েছে তিনমাসের। দু'মাসের বিলে তো আমি নেব না। তোমরা বাপু ঘর ছেড়ে দাও—"

আমরা ভয় পেয়ে বললুম "আচ্ছা। তিন মাসেরই চুকিয়ে দেবো। একটু সময় দিন। ভয় নেই। আমরা পালাবনা।"

ঘর কি তখন ছাড়া যায়? আড্ডা জমে উঠেছে জোর। সন্ধ্যার সময় ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে উঠতো। আমরা রোজ ক্লাবের দরজা খুলে দোকানদারদের মতো সন্ধ্যে জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ধূপ প্রজ্বালন দিতুম। বিশ্বাস থাক বা না থাক প্রথাটাকে কিন্তু মেনে চলতুম। সেদিনও আমরা ছেলের দল সদাচার বর্জিত হইনি। পথে যেতে দেবমন্দির দেখলে প্রণাম করতুম।

সপ্তাহ পার হয়ে গেল। চাঁদা চেয়ে চেয়ে কারুর কাছেই সময়ে আদায় করতে পারলুম না। বাড়ীওয়ালাকে মুখ দেখাবো কেমন করে? ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যে নাগাদ ক্লাবে গিয়ে দেখি ঘরে চাবি ঝুলুপ দেওয়া নেই। দরজা খোলা। ভাবলুম,আমার আগেই হয়ত কেউ এসে বাড়ীওয়ালার কাছে চাবি চেয়ে নিয়ে দরজা খুলে বসেছেন। কিন্তু, ঘর অন্ধকার কেন? দেশলাই নেই বলে বোধহয় আলো জ্বালতে পারেনি। ও বোধহয় জানেনা 'হায়রোনিয়ামে বাঁয়া-তবলা তোলা থাকে যে তাকটায় তারই ওপরের তাকে তাসের প্যাকেটের ওপরে দেশলাইটা আছে। তখন সুইডেনের দেশলাই চলতো খুব। সিকি দুয়ানি ধরণের মার্কা ওয়ালা 'ট্রাংগুইলার ম্যাচ' একপয়সায় দুটো পাওয়া যেতো। এখন ভাবি সে এক পায়েস্তা খাঁর যুগ গেছে। এখন দেশলাইয়ের দাম সেদিনের সন্দেশের চেয়ে বেশি।

'ঘরের ভেতর কে?' সাড়া নিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকলুম। কেউ সাড়া দিলেনা। এমন সময় 'বুড়ো'

এসে পড়লো। 'বুড়ো' হ'ল প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ডাক নাম। সে তখনই 'chained smoker'. ধ' করে পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে জেলে ফেললে।

দেখা গেল ঘরে কেউ নেই।

শুধু কেউ নেই নয়। কিছুই নেই! কতযুগে কেনা আমাদের 'সতরঞ্চি' 'হারমোনিয়াম', 'বাঁয়াতবলা', 'মন্দিরা' 'তাসের প্যাকেট,' 'পাশার ঘুঁটি ও ছক,' আর ডিটক লণ্ঠনটা পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে! পড়ে আছে শুধু খানকতক টিকে আর মাটির ধুনুচিটা!

ক্লাবের দরজায় যে তালা-চাবি লাগানো থাকতো সে আমাদেরই কেনা। তারও পাত্তা নেই! একখানা 'Toilet' লেখা বোর্ড ঝুলছে পাশে।

বুঝতে বিলম্ব হলনা যে এ রাহাজানি বাড়ীওয়ালারই কাজ। তিনমাসের পনেরো টাকা ভাড়া পায়নি বলে আমাদের প্রায় পঞ্চাশ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। একি অন্যায় জুলুম!

ইতিমধ্যে আরও অনেক সহস্য এসে পড়েছে। পান্থির মাঠের সেই 'ভীম' আর 'সদাই' বাবের আমরা 'ভীমের গদা' বলতুম তারাও এসে পড়লো। সব শুনে ওরা বলে 'ব্যাটাকে মারবো! মেরে খুন করে ফেলবো।

এ তারা পারতো। কিন্তু তারপর? থানা পুলিশ, হাতকড়ি, হাজত, ফৌজদারী মামলা সামলাবে কে? সব চেয়ে বড় বিপদ তো বাড়ীতে জানাজানি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমরা আর কী করতে পারি? সবাই যে তখনও নাবালক। একে অল্পবয়স, তার ওপর বোমপারী নই কেউ। একান্নবর্তী পরিবারের ছোটেলে খাই। চেয়ে চিন্তে নানা উপায়ে চাঁদা সংগ্রহ করে যে 'ইয়ং ড্রামাটিক ক্লাব' আড্ডাটি মহা উৎসাহে শুরু করা হয়েছিল, হঠাৎ স্বপ্নের মতো তা শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে দেখে আমাদের যে মর্মান্তিক কষ্ট হয়েছিল কিশোর দিনের সে আঘাত মনে পড়লে এখনও মন টন্‌টন্ করে ওঠে।

গদা ভীমের দল বাড়ীওয়ালার উদ্দেশে বেশ একটু চ্যাঁচাই-মাচাই শুরু করেছিল বটে, কিন্তু, বাড়ী-ওয়ালা উপরের জানালা থেকে কর্কশ কণ্ঠে যেই বলেছে—"দাঁড়া হারামজাদারা! থানায় খবর পাঠোচ্ছি। পুলিশ পাহারাওয়ালা ডেকে সব বেটাকে ধরিয়ে দেবো।"

ব্যাস! একেবারে বোঁকের মুখে নুন! মুখ চুন করে আমরা সবাই পালিয়ে এলুম। 'ক্লাব' খুলে গান বাজনা অভিনয় আর 'আড্ডার' সখ এমনি শোচনীয় ভাবেই সমাপ্ত হল। পান্থির মাঠের দল আবার মাঠেই চরতে ফিরে এলো। কিন্তু, জেঠোটোলার সেই বাড়ীওয়ালার ওপর আমাদের রাগ বহুদিন ছিল কতরকম পলাপরামর্শ করা হয়েছিল লোকটাকে কীভাবে জব্দ করে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে শেষপর্যন্ত কোনও ইঁদুরই সাহস করলেনা।

পান্থির মাঠের আড্ডা আর কিন্তু জমলো না। 'বুড়ো' ওরফে প্রেমাঙ্কুর গুনলুম বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে। সেই ছিল আড্ডার প্রাণ! গদা-ভীম আরও বদলে আড্ডার সন্ধান পেয়েছিল। কাজেই মাঠে তারা প্রায়ই অনুপস্থিত। ভংলী মুংলী অর্থাৎ প্রভাত গাঙ্গুলী ও তার দাদা ক্রমেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্বেচ্ছাসেবকের কাজে ঢুকে পড়ায় তারাও সবদিন আসেনা। আমি আর আমার জ্যাঠতুতো ভাই 'কালো' যার নাম 'অমর দেব' পান্থির মাঠের আড্ডার নিয়মিত সভ্য ছিলুম। কিন্তু, ফাঁকা মাঠ দেখে প্রায়ই ক্রিয়মান চিত্তে ফিরে আসতে হত।

ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজে দেশপ্রেমিক সতীশ মুখোপাধ্যায় 'Dawn Society' খুললেন সিষ্টার নিবেদিতার উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়ে। আমরা তখন নবীন উৎসাহী। মহানন্দে স্বেচ্ছাসেবকের কা

নিলুম। কাজ অন্য কিছুই নয়, স্বদেশী জিনিস যা সতীশ বাবু ভারতের নানা প্রদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনতেন ভগ্নী নিবেদিতার অনুপ্রেরণায়, সেগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে নিজে মিলিয়ে নম্বর দিয়ে দাম লিখে রাখা ও খরিদ্দার এনে বিক্রয় করা। বিদ্যাসাগর কলেজের ছেলেরাও একাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন। কিন্তু খরিদ্দার কোথা? সেদিন সবাই বিলিতী জিনিসের ভক্ত। সিষ্টার নিবেদিতা মাঝে মাঝে সভা ডেকে ছেলেদের বোঝাতেন যে দেশের তৈরি জিনিস ব্যবহার করাই জাতির পক্ষে সম্মান জনক। তবু কিন্তু দেশী জিনিসের খরিদ্দার জুটতো খুবই কম। আমরা 'অনসোসাইটির' দোকানে বসে আড্ডাই দিতুম। অবশ্য নির্দোষ স্বদেশী আড্ডা। অর্থাৎ, রেলির বাড়ীর 'লাট্টু মার্কা' কাপড়ের কাছে বোম্বাই কটন মিলের কাপড় দাঁড়াতে পারেনা। না দামে না উৎকর্ষে। অবশ্য, আমাদের দেশের হাতীর দাঁতের, আর চন্দন কাঠের, আর কাশ্মীরের আখরোট কাঠের শিল্পের কাছে ওদের 'আবলুষ' 'ওক' বা 'ইবনী' দাঁড়াতে পারেনা।

আমার ছোড়দা রাজেন্দ্রদেব ছিলেন তখন বিদ্যাসাগর কলেজের চাত্র। স্বামীজীর পরম ভক্ত, ভগ্নী নিবেদিতার স্নেহভাজন ও 'অন সোসাইটির' সতীশবাবুর একান্ত গুণমুগ্ধ। তিনিই আমাদের 'অন সোসাইটির' স্বেচ্ছাসেবক কর্মী হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু, আমাদের বয়সী ছেলেদের কি ওই গুরুপাক স্বদেশী ভোজ হজম হয়? প্রায়ই পালাতুম আড্ডার সন্ধানে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের শুরু হতেই বেশ কিছু দিন হৈ হৈ করে কাটানো গেল। স্বদেশী গানের মিছিল নিয়ে পথে পথে ঘুরে এ মিটিং ওমিটিং-এ গিয়ে সুরেন বাঁড়ুয্যে, বিপিন পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতির ওজঃস্বিনী বক্তৃতা শুনে বেশ উত্তেজিত হয়েই বাড়ী ফিরতুম এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবো বলে মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করতুম।

আমাদের পাড়ার সতীশ বসুর কল্যাণে সুযোগও জুটে গেল। রামবাগানে অনুশীলন সমিতির এক শাখায় তাঁর নির্দেশমত যোগ দিলুম। প্রত্যহ অপরাহ্নে সেখানে আমাদের মতো আরও অনেক যুবক আসতেন। লাঠি খেলা তরওয়াল খেলা, ছুরি খেলা, গদকা প্রভৃতি খেলা শেখাতেন আমাদের শৈলেন দা। শুনেছিলুম তিনি পুলিনদাসের শিষ্য। ডন্, বৈঠক, কুস্তি, 'প্যারালাল বার' প্রভৃতি ব্যায়াম করা হ'ত। ব্যায়ামান্তে 'গীতমঠে' ও 'স্বদেশী গান' গেয়ে বেশ কিছুক্ষণ আনন্দে কাটতো। তারপর যে যার বাড়ী ফিরে লেখাপড়ায় মন দেওয়া। কিন্তু, মন বসবে কেন? কী উপায়ে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করা যায় এই পরামর্শেই সময় কাটতো। আড্ডার নেশা ক্রমে মাতৃভূমির মুক্তির নেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

আমার ছোট ভায়া, নাম তার নরেন্দ্রদেব—আমার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের ছোট! ডাক নাম ছিল তার "বিলে"। যদিও আমাকে 'দাদা' বলতো—কিন্তু 'তুই-তোকারি' করতো। দু'ভাই ছিলুম বন্ধুর মতই। দুষ্টুমীর পরামর্শও যেমন চলতো, সৎকাজের উৎসাহও তেমনি সমান ছিল দু'ভায়ের। বিলে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীদের দলে ভিড়ে গেল। আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়ায় বাবা মা আমাকে নিয়ে পশ্চিমে চেঞ্জে গেলেন হাওয়া বদলাতে।

বছরখানেক পরে ফিরে এলুম বেশ সুস্থ হ'য়ে।

ঢুকলুম অফিসে। এই সময় বেশ একটি মনোরম আড্ডা আমার জুটে গেল। 'বেকার গ্রে' অফিসের ক্যাশিয়ার অক্ষয় কুমার মিত্র। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতো আমার অফিস থেকে, তাদের গাড়ীতে। অক্ষয় খুব ভালো দামী সিগারেট খেতো। আমাকে [illegible]

ছুটতুম অক্ষয়ের বাড়ীতে। কালীতলা থেকে খুব কাছে। গৌরমোহন মুখার্জী লেনে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ীর পাশে। অক্ষয়ের ছোট ভাই 'হরি' ছিল আমার খুব অনুরাগী। আমার কাছে সে সাহিত্যের প্রথম পাঠ নিয়েছিল। কবিতা লেখা ও ছোট গল্প রচনার নেশা ছিল। আমার এ নেশা ছাত্রাবস্থা থেকেই।

আমার ও আমার ভাইয়ের আরও দুটি, দুটি কেন! চারটি বন্ধুর কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। চিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও অমৃত গোপাল চট্টোপাধ্যায় দুই ভাই! দু'জনেই পরে ইঞ্জিনীয়ার হ'য়েছিল। আর দু'জন হ'ল সিমলের মিত্তিরদের বাড়ীর ছেলে 'হাবলু' আর 'মান্তা'। এরা ছিল আমার আমার বন্ধু অক্ষয়ের যুড়ুতুতো ভাই। আমরা এই ছয়বন্ধুতে মিলে উঠোনে বাঁশ বেঁধে রঙীন কাপড় টেকে স্টেজ তৈরি ক'রে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত নাটক "সংগ্রাম সিংহ" অভিনয় করেছিলাম। সংগ্রাম সিংহের ভূমিকা অবশ্য আমিই নিয়েছিলুম। দর্শকে ছিল যত সব কিশোর আর শিশুর দল। বাঁধারিতে রাংতা মুড়ে তীর ধনুক ও তরওয়াল করেছিলুম। হাবলুর ভাল নাম বীরেন্দ্রনাথ মিত্র। সাহিত্যের প্রতি এর প্রবল অনুরাগ ছিল। বিশেষ ক'রে কাব্য সাহিত্যের ভক্ত ছিল সে। আমি কবিতা লিখতে পারি জেনে সে আমার খুবই অনুগত হয়ে পড়েছিল। বিহারীলাল, কামিনী রায়, অক্ষয় কুমার বড়াল প্রভৃতি কবিদের কাব্যগ্রন্থ কেনা তার একটা নেশার মতন ছিল। সিমলের মিত্তিরের বাড়ীর ছেলে। ধনী পরিবারের সন্তান। অর্থের সচ্ছলতা ছিল প্রচুর। সেও নিজে 'বেঙ্গল গ্লে' কোম্পানীর মুৎসুদ্দী হ'য়েছিল তার বাবা জ্ঞানেন্দ্র নাথ মিত্র অবসর নেবার পর। এরই একমাত্র কন্যার সঙ্গে ছায়াচবির অমর শিল্পী প্রমথেশ বড়ুয়ার বিবাহ হয়েছিল। শ্বশুরের বন্ধু বলে প্রমথেশ আমাকে একটু সমীহ করে চলতেন।

চিত্রগোপাল ইঞ্জিনীয়ার হলে কী হবে, আসলে সে ছিল—'জাত কবি'। তার পিতামহ বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীতকার ছিলেন। যার কৈশোরে শোনা একখানি গান আজও আমাদের কানে গুঞ্জন করে ফেরে—

"আমার মন ভুলালো যে, কোথায় আছে সে?
সে দেখে আমি দেখিনে, কিরে চাই আশেপাশে!
বল দেখিরে তরুলতা, আমার জগৎজীবন আছে কোথা?
তারে পেয়ে কসনে কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে!
ওগুরি ভ্রমরা করি গুণগুন, গাহিছ কি সেই গুণাকর গুণ—"

আর মনে পড়ছে না। হাতের কাছে বই নেই যে দেখে পাদপূরণ করে দেবো। চিত্রগোপাল আজ নেই। থাকলে সে বলে দিতে পারতো। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বন্ধুরা আজ আর কেউই নেই। আগেই বলেছি, আড্ডার আকর্ষণ আফিমের নেশার মতই সর্বনেশে। বিশেষ ক'রে "তাস-দাবা-পাশা"—লোকে বলে, "এই তিন কর্মনাশা।" তাস নিয়ে 'গ্রাবু খেলা,' 'বিস্তি খেলা,' গোলাম চোর,' 'খ্রীহেড্ড কোর,' 'ব্রে' এ সব উঠে গিয়ে শুরু হয়ে গেছে তখন প্রতি আড্ডায় "ব্রীজ" খেলা। 'পাশা' প্রায় উঠে যাবার দশা। 'দাবা' 'ঘ' সতরঞ্চ খেলাটা এখনও টিকে আছে। আমাদের সামনেই এলো 'ক্যারম বোর্ড' 'ব্যাগাটেলি'। 'বিলিয়ার্ড' অবশ্য ইংরেজের সঙ্গেই এসেছিল যেমন এসেছিল 'ক্রিকেট' 'ফুটবল' 'টেনিস্' 'ব্যাডমিন্টন', 'টেবিল টেনিস 'ভলিবল', 'হকী', 'পোলো', 'গল্ফ্' প্রভৃতি। আমাদের আড্ডা দেওয়ার নেশা ছিল যেমন জোর তেমনি খেলা দেখবার ঝোঁকও ছিল প্রবল, একথা আগেই বলেছি। 'ক্রিকেট' খেলা

দেখতে যাওয়া মানেই তো সারাদিন মাঠে বসে আড্ডা। ছোলা ভাজা, মটর ভাজা, চীনের বাদাম, চানাচুর ফিরুনো। সেমসেড আর চা খাওয়া।

এ খেলা দেখার নেশাটা বোধ করি—বংশানুক্রমিক সংক্রামক। কেননা, পরবর্তিকালে আমরা যখন খেলা দেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, তখন দেখেছি আমাদের ভাইপোরা, ভাগ্নেরা ছুটছে মাঠে ফ্লাস্কে চা নিয়ে বোতলে জল নিয়ে, টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে। আমাদের সময়ে কিন্তু এসব সুযোগ সুবিধার কথা আমাদের মাথায়ই আসত না। পরের জেনারেশানটা যে আমাদের চেয়ে অনেক ইনটেলিজেন্ট একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। আমরা উঠতি বয়সে খাও মারতে গিয়ে একাধিকবার ঠকেছি, কিন্তু, আমাদের ছেলেরা বেশ চালাক চতুর। তারা চোরেদের চাতুরী চট করে ধরে ফেলে।

আমাদের বাবা খুড়ো জাঠারাও প্রচণ্ড আড্ডাধারী ছিলেন। কিন্তু, তাঁদের আড্ডা ছিল পক 'ম'কারের। বৈঠকখানা বাড়ীর চেয়ে বাগান বাড়ীতেই জমতো সেটা বেশি। আমরাও হয়ত বয়সকালে ঐ পথেই যেতুম, কিন্তু, পূর্বেই বলেছি তো স্বামী বিবেকানন্দ আর ভগ্নী নিবেদিতার ভক্ত রাজেন্দ্র দেব—আমাদের সকলের প্রিয় 'ছোড়দার সাধু চরিত্রের প্রভাবে আমাদের জীবনের আদর্শ সৎপথের সন্ধানই যেছে নিয়েছিল। তা' ব'লে আমাদের মধ্যে ছুঁৎমার্গের কোনও গোঁয়ামী ছিল না। বহু বন্ধুই পরবর্তীকালে দুরন্ত যৌবনে কোনো 'ম' কারই এড়িয়ে চলতে পারেন নি। তা' বলে আমরা তাঁদের অনুসরণ করিনি, ত্যাগও করিনি। বন্ধুত্ব বরাবরই বজায় ছিল।

আমাদের চোরবাগানে যে "ক্রেওস্ ড্রামাটিক ইউনিয়ন" ক্লাবের নাম উল্লেখ করেছি আগে, সেই ক্লাবের সর্বাধিনায়ক নট ও নাট্যকার কৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে এসে মুক্তিরা ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড়ে 'বোস কোম্পানী' ভাক্তারখানার সামনে একটি নূতন দ্বিতল বাটি ভাড়া নিয়ে "কালকাটা ইভনিং ক্লাব" নাম দিয়ে একটি উচ্চাঙ্গের 'আড্ডা' প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। খবর পেয়েই আমি আর কালো (অমরেন্দ্রদেব) ঢুকে পড়লুম সেখানে।

অবশ্য আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এখানে নাট্যবিভাগে আমরা এইবার থিয়েটার করবার সখ মেটাতে পারবো। তখন আর অভিভাবকদের কোনও ভয় ছিলনা। কারণ, আমরা দু'ভাইই তখন রোজগারী ছেলে। আমি এক অফিসে ঢুকেছি। কালোও এক অফিসে ঢুকেছে। নেশাভাঙ্ করিনি। বদখেয়ালি নেই। সুতরাং বাড়ীতে সাতখুন মাফ্!

'ইভনিং ক্লাবের' পরিচয় একটু দিই, নইলে এই আড্ডাটি কোন শ্রেণীর ঠিক হয়ত বোঝা যাবেনা। এ ক্লাবের সভাপতি ছিলেন কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সহ সভাপতি ছিলেন কবি ও নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। সম্পাদক ক্রিওপেট্রার নাট্যকার প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য। সহসম্পাদক পুলিস অফিসার বিনোদ গুপ্তর ছোটভাই তুলসীগুপ্ত। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের' মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ভ্রাতা সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। প্রসিদ্ধ পাটের দালাল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ ঘোষাল। সিভিলিয়ান পুলিন সেন প্রভৃতি। ১৯০৭ সালের কথা। সবনাম মনে নেই। তবে নিত্য সন্ধ্যায় যারা নিয়মিত ক্লাবে আসতেন তাঁদের অনেককেই আজও ভুলিনি। নিশিকান্ত, ধীরা, অতুল, ভূতনাথ, অশ্বিনী এরা সবাই আমাদের অভিনয়ে স্ত্রী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। আমিও এঁদের সঙ্গে নেমেছি একাধিকবার স্ত্রী ভূমিকায়। সখের থিয়েটারের মুস্কিল হচ্ছে যি চাকরের পার্ট,

কেউ নিতে চায়না। কাটা সৈন্য, দূত, প্রহরীও সাজতে চায়না। সবাই চায় বড় বড় 'পার্ট'। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে কোন কোন নাটকে ভৃত্য, দূত, পরিচারিকা, প্রতিবেশিনী, প্রভৃতি একাধিক বিভিন্ন ভূমিকায় নামতে হয়েছে।

সে যে কী আনন্দের দিন গেছে মনে হ'লে আজও মনের ভেতরটা মুহুরে ওঠে। সেদিন 'ইভনিং ক্লাব' ছিল কলকাতার মধ্যবিত্তদের একটি শ্রেষ্ঠ আড্ডা। শুনে আশ্চর্য হ'তে হবে যে ৬০।৬২ বছর আগে কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরের কয়েকজন উৎসাহী যুবক এমন একটি অভিজাত শ্রেণীর আড্ডা স্থাপন করেছিলেন যেখানে তাস, দাবা, পাশা খেলার ব্যবস্থা তো ছিলই, আর ছিল 'ক্যারম' ব্যাগাটেলী 'পিং পং' বা টেবিল-টেনিস, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি খেলাধূলার সঙ্গে সবরকম গানবাজনা মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, বাঁয়া তবলা, করতালি প্রভৃতি দেশীয় সেতার এস্রাজ, বেহালা, বীণা, স্বরোদ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গীত, পিয়ানো শেখারও ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল একটি মূল্যবান লাইব্রেরী। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আমাদের ক্লাবের লাইব্রেরীতে পাওয়া যেতো। বলা বাহুল্য যে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্যপুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অকৃপণ বদান্যতায়। এই গ্রন্থাগারের আমিই লাইব্রেরীয়ান নির্বাচিত হয়েছিলুম। পরে, প্রিয় তুলসী ভায়ার অকাল মৃত্যুর পর আমাকেই ওরা সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। যখনই মনে পড়ে ইভনিং ক্লাবের এই আড্ডার একজনও আজ আর বেঁচে নেই একমাত্র আমি ছাড়া, তখন বেদনায় দুই চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে আসে।

ইভনিং ক্লাবের সদস্যরূপে আমরা একে একে অনেকগুলি নাটক অভিনয় করেছিলুম। ক্ষীরোদ প্রসাদের "মহারাজা নন্দকুমার" নাটকে বীরজাফরের ভূমিকায় স্বয়ং ক্ষীরোদপ্রসাদ অবতীর্ণ হবেন স্থির হয়েছিল। তিনি মহাউৎসাহে এসে দীর্ঘকাল ভূমিকাটির মহড়াও দিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে। তাঁর অভিনয় দক্ষতা দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে পড়তুম! কিন্তু, দুঃখের বিষয়, অভিনয়ের তারিখ ঘোষিত হবার পর দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাজেই 'ডুপ্লিকেট' যিনি ছিলেন, তাঁকেই শেষ পর্যন্ত এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। নামভূমিকায় সেজেছিলেন 'হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। 'মহারাজ নন্দকুমারের পর যতদূর মনে পড়ে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' অভিনয় করি। নগেন্দ্রনাথের ভূমিকায় 'হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র দত্তের ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্তী, হীরে ঝির ভূমিকায় অতুল ঘোষাল। সূর্যমুখী সেজেছিলেন 'বাঁকা'। কুন্দ নলিনী ভূতনাথ। এই 'বিষবৃক্ষ' অভিনয়ে আমাকে ছোট ছোট অন্ততঃ ৮টি স্ত্রী ও পুরুষের ছুচো পার্টে নামতে হয়েছিল, কারণ ওসব ক্ষুদ্র ভূমিকায় কেউই অভিনয় করতে চাননা সবার সাধ 'হিরো' সাজবার।

একাধিক 'হিরোর ভূমিকা আছে এমন নাটক আজও পাওয়া যায় না। এরপর অনেক নাটকেরই আমরা মহড়া দিয়েছিলুম কিন্তু, কোনও না কোনও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় যোগ্য অভিনেতা খুঁজে না পাওয়ায় সে নাটক শেষপর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে। কারণ, অভিনয় যাতে ক্রেওস ড্রামাটিক ইউনিয়নের চেয়ে সব দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট হয় এইছিল আমাদের মধ্যে একটা নেশা! দুইদলের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিযোগিতা চলছিল বলা চলে।

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' নাটকাকারে অভিনয় করছি শুনে ক্রেওসড্রামাটিকও ঐ নাটক অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। শুরু হয়ে গেল উভয় দলের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং দেবেন দত্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। কারণ তিনি শুধু সুঅভিনেতাই ছিলেন না।

সুগায়কও ছিলেন। কিন্তু, হলে কি হবে? আমাদের দেবেন দত্ত সেজেছিলেন যে-তিনকড়ি চক্রবর্তী। প্রসিদ্ধ সুগায়ক ও সু-অভিনেতা বলে তাঁরও খ্যাতিও শহরময় বড় কম ছিল না। হীরা, সূর্যমুখী, কমলমণি, নগেন্দ্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি ভূমিকার অভিনয়ই ষ্টেওল ড্রামাটিক ইউনিয়নের অভিনয় আমাদের ইডনিং ক্লাবের অভিনয়ের কাছে অনেকখানি ম্লান হ'য়ে পড়লো। আমাদের সে কি অবোল্লাস! প্রমথবাবুর চেষ্টায় একদিন থীয়ার পার্টি হ'য়ে গেল। তিনি পোর্ট কমিশনারের অফিসের একজন উচ্চশ্রেণীর হোমরা-চোমরা কর্মী ছিলেন। কাজেই সরকারি থীয়ারে আমরা সেদিন সারাবেলা গল্প তোলপাড় করে বেড়িয়েছিলুম। যতবার গান বাজনায় স্ফূর্তি, তত চা সরবৎ ও ভোজের আয়োজনও ছিল। রীতিমত বিজয়োৎসব।

এরপর "কাল পরিণয়" নাটকখানি নিয়ে জোর রিহার্সাল শুরু হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হল না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "পূর্ণিমা সম্মেলন" নাম দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শুরু করলেন। প্রতি পূর্ণিমায় এর অধিবেশন হ'ত ঘুরে ঘুরে এক এক সদস্যের বাড়ীতে। তখনকার খ্যাতনামা সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার সমালোচক সম্পাদক ও সাংবাদিকরা এই অধিবেশনে যোগ দিতেন। আমাদের ইডনিং ক্লাবের দল সভাপতির আমন্ত্রণে প্রত্যেক পূর্ণিমা সম্মেলনে দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত নূতন নূতন 'কোরাস্' গান গেয়ে শোনবার জন্য উপস্থিত হত। "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার' আমার দেশ" এবং "ভারত আমার! ভারত আমার! যেখানে মানব মেলিল নেত্র।" আমাদের সঙ্গে কবির পুত্র দিলীপকুমার ও কন্যা মায়াদেবীও গানে যোগ দিতেন। (ক্রমশঃ)

• • •

উপন্যাসিক জেমস্‌ব্যারি তরুণ বয়সে অতি সুপুরুষ ছিলেন। একদিন সকালে তিনি হাইড্ পার্কে বেড়াচ্ছিলেন হঠাৎ এক তরুণী তাঁর সামনে চুপ করে দাঁড়াল।

ব্যারি ভাবলেন সে বোধহয় ভিক্ষা চাইছে। তিনি তাঁর মণিব্যাগ থেকে একটি শিলিং বার করে তাকে দিতে গেলেন।

তরুণী বললে—"না, আমি টাকা চাই না।"

—'তবে কি চাও?'

—"একটি চুম্বন"।

হেসে ফেললেন ব্যারি। তারপর বললেন—"তোমার নাম কি?"

একটু ইতস্ততঃ করে তরুণী উত্তর দিল—Cinderella'।

চমকে উঠলেন ব্যারি। তাঁর নতুন উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে তিনি ভাবছিলেন, এখন পেয়ে গেলেন নাম।

বাড়ী ফিরে এসে তাঁর উপন্যাসের নাম দিলেন—"A kiss for Cinderella",

দেবতার উপহার

মূল : কাথলিন রোডস

অনুবাদ : গৌরীশংকর দে

['দেবতার উপহার' গল্পের লেখিকা কাথলিন রোডসের জন্ম ইয়র্কশায়ারে ; কিন্তু তিনি লেখাপড়া শেখেন ফ্রান্সে। উনবিংশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় তিনি অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বর্তমান রচনাটি তাঁর 'দি ওয়ার্ল্ড ইমেজ অ্যাণ্ড আদার স্টোরিস' গ্রন্থের অন্যতম গল্প।]

ডিক কেনিয়ন যখন জানালো মার্জরি হল-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাটা পাকা হয়ে গেছে তখন তার অসংখ্য বন্ধুদের অনেকেই তাকে ঈর্ষা না করে পারলো না। একথা সত্যি যে ডিক ধনী। আর মার্জরি খুবই গরীব। খেয়ে পড়ে বাড়তি যে পয়সা থাকে তার সবটাই যায় হয়ে যায় ওর ভাইদের পেছনে আর সুন্দর পুরণো হলটাকে ঠিক রাখার জন্য। সেনাবাহিনী আর নৌ-বাহিনীতে ভাইয়েরা রয়েছে শিক্ষানবিশীতে। আর তার জন্ম সূত্রে নিজের বলতে এখন কেবল ওই হলটাই রয়েছে।

মার্জরি গরীব সন্দেহ কি! কিন্তু ওর এমন একটা জিনিস আছে যা লক্ষ টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না। শতকের মধ্যে মাত্র একটি মেয়ের যা থাকে এবং বাকি নিরানব্বুইটি মেয়ে যার নিন্দা করে মার্জারির রয়েছে সেই জিনিস—মুগ্ধ করার এক বিস্ময়কর আর অবর্ণনীয় ক্ষমতা। সে যে খুব সুন্দরী তা নয় : দেখতে ছোট-খাট, পাতলা। কিন্তু তার কালো ভ্রু আর লাল টুকটুকে ঠোঁট তাকে এমন মোহময়ী ক'রে তুলেছে যা অনেক সুন্দরীর পক্ষেও হওয়া সম্ভব নয়।

পাড়ার মেয়েরা অবশ্য ওকে অপছন্দ করে। লম্বা পশমী কোট, টুপী পরে আর গাউন আট-সাঁট ক'রে গায়ে দিয়ে ও যখন বনভোজন বা আদরে হাজির হয়, অন্য মেয়েরা ওকে ঘৃণাই করে। তারা ওকে বলে ছিনাল। হয়তো ঠিকই বলে। মার্জরি কিন্তু ভ্রুক্ষেপও করে না। মোটরে হাড়াতাড়ি যাবার সময় একটুখানি হাসে কিংবা নিজের আসনে বসে একটুখানি মাথা হেলিয়ে সৌজন্য জানায়।

নিজের আদর্শে কিন্তু মার্জরি নিতান্তই বাস্তব। মন-প্রাণ দিয়ে সব সময় ও চায় একটা "ভালো" বিয়ে। ওর লাবণ্য আর যৌবন-ভরপুর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেকগুলো পুরুষ ওকে প্রেম নিবেদন করেছে। কিন্তু ওর মন জয় করবার মতো আর্থিক অবস্থা তাদের কারুরই নেই। তবে ও তাদের প্রত্যাখ্যান

জানিয়েছে সহজভাবে। মন কাউকেই দেয় নি। আর এইভাবে ওর বয়েস গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় একুশের কোঠায়।

তারপর একেবারে হঠাৎ মন স্থির ক'রে ফেললো।

পাশের বাড়ির ছেলে ডিক কেনিয়ন শিশুকাল থেকেই ওর পরিচিত। ওদের হলের উঠোন গিয়ে মিশেছে ডিকদের খামার বাড়ির উঠোনের সঙ্গে। ওদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছেলেবেলা থেকে। তবু মার্জরি এতদিন একবারও ডিককে নিজের উপযুক্ত পাত্র ব'লে ভাবতে পারেনি। খুব অল্প বয়সে ডিক মা-বাবাকে হারায়। সেই থেকে সে বাস করছে গ্রামে, বার্ষিক ৬০০ পাউণ্ড আয়ের ওপর ভরসা ক'রে। তবে ওই আয়ের বেশির ভাগই খরচা হয়ে যায় পুরণো বাড়ি আর জমির তদারকীতে। কেবল একটা বিষয়ে তার মানসিক অশান্তি। শৈশব থেকে সে ভালোবেসে এসেছে মার্জরিকে। কিন্তু শৈশব থেকেই জেনে এসেছে মার্জরি তার জন্য নয়। একবার নয়, দুবার নয়, দশ-বারো বার সে ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। প্রতিবারই মার্জরির ঠোঁটে দেখা দিয়েছে হাসি। মনে করিয়ে দিয়েছে যে ওতো নিঃসম্বল নিঃস্ব মেয়ে।

ডিক সতৃষ্ণ গলায় শুধিয়েছে, "আমাদের দুজনে মিলন হলে কি আমরা সুখী হতে পারি না?"

মার্জরি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলেছে, "না, ডিক। গরীব মেয়ে হওয়া খুব খারাপ, তার উপরে আবার গরীবের বউ হওয়া? না। এ কখনোই হতে পারে না। তোমার উচিত হবে প্রচুর অর্থের অধিকারিণী কোনো মার্কিনী মহিলাকে বিয়ে করা; আর আমার উচিত হবে একজন ধনী কারখানার মালিকের সন্ধান করা।"

এরপরে হঠাৎ, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এলো পরিবর্তন। হাসি-খুশী, উদার-মনা ডিককে যে দেবতারা ভালোবাসতেন তারা সদয় হলেন। ওর এক কোটিপতি কাকা মারা গেলেন। তাঁর প্রতিটি পাই পয়সার মালিক হলো ডিক কেনিয়ন।

আনন্দের খবরটার সত্যতা সম্পর্কে আর যখন কোনো সন্দেহের অবকাশ রইলো না ডিক ছুটে গেলো মার্জরির কাছে, "এখন তো আমাকে তুমি বিয়ে করবে?"

"এখনো তোমার মনে যদি সেই ইচ্ছা থেকে থাকে ডিক তবে নিশ্চয়ই!" ওর মিষ্টি কথা আর কোমল চোখের চাউনিতে ওর আগেকার কথাবার্তা সে ভুলে গেলো। পাকা হয়ে গেলো বিয়ের প্রস্তাব। দু'পক্ষেরই বন্ধুদের আনন্দ আর ঈর্ষা দুইই হলো। নিজেদের কাজের ফলাফল দেখে দেবতারাও হঠাৎ বিষণ্ণ এবং হতাশ হলেন। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। দেখে-শুনে তারা দুঃখিত হলেন। কারণ তাদের প্রিয় পাত্রের ভাগ্যে আরো ভালো পাত্রী জুটবে এই প্রত্যাশাই তাঁদের ছিলো।

অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য বিয়ের এক সপ্তাহ আগে খামার বাড়িতে এসে হাজির হলো ডিকের এক পুরোণো বন্ধু। লম্বা চেহারা। বয়েস পঁয়ত্রিশ। ভারতীয় সূর্যের রোদে পুড়ে গায়ের রং হয়েছে ব্রোঞ্জের মতো। সেই রহস্যময় দেশে দীর্ঘকাল বাস করার ফলে তার টানা-টানা সরু চোখ আর চমৎকার খোদাই করা মুখেও দেখা দিয়েছে কেমন এক রহস্য। ভাবী বধূর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দে'য়া হলো। অন্য যুবকদের মতো সে-ও মার্জরির রূপে মুগ্ধ না হয়ে পারলো না; কিন্তু প্রেমে সে পড়লো না। ডিক কিন্তু ওই আশঙ্কা করেছিলো। প্রথম পরিচয়ের দিন বন্ধুটি প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে কথা বলেছিলো মার্জরির সঙ্গে। তারপর ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ ক'রে খোলা জানলা দিয়ে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তারাভরা আকাশের ঝলমলে ঠিকুজী প'ড়ে গেলো সারারাত।

পরের দিন দেখার ভারী গলায় ডিককে বললো, "দেখছি তুমি বহু উপহার পেয়েছো। তুমি বেশ জনপ্রিয়, তাই না?"

ডিক হাসলো খুশির হাসি, "উপহার পাওয়া নিয়ে খুব মজা করেছি আমরা। কে সব চাইতে বেশি আর দামী উপহার পেয়েছে তা-ই নিয়ে। অবশ্য মার্জরিই জিতেছে। তবে আমার বন্ধুরাও কম যায় না।"

বন্ধুটি বললো, "আমার উপহার তুমি একটু পরে পাবে। এই উপহার আমি তোমার জন্য নিয়ে এসেছি ভারতবর্ষ থেকে—কাজকাজ করা কাঁসার একটি সারস। তোমার পুরণো হলঘরে বেশ মানাবে।"

"বেশ, বেশ," খুশি হয়ে বললো ডিক। "খুশি হয়েছি যে ঠিক সময়ে তুমি দেশে ফিরে এসেছো। আমি তো ভয়ই পেয়েছিলুম সারাজীবন বোধ হয় ও দেশেই কাটিয়ে দেবে।"

"তা নয়। তবে আবার আমি ফিরে যাবো।" তার চোখ দু'টি সজল হয়ে এলো। মনে হলো সে পূর্ব দেশেরই লোক। "ওখানে মানুষ জীবনের খুব কাছাকাছি। অস্পষ্ট ওখানে কখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আত্মা কী যে তা সামান্যও বুঝতে পেরেছে, সেই পারে নিজের প্রকৃত প্রভু হতে।"

বন্ধুর কথা শুনে ডিক তো অভিভূত, "তোমার কথাবার্তা যে যীশুখৃষ্টের রহস্যময় শোনাচ্ছে। ও-দেশে গিয়ে কি মন্ত্র-তন্ত্র শিখে এসেছো না কি?"

"মন্ত্র তন্ত্র? না তা নয়। তবে আমি জীবন সম্পর্কে কিছু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি।" একটু থেমে আবার বললো, "তোমার বোধ হয় মনে আছে কলেজে পড়বার সময়েই গুপ্তবিদ্যা বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিলো। তারপর ভারতে গিয়ে—" ভারত নামটি সে উচ্চারণ করলো আবেগ দিয়ে, "আমি শিখলুম মিথ্যা রহস্যবাদ আর প্রকৃত রহস্যবাদের পার্থক্য।"

"তাই নাকি?" আগ্রহের সঙ্গে শুধালো, "তাহলে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বলবে তো এই বিয়েতে সুখী হতে পারবো কি না।"

আলাদিক ভান্ন মাথা নেড়ে, আস্তে-আস্তে বললো, "তোমার কথা জানবার জন্যেই গত রাতে নক্ষত্র-লিপি পড়েছি। তোমাকে শুধু একটা কথা বলবো···তোমার বিয়ের সব-চাইতে দামী উপহারটি আসবে তোমার বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যেবেলা।"

ডিকের চোখ দুটো বড়ো হয়ে ওঠলো। মনের অস্বস্তি চাপতে না পেরে বলে ওঠলো, "তুমি ঠাট্টা করছো না তো? সেই দামী উপহারটি কী? তুমি যে গম্ভীর গলায় কথাটা বললে!"

গাম্ভীর্য চ'লে গিয়ে বন্ধুর মুখে ফুটে ওঠলো হাসি, "সবুর করলেই দেখতে পাবে। দেরী হয়ে যাচ্ছে। আজ রাতে আমাদের হলে যাবার কথা।"

"আর তিন দিন বাকি। তারপরই আমার বিয়ে হবে মার্জারির সঙ্গে! কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি যেন এসেও আসছেনা!"

"তুমি ওকে বহুদিন ধ'রে ভালোবাসছো, তাই না?"

ডিক অকপটে স্বীকার করলো, "সারা জীবন ওকে ভালোবেসেছি।"

বহু দূরের দেবতারা তার স্থূলবুদ্ধির কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার গর্বিত আত্মতৃপ্তিতে খানিকটা বিরক্ত হয়ে তাঁরা স্থির করলেন শেষ-পর্যন্ত উপহারটি আর দেবেন না···

বিয়ের আগের রাত্রির আবহাওয়া দেখে মনে হলো পরের দিন দেখা দেবে দুর্যোগ। সারাদিন কাটলো গুমোট গরমে। মনে হলো ঝড় উঠবে, বাজ ডাকবে সারাদিন ধ'রে আকাশে তর্জন-গর্জন। সমস্ত আবহাওয়াটাই হিংস্র, ভয়ংকর। সর্বত্র কী এক ষড়যন্ত্র আর বিশৃঙ্খলা। হলে শোভা পাচ্ছে বিয়ের নানা উপহার। পাহারা দিচ্ছেন একজন অভিজ্ঞ সোয়েম্বা। সানন্দ প্রত্যাশায় সারাদিন আনাগোনা করছে অতিথিরা। আর, সারাদিন ধ'রে ডিকও যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ওর মন উত্তেজিত হয়ে আছে পরের দিনের ঝিলমিল স্বপ্নে। পাতাশ বছরের জীবনে এমন আনন্দের দিন আর আসে নি।

পার্থিব সমস্ত ভয় উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে সে যেন হাজির হয়েছে আনন্দের স্বর্গলোকে।

বন্ধু তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। নক্ষত্রলোক যে বার্তা পাঠিয়েছে তা-ই বারবার মনে পড়ছিলো, যদিও সে বার্তার অর্থ এখনো তার কাছে অস্পষ্ট।

যুবকটির অচেতন উল্লাসে বিরক্ত দেবতারা এক সভায় মিলিত হয়ে স্থির করলেন শেষ-পর্যন্ত উপহার তারা দেবেন না।

চত্বরে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দুই বন্ধু ধূমপান করছিলো আর দেখছিলো তামাটে আকাশ আর বাগানের এক প্রান্তে গম্ভীর শান্ত্রীর মতো শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার ঘন গাছ। রাত এগারোটা নাগাদ বন্ধু তাকে শুভরাত্রি জানালো, "অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার তোমার শুতে যাওয়া উচিত।" ডিকের বাহুতে নিজের রোগা হাতখানা রেখে বললো, "মনে হচ্ছে একটু পরেই ঝড় উঠবে।"

"আমি জানি—সমস্ত সন্ধ্যা ধ'রে পশ্চিম আকাশে বাজ ডাকছে। তবু এখুনি শুতে যেতে ইচ্ছা করছেনা···। অবশ্য বেশিক্ষণ বাইরে থাকবো না।" একটু হেসে বললো, "একটা কথা—অ্যালারিক, তোমার ভবিষ্যৎ বাণী কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। তুমি না বলেছিলে বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা সব চাইতে দামী উপহার আসবে!"

অন্ধকার আকাশের দিকে অনিমেষ চোখে তাকিয়ে অ্যালারিক বললো, "তা নয়। আমার, আমারই ভুল হয়েছিলো। যাক, অ্যালারিক তুমি তো এরি মধ্যে অনেক উপহার পেয়ে গেছো। আর যন্ত্র-তন্ত্রও তো ভুল হতে পারে।"

অ্যালারিক যখন চ'লে গেলো তখনো ডিক রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। যেন কি ভাবছে আর ধূমপান ক'রে চলেছে। ঘরে ফিরে এসেও সে ব'সে রইলো জানালার কাছে। ভয়াবহ কোড়ো আকাশের দিকে তখনো তার চোখ।

এখন ডিক একা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রেমিকের সহজাত বোধের তাড়নায় হল-সংলগ্ন নিজের বাগানে গিয়ে আলসেছে হাজির হলো। আরো বেশি গরম লাগছে। কী এক অশুভ ইশারা চারদিকে; গন্ধকের গন্ধে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গাছের একটি পাতাও নড়ছেনা।

কলনের উপরে ডিক এমন জায়গায় দাঁড়ালো যেখান থেকে পুরোনো বাড়িটা ভারি সুন্দর দেখায়। রাতের আলো ভেঙে গেছে। বেশির ভাগ আলো গেছে নিভে। কেবল ভাবী বধূর জানালায় তখনো জ্বলছে আলো। সেই দিকে চোখ পড়তেই ডিক ফিসফিস স্বরে প্রার্থনা জানায়—

"হে ঈশ্বর, আমি যেন আমার প্রিয়তমার যোগ্য হতে পারি।"

এ-কথা বলতে না বলতেই কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝড়। নাটকীয় ঘটনার উজ্জ্বল আকস্মিকতা নিয়ে অন্ধকার আকাশের বুক চিরে বেরিয়ে এলো এক মারাত্মক দীপ্ত আয়ুধ। তার দশ সেকেণ্ড পরে আকাশের গোলা বর্ষণের শব্দে পৃথিবীর কান বধির হবার উপক্রম হলো।

অস্পষ্ট আলোকিত বৃক্ষ-সংরক্ষণ ভবনে নিঃশব্দ পদক্ষেপে যারা মিলিত হয়েছিলো সেই প্রেমিক যুগল ভয়াবহ শব্দে চমকে গিয়ে আলিঙ্গন থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হলো।

"আর নয় "ম্যাক্স।" মেয়েটি পেছন দিকে সরে গেলো। তখনো তার মুখ কামনারক্তিম; কিন্তু ভয়ার্ত। "এখানে থাকা নিরাপদ নয়—ঝড়ের শব্দে অন্যেরা জেগে ওঠবে—আমি এক্ষুণি যাবো।"

"কিন্তু এই তো শেষ সময়—আরেকটু থাকো," পুরুষের কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট ক্ষুধা। "এরপরে হয়তো মিলনের একটু সুযোগ ক'রে নিতে কেটে যাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। আজ রাতের পরে যখনি আমরা মিলিত হতে যাবো ধরা পড়বার ঝুঁকি থাকবে—"

"তা সত্যি—তবু মনে হয় আমাদের জিত হবে। আমার জিত সেতো তোমারও জিত।" সখীর ওষ্ঠে তপ্ত ওষ্ঠ চেপে ধ'রে বললো, "সে এত ধনী···ম্যাক্স, তোমারও যদি ও-রকম ঐশ্বর্য থাকতো····"

আলিঙ্গন দৃঢ় ক'রে রাণী গলায় পুরুষটি বললো "আমিও তাহলে তোমাকে পেতুম। এবং এখন—"

বাসনা-গাঢ় অস্পষ্ট স্বরে মেয়েটি জানালো, "আমার যা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তা রইলো চিরকালের মতো তোমারই জন্য। ও তো একটা বোকা, বেচারা ডিকের কথা বলছি!—তবে আসল কথা ও কখনো জানতে পারবেনা!"

আবার চুম্বন···এবার আরো দীর্ঘ এবং কামনা-ঘন···ঝড় এবার প্রবল হয়ে উঠেছে। তারি মধ্যে দিয়ে ছুটে পালালো মেয়েটি।

বিদ্যুতের শর যেখানে আঘাত হেনেছিলো সেই রেশমকোমল পুরোনো জনের ওপরই হাসি মুখে কালো গাল-নিয়ে শুয়ে ছিলো ডিক। তার সানন্দ বিশ্বাসকে যা একদিন ভেঙে দিতে পারে সেই কপটতার কথা কোনোদিনই সে জানবেনা।

কেননা দেবতারা সদয় হয়েছিলেন; শেষ-পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন বিয়ের উপহার।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

দুঃখের সাহায্য করার জন্য একটি বাজার বসানো হয়েছিলো। দু ধারে সারি সারি দোকান। একটি দোকান চালাচ্ছিলেন বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক জর্জ স্যাণ্ড। ব্যারন জেমস ডি রথসচাইল্ড ওই দোকানের সামনে থামলেন। দোকানের জিনিসপত্র পরখ ক'রে দেখে বললেন, "আপনার হাসি ছাড়া তো দোকানের আর কিছুই আমার পছন্দ হচ্ছে না। বরং আপনার একটি স্বাক্ষর আমার কাছে বিক্রি করুন।"

এক টুকরো কাগজে জর্জ স্যাণ্ড লিখলেন: "ব্যারন জেমস ডি রথসচাইল্ডের কাছ থেকে ৫,০০০ ফ্রাঙ্ক দান হিসাবে বুঝিয়া পাইলাম!"

ব্যারন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ওই অর্থ অবশ্য দিলেন।

• • • •

চাকর মাঝে-মাঝে হুকুম তামিল করতো না তা ব'লে ফরাসী সাহিত্যিক আলেকজাণ্ডার ডুমার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠতো। একদিন চাকরটি হুকুম তামিল না করায় ডুমা চেঁচিয়ে ব'লে ওঠলেন: "উল্লুক কে? তুমি না আমি?"

জবাব এলো: "যে চাকর পাগল নিশ্চয়ই তাকে আপনি কাজে বাহাল করতেন না!"

• • • •

"আমি হাঁটতে—হাঁটতে লিখি," বলেছিলেন এইচ. জি. ওয়েলস্, "কারণ আমি কোথাও যেতে চাই। আমি যেমন সোজা হয়ে হাঁটি, তেমনি লিখিও আমি সোজা ক'রে—কারণ আমার গন্তব্য স্থলে পৌছাবার এই হচ্ছে সেরা পথ।"

• • • •

"লক্ষ মানুষের মধ্যে আপনি তো মাত্র একজন, কাজেই ভোট দিয়ে হবে কি? যা মনে-মনে ভাবছেন তা মুখে ব'লে কী হবে? ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার দরকারটা কী? কেন দায়িত্ব নেবেন?" এর উত্তরে জার্মান সাহিত্যিক হান্স হেব বলেন, "পৃথিবীতে শতকরা এক ভাগ লোক শুধু ভালো আর এক ভাগ খারাপ, বাকি আটানব্বুই ভাগই নিরপেক্ষ। সেই কারণেই একজন মানুষও যা করে তার গুরুত্ব অনেকখানি।"

সাহিত্য-সংবাদ

গারাকোনো জয়েস

লেখক : জেমস জয়েস

ত্রিস্ত-এ এক ধূলি-ধূসর বাক্স থেকে আবিষ্কৃত হলো জেমস জয়েসের একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। জয়েস গবেষকদের মধ্যে সাড়া প'ড়ে গেলো। যেন রসেটা পাথর আবিষ্কৃত হয়েছে।

পঞ্চাশ বছর আগে ত্রিস্ত-এ জয়েস ছিলেন এক বাড়ির শিক্ষক। ভাষা শেখাতেন। তখন তাঁর 'ডাবলিনারস' বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। আর 'অ্যা পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান' বইটি রচনা তখনো শেষ হয় নি। জেমস তাঁর ছাত্রীর প্রেমে পড়লেন। ছাত্রীটি ইহুদী। রূপসী তরুণী। সেই প্রেমের অভিজ্ঞতাই বর্ণিত হয়েছে নতুন আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিটিতে। পাণ্ডুলিপিটি স্বল্পায়তন। এর শব্দ-সংখ্যা মাত্র ৩,০০০।

পাণ্ডুলিপিতে জয়েস লিখিতেছেন 'তার শরীরের কোনো ঘ্রাণ নেই; যেন সে নির্গন্ধ ফুল।' পাণ্ডুলিপির প্রথম থেকে শেষ পাতা সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছেন যে জয়েস তিনি আশ্চর্য প্রেমার্ত। মনে হয় না এই মানুষটিই লিখেছিলেন 'ইউলিসিস'-এর মতো জটিল উপন্যাস।

• • •

লোকে কাল্পনিক গল্প বলে Rip Van Winkle-কে মনে করলেও, গল্প যে কতকটা সত্যি একথা Washington Irving স্বীকার করে গেছেন তাঁর একখানি চিঠিতে। সময়টা অবশ্য বিশ বছর নয়, মাত্র তিনদিন।

আরভিং-এর একজন বন্ধুর ঐ দশা হয়েছিল। দোকান থেকে মদ কিনে খেয়ে বেচারা একটা সেতুর নিচে ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর বাড়ী ফিরে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে তিনি তিনদিন ঘুমিয়ে ছিলেন সেখানে।

গল্পটা শুনে আরভিং এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি এক আশ্চর্য গল্প বানিয়ে Rip Van Winkleকে বিশ্ববিখ্যাত না করে ছাড়েন নি।

ক্যাপ্টেন কিড্

রমেন দে

ক্যাপ্টেন কিড্ কি সত্যি জলদস্যু ছিলেন ? মাটির তলায় কি লুকিয়ে রেখেছিলেন অগাধ ঐশ্বর্য ? এ দু'টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ঐতিহাসিকদের মনে আজো সন্দেহ আছে। কিন্তু যে গাথা—কবিরা আমেরিকার ইতিহাসে ক্যাপ্টেন কিড্‌কে অমর ক'রে রেখেছেন তাদের মনে কিন্তু এতটুকু সন্দেহও ছিলো না। গল্পে, কবিতায় লোকগাথায় অক্ষয় হয়ে আছে ক্যাপ্টেন কিডের কীর্তি। সেই সব কাহিনীতে কী নেই ? কুসংস্কার, রহস্য, খুন-খারাপী, ষড়যন্ত্র, লুটপাট সবই। বাস্তবিক তার মতো বিখ্যাত হওয়ার সৌভাগ্য আর কোনো জলদস্যুর হয়নি। ক্যাপ্টেন কিডের মৃত্যুর পরে আড়াই শ বছরেরও বেশি অতিবাহিত হয়েছে, তবু আজো একদল লোক রাতের অন্ধকারে গোপনে নির্জন দ্বীপে মাঝে-মাঝে খুঁড়ে ফেরে তার গুপ্ত ঐশ্বর্য। ওল্ডেস্ট ইণ্ডিজ থেকে নোভা স্কটিয়া কত জায়গাতেই না তারা সন্ধান করেছে। ক্যাপ্টেন কিডের প্রেতাত্মা ছাড়া আজো কেউ সেই অভিশপ্ত সম্পদের ঠিকানা জানে না।

উইলিয়াম কিডের জন্ম ১৬৪৫ সালে। স্কটল্যাণ্ডে। শোনা যায় তার বাবা ছিলেন ক্যালভিন সম্প্রদায়ের একজন যাজক। উচ্চ শিক্ষা লাভ ক'রে কিড সৎনাবিক হিসেবে দিন-দিনই উন্নতি করতে থাকেন। একবার বে-সরকারী এক ইংরেজ যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হয়ে জাহাজ নিয়ে তিনি হাজির হন নু্য ইয়র্কে। তার ম্যারেজ লাইসেন্সে 'উইলিয়াম কিড, জেন্টলম্যান' এই কথাটি লিখিত ছিলো। নু্য ইয়র্কে তিনি থাকতেন চমৎকার একটা বাড়িতে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে।

১৬৯৫ সালে লর্ড বেলমণ্ট-এর সঙ্গে দেখা না হলে কিড বোধহয় অন্য পাঁচজন ভদ্রলোকের মতোই ঘটনা-বর্জিত নিতান্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন ; তার নামও হয়তো হারিয়ে যেতো হাজার-হাজার নামের সমুদ্রে। ম্যাসাচুসেটস ও নু্য ইয়র্কের গভর্ণর বেলমণ্ট ছিলেন খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। জলদস্যুদের বিতাড়িত করবার জন্য তিনি একজন সৎ ও সাহসী ক্যাপ্টেন খুঁজছিলেন। ক্যাপ্টেন কিডকে দেখা মাত্র তাঁর মনে

হলো এঁকে দিয়েই কাজ হবে। কিড প্রথমে ওই কাজ নিতে চান নি। কিন্তু গভর্নর তয় দেখালেন তাঁর প্রস্তাবে রাজী না হলে তিনি কিডের জাহাজ আটক ক'রে রাখবেন। বাধ্য হয়ে কিডকে রাজী হতে হলো।

ইংল্যাণ্ডে একটা নতুন কোম্পানী গ'ড়ে উঠলো। এতে ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়াম স্বয়ং এবং কয়েকজন অভিজাত ইংরেজ। এরা একটা জাহাজ কিনলেন। কোম্পানীর তরফ থেকে ক্যাপ্টেন কিডকে দেওয়া হলো করাসী জাহাজ দখল এবং জাহাজের জিনিসপত্র লুটপাটের 'আইনসম্মত' অধিকার। ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে এই সময়ে যুদ্ধ চলেছিলো।

কাজের শর্ত: লুটপাট না করলে ক্যাপ্টেন কিংবা তার অধীনস্থ নাবিকেরা কেউ বেতন পাবে না। বেলমন্ট এবং কোম্পানীর অন্য অংশীদারেরা লুটের সামগ্রী থেকে প্রচুর রকরা পাবার আশা করছিলেন।

'অ্যাডভেঞ্চার গ্যালি' নামে জাহাজে চেপে সমুদ্রে ভাসবার পরে ক্যাপ্টেন কিড সত্যি কী করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক চলেছে দু শ বছর ধ'রে। তবু আজো সঠিক কিছু জানা যায় নি। অনেকের বিশ্বাস তিনি শুধু করাসী জাহাজেই হানা দিতেন।

অন্যেরা বলে ক্যাপ্টেন কিড নিজেই জলদস্যু বনে গিয়েছিলেন; যাদের শায়েস্তা করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিলো তিনি ভিড়ে গিয়েছিলেন তাদেরই দলে। এ যেন যাকে ডাকাত ধরতে পাঠানো হলো সে নিজেই হয়ে গেলো ডাকাত। কিডের নিজের বক্তব্য তাঁর নাবিকেরা মনের প্রবণতার দিক থেকে আগে থেকেই ছিলো জলদস্যু, সুযোগ পেয়ে তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং জাহাজ ছেড়ে চ'লে যায়।

বিদ্রোহী নাবিকদের একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন কিডের প্রধান সোলদাত উইলিয়াম মুর। জাহাজ যখন খোলা সমুদ্রে, মুরের সঙ্গে কিডের গুরুতর মনোমালিন্য শুরু হয়। কথা কাটাকাটি হতে-হতে ক্যাপ্টেন কিড্ মুরকে 'ঘৃণ্য কুকুর' বলে গালাগালি দেন। মুর উত্তরে বলেন, "আমি যদি ঘৃণ্য কুকুর হই, তবে আপনিই আমাকে তা বানিয়েছেন।" মুরকে মুখে মুখে উত্তর দিতে দেখে ক্যাপ্টেন কিড ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সামনে লোহার পাত-আঁটা যে বালতিটা পড়েছিলো তা-ই তুলে আঘাত হানলেন। মুরের মাথাটা চৌচির হয়ে গেলো; সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেলেন মুর।

ক্যাপ্টেন কিড সম্পর্কে নানারকম সত্য মিথ্যা কাহিনী রঞ্জিত, অতিরঞ্জিত হয়ে পৌঁছাতে লাগলো ইংল্যাণ্ডে। কেউ বলছে তার মতো শয়তান আর দুরাত্মা পৃথিবীতেই আর জন্মায় নি। ভারত মহাসাগরে তিনি নাকি নারকীয় দৌরাত্ম্য শুরু করেছেন; সৎ নাবিকদের উপরে চালাচ্ছেন অকথ্য নির্যাতন।

পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষ কোম্পানীর অভিজাত অংশীদারদের কাজের তীব্র সমালোচনা শুরু করলেন: বিশেষ ক'রে লর্ড সোমারস এবং লর্ড চ্যাকেলর হলেন তাদের আক্রমণের লক্ষ্য।

ইংল্যাণ্ড থেকে গভর্নর বেলমন্টের কাছে কড়া নির্দেশ এলো আমেরিকান উপনিবেশে পা দেয়া মাত্র যেন ক্যাপ্টেন কিডকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেলমন্টের তো অস্বস্তিকর অবস্থা। তিনিই কিডকে কাজে নামিয়েছেন, তার লুট থেকে রকরা নিয়েছেন, এখন তিনি নিজেই তাকে গ্রেপ্তার করেন কেমন ক'রে?

মালাবার উপকূলের কাছে ক্যাপ্টেন কিড তাঁর নাবিকদের নিয়ে দখল করলেন 'কুয়েডা মার্চেন্ট' নামে একটা জাহাজ। প্রচুর সোনা-রুপো, মণিমুক্তো নিয়ে হাজির হলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। এখানে এসে প্রথম শুনতে পেলেন তাকে এবং তার নাবিকদের জলদস্যুরূপে ঘোষণা করা হয়েছে।

হিসপানিয়োলাতে লুণ্ঠিত সামগ্রী রেখে 'অ্যাণ্টোনিয়ো' নামে একটি জলযানে ক'রে ক্যাপ্টেন কিড রওনা হলেন নিউ ইংল্যাণ্ডের দিকে।

কিড আশা করেছিলেন তাকে ক্ষমা করা হবে। কিন্তু লর্ড বেলমণ্ট তখন নানা লোকের সমালোচনায় জর্জরিত। দুর্নাম রটে গেছে চারদিকে। বোস্টনে নামামাত্র গ্রেপ্তার করে কিডকে পাঠানো হলো ইংল্যাণ্ডে।

বিচারে কিড দোষী সাব্যস্ত হলেন। ১৭০১ সালের ২৩শে মে তারিখে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো এক্সিকিউসন ডক-এ। ওখানেই তার গলায় পরানো হলো ফাঁসির দড়ি।

আজো অনুসন্ধান চলেছে ক্যাপ্টেন কিডের গুপ্তধনের। জলদস্যুদের তো আর ব্যাঙ্ক ছিলো না। তারা লুণ্ঠিত ধন-দৌলত লুকিয়ে রাখতো মাটির তলায় কিংবা নির্জন গুহায়।

আর কয়েক বছর পরে ক্যাপ্টেন কিডের গুপ্ত ঐশ্বর্য্য বের করবার জন্য শুরু হবে ব্যাপক তল্লাসী। প্রাচীন ধাঁধাটির উত্তর খুঁজে বের করবার জন্য ব্যবহার করা হবে বিজ্ঞানের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি। ক্যাপ্টেন কিডের গোপন ধনভাণ্ডার উদ্ধারে কেবল তারাই সক্ষম হবেন যারা সাহসী এবং কুসংস্কারমুক্ত।

কিংবদন্তী বলে কিডের গুপ্ত সম্পদ রয়েছে মোডাগাস্কারের এক দ্বীপে। তার ধনভাণ্ডারের দরজায় পাহারায় নাকি পাতারা দিচ্ছে মস্ত আর ভয়ংকর এক কুকুর। নাম তার আজিয়েল। আজিয়েল নাকি শয়তানের রত্নপুরীর প্রহরী।

বিচারের সময় ক্যাপ্টেন কিড না কি স্বীকার করেছিলেন ইস্ট হ্যাম্পটনের উত্তর সৈকত থেকে কিছু দূরে গার্ডিনারস দ্বীপে তিনি তার ধন-রত্নের কিছু অংশ পুঁতে রেখেছেন। পরে সত্যি সেখানে খোঁজ করে ধন-রত্ন পাওয়া গেছে। একটি মর্মর-ফলক আজো ওই জায়গাটিকে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে।

আবার মিথ্যা গুজবও রটেছে অনেক। এখনো অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস ক্যাপ্টেন কিডের বিপুল ঐশ্বর্য অন্ধকারে অপেক্ষা ক'রে আছে বুকে অতৃপ্ত আলোর পিপাসা নিয়ে, দিন গুনছে নির্ভীক অভিযাত্রীর পদধ্বনি শুনবার জন্য। তাই, আশা করা যায় আরো বহুদিন ধ'রে চলবে ওই সম্পদের খোঁজ। বোধহয় আমাদের পরের শতকেও।

দ্বিতীয় চিঠি

মায়া বসু

বার্ধক্য-কবলিত বুড়িটাকে ঘিরে মহিলা ক'জন বসে ছিলেন। বড় দুজন, যাঁদের বয়স কিছুটা বেশী, যাঁরা সংসারের গৃহিণী পর্যায়ে উঠে গেছেন, তাঁরা গম্ভীর মুখেই কথাবার্তা বলছিলেন। আর কম বয়সী মেয়ে দুটির হাবভাব মুখ দেখলেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল, কোনমতে ওরা হাসি চেপে বসে আছে। নীরস বুড়িটার কাছ থেকে উঠে যায়নি ওরা, তার কারণ একটা বেশ মজার খোরাক পেয়েছে বলেই। নাহলে একটা সত্তর বছরের বুড়ির কুঞ্চিত রক্তহীন মুখের কথায় কান দেবার মত মন বা সময় কোনটাই ওদের নেই।

বয়সে কীং অবজ্ঞ চাহনি দিয়ে বার বার ঘরখানার এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিল বুড়ি। ঝকঝকে আয়না দেওয়া ড্রেসিং টেবিল। আলমারি ওয়ার্ড্রোব ডানলোপিলোর গদীপাতা শ্রীংয়ের খাট। দাসী চাকরের আনাগোনা। এবাড়ির চারদিকে ঐশ্বর্য্য অর্থ আরাম আয়েশের বিজ্ঞাপন ছড়ানো।

তোমার শাশুড়ী কতদিন গেছেন বড় বৌমা?

বছর দশেক হবে। এবাড়ি আসার পাঁচ ছ বছর পর বোধ হয়।

ভাগ্যিমানী। বড় বড় ছেলে, বৌ নাতি নাতনি রেখে স্বর্গে গেলেন। আর এক বয়সী হয়েও আমি এখনো—বুড়ীর চোখে জল এলো। ভাঙ্গা গলা পরিষ্কার ক'রে কথা শেষ করল, পোড়াকপালে অনেক দুর্গতি লেখা আছে কিনা, তাই বাহাত্তর বছর বয়সেও—

কী আর করবেন বলুন? মরা বাঁচা তো আর মানুষের হাতধরা নয়।

তোমার ছেলে কোথা থেকে পাস করেছে বড় বৌমা?

রুড়কী ইনজিনিয়ারিং কলেজ থেকে। ওখানেই চাকরি করত। কিছুদিন হল বদলি হয়ে এখানে এসেছে।

বয়স্কা মহিলা দুজন বুড়ির সঙ্গে কথা বলছিলেন। যদিও কথার মধ্যে মনোযোগ বা আন্তরিকতা কিছুই ছিল না। অত্যন্ত নীরস ও শুকনো কথাবার্তাগুলো ভদ্রতায় মার্জিত ছিল মাত্র।

আপনার নাতনি বুঝি খুব সুন্দরী? কী যেন নাম তার? মেজ বৌ প্রশ্ন করলেন।

বুড়ি এক গাল হাসল। নিজের মুখে আর কি বলব মা, তুমি তাকে দেখনি। ঠিক যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। নাম মমতা মিত্র। তোমার বড় জায়ের ছেলেটির সঙ্গে কত খেলা করেছে ওই পার্কটায়! তার নাম কিন্তু ভুলিনি আমি। তপেশ। মিতু ওকে তপু দাদা বলে ডাকত। কী ভাবই না ছিল দুটিতে তখন! তোমরা ওবাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর মিতুর আমার কদিন ধরে সে কী কান্না! তোমার শাশুড়ী ওকে বড্ড ভালবাসতেন বড় বৌমা। তুমি তো জান, ওদের দুজনের গলাগলি ভাব দেখে মিতুকে ঠাট্টা করে নাতবৌ বলে ডাকতেন।

এ প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যে বড় বৌমা সংযোধিতা মহিলাটি অন্য কথা পাড়লেন—আপনারা তো ওই বাড়িতেই আছেন, না?

হ্যাঁ মা! মিতুর বাবা ওই কুঁড়েটুকু ভাগ্যিস রেখে গিয়েছিল, না হলে ও হঠাৎ এমন অসময়ে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবার পর কোথায় দাঁড়াতাম? বৌমা আর মিতুকে নিয়ে কোনরকমে আছি ওখানে। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারিনি। সম্বন্ধ এসেছিল অনেকই কিন্তু মা, পছন্দসই নয় কোনটাও। বুকে করে মানুষ করেছি, যার তার হাতে তুলে তো আর দিতে পারি না?

তাতো বটেই। মেজজন সায় দিলেন।

হঠাৎ কানে এল, তপুর জন্যে তোমরা সুন্দরী মেয়ে খুঁজছো। ভাল বংশের ভাল ঘরের মেয়ে। দাবী-দাওয়া তেমন নেই। তাই শুনে মা ছুটে এলাম। আমাদের কুল বংশ ঘরদোর সবই তোমাদের জানা। মেয়ে তো আগে চোখেই দেখেছ – এখন আরো সুন্দর হয়েছে।

অবাঞ্ছিত অযাচিত আত্মীয়তায় মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিলেন ওঁরা। বহুকাল আগেকার সামান্য প্রতিবেশী পরিচয়ের সূত্র ধরে এভাবে মেয়ের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ওদের ব্যতিব্যস্ত করাটা মহিলা দুজনের মোটেই ভাল লাগছিল না। কালীঘাটের কাছে একটা রেলিং ঘেরা পার্কের পাশে ওঁরা এককালে থাকতেন ঠিক কথাই। তখন এবাড়ি ওবাড়ি আসা যাওয়াও ছিল, এটাও মিথ্যে নয়। কিন্তু প্রায় পনেরো ষোল বছর ওঁরা নতুন বাড়ি করে উঠে এসেছেন। তখনকার মধ্যবিত্ত অসচ্ছল জীবনযাত্রার ধারাও আজ পালটে গেছে। এঁরা উঠে গেছেন অনেক উঁচুতে, সচ্ছলতার চূড়ায়। আর ওরা, মমতার বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে নেমে গেছে দারিদ্র্যের সমতলে। বহুদিনের অদর্শন ওদের পরস্পরকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এখন কেউ কাউকে চেনেনা। খবরও রাখেনা। হঠাৎ এত বছর বাদে এই বাহাত্তর বছরের বুড়িটা পুরোনো চেনার সূত্র ধরে নাতনীর বিয়ের সম্বন্ধ এনে হাজির করেছে। কী বুদ্ধি বুড়ির। বাহাত্তুরে ধরা বুদ্ধি একেই বলে! তা না হলে এত বড় বাড়ির বড় আদরের ছেলেটির সঙ্গে কিনা বিয়ে দিতে চায় ওর নাতনির? হলেই বা সে মেয়ে সুন্দরী রূপসী।

তাহলে ওই কথাই রইল বৌমা। তপুকে একবার পাঠিও। যদি ওর পছন্দ হয়, তারপর মেয়ের ভাগ্য আর আমাদের কপাল। আজ উঠি। অনেক দূর যেতে হবে মা।

কিছুই তো মুখে দিলেন না। একখানা বিস্কুট কেক দেবে? তপেশের মা অনুরোধ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

না বৌমা, আমি রাস্তা থেকে ধরে নেব। আজ যদি আমার ছেলে বেঁচে থাকত, তবে কি আর এই বয়সে আমাকে তোমাদের বাড়ি আসতে হত মা! মাথা উঁচু করে সেই আসত।

বুড়ি অদৃশ্য হতেই কম বয়সী মেয়ে দুটি হেসে লুটিয়ে পড়ল—ও দাদা, এদিকে এসো। শিগ্‌গির—এসো। তোমার দিদি-শাশুড়ী চলে গেছে।

পাশের ঘর থেকে কান্তিমান সুদর্শন ছেলেটি বেশ বিরক্তিভরেই বেরিয়ে এলো। বোনেদের ধমকে উঠল, এত হাসির কী হয়েছে শুনি?

বারে! আমাদের বৌদি আসছে, তোমার বিয়ে—হাসব না তো কি কাঁদব? বড় মেয়েটি হাসি থামিয়ে ঠোঁট কোলাল।

তপেশ এবার এদিকে ফিরল, মা, কাকিমা, তোমাদের আক্কেলটা কি বলতো? কেন ওসব বাজেলা

বাধাচ্ছ? কোনকালে কবে এইটুকু বয়সে কার সঙ্গে পার্কে খেলেছি সেই স্মরণে···আরে বাবা, অমন কত মেয়ের সঙ্গেই তো ·····

তারা তো আর লক্ষ্মী প্রতিমা নয়! এবার ছোট বোনটি টিপ্পনি কাটল।

তোর মত শাঁকচুন্নিও নয়। তপেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

বেশ শাঁকচুন্নি তো শাঁকচুন্নি। তোমার তাতে কি? ছোট মেয়েটি মুখ ঝামটা দিল দাদাকে।

কাকিমা বললেন, আচ্ছা দিদি, তুমি কেন বুড়িকে বললে ওকথা? তপু মেয়ে দেখতে যাবে?

দেখলেই তো আর বিয়ে হয়ে যায় না। অতঃকরে বললেন বুড়ো মানুষ—বড়বৌ বিব্রতভাবে জবাব দিলেন।

আহা থাক না কাকিমা। হাজার হোক বালাসখি! পনের বছর পার হয়ে গেছে, লক্ষ্মীঠাকরুণ এখন হয়তো দুর্গা প্রতিমাই হয়ে গেছে—কী বল দাদা, অ্যাঁ? বড় মেয়েটি ফোড়ন কাটল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট খুড়তুতো বোনটি খিল খিল করে হেসে উঠল।

তপেশের মাও হাসলেন—আহা, তোরা সুরু করেছিস কি শুনি? থাকনা একবার, দোষটা কি? সত্যিই তো, ছেলেবেলায় খুব ভাব ছিল দুটিতে। মেয়েটা ভারী ফুটফুটে ছিল তখন—। চেয়ে দেখবার মত। অবস্থাও ভাল ছিল।

আমি যাব না। গোঁয়ারের মত মায়ের কথার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল তপেশ। কোন ফুটফুটে মেয়ের কথা আমার মনে নেই। ওখানে বিয়ে যখন করব না তখন মিথ্যে যাবার কোন মানে হয় না। দেখতে যাওয়া, তারপর ফিরে এসে মুখের ওপর বলা মেয়ে পছন্দ হয়নি, সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার।

বিচ্ছিরি ব্যাপার কেন হবে? কাকিমা এগিয়ে এলেন এবার। তুই আমাদের বাড়ির বড় ছেলে। বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ আসছে। বড় লোকের বাড়ি বিয়ে দেব। তত্ত্ব তালাস ঘটাপটা কত কাণ্ড কারখানা হবে তোর বিয়েতে। অমন গরীবের ঘরে তোর বিয়ে দিচ্ছে কে শুনি? আমরা তো দেখে যাইনি, ওরাই দেখে যেতে বলেছে বোকার মত। আর দেখলেই যে বিয়ে করতে হবে, এমন কথা তো নেই? পাঁচটা মেয়ে দেখে তবেই লোকে বিয়ে করে। তুই যা একবার। দিদি যখন কথা দিয়েছেন না গেলে ভাল দেখায় না। তারপর যা বলবার, আমরা চিঠি লিখে ওদের জানিয়ে দেব। এই কথাই বলে আসবি ওদের

• • • •

শাশুড়ী বাড়ি ঢুকতেই প্রতীক্ষারত সংশয় উদ্বেগে উত্তেজিত মমতার মা এগিয়ে এল। কী হল মা? ওরা কী বলল? চিনতে পারল আমাদের?

কোকলা মুখে এক গাল হাসি নিয়ে সপুলকে বুড়ি জবাব দিল, কী যে বল বৌমা, চিনতে নাকি পারবে না। তপু নিজেই মিতুকে দেখতে আসবে। ছেলের পছন্দেই ওদের পছন্দ। আর তাহলেই বিয়ে।

সব কথাই কানে আসছিল, আড়ালেই ছিল মমতা। তার বাইশ বছরের কুমারী হৃদয় অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনা সংশয় নিয়ে দুলছিল। ঠাকুমার কথা শুনে একটা রুদ্ধ গোপন পুলকোচ্ছ্বাস তরঙ্গের মত ঢেউ তুলল মমতার সর্বাঙ্গে। মায়ের যেমন কথা! বড়লোক হয়ে গেলে কি লোকে ছেলেবেলার সঙ্গীসাথী, প্রতিবেশীদের ভুলে যায় নাকি? তপেশের সঙ্গে কত খেলেছে মমতা, কত ঝগড়া করেছে, মারামারি, প্রত্যেকটি ঘটনা তার মনে আছে! কিছুকালের ছাড়াছাড়ি মানেই কি মন থেকে সরে যাওয়া? মুছে যাওয়া?

কবে দেখতে আসবে মা?

এই তো পরশু বিকেলেই আসবে।

সচকিত হয়ে কান পাতল মমতা। পরশু আসবে! মাঝখানে মাত্র একটা দিন বাদ দিয়ে সে আসবে। নিশ্চয়ই ছেলেবেলার খেলার সাথীটিকে দেখবার জন্যে সেও মনে মনে উৎসুক হয়ে উঠেছে।

ছেলেবেলায় এক রকম দেখেছে। পনেরো বছর বাদে আর এক রকম দেখবে। আর দেখলে মাথা ঘুরে যাবে বৌমা। এমন রূপের মেয়ে কটা দেখেছে ওরা? ওই জন্যেই তো বড় মুখ করে দেখতে আসতে বলতে পারলাম।

শুধু রূপে আজকাল কিছু হয় না মা। দেখলেন তো কত ভাল ভাল সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে গেল। তেমন ঘরে দিতে হলে পয়সাও চাই মা। মমতার মা একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

এখন থেকেই আগ্‌বাড়িয়ে কু-গাইছো কেন বৌমা। বুড়ি রাগ করে উঠল। আমার তো ওদের কথাবার্তা শুনে ভালই মনে হল। সবাই কি সংসারে টাকাটাই দেখে? রূপগুণটাও দেখে বৌমা কেউ কেউ।

ভগবান যদি মুখ তুলে তাকান, নইলে অতবড় ঘরে অমন হীরের টুকরো ছেলের সঙ্গে, এবে আমার অতীত মা—

তা যা বলেছ। বুড়ি এবার হাত পা ছড়িয়ে বারান্দায় বসে তপেশদের নতুন বাড়ি, ঐশ্বর্যের বর্ণনা শুরু করল।

দরজার আড়ালে কান পেতে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল মমতা।

• • • •

সিল্কের পাঞ্জাবী বা জরীপেড়ে বর বর ধুতি নয়। একেবারে অফিসের স্যুটে বুটে কক ঝকে হয়ে পনের বছর বাদে মমতাদের বাড়ি হাজির হল তপেশ। বয়সের তুলনায় একটু ভারিক্কি দেখাচ্ছে ঠোঁটের ওপর দুদিকে ছাঁটা গোঁফের বাহারে। গায়ের রংটা পনের বছর আগে ফর্সার দিকেই ছিল। এখন রীতিমত কাল। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক উন্নতি হয়েছে।

পনের বছর আগেকার কথা ওর ভালকরে মনেও নেই। এখানে আসার কোন কৌতূহল বা আগ্রহও তার ছিল না। নিজের দাম সে ভালকরেই জানে। অনেক বড় বড় জজ ব্যারিস্টারের, ব্যবসাদার জমিদার আই. সি. এসের ঘর থেকে তার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। দু চারটি শিক্ষিতা অতিআধুনিকা সপ্রতিভার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয়েছে। এখানে এই গরীবের ঘরে বিয়ে করার তার কোন অভিপ্রায়ই নেই। শুধু বুড়িটার জন্যে, মায়ের কথায় তাকে মেয়ে দেখার ভান করতে হয়েছে। মনটা প্রসন্ন ছিল না একটুও।

বাড়িটা ওদের নিজেদের। মমতার বাবা মোটা মাইনের অফিসার ছিলেন। খুবই ভাল অবস্থা ছিল ওঁদের। এখন বাধ্য হয়ে একদিকটা ভাড়া দিতে হয়েছে। অনেকদিন সারানো হয়নি।

তবে ঘরখানা যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। টেবিলে নতুন টেবিলক্লথ পাতা হয়েছে। ফুলদানিতে রজনীগন্ধার ঝাড়। জানলা দরজার পর্দাগুলোও বদলানো হয়েছে মাননীয় অতিথির পদার্পণ ঘটবে বলে।

ইচ্ছে না থাকলেও ঠাকুমার ধমকধামকিতে বেশী রকম সাজগোজ করেই মমতাকে তপেশের সম্মুখে

আসতে হল। বসে থাকতে হল মুখ নীচু করে। তপেশের দু একটা মামুলি প্রশ্নের উত্তরে নম্র বিনীত ভাবে জবাবও দিতে হল লজ্জাশীলার মত। ঠাকুমা সমানে বকবক করছিল। বুড়ো বয়সের রোগ। নাতনির রূপ গুণ রান্নাবান্না কাজকর্মের কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে তপেশের কাছে বলে যাচ্ছিল বুড়ি।

মনে মনে বিরক্তি বোধ করছিল তপেশ। অবশ্যই বেনারসী আর গয়নায় মোড়া বস্তুটির রূপ ওর একেবারেই নজরে পড়ছিল না। গুণের ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহই ছিল না। কথাবার্তাতেও সপ্রতিভতার কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছিল না সে। এ যে একেবারেই নিরাশ করার মত! এমন একটা কাপড়ের পুঁটুলিকে পছন্দ করবে কে? বিয়ে করা তো দূরের কথা।

অনেক যত্ন করে দেওয়া চা খাবার অনেক অনুনয় সত্ত্বেও মুখে ঠেকিয়ে সরিয়ে রাখল। বুড়িটা ওর ছেলেবেলার দুষ্টুমির কথা, মমতার সঙ্গে ওর ছেলেমানুষী ঘটনাগুলির কথা বলে বলে ওকে আরো অস্বস্তির মধ্যে ফেলছিল। তাই নানা কাজের অজুহাত দেখিয়ে তপেশ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বুড়িও চেপে ধরল ওকে, পছন্দ হয়েছে তো ভাই?

পরে জানাব। বাড়ি থেকে ওঁরা চিঠি লিখবেন। কোনমতে কথা কটা বলে ও গাড়িতে উঠে বসল। এক মুহূর্তে চোখের আড়াল হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

এবার বুড়ি ঘরে ঢুকে মমতাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল, এতদিনে তোর বিয়ের ফুল ফুটল দিদি। তোর শিবপুজো সার্থক।

কী যে কর ঠাকুমা! কোথায় কি তার ঠিক নেই, তুমি নাচতে সুরু করলে।

বুকের মধ্যে অনেক আশা আনন্দে মেশা অনির্বচনীয় সুখটাকে গোপন রেখে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠাকুমার হাত ছাড়িয়ে সরে গেল মমতা।

ওরে বাপু, বয়সের জন্যে চোখে ভাল দেখতে পাই না বলে কি এসব জিনিষ ঠারে ঠোরে বুঝতেও পারি না? এমন একখানা মিষ্টি মুখ দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে, বুঝলি দিদি? আমি বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছি, তোকে তার খুব পছন্দ হয়েছে দিদি।

পছন্দ হয়েছে? খুব পছন্দ হয়েছে?

মমতা কি সত্য সত্যই—এমন সৌভাগ্যের কপাল করে এসেছে? কিন্তু তপেশের দৃষ্টিতে তার আভাস পেল না কেন তবে মমতা? ভাল লাগার, মুগ্ধ হবার মত আবেশ মথিত চোখ দুটির ভাষা পড়তে ভুল হয়েছিল নাকি মমতার?

না না ভুল হয়নি। ঠাকুমার কথাই হয়তো সত্যি। মমতা নিজে তপেশকে দেখে বিমুগ্ধ মোহিত আবিষ্ট হয়েছিল, লজ্জায় ভাল করে ওর চোখের দিকে তাকাতে পারেনি বলেই ওর মনের, ওর চোখের ভাষা বুঝতে পারেনি। মমতাকে দেখে, অপছন্দ করে ফিরে যাবে বলে তপেশ কখনো তাকে এত বছর বাদে নিজে থেকে দেখতে আসত না। না—না। এমন নিষ্ঠুর মনের মানুষ সে নয়।

তারপরের সমস্ত দিনটা কম্বশ্বাস উত্তেজনায় কাটল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গিয়ে তখনি চিঠি লেখা সম্ভব নয়, তবু মমতার দুটো চোখ আর একটা মন সহস্র চোখ আর সহস্র মন হয়ে পড়ে রইল পথের উপর। যে পথ দিয়ে সকাল বিকেল দুপুর উদ্দিপরা পিওনটা চিঠির ঝোলা কাঁধে নিয়ে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

আশ্চর্য! চিঠিখানা বিকেলের ডাকেই এলো!

চোরের মত পিয়নের হাত থেকে ওটাকে নিয়েই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল মমতা।

বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। ঠাণ্ডা কাঁপা হাতে জল দিয়ে দিয়ে খামের মুখটা খুলে চিঠিখানা চোখের সামনে ধরল। তপেশেরই নামাঙ্কিত প্যাড। ওপরে তার অফিসের ঠিকানা ফোন নাম্বার সব লেখা।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র! তারপরই হাত থেকে চিঠিখানা পড়ে গেল। স্তম্ভিত হতবাক মমতাকে অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানের তীব্র আঘাত কিছুক্ষণের জন্যে বোধবুদ্ধির জগৎ থেকে বিচ্যুত করে এক হতাশাময় ব্যর্থ অন্ধকারে নিক্ষেপ করল।

মাত্র কটি লাইন লেখা ছিল। তপেশের কাকা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন তপেশের মেয়ে পছন্দ হয়নি। জন্ম মৃত্যু বিবাহ যাঁর ইচ্ছায় হয়, সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় এখানে তপেশের বিবাহ হয়। মমতার ঠাকুমা, মা যেন ওঁদের ক্ষমা করেন। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

চিঠিখানা যথাযথভাবে রেখে দেবার আগে তপেশের ফোন নাম্বারটা একটা কাগজে লিখে নিল মমতা। তারপর বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখল চিঠিটা। এত তাড়াতাড়ি এমন চিঠি আসে না। দু এক দিন বাদে এলে এখন আর কোন ক্ষতি হবে না। তার আগে মমতার কিছু করার আছে। এখনো বিকেল পাঁচটা বাজেনি। এখনো সময় আছে—

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এলো মমতা। সবচেয়ে কাছের স্টেশনারী দোকানটায় টেলিফোন আছে।

• • • •

রিসিভারটা রেখে বিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল তপেশ। মমতা তাকে ফোন করেছে। সতেজ বলিষ্ঠ গলায় তাকে ডেকেছে। মমতার জীবন জরুরী কথা আছে তার সঙ্গে। আজই, অফিস ছুটির পরই তপেশ যেন সোজা চলে আসে। কোথায়? কেন, সেই পার্কে। যে পার্কে ছেলেবেলায় অনেক খেলা করেছে দুজনে, সেইখানে। মমতা ওর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

তবে কি চিঠিটা পেয়েছে?

না, গলার স্বরে সেকথা মনে হল না। আর ওই অপমানকর চিঠি পেলে মমতা তাকে কিছুতেই দেখা করতে ডাকত না।

হেমন্তের সন্ধ্যাবেলায় নির্জন পার্কের মধ্যে—

পার্ক! ছেলেবেলার সেই পার্কটা!

সহসা তপেশের মনের মধ্যে কতকগুলো ছেঁড়াছেঁড়া কাটাকাটা ছবি ভেসে উঠল। মমতাদের বাড়ি। তাদের বাড়ি। প্রায় মাঝামাঝি সেই সুন্দর ঘাসছাওয়া সবুজ পার্কটা। কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া আরো কি কি সব গাছের সার। সেই দোলনা। ভাঙা রেলিংএ পা ঝুলিয়ে বসে থাকা একটা দুরন্ত দশবারো বছরের ছেলে, তার পাশে দামী ফ্রক পরা কোঁকড়া চুল আর কালোচোখের ভারী সুন্দর একটা ছোট্ট মেয়ে—তপুদা আমায় দোল দেবে এসো—

সব মনে পড়ছে। কিছুই তো মোছেনি মন থেকে। অর্থ সামর্থ্যের শিখর চূড়ায় উঠে গেলে কি দূরের জিনিষগুলো বড় বেশী ঝাপসা দেখায়? আজ যদি মমতাদের বদলে তাদের এমন অবস্থা হত? আজ যদি মমতার বাবার আকস্মিক মৃত্যুর বদলে তার বাবারই হঠাৎ মৃত্যু হত? তাহলে? তাহলে কোথায় থাকত তপেশরা?

চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল তপেশ। ওর বিক্ষুব্ধ বিবেক নয়, যেন মমতার ডাকই ওকে তাড়িয়ে বার করে দিল অফিস থেকে।

• • • •

উত্তরে হাওয়ায় গাছের শাখা প্রশাখাগুলি কাঁপছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হোলনায় দুলছিল। যুবক যুবতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মমতা গুলমোহর গাছটার তলায় দাঁড়িয়েছিল। কনেদেখা গোধূলী সন্ধ্যার সোনার আলোয় তাকে রূপকথার পাতা থেকে উঠে আসা এক রাজকন্যার মতই মনে হচ্ছিল।

এক বিমোহিত আত্মবিস্মৃত মুগ্ধের মত, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল তপেশ। নিরাভরণা, অতি সাধারণ একটা সস্তা ডুরে সাড়ি পরা এই মমতাই যে কালকের সেই মমতা, সে কথা কোনমতেই যেন ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওর মনে হচ্ছিল ষড়যন্ত্র করে মমতার বুড়ী ঠাকুমাটা যেন তাকে ঠকিয়েছে। এই অপরূপা মেয়েটিকে কাল একটা বিশ্রী ছদ্মবেশ পরিয়ে ওর সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল। তপেশের নির্মম প্রত্যাখ্যানের পর সেই খোলসটা খুলে ফেলে মমতা তার স্বাভাবিক বেশেই ওর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই দিব্য সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করে তপেশ মমতার সুন্দর মুখে রাগ অভিমান অপমানের বিরাগ বিতৃষ্ণার রেখাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করল, আ—আপনি—তুমি কি আমাদের বাড়ি থেকে কোন চিঠি পেয়েছ?

চিঠি? ওঃ বুঝেছি। কই নাতো। বহুক্ষণ রিহার্সাল দেবার পর পাকা অভিনেত্রীর মতই কথা কটা উচ্চারণ করল মমতা।

মজ্জমান মানুষটা যেন পায়ের তলায় শক্ত মাটির স্পর্শ পেল। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল তপেশ। ভাগ্যিস সেই ভয়ঙ্কর অপমানের আগুন ভরা চিঠিখানা এখনো পায়নি মমতা! তা যদি পেত, তবে মমতাকে এমনভাবে দেখার, কথা বলবার মহা সৌভাগ্য থেকে চিরদিন ওকে বঞ্চিত থাকতে হত। আচ্ছা, এমন কি হয়না, কোনদিনও সেচিঠিখানা মমতার হাতে না পৌছয়? কত চিঠিই তো ভুল করে পোস্ট করা হয় না! কত চিঠিই তো ডাকবিভাগের গোলমালে মারা যায়, আর মারা না গেলেও, বছর দশ পনের বাদে—

ওর ভাবনার প্রান্তসীমা ধরে টান মারল মমতা। উত্তরে হাওয়ায় এলোমেলো সাড়ি সামলে, কপালের উড়ন্ত চুল সামলে ওর চোখে চোখে রাখল। উপেক্ষার এতটুকু জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র প্রকাশিত হতে দিলনা কণ্ঠস্বরে—

আপনাকে ব্যস্ত করলাম। কিন্তু আপনাকে না ডেকে আপনার সঙ্গে না দেখা করে আমার উপায় ছিলনা। না জানি আপনি আমাকে কী বেহায়াই ভাবছেন! কিন্তু—

আশ্চর্য মানুষের মন! তার চোখের দৃষ্টি। তার ভাললাগা না লাগা। যে-মমতা কয়েক ঘণ্টা আগে তার মনে শুধু বিরক্তি আর বিরূপতার সৃষ্টি করেছিল, হঠাৎ একটা দিনের মধ্যে সে যেন তপেশকে ছাড়িয়ে তপেশের কল্পনাকে ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে। সে যেন তার অপরিসীম ব্যক্তিত্ব দিয়ে সৌন্দর্য দিয়ে তপেশকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে ফেলছিল ক্রমশ।

আমি ব্যস্ত হইনি আমি—আমি কী করে বোঝাব, তুমি আমায় ডেকেছ বলে আমি কত খুশী হয়েছি—মনে হচ্ছে তুমি যেন সেই ছেলে বেলার সেই ছোট মিতু—

অনেক দিনের পুরোনো নাম। ভুলেযাওয়া নাম। মমতার বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। চোখে মুখে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। তপেশের চোখের মুগ্ধতা থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে। বললে, অনেক কষ্টে ঠাকুমাকে লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। আপনার অফিসটার নাম ঠাকুমার কাছ থেকেই শুনেছিলাম। টেলিফোন গাইড দেখে নম্বরটা বার করে ফোন করতে তাই অসুবিধা হলনা। একটা কথা আপনাকে না জানানো পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

কী কথা ? কী এমন কথা তোমার যে···একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় তপেশ সহসা বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

বলছি। আমার ঠাকুমা লোকে তাকে, বয়সের দোষে পাগলামি করছেন। কিন্তু তাঁর এই পাগলামিতে আমার এতটুকু প্রশ্রয়ও ছিল না। সমানে সমানে ছাড়া বন্ধুত্ব হয়না। আপনারা বড়লোক। আর আমাদের অবস্থা তো জানেনই। আমাকে পছন্দ করার মত কোন কারণই আপনার থাকা উচিত নয়। হয়তো হয়ও নি। কিন্তু তবু, যদি সেই মহাআশ্চর্যের ব্যাপারটাই ঘটে থাকে, সেই জন্যেই আমি আজই আপনাকে ডেকে এনেছি। আপনাদের বাড়ি থেকে কোন খবর আসবার আগেই আমি আপনাকে আমার মনের কথাটা জানিয়ে দিতে চাই। আপনাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভবপর নয়।

অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা মানুষকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে অগাধ জলে ফেলে দিলে সেই মুহূর্তে তার মনের অবস্থা কি হয় ? সাহায্যের জন্যে বোধহয় সে চিৎকার করতেও ভুলে যায়।

তপেশ স্তম্ভিত হতবাক ! তপেশ মমতার মুখ থেকে এতবড় কথার তীব্র আঘাতে যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল।

টেলিফোনে বলতে পারিনি। অপারেটররা হয়তো শুনতে পাবে তাই···তাই আপনাকে ডেকে এনে এখানে বলতে হল। যদি অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করবেন। আচ্ছা আসি তবে। ঠাকুমা আবার—

মমতা গেটের দিকে পা বাড়াল। মমতা চলে যাচ্ছে। তপেশের জীবন মরণ সব খুন করে দিয়ে গরবিনী চলে যাচ্ছে মাথা উঁচু করে। তপেশের জীবনের সবচেয়ে শুভ লগ্ন ভ্রষ্ট করে দিয়ে—

মমতা, শোন, একটা কথার জবাব দিয়ে যাও। সহসা তপেশ মমতার যাবার পথ আটকে দাঁড়াল।

বলুন। শান্ত ধীর জবাব মমতার।

আমাকে বিয়ে করতে না পারার যে যুক্তি তুমি দেখিয়েছ, সত্যি সত্যিই কি সেইটেই তোমার অমতের আসল কারণ ?

হ্যাঁ। অন্য কি কারণ থাকতে পারে ?

হয়তো তোমার মন, তোমার ভালবাসা তুমি কোন সৌভাগ্যবানকে দিয়েছ, লজ্জায় সেকথা বলতে না পেরে একটা মিথ্যে অজুহাত দিয়ে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাইছো—

না—না—না। মিথ্যে কথা। আমি কাউকেই ভালবাসিনি। মুখ নীচু করে অস্ফুট কাঁপা গলায় উত্তর দিল মমতা।

তুমি আমাকে বাঁচালে মিতু। শোন, তাকাও আমার দিকে। আমিও এখন পর্যন্ত অন্যকোন মেয়েকে ভালবাসিনি। আমাদের বাড়ি থেকে তোমাদের বাড়ি একখানা চিঠি আজকালের মধ্যেই যাবে। তাতে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করার মতই কিছু লেখা থাকবে। কিন্তু আরো একখানা চিঠি তারপর তোমার নামে যাবে। সেই দ্বিতীয় চিঠিখানা আমার লেখা, আমার মনের সব চেয়ে বড় ইচ্ছেটার কথা লেখা থাকবে। যদি তোমার মনের ওই ভুল ধারণাটা ভেঙে যায়, দয়া করে দ্বিতীয় চিঠিটার জবাব দিও। আর তারও আগে তোমার আর একটা টেলিফোনের জন্যে আমি কান পেতে বসে থাকব।

মমতা গভীর চোখে তাকাল তপেশের দিকে। বিষণ্ণ সুন্দর সে চোখের বেদনার ছায়া আর একবার অভিভূত করল ওকে।

তারপর তপেশের পিপাসিত অতৃপ্ত দুচোখের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগিয়ে গেল মমতা।

যতক্ষণ দেখা যায় একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল তপেশ ; তারপর একসময় হেমন্তের উতরে হাওয়ায় ঝরে পড়া শুকনো পাতার মত তার পায়ের শব্দ তার অস্পষ্ট মূর্তি সন্ধ্যার অন্ধকারে, শীতের কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

পুরাতন পাতা

বাঙ্গালীর বীরত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালী-ভীরু, সংগ্রাম-বিমুখ, বাঙ্গালীর শৌর্য বীর্য কিছুই নেই, এমনিই অপবাদ অতীতেও অনেকে দিয়েছেন আজও অনেকে দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন থেকে সংকলিত এই রচনাটির ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১২৮১ সালের আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রামপ্রসাদ সেন বাঙ্গালীর বীরত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সেই প্রবন্ধে বাঙ্গালীর অনেক নিন্দা করেন। তারই উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনাটি লেখেন পরবর্তী ভাদ্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। রামপ্রসাদ সেন তাঁর প্রবন্ধে বৃদ্ধভরাম নামে এক পরস্ব ও পিতৃধন বাঙ্গালীর ভীরুতা সম্পর্কে নানা বক্রোক্তি করেন এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতের প্রতি বিদ্রূপ হানেন। স্বজাতির নিন্দা বঙ্কিমচন্দ্র কোনোদিনই সহ্য করতে পারতেন না। কোনোরকম উষ্মা বা পালটা শ্লেষ প্রকাশ না করে তিনি একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে রামপ্রসাদ সেনের রচনাটির উত্তর দিলেন। আজকের দিনে এই রচনাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য কম নয়।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব গৌরব অনেক ছিল, বাঙ্গালীর পূর্ব্ববীরত্বও অনেক ছিল, আপনাদের পূর্ব্ব গৌরব-কাহিনী শুনিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, এবং উপকার ভিন্ন অপকার নাই। যাহাদের মনোবৃত্তি বিকারগ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইহাতে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য আমাদের এই প্রয়াস নয়।

রঘুবংশে কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়; কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী নৌযুদ্ধে পটু ছিল। এবং তখন বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন বালী ও যবদ্বীপেও বাঙ্গালীর জয়পতাকা উড়িয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক রণে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে এমন ভারতবর্ষের আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই।

পাঠানেরা যে কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র লইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছে, এ কথা মিথ্যা। বাঙ্গালায় পাঠানের উদয়, স্থিতি ও বিলয় হইয়াছে, তথাপি অনেকস্থানে অনেক বাঙ্গালী আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে। ইহার পর মোগলের আধিপত্য সময়েও বাঙ্গালীর বীর্য্যবহ্নি নিবিয়া যায় নাই, যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম আমাদের দেশের সকলেই জানেন। প্রতাপাদিত্য কখনও কাপুরুষের ন্যায় আপনার স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই, এবং কখনও কাপুরুষের ন্যায় দিল্লীর সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। আমাদের দেশে যে সকল পরাক্রান্ত বারভূঁইয়ার বিবরণ শুনা যায়, প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের অন্যতম। প্রতাপাদিত্য ব্যতীত আরও অনেক পরাক্রমশালী ভূঁইয়ার নাম করা যাইতে পারে, ইঁহাদের

দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, যুদ্ধপোত ছিল। ইহারা যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইতেন, সাহস দেখাইতেন। ইহারা সৈন্য দিয়া, অস্ত্র দিয়া, যুদ্ধপোত দিয়া বাদশাহের সাহায্য করিতেন। ইহারা গৌড়ের অধিপতির অধীনে থাকিয়া, শেষে আপনাদের ক্ষমতাবলে স্বাধীন হয়েন। ইহারা কাহাকেও কর দিতেন না, বা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ইহারা আপনা আপনি স্বাধীন রাজা হইয়া, যুদ্ধের জন্য এবং পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ নিবারণ জন্য সৈন্য ও নাবিক পোত রাখিতেন। অতএব বাঙ্গালী পূর্ব্বে বীরত্বশূন্য ছিল না।

আমরা এস্থলে এই বলবীর্য্যশালী বাঙ্গালী ভূস্বামীদিগের আরও দুই এক জনের নাম করিব। খিজিরপুরের ঈশাখাঁর বীরত্বের বিবরণ আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর লিখিত কোন বাঙ্গালা ইতিহাসে উঠে নাই। ঈশাখাঁ নাম শুনিয়াই অনেকে মনে করিতে পারেন, এ ব্যক্তি পাঠান ছিল: সুতরাং ইহার কথা তুলিয়া বাঙ্গালার বীরত্বের গৌরব করা অসঙ্গত। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি ঈশাখাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন। তাঁহার নাম কালিদাস। হুসেন সার রাজত্ব সময়ে (খ্রীঅব্দে ১৪৯৩-১৫২০) কালিদাস মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং ঈশাখাঁ পাঠান নহেন, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর সন্তান, বিশেষ বাঙ্গালী।

ঈশাখাঁ সুবর্ণগ্রামে আধিপত্য করিতেন, সমস্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি আসামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটীতে, বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের অপর পারস্থ ত্রিবেণীতে, এবং যে স্থানে লাক্ষ্যানদী ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছেন সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী এগারসিন্ধুতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে রালফ ফিচ নামে একজন ভ্রমণকারী সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হয়েন। তিনি লিখিয়াছেন, এই সমস্ত দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশাখাঁ। তিনি অন্যান্য অধিপতিদিগের মধ্যে প্রধান, এবং খ্রীষ্টানদিগের পরমবন্ধু। ১৫৮৫ খ্রীঅব্দে দিল্লীশ্বরের সেনানী সাহাবাজ খাঁ অনেক সৈন্য সামন্তের সহিত পূর্ব্ব বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, কিন্তু ঈশাখাঁর পরাক্রমে তাঁহার এই দেশ জয়ের চেষ্টা বিফল হয়। সাহাবাজ খাঁ পরাভূত হইয়া প্রস্থান করেন। ঈশাখাঁর স্বাধীনতা অটল থাকে; এই সময়ে ঈশাখাঁর জয়পতাকা গোয়াঘাট হইতে সমুদ্র তট পর্য্যন্ত উড়িয়াছিল।

ঈশাখাঁকে ছাড়িয়া দিলেও বলবীর্য্যশালী খাঁটি হিন্দু বাঙ্গালীর অভাব হইবে না। বিক্রমপুরের কায়স্থ-বংশীয় চাঁদরায় ও কেদাররায় পরাক্রান্ত ভূস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, যে ঈশাখাঁর বীরত্বে মোগল সেনানী বিস্মিত হয়েন, সেই ঈশাখাঁর সহিত এই দুই ভ্রাতায় সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। ঈশাখাঁর সহিত যুদ্ধে চাঁদরায় ও কেদাররায় দীর্ঘকাল আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। বাক্লা চন্দ্রদ্বীপের (বর্ত্তমানে বাখরগঞ্জ জেলা) কন্দর্পনারায়ণ রায়, ও সুন্দরবনের সন্নিহিত প্রদেশের মুকুন্দরামও বীরত্বে বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৮৬ খ্রীঅব্দে রালফ ফিচ বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ দর্শন করেন, তাঁহার লিখিত বিবরণে স্পষ্ট বোধ হয়, বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ বর্ত্তমান স্বাধীন রাজাদিগের শাসিত রাজ্য অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিলনা কন্দর্প নারায়ণের অনেক সমরপোত ছিল। অদ্যাপি তাঁহার একটি পিতলের কামান চন্দ্রদ্বীপে আছে, ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী "চরমুকুন্দিয়া" নামক স্থানে মুকুন্দরায়ের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম দিল্লীশ্বরের একজন সেনানিকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাহার পুত্র শত্রুজিৎও দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বাঙ্গালীদিগের এইরূপ প্রতাপ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা যশোহরের রাজা সীতারামকে দেখিতে পাই। কেহ কেহ সীতারামকে একজন ডাকাইত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা ইহাতে সায় দিই না। সীতারাম একজন পরাক্রান্ত হিন্দু জমীদার, সে সময়ে বাঙ্গালার আর কোনই রাজার এ বীরত্ব তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সীতারামের সেনাপতি সেনাহাতীর

নামে অদ্যাপি যশোহরের লোকের হৃৎকম্প হইয়া থাকে। সীতারামের পরাক্রম যখন বাড়িয়া উঠে তখন বাহাদুরসা ও ফিরোজ সাহ যথাক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে যশোহর জেলা বারদ চাকলায় বিভক্ত ছিল। এই সকল চাকলার অধিস্বামিগণ বাদশাহকে কর দিতেন না। বাদশাহ সীতারামের পরাক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই এই অবাধ্য জমীদারদিগকে বশীভূত করিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম বাদশাহের আদেশ লিপি পাইয়া, অবিলম্বে অবাধ্য জমীদারদিগকে দমন করিয়া বারদ চাকলার অধিকারী হয়েন এবং বাদশাহ হইতে এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ রাজা উপাধি লাভ করেন। ইহার পর সীতারাম বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা উচ্ছেদ করিলে, নবাব তাঁহার শাসন জন্য অনেকবার সৈন্য পাঠান, কিন্তু সীতারামের বীরত্বে নবাবের সৈন্য বারম্বার পরাভূত হয়। নবাব অবশেষে অনেক সৈন্যের সহিত স্বীয় জামাতা আবুতরাবকে প্রেরণ করেন, মহাপরাক্রম সেনাপতী সীতারামের অনুপস্থিতিতেই এই সৈন্যদল পরাজয় করেন, এবং নবাব জামাতা আবুতারাবের ছিন্ন মস্তক আনিয়া সীতারামকে দেখান। পূর্ব্বে বাঙ্গালি শত্রু আক্রমণে পৌঢ় মারিত না।

ঐতিহাসিকের মতে সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি দেওয়ান মানিকচাঁদ ও মোহনলাল বাঙ্গালী। সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতায় ইংরেজদের দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন মানিকচাঁদ, আক্রমণকারী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। পলাসির যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই; এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মিরজাফর বিশ্বাসঘাতক হইয়া সিরাজউদ্দৌলাকে কুপরামর্শ না দিলে, পলাসির যুদ্ধে জয়ী হওয়া ক্লাইভের ভার হইত। বাঙ্গালি এক সময়ে ব্রিটিশ তেজের নিকটেও অবনত হয় নাই।

আমরা আর অধিক উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইতে চাহি না। যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে বাঙ্গালি ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে কিরূপ ক্ষমতাপন্ন ছিল, বুঝা যাইবে। আমরা এস্থলে বাঙ্গালীর সাহসের একটি উদাহরণ দিব। ইতিহাস নির্দ্দেশ করে যে, সুরবংশীয় করিম স্বহস্তে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া 'শেরশাহ' নাম ধারণ করেন। একাকী একটা বাঘকে মারিয়া ফেলাতে ইতিহাসে শের আফগানের সাহসে কতই প্রশংসা করে। করিম যে সাহস দেখাইয়া ইতিহাসে নাম রাখিয়াছেন, হতভাগ্য বাঙ্গালার একজন হিন্দু যুবকও এক সময়ে সেই সাহস দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসের পত্রে আজ পর্য্যন্তও তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। এই বাঙ্গালী যুবকের নাম উদয়নারায়ণ, বাসস্থান ঢাকার অন্তঃপাতী উলাইল পরগণা। উদয়নারায়ণের মজুমদার উপাধি, মিত্রবংশীয়। রাজাচন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণের বংশের সহিত ইহার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে কন্দর্পনারায়ণের বংশ লোপ হইলে, তাহাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি উদয়নারায়ণের হস্তগত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে মুর্শিদাবাদের নবাব বংশের এক ব্যক্তি উদয়নারায়ণকে এই সম্পত্তির অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন, উদয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাবের দরবারে ইহা জানাইলে নবাব কহেন, যদি উদয়নারায়ণ স্বহস্তে একটি ব্যাঘ্র বধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি দেওয়া যাইবে। উদয়নারায়ণ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন, নবাবের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। অবিলম্বে একটি ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অস্ত্রকৌশলে তাহাকে হত্যা করিয়া আপন সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। বাঙ্গালি পূর্ব্বে যেমন বলশালী ছিল, সাহসী বলিয়াও বিখ্যাত ছিল।

এক্ষণে যাঁহারা আপনাদের বাসগ্রামে বানরের পাল আসিলে, মহাভীত হইয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সংবাদপত্রে আর্ত্তস্বরে চীৎকার আরম্ভ করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদের ন্যায় অপদার্থ ছিলেন না; আর যাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রের অদ্ভুত বীরত্বে উচ্চ হাস্যের সহিত করতালি দেন, তাঁহাদিগকে বলি, বাঙ্গালি পূর্ব্বে সাহসশূন্য ও বীরত্বশূন্য ছিল না, এবং বাঙ্গালা এক দিনেই অধঃপাতে যায় নাই।

চলতি দুনিয়া

ম্যাসাচুসেটের নিষিদ্ধ ফিল্ম

বোস্টন উচ্চ আদালতের বিচারক ছারী কালুস রায় দিতে গিয়ে মন্তব্য করলেন "বীভৎস অশ্লীলতার দুঃস্বপ্ন।" তাঁর আদেশ ক্রমে ম্যাসাচুসেট শহরে নিষিদ্ধ হয়েছে ৮৭ মিনিটের তথ্যমূলক ছায়াছবি 'টিটিকাট ফলিস।' রাষ্ট্র পরিচালিত ব্রিজ ওয়াটার মানসিক হাসপাতাল এই ছবির উপজীব্য। ছবিটির নির্মাতা ফ্রেডারিক ওয়াইজম্যান। বিচারক তাঁকে আদেশ দিয়েছেন ছবির সমস্ত প্রিন্ট এবং নেগেটিভ আদালতে সমর্পণ করতে। মানসিক হাসপাতালের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সাধারণের জানার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই অধিকারেরও সীমা আছে। 'টিটিকাট' সেই সীমা লংঘন করেছে। সরকারের অ্যাটর্নী জেনারেল এলিয়ট রিচার্ডসন অভিযোগ এনেছেন যে চিত্র-নির্মাতা ওয়াইজম্যান হাসপাতালের রোগী ও রোগিণীদের নগ্ন দেহের ফটো তুলে তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করেছেন।

প্যারাডাইস আইল্যাণ্ড হোটেল

স্থলের বজরায় চ'ড়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবার রেয়াজ এখন হয়তো আর নেই। নাই বা থাকলো। জেট-এর যুগ এখন। যাওয়া চলে বিমানে—যাত্রাপথে শাম্পেনের বোতলের ছিপি খুলতে-খুলতে। মস্কো বা হংকং যে কোনো শহরই হতে পারে গন্তব্যস্থল। সম্প্রতি প্যারাডাইস আইল্যাণ্ড হোটেলে বিশিষ্ট অতিথিদের নিয়ে এক আন্তর্জাতিক সমাগম ঘটেছিলো। এতে যোগ দিয়েছিলেন লণ্ডন থেকে জয়পুরের মহারাজা ও মহারাণী ও লেডি অ্যাস্টর, মাদ্রিদ থেকে তরুণ লর্ড লিচফিল্ড, ও স্পেনের এক কাউণ্ট আর তাঁর স্ত্রী, রোম থেকে ডোনা অ্যালেগ্রা, প্যারিস থেকে রাজকুমারী গেগি অ্যায়েনবার্গ, হলিউড থেকে ক্যারল চ্যানিং। গিয়েছিলেন আরো অনেকে। ধনবান ও সুন্দরীদের সমাগমে প্যারাডাইস হোটেল বাস্তবিকই স্বর্গীয় শোভা ধারণ করেছিলো।

বাবার বিরুদ্ধে নালিশ

লণ্ডনের কাণ্ড। থানায় গিয়ে বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় ছেলে। ছেলের বয়েস এগারো। বাবা গর্ড হ্যালিওয়েল নামে এক ভদ্রলোক। স্ত্রী-র সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তিনি রাগের মাথায় তার পোষা বেড়ালটাকে উনুনের আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তাই ছেলে নালিশ করে বাবার নামে। আদালতের বিচারে বাবা ছ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মূষিক-মন্দির

নয়াদিল্লী, ১০ মার্চ—ভারতের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি এবং আকারে সবচেয়ে বড় ইঁদুর রাজস্থানে। শুধু তাই নয়, সেখানে নাকি একটি মূষিক-মন্দির আছে। সেখানে ইঁদুর পুজো হয় এবং ইঁদুরদের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ৫০ কিলো খাদ্যশস্য দেওয়া হয়। মন্দিরটি যেখানে আছে সে জায়গাটির নাম দেশনোক—বিকানীর থেকে আট মাইল দূরে। খবরটি দিয়েছেন ভারতীয় শস্যরক্ষাকারী প্রাণী-পতঙ্গ নিরোধক সমিতির সভাপতি শ্রী এন এস রাও।

বিশ্ব জনসংখ্যা

ওয়াশিংটন, ১০ মার্চ—বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন মিনিটে ১৩২। এবং ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জনসংখ্যা ৬০০ কোটি অথবা তারও বেশিতে পৌঁছবে।

একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জনসংখ্যা ব্যুরোর হিসাবমত, বিশ্বের ১৯৬৮ সালের পয়লা জানুয়ারির লোকসংখ্যা ৩৪৪ কোটি ৩০ লক্ষ। রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্ষপঞ্জী থেকে তাঁরা এই হিসাব দিয়েছেন। ব্যুরোর মতে, ১৯৮০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা হবে ৪০০ কোটি।

অন্ধ বনাম অন্ধ

দুজনেই অন্ধ। সিংহলের স্কুল শিক্ষয়িত্রীটি আর ইংল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোক। পরিচয় চিঠিপত্রের মাধ্যমে। বেশ কিছুদিন ধ'রে তাদের দুজনের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলে। চিঠির আলাপে পৌঁছায় প্রেমালাপে। দু'বছর এমনি ভাবে চলার পর দেখা-সাক্ষাৎ হয় দুজনের, তারপর বিবাহ। লণ্ডনে।

তুর্কী বিবেক

তুরস্কের পথ দিয়ে যাচ্ছিলো একজন লোক। তার হাতে ছিলো একখানা ছড়ি। তাই দিয়ে হঠাৎ সে একটি মেয়েকে উত্তম-মধ্যম দিতে শুরু করে। চিৎকার ক'রে বলে: "অসভ্যের মতো এমন আধা উলঙ্গ পোষাক পরেছো কেন? আমাদের ধর্ম আর নৈতিক চরিত্র কলুষিত করতে চাও? তোমার এই ধিঙ্গিপনা অসহ্য।" ব'লেই আবার প্রহার। পুলিশ এই লোকটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় চিকিৎসার জন্য।

অদ্ভুত বিবাহ-বিচ্ছেদ

তুরস্কেরই আরেকটি ঘটনা। এক নবদম্পতী বিয়ের একঘণ্টা পরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন।

রেজেস্ট্রি করার পর বর-কনে বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। কী ভাবে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হবে, তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। তারই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে বিয়ের পোশাকেই তারা চ'লে যান আদালতে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন।

মেয়েদের পেশা

মেয়েদের পেশা সব দেশেই আগে ছিলো সীমিত। স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা, কারখানা বা খনিতে কাজ ইত্যাদি। কিন্তু ধীরে-ধীরে কর্মজগতের পরিধি বেড়ে গেছে। আগে যে সব পেশা নিষিদ্ধ ছিলো এখন মেয়েরা তাও গ্রহণ করছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার, মেকানিক, পুলিশ, ট্রেন কনডাকটরের কাজ নিয়েছে মেয়েরা। এ তো জানা কথা। কিন্তু যেটা জানবার কথা তা হলো পশ্চিম জার্মানীর কিছু মেয়ে জীবিকা হিসেবে কশাইয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেছে। নিজের হাতে গরুর জবাই এবং কাটা ছেঁড়া করছে।

বিবাহ-সঙ্কট

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থিনী। বয়েস ২৭। উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। ছিপছিপে চেহারা। টেকনিশিয়ান। একটি সন্তান আছে। তিন কক্ষ যুক্ত একটি বাড়ির মালিক। জীবনের নানা দিকে আকর্ষণ আছে এমন একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। কেউ কি আমাকে ভালোবাসতে পারেন?

চেকোস্লোভাকিয়ার একটি সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এক চেক মহিলা। এটা শুধু একটি একক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমস্ত পূর্ব য়ুরোপেই বিবাহ-বিচ্ছেদের ধুম পড়েছে।

হাঙ্গারীতে জন্মের হার পৃথিবীর ভিতরেই সব চাইতে কম। হাজারে ১৩'৬। ওই দেশে প্রতি বছর যত শিশু জন্মায় তার চাইতে অনেক বেশি গর্ভপাত হয়। রুমানিয়াতে গত বছর প্রতি চারটি বিয়ের মধ্যে একটি বানচাল হয়ে গেছে। এমন কি রোমান ক্যাথলিক পোল্যাণ্ডে পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা অস্বাভাবিক রকম ভাবে বেড়ে গেছে।

আসামীর জবাব

বিচারক নিজের উচ্চ আসন থেকে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন: "দুষ্কর্ম ক'রে লাভ কিছুই হয় না।"

আসামী: "ও কথা বলবেন না হুজুর, অপরাধ না করলে কী নামকরা ভালো-ভালো সব জুরী, বাঘা ব্যারিষ্টার—উকিল এবং চতুর রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ পেতুম?"

সুলতানের প্রেম

টুরিস্টের মেয়েকে দেখা মাত্রই সুলতান তার প্রেমে পড়লেন। টুরিস্টের দিকে তাকিয়ে বললেন: "যদি আমার কাছে আপনার মেয়েকে বিয়ে দেন-তো ওই মেয়ের যত ওজন সেই ওজনের হিরে আপনাকে দেবো।"

টুরিস্ট বলে: "আমাকে কয়েকদিনের সময় দিন।"

"কেন, ভেবে দেখবার জন্য?"

"না, মেয়েটাকে আরো মোটাসোটা করবার জন্য।"

চুম্বনে বিপত্তি

ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের আপেলের মতো লাল টুকটুকে গাল দেখলেই তার সদ্ব্যবহার অনেকের। কোলে তুলে নিয়ে সমানে চুমো খেতে থাকেন।

আর আজকাল তো তরুণ-তরুণীদের পূর্বরাগ বেশি বিলম্বিত নয়; আর নিতান্ত নিরামিষও নয়। প্রেমের শুরুই হয় চুমো দিয়ে। ঝোপঝাড়, পার্কের নিরালা কোণ, রাতের ছায়া, রেঁস্তোরার পর্দা ঘেরা কেবিন—একটু সুযোগ পেলেই হলো। ঠোঁট নিশপিশ ক'রে ওঠবে দু পক্ষের। তারপর দীর্ঘস্থায়ী, কখনো বা সংক্ষিপ্ত চুম্বন-পর্ব। কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকারা ভেবে দেখেছেন কি প্রেমের আবেগে আত্মহারা হয়ে নিজেদের কত বড় সর্বনাশ তারা ডেকে আনছেন। চুমো খাবার সময় ঠোঁটের থুথু আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে এক দেহ থেকে অন্য দেহে চালান হয়ে যাচ্ছে নানারকম রোগের জীবাণু, প্রেমিকারা সাবধান। সাবধান শিশুদের বাপ-মায়েরা। এই বিপদের কথা বলে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন পশ্চিমের নামজাদা চিকিৎসকেরা। ওদেশে এই সমস্যা ভীষণ ভাবে দেখা দিয়েছে এবং এই নিয়ে এখন বিরাট গবেষণা চলেছে।

ব্যাপার যা চলছে

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য গল্প-ভারতী সম্পাদক দায়ী নন)

১৯৬৮ সালের প্রথম তিনমাস সারা বিশ্ব যে খবর নিয়ে মেতে উঠেছে আর সেই সঙ্গে যে আন্তর্জাতিক মোচ্ছব চলেছে তার কাছে রাজনীতি, মুদ্রাস্ফীতি, জন্মনিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন করভার, দলীয় কোন্দলবাজী, আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচন, শর্মিলা ঠাকুরের প্রায়-নগ্ন দেহ-সৌষ্ঠবের ছবি এমন কি জ্যাকুলিন কেনেডির আবার বিয়ের গুজব—সমস্তই চাপা পড়ে গেছে। সে খবরের কেন্দ্রস্থল ভারতবর্ষ আর তার নায়ক মহাঋষি মহেশযোগী। পৃথিবীর বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নাম যখন ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পাতায় লেখা চলে তখন তার মধ্যে মহাঋষি মহেশ যোগীর নাম অবশ্যই থাকবে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, গল্‌ফ থেকে শুরু করে হা-ডু-ডু-ডু পর্যন্ত নানা খেলার মধ্যে মহেশ যোগীর খেলার নাম—যোগক্রীড়া। এই খেলার অঙ্গ হচ্ছে গাঁজা খাওয়া এবং চোরাকুটুরির মধ্যে বসে ধ্যান করা। এই দুই হাতিয়ার নিয়ে মহেশযোগী "গেরো যোগী ভিখ্ পায়

১৯৬৩ সালের ২৮শে আগস্ট। আমেরিকার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মার্চ অন ওয়াশিংটন। চলো ওয়াশিংটন। কালো মানুষদের উপর পীড়ন আর বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে দুই লক্ষাধিক নিগ্রো নরনারীর এক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা হোয়াইট হাউস অভিমুখে চলেছে। লিঙ্কন স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে ডঃ মার্টিন লুথার কিং জনতাকে উদ্দেশ করে সেদিন বলেছিলেন—"আমি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখেছি, একদিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ের নীচে গতদিনের ক্রীতদাসের সন্তানরা আর গতদিনের ক্রীতদাস-মালিকদের সন্তানরা পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলে সম্বোধন করে এক সঙ্গে পাশাপাশি বসে আনন্দ করছে। আমি স্বপ্ন দেখেছি, মে-সিসিপি-রাজ্য আজ অবিচার-অত্যাচারের পঙ্কিল আবর্তে ডুবে রয়েছে সেই রাজ্য সুবিচার আর স্বাধীনতার মরুদ্যানে পরিণত হয়েছে। আমি স্বপ্ন দেখেছি, আলাবামা শহরে ছোট ছোট কালো ছেলেমেয়েরা তাদের বয়সী সাদা ছেলেমেয়েদের হাত ধরে একসঙ্গে বেড়াচ্ছে, পরস্পর পরস্পরকে ভাই আর ভগ্নী বলে মনে করছে।"

মহান বিশ্বনাগরিক ডঃ মার্টিন লুথার কিং কি তাঁর জীবন আহুতি দিয়ে সেই স্বপ্নকে সফল করে তোলবার প্রেরণা দিয়ে গেলেন আমেরিকাবাসীদের মনে?

লিঙ্কন, গান্ধী, কেনেডি—তাঁদের পাশে আসন নিলেন মার্টিন লুথার কিং। সারা জগত আজ তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে! আমরাও সেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে যোগ দিচ্ছি।

না" এই সত্য উপলব্ধি করে চলে গেলেন য়ুরোপ, আমেরিকায়। ব্যস। দেখতে দেখতে সে সব দেশে হৈ-চৈ পড়ে গেল। নতুনতর নেশা পেয়ে সে দেশের খুদে খুদে ধনকুবের মেয়ে-মদ হুমড়ি খেয়ে পড়ল মহেশ যোগীর পায়ে। যেমন কড়া যোগী তেমনি কড়া ব্যবসায়ী। লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক মুদ্রা কামিয়ে যোগী দেশে ফিরেছেন এবং ঋষিকেশের তেহরি গাড়োয়াল-এর কাছে পাহাড়ের তলায় বানিয়েছেন এক বিরাট যোগ-'আকাদামি'। সে এক এলাহি ব্যাপার। বিরাট বিরাট সব বাড়ি। সুসজ্জিত এবং তাপনিয়ন্ত্রিত। মাটীর তলায় সাধন ভজনের জন্যে প্রায় ১০০ চোরাকুটুরি। বহু তপস্বী এবং তপস্বিনী বিদেশ থেকে এসে আড্ডা গেড়েছে সেখানে। তাদের মধ্যে বিটল আর হিপি-রাই বেশী। অঢেল টাকার লেনদেন চলছে সেখানে। মহেশ যোগী দেশ দেশান্তরে যাবার জন্যে এরোপ্লেন কিনেছেন। শুনছি নাকি এরোপ্লেনে এদেশ থেকে ওদেশে উড়ে যাবার সময় তিনি এরোপ্লেনের ছাদে বসে থাকবেন। এমনি তাঁর যোগবল যে তাতে তাঁর কোনো অসুবিধে হবে না। ব্যাপারটার বিরাটত্বে আর আন্তর্জাতিক সোরগোল দেখে সত্যি তাক্ লেগে গেছে। আমেরিকান কাগজে লেখা হয়েছে—"ভারতীয় গুরু আমেরিকানদের চোখে নতুন স্বপ্নের কাজল পরিয়ে দিয়েছেন। ১৯৬৮ সালকে বলা যেতে পারে গুরু-বৎসর"। বড় বড় কূটনীতিবিদ ব্যক্তিরাও সেখানে গুরুর সামনে বসে চোখ বুজে ধ্যান করছেন। কে না যোগ দিয়েছে সেখানে সেই সাধন বেলায়? উকিল, ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, হিপি, বিটল, ফিল্মস্টার, কেউ বাদ নেই। সে দেশের পত্রিকার মতে আমেরিকার নাকি আড়াইলক্ষ নরনারী এই তুরীয় ধ্যান অভ্যাস করছেন। মহাঋষি মহেশ যোগী বলেছেন—এই ধ্যানের মাধ্যমেই আসবে সর্বমানবের মোক্ষ। তা সে যাই হোক—বিনা পয়সায় ধ্যান করা চলবে না, ধ্যানাশ্রম খুলেই মহেশযোগী আটাশ হাজার ডলার বৈদেশিক মুদ্রা তুলিয়ে নিয়েছেন। প্রথম দিনেই ৭০ জন আমেরিকান ভর্তি হয়েছে। তিন মাসের পাঠ, তার জন্যে প্রত্যেককে দিতে হয়েছে চারশ ডলার। অর্থাৎ প্রায় দু'হাজার টাকা। তাছাড়া অন্যান্য ফিও আছে। একেই বলে একটা আন্তর্জাতিক হিড়িক আর নতুন কিছু করার মোহে নতুন নেশার পাগলামি। হোক পাগল-ছিমখানা—খেলা দেখাচ্ছেন বটে মহাঋষি মহেশ যোগী।

• • • •

আর ভাবনা নেই। ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য এখন স্ব-স্ব প্রধান! ভারতীয় সংহতি মহাসমুদ্রে ভেসে গেছে। রাজ্যে রাজ্যে সেনাদল। আর তাদের স্লোগান হল—ভিন রাজ্যের মানুষরা হটো এখান থেকে। অতএব ভারতের প্রত্যেক রাজ্যই অচিরকালের মধ্যেই স্বাধীন হয়ে উঠবে। আসামের 'লাচিট সেনা' বাঙ্গালী আর মাড়োয়ারীদের খেদাচ্ছে। মাদ্রাজের 'তামিল সেনা' তাড়া করছে উত্তর ভারতের লোকদের। কেরালার 'গোপাল সেনা' তলোয়ার ঘোরাচ্ছে অন্য রাজ্যের লোকেদের লক্ষ্য করে। মহারাষ্ট্রের 'শিবসেনা' মাদ্রাজীদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ছে। মধ্য প্রদেশের 'ভীম সেনা'ও কম যাচ্ছে না। বাংলা দেশেও গজিয়ে উঠেছে—'বিজয় সেনা'—'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়'। সেনায় সেনায় ছয়লাপ, সারা ভারতে লঙ্কাকাণ্ড লেগে যেতে আর দেরী নেই। আসামে আবার একাধিক সেনা—'আলফা হিন্দু ইউনাইটেড ফ্রন্ট', 'বন সেনা' আর 'সেনক্লাক।' এদের দাপটে আসাম সরকার বিপর্যস্ত বললেও চলে। শিগ্‌গীরই দেখা যাবে এইসব সেনাদের তাণ্ডবে রাজধানীর কর্তারাও কড়ঠাকুরুণকে নিয়ে শেষের দিন গুনছেন।

• • • •

'হিন্দী হাটাও—বাংলা বাঁচাও'। শহর কলকাতাতেও সুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ কলকাতার সাহার্স এ্যাভেনিউ দিয়ে যদি পথ চলে থাকেন তো নিশ্চয় দেখেছেন বড় বড় বাড়ীগুলোর লম্বা-লম্বা দেওয়ালে কালো কালো হরফে বড় বড় লেখা। রক্তমাখা শব্দ যোজনা, 'বাংলা মুলুকে হিন্দী চলবে না', 'হিন্দী হাটাও, বাংলা চালাও', 'হিন্দীওয়ালা ভাগো, বাংলা ভাইরা জাগো' ইত্যাদি। সুরু যখন হয়েছে তখন ধকধক বেধে যদি যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই হাটাও—বাঁচাও নিয়েই তো আমরা বেঁচে আছি।

• • • •

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেলো। বাংলা বছরের শেষ মাসে 'ব্যাপার যা চলছে' লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে বছরটা গেলো। তাই কিছু মিষ্টি চাটনি দিয়ে বছরটাকে বিদায় করি।

(এক)

এক মেডিকেল কলেজের একজন ডাক্তার রাষ্ট্রপতির অবৈতনিক চিকিৎসকরূপে নিয়োগ-পত্র পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে কলেজে ক্লাস নিতে এসে সেই সুখবরটি ছাত্রদের কাছে ঘোষণা করলেন এবং ব্ল্যাকবোর্ডে সেই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি লিখে দিলেন যাতে সকলে জানতে পারে। পরদিন যখন তিনি সেই ক্লাসে এলেন তখন দেখলেন সেই নোটিশের নীচে কে যেন বড় বড় করে লিখে দিয়েছে—ঈশ্বর আমাদের রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করুন।

(দুই)

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গর্বভরে বললেন—আজ আমার ৯০ বছর পূর্ণ হল। এ পৃথিবীতে আমার একজনও শত্রু নেই।

বললাম—ভারী ভালো তো। এতদিন বেঁচে আছেন অথচ শত্রুহীন, এমন দেখা যায় না।

বৃদ্ধ বললেন—ছিল। ব্যাটারা সব মরে ভূত হয়ে গেছে অনেক দিন। বাঁচার দৌড়ে আমি তাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়েছি।

(তিন)

এক গ্রামে এক গোলদার-এর একটা গাধা একদিন সেই গোলদারের শাশুড়ীকে এমন এক চাট মারল যে শাশুড়ী ঠাকুরুণ তার চোটে অজ্ঞা পেলেন। জামাই বেচারা খুব দুঃখ পেলো। শাশুড়ীকে যখন সবাই মিলে সৎকার করতে নিয়ে গেলো তখন সেও গেলো তার গাধাটিকে সঙ্গে নিয়ে। শ্মশানে দেখতে দেখতে অনেক লোক জড় হল। একজন তিনদেশী ব্যক্তিও সেখানে হাজির হয়েছিল। সে বললে—মহিলাটি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন বলতে হবে। এত লোক তাঁর সৎকারে এসেছে।

তার কথা শুনে অপর একজন বলে উঠল—আরে না মশাই, বুড়ীর জন্যে কেউ আসেনি। সবাই এসেছে গাধাটাকে দেখতে। অনেকেই গাধাটাকে কিনতে চাইছে।

সেদিনের সেই এক বাঙালী ঃ পাঁচু ঠাকুর

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"গাও মাতঃ সুরবনে, বাণী বিধায়িনি,
কমল আসনে বসি, বীণা করি করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দান্ত বাঙালী—
ত্যজিয়া বিলাস ভোগ, চাকুরির মায়া
টানা পাখা বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ায় ঠেস
উৎসর্জি সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ঝুল কোঁচা,—
ভারতের নির্বাপিত গৌরব প্রদীপ—
তৈলহীন, সলতে হীন, আভাহীন, এবে—
জ্বালাইয়া পুনর্বার, উজলিয়া মহী।'

"ভারত উদ্ধার" কাব্য যখন বেরলো তখন তাবায় বাংলা দেশের লোক চমকে উঠেছিল। এ কি প্রচণ্ড শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ রচনা!! কে এর লেখক এই রামদাস শর্মা? ক্রমে পরিচয় জানা গেল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রস-সাহিত্যের উত্তরাধিকারী পঞ্চানন্দ নামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯১১)

"ভারত উদ্ধার" কাব্যটি সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"ইহা নিঃসংশয়ে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা।"

হাস্যরস চর্চায় ও শ্লেষাত্মক রচনায় ইন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ শক্তি আজ বিদগ্ধজনস্বীকৃত। তাঁর নানা বিষয়ের নানা ধরণের রচনা পড়ে আশ্চর্য হতে হয়, কী ব্যাপক ছিল তাঁর দৃষ্টি, সামান্য সহজ ঘটনার মধ্যে দিয়ে কী গভীর জীবনদর্শনের পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন।

দুর্ভাগ্য যে ইন্দ্রনাথের রচনার প্রতি আজকের পাঠকের উৎসাহ নেই। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে বাঙালীকে চিনতে হলে, বাংলার ঐতিহ্যকে জানতে এবং স্বীকার করতে হলে ইন্দ্রনাথের রচনাগুলি পড়া অপরিহার্য। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথাগুলি বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য: "ইন্দ্রনাথের রসরচনার মূল উৎস হইল তাঁহার দৃঢ় আদর্শনিষ্ঠা ও হিন্দুধর্মে অবিচল বিশ্বাস। এই আদর্শনিষ্ঠা ও স্থিরবিশ্বাসের বলেই তিনি উহার বিরোধী শক্তিসমূহের প্রতি এরূপ নির্মম ও অকুণ্ঠতীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার রসিকতা কেবল খোস মেজাজের ফল নহে। সুগভীর জীবন প্রত্যয়েরই

ইন্দ্রনাথের নিজের লেখা আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে তিনি ১৮৪৯ সালে, বাংলা ১২৫৬ সনে ২রা বৈশাখ পাণ্ডুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে গঙ্গাটিকুরী গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন পূর্ণিয়ার উকিল। এনট্রান্স পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। তারপর হুগলী কলেজ থেকে ১৮৬৯ সালে বি. এ. পাশ করেন। মধ্যে কিছুদিন শিক্ষকতা করে ১৮৭১ সালে আইন পাশ করে ওকালতি শুরু করেন। তার পরে কিছুদিন মুনসেফী করার পর বরাবর কলকাতা হাইকোর্টে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত আইনজীবীরূপে কাজ করার শেষে বর্ধমানে অবসর জীবন যাপন করেন।

কলকাতায় থাকাকালে সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে কিছুকাল তাঁর বাসা ছিল। সেই বাসা থেকেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির শুরু। এবং পঞ্চানন্দের আবির্ভাব।

ইন্দ্রনাথের হাস্যরস সৃষ্টির আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তা বারবার পড়ে উপলব্ধি করার জিনিস। আমরা তাঁর কয়েকটি রসসৃষ্টির নমুনা উদ্ধৃত করে দিলাম। এই নমুনাগুলির মধ্যে আশা করি তাঁর রচনার বৈশিষ্ট পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন।

লেজ। লেজ। লেজ!

একটি বিজ্ঞাপন

আমাদের দোকানে অতি উৎকৃষ্ট সুগোল সুদীর্ঘ সুসঠন বিস্তর লেজ বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে। লেজগুলি বিশেষ উপকারজনক। তুমি যখন মাতাল হইয়া আড়ইভাবে পড়িয়া থাক, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে বচন নাই, হাতে পায়ে স্পন্দন নাই, তখন এই লেজ আপনা আপনি তোমার বিনা চেষ্টায় বিনা পরিশ্রমে মুখের কাছে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া মাছি তাড়াইতে থাকিবে। টাকাওয়ালা বাবু হও তো লেজ লও।

তুমি এক প্রকাণ্ড বক্তা, মস্ত বুদ্ধিমান উকিল, মওয়াল জবাব করিতেছ, হাত-পা কতই নাড়িতেছ, —এমন সময়ে মোক্তার আপন কারখানি দেখাইবার জন্য তোমার কানের কাছে ভিন ভিন করিয়া তোমার শ্রোত ভঙ্গ করিয়া দিতেছে, তোমাকে বিরক্ত করিতেছে। থামাও তাহাকে লেজের এক বাড়ি মারিয়া।

তুমি মজলা-কেলা কমিশনর, অমুক কমিটির মেম্বর, রায়ে রায় দিয়া কর্তার মন যোগান আর পাড়াপড়শিকে ভোগান তোমার অবশ্য কর্তব্য। কর্তার হাতে যদি তোমার লেজটি দিয়া রাখিতে পার তাহা হইলে তুমি নির্ভর, নিঃসংশয়, নিশ্চিন্ত। কর্তা যেই লেজ ধরিয়া টান দিবেন, অমনি তুমি তাঁহার দিকে ঝুঁকিবে। যদি এ সম্মানের পদ রাখিতে চাও, একটি লেজ লও।

তুমি বাগ্মি-প্রধান, সভাপতি মহাশয়, তোমার একটি লেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি বায়ুর বরপুত্র। তুমি কথায় কথায় বক্ত বহাইয়া দাও, বায়ুবেগে আপনি কতই উচ্চে আরোহণ কর। তোমার সঙ্গে উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে ভারত এতদিন অধঃপাতিত থাকিত না। কিন্তু নিঃসহায় নিরবলম্ব ভারত কী ধরিয়া উঠিবে? তুমি লেজে বাঁধিয়া না তুলিলে এই অসাড় অন্তঃসার ভারতের কোনো উপায় নাই। লেজ লও, তোমার মহিমার ধ্বজা উড়াও, ভারতের উদ্ধার বার্তা বায়ুবেগে বিঘোষিত কর। মহাভাগ, লেজ লও।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন। বল দেখি, বুড়োরা বেশীদিন বাঁচে কেন?

উত্তর। যাহারা অল্প বয়সে মরে তাহারা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না বলিয়া।

প্রশ্ন। সহজে কাহারও বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার উপায় কী?

উত্তর। তাহার সম্মুখে তাহাকে বোকা বলা। কানাকে কানা বলিলে রাগ করে, যার চক্ষু আছে সে করে না।

প্রশ্ন। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কাহাকে বলে?

উত্তর। ঘড়ি। চলিলেই অস্থাবর, না চলিলেই স্থাবর।

প্রশ্ন। মানুষের চলা বন্ধ হয় কখন?

উত্তর। মানুষ যখন মাটী হয়।

প্রশ্ন। 'সাহিত্য সভা' কাহাকে বলে?

উত্তর। একটা বয়াটে ছেলে; পড়াশুনায় মন নাই; আধাটুকু শিলঙ্গ, চিঠিপত্র ছাপাইয়া দরখাস্ত করে, ভিক্ষা করে, অভিনন্দন লেয়, শেষে ধরা পড়ে।

প্রশ্ন। কে সর্বাপেক্ষা লগ্ন মুহূর্ত্ত ঠিক গণনা করিতে পারে?

উত্তর। পাওনাদার; তাহাকে যখন আসিতে বলিবে, সে ঠিক তখনই আসিয়া উপস্থিত।

প্রশ্ন। সর্বাপেক্ষা উত্তম বাদ্য কে?

উত্তর। যুবতীর চক্ষের জল।

হিসাবী লোক

ব্যারাসাতের ভুলু মাষ্টার গাঁজা খায়, কিন্তু খুব হিসাবী লোক। লালুবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া ভুলু মাষ্টার একদিন শুনিল যে কলিকাতায় গাঁজা বড় সস্তা।

দিন দুই পরে ভুলু মাষ্টার আবার লালুবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত। গল্পের প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিল, "যথার্থ কথা, কলিকাতায় গাঁজা খুব সস্তা। দু'আনায় যাহা আনিয়াছি এখানে দশ পয়সাতেও তত পাওয়া যায় না।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি গিয়াছিলে নাকি?"

ভুলু বলিল,—"ভাই, না গিয়ে কি রোজ রোজ ঠকব? একখানি ফিরতি গাড়ি পেয়েছিলাম; সবে বারো আনা ভাড়া। আসবার সময় কিন্তু বেশি পড়েছিল, পাঁচ সিকা। কিন্তু বন্ধে বিশ্বাস করবে না, আট পয়সায় এই এত গাঁজা।"

যেটা পছন্দ হয়

কেশব চক্রবর্ত্তীরা দুই ভাই, জ্যেষ্ঠ কেশব, কনিষ্ঠ সদাধর। গ্রামান্তরে কলারের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বাড়ীতে ঠাকুর। অনেক বেলা পর্য্যন্ত সভীর চিন্তা করিয়া কেশব বলিল—"সদা, কি করবি? হয়, তুই ঠাকুর পুজো কর, আমি কলারে যাই; নয়ত আমি কলারে যাই, তুই ঠাকুর পুজো কর।"

সদাধর সাধাসিধা লোক; উত্তর দিল—"যা বলো তাই করি; কিন্তু কলারটা আমি ছাড়ব না।"

ধনী হইবার সহজ উপায়

আমেরিকাতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন—"যাহারা সহজে ধনী হইবার উপায় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অদ্য হইতে ছয়মাসের মধ্যে আধ আনা মূল্যের এক একখানি ডাক টিকিট সহিত আমাকে পত্র লিখিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।"

ধনী হইবার সকলেরই ইচ্ছা। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতার নিকট নিত্যই রাশি রাশি পত্র আসিতে লাগিল। কিন্তু ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। তথাপি কেহ উত্তর পায় না। ব্যস্ত হইয়া অনেকে পুনর্বার পত্র লিখিতে লাগিল। তখন সেই ব্যক্তি আবার এই বিজ্ঞাপন দিল—"আমি পূর্ব বিজ্ঞাপন অনুসারে যে টিকিট পাইয়াছি, তাহা বিক্রয় করিয়া আমার লক্ষাধিক টাকা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সহজে ধনী হইবার উপায় আর কি আছে?"

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী

অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য ইন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হল—

কল্পতরু। উপন্যাস। ১২৮১ সালে রচিত। ইন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বছর। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র এই বইয়ের এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। তা থেকেই বোঝা যায় ঐ একটি বই লিখেই ইন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

ভারত উদ্ধার। ব্যঙ্গ কাব্য। ১২৮৩ সালে রচিত। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় সাড়া পড়ে যায়।

পাঁচু ঠাকুর। রস রচনা। ১২৮৭ থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত যে সকল রচনা 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে লিখেছিলেন তারই সংকলন। মোট পাঁচটি খণ্ডে রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। এই বইটিকেই তাঁর আজীবনের সাহিত্য সাধনা বলা যেতে পারে।

বিবিধ রচনা। বঙ্গবাসী, নবজীবন, সাধারণী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর নানা বিষয়ে প্রবন্ধ ও রস রচনা প্রকাশিত হত। বঙ্গবাসীতেই তিনি সবচেয়ে বেশী লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুর অনেকদিন পরে যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে প্রবন্ধগুলি আছে। তাঁর স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রত্নাকর

"সংকল্প্য ভগবানেবং সর্বান বেদানুস্মরণ্
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাদি সম্ভবন ॥

ভগবান প্রজাপতি পঞ্চম বেদ নির্মাণের সংকল্প করে সকল বেদ স্মরণ পূর্বক নাট্যবেদের সৃষ্টি করেছেন।

ধর্ম্যমর্থং যশস্যঞ্চ সোপদেশং সসংগ্রহং
ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্বকর্মানুদর্শকম ॥

নাট্য ধর্মার্থপ্রদ, যশস্কর, উপদেশময়, সর্বশাস্ত্র সংকলন রচিত এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বের সর্বকর্মের পথ প্রদর্শক।

নাট্য চিন্তা

এ যুগের কোন বিশিষ্ট কর্মপথের সন্ধান এ জাতি এখনো পায়নি। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, নতুন পরিবর্তনকে আমরা আহ্বান করেছি। কিন্তু পুরনো বাসভবনকে পরিত্যাগ করে ছেড়ে আসতে পারছি না। তাই দেখতে পাই সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে জনচিত্তের বলিষ্ঠ কোন আহ্বান নেই, আবেদন নেই। চাষী, প্রমা, শ্রমিক, মজুর প্রভৃতির দুঃখ দুর্দশা নিয়ে ভাষা ভাষা বাঁধা বুলি আমরা যথেষ্ট বলতে শিখেছি—আসতে সে সব বুলির পিছনে থাকে নিজেদেরই বড়লোক হওয়ার আকুল কামনা।

উপরন্তু বর্তমান প্রায় সবগুলি আধুনিক নাটকেই দেখতে পাই আদর্শ ও ইজমের কসরৎ। তাই সাধারণ জনসমাজ সে সব নাটকের রসোপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বিস্তীর্ণ জনসমাজকে এসব নাটক উপেক্ষাই করে অথবা বিস্তীর্ণ জনসমাজ সম্বন্ধে বর্তমান নাট্যকারদের কোন ধারনাই নেই। প্রকৃত জাতীয় রঙ্গমঞ্চ মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের জীবননাট্য-রূপায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাকে সর্বজীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে উঠতে হবে। রঙ্গমঞ্চ অথবা নাট্যশিল্প কোন শ্রেণীর একচেটিয়া মালুষের নয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ সমগ্র মানব সমাজের, শ্রেণী বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষেরই কোষাগার স্বরূপ।

মন্মথ রায়

আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[বাংলার নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটি স্মরণীয় নাম। হাস্যরসবোধক মহৎ নাট্যের স্রষ্টারূপে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর কালজয়ী একাধিক সৃষ্টি, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতি নাটক আজো তাদের দ্যুতিময় আবেদন দর্শকদের বিমোহিত করছে।]

বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে বিদ্যাভ্যাস কালে বাইরনের এবং মেঘদূত ও উত্তর চরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাত গিয়া ক্রমাগত Shelley পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বারবার পড়িতাম : ও শেষোক্ত কবির নাটকের যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হইত, মুখস্থ করিতাম।

বিলাতে যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'প্রস্তাকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতে অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।

১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতাবলী ক্রমে 'নাট্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই! কেবল 'দেবতরে সন্ধ্যা' নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া Sir Edwin Arnold-কে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গলা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legends-এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাংলা কবিতা লিখিয়া, "আষাঢ়ে" নামে প্রকাশ করি। সেই সময়ে আমি ইংরাজি গান খুব গাইতাম। ইংরাজি গান প্রায় বাঙ্গালী শ্রোতারই ভাল লাগিত না। তখন ইংরাজি গান গাওয়া ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালায় গান রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করি।

বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া নাট্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং আমি কাব্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমায় স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।

আমি উপরে এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, কারণ উপরি লিখিত প্রত্যেক ব্যাপারই আমার নাটক লিখিবার প্রবৃত্তির সহায়তা করিয়াছিল।

প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌষ্ঠবে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা, কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে 'কল্কি অবতার' নামে একখানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্ব্ব রচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া "বিরহ" নাটক রচনা করি। এবং ক্রমে সে নাটক ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎপরে উক্তরূপে "ত্রাহস্পর্শ" রচনা করি এবং উহাও ষ্টারে অভিনীত হয়। পরে প্রায়শ্চিত্ত রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আমার গম্ভীর রচনাও চলিতেছিল। মৎপ্রণীত "সীতা" নাট্যকাব্য নবপ্রভায় প্রকাশিত হয়। পরে "পাষাণী" নাটক প্রকাশ করি। তৎপরে আমি "তারাবাই" নাটক প্রকাশ করি।

যে কারণে আমি প্রহসন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার অনুরূপ কারণে আমি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় নাট্যসাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যানবস্তুগঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে Shakespeare-এর অনুকরণে blank verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। "তারাবাই" প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর—মাইকেলের ছন্দমাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল—যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে কথা গদ্যের মত হইতেই হবে। Shakespeare-এর অমিত্রাক্ষর Milton-এর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক। Of man's disobedience ইত্যাদির একটা ঝঙ্কার আছে। To be or not to be that is the question—ইহা ত গদ্য বলিলেই হয়। তবে কবিতা বলিয়া ইহা চালান কেন? গদ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত। কিন্তু তৎপরেই who would bear the whips and scorns of time কিংবা For in that sleep of death what dreams may come ইহা গদ্যবৎ কবিতা! দেখিলাম যে Shakespeareএ খানিক গদ্য খানিক পদ্য—তথাপি দুইটি ধারা বহিতেছে। কারণ ইংরাজী ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালাতে "তুমি যদি যাও সখি, আমি সেথা যাবো" ইহার পরে "নবীন নীরদ শ্যাম নিকুঞ্জবিহারী" এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়ই চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে।

Carlyle-এর মতে সামান্য হইতে গম্ভীরতম—এমন কোন ভাব নাই যাহা পদ্য অপেক্ষা গদ্যে সুন্দরতররূপে প্রকাশ করা না যায়। পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায় কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই। বঙ্কিমবাবুর গদ্য অনেক স্থলে ত পদ্য। Schiller, Lessing, Ibres, Moliere ইত্যাদি মহা

শেকারপীয়রের বহু মহা-নাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে ত তাঁহাদের মহিমা কমে নাই। Schiller-এর ছন্দ ভাষা ও রূপক অনুপ্রাসে গদ্যের চৌদ্দপুরুষ।

তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয়ে ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। ইহার উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক (ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) হয় ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্ত্তা ত পদ্যে কয়ে না, গদ্যে কয়ে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক হইবেই।

এই রকম বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। ইহার আমি আমার তারাবাইয়ের পরবর্ত্তী নাটকগুলি (রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান ও সাজাহান) ক্রমে গদ্যেই রচনা করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা চলিত শব্দ বেশী জোরের সহিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে সেখানে প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।

যখন উক্ত গদ্য নাটকগুলি রচনা করিতেছিলাম তখন একখানি অপেরা (সোরাব রুস্তম) পদ্যেও রচনা করি। কারণ অপেরার কথাবার্ত্তা স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে শ্রুতিমধুর করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলাম। সে অপেরাখানি কয়েকস্থলে Shelley-র অনুকরণে প্রণয়ন করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহা কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তির ফল। মাঝে মাঝে কবিতায় দুই একখানা নাটক লিখিবার লোভ বরণ করিতে পারি নাই।

জীবনী ও স্মৃতিকথা

সেদিনের মঞ্চ-নায়ক
যাদের আমরা ভুলে যাচ্ছি

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
১৮৮৯-১৯৫৪

বাংলা রঙ্গমঞ্চে এমন জন্মের নট আর বোধকরি কেউ ছিলেন না। সীতার বাল্মিকী চরিত্রটির এমনতর জীবন্ত রূপ দান করেন যে তারপর থেকে তাঁর নাম হয় মহর্ষি। জন্ম—ঢাকার বারপাড়া গ্রামে। ন'জন ভাইবোনের মধ্যে মনোরঞ্জন ছিলেন সপ্তম। ১৯০৫ সালে জলপানি পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। এফ. এ পড়বার সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন। বরাবর স্বদেশী ব্রতধারী ছিলেন ও খদ্দর পরতেন। কিছুদিন গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯১১ সালে রিপন কলেজে আই. এস. সি. তে ভর্তি হন এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও ১৯১৪ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এফ. এ. তে উত্তীর্ণ হয়ে চতুর্দশ স্থান লাভ করেন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এস. সি-তে ভর্ত্তি হন। এই সময় তাঁর পড়াশোনায় বাধা যতীন সেন সাহায্য করেন। তৃতীয় স্থান অধিকার করে বি. এস. সি পাশ করেন। ১৯১৬ সালে রাজদ্রোহের পরাধে গ্রেপ্তার হন। ১৯২০ সালে মুক্তি পেয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালে ৬০৲ মাইনেতে কেমিস্ট-এর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এম. এস. সি পড়বেন বলে চাকরি ছেড়ে দেন। সি. ভি. রমন তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং পড়া ছেড়ে দেশবন্ধুর ন্যাশন্যাল কলেজে ৮০৲ মাইনেতে অধ্যাপনার কাজে

চন্দ্রশেখর নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করে সবাইকে অবাক করে দেন। পাঠ্যাবস্থা থেকেই নাট্যাভিনয়ে তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। ইতিমধ্যে আর একবার গ্রেপ্তার হোয়ে কিছুদিন কারাবাস। তারপর বেকার জীবন। মধ্যে চাকায় কয়েকটি অভিনয় করেন। তারপর কলকাতায় এসে শিশিরকুমারের অধীনে তাজমহল থিয়েটার-এ যোগদান করেন ৮০৲ মাইনেয়। ১৯২৩ সাল থেকে শিশিরকুমারের সঙ্গে বহুদিন ছিলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হবার পর তিনি অন্য রঙ্গালয়গুলিতেও অভিনয় করেছেন বহু বহু নাটকে। নট হিসাবে তাঁর সততা আর আন্তরিকতা ছিল সর্ব সময়ে সন্দেহাতীত। সীতায় বাল্মিকী, জনায় নীলধ্বজ, আলমগীরে তহবর খাঁ, বিসর্জনে রাজা, নরনারায়ণে অর্জুন, ষোড়শীতে সাগর সর্দার, শেষ রক্ষায় শিবচরণ, রমায় বেণী ঘোষাল, চিরকুমার সভায় রসিক, মুক্তির উপায়ে ফকিরচাঁদ, পোষ্যপুত্রে রজনীনাথ স্বরচিত চক্রব্যূহে কর্ণ, প্রভৃতি বহু নাটকে স্মরণীয় অভিনয় করেন। ছবির পর্দায়, দেনা পাওনা, চণ্ডীদাস, কপালকুণ্ডলা দেবদাস, সীতা, সাপুড়ে, জজসাহেবের নাতনি, শেষ রক্ষা প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেন। সেই সময়কার দর্শকদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা কম ছিল না। দু'বার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। শিশিরকুমারের দলের সঙ্গে আমেরিকায় এবং তার অনেক পরে সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে রাশিয়ায়। তাঁর রচনা : ব্রতচারিণী, দেশবন্ধু, বন্দনার বিয়ে, চক্রব্যূহ ও হোমিওপ্যাথী নাটক এবং একটি প্রবন্ধের বই। ব্যক্তিগত জীবনে অনাড়ম্বর শুদ্ধাচারী এই মানুষটিকে দেখলেই শ্রদ্ধা জাগত মনে। খদ্দরের কাপড়, খদ্দরের চাদর, বেশির ভাগ সময়েই খালি পা। দেখলে, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা বলে মনেই হোত না, মনে হত যেন এক স্বদেশী নেতা।

[আগামী সংখ্যায় : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

নব নাট্য গোষ্ঠী

স্কটিশচার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির অভিনয় : সুশীল মুখোপাধ্যায়ের 'আজকের নাটক'।

গতবছর পঞ্চভারতীর ফাল্গুন সংখ্যায় স্কটিশচার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের অভিনয় সম্পর্কে যে কথা লিখেছিলাম তা পুনরায় বলা যেতে পারে। "বাংলা দেশে যেসব অপেশাদার নাট্য সংস্থা আছে তাদের মধ্যে স্কটিশচার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ বিশেষ উল্লেখ ও স্বীকৃতির দাবী অর্জন করেছে। প্রতি বছর এঁরা একটি করে নতুন নাটক অভিনয় করেন এবং প্রতিবারই এঁদের অভিনয় উচ্চমানের পর্যায়ে পৌঁছোয়।"

স্কটিশচার্চ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার সুশীল মুখোপাধ্যায় এঁদের অভিনয়ের জন্যই (পরে আরও নানা সংস্থা নাটকগুলি অভিনয় করে) ১৯৫৮ সাল থেকেই প্রতিবছর নতুন নতুন নাটক লিখছেন। তাঁর এ বছরকার নাট্যোপহার—"আজকের নাটক।" সাম্প্রতিক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি ঘটনা, যথা টেলিফোনে ভুল নম্বরে যোগাযোগ ঘটে' অজানা তরুণ তরুণীর রসালাপ ও ময়দানে দেখা করার জন্য দিনক্ষণ নির্ধারণ, তরুণ তরুণীর বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা, সিনেমা-তারকা হবার লোভে মেয়েদের সর্বনাশ, ভদ্র ও মার্জিত বেশে বাঙালী তরুণের পাপাচরণ ইত্যাদি ঘটনাগুলি এই নাটকটি রচনায় নাট্যকারকে প্রেরণা দিয়েছে। টেলিফোনে রং কানেকশন দিয়ে

এই নাটকের শুরু। তারপর নাটকের ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে উত্তরোত্তর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি এবং চমকপ্রদ ও নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে এর সমাপ্তি। নাটকের মুখ্য চরিত্র শ্যামল, এক সুন্দর-চেহারা মার্জিত-রুচি তরুণ দুর্বৃত্ত। তার ফাঁদে পড়ল যূথিকা নামে একটি চালুরে মেয়ে।

অবসর-প্রাপ্ত পোয়েন্দা এবং এক বেসরকারী পোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের মালিক দুর্গাশঙ্করের ভাইপো নীরেন কাকার নির্দেশে এই ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে যূথিকার প্রতি আকৃষ্ট হল।

কবি নামে আর একটি মেয়েও শ্যামলের হাতে প্রতারিত হল। এই নাটকের অন্য একটি সাংসারিক চিত্রে দর্শক দেখেন এক সদাপ্রসন্ন গৃহস্বামী শ্রীপতি, তাঁর স্ত্রী সুরমা এবং তাঁদের কন্যা লতা। শেষের দিকে শ্যামল এদের সংস্পর্শে এসে ঘটনাকে ঘোরালো করে তুলল। অবশ্য এই নতুন পরিস্থিতির জন্য দায়ী হলেন পক্ষী থেকে আগত, বাত ও বার্ধক্যগ্রস্ত সুরমার দাদা হিরণ্ময়। তিনি না জেনে শ্যামলকে লতার পাত্ররূপে নির্বাচন করে তাকে একেবারে শ্রীপতির বাড়ীতে নিয়ে এসে হাজির করলেন। অবশ্য শ্যামল শেষপর্যন্ত গ্রেপ্তার হবার ভয়ে কেটে পড়ল। যূথিকা নিজের ভুল বুঝতে পারলে এবং নীরেনের সঙ্গে তার মিলন হল। লতার বন্ধু এবং পছন্দকরা বর বারীনও শেষ দৃশ্যে এসে হাজির হল। জোড়া শাঁখ বাজল। এই জোড়া শাঁখ বাজানোর ব্যাপারে শেষের দিকে আসর মাৎ করে রাখলেন বাতের ও বার্ধক্যের রুগী হিরণ্ময়। এই ভূমিকাটিকে জীবন্ত করে সুন্দর অভিনয় করলেন নাট্যকার ও পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায়। খল-নায়ক শ্যামলের ভূমিকায় অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুনতর ভঙ্গীতে দুর্বৃত্ত চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন। গান-পাগল দিলখোলা শ্রীপতির চরিত্রে প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। নীরেনের কাকা দুর্গাশঙ্করের ভূমিকায় রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় একটি সুন্দর টাইপ সৃষ্টি করেছেন। নীরেন রূপে বিমান গুপ্ত চরিত্রটির মধ্যে বিশেষ দক্ষতায় প্রাণের স্পর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। দুর্বৃত্ত দলের নায়ক কামতাপ্রসাদ চরিত্রটিকে অমর বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র একটি দৃশ্যেই পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করতে পেরেছেন। ছোট ছোট টাইপ চরিত্রে কমলপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মোহন চক্রবর্তী, সুধাংশু গাঙ্গুলী, অসীম চক্রবর্তী, অরুণ বসু ও বাসাভোষ বসু, সকলেই সুষ্ঠুভাবে নিজনিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। স্ত্রী ভূমিকায় যূথিকারূপে কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয় অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হয়েছে। লতা ও কবির ভূমিকায় যথাক্রমে আভা দাশ ও পূরবী মুখোপাধ্যায় দর্শকদের খুশী করতে সমর্থ হয়েছেন। তুষারিকা চক্রবর্তীর সুরমা অভিনয়ের গুনে অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়েছে। নাটকটির গতি কিছু মন্থর হলেও (যা সহজেই সংশোধন করা যেতে পারত অভিনেতৃরা আর একটু চেষ্টা করলে) স্থানে স্থানে নাটা মুহূর্ত ও অন্যান্য কারুকৃতি সৃষ্টি করে পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্রভাবে সেদিনকার অভিনয় দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে।

স্টার লাইফ ট্রাফিক।

এঁরা সেদিন স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের 'জব চার্ণকের বিবি' উপন্যাসের নাট্যরূপ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন শিবব্রত : অতীত দিনের নায়ক জব চার্ণক ও নায়িকা লীলাবতীকে ঘিরে ঘটনার যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল শিবব্রতের নাট্যরূপে তা সজীবতা লাভ করেছে। কয়েকটি সংঘাত সমৃদ্ধ মুহূর্ত সৃষ্টি করে নাটকটিকে সব দিক থেকে গতিশীল করে তোলা হয়েছে। প্রতিটি শিল্পী নিজ চরিত্র সম্পর্কে সচেতন থাকায় সম্বন্ধ অভিনয়ে

চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে অভিনয় করেছেন হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় (চেম্বারলেন), নিতাই বসু (ক্যাচাহেন), সুব্রত রায় (ইলিয়ট) নবদত্ত (পিটম্যান) লতিকা হালদার (এলেদা)।

অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন—রূপ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ কুণ্ডু, প্রবোধ মিত্র, সুধি চট্টোপাধ্যায়, শান্তি মুখোপাধ্যায়, উৎপল লাহিড়ী, অরুণ পাল, মাণিক গোস্বামী, পুতুল চক্রবর্তী, সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়।

ছিটলে গ্রেসাম রিক্রিয়েশন ক্লাব।

এই ক্লাবের শিল্পীবৃন্দ কয়েকদিন আগে বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় করলেন বিমল রায়ের একাঙ্ক নাটক 'অভিনয়' ও সলিল সেনের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'মৌচোর'। 'অভিনয়' একটি রহস্যধর্মী নাটক, এক রহস্যের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে এ নাটকের কাহিনী। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশ হাস, অজিত রায়চৌধুরী, নিখিল মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু সরকার, সুনীল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মৌচোর নাটকে অংশগ্রহণ করেন—সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মিত্র, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মী দে, প্রতিমা পাল, রাহু রায়, সৌমেন মজুমদার, সমুদ্রাস চৌধুরী, প্রেমজিৎ সিনহা, অর্ধেন্দু সরকার, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ হাস, নিখিল মুখোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন হাস গণেশচন্দ্র হাস, নমিতা দত্ত।

উত্তরণ গোষ্ঠি।

কিছুদিন আগে এঁরা প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে 'মমতাময়ী হাসপাতাল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন। এই নাটকের বহু জায়গায় শিল্পীদের নিষ্ঠার অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অভিনয় করেন—রবীন সরকার, রবীন চট্টোপাধ্যায়, পরেশ ঘোষ, অরবিন্দ হাস, খোকন সরকার, চৈতালী রায়, সুনন্দা হাস, দীপঙ্কর মৈত্র, সনৎ বসু, দেবাশীষ ঘোষ, দীপেন সরকার, অসীম মিত্র, চণ্ডী ঘোষ।

বিহার আর্ট থিয়েটার।

বিহার আর্ট থিয়েটার নাট্য প্রযোজনা নিয়ে যে মৌলিক চিন্তার গভীরে ডুবে আছেন, তা ইতিমধ্যেই প্রত্যাশিত ফলল এনেছে। তার প্রমাণ প্যানোরামিক স্টেজের আবিষ্কার যা বিদেশের বিদগ্ধ নাট্য সমালোচকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। এই স্টেজেই সম্প্রতি পাটনা শিল্পী সমিতির প্রযোজনায় পরিবেশিত হল 'শাজাহান' ও 'লৌহকপাট'। এই দুটি নাটকের নির্দেশনা ও পরিকল্পনার দায়িত্ব বহন করেন বিহার আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়।

তরুণ কর্মিবৃন্দের প্রাণপাত পরিশ্রমে পাটনার কালীবাড়ীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নির্মিত হয় প্যানরামিক স্টেজটি। নাটকের উদ্বোধন করেন বিহারের মন্ত্রী শ্রীবিজয় কুমার মিত্র, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 'সার্চলাইট' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার।

এই স্টেজটি ছিল অনেক বড় অন্যান্য স্টেজের তুলনায়। সামনে ৪০ ফুট, পিছনে ৩০ ফুট, এবং উঁচুতে ২০ ফুট। মঞ্চের ডানদিকে আগ্রাদুর্গের প্যানোরামা, সামনে প্রশস্ত চত্বর যেখানে সম্রাট শাহাজাহান বাল্যের খেলাধূলো কাটিয়েছিলেন। মঞ্চের বাঁদিকে দিল্লী দুর্গ প্রাকারের প্যানোরামার সামনে ময়ূর সিংহাসন ও ঔরংজেবের রাজসভা। এই দুই প্যানোরামার মাঝখানে সাজানো হয়েছিল অন্যান্য নানা দৃশ্য। মোনাল সিনেটেমে যখন সে দৃশ্যটির অভিনয় হচ্ছিল তখন সেখানেই শুধু আলো দেওয়া হয়েছিল। অন্য অন্য অংশ ছিল অন্ধকার। অভিনয়ে ঔরংজেব রূপে রণজিৎ চক্রবর্তী, শাহাজাহান চরিত্রে

সুভাষ সেন, জাহানারায় ভূমিকায় হেনা মুখোপাধ্যায়, দারার চরিত্রে অজিত গাঙ্গুলী, এবং দিলদার রূপে প্রভাত গাঙ্গুলী উচ্চাঙ্গের নাট-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হয়।

দ্বিতীয় দিনে জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস লৌহ কপাটের নাট্যরূপ অভিনীত হয় এবং দলগত অভিনয় গুণে দর্শকবৃন্দের প্রশংসা পায়। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন, নেপাল ভট্টাচার্য, সুশীল চক্রবর্তী, অজিত বিশ্বাস ও প্রণব গাঙ্গুলী।

রঙমহলে 'নহবৎ'

একেই তো বলি এন্টারটেনমেন্ট! নাট্যাভিনয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে রসানুভূতির আমেজে কিছুক্ষণের জন্য উৎফুল্ল সজীব রাখা, সংসারের দিনগত পাপক্ষয়ের পর দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি থেকে তাকে ঘুরে নিয়ে গিয়ে কিছু সময়ের জন্যে তাকে এক সুখদ কল্পলোকের সন্ধান দেওয়া, তাহলে 'নহবৎ' যে পরিপূর্ণ সার্থকতা অর্জন করেছে, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রতিরাত্রে পূর্ণ প্রেক্ষাগারের অগণিত দর্শকদের কলোচ্ছ্বাস আর হর্ষধ্বনি। নাটক তো শুধু লিখলেই হল না। এর দায় দায়িত্ব অনেক। বার্ণার্ড শ বলেছেন—বড় কঠিন কাজ আমাদের। একটি থিয়েটার-কর্তৃপক্ষ এসে বললেন, তাঁদের জন্যে নাটক চাই। ব্যাস, নাটক লিখে দিতে হবে। কিন্তু সহজে কী সে কাজটি হবে? নাটক লেখা শুরু করার আগে অনেক তথ্য আমায় জানতে হবে। যথা, সেই থিয়েটারের সংগতি কেমন, অভিনেতা অভিনেত্রীরা কী ধরনের, আগে যে সব নাটক ঐ থিয়েটারে হয়েছে তাদের প্রযোজনা ও অভিনয় কেমন হয়েছে, টেকনিশিয়ান, রূপসজ্জাকরীরা, এরাই বা কেমন দক্ষ, থিয়েটার-কর্তৃপক্ষ ভালমত প্রচারকার্য করেন কিনা, তাঁরা সৎলোক কিনা, অর্থাৎ নাট্যকারের ও শিল্পীদের প্রাপ্য মেটে দেবার তালে থাকেন কিনা এবং সর্বোপরি সেই থিয়েটারে কোন শ্রেণীর দর্শক বেশি ভিড় করে।

নহবৎ-এর নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যগতিকে এইসব তথ্যগুলি ষোল আনা জানেন। তাছাড়া দর্শকদের নাড়ীজ্ঞানও তাঁর আছে পুরো মাত্রায়। এবং সেই সঙ্গে আছে লিপি নৈপুণ্য। ফলে নহবৎ এমন একটি নাট্যাভিনয় যা দেখে দর্শকরা আনন্দ পাবেনই। দর্শকদের জন্যে নহবৎ-এর নাট্যকারের এই যে ভাবনা তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। দর্শকরা কী করে ম্যাক্সিমাম্ আনন্দ পাবেন তারই জন্যে তিনি সর্বপ্রযত্নে নাটকের ঘটনা সাজিয়েছেন, চরিত্র বিন্যাস এবং খুঁটিনাটি যাবতীয় কাজ করেছেন। বলতে আনন্দ বোধ করছি যে, ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, সবকিছুর মধ্যে আছে একটি পরিশীলিত মার্জিত মনের ছাপ, যা আগাগোড়া চুস্ত এবং সংবেদনশীল। নাটকটির গঠন, উপস্থাপন, ঘটনা, চরিত্র, সবই স্বাভাবিক এবং অকৃত্রিম। সে কারণে দর্শক সহজেই নাটকের ঘটনা এবং চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছেন। একজন সমালোচকের মন্তব্য পুনরুক্তি করে বলা যায়, "নহবৎ এমন এক প্রাণবান উপভোগ্য নাটক যে, এক এক সময় মনে হয়েছে, অজান্তে ঐ বিয়ে বাড়ীতে ঢুকে পড়ে আমরাও এই আনন্দ বেদনার অংশীদার হয়ে পড়েছি।"

অত্যন্ত সত্যি কথাই বলেছেন তিনি। নহবৎ এক বিয়ে বাড়ীর নাটক। মেয়ের বিয়ের রাত। সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত, অর্থাৎ বর আসা থেকে পরের দিন ভোরে বরকনে চলে যাওয়া পর্যন্ত, এই নাটকের আয়ুষ্কাল। এইটুকুই সময়ের মধ্যেই কত চরিত্র, কত ঘটনা, কত উদ্ঘাটন, কত প্রীতি, কত বেদনা, আর সর্বোপরি কী চমৎকার। দুঅঙ্কে নাটকটি বিধৃত। প্রথম অঙ্কের প্রায় দেড়ঘণ্টা সময় যেন চোখের নিমেষে কেটে যায়, এমনি দ্রুত নাটকটির গতি। দ্বিতীয় অঙ্কে অনিবার্য ভাবেই গতি কিছু মন্থর। কিন্তু তার আবেদন, [illegible]

নাটকটিতে বহু চরিত্র। কিন্তু কোনো চরিত্রটি চাপা পড়েনি। প্রত্যেককেই সার্থকভাবে কাজে লাগান হয়েছে! এই নাটোর পরিচালক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, রসাত্মক বোধ এবং কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা সানন্দ বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

নাটকের সন্নিবেশ সাধারণই। এক একেবোধা মিলিটারি মেজাজ বরকর্তা (বরের জ্যাঠা) পুরো পণের টাকা না পেলে বিয়ে দেবেন না, বর নিয়ে চলে যাবেন, এই রকম অবস্থা - অথচ পণের চার হাজার দেওয়া হয়েছে। বাকি মাত্র এক হাজার। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত টাকার জোগাড় হল এবং শুভকাজ শুভালাভালি চুকলো। এই গল্পের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে, নানা ছোট ছোট কাহিনী, যাদের মধ্যে দু'একটির গুরুত্ব অবশ্য কম নয়। কিন্তু আসল নাটক সেখানে নয়। আসল নাটক পরিবেশিত হয়েছে বিয়ে বাড়ির একটি মেয়েকে ঘিরে যার নাম কেয়া বা কাহ্নি। বরের বাড়ীর দুটি তরুণকে নিয়ে সে কী খেলাটাই খেলল। কিন্তু যখন জানা গেল সেটাই তার আসল রূপ নয়, সেটা তার অভিনয়, তখন দর্শক রীতিমত বিহ্বল হ'ল। চরিত্রের পরিকল্পনাটি যেমন অভিনব, এর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করলেন সেই নবাগতা আরতি ভট্টাচার্যের অভিনয়ও তেমনি অনন্যসাধারণ। প্রথম সাধারণ মঞ্চে নেমে এই মেয়েটি যে আশ্চর্য ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখলেন তা অনেক প্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রীর গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছে। নবাগতা আরতি ভট্টাচার্য যে বাংলা মঞ্চকে সমৃদ্ধ করলেন তাতে সংশয় নেই। এর জন্যে বাহবা দাবী করতে পারেন রঙমহলের কর্তৃপক্ষ—এমন একজন বহুগুণ-সম্পন্না শিল্পীকে খুঁজে বার করার অশেষ কৃতিত্বের জন্যে। আর একজন নতুন অভিনেতার অভিনয়ও পরিণত অভিনয়ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে; চলনে, বলনে, ব্যক্তিত্বে, বাক্‌ভঙ্গিতে এবং ভাবের অভিব্যক্তিতে, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের উচ্ছসিত প্রশংসা করতে হয়। জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল, নির্মল, মিন্টু, লক্ষ্মীজনার্দন, সরযূদেবী, ইন্দিরা দে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা সব পাকা ঘুঁটি—এঁরা তো ভাল অভিনয় করবেনই। বাহাদুরি দিতে হয় নতুন যাঁরা নেমেছেন তাঁদের ছোট ছোট ভূমিকায় সার্থক রূপায়নের জন্যে। খোঁটুর ভূমিকায় সুস্মিতা রায় একটি আবিষ্কার বটে! অন্যান্য ছোট ছোট ভূমিকায় মানস, গৌতম, ইন্দ্রজিৎ, বাসুদেব, অনাদি, প্রভৃতি শিল্পীরাও পরিচালকের নির্দেশ যথাযথ পালন করেছেন। দৃশ্য, আবহসঙ্গীত এবং আলো—সব মিলিয়ে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ভারী সুন্দর লেগেছে নাটকটি।

উদয়াচল-সঙ্ঘ (কোন্নগর)

কোন্নগর উদয়াচল-সঙ্ঘ তাঁদের ১৩তম বার্ষিক সম্মেলনে ২৯শে ও ৩০শে ফেব্রুয়ারী '৬৮, ডাঃ টি. এন. মিত্র মেমরিয়াল ময়দানে যথাক্রমে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" ও বরদা প্রসন্নর "মিশর কুমারী" নাটক দুটি অভূতপূর্ব জনসমাগমে মঞ্চস্থ করেন। সুষ্ঠু সংযোজনায় ও আলোকসম্পাতে সুবোধ মল্লিক ও রাধাপদ মাজি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান। অভিনয়ে প্রশংসার দাবী রাখেন: বিল্বমঙ্গল—সমীর মিত্র, দাসক—রাম সরকার, শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা—সুস্মিতা মিত্র, মধু—রমা সরকার, পুরোহিত—প্রদীপ বন্দ্যোঃ, আরেব—অমিয় চট্টোঃ, দস্যু সর্দার—সুনীল চট্টোঃ, সেবিক—অসিত কর, জিনো—বীরেশ্বর বন্দ্যোঃ, চিন্তামণি ও মুক্তা—প্রতিমা পাল, থাকমণি—লীলাবতী দেবী (করালী) ও আশনের ভূমিকায়—পাচু বসু, অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন—অতেয়ানন্দ রায়, মোহন বাগ, মনী বাগ, জ্যোৎস্না নিয়োগী, মন্দিরা বাগ ইত্যাদি।

পরিচালক যতীন্দ্র মিত্র কৃতিত্বের সঙ্গে নাটক দুটি পরিচালনা ছাড়াও ভিক্ষুক ও সাধুদেবের ভূমিকায় অভিনয় করে নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন-দুলাল বন্দ্যোঃ ও পরিতোষ বসু।

একটি ক্রিকেট সংস্থার শতবার্ষিকী

জ্যোতির্ময়

ছোট সম্প্রদায়। কিন্তু প্রতিপত্তি কম নয়। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে বাস। তাই সাগরপারের হাওয়াটা পশ্চিম দিক থেকে এসে তাদের গায়েই সব প্রথম লেগেছিল। একশ বছরেরও বেশী আগে এদেশে তারাই খেলার রাজা ক্রিকেটের প্রবর্তন করেছিল।

বোম্বাই-এর পার্শি সম্প্রদায়ের কথা বলছি। বোম্বেকরি তারা যদি এই খেলার প্রতি অনুরক্ত না হত তাহলে হয়ত ভারতে ক্রিকেট চালু হতে আরও অনেক বছর লাগত।

ক্রিকেট সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক অস্টার ওয়াইল্ড বলতেন, আমি ক্রিকেট খেলি না, কারণ ক্রিকেট খেলার অঙ্গভঙ্গি বড় কদর্য। অশ্লীল। রবার্ট লিনড বলতেন, ক্রিকেটের মধ্যে আছে উপন্যাসের বিস্তার আর ধারাবাহিকতা। ফুটবল? সে তো নিতান্তই ছোট গল্প।

পার্শিরা বোম্বেকরি রবার্ট লিনডের ভাবে ভাবিত হয়ে ১৮৬৮ সালে গুলিডাণ্ডা খেলা ছেড়ে ক্রিকেটের ব্যাট হাতে মাঠে নেমেছিল। খেলাটি ব্যয়সাধ্য। কিন্তু সেদিক থেকে পার্শিদের কোনও অসুবিধে ছিল না। জাঁকিয়ে স্থাপিত হল সেই বছর বোম্বাই-এ তাদের ওরিয়েন্টাল ক্রিকেট ক্লাব। তারপর জোরোয়াস্ট্রিয়ান ক্রিকেট ক্লাব, কিছুদিন পরে মারস্ ক্রিকেট ক্লাব এবং বোম্বাই ইউনিয়ন হিন্দু ক্লাব। বোম্বাই-এর কোনই অঞ্চল কেল্লার সোরাব হলও ক্রিকেট খেলতো এবং তারা পার্শিদের এই খেলায় খুব উৎসাহ দিত।

সেই আদিযুগে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রসারকল্পে যাঁর প্রয়াস এবং দান ছিল সবচেয়ে বেশী তাঁর নাম—হিরাজি কোল্টা ওরফে কুকাসাহ।

কয়েকজন পার্শি বন্ধুদের নিয়ে তিনি ১৮৮১ সালে স্থাপন করেন ইয়ং জোরোয়াস্ট্রিয়ান ক্রিকেট ক্লাব। ভারতীয় ক্রিকেটে এই ক্লাবের অবদান অসামান্য। এবছর এই ক্লাব তাদের শতবার্ষিকী উৎসব পালন করছে।

আজাদ ময়দানে তখন ইংরেজদের একটি জিমখানা ছিল। কুকা ডাক ইংরেজদের ক্লাব ঘরের কাছাকাছি নিজেদের তাঁবু খাটালেন এবং ইংরেজদের খেলা অনুকরণ করেই পার্শিরা সেই খেলা রপ্ত করতে লাগল। এলাহি কাণ্ড। খানদানি ব্যাপার। যেমন পোষাক পরিচ্ছদ, তেমনি খাওয়া দাওয়ার আড়ম্বর। কিছুদিন পরে চ্যালেঞ্জম্যাচ খেলা শুরু হল। বোম্বাই জিমখানা (ইংরেজ দল) বনাম পার্শিদল। প্রথম দিনের খেলায় পার্শিরা ৬৩ রাণে হারল বটে, কিন্তু বোঝা গেল এই খেলায় খুব শিগ্‌গীর তারা রীতিমত

তখনকার দিনে অত নিয়মের কড়াকড়ি বা বাঁধাবাঁধি তো ছিল না, কাজেই বোল্ড্ আউট বা নিতান্ত স্পষ্ট ক্যাচ আউট ছাড়া, অন্যসব আউটেই মতভেদ ঘটত, খেলা বন্ধ করে মাঠের মাঝখানেই হয়ত বিতর্ক সভা বসে যেত, সময় সময় হাতাহাতির উপক্রমও যে না হত তা নয়, শেষ যেন আপস রফা এবং করমর্দন, তারপর খেলা আবার শুরু।

ইংরেজরা চেহারায় এবং পোষাকে সবাই প্রায় একই রকমের। কাজেই সব সময় তাদের চেনা যেত না। চালাকি করে তারা যাকে, যাকে যে ভাল খেলোয়াড় গোড়ার দিকে অল্প রানে আউট হয়ে গেছে, তাকেই আবার নাম ভাঁড়িয়ে শেষের দিকে ব্যাট করতে পাঠাত।

তখনকার দিনে এই খেলায় পার্শিদের পোষাক ছিল বড় বিচিত্র। পুরো হাতা কুর্তা, তার নীচে ঢলঢলে পিরান আর পাজামা, মাথায় রুমালের ফেট্টি বাঁধা। কিন্তু খেলার হাল্ট ছিল কম নয়। ১৮৬৮ সালের ১০ই আগষ্ট লণ্ডনের গ্রাফিক পত্রিকায় লেখা হল—"বোম্বাইএ পার্শিরা খুব জোর ক্রিকেট খেলছে। শোনা যাচ্ছে শিগগীরই এক পার্শি একাদশ আমাদের দেশে হানা দেবে। ইতিমধ্যে আমরা অস্ট্রেলিয়ার ভায়াদের হাতে এই খেলায় খুব মার খেয়েছি, এখন এই ভারতীয় অগ্নি-উপাসকদের হাতেও মার খেতে হবে কিনা কে জানে।"

১৮৮৬ সালে পি, ডি, কাজার নেতৃত্বে প্রথম ভারতীয় দল ইংলণ্ডে যায়। সেইদল সর্বসমেত ২৮টি খেলায়, জেতে ১টি, হারে ১৯টি এবং ড্র করে ৮টি।

দু বছর পরে দ্বিতীয় যে পার্শিদল ইংলণ্ডে যায়, সেই দল সেখানে রীতিমত ধরহরি কম্পের সৃষ্টি করে। ৩১টি খেলায় হারে ১১, জেতে ৮টি।

এদেশে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বড় রকমের ক্রিকেট চালু হয় ১৮৯২ সালে। তদানীন্তন বোম্বের গভর্নর লর্ড হ্যারিস-এর উদ্যোগে-চতুর্দলীয় খেলার প্রচলন হয়। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দিবসে প্রথম বলটি দেন ইয়ং জোরোয়াস্ট্রিয়ান ক্লাবের কাপ্তেন বীরাজি সোনার, ডি. এন. রাইটার। ব্যাটস্‌ম্যান ছিলেন ইউরোপীয়ান তরফে ই স্টীল।

শতবছরের পুরাতন ক্রিকেট সংঘ বম্বাই. জে. সি. সি. বহু উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে এই খেলাকে অব্যাহত রেখে রীতিমত ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বলা চলে। এই ইতিহাসের নেপথ্য নায়ক হচ্ছেন দিজিভয় বিলিমোরিয়া, যিনি পঞ্চাশ বছর ধরে ক্রিকেটের জন্যে প্রাণপাত করে গেছেন।

১৯৫২ সাল থেকে এই ক্লাব পার্শি ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেরও সভ্য করছে। ক্রিকেট খেলায় এক সময় পার্শিদল রীতিমত দুর্ধর্ষ ছিল। গত শতাব্দির শেষভাগে বিখ্যাত ক্রিকেট-বীর লর্ড হক এক শক্ত সমর্থ দল নিয়ে ভারতে আসেন। একটি মাত্র খেলায় তাঁর দল হারে, তা হচ্ছে ঐ পার্শিদের বিরুদ্ধে। হেরে গিয়ে লর্ড হক বিলাতে টেলিগ্রাম পাঠালেন—We are beaten by the Parsis. Their batting is excellent. Their bowling is excellent. Their fielding is better than any of the County teams in England.

বড়দরের সাহেবরা গুণের কদর জানত। হেরে গিয়ে এভাবে প্রাণখুলে লেখা সচরাচর দেখা যায় না। পার্শিদের ক্রিকেট খেলার মান যে কত উন্নত ছিল, লর্ড হকের ঐ উক্তির মধ্যেই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রয়েছে।

Regd. No. C3643

প্রতিদিন প্রতিঘরে

লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও হৃদ্য হয়

যৌবনসুলভ
কমনীয়তা ও
অপরূপ
লাবণ্য

প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য।
সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ।

সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশ পত্র

সাধনা বিউটি ক্রীম

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

বিবিধ গুণসম্পন্ন
আয়ুর্বেদীয় ঘৃতাদ্য

মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল

চিঠি লিখলে ভৃঙ্গল-এর
বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত
পুস্তিকা পাঠান হয়।

ভৃঙ্গল

- মাথা ঠাণ্ডা রাখে
- স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশ বর্দ্ধনে সাহায্য করে

ছোট শিশির জন্যই আপাততঃ এই নতুন বাক্স। ছোট ও বড় দুই রকম শিশিতেই এখনও পুরানো লেবেল চলবে। পরে আসবে নতুন লেবেল।

ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

CBP-1.0 68

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
বৈশাখ ১৩৭৫, MAY, 1968
চতুর্বিংশতি বর্ষ—১ম সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

মূল্য : ৬'টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

শ্রীহরিপদ বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সুন্দর ছাপার জন্যে জে. কে. পেপার ব্যবহার করুন

অভিজ্ঞদের অনুসরণ করুন। আমরা বড় কথা বলিনা। আমাদের কাগজ ও বোর্ড তা'দের কাজ দিয়েই সে কথা ব'লে দেয়। সব রকম লেখা, ছাপা ও প্যাক করার কাজের উপযোগী কাগজ ও বোর্ড পাওয়া যায়। "ব্যবহার কারীর সন্তুষ্টি" আমাদের মূলমন্ত্র। যাঁরা উৎকৃষ্ট জিনিস চান তাঁরা যে, জে. কে. পেপার ও বোর্ড চাইবেন তা'তে আর আশ্চর্য কি ?

কে প্রোডাক্টস্ লিমিটেড

একমাত্র বিক্রেতা।
নন্দ ভারত বাণিজ্য লিঃ
১৮ রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-১

KAPARA-SPL-68.0

বাংলার
রাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে
জনসাধারণের যোগাযোগের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

আনন্দবাজার পত্রিকা

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকপত্র

নিয়মিত
আনন্দবাজার পত্রিকা
পড়ুন

॥ আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড। ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট। কলিকাতা-১ ॥
ফোন ২৩-২২৮৬ (৭ লাইন), ২৩-৮০৪১ (৫ লাইন) • গ্রাম: আনন্দবাজার

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

[illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • পাইওনীয়ার ফুল • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] • [illegible] ও অন্যান্য প্রভৃতি বিভিন্ন গেঞ্জি-এর পাওয়া যায়।

* দেখতে সুন্দর

* আরামপ্রদ

* টেকসই

টী-সার্ট • টেবিস সার্ট • চেক সার্ট • ড্রয়ার ও ব্রীফ প্রভৃতিও পাবেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ধৌত ও প্রস্তুত।

ফোন : ৫৬-২৯৩৩

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২

লেক্স্

তামাকটা ঠিক বলে টেক্কা দিয়ে চলে!

সব দিক দিয়ে এগিয়ে তো বটেই, ভারতের বাইরেও বহু দেশে বিখ্যাত সিগারেট হিসেবে লেক্স্ বহু বছর ধরে সুনাম অর্জন করেছে। লেক্স্ সবার চেয়ে ভাল, তা খুব মিঠে, না খুব কড়া। লেক্স্-এর আসল গুণ তাই সেইখানেই।

৪৩ পয়সায় ১০টি

সবার সেরা
তামাকে গড়া . . .
না খুব মিঠে,
না খুব কড়া . . .

STATE BANK OF INDIA

FOR

SERVICE

GEC নতুন অবদান

অভিজাত এক রেডিও রিসিভার!

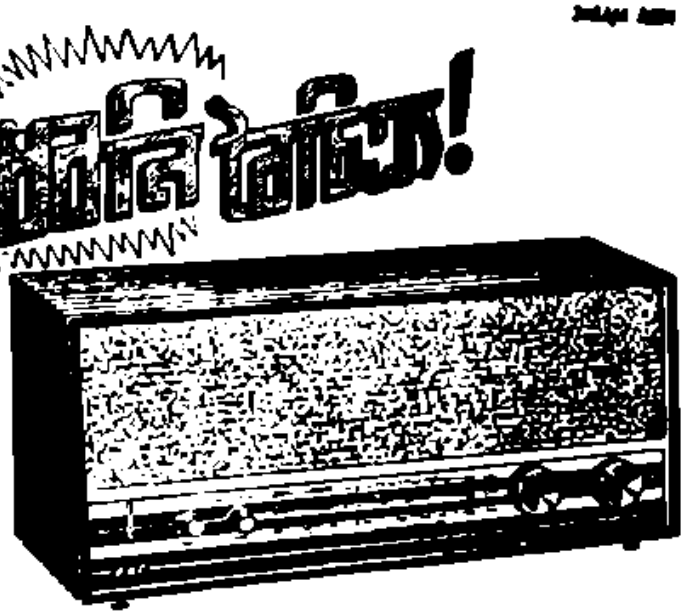

অনন্য ৯ ভালভ সেট-এর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে জিইসি এবারে আপনাকে উপহার দিচ্ছে মডেল ৫৩৮। এই জি ই সি'র কাছ থেকেই আপনি পেয়েছিলেন মডেল ৫৩১, মডেল ৫৩৯। এবারের অতিরিক্ত আকর্ষণ "অবিকল ধ্বনি প্রবাহ।" এই অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যে জিইসি রেডিও আজই এখন বাজারের সেরা।

- ৯ ভালভ ৩ ব্যাণ্ড এসি রিসিভার
- সুস্পষ্ট ধ্বনিগ্রাহক ইলিপ্টিকাল ১২ সেঃ মিঃ × ১০ সেঃ মিঃ স্পীকার
- অবাঞ্ছিত ধ্বনি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা
- ইলেকট্রনিক টিউনিং ইণ্ডিকেটর
- এক্সটারনাল স্পীকার ও উচ্চশক্তি সম্বলিত গ্রামোফোন রেকর্ডের বাজানোর ব্যবস্থা
- লো-প্রাইস কাঠের কেবিনেট

GEC

আপনার শ্রুতিমাধুর্যের বাহক

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড।

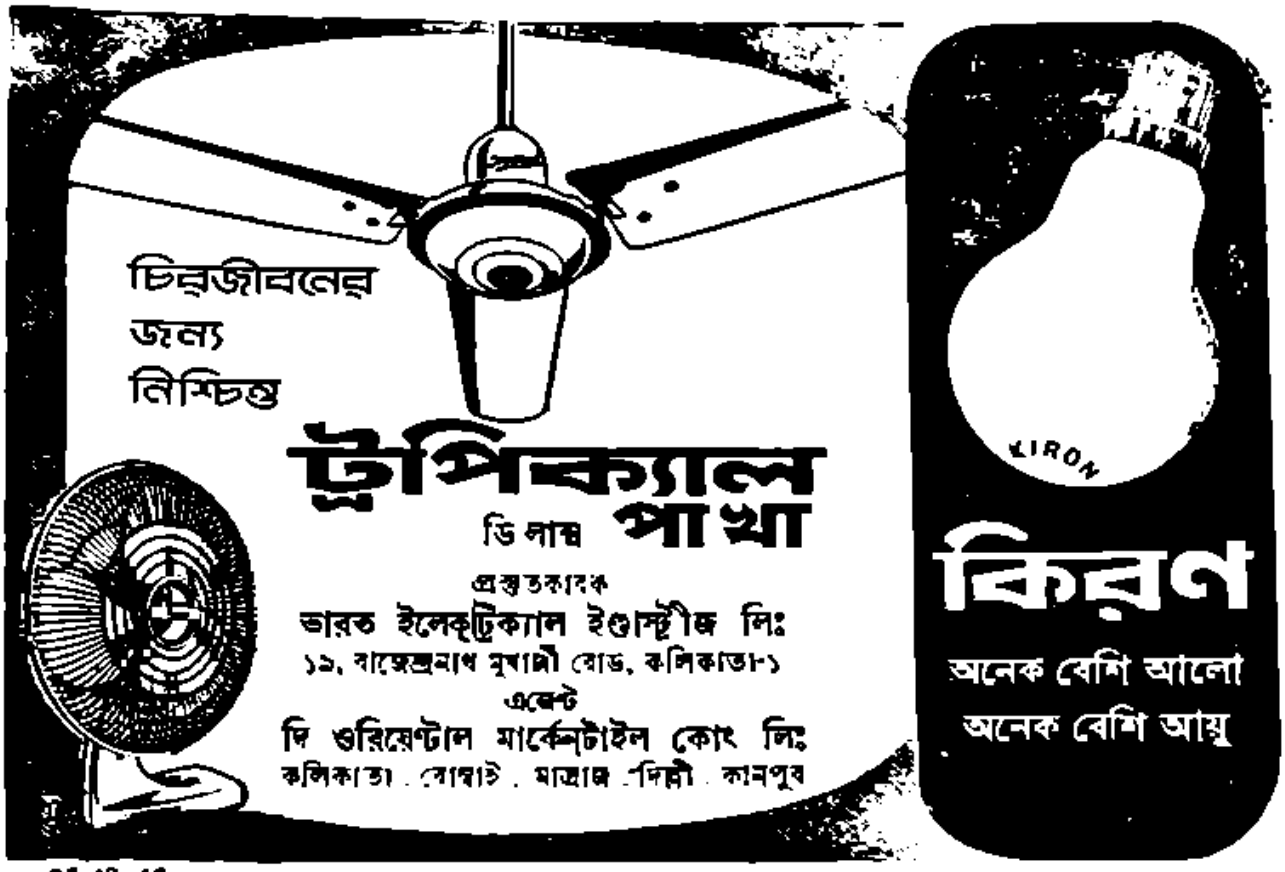

OF-18-68

IT CERTAINLY DESERVES
A HORSE-LAUGH

The idea of trying to save something at the end of the month deserves a Horse Laugh. Once you start spending your income you may not have anything left to save

The proper way is to put aside in a

SAVINGS BANK ACCOUNT
WITH
THE BANK OF INDIA LIMITED

say 10% of the income and limit the expenses to the remainder.

THE BANK OF INDIA LIMITED

T. D. KANSARA
CHAIRMAN

R. GERSAPPE
REGIONAL MANAGER
(Calcutta Circle Branches)

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

অন্তরীক্ষে (কার্টুন)

সঙ্গীতে সঙ্গতি —রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ পঞ্জী

নববর্ষের চিন্তা	—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	4
নববর্ষ	—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	7
বৈশাখী ব্রত ও অন্যান্য	—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	9
রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী	—বিধুশেখর ভট্টাচার্য	12
রবীন্দ্রনাথ ও মাসিকপত্র	—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	14
শান্তিনিকেতনের নববর্ষ : উৎসব : স্মৃতি	—জগদানন্দ রায়	16
নববর্ষের দীক্ষা	– ক্ষিতিমোহন সেন	19
নববর্ষে কলকেতার হাটহদ্দ	—সুতোম প্যাঁচা	20

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন কেশের অযথা বাড়াবাড়ি বন্ধ করে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

অমৃতসর • দিল্লী

এই সংখ্যায়

ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ	—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	24
নববর্ষের প্রথম দিন (স্মৃতিচিত্র)	—গিরিবালা দেবী	28
সেদিনের বাঙালী—		
স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	—মণি বাগচি	34
নববর্ষের সাহিত্য চিন্তা	—মন্মথ রায়	47
বহির্বঙ্গে বাংলা নববর্ষ	—দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল	49
নববর্ষের ব্রত	—রবিশংকর	52
রাঢ় বাংলায় নববর্ষোৎসব	—ডঃ অমলেন্দু মিত্র	56
বহির্ভারতে নববর্ষ (নওরোজ)	—গৌরীশঙ্কর দে	62
বঙ্গরঙ্গমঞ্চে জাতীয়তার ভেরী	—অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	63
মন যেতো যেথা ছুটে (স্মৃতিচারণ)	—নরেন্দ্র দেব	67
জন্মবার থেকে বর্ষফল (জ্যোতিষ)	—সৌরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	74
বন্যা বন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	

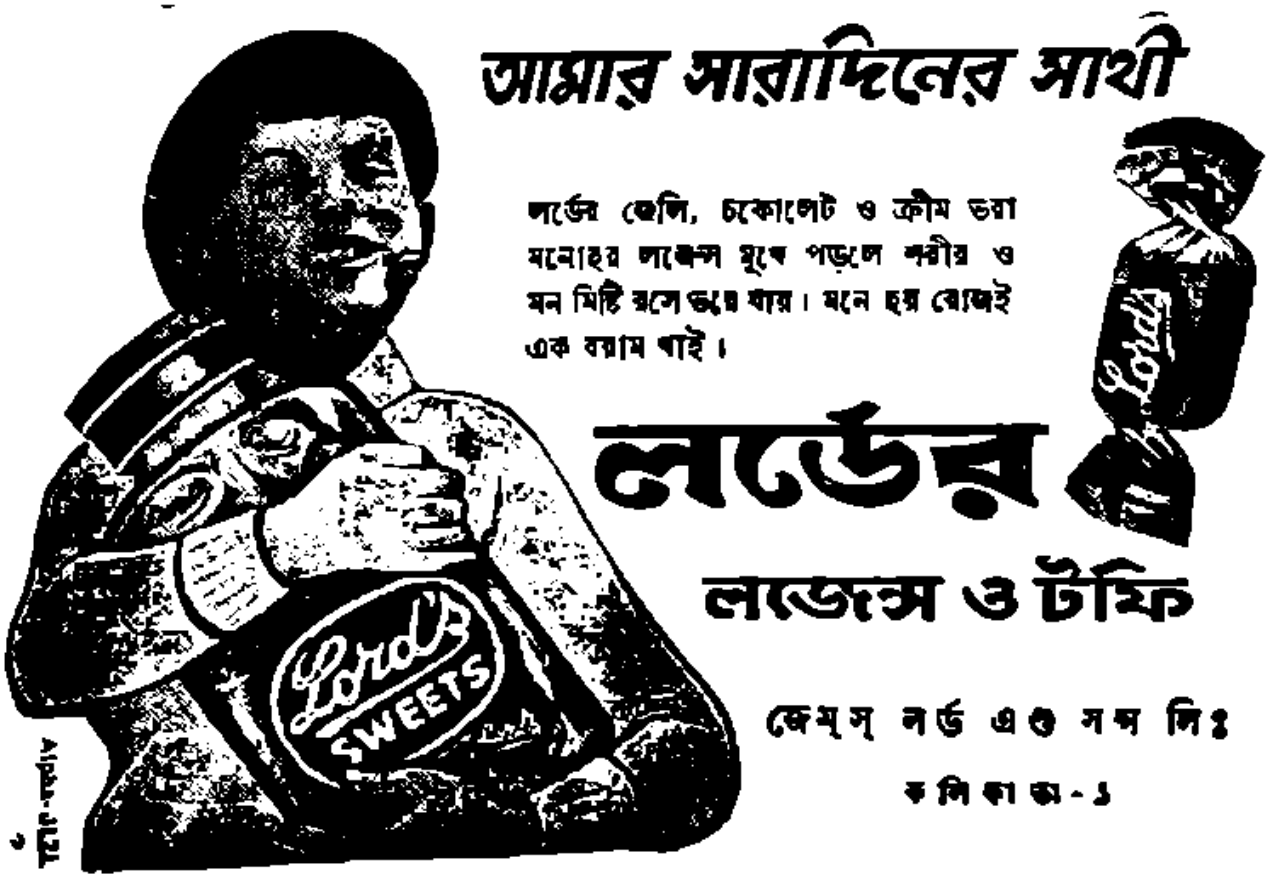

এই সংখ্যায়

●

গল্পগুচ্ছ

সকালের রং	—আশাপূর্ণা দেবী	১০
আকাশ এখন নীল	—বাণী রায়	১৭
পুনশ্চ	—শক্তিপদ রাজগুরু	২৩
রাজযোটক	—মহাশ্বেতা দেবী	৩৩
রূপসী আঁধার	—বিভূতিভূষণ গুপ্ত	৪৩
ডানা ভাঙা পাখী	—পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৫২
নীতিকথা	—সুবোধ বসু	৫৮
অলকার নূপুর	—কবিতা সিংহ	৬৪
দিন পালটেছে	—রাধাদামোদর মিত্র	৬৯
মধুকরবৃত্তি	—সুমথনাথ ঘোষ	৭৪
প্রদীপের তলায়	—শম্ভু মহারাজ	৮৩
মৌবাসা	—অনিলকুমার ভট্টাচার্য	৮৮

আপনার টাকা রাখবার নির্ভরযোগ্য স্থান

ফার্ষ্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক

২নং ব্রেবোর্ণ রোড ও ১নং মিডিলটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের বিশেষত্ব

চেকের প্রতি পাতায় আপনার নাম ছাপা থাকবে

তাছাড়া

টাকা লেন দেন ব্যাপারে এক মিনিটও লাগবে না।

গ্রীষ্মের নকশা

পায়ের পরিচর্যায় যত্নবান যাঁরা স্যান্ডাল পুঁইয়ের পছন্দসই এত উপহার কেন। তার আগে এবার একের নকশা। এমন নকশা যাতে উপরে হাওয়া খেলবে আর নিচে তলা মাটিতে সবের যে পাথুরে বা ভিজেভাব থাকে, স্যান্ডাল তার ছোঁয়া পাবে না। পায়ের পাতায় পুরু, হাওয়া খেলবে সর্বক্ষণ—পুঁইয়ে এর চেয়ে সুখকর অভিজ্ঞতা আর কি হতে পারে। রঙবাহার মজবুত চামড়া, ফোমের তলাও সুঠাম। ঠাণ্ডি, লোভনীয়, সুখতলা—সবই এতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। তার সঙ্গে আধুনিক নির্মাণ কৌশল। ফলে বাটার স্যান্ডাল এমন মজবুত যার তুলনা সবসময়ে বুকে-বুকে। জানবেনা থেকে মনোজ্ঞ সব নকশা এখন বাটার দোকানে এসেছে। আজই এসে দেখে যান।

এই সংখ্যায়

●

গল্পগুচ্ছ

সমুদ্র-মেখলা	—সুকুমার রায়	৯৭
শনিবার	—মানবেন্দ্র পাল	১০১
টেলিফোন : ডাকিনী যন্ত্র	—কুমারেশ ঘোষ	১০৬
চিনি গো চিনি তোমারে	—সমর বসু	১০৯
প্রেরণা	—মায়া বসু	১১৫
আকাঙ্ক্ষা	—নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১২০
দূরভাষিণী	—ভবানী মুখোপাধ্যায়	১২৭
বিবাহ-রঙ্গ	—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩২
নারায়ণের বিপত্তি	—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	১৫৮
পিছনের জানালায়	—রামপদ মুখোপাধ্যায়	১৭১

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার

ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ লইয়াছিলাম। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

বাংলার নববর্ষ
(ছোদ্দে মঙ্গলিশ)
সচিত্র ক্রোড়পত্র

J—৪৮

উষা ভট্টাচার্য, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, বেলা দে, মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তা বসু, নীলিমা সেনগুপ্ত, শকুন্তলা দেবী, মায়া দেবী, মীনা সেন, আভা পাকড়াশী, মালবিকা ঘোষ।

সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পুরনো,
সবচেয়ে ভাল ?
এগুলোর কোনটাতেই আমাদের দাবী নেই।
কিন্তু আমাদের গর্ব এই যে, আমরা

আপনার ব্যাঙ্ক

আপনার শুভেচ্ছাই
আমাদের সবচেয়ে বড় মূলধন। আমাদের
সবচেয়ে বড় পুরস্কার আপনার
সন্তুষ্টি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :
১, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আমরা
সেবার সাথে
দিই
আরও কিছু

THE CENTRAL BANK OF INDIA LTD.

India's Largest Bank in the Private Sector

Head Office : **MAHATMA GANDHI ROAD, BOMBAY—1.**

Figures that tell—

Authorised Capital	...	Rs. 10,00,00,000/-
Subscribed Capital	...	Rs. 8,96,19,250/-
Paid-up Capital	...	Rs. 4,77,54,105/-
Reserve Fund & other reserves	...	Rs. 7,39,06,800/-

Deposits as at 31. 12. 1967. Exceed Rs. 395 Crores

With a net work of over 464 Offices in all Important Commercial Centres of India

"CENTRAL" offers every kind of banking business.

London Office : Orient House. 42/45, New Broad Street, London E. C. 2.

New York Agents : Morgan Guaranty Trust Co, of New York The Chase Manhattan Bank.

Main Office for Assam, West Bengal, Bihar & Orissa
33, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.

V. C. Patel
Chairman.

B. C. Sarbadhikari
Chief Agent

● আপনার লাইব্রেরীর জন্যে আজই সংগ্রহ করুন
● বাংলা স্মৃতিকথা-সাহিত্যের এক অপূর্ব সংযোজন
● প্রাণরসপূর্ণ বৈঠকী-গল্পের সমারোহ

সাহিত্যস্রষ্টা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে
ঘিরে কয়েকজনের সমাবেশ।
অনিলকুমার ভট্টাচার্যের
একজন আর কয়েকজন
। দাম : চার টাকা।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে ভূমিকায় স্বর্গীয় ডাঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন—ব্যক্তি উপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহায্যে যাঁরা না এসেছেন, তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন—একথা মোটেই অত্যুক্তি নয়। মজলিশে, আলাপে, রসিকতায়, সহৃদয়তায়, কৌতুক-পরিহাসে এমন একজন মানুষ আর মিলবে না। উপেন্দ্রনাথের মৃত্যু তাই একটি যুগের অবসান। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত রেখায় অনিলবাবু সেই অবিস্মরণীয় ছবি এঁকেছেন। অনিলবাবু নিজে কবি ও কথক। কবি-মন নিয়ে তিনি মানুষ উপেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ গল্প শুনিয়েছেন।.....

ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

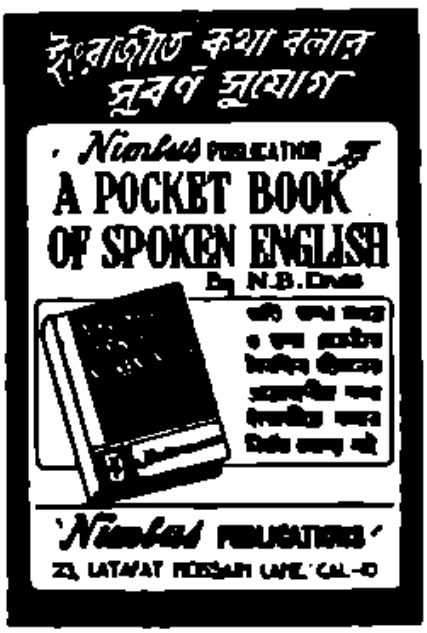

Anglo-Bengali Rs. 3·25
Anglo-Hindi Rs. 5·25

শুধু বাংলা নয় শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্ব জগৎ
আজ যে মহাজীবনের দিব্য-প্রকাশের দিকে চেয়ে আছে,
মানব সভ্যতার ইতিহাসে সেই অপরূপ বিস্ময়কর আবির্ভাব,

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের

অমৃত জীবন-কাহিনী

লেখক - জীবনী-সাহিত্য রচনায় অদ্বিতীয়—সুবিখ্যাত সাহিত্যিক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জনক জননী

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর জননী সারদামণির অপরূপ মানবীয় লীলা, বাংলা ভাষায় এমন অনুপম সৌন্দর্য্য ইতিপূর্বে আর উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই অপূর্ব রচনা প্রত্যেক বাঙালীকে মুগ্ধ করিবে।

'জনক জননী'

বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্তি একটা নতুন যুগের রচনা···
বাংলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ····
প্রত্যেক পাঠক এই কথা সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন।
মূল্য—২৲ বাঁধাই ২৷৷০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৮··

প্রকাশক—সত্যেন্দ্রলাল রায়, ৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৩৫৫

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য,
অম্ল, অমুধা
কোনটা থেকে ভুগছেন?
আমাদের
ভাস্কর লবণ

খেলে নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।
যাঁরাই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

কোলে বিস্কুট আজ প্রতি ঘরে ঘরে...

KOLAY Glucose

বিখ্যাত দুটি বিস্কুট

বিন এরারুট ও গ্লুকোজ

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, কলিকতা-১০

কোমল ত্বকের নিত্য পরিচর্য্যায়

হিমানী গ্লিসারিন সাবান

নিখুঁত ও মসৃণ ত্বক সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি। বছরের প্রতিটি দিনেই এর পরিচর্য্যা করা উচিৎ। উপযুক্ত উপাদানে প্রস্তুত হিমানী গ্লিসারিন সাবান ত্বকের লাবণ্য ও মসৃণতা বাড়ায়।

হিমানী
প্রাইভেট লিঃ

জ্যোতিষাচার্য শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরিয়া জ্যোতিষ গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া ইনি আজ বিশেষ শক্তির অধিকারী। বাঙ্‌লা, ইংরাজি ও হিন্দীতে ইনি ছয়খানি সর্বজনপ্রশংসিত জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বহু জ্ঞানী গুণী সাহিত্যিক অধ্যাপক ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি এঁর গণনায় ও রত্নাদির ব্যবস্থায় উপকৃত হইয়াছেন। দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে এঁর রত্ন-ব্যবস্থা বহু ক্ষেত্রে অত্যাশ্চর্য ফল দিয়াছে।

চিরাচরিত মামুলী প্রথায় ইনি গণনা করেন না। গভীর গবেষণায় ইনি যে নিজস্ব পদ্ধতিতে মানুষের ভাগ্য বিচার করেন বহুবার তার অভ্রান্ততা প্রমাণিত হইয়াছে। আপনি একবার মাত্র পরীক্ষা করাইলেই তাহা উপলব্ধি করিবেন।

সাক্ষাতের সময়

সকালে : ৮—১০ টা। বিকালে : ৪—৮টা।

দক্ষিণা

হাত দেখা : দশ টাকা। কোষ্ঠী বিচার : দশ টাকা।

গ্রহ শান্তির জন্য রত্ন ব্যবস্থা : পঁচিশ টাকা।

জ্যোতিষের আসর

৪০, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা—৪ ফোন : ৫৫-১০৪৮

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বহু প্রশংসিত রচনাবলী

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

চার্লি চ্যাপলিন (আশ্চর্য আত্মকাহিনী) ৩·০০

গল্প-ভারতীতে প্রকাশকালে যে রচনা পাঠক-মহলে বিপুল ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল।

অন্যান্য গ্রন্থ :

যাত্রা হ'ল শুরু (উপন্যাস : চলচ্চিত্রে রূপায়িত : ৩য় সংস্করণ) ৩·৭৫

নব নব রূপে (সুখভোগ্য রম্য কাহিনী) ৩·৫০

বীরবল রঙ্গ (আকবরের সভাসদ বীরবলের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার কাহিনী) ৩·০০

আগুনের পরশমণি (উপন্যাস) ... ৩·০০

যে মহাজীবন (মনীষীদের গল্প) ... ৩·০০

স্মৃতির প্রদীপ (রহস্য উপন্যাস) ... ২·৫০

তামসীর মৃত্যু ও কালরাত্রি (দুটি রহস্য উপন্যাস একত্রে) ২·০০

মায়াজাল ও মরণাভিসার (,) ... ২·০০

কালো করাল ছায়া (রহস্য উপন্যাস) ... ১·৫০

ডিল সর্ট (শিরাজদ্দৌলা, মনোহর, ষ্টিল্‌ড্‌ বার্গ। (নাটক) ... ২·০০

নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের মায়াবসান (নাটক) ২·৫০

নবনাট্যরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা প্রতাপ (,) ৩·০০

Carey's Good Old Days (সম্পাদনা) ১৫·০০

Glimpses of the Olden Times (,) ১০·০০

: যন্ত্রস্থ :

কেরী সাহেবের কলকাতা (বোম্বাই আমলের কাহিনী-রূপে গল্প-ভারতীতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত)

Echoes from Old Calcutta (সম্পাদনা)

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্ডার পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে।

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস নিয়মিত ব্যবহারেই তা সম্ভব।

সতর্কীকরণ

নকলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিনিবার সময় ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র মূর্ত্তি, পিলফার প্রুফ ক্যাপের উপর RCM মনোগ্রাম ও প্রস্তুতকারক এম.এল.বসু এণ্ড কোং দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস
কেশ তৈল

এম.এল বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

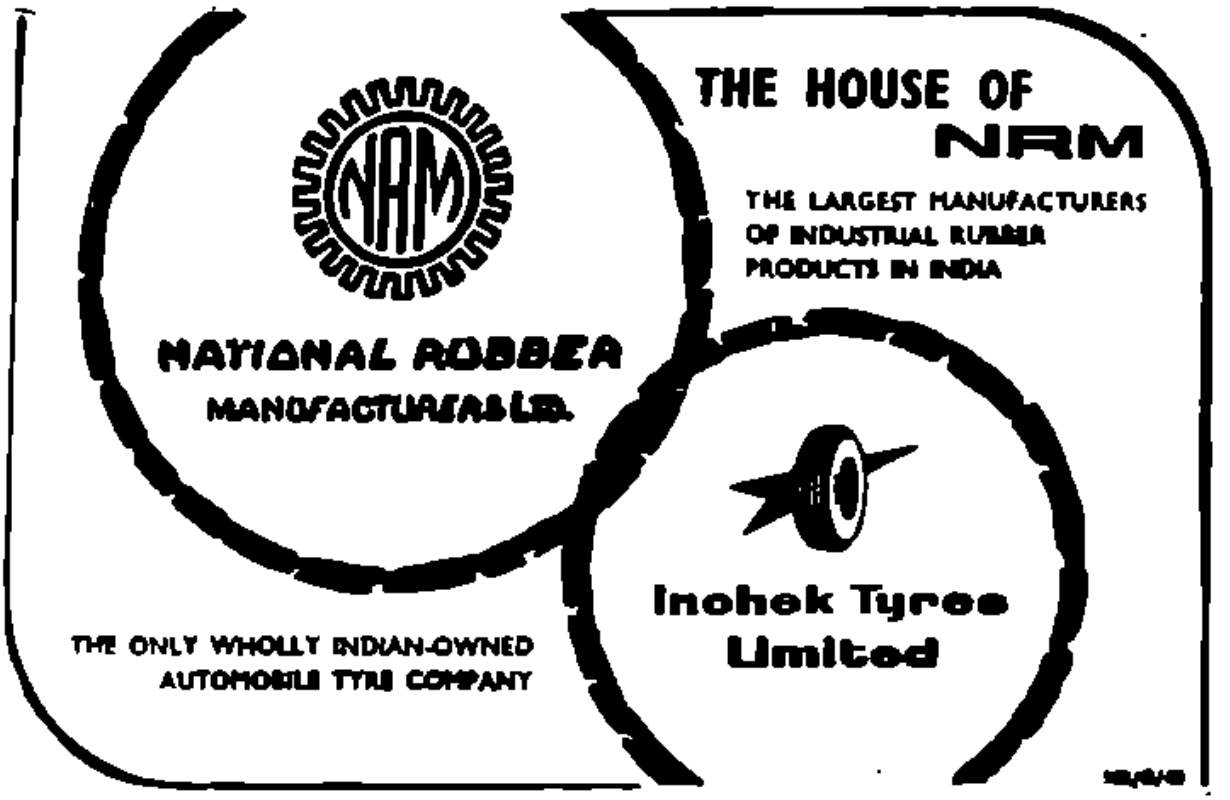

DESIGN ● DISPLAY ● EXHIBITION ● OUTDOOR

ASTER ADVERTISING SERVICE PRIVATE LTD.

3, CAMAC STREET, CALCUTTA-16

PHONE : 44-6552

Sulekha
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK
CALCUTTA - 32
erdayar

ছেঁড়া ···· কাটা ···· পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

ডাক্তারের পরামর্শ নিন

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
ক্ষত আরামদায়ক

ওবেদ ইনভেন্টরিজ লিঃ

দেশের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ুন

পশ্চিমবঙ্গ : সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি।
প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা। ষাণ্মাষিক : দেড় টাকা।
বার্ষিক : তিন টাকা।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল : পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। প্রতি সংখ্যাতেই নানা তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
প্রতি সংখ্যা : বারো পয়সা। ষাণ্মাসিক : তিন টাকা।
বার্ষিক : ছয় টাকা।

পশ্চিম বংগাল : নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী।
ষাণ্মাসিক : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বার্ষিক : তিন টাকা।

- গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন।
- চাঁদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে।
- ভি. পি. পি. তে পত্রিকা পাঠান হয় না।
- পত্রিকা বিক্রির জন্য ৩৩⅓% কমিশনে এজেন্ট চাই।

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা-১

ডব্লিউ. বি. (আই. এণ্ড পি. আর) অ্যাড ১৬৮০/৬৮

বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

গল্প-ভারতী সমসাময়িক সাহিত্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব।

গল্প-ভারতী নবজাগ্রত জাতির মর্মরাঙা মর্মকাহিনী।

গল্প-ভারতী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ।

গল্প-ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতির অন্তরের ব্যথা ও বেদনার কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

গল্প-ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

গল্প-ভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

গল্প-ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করেছে।

গল্প-ভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প-ভারতী জাতির ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে।

গল্প-ভারতী পূজা সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা শুধু একটি উৎসব ঋতুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সেইজন্যেই দেশব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পূজা সংখ্যা গল্প-ভারতী বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে।

গল্প-ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

আজই গল্প-ভারতীর গ্রাহক হোন

সডাক বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ১৫৲

যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-৩২১৪ ও ৫৫-১৩৫৫

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, একাদশ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

কোনও এক দেশের সত্যাশ্রয়ী শক্তিমান একজন লেখক লিখলেন 'লেখকের প্রার্থনা।' লিখলেন, লেখক আমি তাকেই বলছি যিনি কবি, যিনি সাহিত্যিক। বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দনের মহত্তমদেহাশ্রয়ী যে প্রকাশকে আমরা জীবন বলে থাকি, সেই জীবনের বাঙ্‌ময় একটি বিশিষ্ট প্রকাশকে বলি সাহিত্য।

সেই সাহিত্যের যাঁরা লেখক—যাঁরা কথা-শিল্পী, তাঁদের প্রার্থনা হওয়া উচিত—

১। এই পৃথিবীতে জীবনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই বিশ্ববিধাতার মত আমিও যেন সৃষ্টি করতে পারি!

২। চিন্তাশক্তি মানুষের সব চেয়ে বড় শক্তি। চিন্তাই সমগ্র বিশ্বকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুস্থ চিন্তা সব সময়েই স্বর্গাভিমুখী। সেইখানেই বিশ্বের কল্যাণ এবং আনন্দ। বিকৃত চিন্তাই অকল্যাণকে ডেকে আনে। সুতরাং আমার চিন্তা যেন কখনও কলুষিত না হয়!

৩। বিস্ফোরক দ্রব্য নাড়াচাড়া করতে হলে যেমন সতর্ক হতে হয় আমার ব্যবহৃত বাক্য এবং শব্দ যোজনার সময় আমিও যেন তেমনি সতর্ক হতে পারি!

ভাষার শক্তি অনন্যসাধারণ—সেকথা যেন সর্বদা মনে থাকে। ভাষাই তো আমার ভাবের বাহন। সতর্ক শব্দযোজনার দ্বারা আমি যেন সেই মহাশক্তিকে ব্যবহার করতে পারি!

৪। নানারকমের নানা চরিত্র আমাকে সৃষ্টি করতে হবে। তখন যেন আমার নিজের চরিত্রকে ভুলে না যাই।

৫। এমন কিছু যেন না লিখি—যা মানবজাতির অকল্যাণ করে!

৬। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রই আমার একমাত্র লক্ষ্য। সেই হৃদয়ের প্রীতি সম্পাদনেই আমার সার্থকতা। কিন্তু মানবহৃদয়ের নিয়ম বড় বিচিত্র। সেখানে কোথাও স্নেহ, কোথাও রৌদ্র। সুতরাং প্রীতির ফসলেই যখন আমার একমাত্র দাবী, তখন এ-কথা কখনই বলা চলবে না যে সব সময়েই আমি সর্বসাধারণের প্রীতি লাভ করবো। সেখানে অপ্রীতিকর কিছু যদি ঘটে তো আমি যেন বিচলিত না হই!

৭। যে-লেখক হৃদয়হীন সে কখনও সর্বসাধারণের জন্য লিখতে পারে না।

৮। এই বিশ্বপ্রকাশের রহস্য যেন আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হয়!

অন্ধকার যেন অপসারিত হয়ে যায় আমার চোখের সম্মুখ থেকে। বিশ্বসৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য এবং অনাবিল বিস্ময় যেন আমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে!

আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক বিমানবিহারী তাঁর বাইরের ঘরে বালিশে হেলান দিয়ে বসে একখানি ইংরেজি বই পড়ছিলেন। এমন সময় প্রিয়দর্শন একজন যুবক ঘরে ঢুকে তাঁকে একটি প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—কে?

—আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম বিপিন ঘোষ। আমি একটু আধটু লেখার চেষ্টা করি। আপনার কাছে কিন্তু উপদেশ চাই।

সাহিত্যিক বিমানবিহারী বইখানা বন্ধ করে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, বোসো।

বিপিন ঘোষ বললো।

বিমানবাবু বললেন, ছাখো, উপদেশ আমি দিতে পারি তোমাকে, কিন্তু তোমার লেখাটেখা দেখতে পারবো না। আমার সময় নেই। তোমার হাতে ওটা কি?

একটি পত্রিকা ছিল বিপিনের হাতে। সেই কাগজখানি বিমানবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিপিন বললে, বিদেশী একজন লেখক 'লেখকের প্রার্থনা' নাম দিয়ে এই লেখাটি লিখেছেন। এইটি আপনাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে এসেছি।

বিমানবাবু লেখাটি পড়লেন। পড়ে বললেন, হ্যাঁ, কথাগুলো ভাল। লেখবার সময় এমনি করেই লিখতে হয়। এমনি সব ভাল ভাল কথা না বললে লেখকের ওপর লোকজনের ভক্তি হয় না। সাধু-সন্ন্যাসীদের যেমন চুলদাড়ি রাখতে হয়, তিলকফোঁটা কাটতে হয়—এও ঠিক তেমনি।

বিমানবিহারীর মত একজন স্বনামধন্য লেখকের কাছ থেকে এরকম কথা শুনবে বিপিন তা ভাবতে পারেনি। বললে, আপনি কি তাহলে এই কথাগুলো বিশ্বাস করেন না?

বিমানবাবু বললেন, না। বিশ্বাস করলে চলে না। আমাদের দেশের একজন লেখক সেদিন লিখলেন, 'টাকার জন্য লিখবে না। খ্যাতির জন্যেও লিখবে না। শুধু সাহিত্যের জন্যই সাহিত্যের সাধনা করবে।'

বিপিন বললে, ঠিক কথাই লিখেছেন তিনি। টাকার জন্য সাহিত্যিকদের চাকরি-বাকরি করা উচিত।

বিমানবাবু বললেন, দশটা পাঁচটা আপিসে চাকরি যদি কর, লিখবার সময় পাবে তুমি? চাকরি করে দু'মাসে-ন'মাসে হয়ত' এক-আধটা লিখতে পারো, তাতে নাম হবে না।

—নাম করতে হলে বুঝি অনেক লেখা লিখতে হয়? প্রশ্ন করলে বিপিন ঘোষ।

—নিশ্চয়। এই আমাকেই ছাখো না! অনেক লেখা লিখেছি বলে আমার নাম হয়েছে। চাকরি করলে কি এত লেখা লিখতে পারতাম? অনেক লেখা লিখতে হবে, আর অনেক লেখা লেখাতে হবে।

'লেখাতে হবে' কথাটার মানেটা ঠিক বুঝতে পারলে না বিপিন। বললে, তার মানে?

—মানে অতি সহজ। বিমানবাবু বললেন, এটা আর বুঝতে পারছো না? বড় লেখক তুমি হবে কেমন করে? লেখাতে হবে—মানে ক্রমাগত তোমাকে লিখে যেতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোককে দিয়ে (কলেজের প্রফেসার কিম্বা কোনো ভাল কাগজের এডিটার হলেই ভাল হয়) তাকে দিয়ে লেখাতে হবে—বিপিন ঘোষের মতন লেখক আজ পর্যন্ত আমাদের এই বাংলাদেশে জন্মায়নি। অসাধারণ তাঁর শক্তি—অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা।

বিপিন বললে, এত বড় মিথ্যা কথাটা লোকে বিশ্বাস করবে?

বিমানবাবু বললেন, নিশ্চয় করবে। হিটলারের আত্মজীবনী পড়নি? তিনি লিখে গেছেন—'মিথ্যা, তা সে যত বড়ই হোক্, জোরের সঙ্গে উপরি-উপরি যদি বারংবার ছাপার অক্ষরে সত্য বলে প্রচার করতে থাকো তো অবিলম্বে তা সত্য হয়ে উঠবে। এটা হলো গিয়ে প্রচারের যুগ।'

এত বড় একজন সাহিত্যিকের মুখে এই সব কথা শুনে বিপিন বিস্মিতও যেমন হচ্ছিল, নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে আশ্বস্তও হচ্ছিল তেমনি। জিজ্ঞাসা করলে, আমি যদি চেষ্টা করি তো এইরকম লেখবার লোক পাওয়া যাবে?

বিমানবাবু বললেন, টাকা দিলে একজন কেন, দশজন লোক পাওয়া যাবে। তোমার টাকা আছে?

বিপিন কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে, দেশের একজন বড়লোকের মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি। আমার বৌএর মেলা গয়না আছে। কিছু বিক্রি করে দেবো।

—বাস্। দুজন ভাল লিখিয়ে আমি ঠিক করে দেবো। পালা করে তারা লিখবে। টাকা পেলে এরা রাতকে দিন আর দিনকে রাত করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু এসব 'সিক্রেট্' কাউকে বোলো না।

বিনীত ভাবে হাতজোড় করে বিপিন বললে, একটা কথা—যদিও আপনাকে আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় তবু জিজ্ঞাসা করছি।

—কর।

বিপিন বললে, আপনিও কি এই সিক্রেট্ অবলম্বন করেছিলেন?

বিমানবাবুর মুখখানি কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। চোখ বুজে মাথাটি ঈষৎ কাৎ করে নীরবে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তিনিও তাই করেছেন।

তারপর চোখ খুলে আবার আর-একরকম 'পস্চারে' ঘুরে বসলেন। এবার তাঁর ভঙ্গীটি হলো ঠিক মুনি-ঋষিদের—'বৎস, বর প্রার্থনা কর' গোছের ভঙ্গী।

বললে, আর কি জানতে চাও বল। তোমার কাছে বলেছি যখন, তখন আর বলতে কিছু বাকি রাখবো না।

বিপিন বললে, আমার লেখক-জীবন সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। খান-দশেক গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে মাত্র। আর দু'খানি উপন্যাস—আপনার কাছে কিছুই আমি গোপন করবো না—প্রকাশকদের দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে একজোড়া জুতো যখন ছিঁড়ে গেল তখন নিজের পয়সা খরচ করে উপন্যাসদুটি ছাপিয়ে ফেলেছি।

—বেশ করেছ। এইবার বিজ্ঞাপন দাও। লিখে দাও প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। টাইটেল্ পেজের একটা পাতায় ছেপে দেবে দ্বিতীয় সংস্করণ। তিনমাস পরে আবার ছাপবে তৃতীয় সংস্করণ। এমনি করে চালিয়ে যাও, আর এদিকে লিখিয়ে যাও নানান্ নামে নানা কাগজে বইএর প্রশংসা, আর লেখকের প্রশংসা।

বিপিন বললে, এমনি করলে বই দুখানা বিক্রি হবে? লোকে পড়বে—আপনি বলছেন?

বিমানবিহারী হো হো করে এমনভাবে হাসলেন যে বিপিন চমকে উঠলো।

হাসি থামিয়ে বিমানবাবু ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, না না পড়বে না। পড়বে না। ঢাক পেটানোর জোরে বই বিক্রি হবে, কিন্তু কষ্ট করে পড়বে না কেউ। আমাদের এই হতভাগা দেশের মানুষগুলো বই পড়ে না, বই রেখে।

'বই রাখে' কথাটা বুঝতে পারেনি বিপিন ঘোষ। তার বোকা-বোকা মুখের চেহারা দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বিমানবাবু। তাই তাকে বুঝিয়ে বললেন, বই পড়ে না, কিন্তু বইটা কখন সিনেমায় হবে জানতে চায়। সিনেমার ছবিকে বলে বই। বাপ করে একখানা টিকিট কেটে রেখে নেয়। ফুর্তিকে ফুর্তি—বই পড়াকে বই পড়া। দুকাজ একসঙ্গে হয়ে গেল। আমার সেই যে-বইটা সেবার প্রাইজ্ পেলে সেটার বেলায় ঠিক এমনি হয়েছিল।

কি হয়েছিল বিপিন আর জানতে চাইলে না। 'প্রাইজে'র কথায় তার রক্ত তখন চন্‌মন্ করে উঠেছে। ভাল করে এগিয়ে এসে বসলো সে। বললে, এই প্রাইজ্‌গুলো কেমন করে পাওয়া যায় স্যার?

বিমানবাবু বললেন, ওটা হলো গিয়ে 'টপ্ সিক্রেট্।' আজ নয়, পরে বলবো।

কিন্তু বিপিনের মন তখন উস্‌খুস্ করছে। ভাবছে বুঝি-বা সবই যখন হলো তখন পাঁচহাজার টাকার প্রাইজ্‌টাই বা বাদ যায় কেন? কিন্তু মুখ ফুটে বলতে কিছুতেই পারছে না। শুধু বারদুই খতোমতো খেয়ে উচ্চারণ করলে, স্যার, প্রাইজ্—স্যার, প্রাইজ্—

বিমানবিহারী হাসলেন। বললেন, সারপ্রাইজ ই বটে! ক'জন সাহিত্যিক এই প্রাইজ্ দুটোর জন্য মেরে দিয়েছে।

বিপিন হঠাৎ বলে বসলো, কিন্তু স্যার এই প্রাইজ্ দুটো আরও দু'একজনের পাওয়া উচিত ছিল। আপনাদের মত দুচারখানা ভাল বই তাঁরাও লিখেছেন।

বিমানবিহারী বললেন, তুমি কাদের কথা বলছো আমি জানি। তারা যাতে না পায় তার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি। তাদের একজনের লেখা বন্ধ হয়ে গেছে, আর-একজন খুব কম লেখে।

—তার জন্যে কি ব্যবস্থা করেছেন?

বিমানবিহারী বললেন, নিয়ম করে রেখেছি—যে-বইখানিকে পুরস্কার দেওয়া হবে সে-বইখানি তিন বছরের ভেতর লেখা হওয়া চাই।

বিপিন বললে, কিন্তু স্যার, তাঁদের সারাজীবনের সাধনা—

—আরে রেখে দাও সারাজীবন! সব সময়েই মনে রেখো—যে-দেশে তুমি বাস করছো এ-দেশে বড় লেখক যদি হতে চাও তো আমি যা বললাম তাই কোরো। তোমার এই 'লেখকের প্রার্থনা' কাগজখানি ভাল করে বাঁধিয়ে বাইরের ঘরে টাঙিয়ে রেখো। এখানে আত্মসাধনাই হলো সবচেয়ে বড় সাধনা। পরের কথা ভেবেছো কি মরেছো।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সেদিন ও আজ

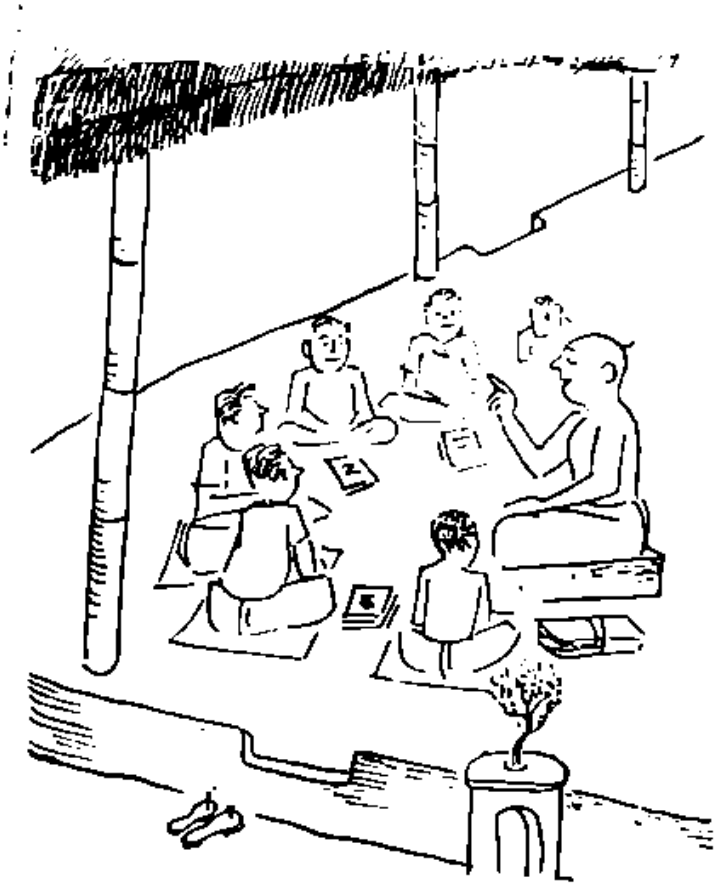

শিক্ষা ও সম্মান

সেদিন ও আজ

শ্রদ্ধা ও ভক্তি

সেদিন ও আজ

আজ।...

সেদিন ও আজ

নববর্ষ উৎসব

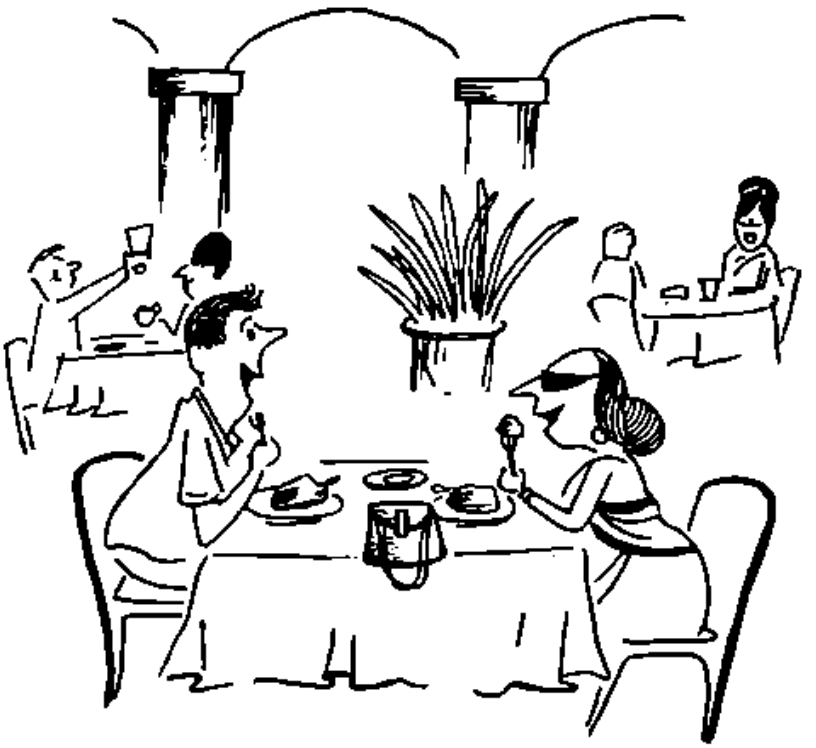

সংগীতে সংগতি

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সংগীত রাগাশ্রয়ী। আবার রাগ অর্থাৎ সুর ভাবাশ্রয়ী। রাগ বিভিন্ন রস বা ভাবের। রাগের মধ্যে আছে উদ্দীপনা, উন্মাদনা, আবেগ, কারুণ্য এবং শান্তরস, তাই রাগের বিকাশ এবং তার বিস্তৃতরূপ মানুষকে মুগ্ধ করে। ভারতীয় সংগীত রাগ সমৃদ্ধ এবং যেহেতু সুর দেশ কাল পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সেজন্য তার রূপ শাশ্বত এবং কোন্ সে আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তার আবেদন অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এর প্রধান কারণ সংগীত প্রগতিশীল, নিত্য-নূতন সুর সম্ভার তাকে পুষ্ট করে চলেছে।

ভারতীয় রাগগুলি একযুগে সৃষ্ট হয় নি বা ঐগুলি দেবদেবীর অলৌকিক সৃষ্টি নয়। সুর মানুষের কল্পনা প্রসূত। অসীমকে সীমার মধ্যে পাবার যে আকাঙ্ক্ষা মানবমনকে আকুল করেছে, তারই ফল স্বরূপ আমরা দেখতে পাই নানা শিল্পকলার উদ্ভব। শিল্পকলা ব্যাপক এবং তার রূপ অসীম। কথায় যখন ভাব অসম্পূর্ণ থেকে যায় তখন সুরে, রেখায়, ভঙ্গীমায় কল্পনাকে রূপ দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য সাহিত্যিক স্বর্গত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখিত সংগীত মঞ্জরী গ্রন্থের ভূমিকা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যুক্তিসংগত মনে করি। "গান মাত্রেরই সুর তার কথাকে অতিক্রম করে, আর সে কথাকে নূতনভাবে রূপান্তরিত করে—সে গান কীর্তনই হোক, আর, বাউলই হোক্। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে শুধু যন্ত্র সংগীত নয়—কণ্ঠ সংগীতেও সুর প্রধান। হিন্দু সংগীতে রাগরাগিনীর সৃষ্টি হিন্দু সভ্যতার একটি অমরকীর্তি। আর এইসব রাগরাগিনীর রূপ ও সৌন্দর্য মার্গ সংগীতে যতটা বিকশিত হয়েছে, দেশী সংগীতে ততটা হয় নি। এই কারণেই হিন্দীগান সংগীতপ্রিয় শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। সুতরাং গীত বাদ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে অবাদ্য কাব্য।" ভারতের সংগীত স্রষ্টারা সুরকেই অনুসন্ধান করে গেছেন এবং এই অনুসন্ধান চলেছে যুগযুগান্তর ধরে, তাঁদের কল্পনাকে রূপ দিতে। আজও এই অনুসন্ধানের সমাপ্তি নেই এবং কোন দিনই এর সমাপ্তি ঘটবে না। ভারতীয় সংগীতের এই মহান সম্পদকে হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নয়। সুর বিস্তারের বা অলঙ্কারের মর্ম তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই স্বর সাধনা, অলঙ্কার সাধনা সংগীত শিক্ষার ভিত্তি।

আমাদের দেশে রাগরাগিনী সৃষ্টির প্রণালীবদ্ধ ইতিহাস নেই। আদি রাগগুলি কে রচনা করেছেন তা অজ্ঞাত। কোন্ সে সুরকবি যাঁর কল্পনাপ্রসূত এই স্বরলহরী রাগ। লোকচক্ষুর আড়ালে, ইতিহাসের নাগালের বাইরে তাঁরা এই অমূল্য রত্ন দিয়ে গেছেন। সংগীতের ক্ষেত্রে সুরই কাব্যকে মহীয়ান করে তুলেছে, কাব্যের ভাব বিশ্লেষণে সুরই প্রধান সহায়ক। সুর ভিন্ন অনেক সময় কাব্য বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। তাই পুরাকাল থেকে শুরু করে ভারতের অধিকাংশ কবি সুরে বেঁধেছেন তাঁদের কাব্য। চার্যগীতি, গীত গোবিন্দ প্রভৃতিতে রাগ উল্লেখ দ্বারা প্রমাণ হয়, যে ঐগুলি সুরে গাওয়া হতো এবং প্রাচীনকাল থেকে মার্গ সংগীতের

প্রভাব বাংলা গানে এসে পড়ে। 'দেশাক্ষী', 'মালবিকা' 'সৈন্ধবী' প্রভৃতি রাগের প্রচলিত নাম 'দেশ' 'মালবী' 'সিন্ধু'। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতির অমর কাব্য সমগ্র ভারতে প্রচারিত হল কীর্তনের সুরের সাহায্যে। শ্রীচৈতন্যদেব এই প্রেমের বাণী প্রচার করলেন প্রাণমাতানো সুরে। রামায়ণ ও মহাভারতও এক সময়ে সুর, তাল ও যন্ত্রের সাহায্যে গীত হতো। সুর ও অভিনয় দ্বারা কথকতা, রামায়ণ গান, চণ্ডীর গান প্রভৃতি এক সময়ে বাংলার পল্লীসমাজ মুখর করে তুলত। এইগুলি লোক শিক্ষার অন্তর্গত ছিল।

আঠারশ শতাব্দী থেকে যখন মার্গ সংগীত বাংলায় বিশেষভাবে অনুশীলন ও প্রচার হয়, তখন থেকে বাংলা গানে বিশুদ্ধ রাগের প্রভাব লক্ষিত হয়। অন্যান্য গান অপেক্ষা ব্রহ্ম-সংগীতই বিশেষভাবে রাগসমৃদ্ধ। বাংলার খেঁচ্চিকার টপ্পার সুরকেও বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন। নিধুবাবু, শ্রীধর কথক রচিত বাংলা টপ্পায় হিন্দী টপ্পার সুর অবিকল অনুকরণ করা হয়েছে। যদিও বাংলা গানে নিজস্ব মৌলিকত্ব আছে এবং তার কথার একটি পৃথক আবেদন আছে, তা হলেও উচ্চাঙ্গ সংগীত যে বাংলা গানকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বাংলার সংগীতে যুগান্তর এনেছেন। তাঁর গানে ভারতীয় বিভিন্ন ধারার সংগীতের অপরূপ সমন্বয়। তাঁর কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতাও সুরে গাওয়া হয়, সুরের অলঙ্কারে কবিতাগুলি আরও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ "তুমি কি কেবলি ছবি", "নহ মাতা নহ কন্যা", "একলি আমি তারেই বলি", "হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থ", প্রভৃতি গানগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। কাব্যসংগীত হিসেবে গানগুলির তুলনা নেই। আবৃত্তি অপেক্ষা সুরের সাহায্যে গাইলে এর মাধুর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। আবার স্বদেশী সংগীতগুলির কথা বলা যায়। ভাবোপযোগী সুর সংযোজনায় গানগুলির আবেদন সর্বজনীন। স্বদেশীযুগে বিশেষতঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বদেশী সংগীতের দীপ্ত বাণী ও সুর ভারতের সুপ্ত আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছিল। এই গানে ভারতবাসী ভুলেছিল আপন পর হীন বর্ণভেদ ও জাতিভেদ। তাই সুরের আদর্শ কি শুধু সামান্য আনন্দদানে, আত্মপ্রসাদে বা প্রতিষ্ঠায়? না' তা নয়—এর যোগ বিশ্বের সাথে।

প্রবন্ধ পঞ্চক

শিকাগোর হল্ অফ্ কলম্বিয়া·····

যে দুঃসাহসিক নাবিক সমুদ্র তরঙ্গের অজানা পথের ভেতর থেকে একদিন নতুন করে খুঁজে বের করেছিলেন এই মহাদেশের তট, তাঁরি নামে নির্মিত হয়েছে এই বিরাট ভবন·· সেই ভবনে আজ সমবেত হয়েছে, জগতের বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি, বিভিন্ন ধর্মের আর সভ্যতার প্রতিনিধি···

১৮৯৩ সাল··সেপ্টেম্বর মাসের ১১ই তারিখ···সোমবার ঘড়িতে বাজছে দশটা···

বিরাট হলে তিলার্ধ স্থান নেই, সমগ্র আমেরিকা থেকে সমবেত হয়েছে প্রায় দশ হাজার শ্রোতা। শ্রোতাদের সামনে সু-উচ্চ বক্তৃতা মঞ্চে গোলাকারে বসেছেন জগতের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা, প্রায় এক সহস্র বিভিন্ন প্রবন্ধ পঠিত হবে এখানে।

মধ্যস্থলে রাজকীয় আসনে সমাসীন রোমান ক্যাথলিক জগতের প্রধানতম ধর্মনায়ক কার্ডিন্যাল গিবন্স্··তাঁর দুই পাশে জগতের সকল ধর্মের প্রতিনিধি-প্রধানেরা যে-যার নির্দিষ্ট আসনে বসেছেন। কোন ধর্মই বাদ পড়েনি···খ্রীষ্টান ধর্ম-মণ্ডলীর বাইরে জগতের আর আট-টি প্রধান ধর্মই সেখানে সমবেত হয়েছেন ··

দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কার্ডিন্যাল গিবন্স্ শান্তকণ্ঠে প্রার্থনা করলেন···

ধর্ম-সভার পক্ষ থেকে ডাক্তার ব্যারোজ সভার উদ্বোধন করলেন, বিশ্বের প্রতিনিধিদের সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনে স্বাগত জানালেন ··। বিরাট জনতা স্থির, প্রস্তর নীরব···। সভাপতি একে একে প্রতিনিধিদের প্রাথমিক বক্তৃতার জন্যে আহ্বান করলেন···

সন্ন্যাসী স্থির বসে আছেন···তাঁর কানে যেন কোন কথাই পৌঁছচ্ছে না·· তাঁর চোখের সামনে সেই বিরাট জনতা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে·· । তিনি বসে আছেন, বহুদূরে, গঙ্গার ধারে, পঞ্চবটীর মূলে তাঁর গুরুর পদতলে···। একজনের পর একজন বক্তৃতা দিতে উঠেন, বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে সভাপতি ঘণ্টা বাজিয়ে আর একজনকে আহ্বান করেন ··

এইভাবে সন্ন্যাসীর পালা আসে···। সভাপতি মৃদুকণ্ঠে আহ্বান করেন···। সন্ন্যাসী বলেন, না,এখন নয় ··আমার আগে অন্য লোক, চলে বক্তৃতা। সভাপতি আবার সন্ন্যাসীকে আহ্বান করেন। সচকিত হয়ে সন্ন্যাসী আবার বলেন, না, এখন নয়···

সভাপতি বিস্মিত হয়ে যান ··ক্রমশঃ বিরক্তও হন। সভাপতি এবার বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন···আর বিলম্ব করা চলতে পারে না···। সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন, ধ্যান থেকে···

সমস্ত মুখ গোধূলির আকাশের মতন রক্ত রাঙা হয়ে উঠে, একবার দু চোখের দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত সভাকে যেন পরিক্রমণ করে আনেন, তারপর অতি মৃদুকণ্ঠে দেবী সরস্বতীকে আহ্বান করেন··· সহসা সন্ন্যাসীর চেতনা বাঙ্ময় হয়ে উঠে, সমবেত জনতাকে আহ্বান করে সিংহ-নাদ করে উঠলেন,—Sisters and Brothers of America···

সহসা সেই নিস্প্রাণ জনতার মধ্যে কে যেন বিদ্যুৎ-সঞ্চার করে দিলো···এতক্ষণ যে জনতা অর্ধ-চেতন অবস্থায় উদাসীন বসেছিল কে যেন তাদের সেই দশ সহস্র দেহকে নিমেষে এক মহাপ্রাণস্পর্শে সচকিত করে তুললো, এক সঙ্গে তারা মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলো···

সন্ন্যাসী স্তম্ভিত, বিমূঢ় কথা বলতে চেষ্টা করেন কিন্তু বলতে পারেন না···সেই দশসহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে, মুহুর্মুহু করতালিতে তাঁর সব চেষ্টা ডুবে যায়···

নববর্ষের অর্ঘ্য

নতুন বছর যখন আরম্ভ হয় তখন মানুষের মনে নতুন করে আশা এবং উৎসাহের সঞ্চার হয়—এই অনুভূতি পৃথিবীব্যাপী। বাংলার নববর্ষও তাই বাঙালীর জীবনে প্রতি বছর তেমনি নতুন আশা নিয়ে আসে। এই দিনটিতে আমরা যেমন নিজেদের সাংসারিক, বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক সুখসমৃদ্ধি কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, তেমনি আন্তরিক ভাবে কামনা করি সকল মানুষের হিত, সকল মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি। ১৩৭৪ সালকে আমরা আমাদের অনেক প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আশা করছি অনাগত দিনগুলি আমাদের জীবনের অনেক ব্যর্থতার গ্লানি মোচন করে নতুন সাফল্য এনে দেবে। আর সেই সঙ্গে স্মরণ করছি বিগত দিনের মনীষী ও সাহিত্যস্রষ্টাদের যাঁরা যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে তাঁদের অমূল্য চিন্তার ফসল আমাদের দিয়ে গেছেন, যা আমাদের মনে আশা দিয়েছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আজকের দিনের সঙ্গে বিগত দিনের চিন্তাকে ধরে রাখার প্রয়াসে আমরা সেকালের কয়েকজন স্বনামধন্য মনীষীর কয়েকটি বিস্মৃত রচনা এই সংখ্যায় সংকলিত করে দিলাম।

রচনাগুলি সংকলন করেছেন : অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও দেশের শিক্ষা, ঐতিহ্য, জাতীয়তা এবং দেশবাসীর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধগুলিও বাংলাসাহিত্যের কম সম্পদ নয়। 'লোকশিক্ষা' নামক প্রসঙ্গটিতে তিনি আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন তা সেদিনও যেমন সত্য ছিল আজও তেমনিই সত্য। লেখাটি ১২৮৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন থেকে সংকলিত।

নব্য লেখকদের প্রতি প্রসঙ্গটিতে যেসব অমূল্য অভিমত আছে তার মূল্য ও আবেদন সর্বকালের। রচনাটি ১২৯১ সালের প্রচার নামক মাসিক পত্রিকা থেকে সংকলিত।

নববর্ষের চিন্তা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লোকশিক্ষা

লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু বাঙ্গালির দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দ্বারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহ মাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে।

ইহা কখন সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষাল পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজীনবীস সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন।

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামরসাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এদেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না। এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদ পত্র; কোন খানির গ্রাহক দুইশত, কোন খানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে

পাঁচশত লাভার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহস্র, সহস্র। এক এক খানির গ্রাহক সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই বাদ্য বাদ্য চর্ব্বণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বক্তৃতাসকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখন দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে, আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্মের কূটতর্ক সকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিভিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মক, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে, গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই বদ্ধমূল দিগ্‌বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন—লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সেদিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকলবাসীকে বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এদিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত পাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম্ম পুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না. লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদী পিঁড়ীর উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকা মালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্ নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়, রাক্ষসীর প্রেম প্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সমলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামরসাধারণসমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম জৈব, যে আত্মান্বেষণ অজ্ঞেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্বপালন করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরমকার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুল্‌কি কাওয়ালী শুনায় চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হইবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওয়ালীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজীতে শিক্ষিত, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয়

যুবকের দোষে লোকশিক্ষার পরম আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে মুদ্রণ ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না। কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরাজী শিক্ষা সত্ত্বেও বাঙ্গালা দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার মূল কারণ বলি। শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার কাউন্সিলারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিন যাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ তাহা নন্দের ষষ্ঠীচরণ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাপ্তা কমেট্ সাহেব এ দেশে সার অ্যাসলি ইডেন্; ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নন্দের ষষ্ঠীচরণের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক, তাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাট লক্ষ নব্বই হাজার নয়ন—তাহারা তাহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয়কোটি ষাটিলক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালার লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালার লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিত অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।

নব্য-লেখকদের প্রতি

যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্ততঃ উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রা ওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করা পাপ। যাহা লিখিবেন তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।

যে বিষয়ে যাঁহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ অকর্ত্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাহিত্যে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক।

অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বাক্যের প্রয়োজন হয় বটে, লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে প্রয়োজনমত আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে, ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর নাই।

সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

কাহারও অনুকরণ করিবেন না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরেজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এইরূপ লিখিব, এরূপ কদাপি মনে স্থান দিবেন না।

যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবেন না, তাহা লিখিবেন না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

নববর্ষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনা ও ভাষণ আছে। এখানে যে লেখাটি সংকলিত হল তা কোন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা নয়। বিভিন্ন সময়ে শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানে যেসব ভাষণ তিনি দিয়েছেন তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ বেছে নিয়ে রচনাটি তৈরি। ১৩৩২ সালের "শান্তিনিকেতন" পত্রিকা থেকে সংকলিত।

নববর্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকের দিনে, নববর্ষের আরম্ভের দিনে সেই রূপটি দেখ, যে রূপ নানা আঘাতে অভাবে অপমানে আমাদের নানা ত্রুটিতেও বড় হয়ে উঠেছে। একে শুধু বাহিরের বস্তু বলে' দেখো না, এ'কে অন্তর্নিহিত সত্যের প্রকাশ বলে' দেখ। আমি একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের এই লাইব্রেরী। এ তো ধনীর টাকায় হঠাৎ তৈরি করা আড়ম্বরের জিনিস নয়। এ যে বিশ্বভারতীর অঙ্গ হয়ে ধীরে ধীরে অভাবনীয় রূপে বেড়ে উঠেছে। আমাদের কাছে বিশ্বভারতীর সাধনা যত সত্য হয়েছে, লাইব্রেরীও সেই সত্যের জোরেই তত পূর্ণ হয়ে উঠেছে, এমন একটি ভাবের দ্বারা এ পুষ্ট যে, অর্থের অভাবও একে দরিদ্র করতে পারেনি। বনস্পতির মত এ আপনার রস আপনিই আকর্ষণ করে নিয়েছে, বাইরে থেকে জল সেচন করতে হয়নি।

আমি দূরে সরে গিয়েছিলুম বলেই আমাদের কাজের এই রূপটি আমার কাছে উজ্জ্বল হয়েছিল। ছোটখাটো খুঁটিনাটি তখন চোখে পড়েনি। এর যা তুচ্ছ সেগুলোকে মানুষ ধ্রুব করে রাখব ভেবে পাথরের পর পাথর গাঁথে, তার মধ্য দিয়ে অশথ গাছ ওঠে। বিশ্বসত্যের মধ্যে যাকে পাই, মৃত্যু তাকে পুনঃ পুনঃ প্রাণের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনে; নিয়ম লুপ্ত হতে পারে, বাইরের সব ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু তার বিনাশ নেই। আমাদের সংস্কার এমনি জড়পুঞ্জক যে, সে মনে করে বাইরের কঠিন উপকরণ দিয়ে সত্যকে সে রক্ষা করবে কিন্তু প্রাণ যে সুকুমার, কাঁচা; তার মত ভঙ্গী করুক না, সে লোপের দিকেই চলেছে। প্রাণকে বিশ্বাস

করব। প্রাণবান সত্য চিরপরিবর্তন-শীল, জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়ে তার আবির্ভাব হয়। সত্যের সেই চিরপ্রবহমান অমৃতরূপের ধারা দেখি কোথাও প্রবাহিত হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না, তবুও সে মরুকে একটু একটু করে জয় করেছে। সেই জীবনসত্যের বিজয়ী রূপকে রেখে দিতে পারি যেন আমাদের মধ্যে, সংস্কারের আচ্ছাদন সরে যায় যেন, ধূলির উপর থেকে কুহক যেন কেটে যায়, চিত্তের ওপর আবরণ যেন না থাকে। সত্যকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে তার জন্যে আমাদের ত্যাগ যেন সহজ হয়, আমাদের পূজা যেন আমাদের অন্তরের মধ্যেই সার্থকতার সন্ধান করে। আমাদের বাণী সেবা কর্ম ত্যাগ এই মহৎ সত্যের উপযুক্ত হোক, বিশ্ববিধাতার কাছে এই আমরা আশীর্বাদ চাই।

• • •

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল উঠ উঠ সঘনে।

প্রতিদিনের প্রভাতের মধ্যে নূতন বাণী প্রতিদিন ধ্বনিত হয়। সমস্ত জন্মের অতীত কালের অতীত যিনি আছেন তাঁরই মুখ অরুণ আলোকে উদ্ঘাটিত হয়, তাঁকে দেখতে পাই, সব অন্ধকার সব শোক দুঃখ তাপ দূর হয়ে যায়। চিরসত্য চিরনবীন, তারই মধ্যে আমাদের আশা। জরা-মৃত্যু অন্ধকারের অবসানে সমস্ত আকাশকে পরিপূর্ণ করে প্রতিদিনই সেই অজর অমর অভয়ের বাণী প্রকাশ পায়।

আমাদের জীবনে প্রতিদিনের প্রভাতের এই আশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এই অন্ধকারের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে চিরনবীন প্রকাশমান না হলে পৃথিবীর মলিনতার ভার অসহ্য হত। মাঝে মাঝে পর্দা পড়ে, আবরণ আসে, নবীন, যা চিরনবীন, যার ভিতর ক্লান্তি নেই, সেই চিরসত্যকে তখন আবার নূতন করে দেখি।

আজকের প্রভাত আমাদের কাছে সেই চিরনবীনকে যেন নিয়ে আসে। আমাদের কর্মে, আমাদের সেবায় কতরকম ত্রুটি, কতরকম বিচ্যুতি ঘটে, আমাদের কর্মজীবনের সব গ্লানি সব গ্লানি দূর হোক, আশ্বাসে সব পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। যদি মনে সংশয় এসে থাকে সব কর্ম ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সব বৃথা হল—তবে যারা বিশ্বের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে ধূলির আকর্ষণ ঠেলে উপরে রেখে দিয়েছে সকলকে যে প্রাণ—প্রাণের যে আশ্বাস, তাকে নূতন করে জীবনে গ্রহণ করি, নব জাগরণের কিরণজাল আমাদের মধ্যে সঞ্চীত জাগিয়ে তুলুক, তার আলোক আমাদের সব চৈতন্য, সব শক্তিকে উদ্বোধিত করে দিক। অজর অমর অশোক যিনি তাঁর আশীর্বাদ আমাদের রক্তের মধ্যে প্রাণকে নূতন করে সঞ্চারিত করে দিক।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ যে সব রচনা রেখে গিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর অনন্য চিন্তা ও ধীশক্তির স্বাক্ষর আছে। বাংলার সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই মূলতঃ তাঁর চিন্তা অনেক রচনার মধ্যেই বিধৃত। এই সংখ্যায় তাঁর যে লেখাটি সংকলিত করে দেওয়া হল তা তাঁর ব্রত-পার্বণ সম্পর্কিত লেখার নানা প্রাসঙ্গিক অংশ নিয়ে গ্রথিত করা হয়েছে।

বৈশাখী ব্রত ও অন্যান্য

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যায়। এটাও বেশ বলা যায় যে, অনুপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রত-ক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।

প্রতি ঋতুতেই ব্রত আছে। বৈশাখে অনন্ত চতুর্দশী, মধু সংক্রান্তি ইত্যাদি। আর একটি হল আদর সিংহাসন ব্রত, এটি সম্পূর্ণ মেয়েলি ব্রত। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এক স্বামী সোহাগিনী সধবা স্ত্রীকে যত্নপূর্বক নিজগৃহে ডেকে এনে পিঠালির দ্বারা বিচিত্র সিংহাসন রচনা করে তাকে বসাবে, তার পায়ে আলতা লাগাবে, ফুলের মালা এবং সুগন্ধি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করবে, তারপর তাকে নানা ভালমন্দ জিনিস খাইয়ে সন্তুষ্ট করবে। এইভাবে সারা বৈশাখ মাস এক একজন সধবাকে অথবা একজনকেই আদর, অভ্যর্থনা, অর্চনা করবে। চারবছর পূর্ণ হলে ব্রতের উদ্‌যাপন। এই ব্রত করলে সধবা মেয়েরা চিরকাল দাম্পত্য সুখ ভোগ করবে।

তারপরে মেয়েদের লক্ষ্মীব্রত। কোনো কোনো ঘরে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবারই এই পুজো হয়।

অন্যদেশের লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে আমাদের পুজাটি মিলিয়ে দেখলে দেখি যে, লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে দেশের ভিন প্রধান শস্য উৎসব। কিন্তু পূজারীরা লক্ষ্মীব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণন করে যে শ্লোকটি মেয়েদের শুনিয়ে যেন সেটা থেকে কিছুতে বোঝা যাবে না যে এই ব্রত অফলন্ত, ফলন্ত এবং সুফলন্ত শস্যের উৎসব অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় শ্লোক বলছে—

লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত সর্বব্রত সার,
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার !
বন্ধ্যা নারী পুত্র পায়, যায় সর্ব দুখ,
নির্ধনের ধন হয়, নিত্য বাড়ে সুখ।

ধানের কি কোনো শস্যের নামগন্ধ এতে পাওয়া গেল না। প্রাচীনকালের প্রধান উৎসব এবং শস্য-দেবতারা খুবই প্রসিদ্ধ বলে এই ব্রতকে হিঁদুয়ানির চেহারা দেবার জন্য এর উপর এত জোড়াতাড়ায়

যায় চলেছে যে আসল ব্রতটি কেমন ছিল, তা আর এখন কতকটা কল্পনা করে দেখা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যে ব্রতগুলি ছোট এবং অপ্রধান বলে শাস্ত্রের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অনেকটা অটুট অবস্থায় রয়ে গিয়েছে তার থেকে ব্রতের খাঁটি ও নিখুঁত চেহারাটি পাওয়া সহজ। যেমন এই 'তোষলা' ব্রতটি। কোথাও একে বলে 'তুঁষতুষলি'। পূর্ববঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে দুজায়গায়ই এই ব্রতের চলন আছে। প্রতিদিন পৌষ মাসের সকালে মেয়েরা এই ব্রতটি করে। ব্রতের বিধি এই: অঘ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সকালে স্নান করে গোবরের ছ-বুড়ি ছ-গণ্ডা বা ১৪৪টি গুলি পাকিয়ে, কালো দাগশূন্য নতুন সরাতে বেগুনপাতা বিছিয়ে তার উপরে গুলি ক'টি রাখতে হয়। প্রত্যেক গুলিতে একটি করে সিঁদুরের ফোঁটা এবং পাঁচগাছি করে দুর্বাঘাস গুঁজে দিতে হয়। তার উপর নতুন আলোচালের তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সরষে শিম মূলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণগুলির থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটি সারমাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বর করে তোলার ব্রত। ব্রতের ছড়াগুলি পূর্ববঙ্গে এক, পশ্চিমবঙ্গে আর এক হলেও ছড়াগুলি পড়তে পড়তে পল্লীগ্রামের সহজ জীবনযাত্রার এমন একটি পরিষ্কার ছবি মনে জাগিয়ে তোলে, যেটি কোনো শাস্ত্রীয় ব্রতে আমরা পাই না। পৌষমাসে এদেশে বেশ একটু শীত, এবং সকাল বেলায় ব্রত এটি, কাজেই আমরা অনায়াসে কল্পনা করতে পারি, বহুযুগ আগেকার বাংলাদেশের একখানি গ্রামের উপর রাত্রির যবনিকা আস্তে সরে গেল; সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি শীতের হাওয়া বইছে—গ্রামের উপরে বড় গাছের আগায় এখনো কুয়াশা পাতলা চাদরের মতো লেগে রয়েছে; শিশিরে সকালটি একটু ভিজে-ভিজে; বেড়ার ধারে ধারে আর চালে চালে শিমপাতার সবুজ; খেতে খেতে মূলোর ফুল, সরষের ফুল—দুধ আর চন্দনের ফেনার মতো দেখা যাচ্ছে: নতুন সরায় বেগুনপাতা চাপা দিয়ে, সারমাটি নিয়ে মেয়েরা দলে দলে তোষলা ব্রত করতে খেতের দিকে চলল এবং সেখানে মূলোর ফুল, শিমের ফুল, সরষের ফুল দিয়ে ব্রত আরম্ভ হল।

প্রথম, তোষলার স্তুতি—

তুঁষ-তুঁষলি তুমি কে।
তোমায় পূজা করে যে—
ধনে ধানে বাড়ন্ত
সুখে থাকে আদি অন্ত।
তোষলা লো তুঁষতুষ্টি!
ধনে ধানে গাঁয়ে গুষ্টি,
ঘরে ঘরে গাই বিউষ্টি॥

তারপর অনুষ্ঠান উপকরণের বর্ণনা, যেমন—

গাইয়ের গোবর, সরষের ফুল,
আসনপিঁড়ি, এলোচুল,—
গেরের গোবরে সরষের ফুল,—
ঐ ক'রে পূজি আমরা মা বাপের কুল

এরপরে মেয়েরা তোষলা ব্রতের কামনা জানাচ্ছে—

কোদাল কাটা ধন পাব,
গোহাল-আলো গোরু পাব,
ঘরবার-আলো জামাই পাব,
সেঁজ-আলো কি পাব,
আড়ি-মাপা সিঁদুর পাব।
ঘর করব নগরে,
মরব গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম কুলে,
তোমার কাছে মাগি এই বর –
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

তারপর পৌষের সংক্রান্তির দিনে মেয়েরা সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রত সাঙ্গ করে একটি সরার ঘিয়ের প্রদীপ জেলে সেগুলি মাথায় নিয়ে সারি বেঁধে নদীতে স্নান করে তোষলা ভাসাতে চলেছে।

কুলকুলনি এয়ো রানী
মাঘ মাসে শীতল পানি
শীতল শীতল ধাইলো।
বড় গঙ্গা নাইলো।

এরপর শীতের মধ্যে সূর্যের ও পৃথিবীর মিলনের আশা জাগল—

শীতল শীতল জাগে
রাই বিয়ে মাগে।

তারপর গঙ্গাধারে জলের কলধ্বনি, পাখিদের কাকলির সঙ্গে সূর্যের বরযাত্রার বাদ্য বাজছে—

আমাদের রায়ের বিয়ে
বাম্ কুরকুর দিয়ে।

এরপর সূর্যের উদয় দর্শন করে স্নান করে ব্রত শেষে নদীতীরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় বর্ণন করে ছড়া—

রায় উঠেছেন রায় উঠেছেন বড় গঙ্গার ঘাটে।
কার হাতে রে তেল গামছা? দাও গো মেয়ের হাতে।
রায় উঠেছেন রায় উঠেছেন মেজ গঙ্গার ঘাটে।
কার হাতে রে শাঁখা সিঁদুর দাও গো মেয়ের হাতে।
রায় উঠেছেন রায় উঠেছেন ছোট গঙ্গার ঘাটে।
রায় উঠছেন অম্নে, তামার হাঁড়ির বর্ণে॥

নানা বস্তুতে, নানা উৎসবে নানা ছড়া—ছেলেমেয়েদের জন্যেও কত ছড়া—

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি ঘুমের বাড়ি এসো।
সেজ নেই মাদুর নেই পুটুর চোখে বস।

ডিবে ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
খিড়কি দুয়োর খুলে দেব দুদ্দুর করে যেও।
... ...
পাঁজ পূজন নেজুতি ষোল ঘরে ষোল ব্রতী
তার এক ঘরে আমি ব্রতী।
ব্রতী হয়ে মাগলাম বর—
ধনে পুত্রে পুরুক বাপ যায় ঘর।
... ...
যমুনা যমুনা যমুনা
সতিন যেন হয় না।
হাতা হাতা হাতা
খা সতিনের মাথা
সাত ভায়ের বোন হয়ে সাবিত্রী সমান হয়ে
গঙ্গা যমুনা পুজ্যন, সোনার থালে ভুজ্যন।
... ...

প্রত্যেক ব্রতের মূল পাতা আকাশ বাতাসের সঙ্গে এইসব অপার্থিব অথচ একেবারে খাঁটি ও আশ্চর্য রকম সৌন্দর্যে রসে ও শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালির সম্পূর্ণ নিজের ব্রতগুলির যে গভীর যোগ দেখা যাচ্ছে তাতে করে এগুলিকে ধর্মানুষ্ঠান বলব কি ব্রত-পার্বণ এক একটি উৎসব বলব ঠিক করা শক্ত।

পণ্ডিত বিধুশেখর: শাস্ত্রীর মত মানুষ আজ আর বোধকরি একজনও নেই বাংলাদেশে। একদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ মেধা, নিয়মনিষ্ঠা, সাত্ত্বিকতা, অপরদিকে তুলনাহীন সারল্য ও সহজতা, সর্বসংস্কারমুক্ত মনের প্রসারতা এবং সর্ববিষয়ে অবাধ উদারতা। অপরিসীম কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যে দিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে দিন কাটিয়েছেন, সদাহাস্যময় প্রফুল্লতা নিয়ে, ছোটবড় সবাইকার শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করে। তাঁর লেখা বেশী নেই। এই সংখ্যায় তাঁর একটি দুর্লভ রচনা উদ্ধার করে দেওয়া হল।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী

বিধুশেখর ভট্টাচার্য

(দেহের বন্ধন কঠিন, কিন্তু আত্মার বন্ধন যে আরও অনেক কঠিন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। দেহের বন্ধনে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় না। আত্মার বন্ধনে মানুষ আর মানুষ থাকে না। দেহের বন্ধন যে উপেক্ষণীয় তাহা নহে, কিন্তু আত্মার যে বন্ধন, যাহাতে মানুষ পশু হইতে বসে, তাহা যে ছেদন করিতেই হইবে তাহাতে যেন ভুল না হয়।

রাজনীতিক সমস্যা-সমাধানের তপস্যায় নিমগ্ন হওয়ায় যখন আমাদের বন্ধনের ছেদন না হইয়া ক্রমশই নূতন নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, বন্ধনে বন্ধনে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া বিশেষ বিশেষ গণ্ডীর প্রাচীর তুলিয়া দিয়া আমাদের দেশ যখন মানুষকে মানুষ বলিয়া দেখিবার শক্তি পর্যন্তও হারাইতেছিল, বিশ্বের জন্য ভারতের যে ভারতীয়—যে বাণী একদিন অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল, নিজের বলিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ অভিমান থাকিলেও রাগ দ্বেষ ও মোহে জর্জরিত হৃদয় লইয়া দেশের যখন তাহার দিকে কর্ণপাতও করিবার অবসর হইতেছিল না, সেই দুর্দিনে এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বভারতীর ভাবমূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ভারতের পূর্বঋষিরা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে তাহাই ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিল—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।" আত্মীয়তার এমন একটি নির্মল আসন পাতিতে হইবে যাহাতে সমগ্র বিশ্ব একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান করিবে। মানুষ যেখানে মানুষের সহিত অবাধে আনন্দে মিলিতে মিশিতে পারিবে, যেখানে মিলনের মধ্যে দেশ, কাল, রাষ্ট্র, ধর্ম, মত, বিশ্বাস, সম্প্রদায় প্রভৃতির উপাধিগুলি কোনোরূপ ব্যবধানের সৃষ্টি করিবে না, যেখানে বিশ্বের দান বলিয়া দিবার ও লইবার উভয়েরই পথ সুগম হইবে, যেখানে চিন্তা বিশ্বের সহিত ভারতের যোগেই, বিয়োগে নহে, কার্য যেখানে বিশ্বকে গ্রহণ, বর্জন নহে এবং যেখানকার কল্যাণ বিশ্বের কল্যাণ, মৈত্রী বিশ্বমৈত্রী ও শান্তি বিশ্বের শান্তি।

ইহাই বিশ্বভারতীর ভাবমূর্তি। সন ১৩২৪ সাল, ৮ই পৌষ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিন বিশ্বভারতীর প্রথম সূচনা, এবং পর বৎসর ১৩২৬ সাল, ১৮ই আষাঢ় তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠা ও কার্যারম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ আয়তোৎসবের ব্যাখ্যানে সর্বশেষে যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন তাহাই উল্লেখ করিয়া এই লেখাটি শেষ করি—

"বিশ্বভারতীর একটি মস্ত ভাব। কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটর ছদ্মবেশে বড়র আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে। অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গল বাদ্য বেজে উঠুক। একান্ত মনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশু বিধাতার অমৃত বহন করে এনেছে, সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে, বাড়াবে এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।"

———

বাংলা ও ইংরাজী মাসিক পত্রের সম্পাদকরূপে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সারা পৃথিবীর স্বীকৃতি ও সম্মান অর্জন করলেও তাঁর শক্তি ও প্রতিভার মূল্যায়ন আজও হয়নি। আজকের দিনে তিনি একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম। অথচ একদিন ছিল যখন তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একটি দুষ্প্রাপ্য ও বিস্মৃত রচনাকে উদ্ধার করে এই সংখ্যায় পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা হল। রচনাটি একমাত্র ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শান্তিনিকেতন পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটির মধ্যে মাসিক পত্রের সম্পাদক ও লেখক উভয় পক্ষেরই চিন্তা করবার মতো কিছু কথা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও মাসিকপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মাসিকপত্রে মুদ্রিত প্রথম রচনা "জ্ঞানপ্রকাশ" নামক মাসিকে বাহির হইয়াছিল। ঐ মাসিক বহুকাল লয় পাইয়াছে। "ভুবনমোহিনী—প্রতিভা" একটি সেকালের কোন নারী নামধারী পুরুষের জাল রচনা। রবীন্দ্রনাথ ইহার সমালোচনা "জ্ঞানপ্রকাশে" করেন। এই জাল তখনকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিককে ঠকাইয়াছিল, কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথকে ঠকাইতে পারে নাই।

তাঁহার "বালক" দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, উহা তিনি যেসব বালকদের জন্য বাহির করিয়াছিলেন তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি রুচি সম্বন্ধে ধারণা তিনি তাঁহার নিজের বালক-কালের জ্ঞান বুদ্ধি রুচির মাপকাঠি অনুসারে স্থির করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে উহা "ভারতীর" সহিত মিলিত হইয়া "ভারতী ও বালক" নামে বাহির হইতে পারিয়াছিল।

তিনি "ভারতী", "ভাণ্ডার", "সাধনা" এবং "বঙ্গদর্শনের"ও সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিতেন, তখন আমার বয়স খুব কম। আমি তখন উহার পাঠক ছিলাম না। সুতরাং উহা কিরূপ কাগজ ছিল, সে বিষয়ে অপর অনেকের মত আমার জানা থাকিলেও, আমার নিজের সাক্ষাৎ জ্ঞানলব্ধ কোন মত নাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রথমে প্রকাশিত ও পরে পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশিত কোন কোন বহি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে ঠিক কোন মত প্রকাশ করা যায় না। যে-সকল বাংলা মাসিক পত্র সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "সাধনা"কে আমি প্রথম স্থান দিয়া থাকি।

তাহার কারণ শুধু উহাতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাগুলির উৎকর্ষ নহে। সমস্ত কাগজখানির উপরই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও লিখনভঙ্গীর ছাপ অনুভূত হইত—অন্ততঃ আমার তাহাই মনে হইত।

ইহার একটা কারণ, এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রায় সমস্ত কাগজখানাই লিখিতেন। দ্বিতীয় কারণ পরে শুনিয়াছি—এবং আশা করি তাহা ঠিক শুনিয়াছি ও ঠিক মনে আছে। তিনি অন্য লেখকদের

লেখা খুব শুধরাইয়া দিতেন। তাহাতে হয়ত অনেক লেখা প্রায় পুনর্লিখিত হইয়া যাইত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত লেখকের লেখাও সংস্কৃত হইয়া তবে "সাধনা"য় বাহির হইত।

সেদিন কোথায় যেন বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর একটা তুলনা পড়িতেছিলাম। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখক বলিতেছেন, যে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে পড়িয়া পিটিয়া "মানুষ" করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু রবিবাবু তাহা করেন নাই। আমার বোধ হয়, লেখকের এই কথা অজ্ঞতা-প্রসূত। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাগজগুলির সম্পাদকরূপে অনেক লেখককে উৎকৃষ্ট রচনার পথ নির্দেশ ও কার্যতঃ করিয়াছেন, অন্য কাগজের সংস্রবেও বহু লেখকের রচনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল "প্রবাসী"র "সঞ্চয়ন" বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজী অনেক মাসিক পত্র পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে তাহার সার সংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিবার পর সংশোধনের পালা আরম্ভ হইত। সংশোধন ও সংক্ষেপন ত খুবই হইত, অনেক স্থলে প্রায় সমস্তটাই তিনি নিজে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁ-দিকের খালি জায়গায় লিখিয়া দিতেন। রবীন্দ্রনাথের মত অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকের এইরূপ সঙ্কলন কার্য্যের জন্য পরিশ্রম হইতে প্রতিভাশালী নবীন লেখকদের কিছু শিখিবার আছে। তাহা এই যে, কোনো কাজকেই ভ্যাজারী বা পাধার খাটুনী বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মাসিক পত্রিকার সম্পাদককে অন্যের রচনার প্রত্যাশায় থাকিতে হয়। যাঁহারা কাগজ বাহির করেন, তাঁহাদের অনেকের কাগজ হয় এই কারণে অনিয়মিত হয়, কিম্বা তাহাদিগকে যা-তা কিছু দিয়া কাগজ ভর্ত্তি করিয়া বাহির করিতে হয়। সম্পাদকের নিজেরই যদি নানা রকম প্রবন্ধ গল্প কবিতা লিখিয়া কাগজ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয় না। দুঃখের বিষয়, এরূপ ক্ষমতা অল্প সম্পাদকেরই থাকিবার সম্ভাবনা। আমি যত সম্পাদকের বিষয় অবগত আছি, তাঁহাদের মধ্যে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যত প্রকার উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনার দ্বারা মাসিক পত্র অলঙ্কৃত করিতে পারেন, অন্য কেহ তাহা পারেন নাই। এই জন্য, অন্যের সাহায্য না পাইলেও, নিয়মিতরূপে উৎকৃষ্ট ও নানা বিচিত্র রচনাপূর্ণ মাসিকপত্র বাহির করিবার সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ একটি আলোচনা সভা স্থাপন করেন। তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। তখন উহার আপিস ছিল ২০নং কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে। ঐ আপিসে বহু সাহিত্যিকের আড্ডা জমিত। সভার অধিবেশনে কোন একটি প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর আলোচনা হইত। এরূপ সভার প্রয়োজন এখনো আছে।

নিজের মাসিকপত্র সম্পাদন ও তাহাতে নিজে লেখা ছাড়া, তিনি অন্য যত মাসিকে লেখা দিয়াছেন, তাহার সবগুলির নামও আমি জানি না। এ বিষয়ে তিনি খুবই মুক্তহস্ত। মাসিকপত্রের লেখকরূপে তাঁহার একটি গুণের সাক্ষ্য ভুক্তভোগী সম্পাদক আমার দেওয়া উচিত। তাহা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার অন্যতম অগ্রজ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশ্চর্য্য নিয়ম নিষ্ঠার কথা বলা উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাবু ক্রমশঃ প্রকাশ্য লেখা প্রবাসীতে দিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কিস্তির জন্য কখন অপেক্ষা করিতে বা তাগিদ দিতে হয় নাই। বরাবর তাঁহার লেখা মাসের ১লা কিম্বা ২রা তাকে আসিয়া পৌঁছিত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরাবর নিয়ম রক্ষা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের

"গোরা" উপন্যাস দুই বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল এবং উহার হস্তলিপি ক্রমে ক্রমে পাইয়াছিলাম; কিন্তু কখনও কোন কিস্তির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। তিনি একবার দারুণ শোক পাইয়াও ঠিক তাহার পরদিন একটি কিস্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ ধৈর্য্য সংযম ও নিয়ম নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বিরল।

এরূপ নিয়ম নিষ্ঠা সম্পাদক ও লেখক উভয় পক্ষেরই থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি রবীন্দ্রনাথ বরাবর কোন না কোন মাসিকের সম্পাদক থাকিতেন বা থাকিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা এই কাজ উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইত।

জগদানন্দ রায় ছিলেন শান্তিনিকেতনের একজন বড় কর্মী ও কর্মপরিষদের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত সভ্য। তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধে বইগুলির খ্যাতি আজ সর্বজনবিদিত। শান্তিনিকেতনের অন্তরঙ্গ ইতিহাসে জগদানন্দ রায় একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাম।

শান্তিনিকেতনের নববর্ষ ঃ উৎসব ঃ স্মৃতি

জগদানন্দ রায়

১৯০১ সালের শ্রাবণ মাসে যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম আসি, সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে। তখন বাড়িঘরের মধ্যে অতিথিশালার দোতলা বাড়ি এবং এখন যে বাড়িতে ডাকঘর আছে তাহাই ছিল। দক্ষিণদিকে ছিল, এখন যেখানে লাইব্রেরী আছে তাহারি মাঝের হলঘরটা এবং পাশের দুটো ছোটো কুঠারি। আর অতি দূরে বাঁধের ধারে নীচু বাংলা দেখা যাইত। তখন নীচু বাংলা খড়ে ছাওয়া একখানা বড় আটচালা ঘরের আকারে ছিল। সেখানে কাহাকেও তখন বাস করিতে দেখি নাই। ভৃত্যেরা ডাকঘরের বাড়িতে থাকিত। সেখানেই অতিথিদের জন্য রন্ধনাদি হইত। জয়পুরী সাদা পাথরের থালাবাটি বোধ করি দশ বারো সেট ছিল। অতিথি আসিলে সেই সকল ভোজনপাত্রে আহার করিতেন। প্রত্যেক বেলায় পাঁচ সাত রকম নিরামিষ তরকারি থালায় সাজাইয়া দেওয়া হইত।

১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর অর্থাৎ ৭ই পৌষ ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা হইতে আগত অনেকেই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এখনকার লাইব্রেরীর মাঝের ঘরে সভা হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ, সুধীরকুমার নাগ, নিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, এবং প্রেমকুমার গুপ্ত এই পাঁচটি বালক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রক্তকৌষ বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া ইঁহারা যেরূপে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তাহা আজ সুস্পষ্ট মনে পড়িতেছে। আমি এবং বিদ্যার্ণব মহাশয় তখনের ধুতিচাদর পরিয়া নিকটে ছিলাম। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ বিবরণ এবং পূজনীয় গুরুদেবের উপদেশের মর্ম্ম ১৯০১ সালের মাঘের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বৎসরের পর বৎসর গুরুদেব প্রায় সর্ব্বদাই ছেলেদের সঙ্গে থাকিতেন। রাত্রিতে ছেলেদের পড়াশুনার পাট ছিল না। ছেলে অল্প ছিল, ক্লাশেই আমরা তাহাদের পড়াশুনা সেব

করাইয়া দিতাম। সন্ধ্যায় গুরুদেব ছেলে ও অধ্যাপকদের লইয়া পুস্তকপাঠ, গল্প ও নানারকম খেলা করিতেন। সে এক আশ্চর্য্য সান্ধ্যসম্মিলন ছিল। আমরা ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য গুরুদেবই এই সম্মিলনের নেতা ছিলেন। প্রত্যেক দিনই তিনি কি প্রকারে নূতন নূতন বিষয় লইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন, আমরা ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। বৎসরের পর বৎসর এই সান্ধ্য সভায় উপস্থিত থাকিয়াছি,—কোনো দিনই তাঁহাকে ক্লান্ত দেখি নাই। আজকাল যাহাকে sense training বলা হয়, গুরুদেবই আমাদের বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে প্রথমে তাহার সূত্রপাত করেন। একটা জায়গায় কতকগুলি কড়ির স্তূপ রাখা হইত। বালকগণ আন্দাজে তাহার সংখ্যা বলিয়া দিত। একটা পাত্রে আট দশ রকম জিনিস রাখা হইত। ছাত্রেরা এক নজর দেখিয়াই সেগুলির বিবরণ লিখিয়া দিত। তা'ছাড়া আন্দাজে জিনিসের ওজন ও দৈর্ঘ্য নিরূপণ প্রভৃতি অনেক খেলা ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে আট দশ বৎসর গুরুদেব এই সকল চালাইয়াছিলেন। ইহার উপরে তিনি দুই তিনটা ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত ক্লাসে শিক্ষা দিতেন। এবং ছেলেদের কবিতা আবৃত্তি করাও শিখাইতেন। এই সময়ে অভিনয় যে ছিল না তাহা বলা যায় না। এখনকার লাইব্রেরী ঘরে ছেলেরা হেয়ালি নাট্যের অভিনয় করিত। তাহার ব্যবস্থাও গুরুদেবকে করিতে হইত। এখন যেমন নূতন গান হইলে সঙ্গীতজ্ঞরাই তাহা প্রথমে উপভোগ করেন, তখন তাহা ছিল না, নূতন গান হইলেই ছাত্র ও অধ্যাপকদের সান্ধ্যসভায় তাহা গীত হইত। কেহই বঞ্চিত হইত না।

"মোরা সত্যের পরে মন" এই গানটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই রচিত হইয়াছিল। আমি ও বিশ্বার্ণব মহাশয় বিকালে পাকলডাঙ্গায় বেড়াইবার সময়ে এই গানটি জোর গলায় গাহিতাম মনে পড়ে। তা'ছাড়া আমাদেরও মাঝে মাঝে বৈঠক বসিত। সেখানে রসসাগরের পাদপূরণের মতো খেলা চলিত। ইহাতে কেহ হয়ত একটা শব্দ বা বাক্য বলিতেন, তাহারি সঙ্গে মিল রাখিয়া মুখে মুখে তাড়াতাড়ি দুই ছত্রের কবিতা রচনা করিতে হইত। মনে পড়ে একবার শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় বলিলেন, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" ইহার সহিত মিল রাখিয়া একটি কবিতা রচনা করিতে হইবে।" তাড়াতাড়ি পাদপূরণ করা গেল,—

হনুমতা হতা লঙ্কা
কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

খুব হাসির রোল উঠিয়াছিল।

তখনকার উৎসবগুলিও অনুপম ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে দুই তিন বৎসর ১লা বৈশাখে যে উৎসব হইত তাহার কথা আজো ভুলি নাই। প্রথম বৎসরের উৎসবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি অনেক অতিথি আসিয়াছিলেন। অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন বোধ করি সেই উৎসবেই আশ্রমে প্রথম আসিয়াছিলেন। বেশ মনে পড়ে লাইব্রেরীর মাঝের বড় ঘরটিতে সকলে বসিয়া গল্প করিতে ছিলেন এবং পাশের ঘরে জলযোগের আয়োজন হইতেছিল। গুরুদেব "আমারে করো তোমার বীণা" গানটি গাহিলেন। তারপর পশ্চিমে মেঘ করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় আসিল। মোহিতবাবু এবং আরো অনেকে ঘর ছাড়িয়া সম্মুখের মাঠে দাঁড়াইলেন। মোহিতবাবু ঝড়ের প্রতিকূলে যে প্রকারে দৌড়াইতেছিলেন তাহার ছবি এখনো চোখে ভাসিতেছে। তিনি যেন ছিলেন উৎসাহের জীবন্ত মূর্ত্তি। বর্ষশেষের রাত্রিতে আমরা কেহই ঘুমাইতাম না, কেহ ঘুমাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে জাগাইয়া রাখিতাম। সমস্ত রাত্রি মাঠে ঘুরিয়া গোলমালে কাটান যাইত। তার পরে যখন রাত্রি চারিটার সময়ে মন্দির হইতে দুন্দুভির শব্দ এবং

রাধিকা গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাতী রাগিণীর সুর কানে আসিত, তখন মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তারপরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হইত গুরুদেবের উপদেশ। সেই সকল উপদেশ এখন বঙ্গভাষার পরম সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এখন ভাবি, আমাদের তখনকার সেই উৎসাহ, সেই উদ্যম কোথায় গেল।

সে সময়কার ৭ই পৌষের উৎসবগুলিও সুন্দর ছিল। কলিকাতা হইতে অনেক বিশিষ্ট অতিথি আসিতেন। মনে পড়ে একবারের ৭ই পৌষে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র, উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এবং কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয় আসিয়াছিলেন। 'কান্ত কবিকে' সেই প্রথম দেখিলাম এবং তাঁহার গান শুনিলাম। একটা হারমোনিয়ম কাছে পাইলে তিনি অবিরাম গান করিতেন। গানে তাঁহার ক্লান্তি দেখি নাই। বোধ হয় সেইবারকার ৭ই পৌষে আশ্রম-বালকেরা "বিসর্জ্জন" নাটকখানি অভিনয় করিয়াছিল। ইহাই আশ্রমের ইতিহাসে প্রথম অভিনয়। ইহাতে অপর্ণার ভূমিকা ছিল না। শ্রীমান সন্তোষচন্দ্র মজুমদার হইয়াছিলেন গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ হইয়াছিলেন শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ, এবং রঘুপতি ছিলেন দিনুবাবু।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় ষ্টেজ নির্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীমান নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায় "দুই কানে বাদা করিয়াছে দুই টিয়া পাখী" বলিয়া যে সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা আজো মনে পড়ে। অভিনয়ে এমন উৎসাহ আর দেখি নাই। আমরা কয়েকজন সেই পৌষ মাসের শীতে ষ্টেজেই রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। লাইব্রেরীর উত্তরে এবং রান্নাঘরের পশ্চিমে যে একটি বড় ঘর ছিল, সেই ঘরে অভিনয় হইয়াছিল।

গুরুদেব নিজে ছেলেদের সহিত মিশিয়া ছেলেদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন। এই সময়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিতেন এবং তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধীয় পরীক্ষাদি আমাদের দেখাইতেন। অনেকবার গুরুদেব নিজে আয়োজন করিয়া রায়পুর প্রভৃতি স্থানে ছেলেদের লইয়া পিকনিক করিতে গিয়াছেন। মনে পড়ে, একবার গুরুদেব এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ছেলেদের লইয়া হাঁটিয়া রায়পুর পর্যন্ত গিয়াছিলেন, এবং আহারান্তে হাঁটিয়া আশ্রমে ফিরিয়াছিলেন। ছেলেদের তখন যতগুলি বাসগৃহ ছিল, গুরুদেবকে পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক বাসগৃহে কিছুদিন করিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

ইহার অনেকদিন পরের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। তখন গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরীর উপরকার দোতলা ঘরের ঘরে থাকিতেন। সেই ঘরের ছেলেরা বড় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। হয়ত ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত রাখিবার জন্য ঐঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে-দিনে নূতন নূতন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেইসব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থমথমে ভাব ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ "শারদোৎসব" নাটক। এই নাটকখানি যেদিন আশ্রমবাসী সকলকে ডাকিয়া আগাগোড়া শুনানো হয়, তাহাও মনে পড়ে। তখন সবে নাট্যঘরের মাঝের অংশটা নির্ম্মিত হইয়াছে। গুরুদেব সেই ঘরে সভা করিয়া একদিন সন্ধ্যায় "শারদোৎসব" পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পরেও লক্ষ্য করিয়াছি, কোনো কারণে যখন আশ্রমে কোনো ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সবই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমাদের আশ্রমে এখন যে কত উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার সার্থকতা কম নয়।

আশ্রমের প্রথম জীবনে এখনকার মতো সাহিত্যসভা এবং পত্রিকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল না বটে, কিন্তু সাহিত্যের আলোচনা যথেষ্ট ছিল। মোহিতবাবু আসিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে "সাহিত্যসভার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনে পড়ে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ এই সভায় পড়িয়াছিলাম। গুরুদেব এই সভায় আসিয়া বসিতেন। সতীশবাবু যখন আশ্রমে ছিলেন, তখন তিনি সাহিত্যের আসরখানিকে রচনাপাঠে মসগুল রাখিতেন। গুরুদেব যে সকল প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন তাহার প্রথম প্রসাদ এখনকার মতো আমাদেরি ভাগ্যে জুটিত। তারপরে কিছুকাল ধরিয়া অতি প্রত্যূষে তিনি মন্দিরে নিয়মিতভাবে যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাও তখন আশ্রমে সাহিত্য ক্ষেত্র রচনার সহায় হইয়াছিল। সেই অমূল্য উপদেশাবলীর অধিকাংশই "শান্তিনিকেতন" নামক পুস্তিকার কয়েক খণ্ডে রচিয়াছে। তারপরে পূজনীয় বড়বাবু মশায় মাঝে মাঝে আসিয়া অধ্যাপকদিগকে লইয়া বৈঠক করিতেন। তাহাতে সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইত, তাহা অধ্যাপকদিগকে কম উপকৃত করে নাই।

সংস্কৃতজ্ঞ, বহুভাষাবিদ, ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ছিলেন শান্তিনিকেতনের গুরুকুলের মধ্যমণি। সহজ অনাড়ম্বর সরল শুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবনযাপনের মধ্যে গভীর জ্ঞান, সুদৃঢ় আদর্শনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সেই সঙ্গে উদার প্রসন্নতায় আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতি স্নেহ প্রীতি আশীর্বাদ ও বিদ্যা বিতরণ। তাঁর 'চিন্ময় বঙ্গ' প্রভৃতি বইগুলি পণ্ডিতসমাদৃত। যৌবনের প্রারম্ভে শান্তিনিকেতনে এসে সেইখানেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন। তাঁর এই রচনাটি শান্তিনিকেতন পত্রিকা (ভাদ্র, আশ্বিন ১৩৩০) ছাড়া আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

নববর্ষের দীক্ষা

ক্ষিতিমোহন সেন

মহাপুরুষেরা যে বাণী নিয়ে সকলকে ডাকেন সে বাণী সুখের পথের নয়। তাই আমাদের সুখলুব্ধ ক্ষুদ্র মন, সেই বাণী না শুনিবার ভাণ করিয়া দুঃখকে এড়াইতে চায়। তাঁহাদের বাণীর মাধুর্য্য অপরিসীম। তাই যাঁরা রসলুব্ধ চিত্তে সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে চাহেন অথচ আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহেন না তাঁহাদেরই হইল মুস্কিল। তাঁহারা মহাপুরুষের বাণী মহাবাণীর মত শ্রদ্ধা করিয়া শোনেন অথচ তার দায়িত্ব জীবনে গ্রহণ করা কঠিন বলিয়া তাঁহারা সেই সব অগ্নিবাণীর চারিদিকে নিজেদের রচিত আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মমতের প্রাচীর তুলিয়া তাহার তাপটা এড়াইয়া চলেন। আত্মাভিমানের বশে বা আত্মগৌরবে যে সব মহাপুরুষকে বড় বলিয়া মানি, এমন করিয়াই তাঁহাদের বাণীর চারিদিকে creed ও মতের প্রাচীর তুলিয়া নিজেদের বাঁচাই। তাই বিদ্যাসাগরকে মানি, বিধবা বিবাহ মানি না। বিবেকানন্দকে মানি, দুঃস্থার্গ ও সামাজিক মিথ্যাচার ছাড়ি না।

মধ্যযুগের সাধকেরা বলেন যে, গুরুজন মরিলে মানুষ দাহ করে বা গোর দেয়। মহাগুরুদের তো [illegible]

কঠিন। তাই সেই সব গুরুদের আধ্যাত্মিক নিত্যস্বরূপকেও আমরা সংহার করিয়া তাহার উপর নিজেদের মতামতের ও আচার অনুষ্ঠানের সুন্দর গোরস্থান রচনা করি।

এমন করিয়াই বিচার হইয়া যায় আবার, শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়া যায় মত ও অন্ধ সংস্কার, সাধনা হইয়া যায় অভ্যস্ত অনুষ্ঠান, ধ্যান হইয়া যায় রূপ। এই মৃত্যু হইতে যে সব মহাপুরুষেরা বাঁচাইতে আসেন, তাঁহাদেরও আমরা এমনই করিয়া মারি। মারিতে মারিতে মানব জাতির হাত পাকা হইয়া গিয়াছে। সকল সম্প্রদায় ও church-এর ইতিহাস এই কথার সাক্ষ্য দিবে।

মালা জপ করিতে করিতে মন যখন জড়তায় মরিয়া আসে তখন মালায় যে একটি বিশেষ গুটি আছে তাহা যখন হাতে ফিরিয়া আসে তখন মনের জড়তা ভাঙিয়া চেতনা চমকাইয়া উঠে। গুটিটিকে সাধকেরা বলেন, "মেরুগুটি।" প্রতিদিন মহাপুরুষদের বাণী আমাদের ক্ষুদ্র মনের কাছে জীবনমুক্ত হইয়া আসে আমাদেরই দোষে। এই "মেরুগুটি", ফিরিয়া আসিয়া যদি চেতনাকে জাগ্রত করিতে পারে তাহা হইলে আশা আছে। মহাপুরুষের মহাবাণীর অগ্নিদীক্ষা জীবনে নিভিয়া আসিয়াছে। নববর্ষের দিনে তাহা নব জীবনে জ্বলিয়া উঠুক, আমাদের অভ্যাসের বেড়া ভস্ম হউক। উৎসবের দেবতা নববর্ষের উৎসবকে অগ্নি-দীক্ষার দ্বারা প্রবাসত জড়তা হইতে উদ্ধার করুন।

বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ এক আশ্চর্য নাম। জন্ম ১৮৪০, মৃত্যু ১৮৭০। মাত্র ৩০ বছর বয়সের মধ্যে তিনি যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন তা শুধু বিরল নয়, বিস্ময়কর। এই স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনি অদ্ভুত কর্মশক্তি ও রচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। স্থাপনা করেছেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা, রঙ্গমঞ্চ, পত্রিকা, সম্পাদনা করেছেন সর্বতত্ত্বপ্রকাশিকা, বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও পরিদর্শক, রচনা করেছেন বাবু নাটক, বিক্রমোর্বশী নাটক, সাবিত্রী সত্যবান নাটক, মালতীমাধব নাটক, হুতোম প্যাঁচার নকশা, কলকেতার হাটহদ্দ, এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাভারতের অনুবাদ ও শ্রীমদ্ভাগবদ গীতার অনুবাদ, তাছাড়া আরও অনেক প্রবন্ধ। তাঁর রচনার মধ্যে হুতোম আজকের দিনে এক বিশেষ সাহিত্যকীর্তি বলে স্বীকৃত। হুতোম ও কলকেতার হাটহদ্দ ১৮৬১ ও ৬৩ সালে প্রকাশিত। একশ বছরের বেশী আগেকার বাংলা রচনার সহজ সরল চলিত ভাষার প্রচলন দেখে অবাক হতে হয়। এই সংখ্যায় আমরা তাঁর রচনার কিছু কিছু অংশ সংকলন করে দিলাম। পরবর্তী কোনো সংখ্যায় তাঁর জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

নববর্ষে কল্‌কেতার হাটহদ্দ

হুতোম প্যাঁচা

(শতাধিক বছর আগেকার শহর কলকাতার একটি চিত্র)

কোম্পানীর বাংলা হবলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিমকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশটাকা উপায় ছিল, সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশলক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদী বড় মানুষ কবলাতে গেলে বাঙালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি

আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলি, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম্ম কাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর মূর্চ্চি নিত্যসেবা হয়ে থাকে।

আজকাল সহরের ইংরাজী কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের 'বেষ্ট'। প্রথম দলের সকলি ইংরাজী কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, ভগে করা গল, ডিকাণ্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোডার ঢাকনি, সালুমোড়া,—হরকরা, ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলিটিক্স ও বেষ্ট মিউস অব দি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন! এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত, কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবারে হৃদয় হতে নিষ্কাসিত হয়েচে, এঁরাই ওল্ড ক্লাস!

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়েও হিংস্র; বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে সঙ্গ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। কামন করে আপনি বড়লোক হব, কামন করে সকলে পায়ের নীচে থাকবে, এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূর পরিহার—চার আনার বেশী দান নাই!

ইংরেজরা নিউ ইয়ারে বড় আমোদ করেন। আগামীকে ঘাড়াগুরা পান দিয়ে বরণ করে আন—মেসার খোঁয়াবির সঙ্গে পুরাণোকে বিদায় দেন। বাঙ্গালিরা বছরটি ভাল রকমেই যাক আর খারাবেই শেষ হোক, সজনে খাড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্যি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে পুরানোকে বিদায় আন। কেবল কলসী উচ্ছুগ্‌গু কর্ত্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেছেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবাবিবাহে বাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষ্যে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার কি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষুমুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাষা সংস্কৃত পড় ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না:—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না; ক্রমে খৃষ্টানী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

অ্যাং যায় ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বাবুন কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যেসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর দুগাছী আটা ও একটু ন্যাবড়ানের বদলে—ফাউলকারী ও রোল রুটি ইষ্ট্ ডিউস হলো। খরকাবান চৈতন্য কলার জায়গায় আলবার্ট ক্যাপ ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁধে করে টেনা ধুতি পরে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না, সুতরাং অবস্থাগত—জুড়ি, বগি ও ব্রাউহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও

উমেদারী হালোতের দুএকজন ভদ্রলোক মোসাহেব, তকমা আরদলী ও হুকরা রেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কলে, কৌশলে, বেপেতী বেসাতে, টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিনমধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোট লোক বড় মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুন ওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেছেন—প্রায় অনেকেরই এক একটি পোষা পাশ বালিশ আছে—"যে আজ্ঞে" ও "হুজুর' আপনি যা বলবেন, তাই ঠিক" বলবার জন্যে দুই এক পশুমূর্খ বরাখুরে ভদ্র সন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ কর্ম্মে দানের বরাদ্দ নবতলা! কিন্তু প্রতিবৎসরে গার্ডেন-পিসটের খরচে চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি কাউণ্ড হয়।

বছর দশ বারো হলো, এই সহরের বাগবাজার অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক নববর্ষে তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ছেলেকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপিকরা প্রথা নয়, আমরা পুরুষপরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে, তিল বুনে, মাছ ছেড়ে, (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে, প্রদীপ জেলে, শাঁখ বাজিয়ে, আইবুড় ভাত খাবার মত কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজকাল সহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতরগোছের আমোদ করে থাকেন। কেউ বেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ করেন; অভিপ্রায় আপনারা আশীর্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এমনি করে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠি পরে নাচ দেখতে বসুন, প্রতিমে বিসর্জ্জন, স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের জন্ম-তিথিতে বাগান টের পান যে আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নের গা সারতে আপিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগবাজারের বাবু সেরকমের কোন দিকেই যাননি, কেবল গুটিকতক ছেলেকে ভাল করে খাওয়াবেন, এইটি তাঁর মতলব ছিল। এদিকে ভোজের দিন মেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুটলেন, খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সেদিন সকালে বাদলা হওয়ায় মাছ পাওয়া যায়নি। বাঙ্গালীদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্ত্তাকর্ত্তা মাছের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন; নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না—শেষ একজন জেলে একটা সের দশধারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হলো। মাছ দেখে কর্ত্তাকর্ত্তার খুসির আর সীমা রইল না। জেলে যে দাম বলবে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাপু, এটির দাম কি নেবে? ঠিক বল, তাই দেওয়া যাবে।" জেলে বল্লে, "মশাই! এর দাম বিশ ঘা জুতো।" কর্ত্তাকর্ত্তা "বিশ ঘা জুতো" শুনে অবাক হোয়ে রইলেন, মনে করেন জেলে বাদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েচে, না হয়ত পাগল, কিন্তু জেলে কোনক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না এই তার পণ হল। শেষে কর্ত্তাকর্ত্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশ ঘা জুতো মাত্তে রাজী হলেন, জেলেও অম্লানবদনে পিট পেতে দিলে। দশ ঘা জুতো জেলের পিঠে পড়া মাত্র, জেলে "মশাই! একটু থামুন, আমার একজন অংশীদার আছে, বাকি দশ ঘা সেই খাবে, সে আপনার দারওয়ান, তারে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ নিয়ে আসছিলাম, তখন মাছের আদ্ধেক দাম না দিলে আমাকে ঢুকতে দেবে না বলেছেন, সুতরাং আমিও আদ্ধেক বখ্‌রা দিতে রাজি হয়েছিলাম।" কর্ত্তাকর্ত্তা তখন বুঝতে পারেন, জেলে কি জন্য মাছের দাম বিশ ঘা জুতো চেয়েছিল। দারওয়ানজীকে ডাকায় বলে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বখরার জন্য প্রতীক্ষে করে থাকতে হলো না; কর্ত্তাকর্ত্তা তখনি দারওয়ানজীকে জেলের বিশ ঘার অংশ দিলেন। পাঠক বড় মানুষেরা! এই উপন্যাসটি মনে রাখবেন।

এইবার নববর্ষ আর অন্যান্য পরবে যে সব গান বাঁধা হত তার কিছু নমুনা শুনুন :—

আজব সহর কলকেতা।
বাঁড়ি বাড়ি খুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
দেখা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, বলিহারি ঐকাতা,
যত বক-বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির কাঁদ পাতা।
গিল্টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা।
... ...
কেহি জাৎ কো না মানো বাবা,
না মানো দেবী দেবা।
একি মনসে, কালী মাইকো, পাওমে কর সেবা।
যব্ হি দেখ', আয়ে মনমে, তেস্‌সে করো ভোগ।
ছোড় দেও সব ধুর্ত্তোকো বাৎ, ভূতা যাগ যোগ।
আব কি নারী, পর কি নারী, বেচ্কি মেলে সব।
নেহি ছোড় দেও, ক্যা খুসী হ্যায়, কাম দেও কি রব।
কামবাজারসে লুট করো সব, কাঁহে রহতো ভাজা।
এহি লোগমে ভোগ কর সব, কাঁহা পরলোক কাজা।
কালী হামারা প্রাণপেয়ারা, কালী হামারা জান্।
কালীকো পাওমে প্রণৎ করো সব, আউর না জান আন।
বাবা, আউর না জানো আন।
... ...
দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত পোয়ানো ভার।
হোল পুঞ্জিমেতে অমাবস্যে তেরো পহর অন্ধকার।
এসে বিন্দাবনে ষোলে গেল বামী বষ্টমী
একাদশীর দিনে হবে জন্ম অষ্টমী,
আর ভাদর মাসের সাতুই পোষে
চড়ক পুজোর দিন এবার।
কাল কামরূপেতে কাগ মরেছে,
কাশীধামে হাহাকার।

বাঙালী জাতিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন প্রেরণায় নতুন চেতনায় উজ্জীবিত করতে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিপুল প্রয়াস ভুলে না গেলেও তাঁর চিন্তার সঙ্গে আজকের বাঙালীর কোন যোগ নেই বললেই হয়। তাই আজ এই নতুন বছরে তাঁর একটি একান্ত দুষ্প্রাপ্য বিস্মৃতপ্রায় মহৎ রচনা পুনরুদ্ধার ক'রে পরিবেশন করতে চরিতার্থবোধ করছি। ১৩২৬ সালের রচনাটির মধ্যে তাঁর আধুনিক মননের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তিনি যে কথা বলে গেছেন আজ তার গুরুত্ব যেন আরও বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। রচনাটির মধ্যে থেকে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে বলে এটি কিছু সংক্ষেপিত। এই লেখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন—"ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধে আশুতোষ ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্বোচ্চ কামনার ও সাধনার যে চিত্র এঁকেছেন তাতে এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব আমি সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেছি।....এই প্রবন্ধে তাঁর মহতী ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বরূপটি দেখে সেই পরলোকগত মনস্বী পুরুষের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।"

ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মা বঙ্গভারতী!

"তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হলে আমি প্রাণ হারা হই।
করুণা কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।
যে কদিন আছে প্রাণ,
করিব তোমার ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও-রাঙা চরণে।" (বিহারীলাল)

এস মা, একবার ধনধান্যের রূপে আসিয়া বাংলার সাহিত্য-মন্দিরে দাঁড়াও এবং আশার স্নিগ্ধ অঞ্জনে বাঙালীর চক্ষু মাজিয়া দাও; তোমার বরাভয়দায়ী করস্পর্শে তাহাদের মোহ কাটিয়া যাক, হৃদয়ে বল আসুক, অন্তরের অন্তস্তলে উৎসাহের সঞ্জীবনীধারা প্রবাহিত হোক—বাঙালী দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া, আত্মপর ভুলিয়া, এক প্রাণে একতানে সঙ্গীত ধরুক,—সে সঙ্গীতে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাক, বাংলার সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের আসন অধিকার করুক।

একদিন—সেই অতি প্রাচীনকালে—যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিও জগতে ফুটে নাই, বিশ্ব যখন একপ্রকার অন্ধতামসে আচ্ছন্ন, সেই আদিকালে—ভারতের আর্যাবর্তে যে বেদগান গীত হইয়াছিল তাহার

মধুর আকর্ষণে ভারতবর্ষ যেন একপ্রাণ হইয়া গিয়াছিল—স্রোতস্বিনের সেই সাহিত্যিক একতা, সেই সংঘবদ্ধ ভাব, সেই চিরনবীন প্রেম, সেই বড় স্পৃহনীয় মিলন, আর কি হইতে পারে না? ভারতে আবার সেই সাহিত্যিক একতা, মনীষার সম্মেলন, এক প্রকার অসম্ভব—এরূপ বলিলে চলিবে না। সেই হারানো ধন আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে; বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, সেই লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। কালের বশে চলিয়া আমাদের কালজয়ী হইতে হইবে।

বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকগণকে গাহিতে হইবে—

"কে বলিল পুনঃ পাবে না তায়?
হারানো মাণিক পাওয়া কি না যায়?
হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে
রাহুগ্রস্ত ছায়া ক'দিন রবে?
এ জগত মাঝে ক'রো না ভয়,
সাহস যাহার তাহারি জয়।
দেখো না, দেখো না, দেখো না পাছে,
আগে দেখ আর কত দূর আছে,
ঐ দেখ ঘুরে ভারতী মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-ভিমিরে,—
কর হে সাধনা, পাইবে ফিরে।" (হেমচন্দ্র)

কি করিলে, কোন্ পথে চলিলে আমার বঙ্গভারতীকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাজসজ্জার মনের মত করিয়া বিভূষিত করিতে পারিব, কি করিলে আমার বঙ্গসাহিত্যকে কালে ভারত সাহিত্যে পরিণত করিতে পারিব, সকল প্রদেশের মনীষাফলে বঙ্গভূমিকে ফলবতী করিতে পারিব—এই চিন্তা আমাদিগকে করিতে হইবে। বাহু প্রসারণ করিয়া সমগ্র ভারতকে আলিঙ্গন করিতে হইবে—আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া লইতে হইবে—বাংলার রামপ্রসাদের করুণস্বরে নিখিল গুর্জ্জরের চৈতন্যসম্পাদন করিতে হইবে, আবার রাজপুতানার ভট্টকবির উৎসাহপূর্ণ সঙ্গীতের সঞ্জীবনমন্ত্রে বঙ্গসাহিত্যের কোমল প্রাণে নবীন আশার আলোক ফুটাইতে হইবে।

অন্যের যাহা ভাল তাহা আমাকে লইতে হইবে; আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জলি পুরিয়া দিতে হইবে। এইরূপ আদানপ্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পূর্ণত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন একটি সাধারণ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, গুর্জ্জর, রাজপুতানা, গান্ধার, পাঞ্জাব—সব এক সূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে। এমন একটি সুখকর যান আবিষ্কার করিতে হইবে, এমন একখানি মনোহর বজরা গড়িতে হইবে, যাহার সাহায্যে ভারতের যে প্রদেশে যাহা কিছু উত্তম, মনোজ্ঞ, তাহা অন্য প্রদেশে অবাধে আমদানী করা যাইবে। যাহার যাহা ভাল, সকলেই তাহার আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, কালে—অনন্তকালের তুলনায় অতি অল্প কালের মধ্যে—ভারতবর্ষে এক অবিতীয় ও অবিচ্ছিন্ন প্রকৃত একতাবদ্ধ সাহিত্য সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন হইবে।

• • •

আমি রাজনীতির কথা বলিতেছি না,—কেন না, যাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, যাহাদের প্রকৃত একতা নাই, যাহাদের জাতীয় ভাবগত ঐক্য নাই, যাহাদের চিন্তার ধারা একই খাতে প্রবাহিত নহে, তাহাদের পক্ষে রাজনীতি চর্চ্চা আপাততঃ উত্তেজনাজনক হইলেও পরিণতিতে চিত্তে অবসাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমি বলিতেছি, শিক্ষার কথা, দীক্ষার কথা, ভাবগত একতার কথা। স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া, যাহার যাহা আছে তাহা বজায় রাখিয়া, কি করিয়া ভারতে এক ভাব, এক চিন্তা, এক সাহিত্যের সৃষ্টি করা যাইতে পারে তাহাই আমার বক্তব্য। বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরে পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সুন্দর, নির্ম্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া ক্রমে ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে, ইহাই আমার বক্তব্য।

যদি এই মহৎ কার্য্যের—এই দুঃসাধ্য কার্য্যের—সুসম্পাদনের কোন উপায় থাকে তবে তাহা আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এখানে যদি আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি যাহাতে বিদ্যার্থীরা প্রথমতঃ ইংরাজী ও দেশীয় ভাষার কৃতিত্বলাভের পর ভারতীয় কতিপয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে এবং সেই সব ভাষার সম্পদসৌষ্ঠব ক্রমে বঙ্গভাষায় অনুক্রমিত করিয়া বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। যে কবিতায় বা যে লেখায় উন্মাদনার মহাবাণী উন্নত তাহারা সেই উন্মাদনা বঙ্গ ভাষার শিরায় শিরায় বহাইতে পারিবে। এবং তেমনি বঙ্গের কবিগণও আর বাংলা ভাষাতেই 'অন্তরীণ' থাকিবেন না, ভারতের বিভিন্ন দেশের ভাষাতেও তাঁহাদের মধুর বংশীরব শ্রুত হইবে।

• • •

অবশ্য যে প্রণালীতে আমি ভারতীয় ভাষার একতা-বন্ধনের কথা বলিলাম তাহাতে ঠিক ভাষাগত একত্ব সংঘটিত হইবে না বটে, কিন্তু ভাবগত একত্ব সাধিত হইবে। ক্রমে সমগ্র ভারতে একই ভাবের বন্যা বহিবে। যদি একবার সেই ভারত-প্লাবিনী বন্যার আবির্ভাব হয় তখন সকল অবসাদ সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। পরস্পরের সুখ দুঃখের অংশীদারের অভাব থাকিবে না। একের কান্নায় অপরে কাঁদিবে, একের অট্টহাস্যে অপরে আনন্দিত হইবে। Unification of language না হউক Unification of thought and culture নিশ্চয়ই জন্মিবে।

কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেন না ভাষা ভেদে মনোভেদ সুতরাং মতভেদ অনিবার্য্য। তাই তাঁহাদের মতে হিন্দি ভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

আমি কিন্তু এমতের সমর্থন করিতে পারি না। যে কারণে ইংরাজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্ব্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অশত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে, সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে। যে মধুরতার জন্য, যে প্রসাদ গুণের জন্য, যে মনোহারিতার জন্য বাংলা ভাষা এত স্পর্দ্ধার বস্তু তাহা ক্রমে সিকতারাশিতে বারিবিন্দুর ন্যায় কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে।

অন্য প্রদেশের সম্বন্ধেও এই একই কথা। সুতরাং আমার মতে, যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক—সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্দ্ধিত হউক, শ্রী সম্পন্ন হউক। সে পক্ষে কোনও বাধার প্রয়োজন নাই। কেন না যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহারা

বড়ই দুর্ভাগ্য। জগতে তাহাদের স্থান অতি অল্প ; কালের অক্ষয় শিলাফলকে তাহাদের কথা ক্ষোদিত থাকে না। তাহারা প্রাতঃকুজ্ঝটিকার ন্যায় অচিরকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়! সুতরাং তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া অন্য প্রদেশবাসীদিগের সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হউক। প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্পন্ন হইয়াও অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রহণ যোগ্য, তাহা স্ব স্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে, কিছুকাল পরে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা জন্মিবে—নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও এক ভাবে ভাবিত হইয়া ভারত একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয় সাহিত্যের ধারা যাহাতে প্রতিহত হয়, দেশ হিতৈষী কোন ব্যক্তিরই তাহা করা উচিত নহে। আপনার ধর্মে আপনিই যাহা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য বি-রূপ করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত বা নীতি সঙ্গত নহে।

(জাতীয় সাহিত্য থেকে সংকলিত)

নববর্ষের প্রথম দিন

গিরিবালা দেবী

(স্মৃতিচিত্র)

"হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল রে ?
হরিনাম স্বর্গে ছিল, মর্ত্যে এলো রে।"

ভোরের স্নিগ্ধ কোমল বনপথে ছিদাম বৈরাগীর ভাঙ্গা-মোটা গলা একতারার গুব্-গুবাক্ বাজনার সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসছিল। চৈত্র সংক্রান্তি হতে আরম্ভ করে গোটা বৈশাখ মাস সে নাম বিতরণ করবে পাড়ায় পাড়ায়, পথে পথে। নতুন বছরে ধর্মমাসে মধুর হরিনাম শোনানোর চেয়ে অক্ষয় পুণ্যের আর কি আছে ?

পোদাইবাড়ীর দুটি ছেলে মেয়ে তিনু আর নীলু চড়কের মেলা থেকে একটু রাত করেই ফিরে এসেছিল। তারা শয়ন করে ঠাকুমার বিছানায়। মাঝখানে ঠাকুমা, দুপাশে দুই ভাইবোন। শোবার সময় কথা হ'য়েছিল ঠাকুমা ওদের জাগিয়ে দেবেন রাত্রি-শেষে।

ছিদামের একতারার শব্দেই হোক, হরিনামের গুণেই হোক, তিনুর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় ঠাকুমা নেই। কখন শয্যাত্যাগ করেছেন। আট বছরের নীলু গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

তিনু নীলুর চেয়ে মাত্র দুই বছরের বড়, কিন্তু মেয়ের জাত বলেই বোধহয় জ্ঞানে বুদ্ধিতে দিব্য পরিপক্ক হয়ে উঠেছে।

তিনু শিথিল খোঁপাটা মাথায় জড়াতে জড়াতে ডাকে, "নীলু ও নীলু, উঠে আয়, এখুনি সূর্য্য উদয় হবে। সূর্য্য উঠলে প্রাতঃস্নানের ফল হয় না। আর ঘুমোয় না। আজ কত কাজ, ভুলে গেছিস নাকি ? আগে নারায়ণকে প্রণাম করে সকলের পায়ের ধুলো নিতে হবে না ?"

নীলুর সাড়া মেলে না ; ঘুম ভাঙে না।

তিনু মহা ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বিছানা ছেড়ে দ্বারে দাঁড়ায়। চারিদিক ফর্সা হয়ে গেছে, সূর্য্য ওঠবার আর দেরী নেই। মা এরই মধ্যে স্নানান্তে পুজোর ঘরে কাজে লিপ্ত। ঠাকুমাও স্নান সেরে নিয়ে আঙ্গিনার কোণে তুলসীমঞ্চে জল দিচ্ছেন। তুলসী গাছে ঝারা বাঁধা হয়েছে। ছিদ্রযুক্ত একটি মাটির ঘট, ছিদ্রমুখের কুশ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে তুলসী গাছে। কুশ অতি পবিত্র, কুশধৌত জল গঙ্গাজল হয়ে যায়। এ পুণ্য বৈশাখ মাসে নিত্যই তুলসী ধারা-স্নান করবে।

তিনু সকলকে প্রণামপর্বটা সেরে নিতে এক পা এগিয়ে তখনই দুই পা পিছিয়ে এলো। মনে পড়ল গত সন্ধ্যায় সে ছোট ভাইটিকে আশ্বাস দিয়েছিল—এবারের শুভ নববর্ষের সব পুণ্য কাজের অংশ দেবে

নীলুকে। এতদিন তিলু একা করে এসেছে, এবার নীলু হবে তার দোসর। সে এখন বড় হয়েছে। তাকে ফেলে তিলু কিছু করতে চায় না। আহা, অবুঝ ছোট ভাইটি দিদির ওপরে নির্ভরশীল।

কল্পনায় বিগলিত হয়ে এবার তিলু নীলুর গায়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বললে, "আমি চান করতে যাচ্ছি। তুই ঘুমিয়ে থাক, তোর কিচ্ছু হবে না। রোদ এখুনি উঠ্‌বে।"

বাইরে দিনের আলো দেখা দিলেও ঘরে আব্‌ছা-আব্‌ছা অন্ধকার। নীলুর দুচোখে এখনো নিদ্রায় জড়িমা, সে বিছানায় বসে বলে, "আমি দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে চল চান করতে যাই। আমার একটু তেল দে, মাথায় মেখে নিই।"

দিদি হিঃ হিঃ করে হাসে, "পাগল কোথাকার, প্রাতঃস্নানে তেল মাখতে নেই। দুপুরবেলা তেল মেখে কেশ মাখা ধুয়ে নিতে হয়। দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া কিসের? ঘাটের জলে মুখ ধুয়ে বালি দিয়ে দাঁত মেজে নিবি। এখন তাড়াতাড়ি চল, প্রণাম সেরে নিই।"

প্রথমে চণ্ডীমণ্ডপে গৃহবিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করে ঠাকুমা, বাবা মা, বাবার চেয়ের ছোট দাদাদের পায়ের ধুলো নিয়ে তিলু নীলু ছুটে গেল নদীর জলে ডুব দিতে।

বিপুলসলিলা পদ্মানদীর এক শাখানদী এ ক্ষুদ্র গ্রামের প্রাণস্বরূপিনী। শান্ত নদীর ধার তার পরিবেশ। তার ভাঙন নেই, উদ্দামতা নেই।

তখন সূর্য্যদেব উদয় হচ্ছেন, আকাশের রক্তিম ছটা নদীর বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ঘাট প্রায় জনশূন্য, দুই একজনা বৃদ্ধ বৃদ্ধা গলাজলে দাঁড়িয়ে ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে সূর্য্য প্রণাম করছেন।

গঙ্গাবিহীন গ্রামবাসীদের বিশ্বাস নিশীথের ঘোর তিমিরে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সকল নদীর সঙ্গেই মিশে যান। সূর্য্যের রক্ততাপস্পর্শে যে যাঁর স্বস্থানে ফের ফিরে যান। এই বিশ্বাসে গ্রামবাসীরা পর্ব্বদিনে প্রাতঃস্নান করে। এতেই তাদের পুণ্যসঞ্চয় হয়।

ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে গোটা কতক ডুব দিয়ে ভেজা কাপড়ে তিলু নীলু মহাখুশীতে ফিরে চলে বনপথ দিয়ে। আজ তাদের অনেক কাজ, নদীবক্ষে জল খেলার সময় নেই। নইলে নদী তাদের খেলার সাথী; ডুবে সাঁতারে, হাসি গল্পে তটভূমি ওরা মুখর করে রাখে।

গোঁসাইবাড়ী হতে নদী দূরে নয়। আঁকাবাঁকা একটুখানি পথ। দুই পাশে নিবিড় অরণ্য। অরণ্যের কোলে তাণ্ডিবন। বসন্ত তখনো ভুবন থেকে বিদায় নেয় নি। তখনও সে "জাগ্রত দ্বারে।"

পথের মাঝখানে একটা প্রাচীন গাব গাছ হেলে পড়ে ঝুর্‌ ঝুর্‌ করে ফুল ঝরাচ্ছে। তিলু চলতে চলতে ভেজা আঁচলে ফুলগুলো কুড়িয়ে তোলে।

নীলু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, "দিদি, গাবের ফুল নিয়ে কি করবি? এ ফুল দিয়ে পুজো হয় না।"

দিদি উত্তর দেয়, "পুজোর পুষ্পপাত্রে আমি রাখব না এ ফুল। ঠাকুরকে মালা গেঁথে দেব রোজ। এ ফুলের কি সুন্দর গন্ধ। এর সাথে তাঁচিফুল মিলিয়ে গোড়ে মালা গেঁথে দেব।"

নীলু গোড়ে মালা গাঁথা জানে না। সে ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, "আমি রোজ বকুল ফুলের মালা গেঁথে দেব। বকুল ফুল আমার খুব ভাল লাগে। বাসি হলেও গন্ধ যায় না।"

"বেশ তো, তুই মাসভরে বকুল মালাই দিস। আমি দেব আমার যা ভাল লাগে।"

আঁচল ভরে ফুল কুড়িয়ে তিলু নীলু বাড়ী ফিরে দেখে সোপালার সামনে ঠাকুমা গোকুল পুজো [illegible]। গোরুর একরত্তী কাজলী গাভীটির শিংএ তেল দেওয়া হয়েছে, কপালে সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটা

গন্ধর চারখানা পা ছুইয়ে দিয়ে ঠাকুমা তাকে খাওয়াচ্ছেন মাত্র পাতায় করে যবের ছাতু, গুড় ও কলা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এসময়টা যবের ছাতুর প্রচলন বেশী। সব কাজেই যবের ছাতু চাই। ছাতু কুটে ঠাকুমা মাটির পাকা হাঁড়িতে তুলে রেখেছেন আচার নিয়মের ঘরে। ছাতু-গুড়-দই-কলা নিত্য যোগান দিতে হবে লক্ষ্মীনারায়ণের জলপানিতে।

নাতিনাত্‌নীর সাড়া পেয়ে ঠাকুমা ডাকেন, "তোদের চান হয়েছে? যা চট করে ভেজাকাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে নে। আমি প্রসাদী চন্দনের টিপ্ পরিয়ে দিচ্ছি। আঁচল ভরে কি এনেছিস? গাবের ফুল? মুহুকে আর ফুল পেলি না? এ দিয়ে কি হবে?"

নীলু বলে ওঠে, "দিদি লক্ষ্মীনারায়ণের অন্তে গোড়ে মালা গেঁথে দেবে। আমি দেব বকুলের মালা।"

"যার যা দিতে মন চায় দিস, বাবু। যে যা ভক্তি করে দেয় তিনি তা পেয়েই তুষ্ট হন। ফুলগুলো ওই তুলসীতলায় কলার পাতায় রেখে দে।" বলতে বলতে ঠাকুমা চন্দনের বাটি আনতে চলে গেলেন।

মা চণ্ডীমণ্ডপ হতে বের হলেন তাম্বার ঘটিতে জল নিয়ে। ছেলেমেয়েদের কাছে এসিয়ে বল্লেন, "তিনবার একটু একটু করে ঘটে জল ঢেলে দে। মন্তর তো মনে আছে? তুলসীতলার মাটি কপালে ছুঁইয়ে যা, চন্দনের টিপ্ পরে নে।"

তিনু নীলু তুলসীবারায় জল দিয়ে মায়ের মুখের দিকে চাইল, মায়ের পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে কোরা শাড়ী। ললাটে এত বড় একটা সিন্দুরের ফোঁটা, তার উর্দ্ধে চন্দন। হাতে রাঙা শাঁখা। আধ-ঘোমটায় মুখের অর্দ্ধেক আবৃত। তাদের মা যেন শুধু তাদের জননী নয়, যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রতিমা।

তিনু নীলু নববস্ত্রে চন্দনে ভূষিত হয়ে পুজোর ঘরে একবার উঁকি দিয়ে এলো। সেখানে আজ সমারোহের সীমা পরিসীমা নেই। বিপুল আয়োজন।

গোটা বৈশাখ মাস বিগ্রহ ধারা-স্নান করবেন। পূজো ও ভোগের পরে বিরাট এক তাম্রপাত্রে তাঁকে বসিয়ে রাখা হবে। মাথার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মাটির একটা হাঁড়ি। তার নাম সহস্রধারা। হাঁড়ির প্রতি ছিদ্রপথে ফুল। বেলা গড়িয়ে যেতে না যেতে বিগ্রহকে জলাধার হতে তুলে নিয়ে ফের পূজো করতে হবে। শীতল ফলমূল, পানীয় নিবেদন করে শয়ন করাতে হবে। সন্ধ্যায় বৈকালী আরতির সময় ফের তিনি জাগবেন। তারপরে রজনীভোর চলবে তাঁর সুখ-নিদ্রা। নববর্ষের প্রারম্ভে ও অক্ষয় তৃতীয়ার পূজোভোগের আধিক্য হ'লেও বৈশাখ মাস ভরে তাঁকে পরমান্ন দিয়ে ভোগ দিতে হবে। ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে। নিত্য উৎসব, নিত্য বিবিধ অনুষ্ঠান।

আজ আবার পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে যার যা সাধ্য দানছত্র খোলা হয়েছে। মণ্ডপের একদিকে কয়েকটা মাটির কলসীতে সুশীতল জল। কলসীর গলায় সাদা ফুলের মালা, সিন্দুর ও চন্দনের তিলক। কলসীর মাথায় আম্রপল্লব ও নারীর ডাব। জলদানের অদূরে ভোগ্য সাজানো। ধুতি, গামছা, আসন, খড়ম, ছাতা, তালের পাখা উৎসর্গ করা হবে পূর্ব্বপুরুষদের নামে।

কাঠের বড় বড় বারকোসে ফলমূল, লুচি, পুলি, কলা, শাঁক-আলু, আখ, নারকেল, বেল কেটে রাখা হয়েছে। পাথরের থালায় গৃহজাত মিষ্টান্ন। তিলের নাড়ু, নারিকেলের নাড়ু, তক্তি, ক্ষীরের নাড়ু, মুগের নাড়ু, সরভাজা, বাতাসা, চিনির ছাঁচ। ফল, নৈবেদ্য, মিষ্টান্ন ভাগে ভাগে সাজানো। একভাগ নারায়ণের পূজোর কাছে। আর একভাগ ভোজ্য উৎসবের কাছে।

তিনু নীলুর বাবার বাড়ীতেই ভোজ। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হ'তে কয়েকটি ব্রাহ্মণ বালক ভোজে অধ্যয়ন

করতে এসেছে। তারা সকলে গুরুগৃহে থাকে, আদার করে—ঘরের ছেলে হয়ে গেছে। ঠাকুমা সকলকেই নববস্ত্র উত্তরীয় দিয়েছেন। তারা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করে ছুটোছুটি করে কাজ করছে। ফুল, দুর্ব্বা, বেলপাতা, তুলসী পাতা সংগ্রহ করে, স্নানের কলসীর মালা গেঁথে দিয়ে ঠাকুমা যার সঙ্গে ওরা জলপানি পাঠিয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মীনারায়ণের যাবতীয় সেবার ভার গ্রহণ করে ওরা অধ্যাপকের শ্রমের ভার লাঘব করেছে।

তিনু নীনু মণ্ডপের পেছন থেকে এক ডালা ভাঁটি ফুল তুলে এনে নিবিষ্টমনে মালা গাঁথতে বসে গেল, তুলসী মঞ্চের অনতিদূরে। টোলের দাদারা নীলুকে একসাজি বকুল ফুল দিয়েছে। নীলুর আর কষ্ট করে ফুল কুড়োতে হল না।

ঠাকুমা ও মা দুইজনেই ভোগশালায়। আজ লোক খাবে কম নয়, আয়োজন প্রচুর। ঠাকুমা আজ বছর চারেক হল ঠাকুর ঘরে ও ভোগের ঘরে কায়েমী হয়েছেন। বাড়ীর কর্ত্তা গতবছর পরলোকে গমন করেছেন।

পিতলের বড় কড়ায় পায়েসের দুধ বসেছে। আজ পরমান্ন সকলের প্রধান প্রসাদ। দুই কড়া পায়েস হবে।

রান্নার ফাঁকে ঠাকুমা একবার বের হয়ে নাতিনাতনীকে ডেকে বলেন, "বেলা বেড়ে হয়েছে, তোরা যে মালা নিয়েই বসে রইলি, কিছু খেয়ে নিবি চল।"

তিনু গম্ভীর হ'য়ে বলে, "পুজোআর্চ্চা হল না, পুরুত দাদু এসে পুজোয় বসলেন না, এখুনি আমরা যাব কি, ঠাকুমা? ঠাকুরের মালা গেঁথে আমরা রেখে এসেছি পুজোর সাজে। এ মালা পুণ্যি পুকুর বর্ত্তের। পুণ্যি পুকুরের পুকুর কেটে ফুল এনে তবে আমরা জল খাব।"

নীলুর ক্ষুধায় উদ্রেক হলেও সে দিদির কাছে পরাভব স্বীকার করতে চায় না, বলে ওঠে, "না এখন আমরা খাব না। আমাদের কত কাজ রয়েছে।"

ঠাকুমা হেসে চলে যান নিজের কাজে। তিনু নীনু বড় একটা ফুলের সাজি হাতে বেরিয়ে যায়।

কবে যেন ঠাকুমা তিনুকে বলেছিলেন, "অগ্রহায়ণ মাসের নাটাই, ফাল্গুন মাসের ইটাকুমুড়, বৈশাখ মাসের পুণ্যি পুকুর ব্রত সমস্তই বনদেবীর উদ্দেশে করা হয়। বনদেবী বনের ফুলেই পরিতুষ্ট হন বেশি।" তিনুর শিশুমনে সেই কথা গাঁথা হ'য়ে রয়েছে। তাই সে বনে বনে বিচরণ করে বনফুলে ডালা ভরে আনে। এবার তার দোসর হ'য়েছে নীনু। আনন্দের আর উৎসাহের সীমা নেই তাদের।

লাল টুকটুকে শিমুল ফুল কুড়োতে কুড়োতে তিনু বোষ্টমীদিদির কাছে শেখা গান ধরে,—

"আরতো ব্রজে যাব না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়।"

নীনু উল্লাসে যোগ দেয় দিদির সঙ্গে।

ফুলে ফুলে ডালা ভরে ওঠে। অনেক বেলায় তিনু নীনু বাড়ী ফিরে দেখে পুরোহিত এসে নারায়ণের পুজো সাঙ্গ করছেন। এখন অন্য অনুষ্ঠান বাকী।

আশিনার পাড়ার ছোট ছেলেমেয়ে, ভিখারী, বৈরাগী, বোষ্টমীতে ভরে গেছে। সকলে সমবেত হয়েছে নারায়ণের জলপানি প্রসাদ নিতে। টোলের ছেলেরা ছোট ছোট কলার পাতায় ফল মিষ্টান্ন কলা শুদ্ধ সাজা নৈবেদ্য বিতরণ করছে তাদের হাতে হাতে। বছরের প্রথম দিনে কারোকে নিরাশ করতে নেই, বিমুখ করতে নেই। আজ যে ভাল কাজ করা যাবে, সারা বছর পাওয়া যাবে তার শুভ ফল।

তিনু নীনু ফুলের ডালা রেখে বারান্দার এক কোণে বসে গেল দুই পাতা প্রসাদ নিয়ে।

দ্বিপ্রহরে নারায়ণের ভোগের পরে সকলের ভোজন পর্ব্ব মিটতে মিটতে বেলা গড়িয়ে গেল। পল্লীগ্রামের আহারাদি সহজে সমাধা হতে চায় না। ঠাকুমার আবার সবদিকে সজাগ দৃষ্টি।

বেলাশেষের স্নিগ্ধ কোমলতা নেমে এসেছে ভুবনে। আকাশে কালবৈশাখীর জলভরা মেঘমালা ধীরে ধীরে তাদের নৃত্য গীতের আসর সাজাচ্ছে।

ঠাকুমা হাঁক ডাক সুরু করে দিলেন, "ওরে তিনু, নীনু, তোদের পুথি পুকুর বর্ত্তর গোছাড় করে নে। বড় বৃষ্টির তাণ্ডব আরম্ভ হলে উঠোনে বসে পুজো করবি কি করে? হাত পা মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ধূপ-দীপ, ফুলমালা নৈবিদ্যি জলপানি সব নিয়ে আয় পুকুরের কাছে।" ঠাকুমাকে বেশি বলতে হল না। তিনু নূতন ব্রতী নয়। ক'বছর হ'ল ব্রত পালন করে পেকে কাহু হয়ে গেছে। পুজোর উপকরণ তার সমস্তই সজ্জিত। নেপাপোছা ভকতকে পুকুরপাড়ে আলপনা পর্য্যন্ত বাকী নেই।

সন্ধ্যাসমাগমে তিনু বসে গেল পুজোয়। এ ব্রত কুমারীদের একচেটে, ছেলেদের অধিকার নেই। তবু নীনু দিদির হাতের কাছে এটা-সেটা এগিয়ে দিয়ে ব্রতের অংশ নিতে লাগল। ঠাকুমা কাছে আসন নিয়ে নাতনীকে নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন। মা গৃহে গৃহে ধূপ-দীপ দেখিয়ে তুলসীতলায় মাটির প্রদীপ রেখে প্রণামান্তে চলে গেলেন আরতির আয়োজন করতে।

বৈশাখ মাসে লক্ষ্মীনারায়ণ সাক্ষাৎ দামোদর হয়ে যান। ধারা-স্নান হতে উঠে কের পুজো নিয়ে নানাবিধ ফল মিষ্টান্নের প্রতি দৃষ্টিভোগ দেরে ঘুমিয়ে আছেন রূপোর সিংহাসনে। আরতির পরে রাতে তাঁরও নিষ্কৃতি, তাঁর সেবাইতদেরও শান্তি।

সহসা সাহাপাড়া, মালীপাড়া থেকে খোল-করতাল বেজে ওঠে ঝন্ ঝন্ করে। সন্ধ্যা হতে সতীর রাত অবধি ওরা নাম কীর্ত্তন করবে পুণ্যমাসে। প্রখর বাতাসে ভেসে আসে তাদের গানের রেশ :—

"হরি বলে আমার গৌর নাচে—
তার রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে।"

তিনু ছোট পুকুরটির পাশে আসনে বসে জোড় হাতে ভক্তিভরে মন্ত্র উচ্চারণ করছিল,—

"পুথি পুকুর পুষ্পমালা, কে পুজেরে সাঁজের বেলা।
আমি সতী লীলাবতী সাত ভাইএর বোন পুণ্যবতী।
হবে পুত্র মরবে না; পৃথিবীতে ধরবে না।
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে মরি যেন অথৈ গঙ্গাজলে।"

পূজান্তে প্রার্থনা :—"দশরথের মত শ্বশুর দিও, কৌশল্যার মতন শাশুড়ী। রামের মত স্বামী, লক্ষ্মণের মতন দেবর" ইত্যাদি—

সন্-সন্ ঝন্-ঝন্ শব্দ করে কালবৈশাখী তার আগমন বার্ত্তা প্রচার করে উঠলো চারিদিকে।

ঠাকুমা উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন, "বৌমা, কোথায় তুমি, শিগ্‌গির এদিকে এসে জিনিষপত্র ঘরে তুলে নাও। বড় বৃষ্টি এলো, সব লণ্ড-ভণ্ড করে দেবে।" বৌমা ছুটে এলেন। ছেলেমেয়ের হাতে হাতে পুণ্যপুকুর ব্রতের সরঞ্জাম ঘরে তুলেন।

দু'খানা পিতলের রেকাবীতে ব্রতের ফল মিষ্টি সাজিয়ে মা ঘরে দিলেন ছেলেমেয়েদের সামনে।

ঠাকুমা বলেন, "ওদের সন্ধ্যেয় রাতের মত খাইয়ে দাও বৌমা। ঝড়-বাদলের ভাওব, কত রাতে কে আসবে কে জানে? সেই ভোর থেকে ওদের হৈ-চৈ সুরু হয়েছে। এখন খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক। আবার শেষরাত থেকে চলবে প্রাতঃস্নানের ধুম।"

ছেলেমেয়ে রাতের আহারের অনিচ্ছা জানায়। তারা আর রাতে ভাত খেতে পারবে না। তাদের পেট ভরা রয়েছে। মা বলেন, "তোদের পায়েস রয়েছে। এখানেই এনে দেই? ভাত খেতে ইচ্ছে না হলে না খেলি।"

পায়েসের উল্লেখে ঠাকুমার মনে পড়ে তিনি পায়েসের কড়া চেঁচে বাটি করে সযত্নে রেখে দিয়েছেন উনুনের পাড়ে ঢাকা দিয়ে। এ তাঁর চিরকালের অভ্যাস। চার বছরেও সে অভ্যাস যায়নি। আজ ব্যস্ততায় ভুলে গেছেন চাঁছির কথা. বৌমাও লক্ষ্য করেনি! ঠাকুমা হঠাৎ বিমনা হয়ে বলেন, "হবিষ্যি ঘরে উনুনের পাড়ে পায়েসের চাঁছি রেখেছি. বৌমা, আমার ভুল হয়েছিল, কারোকে দেওয়া হয়নি। ওদের এনে দাও।"

তিনু বলে, "আমাদের ঠাকুরদা পায়েসের চাঁছি খেতে ভালবাসতেন। তাই ঠাকুমা পায়েস হলেই রেখে দিতেন তাঁর জন্যে পায়েসের চাঁছি। আমি মার কাছে শুনেছি।"

নীনু বলে ওঠে, "আমিও ঠাকুরদার মতন পায়েসের চাঁছি খেতে বড় ভালবাসি।"

বধূ বেরিয়ে গেল শাশুড়ীর আদেশ পালন করতে।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছিল ঝর্‌ঝর্ করে। প্রমত্ত পবনে ভেসে আসছিল নামকীর্তনের সুর। ঠাকুমা সস্নেহে নীনুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। তাঁর হৃদয়ে বাদল, নয়নে বাদল ঘনিয়ে এল।

এখানে কোন কিছুই যায় না। শেষ হয় না। প্রবীণ যায়, নবীন আসে। শুকনো পাতা ঝরে যায়, নূতন পত্রপল্লবে হাসে তরুলতা।

[পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণের পর তৎকালীন 'মাসুক'-সম্পাদক, স্বনামধন্য সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন : "ব্রাহ্মণ স্যর গুরুদাস বাঙ্গলার আদর্শ পুরুষ ছিলেন। এমন অদ্বিতীয় ত এক জীবনে আর দেখি নাই।... মাতৃভক্ত, সদাচার অনুরক্ত, ভাবুক সাধক, নির্মল চরিত্র আর কোন্ গুরুদাসকে দেখাইয়া আমার শাস্ত্রের, আমার ধর্মের, আমার সমাজের মহিমা কীর্তন করিব?" এই বৎসরের ২রা ডিসেম্বর তারিখে স্যর গুরুদাসের মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হইবে। এই উপলক্ষ্যে আমরা বিশিষ্ট জীবনীকার শ্রীমণি বাগচি লিখিত এই চরিতালোচনাটি প্রকাশ করিলাম। বর্তমানের সর্বাঙ্গীন অবক্ষয়ের যুগে দ্বিজোত্তম গুরুদাসের দৃষ্টান্ত আমাদের পথ-প্রদর্শক হউক।

—সম্পাদক : 'পল্লবারতী'।]

সেদিনের বাঙালী

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মণি বাগচি

যে-আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে লোকোত্তর চরিত মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে আসেন, তার পুণ্য প্রভায় শুধু যে তাঁদের কাল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা নয়, দূরান্ত কালকে পর্যন্ত তা স্পর্শ করে। সেই আলোর মহিমা বুঝতে হলে সেইসব মহাপুরুষদের জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হয় আর বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় তাঁদের জীবন ও সাধনাকে। জীবনের সহস্র সোপান বয়ে বুকের পাঁজরে আলোকশিখা বহন করে দুঃখে দাঁড়িয়ে আছেন উনিশ শতকের বাংলার দুই বিরাট পুরুষ—বিদ্যাসাগর ও গুরুদাস। এই দুই বরেণ্য বাঙালি সন্তান তাঁদের স্বজাতির জীবনে যে নূতন আলোর সঞ্চার করে গিয়েছেন, যেভাবে এঁরা স্ব স্ব চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকৃতি দ্বারা জীবনের রাজ-পথের—যাকে আমরা বলি, High way of life—তার উদ্ঘাটন করে গিয়েছেন, তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের দুইটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর সর্বশেষ আলোচিত ব্যক্তি, কিন্তু গুরুদাস অপেক্ষাকৃত অনালোচিত, এবং কিছুটা উপেক্ষিতও বটে। তাঁর লোকান্তর গমনের পর অর্ধ শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হোল, কিন্তু গুরুদাস চরিতের আলোচনা কোথায়? অথচ কে না জানে যে চরিত্র-গৌরবে বিদ্যাসাগরের পরেই গুরুদাস আর ব্রাহ্মণ্য-গৌরবে ভূদেবের পরেই তিনি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুরুদাস এঁদের দুজনকেই অতিক্রম করে গিয়েছেন, দেখা যায়। ব্যাপ্তিতে ও দীপ্তিতে এই চরিত্র সত্যিই অতুলনীয়। শুধু চরিত্র নয়, চরিত্রগত আভিজাত্যেও এই ক্ষীণ ও খর্বকায় মানুষটির একটি অনন্যলভ্য স্থান আছে বাঙলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে।

গুরুদাস-চরিত্রের মহত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ কিভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ভূমিকায় সেটা উল্লেখ করা দরকার। কবি যখন 'স্বদেশী সমাজের' পরিকল্পনা করেন, তখন তিনি তার নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশে একমাত্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর কাউকে যোগ্য বলে মনে করতে পারেন নি। সেদিন কবি প্রকাশ্যে বলেছিলেন : "যিনি একদিকে আচার ও নিষ্ঠাদ্বারা হিন্দু সমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপরদিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী; একদিকে কঠোর দারিদ্র্য যাঁহার অপরিচিত নহে, অন্যদিকে আত্মশক্তির

পিতামহের নির্মিত বাসভবনের পরিসর ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে তিন বিঘায় দাঁড় করিয়েছিলেন—পর্ণ কুটীরকে প্রাসাদে পরিণত করেছিলেন। গুরুদাসের পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কার টেগোর' কোম্পানীর অফিসে কাজ করতেন। এখানে তাঁর মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা; প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট। রামচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী ছিলেন; তাঁর সন্ধ্যাবন্দনা ও পূজা আহ্নিকে একটু বেলা হোত, সুতরাং অফিসে উপস্থিত হতে একটু বিলম্ব হোত। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজন্য তাঁকে কিছু বলতেন না, কারণ তিনি তাঁর এই কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। অল্প বয়সেই রামচন্দ্রের যখন মৃত্যু হয় তখন মহর্ষিদেব তাঁদের অফিস থেকে পেন্সন হিসাবে মাস মাস কিছু টাকা মঞ্জুর করেছিলেন এবং কার টেগোর কোম্পানি উঠে যাওয়া পর্যন্ত রামচন্দ্রের বিধবা পত্নীকে ঐ টাকা দেওয়া হয়েছিল, তথাপি এই অকাল মৃত্যুর জন্য গুরুদাসের পিতৃ-পরিবার তাঁর বাল্যাবস্থায় অশেষ দারিদ্র্য ক্লেশ ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সে-দারিদ্র্য অবর্ণনীয়।

রামচন্দ্র বিবাহ করেছিলেন সোভাবাজারের খ্যাত-নামা অধ্যাপক রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারবাচস্পতির চতুর্থ কন্যা সোণামণি দেবীকে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে হয়ে এবং হিন্দুগার্হস্থ্য জীবনের পবিত্র আদর্শ দেখে গুরুদাসের মাতৃদেবী নিজ চরিত্র গঠন করেছিলেন। এই রামচন্দ্রের ঔরসে ও সোণামণি দেবীর গর্ভে এবং উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণে ১২৪০ বঙ্গাব্দের ১৪ই মাঘ (ইংরাজি ১৮৩৪, ২৮শে জানুয়ারি) শ্রীমান গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নারিকেলডাঙায় তাঁদের পৈতৃকভবনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার তিনি একমাত্র সন্তান ছিলেন। আড়াই বছরের শিশু পুত্রকে নিয়ে সোণামণি বিধবা হয়েছিলেন এবং জীবনের সুদীর্ঘকাল অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে এই বৈধব্য পালন করেছিলেন। এই অকাল বৈধব্য, এই অবস্থা বিপর্যয় সংসারে নিয়ে এলো শত ক্লেশ, শত অসুবিধা আর কঠোর দারিদ্র্য। কিন্তু বিধবার অশ্রু বিসর্জনের অবসর ছিল না, স্বামীর অকাল মৃত্যুতে বিলাপের অবকাশ ছিল না; তিনি সব কিছু মাথায় ধারণ করে শিশু পুত্রটির প্রতিপালনে মনোনিবেশ করলেন। কেমন করে ছেলেটিকে মানুষ করে তুলবেন, এই একমাত্র চিন্তা তখন তাঁর হৃদয়-মন পূর্ণভাবে অধিকার করেছিল। সোণামণির ধ্যান-জ্ঞান তখন গুরুদাস।

লোভশূন্যতা গুরুদাস জননীর চরিত্রের যেমন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট ছিল, তেমনি প্রবল ছিল তাঁর আত্ম-মর্যাদাবোধ। উত্তরাধিকার সূত্রে গুরুদাস তাঁর মায়ের এই দুইটি গুণ পুরোমাত্রায় লাভ করেছিলেন। এক নিঃসম্বল বিধবা হিন্দুনারী দারিদ্র্যের রুক্ষ দৃষ্টিতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁর শিশুপুত্রটিকে সকল গুণের আধার করে তুলে-ছিলেন, কেমন করে তাকে সুশিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মানুষ করে তুলেছিলেন, সে সব কাহিনী আজ কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। আজকালকার মায়েরা ভগবতী দেবী বা সোণামণি দেবীর কথা জানেন কিনা সন্দেহ। স্নেহ মানুষকে অন্ধ করে, দুর্বল করে, মাতৃস্নেহের তো কথাই নেই। কিন্তু সোণামণি দেবী ছিলেন এর ব্যতিক্রম।

গুরুদাসের শৈশব জীবন তাঁর মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয় এবং এখান থেকেই আরম্ভ হয় তাঁর প্রাথমিক বিদ্যাভ্যাস। তাঁর বয়স যখন আট-নয় বছর তখন তাঁর মাতুল ভাগিনেয়কে ভর্তি করে দিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে। নিজের কাছে রেখে নাবালক ভাগিনেয়ের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করার সুবিধা হবে মনে করেই তিনি তাকে এই স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু মায়ের এটা পছন্দ হোল না। ছেলে এখন বড়ো হয়েছে, এখন তিনি তাকে তাঁর নিজের কাছে নারিকেলডাঙায় আনতে চাইলেন। একমাত্র সন্তানকে দূরে রাখবার ক্লেশ এর একমাত্র কারণ নয়। দরিদ্র হলেও সোণামণি দেবী বুদ্ধিমতী ছিলেন। ভাগ্যবান ভ্রাতার বৈঠকখানায় নানাবিধ লোকের গল্পগুজবে ছেলের পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে, এ আশঙ্কা তাঁর ছিল। অতঃপর বালক গুরুদাস মাতুলালয় ত্যাগ করে তাঁদের নারিকেলডাঙার পৈতৃক ভবনে এসে পড়াশুনা করতে থাকেন। নিপুণ ভাস্কর যেমন করে পাথর কেটে একটি মূর্তি গঠন করে, এই নিঃসম্বল

বিধবাও তেমনি মাতৃ-হৃদয়ের সমস্তাগ্রস্ত স্নেহ ও শাসন দিয়ে ভবিষ্যতের গুরুদাস বিগ্রহটি গঠন করেছিলেন। হয়তো সেই গঠন-প্রক্রিয়ার পশ্চাতে ছিল ইতিহাস-বিধাতার হাত। উত্তরকালে গুরুদাস তাই তাঁর মায়ের প্রসঙ্গে বলতেন : "আমি আমার জীবনের সকল সফলতার জন্য আমার মাতৃদেবীর কাছেই ঋণী। ছেলেবেলা হইতেই আমার মায়ের সতর্ক দৃষ্টি সর্বক্ষণ আমার উপর নিবদ্ধ থাকিত। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন আমার পক্ষে বাড়ির বাহিরে যাওয়া চলিত না। তিনি আমার সঙ্গে খেলা করিতেন, সময় সময় প্রতিবেশি সমবয়সী বালকদের বাড়িতে আনাইয়া আমার সঙ্গে খেলা করিতে দিতেন। কোনো প্রকারে নিজের অভিপ্রেত পথের বাহিরে আমাকে তিনি যাইতে দিতেন না। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল অগাধ, কিন্তু শাসন ছিল আরো কঠিন। মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা আমার সাধ্য ছিল না।"

"মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা আমার সাধ্য ছিল না।" —আজকালকার কয়টি ছেলে এমন কথা বলতে পারে? সোণামণি দেবীর ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্তব্যজ্ঞানের সুবিমল প্রভাব যে গুরুদাসের বাল্যজীবন গঠনের পরিশোধক ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিধবা হিন্দু-নারী কেমন সুন্দর ভাবে তাঁর পুত্রটিকে বাল্যকালে, যৌবনে ও পরিণত বয়সে আপন বশে রেখেছিলেন, আবার পুত্রও এই বর্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাভিমানের যুগে, কেমন সহজে মাতৃআজ্ঞার অনুবর্তী হয়ে জীবন সার্থক করেছিলেন—মাতা ও পুত্রের সেই সম্পর্ক, সেই আদর্শটা আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি। পঞ্চাত্তর বছর বয়সে পুত্রকে যশ ও সৌভাগ্যের শীর্ষস্থানে দেখে এই ধর্মপরায়ণা মহিলার মৃত্যু হয়। সোণামণি দেবীর শ্রাদ্ধবাসরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন। বিদ্যাসাগর সাধারণত কারো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না এবং দানও গ্রহণ করতেন না। কিন্তু গুরুদাসের মাতৃভক্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তাই তিনি এই নিয়ম উপেক্ষা করেন নি। তবু গুরুদাস এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগরকে স্বরচিত একটি সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ করা একটি রূপার গ্লাস প্রদান করেন। তিনি মাতৃঋণ পুত্রের সেই দানও গ্রহণ করেছিলেন।

গুরুদাসের ছাত্রজীবন ছিল যেমন গৌরবময়, তেমনি কৃতিত্বপূর্ণ।

জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশন, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও হেয়ার স্কুল—প্রথম জীবনে তিনি এই তিনটি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। হেয়ার স্কুলেই তিনি বেশি দিন পড়েছিলেন। পঞ্চম শ্রেণী থেকে প্রত্যেকটি বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকেন—ভবিষ্যতে কোনো পরীক্ষায় গুরুদাসকে এই সম্মান থেকে বঞ্চিত হতে হয়নি। হেয়ার স্কুলে পড়বার সময় তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন ছিলেন বাংলার শিক্ষক-কুলের শিরোমণি প্যারীচরণ সরকার। তাঁর গুণপরিমার কথা গুরুদাস শত মুখে ব্যক্ত করতেন। বলতেন : "প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ছিলেন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক জ্যোতিষ্কের সূর্যস্বরূপ। আমার ছাত্রজীবনে অমন দেবোপম চরিত্রের শিক্ষক আর দ্বিতীয়টি দেখি নাই।" এই আদর্শ-চরিত্র শিক্ষকের প্রভাবও তাঁর চরিত্রগঠনে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল।

১৮৫৯ সালে গুরুদাস এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজ বলতে গোলদীঘির উত্তর দিকে বর্তমান সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু স্কুলের একাংশ বুঝতে হবে। ১৮৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রথম এফ-এ (First Arts) পাশের ফল বের হলেন, গুরুদাস তাঁদের অন্যতম। এই পরীক্ষাতেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কালে যে দুজন অধ্যাপকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-মাধুর্যের প্রতি গুরুদাস আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কাউয়েল সাহেব (হাবার্ট কাউয়েল) আর অপরজন আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। কৃষ্ণকমলের কাছে তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করেছিলেন। গুরুদাসের

মেধা ও অধ্যয়নে অনুরাগ দেখে কাউয়েল সাহেব একবার তাঁকে বিলাতে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। ১৮৬৭ সালের প্রারম্ভে গুরুদাস বি-এ পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। তিনি গণিত, দর্শন ও বাংলাসাহিত্য—এই তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়েছিলেন। বি-এ পাশ করবার অব্যবহিত পরে গুরুদাস একবছরের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের সহকারী অধ্যাপকের কাজ করেন। তাঁর আগে বাঙালির মধ্যে আর কেউ এই সম্মান লাভ করেন নি। প্রত্যহ দু'ঘণ্টা করে অধ্যাপনা করতে হোত; বেতন ছিল মাসিক ছেড়শত টাকা। কথিত আছে, বেতনের সব টাকা গুরুদাস তাঁর মায়ের হাতে এনে দিলে সোদামণি দেবী তাই দিয়ে গৃহ-দেবতার সিংহাসন তৈরি করিয়েছিলেন এবং পুত্রকে তিনি এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন: "তোর প্রথম রোজগারের টাকার ওপর আমার ঠাকুরকে বসালাম, দেখিস এর ফল ভালই হবে।" মায়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা যায়নি; উত্তরকালে সেই নিঃসম্বল বিধবার পুত্রটির উপর সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা যেন সহস্রধারায় বর্ষিত হয়েছিল। ১৮৬৯ সালে গুরুদাস গণিতশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এই ছয়েই তিনি অল্পদিনের জন্য, দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

গুরুদাসের ছাত্রজীবন শেষ হোল, কিন্তু তাঁর অধ্যয়ন স্পৃহা আজীবন বলবৎ ছিল। তিনিই বলেছিলেন, জ্ঞানের আরম্ভ আছে, শেষ নেই। প্রেসিডেন্সি কলেজের পর গুরুদাস জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) গণিতের অধ্যাপক পদে ব্রতী হন। এখানে তিনি পাঁচ ছয় মাস কাল অধ্যাপনা করেন এবং সেই একই সময়ে দেখা যায় যে, তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আগে নিয়ম ছিল যে, যারা বি-এল পরীক্ষা দেবেন, তাঁদের বি-এ পড়বার সময় আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের লেকচার শুনতে হোত। গুরুদাস তাই-ই করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে বি-এল পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। 'ব্যবস্থা-দর্পণ' প্রণেতা ও বহু ভাষাবিদ্ শ্যামাচরণ সরকারের কাছে তিনি হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্বন্ধে অনেক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন ও স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের কাছে খাজনা সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে লেকচার শুনেছিলেন।

এইবার আরম্ভ হয় গুরুদাসের গৌরবময় কর্মজীবন।

১৮৬৬ সালের মধ্যভাগে তাঁর এই জীবনের আরম্ভ আর ১৯১৬-তে এর পরিসমাপ্তি। তাঁর এই অর্ধশতাব্দী-কাল ব্যাপী কল্যাণকর কর্মজীবনের ইতিহাস বলতে গেলে বাংলার সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তাঁর কর্মজীবনকে সেই বর্ণাঢ্য ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের দেখতে হবে, বুঝতে হবে। সেদিনের বাংলার যেন চাঁদের হাট বসেছিল—দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ স্ব স্ব প্রতিভা ও কর্মশক্তি দ্বারা বাংলার সমাজ জীবনে, এবং সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিপুল তরঙ্গপ্রবাহের সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গুরুদাসের উপর গিয়ে যে পড়েছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তারপর দেখা যায় যে, এই একটি মানুষের নির্মল ও পবিত্র চরিত্র তাঁকে একদিকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আর অন্যদিকে সর্বজন অন্বেষিত ব্যক্তি করে তুলেছিল, বলতে গেলে স্বয়ং গুরুদাস সেদিন হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র ভারতবাসীর আদর্শপাত্র। নারিকেলডাঙার সেই নিঃসম্বল বিধবার সন্তান কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র বাঙালি সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। নারিকেলডাঙার সেই কলাবাগান থেকে এমন একটি বিরাট পুরুষের যে অভ্যুদয় ঘটবে, তা কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল। ইতিহাস-বিধাতা বুঝি এইভাবেই তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাঁর চিহ্নিত পুরুষদের সংসারে পাঠিয়ে থাকেন। তাই বুঝি বীরসিংহ গ্রামে জন্মেছিলেন উত্তরকালের বাংলার সিংহবীর্য পুরুষ বিদ্যাসাগর আর নারিকেলডাঙা থেকে এসেছিলেন অজাতশত্রু ও অপাপবিদ্ধ গুরুদাস।

গুরুদাসের কর্মজীবন আরম্ভ হয় বহরমপুর কলেজে।

১৮৬৮ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর তিনি এই কলেজের গণিত ও আইনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন ; বেতন মাসিক তিনশত টাকা। মায়ের কিন্তু মত ছিল না যে, গুরুদাস কলিকাতা ছেড়ে অত দূরে চাকরি করেন। তিনি অনেক কষ্টেই এই অনুমতি আদায় করেছিলেন। গুরুদাস তখন বিবাহিত। প্রথমবার বহরমপুর যাবার সময় তিনি জননী ও সহধর্মিনীকে সঙ্গে নেননি। কলেজে অধ্যাপনা ব্যতীত তিনি মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব নাজিমের বাঁধা উকিল (Retained Legal Adviser) ছিলেন এবং এজন্য তাঁর অতিরিক্ত অর্থাগমও হোত। বহরমপুরে এসে গুরুদাসের স্বাস্থ্য, অর্থ, বন্ধু, সম্মান কিছুরই অভাব হয়নি। কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং অবসর মত আদালতে ওকালতি করেন। মুসলমান মক্কেলদের দলিল ও খাতাপত্র বুঝবার সুবিধা হবে বলে তিনি এই সময়ে একজন স্থানীয় মৌলভির কাছে খুব যত্নের সঙ্গে উর্দুভাষা শিক্ষা করেন ও অল্পদিনের চেষ্টাতেই ঐ ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ওকালতিতে গুরুদাসের দেওয়ানি অপেক্ষা ফৌজদারি মোকদ্দমার দিকে বেশি ঝোঁক ছিল। এখানে একবার একটি বিখ্যাত ফৌজদারি মামলায় প্রত্যহ পঞ্চাশ টাকা ফীনীতে তিনি সরকার পক্ষের উকিল নিযুক্ত হন ও উক্ত মামলায় তরুণ ব্যবহারজীবী গুরুদাসের নিপুণ সওয়াল শুনে ইংরেজ হাকিম ধারণাতীত বিস্মিত হয়েছিলেন। এই মামলায় জয়লাভের ফলে তাঁর যশ বহুদূরব্যাপী হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের এক জটিল মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখে গুরুদাস যে অভিমত প্রকাশ করেন তা দেখে হাইকোর্ট থেকে নাজিমের পক্ষের ইংরেজ ব্যারিস্টার লিখে পাঠিয়েছিলেন—"I fully agree"—এবং এর ফলেই নাজিমের সমস্ত ও বিশ হাজার টাকা রক্ষা পায়। নবাব এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সোনার ঘড়ি ও চেন উপহার দিয়েছিলেন। তখন থেকেই কলিকাতা হাইকোর্টে মফঃস্বলের উকিল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বহরমপুরে অবস্থান-কালে গুরুদাস শুধু অধ্যাপনা আর ওকালতি নিয়ে থাকতেন না, অবসর সময়ে কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধুদের নিয়ে একটি মনোরম সভা স্থাপন করেছিলেন। বর্তমান বহরমপুরের অন্যতম স্রষ্টা, স্বনামধন্য বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে কেন্দ্র করেই এই সভাটি গড়ে উঠেছিল এবং সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রামদাস সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই সভার সদস্য ছিলেন। এখানে এসে অবধি বিদ্যার পরিসর বৃদ্ধি করতে গুরুদাস বিশেষভাবে মনোযোগী হন। হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষার জন্য তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হলেন এবং পণ্ডিতপ্রবর রামগতি ন্যায়রত্নের পরামর্শে উপক্রমণিকা ও লঘুপাঠ থেকে আরম্ভ করে তিনি সংস্কৃতবিদ্যার ভিত্তি দৃঢ় করেন। 'দায়ভাগ', 'মিতাক্ষরা' প্রভৃতি অধ্যয়নের পূর্বে তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহ পাঠ করে-ছিলেন। প্রত্যহ দু'ঘন্টা করে সংস্কৃত পড়তেন—এক ঘন্টা নিজে ও একঘন্টা ন্যায়রত্নের কাছে।

তাঁর বহরমপুরে অবস্থান কালেই এখানে সরকারি কর্মোপলক্ষে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আগমন ঘটে এবং গুরুদাস ঐ সময়েই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাসের আদর্শের সর্বথা অনুবর্তন করেন নি এবং আচারে ও স্বভাবে যদিও উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল, তথাপিও বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাসের প্রতি কিরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। তাঁর জীবনের শেষ বৎসরে সরকার যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন তখন এক পত্রে আনন্দ প্রকাশ করে স্যর গুরুদাস সাহিত্য সম্রাটকে লিখেছিলেন : "আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে।" এর উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে লিখে পাঠিয়ে-ছিলেন : "অন্যে একথা বলিলে, তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ ; অতএব আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিঠিখানির তারিখ ১৯শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩০০। ঐ বৎসরের চৈত্র মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

গুরুদাসের সময়ে প্রখ্যাত আইনজীবী স্যর রাসবিহারী ঘোষ বহরমপুর কলেজে কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছিলেন। অল্পদিন পরে তিনি কলিকাতায় ওকালতি করতে আসেন। আসবার সময়ে তিনি গুরুদাসকে বলেন: "আপনিও হাইকোর্টে চলুন। আমরা যদি এখানে থাকি তো হাইকোর্টে যাবে কে?" এই আত্মনির্ভরতা আত্মস্তরিতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের এইরূপ নিজের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। সেকালের বরণীয় প্রত্যেকটি বাঙালি সন্তানের চরিত্রে এই গুণটি কম-বেশি পরিলক্ষিত হোত। গুরুদাসও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না, তবে তিনি বহরমপুর ত্যাগ করে কলিকাতায় এসে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন প্রধানত তাঁর মায়ের ইচ্ছায়। বন্ধুবের ভিটে ছেড়ে বিদেশে থাকা সোণামণি দেবীর আদৌ মনঃপূত ছিল না। তাই দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত বহরমপুরের সব আয় ত্যাগ করে গুরুদাস ১৮৭২ সালের শেষভাগে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছরও পূর্ণ হয়নি যখন গুরুদাস হাইকোর্টে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। ওকালতি ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের জন্য ১৮৭৭ সালে তিনি আইনের সর্বোচ্চ পরীক্ষা (Doctor of Law) দিলেন ও কৃতিত্বের সঙ্গেই পাশ করলেন। পরের বছরেই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আইনের অধ্যাপক (Tagore Professor of Law) নিযুক্ত করেন। কাউয়েল সাহেব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম টেগোর লেকচারার। তখন থেকে একাদিক্রমে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল নানাভাবে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। এরপরেই দেখা যায় যে, গুরুদাস ধাপে ধাপে জীবনের সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে, সাবার্বান মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম কমিশনারের পদে, ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট কমিশনের সদস্যপদে এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির অন্যতম সদস্য পদে নিযুক্ত হন। অবশেষে তাঁকে আমরা সৌভাগ্য-অধিরোহণীর সর্বোচ্চ সোপানে উপস্থিত হতে দেখি। ১৮৮৮ সালে গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর।

কথিত আছে, যখন তাঁর কাছে এই নিয়োগপত্র আসে তখন সোণামণি দেবী জানতে পারলেন যে তাঁর পুত্র হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। মায়ের অতিরিক্ত ভাবনা বাড়ল। ছেলেকে বললেন, "ওকালতির কাজে তোমার নিজের ওপর দায়িত্ব ছিল না, এখন তোমার কথার উপর লোকের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করবে। এ কাজ তোমার যেমন ভাল হোল, তেমনি ভাববার বিষয় হোল।"

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চৌদ্দ-পনর বছর ওকালতি ব্যবসায়ে গুরুদাসের প্রতিষ্ঠা যেমন হয়েছিল, অর্থাগমও তেমনি প্রচুর হয়েছিল। তখন যাকে বলে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীবান, তাঁর অবস্থা ঠিক তাই। তারপর তিনি যখন হাইকোর্টের জজ হলেন তখন তাঁর যেন দ্বাদশ বৃহস্পতির অবস্থা। বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই পরামর্শ দিলেন, আর আর কেন নারিকেলডাঙায় পড়ে থাকা? এখন সাহেব পাড়ায় অর্থাৎ চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটা বাড়ি করে, বা ভাড়া নিয়ে বসবাস করলেই ভাল দেখায়। কিন্তু সে পরামর্শ মাতাপুত্র উভয়ের কারো মনঃপূত হয়নি। দুদিনের সংগ্রামক্ষেত্র নারিকেলডাঙার বাসভবন সোণামণি দেবীর বড়ই প্রিয়স্থান ছিল। তিনি এই স্থানটিকে জীবন সংগ্রামের তীর্থস্থান বলে মনে করতেন। কৃতী পুত্রও মায়ের ছন্দানুবর্তী ছিলেন। এই নারিকেলডাঙাকেই গুরুদাস তাঁর পূত চরিত্রের প্রভাবে নবীন বাংলার নূতন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন।

হাইকোর্টের জজিয়তি তিনি যখন পেলেন, এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য, তখন দেশীয় ইংরেজ পরিচালিত সকল সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হয়েছিল। সেইসব মন্তব্যের ধারা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, এই নিয়োগ সেদিন সার্বজনীন আনন্দের বিষয়বস্তুতেই পরিণতি হয়েছিল। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পর যে কয়েকজন এদেশীয় হাইকোর্টের বিচারাসনে

উপবেশন করেছেন, তাঁদের কারো নিয়োগে দেশের মধ্যে এমন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ধ্বনি ওঠেনি, অথবা এমন সর্ববাদী সম্মতিক্রমে আর কেউ বিচারাসনে বসবার অবসর পান নি। এর একটা কারণ ছিল। গুরুদাস শুধু যে একজন যথার্থ আইনজ্ঞ ও অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন তা নয়; তাঁর মতি, গতি, স্বভাব, প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত ধীর। তার ওপর তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র স্বভাবের মানুষ। জজিয়তি করতে হলে এই গুণটির বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু এহো বাহ্য। এইসব গুণের সঙ্গে মিশেছিল স্বাধীনচিত্ততা। জজিয়তি পাওয়ার জন্য গুরুদাসকে এতটুকু খোসামদ করতে হয়নি, কারো সুপারিশের জন্যও তিনি লালায়িত হন নি। আপন প্রকৃতিগত স্বাধীনচিত্ততার জন্যই তিনি এই উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। তাঁর নির্মল চরিত্রের প্রভাব তখন অনেক রাজপুরুষকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল—শুধু আকৃষ্ট করা নয়, অনুরাগী পর্যন্ত করে তুলেছিল। সমকালীন বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের পর আর কোন বাঙালি সম্বন্ধে এই উক্তি করা চলে না। হাইকোর্টের জজিয়তি তিনি পনর বছরের বেশি করেন নি। ১৯০৪ সালে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন তখন নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গুরুদাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "অকালে পেন্সন নিলেন কেন? আরো কয়টা বছর তো চাকরি করতে পারতেন?" নির্লোভ গুরুদাস এর উত্তরে বলেছিলেন: "কি জানেন পনর বৎসর পূর্ণ হইতেই ভাবিলাম ব্রাহ্মণের গণ্ডী কাটিতে নাই; বেশি বাড়াবাড়ি করিলে ব্রাহ্মণের সহিবে না। তাই পেন্সন লইলাম।" শোনা যায় আর দু'তিন বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকলে গুরুদাসের পক্ষে প্রধান বিচারপতির পদলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল এবং বিচারপতি থাকাকালেই তিনি তার আভাসও পেয়েছিলেন। কিন্তু নির্লোভ ব্রাহ্মণ গুরুদাস বিধাতার ইঙ্গিত বুঝে মানে মানে অবসর নিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বিচারপতির পদে নিযুক্ত হওয়ার দু'বছর পরে গুরুদাসের শিরে অধিকতর সম্মান বর্ষিত হয়েছিল—১৮৯০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর আগে আর কোনো ভারতীয় এই সম্মানের অধিকারী হন নি। যে বছর তিনি জজিয়তি থেকে অবসর গ্রহণ করেন, সেই বছরেই (১৯০৪) ব্রিটিশ সরকার গুরুদাসকে 'নাইটহুড' উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু এর চেয়েও সম্মানজনক উপাধি তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীর কাছ থেকে। ভারত ধর্ম-মণ্ডল গুরুদাসকে 'ভারতভূষণ' উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করেন। এর আগে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আর কোনো ভারতবাসী এইভাবে সম্মানিত হন নি। কিন্তু উপাধিলাভের শেষ এইখানেই নয়। ১৯০৮ সনে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব হয় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্যর গুরুদাসকে সম্মানিত 'ডক্টর অব্ ল' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল।

এইবার শিক্ষাবিদ্ গুরুদাসের কথা।

এদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর যা কিছু চিন্তা-ভাবনা সবই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়ান্স এসোসিয়েসন, জাতীয় শিক্ষাপরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছিল। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই তাঁর সংযোগ ছিল নিবিড় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুরাতন কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে, গুরুদাস বিভিন্ন সময়ে এখানে এই পদগুলি অলঙ্কৃত করে-ছিলেন: (১) টেগোর আইন অধ্যাপক—১৮৭৮; (২) সেনেটের সদস্য—১৮৭৯-১৯১৮; (৩) সিণ্ডিকেটের সদস্য—১৮৮৫-১৮৮৯; (৪) মডারেটর ইন আর্টস—১৮৮৭-৮৯; (৫) ভাইস-চ্যান্সেলার—১৮৯০-১৮৯২; (৬) প্রেসিডেন্ট অব্ দি বোর্ড অব্ স্টাডিজ ইন্ ম্যাথ-মেটিকস্—১৮৯০-৯১; (৭) প্রেসিডেন্ট অব্ দি বোর্ড অব্ স্টাডিজ ইন্ ম্যাথমেটিকস্ (সংস্কৃত বিভাগ)—১৯০৪-১৯০৬; (৮) প্রেসিডেন্ট অব্ দি বোর্ড অব্ স্টাডিজ ইন্ ম্যাথমেটিকস্ (সংস্কৃত সাহিত্য)—১৯০৭-১৯১০; (৯)

প্রেসিডেন্ট অব্ দি বোর্ড অব্ স্টাডিজ ইন্ ম্যাথমেটিক্স্ (শিক্ষণ বিভাগ)—১৯০৯-১৯১৪ এবং ১৯১৭-১৯১৮; (১০) ডীন, ফ্যাকল্‌টি অব্ ল—১৯১২-১৯১৩; (১১) আইনের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পরীক্ষক—১৯০৭-১৯১৮। এছাড়া ১৯০২ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান্ ইউনিভার্সিটিজ কমিশনের (র‍্যালে কমিশন) অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।

স্যর গুরুদাস যখন সেনেটের অন্যতম সদস্যপদে নিযুক্ত হন তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈশবকাল সবেমাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তখনো পর্যন্ত এই সর্বোচ্চ শিক্ষায়তনের রূপ-রেখা সুবলয়িত হয়ে ওঠেনি বললেই হয়। তখন থেকেই সাধারণভাবে এবং ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়ার পর থেকে বিশেষভাবে তিনি এর নানাবিধ সংস্কার সাধনে ও উন্নতিকল্পে তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রম কিভাবে নিয়োজিত করেছিলেন তার সবিশেষ উল্লেখ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে। তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতাগুলির মধ্যেও গুরুদাসের শিক্ষাচিন্তা অনেকখানি আভাসিত হয়েছে। এদেশে উচ্চশিক্ষার মান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মান কিভাবে উন্নয়ন করা যায়, গুরুদাসের পূর্বে আর কোনো ভাইস-চ্যান্সেলার সে সব কথা চিন্তা করেন নি। ১৮৯১ সালের কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনিই সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষাগুলির পঠন-পাঠনের প্রশ্নটি তুলেছিলেন। পরবর্তিকালে শিক্ষা সম্পর্কে তিনি দুখানি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছিলেন, যথা—১। **A Few Thoughts on Education** ও **The Education Problems in India**. প্রথম গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। এর ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন :

> "Education is one of the most powerful agencies in moulding the character and determining the future of individuals and of nations; and the question, how to regulate education so as to secure the best results, has engaged the attention of speculative thinkers and practical administrators in all ages and countries. At the present moment in India, that question is occupying a large share of public attention."

চৌষট্টি বছর পরেও দেখা যায় যে, স্যর গুরুদাসের এই সুচিন্তিত অভিমত তার মূল্য হারায় নি। লর্ড কার্জন এই বইখানি পাঠ করে একপত্রে (এই চিঠির তারিখ ডিসেম্বর ১৮, ১৯০৪) স্যর গুরুদাসকে লিখেছিলেন : "I have looked with extreme interest into your wise and practical examination of the sort of education that an Indian youth ought to acquire and the manner in which he ought to acquire it."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স নামক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গেও স্যর গুরুদাস চল্লিশ বৎসরকাল সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন এর সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট। এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা ও বাংলা দেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তক, স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৯০০ সালে একটি ব্যক্তিগত পত্রে স্যর গুরুদাসকে লিখেছিলেন : "I do not know how to thank you sufficiently for what you have done and are doing for the Science Association". প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর ব্যক্তিগত দানের পরিমাণও সামান্য ছিল না। এ ছাড়া, তাঁর কর্মের ক্ষেত্র ছিল আরো দুটি, যথা—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ইনস্টিটিউটের স্থাপনাকালে এর নাম ছিল 'সোসাইটি ফর দি হাইয়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন'। এর উদ্যোক্তাগণের অন্যতম ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও স্যর গুরুদাস। উনিশ শতকের ত্রাস্তিলগ্নে (১৮৯১) এই শহরের জাতীয় একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা একটি স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে গণ্য হওয়ার দাবী রাখে। সমকালীন বাংলার যুব-মানস গঠনে সেদিন এই প্রতিষ্ঠানটি কিরূপ সহায়ক হয়েছিল, সে-ইতিহাস সুপরিচিত। এর সূচনাকাল

থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যবিধি পরিচালনায় গুরুদাসের একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল এবং প্রধানত তিনিই ছিলেন এর প্রাণস্বরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই ইনস্টিটিউট বাঙালিকে দিয়েছে বাংলা থিয়েটারের নবযুগ প্রবর্তক শিশিরকুমার ভাদুড়িকে। নাট্যাচার্য স্বয়ং বলতেন, "আমার নট-জীবনের প্রথম প্রেরণা স্যর গুরুদাস।" এর সাহিত্যশাখার সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত গুরুদাসের অনুরোধেই। স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের পর, জীবন-সংগ্রামে দেশের তরুণ সম্প্রদায় কিভাবে অগ্রসর হবে, তারই প্রেরণা ও নির্দেশ জুগিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান এবং এইদিক থেকে গুরুদাস এর সাফল্যের জন্য যে প্রয়াস পেয়েছিলেন ও এর পিছনে যে সময় ও শ্রম নিয়োজিত করেছিলেন তাই ইনস্টিটিউটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। এর জন্মলগ্নে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন তার দুটি লাইন এই :

"চাহি না কোন উৎসব, নিত্যকর্মে যে গৌরব,
তাই যেন হয় লাভ, সাধি কার্য ধীরে ধীরে।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ২৯শে এপ্রিল ১৮৯৪ সালে (প্রধানত রমেশচন্দ্র দত্তের উদ্যোগে) স্থাপিত হয় এবং এর সূচনাকাল থেকেই স্যর গুরুদাস এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবেই সংশ্লিষ্ট হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এর কার্যনির্বাহক কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা, এফ্-এ, ও বি-এ পরীক্ষায় বাংলা প্রচলনের প্রস্তাব যখন সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হয়েছিল, তখন গুরুদাস স্বয়ং এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেন। মাতৃভাষা প্রসারের জন্য তাঁর চিন্তা ও কর্ম-প্রয়াস কতদূর আন্তরিক ছিল তা জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একখানি পত্র থেকে। কবি যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন পরিষদের পক্ষ থেকে স্যর গুরুদাস যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে। সেদিন তিনি বলেছিলেন: "রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে শুধু যে তিনি সম্মানিত হইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার কর্মভূমিও সম্মানলাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙ্গসাহিত্য পাশ্চাত্য জগতের চক্ষে উচ্চাসনলাভ করিয়াছে।"

আরো একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। সেটি হোল 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' বা জাতীয় শিক্ষাপরিষদ। লর্ড কার্জন অনুসৃত বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়াস্বরূপেই জাতীয় শিক্ষাপরিষদ ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে স্থাপিত হয়। এই পরিষদের 'মেমোরাণ্ডাম ও নিয়মাবলী রচনায় স্যর গুরুদাসের নিপুণ হস্তের নিদর্শন অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। উদ্যোক্তাগণের অভিপ্রেত ছিল: "National education on nationa lines entirely under national control." কিন্তু এইখানে গুরুদাস একটি বাক্যিক সংযোগ করেছিলেন "Standing apart from but not in opposition to the Government system."—অর্থাৎ তিনি এই কথা বলতে চেয়েছিলেন যে, জাতীয় শিক্ষা সরকারী শিক্ষ থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হবে, সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে সংকর ভাবাপন্ন হবে না। কিন্তু তার সঙ্গে কোনে বিরোধও করবে না। বলা বাহুল্য, উদ্যোক্তাগণ তাঁর এই সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ করেছিলেন বলেই না জাতীয় শিক্ষাপরিষদ উত্তরকালে সাফল্যমণ্ডিত হতে পেরেছে সেদিন ইংরেজ শাসকদের পরম বিশ্বাসভাজন স্যর গুরুদাসের কণ্ঠেই আমরা শুনেছি: "আমাদের দেশের বালক ও যুবকবৃন্দকে আমাদের মতানুযায়ী শিক্ষা দিব। উহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই এবং কাহারও বাধা মানিতে আমরা বাধ্য নই।"

শুধু কলিকাতায় নয়, কলিকাতার বাইরেও তাঁর কর্মের পরিধি বিস্তৃত ছিল। পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য যখন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন সর্বাগ্রে তিনি এই বিষয়ে স্যর গুরুদাসের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন ও তাঁর কাছ থেকে শুধু প্রেরণা নয়, পরামর্শও তিনি লাভ করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে নানাভাবে গুরুদাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর পণ্ডিত মালব্য বলেছিলেন:

"The Senate of Banaras Hindu University desires to place on record its sense of profound sorrow and loss at the death of Sir Gooroodas Banerjee who rendered invaluable services to the University by his advice and guidance and active cooperation from its very inception." শিক্ষাবিদ্ হিসাবে সেদিন স্যর গুরুদাস সত্যিই অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছিলেন।

এইভাবে জীবনের প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল স্বদেশ ও স্বজাতির অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করে, ১৯১৮ সালের ২৭। ডিসেম্বর এই কীর্তিমান পুরুষ লোকান্তর গমন করেন।

আজ যখন আমরা স্যর গুরুদাসের কথা আলোচনা করি, তখন দেখতে পাই যে, স্বদেশের প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি—শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কার ও নীতি—তাঁর প্রিয় ছিল, সেব্য ছিল, ধ্যানের বস্তু ছিল। সত্যিই তিনি কর্মে মহান্ ছিলেন; তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। যে সব প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন, তার প্রত্যেকটি তাঁর আন্তরিক সেবাদ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। অধ্যাপনা, আইন ব্যবসায় ও পরে উচ্চ রাজকার্যে ব্যাপৃত থেকেও সমস্ত দেশের সঙ্গে তিনি নানাসূত্রে জড়িত ছিলেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠা প্রচারের প্রবৃত্তি তাঁর আদৌ ছিল না। বিপুল কর্মশীলতার পিছনে যে মহাপুরুষ তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের যোগ্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সর্বদা ন্যায়-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন,—যে মহৎ হৃদয় পরহিতার্থে জীবন সমর্পণ করে প্রাণপণে ও নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করে ক্ষণেকের জন্যও ক্লান্তি বোধ করেন নি,—তাঁর গভীর ও সংযত এবং বিনম্র প্রকৃতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত,—সেই দিব্য দৃষ্টি, উদার হৃদয়, জাতীয় উন্নতিকল্পে সংযমীকৃত জীবন-নৈবেদ্য বাঙালির—ভারতবাসীর পরম আদরের জিনিস বলে গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হোল, এই সময়ের মধ্যে সেই মানুষটিকে আমরা কতটুকু মনে রেখেছি, বা তাঁর জীবনাদর্শের কতটুকু অনুশীলন করেছি? তাঁর সম্পর্কে তো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত আজ পর্যন্ত রচিত হয় নি। যাঁর 'জ্ঞান ও কর্ম' বইখানি পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র, আচার্য কৃষ্ণকমল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিগণ একবাক্যে প্রশংসা করেছিলেন, সেই গুরুদাসকে বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে কি অগৌরবের বিষয় নয়?

রামমোহন থেকে আরম্ভ করে যে কয়েকজন মনীষী ব্যক্তিকে নিয়ে বাঙালি জাতির গৌরব ও গর্ব, স্যর গুরুদাস তাঁদেরই অন্যতম এবং কোনো কোনো বিষয়ে তিনিই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বজন অন্বেষিত ব্যক্তি। তাঁর জীবনের মধ্যে তাঁর চরিত্রটাই বড়ো এবং এইটাই তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে, সমগ্র সত্তাকে করে তুলেছে জ্যোতির্ময়। তিনি কেবল ছিন্ন ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবিত। গুরুদাস আর যাই হোন, গতানুগতিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সজীব মানুষ, অর্থাৎ সেই মানুষ যার সম্পর্কে যোগবাশিষ্ঠে বলা হয়েছে: স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।"—তিনিই প্রকৃতরূপে জীবিত যিনি মননের দ্বারা জীবিত থাকেন। এই মনন জীবনই ছিল গুরুদাসের মুখ্য জীবন। এখানে তিনি বিদ্যাসাগরের সগোত্র।

গুরুদাস-চরিত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিল যেন একটি মহাযজ্ঞ। বিদ্যাসাগর স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রচনা করেছিলেন গুরুদাস-প্রশস্তি এই বলে: "তুমি খাঁটি মানুষ, তুমি খাঁটি ব্রাহ্মণ, গুরুদাস—আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি।" বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন: "গুরুদাস বাবুকে যদি চিনিতে হয়, তবে হিন্দুজাতিকে চেনা আবশ্যক।" কথাটি সত্য। কারণ তাঁর জীবনেতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, ভাঙনের যুগেও জন্মগ্রহণ করেও স্যর গুরুদাস চিরদিন হিন্দুত্বের অজেয় দুর্গে হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর সংস্কার, হিন্দুর ভাব অক্ষুণ্ণ রক্ষা করেছিলেন। আবার সেই একই সঙ্গে দেখতে পাই যে, তিনি প্রাচীর প্রাচীন ভাবের

সঙ্গে প্রতীচির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় করে স্বীয় জীবন-গতি নির্ধারিত করেছিলেন। তাঁর সমকালীন মনীষী বাঙালি সমাজে এই বিশেষত্বে তিনি ছিলেন অতুলনীয়—একেবর সূর্য বললেও চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী ছাত্র, ইংরেজি শিক্ষায় যুৎপন্ন-কেশরী গুরুদাস পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় আকণ্ঠ মগ্ন হয়েও আজীবন ব্রাহ্মণের ধর্ম, ব্রাহ্মণের স্বাতন্ত্র্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নি। যুগধর্ম তাঁকে নিজের আয়ত্ত করতে পারে নি। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই শুচিতা ছিল তাঁর আদর্শ, অথচ তিনি আদৌ শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ ছিলেন না। একা গুরুদাস যেন এক সহস্রে পরিণত হয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে তাঁর নির্মল নিষ্কলঙ্ক জীবনের আলো বিতরণ করে গিয়েছেন। নারিকেলডাঙার এক নিঃসম্বল বিধবার সন্তান স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে বাংলাদেশে কেমন করে অক্ষয় মনুষ্যত্বের ঘট প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, আজো কি আমরা তা অনুধাবন করব না?

গুরুদাস সর্বতোভাবেই স্বকীয়তার মানুষ। তিনি কার্লাইলের 'হিরো' নন, তিনি ভবভূতির 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনিকুসুমাদপি' মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবনের বহু ঘটনায় এর সাক্ষ্য মেলে। তাঁর জীবনের সাফল্যের মূলে ছিল ন্যায় নিষ্ঠা—অত্যন্ত কঠিন principle-এর মানুষ ছিলেন তিনি। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্যলাভ উপলক্ষে যখন কলিকাতায় টাউনহলে একটি মহতী সভার আয়োজন হয়, তখন ঐ স্মরণীয় সভায় (এই সভার তারিখ ৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) সভাপতিত্ব করবার জন্য স্যর গুরুদাসকে অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি সেই অনুরোধে রাজী হন নি; বলেছিলেন: "বিবেকানন্দ নাম গুরুপ্রসূত নয়। তাছাড়া শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের সন্ন্যাস দীক্ষায় অধিকার নাই। সুতরাং এসব শাস্ত্র বহির্ভূত ব্যাপারে আমি সভাপতিত্ব করিতে রাজী নই।" এ হোল নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ গুরুদাসের কথা, যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাস্নান করে পূজা-অর্চনা করতেন। কিন্তু মানুষ গুরুদাস? তিনি তো বিবেকানন্দের এই বিশ্ববিজয়ী কর্মপ্রয়াসকে অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন এবং তার প্রমাণস্বরূপ স্বয়ং ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। রামপতি ন্যায়রত্নের যখন পেন্সনের গোলমাল হয় তখন তার প্রতিকার করার জন্য তিনি গুরুদাসকে অনুরোধ করেন। তিনি তখন হাই-কোর্টের বিচারপতি, তাঁর মুখের একটি কথায় এই সামান্য কাজটা হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু গুরুদাস তা করেন নি। তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে তৎক্ষণাৎ এক চিঠি লিখে জানালেন: "উচ্চপদস্থ সাহেবদের সঙ্গে আমি কখনো ঘনিষ্ঠতা করি না, তাহাদের তোষামোদ করা তো দূরের কথা। তাই কাহারও জন্য তাহাদের কাছে সুপারিশ করিতে আমি অক্ষম। তবে যতদিন আমার হাইকোর্টে চাকরি থাকিবে, ততদিন আমি গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ প্রতিমাসে ত্রিশ টাকা আপনার শ্রীচরণে পৌঁছাইয়া দিব।"

এই আত্মমর্যাদাবোধ ছিল গুরুদাস-চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যখন একটি সরকারী কমিটি গঠিত হয়। তখন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল উক্ত কমিটিতে গুরুদাসের ন্যায় একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌কে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করতে চাইলেন ও এজন্য তাঁকে এক পত্রে অনুরোধও করেন। গুরুদাস সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে লর্ড কারমাইকেলকে লিখেছিলেন: "I have great doubt whether it would be proper for an ex-judge of the Bengal High Court to sit on an official committee under the presidency of one whose official rank is much below that of a High Court Judge. If I do so, I apprehend, I may compromise the dignity of the judicial office I had the honour of holding." (এই চিঠির তারিখ ২৫শে মে, ১৯১২)। তিনি যখন দ্বিতীয়বার ভাইস-চ্যান্সেলার হন, তখন ভারত সরকারের সঙ্গে গুরুদাসের প্রবল মতদ্বৈধতা ঘটেছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ বড়লাটের কাছে এক পত্র লিখে পদত্যাগ করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পরে সম্রাট সপ্তম

এডওয়ার্ডের অভিষেক উৎসবে স্যর গুরুদাসকে বাংলার প্রতিনিধিরূপে বিলাতে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন লর্ড কার্জন। স্যর গুরুদাস লর্ড কার্জনের মতো বড়লাটকে তার সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন। অথচ এই কার্জনই তাঁকে 'নাইটহুড' উপাধিতে ভূষিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে সুপারিশ করেছিলেন। আরো একটি দৃষ্টান্ত আছে। নিজের সম্ভ্রমজ্ঞান যেমন তাঁর ছিল প্রবল, তেমনি স্বজাতির মর্যাদাকেও তিনি কখনো ক্ষুণ্ণ হতে দিতেন না।

১৯০২. ফেব্রুয়ারি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় চ্যান্সেলার লর্ড কার্জন তাঁর বক্তৃতায় একস্থানে ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের শিথিলতার প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্যর গুরুদাস এবং তাঁর পাশেই বসেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতার অনুরোধে এই কার্জনী-কটাক্ষের প্রতিবাদ করেছিলেন সেদিন স্যর গুরুদাস। তিনি তখন হাই কোর্টের বিচারপতি—তাই তাঁর প্রবন্ধটি প্রধান সম্পাদকীয় হিসাবে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সম্পাদকীয়টির শিরোনামা ছিল: "Who is Liar?" এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছেন: "It was Dr. Gooroodas Banerjee who vindicated our national prestige, mainly at my request. I have seldom seen a man like him. He is indeed a man of great moral stature and deep integrity." নিবেদিতা অত্যুক্তি করবার মানুষ ছিলেন না। তাই গুরুদাস সম্পর্কে তাঁর এই অভিমতের যথেষ্ট মূল্য আছে।

গুরুদাসের সমগ্র জীবনেতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় যে, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, যশ, পদমর্যাদা যেন তাঁকেই অন্বেষণ করে বরণ করত, তিনি কখনো এ সবের জন্য লোলুপ হতেন না এবং যখন যশের পুষ্পমাল্য তাঁর কণ্ঠে অর্পিত হোত, ব্রাহ্মণ গুরুদাস সে পুষ্পমাল্য তাঁর অফিসের পোশাকের মতোই ছেড়ে ফেলতেন। জাতীয়তার একনিষ্ঠ সাধক, জাতীয় গৌরবের সদাজাগ্রত রক্ষক, জাতীয় মহত্ত্বের স্বপ্নে বিভোর, জাতীয় কল্যাণে উৎসর্গ জীবন, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেন দেশাত্ম-বোধের মূর্ত-বিগ্রহ। তিনি স্বদেশবাসীর সমবায়ে—বিরাট বিগ্রহে জাতীয়তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নিত্য তার পূজা করতেন। এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

বিদ্যাসাগরের ছিল চটি, গুরুদাসের খড়ম। স্বনামধন্য বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (ইনি স্যর গুরুদাসের জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন) বলতেন: "খড়ম পায়ে দিয়ে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে স্যর গুরুদাস যখন বসতেন, তখন তাঁর পবিত্র আত্মার জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে চারিদিকে আলোক বিতরণ করত।" কালের প্রান্তর অতিক্রম করে, সেই অপাপবিদ্ধ জীবনের আলোকচ্ছটা কি এযুগের বাঙালির জীবনে ও তাদের জীবনচিন্তায় প্রতিফলিত হবে না? বাঙালিকে আবার যদি চারিত্রশক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়, তা'হলে বিদ্যাসাগরের চটি আর গুরুদাসের খড়মকে আবার সযত্নে মাথায় তুলে নিতে হবে।

নববর্ষের সাহিত্য চিন্তা

মন্মথ রায়

সমাজ ও জাতির ভাবধারার ধারক ও বাহক—সাহিত্য। সাহিত্য জাতি ও সমাজের দর্পণই শুধু নয়, পথ নির্দেশের আলোকবর্তিকাও বটে, জাতি ও সমাজ থেকে অবিচ্ছিন্ন এই সাহিত্য। আজকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এটা ভাঙাগড়ার যুগ। ব্যষ্টির যুগ গিয়ে আসছে সমষ্টির যুগ। ব্যক্তিতন্ত্রের জায়গায় আসছে সমাজতন্ত্র। সারা দুনিয়ায় এই ভাঙাগড়া চলছে। চলছে আমাদের দেশেও। প্রচুরতম লোকের প্রকৃততম হিতসাধনই আজ গণতন্ত্রের লক্ষ্য, সমাজতন্ত্রের সাধনা। সাহিত্যিক সৌন্দর্যবোধ ও রসোপলব্ধির আজ তাই নতুন দিগদর্শন, নতুন মূল্যায়ন অপরিহার্য। আজ এই নতুন যুগে সেইটেই সুন্দর যা গোটা সমাজকে আনন্দে অনুপ্রাণিত করে, সেইটেই আনন্দ যা গোটা সমাজের কল্যাণ। সমাজকে বাদ দিয়ে আজ আমার 'আমিত্ব' নেই। সমাজকে বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্বই নেই আজ। কবির বাণীই আজ পরম সত্য: 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' আজ আমাদের সাহিত্য, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের চিন্তা, আমাদের কল্পনা, আমাদের স্বপ্ন—সব কিছুকেই গড়ে উঠতে হবে সমাজের কল্যাণে। আজকের জীবনে সমাজই সত্য, সমাজই শিব, সমাজই সুন্দর। আজ সত্য সত্যই, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। এই সত্য, এই শিব। এই সুন্দরকে প্রকাশ করাই আজ সাহিত্যের পরম ধর্ম, পরম দায়িত্ব এবং চরম লক্ষ্য। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে সাহিত্যের দায়িত্ব এবং কর্তব্য আজ কি নিদারুণ গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের জাতীয় সংহতি আজ বিপন্ন। খাদ্য আমাদের চরমতম সমস্যা। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে না পারলে আমাদের বাঁচবার পথ নেই আজ। স্বাধীনতা অর্জনের বিশ বছর পরেও আমরা আমাদের খাদ্যের জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী। দেশের খাদ্যে ভেজাল, এমনকি ঔষধেও ভেজাল। বিবেকবিহীন ধর্মাহীন দেশাত্মবোধ-বর্জিত এই সব কালোবাজারী মজুতদার মুনাফাবাজরা অন্তর্ঘাতী শত্রু—বাইরের শত্রুর চেয়ে এরা আরও ঘৃণ্য, আরও ভয়ঙ্কর। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে সব ঢলানিনাহী পরিকল্পনা চালু হয়েছে এবং হচ্ছে, তাতে ধনী হচ্ছে আরো ধনী, গরীব হচ্ছে আরো গরীব। এক শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি। স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে আজ আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও অনেকে আজ এ দল পরক্ষণেই অপর দলে গিয়ে শিক্ষা দীক্ষা এবং প্রতিশ্রুতি যেভাবে বিসর্জন দিচ্ছেন তা যেমন কৌতুকজনক তেমনি বেদনাদায়ক। ভেবে অবাক হতে হয় কাদের হাতে আজ আমাদের শাসনভার আমরাই তুলে দিয়েছি। কোন বিপদই বিপদ নয়, কোন সঙ্কটই সঙ্কট নয়; যদি জাতির দেশাত্মবোধ লুপ্ত না হয়, আচরণে সততা থাকে, কার্যে মনুষ্যত্ব থাকে। কিন্তু আজ চারিদিকেই নির্লজ্জভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে আমাদের আদর্শহীনতা। অতীতের মহাজীবনগুলির মহা আদর্শ আমরা বিস্মৃত। আধুনিক যুগের গান্ধী বিবেকানন্দ চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রের আদর্শও আমরা পদদলিত করছি। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি

গরীয়সী। কিন্তু এই জননী ও জন্মভূমির চেয়েও যা বড়, সেই মনুষ্যত্বই আজ আমাদের লুপ্ত হতে চলেছে। জাতির জীবনে এত বড় সঙ্কট আর কখনো আসেনি।

আমি জানি সাহিত্য আলোচনায় এই প্রসঙ্গ অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের আদর্শ ও লক্ষ্য আলোচনা করতে গেলে আধুনিক জাতীয় চরিত্রের এই আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়ছে। কার সাহিত্য? কার জন্য সাহিত্য? কী সাহিত্য আজ চাই? কী সাহিত্য আজ আবশ্যক—এসব প্রশ্ন অপরিহার্য।

প্রশ্ন এই, জাতির এই অধঃপতনে সাহিত্যিকের কর্তব্য কি? ভূমিকা কি? সাহিত্য কি শুধুই প্রেমলীলার বেসাতি করবে? যৌন আবেদনে পশুত্ব জাগ্রত করবে? জীবননিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে আদর্শবর্জিত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র সৃষ্টির সমারোহ করবে? জীবনের মূল্যবোধ নস্যাৎ করে বেপরোয়া জীবনযাত্রার জয়ধ্বজা হবে? তা যদি করে তবে আজ তা হবে দেশদ্রোহিতা, সমাজদ্রোহিতা।

আজ চাই সেই সাহিত্য যে সাহিত্য ঘনায়মান নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার আলো জেলে বলিষ্ঠ জীবনবোধ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করে—যে সাহিত্য দুর্নীতি ও ভণ্ডামির মুখোস উন্মোচন করে জাতিকে সচেতন ও সতর্ক হতে সাহায্য করে এবং যে সাহিত্য সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনায় জাতিকে অনুপ্রাণিত করে।

দারিদ্র্যই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ। আজ এই দারিদ্র্য দোষই আমাদের শতগুণনাশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য থেকে, সমাজের অপরিসীম ধন বৈষম্য থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ সমাজতন্ত্রের আশু প্রতিষ্ঠা। কি কংগ্রেসী, কি কম্যুনিস্ট—দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিও এই লক্ষ্য সম্পর্কে একমত। আমাদের সাহিত্যের লক্ষ্যও বিভিন্ন হবার কারণ নেই আজ। এ কর্তব্য পালন না করলে সাহিত্য হবে লক্ষ্যভ্রষ্ট, সাহিত্য হবে নিছক কলাবিলাস। আজ যখন আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন, ধ্বংসোন্মুখ, তখন সাহিত্য নীরব থাকতে পারে না। আজ আমাদের আত্মরক্ষার আর এক হাতিয়ার—সাহিত্য। এ সাহিত্য প্রচারধর্মী হবে সন্দেহ নেই, কোন্ সাহিত্যই বা প্রচার নয়? কিন্তু সত্যিকার সাহিত্যিক জানেন, সব সাহিত্য প্রচার হলেও, সব প্রচার সাহিত্য নয়।

সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ প্রচারণে দক্ষ সাহিত্যিকের অভাব নেই বাংলাদেশে। বাংলার প্রতিটি সাহিত্যিকের নিকট আজ এই আবেদন জানাই, তাঁদের সাহিত্য যেন জ্ঞানাঞ্জন শলাকারূপে জাতির চেতনা ও অবচেতন মনে অধঃপতনের দুই কতগুলি সম্পর্কে চৈতন্য সঞ্চার করে, জাতিকে সঙ্কট উত্তরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে, মনুষ্যত্বের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে, পরিত্রাণকে ত্বরান্বিত করে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যেন বলতে না পারে—রোম যখন রসাতলে যাচ্ছিল, বাংলার সাহিত্যিকরা তখন বসে বসে শুধু বাঁশী বাজিয়েছেন।

বহির্বঙ্গে বাংলা নববর্ষ

বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল

বহির্বঙ্গ সুদূর প্রসারী। তার একটি ক্ষুদ্র অংশ এই উত্তর প্রদেশটি। এতেও আবার চারটি বৃহৎ বাঙালী কেন্দ্র—বারানসী, এলাহাবাদ, কানপুর ও লখনউ। এদের প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক মান আলাদাই ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। আজ সেটি কী হয়েছে তা বলা নিরাপদ নয়—কারণ এতে মতভেদের অবকাশ আছে।

বারানসীতে ছিলেন সব বিরাট বাঙালী গায়ক, বাদক, শিল্পী, অভিনেতা, পণ্ডিত ও অবসর প্রাপ্ত গুণী সজ্জনরা। এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠাবান উচ্চ পদাধিকারীর কেন্দ্র ছিল, যেহেতু তখন হাইকোর্ট ও অন্যান্য উচ্চ সরকারী দপ্তর সবই ছিল সেখানে। অবশ্য নামকরা ডাক্তার, আইনজীবী ও ব্যবসায়ী সব স্থানেই প্রায় সমান। কানপুর মুখ্যতঃ ছিল ও আছে, কলকারখানার সমষ্টি, সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মানুষের ফুরসৎ নেই, তার ফাঁকে ফাঁকে তারা কিন্তু যথেষ্ট আনন্দের মাল মশলা আহরণ করে নিতে বা নেয়।

লখনউর বিষয়েই আমি সঠিক খবর দেবার অধিকার রাখি, কারণ স্থায়িভাবে বহুদিন এখানেই আছি। এটা হোল নবাবদের দেশ, বাঙালীরা ছিলেন একরকম সৌখীন, বড় বড় গুণীদের কদর করতেন। আমরা ছেলেবেলায় বিখ্যাত কত্থক নৃত্যবিদ বিন্দ্যা দীনের অদ্ভুত নৃত্য দেখেছি, তাঁর ভাই কালকাদীনের সরোদ শুনেছি, তার সঙ্গে চৌবরাটন, অচ্ছনবাঈর গান শুনেছি—এবং পরে পরে আরো অনেক কিছু। কিন্তু যদিও এটা গানের শহর বলে বিখ্যাত, এখানকার স্থায়ী কোনো বাঙালীকে সঙ্গীত অনুশীলন করতে দেখেছি বলে মনে হয় না—অবশ্য ১৯১৭ পর্যন্ত। বিস্তারিত পরে প্রবন্ধান্তরে, বলবার ইচ্ছা রইল।

বাংলা নববর্ষের বিষয়ে কিছু বলবার আগে দুটো ছোট্ট সংলগ্ন গল্প বলে রাখি, তাহলে আমার বঙ্গদেশীয় পাঠকদের কাছে মুখ রক্ষা হবে।

বিলাত থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমি বাড়ী ফিরি ১৯২৩-এর জুলাই মাসে। তখনকার দিনে একটা প্রায়শ্চিত্ত-প্রথার কথা এখানেও শুনলাম। বিদ্রোহ করে উঠলো আমার মন। স্থির করলাম খাস নবদ্বীপে গিয়ে বোরাপড়া করব—ওটা আমার মামার বাড়ী, বুড়োশিব তলায়। কিন্তু আমার বেশী খাতির ছিল, তারই পেছনে, আমার কাকাদের ভাদুড়ী বাড়ীতে। কাকা, আমার বাবার একমাত্র সিনীয়ার বন্ধুছেলে ৺সুরেন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন সাহেব মানুষ। তাঁর কাছে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহরে আমি মাসাবধি কাজ শিখলাম, বিলাত যাবার আগে সাহেবী আদব কায়দা শিখতে। ও বাড়ীতে এসব ভিক্টোরিয়ানী চলবে না, আমার স্থির বিশ্বাস ছিল—আর হোলও তাই। কেউ কিছু বলল না, সবই স্বাভাবিক অবস্থা!

দু' একদিন আরাম করছি, একদিন ভাক হরকরা এসে দাঁড়ালো, আমাদের পুরানো বিশ্বস্ত। তাকে দেখে বললাম, "দাদা পাকা হুক্কুকী খেয়েছ নাকি, তোমার বয়স যে বাড়ে না।" বিনয় সুরে উত্তর এলো, "তা কি হয় দাবু (দাদাবাবু) বয়স বেড়েই চলেছেন তো।" প্রশ্ন, "তা এখন কত হোল?" উত্তর, "তা হবেন বইকি, বেশ খানিকটে হয়েছেন।" প্রশ্ন, "তবু কত?" উত্তর, "তা মনে করগে, শান্তিপুরের বাগচীদের, ঐ তোমাদের পুঁটু দিদ খউর বাড়ী গো, তেনাদের পাজার যে বার আগুন দেওয়া হয় তখন আমি গুদুক খেতাম।" (কী চমৎকার বয়স নিরূপণ পদ্ধতি!)

বিভূতি ব'লে চললো, "ঐ যে ধীরেনবাবুর (ধীরাজবাবুর) বড় গাড়োয়ান, গফুর ভাই, সে তো আমারই দেশের লোক, মনে কর তার সাথেই আমি ছেলে বয়সে ভাংগুলি খেলেছি।" আমি বললাম, "সে তো থুত্থুড়ে বুড়ো, তার বয়স আর তোমার বয়স এক!" উত্তর শুনে কিছুক্ষণের জন্য যেন শ্বাসরোধ হ'য়ে গেল—"তা হবেন না? হবে বৈকি, তা হলেও সেই এক কুড়ি বড় হবে, কি আমিই এক কুড়ি বড় হব।"

যতক্ষণে নিশ্বাস আবার খুঁজে পেলাম, ততক্ষণে দুই সরস্বতী একটা প্রায় সরল বুদ্ধি যুগিয়ে দিলেন—নবদ্বীপ তো জয় করা হোল, এবার পৈত্রিক ভিটা "মেড়তলা" অভিযান কেমন হয়? বিভূতিকে বললাম, একবার গফুর মিঞাকে খবর দিতে।

গফুর এসে, পায়ের কাছের মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে, জানতে চাইল কেন স্মরণ করেছি। বললাম, "তোমার ঘোড়জুড়ী যদি ঠিক থাকেন, তাহলে আমাকে মেড়তলা ঘুরিয়ে দাও।" একগাল হেসে উত্তর দিল, "এ আর বড় কথা কী, তেনারা বেশ পুষ্টই আছে। কাল ভোর চাড়্ভের চল, ৯।১০ তার সময় তোমাকে পুরুত বাড়ী পৌছে দেবখন।" হতাশ হলাম, ১০ মাইলও নয়, তাই যেতে লাগবে ৪।৬ ঘণ্টা। এতো আমি হাসতে খেলতে দু ঘণ্টায় হেঁটে সারতে পারতাম! সম্বিৎ এলে দেখলাম, গফুর চলে গেছে। অগত্যা ভোর চাড়্ভেই বহাল রইল।

পরদিন, ভোর চারটের সময়, সামনেই ধীরাজ বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের আস্তাবলে গিয়ে দেখি, গফুর প্রায় তৈরী। পক্ষীরাজ দুটিকে দেখেই মায়া হোল, এদেশীয় যমুনাপারী রামছাগলের চেয়ে আকারে বড় নয়। আর গাড়ীটি দেখে খানিক থমকে দাঁড়ালাম—সত্যিই ঠিক পাল্কী, একটু এবু লম্বে ছোট। বললাম, "ও গফুর, আমাকে ধরবে তো!" স্থির কণ্ঠের উত্তর পেলাম, "তা হা-বু একটু খাটো হোয়ে থোসো, এঁটে যাবেখন।" তখনও আড়াই মনী আড়া ছিল না, তবে মাপে তো ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি! কোনো মতে দুমড়ে অনুপ্রবেশ করলাম। সঙ্গে আমার কাকার বড় ছেলে নরেন, সে কী করবে ভাবছে, এমন সময়ে গফুর বললো, "ঢুকে পড় ছোট হা-বু, হাঁটুর মদ্দি হাঁটু দিয়ে বসলেই ঢুলিয়ে যাবে।" দুর্গা ব'লে যাত্রা শুরু হোল—কেউ ভরসা দিল না, "পথের বিপদ কিছু নাই।"

মাইল ২।৩ গিয়েছি হঠাৎ হাঁক পাড়ল গফুর, "হাবুরা থীর হ'য়ে বোস, ছুটুই আছেন।"—সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঝড়াম্ ক'রে উঠলো গাড়ীখানা, মাথা দুটিই ছাতে বাধা পেয়ে কিছু ব্যথা ও খানিক ধূলা সংগ্রহ ক'রে স্বস্থানে ফিরে এলো। আবার মাইল দুই গিয়ে বলে, "হাবুরা একটু নামো দিকিন, ধুরো এইকে গেছেন।"—নেমে দেখি চাকা চারটি হাওয়ায় ঘুরছে, ঘোড়া দুটি দুদিকে ঘর্মাক্ত কলেবরে দাঁড়িয়ে।

গাড়ীটিকে উদ্ধার করে, গফুরের নির্দেশে, একটি গাছতলায় আশ্রয় নিলাম দু ভাই। গফুর ঘোড়াদের "রাতিব" দিয়ে, নিজে মুড়ি এবং কালো কিছু গুড়, তেবাসী পকার বা আনন্দ লাড়ু নিয়ে, ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল "নাস্তা" করতে। আমরা "বোর" বোধ করলাম। শেষে গফুরের কাছে গিয়ে অমনিই জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের মোহরম কবে?"

গফুর টান হ'য়ে ব'সে বলল, "ও-সব শুক্নো ভ্যাড়ায় আছাড় খেয়ে কী হবে - বরং ওদোও ভামাপূজা করে, সরস্বতী পূজা করে, দোল দুর্গোচ্ছবের খবর চাও দিতি পারি—তাতে দু পয়সার মুখ দেখতে পাই, বৌ ছাওয়াল পেট্ভা ভরে খেতে পায়—জামা জোড়া গায়ে ওঠে—বাবুদের ও ভালো সেরস্তর দয়ায় কাপড়ডা সাড়ীডা মেলে।"

ঠিক এই মনোভাব, বোধকরি সেদিন বহির্বঙ্গে বাঙালীদের ছিল। বহুদের কথা তো বলতে পারি না—

আমরা ছোটরা তখন উপরোক্ত পার্বণগুলিতে আদৌ আনন্দ পেতাম—খাওয়ার বৈচিত্র্য, নব পরিধান, নতুন জুতো ইত্যাদি তো মিলতই, উপরন্তু নাচগান, থিয়েটার, অনিয়ন্ত্রিত যাতায়াত স্বাধীনভাবে উপভোগ করতাম।

বাংলা নববর্ষ যে একটা ছিল, তার প্রমাণ পেতাম নতুন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা থেকে। তখন এটির পূজা হোত, বাতাসা প্রসাদ মিলত, এবং সেটি ঠাকুর ঘরে রাখা থাকত। যাত্রা, বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে পুরোহিত যখন পাঁজী দেখতে চাইতেন, তখন স্নান ক'রে মা ঠাকুমা সেটি হাতে নিয়ে ভক্তি ভরে মাথায় ঠেকিয়ে হস্তান্তর করতেন এবং অনুরূপ প্রক্রিয়ায়, কাজ সারা হ'লে রেখে দিতেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে কী আনন্দ, দু বাটি ছাতু পাওয়া যেত। একটি জবের, দৈ ও গুড়ে মাখা, অন্যটি ছোলার, ঘি ও চিনিতে জব্জবে। তারও আগের দিনের কথা মনে আছে যখন পুত্রবতীরা শিবের ঘরে বাতি দিয়ে জল খেতেন। বলা বাহুল্য জল খেতেন না যেন ক'রকমের ফল ও কাঁচা মিষ্টিও থাকত—আমাদের ভাগেও একটু আসত বইকি।

বাংলা-নববর্ষের প্রকৃত আবির্ভাব, লখনউ শহরে হোল প্রায় ১৯২৪ সালে। তখন এখানে ইউনিভারসিটি হ'য়েছে। বাংলা থেকে এসেছেন রাধাকুমুদ, রাধাকমল, মূর্জটি প্রসাদ, ভূজঙ্গ চরণ দাস ও নির্মল সিদ্ধান্ত প্রমুখ সুধীবৃন্দ, সেখানে স্থায়ী শিক্ষকরূপে। আমাদের পাড়াতেই তাঁদের তখন বাস। অতুল প্রসাদ গান বাঁধলেন। সাড়া প'ড়ে গেল।—প্রথম নববর্ষ বৈঠক হোল যুবক সমিতিতে (B. Y. A.)। অতুল প্রসাদের গান ক্রমে প্রচারিত হোল :—

নূতন বরষ, নূতন বরষ, তব অঞ্চলে ওকি ঢাকা ?
মিলে নাই যাহা, হারায়েছে যাহা
তাই কি যতনে রাখা ?
দীনের লাগিয়া এনেছ কি দান
ধনীর লাগিয়া এনেছ কি প্রাণ
অলসের লাগি এনেছ কি শ্রম
সুখের লাগি আশা ?
আশায় বসিয়া আছেন জননী
তাঁর লাগি তুমি কী এনেছ ধনি
শিখাবে কি তাঁর অতীতের গানে
সজলে চাহিয়া থাকা !
আসিবে কি হেথা প্রেমের শাসন
তুচ্ছের লাগি উচ্চ আসন
শিখাবে কি হেথ গরব পাসরি
ভাই বলে ভাইয়ে ডাকা !

এই গানটি এতাবধি বাংলা নববর্ষে, প্রভাতী নগর সংকীর্তনরূপে প্রচারিত হ'চ্ছে এখানে। এখন ঐ দিনে নানাস্থানে অভিনয়, সঙ্গীত, জলসা এবং কোথাও বা মিষ্টান্ন পরিবেশিত হয়। প্রায় গৃহস্থই একটু ভালমন্দ আহারে প্রবৃত্ত হন, অবস্থানুযায়ী।

বহির্বঙ্গের বাঙালী আজ আর মূল বাংলা থেকে দূরে নেই। তারা বাংলার ঐতিহ্য বহন বা বরণ করে বৃহত্তর বঙ্গের স্রষ্টা।

নববর্ষের ব্রত

শ্রীবিশংকর

উষা আভাহি.....
সৌভগং মূজ্জংতী হিবিরীষু

বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠে নববর্ষের প্রার্থনা উচ্চারিত হ'লো। নিরানন্দ দূর করে আনন্দ আনো, উষা অন্ধকার নাশ ক'রে এসো জ্যোতিতে। দিনে দিনে আনো তুমি সৌভাগ্য সম্পদ।

সৃষ্টির আদি থেকে নববর্ষের প্রথম দিনে বিশ্বস্রষ্টা সূর্যোজ্যোতির প্রার্থনা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

প্রাচীন ভারতে শ্রাবণ মাসকে বছরের প্রথম মাস হিসাবে গণ্য করা হ'তো। এ মাস সূর্যের দক্ষিনায়ণ যাত্রাকাল। বর্ষা ঋতু থেকেই বর্ষ সুরু। সোমসং বসুতে বর্ষ।

ঋকবেদের যুগে ঋষিরা হিম ঋতু ও শরৎ ঋতু বছরের প্রথম ঋতু বলে মেনে নিয়েছিলেন। আর্যযুগে মাঘোৎসব ও বসন্তোৎসব প্রাধান্য পেয়েছিল। খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে শরৎ বর্ষের প্রথম মাস ছিল অগ্রহায়ণ। মধ্যযুগে বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের প্রথম মাস হিসাবে গণ্য করা হ'য়েছে। সংস্কৃতে অগ্রহায়ণের অপর নাম মার্গশীর্ষ। গীতায় আছে, 'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং ঋতুনাং কুসুমাকরঃ।'

মঙ্গোলিয়, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে প্রাচীন বাঙালী জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। আলপাইন জাতিও বাংলাদেশে বাস করতো। পরবর্তিকালে নবাগত আর্যদের সঙ্গে এরা মিশে গিয়েছিল। আমাদের দেশের পূজা, অর্চনা, উৎসব সব কিছুই আদিবাসীদের দান।

বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা নিজেদের কৃষিভিত্তিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। উত্তরবঙ্গের কোচ সমাজেই লৌকিক শৈব ধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হ'য়েছিল। প্রাচীন বাঙালীরা ছিলেন সূর্যের ও অগ্নিদেবতার পূজারী।

বীজ বোনা ও আহার্য সংগ্রহের সময় দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য উৎসবাদির প্রচলন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই রয়েছে।

বাঙলাদেশে শকাব্দবর্ষের প্রথম মাস বৈশাখ। নববর্ষ পহেলা বৈশাখ নানা জনে নানাভাবে প্রতিপালন করেন। পহেলা বৈশাখ শুধু বাঙালীরই উৎসব নয়। শিখেদেরও উৎসব। এই দিনে দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়কে অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে শিখ খালসা সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন।

১লা বৈশাখ আমাদের কাছে এক পবিত্র দিন। বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালীরা এই দিনে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতেন, পহেলা বৈশাখ ছিল বহ্নেমাতরম দিবস।

বৈশাখ মাস পূর্ণমাস। এই মাসে পূজা পার্বন ও ব্রতের অন্ত নেই। বাংলার ব্রতকথা বাঙালীর একান্ত নিজস্ব। ঋগবেদের যুগে ব্রতানুষ্ঠান হ'তো না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় যুগেও এই অনুষ্ঠানের

প্রচলন ছিল না। ব্রতিনীদের উচ্চকোটীর লোকেরা নিন্দা করতেন। বাংলাদেশে আদিম সংস্কৃতির সঙ্গে পরবর্তিকালে আর্য সংস্কৃতির মিশ্রণে ব্রতের উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে ব্রতকথা ভিত্তি করেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন হ'তেই বাংলাদেশে নানান উৎসব সুরু হয়। গাজন উৎসব মূলতঃ কৃষি উৎসব। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ উৎসব। আদিমবাসীদের দৃঢ় ধারণা ছিল সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ দিলে পৃথিবী শস্যে, ফলে, ফুলে ভরে উঠবে। শিব ও পার্বতী, সূর্য ও পৃথিবী সবাই অভিন্ন। সৌরজগতকে বন্দনা করা হচ্ছে সেই আদি যুগ থেকে।

আমাদের দেশে বৈশাখ মাসে নানান ব্রতের প্রচলন রয়েছে। মেষারাশীর ব্রত পহেলা বৈশাখ হ'তে সুরু হয়। মেয়েরা মনে করেন মেষারাশীর ব্রত করলে মেঘ সন্তুষ্ট হয়। অজন্মা হবে না। মেষারাশীর কুলো মাথায় নিয়ে ব্রতিনীরা বাড়ী বাড়ী গান করে। নাচ দেখায়। গানের শেষে এক কলসী জল ঢেলে দেয় বাড়ীর উঠোনে। ছিটিয়ে দেয় গোলা ঘরে। জল বৃষ্টির প্রতীক। গৃহস্থরা ব্রতিনীদের দেন চাল, তেল, সিঁদুর, পান, সুপারী।

এক মায়ের এক ঝিই হবে প্রধান ব্রতিনী। তিনটি কুলো ও ঘট ব'য়ে নিয়ে যায়। পর পর চার বছর এই ব্রত উদযাপন ক'রে থাকে। মেঘকে উদ্দেশ্য ক'রে সবাই গান ধরে—

ঘরে লো বুন ম্যাঘারাণী
হাত পাও ধুইয়া ক্যালাও পানী।
হেই বৃষ্টি লামালো ঝাঁকে ঝাঁকে।
কালা মাথা ধইলা মাথা বাড়ী আছ নি,
গোলায় আছে বীজ ধান বুনাইতে পারনি।
হেই বৃষ্টি লামালো ঝাঁকে ঝাঁকে।
ঘরে লো বুন ম্যাঘারাণী।

মেষারাণী ব্রতের সঙ্গে জলপাইগুড়ির রহুমা বা বরুণদেবের পূজার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে মেয়েদের এই অনুষ্ঠান পুরুষেরা দেখতে পান না। শোনা যায় নগ্ন অবস্থায় মেয়েরা বরুণদেবকে আহ্বান জানান—তুমি এই পৃথিবীকে তোমার জল দিয়ে শীতল কর।

তিস্তা বুড়ির বা লক্ষ্মীর পূজাও আকাশকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়। মূর্তি তৈরি ক'রে তাতে সিঁদুর মেখে নতুন বস্ত্রে আবৃত ক'রে ব্রতিনীরা বাড়ী বাড়ী ঘোরে, পরে গৃহস্থের উঠোনে মূর্তি স্থাপন ক'রে জল ঢেলে উঠোন ভিজিয়ে ব্রতিনীরা নাচে আর গান গায়।

তিস্তাবুড়ি শস্যের দেবী। বীজ রোহণ থেকে এই গান সুরু হয়। মেয়েরা আকাশ দেবতাকে পূজা করেন। পৃথিবীর সঙ্গে বিবাহ দেন।

বৃক্ষ পূজা মেয়েরা এই কারণেই করে। গাছ এখানে পৃথিবী। পহেলা বৈশাখ মেয়েরা অশ্বত্থ-নারায়ণের ব্রত করেন। পর পর চার বছর এই ব্রত পালন করতে হয়। হাতে পাতা নিয়ে ব্রতিনীরা জল বেঁধে নদী বা পুকুরে যায়। অশ্বত্থ পাতা মাথায় নিয়ে তারা স্নান করে ও গান গায়—

আই আই নারায়ণ তুমি আই ব্রাহ্মণ
আমি তোমার ব্রত করি।

সুখ সম্পদ দাও হে হরি।
চাকদি সুন্দরী কন্যা, ভাই পাণ্ডবের ঝি,
সাত বেটা যায় সাত ঘোড়াতে।
সাত বৌ যায় সাত দোলাতে।
রত্নাসনে গিন্নি যায়।
গজ অশ্বে কর্ত্তা যায়।
হর পার্বতী বলেন উপর থেকে
নর লোকেরা অশ্বত্থ নারায়ণের ব্রত করে।
এ ব্রত করলে কি হয়?
মহাদেবের মত শ্বশুর পায়, গৌরীর মত শাশুড়ী পায়,
রামের মত স্বামী পায়, লক্ষ্মণের মত দেবর পায়,
সীতার মত জা পায়।

বৈশাখ মাসে পুণ্যি পুকুর ব্রত মেয়েরা স্বামী পুত্র কন্যার মঙ্গলার্থে ক'রে থাকেন। বাড়ীর উঠোনে এক চার কোণা পুকুর তৈরি ক'রে পহেলা বৈশাখ থেকে সক্রান্তি পর্যন্ত তাতে প্রতিদিন জল তুলে দিয়ে প্রার্থনা করেন।

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে পুজেরে সকাল বেলা,
বাজিয়ে শঙ্খের ধ্বনি,
ব্রত করে এয়োরাণী,
এক গলা গঙ্গার জলে
স্নান দিও শিব পদতলে,
এ পুজলে কি হয়?
নির্ধনের ধন হয়।
পৃথিবীতে ধরবে না
যমের জ্বালা পাবে না।
এ পুজলে কি হয়?
স্বামী-আদরিণী হয়।
তুলসী তুলসী নারায়ণ,
তুমি তুলসী বৃন্দাবন।
তোমার দিয়ে ঢালি জল
মরণকালে দিও স্থল।

দশ পুতুল ব্রতও এই একই ভাবে মেয়েরা বৈশাখ মাসে করেন। সুরু হয় মহাবিষুব সংক্রান্তিতে। পর পর চার বছর করতে হয়। পিটুলি দিয়ে দশটি পুতুল তৈরি ক'রে পূজা করে আর গান গায়—

সীতার মত সতী হব, রামের মত পতি পাব।

লক্ষ্মণের মত দেবর পাব, দশরথের মত শ্বশুর পাব।
কুন্তির মত পুত্রবতী হব, দ্রৌপদীর মত বঁাদুনী হবো।
সতীর মত সোহাগী হব, পৃথিবীর মত ভার সবো।

বৈশাখের হরিচরণ ব্রত মেয়েরা স্বামী সন্তানের কল্যাণার্থে ক'রে থাকেন। পহেলা বৈশাখ থেকে ব্রতিনীরা পেতলের থালায় চন্দন দিয়ে হরির চরণ এঁকে সারা মাস ধরে পূজা করে আর গান গায়।

আপনাকে সুন্দর চায়, রাজ রাজেশ্বরী স্বামী চায়।
গিরিরাজ বাস চায়, দশরথের মত শ্বশুর চায়।
যেনকার মত মা চায়, দুর্গার মত আদর চায়।
বসুমতীর মত ক্ষমা চায়, ঘরবাড়ি আলো বেটা যায়।

সাধারণতঃ কুমারীরা এই ব্রত উদযাপন করে। কুমারী ব্রতও শিব পূজা ছাড়া আর কিছু নয়, অনেকে শিব তৈরি ক'রে সারা বৈশাখ মাস পূজা করে।

শিবের মাথায় জল দিয়ে বলে—

আকন্দ বিল্বপত্র আর গঙ্গা জল
এই পেয়ে তুষ্ট হও ওগো মহেশ্বর।

মায়েরা মেয়েদের ছোট থেকেই শেখায়—

হবে পুত্র মরবে না,
পৃথিবীতে এক ফোঁটা চোখের জল পড়বে না,
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে, মরণ যেন হয় গঙ্গা জলে।

বিবাহিতারা বৈশাখ মাসে করে সন্ধ্যামণি ব্রত। চার বছর করতে হয়। রাতের আকাশে সাতটি তারা দেখা দিলে মেয়েরা উঠোনের মাঝে ঘর কাটে। সাতটি পুতুল রেখে ফুল দুর্বা নিয়ে পূজা করে। সৌরজগতকে বন্দনা করে ব্রতিনীরা।

সন্ধ্যামণি কনকতারা সন্ধ্যামণি জলের ধারা।
সন্ধ্যামণি করে কে?
সাত ভায়ের বোন যে
আলো ধানে কাল পুতে, জন্ম যায় যেন এয়োতে।
এ ব্রত করলে কি হয়?
শিব সম স্বামী পায়, লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়।
অন্ন বিজয়ী হাসী পায়, গোহাল ভরা গরু পায়।
কৌটা ভরা সিন্দুর পায়।

গোকাল ব্রত পহেলা বৈশাখ থেকে সুরু। চার বছর ক্রমান্বয়ে এই ব্রত মেয়েরা ক'রে থাকে। কৃষিভিত্তিক সমাজে গরু ভগবতী স্বরূপ। ব্রতিনীরা শিং-এ তেল মাখায়। দুলুদ জল দিয়ে শিং ধুইয়ে দিয়ে

নতুন বস্ত্র দ্বারা মুছিয়ে দেয়। কপালে সিঁদুর ও চন্দনের ফোটা দেয়, চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়ে দেয় ব্রতিনীরা সবাই গলবস্ত্র হয়ে ভগবতীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানায়।

কীটদংশক দূর হোক।
দূর হোক রোগ শোক।
তোমায় ঘুরিয়ে পাখা।
আমার হোক সোনার শাঁখা।
তোমায় বাতাস করে
আমার সতীন যেন মরে।

নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত বৈশাখ মাসে শুক্ল-পক্ষের চতুর্দশ তিথিতে পালিত হয়। ঘর্মঘট ব্রত বৈশাখ মাসের বিষুপদী সংক্রান্তিতে সমাপন। একটি জলপূর্ণ কলসী প্রতিদিন উৎসর্গ ক'রে ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। কল্পিনী দ্বাদশীব্রত বৈশাখের শুক্লা দ্বাদশীতে মেয়েরা উপবাস ক'রে লক্ষ্মীনারায়ণের ব্রত কথা শোনেন। অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান হয়। সীতানবমীব্রত সুরু হয় শুক্লা নবমীতে। পরদিন ব্রতিনীরা জানকীর পূজা ক'রে ব্রত কথা শোনে, উমা মহেশ্বর ব্রত শুক্ল পক্ষের চতুর্দশীতে উদযাপিত হয়। এই ব্রতের ফলে বৈধব্য দোষ দূর হয়। বৈশাখ চম্পক ব্রত মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ হয়। পর পর চার বছর এই ব্রত মেয়েরা ক'রে থাকে।

এ-ছাড়া বৈশাখ মাসে মেয়েরা কলদান ব্রত, মিষ্ট সংক্রান্তি ব্রত, ব্রাহ্মণাধার ব্রত, হাড়িব সংক্রান্তি ব্রত, কলাছড়া ব্রত, মধু সংক্রান্তি ব্রত, আইত সংক্রান্তি ব্রত, আদের সংক্রান্তি ব্রত, পৌর্ণমাসী ব্রত, ধন গহান ব্রত প্রভৃতি পালন ক'রে থাকে।

রাঢ় বাংলায় নববর্ষোৎসব

ডঃ অমলেন্দু মিত্র

টেবিলে গোটাকতক হালখাতার লাল চিঠি এসে জমেছে। আর কয়েকটা ছবি আঁকা, সুদৃশ্য নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপক কার্ড। গ্রাম থেকে বাগ্‌দী জাতীয় চাষী এসেছিল। সে বললে, "হালখাতার নেমন্তন্ন বুঝি? কিন্তু বাবু ঐ সাদাগুলো কি?" তাকে বুঝিয়ে বললাম, নববর্ষের রীতি। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের এরকম হয় না?" "না বাবুমশাই, উ-সব আমাদের নাইকো। এসিনে (আশ্বিন) মা দুগ্‌গো আর 'এখোন'—এই আমাদের পরব।" "তোমরা দুর্গাপূজা কর?" "নাঃ, ঐ গাঁয়ে বাবুদের বাড়ীতে হয়, তাই বলছিলাম।" "নূতন কাপড় কেনো? "তা কিনি বাবু। তবে আমাদের ঐ 'এখোন'-ই বেশী।"

চাষী চলে গেল। 'এখোন' নিয়ে বসলাম। কথাটা নূতন করে ভাবিয়ে তুলল। রাঢ় অঞ্চলের শত শত গ্রামাঞ্চলে পর্যটন করে 'এখোন' কি তা আমি জানি; কিন্তু বুঝি না। এ কথায় পরে আসছি। গোড়া থেকে আলোচনা না করলে জিনিসটা পরিষ্কার করতে পারব না।

উৎসবের প্রয়োজনীয়তা মানুষ যুগযুগান্তর থেকে অনুভব করে এসেছে। আজকের যুগে উৎসবগুলির মূল প্রেরণার কেন্দ্র হল আনন্দ সৃষ্টি। কিন্তু অতীতে এমন একটা যুগ ছিল, যখন মানুষ উৎসব করেছে বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে। আদিম ট্রাইবাল সমাজে উৎসবগুলি ছিল কতকগুলি যাদুবিশ্বাস কেন্দ্রিক। কৃষিবিদ্যার আদিম পর্যায়ে যাদুবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা মানুষের মনে প্রবলভাবে ক্রিয়া করেছে। সেই বিশ্বাস আজও প্রায় অবিকৃতই রয়ে গেছে বলা চলে। পরবর্তিকালে ধর্মীয় চিন্তা যুক্ত হওয়ায় উৎসবগুলি বহুমুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলতঃ উৎসবগুলিকে কয়েকটি মোটমুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) শস্য উৎপাদনমূলক (২) সন্তান জন্ম ঘটিত (৩) রোগব্যাধি, ভূতপ্রেত বিতাড়ন সংক্রান্ত (৪) ধর্মীয় (৫) অন্য উৎসব। শেষের দুটি উৎসব বহু পরবর্তিকালের, অর্থাৎ মানুষ যখন উন্নততর ভাববাদী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।'

সমৎসর ধরে আমরা যতগুলি উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকি তার মধ্যে অধুনা নববর্ষোৎসব অন্যতম। ১লা বৈশাখই এই উৎসব পালিত হয়, যেমন খৃষ্টানরা ১-লা জানুয়ারী নববৎসর উদ্‌যাপন করে থাকেন। ১-লা বৈশাখ নববৎসর-উৎসব পালন করা হলেও একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এই উৎসব একান্ত বাহ্য ব্যাপার। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে কোনো যোগ এর নেই। প্রাচীন পুঁথি, চিঠিপত্র এবং অধুনা গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনে এর বিন্দুবিসর্গও পরিচয় পাওয়া যায় না। লিখিত প্রমাণ না থাকলেও মানুষের ভিতর ধারাবাহিকভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়া আচার ব্যবহারের পরিবর্তন সহজে হয় না। কিন্তু সে প্রমাণ দুর্লভ। নববৎসর পালনের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যথা, তৈজসপত্রাদি মার্জনা, গৃহসংস্কার, নববস্ত্র পরিধান, শুচিতা বিধান ও আত্মশুদ্ধি, পরবৎসরের জন্য কল্যাণ কামনা, পুরাতন বৎসরের জীর্ণ যা কিছু তাকে ফেলে আসার বিধি, ইত্যাদি। এগুলির কোনোটিই ১-লা বৈশাখ পরিদৃষ্ট হয় না। (১) এদিকে এসে জড় হয় ব্যবসায়ীদের লাল চিঠি এবং আলোকপ্রাপ্ত বান্ধবশ্রেণীর মুদ্রিত অভিনন্দনজ্ঞাপক কার্ড। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে নববর্ষোৎসবের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। পঞ্জিকায় উদ্ধৃত বচন অনুসারে নববর্ষারম্ভে প্রতি গৃহে ধ্বজা রোপণ করিতে হইবে। কিন্তু এই নির্দেশ কতদিনের ও ইহার মূল কি জানি না। এই নির্দেশ পালনের কোনো নিদর্শনও দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ীরা যে হালখাতার উৎসব অনুষ্ঠান করেন তাহা সাধারণতঃ পয়লা বৈশাখে অনুষ্ঠিত হইলেও কেহ কেহ অক্ষয় তৃতীয়া প্রভৃতি পবিত্র দিনেও ইহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ব্যবসায়ী মহলে সীমাবদ্ধ এই উৎসবকে ঠিক জনসাধারণের নববর্ষ-উৎসব বলা যায় না। তবে বর্তমানে পশ্চিমের আদর্শে বাংলাদেশে সর্বজনীন নববর্ষোৎসব গড়িয়া উঠিতেছে।" (২) এই প্রসঙ্গে মনীষী যোগেশ রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের বক্তব্যও উল্লেখ্য "আমরা ১-লা বৈশাখ বৎসর ধরিতেছি; কিন্তু এই রীতি বেশীদিনের নয়। মাত্র ১৬২৯ বৎসর পূর্বে ২৪১ শকে ইং ৩১৯ সাল ইহার আরম্ভ হইয়াছে। তাহাও ভারতের সর্বত্র নয়। তখন হইতে আমাদের বর্তমান পাঁজির গণনা চলিতেছে। সে সময়ে চৈত্র-বৈশাখ, বসন্ত ও আশ্বিন-কার্তিক,

---

(১) শ্রীমনোজিৎ বসুর "রচনা ভারতী" পুস্তকে আছে, "পল্লীগ্রামে এই দিনটিতে এখনও বাস্তু দেবতা ও গো-পূজার প্রচলন আছে।" কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গও রাঢ় অঞ্চলে আমি খুঁজে পাইনি। পুরোহিত দর্পণ অনুসারে বৈশাখ মাসে হিন্দুদের যে সকল কৃত্যাদি আছে তা নববর্ষোৎসব নয়। সেগুলির কারণ ভিন্ন ভিন্ন।

(২) "বাংলার পালপার্বণ" (বিশ্বভারতী) পৃঃ—৭

শরৎ ; এইরূপ হইত। এখন ঠিক তাহা হয় না।"(৩) তিনি আরও হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ঋগ্‌বেদের ঋষিরা হিমন্তু থেকে বছর গণতেন। তাছাড়া শরৎ ঋতু থেকেও আর এক বৎসর গণনা সুরু হয়। অগ্রহায়ণ মাসকে সেকারণে মার্গশীর্ষ মাস বলা হত। অগ্রহায়ণই ছিল শরৎ বর্ষের প্রথম মাস। সে প্রায় খৃঃ পূর্ব ৪০০০ বছর আগের কথা। কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা হয়। সে সময়েও এক নূতন বর্ষ আরম্ভ করার বিধান ছিল। শরৎ ঋতুর বর্ষারম্ভ, বিজয়া দশমীর দিন থেকে সুরু হত এবং ঐদিন নববর্ষ প্রবেশের পূর্বে যে সমস্ত আচার ও কৃত্য পালনীয় তা পরিষ্কারভাবে আজও টিকে আছে। শারদোৎসবের বয়স খুব অল্প নয়। বিদ্যানিধি মশাই দেখিয়েছেন, সাড়ে ছয় হাজার বছর ধরে এই উৎসব চলে আসছে। বোম্বাই ও গুজরাট প্রদেশের লোকে কার্তিক শুক্ল প্রতিপদে নূতন বৎসর গণনা করে। তারা মনে করে দীপান্বিতা নববর্ষের পূর্বরাত্রির উৎসব।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নববর্ষ কোনো নির্দিষ্ট তারিখে যুগ যুগ ধরে পালিত হচ্ছে না। কালে কালে তারিখ বদল হয়ে গেলেও রীতি নীতির সাক্ষ্য পূর্বাপর বজায় আছে। গ্রাম বাংলার নববর্ষোৎসব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমরা সংস্কার ও বিশ্বাসের কথায় এসে পড়ি। দুর্গোৎসব, হোলি এই দুটি উৎসবই গ্রাম বাংলায় কেন, ভারতের বহুস্থানে সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। অনেকেই জানে না, এগুলি নববর্ষোৎসব। এখন ধর্মীয়ভাব এগুলির মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। সুদূর অতীতে এইদিনগুলির তাৎপর্য, বাস্তব প্রয়োজনভিত্তিক ছিল। গুজরাটের গর্বা উৎসবও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ছিদ্রযুক্ত হাঁড়ির ভিতর প্রদীপ রেখে নারীরা চতুর্দিক বেষ্টন করে নৃত্য করে। বিদ্যানিধি মহাশয় লিখেছেন, "হাঁড়ির শতছিদ্র পথে রশ্মি বাহির হইতে থাকে, যেন সূর্য। নববর্ষের সূর্যই গর্ভ। নবরাত্রের অন্তে নববর্ষের সহিত নবসূর্য উদিত হইবে।"(৪) বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে শরৎ পূজার নমুনা পেয়েছি। এখন তার আসল রূপ নাই। অনুমান করা অসঙ্গত নয়, গুজরাটের ধরনের নববর্ষোৎসব এখানেও উদ্‌যাপিত হত। আজ অবলুপ্ত প্রায়। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নববর্ষ পালনের একটি উদাহরণ দিয়েছেন— "জয়পুর অঞ্চলে পাঞ্জাবের মধ্যে নববর্ষ উপলক্ষে একমাস ধরে অবাধ যৌন-মিলনের উৎসব চলে।"(৫) সাঁওতালদের বাঁধনা পর্বেও অনুরূপ ব্যাপার আছে। এই পর্ব কার্তিক থেকে পৌষ পর্যন্ত দানভেদে হয়ে থাকে। এটিই তাদের নববর্ষোৎসব। তবে তারিখের যে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় তার কারণ অন্যত্র। রাঢ় অঞ্চলের তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বোক্ত "আখ্যান" দিনে অনুরূপ অবাধ মিলন ছিল বলে শোনা যায়। এই অবাধ যৌন মিলন অশ্লীলতার চর্চা মনে করলে ভুল করা হবে। আদিম সমাজের জমির উর্বরতা বৃদ্ধির যাদুবিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মূলে ক্রিয়াশীল।

রাঢ় বাংলায় ১-লা মাঘ একটি দিন বা সংক্রান্তির ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করতে পারে। যোগেশবাবু গণনা করে বলেছেন, "ষোলশত বৎসর পূর্বে পৌষসংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। পরদিন ১-লা মাঘ নূতন বৎসরের প্রথম দিন। সেদিন আমরা দেব-ঘাটে প্রাতঃস্নান করি। লোকে বলে মকর স্নান।" (৬) বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই উক্তিটি এই পর্যায়ে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগাবে।

---

(৩) "পূজাপার্বণ" পৃঃ – ১৮
(৪) Ibid পৃঃ—১৩৭-৩৮
(৫) লোকায়ত দর্শন পৃঃ—৫২১
(৬) Ibid পৃঃ—৩

রাঢ় অঞ্চলে তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ১-লা মাঘটি যেমন পবিত্র উৎসবের দিন বলে গণ্য তেমন আর বছরের কোনো দিনটি নয় (কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে যথার্থ কি আছে তা পাঁচ বছর ধরে অনলস পরিশ্রম করেও হদিস পাই নি।) আর ভাবনা ও গণনার সূত্র তারা গ্রহণ করেছে এবং এখনও টিকিয়ে রেখেছে কিনা তা বলা শক্ত। দিনটি কখন উৎসবের পরবর্তী উৎসবের অন্তর্ভুক্ত তা নিঃসন্দেহে বলা চলে কিন্তু সংস্কৃতির বিচারে ষোলশত বৎসর পূর্বে এর সূচক তা মনে হয় না। আমার ধারণা ট্রাইবাল সমাজের অতি প্রাচীন স্মৃতি এই ১-লা মাঘের উৎসবের মধ্যে আজও রক্ষিত হয়ে আসছে। রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত নববর্ষোৎসব বলে যদি কিছু থাকে তা হল এই ১-লা মাঘের উৎসব। পৌষ সংক্রান্তির পিঠা পরব ও লক্ষ্মীপূজা তো বাঙালীর ঘরে ঘরে খ্যাত। এ সম্পর্কে বহু মনীষী বহু আলোচনাই করেছেন। মাঘ মণ্ডল ব্রত (সূর্যোপাসনা) সম্পর্কেও কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। সে আলোচনা বর্ণ হিন্দুদের সম্পর্কে। কিন্তু তপশীল সমাজের ঐ মাঘোৎসবের কথা কেউ আলোচনা করেছেন বলে আমার সন্ধানে নেই।

১-লা মাঘকে রাঢ় অঞ্চলে তপশীল সম্প্রদায় বলে "আখ্যান" বা "আখ্যেন" দিন। এর অর্থ কি তা আজও ঠাওর করে উঠ্‌তে পারি নি। কাজ চালাবার জন্য আপাততঃ ভেবে নিতে হয়েছে "ক্ষণ" কথাটি "আ" উপসর্গ যোগে "আ-ক্ষেণ" শব্দটি তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ মহাক্ষণ বা পুণ্যক্ষণ। সূর্যের উত্তরায়ণ প্রবেশের ক্ষণ। কিন্তু শব্দটি সংস্কৃত জাত, তদ্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। মুণ্ডারী ভাষায় এরকম কোনো শব্দ নেই। ওঁরাওরা ধান মাড়াইকালে কাঠের হাতলযুক্ত একরকম আঁকশী ব্যবহার করে (যা ছড়িয়ে পড়া ধানকে কাছে টেনে নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়) তাকে বলে "আখিন"। এর দ্বারাও অর্থভেদ হয় না। বীরভূমে রাজনগর থানার একটি গ্রামে কয়েকটি অপদেবতার সঙ্গে "আক্ষেণ" নামে এক দেবতাও বাউরী জাতি কর্তৃক ১-লা মাঘ পূজিত হন। এটিও একটি সমস্যা।

মাঘের "আখ্যেন" দিনটির একটু পরিচয় দিচ্ছি—রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে কোনো না কোনো অর্বাচীন অথবা অবৈদিক দেবদেবী—গাছতলা, থানঘাঠ, পুকুরপাড়, আখবাড়ী প্রভৃতি জায়গায় না আছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ব্রহ্মদৈত্য, বাখরায় চণ্ডী, ধানা। তবে অধিকাংশই দেবী। Fertility Cult-এর সঙ্গে দেবীপূজা সম্পৃক্ত, তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। এবং এই সংস্কৃতি অবৈদিক।(১) দেবদেবী ছাড়াও নানাপ্রকার বুড়ী, ভূত, প্রেত, অপদেবতা প্রভৃতিও আছেন। এদের পূজানুষ্ঠানের সন্ধান অষ্ট্রিক জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যেও পাওয়া যায়। আদিবাসীদের অবদান পুষ্ট এই সকল দেবদেবী এখন গ্রামাঞ্চলে জাঁকিয়ে বসেছেন এবং শুধুমাত্র তপশীল সম্প্রদায়ই নয়, উচ্চবর্ণের লোকেরাও এতে যোগ দেন, ব্রাহ্মণেও পূজা করেন। এদিন গ্রামাঞ্চলে অনেকে বাস্তু পূজা করে

---

(১) "আখ্যেন" দিনে পূজিত (বীরভূম অঞ্চলে সংগৃহীত) আরও কয়েকটি দেবদেবীর নাম—

(১) ঘেনঘেন (২) উত্তরণ (৩) সিচেন (৪) কুদরো বুড়ী (৫) মালক বুড়ী (৬) কদম বুড়ী (৭) বনকুমারী (৮) কেঁদেরা (৯) কামা মেরেন (১০) কাটাইচণ্ডী (১১) কালাপাহাড় (১২) মশান (১৩) চোরদানা (১৪) গোবর লোটন (১৫) বসন্ত বুড়ী (১৬) বাগেশ্বরী (১৭) জানাবুড়ী (১৮) ঢেলোবুড়ী (১৯) ধনীকা চণ্ডী (২০) পাথরা চণ্ডী (২১) পায়রা চণ্ডী (২২) পাহাড়ী মা (২৩) গর্ভকৌত বা গর্ভকোতায় (২৪) শনাশী (২৫) ছুয়রা চণ্ডী (২৬) মুরলী ঠাকরুণ (২৭) লটা বুড়ী (২৮) সোনাই চণ্ডী (২৯) সিদ্ধেশ্বরী (৩০) বাগান বুড়ী (৩১) বসন্ত বুড়ী (৩২) গোঁসাই (৩৩) ভাজই কুমারী (৩৪) ঢেলাই চণ্ডী (৩৫) চানাই চণ্ডী (৩৬) লাউডাই (৩৭) গ্রামদৈত্য (৩৮) পঞ্চানন (৩৯) তাড়িকা চণ্ডী (৪০) লোটন চণ্ডী (৪১) ক্ষেত্রপাল।

থাকেন। এদিন কারও ধান মাড়াই বা ধান সেদ্ধ করতে নেই। তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সম্বৎসর ধরে লালিত শূকর, ছাগ, মোরগ, মেষ এদিন বলি পড়বে—হবে মহাভোজ। নববস্ত্রাদি ক্রয় করারও রীতি আছে সাধ্যমত। আর আছে পচাই মদ। এদিন তারা কারও নিষেধ শোনে না। অনেকের বাড়ীতে মদ তৈরী করা হয় পবিত্র বস্ত্রজ্ঞানে। কারণ বছরান্তে দেবতার সামনে ঐ মদ নিবেদন করা হয় পূজার উপকরণরূপে। ঢাক, ঢোল, মাদল বাজে সকাল থেকে। ভর নামে কোনো উপবাসী ভক্ত। এই ভরকে বলে 'আগোসান'। এটি আর একটি অজ্ঞাত শব্দ। ভর-মাখা লোক কাঁচা পশুমুণ্ড চিবাতে থাকে—রক্তক্ষরণ হয়। জিজ্ঞাসু স্ত্রীলোকদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে। নিম্নশ্রেণী গ্রামবাসীদের এদিন আনন্দের দিন। ভাল খায়, পরে। দেবস্থানের প্রসাদ, সিঁদুর গ্রহণ ও ধারণ করে। মানত শোধ, গড়াগড়ি ও দণ্ডী দেয়। রাঢ়ের বিশিষ্ট গ্রামদেবতা ধর্মঠাকুরও এদিন অনেক জায়গায় পূজা পান। তাছাড়া আছে মেলা। বীরভূম অঞ্চলে ১-লা মাঘ মেলা বসে প্রধানতঃ ব্রহ্মদৈত্য ঠাকুরের ইনি ব্রহ্মচারীও। সকাল থেকে হাজারে হাজারে লোক মেলাতলায় জড়ো হয়। কয়েক ঘণ্টার মেলা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সুরু; সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সে মেলার আর চিহ্ন থাকে না। গ্রাম্য মেলা। আলো, মাইক, সার্কাস, সিনেমার জৌলুস থাকে না। হাড়িকুড়ি, মুড়ি, টোকা, মোড়া, পুতুল ইত্যাদি কুটীর শিল্প—এসবই জড়ো হয়। দূর দূরান্তর থেকে লোকে তাই কেনে এসে। এই-ই তাদের নববৎসর উদযাপন।

ব্রহ্মদৈত্য মেলার অনুকরণে সৃষ্টি হয়েছে গোঁসাই-এর মেলা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের পীরের মেলা ঐ তারিখেই। আর মেলা বসে বাঘরায় চণ্ডীর উদ্দেশে। (ব্রহ্মচারী ও বাঘরায় চণ্ডী সম্পর্কে অন্যত্র পৃথকভাবে বিশদ আলোচনা করা হবে।)

মকর সংক্রান্তিতে যে সকল মেলা বসে তা ১-লা মাঘও থাকে। এই সকল মেলাগুলি উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির আওতায় পড়ে। এগুলির প্রভাব 'আখ্যানের' সঙ্গে কিছু আছে কিনা তা গবেষণাসাপেক্ষ।

'আখ্যান' দিনে পূজিত দেবদেবীগুলিকে বস্তুবাদী বিচারে কয়ভাগে ভাগ করা চলে দেখা যাক—১। অপদেবতা, অর্থাৎ Corn spirit। শস্য-কর্তন, মাড়াই ও গোলায় তোলা শেষ হয়েছে এখন আগামী বৎসরের জন্য শস্য-অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন ২। শস্য-দেবতা—উদ্দেশ্য একই ৩। বার্ষিক ভূতবিতাড়নপর্ব—সম্বৎসর পর গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে নানা ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হয় রোগশান্তি ও ভূতবিতাড়নের উদ্দেশে। যাতে পরবৎসর গ্রামের লোক সুখে দিন কাটাতে পারে। ৪। নবান্ন উৎসব ৫। বৃষ্টি দেবতার পূজা···ইত্যাদি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া আদিম সমাজে শস্য সংক্রান্ত এই সমস্ত উৎসবের চেহারা প্রায় একই রকম। এর থেকে বোঝা কষ্টকর হয় না যে আর্যজাতি যখন বহু সহস্র বৎসর পূর্বে হাইব্যাল জীবন যাপন করতেন তখনকার সংস্কার এগুলি। আর্যদের কয়েকটি শাখা উন্নততর চিন্তা ভাবনা, সাহিত্য, ধর্ম-কর্ম নিয়ে গেছেন। (কিন্তু সমস্যা রয়ে যায় ঐ ১-লা মাঘ তারিখটি নিয়ে)। ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ বলেছেন: "প্রত্নভূমধ্য জাতি নরবলি প্রথা ও অগ্নির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য নানারূপ অনুষ্ঠান সঙ্গে এদেশে নিয়ে এসেছিল।"(৮) জেমস্ ফ্রেজার তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে (৯) এই সংক্রান্ত অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিশ্বের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিকদের রচনা থেকে জড় করেছেন। তুলনামূলক আলোচনার জন্য উত্তর আমেরিকার Creek Indian-দের ফসল কাটার পরবর্তী উৎসবের বিবরণ তুলে দিলাম—

(৮) ভারতের জাতি পরিচয়—পৃঃ ২৮

(৯) Golden Bough

ওদের শস্যকর্তনের পরেই প্রধান বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে কেউ নতুন শস্য খাওয়া দূরে থাক স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। এদিন লোকেরা নববস্ত্র পরিধান করে। বাসন-কোসন মেজে পরিষ্কার করে। পুরাতন বৎসরের যাবতীয় জীর্ণ গৃহস্থালী সামগ্রী একত্র জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়। (আমাদের কালীপূজার রাত্রে অলক্ষ্মীর পূজা এবং জীর্ণ গৃহস্থালী দ্রব্যাদির অগ্নিকাণ্ড স্মর্তব্য।) তারপর আগুন নিভিয়ে সমস্ত ছাই কাঁটা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে। এরপর পুরোহিত এসে নানাপ্রকার যাদুবিদ্যার সাহায্যে প্রতিগৃহে নূতন পাত্রে অগ্নি ও ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি করে। যারা সম্বৎসর পাপ করে থাকে তাদেরও নানাভাবে উপবাসের দ্বারা শুচিতা বিধান এবং (পাপ) বমনের দ্বারা পাপ দূরীকরণের ব্যবস্থাও করা হয়। (তুলনীয় বিজয়া দশমীর দিন শুচিতা বিধানের জন্য শারদোৎসব)। সন্ধ্যার পূর্বেই প্রতি গৃহের পুরাতন শেষ কণাটুকু পর্যন্ত নিভিয়ে ফেলবার নিয়ম। তারপর সকলে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে নিষ্পাপ চিত্তে অখণ্ড নীরবতা পালন করে; পুরোহিত অরণির সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বালন করে পবিত্র বেদীর উপর রক্ষা করেন। বিশ্বাস এই যে, নূতন অগ্নি পূর্ববৎসরের সমস্ত পাপকে দহন করে ফেলবে। (তুলনীয় আষাঢ়ের বিষবৃক্ষ মূলে দুর্গাদেবীর বোধন। বিদ্যানিধি লিখেছেন—"অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের নাম বোধন। বিল্বকাষ্ঠের অরণি, এই হেতু দেবী বিল্ববাসীনী। দুর্গা অগ্নিস্বরূপা। অগ্নি সকল শক্তির প্রতিনিধি। অরণিতে অগ্নি উৎপাদন হয়। সেই অগ্নি কুমার। তিনিই কুমারী দুর্গা।"—পূজাপার্বণ, পৃঃ—১২৯)। এরপর একবুড়ি নূতন ফল বা ফসল আনা হয়। পুরোহিত কিছু তেল ও মাংস সহযোগে ঐ শস্য বা ফল পিষ্ট করে অগ্নিতে উৎসর্গ করে। পাপমোচনের জন্য একটি পশু বধও করা হয়। এরপর পুরোহিত নানারকম সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে থাকে। স্ত্রীলোকরা উৎফুল্ল হয়ে অগ্নি নিজ নিজ গৃহে নিয়ে যায়। এই উৎসব আটদিন স্থায়ী হয় এবং শেষ দিনে লোকেরা কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে খেলা ও স্নান করে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটায়। (তুলনীয় নবরাত্র ব্রত ও শবরোৎসব) (নববর্ষ প্রবেশ হেতু শবরোৎসবের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণপার্শ্বে শবর জাতির বাস ছিল। বোধ হয় তাদের রাজা নবরাত্র করিতেন। তাঁহার শবরজাতীয় প্রজা ঘট বিসর্জনের পর জলকাদা লইয়া খেলা করিত। নববর্ষারম্ভে হুর্ধক্রীড়া স্বাভাবিক।" (পূজা-পার্বণ—পৃঃ ১৩৮)

সিথুনিয়ার কৃষকরাও জিদেম্বরের সুরুতেই নূতন ফসল ওঠার পর মদ্য, শস্য ও মোরগ উৎসর্গ করে কৃষিদেবতার উপাসনা করে থাকে। বেচুয়ানালার অধিবাসীরা নিজেদের শুদ্ধ না করে নূতন ফসল গ্রহণ করে না। এই ঘটনা ঘটে নববর্ষের দিন।

এইরকম দৃষ্টান্ত অজস্র আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এই কয়টি থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে বিজয়া দশমী থেকে যে নববৎসর গণনা করার প্রথা এবং অগ্নিরূপিনী দুর্গার আরাধনা শবরোৎসব ইত্যাদি জাতীয় বিশ্বাসের বহির্ভারতীয় উদাহরণ রয়েছে। ১-লা মাঘের পুষিত দেবদেবীর তুলনীয় দৃষ্টান্তও অপর্যাপ্ত। সুতরাং এই বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান পালনের মূল যে কোথায় তা সহসা নির্ণয় করা অসম্ভব।

আশা করি আজকের নববর্ষ ও গ্রামাঞ্চলের অনুন্নত অধিবাসীদের পালিত নববর্ষের পার্থক্য আমি পরিস্ফুট করতে পেরেছি। উন্নত সভ্যতাভিমানীদের চালে ও ঢাপটে আমাদের অতীত ইতিহাসের যে অধ্যায় আজও অবিকৃতভাবে টিকে আছে, তা ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে। এদিকে অনুসন্ধানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বহির্ভারতে নববর্ষ

নওরোজ

গৌরীশংকর দে

নিজেকে নতুন ক'রে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সার্বজনীন। নতুন বছরের প্রথম দিনটি এই আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র ক'রে তোলে। এরই সচেতন অভিব্যক্তি নববর্ষ উৎসব। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষ বর্ষ সূচনার দিনটিকে পবিত্র দিন, আনন্দের দিন মনে করে।

শুধু আধুনিক কালে নয়, অতীতেও নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হতো। রোমুলাসের উত্তরাধিকারী এবং রোমের দ্বিতীয় রাজা নুমা পম্পিলিয়াস খ্রীষ্টপূর্ব ৭১৩ অব্দে নববর্ষ পালন করেন। উৎসবের আরাধ্য দেবতা ছিলেন সব উৎপত্তির দেবতা জানুস, যাঁর নাম থেকে জানুয়ারী নামের উৎপত্তি।

প্রাচীন মিশরে বছর শুরু হতো ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে। ২৫শে ডিসেম্বর শুরু হতো গ্রীকদের নতুন বছর। মধ্যযুগে একমাত্র ইংল্যাণ্ড ছাড়া য়ুরোপের সর্বত্র নববর্ষ সূচিত হতো ২৫শে মার্চ তারিখে।

গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকা জানুয়ারীর প্রথম দিনকে নতুন বছরের আরম্ভ ব'লে ঘোষণা করে। তথাপি, এখনো ইহুদীদের নতুন বছরের শুরু সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে। চীনাদের নববর্ষের শুরু ২১শে জানুয়ারী এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে।

আমাদের দেশ মুঘল বাদশাহেরা ধুমধামের সঙ্গে নববর্ষ উৎসব করতেন। এই উৎসবের নাম ছিলো নওরোজ। মুঘল বাদশাহেরা পারস্য থেকে ওই উৎসব আমদানী করেন। এই আনন্দের দিনটিতে সম্রাট মুক্তহস্তে উপহার বিতরণ করতেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নতুন পদ-মর্যাদায় ভূষিত করা হতো।

সিংহাসনে আরোহণ করার পর ১৬০৬ সালের মার্চ মাসে জাহাঙ্গীর ঝাঁকজমকের সঙ্গে নওরোজের আয়োজন করেন। অনুগত ও বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের মধ্যে অকৃপণ হস্তে বিতরণ করেন উপহার।

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স ১৬০৮ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। বাদশাহের দরবার ও রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা তাঁর বিবরণীতে রয়েছে। জাহাঙ্গীর প্রায় বড়ো-বড়ো ভোজসভার আয়োজন করতেন। সব চাইতে আকর্ষণীয় ছিলো নওরোজের ভোজসভা।

ঐশ্বর্য-সমারোহ, ঝাঁকজমক আর বিলাসের জন্য শাহজাহানের শাসনকাল তো আজ একটি কিংবদন্তী। তাঁর অনুষ্ঠিত নওরোজ উৎসব থেকেও এই অতুল বৈভবের পরিচয় পাওয়া যায়। রজব মাসে সম্রাট শাহজাহান মহা আড়ম্বরের সঙ্গে নওরোজ উদ্‌যাপন করতেন। দৌলতখানার মস্ত চত্বরে টাঙানো হয় কারুকার্যশোভিত বিশাল চন্দ্রাতপ। নিচে বিছানো থাকে নানাবর্ণে রঞ্জিত, সুদৃশ্য অসংখ্য কার্পেট। অভিনব সাজ-সজ্জায় উৎসব-অঙ্গন স্বর্গীয় শোভা ধারণ করে। মূল্যবান, বর্ণাঢ্য পোশাক প'রে সিংহাসনের চার কোণে দাঁড়িয়ে চার শাহজাদা : দারা, সুজাহ, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ। সেনাপতি আসফ খাঁ ও অন্যান্য আমীর ওমরাহেরা উপযুক্ত আসনে সমাসীন। রাজপরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে সম্রাট উপহার বিতরণ শুরু করলেন। মমতাজ মহলকে দিলেন পঞ্চাশ লাখ, রৌশানারা বেগমকে পাঁচ লাখ এবং প্রত্যেক শাহজাদাকে পাঁচ লাখ টাকা। আসফ খাঁ লাভ করেন ৯,০০০ জাট এবং ৯,০০০ সওয়ারের পদ-মর্যাদা। এই একটি উৎসবেই বাদশাহ ব্যয় করেন মোট এক কোটি বাট লাখ টাকা।

রক্ষণশীলতার জন্য বিখ্যাত ঔরঙ্গজেব ছিলেন সমস্ত রকম আমোদ-প্রমোদের বিরোধী। তাঁর আদেশে মুঘল দরবারে নওরোজ উৎসব নিষিদ্ধ হয়।

জাতির হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে তার রঙ্গালয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগ। বাংলা দেশ ও বাংলা থিয়েটার এই দুই-এর মধ্যে বিগত যুগে সেই যোগ দেখা গেছে বরাবর। বাংলা থিয়েটার যুগে যুগে নানা ভাবে জাতীয় চেতনাকে নাড়া দিয়েছে।

বাংলা থিয়েটারকে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যতখানি ভালবেসেছিলেন, যতটা চিনেছিলেন এবং যতটা আন্তরিকতার সঙ্গে তার সেবা করেছিলেন, তার সমতুল্য দৃষ্টান্ত বিরল। বাংলা থিয়েটারের বিগত যুগ সম্বন্ধে তাঁর রচনাকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। এই বিশেষ সংখ্যায় তাঁর রচনার নানা স্থান থেকে কিছু কিছু অংশ সংকলন করে, স্বদেশী যুগে জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে বাংলা রঙ্গালয়ের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার একটি চিত্র পরিবেশিত হল।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে জাতীয়তার ভেরী

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

খৃষ্টাব্দ ১৯০৩-০৪। বাঙ্গলা জাগিয়াছে। কোনদিন এই অনুগতপ্রাণ বাঙ্গালীর বাহুতে যে বল ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বাঙ্গালী তাহার নিদর্শন খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা', নিখিলনাথের 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'—বাঙ্গলার একটা নূতন হাওয়া বহাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষ, তাহার পিতৃ-পিতামহ যে, একদিন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আপনার অপহৃত স্বাধীনতাকে পরাক্রান্ত সম্রাটের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কুস্তির আখড়ায় মাটি মাখিতে মাখিতে এখন সেই কথারই আলোচনা করে; বাঙ্গলার মাঝে ঘুঁইয়া যে, এই আমাদেরই মত বাঙ্গালীর জাত ভাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী যুবক তাহার নৈতৃক বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় স্বরূপ লাঠিখেলায় মাতিয়া ওঠে, পল্লীতে পল্লীতে সংঘবদ্ধ বাংলার যুবকের দল।

এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সুদূর মারাঠায়, মারাঠা যুবক, মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে; বাঙ্গালী বাঙ্গলার গ্রাম বনানীর অন্তরালে উৎসুক নেত্রে খুঁজিয়া দেখে—কোথায় বাঙ্গলার শিবাজী, কোথায় বাঙ্গলার তানোজী!

ইতিহাসের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া, যশোহরের শাদ্বল-নিবেষ্টিত বনপ্রান্তে, যশোরেশ্বরীর তপঃসিদ্ধ প্রাঙ্গণের ছায়াপুষ্ট লইয়া একদিন যাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া বঙ্গজ কায়স্থ কুলতিলক মোগল-গর্ব্ব বিধ্বংসী-বীর প্রতাপাদিত্য রায় যাঁহার সঙ্গে ছিলে বাহার হাজার বাঙ্গালী জাতী, যুদ্ধকালে সেনাপতি যাঁর কালী, যাঁর মন্ত্রসিদ্ধ সচিব বাঙ্গালী বীর শঙ্কর আর যাঁর উগ্র তপস্যার ঐকান্তিকী কামনার ফল—বাঙ্গলার স্বাধীনতা! বাঙ্গলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কে বলে প্রতাপাদিত্য অত্যাচারী? কে বলে প্রতাপাদিত্য দস্যু? বিশ্বরূপের মত সে বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের গহিল গ্লানি সুন্দরবন হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া বঙ্গোপসাগরে ভাসাইয়া দিল! তাহার চক্ষে বাঙ্গলার নায়ক প্রতাপাদিত্য, বাঙ্গলার বঙ্গবীর্য্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ

প্রতাপাদিত্য। বাঙলা তাঁহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। ভক্তিভরে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিল। কলিকাতায় পাতীর মাঠে শিবাজী উৎসবের স্থায় প্রতাপাদিত্যের উৎসব হইল। এই শুভ অবসরে বাঙলার রঙ্গমঞ্চে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' বীরকণ্ঠে সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে উদাত্ত স্বরে গাহিল— 'হয় যশোর—নয় মৃত্যু'। প্রতাপাদিত্য নাটক দেশের কি করিয়াছে, বাঙলার উত্তরপুরুষগণ তাহার বিচার করিবেন।

এই সময় হইতেই বাঙলার রঙ্গমঞ্চে ইতিহাসের যুগ আসিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইল। জাতীয় কংগ্রেস, নামে জাতীয় হইলেও ইহা ভারতের অভিজাতবর্গের অনুষ্ঠান বলিয়াই চলিয়া আসিতেছিল। ইংরাজীনবীশ, ইংরাজী ভাবের ভাবুক, ইংরাজী বেশভূষাবোধে উদ্বুদ্ধ, ভারতের গণ্যমান্য বরেণ্য বিত্তশালী বিদ্বানমণ্ডলী কংগ্রেসকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন দেশের পাতাল হইতে যে রাষ্ট্রিক সুর যখন উঠিত, সংবাদপত্র মারফতে তাহা সুদূর পল্লীগ্রামে সঞ্চারিত হইলেও, পল্লীর প্রাণকে কখনো তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, বাঙলার প্রাণে এমন একটা আঘাত দিল, যে আঘাতে ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, আইনজীবী ও হলধারী কৃষক একসঙ্গেই যেন একটা দারুণ বেদনা অনুভব করিল। সহরে সে কি উন্মাদনা! অন্ধ, খঞ্জ, জীর্ণ পলিতবাস ভিখারী তাহার সমস্ত দিনের অর্জ্জিত ভিক্ষার মুষ্টি উত্তেজনার আতিশয্যে সানন্দে জাতীয় তহবিলে দান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিল! গঙ্গাতীরে রাখিবন্ধন। কবীন্দ্র রবীন্দ্র গাইলেন—"ভাই ভাই এক ঠাঁই"! দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক পাড়ায় পাড়ায় কান্তকবি রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেনা ভাই" গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরনারীরা হাতের স্বর্ণ শাঁখা ও কলী দান করিয়া শাঁক বাজাইলেন। ১৯০৫—বাঙলা ইতিহাসের এই স্মরণীয় বর্ষ—বাঙালীকে যাহা দান করিল, বাঙালীর উত্তরপুরুষ সে দানের মহিমা কখনো ভুলিবে না।

এই বৎসরেই বাঙলার নায়ক সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার অমুকুট রাজা বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন। সে হাটকোট নাই, সে বিলাতি বুটের মসমস শব্দ নাই, উত্তরীয় মাত্র সম্বল, শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ সন্তানের কণ্ঠে "বন্দেমাতরম" মন্ত্র, যেন তাঁহার বহুবর্ষের স্বেচ্ছাচারকে প্রায়শ্চিত্ত-পূত করিয়া তাঁহাকে জাতিতে তুলিয়া লইল! এই সময়েই নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলাকে অবলম্বন করিয়া বাঙালীকে তাহার কীর্ত্তি অকীর্ত্তির কথা, তাহার ভাগ্য বিপর্য্যয়ের করুণ কাহিনী, তাহার অতীত গৌরব ও অগৌরবের উজ্জ্বল ও মলিন চিত্র দর্শকের সমক্ষে প্রকটিত করিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভৈরব ভেরীর নির্ঘোষে বাঙলার নাট্যশালা স্তম্ভিত হইল।

ইতিমধ্যে ইংরাজ লিখিত বাঙলার ইতিহাস আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন বাঙলার সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "যদি সময় পাই শেষ জীবনে আর কিছু লিখিব না, বাঙলার ইতিহাসই লিখিব। যে জাতির ইতিহাস নাই জগতে তাহার কোন পরিচয় নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের নানা প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই তিনি ইংরাজ-লিখিত ভারতবর্ষ বা বাঙলার ইতিহাসকে যেমন অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তেমনি মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার অভিমত ছিল, এই দুই সম্প্রদায়ের লিখিত ইতিবৃত্ত সত্য ও মিথ্যা, প্রকৃত ও অতিরঞ্জিত—ঐতিহাসিক গবেষণার মহাসমুদ্র নিরপেক্ষতার মন্থন দণ্ড দ্বারা মন্থন করিয়া যাহা সত্য, যাহা চিরন্তন, তপস্যাবলে তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার ইঙ্গিত বাঙলার [illegible] বিস্তর মনীষী বহু প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই সময়ে আমরা বাঙালী কর্তৃক মৌলিক অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ ইতিহাস রচনার প্রথম পরিচয় পাই। বহু বহু বর্ষ পূর্বে কবিবর নবীনচন্দ্র সিরাজউদ্দৌলা অবলম্বনে যখন কাব্য লেখেন, তখন ইংরাজের লিখিত ইতিহাস পড়িয়া আমাদের ধারণা ছিল, সিরাজের ন্যায় অত্যাচারী বুঝি জগতের আর কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু এই যুগ-সন্ধিক্ষণে বাঙালী ইংরাজের এ মসী প্রলেপকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। অজ্ঞাতসারে বালক সিরাজউদ্দৌলা যে কতটা অত্যাচারী এবং ইংরাজ ইতিহাস লেখকের লেখনী চাতুর্যে কতখানি রোমাঞ্চের সংস্রব তাহার চরিত্রে আছে, তাহা বাঙালী বুঝিয়া ফেলিয়াছে। ইতিহাস যে, কোন জাতি বিশেষের ওকালতি করিবার উপাদান স্বরূপ তীক্ষ্ণধার অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার নহে, তাহা আর বাঙালীর নিকট অপরিজ্ঞাত নাই। বাঙালী মেকলের উত্তরপুরুষকে মুখের মত উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

এই সময় বাঙালীর নাট্যশালায় সিরাজউদ্দৌলা নাটকের উৎপত্তি। বাঙালী যাহা দেখিতে চাহিয়াছিল, স্রষ্টা গিরিশচন্দ্র যেন তাহার আভাস বুঝিয়াই তৎক্ষণে সিরাজউদ্দৌলা লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা নাটক পড়িয়া কবিবর নবীনচন্দ্র আত্মত্রুটি স্বীকার করিয়া গিরিশচন্দ্রকে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি এই—

"ভাই গিরিশ,

২০ বৎসর বয়সে "পলাশীর যুদ্ধ" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৩০ বৎসর বয়সে তুমি সিরাজউদ্দৌলা লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন পলাশীর যুদ্ধ লিখি তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। ঈশ্বরবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করুন।"

সিরাজউদ্দৌলা পুলিশ হইতে পাশ করিবার সময় বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রথম পাণ্ডুলিপির বহুস্থানে আমরা অদল-বদল করিতে বাধ্য হই। শেষে এমন হইয়াছিল যে, গিরিশচন্দ্রকে একদিন সকাল ৭টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত পুলিশ আফিসে ধর্ণা দিতে হয়। সেইদিন অদল-বদলের মধ্যবর্তী করেন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ইহার প্রথম রাত্রির প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর তালিকা এইরূপ :—

করিমচাচা—গিরিশচন্দ্র।
ঘসেটি বেগম—অর্দ্ধেন্দুশেখর।
মীরজাফর—নীলমাধব চক্রবর্তী।
সিরাজউদ্দৌলা—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
ক্লাইভ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র।
মোহনলাল—তারকনাথ পালিত।
মীরমদন—মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল।
উমিচাঁদ—হরিদাস দত্ত।
লুৎফউন্নিসা—মন্মথনাথ পাল (মাদুবাবু)

জহরা—তারাসুন্দরী।

লুৎফউন্নেসা—সুশীলা।

মেসিটি - সুধীরাবালা।

যে পুস্তকের প্রচার রাজাদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে সে পুস্তকের সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে অভিনয়ের দিক হইতে একথা বলা যাইতে পারে যে, সিরাজউদ্দৌলা অভিনয় তখনকার দর্শককে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। এবং সময়ের উপযোগী বলিয়া তখনকার নাট্যমঞ্চকে ইহা নতুন আকার দিয়াছিল।

এই বৎসরই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মিনার্ভায় সিরাজউদ্দৌলা অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বেলিত। সিরাজউদ্দৌলাও এই আন্দোলনের যেন একটা অংশ হইয়া পড়িয়াছিল। যেদিন তিলক রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন সে দিনের দর্শক বোধহয় বিস্মৃত হন নাই—তিলক মহারাজ যখন মঞ্চে প্রবেশ করিবামাত্রই সমগ্র দর্শকের কণ্ঠোচ্চারিত "বন্দেমাতরম্" শব্দে রঙ্গমঞ্চ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। দর্শকবৃন্দ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া; গিরিশচন্দ্র তখন রঙ্গমঞ্চের উপর করিম চাচার অভিনয় করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই নতজানু হইয়া তিলককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তিনি সেদিন ইংরাজীতে এই মান্য অতিথির অভিনন্দনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কাহারও মনে আছে কিনা জানি না, দুঃখের বিষয় তাঁহার কোন জীবনী-লেখকও তাহা লিখিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তবে শুনিয়াছি সে দিনের দর্শক তাঁহার সেই অভিনন্দন শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলার প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শকের মধ্য হইতে একজন মুসলমান কবি গিরিশচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া দুই ছত্র কবিতার আবৃত্তি করেন। কবিতাটির ভাবার্থ এই—"হে গিরিশচন্দ্র, তুমি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ কর।"

সিরাজউদ্দৌলা খোলা হয় ১৩১২ সালের ২৪শে ভাদ্র (১৯০৫ সালের ১০ই আগষ্ট)। এই সিরাজউদ্দৌলার পর হইতে বাংলার নাট্য সাহিত্য, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকের ধারা, এক নতুন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল।

মন যেতো যেথা ছুটে

অমরেন্দ্র দেব

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আমাদের ওই গানটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে আহ্বান আসতে শুরু হল। দ্বিজুদার ইচ্ছামতো আমরা বিশেষ বিশেষ সভাসমিতির অধিবেশনে গান করতে যেতুম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল একখানি 'বাণীবন্দনা'-মূলক নূতন গান রচনা করলেন:—

"আজি গো তোমার চরণে জননী, আনিয়া অর্ঘ্য করিয়া দান,
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত হীনের গান।
মন্দির রচি না তোমার লাগি,
পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি।
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননী স্নেহের সলিলে করিয়া স্নান।
(কোরাস) জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান।
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল কমল-চরণে স্থান।

অন্ততঃ ষাট-বাষট্টি বছর আগের কথা এ। স্মৃতিপট থেকে অনেক ছবির রঙ মিলিয়ে আসছে ক্রমে। ইডনিং ক্লাবের আড্ডাটি যে আমাদের বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল, প্রথম যৌবনের এ স্মৃতি ভোলবার নয়। যে ভারত সঙ্গীত সমাজের আড্ডায় প্রবেশ করা আমাদের কাছে একদা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, সেই সঙ্গীত সমাজ থেকে আমাদের আমন্ত্রণ এলো ওঁদের রঙ্গালয়ে কোনো নাটক অভিনয় করবার জন্য।

সঙ্গীত সমাজ ভবনে ওঁদের নিজস্ব স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল। ওঁদের যা কিছু অভিনয় সব ওখানেই তাঁরা করতেন। আমাদের তখন কোনো নূতন নাটক অভিনয়ার্থ প্রস্তুত ছিল না। সময়ও ছিল হাতে খুব কম। কাজেই আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাট্যকাব্যখানির কয়েকটি নির্বাচিত অংশ ও বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দপ্তর" নাটকাকারে রূপান্তরিত করে নিয়ে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হলুম। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং আমাদের সঙ্গে তাঁর "সীতা" নাট্যকাব্যে বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। 'রাম' হরিদাসবাবু। 'বশিষ্ঠ' প্রমথবাবু। "সীতার" ভূমিকায় নেমেছিলেন ভূতনাথ। 'সীতা' নাট্যকাব্যখানির অংশবিশেষের এই অভিনয় এত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে সঙ্গীত সমাজের বিশিষ্ট সদস্যেরা সকলেই সে অভিনয় দেখে সাগ্রহে আমাদের অনেককেই সঙ্গীত সমাজের সদস্য করে নিলেন। তাঁরাও অনেকে স্বেচ্ছায় ইডনিং ক্লাবের সদস্য হলেন। আমাদের আড্ডাধারীদের জীবনে সে এক উল্লাসমুখর স্মরণীয় দিন। সঙ্গীত সমাজ অভিজাত ধনীসম্প্রদায়ের গৌরবিন আড্ডা। তাঁরা

আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থ সন্তানদের সে আড্ডায় সদস্য হবার জন্য আহ্বান জানাবেন একি আমাদের পক্ষে নিতান্ত কম সৌভাগ্যের কথা? সঙ্গীত সমাজ উজ্জ্বল করে আছেন তখন বাগবাজারের একাধিক প্রসিদ্ধ ধনী রাজবাহাদুর গণপতিনাথ বসু, লক্ষপতি রাধানাথ বসুর পুত্র উপেন্দ্রনাথ বসু, রামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্রের দুই স্বনামখ্যাত পুত্র রায় মন্মথ নাথ মিত্র ও নরেন্দ্র নাথ মিত্র, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর গোষ্ঠী, চোরবাগানের জনপ্রিয় ধনী নিবারণ চন্দ্র দত্ত অটল বিহারী সেন, শিবনারায়ণ দাস লেনের চারু মিত্র ও বসু বরাটের বাড়ীর বরাট বাবুরা, গোবরডাঙ্গার জমিদার জানদাপ্রসন্ন, মৈমনসিংহের রাজা শশীকান্ত, মুক্তাগাছার ব্রজেন্দ্রকিশোর, নাটোরের জগদীন্দ্রনারায়ণ, পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, প্রসন্ননাথ ঠাকুর, ৺রমানাথ ঘোষের বাড়ীর হেরম্বনাথ ঘোষ, দিগম্বর ঘোষ। সঙ্গীত-প্রেমিক ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, এঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমন্মথনাথ ঘোষও পিতার পদাংক অনুসরণে সঙ্গীতবেত্তা সুরকার ও বাদ্যযন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন আজও। পটলডাঙ্গার বিশিষ্ট ধনীগোষ্ঠি বসুমল্লিকরা ছিলেন সঙ্গীত সমাজের প্রাণস্বরূপ।

নামের তালিকা আর বাড়াবো না। আমরা অনেকেই বংশমর্যাদায় তাঁদের কারও চেয়ে কম না হ'লেও অর্থসম্বলহীন। বাপ-পিতামহরা কাপ্তেনী করে সবই ফুঁকে দিয়ে গেছেন। অতএব আমরা তখন জনসাধারণের পর্যায়ে। ওঁদের আড্ডায় আমরা এলুম যেন 'হংসমধ্যে বকো যথা!' এই গিরি-মোহর-ওয়ালাদের আড্ডায় এক সন্ধ্যার ঘটনা মনে পড়ছে। রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের হাতের হীরের আংটি একটা সে রাত্রে এত জেল্লা মারছিল যে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল সেই হীরকদ্যুতির কিরণচ্ছটার দিকে। অভিজাত ধনী নাগরিকদের সৌখীন সান্ধ্য আড্ডা এই ভারত সঙ্গীত সমাজ। এ আড্ডায় অবশ্য বেশিক্ষণ কেউই থাকতেন না। রাত দশটা নাগাদ তাঁরা যে যার নিশিকুঞ্জে যামিনী যাপনে চলে যেতেন। কলকাতার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বারাঙ্গনা ও প্রসিদ্ধ বাইজীরা অনেকেই ছিলেন এঁদের নিজস্ব সম্পত্তি, একেবারে রিজার্ভ করা। বাবুরাই তাঁদের প্রতিপালন করতেন প্রায় হারেমের বেগমদের মতোই। এঁদের অনুমতি ছাড়া এইসব সৌরিক্রী নাগরিকাদের কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার অধিকার ছিল না বা কোনও আসরে 'মুজরো' করতে যাবার অধিকার ছিল না। বাবুদের নিযুক্ত দারবান ও ভৃত্য থাকতো বিবিদের গৃহদ্বারে পাহারা দেবার জন্য। তথাপি একথা বোধহয় সকলেই জানেন যে, "যেখানেই বস্তু আঁটুন, সেখানেই ফস্‌কা গেরো।"

মন্মথনাথ মিত্রের হাতের সেই হীরকাঙ্গুরীর অত্যুজ্জ্বল ছটা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ধনপতিরা কেউ কেউ ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন এবং এ জাতীয় সরেশ হীরকখণ্ডের মূল্য কী হ'তে পারে অনুমান করতে লাগলেন। মন্মথনাথ মিত্র মহাশয়ের খ্যাতি ছিল "একজন পাকা জহুরী" বলে। তিনি বন্ধুদের ঔৎসুক্য দেখে আঙুল থেকে আংটিটি খুলে তাঁদের হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, এ হীরের দাম কত হ'তে পারে বলুন দেখি আন্দাজ করে! ওজোন বলে দিচ্ছি—এক রত্তির বেশি হবে না। যদি হয় দু'এক মাসা মাত্র!

হাজার দু'হাজার থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত হর উঠলো। তখন মন্মথবাবু হেসে পকেট থেকে একখানা বিল বার করে দিয়ে বললেন, বেড়িয়ে ফেরার পথে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে গভর্মেণ্ট হাউসের সামনের একটা দোকান থেকে কিনে নিয়ে এলুম। দাম নিলে দশটাকা! একে বলে "টেটস্ ভায়রণ্ড" অর্থাৎ 'নকল হীরে!'

দেখেছিলুম সেদিন কলকাতার সব সেরা ধনী বড়লোক বাবুদের সেই লালরক্ত হেঁটমুখ। আজ আর তাঁরা কেউ নেই। তাঁদের অনেকেরই প্রাসাদ আজ অবাঙালীদের দখলে। কোনো কোনোটি বা যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে ভেঙে পড়ছে। অধিকাংশই তাঁরা নির্বংশ আজ। সেই সঙ্গীত সমাজও

আজ আর নেই। 'ইউনিং ক্লাবের' অস্তিত্বও বিলুপ্ত। তাঁদের শেষ অভিনয়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী হ'ল দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয়। সাড়ে ছফুট লম্বা ও তদনুরূপ চওড়া হরি পালুলী "আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট্।" তিনকড়ি চক্রবর্তী 'সেলুকাস', প্রাণধন এ্যাণ্টিগোনাস, 'চন্দ্রগুপ্ত' হরিদাস বাবু, 'নন্দ' বিজয় ঘোষ, 'বাচাল' গণদেব বাবু। 'চাণক্য' প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। কাত্যায়নের ভূমিকায় নেমেছিল আমরা যাকে ডাকতুম "বায়ওয়েল" বলে। নন্দকুমার নাটকে ইনি মিঃ বায়ওয়েলের ভূমিকায় নেমেছিলেন। 'মুরা' অতুল ঘোষাল, হেলেন 'বাঁকা', 'ছায়া' অশ্বিনী বিশ্বাস। ভিক্ষুকের ভূমিকায় তিনকড়ি বাবুকেই পোশাক বদলে নামতে হয়েছিল গানের জন্য। ভিক্ষুকের পালিত-কন্যা 'গায়ত্রী' সেজেছিল 'শেতল' বলে একটি ছেলে। 'নেপো' 'শেতল' এরা দু'ভাই। বরাবরই আমাদের ইউনিং ক্লাবে সখীর পার্টে বা ছোট ছোট মেয়ের ভূমিকায় নামতো। এদের নিয়মিত মাইনে দিতে হ'ত। নইলে, অন্য ক্লাবে পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল ষোলো আনা।

এই সময় "ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট"ও 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। প্রমথবাবু নানা পুরনো বইপত্র ঘেঁটে গ্রীক্ বীর ও সৈন্যদের পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করাচ্ছেন শুনে ওঁরা খুব আগ্রহ করে আমাদের মহড়া দেখতে এসেছিলেন। এই সূত্রে শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, আমরা ওঁর আবৃত্তি শুনে অনেক আগে থেকেই ওঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠবো যে একদিন, এ আশা করিনি। শিশিরই আমাদের জনকয়েককে ধরে নিয়ে গিয়ে ইন্‌স্টিটিউটের মেম্বার করে দিলেন।

ইন্‌স্টিটিউটের সদস্য হিসেবে যে কজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল তাঁরা হ'লেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি, নরেশচন্দ্র মিত্র, কাস্তি মুখোপাধ্যায়, নগা বোস, জ্ঞান মিত্তির, বিজন বোস, বামাপদ বোস, আশু ঘোষ প্রভৃতি। অনেকেরই নাম আজ ভুলে গেছি।

বামাপদ বসুর পিতা অতুল বসু একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। বোস কোম্পানী ডাক্তার-খানার পাশেই এঁর ডাক্তারখানা ছিল "প্রেসিডেন্সী ফার্মাসি"। পিতার স্বর্গারোহণের পর বামাপদই ডাক্তার-খানাটি চালাতেন এবং চক্ষু-চিকিৎসা ও চশমা বিভাগ খুলে ফার্মাসির অনেক উন্নতি করেছিলেন। এই প্রেসিডেন্সী ফার্মাসিতে আমাদের একটি প্রাক্‌সান্ধ্য আসর বসতো এবং আড্ডাটি বেশ জমজমাট হয়ে উঠতো। বলাবাহুল্য যে এ আড্ডা ছিল intellectual আড্ডা। সাহিত্য, দর্শন, নাট্য, কাব্য প্রভৃতির মধ্যেই আলোচনা অধিকাংশ সময় নিবদ্ধ থাকতো। তা বলে পরচর্চা বা পরনিন্দা বা নিষিদ্ধ আলোচনা যে একেবারেই হ'ত না একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। এই আড্ডায় একজন আসতেন শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র মিত্র। ইনি ছিলেন আমাদের বন্ধু বিজন বসুর 'মাতুল'। কাজেই অধিকাংশ আড্ডাধারীরাই তাঁকে 'মাতুল' সম্বোধনই করতেন। আমি কিন্তু 'গণেশ'ই বলতুম। এ আড্ডার প্রধান আড্ডাধারী বামাপদ বসু, গণেশচন্দ্র মিত্র এবং আমি এখনও বেঁচে আছি। আর সকলেই অনন্তলোকে যাত্রা করেছেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি মাঝে মাঝে এ আড্ডাতেও এসে উদয় হতেন। এখানকার আড্ডাধারীরা অধিকাংশই ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের সদস্য ছিলেন। শিশিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুযোগ এই আড্ডা থেকেই হয়েছিল। পরে শিশিরই আমাকে 'ওল্ড ক্লাবের' আড্ডাতে টেনে নিয়েছিলো।

ইউনিং ক্লাবের 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু ইনস্টিটিউট যখন 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় করলেন—নাট্য জগতে একটি সাড়া পড়ে গেল! শিশির ভাদুড়ির 'চাণক্য', ছবি বাবুর অপূর্ব অভিনয়কেও পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছিল। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বহু গবেষণা

ক'রে এঁদের গ্রীক পোশাক, গ্রীক অভিবাদন, গ্রীক সৈনিকদের সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যের তালে মার্চ করা শিখিয়েছিলেন। সে এক অদ্ভুতপূর্ব দৃশ্য মনে হয়েছিল আমাদের কাছে। সুনীতি কুমার বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত হ'লেও আড্ডাধারী বড় কম নন। তাঁর রসিকতা আজও আমাদের একান্ত উপভোগ্য। সজনীকান্ত দাসের শনিবারের চিঠির আড্ডায় সুনীতি কুমার গেলে আড্ডা খুবই জমে উঠতো। ডাঃ সুশীল দে ছুটি ছাটায় নিয়মিত ওখানে যেতেন। আমিও অবশ্য যেতুম অনেকবার ওখানে। মাঝে মাঝে প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে। কিন্তু তখন প্রায় ভাঙা আসর। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মোহিতলাল মজুমদার, জ্যোতিষী যাত্রিক পর্যা, 'মানময়ী গার্লস স্কুলের' রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, কাজী নজরুল ইস্‌লাম এঁরাও শনিবারের চিঠির আড্ডায় আসতেন। আর একজন মস্ত আড্ডাধারী ছিলেন আমাদের বন্ধু ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য সন্ধ্যের পর তাঁর মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের বাড়ীতেই আড্ডা জমতো বেশি। কিন্তু, বন্ধুবর রাখালদাস কলকাতায় প্রায় সব আড্ডাতেই ঘুরতেন, তবে এখানে থাকবার সুযোগ খুব কমই পেতেন। প্রত্নতত্ত্বের গর্ভেই কাটাতে হ'ত বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে জীবনের অধিকাংশ সময়। অবসর নিয়ে যখন কলকাতায় এসে বসলেন তার অল্পদিনের মধ্যেই আমরা তাঁকে হারালুম। বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ ছিল রাখাল। ইতিহাসকে সে অতি চিত্তাকর্ষক করে কথাসাহিত্যের পর্যায় এনে ফেলেছিল। তার 'শশাঙ্ক'কে বোধ করি ভুলবে না কেউ।

ইভনিং ক্লাব ক্রমশঃ যেন হ'য়ে উঠেছিল আমাদের পারিবারিক আড্ডা। অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে সকলের এমন একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জমে উঠলো যেটি প্রায় আত্মীয়তার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল বলা চলে। প্রত্যেকের সঙ্গেই আমাদের এমন একটি মধুর অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়েছিল যে পরস্পরের বাড়ীর সামাজিক কাজকর্মে আমাদের সকলেরই সাদর নিমন্ত্রণ আসতো এবং আমরা গিয়ে সেখানে বাড়ীর ছেলের মতই খেটে খুটে কাজ তুলে দিয়ে আসতুম। আমরা সবাই ছিলুম ঠিক যেন একপরিবারভুক্ত ছেলে। বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠরা সব দাদা-ভাইয়ের মত স্নেহ মমতায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলুম। সে আড্ডার স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি।

আমাদের এই ঘনিষ্ঠ আড্ডার প্রধান আড্ডাধারী ছিলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। এঁর কথা পূর্বেই বলেছি। ইভনিং ক্লাব তো শুরু হ'তো সন্ধ্যের পর। কিন্তু রবিবার দুপুরটা, ছুটির দিনটা আড্ডা জমানো যায় কোথায়? কোথায় আর, সবাই গিয়ে জুটতুম যুগল কিশোর দাস লেনে হরিদাস বাবুদের প্রাসাদোপম বাড়ীতে। বিশাল বৈঠকখানা, একদল এসে বসে যেতো তাস নিয়ে। একদল বসতো দাবাবড়ে চালতে। একদল পাশার ঘুঁটি সাজিয়ে ছ-তিন-নয়ের দান ফেলতে, আবার এর মধ্যে এককোণে 'ক্যারম' বোর্ড পেতে 'পয়েন্ট' নিয়ে ঠোকাঠুকিও চলতো।

এ আড্ডার 'রসদ' যোগাতেন হরিদাস বাবুই। শুধু পান সিগারেট আর চা নয়, চাহটে না বাজতে বাজতে আসতো সকলের জন্যেই রেকাব সাজানো জলখাবার। সন্দেশ রসগোল্লার সঙ্গে চাচার দোকানের চপ কাটলেটও থাকতো, আর থাকতো বেলের সরবৎ, নয়ত তরমুজের সরবৎ। যাকে বলা যেতে পারে—sinews of war! এ না হলে যেমন যুদ্ধ চলে না; তেমনি আড্ডাও চলে না। খাবার এলেই খেলা ভেঙে যেতো। তারপর খেতে খেতে ধুম আড্ডা চলতো সন্ধ্যে পর্যন্ত। পরনিন্দা, পরচর্চা ছাড়া কোনও আড্ডা জমতে পারে না। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়ের সমালোচনাও চলতো খুব জোর। কোনো কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীর 'ক্যারিকেচার'ও করতেন কেউ কেউ। সে ভারি উপভোগ্য লাগতো সকলের। হরিদাস বাবু বেশ ভাল করতে পারতেন। আমি ছিলুম তাঁর শিষ্য।

এই সময় পার্শী ব্যবসায়ী কে, এফ, ম্যাডান গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে সিনেমা দেখাতে শুরু করলেন। অধিকাংশই "প্যাথেফিল্মস্"—বিলিতি ছবি। অবশ্য তার অনেক আগে হীরালাল বাবু তাঁর 'রয়াল বায়োস্কোপ' দেখাতেন 'ক্লাসিক থিয়েটার' প্রভৃতি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। অভিনয় শেষে অতিরিক্ত আকর্ষণ রূপে বায়না পেলে বাইরে গিয়েও এঁরা বায়োস্কোপ দেখাতেন। বড়লোকদের বাড়ীতেও উৎসবে বা সখের বায়নায় এঁদেও দেখাতেন। এক জায়গায় দেখতে গিয়ে অভিজ্ঞতাও হয়েছিল আমার বড় করুণ। ম্যাজ করতে লাগলো ঘণ্টাখানেক। আলো ঠিক করতে প্রায় আধঘণ্টা। ফোকাস ঠিক করতেও অনেকক্ষণ। অত কি ধৈর্য থাকে অল্প বয়সে? বড় বিরক্ত হয়েছিলুম। কিন্তু শেষে শেষ পর্যন্ত খুশী হতুম যদি না মাঝে ফিল্ম ছিঁড়ে যেত! ছবি জীবন্ত মানুষের মতো হাঁটবে, চলবে, নাচবে, দাঁড়াবে, চিনেবাদাম খাবে, গাছে চড়বে, গাড়ী চালাবে। সজীব জীবন্তও বায়োস্কোপের পর্দায় লাফালাফি কাঁপাকাঁপি করতো। মাঝে মাঝে ছিঁড়েও যেতো। তখন ভয়ানক খারাপ লাগতো।

সিনেমা দেখে ভালো লাগলো এবং নেশা ধরে গেল প্রথম ম্যাডানের 'এলফিনস্টোন সিনেমা' দেখে। শেষে আমাদের আড্ডাতেই ঠিক হ'ল যে আমরাই সিনেমার ছবি তুলবো। কিন্তু অনেক টাকার দরকার। নানারকম মেশিনারী চাই। মুভি ক্যামেরা চাই, স্টুডিয়ো দরকার। যৌবনের উৎসাহে মনে হ'ল ও সবই হয়ে যাবে! হরিদাস বাবুর আড্ডায় দুপুরে শিশির ভাদুড়িও আসতো। অবশ্য মাঝে মাঝে। সে তো খুবই উৎসাহ দিলে। আর সব চেয়ে উৎসাহ দেখালে আমাদের ইউনিং ক্লাবের বিশিষ্ট সভ্য—প্রাণধন চক্রবর্তী। ঠিক হ'য়ে গেল ফিল্ম্ তোলা হবে। প্রাণধন বললে—টাকার জন্য আটকাবে না। দেয়ার বেচে টাকা তুলবো। কোম্পানীর নাম দেওয়া হ'ল সর্বসম্মতিক্রমে 'প্রাণধন ফিল্মস্ কোম্পানী লিমিটেড'।

কী বই প্রথম তোলা হবে? শিশির বললে—রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা"। শুনে সবাই একমত হ'ল। সিনেরিয়ো লিখবে কে? সে ভার সকলে মিলে আমার উপরই দিলেন। আমি তো মহাউৎসাহে সাতদিন ধরে খুব খেটে 'চিত্রাঙ্গদার সিনেরিয়ো' খাড়া করে হাজির করলুম আড্ডায়। শিশির চেঁচিয়ে পড়লে। সবাই শুনে মহা খুশী। সিনেরিয়ো সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হ'ল। কিন্তু, টাকার হিসাব করতে ব'সে খরচের অঙ্ক দেখে মাথায় বজ্রাঘাত। শিশির নিরুৎসাহ নয়। বললে, ভাবনা কী? লিমিটেড কোম্পানী ক'রে দেয়ার বেচে টাকা তুলবো। তা সে করেছিল কিন্তু পরবর্তী জীবনে। "প্রাণধন ফিল্মস্" হ'ল না বটে, কিন্তু শিশিরের "তাজমহল ফিল্মস্" হয়ে ছিল এবং ছবিও তুলেছিল। অবশ্য বাগানে গিয়ে ছবি তোলার ব্যাপারের মধ্যে ইউনিং ক্লাবের কেউ কেউ ছিল, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটেরও কেউ কেউ ছিলো, ওল্ড ক্লাবেরও কেউ কেউ ছিলো,—আর সকলের প্রধান ছিলেন নীতিন লাহিড়ী মহাশয়।

—এই দেখো, আড্ডায় গল্প বলতে ব'সে আড্ডাধারীদের অবান্তর কথাতেই ভরে উঠলো পুঁথি। তাই-ই হয়। আড্ডা জমে ওঠে এক এক জন অধিতীয় আড্ডাধারীকে কেন্দ্র করেই। ইউনিং ক্লাবের আড্ডা একটা নতুন মোড় নিয়েছিল, মুকুন্দ দাঁ স্ট্রীট ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ের বাড়ী ছেড়ে যখন নন্দদুলাল চৌধুরীর মেসে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সুরধামের' হলটিতে উঠে গেল। রাস্তার এ অংশটির নাম হয়েছে এখন বি, এল, রায় স্ট্রীট।

"সুরধামে" দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের এক মস্ত আড্ডা ছিল। এটিকে অনেকটা "সাংস্কৃতিক সমাবেশ" বলা যেতে পারে। কারণ, তখনকার খ্যাতনামা সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, ঐতিহাসিক, নাট্যকার, সুরকার প্রভৃতি গুণীজনের নিত্য সমাবেশ ছিল। ইউনিং ক্লাব এর মধ্যে এসে পড়ায় তার চরিত্র বদলে গেল।

'থিয়েটারের আড্ডা' হ'য়ে উঠলো সাহিত্যরসের তীর্থ-বাসর। প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল হ'ল "প্রবাসী'র চেয়েও উৎকৃষ্ট একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করবো। যার আকৃতি 'প্রবাসী'র চেয়ে মোটা, চিত্র সম্পদেও অধিকতর উজ্জ্বল, রচনা সম্ভারেও বিশিষ্ট এবং মূল্যও দ্বিগুণ হবে। এ ব্যাপারে তাঁকে অনেকেই উৎসাহ দিলেন আবার অনেকে দিলেনও না।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকাই ছিল সেদিন এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলা দেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনাসম্ভারে সে পত্রিকা ছিল অদ্বিতীয়। হরিদাস বাবু দুঃসাহসিকের মতো সেই 'প্রবাসী'র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে সম্পাদক পদে বরণ করে। দ্বিজেন্দ্রলাল পত্রিকার নামকরণ করলেন "ভারতবর্ষ"! সুতরাং, বুঝতেই পারছেন আমাদের 'ইভনিং ক্লাব' হ'য়ে উঠলো 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রকাশনায় উৎসাহীদের একটি প্রধান আড্ডা।

হরিদাস বাবুর মস্ত একটা সুবিধে হয়েছিল এই পত্রিকা প্রকাশের। কারণ, বাংলাদেশের সেরা সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁদের সকলেরই গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয় থেকে। কাজেই 'ভারতবর্ষে'র জন্য লেখকের অভাব হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশ হবার আগেই হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে দ্বিজেন্দ্রলালের অকালমৃত্যু ঘটায় আমাদের সকলের মন যেন ভেঙে পড়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল মহা উৎসাহে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রথম পৃষ্ঠার জন্য 'ভারতবর্ষ' নামে একটি কাব্য-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন—

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ।"

এবং সম্পাদকের বক্তব্যও লিখে ফেলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তার প্রমাণ রেখে গেছেন তিনি এই সম্পাদকীয় বক্তব্যের মধ্যে। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যকে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ প্রমাণ করবার জন্য তিনি একদিন উঠেপড়ে লেগে তীব্র সমালোচনার তীক্ষ্ণ কলম চালিয়েছিলেন, সেই মানুষই রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লিখেছেন দেখলুম—ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হলে রবীন্দ্রনাথ আজ Peerage পেতেন। কবিগুরুর সম্বন্ধে তাঁর এত মহৎ ও উচ্চ ধারণার পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম।

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সুরধামের' প্রাঙ্গণে নিত্য অপরাহ্নে এক মস্ত আড্ডা বসত। আগেই বলেছি তদানীন্তন বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক এ আড্ডায় নিয়মিত আসতেন। যে কজনের নাম মনে পড়ে তাঁরা হ'লেন কবি অক্ষয় কুমার বড়াল, কবি রসময় লাহা, কবি বিজয় চন্দ্র মজুমদার, কবি বরদাচরণ মিত্র, পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দেবনারায়ণ রায়, কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, প্রসাদ গোস্বামী, এঁকে আমরা দাদামশাই বলতুম কারণ, সম্পর্কে ইনি দ্বিজুদা'র দাদাশ্বশুর হতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের দাদা হরেন্দ্রলাল রায়ও মাঝে মাঝে আসতেন, যাঁর ছেলে মেঘেন্দ্রলাল রায় সবার সঙ্গেই বেশ ভিড়ে গেছলেন। ৺দীনবন্ধু মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র ললিতমোহন মিত্র এ আড্ডার একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন।

এই আড্ডার কোনও একজন নির্বোধ আড্ডাধারী একদিন বলে বসলেন—"রবিঠাকুরের গান আর কবিতার চেয়ে আপনার গান আর কবিতা অনেক ভালো।"

দ্বিজেন্দ্রলাল তখন সবে চায়ের কাপটি তুলে নিয়ে একটি চুমুক দিয়েছেন কি না দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি বেতের টেবিলের উপর কাপটি নামিয়ে রেখে বললেন—গান বা কবিতা তুমি যে কিছুই বোঝোনা এটা বেশ ভালো করেই জানা গেল। তারপর 'সুরধামের' সেই প্রাঙ্গণে একটি খুব উঁচু নারকেল গাছ ছিল, সেই গাছটি তাঁকে দেখিয়ে দ্বিজুদা বললেন, "রবীন্দ্রনাথের আসন যদি ঐগাছের চূড়োর ওপর হয়, আমার আসন হবে ঐ গাছের তলার মাটিতে।" আমরা রসীন্দ্রানুরাগী; আমাদের একথাটি যে কত ভালো লেগেছিল তা' বলে বোঝাবার প্রয়োজন নেই।

ইডনিং ক্লাবকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'সুরধামে' টেনে আনায়, তাঁর কোনো সুবিধা হোক বা না হোক, আমরা কিন্তু যোলো আনা উপকৃত হ'য়েছিলুম। বহু বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হবার দুর্লভ সৌভাগ্য এই আড্ডার কৃপাতেই আমরা পেয়েছিলুম। আর দেশের বড় বড় বিশিষ্ট গায়ক-বাজিয়েদের গুণপনার পরিচয় এই 'সুরধামের' আসরের কল্যাণেই পেয়েছিলুম। দ্বিজেন্দ্রলাল একাই সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন না, তাঁর পরিবারের সকলেই ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। তাঁর পুত্র দিলীপকুমার ও কন্যা মায়াদেবীও সুরের রাজ্যে অতুলনীয় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। সুধাকণ্ঠ দিলীপকুমার তো আজও বিশ্ব-বিজয়ী সঙ্গীতজ্ঞ রূপে সর্বজনপ্রিয়। দেশের বড় বড় গুণী শিল্পীর আসর বসতো এই 'সুরধামে'।

আমাদের একান্ত দুরদৃষ্ট, তাই "ভারতবর্ষ" প্রকাশের আগেই তিনি অকস্মাৎ 'সুরধাম' ছেড়ে সুরলোকে তাঁর পত্নী সুরবালার সঙ্গে মিলিত হ'তে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইডনিং ক্লাবের শান্তি-প্রদীপও নিভে গেল। আড্ডাধারীরাও কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো। কেউ কেউ অসময়ে লোকান্তরেও চলে গিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অবর্তমানে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশ করা সঙ্গত হবে কিনা এ নিয়ে বেশ একটু দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বন্ধুবর প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের অদম্য উৎসাহ ও অনলস পরিশ্রমের ফলে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা 'বৈশাখের পরিবর্তে আষাঢ়ে- ঘোষিত সময়ের দু'মাস পরে প্রকাশিত হ'ল। হবামাত্রই কিন্তু, vini-vidi-vici অর্থাৎ চারিদিকে জয়জয়কার পড়ে গেল।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ভারতবর্ষ পত্রিকায় আমার একটি শোকগাথা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী ঠিক গতানুগতিক ছিল না। আরম্ভই হয়েছিল কবিতাটি এইভাবে: "আজকে হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে বাণীর বীণার একটি তার।" এই নূতনত্ব 'ভারতী' পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ফলে আমার নব-পরিচিত হেমন্ত কুমার রায় একদিন আমাকে পাকড়াও করে 'ভারতী'র আড্ডায় নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলেন। সেখানে আরও দু'জন বাল্যবন্ধুকে পেলুম—প্রভাত কুমার গাঙ্গুলী ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিষাচার্য শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ গুপ্ত চল্লিশ বছরেরও অধিককাল জ্যোতিষের সাধনায় ব্যাপৃত। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে এঁর পড়াশুনা যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। নানা পত্র-পত্রিকায় মানুষের ভাগ্য, মনোবৃত্তি এবং হাতের অঙ্গুলি নিয়ে এঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া এঁর রচিত গ্রন্থগুলি, যথা: 'গ্রহরত্নের কথা', জন্মমাস ও জাতক', 'হাত দেখার কথা.' 'Influence of Gems & Hindu Astrology', 'মনস্তত্ত্ব কথার উপায়' প্রভৃতি বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। বর্ষফল নিয়ে ইনি নতুন ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্ত ও গণনা এই নিবন্ধে পরিবেশন করেছেন, আমাদের বিশ্বাস পাঠক সাধারণের কাছে তা আকর্ষণীয় বোধ হবে।

জন্মবার থেকে বর্ষফল

সৌরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রাশি নক্ষত্র প্রভৃতি বিচার করে মাস বা বছরটি মানুষের কেমন যাবে নানা পত্রপত্রিকায় ও পত্রিকায় সে সম্বন্ধে লেখা হয়। নিঃসন্দেহে সেগুলি গভীর গবেষণা ও চিন্তার ফল। কিন্তু এমন অসংখ্য ব্যক্তি আছেন যাঁরা ঠিকুজী-কুষ্ঠীর ধার ধারেন না, নিজেদের রাশি নক্ষত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তাঁরা শুধু জানেন অমুক বারে জন্মেছেন এবং অমুক তারিখে। কিন্তু তাঁদের পক্ষেও বছরটা কেমন যাবে তা জানবার জন্যে উৎসুক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে তাঁদের জন্যেই আমার এই নতুন প্রচেষ্টা। জন্মবার থেকে একটি মানুষের ভবিষ্যৎ দিনগুলির ভালমন্দ বিচার করতে বলে আমাকে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয়েছে। পরিকল্পনা ছিল (এবং এখনো আছে) একটি সপ্তাহ ধরে বা একটি মাস ধরে জন্মবার থেকে প্রতি তারিখের ফলাফল লিখব। গল্প-ভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে উপস্থিত জন্মবার থেকে সারা বছরের ফল সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখলাম। সুযোগ হলে সাপ্তাহিক বা মাসিক ফলাফল লেখা বা ব্যক্তিগতভাবে জানানো যেতে পারে।

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এক একটা বছরের প্রভাবের কথা আমাদের শাস্ত্রে আছে এবং প্রবাদেও আছে। এ বিষয়ে ঘনার ও অন্যান্য পণ্ডিত ও গণনাবিদ্‌দের বহু উক্তি রয়েছে। 'কোষ্ঠীপ্রদীপে' লেখা আছে ধর্মাধী তীর্থপূতশ্চ সহিষ্ণুশ্চ প্রিয়ম্বদ; অল্পব্যয়ে ধনীখ্যাতো রবিবারে প্রসূয়তে। অর্থাৎ রবিবারে যে জন্মায় সে হয় ধর্মাধী, তীর্থপূত, সহিষ্ণু, প্রিয়ভাষী এবং অল্পেই ধনী বলে খ্যাত।

'হোরারত্ন', 'যবন জাতক', প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থেও বারের প্রভাব নির্ণয়কারী বহু শ্লোক আছে।

আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় মানুষ যেই জন্মায় তখনি তার ভবিষ্যৎ ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু একই বারে জন্মেছে এমন দুজন মানুষের জীবন সম্পূর্ণ আলাদা পথে ভবিষ্যতে অতিবাহিত হয়েছে। এতো আমরা হামেশাই দেখি। যেদিনে একজন মহাপণ্ডিত জন্মালেন, সেইদিনেই জন্মালো এক মূর্খ! তাহলে? এই ভাবে একই বারে জন্মেছে অথচ দুই বিপরীত চরিত্র—এদের ভবিষ্যৎ বার-বিচার করে কেমন করে বলা যাবে?

যাবে। শুভাশুভ ফল বলতে কোন বাধা নেই। অবশ্য তার পরিণাম দু'জনার ক্ষেত্রে এক রকম হবে না। রাশি নক্ষত্র প্রভৃতির প্রভাবও থাকবে বৈকি। তাই, ধরুন, দু'জন ডাক্তার একই বারে জন্মেছেন। গণনা করে বললাম, অমুক তারিখে দুজনেই অন্য দিনের অপেক্ষা বেশি রোজগার করবেন। একজন করলেন হয়ত এক টাকা বেশি, অন্যজন করলেন হাজার টাকা বেশি রোজগার। সেদিনের ফল ওঁদের দু'জনের পক্ষে শুভই ছিল—কিন্তু পরিমাণে অনেক তারতম্য ঘটল। এর কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র। গরীব দুঃখীর ঘরের ছেলে আর রাজার ঘরের ছেলে একই বারে জন্মাচ্ছে। কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ তো সমান হতে পারে না। তবে তারই মধ্যে একটি দিনের শুভ বা মন্দ ফল দু'জনের পক্ষেই গণনানুসারে প্রযোজ্য হতে বাধা নেই। কিন্তু তার তারতম্য অবশ্যই ঘটবে, জাতকের কর্মজীবন, পারিবারিক অবস্থা শিক্ষাদীক্ষা এবং তার জন্মরাশি নক্ষত্র প্রভৃতির প্রভাবে।

এই নিবন্ধে আমরা, যে যে মাস ভাল যাবে না সেই সেই মাসের উল্লেখ করলাম, কিন্তু সেই সেই মাসের আবার কয়েকটা তারিখ শুভফলপ্রদত্তও হতে পারে, তার লক্ষণও দেলাম। তাই সেই শুভফলপ্রদ তারিখগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছিল। এর দ্বারা জাতক দিনগুলির ভালমন্দ ফল মিলিয়ে নিতে পারবেন। যে যে বারে যেসব মাসের উল্লেখ নেই, ধরে নিতে হবে সেই মাসগুলি জাতকের পক্ষে সাধারণভাবে শুভ। সেই শুভ মাসগুলিতে জাতকের পক্ষে নিজের অবস্থার উন্নতিকল্পে আরও বেশি যত্নবান ও চেষ্টিত হওয়া বিধেয়।

রবিবার

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র বিশেষ ভালো যাবে না। ওই মাসগুলোর ভিতর যে যে তারিখে কাজ করলে ফল শুভ হবে নিচে সেই তারিখগুলো লেখা হোলো।

জ্যৈষ্ঠ—৮ই (২২শে মে, বুধবার) ; ১৫ই (২৯শে মে বুধবার) ; ২১শে (৫ঠা জুন, মঙ্গলবার)।

আষাঢ়—৬ই (২০শে জুন, বৃহস্পতিবার), ১০ই (২৪শে জুন, সোমবার), ১৬ই (৩০শে জুন, রবিবার)।

ভাদ্র—৪ঠা (২০শে আগষ্ট, মঙ্গলবার), ৭ই (২৩শে আগষ্ট, শুক্রবার); ১৩ই (২৯শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার)।

কার্তিক—৫ই (২২শে অক্টোবর, মঙ্গলবার), ১২ই (২৯শে অক্টোবর, মঙ্গলবার)।

পৌষ—৩রা (১৮ই ডিসেম্বর, বুধবার), ১৪ই (৩০শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার), ১৮ই (২রা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ২১শে (৫ই জানুয়ারী, রবিবার), ২৪শে (৮ই জানুয়ারী, বুধবার), ২৫শে (৯ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ২৯শে (১৩ই জানুয়ারী, সোমবার)।

মাঘ—৩রা (১১ই জানুয়ারী, শুক্রবার), ৮ই (২২শে জানুয়ারী, বুধবার), ১১ই (২৫শে জানুয়ারী শনিবার)।

চৈত্র—৩রা (১৭ই মার্চ, সোমবার), ৬ই (২০শে মার্চ, বৃহস্পতিবার) ১৭ই (৩১শে, মার্চ,

সোমবার

বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন খারাপ। এর মধ্যে কিছু শুভফলদায়ক তারিখ নির্ণয় করা হ'লো।

বৈশাখ—৬ই (১৯শে এপ্রিল, শুক্রবার), ৮ই (২১শে এপ্রিল, রবিবার), ১২ই (২৫শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার), ১৩ই (২৬শে এপ্রিল, শুক্রবার)।

শ্রাবণ—৪ই (২১শে জুলাই, রবিবার), ৯ই (২৫শে জুলাই, বৃহস্পতিবার)

আশ্বিন—৪ঠা (২১শে সেপ্টেম্বর, শনিবার), ৯ই (২৬শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার), ১৪ই (২রা অক্টোবর, বুধবার)।

অগ্রহায়ণ—১০ই (২৬শে নভেম্বর, মঙ্গলবার), ১৪ই (৩০শে ডিসেম্বর, শনিবার), ১৬ই (২রা ডিসেম্বর, সোমবার)

ফাল্গুন—২রা (১৪ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার), ৮ই (২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ৯ই (২১শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার), ১১ই (২৪শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার), ১২ই (২৫শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার), ১৬ই (২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার)।

মঙ্গলবার

বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন খারাপ যায়। এর মধ্যে যে দিনগুলি কিছুটা শুভ ফলদায়ক সেই তারিখগুলো দেওয়া হোলো।

বৈশাখ—৬ই (১৯শে এপ্রিল, শুক্রবার), ৯ই (২২শে এপ্রিল, সোমবার), ১৩ই (২৬শে এপ্রিল, শুক্রবার)।

শ্রাবণ—৩রা (১৯শে জুলাই, শুক্রবার), ৬ই (২২শে জুলাই, সোমবার), ১০ই (২৬শে জুলাই, শুক্রবার)।

আশ্বিন—১লা (১৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার), ৪ঠা (২১শে সেপ্টেম্বর, শনিবার), ৯ই (২৬শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার), ১১ই (২৮শে সেপ্টেম্বর, শনিবার)।

অগ্রহায়ণ—৭ই (২৩শে নভেম্বর, শনিবার), ১০ই (২৬শে নভেম্বর, মঙ্গলবার), ১৪ই (৩০শে নভেম্বর, শনিবার)।

ফাল্গুন—২রা (১৪ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার), ৮ই (২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ৩রা (২১শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার), ১২ই (২৪শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার), ১৬ই (২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার)।

বুধবার

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, চৈত্র, বিশেষ ভালো যাবে না। ওই মাসগুলোর [illegible] যে তারিখে কাজ করলে ফল শুভ হ'বে নিচে সেই তারিখগুলো দেওয়া হোলো।

জ্যৈষ্ঠ—৮ই (২২শে মে, বুধবার), ১৫ই (২৯শে মে, বুধবার), ২১শে (৪ঠা জুন, মঙ্গলবার), ২৪শে (৮ই জুন, শনিবার) ২৭শে ১০ই জুন, সোমবার)।

আষাঢ়—৩রা (১ ই জুন, সোমবার), ১০ই (২৪শে জুন, সোমবার)।

ভাদ্র—৩রা (১৯শে আগষ্ট, সোমবার), ৪ঠা (২০শে আগষ্ট, মঙ্গলবার), ১০ই (২৬শে আগষ্ট, সোমবার)।

কার্তিক—৫ই (২২শে অক্টোবর, মঙ্গলবার), ১১ই (২৮শে অক্টোবর, সোমবার), ১৮ই (২৯শে অক্টোবর, মঙ্গলবার)।

পৌষ—৩রা (১৮ই ডিসেম্বর, বুধবার), ৯ই (২৪শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার), ১০ই (২৫শে ডিসেম্বর, বুধবার), ১৬ই (৩১শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার), ২২শে (৬ই জানুয়ারী, সোমবার)।

মাঘ—৮ই (২২শে জানুয়ারী, বুধবার), ১৫ই (২৯শে জানুয়ারী, বুধবার)।

চৈত্র—৩রা (১৭ই মার্চ, সোমবার), ১০ই (২৪শে মার্চ, সোমবার), ১৭ই (৩১শে মার্চ, সোমবার)।

বৃহস্পতিবার

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, চৈত্র বিশেষ ভালো যাবে না। ওই মাসগুলোর শুভফলদায়ক তারিখগুলি দেওয়া হোলো।

জ্যৈষ্ঠ—২রা (১৬ই মে, বৃহস্পতিবার), ৮ই (২২শে মে, বুধবার), ১৫ই (২৯শে মে, বুধবার)।

আষাঢ়—৩রা (১১ই জুন, সোমবার), ৬ই (২০শে জুন, বৃহস্পতিবার), ১০ই (২৪শে জুন, সোমবার), ১৩ই (২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার)।

ভাদ্র—৩রা (১৯শে আগষ্ট, মঙ্গলবার), ৯ই (২৪শে আগষ্ট, রবিবার), ১০ই (২৬শে আগষ্ট, সোমবার), ১৩ই (২৯শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার)।

কার্তিক—৫ই (২২শে অক্টোবর, মঙ্গলবার), ১১ই (২৮শে অক্টোবর, সোমবার), ১২ই (২৯শে অক্টোবর, মঙ্গলবার)।

পৌষ—৩রা (১৮ই ডিসেম্বর, বুধবার), ৯ই (২৪শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার), ১০ই (২৫শে ডিসেম্বর, বুধবার), ১৬ই (৩১শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার), ১৮ই (২রা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ২২শে (৬ই জানুয়ারী, বুধবার), ২৯শে (১৩ই জানুয়ারী, সোমবার)।

মাঘ—২রা (১৪ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ৮ই (২২শে জানুয়ারী, বুধবার), ৯ই (২৩শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ১৫ই (২৯শে জানুয়ারী, বুধবার)।

চৈত্র—৩রা (১৭ই মার্চ, সোমবার), ৬ই (২০শে মার্চ, বৃহস্পতিবার), ১০ই (২৪শে মার্চ, সোমবার), ১১ই (৩১শে মার্চ, সোমবার)।

শুক্রবার

বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন খুব খারাপ মাস। এর মধ্যে যে যে দিনগুলোতে কাজ করলে ফল ভালো হবে সেই তারিখগুলো দেওয়া হোলো।

বৈশাখ—১লা (১৪ই এপ্রিল, রবিবার), ৪ই (১৮ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার), ৬ই (১৯শে এপ্রিল, শুক্রবার), ৮ই (২১শে এপ্রিল, রবিবার), ১২ই (২৫শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার), ১৩ই (২৬শে এপ্রিল, শুক্রবার)।

শ্রাবণ—২রা (১৮ই জুলাই, বৃহস্পতিবার), ৩রা (১৯শে জুলাই, শুক্রবার), ৫ই (২১শে জুলাই, রবিবার), ৯ই (২৫শে জুলাই, বৃহস্পতিবার), ১০ই (২৬শে জুলাই, শুক্রবার), ১৪ই (৩০শে জুলাই বুধবার)।

আশ্বিন—২রা (১৮ই সেপ্টেম্বর, বুধবার), ৬ঠা (২১শে সেপ্টেম্বর, শনিবার), ১১ই (২৬শে সেপ্টেম্বর, শনিবার)।

অগ্রহায়ণ—৪ঠা (২০শে নভেম্বর, বুধবার), ৭ই (২৩শে নভেম্বর, শনিবার), ১১ই (২৭শে নভেম্বর, বুধবার)।

ফাল্গুন—২রা (১৪ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার), ৪ঠা (১৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার), ৮ই (২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ৯ই (২১শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার), ১১ই (২৩শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার), ১৪ই (২৭শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ১৬ই (২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার)।

শনিবার

এই বছরের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, চৈত্র বিশেষ ভালো যাবে না। এই মাসগুলোর মধ্যে যে যে তারিখগুলোতে শুভ ফল পাবেন নিচে সেই তারিখগুলো দেওয়া হোলো।

জ্যৈষ্ঠ—২রা (১৬ই মে, বৃহস্পতিবার), ৮ই (২২শে মে, বুধবার), ৯ই (২৩শে মে, বৃহস্পতিবার) ১৪ই (২৯শে মে, বুধবার), ১৮ই (১লা জুন, শনিবার), ২৩শে (৬ই জুন, রবিবার)।

আষাঢ়—২রা (১৩ই জুন, রবিবার), ৬ই (২০শে জুন, বৃহস্পতিবার), ৭ই (২১শে জুন, শুক্রবার), ৯ই (২৩শে জুন, রবিবার), ১৩ই (২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার), ১৫ই (৩০শে জুন, রবিবার)।

ভাদ্র—৭ই (২৩শে আগষ্ট, শুক্রবার), ৯ই (২৫শে আগষ্ট, রবিবার), ১৩ই (২৯শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার)।

কার্তিক—২রা (১৯শে অক্টোবর, শনিবার), ১০ই (২৭শে অক্টোবর, রবিবার)।

পৌষ—৩রা (১৮ই ডিসেম্বর, বুধবার), ৬ই (২১শে ডিসেম্বর, শনিবার), ১০ই (২৫শে ডিসেম্বর, বুধবার), ১৩ই (২৮শে ডিসেম্বর, শনিবার), ১৮ই (২রা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ২১শে (৫ই জানুয়ারী,

রবিবার), ২৩শে (৮ই জানুয়ারী, বুধবার), ২৭শে (৯ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ২৮শে (১২ই জানুয়ারী, রবিবার)।

মাঘ—২রা (১৬ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ৮ই (২২শে জানুয়ারী, বুধবার), ৯ই (২৩শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার), ১১ই (২৫শে জানুয়ারী, শনিবার), ১৪ই (২৯শে জানুয়ারী, বুধবার)।

চৈত্র—৬ই (২০শে মার্চ, বৃহস্পতিবার), ৯ই (২৩শে মার্চ, রবিবার), ১৩ই (২৭শে মার্চ, বৃহস্পতিবার), ১৬ই (৩০শে মার্চ, রবিবার)।

** এই রচনাটি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের মতামত আহ্বান করা হচ্ছে—গল্প-ভারতী সম্পাদক।

* * * *

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষ বলে, আমার নেই জন্ম-উৎসব—
দূরের দিকে চেয়ে আরম্ভ বলে,
হায়, কোথায় আমার পরিণতি ?
দিনের শেষে শেষ বলে, হায়, আমি নিঃশেষে গেলাম হারিয়ে।
উষার আলোয় একা কাঁদে আরম্ভ, কোথায় আমার শেষ ?

*

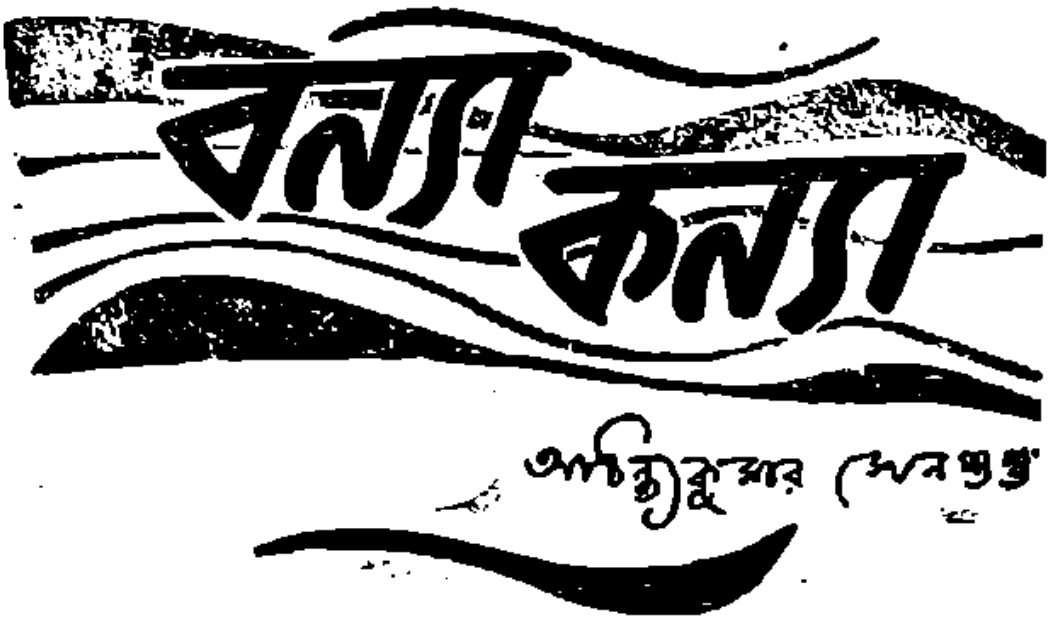

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়ার মাটি করবে, না কেরিয়ারের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার কার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি

দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্যভাবে।

হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছে থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। নরসিংবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন নরসিংবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না।

একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জনজনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে ঘর্ষিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস্ দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর শুনে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সাহিত্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে আফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার বন্দিনী মহিমময় সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার

দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানছে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্বাসন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে হৃদয় জুড়াই। সন্দীপের কথা মনে পড়ল।

॥ সতেরো ॥

বনছায়া ভেবেছিল বোধহয় দেখা পাবে না, গিয়ে শুনবে ফেরেনি অফিস থেকে, কিংবা সংসারে সুমতি হবার জন্য নতুন কোনো টিউশানিতে গিয়ে লেগেছে। না, আজ আর বসবে না, অপেক্ষা করবে না, বাড়িতে নেই শুনলেই চলে যাবে। সে যে এসছিল হাওয়াতে এমনি একটা নিশ্বাসরেখাও না থাকে তো ভালো হয়।

বাড়িটা খুব ঝাপসা-ঝাপসা নিঝুম মনে হচ্ছে না? তবে কি সন্দীপ এ বাড়িতে নেই? বাসা বদলেছে? তার যেমন বাসা বদলানো? বনছায়ার বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। নিজে ছেড়ে দিলেও অন্যে তাকে ছেড়ে দিয়েছে এ ভাবতে কেন হাঁপ ধরে?

সত্যি কোনো খোঁজখবর নেয়নি এতদিন। অবশ্যি তার বিয়ে হয়ে যাবার পর তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজখবর নেবার কোনো মানে হয় না, বিশেষত সে যখন তিমির, বা, তার চেয়েও ভয়ংকর, সে যখন উদাসীন। কিন্তু মানুষ হিসেবে না হোক, সাহিত্যিক হিসেবেও তো বনছায়ার থেকে কিছুটা মনোযোগ সে দাবি করতে পারত! সেই যে 'বিষাণ' পত্রিকায় তার একটা উপন্যাস বেরুবার কথা ছিল, সেটা কতদূর কী ছাপা হল তারও তো সে কোনো খোঁজ রাখেনি। এক সংখ্যা পড়েও দেখেনি কেমন লেখা, কাদের নিয়ে লেখা! হ্যাঁ, বনছায়া মনকে বোঝাতে চাইল এই এক সাহিত্যিক সতীর্থের কাছেই সে চলেছে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়।

ভগবান করুন, যেন দেখা না হয়। কোনো এক বিশেষ লগ্নে তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষার পর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যদি না আসে তখন আশাভঙ্গ ঘটলেও একটা গভীর আরাম পাওয়া যায়। আর যে প্রতীক্ষা করতে হবে না সেই আরাম। তেমনি এখন যদি এতটা পথ আপন গোঁয়ে চলে এসে সে সন্দীপের দেখা না পায় তবে মনের গভীরে সে আশাভঙ্গের নির্মল আরাম পাবে। কেননা এর পর দুরুদুরু বুকে আর তাকে পথ চলতে হবে না, নিশ্চিন্ত সহজে ফিরে যেতে পারবে।

এগিয়ে আসাতেই যন্ত্রণা। ফিরে যাওয়াতেই শান্তি।

দরজাটা খোলা, অন্ধকার-মতন। কাউকে দেখা গেল না কাছাকাছি। মা কই, দিদি কই? কই সেই পরিচিত কোলাহল?

খোলা দরজায় কড়া নাড়ার কোনো মানে হয় না, বনছায়া এক পা দু পা করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ঐ যে, ঐ সন্দীপের ঘর, আলো জ্বলছে।

বনছায়ার কেন কে জানে ভয় করতে লাগল। অন্ধকারকে ভয় করেনি আলো-কে ভয়! কিন্তু যা ভয় দেখায় তাই বুঝি আবার আকর্ষণ করে।

ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বনছায়া। মেঝের উপর সতরঞ্চি পেতে, যেমন লেখে তেমনি লিখছিল সন্দীপ, দরজায় কিছু একটা অন্তরাল হয়ে দাঁড়ালেও চকল হল না, আনত চোখ আনতই রইল।

'লিখছেন?' মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বনছায়া।

'আরে, বনছায়া? এস, এস, এত দিন কোথায় ছিলে?' এক মুহূর্ত চোখ তুলল সন্দীপ।

বনছায়া বুঝি আহ্বানের মধ্যে আরো কিছু উত্তাপ আশা করেছিল। সেই সব মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি —আমার প্রেরণা, আমার প্রত্যাদেশ, আমার উজ্জ্বল উৎসাহ! আশ্চর্য, এখন তার এই লাজ-বদলের দিনে, নতুন অধ্যায়ে, এইসব রক্তাক্ত আহ্বান কি সঙ্গত হবে? যদি অন্য কেউ শুনতে পায়? যদি ঘরের দেয়ালগুলো শুনতে পায়? তার চেয়ে অনুচ্চারণই ভালো।

তবু গলায় কী রকম একটু অভিমান লেগে রইল। বনছায়া বললে, 'আপনি লিখছেন, আপনাকে এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না।'

'তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই। তুমি যে আমাকে বিরক্ত করতে আস না সেই তো আমার বিরক্তি। বোসো। এই জায়গাটা কোনো সহৃদয় লোককে পড়ে শোনাই ভারি ইচ্ছে করছিল। ভাগ্য তোমাকে ঠিক পাঠিয়ে দিয়েছে।'

লেখা শোনবার জন্যে! বনছায়ার মন বাঁকা হতে চাইল। কিন্তু রাগ করে লাভ কী? সে তো নিজের ইচ্ছায় এসেছে। আর সাহিত্যিকের সঙ্গ করতে এসে লেখা-পড়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকাই ভালো।

মিষ্টি করে হাসল বনছায়া। বললে, 'সহৃদয় লোক বলছেন, আমি কি সহৃদয়?'

'সাহিত্য বোঝবার মত হৃদয়টুকু থাকলেই যথেষ্ট। তার বেশি খোঁজে আমার দরকার নেই। তুমি বোসো।'

কী নির্মমের মত কথাটা বললে সন্দীপ। কখনো কখনো নিস্পৃহতাই বুঝি মমতাহীনতার চেহারা নেয়। তবু যখন এসেছে, বসতেই এসেছে, বনছায়া বসল, কিন্তু বেশ একটু দূরে বসল। মন্দ কী, সে যে আজ দূর সেটা স্পষ্টতর হোক।

সন্দীপ ওসব লক্ষ্যের মধ্যেই আনল না। সে পাণ্ডুলিপি গুছিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠা খুঁজতে লাগল কোত্থেকে আরম্ভ করবে।

বনছায়া জিজ্ঞেস করল, 'এটা নতুন লিখছেন?'

'হ্যাঁ, নতুন। আমার দ্বিতীয় উপন্যাস।' সন্দীপ যতই হাটকাচ্ছে ততই পৃষ্ঠা গোলমাল করে ফেলছে।

'আপনার প্রথম উপন্যাসের কী হল? যেটা বিবাগে বেরুবে ঠিক ছিল—'

'বলছি পরে। আগে এটা শোনা—এ জায়গাটা।' পাণ্ডুলিপি গুছিয়ে নিয়ে থামল সন্দীপ। চোঁক গিলল। বললে, 'প্রসঙ্গটা সেই সাবেক ত্রিকুজ। স্বামী স্ত্রী আর স্ত্রীর পূর্ব প্রণয়ী। পূর্ব প্রণয়ী কথাটা ঠিক হল না, বলা উচিত, আগের মানুষ। স্ত্রী যখন কুমারী ছিল তখন সেই আগের মানুষ তাকে স্নেহ করেছে

হয়তো কিছু প্রণয় করেনি। কাকে প্রণয় বা প্রেম বলে তা জানো তো? গাঢ় স্নেহের সঙ্গে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এসে মিশলেই তা প্রেম। একটা নির্দোষ কুমারী মেয়েকে অর্জন করতে খানিকটা স্নেহই যথেষ্ট, উন্মাদ প্রেমের দরকার নেই। অন্তত আমার এই উপন্যাসের নায়ক তেমনি অনুভব করেছে। তাই তার মধ্যে প্রেম জাগল, হ্যাঁ, বলতে পারো, উন্মাদ প্রেম—যখন সে কুমারী মেয়ে কলঙ্কিত হল।'

অস্ফুটে চমকে উঠল বনছায়া।

'কলঙ্কিত হল মানে যখন তার বিয়ে হল। তার আগের মানুষের চোখে তার বিয়ে কলঙ্কের হাস ছাড়া আর কী! আর সে-চিহ্নেই তো সে মেয়ে এত লোভনীয়। পরস্ত্রীত্বেই তো তার সমস্ত মর্যাদা। তাই যদি সত্যি ভালোবাসতে হয় তবে এই দুর্গমকে, এই দুর্লভকে, এই বিঘ্নসংকুলকে। বাধা আছে বলেই তো এ প্রেম তপ্ত ও দ্রুত। আর অবৈধ বলেই তো এত রুচিকর। তারপর শোনো এবার। অনেক উদ্বেগ-ভয় পেরিয়ে দুজনে মিলতে পেরেছে একরাত্রে—ভাবছে, স্বকীয়াতে কি এই অতিরিক্ত উপভোগ আছে, এই অন্যায়বোধের রোমাঞ্চ? হ্যাঁ, তারপর—'

সন্দীপ পড়তে লাগল। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল বনছায়া। আর, যত না শুনতে তত বেশি দেখতে।

নিজের থেকেই সহসা ছেদ টানল সন্দীপ। বনছায়ার চোখের উপর চোখ রেখে বললে, 'বলো কেমন হয়েছে?'

'এ তো স্পষ্ট দেহবাদ।' বনছায়ার চোখে-মুখে কুণ্ঠা ফুটল।

'দেহকে বাদ দিয়ে প্রেম স্পষ্ট হয় কী করে?' সন্দীপ হাসল: 'দেহই তো মন্দির। তার দীপ, স্নেহ তার তেল আর কামনা তার শিখা। মন্দিরে সেই দীপশিখা নিয়ে বিগ্রহকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় বিগ্রহ? সমস্ত প্রার্থনার পরিপূর্তিরূপ যে বিগ্রহ তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কিন্তু যাই বলুন, আপনার এ লেখাকে সবাই অশ্লীল বলবে।'

'অশ্লীল বলুক, অশিক্ষিত না বললেই হল।' সন্দীপ গম্ভীর হল: 'দেখতে হবে বাইরে যতই বস্তুনিষ্ঠা থাক, অন্তরে অনুভবের কাব্য আছে কিনা। জিনিসটা তো করে দেখানো নয়, লিখে দেখানো, তাই দেখতে হবে আমার ভাষায় শিল্পশ্রী আছে কিনা, রচনা রসের যাদুস্পর্শে আলোকিত হয়েছে কিনা—'

'আচ্ছা, শেষে কী হল?' সন্দীপের কথা থামিয়ে দিয়ে উপন্যাসের শেষ জেনে নিতে উৎসুক হল বনছায়া।

'শেষে কী হবে জানি না, ভাবতে পাচ্ছি না।' অসহায়ের মত মুখ করল সন্দীপ: 'তুমি বলে দাও না, ধরা পড়ে যাবার পর শেষটা কী হবে? কী হলে সুন্দর হয়?'

'বা, আপনার উপন্যাস, আপনি জানেন। আমার কী দায়িত্ব!'

'তুমিও তো লেখ। তুমি হলে কী করতে?'

'আমি হলে অমন ঘোরালো প্লটই নিতাম না। আগের মানুষটাকেই খানিকটা ঝোড়ঝাপ করিয়ে চিরকালের স্বামী করে দিতাম।'

'কিন্তু অন্যরকম প্লটও তো আছে, অন্যরকম ঘটনা। অক্ষতে মোহ নেই, বিক্ষতে আকর্ষণ। অজ্ঞানের দিকে হাত বাড়ায় না, বিস্তৃতের পিছনে ছোটে। তুমি এই জটিল মানুষকে নিয়ে কী করবে, কোন অঙ্কে কষে মেলে দুর্লভা? তাই ভেবে পাচ্ছি না এই উপন্যাসের শেষ কোথায়?'

'শেষ পাচ্ছেন না, শুধু লিখে চলেছেন?'

'শুধু লিখে চলেছি 'ভালোবেসে চলেছি—'

'কিন্তু আপনার শিল্পবোধ তো আপনাকে একসময় থামিয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ, যেমন তোমার শিল্পবোধ তোমাকে কতক্ষণ পরেই বটকা মেরে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। কী, তাই নয়? সীমার বোধই শিল্পবোধ।'

দুর্বল রেখায় হাসল বনছায়া। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলে, 'এই লেখাটা কোন্ কাগজে দেবেন?'

'আমার আবার কাগজ!' এবার গলা ছেড়ে হাসল সন্দীপ: 'আমার কাগজ শুধু এই!' বলে যে ফলটানা কাগজে লিখছিল তাই তুলে দেখাল। বললে, 'আমার শুধু লিখে যাওয়া। শুধু দাঁড় টেনে যাওয়া। কূলের কথা ফলের কথা না ভাবা।'

'কেন, আপনার প্রথম উপন্যাসের কী হল?' বনছায়া দীপ্ত চোখে আনন্দ ছড়াল: 'বিষাণ নেয়নি?'

'নিয়েছে কিন্তু টাকা দিচ্ছে না।'

'সে কী, কিস্তিমাফিক একটা টাকা দেবার কথা ছিল না?'

'দু কিস্তি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।' সন্দীপ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল: 'যার বরুন দিদিকে আর রাখা গেল না এখানে। আর নেই তো পুরুষ কী দিয়ে?'

'লেখাও বন্ধ করে দিয়েছেন তো?'

'না, ঠিকমত কিস্তি পাঠিয়ে যাচ্ছি, যদি ভবিষ্যতে কখনো দেয়। টাকা পাচ্ছি না—বিশেষত চুক্তিবদ্ধ টাকা—বেশ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু বই লিখলাম অথচ কেউ পড়ল না সে কষ্টটা আরো কঠিন। তবু কতক লোক বইটা পড়ছে, দু একজন প্রশংসা করছে, বলো এই উপভোগটা কি তুচ্ছ? এটুকুই বা আমাকে কে দেয়? নাইবা টাকা হল, লেখাটা তো হল।'

'তারপর আবার আরেকটা ধরেছেন? নায়ক-নায়িকার ভবিষ্যৎ জানেন না—আপনার এই দ্বিতীয় বইটারই বা কি ভবিষ্যৎ?'

'তবু চিটপানি করার চেয়ে এ ভালো। আমার লেখার ভবিষ্যৎ না থাক্ বর্তমান তো আছে। আর এই যে লিখছি, লিখতে পারছি, এই তো আমার আনন্দের বর্তমান। আমার কেবলই মনে হয় আমি যত বেশি আজ হব তত বেশি আমার সাফল্যকে এগিয়ে আনব। পয়সা প্রতীক্ষা করতে পারে, প্রেম পারে না।'

'দাঁড়ান, আমি বিষাণের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করব। আপনার প্রাপ্য আদায় করে এনে দেব দেখবেন।' বনছায়া দৃঢ়তার ভঙ্গি করল। তারপর চোখে কুহক মাখিয়ে বললে, 'আপনার দ্বিতীয় উপন্যাসটা নিয়ে আমি পীযূষ দত্তের সঙ্গে দেখা করব, দেখব তার 'প্রবাহে' নেওয়াতে পারি কিনা।'

'আমার জন্যে তদবির করে বেড়াবে, তুমি আমার কে?'

'কেউ না।' রুক্ষ মুখে বলে ফেলেই আবার স্নিগ্ধ মুখে বললে, 'আমি আপনার একজন অনুরাগী পাঠক।'

'বই বেরুল না তার আবার পাঠক! না, দরকার নেই, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি বিশ্বাস করি আমার বিষয় প্রেমই আমাকে আমার প্রাপ্য এনে দেবে।'

'তাই বলে পাওনা টাকা নেবে না? ঠকাবে?'

'তাতে তোমার কী যাথাব্যথা! আমার দ্বিতীয় উপন্যাসের নায়িকা তার আগের মানুষের জন্যে এতটুকু অনুরাগ দেখায় নি, যা ভালোবেসেছে আর হাহাকার করেছে সব সেই আগের মানুষ। তেমনি তুমি তোমার কোটরে গিয়ে থাকো, আমিই শুধু নিজের মনে গান গেয়ে যাই। আমার এই লেখা এই ভালোবাসাই অবারণ গান গাওয়া।'

'আপনার ফরমায়েস মতোই নাটকের সব প্লট তৈরি হয় না।' বনছায়া হাতের ঘড়ি দেখল, উঠি-উঠি করল, বললে, 'মানুষের জন্যে না হয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্যের জন্যেও তো হতে পারে। আর কারুর জন্যে না হোক, সাহিত্যের জন্যেও তো কিছু করতে পারি।'

পাণ্ডুলিপি বিস্তৃত করে নিয়ে অলিখিত সাদা পৃষ্ঠার দিকে মনোযোগ দিল সন্দীপ। বললে, 'বেশ, ভালো কথা, আমার জন্যে না হলেই হল। আমার শ্রম আর নিষ্ঠাই আমার যথেষ্ট, তা প্রচার-প্রকাশের প্রতীক্ষা করে না। আমার ভালোবাসাই যথেষ্ট, প্রতিদানের জন্যে তার কাতরতা নেই।' বনছায়া ভেবেছিল সন্দীপ বুঝি এবার তার চোখের দিকে তাকাবে, তাকাল না, বরং অলিখিত শুভ্রতাকে কলঙ্কিত করবার জন্যেই কলম তুলে নিল।

বনছায়া বললে, 'কিন্তু সাহিত্যের বেলায় যদি প্রচার-প্রকাশ জুটে যায়, আর ভালোবাসার বেলায় প্রতিদান?'

'সেইটে তো দারুণ উদ্বৃত্ত। তারই নাম দৈব। আর এই দৈবের জন্যেই তো পুরুষকার। কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে কোনো কলাশা নেই। সেখানে নিরাশাও যথেষ্ট উত্তেজনা।'

আশ্চর্য, এ অবস্থায়ও কাগজে এক কলম লিখল সন্দীপ। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, ভাবল, কলমটা কেড়ে নেবে, না, চলি বলে এক ঝটকায় উঠে পড়ে বেরিয়ে যাবে দ্রুত পায়ে?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বনছায়া, বললে, 'আমার বিয়ে হয়ে গেছে জানেন?'

'ও, হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে।' একটা নতুন খবর শুনলে লোকে যেমন তাকায় তেমনি করে তাকাল সন্দীপ: 'কার সঙ্গে যেন হল? কোন এক বড়লোক ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে—তাই না? তা বিয়ে যখন, বর একজন হলেই হল।'

বনছায়ার মুখে ক্রোধের ছাপ পড়ল, কিন্তু চোখ যার থেকে-থেকে কেবল মৃত কাগজের দিকে সে তা লক্ষ্য করবে কী করে?

একটু অভিমান মিশিয়ে বনছায়া বললে, 'আমার বিয়েতে তো গেলেন না।'

এতে হাসবার কী থাকতে পারে, সন্দীপ হেসে উঠল। বললে, 'ও সব তারিখ-টারিখ আমার মনে থাকে না। এটা কোন্ তিথি, অমাবস্যা না পূর্ণিমা, তাও নয়।'

'কোনো কিছু উপহারও তো দিলেন না আমাকে।'

'ও, কোনো কিছু দিইনি নাকি? সত্যিই তো ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কী তোমাকে দিতে পারি বলো? তবে একটা জিনিস নিয়ে যাও—' পাশে বইয়ের স্তূপের দিকে হাত বাড়াল সন্দীপ, কিন্তু আবার কী ভেবে হাত গুটিয়ে নিল। আবার অমনস্কের মত কলম তুলে নিল।

'কী জিনিস, বললেন না তো?'

'ও, হ্যাঁ, একটা জিনিস, তার নাম নিষ্ঠা। যে প্রচার-প্রকাশের অপেক্ষা না করে অহরহ নিজের অন্তর থেকেই রস টেনে নিয়ে বেঁচে থাকে।'

'আচ্ছা এখন চলি।' বনছায়া উঠে পড়ল।

দরজার সীমা পেরিয়ে যেতেই একটা প্রবল ঝঞ্ঝাস্তম্ভের মত সন্দীপ উঠে দাঁড়াল। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার প্রচার-প্রকাশটা একবার দেখি।' বলে বনছায়ার দু কাঁধে পরপর দুই হাত রেখে তাকে ঘুরিয়ে নিজের মুখোমুখি করে নিল। তার সিঁথির সিঁদুরের দিকে লক্ষ্য করে বললে, 'এ তোমার কিসের প্রচার-প্রকাশ?'

সুস্থ করে হাসল বনছায়া। বললে, 'নিষ্ঠার।'

তবু কই, এই নির্জন আধো-অন্ধকার মুহূর্তে সন্দীপ তো সীমা ছাপিয়ে এসে তাকে নিবিড় বাহুতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল না, তীব্র দীর্ঘ চুম্বনে মুছে নিল না তার কলঙ্কের গ্লানি?

আবার তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিল। বললে, 'দাঁড়াও, আমার দ্বিতীয় উপন্যাসে এ সিঁদুরের একটা ব্যাখ্যা দেব। এ কিসের প্রতীক? আনন্দের, অহঙ্কারের না আর্তনাদের? নিষ্ঠার, না ছলনার?'

'ছলনার।' দিব্যি বলল বনছায়া।

সন্দীপ আবার তার আসনে গিয়ে বসল। বনছায়া যা ভেবেছিল সেই তার নিরীহ নিষ্ক্রিয়তায় ঘুণীভূত হল। এই পরিণাম সম্পর্কে আশঙ্কা ছিল বলেই বোধহয় পেরেছিল আসতে, পেরেছিল সিঁদুরের রেখাটা রক্তাক্ত করে নিতে। এ প্রতীক তাই পুরোপুরি ছলনা, যেমন শুষ্ক পতঙ্গের কাছে মরু দীপশিখা। এ প্রতীক অনাচারীর প্রতি শাসন-তর্জনী।

সত্যি যদি বুকের মধ্যে টেনে নিত, চুমু খেত? মনে মনে হাসল বনছায়া। নিশ্চয়ই সারা দেহে সে মরা কাঠ হয়ে থাকত, ঠোঁট দুটোতে তুলুপ এঁটে সিল করে রাখত, কোনোই কোমল ধ্বনীর স্বাদ নিতে দিত না, রুদ্ধ কণ্ঠে তিরস্কার করত, বলত, এ আপনার কাছে আশা করিনি।

ইচ্ছে হল এই কথাটাই যাবার আগে মুখ ফুটে বলে যায়—এ আপনার কাছে আশা করিনি। কিন্তু, থাক, বললে কী কথার কোন্ অর্থ করবে কে জানে?

ধীরে ধীরে চলে গেল বনছায়া।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে এই যা কি সে আশা করেছিল?

দেখল, বাইরের ঘরে টেবিলে-চেয়ারে নিবিষ্ট হয়ে সুধীর কী লিখছে। মনটা ভরপুর খুশি হয়ে গেল। ভাবল ওর তন্ময়তার বিঘ্ন না হয়ে নিঃশব্দে শোবার ঘরে অন্তর্ধান করবে, কিন্তু প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়াল।

'কোথায় গিয়েছিলে জানতে পারি?'

'জানতে পারি!' প্রশ্নের লেজের আগুনটা মেজাজে ছ্যাঁকা দিল। বনছায়া স্মিতমুখে বললে, 'না, জানতে পারো না।'

'আচ্ছা জানতে-পারিটা যাচ্ছি।' মীমাংসার ভঙ্গিতে মৃদু হাসল সুধীর। জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'বসে বসে কী করব একা-একা, তাই বেরিয়েছিলাম।'

'আমার প্রশ্ন অন্য, কেন নয় কোথায়? কেন গিয়েছিলে নয়, কোথায় গিয়েছিলে।'

'এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম।' রুক্ষস্বরে বললে বনছায়া, 'নাম জিজ্ঞেস করবে না আশা করি।'

'না, তা করব না। কেননা কে বন্ধু তা দুদিনেই জানা যাবে। তোমার হাতে ওটা কী?'

'বিষাণ।'

'কেন, তোমার লেখা বেরিয়েছে?'

'না। লেখা যায় কিনা তাই দেখবার জন্যে কিনে এনেছি।'

'লেখা যায় না। ভীষণ বাজে কাগজ।'

'তোমার কবিতারও উপযুক্ত নয়?' বলেই বনছায়ার খেয়াল হল আঘাতের মত হয়ে গিয়েছে। তাই কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে নরম-নত হয়ে বললে, 'কেমন হচ্ছে এ কবিতাটা? যদি বলো আবার 'প্রবাহে' নিয়ে যাই। ওমা, এ কী, কবিতা লিখছ না!'

'না, কবিতার চেয়েও জরুরি লেখা লিখছি।' নির্মমের মত বললে সুবীর, 'অফিসের একটা রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ করছি।'

'অনুবাদ!' বনছায়া যেন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

'আজ্ঞে, হাঁ—এর জন্যে আলাদা টাকা দেবে।'

'টাকা! টাকার জন্যে—'

'সমস্তই তো টাকার জন্যে। তারপরে জানো বস্-এর জন্যে বাঙলায় একটা অভিভাষণ লিখে দিতে হবে। যদি তুমি ওটা লিখে দাও, তুমি অর্থাঙ্গিনী বলে তোমাকে আজেক দিয়ে দিতে পারি।'

'না, পুরোই তুমি নাও। কিন্তু আমি বলছি তুমি আর কবিতা লিখবে না?'

'দেখি লিখি কিনা!' লেখায় আবার মন দিল সুবীর।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে এসে সুবীর দেখল বনছায়া আবার বাড়ি নেই।

ফিরে এলে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'দোকানে।'

পরদিন আর জিজ্ঞেস করলে না। [ক্রমশঃ]

• • • •

"পণ্ডিতজী আজ আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি যদি দশটা বছর আপনি ভারতের তরুণ তরুণীদের শুধু বিবেকানন্দ পড়াতে পারতেন তা হলে আজ আপনাকে এতখানি উল্টে হ'তে হতো না। আজ যদি ভারতের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুশীলন করবার ব্যবস্থা নিষ্ঠাসহকারে থাকতো, তা'হলে জাতির এই কদর্য মূর্তি এমনি মারাত্মক ভাবে কখনই প্রকটিত হয়ে উঠতে পারতো না।"

গল্প-
গুচ্ছ

বাইরের সঙ্গে প্রায় সব সম্পর্ক ছিন্ন।

মাসে একবার করে দেখাশোনার বন্দোবস্ত···বাসন্তী দেবী আসেন···কারামুক্ত হয়ে···স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে কারাগারে···

সাক্ষী দাঁড়িয়ে সাহেব প্রহরী···

স্বামী স্ত্রীতে কথা কয় ··সাহেবের শুনতে অসুবিধা হয়···

সাহেব বলে উঠেন, Please, speak loud,···I can't hear !

দেশবন্ধু গর্জন করে ওঠেন, I refuse to obey···বিদায় না নিয়েই চলে আসেন নিজের কুঠুরীতে···

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখাশোনা, সব বন্ধ করে দিলেন···

কারাগার থেকে যেদিন বেরিয়ে আসবেন, কারাগারের মধ্যে একটি লোকের হলো বড় অসুবিধা···

মধুর তার নাম···দাগী আসামী···দশ বারো বার ডাকাতির অপরাধে জেল খেটেছে···

জেলের মধ্যে দেশবন্ধু তাকেই বেছে নিয়েছিলেন, তাঁর কাজকর্ম করবার জন্যে···

প্রথম প্রথম মধুর সরম আর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতো কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে তার কি হয়ে গেলো, একদণ্ড দেশবন্ধুকে ছেড়ে থাকতে পারতো না···

বন্ধুর মতো সে নিজের জীবনের সব কথা দেশবন্ধুকে বলে যেতো, দেশবন্ধু একমনে তা শুনতেন···

এমন করে তার কথা জীবনে তো কেউ শোনে নি। মধুর যখন শুনলো, তার জেল-মনিবের "ছুটি" হয়ে গিয়েছে, সে কেঁদেই ফেলে···দেশবন্ধু চলে আসবার সময় তাকে আশ্বাস দিয়ে এলেন, যখন তার ছুটির সময় হবে, দেশবন্ধু তাকে নিয়ে যেতে আসবেন···

কারাগার থেকে বাইরে এসে, বিপুল কাজের মধ্যেও দেশবন্ধু সেকথা ভোলেন নি···

যেদিন মধুর ছুটি পেয়ে জেলের বাইরে এসে দাঁড়ালো···দেখে একজন লোক তাকে নিয়ে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে ···

দেশবন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে নিয়ে যাবার জন্যে ··তিনি ঠিক করলেন, মধুরকে তাঁর খাসভৃত্য করে কাছে কাছে রাখবেন···আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরা সকলে বারণ করলো···খুনে ডাকাত···কখন কি করে বসে ঠিক নেই···

দেশবন্ধু কারুর কথা শুনলেন না, তিন বছর মধুর তাঁর কাছে কাছে অষ্টপ্রহর ছিল···

আজ দেশবন্ধুর কথা বলতে গিয়ে মধুরের কথাও বলতে হলো···

যখনি জেলখানা থেকে মধুরের খবরাখবর নিতে আসতো·· বলতো·· যা বেটা, তুই মানুষ হয়ে গেলি !

'কক্ষনো না।' নীরজা দৃঢ়ভাবে বলেছিল, 'ও বাড়িতে অমন অসভ্যর মতন থাকতে দেব না তোমায়।'

'বাড়িটার মেজের গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছ বুঝি?'

'আহা! অত ঠাট্টা কিসের? ইচ্ছে করলে কিছুটা ভালভাবে থাকা যায়। যাক্ প্রথম দিনটাতেই নাই বা ছেঁড়া লুচি দেখালে।'

ভাগ্যিস!

ভাগ্যিস নীরজার কথাটা শুনেছিল।

নইলে এই ঘরে বড় বিশ্রী বেমানান লাগতো নিজেকে।

কিন্তু···কথাটা কী ভাবে পাড়া যায়?

একবার অনুরোধের ওয়াস্তা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। কারণ একেই তো অভাবের প্রশ্ন নেই, সত্যিই টাকার জন্যে নয় তা বোঝা যাচ্ছে। যতই আপ-টু-ডেট হোক্, একটা বিধবার কতই আর খরচ? চল্লিশ পঞ্চাশটা টাকা ওর কাছে কিছুই নয়।

তাছাড়া, রঞ্জন মনে মনে হাসে, অনুরোধকারী যদি পুরনো প্রেমিক হয়!

শুধু ভাষাটা একটু কায়দা করে—

আচ্ছা যদি এভাবে বলা যায়—'বেণু, তোমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকছি ভাবতে কী অদ্ভুত ভাল লাগছে, কিন্তু আমি তো বেজায়ই গরীব!'

নাঃ! এ একদম অচল।

তবে কি বলে উঠবো, 'বেণু, তোমার তো অনেক টাকা, বাসাটা পুরনো বন্ধুকে বিনামূল্যে দাও না?'

না না, অতটা মাইতিয়ারীতে কাজ নেই। কে জানে যদি সত্যিই বলে বসে, 'তোমার কাছে ভাড়া নেব রঞ্জন? এটা তুমি ভাবছিলেই বা কি করে?'

তাহলে আবার নীরজার কাছে এক্সো কৈফিয়তের খোঁচা! তখন আর ওকে বোঝানো যাবে না—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

তার চেয়ে সোজাসুজিই বলা যাক—বৌ তো বাড়ি পছন্দ করে গেল, কিন্তু আমার ক্ষমতায় কুলোবে না।···

আচ্ছা, শুনতে বড় রূঢ় লাগছে না?

চিন্তা স্থগিত রাখতে হল।

বেণু এসে ঘরে ঢুকলো, চা আর খাবার নিয়ে। কলা, মিষ্টি, বিস্কিট, কাজু, কেক।

ভিতরের কথা সাজানো বন্ধ রেখে অতএব বাইরের কথা সাজাতে হয়।

'তোমার সংসারে শুধু মাত্র এই ছিল? আর কিছু ছিল না?'

'ধাঃ এখন তো সকাল, খাবারই সময়—।'

'অফিস যেতে হবে না?'

'বৌয়ের হাতের ভাতটা না হয় একটু কম খেও।'

'তাই নই। চা নিজে বানালে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখতো শুধু শুধু খাটলে!'

'শুধু শুধুই বা ভাবছো কেন? আমি যদি তোমার বাড়িতে যেতাম, তুমি কি—'

'আমি তো তোমার বাড়িতে থাকতেই আসছি।'

'সে তো আর আমার অতিথি হয়ে নয়।'

কথার পিঠে কেবল কথা।

আলগা আলগা আপনা আপনা।

তারপরে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠতে হয়। বিদায় নিতে হয়।

নেমে এসেছে একতলায়।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মালিকানী।

ভাবছে, এখুনি গিয়েই হয়তো ও বৌয়ের কাছে বলে বসবে খবরটা। কিন্তু সেটা বড় বিশ্রী হবে। এখনো সময় রয়েছে—

যে গেটের কাছে চলে এসেছে সে ভাবে, আর তো সব পার করে ফেললাম, পরে কি আর বলা যাবে?

তারপর যখন একজন গেটের বাইরে আর অন্যজন গেটের ভিতরে, তখন সকালের নির্মল রোদটার গায়ে কালি ছিটিয়ে একটা বেমানান বিশ্রী কথা ছড়িয়ে পড়ে, 'আসবো তো বলছি কিন্তু কি করে যে পেয়ে উঠবো তা জানি না। ওখানে তো একশো পঁচাশি টাকা দিতেই প্রাণ যাচ্ছিল। তোমার তো অনেক টাকা, একটু বিবেচনা করে দেখ না। চল্লিশ পঞ্চাশটা টাকা তোমার কাছে কিছুই নয়, আমার কাছে অনেক।'

কে বললে একসঙ্গে এতগুলো কথা?

কোনো যন্ত্র?

ভাঙা ক্যাসকেসে, মরচে পড়া যন্ত্র? নইলে পৃথিবীর সমস্ত সুর বেসুরো হয়ে গেল কেন?

আর বেণুর মুখের উপর মিলেস ঘোষের খোলসটা এঁটে বসলো কেন?

একেবারে এঁটে না বসলে কি করে সে মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, 'ভাড়াটা বিবেচনা করেই ধার্য করা হয়েছিল। আর 'একজনের কিছু নয়, আর একজনের কাছে অনেক' এই হিসেব নিয়ে তো জগতের লেনদেন চলে না? ভাড়া কমানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এক পয়সাও না।'

ঠিক বলেছে, বেশ করেছে।

কেন বলবে না?

বেণুর পৃথিবীর সমস্ত সুর যদি কেউ চিরতরে বেসুরো করে দেয়, বেণুর আকাশের সুন্দর সকালটি কালির পোঁচড়া টেনে মুছে দেয়, বেণু তাকে ক্ষমা করবে?

কক্ষনো না।···চোখদুটো হঠাৎ জ্বালা করে ওঠে তার।··· আর রঞ্জনের মুখে ফুটে ওঠে এক টুকরো হাসি—হুঁ বাবা! পয়সা এমন জিনিস! প্রেমের চেয়ে অনেক বড়।

আকাশ এখন নীল

শ্রীমতী বাণী রায়

সে আকাশ কেমন ছিল ?

এমনি নীল ?

এমনি স্নিগ্ধ বাতাসে মাধবীলতা দুলত নাকি ? ষোলপূর্ণিমার চাঁদে আরও কি মায়কতা ছিল ?

মফস্বলের পাঁচমিশালী স্কুলের শিক্ষিকা মধুমিতা ড্রইংপেনের মোড়া টিপে বন্ধ করে জানালার শিকের পিছনে আকাশের দিকে তাকালেন।

ধূলিধোঁয়ায় অপরিচ্ছন্ন কলকাতার আকাশ কিন্তু আরও একটু নীল ছিল !

ছাত্রী শুভ্রা ঘরে ঢুকলো, "মিতাদি, আমাদের সঙ্গে একটু ছাতনা যেতে হবে। কমলাদি বলে দিলেন।"

"হঠাৎ" ?

"শিবরাত্রির দিন বাশুলী মন্দিরে যেতে ইচ্ছা করে। ভয় পাবেন না, মিতাদি। পুজোটুজোর ব্যাপার নয়। একবার দেখেই চলে আসব আমরা।"

উঠতে হলই। হেড্‌মিষ্ট্রেসের আদেশ যখন। মফস্বল স্কুলটির সর্বে-সর্বা কমলা দাস। কেন বি. টি. টা পাশ করলাম না ? ভাবিনি কোন দিন টীচারী করতে হবে। তা'হলে শিক্ষাবিভাগের উপরের দিকেই চেষ্টা করতাম।

একখানি ঘর প্রতাপবাগানে নিয়ে থাকে মধুমিতা। মা-বাবা কলকাতায়। সম্পন্ন ঘরেরই মেয়ে। একদিন মনে হ'ল কলকাতার সমস্ত মধু নিঃশেষিত। খবর কাগজ দেখে ঘরখাস্ত ছেড়ে এখানে এল চলে মধুমিতা। এখন এখানকার সুখেদুঃখে মিশে ছেড় বছর আগের অতীতকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছে।

প্রতাপবাগানের সারি সারি নূতন বাড়ীর লাইন পার হয়ে সে বড় রাস্তায় এল। ছাত্রীরা বাসষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করবে। বাসে করে পাঁচমাইল দূরের গ্রাম ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাসের আরাধ্যা বাশুলী দেবীর মন্দিরে যাবে তারা।

মিশনারী কলেজের প্রাচীরের পাশ দিয়ে সাইকেল-রিক্সা ধরে চারমাথায় মোড়ে বাসষ্টাণ্ডে এল মিতা। এত রোদের মধ্যে হাঁটবার ইচ্ছা থাকে না। বাঁকুড়ার রাস্তায় বিনাযা হয় বিগতপ্রাণা।

জন দশবারো ছাত্রী লাল-নীল ডাঙের কাপড় পরে প্রস্তুত। বাঁচির গাড়ীখানা ধরা যাবে। গাড়ীখানা ভালো, গদি, নরম স্প্রিং-এ জোর আছে।

"একেশ্বরশিব ছেড়ে যাওনী কেন?" মিতার প্রশ্নে শুভ্রা উত্তর দিল, "একেশ্বর তো শহরের মধ্যেই। অনেকে ছাড়না যায়নি। তাই আজ যাওয়ার ব্যবস্থা হোল।"

আর—আমি বয়সে সকলের ছোট বলে আমার ঘাড়ে চাপল দায়িত্ব। তা, মন্দ কি? ঘরে বসে আকাশপাতাল ভাবনার চাইতে এমন খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলায় আনন্দ পাওয়া যাবে, শান্তি যদি জীবনে নাই থাকে।

বাঁকুড়ার লাল পথে বাস ছুটে চলল। নতুন চটী পার হয়ে খোলা মাঠে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক অবিনাশচন্দ্র দাসের পুরাতন বাড়ীর পা ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথম বসন্তে গাছে ফুল ফুটেছে। বেলেতোর গ্রামের বুক চিরে হুর্ণ বাজিয়ে চলল। যামিনী রায়ের জন্মভূমি তাঁর আঁকা ছবির মত সেজে আছে। বাঁকুড়ার শক্ত মাটী শিল্পীর তুলীর টানকে শক্ত করেছে, যেমন শক্ত করেছে বিখ্যাত মাটীর ঘোড়াকে।

আদি বাশুলী মন্দিরের কাছে বাস্ থামল। এখানেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভিটা। কোন ফলক নেই, কোন নির্দেশ দেখা যায় না। একটা ভগ্ন গৃহপ্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। উঁচু টিবি একটা পাশেই। কুকুরশিয়ালের স্বেচ্ছাবিহারস্থল। একগাছা ঝাড়ু দিয়ে সকাল বিকালে ঝাঁট দেবার ব্যবস্থা করার দায়ও ছিল না। এদেশের লোক প্রতিটি উদ্যমে সরকারী সাহায্য চেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে। অথচ সামান্য অর্থ ও অনেক উদ্যম ওদের হাতেই। ব্যবহার জানে না।

মেয়েরা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। একটু দূরে মাঠ দিয়ে নেমে এখানকার উচ্চ বিদ্যালয় চণ্ডীদাস বিদ্যাপীঠ। পুকুরের পাশ দিয়ে পথ। সেখানে কয়েকটি শিলা, ক্ষোদিত কিছু। মেয়েরা দেখতে গেল।

দলটির মুখপাত্রী শুভ্রা বলল, "মিতাদি চলুন শুশুনিয়া পাহাড়ে যাই। এখান থেকে মাত্র ছ'মাইল। চন্দ্রবর্মার শিলালিপি আমরা দেখেছি। পাহাড়ের মাথায় বিষ্ণুচক্রের নীচে খোদা। নূতন প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের কি সব চিহ্ন আবার বেরিয়েছে, সবাই দেখতে যাচ্ছে। চলুন, আমরাও যাই। প্যালিওলিথিক যুগের পাথরের হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র, তৈজস নাকি পাওয়া যাচ্ছে। "কমলাদিকে বলা হয়নি। শুশুনিয়া যাওয়া চলবে না।" মিতা উত্তর দিল। অল্পদিনেই মফস্বল স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর মানসিকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে সে।

তাছাড়া, মনে মনে বলল মধুমিতা, প্রাগৈতিহাস তো আমারই মধ্যে নিহিত। আমাকে দেখলেই দেখা হবে।

নিরাশ ও ঈষৎ অসন্তুষ্ট মেয়ের দল ছাতনার বিখ্যাত মিষ্টান্ন ক্ষীরের পাঁড়ার সন্ধানে চলল।

ছোট দাওয়ার কোণে একটি ছোট ঘরের মত মন্দির। আদি বাশুলীপীঠ।

প্রাচীন মন্দিরটির বারান্দায় এক বৃদ্ধ দম্পতি। আধো অন্ধকার, তান্ত্রিক ধরণের পূজারী একখানি প্রস্তর-পীঠ নিয়ে বসে আছেন। দেবী বাশুলীর প্রাচীন মূর্তি তিনমাইল দূরবর্তী রাজভবনের সন্নিকটে স্থাপিত হয়েছে। তবু এখানেও মাহাত্ম্য ভাস্বমান। এই বেদীপিঠে দেবী ছিলেন।

মন্দিরে প্রবেশান্তে প্রণাম মাত্রে কানে গুরুগম্ভীর বাণী এল পূজারীর, "মায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।"

মনোবাঞ্ছা আর পূর্ণ হ'বার কিছু নেই। এই আধো অন্ধকার দেউলে আর্দ্র ফুলবেলপাতার গন্ধ শীতল মসৃণ অন্ধকার আরামপ্রদ, যেমন প্রখর রৌদ্রে মন্দিরের অভ্যন্তর হয়ে থাকে।

বসন্ত এখানে প্রখর হাওয়াই পূর্ব্বাহ্নেই এনেছে। খাঁ-খাঁ রৌদ্রে মাঠঘাট জ্বলে যায়। তবু তারি মধ্যে পুষ্পিত একটা পলাশ একটা কৃষ্ণচূড়া মাথা ফুলে আলো করে রেখে। তখন মনে হয় বসন্ত এসেছে বুঝি।

মন্দিরের বাইরে আকাশ কই নীল নয়? এখানে কলকাতার ধোঁয়া ধুলো অদৃশ্য। তবু আকাশের নীলিমা সেখানেই ছিল। সীসার পাতের মত ধোঁয়া উগ্র রং আকাশের – যেন সূর্য প্রাণহীন তেজপুঞ্জ নয়, উত্তপ্ত কেটলি। কেবলমাত্র চায়ের জল গরম হতে পারে, আহার্য সেদ্ধ না।

পৃথিবী তেমনি আছে। মাতাদে সবুজ গাছপালা হেলছে দুলছে। ফুলের রংএ আবীর খেলা হচ্ছে। কিন্তু আকাশ কেন রং-ছুট? আশ্বাস কোথায় নিশ্চিহ্ন? প্রথম সৃষ্টি মহাশূন্য। আদি সৃষ্টি আজ মধুমিতার চক্ষে ব্যর্থ।

পাশে শীলা এসে দাঁড়িয়েছে, "মিতাদি, এখানে চণ্ডীদাস ছিলেন ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে। আচ্ছা, দ্বিজ চণ্ডীদাস আর বড়ু চণ্ডীদাস কি এক লোক? বীরভূমের লোকেরা বলে, না। ছাতনার কবি প্রসিদ্ধ পদকর্তা নন। নান্নুর দ্বিজ চণ্ডীদাসের জন্মস্থল। আপনি কি বলেন? ছাতনার লোকেরা বলে, গায়ের জোরে বীরভূম চণ্ডীদাসকে নিজের সুক্ষিগত করে। দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস একই। না হলেও পরের ঘুগের দ্বিজ চণ্ডীদাসও এখানকার। আপনি কি বলেন?"

সচমকে মিতা উপলব্ধি করল সে কলকাতার সম্ভ্রান্ত গৃহের ছোট কন্যা নয় এখন, বাঁকুড়াবাসিনের ইতিহাস শিক্ষিকা। তাই কয়লাদি তাকেই ছাত্রী-অভিযানের নেত্রী করেছেন। ভাগ্যের বিরুদ্ধে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করতে করতে এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, স্বাভাবিক কর্তব্যকে কষ্টদায়ক আদেশ মনে করে অসন্তুষ্ট হচ্ছে সে।'

যুদ্ধরত সৈনিকের মত মনকে সজাগ করে মধুমিতা ফিরে এল ছাতনার ভূমিতে, "কেন, ধরে নাওনা একই চণ্ডীদাস কখনও ছাতনায়, কখনও নান্নুরে বাস করেছেন। এত কাছাকাছি যে এখান থেকে ওখানে যাওয়াটা আশ্চর্য ছিলনা। হয়তো এক জায়গায় সুবিধা হয়নি। ভাগ্য অন্বেষণে অন্যত্র গিয়েছিলেন। অবশ্য পুঁথি দেখে ঠিক করে নেওয়া উচিত।"

শুভ্রা পাতার ঠোঙা নিয়ে এল, "একটা ঘুটো খেতেই হবে, মিতাদি। দেখুন, প্যাড়ার গায়ে ছাঁচে লিখেছে ভুলোনা আমাকে।"

রমা শুভ্রা হেসে গড়িয়ে পড়ল! ভূতদেখার মতন করে হলুদে শক্ত চাকার আকারের প্যাড়ার দিকে তাকিয়ে মিতা বলল, "আমি খাবনা।"

"কেন, কেন?"

"বাসলীর মন্দিরে পুজো দেব।"

"ও, তাই বলুন, নন্দা অপরাজিতাও পুজো দেবে বলে উপোষ আছে। কণক আবার ঘুটাকার প্যাড়া নিচ্ছে, ওর মাসতুতো দাদা কলকাতা যাচ্ছেন কাল। মা-বাবাকে পাঠাবে। আপনি পাঠাবেন?"

কলকাতায় "ভুলোনা আমাকে" পাঠানোর আর প্রশ্ন ওঠেনা মিতার। কিন্তু মিথ্যা বলল কেন মধুমিতা? সকালে চিড়েভাজা চা খেয়েছে, সঙ্গে বাঁকুড়ার বিখ্যাত মিষ্টান্ন 'চিত্তহরা' সন্দেশ। এখানে ধান প্রধান খাদ্য। বাদিন্দাদের অনেকেরই ক্ষেতের ধান থেকে মুড়ি হয়, চিঁড়ে হয়। সকাল-বিকালে তাই জলখাবার। পাউরুটী ভাল হয়না। মিষ্টি চমৎকার। লোকগুলিও ভাল। সহজ ও শাদা, বিশেষ অতিথিপরায়ণ। কিন্তু মনের শূন্যতা যায় কি? ভুলোনা আমাকে মুখে তোলা যায় কি?

একে-একে মেয়েরা জড়ো হল। প্রধান বাসলী মন্দিরে ওরা যাবে। একটা বাস ওধারে এখন যেতে পারে। সেটাই ধরে ঝুলতে ঝুলতে ওরাও মন্দিরের মেঠো রাস্তার মাথায় পৌঁছতে পারবে। তারপর [illegible] তীর্থযাত্রীর মত।

আদিগন্ত মাঠের মধ্য দিয়ে বাস ছুটেছে। প্রায়ই ভগ্ন বা নির্জন মন্দির পথের পাশে। ব্রাহ্মণ প্রধান শহরটির মধ্যে শিব। মন্দিরের প্রাধান্য অধিক। অথচ বৈষ্ণবধর্মেরও সমন্বয় ঘটছে। লাউমাচার পাশে রাধামাধবের আখড়া, ধানের মড়াইএর ধারে শিবলিঙ্গ। শাক্ত ও শৈব একত্রিত হয়েছে এই রৌদ্রস্নাত, রুক্ষ অথচ শ্যামল ভূমিশ্রীর বুকে। সঙ্গে খোলের বোল। ধর্মপূজা, বড়ম, বোঙাবুড়ি মিলেছে সঙ্গে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের চিহ্ন পরিপাটী ধরা যায়।

এগিয়ে যাও বিষ্ণুপুরে। মল্লরাজবংশের রাজোদ্যোগে লিখিত পাথরের মন্দিরে, মাটীর মন্দিরে, বাঁধের জলে। বীর হাম্বীরের নামে নানা ইতিহাস ও কাহিনী প্রচারিত আকাশে বাতাসে। মল্লরাজবংশের ঐতিহ্য ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যে মনোরম। কালাচাঁদ, মদনমোহন, জোড় বাংলা আকীর্ণ বিষ্ণুপুর। লালবাঁধে লালবাইএর স্মৃতি এখনও টলমল করে।

সেখান থেকে এল বাঁকুড়ায়, বীরমল্ল হাম্বীরের পুত্র বাঁকুড়া মল্লের নামে শহর, প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর দিনে। গন্ধেশ্বরী নদীতীরে বর্ত্তমান পাঠকপাড়ায় মল্ল রাজকুমার দেবদত্ত তন্ত্র বাঁকুড়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আদি পুরুষ তাঁরাই। এই গন্ধেশ্বরী নদীরও উপন্যাসের বর্ণনা রামানন্দ দুহিতা সীতাদেবীর অগ্রজ শান্তাদেবীর 'অলখঝোরা' উপন্যাসে দেখা যায়।

নিজেকে সংবরণ করে নিল মিতা। এখানে সাহিত্যের আবহাওয়া চলবেনা। ইতিহাসের ধারী তথ্য কামনা করে। ভাবুক মনের শান্তি বহন করে দূরে তো পালিয়ে এসেছে মিতা, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করে।

নিষ্ঠুর অথবা চরিত্রহীন কোন বিশেষণে সুবিমলকে চিহ্নিত করা যায়?

ছিলে-ছিলে, দিনে-দিনে আজ প্রণয় এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ করে দিল সে। সুন্দর-চিত্রিত মুখের আস্তরণে পুরাতন প্রিয়া কোথায় তলিয়ে গেল!

সুন্দরী রমা, কেন তুমি দু'জনের মধ্যে এসে দাঁড়ালে? অতি সাধারণ শ্যামবর্ণা বাঙালীর মেয়ে মিতা হেরে গেল রমার কাছে। রমার মা শ্বেতাঙ্গিনী, বাবা বাঙালী। সংমিশ্রণে যার যেটুকু ভাল, পেয়েছে রমা। অতি সৌর গাত্র বর্ণের সঙ্গে লালিত্যভরা দেহশ্রী।

ছেলেবেলা থেকে মিতা অপেক্ষায় ছিল বাবার বন্ধুর ছেলে সুবিমলের উদ্দেশে। এছাড়া তার জীবনে অন্য কিছু যে আছে একথা ভাবতেও পারেনি সে। যখন সুবিমল বড় কাজ পেল, সকলে ধরে নিল মধুমিতার ভাগ্যেই।

এমন সময়, বিবাহের দিন যখন পত্রিকার পাতা থেকে নামি-নামি করছে, দেখা গেল মিতার ভাগ্যে রম্ভা। রমা পাত্রকে ভুলিয়ে নিয়েছে।

অভিশাপ রমাকে। কেন সে এল, কেন সে মিতার জীবন এমন চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল? জন্মজন্মান্তরে জ্বলে মরুক রমা। কিন্তু, রমার দোষ কি? সুবিমল গেল কেন? রমা যে কি, তা সে জানেনা বলেই। হৃদয়হীনা, চরিত্রহীনা রমার মোহ যখন কেটে যাবে, অমন মেয়েকে বিয়ে করার খেসারৎ সুবিমল দিনরাত্রি শান্তিহীন হয়ে উঠবে।

"মিতাদি, কি ভাবছেন? নামুন।"

নেমে এল মিতা। খাঁ-খাঁ করছে মাঠ, প্রখর তপন যাচ্ছে তামরূপে যেন আগুন লেগেছে প্রান্তরময়। আকাশের আগুন ঝরে পড়ছে। গাছের ছায়াও নেই এতবড় মাঠভাঙা দীর্ঘ পথের দুধারে।

একদল লোক যাচ্ছে হাতে ফলমূল, পূজার্ঘ্য নিয়ে। কেউ না কেউ যাচ্ছে পূজার সামগ্রী বহন করে। বাশুলীর মাহাত্ম্য আছে, প্রতীয়মান হয়।

"আপনারা বাঁকুড়া থেকে আসছেন বুঝি? আমরা ধাপালী থেকে।" একজন প্রৌঢ়া পাশে পাশে যাচ্ছিলেন, তিনিই বল্লেন। মিতা সরেই রইল। শুভ্রাই কথা চালাতে লাগল।

"বাশুলী অতি জাগ্রত দেবী। তাঁর নিকটে যে-যা চায় তাই পায়। বিশেষ করে আজকের তিথিতে।" আর একজন বৃদ্ধ জানালেন। "সব জায়গার লোকেরাই নিজেদের দেবদেবী সম্বন্ধে তাই বলে। সমস্ত জায়গায় যেতেই শুনি দেবতা ভারী জাগ্রত।" শুভ্রা উত্তর দিল।

"দেখবেন, চেয়েই দেখুন না কেন। সব থেকে বেশী যা চান তাই কামনা করবেন।" বৃদ্ধ বললেন, দু'একজন যাত্রী সায় দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

তীর্থযাত্রীর প্রথায় দীর্ঘ রাস্তা হেঁটে এল। নূতন না হলেও বেশী প্রাচীন নয়, মন্দির দেখা দিল। পাশেই রাজবাটী। রাজা স্থাপনা করেছেন মন্দির, চণ্ডীদাসের আরাধ্যা বাশুলী দেবীকে এনে এখানে বসিয়েছেন। নিত্যপূজা ও পূজারী। কাছেই সুবৃহৎ ইঁদারা, এক বটগাছের নীচে বাঁধানো প্রশস্ত বেদী। যাত্রীরা বিশ্রাম পান।

জুতো ছেড়ে উঁচু উঁচু সিঁড়ি বেয়ে একে একে মেয়েরা উঠছে। শিবরাত্রির দিনে, মানুক না মানুক, কুমারী মেয়েরা আপনা থেকে ধার্মিক হয়ে ওঠে। এবেলা ছত্রিনায় বাশুলী মন্দিরে এসেছে। ওবেলা হয়তো ছুটবে একেশ্বরের মাথায় জল দিতে। অনেকে উপবাসীও আছে।

কী লাভ?

বিগতদিনের শিবরাত্রিস্মৃতি মনে পড়ল। অনাহারে গঙ্গাজলের ঘটী, ফুল বেলপাতার ডালা নিয়ে ছোটা দক্ষিণেশ্বরে। বাড়ীর কাছে জোড়াশিবমন্দিরে দ্বিপ্রাহরিক পূজা, গঙ্গাজল, দধি, মধু, ঘি, কাঁচা দুধ দিয়ে লিঙ্গকে মার্জনা করা। মাটীর প্রদীপে ঘৃতদীপ জেলে দেওয়া। ভাব, বেল, আকন্দ সংগ্রহের আন্তরিকতা। মালা গেঁথে লিঙ্গশীর্ষে পরানো। শিক্ষিতা ও আধুনিকা সেখানে মা-মাসীর দলে মিশে গিয়েছিল।

মনে ছিল অপার কৃতজ্ঞতা। মিতার মত সামান্য মেয়ের এমন স্বামীলাভ মহেশ্বরের প্রসাদ ভিন্ন কিছু নয়। কেন সে শিবরাত্রি করবেনা, শিবের মত স্বামী যখন সমুপস্থিত!

সুবিমল হাসত, বিদ্রূপ করত প্রাচীনপন্থী শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপন নিয়ে। কিন্তু মধুমিতা কান্ত হতনা।

আজ সেই শিবরাত্রির স্মৃতি বিষের ঝাঁপি। উপবাস বা পূজার কথা ভাবার প্রশ্ন ওঠেনা আর।

কিন্তু আজ অতর্কিতে এখানে উপস্থিত হয়েছে যখন, আজ সে পূজাই দেবে। অধরোষ্ঠ দৃঢ়সংবদ্ধ হল, মুষ্টী কঠোর। দেবে সে পূজা দেবে। কামনা জানাবে সে। দেখা যাক দেবী কত জাগ্রত।

যিনি তার আকাশের নীল মুছে দিয়েছেন, আবার রং-লাগবার কর্ত্তব্য তো তাঁরি। বেশী কিছু চাওয়া হচ্ছেনা।

রাঢ় দেশের উত্তপ্তপ্রখর শিবরাত্রি। অগণিত পূজার্থী। মাঠ পেরিয়ে তীর্থযাত্রীর পদব্রজে যেযাক সে এসেছে। চণ্ডীদাসের আরাধ্যার কাছেই আসা তার উচিত। তিনি অসামাজিক প্রেমকে সফল করেছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস আর রজকিনী প্রেম নিষিদ্ধ হেম। মন-সাল, স্থান-কাল নিয়ে হানাহানি করবে যে ঐতিহাসিক, আজ সে এই হেঁউলতলে নিঃসেব সমর্পণে প্রণতা।

তুমি কবির প্রেমের দেবী।

"বাসলী আদেশে কহে চণ্ডীদাস
সুখ নিকাশিল দুখেরি পাশ।"

তুমি আমার আজন্মের হৃদয়ভরা প্রেম কেন ব্যর্থ করলে? মৃদু-ম্লান মেয়েটির মনে জোয়ার এল।

বটগাছের বেদীর ওপর হাঁড়ি, চালডাল, ইঁদারা থেকে জল তুলছে। দূরযাত্রী পোটলা নামিয়ে স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। এখানে রান্না চড়াবে। এখানেই গৃহ গড়ে উঠল।

আমার ঘর বাঁধা হলনা কেন?

বল চণ্ডীদাসের দেবী, বল তুমি, এককণা অপরাধও আমার ছিলনা। বিনা দোষে এতবড় শাস্তি।

"মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়াঁবিযোঁ নানা দেশে।
বাসলীচরণ নিহে বন্দিআঁ
পাইল বহু চণ্ডীদাসে।"

আমি যোগিনী হয়ে নানা দেশ বেড়াচ্ছি রাধার মত। কিন্তু মনে বৈরাগ্য আসছে কই?

আমার ভুবন বিবর্ণ। ব্যথা চিরসঙ্গী।

কিন্তু আজ অমাবস্যার প্রহরে প্রমথনাথ শিবের স্নতদিনে আমি চাইব—, একটা বাসনাই আছে।

পূজারী ডাকলেন, "কই মায়েরা, কে কে আপনারা পূজা দিবেন, এগিয়ে আসুন। একটু খালি হয়েছি।"

শুভ্রা অন্যমনা মধুমিতার কাছে এগিয়ে গেল, "মিতাদি, আপনি উপোষে আছেন, পূজো দেবেন চলুন।"

উপোষী হোক না হোক, আজ মিতা পূজা দেবেই দেবে। এগিয়ে গেল সে। পূজারীর হাতে টাকা তুলে দিল। কলমিডাঁটার সরা হাতে নিয়ে ফুলবেলপাতার বোঝা ধরল।

"এবার প্রণাম করে বর চান, মা। আজ যা চাইবেন তাই মিলবে।"

দেবীর দ্বিহস্ত। একহস্তে খড়্গ অন্যহস্তে খর্পর। জিহ্বা প্রকটিত নয়। পাথরে মধুর লাবণ্য, নিরভাস আচ্ছাদিত। দেবীর বারণ নাকি আছে।

অন্ধকার পাষাণে মাথা লুণ্ঠিত করে মিতা প্রণাম করল। এইবার বর চাইবে—সেই ভয়ঙ্কর কামনা।

সুবিমলের জীবন চারখার হয়ে যাক, জ্বলে উঠুক সমস্ত কিছু সুবিমলের। সর্বনাশ হোক।

কিন্তু হাত কাঁপে, মন কাঁপে যে!

সর্বহারা দুঃখী মেয়েটির চোখের জল এবার চণ্ডীদাসের দেবীর পায়ের কাছে ঝরে পড়ল।

না, দেবী, না! ও সুখী হোক, সুখে থাক!

চণ্ডীদাসের ভূমিতে তীর্থ মধুমিতার ব্যর্থ হলনা।

আকাশ এখনও নীল!

পুনশ্চ

শক্তিপদ রাজগুরু

বুঝলেন মশাই, কারবারবার নিয়েই হাঁপিয়ে উঠেছি। নানান ঝামেলা। আজ যেতে হয় কানপুর, জয়পুর, পরশু হাপুর বাজার, না হয় যান পরশাপারে দিনাজপুর বালুরঘাট। তিনি সরষে তামাকের কারবার নিয়েই হিমসিম খেয়ে গেলাম মশাই। নেহাৎ আপনজন খুব চেনা তাই আসতে হল তার সঙ্গে, এখন কাজ শেষ করে ফিরতে পারলে বাঁচি! নিন্—

কালো মুখকো চেহারা ভদ্রলোকের বিরাট হাতের পাতাগুলো, দুচোখে লালচে আভাস, পরণে আদ্দির সিলেকরা পাঞ্জাবী, হাতের দশটা আঙুলের দুটো বাদ দিয়ে বাকী আটটায় চুনি পলা গোমেদ হীরা পান্না ইত্যাদি নবগ্রহশান্তির জন্য সব পাথরই রয়েছে। দামী সিগ্রেট কেস থেকে একটা সিগ্রেট বের করে এগিয়ে দিলেন তিনি। তখনও বলে চলেছে।

—শিবপুরে গিয়ে ব্রেক ঘোলগোবিন্দ সাঁতরার নাম করবেন, দেখবেন কাক-পক্ষীতে চেনে।

গলা তুলে ওদিকে বাঁধানো আমগাছের চাতালে কাকে উদ্দেশ করে বলে সাঁতরা মশাই।

কই গো দেখা হল স্বামীজীদের সঙ্গে। তুমি আবার এমনিতেই মুখচোরা, দেখি আমিই যাই। সব কাজ বাকী।

ভদ্রলোক উঠে চলে গেলেন ওদিকের অপিস ঘরের দিকে।

একটু কাজে গয়া এসেছিলাম, তাই অবসর পেয়ে ভারত সেবাশ্রমে এসে হাজির হয়েছি যদি কোনরকমে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে একমুঠো পিণ্ডির ব্যবস্থা করে দিতে পারি তাহলে তাঁরা হয়তো খুশী হবেন বংশধরের এহেন সুমতি দেখে।

সবে সকাল হয়েছে, রাতের অন্ধকারকে আলোর ধমকে সরিয়ে দিয়ে লাল চোখ মেলে সূর্য উঠছে আকাশ কোলে, পাখীগুলো তখনও মাঝে মাঝে কলরব করছে। দুচারজন তীর্থযাত্রীও এসে ঢুকছে আশ্রমের সীমানায়।

ওদিকে বাঁধানো চাতালে বসে আছে একটি ভদ্রমহিলা। শীতের শেষ তবু ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা আমেজ থাকে, তাই বোধহয় একটা কালো চাদরে গা ঢেকে বসে আছে। হঠাৎ আমার দিকে চাইল। কালো চাদরের আবরণে ঢাকা সুন্দর দীঘল আয়ত দুটো চোখের বেদনাময় ওই চাহনিতে একটু চমকে উঠলাম। যৌবনের আবেগ ওর দেহে স্তিমিত হয়ে আসেনি শুধু যেন চাপা পড়ে আছে। ভাটার আগে থমথমে গাং এর মত স্তব্ধতা ওর দেহ যমুনায়।

মনে হয় ওই চোখ ওই মুখ আমার চেনা—খুব চেনা। কিন্তু ওকে এমনি বেশে এই পরিবেশে ওই সরষে কুবিয়াল তামাকের ব্যাপারী সাঁতরা মশাই এর সঙ্গে দেখবো ভাবিনি। ও চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

বোধহয় অন্য কোন মেয়ে। তবু মনের সেই খটকা যায় না।

—চলো। সব ঠিক করে নিইছি।

সাঁওতাল মশাইএর পিছু পিছু একজন পুরোহিত রয়েছেন। আমাকে দেখে বলে, যান মশাই আপনি বসুন গে স্বামীজীকে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

গয়ার পাণ্ডাদের পাল্লায় পড়লে একদম ঘানিতে সরষেপেষা করে ছেড়ে বুঝলেন, তীর্থস্থান মানেই পাপীদের গুদোম। কই গো চল।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের চাদর ঠিক করে নিল।

বিয়াল্লিশ বেশ, এরেশে সেই আপেকার আমার চেনা মেয়েটিকে কখনও দেখিনি। তবু ওই নাক মুখ চোখ, দেহের গঠনে ভঙ্গী আমার চেনা। ভদ্রমহিলা চুপ করে সাঁওতালমশাই এর সঙ্গে বের হয়ে গেল।

—এখন তবু বসুন।

সাটকেল রিক্সা নিয়ে বের হলাম বিষ্ণুপাদপদ্মের দিকে। সকালের সেই গোলাপী রোদ তখন ধনুষ হয়ে উঠছে। চোখের সামনে সেই মেয়েটির মুখখানা মনে পড়ে। স্মৃতির জগতে একটা আলোড়ন আসে। মনে পড়ে হ্যাঁ মীরাবৌদিই।···ওকে আমার চিনতে ভুল হয় নি।

সেই চাকচিক্য রূপের শান পালিশ না থাকলেও মীরা সেনকে ঠিকই চিনেছি। অবাক হয়েছি ওকে এই অবস্থায় এখানে ওই সাঁওতালমশায়ের সঙ্গে দেখে।

শীতের দিন। এখানে আবার পাহাড়ে শীত। এর শীত মাংসে নয় হাড়ে বেঁধে। সকালের রোদ এসে মিষ্টি আদরে সারা গায়ে পরশ বুলিয়েছে। রিক্সাটা চলেছে, চাকায় মসৃণ শব্দ ওঠে বাতাসে। সামনের পাহাড়টা সকালের রোদ সর্বাঙ্গে মেখে চেয়ে রয়েছে সহরের মানুষের ভিড়ের দিকে। এই জীবনের প্রতি ওর যেন একটা নীরব মমতা জড়িয়ে আছে। পাহাড়ের মাথা থেকে কুয়াশার দিকে পর্দাটা আলোর ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। কালো পাথর দু একটা আধমরা গাছ সবুজের একটু ছোঁয়া ভেসে ওঠে আকাশ কোলে।

মীরা সেনকে মনে পড়ে। একে একে সেই বিস্মৃতির যবনিকা সরে যাচ্ছে। সেদিনের মীরা সেন ছিল এক ঝলক মধ্যাহ্নের আলোর মত ঝলমলে, তার রূপ আর যৌবন সেদিন আমাদের পাড়ার একটা আকর্ষণ। বড় রাস্তার ধারে আমাদের বাড়ির পাশেই বড় বাড়িখানায় ওরা ভাড়া থাকতো, মীরা সেন আর তার স্বামী। নীরোদবাবুকেও মনে পড়ে।

শীর্ণ চেহারা কথাবার্তা বলতো কম। ওর মুখে যেন একটা অমাট বেদনার ছায়া বসে থাকতো সারাক্ষণ। কোথায় কোন অফিসে চাকরী করতেন। সকালে বেরতাম থলি হাতে বাজার সেরে বাড়ি ফিরেই স্নান টান করে অফিস বের হয়ে যেতেন—ফিরতেন রাত্রে।

কোন কোনদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে পার্কে লুকিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সিগ্রেট ফুঁকতে যেতাম, দেখতাম ওপাশে কোণের একটা বেঞ্চে চুপ করে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে বসে আছেন নীরোদবাবু।

বাড়িতে তখন চলতো হৈ চৈ আড্ডা। মীরার গানের সুর উঠতো, রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো দামী দামী গাড়ি। কত লোকজন আসতো। মীরা সেন তখন প্রজাপতির মত রঙীন পাখনা মেলে হাওয়ায় উড়ে চলেছে। হাসি হল্লার শব্দ শুনতে পেতাম।···

বাড়িতে থাকলে ওদিককার জানলা খোলার হুকুম ছিল না। তবু আমরা সেই বিচিত্র মেয়েটির

সকালের রং

আশাপূর্ণা দেবী

সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটিয়ে তুলেছিল একা নীরজাই। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখে লিখে যোগাযোগ করে একদিন ছোট ভাইকে সঙ্গে করে বাড়িটা দেখে এসে, তবে খবর দিয়েছিল রঞ্জনকে।

মাঝখানের ব্যাপারগুলো সবটাই ছিল রঞ্জনের অগোচরে।

অগোচরে রাখবার কারণও ছিল।

বছর দেড়েক ধরে নীরজা এই খবরের কাগজের 'বাড়িভাড়া'র বিজ্ঞাপন দেখছে, আর চিঠি লিখছে, এবং বাড়ি দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু ঠিকমত একটি বাড়ি আর এযাবৎ যোগাড় করে উঠতে পারেনি।

প্রথম প্রথম রঞ্জন সঙ্গে যেত বাড়ি দেখতে, ক্রমশঃ সে বৃথা চেষ্টাটা ত্যাগ করেছে, বর্তমানে নীরজার বাহন তার ছোট ভাই স্বপন। রঞ্জন খালি হেসেছে। খালি বলেছে 'বিজয় অভিযান কতদূর?'

বাড়ি কি সত্যিই আজো পাওয়া যায় না? যাবে না কেন? বিজ্ঞাপন তবে দিচ্ছে কারা? কিন্তু বাড়ির চেহারা, ভাড়ার অঙ্ক এবং বাড়ির পরিবেশ—এই তিনটের শুভ যোগাযোগ হওয়া কঠিন।

কিন্তু এবার নীরজা সেই কঠিন কাজটা ঘটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

এবারে সে রঞ্জনের কাছে হেসে হেসে বলছে, 'বাড়ি যা দেখে এলাম, আইডিয়াল! যেমন ছবির মত বাড়ি, তেমনি শান্ত সভ্য পাড়া, আর বাড়িওয়ালীটিও তেমনি সভ্য ভব্য আপ-টু-ডেট্। অবশ্য বিধবা—'

রঞ্জন হেসে উঠে বলে, 'তুমি যে সুরে কথাটার উপসংহার করলে, তাতে মনে হচ্ছে বিধবার পক্ষে আপ-টু-ডেই হওয়া ঠিক সঙ্গত নয়।'

'আহা তা কেন! তবে আপ-টু-ডেট্ বললেই যেন ঠোঁটে রং, নখে রং, সাজা গোজা মেয়ে মনে হয় কিনা। এ হচ্ছে ছিমছাম ফিটফাট ববচুল অথচ থান পরা বিধবা।'

'যাক্ তোমার বাড়িওয়ালীর 'ডেসক্রিপশানে' দরকার নেই আমার। বাড়িটা কেমন সেটাই হচ্ছে কথা।'

'বললাম তো ছবির মত! ধারণাই করিনি আগে, গিয়ে এধরনের একখানি বাড়ি দেখবো। আর কী গোছ ব্যবস্থা! কী পরিষ্কার! আগাগোড়া মোজেক। ভাড়া দেবার জন্যে তৈরি বাড়ি নয়, বুঝলে? কথায় কথায় যা বুঝলাম নিজেরাই থাকতেন, নিঃসন্তান কর্তা-গিন্নী। তা কর্তাটি মারা যাওয়ায় নিছক একা থাকতে হবে তাই একতলাটা ভাড়া দিতে চান। নইলে টাকার অভাব নেই বলেই মনে হল। আমি দেখবো বলে চালাকি করে বললাম, 'একটু জল খাবো বড় তেষ্টা পেয়েছে—'। ব্যস্ত হয়ে নিজের

দোতলায় উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে ফ্রিজ খুলে শরবৎ খাওয়াবে। বেশ্লায় খুব সাজানো-টাজানো। মানে দিব্যি অবস্থাপন্ন।'

রঞ্জন হেসে ফেলে বলে, 'দেখো ভাড়াটে হয়ে গিয়ে আবার যেন রোজ রোজ চালাকি করে ফ্রিজের শরবৎ খেতে যেও না।'

'আহা! আমি যেন তেমনি হাংলা!' নীরজা চড়া গলায় বলে, 'যাই বলো আর তাই বলো, এমন একখানি বাড়ি তুমি সাত জন্মেও খুঁজে বার করতে পারতে না।'

রঞ্জন মুখ টিপে হেসে বলে, 'এমন একখানি রূপসীরত্ন সংগ্রহ করে উঠতে পেরেছিলাম, আর এটুকু পারতাম না?'

'থাক্! যথেষ্ট হয়েছে। সে ক্যাপাসিটি যেন তোমার! সে তো তোমার মায়ের ক্যাপাসিটি। তুমি তো শুনি মুহূর্তের পণ করে বসেছিলে। নেহাৎ নাকি মায়ের কান্নাকাটিতে—'

'আর তোমার তপস্যার জোরে।' রঞ্জন হাসে।

'মুহূর্তের পণ' শুনে মনটা একটু অন্যমনা হল। পণটা কেন করেছিল রঞ্জন?

তারপর রঞ্জন সবচেয়ে দরকারি কথায় এল, 'সবই তো শুনলাম বাড়ি ছবি, বাড়িওয়ালী ছবি, পাড়া আইডিয়াল, কিন্তু ভাড়াটা?'

'ভাড়া!' নীরজা যেন টাকা জিনিসটাকে সহজেই নস্যাৎ করতে পারে এইভাবে বলে, 'বাড়ির তুলনায় কিছুই নয়। ও বাড়ি তিনশো টাকায় পেতে না তুমি, এ তো মাত্র দুশো চল্লিশ!'

'দুশো চল্লিশ!'

রঞ্জন একেবারে অগ্রাহ্যের ভঙ্গীতে বলে, 'তবে তো খুব বাড়ি দেখে এলে। এ বাড়িতে একশো পঁচাশি দিচ্ছি, তাতেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর পঞ্চান্ন টাকা বেশী। আমিও তোমার বাড়ি দেখিয়ে দেব। চৌরঙ্গীতে তিনতলায় একটা ফ্ল্যাট খালি আছে, পাঁচশো টাকা ভাড়া, বাড়ির তুলনায় জলের দর।'

নীরজা রেগে ওঠে।

বলে, 'সব তাতেই ব্যঙ্গ। আর তো কিছু শেখনি, ওইটিই শিখেছ। কিসে আমায় 'ডাউন' করা যায়। তা'হলে বলি—ভদ্রমহিলা এ 'হিন্ট্'ও দিলেন, তেমন ভাল ভাড়াটে পেলে হয়তো কিছু কমাতেও পারেন। ভাড়ার টাকাটার দরকার তাঁর তত নয়, যতটা দরকার একটা লোকবলের। এখনকার চাকরবাকরও তো সব—'

'হুঁ বেশ চালু মহিলা বলেই মনে হচ্ছে। টাকা কিছু নয়, টাকা হাতের ময়লা! তবে আড়াইখানি ঘরের মূল্য আড়াই শো এই যা!···তা তাই যদি 'হিন্ট্' পেলে, সোজাসুজি চেপে ধরলে না কেন? বললে না কেন আমরা ব্যাচলার অতি সজ্জন লোক।'

নীরজা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'হ্যাঁ আমি একটা ভদ্রমহিলা হয়ে ওইরকম কাকুতি মিনতি করে ছোট হতে যাবো কেমন? যা বলবার তুমিই বোলোনা! যাবে তো কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্ট করতে।'

রঞ্জন গম্ভীর হাসি হাসে, 'তা' বটে 'ছোট' হওয়ার দায়টা আমাদের ওপরই থাক। তা' কবে যাবে বলেছ?'

'কবে কি গো! কাল সন্ধ্যেবেলা। বললো, 'অনেক লোক আসছে—'। আসবেই তো। অমন সুন্দর বাড়ি! দেখো তুমি ওই ভাড়া ভাড়া করে এমন বাড়িটি হাতছাড়া কোরো না। সুন্দর বাড়িতে

থাকলে মনটাও সুন্দর হয়। ····যাও, একটু বলে কয়ে দেখো—ঠিক কমিয়ে দেবে। অভাবে পড়ে তো আর ভাড়া দিচ্ছে না।'

রঞ্জন হাসে।

বলে, 'টাকা কি শুধু অভাবের জন্যেই চায় লোকে?'

সকালবেলা নীরজাই তাড়া দিয়ে দিয়ে পাঠায় রঞ্জনকে। নিজের তো তার এ সময়টা মরবারও সময় নেই।

বলে, 'বাড়ি খুঁজতে তোমায় বেশ পেতে হবে না। ছোট্ট গেট দেওয়া বাড়ি, গেট-এ নাম দেওয়া 'চন্দ্রিকা।' বেশ কবি কবি পছন্দ। উনিশ নম্বর 'বিউটি কর্ণার পার্ক।'

'বিউটি কর্ণার! ওরে বাবা! কোথায় খুঁজে পেলে এ রাস্তা?'

'আহা, পাবোনা কেন? রমাদের নতুন বাড়ি ওইখানে নয়? নতুন পাড়া—নতুন নাম।'

'শেষপর্যন্ত তোমা—না কি বলবো 'আপনাকে'? দেখতে পেলাম বিউটি কর্ণার পার্কে? রঞ্জন উদাস গলায় বলে, 'জগতে কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে।'

বাড়িওয়ালী মিসেস ঘোষ চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলেন, 'এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? পৃথিবীটা গোল, এ কথাটা তো নতুন নয়।'

'নতুন নয় তবু গোলমেলে লাগে। কতদিন করেছেন, না মানে হয়েছে এ বাড়ি?'

'বেশীদিন নয়—', মিসেস ঘোষ চশমাটা এবার চোখে লাগিয়ে বলেন, 'পাড়াটাই তো নতুন। কিন্তু আপনি আজেটার কি খুব দরকার আছে?'

রঞ্জন অপ্রতিভ হাসি হাসে।

'কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না দরকার আছে কিনা।'

'যদি বলি দরকার নেই?'

'তা'হলে বেঁচে যাই।'

'আশ্চিও। বেশ বৌটি তোমার। বেশ ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ ভাব, হাসিখুসি।'

সকালের রোদটা ঘরের দেয়ালে আসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু গরিলন পর্দায় বাধা পেয়ে শুধু একটা আভা ছড়িয়ে রেখেছে। যেন সেই দিকে চেয়ে চুপ করে যান মিসেস ঘোষ। যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায় আঠারো বছর পরে বিধাতা যে তাদের এমন একটা অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন, সেটা রঞ্জনের বৌ কেমন মেয়ে সেই খবরটা আলোচনা করবার জন্যে নয়।

রঞ্জনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

রঞ্জন ওই পর্দাটাকেই দেখছে। বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে, ওপিঠ থেকে রোদ লেগে নক্সাটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। একসময় বলে, 'একলাই থাকো?'

'উপায় কি?'

'উনি মানে—মিষ্টার ঘোষ কতদিন?'

'বছর দেড়েক।'

মাঝে মাঝে বিরতি, মাঝে মাঝে ছোট ছোট কথা।

প্রথম দেখার চমকানির পর দুজনেই প্রসঙ্গ হতে চেষ্টা করেছিল। কেমন খেই হারিয়ে গেল।

একজন ভাবছে···আশ্চর্য! রঞ্জন আর আমি এক বাড়িতে বাস করছি এমন ঘটনা ঘটবে শেষ পর্যন্ত? কিন্তু রঞ্জনকে কি বলে দেব, অতীত ইতিহাস ইতিহাসের পাতাতেই থাক্, রঞ্জনের বৌ যেন বেণুকে কেবলমাত্র বাড়ির মালিকানী বলেই জানে।

কিন্তু কি ভাবে বলবে কথাটা?

রঞ্জন. তোমার বৌ যেন জানতে না পারে আমাদের কোনো পূর্ব পরিচয় ছিল!

নাঃ ওটা কেমন বেখাপ্পা লাগছে।

তা'হলে,—রঞ্জন, আমি তোমার বাড়িওয়ালী, তুমি আমার ভাড়াটে, এই পরিচয়ই ভাল, কি বল?

না না, ওটাও আড়ষ্ট লাগছে।

তবে কি খপ করে বলে উঠবে।, কিন্তু রঞ্জন খবরদার! তোমার বৌ যেন জানতে না পারে আমি তোমার বাল্যবান্ধবী।

কিন্তু কোন্ ফাঁকে বলাটা হবে?

তার মাঝখানে মাঝখানে যে রঞ্জন কথা বলেই চলেছে—সেই যে ত্রিপুরায় চলে গেলে বেণু, তারপর একেবারে খবর-শূন্য নিস্তব্ধতা!....কবে যে কলকাতায় এসেছ, কবে যে বাড়ি করেছ—।

বেণুকেও তাই ভিতরের কথা সাজানো বন্ধ রেখে বাইরের উত্তরটা দিতে হচ্ছে, 'খবর নেবার বাসনা থাকলে কি আর অতটা শূন্যতা থাকতো?'

'বাসনা থাকলেই বা কি? আমি কোথায় তুমি কোথায়? তুমি ত্রিপুরা স্টেটের যুবরাজ-পুত্রবধূ, আর আমি একটা শুধু বি, এ, পাশ হতভাগা কেরাণী!'

'ওটা হচ্ছে আত্মপক্ষ সমর্থনের ছল।'

'এর উত্তরে আর তাহলে দ্বিতীয়বার সমর্থন করা চলে না।'

'রঞ্জন, একটু চায়ের কথা বলে আসি।'

'কেন? আবার কেন চায়ের জন্যে খাটবে? তোমার ঘরের ফ্রিজে তো সরবতের ঠাণ্ডা গরবৎ মজুত থাকে।'

বেণু একবার নির্নিমেষে তাকায়।

তারপর মৃদু হেসে বলে, 'সেটা সকলের জন্যে নয়। কারো জন্যে ঠাণ্ডা, কারো জন্যে গরম। বোসো একটু। এখনও সকাল রয়েছে।'

পর্দা ঠেলে উঠে যায়।

রঞ্জন চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। চারিদিকে ঐশ্বর্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

ভাপ্সিস ছবির মত বাড়ির আপ-টু-ডেট বাড়িওয়ালীর সঙ্গে প্রথম দর্শনের ব্যাপারে নীরজা জোর করে তাকে ধোপদস্ত শার্ট প্যাণ্ট পরিয়ে পাঠিয়ে ছিল।

রঞ্জন তো বলেছিল, 'আরে বাবা, বাস করতে গেলে তো সেই ছেঁড়া লুঙ্গি আর চটের থলি দেখবে।'

দিকে কি সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতাম। নীরোদবাবু যেন তার স্বভাবের ঠিক বিপরীত একটি মানুষ।

কোলাহল থামলে ওই অতিথিরা বিদায় নিলে চুপি চুপি বাড়ি ঢুকতো। কোন কোনদিন রাত গভীরে শুনতাম তার তর্জন গর্জন। মারো মারো হুঙ্কারও শোনা যেতো। মা'র গলাও শুনতাম, মনে হতো যেন একটা বিচিত্র জগতে সেকালে বাসা বেঁধেছে একত্রে দুটি মানুষ যারা পরস্পরকে ঘৃণা করে—বিজাতীয় ঘৃণা।

খবর জোগাতো বাড়ির সামনের পানওয়ালা বেনারসী সাহ। পাড়ার ছেলেদের ভিড় জমতো বেনারসীর দোকানে, পানের চেয়ে তার সংগৃহীত তাজা খবরের দিকেই তাদের বেশী নজর। বেনারসীর দোকানে লেমনেড সোডার বোতলে নাকি অন্য অনেক তেজী পানীয় থাকতো। অবশ্য বেনারসী'র কপালে চন্দন ফোঁটা আর টিয়া এক গোছা শিখা আর মুখে সীতারামের উচ্চারণ শুনে মনে হতো তুলসীদাসের পরম ভক্ত ওই বেনারসী প্রসাদ শর্মা।

এহেন বেনারসী বলতো—ঐ দিদিমণি একদম দেবী আছে। একদম দেবী।

অবশ্য পাড়ায় তবু নানা কথা উঠেছিল। কেউ কেউ নীরোদবাবুকেও নাকি কিছু বলেছিল, তিনি কি জবাব দিয়েছিলেন জানি না। রাতের অন্ধকারে মীরা সেন আর নীরোদবাবুর মধ্যে খুব চীৎকার তর্জন গর্জন চলেছিল। মীরার বাড়িতে গাড়ি লোকজন আসা থামেনি। নীরোদবাবুকেও ক'দিন দেখিনি আর।

ক'দিন বাড়িটা বন্ধ। দুচারজন এসে ফিরে যায়।

খবরটা দিয়েছিল বেনারসীই। ওরা উঠে গেছে কে বলে নীরোদবাবুর অসুখ, কোথায় নাকি চেঞ্জে গেছে।

বেনারসী শর্মা অবশ্য সেদিন সত্যি কথাটা শোনায়।

সেক নৌটঙ্কী ছায় বাবুজী, ও লেড়কী ওইসাই থা। মারো গোলি। ভদ্দর আদমীকা ঘরবালি! থ্যাৎ।

তামাম সহরের ভিড় এখানে এসে জমেছে। পাশাপাড়ার বড় বড় বাড়িগুলো এর ওর ঘাড়ে মাথায় হেলান দিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে, তারই নীচে দিয়ে এইটুকু রাস্তাটা কোন মতে প্রাণ বাঁচিয়ে এদিক ওদিক অন্ধকারের মত ঘুরে কঙ্কর উন্মুক্ত বিস্তারের সামনে এসে মুক্তির আনন্দে হারিয়ে গেছে।

বটগাছের ছায়া পড়েছে নদীর বালির উপর। বাঁধানো চাতালে এদিকে ওদিকে বসে গেছে পুরোহিত দল, পাণ্ডারাও উপোসী ছায়লোকার মত খদ্দেরের সন্ধানে ঘুরছে। একপাশে দেহাতী কোন যাত্রীকে ধরে মাত্র সওয়া পাঁচ টাকার বিনিময়ে তার মর্ত্যলোকে পিতৃদেবের অক্ষয় স্বর্গের ব্যবস্থা করবার জন্য জপাচ্ছে।

ওপাশে বসে আছে সাঁতরা মশাই, সঙ্গের পুরোহিত শ্রাদ্ধাদির আয়োজন করছে, তারই তদারক করছে সাঁতরা মশাই। আমাকে দেখে বলে—এসে গেছেন?

ঘাড় নেড়ে নদীতে নামলাম। ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়িগুলো এসে নদীর বালি ছুঁয়েছে। বন্যার সময় এখানে জল আসে, অন্য সময় অন্তঃসলিলা কঙ্কর বুকে জল পেতে গেলে বালিই খুঁড়তে হয়। সাঁতরা মশাই তখনও পুরোহিতকে তাড়া দিচ্ছে।

যেন খুব করে কাযকর্মো করবেন মশায়। এরপর আবার যেতে হবে প্রেতশিলায়। দেরী হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যে গেল!

বালির উপর এসিয়ে চলি। অন্তঃসলিলা ফল্গু। ওপারে পাহাড় বনশ্রীরা। নীচে রেলশাইনের ত্রিজটা দেখা যায় একটি সরলরেখার মত। নদীর বুকে যাকে মাঝে বালি খুঁড়ে ছোটখাটো পুকুরের মত ঠাঁই এ জল বের করেছে, সেইখানেই স্নান করছে যাত্রীরা। আশপাশে বালির স্তূপ।

হঠাৎ আমাকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়াল সেই মীরা সেন। সদ্য স্নান সেরে উঠে আসছে। নিটোল দেহে ভিজে শাড়িটা চেপে বসেছে, এলোথোপা ভিজে চুল আলতো করে বাঁধা। সুগঠিত ওই দেহের দিকে একদিন কত চোখের মুগ্ধদৃষ্টি পড়েছিল, আজও তা তেমনি যৌবনবতী রয়ে গেছে।

তবু কোথায় কান্নার বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে ওর দুচোখে। ওই দেহ আর এই চোখ দুটোর ভাষা আজ সম্পূর্ণ আলাদা। ওকে এমনি অবস্থায় দেখিনি কখনো। চিনতে পারছেন?

মীরা সেনই কথা বললো। একদিক ওদিকে বালির পাহাড় প্রমাণ স্তূপ ওপাশে বিষ্ণুপাদপদ্ম মন্দিরের ঘাটগুলোকে আড়াল করে রেখেছে। দুচারজন যাত্রী কোনরকমে স্নান সেরেই দৌড়াচ্ছে ওদিকে। কারো ওদিকে মন দেবার সময় তাদের নেই।

আজকের মীরাকে আমি দেখছি। হালকা সাদা নানা রং-এর সিল্কের শাড়ি নেই, ব্লাউজের আবরণে অনাবৃত দেহটাকে প্রকট করার চেষ্টাও নেই। চোখে নেই কাজলের নেশা লাগানো আভাস, ঠোঁট গালের রং মুছে গেছে। সাদা খোলের একটা শাড়ি পরণে শূন্য নিরাভরণ হাতে দুটো মাত্র বালা। সারাদেহের উদ্ভত অসংযত সৌন্দর্য আর যৌবন অন্তরের ব্যাকুল ভাষাহীন বেদনায় স্তব্ধ। ওর কথার জবাব দিলাম।

হ্যাঁ! একাই এসেছেন?

হাসলো মীরা সেন। মলিন বেদনাতুর একটু হাসি ও যেন কান্নার চেয়ে আরও করুণ। বলে মীরা আর তো কেউ নেই। তবু তার শেষ কাজ আমাকেই করতে হবে। সঙ্গে ওরই এক বন্ধু এসেছেন।

কথাগুলো বলে চলেছে মীরা সেন, চকিতের জন্য তার চোখে বেদনার আভাস ছলছল করে ওঠে। ওর স্বামী নীরোদবাবুর অসুখ করেছিল শুনেছিলাম, আজকে ওর চেহারার পোষাক আমাকে এখানে আসার মধ্যে বুঝেছিলাম পরের ব্যাপারটা। নীরোদবাবুর সেই অসুখ আর সারে নি। সেই কলকাতার বাড়ি ছেড়ে যাবার পর অনেক ঘটনার স্রোত বয়ে গেছে ওর জীবনে। শান্ত সেই ভদ্রলোকটির কথা মনে পড়ে। তাই কৌতূহলের বশেই শুধোই, কি হয়েছিল নীরোদবাবুর?

মীরা বৌদি চমকে ওঠে। চকিতের মধ্যে ওর কর্মী সুন্দর মুখখানা পাংশু ছাইবর্ণ হয়ে যায়। ওর সারাদেহ যেন কাঁপছে, ওর চোখের সামনে বোধহয় ওর স্বামীর রোগজীর্ণ মলিন মুখখানা ভেসে ওঠে, ও বোধহয় পড়ে যাবে এই নদীর বালিতেই। হাত থেকে জল ভরা ঘটিটাই পড়ে গেল বালির উপর।

—বৌদি! চমকে উঠেছি আমি। ওর মনের চাপাপড়া সেই বেদনার ঝড়টাকে আমি নাড়া দিতে চাই নি।

মীরা বৌদি কোনরকমে সামলে নিয়ে জবাব দেয়।

—অনেকদিন ভুগছিলেন, এমনি হার্টফেল করে মারা যান।

কথাগুলো কোনরকমে উচ্চারণ করে ও সরে গেল। তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। লক্ষ্য করেছিলাম ওর অজানতেই মীরা বৌদি বিবর্ণ চাহনিতে বার বার নিজের প্রকম্প হাত দুটোর দিকে চাইছিল, চোখে কি ভীত বিস্ফারিত চাহনি নিজের অন্তর মনের সঙ্গে যুঝে তবে ওই জবাব দিতে পেরেছে সে। তবু ভয় যায় নি। কি নিদারুণ অন্যায়ের ভয়। তাই বোধহয় সরে গেল আমার সামনে থেকে। পালিয়ে গেল। বোধহয় আরও কিছু বলতে চেয়েছিল—যা সে বলতে পারেনি যে কোন কারণেই।

তবু ওর চোখের জলটা মিথ্যা নয়। মনে পড়ে এর স্বামীর সঙ্গে আপেক্ষার ব্যবহার। নীরোদবাবু ঘৃণায় যেন ওকে এড়িয়ে চলতেন। মীরাও তাকে অবজ্ঞা আর অবহেলা করতো। তার সারা মনে কামনার নীল নেশা, ওই জগতে নীরোদবাবুর মত তিনশো টাকা মাইনের কেরানীর কোন স্থান ছিল না। নীরোদবাবুর অসহায় বিবর্ণ মুখখানা বিবর্ণ মনে পড়ে। আজ আমার কাছে সব মৃত বিবর্ণ।

হলুদ ঘোর সেজরা চরে ওঠে ফল্গুর বুকে, দূরে ছায়া ছায়া বনসীমা। পাহাড়গুলো কালোছায়ার মত দাঁড়িয়ে দেখা যায়। এযেন মৃতের জগৎ। জীবনদীর তীরে এসে মানুষ তার সব ভুল নীচতা বুঝতে পেরে ক্ষণিকের জন্য চমকে উঠছে।

এই শুভ্র উষর জগতের প্রান্তে কাশফুলের দল এসে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দাঁড়ায়, ওদের চাহনিতে ফুটে ওঠে আলা ঘৃণা। কেউ বা পরম বেদনাময় চাহনিতে ফেলেযাওয়া প্রিয়জনের দিকে চেয়ে থাকে, চেয়ে থাকে ভাষাহীন আবেগ নিয়ে এই পৃথিবীর মানুষের দিকে যারা ও কিছুদিন আবার ওদেরই মিছিলে সামিল হয়ে যাবে।

তবু ওরা জানেনা মানুষের অবিনশ্বর পরমায়ু মোহে তারা ভোগবিলাস আর অন্যায়ের স্বপ্ন দেখে চলেছে।

মীরা বৌদির দুচোখে দেখেছিলাম সেই আতঙ্ক আর বেদনা। ওর স্বামীর মৃত্যুর কারণ আমার জানা নেই। তবু ও কেন শিউরে উঠল জানি না। বারংবার তার দুটো হাতের দিকে চেয়ে দেখছিল কে জানে তাতে কোন রক্তের স্পর্শ লেগে গেছে কিনা? মনের অতলের দুর্বলতা তাকে নিজেদের জন্য বলে দিয়েছিল তার অজানাতেই।

স্নান সেরে ঘাটের দিকে ফিরলাম। কাজকর্ম সেরে বিষ্ণুপাদপদ্ম স্পর্শ করে বের হয়ে আসছি হঠাৎ ঘণ্ডাই গলার ডাক শুনে দাঁড়ালাম।

ওপাশেই কয়েকটা হালুইকরের দোকান। সকালের পরই খদ্দেরের ভিড় লাগে এখানে। উনুনে পুরী জিলাপী ভাজা হচ্ছে।

ও মশাই।

সাঁতরা মশাই খাবারের দোকানের একটা বেঞ্চে বসে ডাকছে। দাঁড়াতেই বলে ওঠে আসুন আসুন।

ওপাশে চুপকরে বসে আছে মীরা বৌদি। এগিয়ে যেতে ও তেমনিই বসে রইল মাথা নামিয়ে। বুঝলাম না-চেনার ভানই করছে ও।

—বসুন।

মীরাবৌদিকে দেখছি। একটু আগে নদীতে দেখা মেয়েটি এ যেন নয়। সেই গভীর বেদনাময় চাহনি ঘুচে গেছে। এযেন নিজের স্বপ্নে বিভোর কোন স্বতন্ত্র নারী। নিজের জগতে সে হারিয়ে গেছে। ফল্গুর অন্তঃস্রোতের মতই এখনও ওর মনে পড়ে হারানো একজনের কথা। কি ব্যাকুল আর্তি নিয়ে সে বাঁচতে চেয়েছিল। নিজের চারিপাশে আগুন জ্বালিয়েছিল মীরা বৌদি। তাই বোধহয় নীরোদবাবুকে সহ্য করতে পারেনি, সে বাধা দিয়েছিল মীরার এই মোহে। গাড়ি বাড়ি ভোগ বিলাসের লোভ তার প্রজাপতি মনকে কোন দূর জগতে উধাও করেছিল। তখনই দেখা হয়েছিল তার এই সাঁতরা মশাই এর সঙ্গে। ক্রমশঃ নীরোদবাবুকে মীরার মনে হয়েছিল বোঝামাত্র। ওই তার পথের বাধা।

কে জানে হয়তো আজ তার সম্বন্ধে মীরাবৌদির মনে এতটুকু বেদনার সঞ্চার রয়ে গেছে, ভালবাসবে। নিশ্চয়ই লোকটাকে বইলে মৃত্যুর পরপারেও কেন আজ তাকে এমনি ব্যাকুল মন নিয়ে স্মরণ করেছে মীরা।

সবই কেমন এলোমেলো বোধ হয়।

দাঁতরা মশাইএর মর্ডারী খাবার এসে গেছে। ভয়দা ঘি-এর স্পেশাল পুরী গরম তরকারী সেই সঙ্গে বড় বড় কয়েকটা কালাকাঁদ আর সোনালী পেড়া। বাতাসে সুঘ্রাণ উঠছে। লোকটা খেতে পারে, খাবার সম্বন্ধে একটা লোভ আর মোহও রয়ে গেছে তার। আমার দিকে একপাত্তা এগিয়ে দিয়ে বলে—

—খান্! কই তুমি নেবেনা?

মীরা ঘাড় নাড়ে: না। ওদিকের কাজকর্ম সেরে তবে বাহুল্য খেয়ে নেবে।

দাঁতরা মশাই প্রতিবাদ করলোনা। গোগ্রাসে গিলে চলেছে সে। আমার দিকে উদারার আনায় খান।

কথা বলার সময় তার নেই। গিলছে গরম পুরি আর তরকারী।

দাঁতরা মশাই খেয়ে চলেছে। ওকে দেখে মনে হয় লোকটার মধ্যে যেন একটা রাক্ষস ঢুকে আছে। সে গোগ্রাসে গিলতে চায় সবকিছু। মীরার দিকে চেয়ে থাকতে দেখেছি ওকে, সে চাহনিতেও এমনি নেশা আছে। নির্লজ্জ পাশব একট নেশা, যে কেবল ভোগই করতে চায়।

দেখি আর গোটাকয়েক কালাকন্দ। বুঝলেন মশাই, পেড়াটা এরা ঠিক নামাতে পারেনি। তবে কালাকন্দ ভালোই করেছে। আউর মাসাই আড়াইশো গ্রাম। খান মশাই!

আমার ওই কথানা পুরি কালাকন্দে পেট ভরে গেছে। দাঁতরা মশাই আমার দিকে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ইয়া বিরাট হাতের পাতা দিয়ে গবাগব বিশাল মুখগহ্বরে চালান করে দিচ্ছে। ওর গর গর করে চিবোনোর শব্দ কানে আসে।

ওর ওই খাওয়ার মধ্যেও অনন্ত লোভী মনের পাশব আনন্দ ফুটে ওঠে। দোকানের ভিতর গরম আর তেমনি ধোঁয়া। উঠে একটু বাইরে এলাম। দাঁতরা মশাইএর তখনও সময় লাগবে, তাই। এর পর যেতে হবে বেশ কয়েকমাইল দূরে প্রেতশিলা পাহাড়ে।

মীরা বৌদি এর আগেই উঠে গেছে। ধোঁয়ার গরমে দেখেছিলাম ওর দুচোখে লালচে আভাস। একটু পরেই বের হয়ে গিয়ে ওপাশের নদীর ধারে বটগাছের নীচে দাঁড়িয়েছে।

আমাকে দেখে মুখ তুলে চাইল। বলে ওঠে।

—ওই লোকটাকে সহ্য করতে পারছেন কি করে?

অবাক হবার পালা আমারই। মীরা বৌদির সঙ্গে ওর একটা ঘনিষ্ঠতা আছে সেটা অনেকদিনের বলেই মনে হয়। মীরা বলে চলেছে।

—আস্ত একটা শয়তান।

কোথায় যেন জড়িয়ে পড়েছে ও। ওই বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার পথ তার জানা নেই। মনে মনে জ্বলছে কি দুঃসহ জ্বালায়।

—হঠাৎ কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল মীরা। ওর মুখ চোখ থমথমে হয়ে থাকে, কি নীরব রাগে ফুঁসছে সে। দাঁতরা মশাই বেশ খুশি মনে এগিয়ে আসে, একমুখ পান চিবুচ্ছে তারই লাল জর্দার খোলবুটার পিচ বেশ খানিকটা ফেলে বলে:

—চলুন মশায়, কোথায় প্রেতের পাহাড়ে যাবেন। আরে পানের দুত পেলায় না এদেশে। বাংলা পান হবে তা নয় বলে বেনারসী।

কই গো চল!

মীরা চুপ করে এগিয়ে আসে ওই গটমাছের নীচেকার আলোছায়ার মাঝ থেকে।

সাঁওতাল মশাই বলে চলেছে।

—তুমি খেলে না কিছুই। তা বাপু তোমাদের ভক্তিছেদ্দা আছে! বুঝলেন মশাই এমন স্বামী হওয়া ভাগ্যির কথা। জীবন্তে সেবাযত্ন তো হ'লই, মরে যাবার পরও এই পাহাড় পর্যন্ত ডিঙিয়ে এসে সারাদিন না খেয়ে এইসব কাজ করা! ভাগ্যের কথা···

নিজেই হাসতে থাকে খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দে। মীরা বৌদির দিকে চাইলাম। ওর দুই চোখ লাল হয়ে উঠেছে। দুচোখের চাহনিতে কি দুঃসহ জ্বালা।···এযেন অন্য কোন নারী। এমনি অন্তরের তীব্র জ্বালা ওর আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মত ছেটে পড়বে।

কোথায় একটা প্রতিবাদ জমে আছে মীরা বৌদির মনে, তবু বোধ হয় অপ্রিয় ঘটনাটা এড়াবার জন্যই চেপে গেল সে। মুখ নীচু করে ওই পেল্লাবাড়ির কোল দিয়ে ভিজে আধো আলো আঁধার রাস্তা বেয়ে নেমে চলেছে সে ওই রিক্সা টাণ্ড। দাঁড়াবার জায়গার দিকে।

মীরা বৌদিদের ওখানেই ছেড়ে দিয়ে সহরে ফিরতাম, প্রেতশিলা পাহাড়ে যাবার দরকার নেই, ওখানে মানুষ শেষকৃত্য করতে যায় অপমৃত্যু ইত্যাদির জন্য। ওদের ওখানে যাবার কারণ আমার অজানা।

এগিয়ে আসতাম—মীরা বৌদিই বলে:

—চলুন না- একটু ঘুরে আসবেন।

ওর কণ্ঠস্বরে আরও কি যেন চাপা একটা রহস্য, জ্বালা আর রাগের ছোঁয়া তখনও ওর মন থেকে মুছে যায় নি। নীরব দুচোখের কি বেদনাময় ভাষার ডাক। ও কি যেন বলতে চেয়েছিল। সে কথা শোনার কৌতূহলও ছিল। তাই ওদের সঙ্গী হয়েছি।

··সহরের সীমা ছাড়িয়ে রিক্সাটা চলেছে প্রেতশিলা পাহাড়ের দিকে। হলুদ রোদ ঝকঝকে রূপালী হয়ে ওঠে। দূর দিগন্তের শালবন পাহাড়সীমা থেকে ভেসে আসে হিম হাওয়া। ওই পাহাড়গুলোকে দেখে মনে হয় ধোঁয়াটে বিবর্ণ কোন মৃতের স্তূপ। রোদ ছায়াময় শালবনসীমা কি অজানা লোকের রহস্যে ঢাকা।

মীরা বৌদি সাঁওতাল মশাই এর মাঝে কি একটা রহস্য রয়ে গেছে! ঘৃণা প্রতিবাদ জমে উঠেছে ওই মীরার মনে, তবু লোকটার নির্লজ্জ লোভী পাশব স্বভাবের কাছে ও যেন বারবার প্রতিবাদ করতে গিয়েও ভয় পেয়েছে। মীরার আজকের এই মৃতস্বামীর প্রতি ভক্তি-ভালবাসার মনভরা জগতে ওই লোকটাকে দেখে বিস্ময় বোধ হয়।

ওদের রিক্সাটা এগিয়ে গেছে। মুক্ত প্রান্তরের মাঝে বিশাল পাহাড়গুলো মাথা তুলেছে। ধ্যানগম্ভীর বন আর পর্বতসীমা রৌদ্রছায়ায় কি বিচিত্র জগতের আভাস এনেছে। মানুষের রাজ্য এখান থেকে ঘুরে।

এ যেন কোন কায়াহীনের রাজ্য—তাদের তপ্তশ্বাসভরা দিগন্ত সীমা। শুষ্ক প্রাণহীন ওই পাহাড়ের বুকচিরে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে, কোথাও সবুজের কোন আভাস নেই—খাড়া পাহাড়টা কঠিন

শাসনের ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শূন্যতাকে প্রকট করে তুলেছে মাঝে মাঝে দুএকটা কাকের কলরব।

সাঁতরা মশাই হাঁপাচ্ছে এরই মধ্যে। ওর পেটের মধ্যে সেই পাঁচ সের পুরী কালাকান্দ জলযোগে বোধ হয় ফুলে উঠেছে। মোটা দেহ নিয়ে পাহাড়ে উঠতে বেদম হয়ে পড়ে। তবু হাতীর মত টলতে টলতে ওঠবার চেষ্টা করছে আর হাঁপাচ্ছে হাফরের মত।

মীরা বৌদি ছিপছিপে শরীর নিয়ে বেশ সহজ ভাবেই উঠে চলেছে ওকে অনেক নীচে ফেলে রেখে। ওর মনের মধ্যে একটা সঙ্কল্প আর প্রয়োজনের তাগিদ বোধহয় সব দুর্বলতা আর ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই এমনি সাহস আনে।

এক মনে উঠে চলেছে। সামনে খাড়া চড়াই—শুকনো পাথর আর পাথর। পাশে কার উষ্ণ নিঃশ্বাসের শব্দে সচকিত হলাম। শুভ্র দিগন্ত।

বহুনীচে ওদিকে দেখা যায় সরু একফালি ফিতের মত রাস্তাটা একেবেঁকে চলেছে, তার পাশে দুএকটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে বিন্দুর মত। কোথায় আকাশে একটা চাতক ক্ষীণ হাহাকারময় দীর্ঘতানে বুকভরা তৃষ্ণা নিয়ে ডেকে চলেছে ফটিক জল! শিলাস্তূপে ওর সেই হাহাকার কি বিষণ্ণতাকে মূর্ত করে তুলেছে।

চারিদিকে এর প্রাণহীনতার রাজ্য। এর বাতাসে ভাসে কান্নাহীন দীর্ঘশ্বাস। কি ব্যাকুল আর্তি নিয়ে অতৃপ্ত আত্মার দল এর মহাযোগে পরিভ্রমণ করে, কবে কোন প্রিয়জন আসবে, তাদের স্মরণে দেবতার পাদপদ্মে নিবেদন করে যাবে একমুষ্টি যবচূর্ণ একবিন্দু পানীয়। দুঃসহ যন্ত্রণায় তার ক্ষণিক শান্তির স্পর্শ পাবে।

ফ-টিক জল!

ওই পাখীগুলো চিরকালই হাহাকার করে আকাশ-বাতাসে কি ব্যাকুলসুরে; ওযেন চিরন্তন মানুষের কান্নার ছোঁয়া লাগা একটি দীর্ঘতান।

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সচকিত হয়ে চেয়ে দেখি ওপাশে একটা পাথরে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে মীরা বৌদি। একদমে এতখানি পথ উঠে এসেছে, তখনও সাঁতরা মশাই রয়েছে অনেক নীচে। বাঁকের মাথায় তাকে দেখা যায় না। মীরা বৌদির মুখ লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে। চুলের লতিতে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সুগঠিত দেহটা তখনও নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছন্দবদ্ধভাবে ওঠা নামা করছে। তাড়া খাওয়া কোন জানোয়ারের মত যেন পালিয়ে এসেছে সে। আমার দিকে চেয়ে থাকে সেই ভয়ার্ত চাহনি মেলে।

কি ভাবছে সে। প্রশ্ন করে হঠাৎ।

—আপনি পরজন্মে বিশ্বাস করেন?

কি যেন ভাবছে সে। বোধহয় এ যুগের পাপ পুণ্যের ভেদ অঙ্ক জগতে রইতে হবে কিনা তাই ভাবছে। জবাব দিই।

—অবিশ্বাস করে লাভ কি?

আমার দিকে স্থির দীর্ঘ চাহনি মেলে সহজ সরল কণ্ঠে মেয়েটি শুধোয়।

—মানুষ সেখানেও খুব কষ্ট পায় না? যারা এমনি অপমৃত্যু মরে—। চুপ করে থাকি। ওর কথাগুলোয় কি প্রচ্ছন্ন বেদনা মাখানো। নীরোদবাবুর নিষ্ঠুর মৃত্যুটাকে সে ভুলতে পারেনি। তার জন্য

আজও তার মনে গভীর একটা অনুশোচনা আর পরিতাপ হয়ে গেছে। নিজের সঙ্গে ও তিলেতিলে সংগ্রাম করে চলেছে, কঠিন নির্মম কোন সত্যকে গোপন করে চলেছে সে।

দুজনে উপরে উঠছি। মীরাই বলে,

—আপনি ওকে চিনতেন, না?

ঘাড় নাড়ি। মীরা বৌদি কি ভেবে বলে ওঠে।

—আমার সম্বন্ধেও তাহলে অনেক কিছু শুনেছেন?

ওর দিকে চাইলাম। মীরা বৌদির দুচোখে কি শুধু বেদনাময় চাহনি। বহু নীচে দেখা যায় মোটা দেহ নিয়ে সাঁতরা মশাই তবু উঠে আসছে, দুচোখ মেলে এদিক ওদিকে সে খুঁজছে মীরাকেই দেখা না পেয়ে তত প্রাণপণে ঠেলে উঠছে। মীরা বৌদি বলে।

—গ্রহ জানেন? আমার জীবনে ওই লোকটিই সেই গ্রহ। নিজেও জড়িয়ে পড়েছি নিজের ভুলে —এর থেকে মুক্তির পথ আমার জানা নেই। যা শুনেছেন—দেখেছেন; তাকে অস্বীকার করার পথ আমার নেই, শুধু দুঃখই পেয়েছি, অশেষ দুঃখ আর বেদনা। অনেক পাপের বোঝাই জমা হয়েছে আমার ঘাড়ে—

মীরার শ্রান্ত দুচোখে জল নামে। আগেকার সেই উছল প্রজাপতি-জীবনের প্রতি আজ তীব্র ঘৃণা আর প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কি মহা পাপে সে লিপ্ত—তা জানি না। তবে মনে হয় ওর হাত দুটো থেকে কিসের দাগ যেন জোর করে মুছে ফেলতে চায় সে বারবার; তবু মনের জ্বালাকে নিভোতে পারেনি।

মনে হয় মীরার দোষ সবটাই নয়। কোথায় বারবার সে ঠকেছে। নিজেকে ভুল করে কোন শয়তানের কাছে বিক্রী করে দিয়েছে। তারই খেসারত দিয়ে চলেছে প্রতি পদে পদে অন্তরের সব শ্রীকে বিসর্জন দিয়ে! ওর চিরন্তন নারী মন কি চেয়েছিল সেদিন বোঝেনি মীরা, তাই স্বামীকে নিদারুণ আঘাতেই জর্জর করে তুলেছিল—বঞ্চনা করেছিল।

আজ সারা মনের বেদনায় তারই প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে। সেও আজ হাহাকার করে—ওই তৃষিত চাতকের মত। ঘর-স্বামী-সন্তান-নারী যা কামনা তা সে পায়নি, পেতে পারেনি। ভুল করে সবকিছুকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তাই আজ একান্তে সেই জীবন-মৃত্যুর মিলনতীর্থে দাঁড়িয়ে আজ চোখের জলই ফেলেছে সে। একান্তে কামনা জানায় বিবাহীন কণ্ঠে সেই চিরন্তন নারী। জীবনে ওকে শান্তি দিতে পারিনি তার জন্য আজীবন জ্বলছি। তবু সে শান্তি পাক।

মীরার দুচোখ সেই বেদনায় ছলছল করে ওঠে। বলে চলেছে সে।

—কিন্তু এভাবে বাঁচা যায় না। এর চেয়ে আমার মরাই ছিল ভালো। তিলে তিলে আমিও মরছি এই পাপের বোঝার চাপে। দুহাতে তারই দাগ—

নিজের হাতদুটোর দিকে ভীত চকিত দৃষ্টি মেলে সে দেখছে। আপন মনে বিড় বিড় করে বলে চলেছে।

—মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি।

হঠাৎ সাঁতরা মশাই-এর হুঙ্কারে চমকে উঠলাম। হাসিই চেহারা নিয়ে সাঁতরা মশাই এসে হাজির হয়েছে, হাপাতে হাপাতে গর্জন করে মীরা বৌদিকে এখনও এখানে দেখে।

—ভাবলাম মন্দিরে উঠে গেছো—এখনো এখানে কি হচ্ছে? কত দেরী হবে এ্যাঁ?

বলি গল্প জুড়েছো নাকি! যাও—

ওর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বের হচ্ছে ক্লান্ত ঘোড়ার মত। আমাকে যেন দেখেও দেখল না সে। বলে ওঠে সাঁতরা মশাই।

—চলো।

মীরা বৌদি অসহায় দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাইল মাত্র, তারপরই আবার উঠতে থাকে মন্দির চূড়ার দিকে। মীরা বৌদি একাই এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে পুরোহিতের দিকে।

সাঁতরা মশাই একটা পাথরে হেলান দিয়ে ধুম নিচ্ছে, গরগর করে।

—হাড় পাজি মশাই। সতী—স্বামীর জন্য দরদ উথলে উঠেছে। চং। গেল কিছু অর্থদণ্ড।

মীরা বৌদির কথাগুলো তবু সব শোনা হয়নি। আরও কি যেন বলতে চেয়েছিল সে। জীবনে একদিন যাকে কাকন বলে সব ভুলে বুকে তুলে নিয়েছিল, সে যে কতখানি অর্থহীন অসার বেদনাময় তা জেনেছিলাম অনেক বেদনায়। জীবনের পরম সত্যকে সে অনেক দুঃখে চিনেছে।

তাই ভালো লেগেছিল তাকে। বারবার করে এক একদিন যেতে বলেছিল তার কলকাতার বাসায়—কি খেয়াল বসেই সেদিন গেছি। বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরী হয় না।

রাস্তার একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে কাদের হাসির শব্দে থমকে দাঁড়ালাম। মীরা বৌদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। এ যেন তার অন্যরূপ। সে আজ সেজেছে বিচিত্র সাজে, পরনে দামী সিল্কের শাড়ি, পেটকাটা ব্লাউজ—সারা দেহে তার অনুরাগ যৌবন প্রবাহ যেন উছলে পড়েছে। চোখের কোলে কাজলের নেশা।

সাঁতরা মশাই রয়েছে সঙ্গে। মীরা বৌদি সাঁতরা মশাই-এর কালো মুষকো শরীরে নিজের বরতনু এলিয়ে দিয়ে নামছে। কোথায় অভিসারে চলেছে রঙ্গিনী নারী।

প্রেতশিলা পাহাড়ের নিষ্করুণ শুষ্কতার বেদনার্তরা আকাশতলে ওই নাগিনী কন্যা যৌবনের নিজের অন্তর অগ্নিপিণ্ডের ব্যথায় দুর্বার হয়ে ফিরে এসেছে।

সরে এলাম চুপিসারে। ওকে ঠিক চিনিনি সেইদিনও।

রাজযোটক

—মহাশ্বেতা দেবী

অবশেষে সত্যবান ওর পুলিশ বন্ধুর কাছে যাওয়াই স্থির করল। সত্যবানের নামটি ভালো, ছেলেটিও ভালো, তবে ঐ যাকে বলে একটু খেলোয়াড় প্রকৃতির ছেলে।

খেলা করতে ভালোবাসে।

যখন ছাত্র ছিল, তখন ওর মনে হত জবাকেই ভালোবাসে। জবার দাদা ওর বন্ধু ছিল, সুমিত। সুমিত এখন পুলিশে। ডি. ডি.। জবা অবশ্য সত্যবানের অজস্র প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেনি। ওর বাবা বিয়ে ঠিক করতেই রীতিমত দেখেশুনে পিঁড়িতে বসবার জন্যে তৈরী হয়েছিল।

সত্যবান কৈফেকেটে বলেছিল 'জবা, এটা কি ঠিক হল?'

'কেন বল তো?' জবা, বিয়ে হয়ে চলে যাবে বলে বিদায় সম্ভাষণ স্বরূপ, ওর বাবার জন্যে অদম্ভব বড়দড় একটা পেয়ারা পেয়ারা রঙের সোয়েটার বুনছিল।

'আমি তো তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে রাজী ছিলাম।'

'ও মা, তাই তো! তুমি আমায় ভালবাসতে বুঝি?'

'যা, জবা, এতদিন বাদে এই প্রশ্ন?'

'আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার কষ্ট হবে?'

'হবে না?'

জবা কিছুক্ষণ গালে হাত রেখে চিন্তা করেছিল। তারপর বলেছিল 'আমার জন্যে যদি তোমার কষ্ট হয় সত্যদা, আমি তোমায় একটা জিনিষ দোব। আমায় মনে করবে আর গায়ে পরবে।'

জবা সত্যবানকেও একটা সোয়েটার বুনে দিয়েছিল। সত্যবানের জীবনের প্রথম ভালবাসাটি এখনো সোয়েটারের আকারে সত্যবানের গায়ে শোভা পায়। জবা বড়দড় করেই বুনেছিল।

তারপর, বলতে নেই, সত্যবান আবিষ্কার করল মেয়েদের ভালবাসি-ভালবাসি বলাটাও একরকম চমৎকার খেলা। ফুটবলের চেয়েও ভাল। ফুটবল চিরকাল খেলা যায় না, কিন্তু ভালবাসার খেলা যেন অনেকদিন চালানো যায়।

এই খেলা খেলতে খেলতে সত্যবানের হৃদয় মস্ত বড় হয়ে গেল, বলতে গেলে সসাগরা পৃথিবী।

গোলপার্কের কৃষ্ণা আয়ারকে সত্যবান বললে তোমায় ভালবাসি। পার্ক স্ট্রীটের অমিতাকে সত্যবান বললে তোমায় ভালবাসি। সদানন্দ রোডের মায়ালতাকে সত্যবান কিছুই বলেনি, শুধু তাকিয়ে থেকেছে। মায়ালতা জানে সত্যবান ওকেই ভালবাসে। সবচেয়ে মুস্কিল এই, মেয়েরা বড় চিঠি লিখতে ভালবাসে। কৃষ্ণা, অমিতা, মায়ালতা ওরা সবাই চিঠি লেখে, সত্যবানও জবাব দেয়।

পুলিশ বন্ধু সুমিতকে সভাষান বললে 'এই করেই ফেঁসে গেলাম।'

'কেন রে ?'

'তোর অপিতাকে মনে পড়ে ?'

'সেই যে, গোঁপ ?'

'সেই গোঁপ।'

'গোঁপ কি করলে ?'

'আর আবার কি !'

'আহা, এত ত্রিয়মাণ কেন ? বল্ না বাপু ?'

'অপিতাকে আমি কিছু বলিনি, জানলি ?'

'বলা সম্ভব নয়।'

'বলা সম্ভব নয়।'

কেননা অপিতা ঘোষের সামান্য গোঁপ তো আছেই, তাছাড়া অত্যন্ত গম্ভীর, বয়স্কা মেয়ে। লেখাপড়ায় রীতিমত ভাল, এখন কোন একটা চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট ফার্মে যেন পার্টনার হয়েছে। বলতে নেই, ভালই রোজগার করছে। বাবার অবস্থাও মন্দ নয়। তাঁর গোঁপ আরো অনেক বড়। তাছাড়া তিনি হচ্ছেন আদর্শবাদী লোক।

উনি যৌবন অব্দি রবীন্দ্রনাথ ঘোটে পড়েননি আর তিরিশ বছর বয়সে 'চোখের বালি' পড়ে নিদারুণ ক্ষেপে গিয়ে না কি বলেছিলেন 'দু'দুটো জোয়ান ছেলে থাকতে বিধবা বিনোদিনীর বে' হল না ? কেন, মহেন্দ্র বল বেহারী বল, ভূঁইফোড় তো নয়। ওদের মামা পিসে কেউ ছিল না ?'

অত্যন্ত রেগে গিয়ে উনি ওঁর চেয়েও রাগী একজন বিধবা নার্সকে বিয়ে করে ফেলেছিলেন। দুজনের ভালবাসার একমাত্র সন্তান অপিতা। বাবার গোঁপের এক দশমাংশে, মা-বাবার মেজাজের সবটুকু নিয়ে বড় হয়েছে।

'অপিতা কি করলে ?"

'আমায় বিয়ে করতে চায় ?

' সে কি রে ?'

'কি করব বল্ ?'

'তুই চাস্ ?'

'এখন চাওয়া-না-চাওয়ার বাইরে।'

'নট ব্যাড।' সুমিত ভেবেচিন্তে বললে।

'তার মানে ?'

'মানে এই, যদি ধরো তুমি ওকেই বিয়ে করো, তাহলে ওর ভাল দিকিগুলো ভেবে দেখলে দুঃখটা কম হবে। ভেবে দেখলাম অপিতার বাড়িটা নিজেদের। তা ছাড়া ভাই, ওরা গোছানো লোক। তোমার টাকা পয়সায় কষ্ট হবে না। নিজের চাকরী ছাড়া তো তোমার সিকিউরিটি বলতে কিছু নেই।'

'দুত্তোরি সিকিউরিটি।'

'সমস্যাটা ভেঙে আনলি কেন ?'

'হয়ে গেল আর কি।'

'আহা, কি করে।'

'মাঝে মাঝে অর্পিতাদের আপিসে যাই। ওর রীতিমত পুরুষ পুরুষ গাম্ভীর্য তো। বেশ লাগে। কোন প্যানপ্যানানি, ভালবাসি ভালবাসি, কিচ্ছুর মধ্যে নেই। কফি খাই, গল্প করি, চলে আসি। সেদিন, বুঝলি ভাই? ও একটা লাল শাড়ী পরে বসে আছে দেখলাম।'

'এমনিতে কি পরে?'

'শাদা।'

'ছেড় হ্যাভ এ ব্যাড এফেক্ট অন্ য়ু।'

'কেন?'

'আহা, সাইকোলজি তো পড়লিনে। সেই যে ক্লাস এইটে পড়বার সময়ে লাল জামা পরে তুই আসছিলি, আর তোকে ষাঁড় গুতিয়ে দিলে মনে নেই? এখন, বড় বয়সে, ওটাই উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে জানলি? ওর পরণে যেই লাল দেখেছ, অমনি ওর প্রতি তোমার ইয়ে আর কি…' সুমিত্তের ব্যাখ্যা রীতিমত প্রাঞ্জল।

'আমি ওকে বলে বসলাম চমৎকার দেখাচ্ছে বিয়ের কনের মত।'

'রিয়েলি, সত্যবান!'

—ও বললে আমায় আর কে বিয়ে করছে বল? আমি হঠাৎ বলে বসলাম যদি আমি করি? বুঝলি, রীতিমত হাসি পাচ্ছিল মনে মনে, আমি ভেবেছিলাম আমার মত ও-ও ঠাট্টা করছে। ও বললে সত্যি বলছ? আমি বললাম নিশ্চয়। তারপর সেদিন ওর চিঠি পেয়েছি। ও লিখেছে সেদিন, পাশের ঘরে তিনজন টাইপিস্ট, অর্থাৎ তিনজন সাক্ষীর সামনে আমি ওকে বিয়ে করব বলেছি। অতএব এটা রীতিমত আইনসম্মত ব্যাপার। আমি যদি ওকে বিয়ে না করি তাহলে ও কেস করবে, আর ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।'

সুমিত্ত হাসতে লাগল।

'তুই হাসছিস?'

'হাসব না? তুই যেমন চিরকাল ধরে এখানে ওখানে টোপ ফেলে বেড়াচ্ছিস, তোর যারা কাউকে বিয়ে করা-টরা হয়ে উঠত না। অর্পিতার মত ভালো প্রকৃতির মেয়ে বলেই তোকে ছাড়নাতলায় তুলবে।'

'আমি তো প্রথমটা বলতে গেছলাম আমি ঠাট্টা করেছি কিন্তু ও পুলিশ, পুলিশে ধরিয়ে দেব বলে এমন চেঁচাতে লাগল যে ভয়ের চোটে রাজী হয়ে গেলাম।'

'হ্যা হ্যা…পুলিশ তোর করবেটা কি?'

'কেচ্ছা হোত।'

এখন অর্পিতার ল্যাজের মত পিছু পিছু ঘোর গে চিরকাল।'

'তোকে একটা কাজ করতে হবে ভাই।'

'কি?'

'কৃষ্ণা, অর্পিতা, মাসীমা সবাই বলছে ওদের কাছে আমার যে চিঠি আছে তাই নিয়ে অর্পিতার কাছে গিয়ে সব ফাঁক করে দেবে।'

'দিক না। বিয়ে ভেঙে যাবে, তুইও নিশ্চিন্ত হবি।'

'বলছে বিয়ের পর ওর কাছে যাবে।'

'তাই তো!'

'তুই আমায় বাঁচা ভাই।'

'কেমন করে?'

'তোর তো অনেক চোরাচোর, যাকে বলে পকেটমারের সঙ্গে চেনাশোনা আছে। কাউকে টাকাপয়সা দিবে···'

'চিঠি চুরি করাবি?' সুমিত সত্যবানের কাছ থেকে এ হেন বুদ্ধি কোনদিনই আশা করে নি।

'পকেটমার হলেই ভাল হয়।'

'কেন?'

'ওরা সবাই ব্যাগে চিঠি নিয়ে ঘুরছে আমায় বলেছে। ওরা ভাবছে ওদের ভয়ে হয়তো আমরা চুপেচাপে বিয়েটা সেরে ফেলব।'

'অর্পিতা যদি তোকে চেনে, তা হলে ওকি জানে না যে তুমি মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে?'

'আমি ওকে বলেছি যে ওকে ছাড়া আর কাউকে···মানে পুলিশ পুলিশ বলে যখন চ্যাচাচ্ছিল····' সত্যবান আবার বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

সুমিত কিছুক্ষণ সত্যবানের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'তুই আর কি করবি বল। ইগো বলতে কিস্সু নেই। তার ওপর সাবকনশাস্ হচ্ছে ইন্ফ্যাটাইল।'

'এখন কি হবে?'

'ভাবিস না। আজকেই আমার সঙ্গে মণি মাষ্টারের দেখা হবে।'

'মাষ্টার দিয়ে কি হবে রে?'

'মণি মাষ্টার মাষ্টার নয়। ওর নাম আসলে হচ্ছে গুরুদেব। একেবারে এ-ওস্তাদ পকেটমার। জীবনেও ধরা পড়ে না। একবার ধরা পড়তে ওর কাছ থেকে আমরা সবাই ট্রেনিং নিয়ে নিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ আছে।'

'দেখা হবে কেন?'

'তা দিয়ে তোর দরকার কি? কত টাকা দিবি বল। ও ঠিক ম্যানেজ করে দেবে। ও যদি না পারে তাহলে কেউই পারবে না এটি জেনে রেখো। ভালকথা, ওদের ঠিকানা চাই। আর তিনজনের তিনটে ছবি। যাতে মণি মাষ্টার ওদের চিনতে পারে।'

'দেখো ভাই। আসলে অর্পিতা ঐ যে বলেছে এন্গেজমেন্ট ভেঙে গেলে ও কেস করতে পারে তাই শুনে কৃষ্ণা, অর্পিতা আর মায়ালতা দারুণ উৎসাহিত, বুঝলে কি না? আমার এ্যাডিনের চাকরী, আমি এখন ইন্ল্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট সেকশনের ম্যানেজার—' সত্যবান কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিল।

'আগে ভাবতে যাওনি কেন?' সুমিত ওকে তাড়িয়ে দিলে বটে কিন্তু ওর বউ পরে বললে, 'ওরকম অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ কেন? ভাল করে খাও। অন্ততঃ আটবার চিবিও।'

সুমিতের বউ পাড়ার 'স্বাস্থ্য শ্রী' পাওয়া মেয়ে, একটু স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বাতিকও আছে। সুমিতের বাড়ীর রান্নাবান্না এতবেশী স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে হয়, যে সুমিত মাঝে মাঝেই গিয়ে বাইরে মুখ বদলে আসে।

মাস্টারদের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে জানলেও ভাল লাগে। হ্যাঁ গা,' সুমিতের স্ত্রী বউ আদরী গলায় বললে 'বাবুসোনার জন্মদিনে ওনাকে আসতে বল না গো?'

'শ'খানেক লোকের মধ্যে?' সুমিত আবার বিষম খেল।

'কেন, কি হয়েছে?' সুমিতের বউয়ের গুষ্টি অসম্ভব বড়। নিকটতম লোকজনদের বললেই শ'খানেক গিয়ে দাঁড়ায়।

'ভিড় উনি পছন্দ করেন না·· মানে উনি পছন্দ করেন কিন্তু আমি পছন্দ করিনা·· আহা, আমার বাড়ীতে হলে হয়তো উনিও পছন্দ করেন না কিন্তু অভ্যাস গত ··'

সুমিত এবার ইচ্ছে করে বিষম খেল।

ওর বউ ওর মাথার তালুতে চাপড় মেরে বললে 'আহা ঘাট! খেতে খেতে অত কথা বল কেন?'

ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে সেই থেকে প্রোফেসর অভোস মত বিষন্ন মুখে বসে ছিল। সুমিতকে সে দুটো তাড়া হাতে তুলে দিয়ে বলল 'গোলপার্ক আর পার্ক ষ্ট্রীট সার। ইদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'কি?'

প্রোফেসর ঘাম মুছে বললে 'আমার সন্তানদ্ব রোজকে ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে। মনে হচ্ছে উনি একজন ম্যাডাম।'

'মায়ালতা!' সুমিত পেল্লায় বিষম খেল, মানে মানসিক বিষম, মনে মনে খাওয়া। মায়ালতার লেখাপড়ার ব্যাপার সুবিধের নয় সত্যি, কিন্তু রীতিমত ভদ্রলোকের মেয়ে, দেখতেও মন্দ নয়।

'তোমার ভুল হচ্ছে।'

'সপষ্ট দেখলাম সার।'

'সে কি!'

'আজ্ঞে কি জানেন? আমার ভ্যায়ডর সন্দেহ হচ্ছে, উনি মানে ম্যাডাম এ-সব কাজ ইচ্ছে ক'রে করেন না।

'তার মানে?'

'জাতশিল্পীর আঙুল সার! ও জিনিষ শিক্ষায় হয় না। কি তুলে নিলেন জানেন? আরেকজন মেয়ে ছেলের ব্যাগ থেকে চকলেট নিয়ে গালে পুরলে, সেন্ট নিয়ে আঙুলে আর চুলে লাগালে আবার ফেরৎ দিয়ে টুপ করে নেমে গেল। ওসব শিক্ষায় হবার নয়। কই, ত্রিশ বছর হতে চলল লাইনে আছি এ-রকম আঙুল কম দেখেছি সার। এইসব শিল্পীদের জ্বালা কি জানেন?'

'শিল্পী · জ্বালা··মায়ালতা!' সুমিতের বেজায় গরম লাগল। অবশ্য, পরে ভেবে দেখেছে প্রোফেসরের কথায় এমন কিছু ভুল ছিল না। গায়ক, অভিনেতা, লেখক, ছবি আঁকিয়ে যদি শিল্পী হতে পারে এরা জীবনের যন্ত্রণায় তাদের অধিকার থাকতে পারে তবে একজন উৎকৃষ্ট লাইনের লোকেরই বা যন্ত্রণা থাকবে না কেন? গণতান্ত্রিক অধিকার।

আমার মনে হয় সার···' প্রোফেসর বললে 'উনিও আঙুলের কাজ থেকে যে যাকে বলে পয়সা রোজগার তা ভাবছেন। আজ্ঞে, ব্যাগে তো রীতিমতো ছিল কিছু। সবচেলে উনি সেন্টটি তুলে একটু দেখে ফিরিয়ে দিলে। একি জানেন? এদের যন্ত্রণা কি জানেন? পয়সা রোজগারের কথা তো আর উনি ভাবছেন না। অতি চমৎকার পরিবারের মেয়েছেলে, তা ভাববেই বা কেন! কিন্তু অজানতে এদের

আঙুল কাজ করে চলে। খোকা সামলেন না সার। ইস্কুলে বোর্ডিতে দিদিমণিরা হাতের কাজ করে না? সর্বসময়ে লোকে পড়ে, না প্রয়োজনে? ইচ্ছে থাক বা না থাক, আঙুল আঙুলের কাজ করবেই করবে।'

'তুমিই বুঝবে প্রোফেসর।' সুমিতের মনে হতে লাগল প্রোফেসর লোকটা অতি সংস্থান। তাকেও সিনিক বানিয়ে দিতে চায়। কি সর্বনেশে কথা, পুলিশের ডি. ডি. তে আছে বলে বিশ্বাসকে সন্দেহের চোখে দেখবার শিক্ষা এখনো তো হয়নি। এরপর থেকে যদি সব মেয়েকেই পকেটমার মনে হয়, অথবা ছিঁচকে চোর, সেটা কি ভালো হবে? মেয়ের আলির মত বুড়ো এবং খ্যাপা হয়ে সব ঝুট ঝাম বলে চেঁচানো চলে। কিন্তু সুমিতের বয়স সবে তেত্রিশ, চাকরীতে সুনাম হচ্ছে, সে কি করে ঝুট ঝাম মনে করবে?

'আমি দেখছি স্যার, আপনি ভাববেন না কিছু।'

'না। ভাবনা করে আমি আর কি করব বল?'

'গণ্ডগোল কখন বাধে জানেন? যখন চকলেটের পর সেন্ট, সেন্ট থেকে ধরুন কি আর বলব··· তারপর কাঠির কাজ থেকে ছোটপাত্তি ··

সেন্ট থেকে কলম, কলম থেকে মানিব্যাগ, মানিব্যাগ থেকে দশটাকার নোট। সুমিতের মনে সব চাকার মত ঘুরতে লাগল। মায়ালতা, মায়ালতা, তোমার মনে কি আছে? কি সর্বনেশে কথা মনে যে কি আছে তা হয়তো মায়ালতাও জানে না।

'ম্যানেজ করে দেব স্যার। আহা কি আঙুল। হবে না? এ যুগে মেয়েরা দেখবেন কোথায় চলে যাবে।'

সুমিতের মনে হল মেয়েরা লাইনে চলে গেলে, অর্থাৎ প্রোফেসারের লাইনে···সেটা খুব ভালো হবে না।

ঠিক চারদিন বাদে সেই চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। প্রোফেসার এসে সুমিতকে চিঠিগুলো পৌঁছে দিল। বলল 'লাইন ক্লীয়ার স্যার।'

'কি করে করলে?'

'টোপ ফেলেছিলাম।'

'কি রকম?'

'পকেটে চকলেট, লজেন্স আর কয়েকটা লিপস্টিক নিয়ে বেরিয়েছিলুম। ম্যাডামের পাশটি ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলুম জানলেন? উনি পকেটে হাত দিতেই আমি ওঁর হাত ধরে ফেললাম। উনি তো ভয়ে সাদা কাঁপতে সুরু করলে। আমি বললুম নেমে আসুন। উনি সুটসুট করে নেমে এলেন।

'তারপর?'

'সর্বস্ব খুলে বললুম। উনি তো ভয়ে থতমত খেয়ে আপনার বন্ধুর চিঠি দিয়ে দিলে। আমি পুলিসের লোক।'

'সে কি?'

'আহা, আপনার জন্যে যখন পরোপকারে নেমেছি তখন আর পুলিশ আর আমাতে একদলের লোক হলুম না?'

'তা বটে।' সুমিতের গলা রীতিমত কাঁপ।

ওর বউ বললে 'কে এক অমিতা বে না কে, তাছাড়া কুলা আবার, আরেকটা কে যেন মেয়ে সবাই তোমায় খুঁজছে। টেলিফোন করে বলেছে ওরা তোমার কাছে আসতে চায়, রেফারেন্স সত্যবান। মানে তোমার সেই জ্বালাখ্যাপা বন্ধু তো ?'

'কি সর্বনাশ। ওদের ঘোল বাড়ীতে আমি কাজের কোন কল দিই না। তা, সত্যবান মানে আমাদের পটলা। না। এখন আর ও জ্বালাখ্যাপা নেই।'

সুমিত সত্যবানের জন্যে রীতিমত ভাবিত হয়েই বাড়ী থেকে বেরোল। পুরনো বন্ধুদের সুমিত ফেলতে পারে না। পুরনো দোকান থেকে আজো জামা করায়। পুরনো চাকরকে বহাল রাখে। ফলে বন্ধুরা সুযোগ নেয়। ওর জামার পকা রীতিমত বদখত বে-টপ দেখায় চাকর চুরি করে শেষ করে দেয়। সুমিতের ভাই আড়ালে বউদিকে বলে 'দাদাটা যে কি! ঐ পুরনো-পুরনো করেই মরল। ঘরে একটা ক্যালেণ্ডার টাঙিয়েছে দেখেছ ? স্যাকরার দোকানের ক্যালেণ্ডার, তায় রবীন্দ্রনাথের ছবি। নিচে লেখা ওল্ড ইজ গোল্ড।'

সুমিত মণি মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মাষ্টার নয়, প্রোফেসর বলতে হয় ওকে। এখন এ-লাইনে আটদশজন মাষ্টার এসে পড়বার পর মণি মাষ্টারের লাইনের লোকরা ওকে 'প্রোফেসর' বলে ডাকে। প্রোফেসর বিমর্ষ বদনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের বেঞ্চিতে বসে বাতাস খাচ্ছিলেন। চারদিকে বিকেলের ভিড়, অজস্র গাড়ী মানুষ লাজগোজ। প্রোফেসর এ্যামেচার ছোকরাদের কাজকর্ম দেখতে দেখতে সুমিতের জন্যে অপেক্ষা করছিল। প্রোফেসারের পরণে টেরিলীন, পায়ে বাটার ভাল জুতো।

সুমিত বললে, 'উনত্রিশ নম্বর ই।' জুতোটা দেখে ওর হিংসা হচ্ছিল।

'হ্যাঁ স্যার। সব প্রোফেসরের লোকরাই যাকে বলে রেসপেকটেবল হতে চায়।'

প্রোফেসর একটু বিমর্ষ, দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে তো।'

সুমিতের হাসি পেল। প্রোফেসরকে কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। অত্যন্ত দুঃখী দুঃখী চেহারা যেন কে ধরে বেধড়ক ঠেঙিয়েছে। চুল পরিষ্কার আঁচড়ানো, খুব ভদ্র ভদ্র মুখের ভাব। প্রোফেসরের কর্মকুশলতা সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে কলকাতা শহরে প্রত্যহ অজস্র পকেটমার, যত পকেট মারে প্রায় সেই অনুপাতেই মার খায়. সেই কলকাতায় প্রোফেসর গত দশবছরের মধ্যে মারধোর দূর হোক একটি থাপ্পড়ও খায়নি।

সুমিত জানে ও রেসকোর্সের বাইরে এবং গুঁড়িখানার আশেপাশে আড্ডা চালায়। লোকটার সুবিধে বা অসুবিধে একই, ওর কোন গ্যাং নেই। ও নিজেই নিজের দল। ওদের মধ্যে আশ্চর্য একটা ভদ্রলোকের এগ্রিমেণ্ট আছে। এক জায়গায় প্রোফেসরকে দেখলে অন্য গ্যাং নেমে চলে যাবে। প্রোফেসরও এ ধরণের ভদ্রতা দেখাবে, পরস্পর পরস্পরকে দেখে বলেই ওদের জগতে বিশৃঙ্খলা খুব কম।

'আপনার জন্যে কি করতে পারি স্যার ?' ভগবান জানেন কি কারণে সুমিতকে প্রোফেসর বেশ খাতির করে। সম্ভবতঃ সুমিত ওর সঙ্গে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করে বলে। ও কখনো সুমিতের এলাকায় আড্ডার কাজ করে না। সুমিত কখনো ওকে ধরে না। ও যখন সুমিতদের ট্রেনিং দিয়েছিল, তখন থেকেই ওদের ভাব। সুমিত ওকে বলল।

'ওঃ, ম্যাডামদের ব্যাপার।'

প্রোফেসর আকাশের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, 'ম্যাডামদের কথা আর বলবেন না স্যার। দাঁড়ান

একটা ছুচকাওয়ালা ভাকি। না না, আদুকাবলী খান, ওকে আমি চিনি। এই, কান দিও না ভাই। হ্যাঁ, ঐ যা বলছিলুম, ম্যাডামদের বহরার লাইনটা খারাপ হয়ে গেল আর। লাইনে কতজন ঢুকে পড়েছে জানেন? আরতো তিরকড়ার। লাইনটা খারাপ করে দিলে। এরকমটা হবে আমি জানতাম। সেই বাবাই সাধে আপনাকে বলিনি সার, যে ভদ্রলোকের এম. এ. পাশ ছেলেরা যখন থেকে কাঠির কাজ সুরু করেছে, তখনই আমাদের লাইনে বেপোওল ঢুকে গেছে? মেয়েছেলেরা যদি মেয়েছেলের মত না থাকে··· আর বলেই বা কি হবে। দেশের মাথার ওপর যে কালে মেয়েছেলে প্রধানমন্ত্রী। ঐ যে যাঁর আশ্রয় আছেন··· ঐ যে কালীঘাটের কালী গো···উনিও তো মেয়েছেলে। আসলে কি জানেন, মেয়েদের এই বাড়াবাড়ি···'

সুমিত মন দিয়ে শুনছিল। প্রোফেসর আসলে যে নারীবিদ্বেষী তা কে জানত বল? অবশ্য প্রোফেসরের নিজের লাইন ছাড়া অন্যদিকে খাতা খুব সাফ। কোনরকম মাতলামি, নোংরামি কিছুই নেই। প্রোফেশনল ত্রিসিআলের বেলায় প্রোফেসর ত্রিলিয়ান্ট, অন্যসময়ে অত্যন্ত ভদ্রবাবু এবং ভদ্রলোক। জাতশিল্পী যাকে বলে। প্রোফেসরের একটু মস্কিরে যাবার বাতিক আছে। প্রোফেশনল পকেটমার বলে লোকটা কালীভক্ত হতে পারে না এমন কোন কথা অবিশ্যি নেই। তা হলে আর গণতন্ত্র কিসে।

সেদিন শুনছি একজন আবার বলছে আমাদের লাইনের লোকদের ইউনিয়ন থাকা দরকার। বুঝলাম বাবুর পেটে দু'কলম বিদ্যে আছে।'

'ইউনিয়ন হলে তুমি তো প্রেসিডেন্ট হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দুনিয়ার লাইনের লোক এক হও বলে স্লোগান মারতে মারতে বেরুবে, গড়েরমাঠে সভা হবে! এরাই দেশটাকে, গুড়ি লাইনটাকে গোল্লায় দিচ্ছে, জানলেন? যাকগে সার, দিন সাতেক সময় লাগবে। কাল বিদ্যুৎবার, আমার জন্মোবারও বটে, ওদিনটা আমি বেরুই না। ম্যাডামদের রেখে নিতে তিনদিন টাইম চাই। আপনার কাজ সার, নিজেহাতে করতে হবে তো।'

'টাকা···'

সুমিত বলতে যাচ্ছিল পারিশ্রমিক এবং পুলিশ হয়ে পকেটমারকে পারিশ্রমিক দেবার কথা ভাবছে বলে হাসিও পাচ্ছিল বেজায় কিন্তু প্রোফেসর ঝিবকেটে বললে 'আপনার বন্ধুর কাছ থেকে··'

'ও অবশ্য বিপদে পড়েছে···'

'পড়বেই সার। চার চারজন ম্যাডাম নিয়ে কথা! যাকগে, সাতদিন বাদে এখানে আসবেন সার। এই যে আপনার চাকতি।'

'প্রফেসর সুমিতের আইডেন্টিফিকেশন চাকতি, গাড়ীর চাবি, পার্স আর কলম বের করে দিলে। বললে 'টের পাননি সার! এরকমটা করবেন না। মানে বেহুঁশ হয়ে কথাগুলো গিলছেন, উদিকে নজর নেই, এরকমটা ভাল না। আর, এতবার বলছি তবু দামী কলম ব্যবহার করেন কেন?'

প্রোফেসর সুমিতকে নিদারুণ লজ্জা দিয়ে অন্ধকারে হাওয়া হয়ে গেল।

সুমিত দেখতে পেল প্রোফেসর রাস্তা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

পাঁচদিনের দিনই সুমিত প্রফেসারের ফোন পেল। ওর বউ বললে 'প্রোফেসর মণিবাবু তোমাকে আজ একবারটি দেখা করতে বলেছেন। কিসের প্রোফেসর গো উনি?'

'এই···একটা সাবজেক্টের।' সুমিত বিষয় বেল।

'সত্যি বিয়ের পর থেকে শুধু পুলিশ আর পুলিশ দেখে দেখে ছন্দ হয়ে গেলাম। প্রোফেসর

প্রোফেসার বুকে হাত রেখে আকাশের দিকে চেয়ে বললে 'আমি বললুম যে লোকটার চিঠি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন তার চেয়ে আমি হাজারগুণ সুপাত্র।'

'বললে এ কথা তুমি ?'

'বলব না ? আমরা হলুম গে হাটখোলার বিশ্বাস, ওনারা হল গে বাবুদের বস্তু। আমার সম্পত্তি স্যার, যা আছে ক্যাশটাকায়।'

'কত ?' সুমিতের অনেকদিনই জানতে ইচ্ছে।

'শুনবেন না। দুঃখ পাবেন। মানে আপনার তুলনায়···'

'উহু—।'

'আহা, বছর বুড়ি কাজ করছি। বয়স বেয়াল্লিশ হল। বারোবছরে নেমেছিলুম। তা বিশবছর ধরে শুধুই জমিয়েছি তো! বেশাটেশা করি না, মাসে মাসে সিনেমা দেখি মাসের পয়লা তারিখে। না স্যার কেরানীদের পকেটমারি না। আমার, বুঝলেন না, লাইফে একটা মটো আছে তো!'

'আর, নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া যা শিখেছি তাতে আপনার ঐ বন্ধুর চে হাজারগুণ ভাল চিঠি, আরে চিঠি কি স্যার, পদ্য অব্দি লিখতে পারি। ম্যাডামকে মনে করে একটা পদ্য ভেবেছি শুনবেন ?

মায়ালতা মায়ালতা
তব আঙুলে কি কোমলতা
মায়ালতা জান কি তা ?'

প্রোফেসার বললে 'ম্যাডামও আমার কথাটা ভেবে দেখছেন। ভেবে দেখবেন না ? আহা, মেয়েছেলের প্রাণ তো! উদিকে ও লোকটা বেইমানী করেছে, ওঁর বুকটা ফেটে যাচ্ছে ইদিকে আমি পুলিসের লোক হয়েও ওনাকে ধরিয়ে দিচ্ছি না সেজন্য মনটা বেশ নরম। আমিও ভাবছিলাম লাইফে এবার সেটল করতে হয়।

'তা বলে তুমি···তুমি ওঁকে বিয়ে করবে ?'

'না করলে অর্থাৎ ও আঙুলকে চেক না দিলে আপনারাই তো ওনাকে করেকবছর যাবে জেলে পুরবেন। ম্যারিজিতেও সুখ নেই স্যার। ভাইটা বখে গেছে, বাপটা বিশেষ কিস্যু করে না।'

'তা বলে বিয়ে ?'

'হ্যাঁ স্যার। লাইনে আর সুখ নেই। মানে একলা কাজ করে সুখ নেই। আমরা হচ্ছি স্যার পুরনো ইস্কুলের লোক। সেই নেতাজী যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট তখন থেকে কাজ করছি। এখনকার ছোকরাদের যা হালচাল, বলে ইউনিয়ন করব বল বাঁধব, কবে বলবে শ্লোগান দেবে পথে পথে। এখন আমাদের রিটায়ার করাই ভালো।'

সুমিত হাসবে না কাঁদবে ঠের পাবার আগেই প্রোফেসার আবার হাওয়া হয়ে গেল।

সত্যবান চিঠি পেয়ে যেমন খুশী হয়েছিল বলা বাহুল্য। সুমিত যা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল তাই হল। অর্থাৎ সত্যবান এখন অমিতার অত্যন্ত বাধ্য পোষের মত বিশ্বস্ত স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করছে।

কৃষ্ণা আয়ার এবং অমিতা যে দুজনেই প্রতিশোধ নেবার জন্যেই হয়তো চটপট বিয়ে করে ফেলেছে। সত্যবান ওদের দামী দামী প্রেজেন্টই পাঠিয়েছিল।

সেদিন সত্যবান এসে সুমিতকে বললে 'জানিস্, মায়ালতার সঙ্গে···

'প্রোফেসার মণিলাল বিশ্বাসের বিয়ে তো ?'

'চিনিস বুঝি ?'

'খানিকটা।'

'কি দিই বলতো ?'

'দামী কিছু নে। অন্ততঃ শ'দুয়েক টাকার মত দামের জিনিষ।'

'অত দামী !'

'চিঠিগুলো উদ্ধার করে দিয়েছিলাম একপয়সা দিতে হয়েছিল ?'

'না। তবে তার সঙ্গে এর···'

'কি যোগ আছে তাই জানতে চাস ?'

'হ্যাঁ।'

সুস্মিত একটু হেসে বললে 'সবকথা জানা যায় না। রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোয় অন্ধকারে না কি যেন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ?'

'তুই কি দিবি ?'

'রূপোর কাঁচি। দেখতে চমৎকার এদিকে ভোঁতা।'

'কেন ? এমন বেয়াড়া প্রেজেন্ট কেন ?'

'বুঝবি না।' সুস্মিত সত্যবানকে বললে।

• • •

সন্ধ্যার পর ছাদ অ্যাণ্ডারসন বেরিয়েছেন সান্ধ্য ভ্রমণে।

শীতের তুষারপাত হচ্ছে খুবই। পথঘাট নির্জন। মানে মানে নিতান্ত দরকারে দু' একজন লোককে দেখা যাচ্ছে পথে যেতে।

অ্যাণ্ডারসন একটা ছোট বাড়ীর সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শিশুদের কলহাস্য জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে আসছিল।

শিশুরা এ রকম হাসছে কেন ? একটু কান পেতে রইলেন অ্যাণ্ডারসন।

চমৎকার গল্প বলছেন এক বৃদ্ধা। কী সে-সব মজার গল্প। অ্যাণ্ডারসন ভুলে গেলেন নিজের গন্তব্যস্থল। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন সে-সব গল্প।

বাড়ী ফিরে এসে তিনি ভাবলেন শিশুরা অফুরন্ত আমোদ পায় যে-সব গল্পে সে-সব গল্প লিখলে কেমন হয় ?

তারপর থেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিশু-গল্প রচয়িতা হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

রূপসী আঁধার

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

একেবারে হঠাৎ থেমে গেল অলকা রায়। ওর অতীত জীবনের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে এই থামাটা শুধু অস্বাভাবিক নয় রীতিমত বিস্ময়কর! অথচ অলকার বাবা সুধীরেন্দ্র রায় একটুও অবাক হলেন না। তাঁর মতে এইটিই স্বাভাবিক, জীবন মানেই গুটিকয়েক দৃশ্যের সমষ্টিতে একটি গোটা নাটক। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বিভিন্ন ঘটনার বিবর্তনের মধ্য দিয়েই তাকে এগিয়ে চলতে হয়। অলকাও এর ব্যতিক্রম নয়।

জীবনকে জানতে এবং বুঝতে প্রচুর স্বাধীনতা তিনি তাঁর একমাত্র সাতটীন কন্যাকে বরাবর দিয়ে এসেছেন। ভাল মন্দ স্থায় অন্যায়ের বিধিনিষেধ দিয়ে কোনদিন তার নিজস্ব চিন্তার পথরোধ করে দাঁড়ান নি।

মেয়েকে তিনি যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়েছেন—ইচ্ছামত চলবার জন্য অকৃপণভাবে অর্থ জুগিয়েছেন। কোনদিন প্রশ্ন করেননি কি প্রয়োজন তোমার এত টাকার। কোনদিন চেষ্টা করেননি তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবার। মেয়ের বুদ্ধি আর বিবেচনার উপর বিশ্বাস ছিল বলেই তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেননি। এতে লাভের চেয়ে বেশী লোকসান হয় ব'লেই তিনি বিশ্বাস করেন।

আপন কর্মময় জীবনে তিনি অনেক দেখেছেন এবং এই দেখাই তাঁকে এই পথে চিন্তা করবার নির্দেশ দিয়েছে।

বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন কেহই তাঁর এই মতবাদকে ভাল চোখে দেখত না। বরং অলকার এই ধরনের বেপরোয়া চালচলন এবং বিচিত্র গতিবিধির উপর আলোকপাত ক'রে সময় থাকতে সুধীরেন্দ্রকে সাবধান হ'তে উপদেশ দিয়েছে।

মন দিয়ে শুনেছেন সুধীরেন্দ্র। তাদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদও দিয়েছেন, কিন্তু মেয়েকে ডেকে একদিনের জন্যও তিরস্কার করেননি। মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর মনে হ'য়েছে যে, ওকে বাধা দিয়ে ফেরানো যাবে না যদি সে নিজে থেকে না ফেরে।

থমকে দাঁড়িয়েছে অলকা রায়। দেরীতে হ'লেও সে খেমেছে। জীবন নাট্যের ক্ষণ বিরতি।

সুধীরেন্দ্র আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করেছেন পরের দৃশ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে তা দেখবার জন্য। কিন্তু মুখ ফুটে তিনি একটি কথাও বললেন না। অতীতেও যেমন বলেননি বর্তমানেও না। যদি বলতে কিছু হয় তা অলকা নিজে থেকে এগিয়ে এসে বলুক। তখন তিনি মুখ খুলবেন। বুদ্ধি যোগাবেন। জীবনের মূল্যবোধ না হ'লে তার মুখের দুটো হিতোপদেশে কতটুকু তিনি দিতে পারবেন! কতটুকু অলকা নিতে

চমকে উঠলেন সুধীরেন্দ্র পাশের ঘরে অলকার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে, তার মানে তুমি রাজী নও নির্মল ?

একটা বিদ্রূপের হাসি শোনা গেল। নির্মল বলল, এককথা আর কতবার তোমাকে ব'লতে হবে অলকা ? বন্ধনের মধ্যে যে আনন্দ তাকে আমি আনন্দ মনে করি না। ভালবাসাকে চার দেওয়ালের সীমার মধ্যে ধরে রাখা আমি অপছন্দ করি। ক্ষমা করিও বলতে পার।

অলকার গলা শোনা গেল। সে জবাব দিল, অর্থাৎ বিয়ে না ক'রেও তুমি বিয়ের আনন্দটুকু সম্পূর্ণ উপভোগ ক'রতে চাও ?

ঠিক তাই। নির্মল নির্লজ্জের মত বলল, আমার প্রচুর টাকা আছে। বাবা অবুঝের মত টাকা জমিয়ে গেছেন, আমি বুদ্ধিমানের মত তা খরচ ক'রতে চাই। আমার কাছে জীবনই আনন্দ, আনন্দই জীবন। জীবনকে নানা ভাবে রকমারী স্বাদে গ্রহণ ক'রে দেখতে চাই। বাল টক, নোন্তা, জোলো · ···

বাধা দিল অলকা রাগ, থামো—

কিন্তু থামতে পারে না নির্মল। বলতে থাকে, পুরুষের মনের এইটেই চিরন্তন চিন্তা। কথাটা তোমরাও ভাল জান বলেই নিজেদের নানা রং-এ নানা ঢং-এ সাজাতে এত বেশী ভালবাস। তোমরা একই মাংসের রকমারী রান্না। কখনও স্টু, কখনও কারী, কখনও চপ, কখনও কাটলেট ·

একটু থেমে নির্মল পুনরায় বলে, নাঃ তুমি দেখছি আজকাল সত্যকে সহজ করে নিতে পারছ না অলকা। অল্পেই রেগে যাচ্ছ। আমি বা হয় আজকের মত বিদায় নিচ্ছি। তুমি বরং ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথাগুলো ভেবে দেখ।

নির্মল উঠে দাঁড়াল।

অলকা কঠিন কণ্ঠে বলল, তাই যাও নির্মল। শুধু আজকের মত নয় চিরদিনের জন্য।

চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল নির্মল। বলল, তাই হবে অলকা। আমার যতদিন টাকা আছে আনন্দের পাত্র ততদিন পূর্ণ থাকবে। পুরুষ একটু বেশী লোভী কিন্তু তার লোভের ইন্ধন যে যোগায় আর একবার না হয় কথাটা ভেবে দেখ।

চলে গেল নির্মল। ঘরের আবহাওয়া তিক্ত আর বিষাক্ত হ'য়ে উঠল। অলকার মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে চলেছে। সে স্থির হ'তে চেয়েছিল নির্মল তাকে অস্থির ক'রে তুলেছে।

অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবছে অলকা। নির্মল আজ আর পোষাক পরিচ্ছদের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে নেই। একেবারে নির্লজ্জ নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। মৌখিক শালীনতা বোধটুকুও ত্যাগ করেছে। অথচ এই লোকটিই তার কানে কানে কত ভালবাসার কথা শুনিয়েছে। শেলী আর স্পেনসের মুখে শুনতে তারও নিতান্ত মন্দ লাগেনি। ওর লোভী দুটো চোখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে খানিকটা প্রশ্রয়ও দিয়েছে। যে প্রশ্রয়ের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আহ্বানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। অনেকটা এগিয়েছিল নির্মল। অল্পের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেও থামতে পেরেছে অলকা।

আত্ম-বিশ্লেষণ ক'রতে বসে নির্মলকে একতরফা দোষ দিতে পারে না অলকা। নইলে শ্যামল যেদিন তাকে সাবধান করে দিয়েছিল অলকা তাকে স্পষ্টই বলেছিল যে, সে নাবালিকা নয়। তাছাড়া শ্যামল আর অলকার সমাজে আলাদা।

শ্যামল হাসি মুখে এ তিরস্কারকে মেনে নিয়েছিল। বলেছিল, আমার ভুল হ'লেই আমি বেশী খুশী হবো অলকা।

শ্যামল যে ভুল করেছে এটা প্রমাণ করবার জন্যেই আবার নতুন বন্ধু নিয়ে মেতে উঠল সে। আর শ্যামলকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের রকমারী পার্টিতে আহ্বান জানাতে লাগল। উদ্দেশ্য—ও দেখুক বর্তমানের উঁচু সমাজের মানুষদের। তাদের পরিবেশকে।

আশ্চর্য প্রত্যেকটি আহ্বানেই শ্যামল সাড়া দিয়েছে। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে যোগদান করেছে।

অলকা রাগ করে বলেছে, তোমার এই প্রেজুডিস্‌ড্‌ মন নিয়ে এখানে না আসাই উচিত ছিল।

অলকার নতুন বন্ধু সরোজ সায় দিয়ে বলেছে, হানড্রেড পারসেন্ট সত্যি কথা বলেছে অলকা।

শ্যামল হাসি মুখে জবাব দিয়েছে, আপনারা আনন্দ উপভোগ ক'রছেন দেখেই আমার আনন্দ।

ভ্রূভঙ্গী করে অলকা বলেছে, কিন্তু মুখের চেহারা দেখে ত তা মনে হ'চ্ছে না শ্যামল।

শ্যামল স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে জবাব দেয়, আমার বলতে একটু ভুল হ'য়েছে অলকা। আনন্দ উপভোগ না ব'লে শুধু উপভোগ করছি বলা উচিত ছিল। তোমাদের এই যুগল নৃত্য, তরল পদার্থে আসক্তি, মদালস দৃষ্টি এ সবই ত যৌবনের অভিব্যক্তি। জানো অলকা এই সময়টা হলো জীবনের সবচেয়ে অশ্লীলতম কাল—বন্য জীবনের আদিমতম রক্তে পরিপূর্ণ। আমিও ব্যতিক্রম নই।

সরোজ বাধা দিয়ে বলল, একমত হ'তে পারলাম না। আপনার চোখের সামনে যাদের দেখছেন তাঁদের বেশীর ভাগই উত্তীর্ণযৌবন।

ওরা ব্যতিক্রম—অথবা আপনাদের সমাজে উঠবার জন্য সাধনারত।

সরোজ রাগ করে বলল, আপনি যেন একটু ঠাট্টা ক'রবার চেষ্টা ক'রছেন বলে মনে হচ্ছে কিন্তু জানেন কি দেশের মানুষ আজ এই সাধনায় মেতে উঠেছে।

ঠিক জানা নেই। শ্যামল স্মিত হেসে বলল, তবে আপনার কথা সত্যি হলে পরিতাপের কথা। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের স্পেসিমেন যদি এরা হয় তবে তা শুধু পরিতাপের নয় লজ্জার কথা।

জবাব দিতে গিয়ে একটা ধাক্কা খেল অলকা। মুখ খুলতে পারল না।

সরোজ বলল, সত্যি সেন্টিমেন্টের যুগ শেষ হ'য়ে গিয়েছে শ্যামল বাবু। বর্তমান যুগটা ব্যবসার যুগ। আজ জীবন মানেই ব্যবসা আর ব্যবসা মানেই জীবন।

সরোজের কাছে যে এই যুক্তিটা কত বড় সত্য এটা জানতে পেরে অলকা ক্ষোভে, দুঃখে আর লজ্জায় একেবারে দিশাহারা হ'য়ে পড়ল।

নির্মলের চলে যাবার অল্প পরেই জানান দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল সরোজ। বলল, বিপদে পড়েছো শুনেই ছুটে এসেছি মিস রায়। ব্যাপার কি বলো দেখি। তুমি অসুস্থ নও তো?

না—জবাব দিল অলকা।

তবু ভাল কিন্তু ক'দিন ধরে তোমাকে ক্লাবে অথবা কোন পার্টিতে দেখছি না কেন বলো ত?

একটু চেঞ্জ খুঁজছি। তোমাদের ঐ ক্লাব আর পার্টি আর ভাল লাগছে না। এবারে স্থির হয়ে বসতে চাই।

হা হা করে হেসে উঠল সরোজ।

মৃদু বাধা দিয়ে অলকা বলল, একটু আস্তে সরোজ, পাশের ঘরে বোধহয় বাবা আছেন।

অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে সরোজ জবাব দিল, তোমার আজকের আচার আচরণ খুবই নতুন লাগছে অলকা।

মিথ্যে বলোনি সরোজ। আমার নিজের কানেও একটু বেসুরো লাগছে। অর্থাৎ আমার গলায় এ সুর যেন মানাচ্ছে না। কি জানি সরোজ তোমাদের সঙ্গে প্রচুর উত্তেজনার খোরাক পরিবেশন করলেও আমার মন ভরে নি। প্রায়ই মনে হয়েছে এ জীবন আমাদের জন্য নয়।

তুমি বোধহয় সংসার ধর্মের কথা ভাবতে সুরু করেছো অলকা? সরোজ প্রশ্ন করে।

অলকা হেসে বলে, তোমার অনুমান সত্য। সেই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি সরোজ।

পরামর্শ ক'রতে?

ব'লতে পার তবে আমার প্রত্যাশা আরও বেশী। তুমি রাজী হলে—

লাফিয়ে উঠল সরোজ, রাজী···তোমাকে পেলে আমি কি ক'রতে পারি তা জান?

না।

অর্থাগমের পথকে আমি রাতারাতি চারগুণ ক'রে তুলব। ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে বেশ পেতে হবে না।

ঠিক বুঝতে পারছি না সরোজ আমাদের সংসার ধর্মের সঙ্গে তোমার ব্যবসার কি সম্পর্ক?

যারা এতদিন ধরে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি ক'রে আমার অর্থাগমের পথ আটকে ছিল তাদের সঙ্গ দিয়ে তুমি কাবাব ক'রবে আর আমি করবো সুযোগের সদ্ব্যবহার।

খল খলে গলায় হিস হিস করে উঠলো অলকা, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে আমি নিশ্চয় তোমার সহধর্মিণী হবো—অথচ তুমি আমার ধর্ম নাশের কথাটা ভাবতে পারলে সরোজ?

সরোজ ব্রহ্ম এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না অলকা। তাছাড়া তোমাকে ত সহধর্মিণীর কাজই ক'রতে বলা হচ্ছে। আমার ধর্মই তখন তোমার ধর্ম হবে।

হাসতে থাকে সরোজ। কিন্তু অলকার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। সে দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, ধন্যবাদ। তুমি চলে যেতে পার। তোমার ধর্মপত্নী হবার ইচ্ছে আর আমার নেই।

সরোজ তথাপি নির্লজ্জের মত বলল, তাহ'লে ভিলটা তুমি একেবারে ক্লোজ ক'রে দিলে? আর একবার ভেবে দেখবার সময়ও নেবে না?

হ্যাঁ দিলাম এবং ঘৃণার সঙ্গে। নতুন করে ভাববার কিছু নেই।

তোমার চেহারাটির বহর দেখে আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে অলকা দেবী—সরোজ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

সাট আপ···গর্জে উঠল অলকা।

ঘাড়টা একটু কাত ক'রে চোখ দুটো ছোট ক'রে সরোজ তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে হেসে দুলে চলে গেল।

শ্যামলের হিসেব একেবারে নির্ভুল। আজ আর একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অথচ এই নিয়ে তাকে কম অপমান সহ্য করতে হয়নি। তবুও শ্যামল তার সঙ্গ ছাড়েনি। ছায়ার মত অনুসরণ ক'রেছে। বিশেষ ক'রে পার্টিতে আর ক্লাবে।

অলকা কতদিন বলেছে, তোমার মত অসভ্য আর বেহায়া আমি জন্মে দেখিনি।

শ্যামল সহাস্যে জবাব দিয়েছে, তুমি রাগ ক'রছো বটে কিন্তু এই বেহায়া লোকটা প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আর একদিনও বিরক্ত করবে না। প্রয়োজন আমার চেয়েও তোমার বেশী।

কথা ক'টির প্রকৃত অর্থ সেদিনে না বুঝলেও আজ সে বুঝেছে। কিন্তু সে বলেছিল, এটা কি তোমার পরোপকার করবার সদিচ্ছা না ঈর্ষার মোহময় প্রকাশ?

এতবড় আঘাতেও টলেনি শ্যামল। হাসিমুখেই জবাব দিয়েছিল, যত অপমান আমাকে করলে একদিন হয়তো তা বিগুণ হ'য়ে ফিরে পাবে তখন যেন সইতে পার এই প্রার্থনাটি সব সময় ক'রবো।

অলকা বলেছিল, তোমার উপদেশ আর সদিচ্ছার কথা শুনলাম, এবার থামো। আমি বেশ বুঝি তুমি ওদের সমকক্ষ হ'তে পারছ না ব'লেই মুখে তোমার সস্তা নীতিকথার খই ফুটছে।

শ্যামল তবুও উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেনি। শান্ত ভেবে বলেছে, তোমার অনুমান মিথ্যে নাও হ'তে পারে। কিন্তু তুমি কোনদিন তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ কি? তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে?

অলকা ফুঁপে উঠেছিল, আমার সম্বন্ধে তুমি একটু কম ক'রে ভাবলেই আমি খুশী হবো। ওটা আমিই ভাববো।

শ্যামল তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিয়েছিল, আমার কথাও ঠিক তাই। বন্ধু হিসেবে উত্তেজিত না হয়ে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে কি?

খানিক চুপ ক'রে থেকে অলকা বলল, বলো।

তোমার এই বন্ধুর দল তোমার কাছে কি চায়?

আর একটু স্পষ্ট ক'রে বলো।

ওরা তোমাকে এক্সপ্লয়েট করতে চায় বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি নির্বোধ নই।

আশ্বস্ত হলাম। শ্যামল বলেছে, প্রয়োজন দেখা দিলে ওদের মধ্যে কেউ কি তোমায় বিয়ে করতে চাইবে?

দুলে দুলে হাসতে থাকে অলকা। এতক্ষণে তুমি একটা হাসির কথা ব'ললে শ্যামল। ওদের যে কেউ এ প্রস্তাবে হাতে স্বর্গ পাবে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।···একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে কথা ক'টি উচ্চারণ করল এবং ততোধিক নাটকীয় ভাবে শ্যামল দ্রুত প্রস্থান ক'রল।

সেই মুহূর্ত থেকেই অলকার চিন্তাধারা নতুন পথে বইতে সুরু করেছে। নিজেকে বারে বারে সে জিজ্ঞেস ক'রেছে, সত্যি সত্যিই সে কি চায়? ক্লাব আর পার্টি জীবনে তার অরুচি নেই বটে তাই বলে সংযমহীন উচ্ছৃঙ্খলতাকেও সে সহজ মনে গ্রহণ ক'রতে দ্বিধাগ্রস্ত। বারে বারে হুঁচোট খাচ্ছে। বাবা এসে তার সামনে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর অকৃপণ ভালবাসা তাকে পিছু টানে। শ্যামলের যুক্তিগুলিও তার মনের এই দুর্বল স্থানটিকে ছুঁয়ে গেল। বাবা কোনদিনই তার কাছে বাবা হেন নি। কেন যে হেননি তা অলকা জানে না। জানবার চেষ্টাও করেনি।

সে নির্বোধ নয়—বড় গলায় একথা অলকা শ্যামলের কাছে ঘোষণা করেছে। তার বুদ্ধির পরীক্ষা কি বাবাও নিচ্ছেন?

বাবাকে বোঝা বড় শক্ত। তিনি যে একেবারেই নীরব। শ্যামল সোচ্চার। তার বক্তব্যের অস্পষ্টতা আর জটিলতার গ্রন্থি মোচন করা কষ্টসাধ্য নয়। তাই সে নির্মলকে আর সরোজকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ওদের সুস্পষ্ট উক্তিতে নারী অলকা অপমানিতা হ'লেও মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। শ্যামল হয়তো এই জন্যই তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে। শত অপমান আর লাঞ্ছনাও তাকে দূরে ঠেলে দিতে পারেনি। বরং আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু কেন? ভালবাসা···

ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল অলকা। চাকরকে ডেকে গাড়ীর খুলবার আদেশ দিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই একেবারে বাবার মুখোমুখী।

শান্ত গলায় সুধীরেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাচ্ছ অলকা?

একটু অবাক হলো বইকি অলকা। বাবা জানতে চাইছেন, কোথায় সে যাচ্ছে? এই বোধহয় তার অবাক হবার পালা সুরু হলো। বাবাও তার গতিবিধির উপর নজর দিয়েছেন।

শ্যামলের কাছে যাচ্ছি। জবাব দিল অলকা।

ড্রাইভারকে সঙ্গে নিও। তুমি নিজে ড্রাইভ ক'রবার ঝুঁকি নিও না। সুধীরেন্দ্র আস্তে আস্তে কথা ক'টি শেষ ক'রে চলে যেতে গিয়েও আবার ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, শ্যামলের ওখান থেকে ফিরে এসে আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে ভুল না।

অলকা আর একবার বাবার মুখোভাব লক্ষ্য ক'রবার চেষ্টা করল। ও ঘরের প্রত্যেকটি কথাই যে তাঁর কানে গেছে তা বুঝতে ওর কষ্ট হল না হয়তো সেইজন্যই নীরবতা ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছেন বাবা।

অলকা যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই ভাবেই চলে গেল। না ক'রল টয়লেট না বদলাল পরণের শাড়িখানা। এদিকে নজর দেবার কথাটা তার মনেই এল না। ভিতরটা তখন তার জ্বলছিল!

শ্যামল বাড়ীতেই ছিল। বলল, কি ব্যাপার? ডেকে না পাঠিয়ে তুমি নিজেই চলে এলে যে অলকা?

অলকা আস্তে আস্তে বলল, তোমার সঙ্গে আমার অত্যন্ত জরুরী পরামর্শ আছে শ্যামল। কিন্তু বেশী সময় নেব না।

একটু হেসে শ্যামল বলল, তোমার যত খুশী সময় নিতে পার।

ধন্যবাদ। অলকা বলল, আমি বোধহয় এতদিন ঠিক পথে চলিনি। মানে···আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। একদিন তুমি আমাকে চোখ চেয়ে চলতে আর মন খোলা রেখে অনুভব করার কথা বলেছিলে···

বাধা দিল শ্যামল, তোমাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। আজ এসব কথা বরং থাক। আমি কাল নিজে তোমার ওখানে যাব।

অলকা বলল, তুমি ঠিকই আন্দাজ ক'রেছো শ্যামল। তবুও আমার যা বলবার তা আজ এখুনি বলতে হবে।

অর্থাৎ আমি বাধা দিলেও তুমি শুনবে না—

না।

একটু চা খাবে অলকা? তুমি যে এসেছো মা তা জানেন না। বলে আসি। উঠে দাঁড়াল শ্যামল।

অলকা তার হাত ধরে টেনে বসালো।

শ্যামল বসতেই অদ্ভুত ভাবে বলল অলকা, তুমি কোনদিন আমার কাছে কিছু খেতে চাওনি শ্যামল। কারি, কোপ্তা, শিক কাবাব, স্টু, কাটলেট। একই মাংসের কত স্বাদ তা তুমি জান···

বাধা দিল শ্যামল, কি আবোল তাবোল ব'কছো অলকা? তুমি কি আমার বাড়ীতেও ঐ সব ছাই পাশ গিলে এসেছো?

চোখ বড় বড় ক'রে খানিক শ্যামলের মুখের পানে চেয়ে থেকে একেবারে তার মুখের কাছে মুখ এগিয়ে আনলো।

চাপা কণ্ঠে শ্যামল তাকে তিরস্কার ক'রল, হচ্ছে কি তোমার অলকা ?

নইলে যে তোমার বিশ্বাস হবে না। অলকা বলল, তবু নেই শ্যামল অলকা আজও অত বেশী সস্তা হতে পারেনি। সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। তোমাকে একটিও বাজে কথা বলছি না। অলকা আজ খোলা মন নিয়েই তোমার বন্ধুত্বের হাত গ্রহণ করে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে চাইছে।···

বলতে বলতে মাঝপথে থামল অলকা। ওর চোখ দুটো অত্যন্ত উজ্জ্বল মনে হলো শ্যামলের, কিন্তু কোন জবাব দিতে পারল না।

অলকা পুনরায় সুরু করে, জান যে সমাজের মধ্যমণি নির্মল আর সরোজ—তারা দেহের মূল্য দিতে অকৃপণ কিন্তু মনের দাম দিতে জানে না। শ্রদ্ধা আর ভালবাসা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

জানি।

জানো বলেই তুমি আমার চোখ খুলে দিতে পেরেছো। আমার বুদ্ধির অন্ধ অহঙ্কারকে আলো দেখিয়েছো। সে আলো তুমি নিজের হাতে আবার নিভিয়ে দিও না শ্যামল।

অলকা মাথা নীচু করল।

শ্যামল বহুক্ষণ বোবার মত বসে থেকে এক সময় অলকার আনত মুখের পানে দৃষ্টি রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল, তোমার আজকের এই আটপৌরে চেহারা কতদিন বজায় থাকবে অলকা ?

তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস ক'রতে দ্বিধা করছ শ্যামল। বিশ্বাস করা সহজ নয় তা আমিও জানি তবুও কি জানি কেন আমার মনে হয়েছিল তুমি পারবে। তোমার ভালবাসার আগুনে পুড়িয়ে আমাকে খাঁটি করে নেবে। আমি আবার মাটিতে পা রাখতে পারব।

কথা ক'টি বলেই উঠে দাঁড়াল অলকা।

তুমি চলে যাচ্ছ ?

তোমার কথা ত আমার শোনা হ'য়ে গেছে শ্যামল।

সব কথা এখনও বলা হয়নি অলকা। আমি সাধারণ মানুষ। জীবন আমার সমস্যায় ভরা। আমি দরিদ্র।

কিন্তু আমি ত দরিদ্র নই শ্যামল।

সেখানেও আমার প্রধান অন্তরায় দারিদ্র্যের অহঙ্কার।

ওটা অহঙ্কার নয় ভীরুতা।

কথাটা স্বীকার ক'রে নিয়ে শ্যামল বলল, ভীরুতাও ব'লতে পার, সাবধানতাও বলা যেতে পারে। আমি জীবনের যথার্থ মূল্য দিতে চাই। সেখানে এতটুকু গোঁজামিল দিয়ে চলতে আমি পারব না। পেতে হ'লে কিছু দিতে হয় নইলে পাওয়ার সঠিক মূল্যবোধ জন্মায় না, আমার কথাটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করো।

অলকা একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে ব'লল, তোমার এই স্পষ্ট কথার জন্য ধন্যবাদ শ্যামল।

অলকা চলে যেতে উদ্যত হলো।

শ্যামল বলল, তুমি অযথা রাগ ক'রছো অলকা।

রাগ আমি সত্যিই ক'রেছি শ্যামল তবে তা অযথা নয় আর তোমার উপর নয়। রাগ হ'চ্ছে আমার নিজের উপর। তুমি ত তোমার মনকে খুলেই ধরেছো। সত্যিই ত শ্রদ্ধার অভাব ঘটলে আর [illegible] এক বিছানায় শোয়া চলে না। এ বরং ভালই হলো।

অলকা চোখের পলকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

শ্যামলের বাড়ি থেকে ফিরে এসে নিজের ঘরে প্রবেশ ক'রবার পূর্বে আর একবার বাবার মুখোমুখী হ'তে হলো অলকাকে।

সুধীরেন্দ্র জিজ্ঞেস ক'রলেন, শ্যামলের দেখা পেয়েছিলে?

হ্যাঁ।

ফিরিয়ে দিলে বোধ হয়?

হ্যাঁ।

আমি জানতাম।

ক্লান্ত গলায় অলকা বলল, আরও অনেক কিছু তুমি জানতে বাবা, শুধু আমাকে সাবধান ক'রে দাওনি।

আমি বর্তমান যুগের সঙ্গে আপস ক'রে চলতে চেয়েছিলাম মা। মেয়ে দুঃখ পেতে চাইনি। সুধীরেন্দ্র বললেন।

এটা কি একটু স্বার্থপরের মত কথা হলো না বাবা? অলকা আস্তে আস্তে বলল, তোমার কাছে বাধা পেলে আমাকে অবশ্যই মাঝে মাঝে থামতে হতো। নতুন ক'রে চিন্তা ক'রতে হতো।

আমি তোমাকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছিলাম অলকা। সুধীরেন্দ্র জবাব দিলেন।

কিন্তু যারা সে স্বাধীনতার সম্মান দিতে জানে না তাদের আইন ক'রে স্বভাব পালটাবার ব্যবস্থা ক'রলে বোধ হয় কিছুটা সুফল পাওয়া যায়। অলকা বলে।

সে পথে শাস্তি ভঙ্গের ভয় থেকে যায় মা।

এটা নিছক ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়া বাবা। কিন্তু বাদানুবাদ থাক। তুমি ভাল মনে ক'রে যা ক'রেছো আমার অপরিণত বুদ্ধি তাকে ঠিক ভাবে গ্রহণ ক'রতে পারেনি। অলকা নরম গলায় বলল।

সুধীরেন্দ্র স্নেহ ভরা কণ্ঠে ডাকলেন, অলকা

কি বাবা? অলকা সাড়া দিল।

আমার হিসেব কি আগাগোড়াই ভুল হ'য়েছে মা? সুধীরেন্দ্র ব্যথিত সুরে বলতে থাকেন, আমি তোকে নতুন কালের নতুন মানুষ হ'তে বাধা দিতে চাইনি। এখনই মনে হ'চ্ছে কোথাও একটা ভুল ছিল আমার। নইলে অলকা তার সেন্টিমেন্টকে কাটিয়ে উঠতে পারছে না কেন?

অলকা নত গলায় বলল, বোধ হয় আমি মেয়ে ব'লে বাবা! শ্যামল কথাটা আমাকে আরও ভাল ক'রে বুঝতে সাহায্য করেছে। মনে হচ্ছে সেন্টিমেন্টকে বাদ দিলে মেয়েরা সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে না। অপূর্ণ থেকে যায়। শ্যামলের বাড়ী থেকে ফিরে আসার পথে কথাটা আমি নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রেছি। গাড়ীতে আসতে আসতে আমি অনেক কেঁদেছি বাবা।

ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেন সুধীরেন্দ্র কিন্তু মুখে তার কোন প্রকাশ নেই, শান্ত কণ্ঠে তিনি ব'ললেন, আর কথা নয় অলকা। তোমার এখন বিশ্রামের দরকার।

অলকা আর দ্বিরুক্তি না ক'রে চলে গেল।

সে রাত্রে সুধীরেন্দ্র বহুক্ষণ যাবৎ অস্থির ভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়িয়েছেন। নিজের কাজের একটা জোরাল যুক্তির সন্ধান ক'রে ফিরেছেন।

অলকা চলে গেছে। কোথায় তা কাউকে জানায় নি। বাবাকে লিখেছে, এতদিন তুমি আমার চলার পথে কোন বাধা দাওনি। আজও দিও না বাবা, অলকা তোমার বিশ্বাসের অমর্যাদা ক'রবে না। ভবিষ্যৎ তার প্রমাণ দেবে। কিছু টাকা নিতে হলো। সময়মত যোগাযোগ করব।

শ্যামলকে লিখল,

তোমার জয় হোক শ্যামল। অলকাকে তুমি বাঁচিয়েছো। তার মোহ ভেঙেছে। সে নিজেকে চিনে তোমাকে জেনেছে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। দূর থেকে তুমি তার সকলের বড় বন্ধু হ'য়ে থেকো।

আজ আর স্বীকার ক'রতে লজ্জা পাচ্ছি না—সত্যিই তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। ভাবতাম, তোমার নজর শুধু আমার দেহটা আর বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের উপর, কিন্তু তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছো কত নিকটতম তুমি আমার। তুমি আমার কত আপন জন।

আমার প্রস্তাবে রাজী না হ'য়ে তুমি ভালই ক'রেছো শ্যামল। আজীবন আমাকে হয়তো ভাবতে হতো তুমি আমাকে দয়া করে গ্রহণ করেছো। ভালবাসা ছোট হ'য়ে যেতো। আমার ভুলটাই চিরদিন বেদনা দিত। এ জীবন সম্মানের নয়।

আমার এই ছোট্ট জীবনের হাটেবাজারে যে ক'টি চেহারা চোখে পড়েছে তা আমাকে আকর্ষণ ক'রলেও দেউলিয়া ক'রতে পারেনি শ্যামল। জলে নামলেও তলিয়ে যাইনি। কথাটা সেদিনে ব'লতে পারিনি। কারণ সেদিনে আমি ছিলাম প্রার্থী। আমার প্রার্থনার মধ্যে স্বার্থের গন্ধ ছিল। তুমি বিশ্বাস ক'রতে পারতে না। আজ হয়তো অবিশ্বাস ক'রবে না এই আশা নিয়ে চলে যাচ্ছি।

নিছক ঝোঁকের বশে আমি চলে যাচ্ছি না শ্যামল। আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি যদিও জানি আমার শক্তি সীমাবদ্ধ। তাছাড়া পরিকল্পনা করা আর তা কাজে রূপায়ণ করার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক আছে। আমার চলার পথে হয়তো আরও বহু নির্মল আর সরোজের দেখা পাব কিন্তু তার জন্য আমি ভয় পাচ্ছি না। নতুন ক'রে আর হারিয়ে যাব না এ আত্মপ্রত্যয় আমি ফিরে পেয়েছি শ্যামল।

ইতি

অলকা

চিঠিখানি যথাসময় শ্যামলের হাতে এল। তার মা-ও দেখলেন, দুঃখ করে ব'ললেন, মেয়েটাকে ঘর ছাড়া করলি শ্যামল—

শ্যামল জবাব দিল, না মা, ওকে ফিরিয়ে আনলাম।

ডানা ভাঙ্গা পাখি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গার ওপারে লাল হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। কিন্তু সূর্যাস্ত দেখার মত তার মন ছিল না। সে তার বদলে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে হাতের ঘড়ি দেখছিল। ঠিক ছ'টা। ছ'টার সময় পরের শিফটের কনেসটবল অনাদি বলের আসার কথা। কিন্তু এখনও সে এল না। অথচ নিতাই আজ সকাল সকাল বাড়ি চলে যাবে বলে ভেবে রেখেছিল। আজ এখনি ফিরতে পারলে ন'টার শোয়ে সিনেমা যেতে পারত। ভাল হিন্দি ছবি এসেছে। সায়রাবানু আছে।

সায়রাবানুর ছবিটা মনে পড়তেই কনস্টেবল নিতাই মণ্ডলের বুকটা একটু খচ খচ করে উঠল। নিজের অজান্তেই সে একটা বিড়ি মুখে দিল। তারপর পকেট থেকে দেশলাই বার করে কাঠি ঠুকতেই দমকা হাওয়ায় আগুনটা নিবে গেল।

শালা! দাঁতে দাঁত চেপে নিতাই মণ্ডল কাকে যেন অভিশাপ দিল। বাতাসকে না তার পরের শিফটের অনাদিকে না থানার দারোগাবাবুকে বোঝা গেল না।

আর সেই মুহূর্তেই ঘটল ঘটনাটা। একটি সোমত্ত মেয়ে এই কিছুক্ষণ আগে গঙ্গার পাড়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। কি মতলব কে জানে। হয়ত ছোড়ার আছে। ফাগুনের ঝুরঝুরে হাওয়া খেতে এসেছে একটু। সন্ধ্যার ঝুল পড়লেই লুকিয়ে চুমু খাবে। যেমন এই বিবেকানন্দ ব্রিজে বিকেলের দিকে যত ছোড়া আসে সবাই খায়। নিতাইয়ের সব মুখস্থ হয়ে গেছে। এ থানায় তার কম দিন হয়ে গেল না।

কিন্তু সেই হলুদ কাপড় পরা সোমত্ত মেয়েটি হঠাৎ জলে নেমে গেল—তারপর আরও জলে আরও—আরও।

নিতাইয়ের সারা শরীরে কে যেন বিদ্যুতের চাবুক মারল। আরে ডুবে মরতে যাচ্ছে নাকি মেয়েটা? বুক-গলা মুখ সব জলে ডুবে গেছে—এখন শুধু হাত দুটো—কারণ দুটো হাত জেগে রয়েছে দাবমেরিনের পেরিস্কোপের মত। হাত দুটো নাড়ছে। কী সর্বনাশ! নিতাই চিৎকার করে উঠল। চিৎকারে গেটকীপার রহমান, যে গাড়ি থামিয়ে টোল আদায় করে, সে কাজ থামিয়ে নিচে নেমে এল।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না নিতাই। একটানে শার্ট আর বেল্ট খুলে রেখে রহমানের হাতে দিল। তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

ভাঁটির টানে ভেসে যাচ্ছিল মেয়েটি। মেছনার পাড়ের লোক নিতাই। ছোটবেলা থেকে জলের পোকা। কিন্তু অনেকদিনের অভ্যাস। কিছুদূর এগিয়ে প্রচণ্ড হাঁক ধরল। অথচ একটু দূরেই ভেসে যাচ্ছে মেয়েটি। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিতাই এগিয়ে গেল। হ্যাঁ এবার ধরেছে—মেয়েটির কালো চুলের গোছা মুঠো করে ধরে সে তাকে টেনে আনতে লাগল। মেয়েটি অবশ, যদি তাকে জড়িয়ে ধরতে চায় তাহলে

কি হবে সে কল্পনা করতে গিয়ে শিউরে উঠল। ঐ যে পাড়ে অনেক লোকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। মনে মনে সে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

তীরে যখন এসে পৌছল তখন মাথা ঘুরছে নিতাইর। সে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। শ'খানেক-লোক জমেছে পাড়ে। মেয়েটি প্রায় বিবস্ত্রা। জল খেয়ে ফুলে উঠেছে। তাড়াতাড়ি কে যেন এগিয়ে এসে মাথা তুলে পেটে চাপ দিয়ে জল বার করে দেওয়ার চেষ্টা করল। ইতিমধ্যেই বুদ্ধি করে কে খবর দিয়েছিল হাসপাতালে। অ্যামবুলেন্স এসে ওদের তুলে নিয়ে গেল দুজনকে।

হাসপাতালে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুস্থ বোধ করল নিতাই। হটওয়াটার বটল দিয়ে সেঁক করায় এখন চাঙ্গা লাগছে নিজেকে। সে উঠতেই নারস হাঁ-হাঁ করে উঠল।

: উঠবেন না। শুয়ে থাকুন।

: সেই মেয়েটি কেমন আছে?

: ভালই। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার থানার বড়বাবু ফোন করেছিলেন। এখুনি আসছেন। বাড়িতে কাউকে খবর দেওয়ার আছে?

: বাড়ি? নিতাই হাসল। বাড়ি নেই তার। থানার পুলিশ ব্যারাকে থাকে। কমপেট অনাদিকে খবরটা দিলে হতো। নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে অনাদি। বড়বাবু যখন নিজেই আসছেন।

নিতাই বলল, আমি এখানে একলা থাকি।

মস মস জুতোর আওয়াজ করে ডাক্তার এলেন একটু পরে। গলায় স্টেথিসকোপ ঝোলান। বললেন: কেমন ফীল করছেন?

: খুব ভাল।

: কনগ্রাচুলেশনস। যেভাবে একটা লাইফ সেভ করেছেন।

: মেয়েটি কেমন আছে?

: কমপ্লিট আউট অফ ডেনজার। প্রেস থেকে ফোন করেছিল, সবাইকে বলে দিয়েছি। সৎকারেরও পাবলিসিটি দরকার।

: আমাকে কবে ছাড়বেন?

: আপনার ও. সি. আসছেন। কথাবার্তা বলে কাল সকালেই ছেড়ে দেব। তবে মেয়েটিকে রাখতে হবে কিছুদিন। একটা কথা, অ্যাটেমপ্ট টু কমিট সুইসাইড বলে মনে হয় আপনার?

: হ্যাঁ। আমার চোখের সামনেই জলে নেমে যাচ্ছিল।

একটা কথা শুনুন। আপনার ও. সি. আসার আগে আপনাকে বলা দরকার। অ্যাটেমপ্ট টু সুইসাইড হলে ফেঁসে পড়ে যাবে মেয়েটি। আবার পুলিশে টানা হ্যাচড়া। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। তার চেয়ে আপনি স্টেটমেনট দেবেন জলে পড়ে যায়। স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল দেখে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচান। মস মস জুতোর আওয়াজ তুলে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা মেয়েটিকে দেখতে এমারজেনসির কিয়েল ওয়ার্ডে গেল নিতাই। মেয়েটি ঘুমোচ্ছিল। ভাল করে দেখল কালো শীর্ণ চেহারার একটি মেয়ে। পাখা সিঁথি। চোখে মুখে ক্লান্তি।

নায়ন বলল : ডাকব ?

নিতাই জবাব দিল : না থাক।

: কি নাম কোথায় বাড়ি কি বৃত্তান্ত কিছু বলেছে ?

: নাম বলেছে বেলা দাস। আর কিছু বলছে না।

কান্নাকাটি করছে। শুধু বলছে, আমায় কেন বাঁচালেন ?

কথাবার্তার আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল বেলা দাসের। চোখ মেলে চাইল।

সিসটার বলল, এই যে ইনি নিতাই বাবু। আপনাকে বাঁচিয়েছেন।

বেলা দাস নিতাইর দিকে তাকাল। না, চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন নেই—ঘৃণা শুধু ঘৃণা। নিতাইর সারা শরীর গরম হয়ে উঠল। এরই জন্যে কি সে কাল জীবন অতখানি বিপন্ন করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ?

নিতাই বলল, কোথায় থাকেন আপনি ?

বেলা কথা বলল না।

: কেন মরতে গিয়েছিলেন ওভাবে ?

: তবুও চুপ করে রইল বেলা। তেমনি ঘৃণাভরা দৃষ্টি।

: বলুন চুপ করে আছেন কেন ?

হঠাৎ সেই বোবা চোখে জল ভরে উঠল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বেলা দাস। দুহাতে চোখ ঢাকল। অপ্রস্তুত সিসটার কি করবে ভেবে না পেয়ে তাড়াতাড়ি নিতাইকে বলল, আপনি এখন যান এখান থেকে।

পরের দিন হাসপাতাল থেকে ফিরল নিতাই।

ডাক্তারবাবু বললেন, খবরের কাগজে আপনার নাম বেরিয়েছে—দেখেছেন ?

: না।

: সে কী, এই দেখুন। একপাতা কাগজ মেলে দিলেন ডাক্তার। নিতাইর পড়তে ভাল লাগছিল না। সে কোন আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পারছে না। মনটা এখন কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা।

: বেলা দাসের বাড়ির খবর পেলেন ?

: না। বলছে তো বেলঘোরিয়ার ওদিকে কোথায় থাকে। মা বাবা নেই। বুড়ি পিসী আছে।

—ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল তাই ডুবে মরতে গিয়েছিল। আপনি কিছু ভাববেন না। ও. সি. ডাইরিতে অ্যাকসিডেন্ট কেস লিখেছেন। কোন ঝামেলা হবে না।

নিতাই ফিরেছে ব্যারাকে। দু তিনদিন হৈ-চৈ হল তাকে নিয়ে। বড়বাবু জানিয়েছেন, এস. পি. ফোন করেছিলেন। তোমার নাম সুপারিশ করেছেন রাষ্ট্রপতির কাছে পুরস্কারের জন্যে। পুরস্কার পেয়েও যেতে পার।

দুদিন ছুটির পর ডিউটি করতে যাবে সেদিন হঠাৎ কে যেন খবর দিল কে একজন মেয়েছেলে ডাকছে তোমাকে ?

: কে ? কোথায় ?

: থানার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাকাতে ডাকাতে গিয়ে দেখল নিতাই। রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি সে আর কেউ নয় বেলা দাস।

আরও রোগা হয়ে গেছে। ময়লা হলুদ শাড়িটা তার পরণে। এই শাড়ি পরেই জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল বেলা দাস। শীর্ণ হাত দুখানা ঝুলছে। গলার হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে।

আপনি না তুমি বলবে ঠিক করতে পারল না নিতাই। শুধু বলল: তুমি এখানে? হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে কবে?

: কিছুক্ষণ আগে।

: আমার নাম ঠিকানা জানলে কি করে?

: ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে নিয়েছি।

: আমার কাছে কি দরকার?

: আমাকে কেন বাঁচালেন?

নিতাই জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিল। ভাল নাটক জমল দেখছি। তবু ভাল আস্তে আস্তে কথা হচ্ছে। বাজারের মেয়েছেলেদের সঙ্গে লোকে যেমন দরদস্তুর করে তেমনি ভাবে। কি বলতে চায় মেয়েটা? খারাপ মেয়ে ছেলে নয় তো? হাসপাতাল থেকে একলা একলাই চলে এসেছে।

: কোথায় থাক তুমি? নিতাই জিজ্ঞাসা করল।

: আগে উত্তর দিন আমার কথার।

: চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। তুমি থানায় চল। বড়বাবুকে বললে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন।

: আগে আমার কথার উত্তর দিন।

: কি উত্তর?

: কেন বাঁচালেন আমায়?

: ভাল জ্বালা হল দেখছি! চোখের সামনে একটা মেয়ে মরছে আমি বাঁচাব না?

: কিন্তু আমার বেঁচে থেকে কি হবে?

: তার মানে?

: কোথায় যাব, আমি? কি করব আমি?

: কেন তোমার বাড়িতে। সেই বেলঘোরিয়া না কোথায়?

চোখ আবার জলে ভরে এল বেলা দাসের। বিকেলবেলা। রাস্তা দিয়ে লোকজন তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। গর্মেন্ট বদলে গেছে। কায়দায় পেলে পুলিশ মেরে পাবলিক এখন হাতের সুখ করে নিচ্ছে। বেহালায় কনেস্টবলকে জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরান হয়েছে। নিতাই থামতে লাগল। বলল, আমার ডিউটির সময় হয়ে যাচ্ছে। ছ'টায় পৌঁছতে হবে। তুমি চল বড়বাবুকে সব বলবে চল।

কিন্তু বেলা দাস থানায় যেতে চাইল না। অগত্যা থানার সামনে পার্কটায় বসে তার কাহিনী বলল বেলা দাস। বাবা মা কেউ নেই। কলকাতায় পাঞ্জাবীর রেস্টুরেন্টে ওয়েট্রেসের কাজ করত। থাকত এক দূর সম্পর্কীয়া পিসীর বাড়ি বেলঘোরিয়ায়। কিন্তু চাকরিটা সহজে মেলেনি। মালিক বচ্চন সিং চেয়েছিল তাকে দিয়ে ঘোলপায় করতে। বুঝতে পারল বেলা দাস। আপত্তি জানাতে চাকরি গেল। আর চাকরি

যাওয়া মানেই বেলঘোরিয়ার পিসীর কাছে টাকা বাকী পড়ল। বহু ঘুরে চাকরি যোগাড় করতে না পেরে ডুবেই সব জ্বালা জুড়োতে চেয়েছিল বেলা দাস।

: এখন কি করবে? কোথায় যাবে?

: জানি না। কুৎসিৎ মুখটা হেলে জবাব দিল বেলা দাস। যেন মনে হচ্ছিল, নিতাইকে পেয়েছে বলে সে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে।

পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করল নিতাই! এই নাও। তোমার পিসীকে দিও। তারপর একটা কাজ দেখে নিও।

কিন্তু বেলা দাস কিছুতেই যাবে না। এমন জানলে কে রক্ষা করতে যেত তাকে? নিরুপায় হয়ে সে বলল, তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি। একটু পরে ইউনিফরম পরে ফিরল। পকেটে আরও একখানা দশটাকার নোট নিল। তারপর বেলা দাসকে বলল, চল, আমার সঙ্গে।

: কোথায়?

: বেলঘোরিয়ায়। তোমার পিসীর বাড়ি। আমি বুঝিয়ে বলব।

কিন্তু পিসী রাখতে রাজি হল না। অনেক বোঝান সত্ত্বেও না। সে বলল, খবরের কাগজে ও মেয়ের নামে চি চি পড়ে গেছে। এমনিতেই মুখ দেখাতে পারছিনে। ওকে রাখতে পারব না।

এর মধ্যে বেশ লোক জমে গিয়েছিল। কাদের মন্তব্য যেন কানে এল, এই সেই কলেজটবলটা না? মান অভিমানের ব্যাপার বুঝতেই পেরেছি। শ্রীরাধিকা যমুনার জলে ডুব দিলেন। কালাচাঁদ তাঁকে ধরে তুললেন। জড়িয়ে জড়িয়ে হেসে উঠল বাকী সকলে।

বেলাকে নিয়ে থানাতে ফিরে এল নিতাই। বড়বাবু বললেন, বল কি? মেয়েছেলে নিয়ে থানায় পুলিশ ব্যারাকে কক্ষনো রাখা যাবে না। শেষকালে কি চাকরি খোওয়াব?

মাথাটা ঘুরছিল নিতাইর। একটি জীবন বাঁচাবার পর তার জীবন যে এমন বিপন্ন হয়ে উঠবে কে জানত? কে জানত বেলা দাস বলে এই আশ্রয়হীনা কুরূপা মেয়েটি তাকে এই বিপদে ফেলবে!

কলকাতা শহরে এমন কোন আত্মীয়-স্বজন নেই নিতাইর যার কাছে সে বেলা দাসকে রাখে—অন্তত: এক রাতের জন্যও রাখে। আর একঘণ্টা পরেই তার ডিউটি সুরু হবে। কোথায় সে রেখে যেবে বেলা দাসকে?

আপনি কেন আমাকে বাঁচালেন? বেলা দাসের সেই একই কথা। যেন বাঁচিয়েছে বলেই বেলা দাস প্রতিশোধ নিতে চাইছে। সে যেন বলতে চাইছে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যে কত কঠিন এইবার বোঝ।

: একটা রাত্তির। একটা রাত্তির দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে কাটিয়ে দেওয়া যায় না? তারপর কাল আবার চিন্তা করা যাবে।

বেলা দাস কিছুই বলল না।

অনাদি নিতাইর দেরী দেখে উশখুশ করছিল। ট্যাক্সি থেকে মেয়েছেলে নিয়ে নিতাইকে নামতে দেখে তার সিটি দিয়ে উঠতে ইচ্ছা করল।

কানে কানে বলল, মালটি কে-রে?

নিতাই বলল, যাকে সেদিন জল থেকে তুলেছিলাম।

: আরে বাবা এর মধ্যেই প্রেম! প্রতাপ-শৈবলিনীর ব্যাপার হয়ে গেল মাইরি।

মন্তব্য গায়ে মাখল না নিতাই। বলল, এই অনাদি, বড় মুশকিলে পড়েছি মাইরি। এই মেয়েটি সত্যি কাঁধে ভর করেছে। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তোর তো বাড়িতে বউ আছে। ওকে একদিন দুদিনের জন্য রেখে দে না। যা খরচা লাগে আমি দেব।

: মাইরি আর কি। ঐ তো চেহারা। কোথাকার কে ঠিক নেই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুমি আর বউ কোঁটিয়ে বিদায় করুক। তোমার দাস তুমি সামলাও।

অনাদি চলে গেল। বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে। সেদিনের মত আজও ভোড়ায় ভোড়ায় ছেলে-মেয়ে বসে আছে গঙ্গার ধারে।

: তুমি যেতে পারবে না দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে? নিতাই জিজ্ঞাসা করল।

: না। আমার ভয় করছে বড়।

: কিসের ভয়?

: বজ্জন সিং-এর লোক সব জায়গায় আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি একা একা থাকতে পারব না।

: তোমার জন্য দোকা কোথায় পাব?

: আমি তো সেজন্যই মরতে গিয়েছিলাম। আমাকে বাঁচালেন কেন?

আবার সেই প্রশ্ন 'আমাকে বাঁচালেন কেন'?

নিতাইর মনে হল যদি জানতাম এমন হবে তাহলে কোন শালা বাঁচাত তোমায়। কিন্তু এই যে তার জীবনে ফেউর মত লেগে গেল বেলা দাস, এখন সে কি করে নিষ্কৃতি পাবে? কে জানে, বাজারের মেয়েছেলে কি না! এই বাজারে চাকরিটাই হয়ত তাকে হারাতে হবে।

নিতাই বলল, এখন বুঝছি অন্যায় করেছিলাম।

পাথরের মূর্তির মত বসেছিল বেলা দাস। নিতাই ডিউটি করতে সুরু করে দিল। হাফ লাঠি হাতে নিয়ে টহল দেওয়ার জন্য সে উঠে দাঁড়াল। যাবার সময় বলল, আমার কাছে তোমার কোন সুবিধে হবে না। তুমি পথ দেখতে পার।

বলে পিছনের দিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটতে আরম্ভ করে দিল নিতাই। আর হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল এখন যদি বেলা দাস জলে ঝাঁপ দেয় তাহলে সে আর তুলবে না। অন্যদিকে ফিরে হাঁটবে। অথবা চোখটা সেদিক থেকে ফিরিয়ে নেবে।

বালি স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল নিতাই। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঝাঁজ-ঘন্টা বাজছে। আরতির সময় এখন। ব্রিজের নিচে কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলো আর নেই। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে চারদিক।

কিন্তু মনটা কেমন যেন খচ খচ করছিল নিতাইর। শিস দিয়ে মনে ফুর্তি আনার চেষ্টা করল। ইচ্ছে করল না।

ব্রিজের এপাশটায় যেখানে বেলা দাস নিথর পাথরের মূর্তির উপর বসেছিল সেখানে গিয়ে দেখল বেলা দাস নেই। না, সত্যিই তাকে বাঁচিয়েছে বেলা দাস। সুবিধে হবে না ভেবে নিজের পথ দেখে নিয়েছে।

সেই সময় আবার চোখে পড়ল তার। একটা ছায়া মূর্তি ব্রিজের নিচে জলে নামছে—হ্যাঁ বেলা দাসই তো। একটু একটু করে জলে নামছে বেলা দাস। কোমর, বুক, মাথা: আর কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র।

শালা! দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা উচ্চারণ করল নিতাই। তারপর জামাটা খুলে দৌড়ে গেল নিচে গঙ্গার দিকে। সেদিন যেমন করে গিয়েছিল।

নীতিকথা

সুবোধ বসু

আসানসোল থেকে মোটরে আধঘণ্টার পথও নয় মাইথন। প্রাতরাশ সেরেই রওনা হয়ে পড়েছিলাম, দশটার আগেই পৌঁছে গেলাম।

সৃষ্টিকর্তার দাদা দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনে সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার। রবিবার এসে মাইথনে কাটিয়ে যাওয়ার নিমন্ত্রণ হয়েছিল টেলিফোনযোগে বৌদি ও ননদের মধ্যে। কান টানলে মাথা আসে, আমাকেও আসতে হয়েছে।

অবশ্য মাইথনের ন্যায় অঞ্চলটা আমার ভালো লাগে। বাঁধের বাধা পেয়ে বরাকর নদী বিস্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। নদী পরিণত হয়েছে মহা হ্রদে।

কী চমৎকার রাস্তা এই বাঁধের উপর। যেমন চওড়া তেমনি মসৃণোজ্জ্বল। একদিকে হ্রদ, অন্য দিকে বাঁধ-বিমুক্ত নদীরেখা। ঘুরে ঘুরান্তরে পাহাড়ের তরঙ্গ। সিধা রাস্তা একটানা চলে গিয়েছে দেবী কল্যাণেশ্বরীর মন্দির পর্যন্ত। মায়ের স্থান এই থেকেই নাকি নাম হয়েছে মাইথন।

পৌঁছবার আধঘণ্টার মধ্যেই বৌদি ও ননদ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেছেন কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে পুজো দিতে। দেবীর প্রতি আমার কোনও অশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু যেহেতু নিত্য নিত্য মন্দিরে যাওয়া পুরুষীয় কাজ বলে গণ্য করা হয় না, সেজন্য মহিলাদের আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে আমি ড্যামের গেট তদন্তে নির্গত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের গাড়ীতে চেপে বসলাম।

বাঁধের মাঝামাঝি ফুটপাথের একধারে যেখানে নদীস্রোত রুখবার গেট নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যন্ত্রের বাক্সগুলি পর পর দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে গ্রামক মহাশয় এবং তাঁর গাড়ীকে ত্যাগ করে আপন মনে বাঁধের রাস্তায় হেঁটে চলেছি। রবিবার বলে সকালেও কিছু লোকজন চলেছে রাস্তায়। গাড়ীর সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নয়। মাইথন এবং দূর থেকে অনেক লোক ছুটির দিনে বেড়াতে আসে। কয়েক শো মাইল দূর থেকেও সরকারী ও বেসরকারী বাস হলিডে-মেকারদের নিয়ে আসে, তা সর্বদাই লক্ষ্য করেছি। কলকাতার সংখ্যায় না হলেও রাস্তার ধারে ধারে চানাচুরওলা, গোলগাপ্পা বা পুচ্‌কেওয়ালা, চা-বিস্কুটওয়ালা আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু এসব তুচ্ছ হয়ে যায় প্রকাণ্ড পটভূমিকায়। কত জল, জলে কত দ্বীপখণ্ড, কত অরণ্য ও পর্বতরেখা, কত বিস্তৃতি, কত প্রকাণ্ড আকাশ। কলকাতার ও আসানসোলের ঠাসাঠাসিতে অভ্যস্ত লোকের কাছে এ যেন মুক্তির স্বাদ!

বাঁধের সড়ক যেখানে হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে আবার তখনই ডান দিকে ফিরেছে সেখানে মোড় নিয়ে আরও এগিয়ে এসেছি। অনেকগুলি বাস দাঁড়িয়ে আছে। নতুন-আসা বাস্ থেকে বেড়াতে আসা অনেক স্ত্রী-পুরুষ নামছেন। রাস্তার খাদ্য ও পানীয় বিক্রেতাদের সংখ্যাও কিছু বেশি। সন্দেহ রইল

না, 'জনতা নিবাসে' যাওয়ার পুলটিতে নামবার সিঁড়ি আছেই। 'জনতা নিবাস' হলে কি হবে, জনতার সম্পূর্ণ বাইরে এর অবস্থান। বাঁধের জলের ভেতর খানখণ্ডের উপর। বাঁধের উপরকার রাজপথ থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি নেমে গেছে জলের কিনারা পর্যন্ত। সেখান থেকে লোহার ফ্রেম আর কাঠের পাটাতনের দীর্ঘ পুল অতিক্রম করে' 'জনতা নিবাসে' পৌঁছতে হয়। রাস্তা থেকে নিচে নেমে এলে তার পাশেই মোটর বোটের স্টেশন। নির্দিষ্টসংখ্যক যাত্রী পেলে সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে বাঁধের জলে খানখণ্ডগুলির কাছ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। কিছু যাত্রী জমা হয়েছিল মোটর বোট স্টেশনে। অনায়াসে তাদের দলে ভিড়ে নৌবিহার করে আসতে পারতাম। সে প্রলোভন দমন করে জনতা নিবাসে যাবার পুলের দিকে পা বাড়ালাম।

এখানকার সরকারী ভাষায় এই অতিথিশালাটিকে এল, আই, জি (লো ইন্‌কম গ্রুপ বা স্বল্প আয়ের লোকদের উপযোগী) হস্টেল বলা হয়। সুন্দর বাগান ও পরিবেশের মধ্যে যে প্রকাণ্ড একতলা আবাসটি গড়া হয়েছে, তার কামরায়, তার আসবাবপত্রে, তার কামরার লাগোয়া গোসলখানায় এই অল্পবিত্তদের ছাপ সুপরিস্ফুট।

একাধিকবার এই জনতানিবাসে এসেছি। এর প্রতিটি কোণ, জলের ধারে বসার জন্য প্রতিটি বেঞ্চি ও আসন আমার চেনা। আগামী মাসে ইয়টক্লাবের রেসেটা'র নেমন্তন্ন আছে। ভোজের আগাম আস্বাদ যেমন গন্ধ থেকে পাওয়া যায়, এখান থেকে জলের ও-প্রান্তে ইয়ট ক্লাবের বৃক্ষ আগামী উৎসবদিনের আভাস বহন করে আনলে। কিন্তু রৌদ্রের তাড়নায় শীঘ্রই জনতা নিবাসের লম্বা বারান্দার আশ্রয়ে উঠে আসতে হলো। প্রায় উদ্দেশ্যহীনভাবে কামরার পর কামরা পার হয়ে এগিয়ে চললাম।

জনপ্রিয় নিবাস সন্দেহ নেই। খানা-কামরার টেবিলগুলিতে লোকের ভিড়। প্রায় প্রতিটি কামরা অতিথিতে পূর্ণ। বারান্দায় স্ত্রী-পুরুষ উৎসবকামীদের আনাগোনা চলছে। ক্যামেরার উপবীত ঝুলিয়ে বা ট্রানজিস্টর রেডিয়ো হাতে নিয়ে অল্প বয়সী ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত।

'প্রণব দা?'

চমকে পেছনে তাকালাম।

'চিনতে পারছেন, প্রণবদা? আমি বিশু!' সদ্য-অতিক্রান্ত কামরাটার দরজার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো তেইশ-চব্বিশ বছরের ড্রেন্‌ পাইপ প্যান্ট আর পদ্মা নাইলনের শার্ট-পরা এক ছোকরা।

কলকাতায় আমরা যখন পাড়ার পাণ্ডাগিরি করতাম, বারোয়ারী দুর্গাপূজা বা চ্যারিটি পার্ফর্মেন্সের ব্যবস্থা করতাম, তখন বিশু আমাদের সাগরেদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে প্রায় দশ এগারো বছরের কথা। কিন্তু চিনতে দু এক সেকেণ্ডের বেশি দেরি হলো না। সদাহাস্যমুখ ছেলেটার হাসির সেই বিশেষ ভঙ্গিটা মনে পড়ে গেল। খুব নিষ্ঠাবান চ্যালা ছিল বিশু। আমাদের সব হুকুম সে নিষ্ঠা এবং আগ্রহের সঙ্গে পালন করে আমাদের খুশি করতে চেষ্টা করত। কিন্তু যেমন অদর্শন ও পরিবেশ-পরিবর্তনে হয়ে থাকে, ওর অস্তিত্বের কথাটাও ভুলে গিয়েছিলাম। সহসা সে ডাক দিয়ে ছাত্রজীবনে টেনে নিয়ে গেল।

'কিরে, কেমন আছিস?' হস্ততার সঙ্গে সাড়া দিয়ে বললাম।

'আছি এক রকম।' বিশু কাছে এসে একটু হেসে জবাব দিলে। 'আপনি ভালো তো? এখন তো কত বড় চাকরি করছেন। সব খবর রাখি। কলকাতায় যান মাঝে মাঝে? আপনাদের সেই বাড়ীটায় এখন এক মাদ্রাজী রেলের অফিসার থাকেন। পাড়াটা আর সে রকম জমজমাট নেই। আসানসোলেই তো আপনার হেড-কোয়ার্টার্স, তাই না?.....'

'হ্যাঁ। আশ্চর্যসোল। কি করছিস তুই?'

'একটা চাকরি দিন না, প্রবীর দা। বড় বিপদে আছি।' আমার প্রশ্নের সুযোগ নিয়ে অতর্কিত আক্রমণের মতো আবেদন এলো। বিশুর সদাহাস্যমুখে বিপন্নের অসহায় ভাবটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। কণ্ঠের স্বরটাও একটু যেন কাটাকাটা।

বেফাঁস প্রশ্নের বোকামি সংশোধনের জন্য গম্ভীর হয়ে যাব, না সহানুভূতির সঙ্গে পূর্বপরিচিতের আবেদন বিবেচনা করে দেখব স্থির করতে পারছিলাম না, ইতিমধ্যে বিশু নিজের কোয়ালিফিকেশন আমার সুবিধার জন্য জানিয়ে দিলে। 'ইণ্ট রমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছিলাম। পাস করতে পারিনি। শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শিখেছি। মাস পাঁচেকের জন্য পোর্টকমিশনারে আমার এক মামাত ভগ্নীপতির জায়গায় অফিশিয়েটও করেছিলাম। তারপর প্রায় এক বছর বসে আছি। মুরুব্বি ছাড়া কাজ হয় না। তবু কোনও রকমে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ এমন অবস্থান্তর ঘটে গেল ..... ।'

কথাটা সমাপ্ত হতে পারল না। তার আগেই বিশুর ঘরের দরজার সামনে বছর কুড়ি একুশ বছরের একটি মেয়ে বের হয়ে এলো। আমাদের বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত করে বোধহয় অদৃশ্য বিশুর উদ্দেশে অনুচ্চকণ্ঠে ডেকে বললে, 'কোথায় গেছ? আমি তো তৈরি।'

'এখানেই আছি।' এদিক থেকে বিশু একটু বিব্রতভাবেই সাড়া দিলে। 'একটু পরেই যাচ্ছি।'

'কে, তোমার স্ত্রী?' মেয়েটি ঘরের ভেতর দ্রুত অন্তর্ধান করার পর প্রশ্ন করলাম। 'যাওনা, বেড়িয়ে এসো। চেঞ্জে এলে ঘরে বসে থাকতে নেই।'

'চেঞ্জে নয়, প্রবীর দা। গৃহহীন হয়ে পালিয়ে এসেছি সাময়িক আশ্রয় লাভের জন্য।' বিশু মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললে।

'কারুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

বিশু ঘাড় নেড়ে আমার অনুমানকে সমর্থন করলে।

'শ্বশুরবাড়ী?'

'তাও নেই।'

'ব্যাপার কি?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

'প্রবীর দা, সত্য কথা এই, এখনও আমাদের বিয়ে হয় নি। আমরা পালিয়ে এসেছি।' বিশু অপরাধীর কণ্ঠে নতমুখে বললে। 'প্রথম সুযোগেই আমরা বিয়ে করে নেব। কিন্তু পাঁচশাত দিনের বেশি চালাবার মত টাকাও হাতে নেই। পুরানো দিনের দোহাই, প্রবীরদা। একটা কাজ দিন। আমাদের বাঁচান।'

স্টেনো-টাইপিস্টের কাজ চলতো এক আধটা পালিই আছে। ইতিমধ্যেই ভাবছিলাম, তার একটা বিশুকে দেওয়া চলে কিনা। বিয়ে না করেই কারও মেয়ে নিয়ে পালিয়ে আসা, এবং বিদেশে এসে স্বামী-স্ত্রী সেজে একই ঘরে বাস করার ব্যাপারটা আমার রক্ষণশীল সংস্কারে প্রায় অগোচরে একটা বৈরিতা সৃষ্টি না করলে হয়তো তাকে একটা আশ্বাসই দিয়ে ফেলতাম। প্রায় অজ্ঞাতসারেই কাঠিন্য এসে গিয়েছিল এই সংবাদ শুনে। এখন বাঁচাবার জন্য তার এই একান্ত আবেদন আবার দ্বিধার মধ্যে ফেললে।

'নমিতা, মানে আমার, কি বলব, স্ত্রী বলে, আর কিছু না হোক, বাঁধের জল তো আছে!' বিশু সঙ্কোচে বলতে লাগল। 'শুনে বড় আত্মবিশ্বাস হয় প্রবীরদা। এরই জন্য কি এঁকে এমন করে নিয়ে এসেছি...'

'এমন করে' না আনলেই পারতে।' রূঢ় হলেও না বলে পারলাম না। 'আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে দোষ কি ছিল। কাজকর্মের একটা ব্যবস্থা করে তবেই……'

'অপেক্ষা বহুকাল করেছি'। বিশু জবাব দিল। 'কত চেষ্টা করেছি একটা যা হোক কোনও চাকরি জোগাড় করবার। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে আমাদের আর ভরসা নেই এটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি। এ-বাড়ী ও-বাড়ী কোনও বাড়ীই এ বিয়েতে রাজি নয়। বারবার আবেদন করে অপমানিত হয়েছি। লুকিয়ে ছাড়া আমাদের দেখাসাক্ষাতেরও উপায় ছিল না। এমন সময় নতুন বিপদ উপস্থিত হলো! শত হোক আমরা মানুষ। মানুষের দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নই। আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্ভব নয়। কালীঘাটে মা কালীর সামনে মালা বদল করে যা সত্যিকারের বিবাহ তা সেরে নিলাম। তারপর ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম। বেচারীকে অপমান ও নিগ্রহের হাত থেকে বাঁচাবার আর উপায় ছিল না।…'

সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকালাম বিশুর দিকে। মুখটা নিচু করেই আছে। কিন্তু আমার ধারোপায় দৃষ্টি ও তার অন্তর্নিহিত প্রশ্ন টের পেতে অসুবিধা হয় নি। আমার দিকে তাকালনা, কিন্তু বেশ বেপরোয়া ভাবেই সে জবাব দিলে। গলার পর্দা নিচু করে বললে, 'ওর এই তিন মাস চলছে।'

এমন কিছুই আশঙ্কা করেছিলাম। তবু স্তম্ভিত হলাম। বিশুকে একটু বোকা সোকা লোক বলেই জানতাম, ইতিমধ্যে সে এতটা লায়েক হয়েছে! গলায় বিপদের আবেদন আছে, কিন্তু লজ্জাসরমের বালাই নাই।

'আচ্ছা চলি। দেখি যদি কিছু করতে পারি।' বলে আর কথা না বাড়িয়ে অগ্রসর হলাম।

'এখন কি আসানসোলে ফিরে যাবেন?' পিছনে চলতে চলতে বিশু জিজ্ঞাসা করলে। 'তাহলে আমিও সঙ্গে…'

'না, আজ এখানেই থাকব।'

'কাল কি আসানসোলে আপনার অফিসে গিয়ে দেখা করব?'

আচ্ছা না-ছোড়বান্দা! বললাম, 'না না। তার দরকার নেই। কাজ মোটেই খালি আছে কিনা আগে খোঁজ নিতে হবে। খালি থাকলে আমিই তোমাকে জানিয়ে যেব। তোমাদের এখানে তো ফোন্ আছে…।'

'দেখবেন প্রণবদা।' সে আবেদনভরা কণ্ঠে বললে। 'আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। কম করেও দৈনিক টাকা দশেক করে চার্জ লেগে যাচ্ছে দুজনের। বেশি দিন এ খরচ চালাবার মত টাকা নেই। যা কিছু ছিল তা নিয়েই পালিয়ে এসেছি। ধার হাওলাত করে যে কিছু সংগ্রহ করব তারও সময় ছিলনা। নমিতার সম্মান বাঁচানোটাই জরুরি প্রশ্ন ছিল। এখানে এক পিসতুত ভাইয়ের চেনা এক ভদ্রলোকের ভরসা করে এসেছিলাম—ডি. ডি. সি-র চীফ্ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে কাজ করেন। কেবল ভাঁড়াচ্ছেন। নিজের লোক না হলে কে কার জন্য করে।

বাঁধে ফিরে যাবার জন্য আবার পুলে পা দিয়েছি। তার 'স্ত্রী'কে নিয়ে বের হবার কথা স্মরণ করিয়ে ও আমার যাওয়ার তাড়া আছে জানিয়ে বিশুকে নিরস্ত করা গেছে অতি কষ্টে, কিন্তু আগামী কালই টেলিফোনে তাকে খবর জানাব, এই প্রতিশ্রুতি দেবার আগে নয়।

পরদিনই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম পি. এ-কে বলেছিলাম। মাইথনের 'জনতা নিবাসে' [illegible]

বিশুকে ছেলেবেলার পর আর দেখিনি। তার অস্তিত্বের কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কার এক মেয়েকে বাড়ী থেকে ভুলিয়ে তার সর্বনাশ করে' হঠাৎ চেনা লোককে আবিষ্কার করে' তার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটাই বিশ্রী। মনটা বিকল হয়ে দাঁড়াল। আমার ভরসা করে সে বাড়ী থেকে বের হয়নি। তার ভবিষ্যতের জন্য আমার দায়িত্ব কোথায়।

তবু শেষ পর্যন্ত টেলিফোন করতে মানা করলাম। আর একটু ভেবে দেখি। নীতি না দুর্নীতি, কোনটা সমর্থন করি?

এমন একটা নোংরা কাহিনী গৃহিণী মালতীকে শোনাবার ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে বলতেই হলো শেষটায়। স্ত্রী বুদ্ধি যদি প্রলয়ংকর কোনও সমাধান করতে পারে!

'করছ কি। মেয়েটা যে বাঁধের জলে ডুবে মরবে। তোমার নীতি-দুর্নীতি বিচারের অপেক্ষা করবে না।' মালতী প্রায় সভয়ে বলে উঠল। 'চাকরি খালি না থাকে, অন্ততঃ টেলিফোন করে' বল, চেষ্টা করছ·····।'

'অত জরুরি কিছু নয়।' আমি অভয় দিয়ে বললাম, 'ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কেউই কম পক্ক নয়। ও একম ভয় ওরা অনেককেই দেখিয়েছে। মা বাপেরা পর্যন্ত ভয় পায় নি··।'

'কিন্তু দারুণ বিপন্ন যে ওরা! কার কোনও খালি আছে?'

'আছে।'

'তবে যাও না। শত হোক, তোমার ছেলেবেলাকার চেনা··।'

'ওটা একটা স্যাণ্ডেল। স্যাণ্ডেল ছাড়া এতটা পর্যন্ত কেউ যেতে পারে?'

'স্যাণ্ডেল কোথায়।' মালতী দেবী সপ্রতিবাদে বললেন 'স্যাণ্ডেল হলে তো মেয়েটাকে বিপদে ফেলে পালিয়ে যেত। এমন করে' সকল দায়িত্ব স্বীকার করে' নিত না। যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত ভাবে চলতে পারেনি, সেটা ঠিক। কিন্তু বাকিটা বখাটের আচরণ নয়, স্বামীর আচরণ।···তুমিও কি নীতিবাগীশ হয়ে গেলে না কি···'

'ঠিক আছে। তবে দুর্নীতিরই প্রশ্রয় দিই।' নৈতিক দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলে জবাব দিলাম।

হাঁ, দেখুন, মাইথনের "জনতা নিবাসে" সেই টেলিফোনটা করে দিন।'

'হ্যাঁ স্যার।' বলে আর প্রশ্নমাত্র না করে' পি-এ মহাশয় ঘুরে দাঁড়ালেন প্রস্থানের জন্য।

'নাম মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'বলবেন···'

'তাও মনে আছে, স্যার···'

'বলবেন,' ফাইলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলতে হলো, 'স্টেনো-টাইপিস্টের কাজ একটা খালি আছে। আজকেই যেন এসে দেখা করে।'

'ও, আচ্ছা!' বলে বিস্ময়টা হজম করে' পি-এ সাহেব ফোন করতে গেলেন। এমন মতপরিবর্তনে তিনি অভ্যস্ত নন।

কথায় বলে, স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকেনা। সন্ধ্যার পর নিজের ড্রইংরুমে বসেই এর আরেকটা

অনন্যাস্ত প্রমাণ পাওয়া গেল। আলাপচারিতা ও মাইথনে টেলিফোনযোগে সংবাদ আদান প্রদান হচ্ছিল। আমাদের বিস্তর সমত্র কাহিনী ও কৌতূহলী প্রশ্ন এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত থেকে আসা-যাওয়া করল অনেকক্ষণ ধরে' ননদ ও ভাজের মধ্যে।

'ওনছ, বৌদি জিজ্ঞেস করছেন আবার কবে যাবে?' প্রশ্নটি আমার প্রতি।

'আগে ভি. ভি. সি. থেকে একটা সমঝোতার ব্যবস্থা হোক, তখন বলতে পারব।' আমি বললাম।

'এতখন কেন?' ননদের কাছ থেকে প্রশ্ন এলো।

'একমাত্র আমাদের জন্যই মাইথনের ড্যাম কলকাতার চাকুরিয়া লোকের ঘুষখোর থেকে রক্ষা পেল, তাকি কম বড় সার্ভিস? নইলে এতক্ষণে 'জনতা নিবাসে'র কাছে দু'দুটো লাশ ভাসতে থাকত…'

'খুব হামবড়াই হচ্ছে। ওও তো নিজে নীতিবাগীশী করতে যাচ্ছিলে।' বলে মালতী আমার বড়াই ও তার অভাব দুটোই মাইথনের স্থপতিবেত্তিং এঞ্জিনীয়ার স্বামীকে জানিয়ে দিলে।

• • •

অনেক রাত্রি পর্যন্ত চোখে ঘুম নেই Bergson-এর, একটা গভীর দার্শনিক তথ্য নিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি।

আজকের মত এ জগৎটা ঠিক এমনিই কি আকাশে হঠাৎ জেগে উঠেছিল?

তাঁর স্ত্রী, এলেন তাঁর কাছে, মিনতি করে বললেন—অনেক রাত হো'ল, শোবে চল।

কথাটা যেন নূতন শোনাল Bergson-এর কানে। পঁচিশ বছর আগের সেই তরুণী মেয়েটি কি এখন তাঁর এই স্ত্রী! এই পরিবর্তন!

একটা evolution হয়েছে তা'হলে। জগতেও তা হবে না কেন?

তিনি তাঁর দার্শনিক গ্রন্থের এবার নাম দিলেন—Creative Evolution. এই বইটির জন্যেই তিনি ১৯২৭ সালে সাহিত্যে Nobel Prize পেলেন। এ কৃতিত্ব তাঁর স্ত্রীর।

অলকার দুপুর

কবিতা সিংহ

তখন অলকা বারান্দায়।

তার চোখ আর বাইরের জগতের মাঝখানে ঠিক এক গেলাস সোনালী শরবতের মতন দুপুর। দুপুরের মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকালে সব যেন কিরকম আজব দেখায়। মুখের মধ্যে সুগন্ধি জর্দা দেওয়া পানের গাঢ় রস। কানের লতি গরম। পাশ দিয়ে বেশমি সুতো বেয়ে বেয়ে উঠেছে মাধবীলতা। আর বুধে আলতা ফুলের গুচ্ছগুলো দুলছিল অল্প অল্প হাওয়ায়। আকাশের রং ঠিক ওর আসমানি টাঙ্গাইল শাড়িটার মতন। সদ্য ভাঁজ ভাঙা, তাঁত থেকে নামা নতুন রঙ। চিলগুলো কালো কালো বিন্দু হয়ে সেই নীলের ভিতর ঘুরছে।

অলকা আস্তে ডেক চেয়ারটায় বসে পড়ল। ঘুমে তার দুচোখ ঝাঁঝরে আসছে। চোখ বন্ধ করে ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে বসে বসে নিজের গায়ের ঘামের গন্ধ, খোলা চুলের ঘুঁই তেলের সুরভি নিতে নিতে অলকা নতুন উঠে আসা পাড়ার ফাঁকা ফাঁকা মাঠ আর নতুন নতুন বাড়িগুলো দেখছিল।

ঠিক তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

অলকার উঠতে ইচ্ছে করছিল না।

সমীর বেরোনো পর্যন্ত তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয়। সমীরের হাতে হাতে, মুখে মুখে সব যুগিয়ে যাওয়া। কোনো প্রয়োজন নেই। তবুও। রাঁধুনী, একজন চাকর, একজন ড্রাইভার। সমীর অফিসের গাড়ি ব্যবহার করে। দুপুরে মার্কেটিঙে যদি যেতে ইচ্ছে করে অলকার, যদি কোনো বন্ধু বান্ধবের বাড়ি যেতে হয়, তাই ড্রাইভার থাকে।

কিন্তু অলকার বিশেষ কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

সারা সকাল, সারা সন্ধ্যে, সারা রাত্রি অলকা নিজের কোনো অস্তিত্ব বলে রাখে না। সকালবেলায় সমীরের জন্য প্রথম চা, লেবুর রস, অলকা এত যত্নে এত সুন্দর করে এনে দেয়, যে সমীরই এখন অন্যকারো হাতে আনা চা সহ্য করতে পারে না।

চায়ের পর খবরের কাগজ ও দাড়ি কামাবার গরম জল, ব্লেড, সাবান, ব্রাস্, রেজার সব হাতের কাছে এনে দেওয়া। ঘুরতে ফিরতে ঘরের অগোছালো টুক্ করে গুছিয়ে নেওয়া, মাঝে মাঝে রেডিও খুলে যদি সমীরের প্রিয় কোনো গায়ক থাকে খেয়াল রেখে তার গানটি শোনানো, একটু সাহিত্য আলোচনা, একটু বা পলিটিকস্—সমীরের রসের কথা শোনা। সমীরের অফিসের কোনো কৃতিত্বে, সপ্রতিভ উত্তরে আনন্দিত হওয়া,—অলকা এই সব করে। বিকেলে দু'ঘণ্টা সমীর বাড়িতে না থাকলেও সে সমীরের। তিনটে থেকে

পাঁচটা রান্না করে। সে আর রাঁধুনী দুজনে মিলে। দুবেলার যাবতীয় রান্না, জলখাবারের মিষ্টি, কেক্, পুডিং, পায়েস, স্যালাড। যাবতীয় আচার মোরব্বা। রাতে যখন টেবিলে সাজিয়ে দেয়, প্রতিদিন সমীর অবাক হয়ে যায়। অফিসে যখন ক্যারিয়ার খুলে লাঞ্চ খায় সব অফিসাররা নাকি হিংসেয় নীল হয়ে যায়।

সমীর বলে,

—তুমি এত সব কি করে যে করো? কখন করো?

অলকা হাসে.

—বাঃ গ্যাস ওভেন আছে, প্রেসার কুকার আছে, রেফ্রিজারেটার আছে!

—ও'ত সব বাড়িতেই আছে। কৈ কেউ ত অত সব রান্না করতে পারে না।

অলকা মাথা নীচু করে হাসে। হাসবার সময়েও সচেতন থাকে। যেন মাত্রা না ছাড়ায়।

তাই দুপুরে অলকা এত গা-ছাড়া। এমন অলস।

তাই ফোন আসতে অলকার উঠতে ইচ্ছে হল না। কারণ আজ সমীরের ফোন আসবে না। সমীর কোলকাতার বাইরে যাচ্ছে কি একটা ইন্স্পেক্সনে।

রং নাম্বার! মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে, একটু ভাবল অলকা। শুধু শুধু গায়ের আলস্য ভেঙে ওঠা। একেই কাল সারারাত ঘুম হয়নি। সমীর পার্টিতে গিয়ে অসম্ভব ড্রিংক্ করেছিল কাল। রাত্রে দু তিনবার বমি করেছে। ঠাণ্ডায় বার বার উঠে বারান্দা বেয়ে বাথরুমে যেতে হয়েছে সমীরের সংগে। সমীর কেমন যেন গুম্ মেরে ছিল কাল রাত্রে। হয়ত সত্যিই খুব নেশা হয়েছিল তার। হয়ত আপিসে বস্ খুব বকেছিল, কিংবা অত্যধিক ড্রিংক করবার পর যে মেয়েটির গায়ের ওপর ঢলে ঢলে পড়ে কথা বলছিল তার সংগে বিয়ে হয়নি বলে নিরুপায় রাগে ভিতরে ভিতরে গুমরোচ্ছিল।

সকালেও কেমন যেন রাগ রাগ ভাব। সমীর বেগে গেলে অলকা তাকে কক্ষনো ঘাঁটায় না। আজকেও চুপ করে ছিল। কথা বলেনি। নিঃশব্দে চা দিয়েছে। লেবুর রস। রেডিওগ্রামে চিন্ময় চাটুজ্জের গান বাজিয়ে শুনিয়েছে, তারপর দুটো টিফিন ক্যারিয়ার ভরে দিয়েছে খাবারে। কখন যে সমীর আজ বেরিয়ে গেল বুঝতেও পারেনি। বোধহয় যখন হাতে সাবান দিয়ে পিঁয়াজের গন্ধ তুলতে বাথরুমে ঢুকেছিল।

হঠাৎ অলকার মনে হ'ল সমীর ত কোনোদিন না বলে যায় না। না বিদায় নিয়ে।

আঃ, তখনো কিন্তু ফোনটা বাজছে। সেই আঁকড়ার মত।

অলকা উঠে গিয়ে ফোনটা তুলেই বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

—হ্যালো! হাঁ বলুন। কাকে চাইছেন?

উত্তরটা টেলিফোনের তার বেয়ে অলকার কানে পৌছোল। আর সংগে সংগে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে স্নায়ুর সূক্ষাতিসূক্ষ্ম প্রান্ত পর্যন্ত।

—তোমাকে শুধু তোমাকে!

ভারী, চাপা গলা। অনেকদিন না শোনা গলা। একটু কাশছে, টেলিফোনের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিশ্চয় অদ্ভুত হাসছে ও।

—আমি, আমি ঠিক···

কাঁপা গলায় অলকা বলল।

টেলিফোনের ওপাশে উঠল খিল্ খিল্ চাপা একটা হাসি। একটু যেন উপহাস মেশানো। যেন অলকার অসহায় কথার সুরটা লুফে নিয়ে বলল :

—চিনতে পারছ না ত? পারবেও না।

অলকা ভারী গম্ভীর একটু চাপা গলাটা আর একটু কান পেতে শুনল। চিনতে ঠিকই পারছে। পারবে না কেন? গলার স্বরের চেয়েও চেনা কথার ভংগি।

—শোনো, এই অলকা! আমি এখুনি যাচ্ছি। এখুনি—

অলকা চমকে উঠল। কি যেন বলতে চাইল। অনেকক্ষণ কিছু বলতেই পারল না। তারপর লাইনের ওপারে শুনল খট্ করে টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ।

অলকা চাপা হতাশ গলায় তখনও ফোনে মুখ লাগিয়ে বলে যাচ্ছে,

—অমল তুমি এসোনা, এসোনা, দয়া কর! দয়া কর!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অলকা আস্তে আস্তে বিছানায় এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

বিছানায় মুখ রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে তার মনে হল পায়ের তলাকার স্থির নিশ্চিন্ত ঘরের মেঝেটা আস্তে আস্তে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, মেঝে ঘুরছে, বিছানা ঘুরছে, দেওয়াল, কড়িকাঠ, আলোর বাল্ব, ড্রেসিংটেবল, স্টীলের আলমারী, মোরাদাবাদী ফুলদানীতে রজনীগন্ধার বাড়—সব, সব দুলে দুলে উঠছে। তার নিশ্চিন্ত সুখের সংসার, এখন মোচার খোলার মত দুলতে আরম্ভ করেছে। চারপাশে কি দারুণ অনিশ্চয়তা। কেন এতদিন পরে অমল এমন করে অলকার সুখের সংসার ভাঙতে আসছে।

অলকা বিছানার ওপর উঠে বসল। দু হাটু হাতে জড়িয়ে তাকাল ঘরটার দিকে। এখনই সে এই ঘর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তার মনে পড়ে যাচ্ছে সেই ময়দানে বসে চিনেবাদাম খাওয়ার কথা। চলন্ত বাসে-বসে সেভিস্ সিটে আর অমল ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সমানে কথা বলে যাচ্ছে। অফিসে মুখোমুখি বসে চিঠি মার্কা করতে করতে কথার শেষ না হওয়া সময়।

তখন রেস্তোঁরায় একটা ময়দার পুলটিস্ দেওয়া কাটলেট্ খেলে যেন উদ্ধার হয়ে যেত অলকা। ঘর্মাক্ত কলেবরে বাসে একটু বসতে পেলে হাতে স্বর্গ পেত। বিয়ের পর অমলের যে সিঁড়ির তলার ঘরে তাকে থাকতে হবে, সেই ঘরও সে মনে মনে সাজিয়ে ফেলেছিল। আর একথাও তার অজানা ছিল না যে বিয়ের পর তাকে চাকরিও করতে হবে। সেই সংগে ছেলেপুলের জন্ম আর হাঁড়ি ঠেলাও বাদ যাবে না। তখন অলকার সামনেই দেয়াল। দেয়াল অর্থাৎ চাকরি, অমল আর মোটামাপের ছাঁটাকাটা একটা রেডিমেড্ জীবন। বয়সের কথায় পলকে আকাশ হাতে পাওয়া আর হারানো। তোষামোদ আর মেনে নেওয়া আর ওটস্ দশটা পাঁচটা। তাই অলকা তার আটাশ বছরের পুরোনো যৌবনের মুখ চেয়ে অমলের বেশি আর এগোতে ভরসা পায়নি। তারও মধ্যেই একটু রোমান্স করতে চেয়েছে, কাল যে বর হবে আজ তাকে প্রেম পত্র লেখে। কাল যে ছেলের বাবা হবে আজ তার সংগে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে, অন্ধকার হলে দুচারটে সিনেমা দেখে।

কিন্তু পাথর চাপা কপালের পাথরটা হঠাৎ সরে গিয়েছিল একদিন বৃষ্টির সন্ধ্যেবেলা। অফিস ভাঙা ভিড়। সবে আকাশ ছাড়ছে। টিপ্ টিপ্ তখনো করছে। সিসে রঙের আকাশ। কাদাগোলা রাস্তা। ট্রামবাস বন্ধ। এর মধ্যে অমল হেঁটেই রওনা দিল বউবাজারের মোড়ে এক ছাত্র পড়াতে। জলে-কাদায়, প্রাইভেট গাড়ির চাকার সিচ্কারীতে যখন নিজেকে অপমানিত নিঃশেষিত মনে হচ্ছিল অলকার, তখনই সমীরের গাড়িটা এসে দাঁড়ালো ঠিক পাশে।

—কোন্ দিকে যাবেন ?

—ভবানীপুর।

—যদি আপত্তি না থাকে, এলগিন রোড পর্যন্ত লিফ্‌ট্ চাইতে পারে !

অলকা হ্যাণ্ডেল্ ঘোরাতে চেষ্টা করল।

সমীরই খুলে দিল। গাড়ীর হ্যাণ্ডল ঘোরাতে তখনও শেখেনি অলকা। প্রথম দিন সমীর এলগিন রোডেই নামিয়ে দিয়েছিল। তৃতীয়দিন বাড়ির গলির মুখে।

অলকা তাকাল চারদিকে। মুখের ভিতর কখন পান শুকিয়ে গেছে। ঠোঁটের ওপর কালচে একটা দাগ।

কয়েকদিন গাড়ি করে ঘোরবার পর অলকা বুঝতে পারল যে কি পিটুলি গোলা খেয়ে সে এতদিন ভুলেছিল। ময়দান আর লেক ছাড়া কলকাতায়, কলকাতার কাছে কত যে বেড়াবার জায়গা আছে। বারাকপুরের গান্ধীঘাট, ডায়মণ্ডহারবার, সোনারপুরে বাগানবাড়ি। আর খাবার ! মেয়েরা যা খুশে নাচে, গান গায়, পিয়ানো বাজায়। আশ্চর্য সুন্দর বাগানে আশ্চর্য রকম খাবার আসে। সুসজ্জিত মানুষেরা খায়।

অলকা বুঝতে পারলে পুরোনো চাকরিটা তাকে ছাড়তেই হবে। পুরোনো চাকরিতে মাইনে কম। উপরি বেশি। বিয়ে হবার পরে অলকাকে আট মাস ধরে পেটে বাচ্চা নিয়ে আপিস করতে হবে। ছেড়মাসের বাচ্চা রেখে আবার জয়েন করতে হবে। তারপর ?

মনে আছে শেষ যেদিন অমলের সংগে ময়দানে গিয়েছিল, কি বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা। চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে। ঘষড়ে ঘষড়ে হাঁটা, অমল কি সব বাঁধা গৎ আউড়ে যাচ্ছিল,—ঠিক তখনই অলকা ব্যাপারটাকে চূড়ান্ত করে ফেললে।

আর হঠাৎ মনে হল, গলা কেন, বুকের ভিতর অবধি যেন তার শুখিয়ে গেছে। কতদিন অলকা দুপুর দেখেনি। সোনালী বিকেল দেখেনি। দুপুরে স্নান করে উঠে, অনেকক্ষণ ধরে পাখার ঘরে বসে একটু একটু করে খেয়ে আরাম করে পর্দা ফেলা ছায়া ছায়া একটা ঘরে কিছু না করে শুয়ে থাকেনি।

অলকা আর দ্বিধা করলে না। মনে মনে সেইদিনই সমীরকে সম্মতি জানিয়ে রাখলে।

এখন বুক পুড়ে যাচ্ছে অলকার। দুশ্চিন্তায়, আতংকে। কেন অমলের কাছ থেকে চিঠিগুলো চেয়ে নেয়নি অলকা ? আচ্ছা সমীর কাল অত ড্রিংক করল কেন ? কেন কথা বলল না অলকার সংগে ভালো করে ? অমল কি সমীরের ওখানে গিয়েছিল নাকি ? যেতেই পারে ! কলকাতা থেকে কলকাতা। কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু, এতদিন পরে ? তিন বছর পরে ? কেন ?

শেষ পর্যন্ত চাকরিটা যাবে।

অলকা হঠাৎ ভাবল। সমীরের কাছে থাকার এই চাকরি। সমীরকে সারাদিন অলকা যে সেবা করে তা ত কৃতজ্ঞতা থেকে। সমীর তাকে হাজার অনের কাছে উঞ্ছবৃত্তি থেকে বাঁচিয়েছে বলে। সারাদিন রাত্রি চাকরির পর এই দুপুরটুকুর শান্তিই অলকার মাইনে। আর উপরি ? আলমারি ভরা শাড়ি, গয়না। সমীরের নির্ভরতা। ভালোবাসা।

ভালোবাসা ! অলকার বুকের ভিতরটা টন্‌টন করে উঠল। যদি সেও সমীরকে ভালোবাসতে পারত। না, পারবে না। তাহলে অত সচেতন থাকত না। সে নিজে যে গরীব কেরানীবাড়ি থেকে এসেছে, সুন্দর নয়, ভালো ইংরেজি বলতে পারে না। সমীর যে তাকে জাতে তুলেছে। এসব কিন্তু ভুলতে পারে না সে। সমীরের ওপর অভিমান করতেও ভয় পায়।

বেল্ বাজছে : কলিংবেল্। অলকার বুকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তার আওয়াজ চিরে চিরে যাচ্ছে।

অলকা নড়তে পারল না। শক্ত হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ড্রেসিং টেবলের সামনে। তারপর ধীর পায়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

সামনে সমীর।

—তুমি ?

সমীর হাসছে।

—জ্বর জ্বর করছে তাই চলে এলাম। এমন সর্দি বসে গলাটা বসখসে হয়ে গেছে যে তুমি পর্যন্ত ফোনে বুঝতে পারোনি।

অলকা বাষ্পিক গলায় প্রশ্ন করল।

—তুমি ইনস্পেকসনে যাওনি ?

—গেলাম আর কোথায় ! কাল রাত থেকে ভালো করে কথা বলছে না। ভাবলাম রাগ হয়েছে, তাছাড়া যার যার বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডাগরমে জ্বর, বাড়িতেই যাই !

অলকা মাথা নীচু করল।

—কেন ? তুমি আর কাউকে এক্সপেক্ট করছিলে বুঝি !

—অলকা মুখ লাল করে বলল,—যাও, ওরকম কথা আমাকে কখ্খনো বলবে না। বলেই চমকে উঠল। জীবনে এই প্রথম সে সমীরের উপর রাগ করল।

• • •

সেবার নরওয়েতে খুব শীত পড়েছে। রাস্তায় বরফ জমে গেছে। গাড়ী চলাচল বন্ধ। সমস্ত শহরটা যেন শীতে হি-হি করে কাঁপছে।

হেন্‌রিক্ জোহান্ ইবসেন একটু কাজে গিয়েছিলেন বাইরে। দারুণ শীতে পথ চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।

সব বাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, একটি আস্তাবলের মধ্যে কয়েকটি ছেলেমেয়ে আগুন জেলে কি যেন করছে।

তিনি উত্তাপ নিতে সেখানে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"কি করছ তোমরা ?"

একটি মেয়ে উত্তর দিল, "আমরা পুতুল খেলা করছি। এটা আমাদের 'ডাল হাউস'।

সেইদিনই ইবসেন তাঁর বইয়ের ঐ নাম রাখলেন।

দিন পালটেছে

রাধারমণের ঝিত্ত

প্রিজন্ ভ্যানটা সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ ইনসপেকটার প্রশান্ত প্রামাণিক এসেছেন, থানার দারোগা আর দু'জন সেপাই সঙ্গে নিয়ে।

বাড়ীর ভিতর থেকে আমাকে বাইরের বারান্দায় আসতে দেখেই ওঁরা দাওয়ায় উঠলেন।

অভ্যর্থনা জানালাম—সুপ্রভাত। আসুন।

প্রৌঢ় ইনসপেকটার জবাব দিলেন—সুপ্রভাত। একটা আনপ্রেজেন্ট্ কর্তব্য নিয়ে এসেছি।

শুকনো হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করলাম—কি ব্যাপার?

—নিরাপত্তা আইনের ওয়ারেন্ট আছে।

বিস্মিত হলাম—আমার নামেই! আমার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গতবার ছিল ভারতরক্ষা আইন। এবার নিরাপত্তা। আই অ্যাম রিগ্রেট্‌ফুল সরি।

ঘরপোড়া গরু ছাঁদা দেখলেই চমকায়। স্ত্রী ললিতা দরজায় লক্ষ্মী-গাড়ি দেখে নড়বে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

ওধার থেকে বড় ছেলে ব্রজেন্দ্র এসে দাঁড়াল। তার দু'চোখে বিস্ময় এবং ক্ষোভ। কয়েকদিন হল ছুটিতে এসেছে। হোস্টেলে থাকে। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র। সেই সঙ্গে আইনও পড়ছে। আগে রাজনীতির ধারেকাছে থাকতো না। কিন্তু কিছুদিন আগে বাপকে ডি. আই. রুলে গ্রেপ্তার হতে দেখে রীতিমত বামপন্থী হয়ে উঠেছে। পুলিশ ইনসপেকটারের দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললে—দিন পালটেছে।

প্রৌঢ় পুলিশ অফিসার কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলেন, তারপর ব্রজেন্দ্রর কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বললেন—আমরা হুকুমের চাকর। ওপরআলা যা হুকুম করেন আমরা তা তামিল করি। তার বেশি কিছু জানি না, বুঝি না।

ব্রজেন্দ্র মা আবেদনের ব্যথা নিবেদন করলে—সেবারও আপনিই এসেছিলেন ওঁকে গ্রেপ্তার করতে। এবারও তাই। অথচ কংগ্রেসী রাজত্ব গিয়ে এখন তো বামপন্থীদের রাজত্ব। দিন পালটেছে। তবু কেন ওঁকে এভাবে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে? ওঁর বিরুদ্ধে পুলিশের রিপোর্ট কি এতই খারাপ?

পুলিশ ইনসপেকটারের কণ্ঠে সহানুভূতির সুর ফুটল—আমার কোন আলোচনায় যাওয়া উচিত নয়। তবু বলছি। রামচন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশের কোন অভিযোগ নেই। উনি স্মাগলার নন, ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার নন, ক্রিমিন্যাল নন। ওয়ারেন্ট দেখে মনে হচ্ছে, খাদ্যশস্যউৎপাদক হিসেবে আইন অমান্য করেছেন।

হেসে বললাম—তাহলে ঠিক আইন অমান্য করে নয়, আইনের মানে সঠিক বুঝতে না পারার অপরাধে। অথবা তারই ছল ছুতোয় পড়ে।

ব্রজেন্দ্র আক্ষেপ করলে—আশ্চর্য! আমরা কেউ কিছু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলাম না।

ললিতার ক্ষোভ আরও গভীর—তুই এবার ভেবে দেখ্, বোকা! আমাদের কথা না শুনে লেখাপড়ার ক্ষতি করে বামপন্থীদের হয়ে এত খাটলি, তাদের হাতে রাজত্ব তুলে দিলি। দেশের হাল পালটালি। কিন্তু তারপর?

শান্তভাবে বললাম—ললিতা, ওরা বলে দিন পালটেছে। কংগ্রেসী আমলে নীতিহীন কোটিপতির শোষণে আর বামপন্থী আমলে প্রলেতারিয়েট শাসনে মরতে বসেছে মধ্যবিত্ত মানুষ। অথচ এই মধ্যবিত্তের কাঁধেই বন্দুক রেখে এরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ অফিসার ভদ্রভাবে তাগিদ দিলেন—দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন এবার।

সহজ ভাবেই বিদায় চাইলাম ললিতার কাছে—আসি। ভগবানের নাম নিয়ে চ'লো, দুদিন কেটে যাবে। চলি।

কান্না চেপে ললিতা বললে—আমি জানি, তুমি কোন দোষ করোনি। বিনা দোষে বিনা বিচারে বারবার তোমাকে জেলে বন্দী করা হচ্ছে। কোন রাজত্বেই কি আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো না?

চোখের জল লুকোতে ললিতা মুখ ফেরালো।

ব্রজেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললাম- বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ভেবেছিলাম দিন পালটালো। কংগ্রেসী রাজত্বে মধ্যবিত্ত হয়েও হাসিমুখে জমিদারী উচ্ছেদ আইন মেনে নিয়ে বাড়তি জমি সরকারকে ছেড়ে দিলাম। ভেবেছিলাম, ক্ষতিপূরণ পাবো আর তাই দিয়ে সংসার প্রতিপালনের কোন ব্যবস্থা করব। কিন্তু বারো বছরেও সরকারী ক্ষতিপূরণ পাওয়া গেল না। এদিকে কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ বেনামদারের জন্যে দুর্নাম ঘাড়ে চাপলো। সৎ আদর্শের পুরস্কারের বদলে পেলাম জোতদারবিরোধী দমননীতি। ভারতরক্ষা আইনের খাঁড়া পড়ল ঘাড়ে।

চোখের জল সামলে নিয়ে ব্রজেন্দ্র বললে—আর এবার?

—এবার বর্গাদার-উচ্ছেদ-বিরোধী আইন। বর্গাদার এই সুযোগে যা খুশী তাই করতে পারে, তাতে মধ্যবিত্ত কৃষিজীবীর উচ্ছেদ ঘটবে। খাদ্যসংকট বাড়বে, বেকার সমস্যা আরও তীব্র হবে। বাঁচার তাগিদে এই সহজ সত্যি কথাটা বলতে সুরু করেছিলাম। তাই বোধ হয় এই নিরাপত্তা আইনের প্রকোপ।

গ্রামের রাস্তায় ভিড় দেখে পুলিশ বাহিনী ব্যস্ত হল। আর কথা বাড়ালাম না। জনতার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বিদায় নিলাম। তারপর সশস্ত্র পাহারায় জালঘেরা কালো গাড়িটায় গিয়ে উঠলাম।

বীরভূমের প্রান্ত থেকে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর জেল। বীরভূমের সদর সিউড়িতে নিরাপত্তা আইনের বন্দীদের রাখার বন্দোবস্ত নেই। তাই সিউড়ি থানায় কয়েকের বিরতির পর সুরু হল দীর্ঘ পথের পাড়ি।

গাড়ির মধ্যে বসে এলোমেলো চিন্তার মধ্যে অতীতের অনেক কথাই মনে হতে লাগল……

* * * *

বিয়াল্লিশ সালের সকাল।

করালী ঘোষের দরজায় লালপাগড়ীর সার। প্রধান কংগ্রেসকর্মী করালীর গলায় মালা পরাতে

এগিয়ে গিয়েছিল রামচন্দ্র। পুলিশের দলকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিরীহ রামচন্দ্র চীৎকার করেছিল—বন্দে মাতরম।

শান্তশিষ্ট রামচন্দ্রের ভাবাবেগ দেখে বিস্মিত মুগ্ধ হয়েছিলেন করালী ঘোষ। তার পিঠে হাত রেখে নিজের বাড়ির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেছিলেন—এরা রইল। এদের দেখো।

রামচন্দ্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

পিতৃ-মাতৃহীন রামচন্দ্র ওয়ারিশনসূত্রে মাতব্বরি জমিদার। বালিকা বধূ ললিতার মাধ্যমে চার বছর ধরে করালী বাবুর সংসার চালিয়েছিল তাঁর কারাবাসের সময়।

চাকা ঘুরলো। করালী বাবু জেল থেকে ফিরলেন। মুক্তির দিনে মালায় মালায় ছেয়ে গিয়েছিল কারামুক্ত পল্লীনায়কের কণ্ঠদেশ। কিন্তু রামচন্দ্রের মালার টাটকা গন্ধটি করালী বাবুর গলায়।

তারপর হাওয়া বদলালো খুব দ্রুত। করালীবাবু এম-এল-এ হলেন। দেশ ভুঁয়ের কপাল ফিরলো। গ্রামে গ্রামে রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল, পোস্টাপিস হল। করালী বাবুর ঘরবাড়ির চেহারাও ফিরলো, তাঁর চালচলন ভারিক্কি হল। কথাবার্তার সুরও হল অন্য রকম।

অন্যদিকে বিরোধীদলের নেতা সুধীর মণ্ডল বিরোধিতায় আরো উগ্র হয়ে উঠলেন। তাঁর ঠোকাঠুকি চলল করালী বাবুর সঙ্গে। পরস্পরকে অপদস্থ করার লড়াই সুরু হল। রাজনীতির জায়গায় কুটনীতি এলো। অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য শিক্ষার সংকট মোচনের চিন্তার জায়গায় এলো উন্নয়নের পেডাগগি। সোস্যালিজমের নতুন নতুন বুলি আর ব্যাখ্যা সংগ্রহে মন দিলেন দুই নেতা। কোটিপতিদের টাকায় ভোট করার পলিসিতে আর দিন-মজুরদের ভোট পাবার ধান্দায় দুই নেতাই মধ্যবিত্তের নিরুচি সুরু করলেন। সহজ হল অশিক্ষিত সমাজের রাজনীতি।

মুসকিলে পড়ল রামচন্দ্র। মধ্যবিত্ত ভোটদারদের সংঘবদ্ধ করবার জন্যে পাড়ায় পাড়ায় ডাক দিয়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু মধ্যবিত্তের এই বাঁচার লড়াইকে সুনজরে দেখলো না রাজনৈতিক দলগুলি। সিংহাসনারূঢ় দলের নির্দেশে ভারতরক্ষা আইনে বন্ধ হল রামচন্দ্রের মুখ।

কালের চাকা চলতে লাগল। একদিন ছাড়া পেল রামচন্দ্র। বাড়ি ফিরে দেখল, বামপন্থী নেতা সুধীর মণ্ডল জেলে চলেছেন। যাবার আগে গোপনে 'মহৎ মহানুভব' রামচন্দ্রের কাছে অনুরোধ জানিয়ে গেলেন, তাঁর সাথী নরেন দাসও তাঁর সঙ্গে জেলে যাচ্ছে, নরেনের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী পুতুলরানীকে দেখবার কেউ রইল না, রামচন্দ্র যেন পুতুলরানীর খাওয়াপরার ব্যবস্থা করে।

কমরেড সুধীর মণ্ডলের অনুরোধ রাখলো রামচন্দ্র। পুলিশের চোখে নিজেকে রাজনীতির সংস্রব থেকে মুক্ত দেখাবার জন্যে সে জোতের কিছু জমি নরেন দাসের নামে ভাগচাষে রেখে পুতুলরানীকে দিয়ে তদারকি করাতে লাগল। তারপর· · ·

সুধীরবাবু সময়মত জেল থেকে বেরুলেন। নরেন দাসও ছাড়া পেল।

তারপর জমানা বদল হল। সুধীর মণ্ডল বিপুল ভোটাধিক্যে বিধান সভায় ঢুকলেন। কংগ্রেস গদীচ্যুত হল। কিন্তু রামচন্দ্র তার ভাগচাষের জমি আর ফিরে পেল না। নরেন দাস জমির দখল ছাড়ল না। কৃতজ্ঞতার ঋণ ওরা এমনি করেই শোধ দিলে। নেতাদের কাছে রামচন্দ্রের ধরনা দেওয়া বিফল হল। করালী বাবু শুনে বললেন—যাও, আরো বেশি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মদত যাও গে।

সুধীর মণ্ডলের কাছে গিয়ে রামচন্দ্র বললে, আপনার অনুরোধ রাখতে গিয়েই আমার এই হাল। আপনার প্রধান চ্যালা হল নরেন। তাকে আমার জমি ছাড়তে বলুন।

অমায়িক হাসি হেসে সুধীর মণ্ডল বললেন—অনেকদিন ওদের ভোগ করেছেন। আর কেন! ওদের জিনিস ওদের ছেড়ে দিন।

কমরেড সুধীর মণ্ডলের হৃদয়হীন অবজ্ঞায় মর্মাহত হয়ে নিরুপায় রামচন্দ্র নতুন করে তার কথা বলতে শুরু করল। ছোট বড় মাঝারি জোতদারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমবায়ের মাধ্যমে অস্তিত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানালো। তার এই কার্যক্রম বরদাস্ত করতে পারলো না রামপল্লীবাসীদের চাইরা। চূড়ান্ত নেমক-হারামি করল নরেন ঘাস। তারই ফুসলানিতে দ্বিতীয়বার জেলের কালো গাড়িতে উঠেছে রামচন্দ্র।

পুতুলরানী কিন্তু নিমকহারামি করেনি। গ্রিজন ভ্যান যখন এলো তখন রামচন্দ্র ছিল খামারবাড়িতে। পুলিশের গাড়ি দেখেই সে ছুটে গেল সেখানে। ইসারায় ডাকল রামচন্দ্রকে। তার ইসারা পেয়ে কৃষাণদের আসর ছেড়ে উঠে এলো রামচন্দ্র। পুতুলকে এখানে এভাবে দেখে আবার রামচন্দ্রের বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল—যেমন করেছিল আর একদিন……

রামচন্দ্রের মনে পড়ে। নরেন তখন জেলে। নরেনের নামে পত্তন করা হালকুষানীর ফসল নিতে পুতুল এসেছে খামারে।

পৌষ মাস লক্ষ্মীর মাস। ক্ষেতে খামারে লক্ষ্মীর আলপনা। ত্রিসন্ধ্যা নয়, সারাক্ষণই লক্ষ্মীর পুজো। ঘরের পায়রার বকবকম, বনের ঘুঘুর ঘুঘুচু, ঘুঘুচু, কুজন চলে সারাদিন। রাত্রে চলে পেঁচার হুঙ্কার, ইঁদুরের বিয়ে। তবে দুপুরের বাহার আলাদা। পৌষের দুপুর। কাঠঠোকরাদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ওঠে তালে তালে…খুঁজছি, খুঁজছি, খুঁজছি—একটানা সুরের উত্তরে দূরের কোন গাছ থেকে উত্তর আসে—খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। সেই সঙ্গে সেরেস্তর গোলাঘরের টেকিশাল যেন পাল্লা দিতে চায়—ভানছি, ভানছি, ধান ভানছি। খামারে ধান মাপার আওয়াজেও সুর থাকে যেন—আয়, আয়, দুই, দুইয়ো, তিন, তিনো… আঠারো…দু' আঠারো…রাশ বাড়ে, বাড়ুক রাশ। তালে তালে ধান পেটানো চলে সেই সঙ্গে— আয় সব, কপাকপ, সপাসপ।

প্রকৃতির প্রাচুর্যে প্রত্যেকের মনে যেন উদার আনন্দ। হীনদরিদ্রের মনেও সাড়া জাগায় মানুষের এই দিলদরিয়া মেজাজ। কেলটিভ্যাল মুড কথাটার পূর্ণ তাৎপর্য ফুটে ওঠে পালপার্বণে ভরা বাংলার পৌষ মাসে।

এমনি একটা দিনে অমন একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়াই হয়ত স্বাভাবিক।

সেদিন দুপুরের দিকে কৃষাণরা কাজ থামিয়ে খামারের মাটিতে পেতে বসল। নিজের নিজের থানের পালুই-এর খেরদায় দুপুরের খাবার নিয়ে এসেছে ওদের পরিবার। বড় বড় জামবাটি আর গামলায় আছে পান্তাভাত, চচ্চড়ি, চুনোমাছের চুটচুটি, কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচা লংকা। সুপসাপ শব্দে বোঝা যায় ওদের তৃপ্তির আমেজ। রামচন্দ্র বাড়িতে খেয়ে এসেছে, সরু চালের গরম ভাত, কপির ঘন্ট, মুগের ডাল, পোনামাছ ভাজা, কই মাছের ঝাল, বড়িপোস্ত, টোমাটোর চাটনি।

কৃষাণরা খেতে লাগল। রামচন্দ্র নিরালায় গিয়ে একটা খড়ের গাদার ওপর বসল। এমন সময় পুতুলরানী এসে হাজির। ঐ পরিবেশে পুতুলকে কাছে পেয়ে রামচন্দ্রের বুকের ভিতরটায় গুর গুর করে উঠল, পুতুলের আটাশ বছরের সুপুষ্ট দেহের সান্নিধ্যে নিজেকে সামলে নিতে তাকে বেগ পেতে হল। নীরবতার সংকোচ কাটাতে গিয়ে সে তোৎলাতে লাগল—এর মধ্যেই তোমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল?

পুতুল তার মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানল। মাথা নীচু করে নীচু গলায় উত্তর দিলে—না। খিদে নেই।

—শরীর খারাপ ?

হাসি নয়, উপহাস মেশানো পুতুল—বাজার আবার শরীর খারাপ !

ওর আক্ষেপের অভিব্যক্তিতে চুপ করে গেল রামচন্দ্র। একটু পরে সান্ত্বনা দিতে চাইল—মরেন শিগগিরই জেল থেকে ফিরবে। তারপর তোমরা দু'জনেই ভাল করে ডাক্তার দেখিও।

—আমি ডাক্তার দেখিয়েছি। একটু থেমে চোখ তুলে তাকাল পুতুল। বললে· ডাক্তার বলেছে আমার কোন দোষ নেই।

আরও কাছে সরে এলো পুতুল। উঠে দাঁড়াল রামচন্দ্র। সামনাসামনি হয়ে কথা বলতে চেষ্টা করল। পারল না। পুতুলের সুডৌল হাতের রুপোর কাঁকনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তার দু'চোখের দৃষ্টি গিয়ে আটকালো পুতুলের হলুদসাড়ী ঢাকা নরম আদুড় গায়ের ওপর। দেখতে দেখতে অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল রামচন্দ্র। তারপর আগুন ছুটে গেল ওর শিরায় শিরায়, স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, স্থান কাল পাত্র পাত্রীর হিসাব ভুলে গেল··· ··· ···

রামচন্দ্রের সুখস্বপ্ন ভেঙে দিল পুতুল। ভয় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে সে আজ এসেছে। আজ আর সে অভিসারিকা নয়। বললে—শুনছ, তুমি পালাও শিগগির ··

—কেন ?

—পুলিশ এসেছে তোমায় ধরতে। গা ঢেকে পালিয়ে যাও কিছুদিনের মত।

—পুলিশ ?

—হ্যাঁ। এদের দল ষড়যন্ত্র করেছে তোমায় জেলে পাঠাতে। আমি ঝগড়া করেছিলুম। তাই পুলিশ আসার খবরটা লুকিয়েছে আমার কাছে।

—কোথায় রয়েছে পুলিশ ?

—পুলিশের গাড়ী দাঁড়িয়েছে তোমার দুয়োরে।

—তাহলে আর উপায় নেই। ললিতার সঙ্গে দেখা না করে তো কোথাও যেতে পারব না।

—যা বলবার আমাকে বলে দিলে চলবে না ?

—না। তা হয় না।

পুতুল কেঁদে ফেললো—আমার জন্যেই তোমার এই শেষো। তা, তুমি দরজা দিয়ে যেও না। খিড়কি দিয়ে যাও। বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখা করে যেও।

পুতুলের শেষ অনুরোধ রাখল রামচন্দ্র। খিড়কির দরজা দিয়েই ঘরে ফিরলো।

• • • •

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পিচঢালা মসৃণ রাজপথে ছোট একটা গর্তে ঝাঁকানি খেলো প্রিজন ভ্যানটা। সেই ঝেঁচকাতে আমার খেয়াল হল, আর ওসব মিষ্টি কথা ভাবা চলবে না। আমি কয়েদী। দিন পালটেছে।

মধুকরবৃত্তি

শ্রীস্বরথনাথ ঘোষ

সরকারী অফিস হলে কবে পেন্‌সন্ হয়ে যেতো অনিমেষবাবুর। এখন ভোরে উঠে নিজেই ষ্টোভ জেলে চা তৈরী করে খেয়ে, লাঠিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মরনিং ওয়াক ক'রে শরীরটাকে মজবুত রাখার জন্যে। পার্কে দু' তিনটা চক্কর মেরে ক্লান্ত হলেও বাসায় ফিরে না এসে বেঞ্চিতে বসে মুক্ত বায়ু থেকে যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ অক্সিজেন টেনে নিয়ে পরমায়ু বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। যাতে সরকারী পেন্‌সনের টাকাটা ঘরে বসে দীর্ঘদিন ভোগ করতে পারেন। অর্থাৎ রবিবারের মত প্রতিদিন বেলায় খেয়ে দেয়ে তুলতে তুলতে দিবানিদ্রা দিয়ে, তামাক টেনে, বৈকালিক চা স্ত্রীর হাতে খেয়ে তারপর হয় রামকৃষ্ণ-মিশনের ধর্মকথা শুনতে যেতেন, নয়ত লেকের ধারে সমবয়সী পেন্‌সনভোগীদের দলে ভিড়ে দেশের ভবিষ্যৎ, রাজনীতি, যুক্তফ্রন্ট, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক অধঃপতন ইত্যাদি ইত্যাদি আলোচনা করে সময় কাটিয়ে দিতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অনিমেষবাবুর বয়েসটা যদিচ সরকারী চাকরীর শেষ সীমানা অতিক্রম করে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, সামনের মার্চ্চে সোত্তর পেরিয়ে তিনি একাত্তোরে পড়বেন, তবু আরাম কাকে বলে জানেন না। এখনো ট্রাম বাসের ভীড় ঠেলে আপিসে না গেলে বেজাজটা যেন ঠিক থাকে না। আর এই জন্যেই সংসারে যত অশান্তি।

ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, নাতি-নাত্‌নিরা সবাই তাঁকে নিষেধ করে কিন্তু কারুর কথাই তিনি গ্রাহ্য করেন না। স্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে মনোমালিন্য, কথাকাটাকাটি নিত্য লেগেই থাকে। তিনি বলেন, কি দরকার এখনো তোমার এত কষ্ট করার! তারপর ট্রাম বাস্ থেকে নামতে গিয়ে হাত পা ভেঙে এই বুড়োবয়সে যখন রাস্তায় পড়ে থাকবে তখন কি হবে! শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে তোমার ভাবনা কি! দু দুটো ছেলেকে মানুষ করে দিয়েছো, তারা আঁচলা আঁচলা টাকা আনছে, ঘরে বসে দু'টো দিন সুখ ভোগ করে নাও, তা নয় আপিস, আর আপিস। বলি চুলোর আপিসে তোমার কি মধু আছে শুনি?

'মধু' কথাটা কানে যেতেই অনিমেষবাবুর বুকের মধ্যেটা যেন ছাঁৎ করে ওঠে অজান্তে। বুঝি তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে আসল কথাটা বেরিয়ে পড়েছে। তাই প্রসঙ্গটা দ্রুত অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বাড়ীতে বসে না থেকে আপিসের চেয়ারে গিয়ে বসা। তাও বেলা দুটো থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত। কাজের মধ্যে গোটাকতক লেখা পড়ে দেখা।

স্ত্রীর মুখ দিয়ে যেন একঝলক আগুন ছিটকে পড়ে। বলি তার জন্যে বুঝি, চোখ, কান, মাথার দরকার হয় না?

অনিমেষবাবু এর জবাবে কি বলবেন, যখন ভাবতে থাকেন তখন গৃহিণী তাঁর গলা পায়ে একপর্দা চড়িয়ে বলেন, জানো আজ তোমার এই কাজের জন্যে দাদা তোমার ওই আপিস। চশমা খুললে, চোখে কিছু দেখতে পাও না। একটু ঠাণ্ডা লেগেছে কি সর্দি কাশি হাঁপানী সব কিছু ওই আপিসের জন্যে।

কথাটা হয়ত সত্যি। অনিমেষবাবুর চাকরী কোন সরকারী দপ্তরে নয় কিংবা সওদাগরী কোন বিরাট অট্টালিকার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রকোষ্ঠেও নয়। উত্তর পাড়ুলী লেনের একটা অন্ধগলির মধ্যে কোম্পানীর আমলের এক পুরানো তিনমহলা বাড়ীর পিছনের দিকে স্যাঁতস্যাঁতে লোনাধরা দেওয়ালঘেরা বড় বড় সাবেকী ধরণের তিনখানা কামরা চণ্ডীমোণ্ডপের একটা অংশ, খানিকটা খোলা উঠোন, পুরনো ছুটো পাইখানা ও তার সঙ্গে বিরাট চৌবাচ্চা নিয়ে 'বসুন্ধরা' প্রেস ও 'বসুন্ধরা' মাসিক পত্রিকার আপিস। এই পত্রিকার সম্পাদক প্রেসের মালিক হলেও তার গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ ইত্যাদি নির্বাচনের সম্পূর্ণ ভার অনিমেষবাবুর ওপর। তাঁর সাহিত্যবিচারের ওপর সম্পাদকের এতদূর অগাধ বিশ্বাস যে অনিমেষবাবুর বিরুদ্ধে কখনো একটি কথাও তিনি বলেন না। তিনি জানেন এই অনিমেষবাবুর জন্যই তাঁর কাগজের যা কিছু সুনাম, খ্যাতি প্রতিপত্তি। উত্তম রচনাই মাসিক পত্রিকার প্রাণ। সেই প্রাণটি, সত্যি কথা বলতে কি, রক্ষা করে চলেছেন তিনি।

দিনের বেলা টেবিললাইট জ্বালিয়ে ঘরের একটা কোণে টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত লেখা নিয়ে পড়তে থাকেন অনিমেষবাবু। যেটা অপছন্দ হয়, তার কোণে ছোট্ট একটা ছাপানো স্লিপ এঁটে কেরাণীর কাছে পাঠিয়ে দেন। সে ঠিকানা দেখে যদি সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে, তাহলে লেখকের কাছে ফেরৎ যায়। নইলে জঞ্জালের বাক্সে ছিঁড়ে ফেলে।

দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে এই ঘরে বসে কাজ করার ফলে যে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে একথা তিনি জানেন না এমন নয়। এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অনেক আগেই তাঁর আলোচনা হয়েছে। অনিমেষবাবু তখন স্ত্রীকে বুঝিয়েছিলেন বড় খোকার একটা ভাল চাকরী হলেই ছেড়ে দেবেন কাজ।

এদিকে সত্যিসত্যি জ্যেষ্ঠপুত্র যখন ভাল চাকরী পেয়ে দিল্লী চলে গেল, তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, ছোট খোকাটার একটা হিল্লে করে তারপর নমস্কার করবো এই বসুন্ধরা-কে।

ছোট ছেলে যখন শিবপুর থেকে পাশ করে ইণ্ডোজার্মান কোম্পানীতে ভাল মাইনের চাকরীতে বহাল হলো তখন স্ত্রী রেগে উঠলেন, আর কেন, শরীরটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছো কি?

এবার ছোট মেয়ের লেখাপড়ার দোহাই পাড়তে গেলে অনিমেষবাবু স্ত্রীর কাছে ধমক খান। বলেন ওর জন্যে আর তোমায় ভাবতে হবে না। ওর মাথার ওপর দাদারা আছে।

অনিমেষবাবু বলেন, তবে কি জানো, এ হলো মধুর চাকরী। চাকরী ত? তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্ত্রী বলেন, এই বাগবাজার থেকে ট্রাম বাস ঠেঙিয়ে দেড়ো পর্যন্ত রোজ যেতে আসতে হয় ত জীবন বিপন্ন করে?

আমতা আমতা করে জবাব দেন অনিমেষবাবু, তা ঠিক। তবে বাড়ীতে দিনরাত বসে থাকলে এ বয়সে শরীর আরো খারাপ হবে। একটু কাজকর্মের মধ্যে থাকাই ভালো। আমি ডাক্তার পালকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। তিনিও ওই কথা বললেন।

কি মধু আছে তোমার ওই চাকরীতে জানি না যে মরে যেতে হবে। যা ভাল বোঝ কর বলতে বলতে কণ্ঠের ঝাঁজ চেপে নিয়ে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে যান তিনি।

সত্যি মধু যেন লুকিয়ে আছে সেই লেখার কাইলের স্তূপের মধ্যে, অনিমেষবাবুর মনটা মধুকরো

মত ছোটে তারি লোভে। অদ্ভুত ক্ষমতা অনিমেষবাবুর! বেড়াল যেমন আঁশটে গন্ধ হাওয়াতে পায় এবং বন্ধবার মধ্যে দিয়ে গলে একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হয়, অনিমেষবাবুর স্বভাবটাও ঠিক তেমনি।

প্রতি ডাকে যে রাশি রাশি লেখা এসে টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত হয়, ঠিক তার মধ্যে থেকে অশ্লীল গল্পগুলিতে আগেই তাঁর হাত গিয়ে পৌঁছয়। লম্বা খামের ভেতর আষ্টেপিষ্টে মোড়া সেইসব কাহিনী যেন দূর থেকে হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকে। নতুন লেখকদের হস্তাক্ষর দেখলেই তিনি চিনতে পারেন। তরুণ লেখকদের কাঁচালেখা তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রিয়! বানান ভুল, ব্যাকরণের কোন জ্ঞান নেই, একসঙ্গে হয়ত দুটো লাইনও শুদ্ধ করে লিখতে জানে না যে সব লেখক লেখিকারা, তাদের গল্পও বাদ যেন না। বরং আরো বেশী মনোযোগ দিয়ে পড়েন। তিনি জানেন এই সব লেখকরা যখনই কিছু লিখতে যায় নিজের অভিজ্ঞতা তার মধ্যে কিছু না কিছু এসে পড়বেই পড়বে। নিছক কল্পনার সাহায্যে লেখার ক্ষমতা অর্জন করতে দীর্ঘদিনের অনুশীলনের প্রয়োজন। নতুন লেখা মানেই নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা।

তাই টেবিল লাইটটা জেলে পুরু চশমার কাছে রঙীন সুদৃশ্য লাইনটানা প্যাডের কাগজ উঁচু করে ধরে যেন তিনি লেখার মধ্যে ডুবে যান। কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না। এক একটা গল্প পড়তে পড়তে গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে, এত অশ্লীল, তবু ছাড়তে পারেন না। শেষ লাইন পর্যন্ত পড়েন। এইভাবে এক লেখা শেষ করেই মুখে ছিঃ ছিঃ করতে করতে আবার একটা খামের মুখ ছিঁড়ে তার ভেতর থেকে রঙীন ছটানা কয়েকটা পাতা টেনে নিয়ে পড়তে থাকেন।

একদিন হরিচরণবাবু কি একটা দরকারী কথা বলতে এসে স্তম্ভিত হয়ে যান। অনিমেষবাবুর চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেও তিনি জানতে পারেন না যে মালিক এবং সম্পাদক স্বয়ং তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি তেমনি তন্ময় হয়ে সেই নতুন লেখকের গল্পের মধ্যে ডুবে থাকেন।

মিনিটখানেক নীরবে অপেক্ষা করে তারপর মুচকি হেসে তিনি প্রশ্ন করলেন, এত মনোযোগ দিয়ে কার লেখা পড়ছেন? দেখি—

ছ্যাঃ ছ্যাঃ এত অশ্লীল, মানুষ কলম দিয়ে লেখে কি করে বলতে পারেন? এই বৃদ্ধ বয়সে অনিমেষবাবুর চোখ দিয়ে শরম ঝাঁজ বেরোয়, তোবড়ানো গালে খালি আঙা লেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়।

কি দরকার মশাই আপনার পাঁক ঘাঁটার, ফেলে দিন না দূর করে। বলে ঘৃণায় নাকটা কুঞ্চিত করেন হরিচরণবাবু, যেন অনিমেষবাবুর হাতের সেই কাগজগুলো থেকে দুর্গন্ধ তাঁর নাকে এসে লাগছে।

ওটাই যে পারি না, জানেন ত! পাঁকের ভেতরেই পদ্ম জন্মায়। তাই নরক ঘাঁটতে ঘাঁটতে জীবনটা কাটলো। এমন কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন আপনি।

আমি ত আপনাকে পাঁক ঘাটতে বলিনি। দু'লাইন পড়ে যেই বুঝলেন দুর্গন্ধ ছেড়েছে ছুঁড়ে ফেলে দেন না কেন?

এবার গর্বের সঙ্গে জবাব দেন অনিমেষবাবু, জানেন ত মনীশ বসু আর কমল মিত্তির যারা আজ সাহিত্যের আসরে বাঁড়াবাঁড়ির বান ডাকিয়ে দিয়েছে, তাদের প্রথম লেখা আমি ছাপি, আপনার এই বন্ধুবরায়। আমিই তাদের প্রথম আবিষ্কার করি। একথা তারাও স্বীকার করে। যদি এমন করে সব লেখা না পড়তুম তাহলে কি লোকে আজ তাদের নাম জানতো?

না জানলে কোন ক্ষতি ছিল না। বাংলা সাহিত্যের অন্ততঃ ইজ্জত রক্ষা পেতো। মা সরস্বতীকে কমলবন থেকে টেনে এনে, ওরা যে রামবাগানে ছেড়ে দেবে তা চোখে দেখতে হতো না কাউকে।

বলতে বলতে হরিচরণবাবুর গলা যেন উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। তিনি বলেন, জানেন তাহলে. জানেন ত আমার ছোট ভায়রাভাইকে, সে একেবারে বাংলা সাহিত্যের অন্ধ ভক্ত! প্রত্যেক বছর পুজোর সময় যতগুলো পুজাসংখ্যা বেরোয় সবগুলো কিনে নিয়ে বিদেশ চলে যায়। সেখানে যে পনেরো কুড়িটা দিন থাকে, ওই পুজাসাহিত্য পড়েই কাটিয়ে দেয়। সেদিন সে এসেছিল। কি বললে জানেন? বললে দাদা, দিন দিন বাংলা সাহিত্যের কি অধোগতি হচ্ছে দেখেছেন কি?

আমি বললুম, রক্ষা কর ভাই। আমি দেখতে চাই না। তোমরা দেখো।

সে বললে, জানেন, এবারের পুজাসাহিত্যের শতকরা আশিটা গল্পের মোদ্দাকথা হলো, ভদ্রঘরের মেয়ে বৌরিরা সবাই বেশ্যাবৃত্তি করছে। কেউ বা লুকিয়ে কেউ বা প্রকাশ্যে! আচ্ছা বলুন ত দেশের চাষার হাজার ছেলেমেয়েরা ত এই সব পড়ছে। এ থেকে তারা কি শিক্ষালাভ করবে?

এই বলে একটু দম নিয়ে আবার হরিচরণবাবু শুরু করলেন। জানি না, আমাদের দেশে মেয়েদের ইজ্জত এত সুলভ হলো কবে! আচ্ছা, একটা মেয়ে কোন পুরুষকে অপমান করেছে কিংবা পায়ের চটি খুলে মুখে মেরেছে এমন গল্প কি কোথাও কেউ লিখেছে। পেটের দায়ে সব মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তি করছে—একটা মেয়েও কি ভিক্ষা করবে, আত্মহত্যা করবে তবু মানমর্য্যাদা খোয়াবে না, একথা কোন গল্পতে আছে দেখেছেন? অনিমেষবাবু বলেন: সব লেখাকেই এক বলে ফেলবেন না। ভাল লেখাও আছে। আপনি ত নিজে পড়েন না!

মা সরস্বতী আমায় রক্ষা করেছেন। এই যদি সদ্‌সাহিত্যের নমুনা হয় তাহলে নমস্কার। আমার দরকার নেই সাহিত্য পড়ে। মা সরস্বতী চিরদিন বন্ধ্যা থাকুন। নরক সংকারের বহু-বিজ্ঞাপিত 'সুপ' ব্যবহার করুন। এই বলে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

তবু অশ্লীল রচনা পড়ার নেশা যেন পেয়ে বসে অনিমেষবাবুকে। যদিও জানেন, তাঁর পত্রিকাতে এসব গল্প একেবারে নিষিদ্ধ। হরিচরণবাবুর কড়া হুকুম এমন কোন লেখা তাঁর কাগজে প্রকাশিত হবে না, মা-বাপ ছেলেমেয়ে ভাই বোন সবাই একসঙ্গে যা পড়তে লজ্জা পায়! সদ্‌সাহিত্য প্রচারই তাঁর পত্রিকার একমাত্র ধর্ম্ম! এই কথাটা সব সময় মনে রেখে যেন তিনি কাজ করেন।

অবশ্য তাই করছেন অনিমেষবাবু। কিন্তু সেই ধোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়িধোড় একঘেয়ে লেখা আর নষ্টা কথা বলতে কি ভাল লাগে না তাঁর নিজেরই। ধর্ম্মের জয়, সতীত্বের মহিমা, আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত পড়ে পড়ে পাঠকরাও সব ক্লান্ত। অনেক পুরনো গ্রাহক তাই ছেড়ে গেছে। একদিন যেসব শিক্ষিত ব্যক্তিরা অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন আজ তারাই চিঠি দিয়ে নিষেধ করছেন, আগামী বছর থেকে আমার নাম গ্রাহকতালিকা থেকে কেটে দেবেন।

অনেক গ্রাহিকারা আবার অনুরোধ করে চিঠি লেখেন, নতুন সব লেখকদের লেখা কেন আপনারা প্রকাশ করেন না, অন্যসব পত্রিকাতেই ত তাদের গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে।

অনিমেষবাবু এই চিঠিগুলো সব হরিচরণবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন। হরিচরণবাবু কিন্তু তেমনি অচল অটল তাঁর আদর্শে। তিনি বলেন দীর্ঘদিন ধরে যে সদ্‌সাহিত্য প্রচার করে বন্ধুরা সুনাম অর্জ্জন করেছে তাকে আমি কোন মতেই নষ্ট হতে দেবো না। তার চেয়ে কাগজ বন্ধ করে দেবো! যাক পুরোন গ্রাহক ছেড়ে। নতুন গ্রাহক আবার হবে, তার জন্যে ভয় পেলে চলবে না। দুটো পয়সার লোভে, ঘরে ঘরে অমৃতের বদলে বিষ পরিবেশন করতে পারবো না।

দিনে দিনে গ্রাহক সংখ্যা কমে যায়। প্রতি মাসেই অবিক্রীত কাগজ ফিরত আসে বিক্রির ষ্টল থেকে।

যারা কাগজ বিক্রী করে তারা ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বলে : অন্ততঃ কিছু সিনেমার বিজ্ঞাপন দিন, বোম্বের চিত্র তারকাদের ছবি ছাপুন, নইলে চালাতে পারবেন না।

হরিচরণবাবুরা তিনপুরুষে বড়লোক। তাছাড়া এই 'বসুন্ধরা' পত্রিকা থেকেও এককালে যথেষ্ট উপার্জন করেছেন। যারা তাঁর কাগজ চলবে না বলে ফেরৎ দিয়ে যায়, গ্রাহক করেন না তাদের কথা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তার জন্যে যদি দশবছর লোকসান খেতে হয় তাতেও তিনি প্রস্তুত। যে 'বসুন্ধরা'র অনুগ্রহে তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে তাকে রক্ষা করতে যদি প্রয়োজন হয় ত শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচ করবেন।

অনিমেষবাবুর ঘরে এসে পরামর্শ করেন হরিচরণবাবু। কি করে পত্রিকার উন্নতি করা যায়। ইজ্জত রক্ষা হয়।

অনিমেষবাবু অনেক চিন্তা করে বলেন যখন মসলাদার গরম গরম মুখরোচক মাংসের চপ্, কাটলেট পাঠকদের দিতে পারবেন না, তখন নিরামিষের লাইনে আমাদের যেতে হবে অর্থাৎ শাকের ঘণ্ট, শুক্তো, মোচার তরকারী, পরমান্ন প্রভৃতি দিয়ে পাত সাজাতে হবে।

হরিচরণবাবু এবার প্রশ্ন করেন, তার মানে? কি বলতে চান!

'ফিচার' করুন, নানারকমের বিভাগ খুলে দিন। যেমন, 'সঙ্গীত বিভাগ', 'মহিলা বিভাগ', 'সদ্‌সাহিত্য বিভাগ'—

হরিচরণবাবু লাফিয়ে ওঠেন, ঠিক বলেছেন। হাঁ, দেশবিদেশের সদ্‌সাহিত্যের বিভাগের সঙ্গে জুড়ে দিন মহামনীষীদের বাণী ও জীবনীর একটা বিভাগ, দেখি কাগজ চলে কিনা এবার। দেশে এত স্কুল কলেজ হয়েছে, অন্ততঃ সেসব জায়গায় ত আমাদের পত্রিকার প্রচার হবে, কি বলেন?

নিশ্চিত।

বেশ খুশিখুশি মনে বাড়ী ফিরে গেলেন হরিচরণবাবু। স্ত্রীর সঙ্গে দু'তিনদিন একেবারে দেখা হয়নি। তিনি সব সময়ে তিনতলায় ঠাকুর ঘরে পুজোআচ্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বারোটা একটার আগে কোনদিনই নীচে নামার সময় পান না। এদিকে পত্রিকা বেরুবার মুখে তিনচারটে দিন হরিচরণকেও বারোটার মধ্যেই আপিসে আসতে হয়। তাছাড়া তিনতালায় থাকেন গৃহিণী, নাত নি রেখাকে নিয়ে। রেখা সামনের বছর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে। ঠাকুমার ঘরটা বেশী নির্জন বলে, সেখানে এসে যেদিন থেকে আশ্রয় নিয়েছে, হরিচরণবাবুও স্ত্রীর ঘর থেকে দোতালায় নির্বাসিত হয়েছেন। তাছাড়া সিঁড়ি দিয়ে তিনতালায় ওঠানামা করতে গেলে ইদানীং হাঁপ ধরে হরিচরণবাবুর। সন্ধ্যেবেলা আপিস থেকে ফিরলে গৃহিণীই তাঁর ঘরে আসেন। চাকরের দেওয়া চা জলখাবার খেতে খেতে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করেন। গৃহিণী খাটের ওপর পাদুটো তুলে বসে সব শোনেন।

কিন্তু আজ কি জানি, কি মনে হলো হরিচরণবাবুর, সোজা তিনতালায় গৃহিণীর ঘরে উঠে গেলেন। কৈ গো, কোথায় গেলে বলে দামী পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখেন কেউ কোথাও নেই। না গৃহিণী, না রেখা। ম্যাটিনীর শোতে রেখা ঠাকুমাকে নিয়ে 'ইভ্‌নিং ইন্ প্যারিস'—সাম্প্রতিক রেকর্ডভঙ্গকারী হিন্দী ছবি দেখতে 'চিত্রা'তে গিয়েছিলেন। স্বামী ফেরবার আগেই বাড়ীতে আসতে পারবেন, হরিচরণবাবু জানতেও পারবেন না কিছু, এই মনে করেই গিয়েছিলেন কিন্তু ছবিটার দৈর্ঘ্য এত বেশী যে পুরো সাড়ে তিনঘণ্টা লাগবে, তা জানতেন না।

হরিচরণবাবু ঘরের ভেতরে কাউকে না দেখতে পেয়ে ভাবলেন নীচে গিয়ে ঝিকে জিজ্ঞেস করবেন, মা কোথায়?

কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো, গৃহিণীর শয্যায়। একখানা কি পত্রিকা তাঁর বালিশের পাশে উপুড় করা রয়েছে। যে লেখাটা পড়তে পড়তে উঠে গিয়েছেন, বোধহয় তখনো শেষ হয়নি।

পত্রিকাটার নাম দেখেই ঘৃণায় তাঁর সমস্ত শরীর রিরি করে উঠলো। সব চেয়ে অশ্লীল লেখা নিয়মিত প্রচার করে কুখ্যাত হয়েছে যে পত্রিকাটা সেটা তাঁর ঘরে ঢুকলো কি করে মনে করতেই রাগে তাঁর সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরে যায়। ছুঁতে ঘেন্না করছিল, তবু কৌতূহল সামলাতে পারলেন না হরিচরণবাবু। কার রচনা এত মনোযোগ দিয়ে পড়তে পড়তে উঠে গেছেন গৃহিণী জানার জন্যে উল্টে দেখতে গিয়ে যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হলো। সবচেয়ে জঘন্য, অশ্লীল গল্পগুলি লেখেন তার গল্প সেটি।

রাগে হরিচরণবাবুর দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল। তাহলে কি তাঁকে লুকিয়ে তাঁর স্ত্রী গোপনে এইসব পত্রিকা পড়েন। একবার বাড়ী আসুক, তারপর বোঝাপড়া হবে।

পত্রিকাটা হাতে করে নিজের ঘরে নেমে গেলেন।

একটু পরে স্ত্রী বাড়ী ফিরলে, ঝিকে দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। হিন্দী ছবি দেখা যে স্বামী একেবারে পছন্দ করেন না এবং তিনি যে প্রত্যেকটি ছবি দুপুরের শোতে দেখেন এটা এতকাল ধরা পড়েনি। হয়ত আজ জানতে পেরেছেন এই মনে করে দুরুদুরু বক্ষে স্বামীর ঘরে এসে ঢুকলেন। ক্রুদ্ধ সিংহের মত ঘরে পায়চারি করছিলেন হরিচরণবাবু। গৃহিণীকে দেখামাত্র যেন লাফ মেরে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই পত্রিকাখানা তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এসব কি? 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'! তুমি জানো না যে এইসব পত্রিকা দেশের কি সর্বনাশ করছে। ছেলেমেয়েদের চরিত্রকে কোথায় নামিয়ে দিচ্ছে! মাসের পর মাস আমরা যে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চলেছি তুমি কি তা জানো না?

জানবার জন্যে বয়ে গেছে তাঁর। কোনদিন নিজেদের পত্রিকা কি উল্টে দেখেন! ভাল লাগে না পড়তে, ওইসব ছাইভস্ম লেখা, সেই পুরনো সব লেখক। যখন তিনি যুবতী ছিলেন, তখন এইসব লোকদের লেখা নিয়মিত পড়তেন। এখন যতসব সিনেমাপত্রিকা স্বামীকে লুকিয়ে লুকিয়ে দুপুরবেলা পড়েন। আর পড়া শেষ হলেই চাকরকে দিয়ে পুরনো দোকানে পাঠিয়ে দেন।

তবু স্বামীকে খুশি করার জন্যে তিনি বললেন, পড়ি বৈকি! তবে এ পত্রিকা তোমার ঘরে কেন?

আমতা আমতা করে জবাব দেন তিনি, এই রেখা বলছিল, যে গল্পটা এবার মনীশ বসু লিখেছেন, সেটা নাকি ওঁর নিজের জীবন কাহিনী, তাই একটু উল্টে দেখছিলুম—

কি বললে? চীৎকার করে উঠলেন হরিচরণবাবু। রেখা এইসব কাগজ পড়ে নাকি?

তৎক্ষণাৎ কথাটাকে উল্টে দিয়ে তিনি বললেন, না না সে পড়তে যাবে কেন? তার বলে পরীক্ষার বই পড়ার সময় নেই। তাছাড়া সে রীতিমত ঘেন্না করে এই পত্রিকাগুলোকে। তার মত তোমারই মতন। তোমারই পেয়ারের নাত্‌নি ত।

হরিচরণবাবুর মুখের পেশীগুলো এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে কোমল হয়ে আসে। তিনি বলেন, হাঁ, রেখাকে ছেলেবেলা থেকে আমি মানুষ করেছি হাতে করে। তাকে সদ্‌গ্রন্থ পড়ার অভ্যাস ধরিয়েছি আমি নিজে, জানি সে কখনো এসব পছন্দ করে না। তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, তবে যে তুমি বললে, রেখা বলছিল! ও যদি না পড়ে থাকে তাহলে—

ওর ক্লাশের মেয়েরা ত সব, এই পত্রিকা ছাড়া অন্য কিছু পড়ে না। তারাই ওকে বলেছে। তাছাড়া বেশ জানে, আমিও কিরকম ঘেন্না করি ওই লোকটার লেখা। এবার ওর জীবন কাহিনীটাই লিখেছে বন্ধুদের মুখে শুনে আমাকে পড়াবে বলে তাদের কাছ থেকে চেয়ে এনেছে। ওটা কাল ই ফেরৎ দেবে।

না-না, ও আঁস্তাকুড়কে ঘরে স্থান দিও না। এখুনি দাও ওটাকে দূর করে।

ভদ্রলোকের ছেলে নাকি লেখাপড়া শিখেছে, তিন চারটে পাশ করেছে। তাছাড়া তাদেরও নিজের ঘরে ছেলেমেয়ে, মা বোন আছে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ এসব কি করে লেখে আমি ভেবে পাই না। বলে গৃহিণী মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করেন।

তারা না হয় লিখছে কিন্তু যাদের ঘরে ছেলেমেয়ে আছে তাদের বাপমায়েরা জেনেশুনে ওইসব নোংরা গুলো কি বলে ঘরে কিনে নিয়ে যায় সেটাই সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে আমার।

গৃহিণী বলেন, মা বাপকে দোষ দেওয়া যায় না। ওর ভেতর সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে তা পড়ে দেখার সময় কৈ তাঁদের। আজকাল ছেলেমেয়েরা ওসব বাপমাকে লুকিয়েই পড়ে। অভিভাবকদের মিথ্যে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

এই বলে পত্রিকাটা ঘরের মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যান।

নানা বিভাগীয় রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে বন্ধুরা প্রকাশিত হতে ধীরে ধীরে গ্রাহক সংখ্যাও বাড়তে থাকে। একটা বছরেই তার বিক্রয় সংখ্যা রীতিমত বেড়ে যায়। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হরিচরণবাবু অনিমেষবাবুর ঘরে এসে বলেন, দেখছেন ত এখনো ভাল জিনিষ দিতে পারলে তা গ্রহণ করার লোকের অভাব নেই দেশে। পত্রিকাগুলো যদি একজোট হয়ে বলে যে সদ্দাহিত্য ছাড়া আর কিছু ছাপাবো না, তাহলে দেশের ছেলে-মেয়েগুলো আবার সত্যিসত্যি মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

অনিমেষবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, আপনার মত আদর্শ নিয়ে সকলে কি ব্যবসা করতে পারে? লোকসান খেয়েও আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন। সেটা স্বজনের পক্ষে সম্ভব। তাই গ্রাহকদের চাহিদামত মুখরোচক জিনিষ পরিবেশন করতে তারা বাধ্য হয়। নইলে পত্রিকা উঠে যায়। বহুলোক বেকার হয়ে পড়ে—বুঝতে ত পারেন।

বুঝতে পারলেও তাঁর এ যুক্তি মানতে রাজী নন হরিচরণবাবু। বলেন এ আপনার ভুল আইডিয়া। অনিমেষবাবু বলেন, সমাজের ভেতরে ভেতরে ঘুন ধরেছে, সব খোঁপরা হয়ে গেছে। ওপর থেকে আপনি আমি যা দেখি তা বাইরের পালিশ। ভেতরে যত কালিমা বাড়ছে তাকে ঢাকবার জন্যে ওপরে তত রঙের চাকচিক্য, বর্তমানে সমাজ যে কোথায় নেমে গেছে আজকের সব লেখকদের লেখা পড়লেই বুঝতে পারতেন। আপনি ত পড়েন না। আমাকে যে বাধ্য হয়ে পড়তে হয় আমি তাই হাড়ে হাড়ে বুঝি।

হরিচরণবাবু রেগে ওঠেন, আমার দরকার নেই ওই লেখা পড়ে সমাজকে জানবার। ওরা যে সমাজকে জানে সেটা সব নয়! তার বাইরেও মানুষ আছে, সমাজ আছে, জগত আছে এটা ভুলে যাবেন না।

মাথা ঘুরে একদিন ট্রাম থেকে পড়ে গেলেন অনিমেষবাবু। ডাক্তার এসে তাঁকে ঘরে শুইয়ে রাখলেন। বাইরে বেরনো ঘুরে থাক কোন রকম মস্তিষ্কের কাজও নয়। এমনকি বইপড়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। [illegible] অনিমেষবাবু এবার চাকরী ছেড়ে দিতে

যাব্য হলেন। ৮'মাস লাগল তাঁর সুস্থ হয়ে উঠতে। দু'মাস আগের একখানা পুরনো 'বসুন্ধরা'র পাতা উল্টতে উল্টতে একদিন তিনি চমকে উঠলেন : একি, এ যে রীতিমত অশ্লীল গল্প। হরিচরণবাবু বেঁচে আছেন এখনো, তবে এ গল্প ছাপলে কে?

টুকটুক করে দুপুরের ট্রামে চেপে সেইদিনই আপিসে গিয়ে হাজির হলেন অনিমেষবাবু। তারপর হরিচরণবাবুর ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর চেয়ার শূন্য।

ব্যাপার কি, তিনি আসেননি! বেয়ারাকে প্রশ্ন করতে সে বললে, বাবুর ত খুব বেমারি হয়েছে। বাঁচবার আশা ছিল না। আজ চারমাস হয়ে গেল, আপিসে আসেন না। চন্দ্রকান্তবাবুই সব দেখছেন।

তাহলে একবার তাঁর সঙ্গে বাড়ীতে দেখা করতে হয়। আজ থাক, কাল সকালের দিকে একবার যাবো।

না বাবু যাবেন না। ডাক্তারবাবু কারুর সঙ্গে কথা কইতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিজেও কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।

সেকি? এত ব্যাপার এই ক'মাসে ঘটে গেছে, আমি ত কিছুই জানি না। বেয়ারা বললে : মানুষের শরীর। একদিনে কি হয়, কে বলতে পারে? তখন প্রেসের মধ্যে ঢুকে অনেক দিনের পুরনো বসুন্ধরার প্রিন্টার পরিতোষবাবুকে চুপি চুপি ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকাল দেখছি অশ্লীল গল্প ছাপা হচ্ছে 'বসুন্ধরায়'। হরিচরণবাবু জানেন না, তাঁর অজানতে আপনারা ছাপছেন নাকি? তখন জলখাবারের ঘরের দিকে গলিটার মধ্যে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিতোষবাবু চুপি চুপি বললেন, আপনি শোনেননি কিন্তু?

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন অনিমেষবাবু—কি?

বেশ, হরিচরণবাবুর নাতনি, তাঁর চোখের মণি, এক পাঞ্জাবী ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। কাউকে বলবেন না যেন। বাইরের লোক কেউ জানে না।

এঁ্যা, বলেন কি!

হ্যাঁ, তাতে এত শক্ পেয়েছেন হরিচরণবাবু যে, তিনদিনের মধ্যেই তাঁর 'হার্ট এটাক্' হয়, গেল-গেল অবস্থা। বোধহয় দশ বিশ হাজার টাকা এই চার মাসে খরচ হয়ে গেছে। সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে 'হার্ট স্পেশালিস্ট' আনিয়ে চিকিৎসা হয়েছে। যাক্, প্রাণটা রক্ষা পেয়েছে এই ঢের। এ যাত্রায় বেঁচে গেছেন তিনি। তবে আপিসে তিনি আর আসবেন না। অনিমেষবাবু বললেন, আরে যে গল্পটা আমি পড়লুম, তাতেও এক পাঞ্জাবী ড্রাইভারের সঙ্গে মনিবের একমাত্র বিদুষী কন্যার অবৈধ প্রেমের মর্মান্তিক পরিণামের কথাই রয়েছে যে!

হ্যাঁ। পরিতোষবাবু বললেন, শুনলুম নাকি গল্পটা তিনি নিজেই লিখেছেন অন্যের নাম দিয়ে। তাঁর এখন মতের পরিবর্তন হয়েছে তিনি বলেন। এই সব কাহিনী প্রচার করে সমাজের মা-বাপকে ও মেয়েদের সতর্ক করে দেওয়া তাঁর পত্রিকার কর্তব্য।

বলেন কি! তিনি নিজে বলেছেন একথা? এ যে বিশ্বাস হয় না! পরিতোষবাবু বললেন, আমি মশাই প্রুফটা পড়েই লেখাটাকে 'কেনসেল্' করে দিয়েছিলুম। তারপর বড়বাবুর কাছে আমি নিজে গিয়ে লেখাটার সম্বন্ধে অভিযোগ করতে তিনি ওই কথা আমায় বললেন। অবশ্য ওটা যে ওঁর লেখা, এটা আমার অনুমান। অনিমেষবাবু একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেই ত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি।' আমি কতবার চেষ্টা করেছি, একটু একটু করে এই সব সমাজ-সচেতন লেখা দেবার, কিন্তু উনি একেবারে বজ্রমুষ্ঠি। তবে কাগজের 'সেল' হু হু করে উঠে যেতো।

পরিতোষবাবু মুখে একটা আওয়াজ করে বললেন, ওটা আপনার একেবারে ভুল ধারণা। বরং উল্টো ফল হয়েছে। এই গল্প বেরুবার পর থেকে গ্রাহক সব ছেড়ে যাচ্ছে। যেমন বিক্রীটা বেড়েছিল তেমনি আবার পড়ে যাচ্ছে।

হরিচরণবাবুকে বলেছেন একথা?

হ্যাঁ। কিন্তু জানেন ত, তিনি কি রকম জেদী। বলেন, তা হয়ুক তবু আধুনিক সমাজের চিত্র দেশের লোকের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। যাতে সবাই সচেতন থাকে, তাদের চারিপাশে শয়তানদের যে লীলা চলেছে, তা বুঝতে পারে। অনিমেষবাবু এবার বলেন খুবই ভাল কথা। যুগের সঙ্গে তাল রেখে না যেতে পারলে তো পিছিয়ে পড়তেই হবে! পরিতোষবাবু মাথা চুলকে বলেন, কিন্তু আমার ত মনে হয় "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মে চ ভয়াবহঃ"।

অনিমেষবাবু হেসে উঠলেন, ওসব সেকেলে নিয়ম তুলে যান। জগতে যে কি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে কিছুই খবর রাখেন না, তাই ওকথা বলছেন। "সবাই বলে ভাসতে ছাড়ো, নিজের হলেই জানতে পারো"—সেই মেয়েলী ছড়াটাকে মনে করুন! বলতে বলতে বিদায় নিলেন। এবং দু'পা গিয়ে আবার ফিরে এসে বললেন, হরিচরণবাবুর সঙ্গে দেখা হলো না, বলবেন আমার কথা। খুব খুশি হয়েছি আমি, তাঁর এই 'পলিসি'র পরিবর্তন দেখে।

পরিতোষবাবু একটু ভেবে বলেন, দেখুন এটা আমার পক্ষে তাঁকে বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আপনি বরং দু'লাইন পোষ্টকার্ডে লিখে তাঁকে অভিনন্দন জানাবেন।

আচ্ছা, সেই ভাল।

পরিতোষবাবু আবার গলাটা নীচু করে বললেন, ওঁর নাতনির কথা শুনেছেন বোধ লিখবেন না। সবাই জানে রেখা ওর মামার বাড়ী দিল্লীতে চলে গেছে। সেখানেই সে লেখাপড়া করছে। নেহাত আপনার সঙ্গে বহুকালের আলাপ, তাই না বলে থাকতে পারলুম না। অনিমেষবাবু বললেন, ঠিক আছে! আপনি কিছু ভাববেন না। বলে চলে গেলেন।

প্রদীপের তলায়

শম্ভু মহারাজ

সদাহাস্যময় বংশী। পুরো নাম—বংশীবদন বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজিরা-খাতায় সই করে—'বি. বি. বি.'। আমরা ডাকি, বিবি বন্দ্য, সংক্ষেপে শুধু বিবি।

বংশী আমাদের সহকর্মী। বয়সে আমার চেয়ে ছোট কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। বয়সের তুলনায় বড় বেশি বুড়ো বলে মনে হয় তাকে। কালো রং, রোগা চেহারা আর ঢিলে পোশাক। কোটরাগত দুটি চোখ, বসে যাওয়া দুখানি গাল আর একমাথা ঝাঁকড়া চুল। চলার সময় দীর্ঘ ও কৃশ দেহটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। দেখে দুঃখ হয়। কিন্তু বংশী কখনও কারও কাছে কোন দুঃখ প্রকাশ করে না। কেউ বললে জবাব দেয়, "কেন, আমি তো বেশ ভাল আছি, ও আপনাদের চোখের ভুল।" বংশী হাসে। সদাহাস্যময় বংশী।

কাজে কখনও গাফিলতি করে না বংশী। টাইপের কাজ দিন, লেখার কাজ দিন, বৈশাখী দুপুরে ছুটোছুটি করার কাজ দিন—বংশী উৎসাহের সঙ্গে সম্পাদন করে। একমাত্র দোষ সে মাঝে মাঝে অফিস কামাই করে। জিজ্ঞেস করলে বলে, "একটু কাজ ছিল বাড়িতে।"

"কি কাজ।"

জবাব দেয় না বংশী। সহাস্যমুখে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। দরখাস্তে লেখে: গার্ডেন আরজেন্ট ডোমেস্টিক বিজনেস। দরখাস্ত মঞ্জুর করে দিই। বলি, "না জানিয়ে এমন কামাই করবে না।"

বংশী ঘাড় নাড়ে। হাসতে হাসতে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে। সদাহাস্যময় বংশী।

ইদানীং কিন্তু আর বংশীকে নিয়ে পারা যাচ্ছে না। কেবলই কামাই করছে অফিস। এতো বেশি 'ডোমেস্টিক বিজনেস' হলে তো অফিসের বিজনেস বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া ওর ক্যাজুয়াল লিভ শেষ হয়ে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যে আর্নড লিভও ফুরিয়ে গেল। বাকি আছে কিছু মেডিক্যাল লিভ। কিন্তু তা তো মেডিক্যাল গ্রাউণ্ড ছাড়া দেয়া যায় না। অথচ দরখাস্তের সেই একই বুলি—গার্ডেন আরজেন্ট ডোমেস্টিক বিজনেস।

ডেকে বলি, "তোমার তো আর ছুটি পাওনা নেই।"

"জানি।" বংশী নিরুদ্বিগ্ন।

"বাইনে পাবে না যে।"

বংশী চুপ করে থাকে।

আমি আবার বলি, "অসুখ হয়েছিল বলে একটা দরখাস্ত করে দাও, দেখি কি করা যায়।"

"কিন্তু আমার তো অসুখ হয় নি।" বংশী বলে ওঠে।

ওর উক্তিতে বিরক্তি বোধ করি। হেসে দিয়ে বলি, "তাহলে মাইনে কাটা যাক, ফেক্ অব সার্ভিস হোক্।"

বংশী কোন কথা বলে না, অন্যমনস্কের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কর্কশ কণ্ঠে বলি, "কানে গেছে কথাটা?"

"আজ্ঞে....."

"তাহলে কথা বলছ না কেন?"

"আজ্ঞে এ মাসটা কোনমতে ম্যানেজ করা যায় না?"

"আমাকে বলে কি হবে, হয় দরখাস্ত পালটে দাও, না হয় বড়-সাহেবকে গিয়ে বল।" আমি শেষ কথা বলি।

বংশীও শেষ জবাব দেয়। একটু হেসে বলে, "তাহলে থাক।" সে আস্তে আস্তে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। কাজ করতে থাকে।

মাইনের দিন। নির্বিকার ভাবে বংশী এসে ক্যাশিয়ারের কাছে দাঁড়ায়। বিশ দিনের মাইনে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় অফিস থেকে। যোগকরি ওর তেমন অভাব নেই সংসারে। নিশ্চয়ই বাবা দাদা কিম্বা ভাই আছে। তারাই সংসার চালায়। নইলে যা বাজার! ওর থেকে অনেক বেশি মাইনে পেয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর কো-অপারেটিভের ধার বেড়েই চলেছে দিন দিন। অথচ বিশ দিনের মাইনে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল বংশী। তবে এবারে সে জব্দ হয়েছে। আর এমন অকারণে অফিস কামাই করবে না।

আমার অনুমান মিথ্যে হল। আবার অফিস কামাই করতে শুরু করল বংশী। অবশেষে একদিন বেলা একটার সময় সহসা হাজির হল বংশী। অফিসে সোরগোল পড়ে গেল—'বিবি এসেছে, বিবি।'

খবারীতি ডেকে পাঠালাম। বংশী এলো, হাসি মুখেই কাছে এসে দাঁড়ালো। চেহারাটা যেন আরও খারাপ হয়ে গেছে, জামা-কাপড় আরও বেশি নোংরা। জিজ্ঞেস করি, "কি হয়েছিল তোমার? এতোদিন অফিসে আসো নি কেন?"

বংশী হাসে। কোন কথা বলে না।

আমার গা জ্বলে যায় ওর আচরণে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, "ভেক ধরে কোন লাভ নেই। আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় ঘুঘু। যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও। নইলে আমি রিপোর্ট করে দেব তোমার নামে।"

এবারে বংশী মুখ খোলে, "আজ্ঞে এলাম না.....।"

"এলে না, তা আমিও জানি। কেন এলে না তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"আসা হয়ে উঠল না। মানে আসতে পারলাম না। তাই এলাম না।"

বেয়াড়া লোকটার কথা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে উঠল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, "তোমাকে দু দিন হাওড়া স্টেশনে দেখা গেছে।"

"দু দিন! না না, দু দিন নয়, আজ পনেরো দিন পরে অফিসে এলাম, এর মধ্যে কম করেও আট-দশ দিন হাওড়া এসেছি।"

"হাওড়া স্টেশনে ঘুরে বেড়িয়েছো অথচ অফিসে আসো নি?"

বংশী সে প্রশ্নের জবাব দেয় না। আমাকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা কোথায় থেকেছেন, হাটকর্মে না ইয়ার্ডে?"

"মাটকর্মে। তুমি ঘোরাঘুরি করছিলে।"

"তা তো করতেই হবে।" বংশী বিস্মিত হয় আমার প্রশ্নে। বলে, "ঘোরাঘুরি না করলে গেট-পাস করব কেমন করে? আজকাল যে বড়ই কড়াকড়ি করেছে, মাথলি না দেখালে বের হতে দেয় না।"

"তুমি মাথলি টিকেট করো নি?"

"না। কয়েক মাস আগে বাড়িতে অসুখ লেগেছিল, অনেক টাকা পয়সা বেরিয়ে গেল। সেই থেকে আর মাথলি কাটতে পারি নি। যেদিন পয়সা থাকে টিকেট করে আসি। যে দিন পয়সা না থাকে বিনা টিকেটে হাওড়া আসি। গেট না পেরোতে পারলে বাড়ি ফিরে যাই।"

"মাইনে পেয়ে একখানা মাথলি কেটে নিলেই পারো।"

"পারি না, মানে পেয়ে উঠছি না। পুরো মাইনে পাচ্ছি না কিনা?"

"ছুটি নেই অথচ অফিস কামাই করছ। এ মাসেও তো পুরো মাইনে পাবে না।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। অফিসে আসতে পারছি না যে।"

না, এর সঙ্গে কথা বলা বৃথা। মরুক গে। অফিসে না এলে মাইনে পাবে না। বিরক্ত হয়ে বলি, "যাও এবারে গিয়ে কাজে বসো।"

বংশী একটু হেসে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। আমি ভাবি বংশী কি গাড়িভাড়ার অভাবেই অফিস কামাই করে, না অন্য কোন কারণ আছে। নিশ্চয়ই আছে। তাহলেও এ কটা দিন যাক্। সামনের মাসে ওকে একটা মাথলি কেটে দিতে হবে।

পনেরো দিনের মাইনে পেলো বংশী। একজন বেয়ারাকে হাওড়া পাঠিয়ে ওর জন্য একখানি মাসিক টিকেট কাটিয়ে আনালাম। টিকেটখানি বংশীর হাতে দিয়ে বললাম, "এই নাও মাথলি, রোজ অফিসে আসা চাই।"

"আসব।" টিকেটটা পকেটে রাখে বংশী। তার পরে টাকা বের করে আমার হাতে টিকেটের দামটা দিয়ে বলে, "ভালই করেছেন, আমাকে আবার লাইন দিতে হত। দেরি হয়ে যেতো। শরীরটা ভাল লাগছে না, আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবো।" বংশী চলতে শুরু করে।

বিস্মিত স্বরে বলি, "কিন্তু তুমি টাকা দিলে কেন, আমি তো এমনি তোমাকে টিকেটটা দিতে চেয়েছিলাম।"

বংশী পেছন ফেরে। হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে। বলে, "আপনি দিতে চাইলেই বা আমি নেবো কেন?"

আমি চট করে কোন জবাব দিতে পারি না। একটু থেমে বলি, "তোমার অসুবিধে, তাই টিকেটটা করে দিয়েছিলাম।"

"আজ তো আমার কোন অসুবিধা নেই। আজ মাইনে পেয়েছি। তবে জানা রইল, যদি তেমন অসুবিধায় পড়ি, নিশ্চয়ই জানাবো আপনাকে। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।"

বংশী হাসে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় অফিস থেকে। আমি তাকিয়ে থাকি ওর দিকে। টিকেটের দামটা এখনও আমার হাতে। খেয়াল হতেই পকেটে রেখে দিই। মনটা একটু খারাপ হয়ে যায়। টাকাটা নিল না বংশী! তারপরেই ভাবি, না নিক। তবু তো কাল থেকে নিয়মিত অফিসে আসবে। বংশী পুরো মাইনে পাবে সামনের মাসে।

আমার অনুমান ব্যর্থ হয়। পরদিন অফিসে আসে না বংশী। তাহলে রেল-ভাড়ার অভাবে অফিসে আসে না, কথাটা সত্য নয়। স্বভাবের জন্যই ওর অভাব।

পরদিনও অফিসে আসে না বংশী। তার পরদিন? না, সেদিনও অফিসে আসে না সে। কথাটা নিয়ে কেউ কিন্তু মাথা ঘামায় নি। বরং বংশী যে আরও কয়েকদিন কামাই করবে সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি।

বেলা বোধকরি দুটো হবে। অফিসে কাজ করছি। এমন সময়—

"নমস্কার।"

মুখ তুলে দেখি অপরিচিত একজন ভদ্রলোক। অফিসের কোন কাজে এসেছেন। প্রতিনমস্কার করে ভদ্রলোককে বসতে বলি। তিনি সামনের চেয়ারখানিতে বসেন। আমি তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন, "আমি বংশীবাবুর বাড়ি থেকে আসছি।"

"বংশীবাবু, মানে আমাদের বংশী?" আমি বিস্মিত। বহুদিন বংশী চাকরি করছে কিন্তু কখনও তো তার বাড়ি থেকে কেউ আসে নি অফিসে। তাহলে কি কোন···। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি, "কি ব্যাপার? বংশীর খবর কি? সে অফিসে আসছে না!"

ভদ্রলোক একটুকাল চুপ করে থাকেন। তারপরে ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, "বংশীবাবু নেই।"

"নেই!"

"না। কাল রাতে বংশীবাবু মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন! কি হয়েছিল?"

ভদ্রলোক পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে বলতে থাকেন, "সেদিন জ্বর নিয়েই অফিস থেকে ফিরেছেন। আগের দিন খাওয়া হয় নি। মাইনে পাবেন বলে না এসে পারেন নি। বাড়ি ফিরে বিছানা নিয়েছেন···আর সে বিছানা ছাড়তে পারেন নি।"

"জ্বর হয়েই মরে গেল?"

"জ্বরটা উপলক্ষ্য মাত্র। ইপোস করে করে শরীরে কিছুই ছিল না। কাল দুপুরে ডাক্তার ডেকেছিলাম, কিন্তু তখন চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন।" ভদ্রলোক ধরা গলায় জবাব দেন।

"আপনি ওর কে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কেউ নই, প্রতিবেশী।"

"ওর আর কে আছে?"

"এক ভাই আছে, শান্তিপুরে থাকে। তবে কখনও তাকে আসতে দেখি নি। অথচ বংশীবাবুই নাকি তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন।"

"বংশীর ছেলে-মেয়ে কটি?"

"একটি। একটি ছেলে বছর তিনেকের। তবে দেখে মনে হয় বড়জোর দেড় বছর। কেনই বা দেখাবে না বলুন, অভাবের সংসার, ভাল খাওয়া তো দূরের কথা, একটু দুধও জোটে না। কেবলই রোগে ভোগে, ওষুধ-পথ্য পর্যন্ত পায় না।"

"ওর স্ত্রী কি বলছে?"

"কি আর বলবে, কতই বা বয়স—বছর বিশেক হবে হয়তো। মানুষটা খেতে দিতে পারতো না

তবু ছিল কাছে, তাও কাল চলে গেল ছেড়ে। তাই কেবল কাঁদছে। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। কেবলই বলছে—আমি তো কখনও কিছু চাই নি তোমার কাছে, তবে তুমি এভাবে আমাকে ছেড়ে কেন চলে গেলে?" ভদ্রলোক থামেন।

আমি কোন কথা বলি না। কি বলব?

আমি চুপ করে থাকি। ভদ্রলোক আবার বলতে থাকেন, "যে যায় সে তো ভালই যায়, যারা থাকে তারা কষ্ট পায়। বংশীবাবু মরে বেঁচেছেন, কিন্তু ঐ বউটা বাঁচবে কেমন করে, কেমন করে সে বাঁচাবে ঐ ছেলেটাকে? আজ তার কান্না থামছে না। কিন্তু ধৈর্যের একটি জীবন্ত প্রতীক ঐ মেয়েটি। পরণে শাড়ী নেই, পেটে ভাত নেই, স্বামী তার কোন সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ করতে পারে নি, তবু কখনও তাকে কান্নাকাটি কিম্বা বায়নাক্কা করতে শুনি নি। আমরা পাশের ঘরে থাকি, কখনও টের পাই নি, ওরা উপোস করেছে। কোনদিন কিছু চায় নি, বায়না করে নি। কেবল ছেলেটা কাঁদলে বুঝতে পারতাম। আমার স্ত্রী অনেক দিন ছেলেটাকে নিয়ে এসেছে জোর করে, কিছু খাইয়ে তার কান্না থামিয়েছে। কিন্তু ওদের দুজনকে কখনও কিছু দিতে পারি নি, ওরা নেয় নি। জিজ্ঞেস করলে বংশীবাবু বলেছেন—রান্না হয় নি ঠিকই। কিন্তু আমি নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরেছি, আর আপনার বৌমার খাবার নিয়ে এসেছি। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করুন।

আশ্চর্য শিক্ষা, মেয়েটা মৃদু হেসে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়েছে।

"সত্যি বলছি আপনাকে, এমন অদ্ভুত মানুষ আমার জীবনে আর দেখি নি।" ভদ্রলোক চুপ করেন।

"আমিও দেখি নি" আমি বলে উঠি।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান। নমস্কার করে বলেন, "বংশীবাবুর স্ত্রী আমাকে পাঠান নি, আমি নিজেই এসেছি। তবে তার জন্যই এসেছি। যদি তাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন, বাধিত হব।"

"নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। দেখি কি করতে পারি। আমি দু-চারদিনের ভেতর আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

ভদ্রলোক বেরিয়ে যান অফিস থেকে। আমি চেয়ারে বসি। কাজে মন দিতে পারি না। ভেবে চলি বংশীর কথা।

দেখে মানুষকে কতটুকু বোঝা যায়, কতখানি জানা যায়? এই যে বংশীকে আমরা দেখেছি এতদিন ধরে,—দেখে তার সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তুলেছি মনে, তার সঙ্গে প্রকৃত বংশীর মিল কোথায়? জীবিতকালে তাকে দেখেছি করুণার চোখে, মৃত্যুর পরে আজ তাকে বড় বেশি মহীয়ান বলে মনে হচ্ছে। অথচ সেদিন যদি ওর সত্যিকারের পরিচয় পাবার চেষ্টা করতাম, তাহলে হয়তো আজ বংশী বেঁচে থাকতে পারত।

না। বংশী তো মরে নি। বংশীরা বেঁচে আছে আমাদেরই মাঝে—এই হতভাগ্য স্বাধীন দেশের কোটি কোটি অভুক্ত মধ্যবিত্তের মাঝে। কেবল ওর মতো কয়েকজন বেয়াড়া মানুষ এমনি হঠাৎ মরে গিয়ে বেঁচে যাচ্ছে কিন্তু তাতে মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রণার অবসান হচ্ছে না।

মৌবাসা

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

পুরানো আলিপুরের এ-ধারটা অপেক্ষাকৃত নির্জন।

সাবেককালের ইট, পাথর, মেহগিনি কাঠের নির্মিত বড় বড় বাড়ির কিছু অংশ এখনো এখানে পুরানো দিনের ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কালীঘাটের আদিগঙ্গা পার হলেই আলিপুর!—সেখানে মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু বাসস্থান,—তারপর হেস্টিংস, প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড ঘিরে মেয়েদের শিক্ষালয়। আরো পশ্চিমে আলিপুর জাজেস কোর্ট। উত্তরে বেলভেডিয়ার এবং তারই আশেপাশে আলিপুর চৌহদ্দী ঘিরে জমিদার, রাজারাজড়া এবং সাবেককালের বনিয়াদী কিন্তু অভিজাত বাঙালি পরিবারের সুরম্য অট্টালিকা এখনো শেষ-নিদর্শনকে মুছে ফেলে নি।

জামার পকেট থেকে সাদা খামখানি বার করলাম। তার ভেতরে নীল রংএর এনগ্রেভিং করা একটা বড় অক্ষর 'এম', এবং বাঁপাশে ইটালিয়ান টাইপে লক্ষ সুতোর মতন বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম মুদ্রিত।

সামনে থেকে বাড়িখানি দেখলেই মনে হয় এককালে এর আভিজাত্য ছিলো। এখন মৌনাবরণ দেয়ালে ক্রমশ তা মিলিয়ে আসছে। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডঘেরা বাড়ি,—আগাছা এবং বিবর্ণতায় মলিন।

চিঠিখানি খুলে দেখলাম,—লেটার প্যাডের ওপর ইংরেজি বড় অক্ষরে ছাপা 'এম' এবং নীচে পত্র-লেখিকার নাম সইকরা রয়েছে মক্ষিরাণী।

মক্ষিরাণী?

বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে একজন উর্দিপরা প্রৌঢ় পরিচারকশ্রেণীর লোক আমার দিকে এগিয়ে এলো। তার উর্দি ঘিরে এখন আর সে পূর্বকালের জৌলুষ নেই। তবু এ-বাড়ির অধিশ্বরীর সম্ভ্রান্ততার কিছু নিদর্শন তার মধ্যে জাগ্রত।

লোকটি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললে, 'আপনারই তো আসার কথা!'

বললাম, 'হ্যাঁ। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখেছিলাম; জবাবে আমাকে আজ সকালে ডেকে পাঠানো হয়েছে।'

'ভেতরে আসুন!' পরিচারক আমাকে আহ্বান জানালে।

সামনের লনের আশে-পাশের গাছগুলি আগাছায় ভরে গেছে, নরম ঘাসগুলিও মসৃণ নয় আর লাল কাঁকর বিছানো পথটিও তেমন আর সযত্নরক্ষিত নয়।

বাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করলাম, 'এই বাড়িই কী বিক্রি করা হবে!'

সঙ্গের পথপ্রদর্শক বললে, 'না। এবাড়ি পুরোটা নয়, পিছনের একটু অংশ শুধু বেচবার কথা হচ্ছে।'

লাল কাঁকর-বিছানো পথ একটু অতিক্রম করলেই সামনে বড় বড় থামওয়ালা বাড়ি। বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই প্রথমে পড়ে উপরে ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'পাশে এখনো পামের ডাল—মোজায়েক ফ্লোরে ফাটল ধরেছে, তবুও বাড়িখানির আভিজাত্য প্রকাশ পায়।

একতলা থেকে দোতলা। সাবেক কালের বাড়ি।

এই বাড়ির অধিশ্বরীই মক্কিরাণী। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে মক্কিরাণীর কথা শুনছিলাম।

পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত এক জমিদার বংশের বধূ মক্কিরাণী। র‍্যাডক্লিফের রোয়দাদে দেশবিভাগের পরই পদ্মাপারের ঐশ্বর্যকে চিরতরে পরিত্যাগ করে যে-সব বিত্তশালী ভূমিজ পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গে সপরিবারে চলে আসতে হয়েছে মক্কিরাণী তাদেরই একজন।

দেশ বিভাগের সময়েই আত্মীয় স্বজন, পরিচারক পরিচারিকাদের নিয়ে মক্কিরাণী চলে এসেছেন কলকাতায় আলিপুরের এই জমিদার ভবনে। এই বাড়ি তাঁদের তিন পুরুষের। কর্তারা সপরিবারে কখনো-সখনো এখানে আসতেন। তা ছাড়া এবাড়ি ছিলো তাঁদের প্রমোদ-ভবন। সেই প্রমোদ-ভবন এখন মক্কিরাণীর বাস-ভবনে পরিণত হয়েছে।

মক্কিরাণীর স্বামী জমিদার রঘুনাথ মিত্তিরও পরবর্তীকালে এখানে চিরস্থায়িভাবে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। পদ্মার ওপারে পড়ে রইলো দশখানি গ্রামের মালিকানা-স্বত্ব,—আর-আর কত ঐশ্বর্য, কত প্রাচুর্য।

আগে তো প্রাণ,—তারপর বিলাস, ঐশ্বর্য।

তবু যাহোক কিছু সোনা-দানা টাকা-কড়ি আনা গিয়েছিলো—তাইতেই এই বিশ-বাইশ বছর চলেছে। এখন সকলের ভাণ্ডারের তলানিতে এসে ঠেকেছে; তাই এই বাড়ির ভিতরে পিছন-অংশের খান-তিনেক ঘর এক টুকরো জমিসমেত বিক্রী করবার জন্যে দৈনিক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিলো।

আমার পেশা জমি এবং বাড়ি কেনা-বেচা অর্থাৎ বাড়ি এবং জমির দালালি করা। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে সঙ্গী প্রৌঢ় পরিচারক এইসব তথ্য পরিবেশন করতে লাগলো।

দোতলায় উঠে সামনে করিডোরে একটা লম্বা সোফা—স্প্রিংগুলি উঁচু-নীচু। পরিচারকের কথায় সেইখানে বসলাম।

'বসুন! মক্কিরাণী এক্ষুনি আসবেন।'

'মক্কিরাণী?'

আমার কথায় পরিচারক একবার এদিক-ওদিক তাকালে, তারপর বললে, 'মক্কিরাণী, না তাইনি!'

'তাইনি, মানে?'

'মানেটা, আমার মুখ থেকে না শোনাই ভালো। কর্তাদের আমল থেকে মশাই আমরা এ-বাড়িতে পুরুষানুক্রমে কাজ করে আসছি, কিন্তু আর নয়। এবারে পালাতে পারলে বাঁচি!'

পরিচারকদের মনিব সম্পর্কে এ-কালীন এই রকমই আচার-আচরণ—আমার মনে সেই কথাই অনুভূত হলো এক্ষেত্রে।

'বিশ্বাস করবেন না মশাই, কী অর্থপিশাচ আমাদের মনিব এই মক্কিরাণী! মেয়েমানুষের এত টাকার লোভ আমি কখনো দেখিনি। কর্তা ছিলেন ঠিক উল্টো। কোথাকার হা-ঘরে মেয়ে নিয়ে এলেন

ঘরে শুধু দেহের রূপ দেখে। তারপর থেকেই সোনার সংসারে আগুন লাগলো। কর্তা মারা যাওয়ার পর থেকে এত বাড়িয়েছেন যে আমাদের আর এ-বাড়িতে টিকানো দায় হয়ে উঠেছে। একে একে পুরোনো লোক সবাই চলে গেছে। এখন আমি হচ্ছি সাবেক নীলমণি।'

পরিচারকের কথায় কিছুটা বিস্ময় হলাম; তবু একেবারে হতাশ হলাম না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বহু লোকজনের সান্নিধ্যে এসে বহু লোক দেখেছি এবং লোক সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি। মনে করলাম, হয়ত এ-লোকটার কোন কিছু স্বার্থে আঘাত লাগার জন্যেই ধনিক-পত্নী সম্পর্কে এই সব কটূক্তি প্রকাশ করছে।

জিগ্যেস করলাম, 'তুমি এ-বাড়ির কে?'

'চাকর, ঠাকুর, দরোয়ান, বাজার সরকার, ম্যানেজার—সবকিছুই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি। দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া, আর মাইনের কথা না বলাই ভালো!'

'আর কে আছেন এ-সংসারে?'

'কে আর থাকবে? কাউকে কী আর রেখেছে তাইনি? একে একে সব খেয়েছে। গত বছরে স্বামী, তার আগের বছরে রাজকন্যার মতন মেয়ে, তার আগের বছরে রাজপুত্তুর—এখন নিজের বলতে কেউই আর নেই। আশ-পাশের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও বনিবনা নেই। এই বাড়িতে একাই রাজত্ব করছেন।'

পরিচারকের কথায় বললাম, 'ও, তাই। রোগে-শোকে তাই বোধহয় এইরকম হয়েছেন।'

পরিচারক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে, 'বলেন কী মশাই, রোগ-শোক? রোগ-শোক ওঁর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।'

'তা'হলে হয়ত বয়েসের ভারে?'

আমার কথায় অল্প হেসে পরিচারক বললে, 'বয়েস? বয়েস ওঁর হয় না।'

'মানে?'

'চোখে দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

প্রসঙ্গকে আর বাড়তে দেওয়া নীতিসঙ্গত মনে করলাম না। তাছাড়া, বক্সিরানী সম্পর্কে এত তথ্যে আমারই বা প্রয়োজন কী? আমার পেশার খাতিরে এখানে আসা। তাইনি কিংবা দেবী—আমার তাতে কিছুই এসে যায় না।

পরিচারক মৃদুকণ্ঠে আমাকে সাবধান করে দিলে, 'বুঝে-সুঝে মেলামেশা করবেন মশাই। ভালো মানুষ দেখলেই রক্ত শুষে নেবে।'

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বক্সিরানী এলেন।

সিঁড়ির পাশে করিডোরের অনতিদূরে সাবেক কালের মজবুত প্রশস্ত একখানি ঘর।

পরিচারকের অনুগামী হয়ে সেই ঘরে ঢুকলাম। দেয়ালের গায়ে তেল নং কোথাও বা মাঝ কোথাও বা ফিকে। সাদা পাথরের ফ্লোরে আগেকার দিনের গালিচা বিছানো। ঘরের দরজা-জানলায় দেশের প্রচলিত পর্দা,—এপাশে ওপাশে কয়েকখানি বড় বড় চেয়ার গোল করে সাজানো—মাঝখানে শ্বেত পাথরের একটা টেবিল।

একটি বড় কুশনে যিনি বসে আছেন বয়েস তাঁর ঠিক এক সত্তরায় তাঁর রূপ এবং যৌবন প্রভাতে আজও অটুট আছে।

যে পরিচারক এতক্ষণ মক্কিরাণীর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো, ঘরে ঢুকে তার তাবাস্তর লক্ষ্য করে গেলো। নতজানু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে সে মক্কিরাণীকে আমার আগমন-বার্তা জানালে।

মক্কিরাণী একবার আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চাউনির সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় ঘটতে না ঘটতেই আমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে গেলো।

অপূর্ব রূপবতী যুবতী। টানা টানা পদ্মপলাশ চোখ দু'টিতে সুর্মার সুস্নেহরেখা, সুডৌল মুখখানিতে লঘু লঘু লাবণ্য, তির্যক নাসিকা। স্নান করা একরাশ এলায়িত কুন্তল। করসা ধবধবে রং। বয়েস বোঝবার উপায় নেই। বেশভূষার সম্পূর্ণ আধুনিকতা। সবকিছু খুঁটিয়ে দেখার আগেই তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনিই সঙ্গীতবাবু?' কণ্ঠস্বরে তাঁর সঙ্গীতের রেশ।

বিস্ময় এবং সসম্মান অভিবাদন জ্ঞাপন করে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার চিঠি পেয়ে এসেছি।'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর স্বাস্থ্যবতী চেহারার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সুষম ছন্দের খেলা, কালো চোখের দৃষ্টিধারায় মনকে স্পর্শ করার আবেগ।

'চলুন, আপনাকে বাড়ির ওদিকটায় আলো দেখাই।'

তাঁকে অনুসরণ করবার সময় তাঁর গায়ের মিষ্টি টয়লেটিং-এর গন্ধ আমার মনে যেন মেলা বসিয়ে দিলে। আশ্চর্য তাঁর চলনভঙ্গিও।

সিঁড়ি বেয়ে আবার আমরা নামতে লাগলাম। তাঁর অত্যন্ত কাছাকাছি পাশাপাশি আমরা দু'জন।

নীচে একতলায় দু'ধারে বাগান—সযত্নরক্ষিত। লাল সুরকির রাস্তাটিও আর সুবিন্যস্ত নয়।

কিন্তু মক্কিরাণীর মধ্যে সবকিছুই সুন্দর। এমন কী তাঁর বেশভূষার উগ্র আধুনিকতাও তাঁর দেহের প্রতিটি স্তরে বেশ মানানসইই লাগছে। পরণে কালো সিল্কের শাড়ি, গায়ে সর্ট ব্লাউজে নগ্ন হাতখানি এবং করসা ধবধবে কোমর ও পিঠের খানিকটা অনাবৃত অংশ—সুডৌল তরঙ্গ যৌবনের উগ্র প্রকাশে তাঁকে মোটেই বেমানান লাগছে না। বাতাসে ভ্রমর-কৃষ্ণ স্নান করা চুলগুলি চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ায় তাঁকে যেন আরো সুন্দর করে তুলেছে। কপালে একটি শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। বেশ ভালো লাগছে তাঁকে। মনে করতে পারছিনে যে তিনি তাঁর সংসারের সবকিছু হারিয়ে বিধবা।

নেশার আবেশে তাঁকে অনুসরণ করে চললাম।

বাড়ির পিছনের দিকে ছোট একটি অংশ। একতলায় খান দুই ঘর একেবারে সাধারণ ঘরের। পিছনে খোলা কলতলা, তার পাশে পায়খানা—মনে হয় যেন বহু দিনের অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। একটি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। সেখানে দু'খানি ঘর আর একটি ছোট বারান্দা।

মক্কিরাণী বললেন, 'এই অংশটা বিক্রী করবো।'

ব্যবসায়ী চোখ দু'টি কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি!—মক্কিরাণীর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো।

'কত হয় পেতে পারি?'

মক্কিরাণীর প্রশ্নে আবার নিজের সত্তার মাঝে ফিরে এলাম। বললাম, 'খুব বেশি হাম কী পাবেন?'

'কেন?'

'অনেক অসুবিধে বাড়িটায়। তাছাড়া—'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই মক্কিরাণী উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আমি স্ত্রীলোক বলে মনে করবেন না যে বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে আমার জ্ঞান কিছু কম।'

সবিনয়ে বললাম, 'না, না, তা কেন। কিন্তু আপনিই খুঁজে দেখুন না কেন, বাড়ি আপনার একেবারে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই ভালো হয় পাওয়া যুক্তিসঙ্গত।'

মক্কিরাণী বললেন, 'স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় কেন?'

বললাম, 'আসা-যাওয়ার রুমন প্যাসেজ আর বাথ-প্রিভি এগুলোও বেশ আধুনিক রুচিসম্মত পরিবারের পক্ষে উপযুক্ত নয়।'

মক্কিরাণী এবার হাসলেন। সাদা মুক্তার মতন তাঁর দাঁতগুলি দেখা গেলো। বললেন, 'প্যাসেজ রুমন হবে কেন? বাড়ির পিছনে যে রাস্তা সেদিকে দরজা ছুটিয়ে নিলেই আলাদা প্যাসেজ, আর বাথ-প্রিভি নতুন করে রুচি মাফিক তৈরি করার বাধা কোথায়?'

মক্কিরাণীর কথায় আমিও মৃদু হাসলাম। বললাম, 'নতুন করে তৈরি করে নেওয়ার বাধা কিছু নেই। সিঁড়িটিও নতুন করে তৈরি করে নিতে হবে। কিংবা গোটা বাড়িটিকেই নতুন করে ক্যাসানেবল করে নেওয়া যায়। সে খরচ তো ক্রেতাকেই বহন করতে হবে!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!' মক্কিরাণী আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। তারপর আবার বললেন, 'এতদিন এখানে তো সরকারসাহেব সপরিবারে বসবাস করতেন। এখন আমার প্রয়োজন বোধেই না—'

তাঁর কথা শেষ না হতেই বললাম, 'হ্যাঁ; প্রয়োজন বোধটাকে যুক্তিসঙ্গত মাত্রায় আনতে হবে আমাদের; আর তা হলে কোন অসুবিধেই হবে না।'

মক্কিরাণীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি আরো আশ্বাস দিলাম, 'আমার দিক থেকে যতটা আপনাকে সাহায্য করতে পারি তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই দিয়ে যাচ্ছি।'

'তবু কী দাম হতে পারে?'

মক্কিরাণীর কথায় জিগ্যেস করলাম, 'কতটা পরিমাণ জমি হতে পারে?'

মক্কিরাণী উত্তর দিলেন, 'এক কাঠা চার ছটাক।'

একটু চিন্তা করে বললাম, 'তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার হতে পারে।'

মক্কিরাণী চমকে উঠলেন, 'তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার মাত্র? বলেন কী?'

'কম হলো কী?

আমার কথায় মক্কিরাণী নিতান্তই বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'কম হলো না? বলেন কী! আলিপুরের মতন এমন সম্ভ্রান্ত পল্লীতে ওপর নীচে চারখানা ঘর সমেত পাকা বাড়ি। এই আপনার আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি?'

বললাম, 'জমি এবং সম্পত্তির বাজার দাম কমছে। সে-খবর নিশ্চয়ই রাখেন?'

'হ্যাঁ, রাখি বলেই তো একাজে নেমেছি। আচ্ছা, নমস্কার, আসুন আপনি।'

মক্কিরাণী পিছন ফিরলেন। এক কথাতেই শেষ।

বাড়ীর বার হওয়ার পথে নিজের টেলিফোন নম্বর তাঁকে জানিয়ে অনুরোধ জানালাম, 'যদি প্রয়োজন বোধ করেন জানাবেন।'

মক্কিরাণী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজারে প্রয়োজন বোধ করবো না।'

শেষ চেষ্টায় আবার এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনার আইডিয়া কত?'

মক্কিরাণী বললেন, 'অন্তত: পঞ্চাশ হাজার।"

'আচ্ছা চেষ্টা করবো।' - অভিবাদন জানিয়ে আলিপুরের ট্রাম রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম।

কয়েকদিন পরে একজন সম্ভাব্য ক্রেতা নিয়ে মক্কিরাণীর আলিপুরের বাড়িতে আবার গেলাম। ক্রেতা ভদ্রলোক প্রৌঢ়ীন ব্যক্তি—কলকাতার একটা বড় মার্চেন্ট অফিসের বড় অফিসার তাঁর স্ত্রী এবং তিনি দু'জনেই আমার সঙ্গে বাড়ি দেখতে গেলেন।

মক্কিরাণীকে দেখে ক্রেতা ভদ্রলোকের স্ত্রীর এ-বাড়ি সম্পর্কে আগ্রহ আর তেমন রইলো না। কিন্তু ভদ্রলোক খুবই আগ্রহান্বিত হলেন। পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে শেষ পর্যন্ত চল্লিশ হাজারে উঠলেন।

ব্যবসায়ের সার্থকতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। ভদ্রলোক হাজারখানেক টাকা আমাকে পারিশ্রমিক বাবদ দিতে রাজি হলেন।

মক্কিরাণী কি দেবেন? সে-কথা আর প্রকাশ্যে জিগ্যেস করতে ভরসায় কুলোলো না। পরের দিন সকালবেলা টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙলো।

আমার স্ত্রী এসে ডাকলেন, 'তোমার সেই মক্কিরাণী।'

'মক্কিরাণী?' ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলাম। মনস্থির করলাম, আমার পাওনাটা এবারে বুঝে সুঝে নিই।

কিন্তু বিপরীত কথা।

টেলিফোনে মক্কিরাণীর লীলা-বিলম্বিত কণ্ঠস্বরকে এবে অত্যন্ত বেসুরো মনে হতে লাগলো।

'হ্যালো।'

'বলুন!'

'শুনুন, চল্লিশ হাজারে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে। আপনার প্রাপ্যটাকে বলুন অন্ততঃ আর পাঁচ হাজার উঠতে।'

মক্কিরাণীর এ-কথা শুনে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললাম, 'রাগ করবেন। আমি আর এ-ব্যাপারে কোন কথা বলতে পারবো না!'

'কেন?'

বললাম, 'ভদ্রলোকের কথার হারই সবচেয়ে বড় সম্পদ!'

মক্কিরাণীও রুষ্ট হয়েছেন, 'তার মানে?'

'তার মানে, যে-কথা মুখে হয়েছে, সেই কথা কাজে পরিণত করাই হচ্ছে ভদ্রতা।'

মক্কিরাণী টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

এক বিপত্নীক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এলেন আমার কাছে জমি কিংবা বাড়ির খোঁজে।

মক্কিরাণীর আলিপুরের বাড়ির কথা কেমন যেন নিজের অজান্তেই আমার মুখ থেকে বার হয়ে এলো।

ভদ্রলোক আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বড়বাজারের নামকরা ব্যবসায়ী তিনি। প্রচুর ধন-সম্পদ। তাঁর প্রকাণ্ড বড় ক্যাডিলক গাড়িখানি নিয়ে তখুনি তিনি আমার সঙ্গে আলিপুর বেলভেডিয়ারে চললেন।

মক্কিরাণীকে আজ আরো সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

পরনে চাকাই শাড়ি—গায়ে লাল হাতকাটা স্লিপসুট ব্লাউজ। ঠোঁট দুটিতে পাতলা রঙের ছোঁওয়া। চোখের কাজলে চোখ দু'টি কাজলকালো। একরাশ ছড়ানো চুল।

শহরজাত তাঁর রূপে মফস্বলী ভ্রমর আকৃষ্ট হলো।

ঘন্টিরাণী ভদ্রলোকের প্রতি প্রথমেই নিবিড় অনুরাগের দৃষ্টি মেলে ধরলেন।

দু'চারটি কথা, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সৌজন্যমূলক আলাপ-আলোচনা। তারই মাঝে সেরিয়ের সেই প্রৌঢ় পরিচারক চা, বিস্কুট আর কিছু খাবার একটা ট্রেতে করে নিয়ে আমাদের সামনের টেবিলে রেখে দিলে।

ঘন্টিরাণী আপ্যায়িত করলেন প্রৌঢ় বিপত্নীক ভদ্রলোককে, 'একটু চা!'

ভদ্রলোক আপ্যায়িত হলেন, আর তাঁর কল্যাণে আমিও চা-অভিযোগের আপ্যায়ন হতে বঞ্চিত হলাম না।

তারপর বাড়ির পিছনের সেই অংশটি আবার দেখতে যাওয়ার পালা। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছেন ঘন্টিরাণী;—সঙ্গে প্রৌঢ় বিপত্নীক ভদ্রলোক। দু'জনে পাশাপাশি এবং কাছাকাছি হয়েছেন।

আমি আর ঘরে ঢুকলাম না। বাইরের ছোট বারান্দাটিতে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাড়ি কেনা-বেচার প্রসঙ্গ ছেড়ে তাঁরা দু'জনে আরো অন্তরঙ্গ হয়েছেন।

লক্ষপতি ভদ্রলোকের ব্যবসায়-প্রসঙ্গ, সংসার-প্রসঙ্গ উঠেছে। তিনি দরিদ্র বংশজাত; নানা জীবন অভ্যস্ত পরিশ্রম করে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হয়েছেন। দুই ছেলে এবং এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ছেলে দু'টিও সাবালক। তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভদ্রলোকের বালিগঞ্জের প্রকাণ্ড বাড়িতেই আছে। সেখানে তাঁর জাঁকজমকের সংসার। সম্প্রতি পত্নীবিয়োগ ঘটায় সংসারের ঝামেলা আর তাঁর ভালো লাগছে না। তিনি নিরিবিলি থাকতে চান এখন। তাই ছোট একান্ত নিজস্ব একটি নিরিবিলি বাড়ি চাইছেন—যেখানে তিনি একলা শুধু নিজেকে নিয়েই থাকবেন।

ঘন্টিরাণী কি এইরকম খরিদ্দারই বেশি পছন্দ করেন?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ভদ্রলোক বাড়ির দর দিলেন। চল্লিশ হাজার দর, পঞ্চাশ হাজার টাকা। এক কাছে দশ হাজার বেশি।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনছিলাম প্রৌঢ় বিপত্নীক ভদ্রলোকের আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠস্বর!

'আপনিও একা! আপনার এমন বাড়িতে একা থাকেন কেমন করে?'

ঘন্টিরাণী আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছেন লক্ষপতি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের। তাঁর মিষ্টি কণ্ঠস্বরে বিহ্বলতার ঝরি, 'সবই অভ্যেস। জীবনটাই হচ্ছে আমাদের বাধ্য-বাধকতার অধীন, বুঝলেন মিস্টার মল্লিক! এই বাড়িটাই ছিলো কর্তাদের প্রমোদ-ভবন। পদ্মার ধারে চক্-মেলানো বাড়ি আমাদের। বাড়ি নয়, প্রাসাদও নয়—পুরো একখানি গ্রামের পরিধি নিয়ে অট্টালিকা। পদ্মা ভাঙে আর নতুন বাড়ি গড়ে তোলা হয়। সেই বিরাট পরিধি জুড়ে খোলামেলা অফিসারি সেরাস্তা। লোকজন, পাইক বরকন্দাজ, হাতী, ঘোড়া, মানুষ, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের এক সমভিপূর্ণ সংসার। শুধু বিত্তার আর প্রাচুর্য।

চলে গেল সব এক কথায়। দেশ-বিভাগে পঞ্চাশটি ধানের সোনা আর অপার ঐশ্বর্য রাজনীতির বন্যায় ভেসে গেলো।

এ-বাড়িটা কেনা হয়েছিলো দু'পুরুষ আগে। পদ্মার মধ্য-বেখলা গ্রাম থেকে কর্তারা শহরে আসতেন মাঝে মাঝে। আসতেন সেই প্রমাদভরা থেকে নিজেদের একটু গুটিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশায়।

দেশ-বিভাগের পর প্রথমে আমি এলাম ছেলে-মেয়ে আর আমাদের দেখাশুনা করবার জন্যে বুড়ো সরকার মশাইকে নিয়ে। প্রথমে মনে হয়েছিলো পাখির বাসা। এখন মনে হচ্ছে শুধু একা নিজের জন্যে দশকাঠার এই বাড়ির দরকার কী? এর থেকে এক কাঠা তাই বেচতে বসেছি। তা ছাড়া একা একা ঠাক ধরছে। তাই ভাবলাম, বাড়ির মধ্যে আর একটা পরিবার আসুক!'

মক্কিরাণীর সুউন্নত যৌবনপুষ্ট বুক দু'টি সর্ট ব্লাউজের মধ্য থেকে এইবার উত্তেজনার আবেগে ওঠা-নামা করছে।

আমি আর তাঁর দিকে তাকাতে পারছি নে। বিপত্নীক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের অন্তরঙ্গতায় মক্কিরাণী যখন তাঁর বাড়ির প্রকৃত ক্রেতাকে খুঁজে পেয়েছেন তখন আমার আর মধ্যস্থতা শোভা পায় না।

কিন্তু আমার পাওনা?

কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলো। পঞ্চাশ হাজারে দু'পক্ষেই রাজি! কয়েকদিনের মধ্যেই আলিপুর রেজেস্ট্রি অফিসে দলিল সই হবে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড ক্যাডিলকখানি আরো কতক্ষণ মক্কিরাণীর বাড়ির কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিলো জানি নে। আমি তাঁদের দু'জনকেই অভিবাদন জানিয়ে আলিপুরের ট্রাম-রাস্তা ধরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

মক্কিরাণী মধুর হাসি হাসলেন,—তাঁর সে মৃষ্টি-ধারার মধ্যে মধু অপেক্ষা হুলই ছিলো বুঝি বেশি।

প্রৌঢ় ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমাকে আশ্বাস জানালেন, 'সন্ধীপবাবু, আপনার পাওনা যা তা আমি আপনার বাড়িতেই পৌঁছে দেবো।'

মাসখানেক পরে এক বন্ধুর গাড়িতে আলিপুর পল্লীতে আর একটি বাড়ির সন্ধানে যেতে যেতে বেলভেডিয়ার-অন্তর্গত মক্কিরাণীর বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম।

পঞ্চাশ হাজার কেন ষাট হাজারেও এককাঠা চার ছটাকের ছোট্ট অংশটি এখনো বিক্রী হয়নি। প্রৌঢ় বিপত্নীক ভদ্রলোক পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজারেও উঠেছিলেন নাকি; কিন্তু মক্কিরাণীর মুখে কয়েক কাপ চা আর টুকিটাকি জলখাবারের টেবলে শুধু মিষ্টি হাসি ছড়িয়েই তাঁকে ফিরতে হয়েছে।

সেই পুরানো পরিচারকই এসে বললে, 'ও ডাইনিকে চেনেন না মশাই। লক্ষ টাকাতেও ওকে পাওয়া যায় না।'

আমি আগ্রহে জিগ্যেস করলাম, 'তা হলে বাড়ি এখনও বিক্রী হয়নি?'

'না। আপনি যাকে এনেছিলেন তিনি পঞ্চাশ হাজার থেকে ষাট হাজারে উঠেছিলেন; কিন্তু আর একজন সুদর্শন কোথাকার রাজকুমার নাকি সত্তর হাজার দর দিয়েছেন।'

'মক্কিরাণী কোথায়?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে পরিচারক অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে, 'হনি মুন, দা, তী যে বলে!'

'কার সঙ্গে?'

'সেই রাজকুমারের সঙ্গে।'

পরিচারক আমার দুঃখ প্রকাশ করলে আমার হয়ে,নিজে, 'বলেছিলাম না মশাই, আপনি এ তাঁকে পা দেবেন না। ও হচ্ছে ডাইনি। ওর সংস্পর্শে যে আসে তারই রক্ত শুষে নেয় ও। সাঙ্ঘাতিক

মেয়েমানুষ মশাই, সাঙ্ঘাতিক মেয়েমানুষ। এই রাজকুমারই বা ওর কাছে কতদিন? ফিরে এলো বলে!'

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তবুও যক্ষিরাণীর বাড়িটার মধ্যে একটা বিরাট স্তব্ধতাকে অনুভব করতে লাগলাম।

সামনের মোড়াইক সিঁড়িটার ফাটলগুলি আমাকে যেন গিলতে আসছে। ডাইনির ক্ষুধা যেন জেগে রয়েছে ওই ফাটলগুলির মধ্যে।

তবুও অবাধ্য পা দুটি কেন সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে চায় যেখানে সাবেক কালের নক্সার সুরম্য ঘরখানির মধ্যে যক্ষিরাণীর সুরক্ষিত আসন।

যক্ষিরাণীর কাজল-ছোঁওয়া চোখ দুটি আমাকে টানছে।

বাইরে মোটরের হর্ন শুনলাম।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বুঝি উঠতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তাড়াতাড়ি নেমে এলাম।

আমার ক্লায়েন্ট বাড়ির সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

• • • •

গঙ্গার ওপর দিয়ে নৌকায় নবদ্বীপের দুজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পার হচ্ছেন। চৈতন্যদেব আর রঘুনাথ। রঘুনাথের আজীবনের সাধনা, তিনি ন্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করবেন। করেছেনও। কথাপ্রসঙ্গে চৈতন্যদেব বলেন, তিনিও ন্যায়ের একখানি পুঁথি লিখেছেন। সেই পুঁথির শ্লোক উল্লেখ করে রঘুনাথকে শোনালেন। শুনে রঘুনাথের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

—নিমাই, তোমার এই পুঁথি ফেলে আমার পুঁথি কেউ দেখবে না। আমার আজীবনের সাধনা ব্যর্থ হলো।

পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিমাই সেই মুহূর্তে তাঁর বগলের পুঁথি ছুরি বেঁধে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিলেন। বলেন, জীবনে আর তিনি কোন পুঁথি রচনা করবেন না····স গৌরবের অভিলাষ তিনি বহন করতে চান না।

সমুদ্র-মেখলা

সুকুমার রায়

মিনতি ও অরুণ পুরী সমুদ্রের জল-সীমা থেকে বড় রাস্তায় উঠে এসে দাঁড়াল। বড় হোটেলটি এখন জনবহুল, সমুদ্রতীরও তেমনি। বসবার জন্যে ভাল ঠাঁই মিলছে না। স্থান নির্বাচন করলে মিনতি। দুজন এগিয়ে গেল বাঁধানো চত্বরটার দিকে। উপকূলের আলোর মাস্তুলটাকে ঘিরে পাকা বায়গা, ওখানে বেড়ে দুজনে পাশাপাশি বসল। মাস্তুলের ওপরের ঘূর্ণী আলোটা অন্ধকারকে চিরে চিরে সমুদ্রের দিকে ছিটকে পড়ছে। ওদিকেও অন্ধকারের পর্দা টানা হয়ে গেছে। ছুটে আসছে শুধু গর্জন আর হাওয়ার, গড়ানো ঢেউগুলোর ফেনারেখা অন্ধকারে বিদ্যুতের মত চকচক্ করে উঠছে। ঝাওয়াজের মত প্রবল আর হাওয়ার মত তীক্ষ্ণ ওদের দুজনার প্রশ্নোত্তর। মিনতি সংক্ষেপে উত্তর দিতে চেষ্টা করছিল।

আমার কাছে সব কথা খুলে বলবে না কেন মিনতি?

কি বলব?

তুমি কেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও, বলতে চাও না—যা আমি জিজ্ঞেস করি। আমার সঙ্গে তোমার বিয়ের বাধা কোথায়? পত্রের স্পষ্ট উত্তর দাও না কেন?

তুমি অনেক বাজে কথা লেখ, আর সে পত্র এসে বাবার হাতে পড়লে কি রকে থাকবে। তাগিস্ আমি পত্রগুলো লুকে নিই।

অরুণ বলে ওঠে, আমার কোন কথাই বাজে নয়।

কেন, জাহাজের মধ্যে তুমি স্বপ্ন দেখছ আমাকে, অসভ্যের মতো ধরে ফেলেছ, একখাটি বাজে নয়? —হেসে ওঠে মিনতি।

তুমি ছাড়া আমার এ কথা জানাবার লোক ত কেউ নেই।

বুঝি, কিন্তু বাবাকে যে বোঝান যায় না। তোমায় জন্যে আমি সমুদ্র ভালবাসি, নাবিক-জীবন পছন্দ করি—এসব কথা বলেও যে বাবাকে বোঝাতে পারি না—যা বলতে চাই। বাবা আমাকে বলেন, সামুদ্রিক জীব হতে যাস নে। ওসব চলবে না।

কেন? বাধা কোথায়?

জানইত। কি করে বলব? তোমার জীবনটা কাটবে জাহাজে, আর আমি ডাঙায়। কেমন খাপ-ছাড়া নয়? আমি তো তোমার কাছে যেতে পারব না কখনো।

পারবে না সত্যি, কিন্তু যে হাওয়ার দোলা আমাকে ঢেউয়ের ওপর দুলিয়ে দিয়ে আসে প্রতিদিন, সে তো তোমাকে ছুঁয়ে যায়। তোমার কাছে হাওয়া আসে আমার মন নিয়ে। অধিনায়কের ইঙ্গিতে আমার জীবন চলে, কিন্তু তোমার গন্ধ থাকে আমার শরীরে আর মনে। আমাকে পাও না তুমি?

আকাশের তারার দিকে চোখ রেখে মিনতি বলে, হয়ত পাই। তোমার বিপদ আপদ হয়ত বুঝি। মনে পড়ে একবার লিখেছিলে জাহাজের কাছাকাছি কোথাও একটা অজানা মাইন ফেটেছিল, তোমাদের বিপদ হয়েছিল খুব। জানি না কেন সেই সারাটা রাত্রি আমি ছট্‌ফট্‌ করে কাটিয়েছিলাম তোমার কথা ভেবে, আর বাইরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল।

তা'হলেই বুঝতে পারছ আমি সর্বদা উপস্থিত। বাধা কোথায় ?

বাধা ? তবু থাকে। তুমি বলে আর আমি ডাঙায়। দুয়ের মধ্যে থাকে শুধু টান আর টান। কেউ জানে না কার কি হচ্ছে।

অরুণ বলল, বেশ বলেছ—"টান"। এই পৃথিবীর একটা দিকে সূর্য আর চন্দ্র বলে যের একটা শুধু টানে তোমরা সবার মধ্যে এক হয়ে বাঁধা আছো।

কেমন যেন হেঁয়ালির মতো বলছ। ধরো, কেউ আমাকে ইসারা করল অথবা অধিকার করতে চাইল, তখন কি হবে ?

আসল কথা মন। জল মাটি যেমন অবান্তর, অন্য লোকও তেমন অবান্তর। মনের জন্যেই ত বেঁচে থাকি আমরা, যারা সমুদ্র থেকে পাড়কে টানি আর পাড় আমাদের টানে। কেবিনে বসে দিন গুণি, রাত্রি গুণি। ঢেউ গুণে গুণে পাঠাই তোমার কাছে, ডেকের ওপর লাইন করে প্যারেড করি, নৌকো ভাসিয়ে চেউয়ের ওপর দোলা খাই - একটি মনের তাড়নায়। সেটাতো এখানে বাঁধা।

মিনতি বলল, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। এই মাস্তুলের ওপরের আলোটা যখন সমুদ্রের দিকে ছুটে পড়ে, তোমাদের জাহাজ যদি এদিকে আসে, তুমি হয়ত বুঝতে পারো এই আলোর টান আমাদের বাড়ির কাছ থেকেই আসছে।

হ্যাঁ, এ কথাই লিখেছিলাম কিছুদিন আগে। পুরী থেকে কয়েক মাইল দূরে আমরা সেদিন। পেয়েছিলাম তোমার আলো। সেদিন ছিল ঝড়।

ঝড় ?

জাহাজ কলকাতা পোর্ট থেকে ফিরছিল। ক'দিন তোমার চিঠি পাইনি।

ওহ্‌, তাই ঝড়ের কথা বলছ ? এখন খেমেছে ?

অরুণ মৃদু স্বরে বলল, মিনতি, থামেনি। বেশ আছে। আবার উঠবে যদি তোমার কথা না পাই। আমি মানব না।

মিনতি ধীরে বলল, আমাকে তুমি রাখবে কোথায় ? আমি তো আর সমুদ্রে যেতে পারব না। তোমার পরিচয়ে কোথায় থাকব ?

একটা কোয়ার্টার পাব। সেখানে তোমাকে সমুদ্রের মত বেঁধে রাখব। সেই তো প্রকৃত সমুদ্র, তাতে আমি পরম স্নান করব।

কিন্তু, আমার বাবা যে কিছুতেই মানবেন না, কারণ—কারণ, তোমার পরিচয় কি ? কোথা থেকে তুমি এসেছ ? তোমার পরিচয় কি কেউ জানে ? তোমার এ শরীরে কোথাকার চিহ্ন ?

হঠাৎ একথা শুনে শরীরের দিকে তাকায় অরুণ। মিনতি যেন ভেঙে পড়েছে কান্নায়। হাত ধরে ফেলল অরুণের। তোমার পরিচয় আমি জানি, তোমার মন জানি, কিন্তু শরীরটাকে তো কেউ জানে না।

কি বলছ, খুলে বলো। আমার পরিচয় জানো না মানে কি ?

মিনতি জানাল, তাহলে তোমাকে বলব এমন একটি কথা যা তোমাকে সহ্য করতে হবে।

করব, তবু সত্যি বলো।

পঁচিশ বছর আগেকার কথা বাবা বলেছেন।

কি বলেছেন?

পঁচিশ বছর আগে এক বর্ষায় একটি ধনকয় মাঝে তুলিয়া এসেছিল এক শিশুকে কোলে নিয়ে। ক্ষমাগত বৃষ্টি, পুরীর তখন ভীষণ অবস্থা।

বেশ তারপর?

তুলিয়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দেবেনবাবুর কাছে। শিশুকে সে নামিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে গেল। বলে গেল, বাবু মো ভাকু সমুদ্রঙ্ক পাইছি। ভাসি আসিথিলা। আপন তাকু রখন্তু।

দেবেনবাবু বললেন, হউ ভরুর রখিবি।—মৌতাতে ছিলেন দেবেনবাবু, লোকটাকে টাকা দিয়েছিলেন বখশিস হিসেবে। তারপর আর হদিস পেলেন না কোথা থেকে এই ছেলে এল।

কিছুদিন কেটে গেল। কোথা থেকে এল শিশু বাবাও জানতেন না। অবশেষে হোটেলে না রেখে কলকাতায় কোন নার্সারিতে আর পরে শান্তিনিকেতনে রেখে মানুষ করলেন নিজের ছেলের মতো করে। সমুদ্র থেকে ভেসে এসেছিল বলে তাকে অল্প বয়সেই নৌ-বিভাগের পরীক্ষায় পাঠালেন। চমকপ্রদ ছাত্র হিসেবে উত্তীর্ণ হল সে। দেবেনবাবু মরবার সময় বাবাকে বলে গেলেন—মোর অর্ধেক সম্পত্তি পিলাটি পাইব, অবশিষ্ট জগন্নাথকে সেবারে ব্যয়িত হব। আপন ট্রাষ্টি রহিবে।—আমার সম্পত্তির অর্ধেক থাকবে ছেলের জন্যে আর অর্ধেক যাবে জগন্নাথদেবের মন্দিরে সেবার জন্যে। ইন্দ্রবাবু আপনি রইলেন ট্রাষ্টি।—সেই থেকে বাবা তোমার দেখাশোনার ভার নিলেন।

আমি সেই অরুণ? দেবেন্দ্রবাবুর ছেলে নই?

হ্যাঁ তাই।

আমার আর কোন পরিচয় জানা যায় নি?

অনেক চেষ্টা করেছেন বাবা, কিন্তু জানা যায় নি। আইনতঃ, দেবেনবাবুর ছেলে তুমি, কিন্তু বাবা বলেন—একটা জায়গায় এসে আইনও দাঁড়ায় না।

ও, আমি সেই অরুণ—যার জাতি নেই, গোত্র নেই, শুধু আছে পৃথিবী আর সমুদ্র। সেই জন্যেও নেই, তা'হলে আমি কি করব? আমি কি করব মিনতি? তবে আবার সমুদ্রেই যাব। চলে যাব। কাল এখানে এসো মিনতি।

এক মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অরুণ। বাবা দিল মিনতি, যেও না, দাঁড়াও।

কাল এসো। চিৎকার করে বলে অরুণ চলে গেল। মিনতির চোখে জল গড়িয়ে আসছে। দীর্ঘ কালো চেহারাটির মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ততা আর সংস্কৃতির ছাপ আছে। বাবার কাছে শুনেছে অরুণ ভাল ছাত্র—এ সবই কি মানুষের পরিচয়ে যথেষ্ট নয়? বিভাগীয় রিপোর্ট অনুসারে অরুণ দক্ষতার বাহক। কিছুকাল মিনতির বাবার অভিভাবকতার আওতায় থেকেছে অরুণ। ইনি হোটেলের আয়ের অংশ ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছেন কাঁধে। মরবার সময়ে দেবেনবাবু বলে গিয়েছিলেন, অরুণকু দেখিবে বরুণ দেবতা আউ শ্রীজগন্নাথ।—অরুণকে দেখবে বরুণ দেবতা আর জগন্নাথ। কিন্তু, ওদিকে মিনতির সঙ্গে প্রতি ছুটির প্রতিটি দিন কেটে যেত বেলাভূমিতে। হোটেলেও দেখা হত, আর দেখা হত নিজেদের বাড়িতে

—দুজন দুজনকে বুঝে নিত—একে যেন অপরের মালিক। শাদা প্যাণ্ট সার্ট টুপি মাথায় পরে সমুদ্র-চিত্রের মত এসে পৌঁছে যেত পুরীতে অরুণের হোটেলে। ম্যানেজার মালিককে আদর যত্ন করত। কত না ঢেউ বয়ে যেত মুখে চোখে ও শরীরে। ওরা যেন অন্য পৃথিবীর লোক। এমনি অনেক ছুটির দিন বারে বারে কেটেছে। তারপর কেমন যেন চল, মিনতির বাবা দৃঢ় স্বরে বারবারই বলে দিলেন—মিনতিকে সাবধান হতে। তাইত, মিনতি কথাটি বলে ফেলল, না বলে উপায় কি? বাবাই ত বাধা। না বললে উনিই একদিন বলে দেবেন। কিন্তু ভুলতে পারে না মিনতি এক মুহূর্তও সেই চিত্র—অরুণ সূর্যের আলোর মত সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে আসে যেন। সূর্যের ঢেউএর ঝকঝকে কেনারেখাগুলোর মতো দীপ্ত, বর্ষার ঢেউএর মতো প্রবল। হোটেলের ঘাটের ওপর যখন শুয়ে থাকে, ওকে যেন দেখায় একটা গড়ানো ছোট ঢেউ; যেন কোমল অথচ ভীষণ তোড়ে ছুটে এসে মিলিয়ে যাবে, ওকে বালির মতো গলিয়ে গলিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রে। ঢেউএর আবার জাতি কি গোত্র কি? ঢেউ—শুধু ঢেউ। মিনতিকে ঢেউএর সঙ্গে মিশে যেতে হবে। শুধু অরুণের দেখা পাবার জন্যে কাল অপেক্ষা করতেই হবে।

পরদিন সন্ধ্যায় মিনতি অরুণের হোটেলের পথে পা বাড়ায় নি! বিখ্যাত এডভোকেটের মেয়ের আর কোন পথ নেই—বর্ষার বালির অনন্ত বিস্তৃতে মিশে যাবার পথ ঠিক আছে। আর কোন ভাবনা নেই। শুধু অরুণের আসার অপেক্ষা।

একটা রিক্সা এসে থামল। বাক্স আর বিছানা চাপিয়ে অরুণ স্টেশনে যাচ্ছে, বলল, যাচ্ছি।

মিনতি ইঙ্গিত করে আড়ালে এগিয়ে গেল। ওদিকে অন্ধকার নেমেছে।

কেন? কেন? চলে যাচ্ছ কেন?

সমুদ্র আমার মন, সাগরই আমার পরিচয়, আমার জাত সমুদ্র। ভেবে দেখেছি ওখানেই আমাকে যেতে হবে।

মিনতি বলল, না যেও না। আমি আগে বালি হয়ে যাব তারপর যেও। বালি হয়ে বর্ষার ঢেউয়ে মিলিয়ে যাব। ওখানেই আমাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। মিলিয়ে যেতে হবে গভীর সমুদ্রে—সমুদ্র-মনের জন্যে।

অরুণ কাছে এসে প্রবল ভাবে টেনে নিল,—মিনতি, সমুদ্র-মনের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। মিলিয়ে যেও না। আরো হাওয়া মুখে চোখে মেখে ঢেউ শুনতে থেকো। তারপর এই সমুদ্র-মনকে পাবে। সব ব্যবস্থা আমি করব যদি স্বীকার করতে পার।

মিনতি কাঁদতে কাঁদতে বলল, স্বীকার করতেই হবে আমাকে।

তোমার বাবা তোমাকে ক্ষমা করবেন না। আমার হোটেলের অংশ যাবে—যাক তা।

হোক, তাই হোক। তবু আমি সমুদ্র-মন চাই।

তাহলে অপেক্ষা করে থেকো। হাওয়ায় হাওয়ায় আবার মন পাঠাবো, ঢেউ পাঠাবো, তাকে নেবার জন্যে তৈরি থেকো, বালিতে মিশে যেও না। আবার আসব। যেখানে নিয়ে যাবো তোমাকে সেখানেও এমনি করেই সারা জীবন ভরে সমুদ্র-মন আসবে। তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। লক্ষ্মীটি!

আবদ্ধ শরীরের শেকলে বন্দী ঠোঁটের চাবিতে ঠোঁট এঁটে মিনতি বলল, তাই হবে। তাই হবে। আবার এসো। সমুদ্র থেকে মন পাঠিও।

বিদায় হয়ে গেল অরুণ। চারটি চোখে শুধুই সমুদ্র-মথলা।.....

———

শনিবার

মাণবেন্দ্র পাল

ব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বন্ধুবর শীতানাথ পরিহাস করে বললে, ও, আজ শনিবার! ভুলেই গিয়েছিলাম।

প্রৌঢ় স্টোরকিপার সুহাসবাবু চশমা মুছতে মুছতে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে সহাস্যে বললেন, গিন্নিকে আমার অভিবাদন জানিয়ো। আর বোলো এবার বর্ষার সময়ে গিয়ে ওঁর হাতে বেলেগুক্তুক্তির ঝাল খেয়ে আসব।

আমিও হাসতে হাসতে হাত নেড়ে সায় দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি। এখন কাঁটায় কাঁটায় পৌনে দুটো। হাওড়া থেকে আড়াইটের কাটোয়া লোকাল ছাড়বে। ট্রাম-বাসে ওঠা যাবে কিনা সন্দেহ—শেষ পর্যন্ত হয়তো এই ভারী ব্যাগটা কাঁধে তুলে হাঁটতেই হবে।

প্রতি শনিবারই বাড়ি যাই—আর আপিস থেকে বেরোবার মুখে প্রতিবারই বন্ধুবান্ধব এবং রসিক সহকর্মীদের কাছ থেকে ঐ এক সম্ভাষণ! কেউ কেউ আমায় স্পষ্টই বলেন, বেশ আছ। সপ্তাহান্তে এই বাড়ি যাওয়া, এ তো দারুণ রোমান্টিক।

মনে মনে হাসি। এমনি করে প্রতি শনিবার ছুটতে ছুটতে ট্রেন ধরা একি আজ? দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল। এখনো রোমান্স! তা অঙ্কে যদি এখনো আমার মধ্যে রোমান্স খুঁজে পায় পাক, আপত্তি কী? ঈর্ষা? আর কোনো বিষয়ে তো কারও ঈর্ষাভাজন হতে পারিনি—যদি এই শনিবারের প্যাসেঞ্জার হয়েই ঈর্ষার লক্ষ্য হয়ে উঠি মন্দ কী!

কিন্তু ও নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানোর অবকাশ নেই। মনে মনে আর একবার হিসেব করে নিই—সব জিনিসগুলি গুছিয়ে নিয়েছি কিনা। সেবার আসবার সময় গৃহিণী বার বার করে বলে দিয়েছিল খোকার জন্যে যে-কোন একটা 'ফুড' যেমন করে হোক জোগাড় করে আনতে হবেই। দেশে একেবারে মিলছে না। গত দু'সপ্তাহ ধরে সারা শহর চুঁড়ে শেষে কোনোরকমে একটা হরলিকস পেয়েছি।—হ্যাঁ, ওটা ব্যাগের এই দিকটায় রেখেছি। আর দেশে এক ছটাক গম পাবার উপায় নেই। ব্ল্যাকে দুটাকা আড়াই টাকা—তাও অনেক সাধ্যসাধনা করে। কালিদাস বলেছেন 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা'। অর্থাৎ মহৎ লোকের কাছে কিছু প্রার্থনা করে বিফল হওয়াও ভালো তবু অধমের কাছে সফলকাম হওয়া উচিত নয়। —এই বাজারে অসৎ চোর জোচ্চর ব্যবসাদারদের সংখ্যাই বেশি। কাজেই সেই সব অধমদের কাছ থেকে দু'এক কে. জি. গমের জন্যে প্রার্থনা জানাতে আমার মতো একান্ত নিয়মধাবিত্ত লোকেরও সম্মানে লাগে। অথচ একটু আটা না হলে ছেলেমেয়েগুলো জলখাবারই বা খায় কী! দুবেলা ভাত খাওয়াও তো এখনকার দিনে শুধু অন্যায় নয়—অপরাধ!

মধুরভাষিণী গৃহিণী একদিন ব্যাসানের ব্যাগ থেকে শেষ ক' মুঠি আটা থালায় ঢালতে ঢালতে মৃদু স্বরে বললো, স্টীর লোকে সপ্তাহে কলকাতা থেকে সব না হয় আটা নিয়ে আসছে। আর তোমায় বলতে গেলেই—

বাধা দিয়ে বললাম, ওরা কোথা থেকে কেমন করে জোগাড় করে আমি কী করে জানব ?

—একটু নড়ে চড়ে দেখতে হয়। বলে গৃহিণী এমন একটা মুখভঙ্গি করে উঠে গেলেন যে ছুটির দিনের বেলাজটাই নষ্ট হয়ে গেল।

গৃহিণী নড়েচড়ে দেখার উপদেশ দিয়ে গেলেন। কিন্তু কোথায় নড়ব—কিসের ওপর চড়ব কিছুই ভেবে পেলাম না। যাই হোক অনেক চেষ্টা করে আমার এক আত্মীয় মারফৎ পাঁচ কে. জি. গম জোগাড় করে দেখেছি। মাসের শেষে এক ধোকে দাড়ে সাত টাকা বেরিয়ে গেল। তা যাক, তবু শনিবারের বাজার ! গৃহিণী হয়তো প্রসন্ন হবেন—এই ভরসা।

সেই পাঁচ কে. জি. গমও নিতে ভুলিনি। সাবধানেই নিয়েছি—যাতে হোমগার্ডের দল বাইরে থেকে আমার ব্যাগ টিপে ধরতে না পারে। আইন হয়েছে নাকি দু'কে.জি.র বেশি চাল বা গম কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। আইন না ছাই। যত চাপ আমাদের মতো লোকের ওপর—নিতান্ত দায়ে পড়ে যাদের এই সামান্য চাল গম বইতে হয়। আর ওদিকে দেখো দরাতে গোরুর গাড়িতে সাইকেলে এমন কি ট্রেন থামিয়ে বস্তা বস্তা চাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। ওখানে সব 'ব্যবস্থা' আছে কিনা !

কিন্তু যাক ওসব কথা। ভাবতে গেলেই মন খারাপ—শনিবারের আনন্দ মাটি। আপিসের সহকর্মীরাও এর খবর জানেন না। না জানাই ভালো। তাহলে চার্ম চলে যাবে—আর কেউ ঈর্ষা করবে না।

স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। বাসের আর দেখা নেই। বারে বারে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। দুটো তো বেজে গেল। আর আধঘণ্টা মাত্র।

এমনি সময়ে একখানা বাস আত্মপ্রকাশ করল। উরে শালা—ভিড় কী ! ঝুলতে ঝুলতে আসছে। ওর ভেতর এই ব্যাগ নিয়ে ঢোকা অসম্ভব !

বাস মুহূর্তক্ষণ দাঁড়িয়ে—না, স্টপেজের বুড়ি ছুঁয়ে উধাও হয়ে গেল।

তা হলে ? আবার আর একটা বাসের জন্যে অপেক্ষা ? "Failure is the pillar of success ?" —এক্ষেত্রে কিন্তু একবার ফেল করে সাকসেসের আশায় আর একবার ফেলের প্রতীক্ষা করলে ট্রেনটিও ফেল হবে। আর এ ট্রেন না পেলে আবার সেই বিকেলে ! অসম্ভব।

কাজেই পদযাত্রাই শুরু করলাম। মালকোঁচা মেরে কাপড়টা পরে নিলাম, পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে নিলাম—আর ঐ ভারী ব্যাগটি ঝুলিয়ে নিতে সাহস করলাম না যদি হ্যাণ্ডেল ছিঁড়ে যায়। তাই একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে মুটের মতো কাঁধে তুলে নিলাম। মনে মনে একবার বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করলাম। ভাগ্যে ছোটোবেলায় এইসব উপদেশামৃত পাঠ করেছিলাম !

বাড়ি ঢুকতেই স্ত্রীর কণ্ঠস্বর পেলাম। প্রচণ্ড রাগে বড়ো ছেলেটাকে পিটোচ্ছেন আর বকছেন—হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, পড়াশোনা শিকেয় তুলে দিয়েছ ! কেবল আড্ডা ! রাগে আমার হিতে হিতে মাথায় জ্বলেছে !

যা বাব্বা! বাড়ি ঢুকতেই—

অপরাধীর মতো আত্মপ্রকাশ করলাম। এবং কোনো কথা যেন শুনতে পাইনি এইভাবে প্রথমেই ব্যাগ খুলে গৃহিণীর সামনে হরলিক্সের শিশি আর পাঁচ কে.জি. গম বার করে নজরানা দিলাম। গৃহিণী সন্তুষ্ট হলেন কিনা বোঝা গেল না, তবে ছেলেটা তখনকার মতো নিষ্কৃতি পেল।

ছেলে তো নিষ্কৃতি পেল, কিন্তু আমি? চা খাওয়া শেষ হতেই গৃহিণী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ভোতনা তো পড়াশুনো একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। ওর যে ভবিষ্যৎ কী হবে কে জানে! বলে চোখে আঁচল দিলেন।

অসময়ে অকস্মাৎ এই অশ্রুপাতে আমি বিচলিত হলাম।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, কেন মাস্টারের কাছে পড়তে যায় না?

—হাই যায়। পড়ার নাম করে বইখাতা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফিরে আসে। এই দেখোনা মাস্টারমশাই চিঠি পাঠিয়েছেন। বলে কাপড়ের খুঁট থেকে দলা পাকানো একটা চিরকুট বের করে দেখালেন।

আমি চিন্তিত মুখে বললাম—তাই তো। আচ্ছা, আজ তো তুমি শাসন করেছ। কাজেই আজ আর আমি কিছু বলব না। কাল ওকে একবার বুঝিয়ে বলব।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, বুঝিয়ে ব'লে-টলে কিছু হবে না।

আমারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠে বললাম, তবে কি মেরে ধরেই শায়েস্তা হবে?

গৃহিণী অশ্রুবর্ষণ করে বললেন, মারধোর করতে আমারই কি বড়ো সাধ? তুমি তো থাকো বাইরে বাইরে আর আমি কী করে যে এই ছেলে তিনটেকে সামলাই তা আমিই জানি। মেয়েটাও হয়েছে তেমনি দস্যি। ফোলের দিন, তুমি তো ছিলে না, একদল মেয়ের সঙ্গে গিয়েছিল ঠাকুরপাড়ায় রঙ খেলতে। কিরকম যখন তখন চেহারা হয়েছে ভূতের মতো। পোটা একটা সাবান গেছে ঐ রঙ তুলতে।

আমি বললাম, তা ছেলেমানুষ, রঙের দিন একটু রঙ খেলবে না?

গৃহিণী মুখ ভার করে উঠে গেলেন। বললেন, এই ভাবেই তুমি ওদের প্রশ্রয় দাও!

পরের রবিবার।

আয়াস করে চা মুখে দিতেই মুখটা বিকৃত হয়ে গেল।

—চায়ে যেন কিসের গন্ধ?

গৃহিণী মশারিতে তালি দিচ্ছিলেন। দাঁতে ছুঁচ টিপে তালিটা বসাতে বসাতে অস্ফুট স্বরে বললেন—একটু আদা দিয়েছি।

—আদা কেন?

—গুড়ের গন্ধ ঢাকবার জন্য।

—গুড়ের চা নাকি?

—গুড় নইলে চিনি পাব কোথায়? বাজারে কোথাও এতটুকু চিনি নেই।

গৃহিণী একটু থামলেন। তারপর বললেন, অথচ শুনতে পাই কলকাতায় নাকি অঢেল চিনি!

আমি চমকে উঠে বললাম, এ সংবাদ তুমি কোথায় পেলে?

—তুমি ছাড়া আর সকলেই সন্ধান রাখে। ঐতো বুড়ির বাবা—প্রত্যেক সপ্তাহে কলকাতা থেকে

৫ কে. জি. তিন কে. জি. করে চিনি নিয়ে আসে। বুড়ির মা-ই বলছিল। সে তো আর খামকা মিথ্যে কথা বলবে না।

আমি প্রমাদ গুণলাম। বুঝলাম, শুধু বেরি ফুড বা গম নয় এবার থেকে চিনিও জোগাড় করতে হবে।

এও তবু সইছিল, কিন্তু সেবার গৃহিণী বললেন, ভোতনার জন্যে প্রাইভেট মাস্টার দিতেই হবে—তখন আর আমার বাক্যস্ফূর্তি ঘটল না। এ প্রস্তাব আজ নতুন নয়। ইতিপূর্বেও তিনি একাধিকবার করেছেন, আর আমিও কোনোরকমে ঠেকিয়ে রেখেছি অদূর ভবিষ্যতে একটা প্রমোশনের গ্রীন সিগন্যাল দেখিয়ে।

এবারও গৃহিণীর প্রস্তাবে যখন প্রমোশনের জন্যে অপেক্ষা করতে বললাম, তখন তিনি সহাস্য বিদ্রূপে বললেন, তোমার প্রমোশন পেতে পেতে ছেলের ছাত্রজীবন কেটে যাবে।

এই ধরনের আক্রমণ করেই গৃহিণী সচরাচর উঠে চলে যান, এবার যেতে পারলেন না। কিন্তু আমাকেই যেতে হল। কারণ স্ত্রীরা যখন হেঁসেল থেকে আপিস পর্যন্ত ধাওয়া করে আসেন তখন তাঁদের সামনে দাঁড়াতে পৌরুষে বাধে।

এমনি ভাবেই দিন কাটছে। তবু এক একটা শনিবার আসে, আর চঞ্চল হয়ে উঠি। মাত্র এক দিনের জন্যে বাড়ি যাওয়া—তার জন্যেই সাজ সাজ রব! কোথায় গম, কোথায় চিনি, কোথায় একটু ভালো চা। ছেলেমেয়েদের জন্যে লজেন্স বিস্কুট, স্ত্রীর জন্যে জর্দা—নিজের জন্যে ধোওয়া ধুতি পাঞ্জাবি—গৃহিণীর নিপুণ হাতে সেলাইয়ের জন্যে আদ্দির পাঞ্জাবিটা, দাড়ি কামানোর যন্ত্রপাতি, চিরুনি—একটা মাসিক পত্রিকা···তার পর ঠিক পৌনে ছুটোর সময় আপিস থেকে বেরোন—আর সেইসঙ্গে সহকর্মীদের মধুর পরিহাস! দিন কেটে যাচ্ছে বৈকি।

কিন্তু এক শনিবার ঘটল ব্যতিক্রম।

বাড়ি যেতেই গিন্নী বললেন, ওগো, তোমায় মেয়ে দেখতে যেতে হবে।

রসিকতার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, এই বয়েসে আবার?

—খুব হয়েছে! বিনয়ের অবতার! তোমাদের গুণে ঘাট নেই। শোনো, শেষ পর্যন্ত বিনু বিয়েতে মত দিয়েছে। রসুলপুরে একটি মেয়ে আছে। মা লিখেছেন আগামী শনিবার বিকেলে তোমাকেই গিয়ে মেয়ে দেখে আসতে হবে।

বিনয় আমার বালক। এত দিনে তার সুমতি হয়েছে জেনে সুখী হলাম। কিন্তু এ গুরুদায়িত্ব মায়েতে আর মেয়েতে আমারই ওপর দিচ্ছে কেন বুঝতে পারলাম না। হয়তো আমার পছন্দ যে খুব খাঁটি এ প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন। কারণ জীবনে ইতিপূর্বে আমি একটিবারই মেয়ে দেখতে গিয়েছি—আর সে মেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয় নি।

মেয়ে দেখা পর্ব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল। অতিথি-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয় নি। বাইরের ঘরে বসে আছি। পিছনেই ভাঙা-ভাঙা পুকুর। দুপাশে কলাগাছ আর বাঁশ ঝাড়। তখন শ্রাবণের শেষ। মেঘলা আকাশ, জোলো বাতাস বইছে। বাঁশ-ঝাড়ের পাতায় পাতায় যেন শিস্ দেওয়ার শব্দ। কলাগাছের পাতাগুলো বাপটা বাতাসে পস্ পস্ করে উঠছে।

হঠাৎ নজরে পড়ল পুকুর-ঘাট থেকে একটি বধূ গা ধুয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়ে ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনভ্যস্ত দৃশ্য। একটু বিচলিতও হলাম। বেশ লাগল।

মেয়ের বাবা এই সময়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। দুই হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন, এইবার যেন হাসিমুখে আপনার বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

আমি বললাম, অবশ্য। মেয়েটিকে তো আমার খুবই ভালো লেগেছে। এখন একবার ছেলেকে পাঠিয়ে দেব। তারও পছন্দ না হবার কোনো কারণ নেই।

ভদ্রলোক বিনয়ে বার বার নমস্কার করতে লাগলেন।

ট্রেন ধরার তাগিদে আমি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে রিক্সায় উঠে বসলাম। কন্যাকর্তা অসুস্থ শরীর নিয়ে নিজেই স্টেশন পর্যন্ত আসতে চাইছিলেন, আমি বাধা দিলাম। অগত্যা ভদ্রলোক তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটিকে সঙ্গে দিলেন।

সামনের দরজা ছেড়ে মোড় ঘুরতেই আমি আর একবার পিছন ফিরে তাকালাম। পুকুরঘাটে বাঁশঝাড় আর কলাগাছের আড়ালে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি। তখন আকাশে আসন্ন বর্ষার ঘন মেঘ। এরই মধ্যে যেন অকালসন্ধ্যার আবির্ভাব হয়েছে। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল সেই একতলা বাড়ির জানালায় যেন সেই বধূটি। ধোপভাঙা একটা শাড়ি— লাল রঙের ব্লাউজ—কপালে বড়ো করে সিঁদুরের টিপ।

আমি তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, খোকা, উনি তোমার কে হন?

ছেলেটি তাকিয়ে নিয়ে সহজ সুরে বললে, ও তো নতুন কাকীমা। নতুন বিয়ে হয়েছে। আমাদের নিজের কেউ নন। তবু আমরা নতুন কাকীমা বলি।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের কাকাটি কি করেন?

চাকরি করেন কলকাতায়। শনিবারে শনিবারে আসেন। ঐ যে নতুন কাকী দাঁড়িয়ে আছেন— এই ট্রেনে কাকা আসবেন কি না।

রিক্সাওলা মুহুর্মুহু হর্ণ বাজিয়ে একটা মোড় ফিরল। সমস্ত শরীরে ঝাঁকানি দিয়ে উঠল। হঠাৎ মনে হল মনোরমাও কি তাহলে কোনোদিন এমনি করে পথ চেয়ে থাকত শনিবারে শনিবারে?

কে জানে! সে তো কোন্ যুগান্তরের কথা! সাক্ষী নেই কেউ।

———

টেলিফোন ঃ ডাকিনী যন্ত্র

কুমারেশ ঘোষ

আমি টেলিফোনের নাম দিয়েছি—'ডাকিনী-যন্ত্র।'

এই যন্ত্র যেমন দূরের মানুষকে ডেকে দেয়, তেমনি ঘরের মধ্যেও কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। রাষ্ট্রভাষায় এই টেলিফোন যন্ত্রের নাম হয়েছে 'দূর-ভাষিণী'। তাই-ই যদি হয়, তবে এর সঠিক নাম হওয়া উচিত 'দূর-দূর ভাষিণী! দূর দূর থেকে কথা বলা যায় বলে নয়, বাড়ি থেকে 'দূর দূর' করে বিদায় করা দরকার এই ভাষিণী-যন্ত্রটাকে।

আগে লোকে কাউকে অভিশাপ দিতে গেলে বলতো, তোর ঘরে উকিল ঢুকুক, ডাক্তার ঢুকুক। এখন বলা দরকার, তোমার ঘরে টেলিফোন ঢুকুক।

এই ডাকিনী-যন্ত্র একবার যদি আপনার ঘরে ঢোকে তবে ব্যস্ আপনার হয়ে গেল একদম গল্প! নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে পারবেন না, বসতে পারবেন না, ঘুমুতে পারবেন না, ভাবতে পারবেন না, নাইতে পারবেন না, খেতে পারবেন না—কিছু করতে পারবেন না। যখনি কিছু করতে যাবেন ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠবে ঐ ডাকিনী-যন্ত্র: টেলিফোন। বৈজ্ঞানিক ভেঁপু. সভ্যতার বলাবাহুল্য।

এই টেলিফোন না হলে কি মানুষ বাঁচে না? খুব বাঁচে। আগেকার লোক অনেকদিনই বাঁচতো। এই টেলিফোন না হলে কি বড় হওয়া যায় না? তাও যায়। উদাহরণ, কালিদাস, শেক্সপীয়ার, নিউটন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ—আরো নাম বলবার দরকার আছে? টেলিফোন না হলে পেট ভরে না? খুব ভরে। এখনিই বরং ভরে না। টেলিফোনে ভোরবেলায় হরিণঘাটার দুধ আনা যায়? সপ্তাহের রেশন আনা যায়? টেলিফোনে তেমনি মনও ভরে না।

কোথায় সেই মন তোলানো মন ভরানো মধু ঝরানো প্রেমপত্রের মিষ্টি ডাকের বৃষ্টি? সেই 'প্রাণেশ্বর, প্রিয়তম, প্রাণাধিক, এবং ওগো আমার মনের রাজা?' কিংবা 'প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে এবং ছোট্ট পাখী, লক্ষ্মী সোনা, দুষ্টু আমার' ইত্যাদি? কোথায় সেই নীল কাগজের দশ পাতার চিঠি খামে ভরা আর ভাল করে এঁটে তার পেছনে লেখা ৭৪০? সে সব এখন হারিয়ে গেছে। এখন টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে ৭৫-৩৮৩৯ আর হ্যালো, হ্যালো!

এই টেলিফোনের যন্ত্রণায় এতদিনের বিরহকাব্য-ই গেল মারা। এমনি মারাত্মক এই ডাকিনী-যন্ত্র!

তবু কি তাই? আপনার বাড়িতে টেলিফোন নিয়েছেন, মনটা খুব খুশি-খুশি। ছেলে-মেয়েরাও খুব খুশি—বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু খোসগল্প করতে পারবে। গৃহিণীও খুশি, দুপুরবেলায় তিনিও তাঁর বাপের বাড়ির সঙ্গে. বা বান্ধবীর সঙ্গে 'হ্যাঁ ভাই. হ্যাঁ দিদি' করতে পারবেন—কিন্তু সেই সঙ্গে পাড়ার সকলেও

যে খুশি হয়ে উঠেছে, সে খবর হয়তো জানেন না। জানবেন, যখন ফোন আসবে, আপনার পাশের বাড়ির রামবাবুকে একবার ডেকে দেবেন, বা সামনের বাড়ির তরুণদা-কে একবার খবর দেবেন? ব্যস এইবার খবরদারি করুন! আপনার টেলিফোন নম্বরটা কলকাতাময় ছড়িয়ে গেছে এবং দেখবেন, আপনার ফোন আর আসছে না, আসছে পাড়ার লোকের ফোন! এবং আপনি কোন্ সাহসে সে সব ফোনানুরোধ উপেক্ষা করবেন? আপনি না সামাজিক জীব? পাড়ায় বাস করবেন তো?

আর আপনি যদি কাউকে আপনার টেলিফোন ব্যবহার করতে দেন, এবং সেজন্যে কল্ বাবদ পয়সা হাতে নেন তবে তো গেলেন! সে পয়সা আধঘণ্টার ফোনেও উশুল হবে কিনা সন্দেহ। আর যদি সেই টেলিফোনের দুই তারের দুই দিকে কোন সদ্য প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়স্কা থাকে তবে তো আপনার সেই ফোনের ঘরে থাকাও হবে অভদ্রতা—বাইরের বারান্দার কোণে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। আপনার ফোনের ঘর—হতে পারে সেটা আপনার শোবার ঘর—সেই ঘরই হবে কোনালু প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রেমের আস্তানা!

তারপর, ধরুন আপনি সারাদিন খেটে-খুটে এসে খেয়ে-দেয়ে সবে শয্যাশায়ী হয়েছেন, বেশ একটা মিষ্টিঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে, নাকটা সবে ডাকতে শুরু হয়েছে কি—হঠাৎ সশব্দে ডাকিনী-যন্ত্র বেজে উঠলো! আচমকা শব্দে বুকটা আপনার ধড়াস করে উঠলো। ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা ধরলেন, এবং দেখলেন—দেখলেন আপনাকে তিনি চান না। রং-নাম্বার! অথচ আপনাকে চানকে দিলো, চটকে দিলো ঘুমটাকে। আবার এই ব্যাপারই যদি রাত দুপুরে ঘটে (ঘটা বিচিত্রও নয়) তবে আঁতকে উঠতেই হবে, এত রাত্রে ফোন, কী হলো রে বাবা? এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ঘরেই দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হার্টের ব্যাপার তো!

তবে হ্যাঁ, টেলিফোন যন্ত্রের সুবিধেও আছে। যেমন 'কেতনা ডাউ' জানা যায়, টিফিনের সময় বস্ ঘরে না থাকলে তাঁর ঘর থেকে উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম চারদিকের বন্ধুর সঙ্গে একটু ফোনালাপ জমানো যায়, পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে সম্পাদককে তাগিদ দেওয়া যায়, বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে এপয়েন্টমেন্ট করা যায় আর যায় বিনা ভয়ে বা সংকোচে যে কোন টেলিফোন-মার্কা বাড়ির বৌ-ঝিদের সঙ্গে একটু 'ইয়ে' করা! আহা, কী কলই বেরিয়েছে! মোটা বইখানা থেকে পছন্দ মাফিক যাকে ইচ্ছে 'কল্' করো—যা ইচ্ছে বলো, অথচ গালে চড় খাওয়া তো দূরের কথা, গায়ে আঁচড়টি লাগবার ভয় নেই!

কাজেই ঐ যে বাড়ির গেটে দরোয়ান দেখেন, বা গেটের মধ্যে এলসেসিয়ান কুকুর দেখেন বা দরজা-জানলায় ভারি ভারি পর্দা দেখেন—ওসব কিস্সু না। ডাকিনী-যন্ত্রের মন্ত্রে রাস্তার প্রেমপাত্র ঢুকে পড়ে একেবারে শোবার ঘরের মধ্যে।

না মশায়, আমি তো ঠিক করেছি আমার বাড়ির ঐ ডাকিনী-যন্ত্রকে আমি 'দূর' করে দেবো বাড়ি থেকে।

মানে, ঠিক করেছিলাম।

কিন্তু মতটা বদলে গেল সেদিন।

বলবো কি মশায়, সেদিন টেলিফোন করতে গিয়ে হয়ে গেল রং নাম্বার। এবং তারপরেই শুরু হ'লো মধুবর্ষণ! হঠাৎ কানে এলো দু'তারের—মানে তারের দু'পারের দুই কপোত-কপোতীর সে কী বক-বকুম বক-বকুম! সে কী আলাপ, প্রলাপ, প্রেমালাপ! শুনে মনটা যেন বিশ বছর পেছিয়ে গেল, পাখী হয়ে

আকাশে উড়তে লাগলো, শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে গেল। আহা, দুজনের কত মান কত অভিমান, কত কথা কত ব্যথা, কত রাগ কত অনুরাগ, কত ভজনা কত গঞ্জনা এবং আরো কত কি!

টেলিফোনে সেই মন-দেয়া-নেয়া শুনতে-শুনতে—মানে, প্রেমফোনে সেই আধুনিক প্রেমকথা শুনতে শুনতে মনে হলো এ ব্যাপারেও আমরা বেশ প্রগ্রেস করেছি! যারা প্রগ্রেস করতে পারেনি, তারাই ডিসগ্রেস মনে করে। কত নতুন-নতুন ভাব, নতুন-নতুন ভাষা, নতুন-নতুন পরিভাষা, নতুন-নতুন ইঙ্গিত আর ইশারা!

বুঝলাম, এদের কাছে কালিদাস খালি ঘাস, চণ্ডিদাস শুকনো শাঁস। বাজে।

আমি সেই থেকে ফাঁক পেলেই যে কোন নম্বরে ডায়াল ঘুরিয়ে কানে রিসিভার চেপে বসে থাকি। রং কানেকশনের আশায়। সত্যি রং কানেকশন যে মনে এমন রং ধরাতে পারে, তা কে আগে জানতো!

—এ আর কে না জানে! শুনে আমার বন্ধু বলেছিল, আরে বাপু, প্রেমের ব্যাপারে রং কানেকশনেই তো মজা! জানিস নে, পরকীয়া প্রেম তাই তো অত মিঠে! রাইট কানেকশনে কি মজা আছে রে?

রাইট!

ভাবছিলাম, আর দুটো মাস পরে রিটায়ার করলে সময় কাটবে কি ক'রে? আর ভাবনা কি? সারাক্ষণ প্রেম-ফোন কানে দিয়ে বসে থাকবো। মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ করবে।

ভাবছি, আমার আর এক কানের সুখের জন্যে আর একটা প্রেম-ফোন পাবার দরখাস্ত করবো কিনা!

• • •

জীবন

শেক্সপীয়ার বলেছেন জীবন হল ক্ষয়িষ্ণু অনন্তগতি।
বার্নার্ড শ' বলেছেন আমার জীবন হলো এক মশাল……তাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়ে যাব অনাগত যুগের হাতে।

চিনি গো চিনি তোমারে

সঞ্জয় বসু

সুলতাদি-ই খবরটা দিয়ে গেলেন।

পাড়ায় যে দোকান ঘরটা খালি প'ড়ে ছিল, এতদিনে সেটা ভাড়া হ'য়ে গেছে।

পাড়ার সবাই, এমনকি আমরাও চেয়েছিলাম—কেউ যদি ওটা ভাড়া নিয়ে খাবারের দোকান করে তো খুব ভাল হয়। পাড়ায় একটাও খাবারের দোকান নেই। হঠাৎ লোকজন এসে পড়লে, ভারী মুশকিলে পড়তে হয়। যেতে হয় সেই বড় রাস্তার ওপারে। ঐখানে যা একটা দোকান আছে, দোকানটা অবশ্য অনেক বড়; কিন্তু আসতে যেতে যে দশ-পনেরো মিনিট লেগে যায়। অসুবিধে তো ঐখানেই। তাই আমরা সকলেই আশা করছিলাম, যে ঘরভাড়া নেবে, সে নিশ্চয়ই খাবারের দোকান করবে। কিন্তু আমাদের এ-আশা অন্য অনেক আশার মত সফল হ'ল না। যিনি ভাড়া নিলেন, তিনি আমাদের অসুবিধের কথা একবারও ভেবে দেখলেন না। সুতরাং খাবারের দোকানের পরিবর্তে আমরা পেলাম একটি দর্জির দোকান।

এইটুকু খবর দিয়েই সুলতাদি চলে গেলেন। বাকীটুকু আমি নিজেই সংগ্রহ করলাম।

স্কুল থেকে ফেরার পথে তাকালাম দোকানটির দিকে। নতুন সাইন বোর্ড টাঙানো—'অঙ্গশোভা'; সামনে দরজার দু'পাশে দুটো ছোট ছোট কলাগাছ, তারই গোড়ায় মাটির কলসীর ওপর বসানো সিঁদুর আঁকা লম্বীর ভাব। গতকাল বিকালে আনুষ্ঠানিকভাবে দোকানের উদ্বোধন হয়েছে। এগুলো তারই সাক্ষী।

ভেতরের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। মেসিন চালাচ্ছে একটি মেয়ে। বয়স বেশী নয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে।

মিনিট খানেক হয়তো আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম। ওরই মধ্যে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাকে জানিয়ে দিল—মেয়েটির মাথায় সিঁদুর নেই। সীঁথি ফাঁকা। পরণে সাদা-মাটা শাড়ী, সাদাসিধে ভাবে পরা। হাতে একগাছা ক'রে চুড়ি, সোনার কী রোল্ডের বোঝা গেল না। আর কোথাও কোন গহনা নেই। মুখটা লম্বা মতন। রং ফর্সা। চোয়ালে-চিবুকে যতটা কাঠিন্য, কালো চোখ দুটো তার চেয়ে অনেক বেশী কোমল। বর্ষার দীঘির মত টল টল করছে।

আমার ছত্রিশ বছরের জীবনে, এই প্রথম আমি বাঙালী মেয়েকে দেখলাম দর্জির দোকান খুলতে। সুতরাং আমার মত আরও অনেকেই বিষয়টি নিয়ে কৌতূহলী হ'য়ে উঠল। ক্রমশ জানতে পারলাম,—উনি মেয়েদের পোশাক-আশাকই তৈরী করবেন।

সংবাদটা পাড়ার প্রায় সব মেয়েদেরই খুশী করল। কেননা, আধুনিক ফ্যাশনের ব্লাউজ, ফ্রক ইত্যাদি পেতে গেলে 'রেডী-মেড্' কিনতে হয়। তাতে দামও যেমন অনেক বেশী প'ড়ে যায়, জিনিসটাও তেমনি পুরোপুরি পছন্দ হয় না। অথচ কিনতে হয়। পুরুষ দর্জির কাছে গিয়ে মাপ-জোপ দেওয়া তো সকলকার পক্ষে সম্ভব হয় না, সুতরাং মেয়েটিকে সবাই আমরা স্বাগত জানালাম।

সপ্তাহ খানেক পরে বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ওর দোকানে গেলাম। দেখলাম বেশ ভীড়। এরই মধ্যে দোকানের নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। দেখলাম কলেজের মেয়েদের ভীড়টাই বেশী। নানারকম ফরমাইশ ওরা করছে, আর মেয়েটি ঠোঁটের কোণে একটুকরো মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে একমনে লিখে রাখছে ওদের ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ। বিরক্তি নেই, প্রতিবাদ নেই, এ-কাজে খাটুনী অনেক পড়বে, ও-কাজে অনেক ঝামেলা, সুতরাং মজুরী আরও দিতে হবে, এই ধরনের কোনও অনুযোগও নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম ওর কর্তব্যনিষ্ঠা। মনে হচ্ছিল - এই কাজটা ও শুধু ভালবাসে না, মনে মনে গভীর শ্রদ্ধাও করে। কাজটা শুধু ওর জীবিকা নয়, হয়তো ওর জীবনও।

নিজে আমি শিক্ষিকা, কাজের চাপে যখন হাঁফ ধরে তখন জীবনকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। নির্বোধ ছাত্রীদের সঙ্গে বকতে বকতে মনে হয়—অনেক জন্ম পাপ করলে, তবে মানুষ এই কাজ গ্রহণ করে।

জীবন ও জীবিকার দ্বন্দ্বে আমরা প্রতিনিয়ত নিষ্পিষ্ট হই। অল্পেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি। নৈরাশ্যে মন ভরে যায়। ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ জমতে থাকে। তাই একটুতেই অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়ি। সমস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গর্জন ক'রে উঠি। কাজের প্রতি মেয়েটির ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাই আমাকে মুগ্ধ করল। আমি অভিভূত হ'য়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ বসেছিলাম। ব'সে ব'সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম ওর প্রতিটি কাজ।

সবাই যখন চলে গেল, তখন ওর পাশে গিয়ে বসলাম। এতক্ষণ ও আমাকে বসিয়ে রেখেছে ব'লে ক্ষমা চাইল। বলল—কিছু মনে করবেন না কমলাদি, আপনার অনেক দেরী ক'রে দিলুম।

আমার নাম জানলেন কি ক'রে!—আমি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মুচকে হেসে মেয়েটি বলল,—আপনি আসতেই একটি মেয়ে যে চাপা গলায় বলল, এই রে, কমলা-দিদিমণি আসছেন। আগে বোধহয় মেয়েটি আপনার ছাত্রী ছিল।

—তা হবে, আমি অত লক্ষ্য করিনি। আমি একমনে আপনার কাজ দেখছিলাম।

—ছিঃ ছিঃ, আমাকে আবার আপনি বলছেন! মনে করুন না আমিও আপনার ছাত্রী। আমার নাম রেখা।

ওর কথা বলার সহজ-সরল এবং কোমল ভঙ্গী আমাকে আবিষ্ট করল। হাসতে হাসতে বললাম—একা মানুষ তুমি, পারবে অত কাজ করতে? এক সঙ্গে অনেক অর্ডার তো নিলে দেখলাম। সামনে আবার পূজো, তখন তো কাজের চাপ আরও বাড়বে!

রেখা একটু হাসল,—হাসতে হাসতে বলল,—আমি ভাবতেই পারিনি এত তাড়াতাড়ি এত খদ্দের এসে জুটবে। ওরা লক্ষ্মী, ওদের কী ফেরাতে আছে! তাই সকলকার অর্ডারই লিখে নিলাম। অবশ্য এই ভাবে চললে,—আরও দু-একটা 'হ্যাণ্ড্' আমায় রাখতে হবে। কিন্তু এই অজানা জায়গায় 'হ্যাণ্ড্' কি ক'রে পাবো তাই ভাবছি।

একটু থেমে রেখা জিজ্ঞেস করল—আপনার কোনও অর্ডার আছে নাকি কমলাদি।

ওর প্রশ্নটা কানে গেছে; তবুও আমি উত্তর না দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মুখের রেখায় কিন্তু ক্লান্তি নেই। সমস্ত মুখখানা যেন আনন্দে ঝলমল করছে।

বললাম,—এই মেয়েটির একটি ফ্রক ক'রে দিতে হবে, আর আমার দুখানা ব্লাউজ।

চকিতে রেখা উঠে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যে গায়ের মাপ-জোপ নিয়ে, দু-পীস্ কাপড় ভাল ক'রে মেপে পাশের আলমারীর মধ্যে রেখে দিয়ে মেসিনে গিয়ে বসল।

দোকানে বসে থাকা আর উচিত নয়, বুঝতে পারলাম। তবুও উঠতে ইচ্ছে করছিল না। ওকে আরও ভাল ক'রে জানবার জন্যে মনটা কেমন যেন আকুল হ'য়ে উঠেছিল। অহেতুক এবং অশোভন কৌতূহল, বুঝেছিলাম,—কিন্তু মনকে নিরস্ত করতে পারিনি। কেন ও এ-কাজ করছে, বাড়িতে ওর কে কে আছে এখনও বিয়ে করেনি কেন, এই সব জিজ্ঞাসাগুলো তবুও আমায় পেয়ে বসেছিল।

সোজাসুজি প্রশ্নটা করতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম, অথচ উঠতেও পারছিলাম না।

চুপ ক'রে ব'সে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর উঠে আসবার সময় ব'লে এলাম—হাতের কাজ একটু হাল্কা হ'লে একদিন আমাদের স্কুলে এসো। রিজার পিরিয়ডে বেশ গল্প করা যাবে।

হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে রেখা বলল,—নিশ্চয়ই যাবো। আমি তো এর আগে স্কুলেই কাজ করতাম।

হঠাৎ ও নিজের কথা ব'লে ফেলায় আমার পক্ষে খুব সুবিধে হয়ে গেল।—সে-কাজ ছাড়লে কেন?—এ-প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেল ঠোঁটে।

ও বলল, - সে অনেক কথা কমলাদি!

তারপর ও বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল একটু। পা দুটো চলতে লাগল; মেসিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দে ও আরও রহস্যময়ী হ'য়ে উঠল।

মেয়ের হাত ধ'রে আমিও বেরিয়ে এলাম।

তারপর স্কুলে যাওয়ার পথে দু'বেলাই ওকে দেখি। কখনও বড় কাঁচিখানা নিয়ে কাপড় কাটছে, গলায় ঝুলছে ফিতে, কখনও বা মাথা হেঁট ক'রে ঝক্‌ঝক্ করে মেসিন চালাচ্ছে কিংবা নতুন খদ্দেরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। তারই ফাঁকে যদি চোখে চোখ প'ড়ে যায় তাহলে মুচকে হেসে জিজ্ঞেস করে,—ভাল আছেন কমলাদি! দু-একদিনের মধ্যেই আপনাদের বিরক্ত করতে যাব।

কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই আসতে পারেনি রেখা।

এল প্রায় দশ দিন পরে। স্কুলে নয়, আমার বাড়িতে। সন্ধ্যে বেলায়, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমি তখন মেয়েদের খাতা দেখছিলাম।

ভাবতেই পারিনি ও একেবারে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হবে। বাড়ির ঠিকানা অবশ্য ওর কাছে ছিল। অর্ডার বুকে লিখে রেখেছিল সব। কিন্তু অত কাজ ফেলে দোকান বন্ধ ক'রে ও যে কারও বাড়িতে বেড়াতে আসতে পারে, ওর কর্মনিষ্ঠ প্রকৃতি দেখে তা আমি অনুমান করতে পারিনি।

তবে কী ও খুব জরুরী দরকারে এসেছে!

তাড়াতাড়ি খাতা রেখা বন্ধ ক'রে দরজা খুলে দিলাম।

কিসের আবেগে যে ওর হাত দুটো ধ'রে ঘরের ভেতর নিয়ে এসে একটা চেয়ারে ওকে বসিয়ে দিলাম,—বলতে পারিনে। মনে হয়েছিল, ঐভাবে ওকে ঘরে ডেকে এনে ওর সঙ্গে আরও অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠার জন্যে মনে মনে আমি যেন তৈরী হ'য়েই ছিলাম। ও আর আমি কেউই মানতে রাজী ছিলাম না, যে আমাদের পরিচয় অত্যন্ত অল্প সময়ের।

জিজ্ঞেস করলাম,—হঠাৎ কী মনে ক'রে!

ও হাসল, বলল—এ-বেলা দোকান বন্ধ। কেনা-কাটা করবারও কিছু নেই, আপনাদের কাজটাও হ'য়ে গেছে, তাই নিয়ে এলাম। ভাবলাম স্কুলে যাবার আগে কমলাদির বাড়িতে গিয়েই রেখা ক'রে আসি! এসে কিন্তু ভাল করিনি,—তাই না, কমলাদি? আপনার কাজের কত ক্ষতি হ'ল। কাল সারাদিন বন্ধ, কাল আপনাদের স্কুলে যাব!—এক সঙ্গে অনেক কথা ব'লে গেল রেখা। আমি কিন্তু কিছু বললাম না। না ব'লে,—ওর চোখের মধ্যে ওর মনটাকে খুঁজছিলাম। ভাবছিলাম,—নিজের থেকে এই আলাপ করতে আমার পিছনে নিশ্চয়ই ওর একটা তাগিদ আছে। ও হয়ত বন্ধু খুঁজছে,—দু-দণ্ড কথা বলার সঙ্গী। বলার কথা হয়তো অনেক জমা হ'য়ে আছে মনের মধ্যে।

বড় মেয়েকে চা করতে ব'লে দিয়ে, আমিও আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর পাশে এসে বসলাম।

আমি কি subject পড়াই, কতগুলো ছাত্রী, কতজন শিক্ষিকা, শিক্ষক কেউ আছেন কিনা, সেলাইয়ের কাজ শেখানো হয় কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ক'রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রেখা খুব অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠল।

আপনাদের স্কুলটি বেশ,—রেখা একটু গম্ভীর ভাবেই বলল,—একটিও শিক্ষক নেই। আমি যে স্কুলে কাজ করতাম সেখানে পণ্ডিতমশাই ছিলেন, আর ছিলেন অনাদিবাবু। অঙ্কের মাস্টার।

বলতে বলতে হঠাৎ রেখা থেমে গেল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করল। মুখটা কঠিন হ'য়ে উঠল।

ওর এই আকস্মিক পরিবর্তনের দিকে চেয়ে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। ঠিক সেই সময় মেয়ে চা দিয়ে গেল। এবং তাইতেই দুঃসহ পরিস্থিতিটা মুহূর্তের মধ্যেই সহজ হ'য়ে উঠল।

মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম, স্কুলের কাজ ছাড়লে কেন? এখানে কে কে আছে তোমার?

চায়ের কাপটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে, চুমুক না দিয়ে আবার টিপয়ের ওপর রাখল। রেখে বলল,—আমি যে এই হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিজের পেট চালাই, তার জন্যে আমার এতটুকু কষ্ট হয় না। কিন্তু যখনই সেই অপমানের কথা মনে পড়ে, তখনই আমি যেন কেমন ভেঙে পড়ি। কোনও কাজে উৎসাহ পাই না। সমস্ত চেতনা গভীর অবসাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে। শুধু—

বলতে বলতে অধীর আবেগে ওর সমস্ত শরীরটা যেন থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

আমার মনে হ'ল,—ওর জীবনপথে যেখানে মস্ত বড় বাঁক, ঠিক সেইখান থেকে সুরু না করলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি ওকে স্তব্ধ হ'তে হতো না। তাই ভাবলাম একটু সান্ত্বনার আশ্বাস, একটু সমবেদনার নরম সুর ওর মনকে আরও আকুল ক'রে তুলবে, হয়তো অল্পপরিচিতা একটি মহিলার কাছে নিতান্ত অসহায়ভাবে ও কান্নায় ভেঙে পড়বে।

কিন্তু আশ্চর্য, ওর মুখের রেখাগুলো আবার কঠিন হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণ আত্মসম্ভ্রমবোধ, আর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠল ওর কথা বলার ভঙ্গীতে।

—স্কুল কেন ছাড়লাম জিজ্ঞেস করছেন কমলাদি!—কিন্তু না ছেড়ে উপায় ছিল না যে। আমার মতন অবস্থায় পড়লে আপনিও হয়তো কাজ ছেড়ে আলাদা ভাবে থাকতেন। বলতে পারতাম,—এই আমার কপালে লেখা ছিল। কিন্তু ভাগ্য কিংবা অদৃষ্টকে আমি বিশ্বাস করি না। তা যদি করতে পারতাম, তাহ'লে অপরের অবিচারকে নিজের দুর্ভাগ্য ব'লে মেনে নিয়ে হাসিমুখে তার ঘর সংসার করতাম।

আমি ওর কথা কিছু বুঝতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, কার ঘর সংসার করতে? তোমার কি বিয়ে হয়েছে!—বলেই ওর সীঁথির দিকে চাইলাম।

মুচকে হাসল রেখা। বলল,—ওখানে চাইছেন কি! সে-চিহ্ন আমি লুকিয়ে রেখেছি সীঁথিকে বাঁকা ক'রে। সংস্কারকে জয় করতে পারিনি। তাই পুরোপুরি সে-চিহ্নটাকে মুছে ফেলতে সাহস হয়নি।

আমি ওর মাথাটা হঠাৎ কোলের কাছে টেনে এনে চুল ঘুরিয়ে দেখলাম,—অস্পষ্ট লাল লাল ছাপ। সিঁদুরের ক্ষীণ রেখা। হাতে যে চুড়িগাছাটা রয়েছে সেটা যে সোনার পাত দিয়ে মোড়া—এয়োতীর চিহ্ন—তা অনুমান ক'রে নিলাম।

—তা' তুমি এমন ভাবে চলে এলে কেন?—বলতে বলতে নিজেকে ওর চেয়ে বেশী অসহায় ব'লে মনে হ'ল আমার।

রেখা মাথাটা সরিয়ে নিয়ে সোজা হ'য়ে ব'সে বলল,—নিজের ভাগ্যকে জয় করবার জন্যে। নিজেকে খেলো ক'রে অপরের খেয়াল-খুশীকে চরিতার্থ করতে পারিনি, তাই।

—তাই তুমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছ?

—হ্যাঁ!—বাপের বাড়ী, কিংবা কোনও আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেতে পারিনি, কেননা সেখানেও মর্যাদা পেতাম না। তাই এই শহরে চলে এলাম, পরিচিতির গণ্ডী থেকে অনেক দূরে।

—তা, স্বামীর সঙ্গে হয়েছিল কি!—বলতে আপত্তি যদি থাকে—

—না, না আপত্তি কিসের, বলবার জন্যেই তো এসেছি।—বলেই একটু থামল রেখা।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল। বলল,—আপনি বোধ হয় জানেন কমলাদি, যে, মেয়েরা যদি বাইরে কাজকর্ম করতে যায়, তাহলে কর্মক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়।

কর্মক্ষেত্রের পুরুষ-বন্ধু, গৃহের পুরুষটিকে যখন উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে, ঘটনার আকস্মিক সম্মিলন তার কাছে তখন বিশেষ অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। অনাদিবাবুর বয়স বেশী নয়। আমারই সমবয়সী। তার সঙ্গে মেলামেশা করা যদিও বা সহ্য হয়, কিন্তু তার সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া,—সে যে একেবারে অসহ্য। তাই আমার স্বামী সেদিন সোজাসুজি বললেন,—পরসা উপার্জন কর ব'লে তুমি ভেবো না যে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তোমার ভালোমন্দর সঙ্গে আর একজনের ভালোমন্দও জড়িয়ে আছে। তার বংশমর্যাদা নষ্ট হ'তে পারে এমন কাজ যদি তোমায় করতেই হয়, তাহ'লে তুমি নিজের পথ দেখে নিও।

আমি স্থির হ'য়ে ওঁর কথাগুলো শুনলাম। একটুও প্রতিবাদ করিনি। শুধু ব'লেছিলাম,—অনাদিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, এ-কথা সত্যি, কিন্তু একই দিনে, একই সময়ে সিনেমায় যাওয়া একটি সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা। কোনও মতেই পূর্বপরিকল্পিত নয়।—এর চেয়ে বেশী কিছু আমি বলতে পারিনি। নিজেকে defend করার চেষ্টাটাকেও অপমানজনক ব'লে মনে হয়েছিল। তাই আর কিছু না ব'লে আমি একটু হেসেছিলাম।

তাইতে আমার স্বামী আরও রেগে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন আমি বুঝি ওঁকে অবজ্ঞা করছি। ওঁর ব্যক্তিত্বকে বিদ্রূপ করছি। তাই আরও রূঢ় এবং আরও অশ্রাব্য ভাষায় তিনি আমায় গালাগালি করলেন। প্রহার করতেও তাঁর শিক্ষিত রুচিশীল মন এতটুকু ইতস্ততঃ করল না।

এখন বলুন কমলাদি, এইটাই কি আমার পাওনা ছিল? না, একে আমি ভাগ্য ব'লে মেনে নিতে পারি?

আমি স্তব্ধ হ'য়ে ওর কথা শুনছিলাম। আর ভাবছিলাম, সেই অপমানের ভস্মশয্যা থেকে এ-এক নতুন রেখা জন্মগ্রহণ ক'রেছে। এবং সে-ই আমার সামনে ব'সে আছে। চোখে আগুন, চোয়ালের হাড়ে, স্নেহদণ্ডের কঠোরতায় কঠিন জীবন বেহ। আমি মনে মনে আনত হলাম। রেখা হাসল। সুন্দর, স্বচ্ছ, শরতের সকালের মত ঝলমলে হাসি।

পূজোর ছুটিতে একটি চাকর এবং স্বামীকে ঘরে রেখে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এলাম লক্ষ্মী পুজোর পর।

সেই দিনই সন্ধ্যে বেলায় সুলতাদি এলেন। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বললেন,—শুনেছ কমলা, তোমাদের ঐ ধরজিনী চলে গেছে।

মাস্টারনী বলতে সুলতাদি ভীষণ রেগে যান, কিন্তু অনায়াসে রেখাকে তিনি ধরজিনী বললেন। তা' লক্ষ্য ক'রেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়! বাপের বাড়ি!

সে-কথার জবাব না দিয়ে সুলতাদি বললেন,—তুমি যে ওকে খুব ভাল মেয়ে ব'লে মনে করেছিলে তাই তোমাকে সংবাদটা দিতে এলাম। কদিন তো তুমি এখানে ছিলে না, তাই কিছুই জান না। আসলে ঐ মেয়েটাই হ'ল যত নষ্টের গোড়া। স্বামীর ঘর করে না যে-মেয়ে তার কি স্বভাব-চরিত্র ভাল হয়। নিজে যে-পথ বেছে নিয়েছে অন্য মেয়েদেরও সেই পথে টানে। সত্যি তো আর বেশীদিন চাপা থাকে না, তাই সব জানাজানি হয়ে গেছে। পাড়ার ছেলেরাই ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে!

– তাই নাকি। প্রশ্নটা ক'রেই আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলাম,—রেখা কিছু না ব'লেই চলে গেল!

—বলবে আবার কি? বলার ওর মুখ আছে নাকি! তুমি আবার ওকে স্কুলে ঢোকাতে চেয়েছিলে!

সুলতাদির কথা শুনতে শুনতে ভাবছিলাম,—তীব্র আত্মসম্মানবোধ আবার ওকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল কে জানে!

এমন সময় স্বামী অফিস থেকে ফিরলেন। বললেন, তোমার একটা চিঠি আছে। গত কাল বোধহয় এসেছে। পেয়েছ?—ব'লেই ড্রয়ার থেকে চিঠিটা বার ক'রে দিলেন।

কভার ছিঁড়ে দেখলাম রেখার চিঠি। বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে লিখেছে—হঠাৎ একটি দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে আমাকে চলে আসতে হ'ল। সংবাদটি পেয়েছিলাম অনাদিবাবুর কাছ থেকেই। তিনি আমার ঠিকানা কি ক'রে জেনেছিলেন জানি না। সে-কথা থাক;—ট্রাম থেকে প'ড়ে গিয়ে আমার স্বামীর একটি হাত এবং একটি পা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। এখন ক্রমশ আরোগ্যের পথে। ভবিষ্যতে হয়ত তাঁকে বেকার হ'য়েই থাকতে হবে। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি,—আপনাদের ওখানে স্কুলের কাজটা যাতে আমার হ'য়ে যায়, আপনি দয়া ক'রে সে-চেষ্টা করবেন। পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে দোকান চালানো সম্ভব হবে না। যাঁরা মাইনের চাকরিই দরকার। অবসর সময়ে বাইরের কাজ করব।···· একটু সুস্থ হ'লে আপনাদের ওখানে যাবো।·····

চিঠিটা সুলতাদির হাতে দিয়ে বললাম,—রেখার চিঠি। আপনি ততক্ষণ পড়ুন। আমি চা ক'রে নিয়ে আসছি।

মিনিট দশেক পরে, চা আর মিষ্টি নিয়ে বাইরের ঘরে এলাম। দেখলাম—চিঠিটা টিপয়ের ওপর রয়েছে, কিন্তু সুলতাদি নেই। চুপি চুপি কখন চ'লে গেছেন কেউ জানতে পারেনি।

প্রেরণা

মায়া বসু

লেকের ধারে জলের কাছে পুষ্পিত গুলমোহর গাছটির অন্ধকার ছায়ায়, ওরা দুজনে পাশাপাশি বসেছিল। ছেলেটি তরুণ। সুদর্শন। উঠতি লেখক হলেও এর মধ্যেই বেশ নাম করেছে। বয়সের চেয়েও যেন একটু বেশী গম্ভীর। কিছুটা অন্যমনস্ক।

মেয়েটি বিপরীত। হাসিখুশীতে উজ্জ্বল প্রকৃতির মিষ্টি স্বভাবের তরুণী। বেশে বেশে আধুনিকা। সুরূপা সুগঠনা। কলেজের ছাত্রী।

সবেমাত্র সন্ধ্যা। লেকের জলে আলোর ঝিলিমিলি। গাছের পাতারা দক্ষিণ হাওয়ায় শিরশিরিয়ে উঠছে। মার্চের শেষের আবহাওয়া ভারী চমৎকার।

মেয়েটি নীতা। ছেলেটি সুনির্মল।

নীতাই বেশী কথা বলছিল। হাসছিল। এই বয়সের মেয়েরা তাদের ভালবাসার মানুষটির কাছে নিয়ালায় বসে যেমন করে থাকে।

মুক্তাদাঁতের ঝিলিক হেনে ও বললে, 'বলতো, আজ কত তারিখ?'

'তারিখ!' সুনির্মল বিব্রত হয়ে একটু ভাবল। 'আজ তো বিশে মার্চ। কেন বলতো?'

গত বছর এই দিনটির কথা তোমার মনে পড়ে?' নীতা উৎসুক দৃষ্টিতে সুনির্মলের দিকে তাকাল।

'গত বছর। মানে গত বছর বিশে মার্চ।' সুনির্মল ভ্রূ-কুঞ্চিত করে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল।

'ধন্য মানুষ বটে তুমি। কোন কথাই তোমার মনে থাকে না।' নীতার মুখ মুহূর্তে অন্ধকার। গলা অভিমানে ভারী। 'কী এত ভাব বলতো? সব সময় অন্যমনস্ক। ভাল করে আজকাল আমার সঙ্গে কথাও বল না, আমার কথা কানেও নাও না। এত ভুলো মন তোমার! রাতদিন তো পকেটে একটা নোট বই নিয়ে ঘুরছো আর খচ্ খচ্ করে কী সব মাথামুণ্ডু লিখছো। এবার থেকে আমার দু'একটা কথাও না হয় তোমার ওই ডায়েরীটায় লিখে রেখ। তাহলে অন্ততঃ ওটা খুললে চোখে পড়বে। মনেও পড়বে। বুঝলে?'

পকেটের ডায়েরীটার কথা, যখন তখন ওটাতে খচ্ খচ্ করে লেখা বড় বেশী রকমের সত্যি বলে লজ্জিত ও অপ্রস্তুত সুনির্মল বিমূঢ়ের মত পাশ কাটাতে চাইল। 'এক বছর আগেকার কথা মনে করিয়ে না দিলে কি করে আমার মনে পড়বে, শুনি?'

'আমার সব কথা কি করে মনে থাকে?' গনগনে মুখে নীতা বলল। 'মনে নেই, গত বছর এই দিনে তুমি আর আমি ম্যাগ্নোলিয়া থেকে বেরিয়ে সোজা এই লেকে চলে এসেছিলাম? কোথাও দুজনে নিরিবিলি বসবার জায়গা পাচ্ছিলাম না? তারপর ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে শেষকালে এই গুলমোহর গাছটার তলায় বসেছিলাম দুজনে। তুমি আর আমি পাশাপাশি, হাতে হাত রেখে···মনে পড়েছে এবার?

'হাঁ হাঁ—এবার সব মনে পড়েছে।' অকূলে যেন কূল পেল সুনির্মল, সবজান্তা বোকার মত ঘাড় নাড়তে লাগল।

'তুমি বলেছিলে, আচ্ছা বলতো, তুমি আমাকে কী বলেছিলে?'

নীতার জেরায় ঘায়েল সুনির্মলের ঘন ঘন ঘাড় নাড়া বন্ধ হয়ে গেল। মুখ শুকিয়ে আমসী।

'তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না।' নীতা আবার কাপ্‌টা মারল। 'কী করে যে গল্প লেখ, কে জানে? মেমারি শার্প না হলে কখনো নামকরা লেখক হতে পারবে না, বুঝলে? এই চীনবাদামওলা ইধার আও।'

অসীম বিরক্তিভরে নীতা বাদামওলাকে ডেকে ধমকধাম করে তার কাছ থেকে বাদাম আর বাদামুন কিনতে লাগল।

এই সুযোগে লেখক সুনির্মল তার আশে-পাশের নরনারীদের লক্ষ্য করতে লাগল। কত লোকই না এসেছে লেকে বেড়াতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি, কত সুন্দর তরুণী সুপুরুষ তরুণ। ফেরিওয়ালা। ফুচ্‌কা চীনাবাদাম কালমুড়ির দল। মালাই বরফ থেকে কোল্ডড্রিঙ্ক অবধি। গরম চা-ও পাওয়া যাবে। বেলফুলের মালাও! কিন্তু সুনির্মলের ওসব দরকার নেই। নতুন গল্পের জন্যে তার এখন নতুন প্লটের দরকার। আর কয়েক মাস বাদেই পুজো। গোটাকতক ভাল গল্প তাকে লিখতেই হবে। অল্প কয়েক বছর লেখা সুরু করলেও বাজারে তার একটু নাম আছে। চাহিদাও আছে। সম্পাদকের তাগিদও আছে বেশ জোর।

ওঁরা তো ভাল গল্পের জন্যে তাগাদা মেরেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু নতুন ভাল গল্প লেখা যে কী ভয়ঙ্কর সমস্যার ব্যাপার তা যদি···বাঃ বেশ দেখতে তো মেয়েটিকে! চোখ দুটি কী চমৎকার! ঠিক যেন ওই লেকের জলের মত গভীর!

সুনির্মলের দৃষ্টি কিছু দূরে বসে থাকা একটি সুন্দরী তরুণীর দিকে নিবদ্ধ হল। সাদা সাড়ি সাদা ব্লাউজ পরা প্রায় নিরাভরণা মেয়েটি চুপচাপ জলের দিকে তাকিয়ে একা বসে ছিল। দৃষ্টি বিষাদময়। মুখ গভীর। দুটো হাত কোলের ওপর জড়ো করা। এত কী ভাবছে ও? ওর জীবনে নিশ্চয়ই কোন বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে গেছে। মেয়েটি কি কুমারী? না বিধবা? বোধহয় বিধবা। পরণের সাড়ি ব্লাউজে কোন রং নেই···

'হাঁ করে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছো কেন শুনি? আমি বকে যাচ্ছি, সেদিকে মন নেই কান নেই, একটা কথার জবাব পর্যন্ত নেই। চোখের পলক পড়ছে না যে, ব্যাঁ!'

নীতার হাতের ঠেলা খেয়ে তাড়াতাড়ি সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল সুনির্মল। 'মোটেই না। মেয়েটা তোমার চেয়ে সুন্দরী নয় যে আমি ওকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে গিলে ফেলব। দেখেছ ওর সাড়ি ব্লাউজ সব সাদা? তাই ভাবছিলাম মেয়েটা কুমারী না বিধবা? ভাবছিলাম ওর জীবনে হয়তো কোন গভীর দুঃখ আছে। জলের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ যেভাবে ও একলা বসে আছে—'

'যাও! ওর কাছে গিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করগে যাও!' নীতা তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বলে উঠল। 'আমি জানি, তুমি হিপোক্রিট। হার্টলেস্! কোনদিনও তুমি আমাকে ভালবাসনি। সব আমার একতরফা···আমিই শুধু বোকার মত তোমাকে···'

'আঃ নীতা, কী হচ্ছে? তুমি ভাল করেই জান আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি। লক্ষীটি? ভুল বুঝোনা—'

সুনির্মল বিব্রত ভাবে ওর হাত ধরতে গেল।

'তুমি ঠগ্ জোচ্চর মিথ্যাবাদী।' নীতা এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঙাসুদ্ধ চীনাবাদামগুলো ছড়িয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

নীতা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। আগ্নেয়গিরির জলন্ত তরল লাভা বেরুতে লাগল তার মুখ থেকে। 'তুমি—তুমি মিথ্যুক। ভালবাসা কাকে বলে তুমি জান না। ভালবাসার ভান কর। তুমি আবার লেখক! তুমি আবার প্রেমের গল্প লেখ! একটা সরল সুন্দর মেয়েকে ভালবাসার নাম করে ঠকিয়ে তুমি নাম কিনতে চাও? সাত জন্মেও তুমি নামকরা সাহিত্যিক হতে পারবে না।'

'তুমি কেন যে এসব বাজে কথাগুলো শুনিয়ে আমাকে দুঃখ দিচ্ছ নীতা! তুমি ভাল করেই জান, আমার ভালবাসায় এতটুকু ভেজালও নেই।' ঘাসে ছড়িয়ে পড়া বাদামগুলি কুড়োতে কুড়োতে সুনির্মল নীতাকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

'তাই বটে।' শান্ত হবার বদলে নীতা আরো তিন ডিগ্রী জ্বলে উঠল। 'শুধু আজ নয়। যখনি তোমার সঙ্গে কোথাও গেছি, আমাকে তুমি একটা মানুষ বলেই গ্রাহ্য করনি। আমার দিকে তোমার চোখ থাকে না। মনও থাকে না। তুমি অন্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাক। আমি কি কচি খুকী? আমি ছাকা? আমি তোমার মনের ভাব টের পাইনা না? তুমি নিজেকে একটা মস্ত হোমরা চোমরা লেখক ভাব, না?'

'আমি মোটেই নিজেকে তা মনে করি না। যাঁরা সত্যিকার মস্তবড় লেখক, তাঁরাও নিজেকে তা মনে করেন না।'

'তুমি কর।' নীতার গলা ছুরির মত ধারালো। 'তুমি নিজেকে একটা মস্ত সাহিত্যিক বলেই ভাব। কিন্তু জেনে রেখ, তোমার চেয়ে অমরেশ বসু, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ ঘোষ, সুবিমল মিত্র এঁরা ঢের ঢের বেশী ভাল লেখক।'

মেয়েরা কী নিষ্ঠুর! কী স্বার্থপর! কী সেলফ্ সেন্টারড্! সদাসর্বদা নিজেকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। নিজেকে নিয়েই আছে। নিজের স্বার্থটুকু ছাড়া আর কিছুই জানে না ওরা। নীতা ভাবে, ও কাছে থাকলে আমার সমস্ত মন প্রাণ এমন কি চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত ওর দিকেই আটকে থাকবে। আমি লেখক। আমার একটা আলাদা শিল্পী মন শিল্পী সত্তা আছে। সিক্স্থ সেনস্ বা একটা অতীন্দ্রিয় চেতনাও আছে। যে চেতনা শিল্পীর সৃজনকে, শিল্পকর্মকে মহত্তর করে তুলে তার রচনাকে সার্থকতার স্তরে পৌঁছতে সাহায্য করে। কিন্তু নীতার এসব ধারণাই নেই। চেতনাও নয়।

কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাবার সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটাও চড়ে গেল সুনির্মলের। 'তুমি একটি অতি স্বার্থপর, সেল্ফ্ সেন্টারড্ মেয়ে। শুধু নিজেকে ছাড়া আর কোন কিছুই জান না। তুমি সঙ্গে থাকলে সব সময় যে তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে, তোমার দিকে নজর রাখতে হবে, এমন কোন মানে নেই।' ফস্ করে কথাটা কেমন করে যেন ওর মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল।

'কী বললে! আমি স্বার্থপর! আত্মকেন্দ্রিক!'

সুনির্মলের শেষের কথাগুলো নীতার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে চাপা পড়ে গেল। বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়াল ও। ওর চোখ জ্বলছিল। মুখ ক্রোধে আরক্ত, নিঃশ্বাস দ্রুত। 'জানতাম—আমি জানতাম তোমার কাছ থেকে একদিন এই সমস্ত কথা আমাকে শুনতে হবে। কিন্তু সেদিনটা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে, তা কল্পনাও করিনি।'

ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে নীতা হন হন করে সোজা এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

'এই নীতা—এই—এই নীতু, রাগ করোনা শোন, শোন, দাঁড়াও লক্ষ্মীটি—' বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ব্যাকুল সুনির্মল ওকে অনুসরণ করল।

নীতা সাড়াও দিল না। মুখও ফেরাল না।

সুনির্মল এক রকম ছুটতে ছুটতে ওর সঙ্গ ধরে ওর সঙ্গে চলতে চলতে অনুনয়ের স্বরে বলতে থাকে, 'সামান্য কথাতেই তুমি এত রেগে উঠলে কেন বলতো? তুমি কি সত্যি বোঝনা আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি?'

নীতা একটু শান্ত হল। সুনির্মলের গভীর ও অকৃত্রিম কথাকটা ওর হৃদয় স্পর্শ করল।

সদর রাস্তায় অসংখ্য যানবাহনের আসাযাওয়ার জন্যে রাস্তা পার হবার আগে থমকে দাঁড়াল নীতা। ওর মুখ চোখ দেখে সুনির্মল বুঝল ও একটু নরম হয়েছে।

এ সুযোগ ছাড়ল না সুনির্মল। গলায় আদর ঢেলে ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে ও বলে চলল, 'হয়তো সব সময় তোমার কথার উত্তর ঠিকমত দিতে পারি না। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে আমি তোমার কথায় গুরুত্ব দিই না। হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে যাই, অন্য চিন্তা করি, কিন্তু নীতা আমার মন তো তোমাকেই দিয়েছি। সে মন সদা সর্বদা তোমার মনের কাছেই বাঁধা আছে। সব জেনেশুনেও তুমি কেন যে আমার ওপর রাগ কর!'

'না রাগ করব কেন?' সুনির্মলের দিকে এক মর্মভেদী বিদ্যুৎগর্ভ কটাক্ষ হেনে ভ্রূভঙ্গি করল নীতা। 'যাদের হৃদয় বলে কিছু নেই, তারাই এইরকম উপেক্ষা অবহেলায় নির্বিকার হয়ে থাকতে পারে। বাড়িতে কত লুকোচুরি করে তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসি। শুধু কি আমি একলা বক্ বক্ করব বলে? কেন, তুমি বুঝি আর আমাকে দুচারটে ভাল কথা শোনাতে পারোনা?

রাস্তার চাঁদের আলোর মত মায়াময় ফ্লুরেসেন্ট আলো জলে উঠেছে। লেকের জলে সেই আলোয় ঝিলিমিলি। কাছেই গুম্ গুম্ ঝিক্‌ঝিক্ রেলগাড়ির আওয়াজ। দুটি প্রায় সংলগ্নদেহ তরুণ তরুণী। একটি সুন্দরী কিশোরী···দুটি ছোট্ট ছেলের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটা অন্ধ মানুষ একজনের হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছে। গাছের তলায় একজন নিঃসঙ্গ মানুষ আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে—

চারদিকে তাকিয়ে সুনির্মল কের অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এদের প্রত্যেকের জীবন নিয়েই তো কত গল্প হয়!

'তোমার ভালবাসা শুধু মুখে মুখে। আজ নয়, এক বছর আগে যখন তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, তখনও তুমি যেমন ছিলে, এক বছর পরও ঠিক তেমন আছো। অন্য লোকেদের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ভালবাসা ক্রমে বাড়ে, আর তোমার? কী কথাগুলো কানে যাচ্ছে, না না?

নীতা কনুই দিয়ে সুনির্মলকে গুঁতো দিল।

'অ্যাঁ! কী বললে?' সচকিত সুনির্মল ফ্যাল ফ্যাল করে এমন ভাবে ওর দিকে তাকাল যে স্পষ্ট বোঝা গেল নীতার কোন কথাই ওর কানে যায়নি।

'সব মিথ্যে। সব ভান! চীট লায়ার কোথাকার। আমি তোমার কেউ নই। গল্প লেখার প্রেরণার জন্যেই আমার সঙ্গে ভাব করেছিলে। আমাকে নিয়ে লেখা শেষ হয়ে গেছে, এখন নিত্যি নতুন প্লট চাই। নিত্যি নতুন মেয়ে চাই!' নীতা রাগে ফেটে পড়ল।

দি আইডিয়া! বিদ্যুৎ চমকের মতই সুনির্মলের মাথার মধ্যে তখন একটা নতুন প্লট এসে গেছে, নীতার কথার মাঝখানেই। দুটি তরুণ-তরুণী, তাদের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল। তরুণটি একজন লেখক। জীবনদর্শনের গভীরতায় সে মাঝে মাঝে ডুবে যায় বলে সে তার প্রিয়তমার ওপর সর্বদা সুবিচার করতে পারে না। তার এই নির্লিপ্তি ও উদাসীনতাকে তার প্রেয়সী প্রেমহীনতার লক্ষণ বলে ভুল করে। সে ভাবে লেখক অন্য মেয়েকে ভালবাসে, তাকে আর চায় না। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির পালা সুরু হয়। লেখক তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না, যে, সৃষ্টির কাজে এই অন্যমনস্কতা উদাসীনতা প্রকৃতিসিদ্ধ। এই নিয়ে মান-অভিমান কলহ-বিবাদ মনোমালিন্য—

তারপর বিচ্ছেদ। অর্থাৎ বিয়োগান্ত গল্প।

ঠিকমত গুছিয়ে লিখতে পারলে এটি একটি চমৎকার ছোট গল্প হবে। কিন্তু এই চমৎকার প্লটটা এখুনি ডায়েরীটায় লিখে রাখা দরকার। নীতা ঠিকই বলে। ভারী ভুলো মানুষ সুনির্মল। লিখে না রাখলে কিছুক্ষণ পর কিছুই মনে থাকবে না তার। সদাসর্বদা এই জন্যেই ও পকেটে নোট বইটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ মাথায় এসে যাওয়া প্লটগুলো না লিখে রাখলে, হঠাৎ এমনভাবেই তারা আবার অদৃশ্য হয়ে যায় যে তাদের জীবনেও আর কোন সন্ধান মেলে না। ব্রেনের ডিফেক্ট আছে বোধ হয় তার। নীতা মিথ্যে রাগ করে না। কিন্তু নীতা সাংঘাতিক রেগে আছে। এই সময় নোট বইটা ওর সামনে বার করলে ও একেবারে রণরঙ্গিনী হয়ে উঠবে।

কিন্তু উপায়ই বা কি? সুনির্মল অতি সন্তর্পণে কাঁপা হাতে পেন আর নোট বইটা বার করে প্লটটা লিখতে চেষ্টা করল।

'আমি জানতাম!' বোমার মত বিস্ফোরণ ঘটায় নীতা। 'তুমি—তুমি মানুষ নও। একটা পাথরের স্ট্যাচু, যার মধ্যে রক্ত মাংস হৃদয় বা অনুভবশক্তি কিছুই নেই। তুমি কোন দিনও আমাকে ভালবাসনি, কোনদিন বাসতে পারবেও না—'

সুনির্মলের পাশ থেকে ছিটকে সরে গেল নীতা। চোখে রুমাল দিতে দিতে রাস্তার চলমান গাড়িগুলোর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'নীতা—নীতা—শোন—লক্ষীটি অমন করে চলে যেও না—'

সুনির্মলের ডাক নীতার কানে গেল কি না বোঝা গেল না।

হতবুদ্ধি বিমূঢ় বিহ্বল সুনির্মল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। করুণ দৃষ্টিতে একবার হাতের পেন আর ডায়েরীটার দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে এমন সুন্দর মর্মস্পর্শী প্লটটা লিখে না রাখলে সে সবকিছু ভুলে যাবে। নীতা ঠিকই বলে। ভারী ভুলো মন সুনির্মলের।

কিন্তু নীতা যে ওদিকে চলে গেল!

মেয়েরা ভারী অবুঝ। কিছুতেই ওরা বোঝে না, সহজে গল্প লেখা যায় না। সুনির্মল এখন কী করবে? কী করে একথা ওকে বোঝাবে?

নীতার মান ভাঙাতে ওর পেছনে ছুটবে না নোট বইটাতে এই জটিল প্লটটা লিখে রাখবে?

এই জরুরী বিষয়টা ভাবতে ভাবতে, দ্বিধা সংশয়ে দুলতে দুলতে অভিমানক্ষুব্ধ নীতাকে রাস্তার অসংখ্য মানুষের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখল সুনির্মল।

আকাঙ্ক্ষা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অপ্রত্যাশিতভাবে কমপ্লিমেন্টারি কার্ডখানা পেয়ে প্রথমে খুব খুশিই হয়েছিলেন সত্যগোপাল। পাড়ারই একটি যুবক তাঁকে উপহার দিয়ে গেল। একার নয়, দুজনের; আরো একজনকে সঙ্গে নিতে পারবেন সত্যগোপাল। ভাই বন্ধু স্ত্রী বান্ধবী যে কেউ। ছেলেটি রসিক আছে। তাঁকে নিঃসঙ্গভাবে রুপালী চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী দেখতে আমন্ত্রণ করেনি। বই মানুষ একা বসে পড়ে, কিন্তু ছবি দেখতে হলে আরো একজনকে সঙ্গে নিতে হয়।

ছেলেটির মুখ চেনেন। কিন্তু নামটি মনে করতে পারছিলেন না সত্যগোপাল। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করেই বসলেন, 'ইয়ে তোমার নামটি যেন কী, কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে।'

প্রসন্নমুখ যুবক প্রৌঢ়ের এই স্মৃতিদৌর্বল্যে ক্ষুণ্ণ হল না। হেসে বলল 'স্যার আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। কলেজে পড়াতেন আমাদের।' আমার নাম দিবেশ সেনগুপ্ত।'

সত্যগোপাল বললেন, 'বেশ বেশ।'

প্রথম যৌবনে কয়েক বছর কলেজে পড়িয়েছিলেন সত্যগোপাল। পড়িয়ে দেখলেন আর যাই হোক বিদ্যাদানের ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি দিতে চাইলে কী হবে ছেলেরা নিতে উৎসুক নয়। তাঁর ক্লাসে গোলমাল হয় বেশি, পড়াশোনা হয় কম, এই অখ্যাতি ঘাড়ে নিয়ে তিনি কলেজ ছেড়েছিলেন। বিস্মৃতি সেই অপ্রীতিকর দুঃখের দিনগুলিকে অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে। তারপর সত্যগোপাল এক বেসরকারী অফিসে কাজ নিয়েছেন। চুপচাপ বসে কলম চালান। সহকর্মীদের সঙ্গে মোটামুটি সহযোগিতা রক্ষা করে চলেন। তেমন কোন শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ তাঁর নামে ওঠেনি। বড় রকমের কোন সাফল্যও আসেনি আবার নিদারুণ বিফলতার মনস্তাপেও কষ্ট পেতে হয়নি।

সেই অখ্যাতি আর অপচয়ের দিনগুলিতে জনকয়েক অনুরাগী ছেলে তাঁর কাছে আসত। বাসায় যেত। সহানুভূতি নিয়ে কথাবার্তা বলত। সত্যগোপালের মনে হয় তারা তাঁর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতেও পারত। এই দিবেশ কি তাদেরই একজন? না যারা পিছনের বেঞ্চে বসে বিড়াল ডাকত, কবিতা পড়াবার সময় কখনো হাতে কখনো জুতোর শব্দে তাল দিত তাদের দলের, সত্যগোপাল তা মনে করতে পারলেন না। সে কথা জিজ্ঞাসা করেও এখন লাভ নেই। বরং যুবকটির শুভদক্ষিণা তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন।

দিবেশ বলল, 'যাবেন কিন্তু স্যার।'

সত্যগোপাল বললেন, 'আচ্ছা যাব।'

শিবেশ বলল, 'অ্যাডমিট টু বলে লিখে দিলাম। আপনি সঙ্গে কাউকে নিয়ে যেতে পারেন।'

সত্যগোপাল বললেন, 'আচ্ছা।'

কাউকে। ইচ্ছা করেই বোধ হয় শিবেশ মাসীমা কথাটা ব্যবহার করল না। আজকাল তরুণ-তরুণীরা তাঁর স্ত্রীকে বেশির ভাগ মাসীমা বলেই ডাকে। প্রতিসুখকর মনে হয় না সত্যগোপালের। তবে শুনতে শুনতে অনেকটা কান-সওয়া হয়ে গেছে।

নিজের এই মনোভাবে সত্যগোপাল নিজেই মাঝে মাঝে হাসেন। এও এক ধরনের ইডিয়োসিনক্রেসী। শুধু সম্বোধনের হেরফেরে কি আর জরাকে ঠেকানো যায়? ঠেকাবার দরকারই বা কি। যৌবনের মত বার্ধক্যও জীবনের আর একটি পর্যায়। বার্ধক্যে জীবনকে আর এক ভাবে ভোগ করতে হয়। যৌবনে সৃষ্টি আর সম্ভোগ, বার্ধক্য জীবনকে নিরাসক্ত দৃষ্টি উপহার দেয়। অপরাহ্নের সেই আলো অধ্যয়ন আর মননের পক্ষে খুবই উপযোগী।

একথা সত্যগোপাল রায় যে জানেন না তা নয়। কিন্তু সব সময় মানতে পারেন না। প্রবীণ হয়েও শিক্ষা নিতে হয়। সে শিক্ষা বড় কঠিন শিক্ষা।

কার্ডখানা পেয়ে সত্যগোপাল খুশি হলেন। আজকাল প্রাপ্তির সীমা স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। বন্ধুরা বই বগলে নিয়ে আর উপহার দিতে আসে না। থিয়েটার সিনেমার টিকেট কেটে এনে কেউ বলে না, 'চল দেখে আসি।' আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের পালা অতি সীমিত।

বন্ধুরা নিজেদের কাজকর্ম আর পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। কূর্মের সেই আবরণ থেকে তাদের বের করে আনা কঠিন। সত্যগোপাল নিজেও কি সেই কূর্মবৃত্তি নেননি! তিনিই বা কজনকে নিজের বাড়িতে ডাকেন? অনাহূত কেউ এসে পড়লে কতক্ষণ প্রসন্ন মনে তাঁকে সঙ্গ দেন?

কার্ডখানা টেবিলে রেখে দিলেন সত্যগোপাল। কিন্তু ওই রাখাই সার। সিনেমা দেখা আর হয় না। অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে রোজ দেরি হয়ে যায়। কাজকর্মের চাপ বেশি। ফিরে এসে বড় ক্লান্তি লাগে। কোথাও নড়তে চড়তে মন যদি বা চায়, শরীর সায় দেয় না। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকেন।

কার্ড তাঁর নামের। কিন্তু একদিন ছেলে দেখে এল। আর একদিন গেল মেয়ে। দুজনে আলাদা আলাদা গেছে। নিশ্চয়ই একা যায় নি। ওই বয়সে কেউ কি আর একা একা সিনেমা দেখে? স্ত্রীকে বললেন, 'বেশ তো মজা। আমার কার্ড, আর তুমি পাঁচজনকে বিলিয়ে বিলিয়ে দিচ্ছ।'

সুনন্দা বললেন, 'তুমি এত হিংসুটে কেন বলতো? ও কার্ড দিয়ে তুমি কী করবে? যারা দেখে আনন্দ পাবে তারা দেখুক।'

সত্যগোপাল বললেন, 'দেখে আনন্দ তো আমিও পেতে পারি!'

সুনন্দা বললেন, 'রাম বলো। এই বুড়ো বয়সে তোমার আর ও-সব দেখে দরকার নেই। অমনিতেই ভীমরতি যায় না।'

সত্যগোপাল মনে মনে ভাবলেন, 'তা ঠিক। এখন রতি মানেই ভীমরতি।'

তিনদিনের তিনটি শো হয়ে গেল। চতুর্থ এবং শেষ দিনে নিজের নামের কার্ডখানা নিয়ে পকেটস্থ করলেন সত্যগোপাল। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'আজ আর এই কার্ড কাউকে দিতে পারবে না। আজ আমি নিজেই যাব।'

সুনন্দা বললেন, 'বেশ তো যাওনা। এই বেলা দশটার সময়ই যাবে নাকি ?'

সত্যগোপাল বললেন, 'দশটার সময় কেন, সময়মতই যাব। তুমি চলো, যাবে আমার সঙ্গে।'

'ওরে বাবা! সূর্য আজ কোন্‌দিকে উঠেছে ? দরকার নেই তোমার অত দয়াদাক্ষিণ্যে। মুখে বলেছ এই আমার পরম ভাগ্য।'

কিন্তু সুনন্দার এই মান-অভিমানের খোঁচা এও যেন নিতান্তই মৌখিক। সত্যগোপাল জানেন সুনন্দা বহুদিন তাঁর সঙ্গে বেড়িয়ে আনন্দ পান না। জীবনসঙ্গিনী ভ্রমণসঙ্গিনী হতে বড়ই কুণ্ঠিত। তাঁর সিনেমা দেখা, সমাজ সামাজিকতা রক্ষা করার জন্যে অন্য সঙ্গী সঙ্গিনী আছে। নিতান্তই যেখানে একসঙ্গে না গেলে নয়, সেখানেই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে যান। সত্যগোপাল তবু একটু সাধাসাধি করলেন স্ত্রীকে, 'চল যাই। একটা কার্ড যখন পাওয়া গেছে—'

সুনন্দা কাতর অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, 'আজ থাক আর একদিন যাব লক্ষ্মীটি। সিনেমা দেখতে গেলে অমনিতেই আমার মাথা ধরে। তারপর আবার ওই কড়াশী ছবি। কিছু বুঝতে পারব না মিছামিছি—

সত্যগোপাল বললেন, 'ছবি দেখাটা একটা উপলক্ষ্য। দুজনে মিলে একটু ঘুরব, বেড়াব, সেইটাই আসল।'

সুনন্দা হেসে বললেন, 'থাক আর কাব্যে দরকার নেই। কলকাতা শহর দেখে দেখে আমার চোখ পচে গেল। এখানে আমার একটুও বেরোতে ইচ্ছা করে না। যখন বাইরে কোথাও নিয়ে যাবে তখন বেশ মনের আনন্দে বেড়াব। যা বলবে তাই করব।'

সত্যগোপাল আর পীড়াপীড়ি করলেন না। বললেন, 'আচ্ছা।' তারপর কী কথা মনে পড়ে গেল, হেসে বললেন, 'আজ তোমাদের শনিবার তাই না ?'

সুনন্দা বললেন, 'আমাদের শনিবার আর তোমার বুঝি শনিবার না ?'

সত্যগোপাল বললেন, 'মানে আজ তোমাদের সেই তাসের আসর আছে না ? সেই কথা বলছি। আজ তোমার সেই রেখা আর সুশোভনের দল আসবে।'

সুনন্দা রাগ করে বললেন, 'আসবেই তো। সপ্তাহে একদিন একটু বন্ধুবান্ধব মিলে বসি। তাস খেলি, হাসি গল্প করি, তাতেও তোমার হিংসে ?'

সত্যগোপাল রঙ্গে ভঙ্গ দিয়ে বললেন 'আহা, হিংসের কথা নয়। এমনিই বলছিলাম।'

বাসের ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অফিসে যাওয়াটা অভ্যাস হয়ে গেছে সত্যগোপালের। আর যেতে যেতে ভাবা। চিন্তার বিলাস ছাড়া আর কিসেই বা বিলাস আছে এই বয়সে ? আর এই বাঁধা বরাদ্দের অর্থসামর্থ্যে ?

সত্যগোপাল জানেন শুধু একদিনই নয়, সপ্তাহে দু-তিন দিন তাসের আসর বসে সুনন্দার ঘরে। সেই আসরে অল্পবয়সীদেরই ভিড় বেশি। আশেপাশের ফ্লাটগুলি থেকে তরুণ-তরুণীরা আসে। সুনন্দা তাদের সান্নিধ্যে আনন্দ পান, যেন নতুন তারুণ্য লাভ করেন। বাইরের কোন ক্লাবের দরকার হয় না সুনন্দার। ঘরেই তিনি ক্লাব বসাতে পারেন।

স্ত্রীর এই আনন্দে বাধা দেবার কোন অধিকার নেই সত্যগোপালের। কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া চলে। পারিবারিক, সামাজিক, নানারকম বিধিনিষেধ অনুশাসন দিয়ে মানুষের কাজকে বাঁধা যায়। কিন্তু অবসর যাপনে প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। যে যার নিজের রুচি অনুযায়ী এই পৃথিবী থেকে আনন্দ আহরণ করুক। 'সংসার আনন্দময় যার চিত্তে যা লয়।'

সত্যগোপাল জানেন সংসার অবিমিশ্র আনন্দময় নয়। আনন্দ আর বিষাদের মিশ্রিত রসায়ন। সেই রসায়নে কারো কারো প্রকৃতি আর প্রবণতায় বিষাদের ভাগই বেশি। হয়তো তাতেই তারা জীবনের স্বাদ পায়। কেউ কেউ যেমন শুকতো আর তেতো খেতে বেশি ভালোবাসে।

অফিসে এসে কাজের চেয়ে অবসর যাপনের কথাটাই বেশি মনে পড়ল সত্যগোপালের। বিষাদের রাজ্য থেকে প্রসন্নতার সাম্রাজ্যে প্রবেশের আজ তিনি একটি ছাড়পত্র পেয়েছেন। কিন্তু সেখানে নিঃসঙ্গ যেতে মন সরে না। একজন সঙ্গী কি সঙ্গিনী চাই।

অফিসে কয়েকটি তরুণী মেয়ে আছে। সঙ্গসুখ লাভের জন্যে প্রথমে অবশ্য তাদের দিকেই চোখ পড়ল সত্যগোপালের। দুজন টাইপিস্ট, একজন টেলিফোন অপারেটর, আর গুটি পাঁচ ছয় কেরাণী। সবাই যে সুশ্রী তা নয়, কিন্তু যৌবন-মহিমায় রানী হয়ে বসে আছে। ওদের সঙ্গে অল্প-স্বল্প আলাপ আছে সত্যগোপালের। কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠতা নেই যে সিনেমা দেখার সঙ্গিনী হতে ওদের ডাকতে পারেন। ওরা সিনেমা যে দেখে না তা নয়। যুবক সহকর্মীদের সঙ্গে দেখে। আর দেখে প্রৌঢ় ক্ষমতাবান বিত্তবান অফিসারদের সঙ্গে। দৈহিক সামর্থ্যের মত সেও আর এক ধরনের যৌবন বিত্ত আর প্রতিপত্তির মধ্যে উদ্ভাসিত। সত্যগোপালের দৈহিক রূপ লাবণ্য নেই, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি নেই। শুধু মিষ্টভাষী, সদালাপী, সদাচারী বলে খ্যাতিটুকু আছে। তার জন্য কেউ কেউ হয়তো তাঁকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু কাছে এসে ঘনিষ্ঠভাবে মেশে না। সত্যগোপাল জানেন তাঁর স্বভাবের মধ্যে মেরু অঞ্চলের শীতলতা আছে। সেই শৈত্য সবাইকে দূরে সরিয়ে রাখে। না, ওই তরুণী সহকর্মীদের কারো কাছে গিয়ে হঠাৎ সঙ্গভিক্ষা করতে পারেন না সত্যগোপাল। ওদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হলে মান থাকবে না, বরং অফিসভরে অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। ওই যুবভোগ্যারা সত্যগোপালের শুধু দৃষ্টিভোগ্য হয়েই থাকুক, তার বেশি চাইতে গেলে দুর্ভোগ বাড়বে।

যুবতীদের বাদ দিয়ে যুবক সহকর্মীদের যাচাই করাটাই নিরাপদ। সব সহকর্মীই তো আর সহধর্মী নয়, সব যুবকই বয়স্কদের সান্নিধ্য পছন্দ করে না। বিশেষ করে সত্যগোপালের মত প্রবীণ ব্যক্তি, যিনি তরুণদের সান্নিধ্যে এসেও বয়সের ভার নামিয়ে রাখতে পারেন না, কাউকে কাছে পেলেই সাহিত্য দর্শনে আলোচনার আবহাওয়াকে ভারী করে তোলেন। তবু ওদের ভিতর থেকেই একজনকে বেছে নিলেন ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টের প্রশান্ত সমাদ্দারের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি হবে না। সুদর্শন এই ছেলেটি সত্যগোপালের অনুরাগী। এক সঙ্গে চা-টা খান, মাঝে মাঝে গল্পটল্পও হয়।

ওকে বেছে নিলেন সত্যগোপাল।

'ওহে প্রশান্ত, সিনেমা দেখবে নাকি?'

প্রশান্ত বলল, 'সেকি সত্য না! ভূতের মুখে রাম নাম! আপনার মুখে সিনেমার কথা!'

বৃত্তান্তটা সত্যগোপাল বললেন প্রশান্তকে।

তারপর সস্নেহে বললেন, 'চল যাই। ঘণ্টাদেড়েক একটু বিদেশ ঘুরে আসি।'

প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে গেল। সবিনয়ে হেসে বলল, 'যেতে পারলে খুবই ভালো হত ভালো মানুষের সঙ্গে ভাল ছবি দেখা যেত। কিন্তু আমার যে আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, বিকালে একজনকে কথা দিয়েছি।'

সত্যগোপাল বললেন, 'কথা দিয়েছ? তা হলে আর কথা কী।'

কে জানে সত্যি সত্যি কথা দিয়েছে কি দেয় নি। তা মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ কী। সত্যগোপাল যে ওর কাছ থেকে আজ কিছু পেলেন না, ও যে দেড়ঘণ্টা দু'ঘণ্টার সান্নিধ্য তাঁকে দিতে চাইল না এইটাই আজ নির্মম সত্য।

আরো দু'তিনজন কমবয়সী সহকর্মীর দিকে আড়চোখে তাকালেন সত্যগোপাল। কিন্তু কাউকে কাছে ডাকতে ভরসা পেলেন না। ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আরো কম। ওরা কেউ তাঁর সঙ্গে যাবে না। বলে লাভ নেই।

বরং তার চেয়ে প্রবীণ সমবয়সীদের সঙ্গই নিরাপদ। কিন্তু সমবয়সী হলেই তো আর হল না, যাঁদের সঙ্গে বয়সের সমতা আছে তাঁদের সঙ্গে রুচির অসাম্য যেন আরো বেশি। কারো সঙ্গে অবশ্য তেমন অসদ্ভাব নেই সত্যগোপালের। কিন্তু অসদ্ভাব না থাকা আর সদ্ভাব থাকা এক কথা নয়। ঘণ্টা দুই সত্যগোপালের সঙ্গে একসঙ্গে কাটাতে ওঁরাও কেউ স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন না, সত্যগোপাল নিজেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

তবু বেছে বেছে একজন বয়স্ক সহকর্মীর কাছে প্রস্তাবটা নিয়ে গেলেন সত্যগোপাল। অবনীবাবু সত্যগোপালের চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড়। তিনিও চিন্তাভাবাতুর। অসুখ বিসুখ, আর্থিক অনটন, কন্যাদায় নানারকম দুশ্চিন্তাই তাঁর আছে। তবু মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে সত্যগোপালের কিছু সুখ-দুঃখের কথা হয়। অফিস আর ঘর-সংসারের বাইরের প্রসঙ্গ নিয়েই তাঁরা বেশির ভাগ আলোচনা করেন।

একগাল হেসে সত্যগোপাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাবেন নাকি অবনীবাবু?'

অবনীবাবু সব শুনে বললেন, 'আপনি বড়লোকের বস্তু সামনে নিয়ে এসেছেন মশাই। কিন্তু খেয়ে যে হজম করব তার সাধ্য নেই। আজ পাঁচ বছর কোন সিনেমা দেখিনে। দেশী বিদেশী কোন ছবিই না। সবাইকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেই পারছিনে আর, তো নিজের সাধ আহ্লাদ!'

সত্যগোপাল বললেন, 'ফ্যামিলি-টাইপ কার্ড, কারো কোন খরচ নেই।'

অবনীবাবু বললেন, 'তা জানি, আমার খরচ নেই কিন্তু আপনার আছে। আপনি ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবেন, ট্যাকসি করে নিয়ে আসবেন। চা-টা না খাইয়েও পারবেন না। বিনা পুণ্যে এমন স্বর্গসুখও ভোগ হয় না মশাই।'

'কেন বলুন তো?'

অবনীবাবু বললেন, 'রোগ এই দেহটায় কিছু আর রাখেনি। দেখতেই মোটাসোটা, ভিতরে কিছু আর নেই মশাই। বিকাল হলেই প্রেসারটা বাড়ে। ভারি কষ্ট দেয়। চুপচাপ ঘরে বসেই কাটাই। ডাক্তারও তাই বলেছেন। নড়াচড়া বারণ। সেদিন মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, তাঁর শাসন মানতেই হয়।'

সহানুভূতি জানালেন সত্যগোপাল, 'তাহলে থাক। তাহলে আর গিয়ে কাজ নেই আপনার।'

অবনীবাবু বললেন, 'আপনার মত তো আর নয়। আপনি স্বাস্থ্যটি বেশ অটুট রেখেছেন। যার স্বাস্থ্য আছে তার সব আছে।'

সত্যগোপাল প্রতিবাদ করলেন না। তিনি মনে মনে জানেন স্বাস্থ্যই সব সুখের আকর নয়। স্বাস্থ্য থাকলেও মানুষের অনেক দুঃখ থাকে। স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে না পারার দুঃখ। সামর্থ্যকে অসঞ্চিত হতে দেখার দুঃখ।

টেবিলে ফিরে গিয়ে মনে মনে অনেকের কাছেই যাতায়াত করলেন। বিভিন্ন বয়সের বন্ধু, বিভিন্ন স্তরের বন্ধু। কিন্তু স্টাউকেট মুখ ফুটে বলা যায় না, 'সঙ্গে চল'। বন্ধুরা প্রায় সবাই বেঁচে আছে। কিন্তু বন্ধুত্ব বেঁচে নেই। উচ্ছলতা, উত্তেজনা, প্রাণসত্তা আজ নিঃশেষিত।

টেলিফোনটা হাতের কাছে আছে। অনেকের ফোন নাম্বারও আছে পকেট ডায়েরিটিতে। মুখস্থও আছে কারো কারো নম্বর। তবু মন মানে না কাউকে ডাকতে। কী হবে ডেকে? সাড়া যে পাবেন না তা অবধারিত।

তবু খুঁজে পেতে একজনকে ডাকলেন। বহুকালের পুরোন বান্ধবী। হারিয়ে গিয়েছিল। বিশ বছর পরে ফের দেখা হয়েছিল। একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছেন। বান্ধবীর মেয়েটি তরুণী। লাবণ্যবতী। সত্যগোপাল তাঁর ওখানে যেতেন মাঝে মাঝে। মা মেয়ে দুজনের সঙ্গেই গল্প করতেন, বন্ধুবৎ ব্যবহার করতেন।

তারপর বান্ধবী একদিন মুখ ফুটে বললেন, 'তুমি আর এসোনা। এলে বড় কষ্ট পাই। বড্ড যন্ত্রণা হয়।'

'কেন?'

'তুমিতো আর আমার জন্যে আসোনা। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।'

তবু সত্যগোপাল সবই বুঝেছিলেন। মেয়েটির বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আর যাননি।

তারপর আবার যোগাযোগ রেখেছেন। তবু সেই ভাঙা সম্পর্ক পুরোপুরি যেন জোড়া লাগেনি।

তবু কিছু ইতস্তত করে সেই বান্ধবীকেই ফোন করলেন, 'যাবে না কি সিনেমায়?'

তিনি বললেন, 'অশেষ তোমার উদারতা। কিন্তু কী করে যাই বলো—জামাই মেয়ে এসেছে যে।'

সত্যগোপাল বললেন, 'তাতে কী। বেড়ানটা কি দুঘণ্টার তো ব্যাপার।'

তিনি বললেন, 'তাই কি আর হয়। ওরা কী ভাববে বলতো। হট বললেই বেরোতে পারি সেইদিন কি আর আছে। আগে থেকে জানিয়ে রেখো। আর একদিন যাব। সেদিন নিশ্চয়ই বেরোব তোমার সঙ্গে।'

সত্যগোপাল মনে মনে ভাবলেন, 'সেদিন কি আর আসবে?'

শেষ পর্যন্ত একাই গেলেন সত্যগোপাল। ফুলে পল্লবে সজ্জিত চারুকলা একাডেমির পরিবেশটি ভারি মনোরম। অনেক যুগলমূর্তি দেখতে পেলেন সত্যগোপাল।

অডিটোরিয়ামের সামনে শিবেশ তাঁকে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন স্যার আসুন। ভাবলাম আজও বুঝি এলেন না। আজকের ছবিটি সবচেয়ে ভালো। আর কেউ আসেনি আপনার সঙ্গে?'

সত্যগোপাল বললেন, 'না। আমি একাই এসেছি।'

শিবেশ বলল, 'এ ছবি স্যার একা বসেই দেখবার মত। ডিরেক্টরও সেই কথা বলেছেন।'

একখানি হ্যাণ্ডআউট শিবেশ তাঁর হাতে দিল। সীটে গিয়ে বসে তাতে কেবল একটু চোখ বোলাচ্ছেন অমনি অন্ধকারে ঘর ভরে গেল।

সত্যগোপাল গভীর মনোযোগে ছবি দেখতে লাগলেন। পারমাণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমার ধ্বংসস্তূপের পর নতুন শহর গড়ে উঠেছে। তারই পটভূমিকায় তরুণ-তরুণীর প্রণয় চিত্র। মেয়েটি ফরাসী অভিনেত্রী, ছেলেটি জাপানী স্থপতি।

খানিক বাদে ইন্টারভ্যালের আলোক জ্বলে উঠল। সত্যগোপাল অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর পাশে

কখন এক অপরিচিতা তরুণী এসে বসেছে। তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী, চম্পকবর্ণা। আড়চোখে তাকে একটু দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলেন সত্যগোপাল। অবাক কাণ্ড। এই মেয়েটা কেন এল, কোথেকে এল?

ঘর ফের অন্ধকার হল। অধমনস্কভাবে ছবি দেখতে লাগলেন সত্যগোপাল। আধখানা মন ছবির দিকে। বাকি আধখানা অপরিচিতা পার্শ্ববর্তিনীর চিন্তায় মগ্ন। অমন মুখের ডৌল আরো দেখেছেন, তবু মনে হয় এ যেন অদৃষ্টপূর্ব। নারীকে পাশে নিয়ে ছবি আরো দেখেছেন, তবু মনে হয় এমন দেখা এই প্রথম, অনমুভূত অনাস্বাদিত এই বোধ অস্তিত্বের রস।

ছবিতে দুই বিদেশীর প্রণয়সম্পর্ক অচিরস্থায়ী বিয়োগান্তক।

সত্যগোপাল ভাবলেন, 'তা হোক। জীবনের সঙ্গে মিল আছে।'

* * *

এই যেখানে আমরা পড়ছি শুনছি, চাকরির উমেদারি করে বেড়াচ্ছি, দশটা পাঁচটায় ভূতের খাটুনি খেটে কী যে করছি তার কিছু ঠিকানা নেই, এই যাদুকরের মিথ্যে ভারতবর্ষটাকেই আমরা সত্য বলে ঠাউরেছি……একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে—পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেইখানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসটা টেনে নিতে পারব না।

—রবীন্দ্রনাথ ('গোরা')

দূরভাষিণী

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এ পাড়ায় আমি বেশীদিন আসিনি। অনেক চেষ্টার পর ফ্ল্যাটটা পেয়েছি। চমৎকার ফ্ল্যাট। চমৎকার পাড়া। চারদিকে নতুন নতুন বাড়ি, মা লক্ষ্মী যেন ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছেন। দুএকটা ফেরিওলা ছাড়া আর তেমন কোনো হাঁক-ডাক নেই। সরকারি ফ্ল্যাট, জল, কল, আলো, পাখা আর টেলিফোন। প্রথম দিন গৃহপ্রবেশ করে হমিনস্ত, হমিনস্ত করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। ঘরের মেঝেগুলি মোজাইক টালি বসানো, কি পালিশ, পা পিছলে যায়। গৃহিণী এখনও আসেন নি, সামনে চৈত্রমাস, সেই বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়ার সময় আসবেন। যদিও দিল্লীতে বেশ গরম, তবু শিত্রালয়ে ত' মানুষ রোজ-রোজ যায় না, সুবিধা একবার যখন হয়েছে শরীরটা না সারিয়ে তিনি ফিরবেন না।

আমার পাশের ফ্ল্যাট নেভ-১৩। এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ভারী ভদ্র, ভারী সুন্দর পরিবার। স্বামী-স্ত্রী আর দুটি স্কুলে যাওয়া ছেলেমেয়ে। তাই অল্প ক'দিনেই তাঁদের সঙ্গে বেশ জমে গেছে। মিঃ মজুমদাররা এখানে এসেছেন অল্পদিন। সি, সি, ডি, সি'র অফিসর। ছিলেন এলাহাবাদে, পুজোর সময় বদলী হয়ে এসেছেন।

তাই ওঁরা এবার যখন ট্যুরে গেলেন সপরিবারে, আর ফ্ল্যাটের চাবিটা আমার কাছে রেখে গেলেন আমি আপত্তি করিনি। আমি ওঁদের চাবিটা পরমানন্দে আমার বসবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছি। যেদিন ফিরবেন সেদিন গয়লা, কি, ইত্যাদির ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক করা থাকবে। সেই ভারটা আমি নিয়েছি।

যেদিন ওঁরা চলে গেলেন, বোধহয় ঠিক তার পরদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। আমি তখন বাথরুমে, অফিস থেকে ফিরে একটু জিরিয়ে তবে আমি গা-হাত ধুই। টেলিফোন বেজে উঠতে তাড়াতাড়ি মাথাটা মুছে যতক্ষণে টেলিফোনটা ধরলাম, ততক্ষণে টেলিফোন কেটে গেছে। সেই গোঁ গোঁ আওয়াজ। কে ফোন করছিল কে জানে, আমার দেরী দেখে ছেড়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় দিনেও ঠিক একই সময়ে একই ব্যাপার টেলিফোন থেমে গেল। তাই তৃতীয় দিনে টেলিফোন বেজে উঠতেই আমি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কোনটা বাগিয়ে ধরলাম। বললাম—হ্যালো ৬৩-১৩১৪! আমি বেশ চেঁচিয়েই বলেছিলাম, কিন্তু কোনো জবাব নেই। এবার আর কোনো সাড়া নেই। লাইন কেটেও দেয়নি—ওদিকে একটা খস্ খস্ মর মর শব্দ, বুঝলাম নিশ্চয়ই কেউ আছে।

আমি বেশ বিরক্ত গলায় কয়েকবার বললাম—হ্যালো হ্যালো। কিন্তু শুধু ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। অস্পষ্ট আকুলতাভরা দীর্ঘশ্বাস কানে এল, তারপর সহসা ফোনটা কেটে গেল।

কাছাকাছি দু একটা বাড়িতে কিছুদিনের মধ্যে চুরি হয়ে গেছে। এসব পাড়ায় চোরের উপদ্রবটা

বেশী। আমি তাই ভাবলাম, নিশ্চয়ই কেউ আমায় ফোন করে জেনে নিচ্ছে বাড়িতে কেউ আছে কিনা। আবার এরকম হলে পুলিসে খবর দিতে হবে দেখছি।

এর পরদিন সন্ধ্যায় আমি বাড়ি ছিলাম না। কিন্তু তার পরদিন সাতটার সময় আবার সেই টেলিফোন-ধ্বনি। ভাবতে থাকি লোকটা আগের দিন ফোন করেছিল কিনা কে জানে। এখন কি করা কর্তব্য। সম্ভাব্য চুরি বিষয়ে পুলিসকে খবর দেব? তবে এটা একটা জরুরী কলও হতে পারে, অফিস থেকে কেউ কিছু বলতে চায় কিংবা কোন ট্রাংক-কল। হয়ত আমারই কোনো আত্মীয় অসুখ হয়ে পড়েছে। কতরকম বিপদ-আপদ আছে এই শহরে। আমি এবার দ্রুতগতিতে রিসিভারটা ওঠালাম—

"হালো—৬৯-২৩৪৫—'

ক্ষণিক স্তব্ধতা, তারপর একটি নারীকণ্ঠ, অতি কোমল, অতি মৃদু, এত মৃদু যে আমার শোনার অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি বললেন—আজ বাড়ি আছেন দেখছি।

অপরিচিত কণ্ঠস্বর। আমি জানতে চাইলাম—কে কথা বলছেন? আপনি কাকে চান?

ওপার থেকে উত্তর এল—আপনি আমাকে কখনও দেখেন নি—আমরা আপনার পাশের বাড়িতে থাকতাম।

আমি ভদ্র গলায় বললাম—আপনার কিছু কি প্রয়োজন আছে? কি চাই বলুন। আপনি কি আগেও আমাকে রিং করেছিলেন?

হাঁ, ক'দিন ধরেই ত' চেষ্টা করছি, কিন্তু ধরা যাচ্ছে না।

কণ্ঠস্বর এইবার অগ্রসর হয়ে এল, লাইনটা বোধহয় এতক্ষণে ঠিক হয়ে গেল, এইবার কণ্ঠস্বর অনেক স্পষ্ট এবং দৃঢ়। উনি বলতে থাকেন—

—দেখুন, একা একা আছি, কথা বলার কেউ নেই। এই সময় কারো সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালোই লাগে। বিশেষতঃ এখন একেবারে একা—

আমি ঘেমে উঠ্‌লাম। বলে কি! একে স্ত্রীলোক, তায় অপরিচিত। একা একা আছে তাই অপরিচিত পুরুষ মানুষকে ফোন করছে। এ ত' ভারী মজার খেলা।

ওপার থেকে আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—আপনার বন্ধুরা কবে আসবেন? মজুমদাররা ভারী চমৎকার লোক। বেশ হাসি-খুসী ভরা ছোট্ট পরিবার।

এ কথা আমি সমর্থন করলাম। মজুমদার-দম্পতি এবং তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ কাটল। এরপর তিনি বলে উঠ্‌লেন—

—আচ্ছা এইবার ছেড়ে দিই কেমন? আপনার সঙ্গে কথা বলতে বেশ লাগে। সময়টাও কাটল বেশ। আবার কিন্তু আপনাকে রিং করবো, কোনো আপত্তি নেই ত'?

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর আকুলতায় ভরা।

তেমন বিরক্তি প্রকাশ না করে বললাম—তা করতে পারেন। তবে আমি সব সময় বাসায় থাকি না।

কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল—তাতে কি হয়েছে, চেষ্টা করতে দোষ কি? মানে, যদি পেয়ে যাই ভালোই হবে—আচ্ছা নমস্কার।

শেষের কথাগুলি একেবারে কানে কানে বলা কথার মতো শোনালো।

রিসিভারটি নামিয়ে রেখে খেয়াল হল : ভদ্রমহিলা কে, কোথায় থাকেন, কি তাঁর পরিচয়, কেনই বা আমাকে সোজাসুজি ফোন করলেন, কিছুই জানা গেল না। শুধু বুঝছি যে উনি এখন নিঃসঙ্গ এবং সময় কাটানোর জন্য এই এক বিচিত্র উপায় আবিষ্কার করেছেন।

আমি এইবার কিন্তু অতিশয় দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির করলাম এর পর উনি যদি ফোন করেন আর আমি যদি বাড়ি থাকি তাহলে কিছুতেই সাড়া দেব না। হয়ত উনি আবার সাতটায় ফোন করবেন।

তাই হল, পরদিন সাতটায় টেলিফোন বাজতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে বাজল। আমি ধরলাম না ফোন, তবে যে একঘেয়ে সুরে ফোনটা প্রায় পাঁচমিনিট বেজে গেল তার চেয়ে গতদিনের আলাপচারী অনেক বাঞ্ছনীয়।

পরদিন সন্ধ্যায় আমার মেজাজটা তেমন ভালো ছিল না। টেলিফোনটা বাজতেই ধরলাম।

মহিলাটি বল্লেন—কি হল ? কাল ফোনটা ধরলেন না যে! ভারী হতাশ হয়েছি কিন্তু—

কণ্ঠস্বরে তিক্ততার আভাস।

আমি প্রায় বলে ফেলেছিলাম যে একটু বাইরে গিছলাম। কিন্তু উনি বলে উঠলেন : কাল ত সাড়ে ছটার মধ্যেই ফিরলেন দেখলাম।

কি বিপদ! আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। আমি গম্ভীর গলায় বললাম—কাল একটু ব্যস্ত ছিলাম।

বুঝলাম, মহিলাটি নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো ফ্ল্যাটে থাকেন এবং সম্ভবতঃ মাথার ঠিক নেই। আমার দিকে কিন্তু চোখ রেখেছে। কোথা থেকে নিশ্চয়ই সব লক্ষ্য রাখে।

যাই হোক কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল। তাও বেশীরভাগ গরমটা কেমন পড়েছে, কিছুতেই বৃষ্টি হচ্ছে না এইজাতীয় প্রসঙ্গ। বাজার দরটা আর ওঠেনি। উনিই কেটে দিলেন।

এর পর কয়েকদিন আমাদের আলাপ আলোচনা দীর্ঘতর হতে লাগল। আর আশ্চর্য, রোজ না হলেও তিনি ফোন করেন ঠিক সন্ধ্যা সাতটায়। প্রশ্ন করতে পারেন আমিই বা একজন নামগোত্রহীনা অপরিচিতার সঙ্গে এইভাবে আলাপাচার চালালাম কেন! সেই প্রশ্ন করলে আমি কিন্তু উপযুক্ত জবাব দিতে পারবো না। আমার ভদ্রতা, কিংবা দুর্বলতা বলাই ভালো। আমার চারিত্রিক ত্রুটি। আমি কাউকে সহজে চটাই না। হয়ত মহিলাটির জন্য আমার মনে দুঃখ ছিল। হয়ত আমার আগ্রহ ছিল তাঁর সঠিক পরিচয়টা জেনে নেওয়ার—এমনই একটা কিছু হবে। উনি কিন্তু বলেছিলেন যে ওঁর নাম মায়া, কিন্তু পদবীটা বলেন নি। মায়া নামটুকুই জানা, তার বেশী কিছু নয়।

কথাবার্তার মধ্যে এইটুকু জানতে পারা গেল যে ভদ্রমহিলার স্বামী অনেক দেরীতে ফেরেন। রাতের খাওয়াটা অর্ধেক দিন নষ্ট হয়। স্বামীকে নিয়ে তাঁর ভারী অশান্তি।

আমার পাশের ফ্ল্যাটের মজুমদাররা ফিরে আসার দুদিন আগে আমার খেয়াল হল যে এই টেলিফোনের মোহ আমাকে পেয়ে বসেছে। একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে। এতদিন ধরে এভাবে প্রশ্রয় না দিলেই হয়ত ভালো হত।

ভদ্রমহিলা কোনদিন যদি অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের আমার কথা গল্প করেন, তাঁরা কি মনে করবেন ? মজুমদারদেরই যদি বলে ত' কি হবে ? এইরকম ফ্ল্যাটে ত উনিও ছিলেন কিছুদিন, নিশ্চয়ই ফ্ল্যাটের লোকজন সবাই ওঁর চেনা।

পরদিন সকালে গোয়ালার সঙ্গে কথাটি তুললাম। মনের ভেতর কেমন খচ্ খচ্ করছিল সারারাত।

বললাম, তুমি অনেকদিন দুধ দিচ্ছ এই সব ফ্ল্যাটে। মজুমদার বাবুরা আসার আগে ঐ ফ্ল্যাটে কারা ছিলেন জানো? নিশ্চয়ই কাছাকাছি ওরা কোনো ফ্ল্যাটে উঠে গেছেন?

গোয়ালা বলে উঠল—না বাবু ওরা এখানে থাকে না, বাবু ত' বোম্বাই চলে গেছেন!

আমি বললাম—বাবু বোম্বাই গেছেন! আর মাইজী?

গোয়ালা একটু যেন অস্বস্তি বোধ করল। বলল, বাবুজী আপনাকে সব বলছি, তবে মজুমদার বাবুদের কিন্তু বলবেন না। ওদের ঘরে দুটো ছেলেমেয়ে। সব ব্যাপারটি ভারী দুঃখের বাবুজী। যারা এ বাসায় থাকতেন তাঁরা ভারী ভালো লোক, ভারী সুন্দর দেখতে দুজনকে। বিয়ে হওয়ার পরই এই বাসায় এসেছিলেন।

প্রথম প্রথম ভারী হাসিখুসীতে ছিল সব। কিন্তু একটু একটু করে দেখা গেল, কোথায় কি গণ্ডগোল আছে। অনেকদিন সকালে দেখতাম মাইজী কাঁদছেন। মাইজী বাবুকে ভালোবাসত খুব, তাই একটু দেরী হতো যদি ঘরে ফিরতে, তাহলে কান্নাকাটি করে হৈ চৈ করত। কেউ কেউ বলে বাবুটার কোনো দোষ ছিল না। তবে সবাই বলে অন্য মেয়েছেলে একজন মাঝে মাঝে আসত।

একদিন মাইজীর বসে বসে অনেক রাত হয়ে গেল। বাবুজী আর ফেরে না।

এইখানে আমার গয়লা একটু চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, সবই কপাল বাবুজী! মাইজী একেবারে পাগলা হয়ে গেল।

আমি অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করলাম—হল কি শেষ পর্যন্ত?

—আরে বাবুজী, টেলিফোনের তারটা কেটে গলায় ফাঁস দিয়েছিল মাইজী। আর সবচেয়ে বিপদ হল, বাবুজী তখন হাসপাতালে। মোটর এ্যাক্সিডেন্টে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কাগজ-পত্র সব পুড়ে গিছল, তাই জ্ঞান হওয়ার আগে কেউ তাঁর পরিচয় জানতে পারেনি।

এরপর রামজীর জন্মভূমির অধিবাসী গোয়ালা রামনরেশ আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করল—বাবুজী একথা কিন্তু আপনি মজুমদার বাবুদের বলবেন না। আমার কাছ থেকে শুনেছেন বলবেন না কখনও। ওদের বাসাটায় গণ্ডগোল আছে এটা ওঁরা এখনও কিছু জানেন না। ফ্ল্যাট বাড়িতে কত কি কাণ্ড ঘটে বাবুজী। রামজীর ইচ্ছা বাবুজী! সবই রামজীর ইচ্ছা।

আমি এমনভাবে রামনরেশ গোয়ালার কথা সমর্থন করলাম যে সে যেন চমকে গেল, মনে হল যেন আমি আর কারো ঘরের কোনো কেলেঙ্কারি আবিষ্কার করে ফেলেছি।

রামনরেশ সেই প্রাতঃকালে আমাকে তার অদ্ভুত বাংলায় আরো অনেক উপদেশ দিয়ে চলে গেল, আর আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। যে প্রভাতী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অজস্র কেলেঙ্কারি ছাপা হয়েছে, সেটি আমার কোলেই পড়ে রইল।

সেদিন সন্ধ্যায় স্থির করেছিলাম সিনেমায় যাবো—কিন্তু মত পরিবর্তন করলাম। শান্তি যদি পেতে হয় তাহলে অবিলম্বে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন কে আমাকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এইভাবে ফোন করে।

বাড়ি ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেল। বাসায় ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে শুনি ফোন বাজছে।

অতি দ্রুতপদক্ষেপে গিয়ে টেলিফোনের [illegible] —

আজ যেন অনেকদূর থেকে কথা ভেসে আসছে। অতি মৃদু এবং করুণ কণ্ঠস্বর—আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন, জানেন, আপনাকে আজ ধন্যবাদ দিতে এসেছি। সত্যি! আপনি না থাকলে—

আমি সবিস্ময়ে বলি, না না, সে কি কথা, আমি আর কি করেছি। কি করতে পারলাম আপনার? আপনি ত' পরিচয় গোপন করে রাখলেন, পাছে গিয়ে পড়ি, পাছে পায়ে পড়ে উৎপাত করি।

মহিলাটি বললেন—জানেন, আমি কিন্তু আর আপনাকে ফোন করবো না! কাল থেকে আর একা নই। এইবার বোধহয় চলে যেতে হবে।

ভদ্রমহিলার গলাটি ধরা-ধরা, যেন কান্নায় ভরা। অতিকষ্টে কান্না চেপে আছেন। অতি অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। কি যে বলছিলেন, সত্যি আমি কিছু শুনতে পারছিলাম না।

বুঝলাম এই সেই মুহূর্ত। যে প্রশ্ন এতদিন তাঁকে করব মনে করেছি সেই প্রশ্নটি আজ করতেই হবে।

আমি বললাম—যাওয়ার আগে একটি অনুরোধ আছে! আপনি আপনার পুরো নাম বলেননি। পরিচয় গোপন রেখেছেন। আপনি কে! আপনি কোথায় থাকেন? কি আপনার পুরো নাম? একটু বলুন দয়া করে—

কোনো জবাব নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। কোনো সাড়া নেই, একটু যেন খস্ খস্, তারপর খুব চাপা কান্নার মতো অস্পষ্ট আওয়াজ।

ঠিক এই সময় নজরে পড়ল, মজুমদারদের ফ্ল্যাটের চাবি, ঠিক টেলিফোনের ওপরকার র‍্যাকটায় ঝুলছে।

পাশের বাড়িতে কেউ আছে কিনা লুকিয়ে এই আমার সর্বশেষ সুযোগ ভালো করে দেখার। আমি আস্তে আস্তে রিসিভারটা টেবলের ওপর রাখলাম—চাবিটা নিয়ে মজুমদারদের সামনের দরজাটি খুলে ওঁদের বসবার ঘরের দরজাটি খুললাম—

দরজাটি খুলতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম টেলিফোনটি কে যেন নামিয়ে রাখল। ভেতরকার বেলটায় টুং করে আওয়াজ হল।

দরজা খুলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এক মিনিট—দুইচটা টিপ্‌তেই কে যেন চলে গেল, চলে গেল বলা হয়ত ঠিক হল না, কে যেন বেমালুম মিলিয়ে গেল, ঠিক যেমনটি স্বপ্নে হয়। ধরতে গিয়েও যেমন ধরা যায় না।

কিন্তু একটা শাদাশাড়ির আঁচল আর একরাশ ঘন কালো চুল আমি দেখেছি—এ আমার চোখের ভুল নয়।

বাংলা সাহিত্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্বীকৃত স্মরণীয় নাম। ভারতী-যুগে বা আরও আগে থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে যাঁরা বিপ্লবের সুর এনেছিলেন, গতানুগতিক পথ পরিহার করে নতুন চেতনায় নর-নারীর জীবনকে দেখেছিলেন ও দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তাদের চিত্রিত করেছিলেন, চারুচন্দ্রের স্থান তাঁদের পুরোভাগে। তাঁর 'স্রোতের ফুল', 'হোটানা', 'হেরফের', 'হাইফেন', 'নোঙরছেঁড়া নৌকা', 'পঙ্কতিলক' প্রমুখ উপন্যাসগুলি বাংলা কথাসাহিত্যের চিরকালের সম্পদ। ছোটগল্পেও তাঁর ভাষার লালিত্য, কারুকর্ম এবং ঘটনাবিন্যাস ছিল অনন্যসাধারণ। এখানে যে গল্পটি পরিবেশিত হল, সেটি নিতান্তই একটা হালকা কাহিনী। প্রথম বয়সের রচনা। তাঁর কোন বইএ গল্পটি ছাপা হয়নি।

বিবাহ-রঙ্গ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মা আর মেয়ে দুজনে এক ঘরে বসেছিল, দুজনেই নীরব। মা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে এক হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ছিল আর অন্য হাত দিয়ে ক্রমাগত চোখ মুছছিল, তবু চোখের জলধারা কিছুতেই রোধ করতে পারছিল না। মেয়ের চোখ দিয়েও অশ্রুধারা অনর্গল গড়িয়ে পড়ে তার গাল দু'টিকে প্লাবিত স্নান করে দিচ্ছিল। মেয়ের অঙ্গের বেশভূষা কিন্তু সুসজ্জিত পরিপাটি, কোনো উৎসব আনন্দে যোগ দেবার উপযুক্ত, শোক বা দুঃখের বেশ মোটেই নয়। তবে কি মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাবে? তার সিঁথিতে তো সিন্দুর নেই, তার এখনও বিয়েই হয়নি, যদিও তার বয়স বাইশ বছর হয়েছে। তবে! এ কান্না কিসের জন্যে, আর অমন সুসজ্জিত হয়ে কাঁদবারই বা কারণ কি?

মেয়ের বাপ গরীব কেরানী, মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে সে কত চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই এমন কোনো পাত্র স্থির করতে পারেনি, যে বিনাপণে বা সামান্য পণে তার মেয়ের পাণিগ্রহণ ক'রে কন্যাদায় থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে। এই জন্যে কন্যার জননী বলে গৃহিণী লজ্জিত ও দুঃখিত ছিলেন, আর কন্যা নিজেকে পিতামাতার দুঃখের হেতু বিবেচনা ক'রে অপরা ভেবে কুণ্ঠিত বিমর্ষ হ'য়েই থাকত। অনেক কষ্টে অনেক অনুসন্ধানের পরে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে, আর আজ বর স্বয়ং কনে দেখে পছন্দ করতে এসেছে। এই শুভ অনুষ্ঠানের উদ্‌যোগ পর্বেই মা ভাবী জামাইয়ের শুভাগমন দেখেই মেয়েকে ঘরে টেনে এনে কোলের কাছে বসিয়ে কাঁদতে সুরু করে দিয়েছে। যতসব অলক্ষুণে কাণ্ড!

মেয়ের বাপ ঢাকার আদালতে জজের সেরেস্তায় একজন সামান্য বেতনের কেরানী, যদিও তার বাপ অনেক আশা ক'রে ছেলের নাম রেখেছিল রাজেশ্বর। বেচারা আবার নিকষ কুলীন। কাজেই তার মেয়ের যোগ্য পাত্র সুপ্রাপ্য নয়। অনেক অনুসন্ধান ও সাধ্যসাধনার পরে সে দুটি পাত্র স্থির করেছিল, কিন্তু তারা

মেয়ে দেখে পছন্দ করেও পাঁচ ছয় হাজার টাকার খাঁই করাতে বেচারা আর ভরসা করে অগ্রসর হতে পারেনি। যতদিন বিয়ে না হয় মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রেখে কি করবে? এই ভেবে রাজেশ্বর বরাবর মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে এসেছে, এবং প্রত্যেক বৎসরই মনে করেছে এইবার বিয়ে হবে, কিন্তু হয় হয় ক'রে এতদিন আর হ'য়ে ওঠেনি এবং বুদ্ধিমতী সুরভি পাশ করতে করতে আই. এ. পাশ ক'রে এখন ইউনিভার্সিটিতে বি. এ. পড়ছে।

রাজেশ্বর ঘরে প্রবেশ করে ব্যস্ত স্বরে ডাকলে—সুরভি, উঠে এসো, উঠে এসো। ওকি? কেঁদে কেঁদে মুখখানাকে করেছ কী! যাও যাও, চট ক'রে চোখে মুখে জল দিয়ে মুখে একটু স্নো মাখিয়ে নাও। বর এসে তোমাকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করছেন, উনি আবার বিকেলের ফেরি ষ্টীমার ধ'রে আজই মুন্সীগঞ্জে ফিরবেন।

মেয়ের মা অশ্রুপ্লাবিত চোখ দু'টি তুলে স্বামীর মুখের ওপর করুণ দৃষ্টিপাত ক'রে ব্যথিত কাতরস্বরে বললে, ঐ বুড়োর সঙ্গে এই কচি মেয়ের বিয়ে দেবে? ও যে একেবারে ঘাটের মড়া? মেয়ের কপালে সদ্য বৈধব্য লিখে দেবে?

রাজেশ্বর বললে—তোমার ওসব কী অলক্ষুণে কথা। বরের বয়েস আর এমন কী বেশী হয়েছে? এই তো সেদিন বছর মাত্র সবজজের কাজ থেকে পেনসন নিয়েছেন। ভোগে সুখে থেকে শরীর তো বেশ তাজা টনকো আছে। এর চেয়ে ভালো বর আর কোথায় মিলছে বলো? মেয়ে তো এতদিন আইবুড়ো হয়েই বাড়ীতে আছে; ঈশ্বর না করুন, তুমি যা বলছ তা যদি হয়ই, তবে এই আইবুড়ো অবস্থা আর বিধবা হওয়ার মধ্যে তফাৎটা বেশী আর কি হবে, এখন যেমন আছে তখনও তেমনই থাকবে। আর অজবাবুর কোনো ছেলেপিলে নেই, তাঁর বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ি সব তো সুরভিরই হবে, আর তাতে আমাদের পর্যন্ত সকল অভাব ঘুচে যাবে। এই সব কথা ভেবে দেখেই আমি ওঁর হাতে মেয়ে দিতে উদ্যত হয়েছি। বুড়ো শিবকে পাবার জন্যে উমা দুষ্কর তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু শিব তো ছিলেন ভিখারী, আর এ ছিল সবজজ, একেবারে টাকার কুমীর।

স্বামীর অকাট্য যুক্তি শুনে মেয়ের মা আর কিছু বলতে পারলে না। সে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল, এবং সুরভির হাত ধ'রে উপর দিকে টেনে বললে—উঠে আয়, চোখে মুখে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে দেখা দিয়ে আয়। যদি ওর হাড়িতেই চাল দিয়ে থাকিস তবে আর ভবিতব্য কে খণ্ডাবে বল্। আর ভাগ্যে থাকে ওর হাতে পড়লেও তোর সুখ হবে।

সুরভির বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, নিজের ভালোমন্দ নির্বাচন করবার শক্তি জন্মেছে; তার মনে হচ্ছিল যে, এই বৃদ্ধের সঙ্গে ঘর করার চেয়ে চিরজীবন কুমারী থেকে কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হ'য়ে জীবন যাপন করা ঢের শ্রেয়। কিন্তু তার জন্যে তার পিতামাতার যে দুশ্চিন্তা ও অশান্তি সে দিনের পর দিন দেখে এসেছে এবং এখন তার ধনীর সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনা হওয়াতে তার পিতামাতার ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কল্পনায় যে রকম আশা ও আনন্দের পরিচয় সে এইমাত্র পেল, তাতে সে আর কোনো আপত্তি প্রকাশ করতে পারলে না, সে বলির পশুর মতন ধীরের টানে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল ভাবী বরকে দেখা দিয়ে পছন্দ করাবার জন্যে।

সুরভি মোটের উপর সুন্দরী মেয়ে, তার লেখাপড়া শিখে সভ্যতব্যা, তার মুখশ্রী বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে উজ্জ্বল এবং সে এখন পূর্ণযৌবনা। তাকে দেখেই তো সবজজের পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু সবজজকে দেখে সুরভির বিতৃষ্ণা আরো বেড়ে গেল—তার ছুপাটি দাঁতই বাঁধানো, কথা বলবার সময় মুখের মধ্যে ঠক্-

ঠক্ শব্দ হয়, আর পাছে দাঁত খুলে বেরিয়ে আসে এই আশঙ্কায় সে থেকে থেকে কথা বলতে বলতে হস হস ক'রে মুখের মধ্যে বাতাস টেনে নেয়। সুরভি আড়ষ্ট বিমর্ষ হয়ে নিজেকে দেখিয়ে বিয়ের বাজারে যাচাই করিয়ে চলে এলো। বিবাহ স্থির হ'য়ে গেল। সুরভির পিতামাতা এতদিন পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। মেয়ের বিয়েতে তাদের কিছুই দিতে তো হবেই না অধিকন্তু বর স্বয়ং উপযাচক হ'য়ে তাদের মেয়ের বিয়ের খরচ বলে পাঁচশত টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে গেল।

রাজেশ্বর এই দরজজের কাছে ঢাকাতে কাজ করেছে, সে জজবাবুকে মুনিবের সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত সমাদর ক'রে বিদায় দিলে এবং একদিন যার কাছে তটস্থ হয়ে হুকুম শুনেছে সেই মহামান্য ব্যক্তি আজ তার জামাই হ'তে স্বীকার ক'রে গেল, এ তার পক্ষে পরম সৌভাগ্য আর গৌরবের ব্যাপার বলে মনে হ'তে লাগল।

জজ বাহাদুর চলে গেলে রাজেশ্বর ঘটককে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা ঘটক মশায়, জজবাবুর যে তৃতীয় পক্ষে বিয়ে হয়েছিল শুনেছিলাম, তিনি কি তবে বিদ্যমান নেই?

ঘটক তামাক টানতে টানতে বললে—তা ওঁর দুর্ভাগ্যের কথা বলেন কেন, ভদ্রলোক তিন তিনবার বিয়ে করলেন, তা না হোলো একটি ছেলে, আর না টিঁকল একটা বৌ। সেই দুঃখেই তো আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

সুরভির বিয়ের সব ঠিকঠাক। গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে, পরশু বিয়ে হবে। রাজেশ্বর ছুটি নিয়ে নিজেদের গ্রামে শুভাচ্যায় গেছে, সেইখানেই বিয়ে হবে। এমন সময় গ্রামে একখানি চিঠি এল—তার শিরোনামায় লেখা "শুভাচ্যা গ্রামের যুবকবৃন্দ।" এই অদ্ভুত সম্বোধন দেখে গ্রামের যুবকেরা আগ্রহ সহকারে খাম খুলে পত্র প'ড়ে দেখলে—একজন অপরিচিতা মহিলা তাদের সম্বোধন করে লিখেছে—

সবিনয় নিবেদন, আমি আপনাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা হইয়াও আপনাদের নিকট সাহায্য-প্রার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইতেছি। যে যুবকেরা দেশের যেখানে দুঃখ সেখানে প্রাণপাত করিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হন, সেই যুবকদের কাছে তাহাদেরই একজন হতভাগিনী ভগিনী সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে তাহারা অবহেলা বা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, এই আশাতেই আমি আপনাদের শরণাপন্ন হইতেছি।

আমি সধবা, আমার স্বামী ধনী বলিয়া বিখ্যাত, আমার স্বামী রায়বাহাদুর সবজজ ছিলেন, অল্পদিন হইল পেনশন লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ তিনি আমাকে কিছুদিন হইতে ত্যাগ করিয়াছেন, আমার অপরাধ, আমার কোনো সন্তান হয় নাই। তিনি আমার পূর্বেও আরও দুটি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কোনো সন্তান হয় নাই। অতএব নিঃসন্তান বন্ধ্যা অপবাদ দিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবার অধিকার আমার স্বামীর কতখানি আছে তাহা আপনারাই বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আর আমার বয়স এখনও ত্রিশের কোঠা উত্তীর্ণ হয় নাই, অতএব আমার যে সন্তান হইবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহাও বলা যায় না।

আমি ভগিনী হইয়া ভাইয়েদের কাছে এই সব কথা নির্লজ্জের মতন বলিতে বাধ্য হইতেছি। তাহার কারণ এই যে, আমি শুনিলাম যে, আমার স্বামী আপনাদের গ্রামের কোন একটি বালিকাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেই বালিকার বা তাহার পিতার নাম বা পরিচয় কিছু জানিতে পারি নাই,

কেবল লোকপরম্পরা জানিলাম যে, আমার স্বামীর পুনরায় বিবাহ স্থির হইয়াছে আপনাদের গ্রামে। আমার স্বামীর নাম বলিলেই আমার আপনার সত্যমিথ্যার নির্ণয় করিতে পারিবেন, তাই হিন্দু-স্ত্রী হইয়াও স্বামীর নাম উল্লেখ করিতেছি প্রাণের দায়ে—তাঁহার নাম রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার আশঙ্কা যদি সত্যসত্যই সত্য হয়, তাহা হইলে আপনারা এই হতভাগিনী ভগিনীর প্রতি দয়া করিয়া এমন অঘটন ঘটিতে দিবেন না এবং এই বিবাহ নিবারণ করিতে পারিলে দুইটি স্ত্রীলোকের দুঃখ মোচন ও একজন বৃদ্ধ লোকের অন্যায় প্রতিরোধ করিয়া আপনারা পুণ্য ও যশোভাগী হইতে পারিবেন এবং আপনাদের একটি হতভাগিনী ভগিনীর সর্বাস্তঃকরণের শুভ কামনা ও আশীর্বাদ লাভ করিবেন। ইতি—

আপনাদের হতভাগিনী ভগিনী
সাবিত্রী দেবী
কমলাপুর, জেলা—ময়মনসিংহ।

এই পত্র প'ড়ে গ্রামের যুবকদের মধ্যে একটা মহা চাঞ্চল্য ও আন্দোলন উপস্থিত হলো, তারা কী কর্তব্য সেই বিষয়ে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলো। কেউ বললে—নিশ্চয় কেউ শত্রুতা ক'রে বিয়ে ভেঙে দেবার জন্যে এইরকম জাল চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। হয়ত সে রাজেশ্বর বাবার শত্রু, হয়ত সে সবজজের শত্রু।

চিঠির পোষ্ট অফিসের ছাপ দেখা হলো, পত্র ময়মনসিংহ জেলারই এক পোষ্ট অফিস থেকে আসছে। হাতের লেখা ভালো হলেও মেয়েলি ছাঁচের—হয়ত লেখাপড়া জানা মেয়ের লেখা, তাই চিঠির ভাষা ও লেখার ছাঁদ আর বাঁধুনি ভালো হয়েছে।

তথাপি যুবকদের মধ্যে দুই দল হয়ে গেল, একদল চিঠি সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে চায়, আর অপর দল এটা শত্রুতার জাল বলে উপেক্ষা করতে চায়। অনেক বাদ-প্রতিবাদের পরে কয়েকজন যুবক স্থির করলে যে, এখন রাজেশ্বর বাবুকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলার দরকার নেই, তারা আজ এখনই কমলাপুরে চ'লে যাবে এবং এই পত্রের উক্তির সত্যমিথ্যা নির্ণয় ক'রে আসবে, এবং তারপরে সেই অনুসারে তারা সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে কাজ ক'রবে—এই বিয়ে হ'তে দেওয়া বা না-দেওয়া তারা পরে স্থির করবে, এখনো তো তিন দিন সময় হাতে আছে।

আজ রাজেশ্বরের বাড়ীতে বিবাহ। গ্রামের যুবকেরা মহা উৎসাহে উদ্‌যোগে ব্যাপৃত। রাজেশ্বরের মুখ প্রফুল্ল, সুরভির মায়ের মুখ হাস্যোজ্জ্বল, আর সুরভির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত, গ্রামের যুবকদের মুখ থেকে একটা কৌতুকের ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। রাজেশ্বরের বাড়িতে দুটি বিবাহের আয়োজন করা হচ্ছে; যে ঘরে বর এসে বসবে, সে ঘরে দুটি মহলদ্ধ পাতা হয়েছে; বিবাহের সম্প্রদানের স্থানে দুটি বসুচ্ছত্র আলপনা দেওয়া হয়েছে, এবং দুখানি আলপনা দেওয়া পিঁড়ি পাতা হয়েছে: শুভদৃষ্টির জন্য দুটি ছাদনাতলা রচনা করা হয়েছে এবং দুটি বাসরঘরও সজ্জিত করা হয়েছে।

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ সবজজ চুলে কলপ দিয়ে আর গায়ে সন্ধ মেখে বরবেশে বিবাহ করতে এসে উপস্থিত হলেন। রাজেশ্বর তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে বরাসনে বসাল। সেই বরাসনের পাশে আর একটি বরাসন পাতা রয়েছে দেখে রায় বাহাদুর বীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে আর একটি বরাসন পাতা হ'য়েছে কেন?

এই প্রশ্ন শুনেই একজন যুবক বললে—আজ রাজেশ্বর কাকার মেয়ে আর ভাইঝির বিয়ে একসঙ্গে হবে কিনা তাই আর একজন বরের আসন পাতা হয়েছে।

রাজেশ্বর তাড়াতাড়ি 'যাই' বলে সাড়া দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলে, যদিও কেউ তাকে তখন ডাকেনি। তার মুখেও একটা কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছিল, তাই লুকোবার জন্যে তার এই ছল।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন- এক সঙ্গে তো এই দুই বরের দেখা হ'তে নেই।

যুবকটি বললে—ও সব তো একটা মেয়েলি সংস্কার মাত্র, কোন শাস্ত্রে নিষেধ তো নেই। আপনি এমন বিদ্বান আর এই নবযুগের লোক হয়ে ও-সব কুসংস্কার কি মানেন?

জজ বাহাদুর বললেন—না না আমি মানিনে, কিন্তু ·····

যুবকটি হেসে বললে—এতে আর কিন্তু কী? এতো আর শুম্ভকে বিয়ে করতে গিয়ে শিশুপালের মত হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে না। আপনিও আপনার বৌ পাবে , আর অন্য বরও তার বৌ ঠিক পাবে।

সবজজ আর কোনো কথা না বলে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন

অল্পক্ষণ পরে আর একটি বর এলো। সে সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবা, । চোখে মুখে কৌতুকের মন্দ মন্দ হাসি।

অল্পক্ষণ পরেই লগ্ন উপস্থিত হলো। দুই বরকেই আসন ছেড়ে গা তুলতে আহ্বান করা হলো। দুইজনেই গিয়ে বিবাহমণ্ডপে আলপনা দেওয়া পিঁড়ির উপর বসল। রাজেশ্বর সবজজকে এবং রাজেশ্বরের স্ত্রী অপর যুবকটিকে কন্যা সম্প্রদান করতে বসল। পুরোহিত রাজেশ্বরকে মন্ত্র পড়াতে লাগল—ভরদ্বাজগোত্রস্য—ভরদ্বাজ—আঙ্গীরস—বার্হস্পত্য—প্রবরস্য—বজেশ্বর—দেবশর্মণঃ—পুত্রীং শ্রীমতী সাবিত্রীদেবীং শুভবিবাহায় দাতুং—এভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ বরস্যেন ভবন্ত মহংবৃণে।

সন্ধ্যাবেলা এক ডেলা আফিং খাওয়া জজবাহাদুরের অভ্যাস। এতক্ষণে তার নেশাটা বেশ জমে এসেছিল, তিনি নিদ্রাজড়িত স্বরে এতক্ষণ মন্ত্র পড়ছিলেন, কিন্তু কন্যার নাম ও তার পিতার নাম শুনে তার মনে কেমন একটা খটকা লাগল, তাঁর আফিংএর মৌতাত ছেড়ে গেল, তিনি চমকে উঠে চিন্তা করলেন, এ কী রকম নাম হলো? রাজেশ্বর দেবশর্মনঃ পুত্রীং শ্রীমতী সুরভি দেবীং তো হওয়া উচিত ছিল এবং নাম দুটো তো তাঁর তৃতীয় পক্ষের কোনো পক্ষেরই নয়—

পরক্ষণেই তিনি আবার ঝিমিয়ে পড়লেন, তাঁর মনে হতে লাগল যেন তিনি আকাশপথে পুষ্পক রথে চেপে চলেছেন, পাশে তাঁর নব পরিণীতা বধূ ··

বিবাহ শেষ হয়ে গেল। দুটি ঘরে দুটি বাসর সাজানো হয়েছিল সবজজকে সকলে মিলে সমাদরে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে ফরাসের উপর বসালে। নেশার ঘোরে তিনি দেখলেন, অনেকগুলি মেয়েছেলে তাঁকে ঘিরে বসেছে কিন্তু বরকে নেই। শোনা গেল, বরের শরীর খারাপ হয়েছে বলে তাকে বিশ্রাম করবার অবসর দেবার জন্যে শয্যায় পাঠানো হয়েছে। সবজজ ভাবলেন, অনেক রাত্রিই তো আছে! আজ রাতটায় না হয় প্রেমালাপ মুলতুবিই রইল।

পাশের ঘরে যেন মহা আনন্দ এবং কৌতুকের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল। রাজেশ্বর আর তার পত্নী সবজজবাবুর নতুন বরকে বলছিলেন, মা তোমায় আর কী বলে আশীর্বাদ করব। আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হও। তোমার স্বামীর সুমতি হোক। সুরমাকে আজ যে আমরা পেলাম সে তোমারই কল্যাণে।

সুরভির বর সুকুমার তখন মুহ্যমানের নিজের কনের দিকে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছিল, শ্বশুরের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে সে ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে মুখ ফিরিয়ে বসল।

সকলে ঘর থেকে চলে গেল। ঘরে রইল সুকুমার, সুরভি আর সাবিত্রী।

সুকুমার সাবিত্রীর ভাই। পাড়ার ছেলেদের মুখে ব্যাপার শুনে সুকুমার দিদিকে নিয়ে এখানে চলে আসে এবং রাজেশ্বরের অবস্থা দেখে ও দিদির অনুরোধে সুরভিকে বিবাহ করতে রাজী হয়ে পড়ে। অবশ্য সুরভিকে দেখে তার পছন্দও হয়েছিল খুব।

ক্ষণেক পরে সাবিত্রী বললে—আমার আবার বিয়ে তো দিলে সুকু, কিন্তু ভাবছি কাল আবার এ নিয়ে হাঙ্গামা হবে না তো?

সুকুমার বললে – কিছু ভেবোনা দিদি। এতেই সবজজ শালার আক্কেল হয়ে যাবে। তোমার ফাঁড়া কেটে গেছে। এখন আমার কপালে কী ঘটল কে জানে।

এই বলে সে সুরভির দিকে কটাক্ষ করলে। সাবিত্রী মৃদু হেসে বললে—তাহলে তোর কপাল যাচাই ক'রে নে। আমি চললাম ও-ঘরে। —এই বলে সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

পাড়ার ছেলেরা তখন মহা উৎসাহে লোকজনদের পরিবেশন করছিল আর নিজেদের কৃতিত্বের উল্লাসে চীৎকারে পাড়া মাৎ করে দিচ্ছিল।

• • •

বার বার সাতবার

যাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভা সমসাময়িক জগৎ স্বীকার করেছে, মিস পেরার বিভস্ তাদের একজন। অর্থাৎ তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

যখন তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন, আমেরিকার কোন প্রকাশকই তাঁকে আমল দিল না। পাঠকরা ভুলেও তাঁর নাম করতো না।

পর পর ছ'খানা নভেল লিখলেন। তিনি যে একজন লেখক তা পর্যন্ত কেউ উল্লেখ করলো না।

ভ্রূক্ষেপ না করে সপ্তম নভেল লিখতে আরম্ভ করলেন। সতেরো বৎসরের পরিশ্রমের ফলে নভেলখানি শেষ হলো।

জগৎ নোবেল প্রাইজ দিয়ে সেই অক্লান্ত সাধনাকে স্বীকার করলো।

নারায়ণের বিপত্তি

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বেলা আট্‌টার সময় বাজারের থলি হাতে করিয়া নারাণদাস বাজার করিতে বাহির হইয়া প্রথমে ঢুকিল রস্তুদের দোকানে। রস্তুদের ন'বাবু তখন হিসাবের খাতা খুলিয়া বসিয়াছিল; নারাণদাস তাহার সামনে আসিয়া কহিল—"আজ যাচ্ছেন ত? একটু সকাল-সকাল যাবেন, নইলে জায়গা পাবেন না। আজকে একবার মোহনবাগানের খেলাটা দেখবেন। গোটা-চারেক আজ 'ইস্টার্ণ'কে খাওয়াবে।"

ন'বাবুর কর্ণযন্ত্রে বোধ হয় কিছু প্রবেশলাভ করিল না; কাহার একটা হিসাব লইয়া তিনি তদ্গত-চিত্ত ছিলেন। নারাণদাস কহিল—"আজকের খেলা দেখবার মত হবে। ক'টায় বেরুবেন দাদা?"

দাদা নিরুত্তর। নারাণদাস দোকান হইতে বাহির হইয়া বাজারের পথে অগ্রসর হইল। গদাই বিড়িওয়ালাকে কহিল—"গদাইচরণ, আজ ক'টা খাওয়াবে বোলে মনে হয়?"

"কিসের নারাণবাবু?"

"আরে আজকের খেলায়! ইষ্টার্ণকে আজ ঘোল খেতেই হবে। যাচ্ছিস্ ত? একটু সকাল-সকাল না গেলে কিন্তু—"

গদাই-এর যদ্দের আসিয়া পড়ায় সে নারাণদাসের কথায় কর্ণপাত না করিয়া যদ্দের বিদারের দিকে মন দিল। নারাণদাস তখন সোজাপথ ছাড়িয়া, একটু বাঁকা পথে গাঙ্গুলীদের বৈঠকখানায় গিয়া হাজির হইল। বৈঠকখানায় তখন পুরা মজলিস্ চলিতেছিল। নারাণদাস প্রবেশ করিতেই শচীন দাঁড়াইয়া উঠিয়া জোড়হাতে কহিল—

নারায়ণ! তব দর্শনাভিলাষে,
আসিলাম বৈকুণ্ঠে ছুটিয়া।
কিন্তু এ কি হেরি রূপ তব প্রভু?
এক হস্তে তব
বাজারের থলিয়া, অপর হস্তে, দেব!
আধ-পোড়া বিঁড়ি!

সুরেশ কহিল—কিরে! How is তোর খোকা? অসুখ সেরেচে?

নীরেন বলিল—বিকেলে ভাল গান হবে রে, আসিস্। বোস্, তামাক ready হোচ্ছে।

নারাণদাস কহিল—তামাক খাওয়ার অবসর নেই, ও-বেলা গান শোনবারও অবসর নেই।

নীরেন কহিল—অপরাধ?

"বাজারে যাচ্ছি ; বাজার গেলে তবে রান্না হবে। আর ও-বেলা মোহনবাগান vs. ইস্টার্ণ রেল।"

"তা ও আর দেখবার কি আছে ? তোর মোহনবাগানই হয়ত আধ ডজন খেয়ে যাবে।"

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নারাণদাস কহিল— কথাটা প্রায়ই ঠিক ; তবে একটু উল্টে পড়লো। মোহনবাগান আধ ডজন খাবে নয়—দেবে।

মহিম কহিল—যা—যা। ও মোহনবাগান ছেড়ে বোসে আছে।

নারাণদাস ঝাঁকিয়া উঠিয়া কহিল—থাম্, থাম্। খেলার খবর তুই কি জানিস্ ?

সুরেশ কহিল—ও না-জানতে পারে, তবে সকলেই জানে যে, ইস্টার্ণ রেলের কাছে মোহনবাগান—

কথা কাড়িয়া লইয়া শচীন কহিল—তা বোলে আধ ডজন যে খাবে তা মনে হয় না, গোটা চারেক খেতে পারে—আগের মত সে মোহনবাগান ত আর নেই।

নারাণদাস ভিতরে ভিতরে বিষম রাগিয়া উঠিল। যদিও তামাকটা দু'এক টান দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই পাপস্থানে আর বসিল না। উঠিয়া পড়িল। নারাণদাস উঠিয়া দাঁড়াইতেই, মহিমও উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল—এরা ত খেলার বিষয়ে সব দিগ্-গজ। আজকের খেলায়, নারাণদা' যা বোলেচে—ইষ্টার্ণকে আধ-ডজন খাওয়াবে মোহনবাগান। নারাণের পিছন-পিছন মহিম বাহিরে আসিয়া কহিল—নারাণদা, কাল যে-কথাটা বলেছিলুম—সেটা··· ··

"ও! দশটা টাকা ধার ? দেবো। কাল হাতে ছিল না ভাই, হঠাৎ এক জায়গা থেকে পেয়ে গেছি। ঘণ্টাখানেক পরে যাস, হ'বে খন।—ম্যাচে যাচ্ছিস ত ?"

"নিশ্চয়ই। মোহনবাগানের ম্যাচ, যাবো না !"

"একটু সকাল-সকাল যাস্—নইলে·· "

"তাহোলে ঘণ্টা খানেক পরে যাব তোমার ওখানে ?"

"যাস।" বলিয়া নারাণদাস বাজারের পথে অগ্রসর হইল।

• • •

"চাই—গরমা-গরম ছোলা ভাজা মুড়ি।"

"পান সিগারে-ই-ট্ !"

"টাট্‌কা ভাজা, বাবু, টাট্‌কা—ভাজা !"

"আইস্ ক্রী-ই ইম্, লেমনে—ড্ !"

চতুষ্পার্শ্বে নানা জাতীয় অসংখ্য দর্শকের মধ্যে মোহনবাগান vs. ইস্টার্ণ রেলের ম্যাচ চলিতেছে।

"এই—এই গো···উঃ ! বড্ড বাঁচালে !"

"আরে এত্তে ঠেলিচো কাঁইকি ?"

"নাইস্ ! গুড্ শট্ !'

"হওলি মিওলি চুবাণ্ চলসু ভেত্তি গ্রিবিত্তি !"

"আরে ছাতা জেরাসে উঁচা করো বাবু।"

"রে—রে—রে—রে—রে—রে !"

মোহনবাগানের গোলের দিকে যেখানটায় সর্বাপেক্ষা বেশী ভীড় জমিয়াছিল, সেইখানে একটি প্যাকিং বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া নারাণদাস প্রায় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ক্রমাগত পাগলের মত চীৎকার

করিতেছিল—গো অন্ গোষ্ঠাষ্টী—গো অন্! গো অন্! —নাইন, ডেটি নাইন! মৌলিক—সাবাস্ ঘাষা—কিক্ অন্, শুই—এক্সনে—এ হে-হে-হে-হে! গো অন্ থকোয়াজ! গো অন্ গোষা···। হেহটাকে অসম্ভব রকম ডানদিকে হেলানোর ফলে নারাণদাস বাম উল্টাইয়া পড়িয়া গেল এবং বাক্সের কোণা লাগিয়া কপাল হইতে রক্ত গড়াইতে লাগিল। বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নারাণদাস আবার উঠিয়া জামার হাতায় কপালের রক্ত মুছিতে মুছিতে চীৎকার করিতে লাগিল—কাউন! তাহা কাউন। কাণা রেফারী কোথাকার!···

"হাও ব-অ-অ-ল্!"

মিনিট দুই পরেই বিনা-হাততালি ও কলরবের মধ্যে একটা অস্ফুট রব শোনা গেল—'গো-ওল্'।—অর্থাৎ মোহনবাগান অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা গোল খাইল। ইহারই মিনিট খানেক পরে রেফারীর খেলা-শাষর বাঁশী বাজিয়া উঠিল - ক্র-র্-র্-র্!—মোহনবাগানের হার হইল।

• • •

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, ম্লান ও গম্ভীর বদনে নারায়ণ গৃহে প্রবেশ করিল। নারায়ণের নারায়ণী—অর্থাৎ স্ত্রী বিরক্ত স্বরে কহিল, "খোকার মালিসটা এনেছ?"

উত্তর না দিয়া নারাণদাস শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

"আনো নি তাহোলে? বুকে সর্দি বোসে ছেলেটা এইবার মরে যাক। অত জোরে বলে দিলুম—"

তেমনি নির্জীবের মত শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া নারাণ খুব জোরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার যেন কথা কহিবার শক্তি নাই।

"তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?"

"উঃ! ওঃ-ও-ও! বাবা গো!"

"কি হোয়েচে তোমার? বুকে কোন ব্যথা-টাথা আটকালো নাকি?" বলিয়া হেমাঙ্গিনী বুকে তেলে-জলে মালিস করিবার জন্ত তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে তেল আনিতে ছুটিয়া গেল।

কোন কথা না বলিয়া নারাণদাস ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক-পা এক-পা করিয়া হাজির হইল পাড়ুলীদের বৈঠকখানায়।

তখন সেখানে বিকালের গানের আসর ভাঙিয়া গিয়াছিল। তবে শচীন, সুরেশ, নীরেন, মহিম প্রভৃতি অনেকেই ছিল। নারাণদাস টলিতে টলিতে গিয়া সতরঞ্চির একধারে নির্জীবের মত শুইয়া পড়িল।

শচীন লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—ওরে নারাণের কি হোল—ভাখ—ভাখ।

সুরেশ তাড়াতাড়ি পাখা আনিয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল; কহিল—হবে আবার কি; মোহনবাগান যে হেরেচে।

নীরেন এক বালতি ঘোলা জল আনিয়া নারাণের মাথায় ঢালিতে যাইতেছিল, সুরেশ বারণ করিল, কহিল—ওতে সুবিধে হবে না। নারায়ণের মাথায় মধ্যম-নারায়ণ মালিসের দরকার। কেউ আনতে পারিস?

সকালেই টাকা দশটা মহিমের হস্তগত হইয়াছিল। মধ্যম-নারায়ণের কথায় সে তখনি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং উঠান হইতে এক তাল কাদা তুলিয়া আনিয়া নারাণের মাথায় মাখাইয়া দিতে দিতে কহিল—আপাততঃ এই দিয়ে "মধ্যম-নারায়ণ"ই চলুক, তারপর দেখা যাবে এখন।

তখন নারাণ ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া ঘরের কোণের লাঠিগাছটা লইল এবং ক্ষিপ্তের মত সকলের মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পিছনের জানালায়

রামপদ মুখোপাধ্যায়

(অসি কানী)

ওই ভাগবত রামায়ণের আসরে আরও একজনকে নিত্যনিয়মিত হাজিরা দিতে দেখেছি। যখই সাধারণ স্তরের মানুষ এরা। কোন আসরে এদের আসা-যাওয়া নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না—একদিন অনুপস্থিত থাকলে কেউ প্রশ্ন করে না—কাল আসনি কেন? শরীরটা ভাল ছিল না? বাড়ীতে কুটুম এসেছিল—বা কোন কাজে আটকে পড়েছিলে? আমাদের সেকালে জিনিস কেনার সঙ্গে 'ফাউ' নেওয়ার যেমন চলিত ছিল—এই মানুষগুলিও তেমনি সংসারে প্রতিদিনের কর্ম-পণ্যের ফাউ। এদের কাছে কড়ায় গণ্ডায় কাজ বুঝে নিয়ে 'ফাউ' স্বরূপ দুই একটা ছুটকো কাজের ফরমাসও দিয়ে থাকে হিসাবী গৃহস্থ। হয়তো বলে, ওই পাড়া দিয়েই তো বাড়ী যাবি, কাল আসবার সময় মল্লিকদের বাড়ী থেকে চাল ক'টা নিয়ে আসিস তো। কিংবা এই কলাই ক'টা ওদের বাড়ীতে পৌঁছে দিস। সেই চাল বা কলাই-এর পরিমাণ আধসেরের কম নয়। তা হোক, ও খুসি মনেই পারিশ্রমিক না নিয়ে ব্যাগারটুকু সেরে দেয়। ওই ধরনের কাজ ওর হিস্তেতেই পড়ে। ওর ডাকনাম, অসি কানী। ওটা অসীমা, অশ্বিনী কিংবা অন্য কোন ভদ্রগোছের নামের অপভ্রংশ কিনা মনে নেই। একটু লম্বের সুরে ডাকটা 'অসম' অবধি টানতে শুনেছি। না হলে সাধারণত 'অসি কানী'। ঠিক দাসীবাঁদীর পর্যায়ে ও পড়ে না। বাসন মাজা, ঘরদুয়োর পরিষ্কার বা ঘরগৃহস্থালীর বাঁধা ধাইনের কাজ ও করে না—সে ক্ষমতাও নাই, কারণ ও জন্মান্ধ। একটি আধা-স্বাধীন বৃত্তি ওর আছে—তাতেই কোনক্রমে দু'মুঠো অন্ন ও পরণের একখানা কাপড় ও জুটিয়ে নিতে পারে। বৃত্তিটি হ'ল ধান ভানা, পাশে-পার্বণে চাল গুঁড়ানো, মশলা কোটা—ডাল ঝাঁড়ানো। তখনকার দিনে (৬০ বছর আগে) বহু গৃহস্থ বাড়ীতে যেমন গোয়াল থাকত তেমনি থাকত ঢেঁকিশাল। ওই দু'টি সম্পদ আজ রূপকথার রাজ্যে নির্বাসিত। ও দুটি ছিল সম্পন্ন গৃহস্থের লক্ষণ। সুতরাং কোন-না-কোন বাড়ীতে প্রতিদিন কাজের জন্য ডাক পড়তো 'অসি কানীর'। কাজ হ'ল ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া। সবচেয়ে পরিশ্রমের কাজ, এবং কিছুটা হিসাবের কাজও। ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ারও নাকি ইতরবিশেষ আছে—যার একটু এদিক ওদিক হলে হয় ভানা চালে ধানের অংশ বেশী থাকবে নতুবা গুঁড়িয়ে গিয়ে খুদের ভাগ বাড়বে। আবার বিশেষত্বও আছে। গানের যেমন তাল লয় ঠিক থাকলে ওটা সুন্দরভাবে উতরে যায় তেমনি তালে তালে পাড় দেওয়ার উপরে সুন্দর চাল তৈরীর তত্ত্ব নিহিত। তাছাড়া যে মানুষ ঢেঁকির গড়ে হাত ঢুকিয়ে ধানগুলো উল্টে-পাল্টে দেয় তার নিরাপত্তাও বজায় থাকে। গানের সঙ্গে সঙ্গতের মত ভানুনীর সঙ্গে ধানপরিচর্যাকারিণীর যোগাযোগটা খুব নিবিড়। একটু অসাবধান হলে দুর্ঘটনা অনিবার্য। তা জন্মান্ধ হলেও তেমন দুর্ঘটনা 'অসি কানী' কোনদিন ঘটিয়েছে বলে শুনিনি। বরং ওই রকম হিসাবী

কাজের তালে তালে ও যেভাবে চমৎকার চমৎকার গল্প বলে যেতো তা শুনে বাড়ীর গিন্নী ও বৌ-ঝিরেরা মুগ্ধ হতেন, একটানা কাজে ক্লান্তি বোধ করতেন না। ওঁদেরই অনুরোধে সন্ধ্যাবেলায় আসরে মালা জপ থামিয়ে দেহতত্ত্বের গানও ওকে গাইতে শুনেছি। কথকতার আসর থেকে ও সংগ্রহ করে আনত বিচিত্র সব পৌরাণিক গল্প, বহু তত্ত্বকথা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত। কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায় কোন গৃহস্থ বাড়ীর রোয়াকে বা বারান্দায় বসে সেইগুলি চমৎকার ভাবে গুছিয়ে বলত। অদ্ভুত ছিল ওর স্মৃতিভাণ্ডার। পৌরাণিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন সংশয় উঠলে 'অসি কানী'র শরণাপন্ন হয়েছি এবং অবিলম্বে সদুত্তর লাভ করেছি। আমাদের কাছে ও ছিল সচল পৌরাণিক অভিধান। আজ ওরা নেই, ছাপার হরফে পৌরাণিক অভিধান বা'র হয়েছে।

অন্ধ হলেও গ্রামের পথঘাট ছিল ওর নখদর্পণে। এক পথ থেকে অন্য পথে মোড় ঘুরে ডাইনে বামে চিহ্ন ধরে কেমন করে যে ঠিকানায় পৌঁছত বিস্ময়ের কথা। সন্ধ্যায় রামায়ণ ভাগবতের আসর শেষ হলে নির্ভুল পথ ধরে নিজের আস্তানায় পৌঁছত। অবশ্য একথা ঠিক, অন্ধের দিনই বা কি—রাতই বা কি। একটা ইন্দ্রিয় হারিয়ে আরও কয়েকটি ইন্দ্রিয় ওর প্রতিমুহূর্তে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। পায়ের শব্দে, হাসি-কাসির শব্দে টপ করে মানুষ চিনে ফেলতো, পথের বাপতোক পা ফেলার সংখ্যা দিয়ে ঠিক করে নিত, এবং স্পর্শানুভূতিতে আলোছায়া দিনরাত্রি বেলা ও রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকৃতিকে ধরে ফেলতো। বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাস পড়ে প্রথমেই আমার মনে পড়েছিল ওই গরীব অন্ধ ধান-ভানুনীকে।

ওকে কিন্তু 'কাউ' হিসাবে ধরলে ভুল হবে। শ্রমের বদলে পারিশ্রমিক ও ঠিকই নিতো, কিন্তু বাড়তি কাজটুকু হাসি মুখেই করে যেতো। বলত, আর জন্মে কত পাপ করেছিলাম—তাই এই জন্মে ভুগছি। মানুষের উপকারে যদি না লাগলাম তবে মনিষ্যি জন্ম কেন।

ওর উপকার করার স্পৃহাকে অনেক সুযোগ-সন্ধানী স্বার্থসাধনে ব্যবহার করতো।

যদি কেউ বলতো, ও তোমাকে ঠকিয়ে নিচ্ছে—

ও হেসে বলতো, নিক না—সব কাজের হিসেব নিকেশ এক জায়গায় জমা থাকবে।

তার মানে তুমিও একদিন ওকে ঠকাতে পারবে?

ছি-ছি, কি যে বলেন। অমন মতি যেন না হয়। আগের জন্মে কত জনকে কত কষ্ট দিয়েছি বলেই তো এই জন্মে এমন ফল।

কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ চোখে জলের ধারা গড়াতো।

চালের দর হঠাৎ বেড়ে গেল—আড়াই টাকা কিলো থেকে পাঁচ টাকা কিলো হল। স্বল্প আয়ের মানুষরা চোখে অন্ধকার দেখল। অসি কানীর তো সামান্য আয়, তাতে সব দিন কাজ জোটে না। সুরু হল অর্থাশন। সবাই পরামর্শ দিল—তোমার বোনপো-কে চিঠি লেখ, টাকা পাঠিয়ে দেবে নিশ্চয়। হাজার হোক মামী তো!

আমাদের বাড়ীতে এসে মাকে বলল, দেখুন মা, সবাই এই পরামর্শ দিচ্ছে, কিন্তু এটা কি ঠিক হবে? কখনও মামীর কাজ করলাম না, কোনদিন স্নেহস্পর্শ করে ভালমন্দ পাতে দিতে পারলাম না, এখন দ্বারে ঠেকে হাত পাতবো? ভারি লজ্জার কথা মা। তা-ও যদি দিদি বেঁচে থাকতো।

মা বুঝিয়ে বললেন, তোমার অবস্থা ও তো সবই জানে—এতে 'কিন্তু' হচ্ছে কেন? ও-ছাড়া তোমাকে দেখবার কে-ই বা আছে!

না মা, এ ভারি অন্যায়ের কথা, আমি পারব না! থাকই না দুটো দিন, দীন-দুঃখী সবাই'র যে গতি —আমারও তাই হবে। যদি মরেই যাই ওকে একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন।

ওর একমাত্র আত্মীয় বোনপো ললিতচন্দ্র থাকতো ভুয়ার্সের চা বাগানে। সেখানে ভাল ভাবেই থাকতো পরিবার নিয়ে। মাঝে মাঝে দেশে এসে মাসীকে টাকা দিয়ে যেতো। নতুন কাপড় কিনে দিত। প্রতি মাসে বাঁধা টাকা পাঠাবার মত অবস্থা ওর ছিল কিনা জানি না, তবে পুজোর সময় পাঁচটি করে টাকা পাঠিয়ে প্রণাম জানাতো মাসীকে।

সেইবার অঘ্রাণে থেকে ওর দেহের শক্তি কমে গেল, আগের মত বহুক্ষণ ধরে ঢেঁকিতে পাড় দিতে পারত না। তাছাড়া কর্তনিং ও লেভির পর ঢেঁকিও গৃহস্থ বাড়ী থেকে বিদায় নিতে সুরু করেছিল। আমাদের বাড়ীতে ঢেঁকি ছিল, উঠে গেল। পাড়াতে আরও পাঁচটা বাড়ী থেকে বিদায় নিল ঢেঁকি। সুতরাং অসি কানীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কমে আসারই কথা। ঢেঁকিতে ধান ভানা উপলক্ষেই তো ওর আনাগোনা। কিন্তু তা হ'ল না, ঢেঁকি দূর হলেও অসি কানী আমাদের সংসারের মাঝখানে এসে পড়লো।

ওর নিজের জন্ম-ভিটে অনেক আগেই বিক্রী হয়ে গিয়েছিল—মাসিক আট আনা ভাড়ায় একখানা চালা ঘরে বাস করতো। অন্ধকে কে বিয়ে করবে—সুতরাং নারীর দ্বিতীয় ও প্রধান আশ্রয় ওর ছিল না। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একমাত্র ওই বোনপো—তা সে-ও থাকতো বহু দূরে। ভাড়ার চালাঘরখানা ক্রমশঃই জীর্ণ হয়ে আসছিল—চালাটা ছাইয়ে না নিলে আর চলে না—বর্ষাকালে দুর্গতির একশেষ।

ঘরের মালিককে জানিয়ে কোন ফল হয়নি। মালিক বলেছে, চালা ছাইবার পয়সা আমার নেই। নিজে খরচ করে নিতে পার, থাক। না পার—

সে সামর্থ্য ওর ছিল না—একেই তো অর্ধাশন চলছিল। একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে সরাসরি প্রস্তাব করল, মা, একটু আশ্রয় দেবেন? আপনাদের দিবের বাড়ীতে একটু কুঁড়ে তুলে নেন যদি—

মা বললেন, ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে বলব। কিন্তু ঘর ভাড়া বলে কিছু নিতে পারব না।

অসি কানী বলল, সে কেমন করে হবে মা? বামুনের ঋণ—

মা বললেন, কি করব বল, এ বংশে কেউ কোন দিন বসতবাড়ী ভাড়া দেয়নি, এতো কলকাতা শহর নয়।

এই কথায় ওর মুখখানা শুকিয়ে গেল দেখে মা তাড়াতাড়ি বললেন, দুঃখ করো না। টাকা না দিয়ে অন্য কিছুও তো দিতে পার। সত্যি কথাই তো—তুমিই বা অমনি নেবে কেন!

ও শুকনো গলায় বলল, আমি কি দেব মা, আমার তো কিছু নেই।

মা হেসে বললেন, কেন? আমার বাড়ীতে দেখছই তো লোকাভাব, ছেলেরা কলকাতায় থাকে, আমি একলা থাকি ভিটেয়। একজন কথা কইবার লোকের জন্য প্রাণ ধাঁকপাক করে। সন্ধ্যের পর তোমার সঙ্গে গল্পগাছা করলে মন ভাল থাকবে। তা ছাড়া দরকার হলে এটা ওটা জিনিসপত্তর কিনে এনে দেবে।

এই কথায় ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বলল, বেশ বলেছেন মা, রোজ সকালে আমি আপনার উঠোন ঝাঁট দিয়ে দেব।

না-না, তা কেন—

কেন মা, ব্রাহ্মণের সেবা কি ধর্ম নয়? ওতে ইহকাল পরকাল দুইই সার্থক হবে। অন্ধ মানুষ, আর কিছু করবার ক্ষমতা তো দেননি ভগবান—ওটুকু থেকে বঞ্চিত করবেন না মা।

বাড়তি কয়োগেট টিন পড়েছিল কয়েকখানা, একটা ছোট দুয়োর- একটা হাত জানালা ছিল, বাড়ীতে ছিল প্রচুর পাতলা ইট—তাই দিয়ে ছোট একখানা ঘর তোলা হল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই ঘরে কাটিয়ে দেবে অসি কানী।

ক্রমশঃ বয়স বাড়ছিল—অথর্ব হয়ে পড়ছিল। মাকে ওর বোনপো এসে কর্মস্থলে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করল। ও তার সঙ্গে গেল না। একদিন মা-কে বললে, এই শেষ বয়সে—বিদেশ বিভূঁই অগঙ্গার দেশে আর যাব না, মা। আপনারা রয়েছেন—শেষ সময়ে মুখে একটু গঙ্গাজল দেবেন— তারকব্রহ্ম নাম শোনাবেন। যেখানে জন্মেছি সেই মাটিতে দেশের ঘরে চোখ বুজতে পারব এর চেয়ে সুখ আর কি আছে মা। এই বেলা আর একটা কথা বলে রাখি। ঘরের ঈশান-কোণে পেতলের একটা ছোট ঘটি পোঁতা রইল—ওর মধ্যে লিখিত (বোনপো) মাকে মাঝে যে টাকা পাঠায়—তার সবটা খরচ না করে কিছু কিছু জমিয়ে রাখি। আমার তেমন তেমন অবস্থা হ'লে ওকে একটা খবর পাঠাবেন। ঘটিটা তুলে টাকাগুলো নিয়ে ঘাটখরচ, শ্রাদ্ধ-শান্তি ব্রাহ্মণ-ভোজন এগুলো যেন করায় লিখিত। এতো ওরই করবার কথা, ওর টাকাতেই হওয়া ভালো।

* * *

হেলেন কেলার জন্মেছিলেন, বিধাতার পরিপূর্ণ অভিশাপ নিয়ে।

জন্ম থেকেই তিনি অন্ধ, মূক ও বধির।

কিন্তু সাধনায় বলে সেই অন্ধ-অভিশপ্ত নারী যখন পৃথিবী থেকে চলে গেলেন তখন সগৌরবে তিনি বলতে পারতেন, যাদের চোখ আছে, তারা যত বই না পড়েছে, আমি তার একশো গুণ বেশী পড়েছি।

নিজের হাতে লিখে পৃথিবীকে সাতখানা নূতন বই দিয়ে গিয়েছি ; ছায়াচিত্রে নিজের ভূমিকায় নিজে অভিনয় করে গিয়েছি ; যাদের কান আছে, তাদের শতকরা নব্বুই জনের চেয়েও জগতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বেশী করে উপভোগ করে গিয়েছি।

Sulekha
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA
WORKS
LTD.
SULEKHA PARK.
CALCUTTA - 32
sridevyar

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫, JUNE, 1968
ত্রয়োবিংশতি বর্ষ—১২শ সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

শ্রীগোপাল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

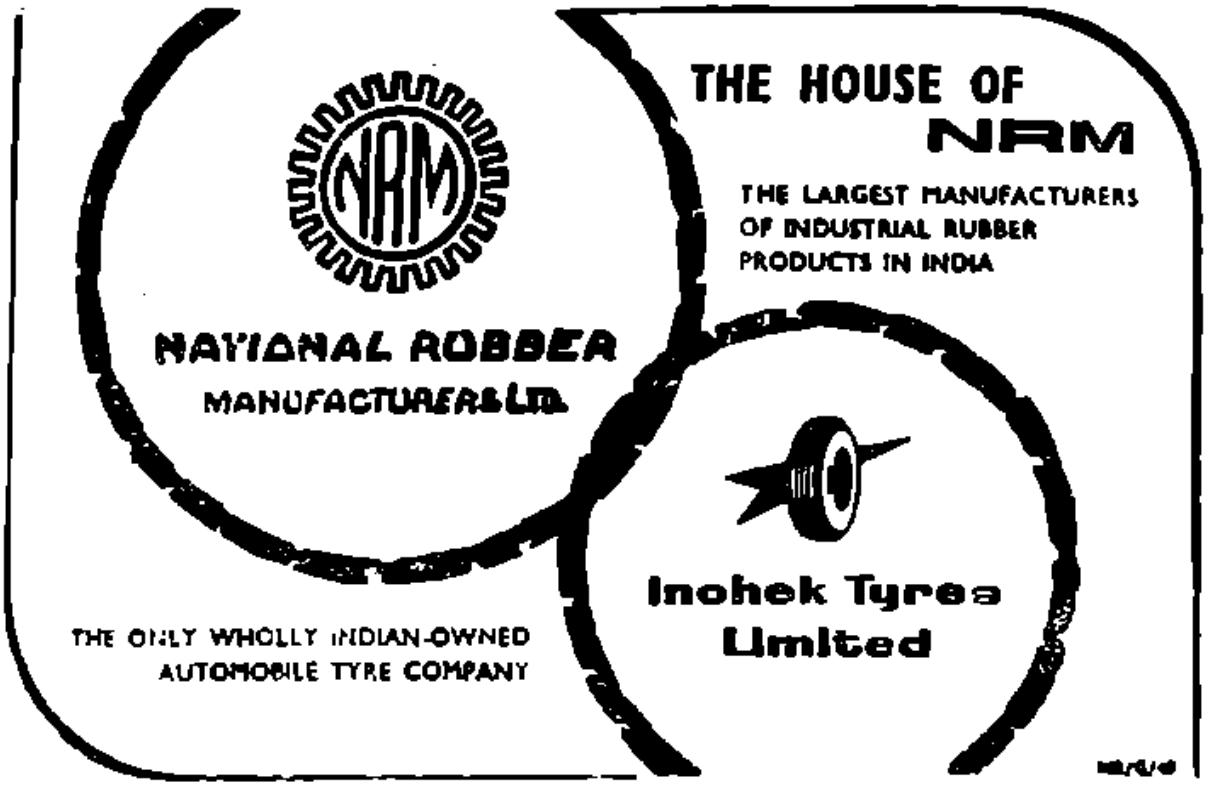

DESIGN ● DISPLAY ● EXHIBITION ● OUTDOOR

ASTER ADVERTISING SERVICE PRIVATE LTD.

3, CAMAC STREET, CALCUTTA-16

PHONE : 44-6552

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়		৮৫১
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)		৮৫৩
মন যেতো যেথা ছুটে (স্মৃতিচারণ)	—নরেন্দ্র দেব	৮৫৭
কন্যা কন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৮৬৪
জোড়াতালি (গল্প)	—রবীন্দ্র নারায়ণ দে	৮৭৫
চলতি পথের চিত্র „	—নির্মল দত্ত	৮৮৩
পলাশের রঙ „	—সন্তোষকুমার অধিকারী	৮৮৬
অস্বীকার „	—শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়	৮৯৪

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

সুন্দর ও সকল বয়সের উপযোগী।

[illegible] • [illegible] • [illegible] • [

এই সংখ্যায়

অন্ধ্রের মন্দির (ভ্রমণ কাহিনী)	—সুবোধ কুমার চক্রবর্তী	৮৯৭
দারোগার দপ্তর	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৯০৭
পুরাতন পাতা—		
আমার সম্পাদকীয় জীবন	—সরলা দেবী	৯১৭
নাটমঞ্চ	—রত্নাকর	৯২০
খেলাধূলা	—শ্রীজ্যোতির্ময়	৯৩০
বিশ্ব-সাহিত্য—		
চাকরি নিতে পারলাম না	মূল : ভ্যালিমির গারশিন অনুবাদ—মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ	৯৩৩
দানিয়ুব হলো নীল	—গৌরীশঙ্কর দে	৯৩৫

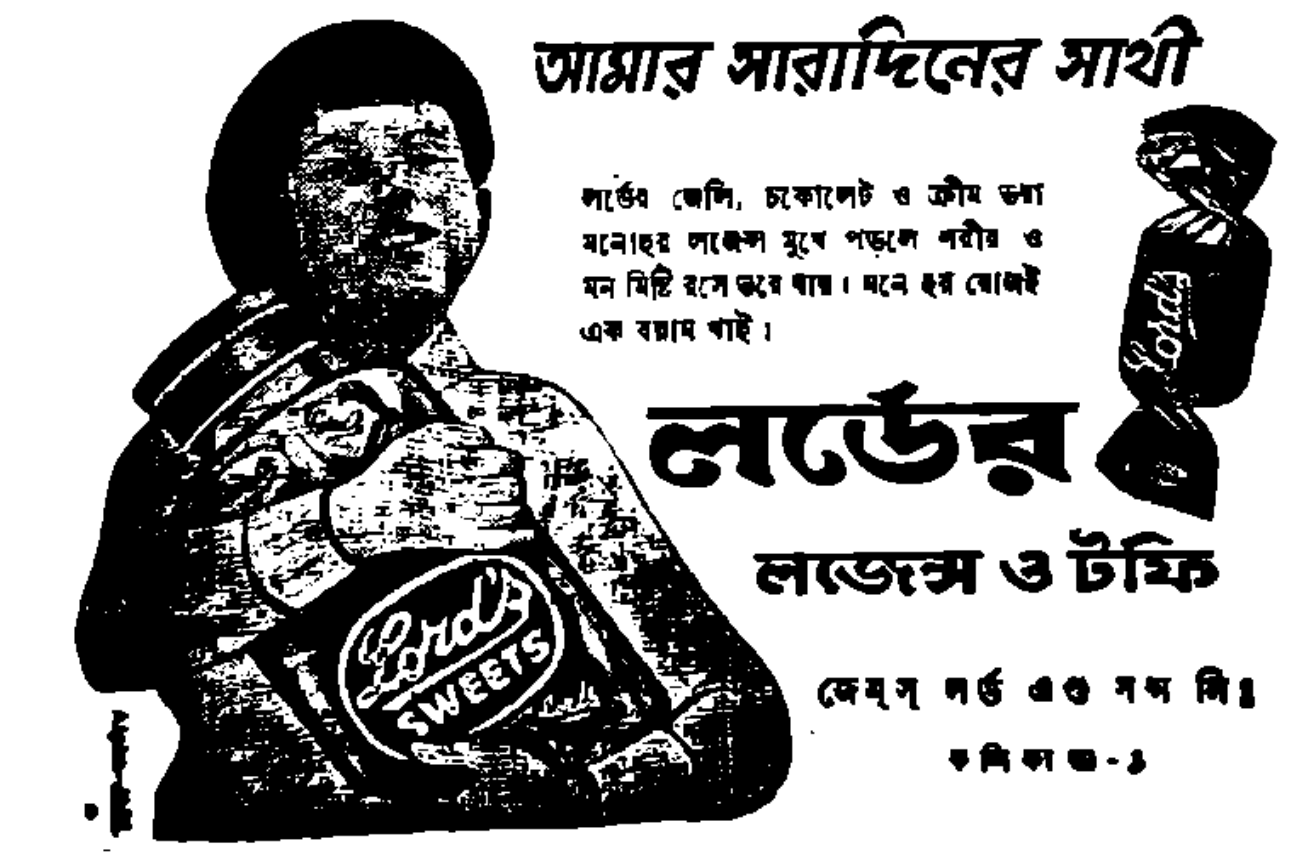

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল। বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
ভূতপূর্ব সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যি খি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

চলতি দুনিয়া		৯৩৮
অজনা সংবাদ	—দেবযানী	৯৪১
মেয়ে-মজলিশ—		
একালের রান্নাঘরে	—বেলা দে	৯৪৬
ঘরকন্নার টুকিটাকি	—শকুন্তলা দেবী	৯৪৮
ফল বলতে আম জাম আনারস আরো কত কি	—আভা পাকড়াশী	৯৪৯

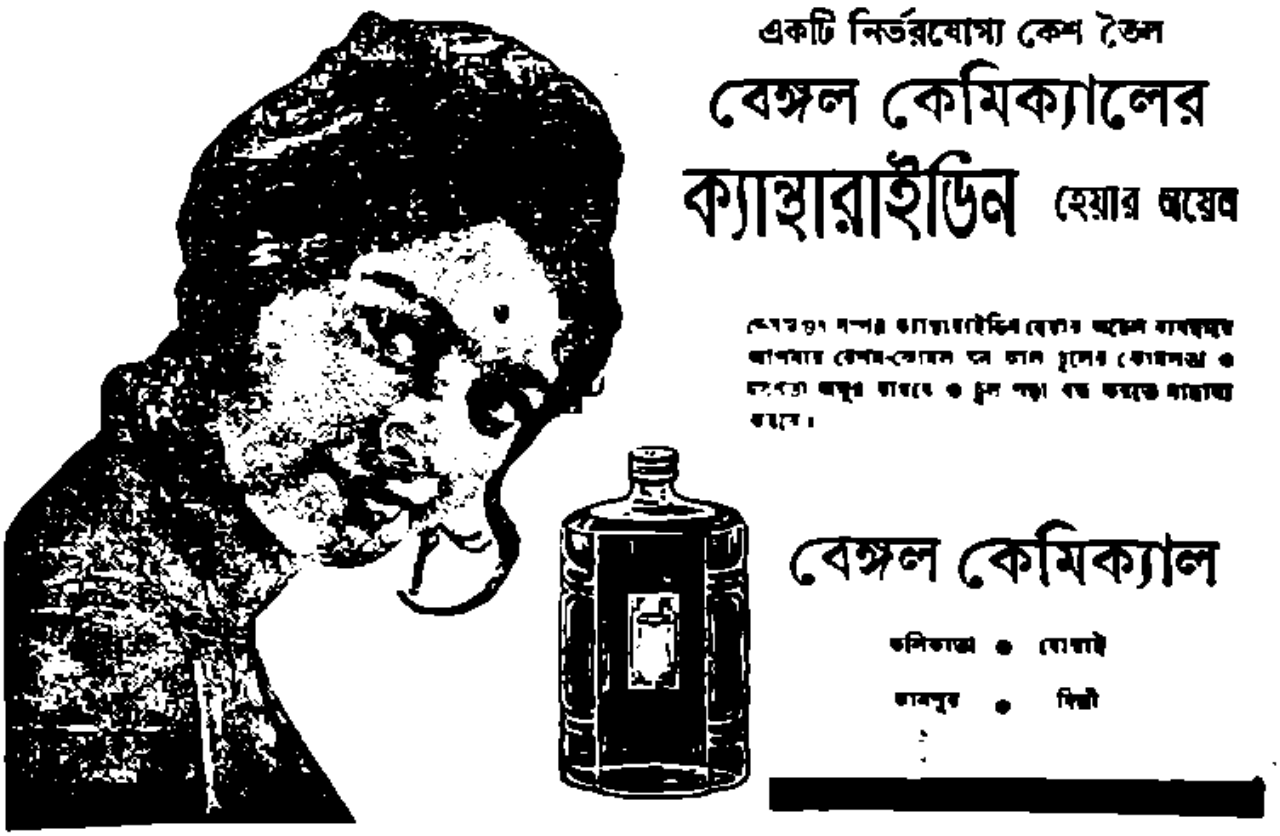

দ্বিবিধ গুণসম্পন্ন
আয়ুর্বেদীয় সুরভিত

মহাভৃঙ্গরাজ

কেশ তৈল

চিঠি লিখলে ভৃঙ্গল-এর
বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত
পুস্তিকা পাঠান হয়।

ভৃঙ্গল

- *মাথা ঠাণ্ডা রাখে*
- *স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশ বর্দ্ধনে সাহায্য করে*

ছোট শিশির জন্যই আপাততঃ এই নতুন বাক্স। ছোট ও বড় দুই রকম শিশিতেই এখনও পুরানো লেবেল চলবে। পরে আসবে নতুন লেবেল।

ক্যালকাটা কেমিক্যেল কর্তৃক প্রস্তুত

CBF-1.0-60

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

গ্রামের একটি স্কুলে মাষ্টারি করতে এলেন বিনয় সান্যাল।

ছোট ইস্কুলের ছোট মাষ্টার। টিকিটের ওপর সই করে রসিদ লিখতেন পঞ্চাশ টাকার, কিন্তু পেতেন মাত্র তিরিশ টাকা।

নিজে এই কাজ করতেন আর ছাত্রদের বলতেন, যদি বড় হতে চাও তো জীবনে কোনোদিন মিথ্যাচার কোরো না।

এই কথা শুনে একদিন একটা বখাটে ছাত্র তাঁকে খুব বিপদে ফেলে দিলে। বললে, তা যদি বলছেন তো স্যার আমাদের গাঁয়ের দুটু বোয়েশী এত বড় হলো কেমন করে?

—কেন? দুটু কি করেছে?

ছাত্রটি বললে, হরদম মিছে কথা বলছে। বাণীগঞ্জে যে জিনিস এক টাকায় কিনে আনছে, এখানে সেই জিনিস বিক্রি করছে দেড় টাকায়। দুটু বোয়েশীর মস্ত বড় গোলদারী দোকান, আর সুদের কারবার।

বিনয়বাবু হেসে বললেন, ব্যবসায় দোষ নেই।

ছেলেটার ইচ্ছে ছিল আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবার। ইচ্ছে ছিল—আরও কিসে কিসে দোষ নেই জেনে নেবার।

কিন্তু পারলে না জিজ্ঞাসা করতে। বিনয়বাবু বই খুলে পড়া ধরে বসলেন।

কথাটাকে বিনয়বাবু তখনকার মত চাপা দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নিজের মনেও তখন সেই এক প্রশ্ন।—জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিথ্যাচার করলে দোষ হয় না।

রাত্রে বিনয়বাবুর ভাল ঘুম হলো না। বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে তিনি তাঁর মনের মত করে সে প্রশ্নের মীমাংসাও করে ফেললেন।

জীবনে বড় হওয়া মানে বড়লোক হওয়া। আর বড়লোক হওয়া মানেই ধনবান হওয়া।

আর-একরকমের বড় হওয়া আছে। চরিত্রবান হওয়া, সৎ হওয়া, পরের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। তাতে শ্রদ্ধা পাওয়া যায়, সম্মান পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থ পাওয়া যায় না।

সে রকম বড় তিনি হতে চান না। শুধু অন্ধা সম্মানে পেট ভরবে না।

তিনি চান টাকা। তিনি চান সুখ। জীবনকে তিনি উপভোগ করতে চান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত পবিত্র প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ টাকার রসিদ লিখে মাত্র তিরিশটি টাকা উপার্জন ক'রতে যদি কোনও অপরাধ না হয় তো কোনও মিথ্যাচারেই কোনও অপরাধ নেই।

বিনয়বাবু বিবাহ করেননি। স্ত্রী নেই, সংসার নেই, তবু তাঁর কষ্টের সীমা নেই। সে কষ্ট তাঁকে দূর করতে হবে।

তিরিশ টাকা মাইনের স্কুল-টিচার মনে মনে একদিন এই সঙ্কল্প করে বসলেন।

ছুটি যোগেশীকে একদিন দেখে এলেন বিনয়বাবু। নাকে কপালে তিলক আঁকা, গলায় তুলসীর মালা। সোনার গয়না বন্ধক দিতে এসেছে একটি মেয়ে। তারই সুদের হিসেব করছে।

তিলক কেটো কেটে তুলসীর মালা পরে সে নিজে যা নয় তাই সেজে বসে আছে। ধার্মিক মানুষের মুখোস পরেছে।

বংশানুক্রম উপার্জনের আর একটি পথ ছিল বিনয়বাবুর।

আগে যেখানে ছিলেন লোকজনকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন।

সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স আর বইগুলি সঙ্গে এনেছিলেন। ভেবেছিলেন রুগী পেলে এখানেও চিকিৎসা আরম্ভ করবেন।

একদিন একটি রুগী পেলেন। তাঁরই ইস্কুলের একটি গরীব ছাত্রের হলো অসুখ। একটি পাথরের বাটিতে জল দিয়ে তারই সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধ মিশিয়ে তাকে তিনি খাইয়ে দিলেন।

ছেলেটি সেরে উঠলো।

সে যে হোমিওপ্যাথি ওষুধে সেরেছে বিনয়বাবু সেকথা বললেন না। বললেন, তিনি একটি স্বপ্নাদ্য মন্ত্র জানেন। এ সেই সর্বরোগহর মন্ত্রঃপুত জল।

কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। প্রথমে সেই গ্রামের মধ্যে। তারপর গ্রামান্তরে।

প্রতিদিন নানারকমের রুগী আসতে লাগলো তাঁর কাছে। সবাইকেই তিনি সেই মন্ত্রঃপুত জল দিতে আরম্ভ করলেন। মাথায় চুল রাখলেন। গোঁফ-দাড়ি কামালেন না। কপালে লাল একটি সিঁদুরের ফোঁটা কাটতে লাগলেন। গলায় পরলেন একটি রুদ্রাক্ষের মালা।

রাত্রে ঘরের ভেতর খিল বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হোমিওপ্যাথি বই পড়েন। লোকে জানলো গোপনে তিনি তন্ত্রসাধনা করছেন।

রোজগার মন্দ হয় না। হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে যে রোজগার হতো, এতে তার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার হয়। মন্ত্রঃপুত জলের দাম তিনি নেন না। রুগীরা ভক্তিভরে মায়ের প্রণামী দিয়ে যায়।

এইবার ইস্কুলের চাকরিটি বিনয়বাবু ছেড়ে দিলেন। সবিনয়ে হাতজোড় করে হেডমাষ্টারমশাইকে জানালেন, মায়ের আদেশ—এখন আর আমি কোনোরকম মিথ্যাচার করতে পারবো না।

মিথ্যাচারটি কি—হেডমাষ্টারমশাই তা বুঝলেন। পঞ্চাশ টাকার রসিদ সই করে তিরিশ টাকা নেওয়া তাঁর পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়।

সত্যই ত! এমন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে সে অনুরোধও আর করা চলে না।

বিনয় সান্যালের ওপর হেডমাষ্টারমশাইএর শ্রদ্ধা যেন আরও বেড়ে গেল।

এদিকে আর এক সমস্যা। ইস্কুলের যে ঘরখানি তাঁকে দেওয়া হয়েছে সে ঘরখানি তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে।

কোথায় তিনি যাবেন ভাবছেন, এমন দিনে একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে গেল।

ছুটু বোরেগীর এক ভগ্নিপতি এলো সেই গ্রামে। পায়ে তার একটা ঘা হয়েছে। ডাক্তারী চিকিৎসা করিয়েছে, অনেক ওষুধ লাগিয়েছে, অনেক ওষুধ খেয়েছে, কিছুতেই সারছে না। সে নাকি শুনেছে এই গ্রামে একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আছেন তাঁর জলপড়া খেলে নাকি সব রোগ সেরে যায়।

বিনয় সান্যালের ডাক পড়লো ছুটু বোরেগীর বাড়ীতে।

ছুটুর ভগ্নিপতি বললে, আমার এই অসুখটি সারিয়ে যদি দিতে পারেন, আপনাকে আমি ভাল টাকা দেবো।

বিনয়বাবু বললেন, টাকা আমার নেবার উপায় নেই—মা'র আদেশ। তবে মায়ের প্রণামী বাবদ কিছু দিতে পারেন। মায়ের একটি মন্দির করবার ইচ্ছে আছে আমার।

সে ইচ্ছা বিনয়বাবুর পূর্ণ হয়েছিল।

ছুটু বোরেগীর ভগ্নিপতির পায়ের ঘা সারতে একমাস লাগলো।

বিনয়বাবুকে সে নিয়ে গেল নিজের বাড়ীতে।

বিনায়ক-সাধুর নাম শুনেই আমি গিয়েছিলাম।

কয়লাকুঠির থেকে ছোট্ট একটি পথের একপ্রান্তে 'ভবানী-মন্দির'। সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবানীর সেবায়েৎ বিনায়ক-সাধু।

অনেকে বলে সাধু-মহারাজ।

সাধু-মহারাজের মন্ত্রপূত জল খেলে মানুষের সবরকম রোগ সেরে যায়। হাত আর মুখ দেখে জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সবকিছু তিনি বলে দিতে পারেন। মা-ভবানীর প্রসাদী পুষ্প এবং কবচ ধারণ করলে মানুষ তার দুঃখদুর্গতি থেকে মুক্তি লাভ করে।

এইসব শুনেই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম নিজের জীবনের কথা কিছু জানবার উদ্দেশ্যে।

গিয়ে দেখলাম আমারই মত বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক রোগশয্যায় শুয়ে আছেন। শরীরের বামঅঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে। চুল দাড়ি সব সাদা। মুখে একটিও দাঁত নেই। সব দাঁত বাঁধানো।

আমি গিয়ে কাছে বসতেই তিনি আমার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর যে-লোকটি তাঁর পায়ে ধীরে-ধীরে হাত বুলোচ্ছিল সে-লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে আমার অতীত জীবনের এমন-সব কথা তিনি বলতে লাগলেন যে আমি একেবারে বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

এই সাধু-মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবো কিনা ভাবছি, এমন সময় তিনি ম্লান একটুখানি হাসলেন। হেসে তিনি আমার নাম ধরে ডেকে বললেন।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়।

মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, মহারাজ বললেন, এখনও চিনতে পারছো না আমাকে? আমি বিনয় সান্যাল। বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে একসঙ্গে পড়েছি। ক্লাসে ফার্ষ্ট হতাম বলে—

আর বলবার দরকার হলো না। আমাদের স্কুলের সব চেয়ে ভাল ছেলে এই বিনয় সান্যালের বয়স তখন সতেরো কি আঠারো। সেই বিনয় এখন বৃদ্ধ। চিনবো কেমন করে?

বললাম, এতক্ষণে চিনেছি ভাই। তুমি ছিলে সব চেয়ে গরীব।

—হ্যাঁ। পিসির বাড়ীতে থেকে মানুষ হয়েছি। মা নেই বাপ নেই, সুখ কাকে বলে জানিনা, পয়সার মুখ কখনও দেখিনি। পয়সার ওপর ছিল অসম্ভব লোভ।

—আর তুমি ছিলে খুব বুদ্ধিমান।

বিনয় বললে, সেই বুদ্ধিই আমার সর্বনাশ করেছে। সেই বুদ্ধি দিয়ে এই ভাখো না—কি করেছি। এখন এই পৃথিবী থেকে চলে যাবার দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই ভাবছি মিথ্যা দিয়ে প্রবঞ্চনা দিয়ে সারা জীবন ধরে যে অর্থ আমি উপার্জন করেছি সে পাপের বোঝা কোথায় নামিয়ে দিয়ে যাব। সঙ্গে তো কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না!

তার কথাগুলো শুনছিলাম শুধু। শুনতে শুনতে জিজ্ঞাসা করলাম, একে মিথ্যা কেন বলছো? প্রবঞ্চনা কেন বলছো?

বিনয় বললে, হ্যাঁ, সব মিথ্যা, সব প্রবঞ্চনা। ওই যে দেবী মূর্তি দেখছো ও মিথ্যা, এই যে মন্দির, এ-ও। সত্য ছিল শুধু আমার হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে জ্ঞান। বই পড়ে পড়ে বুদ্ধি দিয়ে আর রুগী দেখে দেখে আয়ত্ত করেছিলাম। তাকেও একটা মিথ্যা ধর্মের আবরণে মিথ্যা করে দিলাম।

এই বলে সে তার জীবনের ঘটনা সবই আমাকে খুলে বললে। —এসব কথা নিজের ভেতর চেপে রাখতে পারছিলাম না। তোমাকে বলে নিশ্চিন্ত হলাম। এবার আমার টাকাগুলোর কি ব্যবস্থা করবো বল।

—আমি কি বলবো? তোমার টাকা—তুমি যা ভাল বুঝবে।

—ভাল আমি বুঝতে পারছি না। ভাল বুঝবার ক্ষমতা আমার লোপ পেয়ে গেছে। কাম আর অর্থের মোহ এখন বুঝতে পারছি মানুষকে সহজে ছাড়ে না। এই জন্যই পরমহংসদেব কামিনী ও কাঞ্চন থেকে মানুষকে নিরাসক্ত হতে বলেছিলেন।

ভেবে বললাম, তাহলে তুমি এক কাজ কর বিনয়। ছাত্র যখন ছিলে তখন তুমি খুব কষ্ট পেয়েছ। তোমার টাকাটা সেই সব ছাত্রদের দাও যারা গরীব অথচ বুদ্ধিমান।

বুদ্ধিমান শুনেই হা হা করে উঠলো বিনয় সান্যাল। বললে, না, না, বুদ্ধিমানের হাতে কিছু দেবো না। বুদ্ধিমানেরা পৃথিবীর ভাল যত না করে, মন্দ করে তার চেয়ে অনেক বেশি। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ক্ষতি কে করেছে বলতে পারো? যিনি এ্যাটম্ বোম আবিষ্কার করেছেন। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন নিশ্চয়ই। আর সব চেয়ে ভাল কে করেছেন? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। অথচ তাঁর না ছিল বিদ্যা না ছিল বুদ্ধি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অন্তরীক্ষে

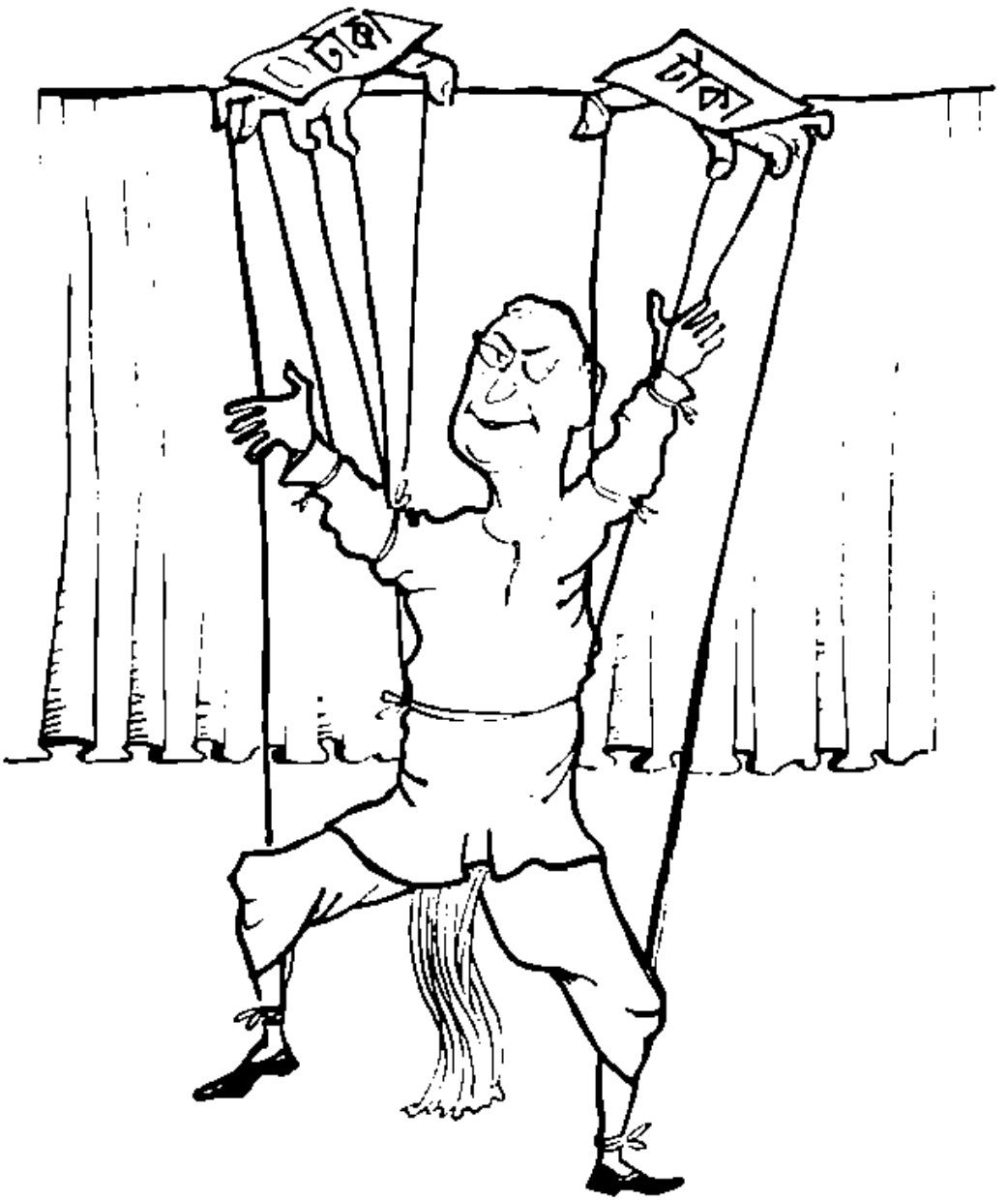

নাচের পুতুল।

ওমা! কিসের গন্ধ?

—এ কিসের পাহাড়?

প্রগতি।

আগুন। আগুন॥

পৃথিবীর নূতন উপগ্রহ।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

মন যেতো যেথা ছুটে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতীর আড্ডায় এসে পেলুম এমন একটি আসর যেখানে শুধু আড্ডাই নয় সংস্কৃতির সকল দিকের অনুশীলনই এখানে নিত্য সন্ধ্যায় চলে। রবিবার ও ছুটির দিনের প্রভাতী বৈঠক গড়িয়ে চলে এখানে দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে। কত নব নব উদীয়মান ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য সাধকের সান্নিধ্য লাভ ও বন্ধুত্ব অর্জনে ধন্য হয়েছিলুম এই বহুজন আকাঙ্খিত আড্ডায় প্রবেশ করে। জীবনের সবচেয়ে সার্থক বড় লাভ হয়েছিল এই ভারতীর আড্ডার কল্যাণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা।

'ভারতী' মাসিক পত্রিকার সাহিত্য-চক্রে যে শিল্পীরা নানা ফুলের মধু সঞ্চয় করে এই মৌ ভাণ্ডার গড়ে তুলছিলেন তাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়েছিল।

ভারতীর আসরের অধিপতি ছিলেন বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে ঠাকুর বাড়ীতেই থাকতেন। রূপবান গুণবান ও সাহিত্য ক্ষেত্রেও কীর্তিমান ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলাদেবীর উপর 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করে স্বর্ণকুমারী দেবী অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সরলাদেবী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টচৌধুরীকে বিবাহ করে পাঞ্জাবে চলে যাবার সময় স্বর্ণকুমারী দেবীর উপরই ভারতীর সম্পাদনাভার পুনরায় ফিরে আসে। স্বর্ণকুমারী দেবী তখন বার্ধক্যের শুরুভারে পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিজেকে অশক্ত মনে করে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের উপর ভারতী পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন।

এই দুই তরুণ যুগ্ম সম্পাদকের নবীন উৎসাহে ও কর্মকুশলতায় 'ভারতী' পত্রিকা এমন একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল যার মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের সুরও ধ্বনিত হতে শোনা যেতো। বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এদিক দিয়ে ভারতীর গৌরব বর্ধণে যথেষ্ট সাহায্য করতেন।

তদানিন্তন সাহিত্য-লোকের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সঙ্গে উদীয়মান নব নব নক্ষত্ররাজিও সেখানে ঝিকমিক করতে দেখেছি। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে ভারতীর যুগ্ম সম্পাদক মণিলাল ও সৌরীন্দ্রমোহন ছাড়াও উপস্থিত থাকতেন কবি ও কথা সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়, "প্রবাসী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দরাজ কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মহাকবির জাতক খ্যাত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, 'মৌচাক' সম্পাদক সুধীর চন্দ্র সরকার, শিল্পী চারু রায়, কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, সাংবাদিক অমল হোম, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা বন্ধুগণ। এছাড়া ভারতীর আসরে মাঝে মাঝে এসে উঁকি দিতেন স্বয়ং শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বীরবল" খ্যাত ও "সবুজপত্র" সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের গবেষক দীনেশ চন্দ্র সেন,

'একতারার' কবি বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, 'আবোল তাবোল' ও 'হ-য-ব-র-ল-ল'র সুকুমার রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শান্তিনিকেতনের অজিত চক্রবর্তী, কবি ও শিল্পী অসিত হালদার, চেরিফুলের কথা শিল্পী সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারণ কবি নজরুল ইসলাম, শিল্পী ও গায়ক এবং শিকারী দেবীপ্রসাদ চৌধুরী, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, মঞ্চ শিল্পী ও অভিনেতা রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, হাস্যার্ণব চিত্তরঞ্জন গোস্বামী প্রভৃতি আরও অনেকে। বাইরে থেকে মফঃস্বলের বন্ধুরাও অনেকে কলকাতায় এসে একবার ভারতীর আড্ডা না ঘুরে ফিরতেন না। সকলের কথা আজ আর এই অস্তাচলের পথে পা বাড়িয়ে মনে পড়ছে না।

অনেকের ঔৎসুক্য হতে পারে ভারতীর আড্ডায় কী আলোচনা হ'ত জানবার। তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি সব আড্ডায় যা হ'য়ে থাকে এখানেও তাই হোতো, অর্থাৎ পরনিন্দা, পরচর্চা, প্রকাশিত পুস্তক ও রচনাবলীর ভালো মন্দ সমালোচনা, উপস্থিত সদস্যদের রচিত নূতন কোনও রচনা পাঠ ও তৎসংক্রান্ত আলোচনাও চলতো। অভিনয় ও চলচ্চিত্রের চর্চাও বাদ যেত না। বিদেশী সাহিত্যেরও সূক্ষ্ম বিচার চলতো। 'সোসাইটি গার্লরা'ও আমাদের আড্ডার আলোচনায় অস্পৃশ্য ছিলেন না। কাব্য আলোচনা এবং কণ্ঠসঙ্গীতের আনন্দ থেকেও আমরা বঞ্চিত থাকতুম না। 'বসন্তজাগ্রত মম দ্বারে' থেকে "সজল ঘন কাজল মেঘে" আর "ভোর হ'ল যে জাগো শর্বরী!" গানে যেমন আড্ডা মুখরিত হ'য়ে উঠতো তেমনি তারুণ্যের তরল কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ত—"আজি শুভ্র একাদশী, নিদ্রাহারা শশী" আর "বিধি ভাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে সে কি আমার পানে কভু পড়িবে না?"

ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় এলেই ভারতীর আড্ডায় প্রতি বার ঘুরে যেতেন। গুরুতর গবেষণায় নিযুক্ত ব্যক্তি যে এত রসিক হ'তে পারে এ যারা রাখালকে না দেখেছে তারা কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। এক একজন চৌকোস মানুষ থাকে যারা অনায়াসে আড্ডা জমিয়ে তুলতে পারে। রাখাল ছিল সেই দলের লোক, এই আড্ডাবাজের কথা 'ইভনিং ক্লাবের' আড্ডার বিবরণে কিছুটা বলেছি।

আন্তর্জাতিক বা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে এদেশের পাঠকদের পরিচয় 'ভারতী' পত্রিকাই প্রথম করিয়ে দেয়। আমাদের আড্ডায় সাহিত্য আলোচনার প্রধান বিষয়ই ছিল টলস্টয়, গোর্কি, টুর্গেনিভ্, পুশকিন, চেকভ, গোগোল প্রভৃতি বিশ্বস্তুত রুশ সাহিত্যিকদের রচনাবলীর সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টর হুগো, আনাতোল ফ্রাঁস, গ্যাঁদাল, রোমাঁ রঁল্যা, এমিল জোলা, জিরো, গীত মোঁপাসা, মালার্মে, ভ্যালরি প্রভৃতির গদ্য-পদ্য রচনার আলোচনা। নরউইজিয়ান সাহিত্যিক ইবসেন, মেটারলিঙ্, স্টাইওবার্গ, জোহান বোহিয়ার প্রভৃতির রচনা সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিল, দিয়েছিল জার্মান সাহিত্যরথী গায়টে, শিলার, হফ্‌ম্যান, জুদারম্যান, টমাস ম্যান প্রভৃতির রচনা আমাদের নাট্য ও কাব্য নূতন পথ-নির্দেশ ক'রেছিল। হাইনে, রিল্‌কে, বোদেলিয়র প্রভৃতি কবিদের নিয়ে আজ যে মাতামাতি চলছে, পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের আড্ডায়ও এদের নিয়ে মাতামাতি বড় কম হয়নি। অস্কার ওয়াইল্ড, বার্নাড শ', অডেন, ঈকেন স্পেণ্ডার প্রভৃতি ইংরেজ কবি ও নাট্যকারদ্বাও আমাদের প্রিয় ছিলেন। মার্কিন সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা সেদিন কবি হুইটম্যানের ভক্ত হয়ে উঠেছিলুম। তাঁর 'লিভস্ অফ্ গ্রাস' বইখানি আমাদের যেন 'গীতা' হয়ে উঠেছিল। 'হেনরি থরো'র বিপুল রচনার মধ্য "পোয়েমস্ অফ নেচার"ই আমাদের প্রিয় ছিল।

১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা আমাদের ভারতীর আড্ডাকে কাবু করতে পারেনি। ব্রিটেনের গায়েও তাঁর আঁচ ততটা লাগেনি যতটা লেগেছিল ফ্রান্স আর রাশিয়ার। তবু, "বাঙালী রেজিমেণ্ট" গড়ে

উঠলো এই সুযোগে। চলে গেল তারা মেসোপোটেমিয়ায়। অবশ্য যুদ্ধ তাদের করতে হয়নি। অক্ষত দেহেই ফিরে এসেছিল ঘরের ছেলেরা সব ঘরে। তবে আমাদের একটা মস্ত বড় লাভ হয়েছিল এই যুদ্ধের পর সাহিত্যের দিক থেকে "অল কোয়েস্ট অন দি ওয়েস্টার্নফ্রন্ট" দিয়েছিলেন যুদ্ধ ফেরত "রেমার্ক"। পেয়েছিলুম হাভিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আর রাশিয়ার লাভ হল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে বলশেভিজমের প্রতিষ্ঠা। পেয়ে গেল তারা লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রট্স্কীর মতো তিনটি বিশ্বস্তুত লোকনেতা। 'নিহিলিস্ট্' ও 'এনার্কিস্টদের মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিলুম আমরা এই বিদ্রোহী ও বিপ্লবী রাশিয়ার কাছ থেকেই। তবে একথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের লেখকগোষ্ঠির মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লেখকই বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। তবে, কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচারে আমাদের সাহিত্যিকের দল পরাবরই তৎপর ছিল। সেই ১৯০৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সাময়িক পত্র পত্রিকা খুলে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে ভারতীয় আড্ডায় একাধিক লেখক স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা মূলক নানা কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন। কিছু কিছু নমুনা তুলে দিচ্ছি: কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সেই অবিস্মরণীয় দেশাত্মবোধক কাব্য সঙ্গীত—

"কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল,
কোন দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয়রে দূর্বা কোমল?"

প্রমথ চৌধুরীর: "তুই মা মোদের জগৎ আলো!
থাকনা অঙ্গের গৌরবরণ
হলেমই বা আমরা কালো!

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়: "আমি মরণ আজিকে বরণ করিব
মরণ তবু না চাই;

শাসন বাঁধন কিছুই মানি না,
বন্ধা প্রলয় নয়;
শমন শিয়রে কৃপাণ বুলায়ে
মরণ নিঃসংশয়,
কারেও করিনা ভয়।"

কাজী নজরুল ইসলাম:—
এই শিকল পরা ছল, মোদের এ শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো যে বিকল!"

অতুলপ্রসাদ সেন:—
"বল বল বল সবে শত-বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

হেমেন্দ্রকুমার রায় :—

"যৌবনের গান গাও আজি প্রাণ
যাও যত যান দেশের কাজে!"

যতীন্দ্রমোহন বাগচী :—

"ওরে ক্যাপা! যদি প্রাণ দিতে চাস
এই বেলা তুই দিয়ে দেনা!
ওরে মায়ের কাজে প্রাণটি দেবার
এমন সুযোগ আর হবে না।"

করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন :—

লোহার নিগড় ছিঁড়ে—
মত্ত মাতাল বাহিরিয়া পড়
লক্ষ লোকের ভিড়ে!"

স্বদেশী আন্দোলনের সময় এঁরা সকলেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তবে একথা ঠিক ভারতীর আড্ডার জন্ম হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন জুড়িয়ে আসার পর। অর্থাৎ, বঙ্গের-অঙ্গচ্ছেদ যখন পরিত্যক্ত হয়েছে। তখন শুধু দেশ বিদেশের সাহিত্য আলোচনা নিয়েই আমাদের ভারতীর আড্ডা মশগুল থাকতো না, নিয়মিত কাব্যালোচনা, সঙ্গীতচর্চা ও শিল্প কলার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও আমাদের আড্ডার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বৈষ্ণবাটি ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের ভারতীর আড্ডার একজন প্রেমিক পাণ্ডা। যথেষ্ট উপার্জন করতেন। কাজেই তাঁর দৌলতে আমরা বহু সন্ধ্যার সাদ্ধ্যভোগ উপভোগ করতুম। ছুটিছাটার দিন মাঝে মাঝে দলবলে বৈষ্ণবাটি যাওয়া করাও ছিল আমাদের আড্ডার কার্যক্রম। বৈষ্ণবাটি যুবক সমিতি আবার ভারতীর দলের এক একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সংবর্ধনার ব্যবস্থাও করতেন।

প্রতি রবিবার এবং ছুটি-ছাটার দিন ভারতীর আড্ডা শুরু হ'ত পূর্বাহ্নে। সেদিন আর সান্ধ্য-আসর বসতো না। সেই অবকাশ কাটতো আমাদের সিনেমা, থিয়েটার বা অন্যকোনো আমোদ প্রমোদের আসরে। ছুটির দিনের সকালে ভারতীর আড্ডা বসতো একটু বেলায়। কিন্তু আড্ডাধারীরা ঘুম থেকে উঠে এককাপ চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তেন আড্ডার সন্ধানে।

সকালের সেই প্রাথমিক আড্ডা বসতো বেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি শিল্পী চারু রায়ের বাড়ি। আমি থাকি তখন আমার পৈতৃক নিবাস ঠনঠনে কালিতলার ৩নং মুক্তারাম বো, এখন ১নং রাজেন্দ্রদেব রোড। চারু রায়ের বাড়ি এখান থেকে পাঁচ মিনিটে যাওয়া যেতো। অনিল (প্রভাত গাঙ্গুলী) থাকতো গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। সেখান থেকেও চারুর বাড়ি খুব কাছে। প্রেমাঙ্কুর থাকতো সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে, আর সুধীর সরকার থাকতো কালিসিংহের লেনে। সেও বেশি দূর নয়। কাজেই ছুটির দিনের প্রভাতী আড্ডার প্রাথমিক অধিবেশনটা বসতো চারুর বাড়িতেই। চারুর বাবা প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আইনজীবী ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রায়ই আসতেন সকালের দিকে চারুর কাছে তাঁর উপন্যাসের প্রচ্ছদপট আঁকিয়ে নিতে। বয়সের দিক দিয়ে আমরা তাঁর কাছে তরুণ হলেও চিন্তার দিক

দিয়ে তিনি ছিলেন আমাদের চেয়েও তরুণতর। কাজেই মাতুলের সঙ্গে আমাদের সাহিত্য আলোচনাও চলতো। আমাদের সকলকেই তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। কারণ, আমরা ছিলুম তাঁর সাহিত্য জগতে সমাজের গোপন ঘার উদ্ঘাটনের সমর্থক।

আরও একাধিক শিল্পী, সাহিত্যিক, মঞ্চ ও ছায়া চিত্রের নটেরাও আসতেন। সবার নাম স্মরণ নেই তবে তাদুকে ভোলার নয়। সুরসিক, সংস্কৃতিবান সুদর্শন যুবক। ইনি পরে চারুর কনিষ্ঠ ভগিনীকে বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন। চারুর শ্বশুর স্বদেশীমার্কা খদ্দরধারী জগদীশ বাবু ঢাকায় স্বদেশী বোতামের কারখানা করেছিলেন। বড় ভালো লোক। জামাইয়ের বন্ধুদেরও জামাই আদরে প্রশ্রয় দিতেন। চারুর বাড়ির প্রভাতী আড্ডাটি ছিল প্রায় নিজেদের পারিবারিক ঘটনার মতো।

বাংলার গান্ধী সতীশ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ছোট ভাই, সম্পর্কে চারুর আত্মীয় ছিলেন তিনি. সেই পরেশভায়াও এ আড্ডার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। আর একটি মানুষকে ভুলবোনা, ভোলা উচিতও নয়, তিনি ছিলেন শ্রীবিমল পাল। সাহিত্যের চেয়ে ব্যবসাতেই তাঁর মাথা খেলতো ভালো। তিনি চারুর সহযোগিতায় "বায়োস্কোপ" নামে বাংলার প্রথম 'সিনেমা সাপ্তাহিক' প্রকাশের গৌরব অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া শ্যামবাজারের দিকে সার্কুলার রোড ও কড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থল বরাবর তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'টকী শো হাউস' আজও চলছে, কিন্তু তিনি আর এতে নেই। ছাদের ওপর 'স্টুডিয়ো' করে প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র তোলবার চেষ্টা ইনিই করেছিলেন। রূপসী সু-অভিনেত্রী শ্রীমতী চন্দ্রাবতীকে আমাদের বিমল পালই চিত্রাঙ্গনে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বিমল পালের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগ পাওয়ায় চন্দ্রাবতীর সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়েছিল এবং সে পরিচয় আজও আমরা পরস্পরে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করি।

চারুবাবুর বাড়ির সকালের প্রাথমিক আড্ডার প্রধান আকর্ষণ ছিল বন্ধু পত্নী মায়াদেবীর উদার আতিথেয়তা। গরম গরম মাছ ভাজা, সঙ্গে চিড়ে ভাজা, বেগুন, ফুলুরী, পেঁয়াজী, পিঠে, পরোটা কত দিন কতরকম খাওয়াতেন। চারুভায়া আজও আছেন। কিন্তু, সুহাসিনী চারুপ্রিয়া মায়া আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন।

চারুর বাড়ির আড্ডার প্রথম পরিচ্ছেদ বা উপক্রমিকা শেষ করেই আমরা ছুটতুম ভারতীর আড্ডায় ছুটির দিনের পূর্বাহ্নের অধিবেশনে যোগ দিতে। এ আড্ডা চলতো বহুদিন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এমন যে সংস্কৃতি সম্পন্ন, সাহিত্য-রস-সমৃদ্ধ কবি, শিল্পী, কথা ও কাহিনী এবং সুরজ্ঞ রসিকদের সমাবেশ তার বনিয়াদ টলিয়ে দিলে শিশির ভাদুড়ীর নাট্য মন্দিরের আড্ডার দুনিবার আকর্ষণ। তখন আমাদের অকূলে কূল দিলেন অরফোর্ড মিশনের পাশের পূর্বাভিমুখিক আড্ডাধারী সত্যেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

সত্যেনদার আড্ডা ছিল সেদিন উত্তর কলিকাতার এক সর্বজনপ্রিয় আড্ডা। কে যে না আসতেন এখানে সেইটেই বলা কঠিন। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, অভিনেতা, সুরকার যন্ত্রশিল্পী, বাদ্যবিশারদ, মুদ্রণী, আইনবিদ্, খেলোয়াড়, গাঁতাক, পাটের দালাল, বড়বাজারের ব্যবসাদার, বড়লোকের বাড়ির কাত্তেন ছেলেরা এমন কি স্কুলমাষ্টার ও অধ্যাপকরাও সেখানে প্রায়ই পদধূলি দিতেন।

কাজেই 'ভারতীর' আড্ডা থেকে ছিটকে আমরা অর্থাৎ চারু, প্রেমাংকুর, সুধীর, হেমেন্দ্র প্রভৃতি যখন সত্যেনদার আড্ডায় এসে যোগ দিলুম পুকুরের মাছেরা যেন দিঘির জলে এসে পড়লো। এ আড্ডায় আলোচনা হ'তনা এমন কোনও নিষিদ্ধ বিষয়ই ছিলনা। অবশ্য সাহিত্যও বাদ যেত না। কারণ সত্যেন্দ্রনাথ, রবিলাল, চারুচন্দ্র থেকে শুরু করে মোহিতলাল ও কাজী নজরুল পর্যন্ত ভারতীর আড্ডার সব আড্ডাধারীরাই

একে একে এখানে এসে ঢুকেছিলেন। কেরামৎউল্লা খাঁর মত গল্পী আর দানীবাবুর মতো রূপসী গাইয়ে এবং পাখোয়াজীও এক একদিন আসর জমাতেন। সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্রও মাঝে মাঝে উঁকি মারতেন। হাস্যার্ণব চিত্তরঞ্জন গোস্বামী ও 'দাঠাকুর' পরং পণ্ডিত মশাইও প্রায়ই এসে আসর জমাতেন। সেদিন হাস্যরসের বান ডেকে যেতো। ঐতিহাসিক রাখাল বাঁড়ুয্যে যেদিন এসে পড়তো সেদিন আড্ডার ভোলা ময়রা ও এণ্টনী ফিরিঙ্গীর চেয়েও খিস্তি-খেউড় চলতো।

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র স-গড়গড়া এসে অধিষ্ঠিত হতেন মাঝে মাঝে এবং গড়গড়ার নল টানতে টানতে রাজনীতি ও 'পঞ্চনেতা'র আলোচনা করতেন। নীরদ ডাক্তার উঁকি মারতেন কখনো কখনো। কাছেই ছিল তাঁর "ব্যাক্টেরিওলজিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি।" শিশির ভাদুড়ী প্রমুখ নটেদেরও আবির্ভাব ঘটতো। সাঁতাক কবি শান্তি পাল ঝড়ের মতো এসে তাঁর কবিতা শুনিয়ে যেতেন। গজগামিনী গজেন্দ্রপ্রিয়া ভগবান স্বামীর রূপসী পত্নী ছিলেন আমাদের সকলের বৌদি। আড্ডার জন্য অবারিত চা ও পান সরবরাহ করতেন। তাঁর গুণগানে আমাদের কণ্ঠ ছিল সততই মুখরিত। কিন্তু, বৌদি ছিলেন আমাদের একেবারেই পর্দানশীন। আত্মীয় কুটুম্ব সম্পর্কিত ছাড়া সকলের সামনে বেরুতেন না এবং কথাও বলতেন না। কিন্তু যত্ন করতেন সকলকেই আত্মীয়াধিক।

আজ যখন আশে পাশে চেয়ে দেখি আমাদের আড্ডার মুকুটমণি ছিল যারা তারা আর কেউ নেই। চারিদিক ফাঁকা। শুধু স্বাস্থ্যহীন বৃদ্ধ চাকর রায়, আমি আর 'জংলি' অর্থাৎ 'প্রভাত লাইব্রেরী' এই তিনটি নির্বাণোন্মুখ দীপ আজও টিম টিম ক'রে জলছে, কবে যে কার ডাক পড়বে সেই দিনটিরই অপেক্ষায় পথ চেয়ে রয়েছি।

ভারতীর আড্ডার পরই যদি কোনও উল্লেখযোগ্য আড্ডার পরিচয় দিতে হয়তো সে হ'ল "কল্লোল" পত্রিকা অফিসে দুঃসাহসী নবীন সাহিত্যিকদের প্রাণোচ্ছল আড্ডা। বলা বাহুল্য যে আমরা ছিলুম কবি গুরুর একান্ত ভক্ত শিষ্য। তিনি নিজে ছিলেন চির নবীন, তাই নবীনদের তিনি বিশেষ অনুরাগী এবং তাঁদের বরাবরই উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। কবির সবুজপত্রের সেই কবিতা :—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মোর তুই বাঁচা।

এ কবিতা কবি লিখেছিলেন বাংলা ১৩২১ সালে। এর ঠিক দশ বছর পরে "কল্লোল" পত্রিকা নবীনের দাবী নিয়ে প্রকাশিত হ'ল। এই অনাগতদেরই আহ্বান জানিয়েছিল কবির প্রাণ। বলেছিল :—

"চিরযুবা তুই যে চিরজীবী।
জীর্ণ ধরা করিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে যেথায় দিবি!"

কল্লোলের শিল্পীরা তাইই দিয়েছিল। তাই কল্লোলের পাতা ওল্টালে নিশ্চয় চখে পড়বে ভারতীর আড্ডার অনেকেরই রচনা কল্লোলের কোলে আনন্দে ভাসছে। হেমেন্দ্র কুমার, মণিলাল, সৌরীন্দ্রমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম কল্লোলের প্রেমে উতরোল হয়ে উঠেছিলেন। আমারও গল্প, কবিতা, উপন্যাস কল্লোলের পাতা উল্টালেই

চখে পড়বে। আমি প্রায় কল্লোলের আড্ডারই একজন হয়ে পড়েছিলুম। যুগ সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাস ও গোকুল নাগই শুধু অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন নি, প্রতিভার স্বকীয় স্বরূপ যাঁদের রচনার দ্যুতি সেদিন বাঙলার মন্দিরকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল সেই অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,'গোরা' শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গাঙ্গুলী, সুকুমার ভাদুড়ী, সোমনাথ মৈত্র, হরিহরচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, অজিত দত্ত, বুদ্ধ দেব বসু প্রভৃতি আজ যাঁরা সাহিত্যের দিকপাল, এমনকি সাহিত্যিক শিরোমণি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত একদিন কল্লোলের প্রেমাধীন ছিলেন। গোকুল নাগের শেষ উপন্যাস 'পথিক', আমি মণিলালকে ধ'রে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়েছিলুম। তবে শেষ পর্যন্ত সেখান থেকেই বেরিয়েছিল কিনা স্মরণ নেই।

আড্ডাকে অলসদের অবসর যাপনের অবলম্বন মনে করলে খুবই ভুল করা হবে। 'আড্ডা' হ'ল উঠতি বয়সের মানুষদের এমন একটি মিলন কেন্দ্র যেখানে তাদের উদ্‌ভ্রান্ত জীবন আনন্দের পথ খুঁজে পায়। কল্লোলের অবিস্মরণীয় আসরের সবিশেষ বিবরণ দেবার আমার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ, নবসাহিত্যলোকের চির-নবীন পরম পুরুষ, সারস্বতপরিজন বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর জাদু লেখনী দিয়ে 'কল্লোলযুগের' যে মনোরম চিত্র এঁকেছেন তারপর আর তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার আমার সাহসও নেই, যোগ্যতাও নেই।

এই কল্লোলের ঢেউ গিয়েই 'কালিকলমের' ঘাটে যে জটলা বেঁধেছিল মুরলীধর বসুকে অবলম্বন করে তা এই কল্লোলেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। 'ভারতীর' সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা' বহেছিল এখানেই। সুতরাং সে আড্ডার বিবরণ লেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ তা'হবে পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি।

(ক্রমশঃ)

• • •

কলকাতা সহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয়নি। অনেকখানি কাঁচা ছিল···বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল কলুনার মতো ঘরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে। মাঝে মাঝে গলি থেকে পাল্কী বেহারার হাই হুই শব্দ আসত কানে। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ। তারি ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা।

—রবীন্দ্রনাথ

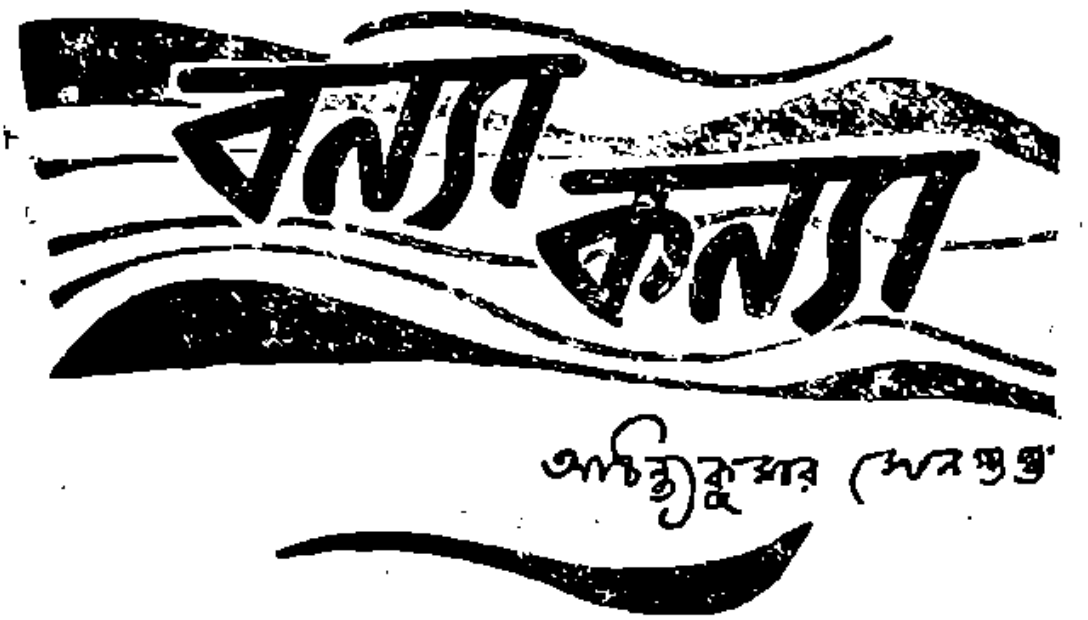

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

[**পূর্বকথা :** সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজ্‌মেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু ঘোষ নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার কার্যে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি

দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে।

হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছে থেকে মিথ্যা অজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা বদল করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না।

একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ড্রেসিং টেবিলে দর্পিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে যেন বনছায়ার বস্ দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটেরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আরুষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর শুনে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নামা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে আফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আকর্ষিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মধ্যির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার

দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানছে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্যাতন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে হৃদয় জুড়াই। সন্দীপের কথা মনে পড়ল।

সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।]

॥ আঠারো ॥

পরদিন এমন সময় এল যখন বনছায়া বেরুচ্ছে। ঠিক ধরে ফেলেছি। মুখে কোথায় প্রসন্নতা আনবে, সুবীর নির্মমতা আনল। বললে, 'দাঁড়াও, আমিও যাব।'

'তুমি আমার সঙ্গে যাবে কোথায়?' বনছায়া থমকে গেল।

'আমি তোমার সঙ্গে যাব না, তুমি আমার সঙ্গে যাবে। দাঁড়াও, দু মিনিট।'

কোনো মেয়ে-বন্ধুর বাড়ি একক নিমন্ত্রণ আছে যদি বলতে পারত। বলতে পারলেও রাস্তাটুকু থেকে সুবীরকে নিবৃত্ত করত কী করে? সুবীর অনায়াসেই বলে উঠত, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। চিনে আসি বাড়িটা। হয়তো বা দেখে আসি বন্ধুকে।

কিংবা যদি বলতে পারত, বাপের বাড়ি যাব। বাবার অসুখ করেছে শুনেছি, একবার দেখে আসি। তাহলে সুবীর নিশ্চয়ই পিছিয়ে যেত। কিন্তু তেমনি করে বলার মত গলায় আওয়াজ আনাও কঠিন।

তাই, যেমন বলেছে, দু মিনিট দাঁড়িয়ে যেতে রাজি হল বনছায়া। বললে, 'চা খেয়ে যেবে তো?'

'তাতে আর কতক্ষণ?' বলেই সুবীর হাঁক পাড়ল: 'অভিরাম! চা!'

'এই যে সব রেডি, হুজুর।'

'হুজুর? এ আবার কী।' সুবীর মজা পাবার মত মুখ করে বনছায়ার দিকে তাকাল।

'বড় সাহেব বাবু বলতে বারণ করে দিয়েছেন।' আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে বললে অভিরাম।

'বোস সাহেবের কী খেয়াল দেখেছ।' সুবীর প্রায় চরিতার্থের মত মুখ করল।

আশ্চর্য, ওরকম একটা কদর্য সম্বোধনে সুবীরের সমস্ত সত্তা রি-রি করে উঠল না? বরঞ্চ তো করলই, যেন বা একটু উপভোগ করল। মনিবের খেয়াল দেখল। গরিবের প্রতি ঘৃণা বা অবমাননার ভাবটা

দেখল না। দিনকে দিন সুবীর কী হয়ে যাচ্ছে! বনছায়ার সর্বাঙ্গে পিন ফুটতে লাগল। এগিয়ে এসে অভিরামকে উদ্দেশ করে বললে, 'হুজুর-বাবু এসব কিছুই বলতে হবে না তোমাকে। ওসব শব্দ বাতিল হয়ে গিয়েছে।'

'তা হলে কী বলব?' নির্দেশের জন্যে অভিরাম বনছায়ার দিকে তাকাল।

বনছায়ার মোড়লি সুবীরের পছন্দ হল না। সে টিটকিরি মিশিয়ে বললে, 'শুধু 'এই' বলবে, 'ওই' বলবে।'

বনছায়ার বুকের ভিতরটা ছাৎ করে উঠল—'এই' বলেই তো সুবীরকে সে ডাকত এককালে। মনে হল সেই ডাকটার উপর তার আর সেই দখল নেই।

বনছায়া কঠিন হয়ে বললে, 'ওসব কিছু বলার দরকার নেই। ওসব কিছু না বলেও কাজ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নেওয়া যায়।'

'যে আজ্ঞে।'

'যে-আজ্ঞেটাও বাদ যাও। বলবে, আচ্ছা। কিংবা, ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে।' অভিরাম হাসল।

কিন্তু সুবীর গম্ভীর হল। অবশ্য এ নিয়ে তার তর্ক করার কিছু নেই। তার শুধু ভয় এসব আলোচনা যদি হিমাংশুর কানে যায়। তার নির্দেশ বাতিল হয়ে গিয়েছে এতে যদি সে অপ্রসন্ন হয়! বলা যায় না, কিসের থেকে কী হয়ে ওঠে। চাকরির জলবায়ু নিমেষে বদলে যেতে কতক্ষণ। মাসখনুর পরে আবার না নতুন করে বেষ করে আসে।

'চলো।' চা-টা খেয়ে মুখ মুছে তৈরি হয়ে নেল সুবীর। এগোল দরজার দিকে।

বনছায়াও যাচ্ছে হঠাৎ পিছু ডাকল অভিরাম: 'মা!'

বনছায়া পিছন ফিরল।

'আপনার ব্যাগ—ব্যাগটা ফেলে গেলেন—'

মুহূর্তের জন্যে বনছায়ার বুঝি ভুল হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু সুবীর তাকে নিয়ে যাচ্ছে সমস্ত দায়-ভার সুবীরের। তার স্বাতন্ত্র্য নেই, সে সহগামী মাত্র। যদি পথে কিছু খরচ করবার হয়, সুবীর করবে। নিমন্ত্রণ তার।

কিন্তু, না, যখন মনে করিয়ে দিয়েছে তখন নিয়ে যাওয়াই ভালো। বনছায়া বিছানার উপর থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিল।

ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করছে অভিরাম, তাকে শুনিয়ে বনছায়াকে ভ্রুকুটি করল সুবীর: 'এটা কী হল—এই 'মা' ডাকটা? অভিরামের না সমস্ত ডাক বারণ হয়ে গিয়েছে?'

বনছায়া বললে, "মা' কোনো ডাক নয়—'

'ডাক নয়, তবে কী?'

'ও একটা কান্না।'

অভিরাম দরজা বন্ধ করে দিল।

বাইরে এসে বনছায়া জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাবে?'

'তুমিই বলো।'

বিয়ের আগে এসব নিয়ে তাদের ভাবতে হয়নি। কখন হেঁটেছে কতক্ষণ হেঁটেছে কোথায় বসেছে

ট্যাক্সি নিয়েছে বেড়াবার চুকেছে—কেনো বলাবলি ঠিক-করাকরি ছিলনা। আপন নিয়মে অজান্তে সব ঘটে গিয়েছে। এখন সব হিসেবে-মাপা আঁক-কষা হিসেবের তোলে ফেলা। এখন আর অনির্দেশ হাটার মানে নেই, মানে আগেই হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু মুখর বলা।

খানিকদূর হেঁটে এসে সুবীর বললে, 'একটা ট্যাক্সি নিই।'

'সত্যি?' আনন্দে উছলে উঠল বনছায়া। কোনো উদ্দেশ্য নেই গন্তব্য নেই এমনিতে খানিকটা হাওয়া-খাওয়া বেড়ানোর নিমন্ত্রণ—সুবীরকে সহসা আবার আগেকার মত ভালো লেগে গেল। মাথার চুল-গুলি তেমনি উড়ছে, উন্মন উদাস, দুই চোখে দূর-দূরান্তের স্বপ্ন—সুবীরের সেই কবিসত্তার স্পর্শ বুঝি লাগল তার কণ্ঠস্বরে। 'চলো একটা ট্যাক্সি নি।' কিছুটা অপব্যয়ের মধ্যে ছাড়া না পেলে প্রেমের গৌরব কোথায়?

ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসল দুজনে।

সুবীর ড্রাইভারকে বললে, 'এই একটু ঘুরব এদিক-ওদিক।'

ড্রাইভার যা বোঝবার বুঝলে! তার আন্দাজটাকে একটু লাগসই করলে।

কিন্তু ঘোরাই হচ্ছে, কথা কই? এখন কথা কইতে গেলেই তো তুচ্ছ ধুলোবালির কথা হবে। তার চেয়ে এই স্তব্ধতাটুকু ভালো। এই স্তব্ধতাই বুঝি একটি অলিখিত কবিতার সঙ্কেত।

কিন্তু মিটারের কথাটাকে বেশি তুচ্ছ করা যায় না। বনছায়া অস্ফুট সাংসারিক স্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'এত যে ঘুরছ তোমার টাকা আছে?'

'তার নেই, তোমাকে দিতে হবে না।'

বনছায়ার এমন ভয় যে একেবারে ছিল না তা নয়। প্রেমের গর্বে ট্যাক্সি ভাড়া তো সেই জুগিয়েছে। এখনো তো সেই হাত পাতার অভ্যেস যায়নি। বললেই হল, কিছু কম পড়েছে, পূরণ করে দাও। সংসার-খরচ ভাগাভাগি করে চালাচ্ছি, ট্যাক্সিভাড়ারও শরিক হও।

কিন্তু পুরো ভাড়া সুবীরই তার নিজের পকেট থেকে দেবে এতেও স্বস্তি পাচ্ছিলনা বনছায়া। মনে হচ্ছিল ট্যাক্সি করে এই বেড়ানটাই একটা বাজে ব্যাপার। আসলে শরীর তো বেড়ায় না, বেড়ায় মন। কিন্তু এই বেড়ানোতে সেই মন কই—সেই আনন্দিত মন? কই সেই সব মৃদু-মধুর কথা, মনের খুশিকে কথার আবিরে হাওয়ায় ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দেওয়া। সেই মনই যদি না আসল, না ছুটল, তবে ট্যাক্সি ছুটিয়ে লাভ কী?

অস্বস্তি কাটাবার জন্যে বনছায়া জিজ্ঞেস করলে, 'টাকা পেলে কোথায়?'

'বস দিয়েছে। সেই যে বাংলা অনুবাদটা করে দিয়েছিলাম না—তার জন্যে।'

'কত দিয়েছে?'

'পঞ্চাশ টাকা।' প্রায় বীরের মত ভঙ্গিতে বুকপকেটের মনিব্যাগের উপর হাত রাখল সুবীর। বললে, 'তারপর অভিভাষণটা লিখে দিয়ে কোন না কের পঞ্চাশ টাকা আদায় করব। চাইকি, খুশি থাকলে একশোও দিতে পারে। তারপর বলেছে এমনি আরো ছাক ওয়ার্ক, মানে ছুটকো লেখার কাজ আমাকে এনে দেবে।' পরে স্বগতোক্তির মত বললে, 'লোকটা ভালো।'

বনছায়ার মেজাজ বিগড়ে গেল। বললে, 'তুমি এখন থেকে এসবই লিখবে নাকি? অনুবাদ আর অভিভাষণ? তোমার কবিতা—কবিতা ছেড়ে দেবে?'

'রাখো।' সুবীর ভয়ে ধমকে উঠল: 'একটা কবিতা লিখতে সাত রাত্রি ঘুম নেই—তারপর লিখে উঠতে পারেনেই বা কী। পাব পঞ্চাশ টাকা?'

'তাই বলে কবিতা লিখবে না?'

'আবার যদি কখনো দুর্ভিক্ষের দেশে যাই, চেষ্টা করব লিখতে।' কীরকম লঘু মেজাজে হেসে উঠল সুবীর: 'এখন অমৃতে প্রাপ্তিযোগ পড়েছে—এখন প্রেম করে বউ পেলাম, বউ পেয়ে চাকরি পেলাম, চাকরি পেয়ে ওভারটাইম পেলাম—তারপর আরো দশ বাড়াত আয়ের সুযোগ পাচ্ছি, চারদিক পরমমস্ত, এখন কিসের কবিতা? কটা দিন টাকার মুখ দেখছি তাই দেখতে দাও।'

বনছায়া চাইল সুবীরের মুখ দেখতে। অন্ধকারে সব কেমন ঝাপসা হয়ে গেল।

তারপর সুবীর টাকার কথা থেকে তার বসএর কথায় চলে এল। এমন ভালো লোক, এমন বন্ধু আর হয় না। কী চোখে দেখেছেন আমাকে কে বলবে? অবশ্যি আমি তাঁকে আপ্রাণ কাজ দিচ্ছি আর সে কাজ সর্বাংশে তাঁর মনঃপূত হচ্ছে। তবু এতটা আমার জন্যে করবে এ প্রায় অপ্রাতীত। কী, তোমার তাই মনে হয়না? বাড়ি পাইয়ে দিলেন, বাড়ির কাজের লোক রেখে দিলেন, তারপর ওভারটাইম, তারপর আবার বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা—আপাতীত বলবেনা? আমার তো মনে হয়, কল্পনাতীত। তারপর আশ্বাস দিয়েছেন, শিগগিরই চাকরিতে কনফার্মড করে নেবেন, আমি গ্রেড পেয়ে যাব। দেখতে-দেখতে আরো উন্নতি হয়ে যাবে। এমন যিনি মহানুভব, বলো, তার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয়?

কণ্ঠস্বরে অসীম বিরক্তি নিয়ে বনছায়া বলে উঠল: 'তোমার কি চাকরি আর বস ছাড়া কথা নেই? ট্যাক্সিতে বেড়াতে বেরিয়েও এই কথা?'

অনুরোধের প্রলেপ মাখিয়ে কণ্ঠস্বরকে নরম রাখতে হবে, তাই সুবীর প্রশ্নের উত্তরে কোনো মন্তব্য করল না। মধুমর মুখ করে বললে, 'চলো না ভোডার লেনে।'

'ভোডার লেনে? সেখানে কী?' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল বনছায়া।

'ট্যাক্সি তো সেই দিকেই চলেছে। সেখানেই তো হিমাংশু বোসের ফ্ল্যাট।'

'তুমি কি সেখানে যাবার জন্যেই ট্যাক্সি নিয়েছ নাকি?'

সুবীর স্পষ্ট ঢোঁক গিলল। বললে, 'না, তা কেন? দিব্যি খানিকটা বেড়ানো হল, এখন ফেরবার মুখে তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করে যাওয়া।'

'তা আমি যাব কেন?' ঘাড় বাঁকা করল বনছায়া।

'উঃ, তুমি জান না, তোমাকে দেখলে তিনি কত খুশি হবেন। আর তাঁর খুশিতেই আমার চাকরির উন্নতি।'

বনছায়ার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেল। বললে, 'তোমার চাকরির উন্নতি—তা তুমি খুশি করোগে। তাতে আমার সম্পর্ক কী?'

'বা, তুমি আমার স্ত্রী না?' অনুরোধের এলাকায় আছে বলে কণ্ঠস্বরকে চড়তে দিল না সুবীর। মোলায়েম করেই বললে, 'সকল স্ত্রীই তার স্বামীর উন্নতিতে ইন্টারেস্টেড।'

'উন্নতি মানে চাকরির উন্নতি?'

'তা ছাড়া আবার কী। আর্থিক উন্নতি। আর তাতে তো স্ত্রীরও স্বার্থ।'

'কিন্তু আমি তো কোনো অর্থলোলুপ চাকুরের স্ত্রী নই, আমি এক কবির স্ত্রী।'

'রাখো, সে কবি বেকার থাকলে কত তোমার একেবারে আনন্দের সন্ধ্যা বয়ে যেত। সত্যি কথা বলতে, তুমিই তো সেই বেকার কবির চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলে।'

'যাদ, ঐ পর্যন্ত। তারপর উন্নতি করতে হয় তুমি করবে, তোমার নিজের গুণে করবে। তাতে আমার কোনো অংশ নেই। আমি তোমার উন্নতির ঘুষ হতে পারব না।'

'ঘুষ! তুমি কী বলছ'? সুবীর ছটফট করে উঠল।

'ঠিকই বলছি। নইলে আমি গেলে উনি খুশি হবেন আর উনি খুশি হলেই তোমার উন্নতি তার মানে কী? ওঁকে খুশি করার আমার দায়?'

'আহা, তুমি তিলকে তাল করছ। তিনি তোমার পরিচিত, তোমার দাদাদের বন্ধু।'

'দাদাদের সঙ্গেই এখন পরিচয় নেই, তাই দাদাদের বন্ধু!' এবার বনছায়ার স্বরে স্পষ্ট ঝাঁঝ ফুটল: 'আর পরিচিত হলেই বা কী! বিনা নিমন্ত্রণে যেতে হবে?'

'এখানে নিমন্ত্রণ লাগেনা। এ সাধারণ সৌজন্য।' গম্ভীর হল সুবীর।

'সৌজন্য? অনাহূত তাঁর বাড়ি ঘরে তাঁকে সেলাম ঠুকে আসা?' বনছায়া তার যুক্তিতে তীক্ষ্ণ হতে চাইল: 'তুমি তো তোমার বসএর সঙ্গে ভিড়লে আমি কার সঙ্গে ভিড়ি? বাড়িতে ওঁর স্ত্রী আছে?'

'স্ত্রী!' সুবীর হেসে উঠল: স্ত্রী যে নেই তা আমি বলতে পারি কিন্তু স্ত্রীলোক নেই তা বলতে পারি না।' আবারও হেসে উঠল সুবীর: 'তাঁর স্ত্রীতে বিশ্বাস নেই, তাঁর স্ত্রীলোকে বিশ্বাস। তা, তোমার আলাপে কোনো অসুবিধে হবে না, আমিই তো আছি।'

'তুমিই আলাপ করে ধন্য হও সে। আমি যাব না।' বনছায়া দৃঢ় হল।

'এই যে এসে পড়েছি। ঐ—ঐ বাড়িটা।' ট্যাক্সিটা দাঁড় করাল সুবীর। নিজে নেমে পড়ে হুকুমজারির মত করে বললে, 'নেমে এস। নেমে এস বলছি।'

'না।' বনছায়া দৃঢ়তর হল: 'আমি নামব না। তুমি একা যাও। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।'

সুবীর চলে গেল। ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে গেল না।

সেই মুহূর্তে সুবীরকে বনছায়ার অত্যন্ত ছোট, ও তার চেয়েও ছোট কথা, অসাধু মনে হল। কেমন নিজে ডেকে নিয়ে এসে শেষমুহূর্তে ট্যাক্সি-ভাড়ার বোঝাটা তার একার ঘাড়ে ফেলে পালিয়ে গেল। একে প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কী বলে?

নিজের ব্যক্তিত্বে বিস্তৃত হয়ে বসে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বললে, চলুন।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার তার আয়নাটাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিল।

বাড়ি ফিরে এসে মোটা হাতে ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে দিল বনছায়া। কড়া নাড়তেই অভিরাম দরজা খুলে দিল। তোমার তো কাজ হয়ে গিয়েছে—এবার তোমার ছুটি। হ্যাঁ, খাবার টেবিল সাজিয়ে সব চাকাছুকি দিয়ে পরিপাটি করে রেখেছে। রান্নাঘরের ধোয়াপাখলাও ত্রুটিহীন। হ্যাঁ, ছুটি—বেরিয়ে গেল অভিরাম। দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে একজন ফিরলেন, আরেকজন কোথায় গেল—জানতে কৌতূহল হলেও জিগগেস করল না। শুধু শুনল সে বেরিয়ে আসতেই বনছায়া বেশ জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করলে। বেশ জোরেই খিল চাপাল, ছিটকিনি লাগাল। আজকের খবর কী, যদি বড়সাব, মিস্টার বোস, তাকে জিগগেস করেন, তা হলে সে শুধু এইটুকুই বলতে পারবে, এর বেশি আর কিছু নয়!

দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে ঢুকল বনছায়া। ব্যাগটা আলনার ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রেখে বেডকভার চাকা বিছানায় গা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

হতাশাও মানুষকে কম ক্লান্ত করে না। বনছায়ার মনে হল সে বুঝি ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবার আগে বনছায়া মনে মনে আরেকবার হিসেব করে নিল সে এখন নিশ্চিন্ত, তার একাকীত্বে অব্যাহত। অভিরাম নেই, কেউ নেই, আর দরজা তার হৃদয়ের চেয়েও কঠিনতরো ভাবে রুদ্ধ।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যে এই অব্যাহতি? সুবীর এসে দরজায় ঘা দিলেই তো তাকে উঠে খুলে দিতে হবে।

তার আর উপায় কী। নিজের কুড়ুলে নিজের পায়ে জখম করলেও কুড়ুলকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, বরং ঘষে ঘষে শান দিয়ে ধারালো করেই রাখতে হয় একপাশে।

তারই জন্যে তিনঘরের ফ্ল্যাটের দিকে সে এত বেশি ঝুঁকেছিল। তিন ঘরের ফ্ল্যাট হলে কোনো বাদ-বিতণ্ডা না করে, সাধারণ নিয়মে, সাম্যবাদের ভিত্তিতে, সে একটা ঘর একান্ত নিজের বলে অধিকার করতে পারত। তা হলে সে আজ আরো বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারত। নিরুত্তনিশ্চিন্ত। তাহলে আজ আর সে খাবার টেবিলে বসত না, এক বিছানায় শুত না, মুখোমুখিই হত না। অসুখ করেছে বলবার মতও আজ অবকাশ নেই। দরতো গায়ে হাত দিয়ে বসবে। ধস্তাধস্তি করতে গেলেও তো ওর সুবিধে ছাড়া অসুবিধে নেই।

অসুপায়। কঠিন পার্টটাই সে করে যাবে সুকৌশলে।

কিন্তু দরজা খুলে দিয়ে যদি দেখে, সুবীর নয়, হিমাংশু!

তাকে যখন হিমাংশুর বাড়িতেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল তখন সুবীর যে হিমাংশুকে এখানে ডেকে নিয়ে আসবে তা আর বিচিত্র কী।

তা এলই বা, ভয় কিসের? আনুষ্ঠানিক ভাবে যদি আসে তবে বাড়িতে তো সুবীরই মোতায়েন থাকবে। আর সুবীরের অনুপস্থিতিতে যদি আসে আর যদি অভিরাম দরজা খুলে দেয়, তা হলেও বা ভয় কী! নিজেরই অফিসের চাকরের সামনে সে অপমানীন হতে পারবে না। কিন্তু, এখন যেমন অবস্থা, বাড়িতে যখন সুবীরও নেই, অভিরামও নেই, তখন যদি দরজায় এসে ঘা মারে? আর সুবীর এসেছে মনে করে যদি দরজা খুলে দিয়ে দেখে—মূর্তিমন্ত হিমাংশু!

একটা ঠাণ্ডা স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে উপরের দিকে উঠতে যাচ্ছিল, দৃঢ় হয়ে সেটাকে আটকে থামিয়ে দিল বনছায়া। একাকী হিমাংশুকেই বা তার কী ভয়? একবার তো এসেছিল একাকী। হ্যাঁ, সেবার শুধু দেখতে এসেছিল, হাতে শাড়ির প্যাকেট ছিল—আর এখন যদি সে আসে, প্রতিশোধ নিতে আসবে—তবে হাতে কি তার রিভলভার থাকবে, না কি উন্মুক্ত ছোরা! মনে মনে হাসল বনছায়া। তারও প্রতিরোধের অস্ত্র আছে—প্রবল প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখ্যানের মত প্রত্যাঘাত নেই। আসন্ন মৃত্যুর ভয় না দেখিয়ে, বা জখম বা অজ্ঞান না করে কোনো একক পুরুষের পক্ষে জাগ্রত ও অসম্মত নারীর ধর্ষণ করা অসম্ভব—সে পুরুষ যতই শক্তিশালী, যতই পরাক্রান্ত হোক। আর খুন-জখম করে যে মাংস চায় তাতে আর ভাগাড়ের শকুনে তফাত কী।

নানা রকমের অসম্ভবমুক্ত কল্পনা করে বনছায়া মনকে দৃঢ়তর করে তুলল।

সেদিন, মনে আছে, হিমাংশুর কাছে সুবীরের জন্যে সে একটা প্রার্থনা করেছিল। বলেছিল, মহানুভব হতে। বলেছিল, আমার উপর রাগ করে সুবীরকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেবেন না। ও কোনো দোষ করেনি।

এখন যদি কের কোনো প্রার্থনা করবার সুযোগ পায় তাহলে বনছায়া বলে, আপনি মহাপুরুষ, দয়া করে সুবীরকে তার চাকরি থেকে ছাটাই করে দিন। ওকে ঠেলে পাঠিয়ে দিন দুর্ভিক্ষের দেশে। ও আবার কবি হয়ে উঠুক। আমার সেই স্বপ্নের কবি, বিপ্লবের কবি।

কিন্তু কদিন পরে, কী আশ্চর্য, সত্যিসত্যি হিমাংশুই দরজায় কড়া নাড়ল।

এ কী, সন্ধ্যাবেলাতেই দরজা বন্ধ করে ওরা ঘুমুচ্ছে নাকি? হিমাংশুর কড়া নাড়ার শব্দ ক্ষিপ্রতর হল।

তবু সাড়া নেই। এত নিবিড় প্রেমবন্ধন! হিমাংশু এবার গলা ছেড়ে ডেকে উঠল: অভিরাম!

সুবীর তখন ধড়মড় করে উঠে বসল। দরজা খুলেই হিমাংশুকে দেখে একেবারে বিগলিত হয়ে গেল: 'আপনি স্যার? ভাবতেও পারিনি আপনি আসবেন। আসুন—আসুন—'

'আপনাদের গভীর বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত ঘটালুম।' অপরাধীর মত মুখ করে চারদিকে চোখ মেলল হিমাংশু।

'বসুন। এটাই আমাদের বসবার ঘর। আর ওটা শোবার। ভাবতেই পারিনি আমাদের এখানে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে।'

'হ্যাঁ, দেখতে এলাম কী রকম সংসার পেতে বসেছেন দুটিতে।' হিমাংশু বসল স্থির হয়ে: 'অভিরাম বুঝি চলে গিয়েছে। কিন্তু বনছায়া—তাকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

'অফিস থেকে ফিরে সেই যে বেড়াতে বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি।'

'এখনো ফেরেনি? কী ব্যাপার?' হিমাংশু ঘড়ি দেখল: 'আপনারা দুজনে একসঙ্গে বেরোননা?'

'তার আর সুযোগ মেলে কই?'

বলে সুবীর তার সান্ধ্য সংসারের ছবিটা হিমাংশুর চোখের সামনে তুলে ধরল। ওভারটাইম খেটে সুবীরের ফিরতে দেরি হয় তাই বনছায়ার রাগ। তার জন্যে সে ওভারটাইম প্রতীক্ষা করতে রাজি নয়, তার ফেরার আগেই সে বেরিয়ে পড়ে। তারপর কখন যে ফেরে তার ঠিক নেই। বলে তুমি যদি আর বাড়াবার চেষ্টা করতে পারো আমারও বাড়তি আয়ের পথ দেখতে দোষ নেই। যাব কোথায়? সাহিত্যিকদের আড্ডায়, নয়তো পত্রিকা সম্পাদকের বাড়িতে, নয়তো কোনো সভায়-সমিতিতে। যদি কোথাও কিছু লিখে-টিখে দশ-বিশ টাকার সংস্থান হয়। যত সব কিচেন কারখানা।

'আপনি আপনার স্ত্রীকে বাড়িতে আটকাতে পারেন না?' কঠিন চোখে তাকাল হিমাংশু।

'কই আর পারি? কেই বা পারে?'

'আপনি স্বামী না? পুরুষ না? প্রবলরূপে আপনার অধিকার স্থাপন করতে পারেন না?' হিমাংশু উঠে পড়ল। নাটকীয় সুরটাকে অন্তরঙ্গতায় তরল করে ফেলল। বললে, 'কোলে দু-একটা বাচ্চা তুলে দিন, ঠিট হয়ে যাবে। প্রকৃতি যাকে বন্দিনী করে দিয়েছে তার কিসের স্বাধীনতা!'

এর উত্তরে সুবীর কী আর বলবে, শুধু দুর্বল মুখে হাসল। বনছায়া যে এখুনি মাতৃত্বে স্বীকৃত নয় সে গোপন কথাটা বাইরের লোককে জানিয়ে ফল কী।

কিন্তু কথাটা আন্দাজ করতে হিমাংশুর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না। সে বললে, 'পৃথিবীর সমস্ত নির্যাতিতই স্লোগান তুলেছে, আমার দাবি মানতে হবে—শুধু স্বামীই চুপ করে থাকবে? তার দাবিই তো প্রথম—পুত্রার্থেই তো তার ভার্যাগ্রহণ।' তারপর নাটকীয়তাকে আবার অন্তরঙ্গতায় তরল করে তুলল: 'তাড়াতাড়ি হলেই তো ছেলে তাড়াতাড়ি বাপের পিছে দাঁড়াতে পারে।'

'সে কি স্যার, চললেন ?　বসুন, চা করে দি।'

'আপনার হাতে চা খাব কী ?' হেসে উঠল হিমাংশু। বললে, 'আপনার গৃহিণী যেদিন করে দেবে, সেদিন খাব।'

আবার চারদিক তাকিয়ে বলতে-হয়-বলা প্রশংসা করে হিমাংশু চলে গেল।

আর কতক্ষণ পরে বনছায়া বাড়ি ফিরতেই একেবারে ফেটে পড়ল সুবীর।

'কেন, কী হয়েছে ?' মুহূর্তে বনছায়াও রুক্ষ হয়ে উঠল।

'বস এসেছিল।'

'উঃ, একেবারে মহামারী ব্যাপার।'

'তাঁকে এক পেয়ালা চা অফার করতে পারলাম না।'

'পদতলে হৃদয় অফার করতে পেরেছিলে তো—তা হলেই যথেষ্ট।'

'শোনো।' বেঁকে রুখে দাঁড়াল সুবীর : 'রোজ-রোজ তুমি বাড়ি ছেড়ে এমনি বেরিয়ে যেতে পারবে না। যতক্ষণ আমি না ফিরি ততক্ষণ অপেক্ষা করবে। আমি যেন ফিরে এসে দেখি তুমি বাড়ি আছ। তারপর বেরোতে চাও, বলে-কয়ে ম্যারেঞ্জমেন্ট করে বেরোবে—'

'এ যে দেখছি সেই সাবস্ক্রাইবের ক্যাপিট্যালিস্ট স্বামীর ভূমিকায় নেমেছ।' বনছায়া কথায় বিদ্রূপ মেশান : 'পার্ট কি তোমার লেখা না আর কাউ প্রম্পটিং ?'

'আমি অন্যায্য কিছু বলছি না—'সুবীর চুপ করে গেল।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে সেই যে বনছায়া বিশ্রাম করতে শুয়েছিল আর ওঠেনি। সন্দীপের নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে শীযুষ দত্তের বাড়ি যাবার কথা ছিল, উঠতে ইচ্ছা করল না। ক্লান্তির অপরিচ্ছন্ন স্তূপ হয়েই পড়ে রইল।

মেঘলা-মেঘলা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা সন্ধ্যা, ঘুমিয়ে পড়েছিল বনছায়া। কী না জানি কী একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু এ কী, স্বপ্ন, না, দুঃস্বপ্ন ?

বুকের উপর দুর্ধর্ষ একটা ভার অনুভব করে জেগে উঠল বনছায়া। এ কী! ঘর অন্ধকার কেন ? অন্ধকারে কে ঢুকল কী চুরি করতে ?

ক্ষণপরেই সম্বিৎ স্থির হতেই বুঝতে পারল বনছায়া। কিন্তু এ কে ?

ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে বললে, 'এ কী অন্যায় কথা! আমাকে ঘুমন্ত পেয়ে আপনি—ছি ছি, ছাড়ুন ছাড়ুন বলছি—'

'না, না, আর কেউ নয়। আর কিছু অন্যায়ও নয়। আমি সুবীর।'

সত্যি, সুবীরই তো। আচ্ছন্ন চেতনার প্রথমটা ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। মনের ভয়টাকেই বুঝি ঘুড়ি দিয়ে ফেলেছিল! আর এখন সেই দুঃস্বপ্নের ভুলটাকে আবৃত করতে প্রযত্নশীল না হয়ে বুঝি উপায় ছিল না।

'আমি ভেবেছিলাম ডাকাত-টাকাত হবে বুঝি।' শ্বাস নামাল বনছায়া : 'অভিরাম কোথায় ?'

'আমাকে ঘরটা খুলে দিয়েই চলে গিয়েছে।'

'কখন যে ঘরটা খুলে দিল টের পাইনি।'

'ভাগ্যিস পাওনি। পেলেই তো জেগে উঠতে। আমার লেখা হত না কবিতা।'

'কবিতা ?'

'ঠিক আধুনিক কবিতা। কী অপরূপ বিশৃঙ্খলায় লাইনগুলো এলোমেলো করে দেওয়া। অর্থ কোথাও ফুটে আছে, কোথাও ঢাকা। মিল নেই মাত্রা নেই কিন্তু ছন্দ আছে। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে দুলছে। দেখলুম এ আমারই বিষয়, আমারই জমিদারি।'

মুখের কাছে মুখ আনল সুবীর।

'তোমার মুখে এ কিসের গন্ধ ? তুমি কী খেয়েছ ?'

'ড্রিঙ্ক করেছি। বস এর ওখানে পার্টি ছিল। বস খাইয়ে দিয়েছে। বেশি খাইনি—এই একটুখানি খেয়েছি। বলতে পারো সিপ করেছি। কিন্তু খেতে খুব ভালো। খাবার পর আরো ভালো। তোমাকেও একদিন খাওয়াব। দেখবে দুর্দান্ত আনন্দ।'

মূর্ছিতের মত পড়ে রইল বনছায়া।

(ক্রমশঃ)

• • • •

সাধারণ ইংরেজ গৃহস্থ বাড়ীতে গিন্নীরা রান্নার পেছনে আধঘণ্টার বেশী সময় ব্যয় করেন না। রান্নার পেছনে বেশী সময় ব্যয় করে বলে অনগ্রসর ফরাসী গিন্নীদের প্রতি এদের অবজ্ঞার সীমা নেই। রান্নার ব্যাপারে ইংরেজ গিন্নীদের কল্পনার দৌড় অতি সামান্য। দিনের পর দিন একই ভাবে তরকারী সেদ্ধ করে চলেছে। বেশী সময় ব্যয় না করেও সামান্য অদল বদলে জিনিষটার স্বাদে যে তফাৎ হতে পারে সেটা ওদের মাথায় আসে না।

জোড়াতালি

—রবীন্দ্র নারায়ণ দে

গোমেজের তামাটে রং-এর লোমশ হাতখানা নাড়া-চাড়া করতে করতে সুমিতা হাতের সেই দিকটা সামনে ঘুরিয়ে ধরল। সেখানে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কাল উল্কিতে আঁকা একটা উড়ন্ত পরীর মূর্তি। যেন যৌবন উন্মত্তা পরী ডানা মেলে তার স্বল্প বাস আবরণ থেকে সবে মুক্ত হয়ে মহাশূন্যে উড়ে চলেছে।

মুখটিপে হাসতে হাসতে সুমিতা সেই বিবসনা পরীর সর্বাঙ্গে আঙুল বুলতে বুলতে বললে :

—অসভ্য কোথাকার··· ।

সুমিতা এ রকম প্রায়ই দুষ্টুমি ক'রে করে। পরীর গায়ে আলতো ভাবে আঙুল বুললে গোমেজের সর্বাঙ্গ শির শির করে ওঠে।

সুমিতা আবার হাসে।

পুরুষ মানুষের মধ্যে শিহরণ জাগান কত সোজা। বিশেষ করে যারা মাঝে মাঝে শিহরিত হবার জন্যেই নিজের শরীরে অমন ছবি এঁকে রাখে।

গোমেজ একমনে সিগারেট টানছিল। হঠাৎ একমুখ ধোঁয়া সুমিতার মুখের ওপর ছেড়ে দিয়ে ডান হাতটা সোজা চালিয়ে দিলে প্যান্টের পকেটে। বার করে আনল একটা অরেঞ্জ পেপারের প্যাকেট। ভেতরে চিকেন প্যাটিস্। তার থেকে গোটা একটা ভেঙে সুমিতার মুখে গুঁজে দিয়ে আবার সিগারেট টানতে লাগল। আর গোমেজের সেই হাতখানা জড়িয়ে ধরেই সুমিতা ওর আধশোয়া শরীরের ওপর হেলান দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে প্যাটিস্ চিবোতে লাগল।

সারাদিনের খাটুনির পর এইভাবে একটা পেশীবহুল শরীরের ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে অলস-ভাবে প্যাটিস্ কিম্বা স্যাণ্ডুইচ্ চিবোতে বেশ লাগে।

হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠতেই সুমিতা ধড়মড় করে উঠে গোমেজের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে ছিটকে দূরে সরে গেল। তারপর আবছা অন্ধকারে বারান্দার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে মাকড়সার জালের মত পাতলা নাইলনের পরদা সরিয়ে হলঘরে এসে ঢুকল। সেখানে পুরু গদীতে মোড়া সারি সারি এইট্সীটেবল্ চেয়ার বসান রয়েছে। আর যার সামনে, পেছনে, পাশে, ওপরে ফিট করা আছে বেলজিয়াম গ্লাসের বড় বড় আয়না।

সন্ধ্যে ঠিক ছটার পর থেকেই সেখানে ভিড় জমে ওঠে চৌরঙ্গীপাড়ার মেমসাহেব আর আধা মেমসাহেবদের।

সিল্কি পোষাকের স্বল্প আবরণের তলায় কেনিল যৌবনের অঙ্গভঙ্গিমা, ইভ্নিং-ইন্-প্যারী, ওডো-

রোনো আর অ্যামে-ক্রাফের পাক্ করা উগ্র গন্ধে ভরা বাতাসকে সেখানে উত্তপ্ত করে রাখে। হাজার ওয়াটের চোখ ঝলসান বাতিও সেখানে যাকে মাঝে নিষ্প্রভ মনে হয়।

ইংলিশ্, ফ্রেঞ্চ আর স্টেট্স্ এর বিভিন্ন রকমের স্টাইল, বিভিন্ন ক্যাসনে হেয়ার ড্রেসিং, কার্লিং, কার্লিং এই সবের একমাত্র সেন্টার। চার্জ—পাঁচ টাকা, দশ টাকা, পনের টাকা করে ক্রমে ওপরের দিকে উঠে গেছে।

দরজার পাশে এলুমিনিয়ামে প্লেটে এমবস্ করা অক্ষরে লেখা—মিসেস্ এইচ্. ব্রাউন। নিউইয়র্ক হেয়ার ড্রেসার। আর একপাশে বড় বড় হরফে লেখা—ওন্‌লি ফর্ দি লেডিজ্।

একচেটিয়া এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই এর কাস্টমার্। আজকাল অবশ্য সৌখিন পাড়ার পাঞ্জাবী, সিন্ধী, মাড়োয়ারী এমনকি বাঙ্গালী মেয়েরাও হেয়ার ড্রেসিং করাতে আসে। মডার্ন খোঁপা বাঁধাতে আর আপটু-ডেট্ মেক্ আপ-এর ষ্টাইল এক্সচেঞ্জ করাতে আসে। আর আসে—অন্ধকারে চুপি সারে—ঘোড় দৌড় মাঠের জকি, চৌরঙ্গী পাড়ার সিনেমার সেটকিপার, লোকো সেডের ফোরম্যান আর জাহাজের খালাসি।

আর এদেরই সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে পেছনের লোহার সিঁড়ি বেয়ে বারান্দার রেলিং টোপকে আসে ভেমলার গাড়ীর ড্রাইভার জোসেফ্ ফ্রেড্রিক গোমেজ।

কিন্তু অত মেয়ে থাকতে শেষে গোয়ানিজ্ খ্রীশ্চান গোমেজের সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মেয়ে সুমিতা মুখার্জির আলাপ যে কি করে অত ঘনিষ্ট হয়ে উঠল তার একটা গোপন আবহা ইতিহাস আছে। যেমন আছে সুমিতার হেয়ার ড্রেসার হবার পেছনে একটা গোপন ইতিহাস।

অনেক দিনের কথা—

গোমেজের বুক পকেটে একদিন একটা ফিকে নীল কাগজ উঁকি মারতে দেখে সুমিতা ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিল। একখানা ফিন পনের আগেকার চিঠি, আসছে বার্মিজ্ বেটিস্ থেকে।

—মাই গড্, তোমার মায়ের চিঠি! পেশাদার হেয়ার ড্রেসারের চাকরি করেও সুমিতা অজান্তে কিছু মেয়েলি কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গোমেজের মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে গোমেজ হঠাৎ যেন অন্যরকম হয়ে গেছল। সে জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছে কিন্তু এ যে এক অন্য ধরণের। সুমিতার মত একজন ইয়ং গার্ল শেষে এক আনসিন্ ওল্ড্ লেডীর সম্বন্ধে কৌতূহল? বোধ হয় গোমেজের জীবনে এই প্রথম, যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি গোমেজের মায়ের সম্বন্ধে এত কথা জানতে চাইল। সুমিতা অবাক হয়ে বললে:

—এত পুরণ চিঠি আর তুমি এখনও উত্তর দাও নি?

একপাশের ভুরু কুঁচকে গোমেজ উত্তর দিয়েছিল—কাট্ হেয়ার। ছ মাস চার মাস ছাড়া ছাড়া মায়ের কাছ থেকে চিঠি আসে কিন্তু তার আর উত্তর দেওয়া হয় না। বাট্ মাই মাদার্ ইজ্ অ্যাওয়ার্ অফ্ ইট্, রাইটিং ইজ্ আউট্ অফ্ মাই নেচার্।

সুমিতা সেদিন গোমেজের চিঠিখানা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল আর পরের দিন ওকে দেখিয়েছিল আর একখানি চিঠি। গোমেজের হয়ে তার মায়ের চিঠির উত্তর। চিঠিখানা পড়ে গোমেজ উল্লাসে জড়িয়ে ধরেছিল সুমিতাকে।—ইউ প্রেসাস্ নোবল্ লেডী, ইউ রাইট্ সো নাইসলি!

তার পর থেকেই বিখ্যাত ডেমলার গাড়ীর একমাত্র বিশ্বস্ত ড্রাইভার গোমেজ আর তার হেডলাজার মাইল দূরের অখ্যাত বার্ডেজ গ্রামের বৃদ্ধা মায়ের মধ্যে একটা অদৃশ্য সেতু তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু এইটেই দুজনের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠার প্রধান কারণ নয়। আসল কারণটা ঘটেছিল তার বেশ কিছুদিন পরে—যখন সুমিতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ঝলমলে অফুরন্ত যৌবন এক নিমেষেই যেন দপ্ করে নিভে গেছল। কিন্তু গোমেজ ভেবে পেলে না একটা উচ্ছল যৌবন প্রবাহ হঠাৎ প্রায় থেমে যাবার কি কারণ থাকতে পারে? একদিন দুঁকতে দুঁকতে সুমিতা গোমেজের সামনে মুখ নীচু করে এসে দাঁড়াল।

সুমিতার শুধু খেয়াল আছে ডেমলার গাড়ীর পুরু কুশনের মধ্যে তার শরীরটা মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

সুমিতাকে ভাল করে পরীক্ষা করে ডাক্তার গোমেজের মুখের দিকে চেয়ে এক চোখ বন্ধ করে মুচকি হেসেছিল।

—এ ত রোগ নয়। ঘটনা। এই সব অতি গোপন ব্যাপার এই বয়েসে একটু আধটু ঘটেই থাকে। সে ত আর নতুন কিছু নয়। তবে এ সবের চিকিৎসা নিজে করতে যেও না, তাছাড়া এ সব ক্রুড্ মেথড্ আজকাল আর চলে না,··· বুঝলে ওল্ড্ ব্যাচিলর্।

ডাক্তার গোমেজের একপাশের গোঁফ ধরে নেড়ে দিয়েছিল।

প্রথম থেকেই ঘাবড়ে যাবার কথা গোমেজের। কিন্তু আশ্চর্য! অতবড় অপবাদ আর ঝুঁকি গোমেজ ঘাড় পেতে নিলে কি করে?

যদি শেষ পর্যন্ত মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যেত? সুমিতার ভয় হয়েছিল, ডাক্তারের সামনেই হয়ত গোমেজ ক্ষেপে উঠবে। একে দেখলেই লোকটাকে রগচটা গোঁয়ার বলেই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য! লোকটার মুখের কোন ভাবান্তর হল না। গোমেজের কোঁচকান মুখে অতিরিক্ত একটা কোঁচও ফুটে উঠল না।

ফেরবার সময় গাড়ীতে বিশেষ কোন কথাও হয়নি। শুধু একটা কথাই সুমিতার মনে আছে—হু ইজ্ দাট্ বাগার্?

না বোঝার ভান করে সুমিতা ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল—কার কথা?

—ইউ নো প্রেটি ওয়েল্, হুম্ ডু আই মীন্।

কিন্তু সুমিতার মুখ থেকে কোন কথাই বেরয় নি। সুমিতার নেতিয়ে পড়া দেহ আর কাঁদ কাঁদ মুখ দেখে গোমেজ কি বুঝেছিল সেই জানে কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করে নি।

সুমিতা জানত এটাই বোধহয় গোমেজের সঙ্গে শেষ দেখা। আর কোনদিন তাকে সেলুনের পেছনের লোহার সিঁড়ি বেয়ে চুপিসাড়ে উঠে আসতে দেখা যাবে না। বেলজিয়াম গ্লাসের লাইক্-সাইজ আয়নার ওপর আর কোনদিন তার কোন ছায়া এসে পড়বে না।

কিন্তু ঠিক তার উল্টো।

তার পর থেকেই গোমেজের সঙ্গে সুমিতার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেছল। সুমিতার মাঝে মাঝে মনে হত লোকটা তার কাছে কি চায়? কি বিশেষ মাল মশলা দিয়ে এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটা তৈরি?

জলের মত পয়সা খরচ হয়েছিল কিন্তু সুমিতা কার কাছেই বা হাত পাতবে। তবে গোমেজ রোজ

আসত যাবার সময়ে সুমিতার আঁচলে খুচরো টাকার নোট বেঁধে দিয়ে যেত। ডাক্তার গোমেজের বন্ধু তাই সে খরচটাও শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছল।

সুমিতা অবশ্য সাধ্যমত প্রতিদান দেবার চেষ্টা করত না যে তা নয়। রোজ গোমেজের গলায় তোয়ালে জড়িয়ে ভাল করে গালে স্নেভ করে দিত তারপর অনেকক্ষণ ধরে ঘসে ঘসে ভ্যানিসিং ক্রীম মাখিয়ে দিত।

একটু একটু করে সুমিতা আবার আগের মতই সুস্থ হয়ে উঠল।

এক একদিন রাত্রে ফেরবার সময়ে পরিচিত বট্‌স্‌গ্রীন বং-এর গাড়ীখানা রাস্তার মোড়ে লাইট্‌ পোষ্টের তলায় অপেক্ষা করতে দেখলেই বোঝা যায় এই নির্জন পরিবেশে একজন বসে বসে তার কথাই ভাবছে।

সারাদিনের খাটুনির পর ডেমলারের নরম গদীর মধ্যে তলিয়ে গিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকতে খুব ভাল লাগে। ডানহাতখানা যেন আপনা থেকেই গিয়ে আলতো করে স্পর্শ করে গোমেজের চওড়া কাঁধের ওপর। সুমিতা জানে ওর প্যাণ্টের এক পকেটে আছে অয়েল পেপারে মোড়া চিকেন প্যাটিস্‌ আর এক পকেটে হুইস্কির ছোটো বোতল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খুসিমত বার করে নিলেই হল।

সেদিন ফেরবার সময় আবদারের ভঙ্গিতে সুমিতা বললে—আমাকে সেখানে নিয়ে যেলে না।

—কোথায় ?

—যেখানে সেদিন নিয়ে যাবার কথা ছিল।

—না, আজ নাইট্‌ শো এর টিকিট করেছি।

সুমিতা ভাল করেই জানে, নাইট্‌ শোয়ের পরেই গোমেজ গিয়ে ঢুকবে পার্ক ষ্ট্রীটের কোন একটা বারে। আর তার পরের সমস্ত চিন্তা আর ভাবনা সুমিতার। তখন কোথায় থাকবে পঁচাত্তর হাজার টাকার ডেমলার আর কোথায় সুমিতা। তখন কি আর খেয়াল থাকবে যে সে একজন দু'শো পঞ্চাশ টাকার ড্রাইভার আর সঙ্গিনী একজন একশো পঁচাশি টাকার হেয়ার ড্রেসার। রাত আড়াইটের সময় ঐ বিরাট লাসকে কাঁধের ওপর ভর দিয়ে নিয়ে আসতে হবে ফুটপাথের ধারে পার্ক করা গাড়ীর মধ্যে আর ষ্টিয়ারিং এর সামনে বসতে হবে সুমিতাকে। আবার হুঁস রাখতে হবে কখন আবার ষ্টিয়ারিং সুদ্ধ সুমিতাকে না জড়িয়ে ধরে চলন্ত গাড়ীর মধ্যেই।

নাইট্‌-শো এর কথা শুনেই সুমিতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—না না আজ নয় প্রিজ, আজ আমার শরীরটা খারাপ, আজ আমি ড্রাইভ করতেই পারব না। তুমি টিকিট সেল করে যাও, তারপর গোমেজের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কি যেন বললে। গোমেজ সুমিতার বব্‌ করা চুলের ঝুটিতে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে উঠল—মাই সি। সামটাইম্‌ গার্ল্‌স্‌ আর্‌ টোটালি আনপ্রিডিক্টেবল্‌ ফর্‌ ড্রাইভিং।

একদিন সন্ধ্যে বেলায় গোমেজ তাকে অনেক গলি ঘুঁজি পার হয়ে এক মজার জায়গায় নিয়ে হাজির করল। আজকাল আর চিনে নিতে অসুবিধে হয় না—জাহাজের খালাসী, জকি, হোটেল কমসার্ট পার্টির মিউজিসিয়ান দেখলেই চেনা যায়। এক একখানা টেবিলকে ঘিরে তাস আর মদের বোতল নিয়ে সব জটলা পাকাচ্ছে।

সুমিতা সেখানে নতুন আমদানি। সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল। অবশ্য সুমিতা এসব অনেক দেখেছে। এই কয়েকের মুণ্ড ঘুরিয়ে দেবার মত তার অনেক কৌশলই জানা আছে।

খানিকক্ষণ পরে গোমেজ ছুটে এল—হালো, চার্মিং গার্ল, ইউ নো ওয়াণ্ডারফুলি কারেক্ট, স্টেপিং···এসব শিখলে কখন।

—সাহেব, তুমিত আমাকে চিনলে না।

কিন্তু মনের মেশা যেন গোমেজের কেটে গেছল। সুমিতাকে কানে কানে বললে—দি কেয়ারফুল্। ডোণ্ট্ গিভ্ দেম্ ইয়োর্ হোয়ার্ এবাউট্স্।

আড্ডাখানা থেকে বেরিয়ে গোমেজ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল···

—সুমিটা, গিভ্ মাইই এ লেটার টু মাই মাদার্। আই এ্যাম্ ভেরিমাচ্ ওরিড্।

সুমিতা জানে ওল্ড লেডীর কথা মনে পড়লেই গোমেজ অন্যরকম হয়ে যায়।

—সাহেব, তোমার মাকে কলকাতায় নিয়ে এস না।

গোমেজ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—ডেন দি উইল্ ভাই। ইউ নো, আই এম্ এ রেচেড্ ম্যান্, হু উইল্ লুক্ আফটার্ হার্?

সুমিতা একটু হেসে বলেছিল—যদি বলি আমি।

গোমেজ অনেকক্ষণ ধরে একটা চুরুট ধরাল। তারপর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললে—সুমিটা, অনেকবার ভেবেছি···আমি তোমার সঙ্গে অন্য রকম ভাবে মিশব। কিন্তু আমি নিজেই বুঝিনা··· সামটাইমস্ উইথ্ অল্ মাই ক্রটাল্ ভিজায়ার্ আই কাম্ টু টক্। বাট্ বিকোজ্ ইয়োর্ আইজ্ আই ফিল্ মাইসেলফ্ হেল্পলেস্।···অলটোগেদার্ এ ডিফারেণ্ট্ ম্যান্।

গোমেজ একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—বলতে পার ইয়ং গার্ল, তোমার মধ্যে কি আছে?

সুমিতা মুচকি হেসে গোমেজের উক্তি দেওয়া হাতখানা নিজের দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললে,

—আমি যে ইন্দ্রজাল জানি।

—আই ডু নট্ নো হোয়েদার্ ইট্ ইজ্ ইন্দ্রজাল অর্ এনিথিং, বাট্ ইট্ ইজ্ মিরিরিয়াস্।

সে দিন আর গাড়ী পাওয়া যায় নি। শরৎ কালের স্বচ্ছ নীল আকাশ আর সন্ধ্যে বেলার একটু একটু ঠাণ্ডার আমেজ। আউটরাম ঘাট জ্যোৎস্নার আলোয় ঝলমল করছে। দুজনে পাশাপাশি রাস্তার পাশের রেলিং পার হয়ে গঙ্গার ধারে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর এসে বসল।

—জান সুমিটা এখন কি ইচ্ছে হচ্ছে।

—তোমার আবার কি ইচ্ছে হবে? নিশ্চয়ই বিয়ার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

গোমেজ হেসে উঠল—ওয়াণ্ডারফুল্!

সত্যিই তুমি ইন্দ্রজাল জান। এটা যদি আউটরাম্ ঘাট না হয়ে আমাদের প্যাসপার্-ডায়াল্-বীচ্ হ'ত, আই উড্ অফার্ ইউ এ ওয়ার্ম কিস্ কস্ ইয়োর্ রিগ্রাই।

—দেখ সাহেব, তুমি আজকাল বড্ড বিয়ার খেতে আরম্ভ করেছ। ওটা কমাতে পার না।

—ওটা কমালে থাকব কি নিয়ে, ক্যান্ ইউ ইমাজিন্ এ ক্রনিক্ ব্যাচিলার্ উইদাউট্ বিয়ার্?

—ওটা কমিয়ে দিয়ে বরণ মাঝে মাঝে হুইস্কি কিম্বা জিন্ খেও।

—হোল্, আর্ টু কাট্, আকোর্ড্ দেম্।

সুমিতা ততক্ষণে গোমেজের প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে গোটা দুয়েক প্যাটিস্ আর একমুঠো চকোলেট বার করে নিয়েছে। এর সঙ্গে আনা চারেকের বাদাম কিনলে মন্দ হত না।

সুমিতা শাড়ির আঁচোলটা ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে খানিকক্ষণ পরে নিজের মনেই ভাবলে—না, এ ভাবে বললে শরীর থেকে শাড়ীখানা অনেকখানি অনাবৃত করতে হয়। তার থেকে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে ঘাসের ওপর হেলান দিয়ে শুলে আঁচোল বিছিয়ে দিতেও কোন অসুবিধে নেই অথচ মৌজকরে গল্পও করা চলে।

ইচ্ছে করছিল গোমেজের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। কিন্তু স্বচ্ছ নীল আকাশের নীচে চাঁদের আলো পৃথিবীর সব কিছু গোপনীয়তা যেন নষ্ট করে তুলেছে। আর কম বয়েসী ছেলেগুলো এমন হেংলার মত তাকিয়ে থাকে · ···।

লোহার রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসে গোমেজের কি খেয়াল হল, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে—আচ্ছা সুমিটা, তুমি ঘোমটা দাওনা কেন ?

বড় অদ্ভুত প্রশ্ন, সুমিতা হেসে উঠল,

—সেলুনের হেয়ার ড্রেসারের কপালে কি আর ঘোমটা দেওয়া আছে, তবে তুমি যদি চাও ত দিতে পারি।

—ইয়েস্, ইউ উইল্ লুক্ নাইস্, আণ্ডার্ এ ভেল্।

তারপর হঠাৎ যেন গোমেজের মুড্ পালটে গেল—একটা ইমপরটেন্ট্ খবর বলা হয়নি, ওল্ড মাদারের কাছ থেকে তোমার চিঠির রিপ্লাই এসেছে। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললে—জান সুমিটা, তোমার মিডিয়ামেই আমি মায়ের কাছে পৌঁছতে পারি।

তারপর কি ভেবে আবার বললে—সুমিটা, হোয়ার্ ইজ্ ইয়োর্ মাদার্। তোমার মায়ের কথা কৈ বল না তো ?

সুমিতার আর প্যাটিস্ খাওয়া শেষ হল না, একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

চাঁদের আলো সুমিতার ভাম্প্ করা চুলে, কপালে, গালে এসে পড়েছে। ওর আঁচোল খসে পড়া দেহের প্রতিটি রেখা ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। গোমেজ একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়েছিল। হঠাৎ সুমিতার কথাতেই চমক ভাঙল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সুমিতা বললে —আমার মায়ের কথা নাই বা শুনলে, সে সব তোমার শুনে কাজ নেই।

গোমেজ গঙ্গার বুকে সারি সারি জাহাজের আলোর দিকে চেয়ে বললে,

—অল্ রাইট্, লিভ্ ইট্।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে— বেঙ্গলী গার্লস্ আর্ টু সেন্টিমেন্টাল্।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। দিন করেক শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। রাত নটার পর সেলুনের ভীড়ও কমে গেছে। থার্মফ্লাস্ক থেকে গরম কফি ঢালতে ঢালতে ঘন কুয়াশার মধ্যে চোখে পড়ল···লোহার সিঁড়ির ধাপে ধাপে একটা ছোট্ট আগুনের টুকরো ওপরে উঠে আসছে। সুমিতা একটু মুচকি হেসে আর একটা কাপ টেনে নিয়ে কফি ঢালতে আরম্ভ করল। দর্বাণ ওভার কোটে মুড়ি দিয়ে গোমেজের বিরাট

শরীরটা রেলিং টোপ্‌কে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালে। কফির কাপ শুদ্ধ সুমিতার হাতটা চেপে ধরে গোমেজ একটু ঝুঁকে পড়ে বললে—

- সুমিটা, আমি ভেবে দেখলাম, ইউ আর্‌ ইনডিস্‌পেনসেবল্‌ টু মাই লাইফ্‌।

সুমিতা মুখে কিছু বললে না শুধু গোমেজের উষ্ণি দেওয়া হাতটা নিজের গালে চেপে ধরল। তারপর গোমেজের কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বললে—আজকে বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলনি ত।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। ক্রমে রাত গভীর হয়ে উঠেছে।

ঘন কুয়াশার মধ্যে দুজনে পার্ক স্ট্রীটের ফুটপাথে এসে দাঁড়াল। সুমিতা হাসতে হাসতে বললে- শেষে একজন ব্যাপিস্টকে বিয়ে করবে ঠিক করলে।

—তাতে কি হয়েছে। আমিও ত একজন ড্রাইডার। মাই প্রফেশন্‌, ইজ্‌ নো বেটার্‌ দ্যান্‌ দ্যাট অফ্‌ ইয়োর্স্‌। অন্য সময় হলে সুমিতা হেসে ফেলত কিন্তু এই মুহূর্তে যেন হাসতে চেষ্টা করেও পারল না।

ফুটপাথ ধরে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। কিন্তু কারও মুখেই কোন কথা নেই। সুমিতাই প্রথম বললে তুমি যখন প্রথম সেলুনে এসেছিলে তখন নিশ্চয়ই কোন গোপন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলে। আর আমিও তোমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলুম।

সুমিতা হঠাৎ যেন আরো গম্ভীর হয়ে গেল. তারপর একটা ঢোক গিলে বললে,

—তা ছাড়া তুমি ভাল করেই জান, আই এ্যাম্‌ নট এ ভার্জিন্‌ গার্ল।

—য়্যারেঞ্জ্‌ ইজ্‌ নাথিং বাট্‌ এ কন্ট্রাক্ট্‌, এণ্ড্‌ চেইটি ইজ্‌ সিম্প্লি এ ম্যাটার্‌ অফ্‌ আরভিয়লাজ।

তারপর সুমিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে—তুমিও জান, স্ক্রিপচারেন্টলি আই স্পেয়ার্‌ মাই নাইট্‌স্‌ টু দি ব্রথেল্‌। বাট্‌ আফটারঅল্‌ উই মাস্ট্‌ হ্যাভ্‌ সা আওারস্টাণ্ডিং। উই আর্‌ অল্‌ হিউম্যান্‌ বিইংস্‌।

চলতে চলতে সুমিতা হাতঘড়িতে দেখল রাত প্রায় বারটা বাজে। পার্ক স্ট্রীটকে বাঁয়ে রেখে দুজনে এবারে দক্ষিণ মুখো একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল।

সুমিতা বললে—তুমি হয়ত জান না আই এ্যাম্‌ ওভার খারটিসিক্স্‌ আর তুমিও নিশ্চয়ই ওভার ফরটি ফাইভ্‌।

—সো হোয়াট?

—বলছিলাম ··· আমরা যেভাবে এতদিন জীবন কাটিয়েছি আমাদের মধ্যে অলরেডি একটা পারভারসন্‌ এসে গেছে। বাট্‌ উই ক্যান্‌ নট ডিভিয়েট্‌ দি মোড্‌ অফ্‌ আওয়ার্‌ ওল্ড্‌ প্র্যাক্‌টিস্‌।

তারপর করুণ হেসে বললে—আমরা যখন আর বাঁধাধরা জীবনের মধ্যে কোন চার্ম খুঁজে পাব না তখনই দু'জনে দু'জনের দোষ খুঁজব ···· হয়ত ছুতো খুঁজব ···কজ্‌ দি ডুডিসিয়াস্‌ সেপারেশন্‌·····।

গোমেজ আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললে—সুমিটা, তুমি বড় রিএ্যাক্সানারী, ইউ মাস্ট্‌ হ্যাভ্‌ এন্‌ অপটিমিষ্টিক্‌ ভিউ।

ডিসেম্বর মাসের কুয়াশা ঢাকা নির্জন ফুটপাথের ওপরেই সুমিতা গোমেজের গলা জড়িয়ে ধরে ওর বুকের ওপর মুখটা চেপে ধরল—থিঙ্ক্‌ ডোন্ট্‌ দিস্‌আওয়ারটাও, মি। পৃথিবীতে প্রত্যেকেই বিয়ে করার জন্যে আসে না। ইউ মাস্ট্‌ রিয়েলাইজ্‌····· আমাদের মধ্যে অনেক পারভারসন্‌ আছে, আর আমরা জীবনের সমস্ত ফ্রাস্ট্রেশন্‌ কেবল মদ খেয়ে ভোলবার চেষ্টা করছি।

গোমেজ কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ল—তবে কি আমরা কোনদিনই নরম্যাল্ লাইফে ফিরে আসতে পারব না।

গোমেজের বুকের মধ্যে সুমিতার মুখটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল—না, না, না, কোন দিনই না। আমাদের লাইফের স্টাটিং খারাপ হয়ে গেছে, উই উইল্ নুভ দি রেশ্…। ……মারকুইস্ ম্যানসনের অফ্‌টাইম্ রোমান্স্ আর ম্যারেড্, লাইফ্ এক নয়।

প্রচণ্ড শীতের রাতেও সুমিতার চোখের জলে গোমেজের বুকের কাছটা গরম হয়ে উঠল।

দিন সাতেক আর গোমেজকে চুপি পাড়ে লোহার রেলিং বেয়ে উঠে আসতে দেখা গেল না। তারপর হঠাৎ একদিন এসে হাজির।

—সুমিটা ইউ আর্ রাইট্। উই নুড্ নট্ মেট্ ম্যারেড্।

কিন্তু কথাটা শুনেই যেন সুমিতার মুখখানা এক নিমেষে রক্তশূন্য, সাদা হয়ে গেল।

গোমেজ আবার বললে—উই মাস্ট্ নট্ স্পয়েল্ আওয়ার্ গুড্ রেপুটেশন্।

সুমিতার চোখ ছল ছল করে উঠল। সে মুখ ঘুরিয়ে নিলে, তারপর গোমেজের হাত সজোরে চেপে ধরে বললে,

—তুমি কিন্তু আগের মতই এস।

গোমেজ আজ একটু বেশি গম্ভীর। বললে—শিওরলি।

তারপর সুমিতার হাতের ভেতর থেকে নিজের হাতখানা সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। গোমেজ চলেই যাচ্ছিল।

সুমিতার কি খেয়াল হল, গোমেজের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর জোর করে মুখে হাসি টেনে বললে—আচ্ছা সাহেব, আমরা ঠিক ভদ্র সোসাইটীর নই বলেই বোধ হয় আমাদের জীবনের কোন ইচ্ছেই পূর্ণ হল না……।

গোমেজ হঠাৎ যেন একটু ভেবাচাকা খেয়ে গেল, তারপর দাঁতের ফাঁকে চুরুটটা চেপে ধরে একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—সার্টেনলি, হোয়াই নট্। নো ওয়ান্ কুড্ সেট্ এন্ একজাম্পল্ লাইক্ আস্।…… উই আর্ নট্ গোইং টু বি দি পেরেন্ট্ অফ্ এনি কোয়লোয়্ন চাইল্ড্ অফ্ ইয়োর্ ব্রাভ আরিস্টোক্রাট্ সোসাইটী……।

কাপসা চোখে সুমিতা দেখলে পেছনের লোহার সিঁড়ি বেয়ে গোমেজের শরীরটা ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

———

চল্‌তি পথের চিত্র

নির্মল দত্ত

প্রায় দৌড়ে এসেই ট্রেনে উঠ্‌লাম।

ইলেকট্রিক্ ট্রেন। ছাড়লেই একেবারে সাঁ-সাঁ! কয়েকজন তরুণ তখনও প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়িয়ে। ট্রেন ছাড়তেই তারাও হুটোপুটি ক'রে উঠ্‌ল গাড়ীতে। ফলে ধাক্কা খেয়ে একটু লাগ্‌ল। চশমাটা খুব বেঁচে গিয়েছে এই রক্ষে! ট্রেনে বেশ ভিড়। বসার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে অনেকেই। ষ্টেশনের টিকিট ঘরের সাম্‌নেও ছিল বিরাট লাইন। নতুবা লাইনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে টিকিট কাট্‌তে না হলে আর একটু আগে আস্‌তে পারতাম। তাতে বসার জায়গা না পেলেও হয়ত একটু ভাল দাঁড়াবার জায়গা পেতাম।

আমার পেছন পেছন কালো কোট পরা চেকারও উঠ্‌লেন। ছেলেগুলোর মাঝে বেশ একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল। ফিস্‌ফিসানিও কানে এল—চেকার, তা হয়েছে কি!

ইতিমধ্যে টিকিট চেকার টিকিট চেক কর্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছেন। ছেলেগুলোর মধ্যে পাওা গোছের একজন বল্‌লে—আমরা বিপিনচন্দ্র মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্র। কলকাতার ময়দানে পার্টির মিটিংএ যাচ্ছি। আমাদের—

বাকি কথা আর বল্‌তে হ'ল না। চেকার মহোদয় হয়ত সে কথা বুঝে নিলেন। তাই আর পীড়াপীড়ি করলেন না। অন্যত্র টিকিটের খোঁজে গেলেন। ইতিমধ্যে পাওা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেশ বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছে। শ্রোতা আর সব মিটিং-যাত্রী। পাওা বলে চলেছে—দেশকে যারা ভাল না বাসে তারা দেশের শত্রু। দেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সব কাজ করতে হবে। এমন কাজ কখনই করা উচিত নয় যাতে দেশ ও জাতির ক্ষতি হ'তে পারে।.....ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুন্‌তে শুন্‌তে দু'লাইনের সিটের দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম—বাঙ্কের একটা রড্ ধ'রে। ততক্ষণে চেকারও এদিকে চেকিং সুরু করেছেন। একপার্শ্বে দু'সিটের দু'কোনে ব'সে অপরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরা এক স্ত্রীলোক ও আর এক কিশোরী। চেকার তাদের কাছে টিকিট চাইলেন। ওরা দু'জনেই অচঞ্চল, নিরুত্তর।

চেকার আবার তাগাদা দিলেন—কি হল?

মুখ খুল্‌ল স্ত্রীলোকটি। অল্প একটু হেসে বল্‌ল—টিকিট নেই।

—ভাড়া দিন। চেকার তাঁর খাতাপত্র বের কর্‌লেন পকেট থেকে।

—ভাড়ার পয়সা নেই।

—মাত্র পাঁচ কেজি চাল, বাবু। ট্রেনের টিকিট কাট্‌লে ওতে আর থাক্‌বে কি! দোহাই বাবা, টিকিট চাইবেন না।

অগত্যা মধুসূদন। চেকার আর কি করবেন! তাঁর শেষ অস্ত্র ছাড়লেন—তা হ'লে উঠুন সিট ছেড়ে। জায়গা ছেড়ে দিন। যারা টিকিট কেটেছেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে যাবেন, আর আপনারা টিকিট না কেটেই দিব্যি আরামে ব'সে যাবেন, বাঃ!

কথায় কাজ হ'ল। সিট ছেড়ে উঠে গেল দু'জনেই। আমার বসার জায়গা হ'য়ে গেল। ইতিমধ্যে আর একটি ষ্টেশন এসে গিয়েছে। এবার আরও হুড়োহুড়ি। নারী আর ছোট ছেলেমেয়েই বেশী। সবার কাছেই একটা দু'টো ক'রে পুঁটুলি। মনে হ'ল চাল। উঠেই হুড়োহুড়ি—তাদের পুঁটুলিগুলি নিরাপদে রাখার।

ইতিমধ্যে চেকার মহোদয় টিকিট চেক করতে করতে সামনের বেঞ্চে হাত বাড়িয়েছেন। এক বয়স্কা বিধবা মহিলা কোলে একটা বছর তিনেকের বাচ্চা ছেলে নিয়ে ব'সে আছেন। বললেন—বড় গরীব বাবা, পয়সা ছিল না। টিকিট কাটতে পারি নি।

—সঙ্গে আর কে আছেন?

স্ত্রীলোকটি আর একপাশে একটু দূরে এক ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে দিলেন। তাকিয়ে দেখি, বছর তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের এক বিবাহিতা মহিলা। কোলে তার মাস ছয় সাতের একটি বাচ্চা। মহিলার হাতে কয়েক গাছা ক'রে সোনার চুড়ির সাথে শাঁখা আর বেশ ভারি ভারি সোনার বালা দু'হাতে দুটি। গলায় সোনার হার, নাকে সোনার নাকছাবি, কানে সোনার ওপর পাথর বসানো দুল। রঙিন ভাল শাড়ী পরনে। দেখে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলাম শুধু।

চেকার প্রশ্ন করলেন—কতদূর যাবেন?

—রাণাঘাট।

—ভাড়া দিন।

—ভাড়া নেই, বাবা!

—আচ্ছা, একজনের ভাড়া দিন এক টাকা দশ পয়সা।

বিধবা স্ত্রীলোকটি আঁচল দেখিয়ে বললে—মাত্র এই আট আনা পয়সা আছে।

চেকার বিবাহিতার দিকে তাকিয়ে বললেন—তা হ'লে ওঁর কাছে নিশ্চয় আছে। ব'লে তিনি বিবাহিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—দিন, এক টাকা দশ পয়সা।

বিবাহিতা নিরুত্তর।

—বের করুন, বের করুন তাড়াতাড়ি।

বিবাহিতার মুখে এবারও কথা নেই।

—কৈ, কি হ'ল?

বোঝার শক্ত নেই। বিবাহিতা এখনও নিরুত্তর।

চেকার আরও কয়েকবার চাইলেন। কিন্তু অপর পক্ষ থেকে কোন সাড়াই পেলেন না। একেবারে নিরুত্তাপ ভাব। এদিকে রাণাঘাট এসে গিয়েছে। চেকারের ডিউটি শেষ। আর ওরাও হয়ত নেমে পড়বে। তাই চেকার আর কি করেন! নেমে গেলেন ট্রেন থেকে।

কিন্তু বিধবা ও বিবাহিতা মহিলাদের নামবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আরও যেন ভাল ক'রে বসলেন। ভাবলাম হয়ত নতুন লোক এ লাইনে, রাণাঘাট যে এসে গিয়েছে তা বুঝতে পারে নি।

বললাম—রাণাঘাট নামবেন তো? এসে গিয়েছে।

বিধবা বললেন—না, কাঁচড়াপাড়া যাব।

তবে মিথ্যে কথা বললেন কেন চেকারকে?

বিধবা নিরুত্তর। তারপর ঘুমের অছিলায় চোখ বুজলেন। ক্রমে ট্রেন কাঁচড়াপাড়ায় এল। ওদের ডাক দিলাম—শুনছেন, কাঁচড়াপাড়া এসে গিয়েছে।

আমার কথা শুনে একটু ইতস্ততঃ ক'রে ডাক দিলেন বিবাহিতাকে—ও বাসু, কাঁচড়াপাড়ায় নামবি?

বিবাহিতা কোন উত্তর দিল না। মনে হ'ল, বিবাহিতা ওর মেয়ে।

ট্রেন কাঁচড়াপাড়াও ছেড়ে গেল।

পাশের এক ভদ্রলোক বললেন—কেন আর তাগাদা ক'রে নামাচ্ছেন। ওরা কলকাতায় যাবে। আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছে ট্রেনে উঠেই—ট্রেন কলকাতায় ক'টায় সময় পৌঁছুবে।

সত্যিই তাজ্জব ব'নে গেলাম।

কিন্তু তাজ্জব বনার কিছু নেই। এই সামান্য সময়ের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে—সারাদিনে তা হ'লে তো অসংখ্য ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটছে।

ইতিমধ্যে এক ষ্টেশনে সেই পাঁচ কেজি চালের স্ত্রীলোকটি আমার সিটের তলা থেকে চালের বস্তা টানাটানি ক'রে বের ক'রে নেমে গেল। তাকিয়ে দেখি, চাল তার পাঁচ কেজি নয়,—কম্-সে-কম্ পঁচিশ কেজি।

ওদিকে আবার কান্না ট্রেন আটকেছে। যেতে দেবে না। কি সব তাদের অভিযোগ। তাই যেবাও। ট্রেন ছাড়বার সিকি মিনিট আগেই নাকি গার্ড ট্রেন ছাড়ার বেল্ দিয়ে দিয়েছেন—তাই। যাত্রীদের চেষ্টায় অবশ্য মিনিট চল্লিশেক পরে ট্রেন ছাড়ল। অনেকেই উস্‌খুস্ করছিলেন—নাঃ বড্ড লেট হ'য়ে গেল। আজ সব কাজ মাটি!

• • • ট্রেন এবার নৈহাটী ষ্টেশনে এসে গিয়েছে। একদল পুলিশ আর এন্. ভি. এফ্ উঠল গাড়ীতে। এক পৌঢ়ার গায়ে লাঠির খোঁচা মেরে এক এন্. ভি. এফ বলল - ওঠ।

—মাত্র দু'সের চাল আছে খাবার জন্যে। প্রৌঢ়ার উত্তর।

—হ্যাঁ, প্রতিদিনই দু'সের ক'রে চাল থাকে খাবার জন্যে! নয়! ওঠ। ওঠ—

ইতিমধ্যে পেছন দিক থেকে এক স্ত্রীলোকের বুকফাটা কান্নার রোল শোনা গেল! পুলিশ তার চাল নামিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

অফিসার-ইন্-চার্জ বল্লেন—কাঁহুক্। রোজ বারণ করি আর রোজই চাল নিয়ে আসবে। আজ ছাড়া হবে না।

যাত্রীদের মধ্যে একজন বল্লেন কি দরকার বাপু, এই কাজ ক'রে। এর চেয়ে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে কাজ ক'রে খেলেই পার—তাতেও সম্মান আছে।

আর একজন বল্লেন—লোভ মশাই, লোভ।

এর প্রতিবাদ করলেন আর একজন—বলা তো সহজ। কাজ বল্লেই কি কাজ মেলে! যে দিনকাল। পেটের জন্যে করবে না তো, কি করবে! আর ওরা আনছে ব'লেই তো আমরা পাচ্ছি।

অকাট্য যুক্তি!

ট্রেন আবার ছেড়েছে।

• • • •

এর কিছু দিন পরের কথা!

শহরের এক সিনেমা হলের সামনে দেখি বিরাট ভিড়। কি একটা হিন্দী বই হচ্ছে। টিকিট ঘরের সামনে ভিড়ের হুড়োহুড়ি। হঠাৎ ভাল ক'রে নজর পড়তেই দেখি, লাইনের টিকিট ক্রেতাদের ঘাড়ে পা দিয়ে ধস্তাধস্তি ক'রে টিকিট কাউন্টারে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে সেই ছেলেটি না। হ্যাঁ, এইতো ট্রেনের সেই পাণ্ডা!

পলাশের রঙ্

সন্তোষকুমার অধিকারী

সারাদিন একা একা কোয়ার্টারে বসে থাকা যে এত ক্লান্তিজনক তা আগে মনে হয়নি রেখার। স্বামী তার ইঞ্জিনিয়ার। করাক্তায় এসেছে মাত্র মাস তিনেক আগে। প্রথম দর্শনে গঙ্গার তীরে খাড়ে' ওঠা এই নতুন অঞ্চলটুকু তার মনে পুলক জাগিয়েছিল। কিন্তু তিনমাসেই মনের সে রোমাঞ্চ ঝরে' গেছে। এখন একঘেয়ে লাগে। সময় কাটাবার উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়ায় সে।

অথচ আগন্তুকের চোখে করাক্তার রূপ ধরা পড়ে। মনে হয় ভারী সুন্দর জায়গাটা। রেখারও যে ভাল লাগে না তা নয় কিন্তু সময় সময় মনে হয় প্রাণহীন, বড় নির্জীব।

ষ্টেশনের পূর্বদিকে ব্যারেজের নিজস্ব গড়ে তোলা শহর। পিচের রাস্তাগুলো সোজা আর চওড়া। ঝকঝকে কালো পথে মোটরের চাকাগুলো পিছলে যায় যেন। পথের দুধারে একই ধরণের সারবাঁধা বাড়ীগুলো ম্লান করে' সাজানো। যতদূর চাও, দৃষ্টি অবাধ; আকাশ ছুঁয়ে আবার ফিরে আসবে। এ পাশে গঙ্গা আর ওপাশে রেল লাইন। রেললাইন ছাড়ালে অন্তহীন মাঠ।

রেখার স্বামী অজিতেশ ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। হাতুড়ি যন্ত্র আর নক্সা নিয়ে মাথা ঘামায় সারাটা দিন। মাঝারি বলিষ্ঠ দেহ। চওড়া কপালের ওপর কাটা দাগটা যেন তার চরিত্রের প্রতীক। পুরু অধরোষ্ঠের ওপর নাকটা কিছুটা বিনীত। সে মুখে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে দেখবার মত কিছু নেই; চেয়ে থাকবার সময়ও থাকে না। কারণ বিছানা ছেড়ে ওঠে সে আটটায়। চা খেয়েই দাড়ি কামাতে বসে। তারপরেই চান, খাওয়া ও আপিস।

দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অবসর তার। চান সেরে খাওয়া-দাওয়া করতে বারোটা বেজে যায়। তারপর রেডিয়োটা খুলে দিয়ে একটা সিনেমা পত্রিকা হাতে নিয়ে একটু শোয় রেখা। এক একদিন ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু তাই বা কতটুকু? সময় আর কাটতে চায় না তার।

সন্ধ্যের পরও স্বামীকে পায় না রেখা। তখন তার ক্লাব বয়েছে; অফিসার্স ক্লাব। রেখা মাঝে মাঝে একাই বেড়াতে বেরোয়। বাইরের দীর্ঘ রাস্তাটা ধ'রে হাঁটে। রেললাইনের ধার দিয়ে সে রাস্তাটা উত্তরেও গঙ্গার বুকে গিয়ে ঠেকেছে। হাঁটতে হাঁটতে এই পথেই সে চলছিল সেদিনও। ষ্টেশন বাঁদিকে রেখে আর একটু এগোলেই গঙ্গা। এই জায়গাটা একটু নির্জন। আর বাগানের আড়াল দিয়ে পথটা গঙ্গার কূলে পৌঁছেছে। আর গাছের ছায়ায় ছায়ায় চালা ঘরে এক আধটা অস্থায়ী ভেরা। একটা পানের দোকান। একটা ভাঙা ট্রাক মাটিতে গেঁথে আছে। রেখা এতদূর পর্যন্ত এসে পড়েছিল। সঙ্গে বাচ্চা চাকর শিবু। রেখা শিবুকে ডেকে বললো—আর না, চল ফিরি।

—জলের কিনারে যাবেন না? শিবুর চোখে কৌতূহল জ্বলে উঠ্‌লো। ইষ্টিমার এপার ওপার করে। ভাল লাগে দেখতে।

রেখা শিবুর মুখের দিকে হাসলো। বছর বারো বয়েস ছেলেটার। কালো কুচকুচে, একরাশ ঝাঁকড়া চুলের নিচে দুটো জলজ্বলে চোখের চাউনি। রেখা বললো—আজ আর না, দেরি হ'য়ে যাবে রে।

—দু'আনা পয়সা দিন। খুব মিষ্টি পেয়ারা; নিয়ে আসি। শিবু হাঁটতে হাঁটতেই বেণার মুখের দিকে চাইলো।

—কোথা থেকে আনবি?

—টিপনের বাড় থেকে। মেয়েগুলা বসে' থাকে পেয়ারা নিয়ে। শিবুর ক্ষুদে চোখ দুটোতে ছেলেমানুষির দুষ্টুমি। ও জানে, বেণা পেয়ারা খেতে ভীষণ ভালবাসে। মাঝে মাঝে চান করবার নাম ক'রে বেরোয়, আর পাছ থেকে কাঁচা পেয়ারাই পেড়ে আনে। বেণা তাই চিবোয় বসে' বসে'।

হাতের ছোট্ট ব্যাগটা থেকে খুচরো পয়সা বার করে দিতেই শিবু ছুটলো—ঠিক একটা বাচ্চা হরিণের মত। বেশ মজা লাগে বেণার। কালো ছোট্ট ছেলেটা নিয়ে বেললাইন টপ্‌কে দৌড়ে যাচ্ছে ছেলেটা। বেণা একটু হেসে আসতে আসতে এগোতে লাগলো।

এ পাশের বাড়ীগুলো 'ডি' টাইপের। অর্থাৎ আপার ডিভিসন কেরাণীদের। প্রত্যেকটা কোয়ার্টারের সামনে খানিকটা করে' খালি জমি। ইচ্ছে করলেই বাগান করা যায়। তবু শুধুই খালি মাঠ। বুনো কাঁটানটে চারদিকে। হয়ত একটা করবী কোন বারান্দার কোলে। একটা আধ্‌টা পেঁপে গাছ। কিন্তু তার বেশী না।

আস্তে আস্তে হাঁটছিলো বেণা। নইলে শিবু এসে খুঁজবে। হাঁটতে হাঁটতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো প্রত্যেকটা বাড়ী। এ তার অনেক দিনের অভ্যেস। সতেরো নম্বর বাড়ীর জানলায় যে পরদা টাঙানো, দেখলেই বোঝা যায়, ছেঁড়া লুঙি সেলাই করে' সে পরদা টাঙানো হ'য়েছে। সতেরো নম্বরের লাগা আঠারো নম্বরের খোলা জানলার ট্রানজিষ্টার খুলে হিন্দী গান শুনছে একটি অল্পবয়সী ছেলে। তারপরেই খোলা মাঠ খানিকটা। মাঝখানে একটা ডেনে মুখ থুবড়ে যাবার থুঁজছে দুটো মুরগী। বেণা এগিয়ে চললো।

নাঃ। শিবুটা আসতে দেরি করছে। সোজা রাস্তা। খুঁজে পাবে ঠিকই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। বেণা এগিয়ে চললো। বেহালার একটা সুর যেন কানে এসে বাজছিলো। হয়ত রেডিয়োতে বাজাচ্ছে কেউ। ডানদিকে মালগাড়ীর শান্টিং করার শব্দে কান আচ্ছন্নপ্রায়। দূর থেকে একটা জিপ্ ছুটে আসছে দুরন্ত স্পিডে। পলকে ঘমকা বাতাসের মত বেরিয়ে গেল। ধারের দিকে সরতে গিয়ে একটা বেড়ার গায়ে এসে ঠেকেছিলো বেণা।

এতক্ষণে একটা বাগানের ছবি চোখে পড়লো। বাড়ীটার সামনের জমিটুকু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝখানের গেট থেকে রাস্তাটা ঘরের দরজায় গিয়ে ঠেকেছে। বেণার হঠাৎ ভাল লাগলো। বাগানের ভেতরে কোপাকুনি ইট সাজিয়ে সরু সরু রাস্তা। ধারে ধারে গাছ ঘুঁই আর বেলি। কিছুটা সবুজ জমি ঢাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু ···

হঠাৎ থমকে গেল বেণা। বেহালার সেই সুরের ঘীড় যেন এই বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে। শব্দ অনুসরণ ক'রে চোখ এগিয়ে গেল। সুরের মূর্ছনার জাল রচনা করে যে বসে আছে সেই লোকটির দিকেই চোখ পড়লো তার। জানলার পেছনে একটি চৌকিতে বসে রয়েছে শিল্পী। তার হাতের ছড়ির টান যেন বুকের ভেতরে কাঁপন তুলে যাচ্ছে। একটা রুদ্ধ আবেগের প্রবাহ ঘুরে ফিরে আছাড় খাচ্ছে যেন। বন্ধ কাঁচের জানলায় ভ্রমর যেমন ভাবে মাথা ঠোকে।

ট্রেনের একটা হুইশ্‌ল্ বেজে উঠলো হঠাৎ। শব্দে তাজা লাগলো কানে। দু'হাতে কান ঢেকে এগিয়ে গেল বেণা। আস্তে নয়, ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল। ট্রেনটা যেন তার মাথের ওপর এসে পড়েছে।

রেখা ছুটতে লাগ্‌লো—বেহালার সুরের ধ্বনি যতক্ষণ না তার কান থেকে মিলিয়ে গেল একেবারে। ইঞ্জিনের ঘসঘস শব্দও যেন ক্ষীণ হ'য়ে গেছে। সামনের বাড়ীর রেডিয়োর চিৎকারেও ঢাকা পড়ছেনা আর একটা শব্দ। রেখা একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগ্‌লো। তারপর আবার হেঁটে চললো।

দৌড়তে দৌড়াতে এল শিবু—টিপনের ধারে আজ ছিল না। ঘুরে যেতে হয়েছিল। দেরি হ'য়ে গেল মা।

রেখা তখন সামনের দিকে চেয়ে দেখছিলো। গাঢ় অন্ধকারে ভরে গিয়েছে চারদিক। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে টাউনশিপের পথ বিদ্যুতের আলোতে উদ্ভাসিত। এবার পাশের গলিতে ঢুক্‌তে হবে। এটাই ফিপ্‌থ্ ষ্ট্রীট্।

বুকি একটা গল্প পড়েছিল রেখা। হয়ত কোন সিনেমার গল্প। সেই গল্পের নায়কও বেহালা বাজাতো। কি যেন তার নাম? মনে কর পীযূষ। পীযূষের বেহালার তারে যেন এক অরণ্যের ধ্বনি-মর্মর বাজ্‌তো। সেই বেহালার সুরে একদা মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল একটি মেয়ে···কি যেন তার নাম?

বাসায় পৌছে গিয়েছিলো রেখা। অজিতেশ এখনও এসে পৌছায় নি। সবে সাতটা। অজিতেশ এত তাড়াতাড়ি ফেরে না বড় একটা।

শিবুকে এককাপ চা তৈরী করতে বলে বাইরে বারান্দায় এসে বসলো রেখা। হাতে তার আধ বোনা উলের একটা পুলোভার। শীত পড়ার আগেই জামাটা শেষ করে ফেলতে হ'বে। অথচ ঘরের আলোটা হঠাৎ যেন ম্লান হ'য়ে গেল। হাতে পুলোভার আর কাঁটা ধরাই রইলো। রেখা দেখতে লাগলো একটা ছবি; পাঁচবছর আগে ফুরিয়ে যাওয়া ম্লান বিবর্ণ একটা ছবি··একটা গানের জলসা। গান গাইতে এসেছিলো রেখা রায়। আর তাকে বেহালায় অনুসরণ করছিলো এক তরুণ···

—তুমি বুকি আধুনিক গানই পছন্দ করো?

—ভাল লাগে গাইতে।

—ভাল লাগে না মার্গ সঙ্গীত?

চুপ করেছিলো রেখা। সেদিন তাদেরই বাড়ীতে ব'সে বেহালা শোনাচ্ছিলো পীযূষ। হঠাৎ বেহালা থামিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—ভাল লাগে না তোমার মার্গ সঙ্গীত?

চুপ করে রইলো রেখা। প্রকাশ করে বলতে তার লজ্জা হ'য়েছিলো। ওস্তাদি গানের তানের কসরৎ তার কানে সুরের লহরা তোলে না; সে যে আধুনিক গান গেয়েই আনন্দ পায় বেশী·····

—আশ্চর্য!

একটিমাত্র শব্দের মধ্যে দিয়ে বিস্ময়ের প্রকাশ। রেখা হঠাৎ সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লো। উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিলো রেডিয়োর চাবিটা। একটা অত্যন্ত সুরহীন ফাঁকা গলার গুণগুণ যেন কানীর শব্দের মত কর্কশ মনে হচ্ছে। কে যেন আড়াল থেকে ক্রমাগতঃ বলে যাচ্ছে।—আশ্চর্য।

মনের সূক্ষ্মতার একটা রূপ আছে। রুচির মধ্যে দিয়ে চরিত্রের যে প্রকাশ ঘটে, তাকে ঠিক প্রকাশ করে' বলা যায় না। এই মুহূর্তে যদি ফিরে আসে অজিতেশ, সে একাত্ম হ'য়ে যাবে না রেখার চিন্তার সঙ্গে। এই মুহূর্তের নির্জন অন্ধকার আর মাঠ পেরিয়ে গভীর আকাশ তার মনে কোন অনুরণন জাগাবে না। সে হয়ত বলবে—সময়টা একটা স্কাউণ্ড্রেল। আসেনি ক্লাবে, খেলাটাই জমলো না। আর অনন্তনারায়ণ এত বাজে খেলে

না, অজিতেশ বিচলিত হয় খেলা না জমলে। কিন্তু অণুমাত্র সঙ্গীতের প্রকারভেদে, রসাস্বাদনের নিগুঢ়তার অভাবে কেউ যে বিমুখ হ'তে পারে— এ' তার কাছে অবোধ্য। আর একটিমাত্র ধ্বনির মাধ্যমে মনের সমস্ত বিস্ময়কে প্রকাশ করে দিতে পারা—প্রকাশভঙ্গির এতখানি সূক্ষ্মতা তার মধ্যে নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস শব্দ না তুলে বেরিয়ে এলো। অজিতেশ গান বোঝে না। বোঝে না বললে— বলা হয় না; তার মধ্যে গান নেই। রেখাও একসময়ে মার্গ সঙ্গীতের বিচিত্র স্বরপদ্ধতির রূপ বুঝতো না। কিন্তু সে না-বোঝা স্বতন্ত্র। একদিনের কথা মনে পড়ছে। রেখা আপন মনে গান গাচ্ছিলো, অনেক যত্নে শেখা একটি গানের সুরকে সেদিন রূপ দিচ্ছিলো। সেদিনের সন্ধ্যেটাও যেন সেই মুহূর্তে সেই একটি সুরেরই রূপের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করছিলো। হঠাৎ মেঘলা আকাশে ঝাপ ছাড়া একটা বাতাস যেন থেকে থেকে পাখার ঝাপটা দিচ্ছিলো। বাতাসের শব্দটা কেমন করুণ আর্তনাদের মত হয়ে উঠছিলো। সেই অন্ধকার বিচ্ছিন্ন সন্ধ্যায় একা একা বসে রেখা সুরের একটা ছবিকে ধরবার চেষ্টা করছিলো। গানটা—"রোদন ভরা এ বসন্ত··" হঠাৎ সশব্দে ঘরে ঢুকলো অজিতেশ—একা বসে আছো ত'? শালা চ্যাটার্জীটা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো ওদের একটা আড্ডায়···· কথা বলতে বলতে সে গিয়ে রেডিয়োটা খুলে দিলে। কাঁটা ঘুরিয়ে দিলো অন্য। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী সুরের প্রবল একটা চিৎকার উঠলো।

রেখা সেদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো—গান সে আর কখনও গাইবে না।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ে গেল। চোখে পড়ে গেল ক্যালেণ্ডারের তারিখটা। আজ তাদের বিয়ের তারিখ; তাদের জীবনের পাঁচটা বছর পূর্ণ হ'লো। সকালের আলোতে তারিখটা যেন গুনগুন করে গেয়ে উঠলো। রেখা সেই ভোরেই চান সেরে নিলো। শুভ্র ছুঁইয়ের মত স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো তার মন। শিবুকে কিছু ফুল আন্‌তে পাঠিয়ে সে রোদটা ধরিয়ে দিলো। নিজের হাতে চট্ করে ভেজে ফেললো ডিমের ওমলেট্। ডিশে সাজিয়ে দিলো সন্দেশ আর কেক। তারপর ঘুমন্ত অজিতেশকে গিয়ে ধাক্কা দিলো—শুন্‌ছো, ওঠোনা একটু।

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললো অজিতেশ—হ'য়েছে কি? এত ভাকাডাকি করছো কেন?

—আজ যে আমাদের বিয়ের তারিখ। মনে নেই বুঝি।

—না নেই; সকালের ঘুমটাকে এমনি করে নষ্ট দিলে ত'?

অপ্রসন্ন মুখে টুথ্‌ব্রাশটা হাতে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো সে। আর রেখার মনে হ'লো—না ডাকলেই হ'তো। সত্যিই ত, বিয়ের তারিখ নিয়ে এত মাতামাতি করবার কিই বা দরকার ছিল। অজিতেশ যখন চায় না।

বাথরুম থেকে ফিরে প্রতিদিনের মতই খবরের কাগজ হাতে নিয়ে চা খেতে বসলো অজিতেশ। চা খাওয়া হ'লে কামাতে বসলো। তারপর চান সেরে তার ব্রাকফাস্ট এবং আপিস। এর মধ্যে আর সে উচ্চারণ করলো না কোন কথা। জিজ্ঞেস করলো না কেন ফুল আর স্পেশাল মেনু!

রেখার অতি সচেতন স্পর্শকাতর মনে কালো একটা দাগ পড়লো যেন। মনের বীণাতে সকাল থেকেই সুর লেগেছিল। কিন্তু হঠাৎ তার সবকটা তার একসঙ্গে ঢিল হ'য়ে বেসুরো হ'য়ে গেল সব। রেখা একটা উপন্যাস নিয়ে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করলো।

·····একদা একটা মেয়ের জন্মদিনের তারিখ কেমন করে জেনে ফেলেছিলো পীযূষ। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাতো বোন দীপ্তিকে নিয়ে এসে হাজির। হাতে একগোছা টাটকা রজনীগন্ধা।

সেদিন সারাটা বিকেল তাই বেহালার সুরে বড়ীন হয়ে উঠেছিলো—আজও মনে আছে রেখার। কিন্তু সে ছিলো পীযূষ—যার মনের পরতটাই সুরে বাঁধা।

বন্ধুরা হিংসে করেছিলো রেখাকে হয়ত সে এক ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর বউ হ'লো। কিন্তু তারা ত' জানতো না কি প্রচণ্ড বিক্ষোভ তার মনের মধ্যে। তার প্রবল ও গম্ভীর বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি সে। পীযূষও সাহস করে এগিয়ে আসেনি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে। আপন মনের দাহে জ্বলছিলো রেখা। এমন সময় এলো তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু লিপিকা। বললো ফোঁসনে—ভালোই হ'লো রে। আমি খুব খুশী হ'য়েছি।

রেখা জলভরা চোখ তুলতেই সে বলে উঠলো—আমি বলছি তোর ভালো হয়েছে। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে সে বলেছিলো—পীযূষের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুই সুখী হতিস্ না। কোন মেয়েই হ'বে না। ও' একেবারে ব'য়ে গেছে।

—মানে? চমকে উঠেছিলো রেখা।

—মানে নাই বা জানলি? তবে ভুলে যাস তাকে। মনে রাখিস, সে পলাশ ফুল মাত্র।

তবু ত' পলাশের নেশাই তাকে পেয়ে বসেছিলো। পেরেছে কি সে অজিতেশকে নিয়ে সুখী হ'তে। একটি দিনও কি সেই অনুভূতির স্বাদ পেয়েছে—যা দিতে পারতো পীযূষ?

অথচ অজিতেশ সচ্চরিত্র। অতিমাত্রায় সচ্চরিত্র। অর্থের কোন অস্বাচ্ছল্য তার নেই। কিন্তু মন তবু ত' ভরেনি!

দুপুর দুটোয় সময় একেবারে নির্জন চারিদিক। কোন প্রাণচেতনা নেই কোথাও। চারিদিকে ঘন সবুজ মাঠ আর ছবির মত স্থির, শব্দহীন, সারি সারি বাড়ী। রেখা ভীতু খরগোসের মত এদিক ওদিক চেয়ে সন্তর্পণে হাঁটছিলো। রেললাইনের দিক দিয়ে ঘুরে এসে সে একনম্বর ষ্ট্রীটে পৌঁছলো। তারপর সেই বাগান দিয়ে ঘেরা ডি টাইপের বাড়ী। রেখা বাঁশের গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। দরজার সামনে বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে টোকা দিলো দরজায়।

রেখা জানে, এই দুপুরে বাড়ীর পুরুষেরা কেউ থাকে না। থাকে শুধু মেয়েরাই। রেখা দেখতে এসেছে পীযূষের স্ত্রীকে। নিজের পরিচয় লুকিয়ে রেখে সে দেখে যাবে, কেমন সে মেয়ে যাকে নিয়ে পীযূষ সুখী হ'য়েছে।

হাত কাঁপছিল ভয়ে। ভয়ে ভয়ে দরজায় টোকা দিল সে। ভয়, কেননা সে ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী। কোন ইঞ্জিনিয়ার বা অফিসারেরা কখনও ডি টাইপের বাড়ীতে পা দেয় না। ভয়—যদি পীযূষ জানতে পারে যে, রেখা এসেছিলো তার বাড়ীতে?

মৃদু আঘাত করে দাঁড়িয়েছিল সে; আর হঠাৎ চমকে উঠলো। দরজা খুলে তার সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়েছে পীযূষ। পলকে বিমূঢ় হ'য়ে গেল সে।

—কে? চিৎকার করে উঠলো পীযূষ। একটা উচ্চকিত চিৎকার। উত্তেজনার লাল রেখাচ্ছে তার মুখ। পীযূষ চিৎকার করে বলে উঠলো—রেখা?

—আস্তে। ভেতরে আসতে দাও তারপর বলছি।

পীযূষকে পাশ কাটিয়ে রেখা ভেতরে ঢুকলো! বলল—তোমার বউ কোথায় পীযূষদা? আজ অফিস যাওনি যে বড়?

পীযূষ অবাক হ'য়ে তাকালো রেখার দিকে। তারপর বলল—আগে শুনি, তুমি কোথায় থাকো, আর আমার খবর পেলে কি করে?

—আমার স্বামী এখানে চাকরি করে। ইঞ্জিনিয়ার।

—বুঝেছি। পীযূষ বলল।—আর আমাকে কোনদিন দেখে ফেলেছো এখানে। কেমন অদ্ভুত যোগাযোগ। আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এখানে আছো। কেমন আছো রেখা?

—ভাল আছি। তুমি?

রেখার গলা কেঁপে গেল। পীযূষ বলল—আমি এখানে থাকি না। এটা আমার বন্ধুর বাসা। আমার বন্ধুটি আর একজনের সঙ্গে মেস করে রয়েছে। দিন কয়েকের জন্য শুধু বেড়াতে এসেছিলাম। এসেছিলাম বলেই ত' দেখা হ'য়ে গেল। উঃ! কতদিন পরে?

ঘরের এককোণে একটা সতরঞ্চ পাতা। একপাশে খোলা বাক্স'র ওপরে একটা বেহালা পড়ে আছে। টেবিলের গ্লাসে কতকগুলো বাসি ফুল। পীযূষ বিহ্বল চোখে চেয়ে আছে; রেখা শুধু পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

রেখার সব কথা যেন হারিয়ে গেছে; সমস্ত শক্তি। এই পাঁচবছর ধ'রে যার ছবি সে মনের গোপনে এঁকে রেখেছে, আজ সেই মানুষ প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে তার চোখের সামনে। কি বলবে সে?

পীযূষই বলল আগে—তুমি দাঁড়িয়ে আছ রেখা, বোসো। ওই চেয়ারটায় বোসো রেখা।

রেখা বসলো। তারপর বললো—তোমার বউ কোথায় পীযূষদা? তাকে আননি?

পীযূষ হাসল—তেমন কোন মেয়ে এখনও আসেনি জীবনে।

—তার মানে, এখনও বিয়ে করনি। কেন?

—কেন? পীযূষের চোখে জ্বালা ধরলো বোধ হয়। বললে—বছর সাতেক আগে একজনকে কথা দিয়েছিলাম। সেটা বোধ হয়·····অঘ্রাণ মাস, তাই না? একটু একটু শীত পড়ছে সবে। একটু ভিজে ভিজে যেন ঘাস। ট্র্যাণ্ড্ রোডের ধারে বেড়াতে বেড়াতে চলে গিয়েছিলাম। গঙ্গার ধারে একটি মেয়ের চোখের দিকে চেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—সে প্রতিজ্ঞার কথা আমি ভুলিনি রেখা।

রেখা মুখ নিচু করল। অতীতের একটি মধুর স্মৃতিতে বুঝি আচ্ছন্ন হ'য়ে যাচ্ছে তার মন। সে কি একদিন শুধু? মনে পড়ছে চৌরঙ্গীর একটি রেস্টুরেণ্টে এক সন্ধ্যা। রেড রোডের বুকে ট্যাক্সিতে। কিন্তু। কিন্তু সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। পীযূষের মামাতো বোন দীপ্তিদের বাড়ীতে দুপুর। রেখা অস্থির হ'য়ে বলল—সে মেয়ে ত' ভুলে গেছে পীযূষদা।

—মেয়েরা চিরকালই ভোলায়, অথচ নিজেরাই সবার আগে ভোলে। কিন্তু সে যাক্। আজ কতদিন পরে তোমাকে দেখছি; কতবছর পরে! সেই তেমনি শুভ্র, কোমল তুমি····· রেখা তুমি চলে গেলে কেন?

রেখাও ভাবছিল তাই। সেই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল পীযূষকে দিয়ে। না, সে নয়, তারই মায়ের অন্য কোন মেয়ে। প্রতিজ্ঞা করেছিল পীযূষ। সেটাই যেন সেদিন দুজনের কাছে বর্ম হ'য়ে কাজ করেছিল। ভয় আর সংস্কার, অন্যায়বোধ আর আতঙ্ক তার বিরুদ্ধে বর্ম। পীযূষ সে প্রতিজ্ঞা পালন করে চলেছে। কিন্তু করেনি রেখা।

বিয়ের আগের মুহূর্তের কথা মনে পড়ে গেল। কথা পাকা হ'তেই ওরে আত্মগোপন করেছিল সে। পালিয়ে গিয়েছিল মাসীর বাড়ী। বাপের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত সাহস ছিল না? না কি, ইচ্ছেও

ছিল না। ইঞ্জিনিয়ার স্বামী আছে যে, সে কেন ঝুঁকি নেবে? আর পীযূষও……নিশিক। বলেছিল তাকে—একটা পলাশ ফুল। তবু—

দীপ্তিদের বাড়ীর কথাটা মনে পড়ে গেল তার। একটি নির্জন দুপুর। বাড়ীর সকলে গিয়েছিল পিকনিক করতে ডায়মণ্ডহারবারে। চাবি ছিল পীযূষের কাছে। দীপ্তিই তাকে খবর দিয়ে গিয়েছিল আর সেদিনই পীযূষ—তার সব কিছু ··

রেখা মুখ তুলে চাইল। পীযূষও চেয়ে আছে তার চোখের দিকে। ঘৃণা? না, করুণা? না তাও নয়। ভালবাসায় মুগ্ধ তার মুখ। রেখা হাসবার চেষ্টা করল—কি দেখছো পীযূষদা? মেয়েরা বহুরূপী, তাই?

পীযূষও হাসল। কেমন যেন ব্যথাকরুণ হাসি। বললো—একটুও বদলাও নি তুমি। তোমাদের রূপের বদল মনে মনে। কিন্তু বাইরে তুমি সেই রেখাই। মনে আছে রেখা, ইডেন গার্ডেনে একটি সন্ধ্যেতে জলের ধারে আমরা বসেছিলাম?

—আছে বই কি। কি ছেলেমানুষই না তখন ছিলাম!

—তা ছিলে। নইলে অমন চিঠি কেউ লেখে? অমন উচ্ছ্বাস ···শুধু একগুচ্ছ লাল পতুর্লেকার মতন। এক বেলার রৌদ্রেই যার সমাপ্তি।

—কোন্ চিঠি পীযূষদা? রেখার চোখে কৌতূহল জাগল।

পীযূষের মুখে পলকে ভাবান্তর। সে যেন হারিয়ে গেল এ' ঘর থেকে। যেন ফিরে গেল সেই অতীতের দিনগুলিতে।

"পীযূষদা, তিনদিন ধরে তোমার পাত্তা নেই। কি হ'য়েছে বলো ত'? জানো না, তুমি না এলে আমি কষ্ট পাই? জানো না, আমি শুধু তোমারই।"

—শুধু তোমারই·· পীযূষের মুখে পলকে হাসির ছোঁওয়া। বিকেলের হলুদ হাসি। পীযূষ বললো —আর একটা চিঠি,

"এইবার বোধহয় তৃপ্ত হ'য়েছ। পেয়েছ আমার সব কিছু—আমার মন, আমার দেহ, আমার ভালবাসা। এবার কবে এসে বলবে—তুমি আমার ঘরে এসো।"

—কেমন? আমার মুখস্থ রয়েছে অক্ষরগুলো পর্যন্ত। মনে পড়ছে রেখা!

রেখার মুখ তৎক্ষণে বিবর্ণ, নিস্তেজ। মনে পড়েছে বই কি। কিন্তু এ'যে সর্বনাশের সূচনা। ঐ চিঠি যদি এখন অজিতেশের হাতে পড়ে, কি হ'বে। তার সব যাবে হয়ত। এই সুখ, অহঙ্কার, বিলাস সবই। রেখা—যেন একটা অন্ধকারের গহ্বরে পড়ে গেল। সেখান থেকে বললো—সে চিঠি দুটো কোথায় পীযূষদা?

—যত্ন করে রেখেছি। যেমন করে লোকে মণিমাণিক লুকিয়ে রাখে, তেমনই ক'রে। ওইটুকুই ত' আমার সঞ্চয়।

পীযূষ সরে এল কাছে। তার একটি হাত রাখলো রেখার ঘাড়ে। রেখার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বললো—কোন্‌টা বেশী সত্যি রেখা? সেদিনের তুমি, না আজকের তুমি?

রেখার কপালে ঘামের বিন্দু রেখা দিল। আস্তে আস্তে পেছিয়ে গেল সে। পীযূষ কি তবে তাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে? কি পেলে সে খুসী হ'বে, টাকা? না তার দেহ? রেখার ঠোঁটদুটো আস্তে আস্তে দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌লো।

—চিঠি দুটো আমাকে ফেরত দেবে তুমি? ও চিঠি রেখে ত' কোন লাভ নেই তোমার পীযূষদা?

—অসম্ভব রেখা। সে চিঠি আর কোনও দেওয়া নেওয়া যায় না।

রেখা যা' ভেবেছে তাই। পীযূষের ঠোঁটে তুষ্ট হাসি। সে জানে রেখার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। তাই ব্যবহার করতে চায় চিঠি দুটো। রেখা ম্লানস্বরে বললো—তুমি জানো আমি বিবাহিতা, নিরুপায়; তাই বুঝি পলকে গলার স্বর বদলে গেল তার। পীযূষের হাতটাকে মুঠো ক'রে ধরে বললো—সে চিঠি আমার চাইই। বলো, তুমি কি চাও। আমি কাল আর আসতে পারবো না। আজই অবসর আছে। বলো পীযূষদা?

পীযূষের চোখে কিন্তু লোভ নেই। বেদনায় ও করুণায় উজ্জ্বল সে চোখ। কিন্তু আস্তে আস্তে সে উজ্জ্বলতা যেন নিভে গেল। বললো—

—ছিঃ রেখা। তোমাকে ভয় দেখাতে আসিনি আমি। তুমি এখানে আছে, তাই ত জানতাম না। চিঠি কেরত দিতে পারবো না, কেন জানো? এখন সে চিঠি স্মৃতির বুকে গেঁথে রেখে দিয়েছি। আর কাগজ দুটো ত' নেই। অনেকদিন আগে, যেদিন তুমি বিয়ে করলে সেদিনই সব পুড়িয়ে দিয়েছি। মনে হ'য়েছিলো, তুমি আমায় যা দিয়েছ তা মনেই ত' গাঁথা রইলো। কোন দিন হারাবে না, নষ্টও হ'বে না। চিঠির কাগজটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে হ'লো। তাই আগুনে দিলাম।

পীযূষের কথার স্বরে যে বেদনা জমে ছিল, তাতে অভিভূত হ'লো রেখা। তার মুখের ওপর থেকে ভয়ের ছায়া সরে গেল। মনে হ'ল সত্যি কথাই বলছে পীযূষ। আবার উজ্জ্বল, মধুর হয়ে উঠল রেখা পীযূষের মুখে হাত বোলাতে বোলাতে বললো—জানো ত' পীযূষদা, মেয়েরা কত অসহায়! তোমায় শুধু ব্যথাই দিয়েছি আমি। পীযূষদা!

পীযূষ উত্তর দিল না; ফিরে চাইল না রেখার দিকে। তার চোখের দৃষ্টি যেন নির্লিপ্ত, উদাস হ'য়ে গেছে। কে জানে, চিঠির সেই কাগজের মতই আজ অপবিত্র মনে হ'চ্ছে কিনা রেখাকে!

রেখা দুহাতে ধ'রে ফিরিয়ে আনলো পীযূষের মুখ। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো—মনে আছে—দীপ্তিদের বাড়ীতে সেই নির্জন দুপুর? আজও ত' তেমনি নির্জন। শুধু তুমি আর আমি। তুমি চাওনা আমায়?

পীযূষ আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলো। বললো—লোভ দেখিয়োনা রেখা। বাঘকে কখনও রক্ত দেখাতে নেই। তার চেয়ে তুমি ফিরে যাও তোমার স্বামীর কাছে। যাও—।

—তাড়িয়ে দিচ্ছো আমায়? এতই ঘেন্না করো আমাকে?

পীযূষ ভ্রূক্ষেপ করলো না তার কথায়। বললো—ডিনটে বেজে গেছে। আমার বন্ধুটি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারে। তোমায় দেখলে হয়ত চিনে ফেলবে।

পীযূষ বাইরের ঘরজাটা খুলে দিলো।

রেখা একপা' একপা' করে অগ্রসর হ'তে হ'তে বললো—কাল যদি·····

রেখার মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বললো পীযূষ—আজ রাত্রেই আমি চলে যাচ্ছি।

পীযূষ বন্ধ দরজার পেছনে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার নিজের বুকের শব্দকে দরজার ওপর আঘাত মনে করে আবার খুলে দিলো দরজা। না, কেউ নেই। অনেক দূরে পিচের রাস্তার নীলে মিলিয়ে যাচ্ছে একটি দেহের ছায়া। পীযূষ অতি নিঃশব্দে শুধু নিজের মধ্যেই আর্ত হ'য়ে একবার ডেকে উঠ্‌লো —রেখা!

অপরাহ্নের হলুদ রৌদ্রে আকাশটাকে লাল মনে হ'চ্ছিলো রেখার! তার চিৎকার ক'রে ডেকে উঠ্‌তে ইচ্ছে করছিলো। তার মনে হচ্ছিলো—পলাশ ফুলের রঙ্ আগুনের মতই লাল, লাল তবু ত' আগুন নয়।

অস্বীকার

শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

মনে মনে আর একবার কথাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছে বিনতা। কেমন যেন একটা ভয় আর লজ্জা ওকে ঘিরে ধরেছে। সাধারণতঃ সে সন্ধ্যের মধ্যেই বাড়ী ফেরে। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম। অনেক দেরী, অনেক রাত হয়ে গেছে আজ। বাবা, মা নিশ্চয়ই কৈফিয়ৎ তলব করবেন। তখন কী ব'লবে বিনতা? সত্যি কথাটা নিশ্চয়ই সে বলতে পারবে না। মিথ্যের আশ্রয় তাকে নিতেই হবে। তাই বিনতা এখন মনে মনে মিথ্যের জাল বুনছে আর পথ হাঁটছে।···

আর ভাবছে জয়ন্তর কথা। ওর মুখটা এখনও বিনতার সামনে ভেসে উঠছে। ওর বড় বড় টানা দুটো চোখ, ওর কোঁকড়ানো চুল, চওড়া বুক—সব কিছুই যেন সুন্দর।

'চলো না আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক।' জয়ন্ত ব'লেছিলো।

'কোথায়?'

'ইডেন গার্ডেনে।'

'ফিরতে রাত হবে যে! বাবা-মা ভাববেন।' বিনতা ব'লেছিলো।

জয়ন্ত তারপর রাগের ভাণ ক'রে ব'লেছিলো, 'তুমি কিন্তু একেবারে সেকেলে বিনতা।'

'বেশ বেশ চলো, আর রাগ ক'রতে হবে না।'

কথাগুলো ভাবতে কিন্তু এখন ভারী ভালো লাগছে। আপিস ফেরৎ ফেরারীর ভীড়ে ওরা কোনদিন হারিয়ে যায় না। ঠিক খুঁজে যায় করে দু'জন দু'জনকে। ঘি. পি. ওর ঘড়ির নীচে পাঁচটার পর প্রত্যহ তারা পরস্পর মিলিত হয়। দু'চারটে কথা। একটু হাসি। পায়ে পায়ে পথ চলা। ব্যস্। এই পর্যন্ত। তারপর ট্রামে উঠে পড়া। কোন কোন দিন বড় জোর ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখা আর রেষ্টুরেন্টে চপ-কাটলেট খাওয়া। তারপর যথা সময়ে বাড়ী ফিরে যাওয়া। কেউ জানতে পারে না বুঝতে পারে না।

কিন্তু, আজ একেবারে আপিসের ছুটির পর ইডেন গার্ডেনে। কখন বাড়ী ফিরবে কে জানে।···

তারপর ঘাসের ওপর ব'সে দু'জনে গল্প ক'রতে থাকে। এ কথা। সেকথা। অনেক কথা। কথার যেন আর শেষ নেই।

কিন্তু, জয়ন্ত যখন তার ডান হাতখানা চেপে ধ'রে ছিলো, তখন যেন কেমন হ'য়ে গিছলো বিনতা। যেন মনে হ'য়েছিলো সে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে জয়ন্তর মধ্যে। মাথাটা আপনা হ'তে

অমলের কাঁধের ওপর ঝুঁকে প'ড়েছিলো। অমল ব'লেছিলো, 'এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে আর তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে ভালো লাগে না।'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ আমরা পাশাপাশি সকলের সামনে এসে দাঁড়াতে চাই।'

'কী ব'লতে চাও, একটু স্পষ্ট ক'রে বলো বাপু।' বিনতা ব'লেছিলো।

অমল পকেটে হাত ঢুকিয়ে, সিগারেটের প্যাকেট বার ক'রতে ক'রতে ব'লেছিলো, 'এখনও বুঝতে পারলে না ? ঐ জন্যেই বলি, তুমি একেবারে লেবেলে। মানে, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা এবার সেরে ফেলতে চাই।'

'কিন্তু, বাবা-মাকে আমি কিছু ব'লতে পারবো না।'

'সেজন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই—সে ভার আমার।' বুকটান ক'রে অমল কথাটা ব'লেছিলো।···

আশে-পাশের লোক, তাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে ব'লে মনে হয়। কেউ কেউ আবার মুখ টিপে হাসছেও। কিন্তু, বিনতার এখন বেশ লজ্জা ক'রছে।

সিগারেট—ধরাবার জন্যে অমল দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে। তারই আলোয় বিনতা বাঁ হাতের কব্জি উলটে ঘড়িটা দেখে নিলে। দাতটা বাজে। বিনতা এবার অমলের হাতে চাপ দিয়ে ব'লে উঠলো, 'চলো, ওঠা যাক। অনেক রাত হ'ল।'

'চলো।'

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল।

বিনতাকে দেখেই—মা উদ্বেগের সঙ্গে ব'লে উঠলেন, 'কীরে, এতো রাত ?'

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বিনতা ব'ললে, 'আর বলো কেন মা ; কলকাতায় বোমাই বিকেলে একটা না একটা মিছিল লেগে আছে। ট্রাম-বাস বন্ধ। হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদা ষ্টেশনে এসে দেখি গাড়ী চ'লে গেছে। তারপর পরের ট্রেনে—যাও বা উঠলুম, সেটাও আবার কিছুদূর যাবার পর ইলেকট্রিক কারেন্ট ফেল ক'রল।'

'তাই বল্। উঃ! কী ভাবনাটাই না আমাদের হ'য়েছিলো। বিপদের কথাটাই আগে মনে হয়। হাজার হ'ক মায়ের প্রাণ তো! যাই হ'ক, কাপড় পালটে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নে।'

'চলো যাই।'

অন্যদিন অবশ্য বিনতা আপিস থেকে ফিরে ধীরে সুস্থে সব কাজ করে। চা জলখাবার খায়। বাবা-মার সঙ্গে গল্প করে। ছোট ভাই-বোন দুটোর পড়ার খবর নেয়। আজ কিন্তু এসবের কিছুই হ'ল না। মার নির্দেশ মতো তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকতে হ'ল খাবার জন্যে।···

তারপর নিজের ঘরে এসে ঢুকলো বিনতা। কেমন যেন ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। বিছানায় শোয়ামাত্র নিশ্চয়ই সে ঘুমিয়ে প'ড়বে। কিন্তু নাঃ। ঘুম আসে কৈ ? কেবলই অমলের সেই কথাগুলো বার বার ঘুরে

কিরে তার মনের মধ্যে আসছে। ওর হাতের স্পর্শ, যেন এখনও সে তা'র ডান হাতখানায় অনুভব ক'রছে।.....

ও কী? বাবা-মা কী এখনও ঘুমোন নি? পাশের ঘর থেকে ফিস্ ফিস্ কথার আওয়াজ কানে আসছে। কৌতূহল হ'ল বিনতার। ওঁরা নিশ্চয়ই তা'র আজ রাত ক'রে বাড়ী ফেরার ব্যাপার নিয়ে কথা ব'লছেন। বিনতার এখন কিন্তু এই ধারণাই হ'চ্ছে। আড়ি পেতে কথাগুলো শোনার জন্যে, বিনতা এখন উৎগ্রীব। বিছানা থেকে উঠে; ঘরের মেঝের ওপর কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর পা টিপে টিপে বারান্দায় বেরিয়ে এসে, ওঘরের বন্ধ দরজার ওপর কান পেতে রইল।...

'আমার মনে হয় বিনতার এবার বিয়ের ঝোঁক চ'ড়েছে, ওর জন্যে কোন পাত্রের সন্ধান ক'রছ কী?' মার চাপা কণ্ঠস্বর বিনতার কানে ভেসে এলো।

'বিয়ে, কী বলছ তুমি?' বাবা ব'ললেন।

'হ্যাঁ বিয়ে; তুমি দেখছি একেবারে আকাশ থেকে প'ড়লে। মেয়ে আমার চিরকাল আইবুড়ো হ'য়ে থাকবে না কী?'

'সে তো আমিও বুঝি, কিন্তু এদিকের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছো? বিয়ে হ'য়ে শ্বশুর বাড়ী চ'লে গেলে সংসার তো একেবারে অচল। ওর মাইনের টাকাই তো এখন আমাদের ভরসা।'....

বিনতা আর শুনতে পারে না। কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে ওঠে। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে ওঠে। টলতে টলতে নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালো সে। জোর পাওয়ারের আলোটা জেলে দিয়ে, কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেলো। তারপর বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে, নরম গাল দুটোয় আলতোভাবে হাত বুলোতে বুলোতে কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলে বিনতা।.....

নাঃ! তা' সে পারবে না। বাবা-মার মনে কিছুতেই কষ্ট দিতে পারবে না বিনতা। তার চেয়ে সে অস্বীকার করুক, পঁচিশ বছরের যৌবন চল্ চল্ এই বিনতাকে। আর জয়ন্ত? হ্যাঁ—তাকেও।

* * * *

"অবশেষে রবিকাকা রাজী হলেন, বললেন, আচ্ছা লিখব।
রবিকাকার লেখা নিয়ে কাগজ বেরুল, সবুজপত্র। বাংলা দেশে সেই কাগজ দীর্ঘদিন অবশ্য চলেনি। কিন্তু সাহিত্যিকদের কাছে তা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

অন্ধ্রের মন্দির

শ্রীপ্রবোধ কুমার চক্রবর্ত্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

[মামা মামীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছি। সঙ্গে তাঁদের কন্যা স্বাতি। মাদ্রাজ মেল থেকে আমরা ওয়ালটেয়ারে নামলুম সকালে, বিকেলবেলায় দেখলুম ওয়ালটেয়ার শহর। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি একা গিয়েছিলুম সমুদ্রের ধারে, আর স্বাতি স্টেশনে যাবার নাম করে বেরিয়েছিল। কিন্তু সেদিকে সে যায়নি, সেও এসেছিল সমুদ্রের ধারে। দেখা হয়েছিল দুজনের, তার পরে একসঙ্গে হোটেলে ফিরে এসেছিলুম।]

॥ ছয় ॥

হোটেলে ফিরেই স্বাতি টেলিফোন করল স্টেশনে, কিন্তু উত্তর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল: কী বলছেন, আমাদের নামে তিনখানা বার্থ রিজার্ভ করা আছে! কী নাম বলুনতো আর একবার। ঠিক দেখছেন তো! ওয়ালটেয়ার থেকে মাদ্রাজ! মাদ্রাজ কোচে!

তারপরে আমার দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল: চারখানা বার্থ হয় না? তার জন্যে টিকিট কাটতে হবে আজই!

আমি তাকে বাধা দিলুম: রেখে দাও টেলিফোন, কাল স্টেশনে গিয়ে দেখা যাবে।

আমার কথায় স্বাতি টেলিফোন রেখে দিল। বলল: আমাদের রিজার্ভেশন কে করে রেখেছে গোপালদা?

আমি হেসে বললুম: তুমিই তো করলে, মামা তো তোমার ওপরেই ভরসা করে আছেন। স্টেশন থেকে সব দেখে শুনে ফিরলে, এখন জবাবটা ভাল দিতে পারবে।

স্বাতি রাগ করলনা। সে ভাবছিল কিছু, তারপরে বলে উঠল: মনে পড়েছে, এ তোমারই কাজ। তুমিই তো বাবার কাছ থেকে টিকিট কখানা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলে!

বলে হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। আমি অনুসরণ করলুম তাকে।

মামী আশ্চর্য হলেন আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে। কিন্তু কিছু বললেন না। সকলের আগে স্বাতিই কথা বলল: গোপালদা হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, না আর কিছু! আগে জানলে কি আর আমি বেরুতাম!

মামা বললেন: তুমিও বুঝি স্টেশনে গিয়েছিলে?

স্বাতি বলল: আর বল কেন, শুধু শুধু হয়রানি হল।

আমি মামীর দিকে নজর রেখেছিলুম। মনে হল যে তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছেন।

কিন্তু মামা প্রসন্ন মনে বললেন : এই জন্যেই তো এবারে গোপালকে সঙ্গে এনেছি। ও এসব জানে-শোনে কিনা।

বলে হাতের পাইপ ঠোঁটে লাগালেন।

বিছানার একপাশে মামী চুপ করে বসেছিলেন। স্বাতি তাঁর কাছে গিয়ে বলল : কালে সকালে কি আমরা না খেয়ে বেরুব ?

মামী বললেন : তোমরা না খেয়ে বেরুবে কেন ?

আর তুমি !

আমার কথা ছেড়ে দাও।

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে মামা আমাকে বললেন : দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

আমি তাঁর পাশের চেয়ারটায় বসলুম, আর স্বাতি বসল মামীর পাশে। মামা বললেন : একটা কথা এতক্ষণ ভাবছিলুম গোপাল, কিন্তু কোন হদিস পাচ্ছিলুম না। তোমার গাইড বই কী বলে ?

বলে স্বাতির দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল : তোমার প্রশ্নটা বল।

মামা বললেন : ওয়ালটেয়ারের নাম বিশাখপত্তন কেন হল ? পত্তন মানে তো নগর, কিন্তু বিশাখ কার নাম ?

স্বাতি লাফিয়ে উঠল তার গাইড বই দেখবার জন্যে।

আমি বললুম : বিশাখ হল দেব সেনাপতি কার্তিকের নাম। আরও দক্ষিণে তাঁকে সুব্রহ্মণ্য বলে।

বিশাখ কার্তিকের নাম !

গণেশকেও বিশাখ বলে, বলে শিবকেও।

আশ্চর্য ! বাপ ও দুই ছেলের একই নাম !

বলে মামা আবার পাইপে মনোনিবেশ করলেন।

ততক্ষণে স্বাতি তার গাইড বইগুলো তন্ন তন্ন করে দেখে নিয়েছে। কিন্তু কিছু না পেয়ে হতাশভাবে বলল : নামের আবার মানে কী।

আমি বললুম : নামের মানে নেই। মছলিপত্তনে মাছ পাওয়া যায় প্রচুর—

আর বিশাখপত্তনে ?

পুরাকালে বিশাখ স্বামীর মন্দির ছিল সমুদ্রের ধারে, এখন সেই স্থান সমুদ্রগর্ভে।

সত্যি নাকি !

বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : সত্যি মিথ্যা জানিনে, তবে শুনেছি একজনের কাছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে সমুদ্রের ধারে বড় বড় পাথরের স্তূপ দেখে অনেকে সন্দেহ করেন যে সহরের একাংশ ডুবে গেছে কোন প্রাকৃতিক কারণে।

একি বিশ্বাসযোগ্য কথা ?

আমি বললুম : না। তবে ভেবে দেখবার মতো কথা, ভাল ভাবে অনুসন্ধান করলে হয়তো কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়েছিল। তাই বললুম : এই বিরাট দেশের সমুদ্র উপকূলের কথা ভেবে দেখ। অনেক বিখ্যাত তীর্থ ও মন্দির আছে এই উপকূল ঘিরে। কোণারকে, পুরীতে, মহাবলীপুরমে, রামেশ্বর ও কন্যাকুমারীতে, দ্বারকা ও সোমনাথে। নানা দেবতার মন্দির। বিশাখপত্তনে কার্তিকের মন্দির ছিল, তাতে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই।

মামা বললেন : কার্তিকের মন্দিরের কথা কোনখানে শুনিনি।

আমি বললুম : দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে আছে কার্তিকের মন্দির, তারা সুব্রহ্মণ্যম্ বলে। আমাদের দেশে গণেশের মন্দিরও তো নেই, কিন্তু পশ্চিম ভারতে গণেশ পুজোয় নাকি প্রচুর ধুমধাম হয়।

তা বটে।

বলে মামা পাইপ টানতে লাগলেন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : বিজয়ওয়াড়ার কাছে কী দেখবার আছে ?

বললুম : তাহলে তোমার ম্যাপটা একবার বার কর।

স্বাতির কাছেই ছিল একখানা পাটকরা মানচিত্র। সেখানা সে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি সেখানা টেবিলের উপরে মেলে ধরলুম। দক্ষিণ ভারতের একখানা মস্ত ম্যাপ। একসঙ্গে চারটি রাজ্য —অন্ধ্র, মহিশূর, মাদ্রাজ ও কেরালা। অন্ধ্র ও মহিশূর উত্তরে, দক্ষিণে মাদ্রাজ ও কেরালা। সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম এই দেখে যে কন্যাকুমারী এখন কেরালায় নয়, ও ভারসাটা মাদ্রাজ রাজ্যে। অথচ আমাদের প্রায় সকলেরই ধারণা যে কন্যাকুমারী হল কেরালা রাজ্যে। বর্তমান কেরালা একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, এর চেয়ে ছোট রাজ্য ভারতে আর আছে কিনা জানিনে। মাদ্রাজও ছোট রাজ্য, মহিশূরের চেয়েও ছোট। বড় হল অন্ধ্র। ভারতের যে কোন বড় রাজ্যের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়।

মামা যে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, তা আমি বুঝতে পারিনি। বললেন : তুমি কিছু বলবে না নাকি ?

সন্ধ্যস্ত হয়ে আমি বললুম : কী বলব বলুন।

যা দেখছ, তাই বলবে।

আমি বললুম : ম্যাপটি বড় সুন্দর। রাজ্যের জেলাগুলিও খুব পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছে।

মামা বললেন : স্বাতি ওসব কলকাতায় যোগাড় করেছে।

স্বাতি চট করে জিজ্ঞাসা করল : কতগুলো জেলা আছে অন্ধ্রে ?

নিজের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার জন্যে যে সে এই প্রশ্ন করেছিল, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তবু আমি জেলার সংখ্যা গুণে বললুম : গোটা কুড়ি। পুরনো হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বেশিটাই এসেছে অন্ধ্রে, আর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সমস্ত উত্তরাঞ্চল। বলতে গেলে মাদ্রাজ শহর থেকেই মাদ্রাজ রাজ্য শুরু হয়েছে।

স্বাতি উঠে এল ম্যাপটি দেখবার জন্যে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল : ওমা, তাইতো। ভারতের অর্ধেকটাইতো অন্ধ্র।

মামা হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বললেন : সত্যি নাকি !

এরকম কথার উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। তবু বললুম : এত বড় একটা রাজ্যের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অল্প।

স্বাতি বলল : কোন ধারণাই নেই। থাকলে কি আর সমস্ত রাজ্যটা পেরিয়ে যেতাম।

মামা বললেন : তুমি কোন জায়গার নাম বলছিলে ?

বললুম : অমরাবতী আর নাগার্জুনকোণ্ডা।

স্বাতি একেবারে ম্যাপের উপরে ঝুঁকে পড়ল, কিছুক্ষণ পরেই বলল : পেয়েছি অমরাবতী। বিজয়ওয়াড়ার খুব কাছেই তো। কিন্তু—

স্বাতি নিবিষ্টমনে আরও কিছুক্ষণ খুঁজে বলল : নাগার্জুনকোণ্ডাতো পাচ্ছিনে।

আমিও খানিকক্ষণ দেখলুম, তারপরে বললুম : কৃষ্ণা নদীর ধারে খুব প্রাচীন জায়গা। কারও কাছে জেনে নিতে হবে।

মামী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবারে প্রশ্ন করলেন : কোনও তীর্থস্থান বুঝি ?

আমি বললুম : বৌদ্ধতীর্থ, হিন্দুদের নয়। অমরাবতীতে একসময় সাঁচীর চেয়েও বড় স্তূপ ছিল, আর বৌদ্ধ আচার্য নাগার্জুন বাস করতেন নাগার্জুনকোণ্ডায়। কৃষ্ণা নদীর উপরে বাঁধের খবর পড়েছি খবরের কাগজে, সেই ড্যামের নাম হয়েছে নাগার্জুন সাগর।

স্বাতি তার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছিল। আর আমি আবার মন দিলুম মানচিত্রে। এই রাজ্যের বর্তমান রাজধানী হায়দ্রাবাদ। তার অবস্থান রাজ্যের ঠিক মাঝখানে নয়। একেবারে পশ্চিম ঘেঁষে। এই শহরে ট্রেন আসে তিনদিক থেকে। উত্তরে মনমাড় থেকে আসে ছোট লাইনের গাড়ি। মনমাড় বম্বের কাছে। বম্বে থেকে অজন্তা ইলোরার গুহা-মন্দির দেখতে হলে মনমাড় নেমে হায়দ্রাবাদের গাড়ি ধরতে হয়। কয়েকটা ষ্টেশন পরেই ঔরঙ্গাবাদ। ঔরঙ্গাবাদ থেকেই অজন্তা ও ইলোরা দেখতে হয় বাসে বা ট্যাক্সিতে করে। হায়দ্রাবাদেই এই লাইন শেষ হয়ে যায়নি, সোজা দক্ষিণে নেমেছে ব্যাঙ্গালোর, মাইশোর পর্যন্ত। কাজিপেট থেকে বড় লাইনের গাড়ি আসে, কিন্তু কাজিপেটে ট্রেন আসে দুদিক থেকে—দিল্লীর যাত্রী আসে নাগপুর হয়ে, বিজয়ওয়াড়া হয়ে আসে কলকাতা ও মাদ্রাজের যাত্রী। কলকাতা থেকে কোন গাড়ি বদল না করেই হায়দ্রাবাদে আসা যায়।

হায়দ্রাবাদের পরে বড় শহর বিজয়ওয়াড়া। কিন্তু বিজয়ওয়াড়ায় ট্রেন আসে পাঁচ দিক থেকে। পাচদিকেই বড় লাইন। উত্তরে নাগপুর কলকাতা ও মছলিপট্টম থেকে ট্রেন আসে। আর দক্ষিণে যায় গুন্টুর ও মাদ্রাজ। গুন্টুরও একটি বড় জংসন ষ্টেশন। মাদ্রাজ থেকে বড় লাইনের গাড়ি আসে। বিজয়ওয়াড়া থেকেও আসে। ছোট লাইনের গাড়ি এখানে দুরপাল্লার—ব্রোণচেলমের উপর দিয়ে গুন্টাকল যায়। হায়দ্রাবাদ থেকে ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন এই ব্রোণচেলম্ আর গুন্টাকল হয়েই ব্যাঙ্গালোর যায়। গুন্টাকলে বড় লাইনের ট্রেনও আছে, সে ট্রেন বম্বে থেকে মাদ্রাজে যায়। ছোট লাইনের নানা লাইন আছে আরও, কিন্তু সে সব ভাল করে দেখবার অবকাশ পেলুম না। মামা বললেন : তুমি একাই সব দেখবে, না আমাদেরও কিছু বলবে।

তাড়াতাড়ি আমি মুখ তুলে তাকালুম। বললুম : এত বড় একটা রাজ্যে দ্রষ্টব্য স্থান কী আছে, আমরা কিছু জানিনে। কিছু নেই, এ কথা তো ভাবতে পারা যায় না !

বেণ ?

অন্ধ্র খুব প্রাচীন নাম, বেদ পুরাণেও অন্ধ্রের উল্লেখ আছে।

মামা বললেন : বলকি, বৈদিক যুগে তো আর্য সভ্যতা দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হয়নি !

কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি কাহিনী আছে, তাতে আমরা অন্ধ্র কথাটির উল্লেখ দেখি। বিশ্বমিত্র

ঋষি তাঁর কয়েকটি পুত্রের অপত্যদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। সেই পাপে তারা অন্ধ্র প্রভৃতি নীচ জাতিতে পরিণত হয়ে বিন্ধ্য পর্বতের নিকটে বসবাস করতে থাকে।

বাধা দিয়ে মামা বললেন : অন্ধ্র কি নীচ জাতি ছিল ?

এ কথার উত্তর আমার জানা ছিলনা। বললুম : আরও এক জায়গায় আমি এই রকম কথা দেখেছি। পাল রাজাদের তাম্রশাসনেও নাকি এই রকম কথা আছে। তাদের হীন জাতি বলা হয়েছে। কিন্তু এই দুর্নামের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই বলে পণ্ডিতরা মনে করেন যে পাল রাজ্যে যে লোকেরা অন্ধ্র থেকে এসেছিল তাদের বৃত্তি হয়তো হীন ছিল। জীবিকার্জনের জন্য তারা বোধহয় ছোট কাজ করত। পুরণো বাঙলা অভিধানে তাদের অন্ত্যজ জাতি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ব্যাধ বিশেষ।

পুরাণে কিন্তু এসব কথা নেই। বিষ্ণুপুরাণে অন্ধ্রভৃত্য নামে ত্রিশজন রাজার সাড়ে চারশো বছর রাজত্বের কথা আছে। বায়ু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ ও ভাগবতেও আছে এইরকমের কথা। পুরাণে এই রাজাদের অন্ধ্রভৃত্য কেন বলা হয়েছে তার কোন কারণ নেই। তবে ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় যে সাতবাহন রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা অন্ধ্রজাতীয় সিমুক ছিলেন শেষ কাণ্বায়ন রাজ সুশর্মার সামন্ত বা ভৃত্য। এ হল প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকের ঘটনা। সাতবাহন রাজাদেরই অন্ধ্রভৃত্য বলা হয়েছে কিনা তা ভেবে দেখবার বিষয়। আশ্চর্য হয়ে মামা বললেন : পুরাণেও আমাদের ইতিহাসের কথা আছে ?

বললুম : পুরাণতো আমাদের প্রাচীন ইতিহাস। বিদেশীদের মতো রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে কাব্য বলে চিহ্নিত করাতো উচিত নয়। রামায়ণ ও মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলা চলে। আর পুরাণ হল জাতীয় ইতিহাস, আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির দলিল। চেষ্টা করলে পুরাণকে ইতিহাস বলে প্রমাণ করতে পারব। কিন্তু দেশের পণ্ডিতরা সে চেষ্টা করেন নি, দেশের মানুষও পুরাণ পাঠ বর্জন করেছে।

স্বাতি এতক্ষণ সব কথা নীরবে শুনেছে, এইবারে বলল : আমাদের ইতিহাসের শুরু তো মেগাস্থিনিসের সময় থেকে।

আমি বললুম : সে বিদেশীর লেখা ইতিহাস। খ্রীষ্টের জন্মের সোয়া তিনশো বছর আগে এ দেশে এসেছিলেন আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মেগাস্থিনিস। সে সময়ে নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন এ দেশে। বিষ্ণুপুরাণে এই নন্দের উল্লেখ আছে, অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের জন্মের কত বছর পরে নন্দের রাজ্যাভিষেক হবে তারও উল্লেখ আছে। নন্দ যদি ঐতিহাসিক রাজা হন তো পরীক্ষিত কেন নন ! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই বা কেন আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকার করব না !

মামার পাইপ বোধ হয় নিবে গিয়েছিল। চেয়ারের হাতলের উপর বার কয়েক ঠুকে বললেন। ঠিক কথা।

আমি বললুম : পুরাণের কথা থাক, প্রাচীন ইতিহাসেও অন্ধ্র ও অন্ধ্র জাতির কথা নানা জায়গায় আছে। খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই শো বছর আগে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের লেখাবলীতে অন্ধ্রদের নাম আছে। তারা তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য জাতি ছিল।

মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল আনুমানিক ১৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তখন মগধ অধিকার করেন। তাঁরা রাজত্ব করেছিলেন একশো বারো বছর। তারপরে কাণ্বায়ন বংশ। এঁদের

পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্বের পর অন্ধ্রবাসী শিমুক রাজা অধিকার করেছিলেন। কুশানদের সময়ে অন্ধ্র একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য বলে গৌরবান্বিত ছিল।

ঠিক এই সময়ে আমাদের ঘরের দরজার পাশের শব্দ শুনলুম, আর দরজার গায়ে ঠকঠক শব্দ। মামা বললেন: কে?

রামারাও মুখ বাড়াল। সে এই হোটেলের ভৃত্য, দুপুরের খাবার সে আমাদের ঘরে দিয়ে গিয়েছিল। কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মামা বললেন: কী চাই?

অত্যন্ত বিনীত ভাবে সে জিজ্ঞাসা করল: কখন খাবার আনব?

মামা বললেন: খাবার সময় হয়েছে কি?

মামী বললেন: এখুনি খেয়ে নাও, ভোর বেলায় আবার উঠতে হবে তো!

মামা বললে: তারপরে ট্রেন ধরাও আছে।

স্বাতি বলল: খাবার সময়ও হয়েছে।

সুতরাং রামারাওকে খাবার আনার আদেশ দিলুম আমি।

এরপরে অন্ধ্রের ইতিহাস আর জমলনা। আহারের পরে এক ঘরে স্বাতি রইল মামীর সঙ্গে, আর মামার সঙ্গে আমি গেলুম অন্য ঘরে। শান্ত শুদ্ধ পরিবেশ এই হোটেলের। সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত হল না।

॥ সাত ॥

দরজায় করাঘাত শুনে আমাদের ঘুম ভাঙল। ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে মামা বললেন: ডাকাত পড়েছে নাকি!

ঘরে তখনও অন্ধকার আছে বলে আমি প্রথমে বাতি জ্বাললুম তারপরে খুললুম দরজা।

সহাস্যে স্বাতি বলল: কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম তোমাদের।

তারপর ভিতরে এল বলল: বেরবার জন্য মা যে তৈরি হয়ে নিয়েছেন বাবা!

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: রাত দুপুরে কোথায় বেরবে!

স্বাতি হেসে বলল: তুমি তো তাই বলেছিলে।

ঘরের জানালা বন্ধ ছিল বলেই অন্ধকার দেখাচ্ছিল। দরজা খোলবার পরে উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেছে। মামা বললেন: তোমাদের কাণ্ডই আলাদা।

বলে শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন।

মুখহাত ধুয়ে এসে আমি দেখলুম যে মামী তখনও তৈরি হতে পারেন নি। তিনি গেলেন স্নান করতে। ভোর বেলায় চা দেবার কথা বলা ছিল রামারাওকে। সে আমাদের খোঁজ নিতে এসে স্বাতিকে জাগিয়েছে, আর স্বাতি তাকে চায়ের ফরমায়েস দিয়ে আমাদের ডেকে তুলেছে।

বেড-টী নয়। আমাদের ব্রেকফাস্ট এল সাত সকালে। তৎপর ভাবে আমরা খেয়ে নিয়ে বেরবার জন্যে তৈরী হয়ে নিলুম। মামী আগেই বেরিয়েছিলেন। আর ট্যাক্সিও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাই আর আমরা দেরি করলুম না।

ওয়ালটেয়ারের পথঘাট একদিনে আমরা চিনতে পারিনি। কোথা দিয়ে যে শহর থেকে বেরিয়ে সীমাচলমের পথ ধরা গেল, তা বুঝতে পারলুমনা। রেললাইনের পাশ দিয়ে আমরা কলকাতার দিকে চলেছি। ছোট ছোট ঘর বাড়ি মাঠ প্রান্তর ও তাল গাছ দেখছি, নিচু পাহাড়ও দেখছি পথের ডান ধারে। এমনি করে আমাদের মাইল দশেক যেতে হবে, তারপরে উঠতে হবে পাহাড়ের উপরে।

সীমাচলম নামটা ঠিক নয়, পাহাড়ের নাম সিংহাচলম বা সিংহগিরি। বাঙলায় সীমাচলম নামটা এমন প্রচলিত যে সিংহাচলম বললে বেয়াড়া শোনাবে। স্টেশনের নামও সিমহাচলম। এ অঞ্চলের লোক সীমাচলম পাহাড়কে সিংহগিরি বলে, অচল মানে গিরি, কিন্তু সিংহগিরি কেন নাম হল তা জানিনে। সিংহের সঙ্গে কি নৃসিংহ দেবের কোন যোগ আছে! সিংহগিরি পর্বতে তো নৃসিংহদেবেরই মন্দির! নৃসিংহ দেবের জন্যেই বোধহয় সিংহগিরি নাম হয়েছে।

কিছু দিন আগে হলে আমাদের হেঁটে উঠতে হত এই পাহাড়ে। একটা দুটো নয়, এক হাজার সিঁড়ি। মামা মামী হয়তো উঠতেই পারতেন না, কিংবা এই ওঠানামায় সারাদিন লেগে যেত। এখন আর কোন দুর্ভাবনা নেই। ওয়ালটেয়ারের বাস আসছে পাহাড়ের পাদদেশে অবধি, তারপরে দেবস্থানমের বাস মন্দিরে এলাকায় পৌঁছে দেয়। আমাদের গাড়ি সোজা উঠবে পাহাড়ের উপরে।

এক সময় আমরা সীমাচলম বা সিংহাচলম স্টেশন দেখতে পেলুম পথের বাঁ ধারে। একটা পথ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এই বড় রাস্তায় এসেছে। এখান থেকে মন্দিরের দূরত্ব নাকি আড়াই মাইল।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা সিংহাচলম শহরে এসে পৌঁছলুম! গ্রামের মতো ছোট শহর, পাকা ঘর বাড়ি দেখেই শহর বলতে হয়। দোকান-পাট পোস্টঅফিস বাজার সবই আছে। যেখানে বাস এসে দাঁড়ায় সেইখানটাই জমজমাট বেশি। সব মন্দিরের নিকটেই একটি বাজার থাকে। ফলমূল মিষ্টান্ন, পূজার ও ভোগের উপকরণ, যাত্রীদের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ও আহার্য। এরই নাম মন্দিরের বাজার। মন্দিরের আকর্ষণ যত, বাজারের জাঁকও তত। কাশীর বিশ্বনাথগলি শুনেছি মন্দিরের সব চেয়ে ব্যস্ত বাজার। সিংহাচলমের বাজারে সেরকম ব্যস্ততা নেই।

পাহাড়ের নিচে আমরা থামলুম না, উপরে ওঠার পথ ধরে উঠতে লাগলুম। যেকোন পাহাড়ের মতো আঁকা বাঁকা সর্পিল পথ, পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। দু'ধারের গাছপালা অরণ্যের মতো মনে হচ্ছে। এই পথ নাকি সম্প্রতি হয়েছে। সকল যাত্রীকেই এর আগে বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত।

স্বাতি বলল: ওপরে ওঠার সিঁড়ি তো দেখতে পাইনা গোপালদা।

আমি বললুম: ফেরার সময় ঐ সিঁড়ি বেয়ে নামব।

সোৎসাহে স্বাতি বলল: সত্যি!

মামা বললেন: তোমরা কি পায়ে হেঁটে পাহাড় থেকে নামবে!

বললুম: আটশো ফুট মাত্র উঁচু পাহাড়।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: এক লাফেই নামতে পারবে।

এ মামার অপছন্দের কথা, তাই আমি কোন জবাব দিলুম না। কিন্তু স্বাতি হেসে উঠল।

মামা বললেন: তীর্থস্থানগুলো কেন বেয়াড়া জায়গায় হয়েছে, তা বুঝতে পারিনে। কেদার বদরি অমরনাথ—ইচ্ছে থাকলেও এসব জায়গায় যাবার উপায় নেই।

মামী বললেন : কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে।

কী কারণ?

তোমার মতো পাপী এমন কষ্ট স্বীকার করে সেখানে যাবে না।

হো হো করে মামা হাসলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন : আমার মতো পাপী একবার ঘুরে এসেছে। যায়নি তোমার মতো পুণ্যাত্মা।

আমি বললুম : তপস্যায় দেবতার দেখা পাওয়া যায়, দুর্গম তীর্থ-যাত্রাও এক রকমের তপস্যা।

স্বাতি বলল : জীবন যাত্রার নোংরামিতে অপবিত্র হবার সম্ভাবনা নেই।

মামা বললেন : বেশি দিন পবিত্র থাকবে না। এখনই শুনছি যে বদ্রীনাথে বাস যাচ্ছে। বাসের সঙ্গে সঙ্গে এ যুগের সভ্যতা কি পৌঁছবে না—চুরি জোচ্চুরি অনাচার!

আমি বললুম : এ যুগের ভাল কিছু আপনার মনে পড়ছেনা!

এই দুর্নীতির যুগে ভালমন্দের বিচার করবে কে।

আমাদের গাড়ি তখন পাহাড়ের উপর উঠে এসেছে। এক জায়গায় পথের ধার ঘেঁসে দাঁড়াতেই বুঝতে পারলুম যে এইখানেই আমাদের নামতে হবে। এত শীঘ্র যে উপরে পৌঁছে যাব তা আমরা ভাবতে পারিনি। সূর্যের আলো তখন চারি ধারে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু রৌদ্র প্রখর হয়নি। স্বাতি ক্যামেরা এনেছিল সঙ্গে। গাড়ি থেকে নেমেই প্রথমে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল, সূর্য কোন দিকে তা জানা দরকার। তারপরে বলল : এত সকালে এসে আমার বিপদ হল।

মামা বললেন : কেন?

সূর্য কোথায় দেখতে পাচ্ছিনে। বেলা না বাড়লে বোধহয় দেখা যাবে না।

কথাটা মিথ্যা নয়। মনে হল যে আমরা একটি মালভূমির ওপরে দাঁড়িয়ে আছি, তার চারিধারে পাহাড়ে ঘেরা। সেই পাহাড়ের আড়ালে আছে সকালের সূর্য। বেলা না বাড়লে সত্যিই আমরা সূর্য দেখতে পাব না।

ড্রাইভার আমাদের মন্দিরের পথ দেখিয়ে দিল। বাঁ হাতের সেই পাথরে বাঁধানো পথ ধরে আমরা অগ্রসর হলুম।

একতলা ঘর বাড়ি দোকান পাটও কয়েকটি দেখতে পেলুম। কিছু যাত্রীও আছে। কিন্তু পথে ভিড় নেই, কোলাহল কলরব নেই। খানিকটা পথ এগিয়েই একটা তিন মাথায় এসে পৌঁছলুম। একটা পথ সামনে গেছে, আর ডানদিকে ঘুরে গেছে আর একটা পথ। যেপথ সামনে গেছে সেইটেই সঙ্কীর্ণ দেখে মনে হল যে মন্দিরে যেতে আমাদের ডান হাতে ফিরতে হবে। মামা বললেন : কাউকে জিজ্ঞাসা করে নাও।

জিজ্ঞাসা করলুম একজন যাত্রীকে, কিন্তু তিনি আমার প্রশ্ন বুঝলেন না।

বললুম : মন্দির, টেম্পল্?

ভদ্রলোক ডানদিকের পথ দেখিয়ে দিলেন।

আমি সামনের পথটা দেখিয়ে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলুম, এ পথ কোথায় গেছে?

ভদ্রলোক সহজেই আমার প্রশ্ন বুঝলেন, বললেন : মন্দাকিনী।

তারপরে নিজের কাজে এগিয়ে গেলেন।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : গঙ্গাধারা আবার কী ?

আমি এর বৃত্তান্ত শুনেছি শ্রীনিবাসপুর কাছে। বললুম : চলুন না। দেখে যাই একটু এগিয়ে।

মামা বললেন : কত দূর এগোতে হবে তাতো জিজ্ঞাসা ক'রোনি।

আমি বললুম : বেশি দূর নিশ্চয়ই নয়।

পাশে থেকে মামী বলে উঠলেন : স্বাতি কোথায় গেল।

সত্যিই তো, স্বাতি আমাদের সঙ্গে নেই। মামা আমাদের দিকে তাকালেন অসহায় ভাবে। আমি পিছনে যাব না সামনে তা ঠিক করবার আগেই স্বাতির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। সে ডাকল : এই দিকে এস মা, শিবের মন্দির এটা।

রোডের উপরেই ছোট একটি মন্দিরের বারান্দায় তাকে দেখতে পেলুম। মন্দিরে দেখে তার আকর্ষণ বোঝা যায়না। নিতান্তই সাধারণ ব্যবস্থা। শুধু কৌতূহলেই বোধহয় স্বাতি সেখানে গিয়েছিল। মামীও এগিয়ে গেলেন।

মামাকে আমি বললুম : চলুন, আমরাও দেখে আসি।

মামা বললেন : না, যে মন্দির দেখতে আসা, তাই আগে দেখা যাক।

মামীকেও বললেন : বেশি দেরি কোরোনা এখানে, সময়মতো আমাদের ফিরতে হবে।

স্বাতি ফিরে এল আগে, বলল : মন্দির দর্শনের আগে গঙ্গাধারায় স্নান করবার নিয়ম। চল, আমরাও আগে মাথায় একটু জল ছিটিয়ে আসি।

বলে সামনের গলি ধরে এগোতে লাগল।

মামা তাকে বারণ করবার অবসর পেলেন না, আমার দিকে চেয়ে বললেন : মেয়ের কাণ্ড দেখ।

আমি চুপ করে ছিলুম। তাই দেখে বললেন : দাঁড়িয়ে দেখছ কী, দেখ আবার হারিয়ে না যায়।

আমি বললুম : আপনারা তাহলে মন্দিরের দিকেই এগোবেন।

বলে স্বাতির দিকে এগিয়ে গেলুম।

খানিকটা এগিয়েই বুঝতে পারলুম যে গঙ্গাধারা বেশি দূরে নয়। জলের ছাপ দেখতে পাচ্ছি বাঁধানো পথের উপরে। যাত্রীদের পায়ে পায়ে এই জল আসছে। আর পথের দুধারে ভিখারীরা হাত পেতে বসে আছে। স্নান করে যারা ফিরছে, তাদের কাছে আবেদন করছে ভিক্ষার। তীর্থস্থানের এও একটা অলিখিত নিয়ম। দেবতার মন্দিরের সামনে যে ভিখারীরা সারিবদ্ধ হয়ে বসে থাকে, মন্দিরগামী যাত্রীদের তারা বিরক্ত করে না। ছেঁকে ধরে দেবদর্শন করে হৃষ্টচিত্তে ফেরার সময়। মন যার পবিত্র, হৃদয় তার উদার হয় দেবতার দর্শন পেয়ে। সেই প্রসন্নতায় ত্যাগের আদর্শকে করে শ্রদ্ধা, যথাশক্তি দান করে। ভিখারীরা আমার কাছে তাই পয়সা চাইল না।

আমি যে স্বাতিকে অনুসরণ করছি, পিছন দিকে না দেখেও সে অনুভব করেছিল। তাই চারি দিকের সৌন্দর্য্য দেখার ভান করে সে থমকে দাঁড়াল। আমি পাশে পৌঁছতেই বলে উঠল : একি, তুমি একা এলে !

বললুম : তুমি হারিয়ে যাবে ভয়ে মামা আমাকে পাঠালেন।

এমনি দিনের আলোয় ! রাতের অন্ধকারে তো কাল হারাইনি !

হেসে বললুম : মেয়ে হারিয়ে যাবার ভয় সব বাপ-মায়ের।

স্বাতি নিশ্চয়ই একটা জবাব দিত, কিন্তু তার সুযোগ পেলনা। আমরা গঙ্গাধারায় পৌঁছে গিয়েছিলুম। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। পাকা ঘর আছে কয়েকটা। তার কোনটায় পুরুষেরা মাথা মুড়োচ্ছে, আর কোনটায় মেয়েরা ভিজে কাপড় বদলাচ্ছে। জল ঝরছে ঝর্ণার, তার চারিধার পাথরে বাঁধানো। যাত্রীরা সেইখানেই স্নান করছে।

এইসব ঝর্ণার জল বড় পবিত্র। নানারকমের গুণ থাকে জলে। এক এক জায়গায় এক এক রকমের গুণ। কোন জায়গার জলে চর্মরোগ সারে, পেটের রোগ সারে অন্য জায়গার জল খেলে। এসব ঝর্ণার জল তো বরফ গলা জল নয়, বৃষ্টির জলও নয়। পাহাড়ের কোন নিভৃত স্থান থেকে এই জল আসছে, তার উৎস আমরা দেখতে পাইনি। স্বাতি আমাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করল: কোথা থেকে এই জল আসছে গোপালদা!

বললুম: চল, আর একটু উপরে উঠে দেখি।

উঠবার সিঁড়ি আছে। সেখানে আমরা উঠে গেলুম। মনে হল যে পাহাড়ের চূড়োতেই আমরা পৌঁছে গেছি। কিন্তু পাহাড় তো একটা নয়, চারিধারে তাকিয়ে কিছুই ভাল বোঝা গেল না। আমরা নেমে এলুম।

স্বাতি বলল: কাছে একটা ঝর্ণা না থাকলে যোগহয় তীর্থস্থান হয় না।

বললুম: তা না থাকলে একটা পুকুর খুঁড়তে হত।

হঠাৎ আমার শ্রীনিবাসুলুর একটা কথা মনে পড়ল। এই ঝর্ণার জলে নাকি বারো মাস ধানের চাষ হয়। নৃসিংহদেবের ভোগের জন্য রোজ ধান কাটা হয়, বাসি ধানের চালে ভোগ হয় না এই দেবতার। স্বাতিকে আমি এই গল্প বললুম, কিন্তু সে বিশ্বাস করল না। বলল: এ একেবারে অসম্ভব কথা।

আমি বললুম: বারমেসে শাকসব্জি তো অনেক আছে, এ হয়তো বারোমেসে ধান।

স্বাতি বলল: কিন্তু ধানের চাষ তো কোথাও দেখিনি।

পথে আম-কাঁঠালের গাছ দেখেছি, দেখেছি তাল ও খেজুরের গাছ। পাহাড়ের গায়ে আনারসের চাষও দেখেছি। তাই স্বাতির কথার প্রতিবাদ করতে পারলুম না।

ফেরার পথে দু'একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম এ কথা। কিন্তু আমার প্রশ্ন তাঁরা বুঝতেই পারলেন না। দেরি না করে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলুম।

[ক্রমশঃ]

• • • •

"আমি ভাল বেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে,
আমি কামনা করেছি মুক্তিকে।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রায় একশ' বছর আগে কলকাতা পুলিশের স্বনামখ্যাত দারোগা গিরিনাথ মুখোপাধ্যায় বহু তদন্তে অনন্যসাধারণ কর্মকুশলতার পরিচয় দেন। এবং সেই সব ঘটনা গুলি পরে আত্ম-কাহিনীরূপে লিখে 'দারোগার দপ্তর' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই সিরিজের প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১২৯৮ সালে। বাংলা রহস্য রচনার ক্ষেত্রে দারোগার দপ্তর অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেছে। হল পনেরো বছর ধরে বইগুলি বেরিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সব চটি বইগুলি আজ আর পাওয়া যায় না। আমরা অনেক অনুসন্ধানে কয়েকটি কাহিনী উদ্ধার করেছি। সে গুলি পরপর পরিবেশন করব আধুনিক কালের উপযোগী ধারায় লেখকের বক্তব্য ও বিন্যাস অক্ষুণ্ণ রেখে। এই কাহিনীগুলির মধ্যে পাঠক পাবেন তখনকার দিনের এক সুদক্ষ ডিটেকটিভ-এর অসামান্য তদন্ত পদ্ধতি, চিন্তাশক্তি, যুক্তি-মীমাংসা ও জেরার কৌশল, আর সেই সঙ্গে তৎকালীন সমাজের ছবি।

দারোগার দপ্তর

১৩০৫ সালের একটি নারীহত্যা

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একদিন সকালে এক ব্যক্তি শহরতলীর এক থানায় এসে উপস্থিত হল। সে যে এজহার দিল তার মর্ম এই রকম :

"আমার নাম শম্ভু। আমি জাতিতে গুড়িয়া, আমি বিজয়বাবুর বাগানের মালী, দিনে এবং রাতে বাগানেই থাকি, কিন্তু কাল রাতে বাগানে ছিলুম না। আমার দেশের একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিছলুম, সেখানে যাবার পর খুব বৃষ্টি হয় বলে আমি আর বাগানে ফিরতে পারিনি। যাবার সময় বাগানের গেট-এ তালা লাগিয়ে গিছলুম। আজ ভোরবেলা ফিরে এসে দেখলুম, গেটের সেই তালা খোলা। বাগানের মধ্যে ঢুকে যে দোতলা পাকাবাড়ী আছে তার কাছে গেলুম। দেখলুম তার সদর দরজার চাবীও খোলা। আমি যখন বাগান থেকে গেছিলুম তখন নিজের হাতে দুই দরজার তালা বন্ধ করেছিলুম আর দুটো চাবীই সঙ্গে করে নিয়ে গিছলুম। তালা খোলা দেখে খুবই অবাক হলুম। ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রথমে নীচের তলার ঘরগুলো দেখলুম। কিন্তু কোন জিনিষ চুরি গেছে বলে মনে হল না। তখন ওপরে উঠলুম। আমার মনিব বিজয়বাবু বাগানে এসে যেখানে বসে আমোদ আহ্লাদ গান বাজনা করতেন প্রথমে সেই ঘরে গেলুম। ঘরের অবস্থা দেখে বোধ হল, ঐ ঘরে কেউ এসেছিল, নাচগান হয়েছিল, মদ পানও চলেছিল। কারণ, দেখলুম, দু'তিনটে মদের বোতল আর গ্লাস পড়ে রয়েছে, বাজনাগুলো যেখানে থাকে সেখানে নেই, বসবার বিছানায় রয়েছে। স্ত্রীলোকেরা নাচবার সময় যে ঘুঙুর পরে তাও সেখানে পড়ে রয়েছে। এইসব দেখে আমার বোধ হল, আমার অনুপস্থিতিতে আমার মনিব বাগানে এসেছিলেন, নাচগান আমোদ আহ্লাদ

করবার পর চলে গেছেন। মনে মনে এই রকম ভেবে আমি পাশের ঘরে গেলুম। সেখানে গিয়ে যা দেখলুম তা বলতেও আমার ভয় হচ্ছে, দেখলুম, একটি স্ত্রীলোক উলঙ্গ অবস্থায় সেই ঘরের মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মনে হল, সে মরে গেছে। তাই না দেখে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম আর ছুটতে ছুটতে আমার মনিবের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। সহরতলীর পারেই সহর যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেই মুখেই তাঁর বাড়ী! আমি তাঁকে যা দেখেছি সমস্ত বললুম। শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আমি তো কাল বাগানে যাইনি'। তারপর গাড়ী বার করতে বলে তিনি বেরুবার জন্যে তৈরী হলেন আর অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাকে নিয়ে বাগানে এলেন। বাড়ী থেকে আরও দু'তিনজন তাঁর সঙ্গে এলো। ঘরের অবস্থা আর লাশ দেখে তাঁরা খুব চিন্তিত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন, আর আমার মনিব, আমি সত্য রাত্রে বাগানে পরহাজির ছিলুম বলে, আমাকে খুব গাল দিলেন। বললেন, যাও এখনি থানায় গিয়ে জানিয়ে এসো। যতক্ষণ না পুলিশ আসে ততক্ষণ আমাদের চলে যাওয়া ঠিক হবে না'। তাঁর হুকুম মত আমি থানায় এসেছি আর এই খবর দিচ্ছি। আমি কারুর বিরুদ্ধে নালিশ করছি না বা কাউকে সন্দেহ করছি না, কারণ রাতের বেলায় আমি নিজেই সেখানে ছিলুম না। এই আমার এজাহার।"

কেসটির ভার পড়েছিল আমার উপর। খবর পাওয়ামাত্র কলকাতা থেকে সেই থানায় পৌঁছে প্রথমে শম্ভু মালী এজাহারটি পড়ে নিলুম। তারপর বিজয়বাবুর বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমার আগে সেই সহরতলীর থানার ইনস্পেক্টার বাগানে গিছল। সেখানে গিয়ে ইন্সপেক্টারের সাহায্যে প্রথমে মৃতদেহটি দেখলুম। স্ত্রীলোকটির শরীর একবারে উলঙ্গ। শাড়ী, জামা, সায়া, কিছু নেই, গায়ে গহনাও একটিও নেই। স্ত্রীলোকটির বয়স হবে বছর পঁচিশ। সৌষ্ঠবী এবং দেখতে অতিশয় সুশ্রী। পায়ে 'মেহির' চিহ্ন। ঐচিহ্ন পুরনো নয়, বোধ হয় খুন হবার দিনই সে পায়ে 'মেদি' মেখেছিল। সে যে গয়না পরত তা তার কান ও নাকের ছাঁদা আর হাত এবং গলা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়। তার শরীরের কোন জায়গায় জখমির কোন চিহ্ন নেই, শুধু গলায় চার পাশে একটা কালশিটার দাগ দেখা গেল। বুঝলুম, গলায় ফাঁস লাগিয়ে গলা চেপে শ্বাসরোধ করে তাকে মারা হয়েছে, তারপর তার সমস্ত গয়না গাঁটি এমন কি পরনের কাপড় চোপড় গুলোও চুরী করা হয়েছে। কাপড় চোপড় বোধ হয় বেশ দামী ছিল, নইলে এরকম উলঙ্গ করার কোন মানে হয় না। তারপর পাশের ঘরে ঢুকলুম। বিজয়বাবু আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। সেঘরে প্রকাণ্ড ফরাস পাতা। গোটা তিনেক তাকিয়া এধারে ওধারে ছড়িয়ে রয়েছে। ফরাসের ওপর তিন চারটে বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে, তিন চারটে কাঁচের গেলাসও রয়েছে। বোধ হয় ফরাসের উপর বসেই খাওয়া দাওয়া হয়েছিল। এধারে ওধারে এঁটো কাঁটা মাংসের হাড়। মালীটার এজাহার যথাযথ। বোঝা গেল, সে ঘরে নাচগান হয়েছে, মদ্য পান চলেছে, তারপর এই ভয়ানক খুন হয়েছে। ঘরের মধ্যে একটি আলমারি ছিল। বিজয়বাবুর কাছ থেকে চাবী নিয়ে সেই আলমারি খুললুম। ভিতরে অনেক দামী কাপড় চোপড়, রুপোর বাসন। কিন্তু সেসব যেমন ছিল তেমনি আছে, ঘরের কোন জিনিষই খোয়া যায়নি। কিছুক্ষণ পরে আমরা বাইরে এলুম এবং আমি তালা দুটি পরীক্ষা করলুম। দেখলুম, তালা দুটো একটুও ভাঙা হয়নি, চাবী দিয়ে খোলা হয়েছে। যাই হোক, বাইরে এসে বসে আমরা কোন্ পথে তদন্ত চালাবো তারই পরামর্শ করতে লাগলুম। আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় আমাদের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা দরকার বলে মনে হল। (১) ঐ স্ত্রীলোকটি যেরকম সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে তাতে সে যে কোন বড় ঘরের মহিলা নয়, তা কে বলতে পারে। (২) যদি তাই হয়, তাহলে স্ত্রীলোকটি বিজয়বাবুর পরিবারের মধ্যে বা তাঁর আত্মীয় স্বজনের

পরিবারের মধ্যে কেউ হওয়া সম্ভব নয় কি ? বিজয়বাবুর দ্বারা বা তাঁর জানিত যদি এই খুন হয়ে থাকে তাহলে এ খুনের উদ্দেশ্য চুরী নয়, ঐ স্ত্রীলোকটির চরিত্র বা সেই ধরনের অন্য কোন বিষয়ই এই খুনের হেতু। (৩) মৃতদেহটি কার। (৪) কার দ্বারা এই খুন হওয়া সম্ভব। (৫) বিজয়বাবুর দ্বারা বা তাঁর জানিত যদি এই খুন হয়ে থাকে তাহলে খুন করার পর দেহটাকে উলঙ্গ করে রাখবার কারণ কি ? সময় সময় ভদ্রলোকের দ্বারা তাদের ঘরের মহিলাকে খুন করা হয় বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত মৃতদেহ একেবারে উলঙ্গ করে ফেলে রেখে যেতে কোন ভদ্রলোককে দেখিনি বা শুনিনি। এরকম অবস্থায় ঐ কাজ বিজয়বাবুর দ্বারা বা তাঁর জানিত হয়েছে তা অনুমান করি কেমন করে ? (৬) বিজয়বাবু বা তাঁর জানিত কেউ যদি এ কাজ না করে থাকে তাহলে আর যে এ কাজ করতে পারে ? তাঁর বিনা অনুমতিতে কে তাঁর বাগানে এসে এরকম একটা ভয়ানক কাজ করতে সাহসী হতে পারে ? আর যদিই বা তিনি বা তাঁর জানিত কেউ এ কাজ করে থাকেন, তাহলে তিনি নিজের বাগানে খুন করে লাশ ঐভাবে বাগানবাড়ীর মধ্যেই ফেলে রেখে যেতে কি সাহসী হবেন ? (৭) স্ত্রীলোকটি বেশ্যাও তো হতে পারে। শেষর মেয়েরা পায়ে আলতা পরে, মেহেদি পাতার রং ব্যবহার করতে কোন হিন্দুঘরের মেয়েকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না। ঐ রং বেশ্যারাই ব্যবহার করে আর করে মুসলমান মেয়েরা। এরকম অবস্থায় স্ত্রীলোকটি বারবনিতাও হতে পারে, আবার মুসলমান রমণীও হতে পারে। (৮) যদি স্ত্রীলোকটি মুসলমান হয় তাহলে গয়না চুরীর জন্যেই এই খুন হয়নি, হয়েছে তার চরিত্রের জন্যে। কিন্তু তাহলেই বা তাকে ঐভাবে বিবস্ত্রা করে রাখা হল কেন ? (৯) যদি মেহটা কোন বেশ্যার হয় তাহলে এই খুনের উদ্দেশ্য চুরী—সেটাই বেশী সম্ভব এবং তাকে উলঙ্গ করে রেখে যাওয়ার মধ্যেও ওই চুরীর উদ্দেশ্য বর্তমান, অর্থাৎ তার পরনের সাড়ী, ব্লাউজ পেটিকোট বোধ করি দামী ছিল, সেগুলো নেবার লোভ খুনেরা সম্বরণ করতে পারেনি। (১০) চোরের দ্বারাই যদি এ কাজ হয়ে থাকে তাহলে তারা কোন্ সাহসে স্ত্রীলোকটিকে এই অপরিচিত বাগানের মধ্যে আনতে সাহসী হবে এবং কোন্ সাহসের ওপর নির্ভর করে তারা মৃতদেহটাকে ঐভাবে ফেলে রেখে চলে যাবে। বিশেষত, যেরকম আমোদ আহ্লাদ নাচ গান এবং মদ্যপান হয়েছে তা কি চোরের দ্বারা সম্ভব ? কিম্বা হয়ত হতে পারে। আধুনিক চোরেরা হয়ত আজকাল এই রকমই হয়েছে। কিন্তু তাহলেও বাগানের দরওয়ানের সঙ্গে যোগ সাজস না করে কোন চোর বা চোরেরা যে এরকম কাজ করতে সাহসী হবে তা আমার বোধ হয় না। (১১) যদি চোরেরাই এই কাজ করে থাকে এবং বাগানের দরওয়ানের সঙ্গে তাদের যোগ থাকে তাহলে শম্ভুর কথা আমরা কি করে বিশ্বাস করি ? শম্ভু হয়ত অনেক কিছুই জানে, তবে বলছেনা। (১২) শম্ভু যদি চাবী দিয়ে চোরেদের বাগান আর বাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে থাকে তাহলে সে কতটা জানে ? বাগানের মধ্যে চুরী বা খুন হবে, একথা সহজে জানলে সে বোধ হয় কখনই তাদের ঢুকতে দিতনা। চোরেরা সম্ভবত ভদ্রবেশে ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে এখানে এসেছিল, আর শম্ভুকে বলেছিল তারা বাগানের মধ্যে কিছুক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করে চলে যাবে ; সেজন্যে তারা হয়ত শম্ভুকে কিছু টাকা দিয়ে বাগান খুলে দিতে রাজী করিয়েছিল। তারপর আমোদ আহ্লাদ শেষ করে স্ত্রীলোকটাকে মেরে তারা চলে যায়। পরে শম্ভু ব্যাপারটা জেনে খুব ভয় পেয়ে মনিবের বাড়ী গিয়ে জানায়, কিন্তু সে যে কাউকে বাগানে ঢুকতে দিয়েছিল তা বেমালুম চেপে যায়। আমাদের এই অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে শম্ভু যে পর্যন্ত সব কথা কবুল না করবে সে পর্যন্ত এই রহস্যের কিনারা হওয়া সম্ভব নয়। অতএব শম্ভুকে জেরা করা দরকার।

বিজয়বাবুকে বাড়ীর ভিতর যেতে বললুম। কারণ তাঁর সামনে শম্ভুকে জেরা করার অসুবিধা

আছে। বিজয়বাবু ভিতরে গেলে শম্ভুকে ডেকে পাঠালুম এবং সে এসে দাঁড়ালে তাকে প্রশ্ন করতে লাগলুম।

আমি। তুমি বিজয় বাবুর মালী না দরওয়ান?

শম্ভু। দু'কাজই করে থাকি।

আমি। দু'কাজ কেমন করে কর?

শম্ভু। দিনের বেলায় মালীর কাজ করি। তাছাড়া বাড়ী পাহারা দিই। আমার থাকবার ঘর বাগানের গেটের কাছে। সেখানে থাকি। বাগানের বাড়ীর দরজার চাবী আমার কাছে থাকে। অন্য চাবীও থাকে।

আমি। তুমি ছাড়া আর ক'জন মালী আছে?

শম্ভু। আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

আমি। এত বড় বাগান তুমি একলা পরিষ্কার রাখ কি করে?

শম্ভু। দরকার হলে ঠিকে লোক লাগানো হয়। তারা দিনের বেলায় কাজ করে সন্ধ্যের আগে চলে যায়।

আমি। কাল ক'জন ঠিকে লোক বাগানে কাজ করেছিল?

শম্ভু। কাল কেউ কাজ করেনি। গত এক মাসের মধ্যে কোন ঠিকে লোক লাগানো হয়নি।

আমি। তুমি তো মালী আর দরওয়ান, দুটো 'কাজ' একাই কর, কিন্তু মাইনে পাও কত?

শম্ভু। পাঁচ টাকা।

আমি। খোরাক পোষাক?

শম্ভু। না। কেবলমাত্র ওই পাঁচ টাকা।

আমি। মাত্র পাঁচটা টাকার জন্যে এই জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাক কেন? সহরের মধ্যে কারুর বাড়ি কাজ করলে অন্তত আট দশ টাকা তো অনায়াসেই পেতে?

শম্ভু। বাগানে থাকলে খোরাকী-খরচ অনেকটা কম হয় বলেই আমরা বাগানে থাকতে ভালবাসি।

আমি। তাছাড়া বকশিসও তো পাও, অন্যান্য বাবুরা এলে যাবার সময় তাদের কাছ থেকে মোটা বকশিস পাও, তাই না?

শম্ভু। কেউ কেউ কিছু কিছু দিয়ে যান, যা পাই তা আমার মনিব জানতে পারেন। তাঁর সাক্ষাতেই পাই।

আমি। তাঁর অসাক্ষাতে?

শম্ভু। তাঁর অসাক্ষাতে আর কী করে পাব।

আমি। তাঁর অসাক্ষাতে যারা বাগানে এসে আমোদ আহ্লাদ করে যায় তারা যাবার সময় বকশিস বলে বেশ মোটা রকম দিয়ে যায় না কি?

শম্ভু। বাবুর সঙ্গে না এলে আমি কাউকে বাগানে ঢুকতে দি না।

আমি। তোমার মনিব রোজ বাগানে আসেন না কি?

শম্ভু। না।

আমি। কোন্ দিন আসেন?

শম্ভু। শনি রবিবার প্রায় আসেন।

আমি। একা আসেন, না, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আসেন?

শম্ভু। কখনো একা আসেন, কখনো বা বন্ধুদের নিয়ে আসেন।

আমি। মেয়েরা আসেন না?

শম্ভু। কখনো কখনো আসেন।

আমি। তারা কারা?

শম্ভু। তাঁর বাড়ীর মেয়েছেলেরা, তাঁর স্ত্রী, মেয়ে বা অন্য কোন বাড়ীর মেয়েলোক।

আমি। তুমি তোমার মনিবের বাড়ির সব স্ত্রীলোকদের চেনো?

শম্ভু। চিনি।

আমি। কেমন করে চিনলে?

শম্ভু। আমি বাগানের তরিতরকারী নিয়ে প্রায় রোজই বাবুর বাড়ী যাই। অন্দর মহলে যেতে আমার কোন বাধা নেই। তাই সকলকেই আমি চিনি।

আমি। যে স্ত্রীলোকটি ঐ ঘরের মধ্যে খুন হ'য়ে পড়ে আছে, সে তোমার বাবুর কে হয়?

শম্ভু। সে আমার বাবুর বাড়ীর কোন স্ত্রীলোক নয়।

আমি। তুমি মিছে কথা বলছ, তোমার বাবু যে একথা আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন।

শম্ভু। তাঁর বাড়ীর কেউ নয়, তিনি স্বীকার করবেন কেমন করে?

আমি। আর যদি স্বীকার করে থাকেন?

শম্ভু। তাহলে হয় মিথ্যে বলেছেন, নাহয়, এমন কোন স্ত্রীলোক আজকালের মধ্যে তাঁর বাড়ী এসেছিল যাকে আমি দেখিনি, আর ঐ মরা মেয়েলোকটি তাহলে বোধ হয় সেই হবে।

আমি। তোমার বাবুর বাড়ীর মেয়েরা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোক এখানে কখনো আসে কি?

শম্ভু। না।

আমি। কোন বেশ্যা?

শম্ভু। কোন বেশ্যাকে এখানে আসতে দেখিনি।

আমি। কোন নাচওয়ালী?

শম্ভু। না।

আমি। তাহলে ওই যে সব বাজনা রয়েছে ও সব বাজায় কে?

শম্ভু। বাবুরা বাজান।

আমি। ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচে কে?

শম্ভু। তা জানি না।

আমি। তুমি মিছে কথা বলছ। এখানে সেদিন এক বাইজি এসে নাচ গান করেছিল সে মজলিসে আমিও ছিলুম, তুমি আমায় দেখনি?

(পাঠকদের বলে রাখি, ইতিপূর্বে সে বাগানে আমি কোনদিনই যাই নি।)

শম্ভু। ঠিক মনে করতে পারছি না।

আমি। বাইজির নাচ হয়েছিল। মনে আছে তো?

শম্ভু। তা আছে।

আমি। তবে তুমি একটু আগে কেমন করে বললে যে অন্য কোন স্ত্রীলোক বাগানে আসেনি?

শম্ভু। আমি বলেছিলুম, কোন বেশ্যা আসেনি।

আমি। তাহলে বাইজি যে এসেছিল?

শম্ভু। বাইজি তো আর বেশ্যা নয়।

আমি। তা ঠিক। বাইজি তো বেশ্যা না। যাই হোক, শোন শম্ভু, আমি তোমায় আরও কয়েকটা প্রশ্ন করব, যদি সত্যি উত্তর না দাও তো বিপদে পড়বে। বাগানের চাবী তোমার কাছে থাকে। সেই চাবী খুলে বাগানে লোক ঢুকল, একটি স্ত্রীলোক খুন হল। তোমার ওপরেই সবচেয়ে বেশি সন্দেহ। পুলিশ সহজে ছাড়বে না। তোমাকে চালান দেবে। আর হয়ত তোমার খুনের দায়ে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হবে। কিন্তু তুমি যদি সত্যি কথা বল, তাহলে যারা খুনে তাদের আমরা ধরবার চেষ্টা করব আর তোমার কোন ভয় থাকবে না। হয়ত খুন তুমি করনি। কিন্তু আসল খুনীদের ধরতে না পারলে তোমারই সাজা হবে।

আমার কথা শুনে শম্ভু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—হুজুর, দেখবেন যারা না পড়ি। যা জিজ্ঞাসা করবেন তার সত্যি জবাব দেব।

আমি। কাল রাত্রে তুমি তো বাগানেই ছিলে?

শম্ভু। ছিলুম।

আমি। এখন বল, কাল রাত্রে কারা বাগানে এসেছিল?

শম্ভু। আমি তাদের চিনি না। আগে কখনো দেখিনি।

আমি। তাহলে তাদের বাগানে ঢুকতে দিলে কেন?

শম্ভু। কুবুদ্ধি, টাকার লোভ হুজুর।

আমি। ক'টাকা পেয়েছিলে?

শম্ভু। পাঁচ টাকা।

আমি। এত অল্প টাকায় তুমি এরকম কাজ করতে মত দিলে কি করে?

শম্ভু। কি কাজ?

আমি। খুন!

শম্ভু। দোহাই ধর্মাবতার! আমি খুনের কিছুই জানি না। আমি যা জানি, সবই বলছি। একটুও মিথ্যে বলব না। কাল সন্ধ্যের পর আমি বাগানের গেটের কাছে বসে আছি এমন সময় একটা গাড়ী এসে বাগানের দরজায় থামল। গাড়ীর মধ্যে তিনটি পুরুষ আর একটি স্ত্রীলোক ছিল। একজন পুরুষ গাড়ি থেকে নেমে আমার কাছে এসে বললে, 'দারওয়ান, আজ তোমার মনিব এ-বাগানে আসবেন কি?' আমি বললুম, 'না, শনি রবিবার ছাড়া তিনি আসেন না।' এই শুনে সেই লোকটি বললে 'তাহলে তুমি আমাদের একটি অনুরোধ রাখবে কি। সেজন্যে আমরা তোমাকে দু'টি টাকা দিচ্ছি।' আমি বললুম, 'কি করতে হবে?' লোকটি বললে, 'আমোদ আহ্লাদ করার জন্যে একটা বাগান ঠিক করেছিলুম, কিন্তু সেই বাগানে হঠাৎ মালিকের অনেক আত্মীয় বন্ধু এসে পড়ায় সেখানে ঢুকতে পারিনি। তাই অন্য বাগান খুঁজছি।' আমি বললুম, 'কতক্ষণ আপনারা বাগানে থাকবেন?' লোকটি বললে, 'দু তিন ঘণ্টার বেশি নয়। তারপরেই

আমরা চলে যাব।' আমি তখন বললুম, 'দু'টাকায় হবে না।' লোকটি বললে, 'ক'টাকা চাও।' বললুম 'অন্তত দশটাকা।' উত্তরে লোকটি বললে, 'দশটাকা দিতে পারবো না। নিতান্ত পক্ষে পাঁচ টাকা দিতে পারি।' আমি রাজী হলুম। মনে ভাবলুম, বাবু তো আজ আর আসছেন না। তবে পাঁচ পাঁচটা টাকা ছাড়ি কেন? এতে তো আর বাবুর কোন ক্ষতি হচ্ছে না। এরা তো দু'তিন ঘন্টা থেকেই চলে যাবে। কেউ কিছু জানতে পারবে না। এই রকম ভেবে আমি দরজা খুলে দিলুম। তারা ভিতরে উঠে গেলে আমি আমার ঘরে এসে বসলুম। তারা ওপর উঠে আমোদ আহ্লাদ করতে লাগল। আমি খাওয়া দাওয়া সেরে বসে আছি, খুব ঘুম পেতে লাগল। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। আমার ইচ্ছে ছিল, ওরা চলে গেলে, দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে আমি শোব। কিন্তু কোথা থেকে কাল ঘুম এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। যখন ঘুম ভাংলো, দেখি, সকাল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ীর মধ্যে এলুম। দোতলায় উঠলুম, কেউ কোথাও নেই। পাশের ঘরে ঢুকে দেখলুম স্ত্রীলোকটি মরে পড়ে আছে। তাই দেখে আমার খুব ভয় হল। আমি তখুনি ছুটতে ছুটতে বাবুর বাড়ী গিয়ে ব্যাপার জানালুম আর সেই সঙ্গে মিথ্যে করে বললুম যে কাল রাত্রে বাগানে ছিলুম না। তারপর বাবুর হুকুম মত পুলিশে গিয়ে এত্তালা দিয়ে এলুম। আমি এখন যা বললুম হুজুর, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

আমি। কতকটা তোমায় বিশ্বাস করছি। এইবার বল দেখি, তিনজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক ছিল, বলেছ, তারা কি সবাই বাঙালী?

শম্ভু। হ্যাঁ। বাঙালী।

আমি। ভদ্রলোক গোছের। না ছোটলোক গোছের?

শম্ভু। ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছিল।

আমি। তুমি তো বলেছ তাদের চেন না। এখন দেখলে চিনতে পারবে?

শম্ভু। তা বোধ হয় পারবো। বিশেষ, যে-লোকটি আমায় পাঁচ টাকা দিয়েছিল, তাকে দেখলেই চিনতে পারবো।

আমি। যে স্ত্রীলোকটি তাদের সঙ্গে ছিল সেই কি খুন হয়ে পড়ে আছে?

শম্ভু। হ্যাঁ, সেই স্ত্রীলোকটিই।

আমি। যখন সে বাগানে ঢুকেছিল তখন তার গায়ে গয়না ছিল কি দেখেছিলে?

শম্ভু। দেখেছিলুম, অনেক গয়না পরা ছিল।

আমি। পরণের কাপড় কি রকম ছিল?

শম্ভু। তাও খুব ভাল। খুব জমকালো, বিয়ের সময় মেয়েরা যেরকম কাপড় পরে সেই রকম।

আমি। তাদের সঙ্গে কিছু জিনিষ পত্তর ছিল?

শম্ভু। কয়েক বোতল মদ ছিল। একটা চ্যাঙারিতে বোধ হয় খাবার দাবারও ছিল।

আমি। তারা যে গাড়ীতে এসেছিল, সেটা ঘরের গাড়ী না ঠিকে গাড়ী।

শম্ভু। ঠিকে গাড়ি।

আমি। ক' ঘোড়ার গাড়ী? এক ঘোড়া না দু ঘোড়া।

শম্ভু। দু' ঘোড়া।

বললুম, আচ্ছা, পল্টু, এখন আমি চললুম, আবার আসবো। তোমার কথা সত্যি কি না, খুব শিগগির তা জানতে পারবো। যদি মিছে কথা না বলে থাকো তো তোমার কোন ভয় নেই।

এই বলে আমি বাগান থেকে বেরিয়ে এলুম।

॥ দুই ॥

থানায় এসে আমার প্রধান সহকারীকে দিয়ে সহর ও সহরতলীর প্রত্যেক থানায় টেলিফোনে একটি নির্দেশ পাঠালুম। সেই নির্দেশটি এই রকম :—

"উত্তর সহরতলীর একটি বাগানের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তাকে দেখে এবং অনুসন্ধান করে যতদূর জানা গেছে তাতে বোধ হচ্ছে যে ঐ স্ত্রীলোকটি কোন সম্ভ্রান্ত বারবণিতা। তার পরণে দামী শাড়ী ছিল, গায়ে অনেক অলঙ্কার ছিল। অনুমান হয়, নাচগান করার জন্যে কোন বাবু তাকে বাগানে এনেছিল। এই জন্যে প্রত্যেক থানার ইনসপেক্টাররা তাঁদের এলাকার সমস্ত স্থানে ঢোল সহরৎ দ্বারা এই ঘটনা এইভাবে প্রচার করুন যাতে এলাকার সমস্ত লোক বিশেষ করে বেশ্যারা জানতে পারে। যদি কারুর কাছ থেকে খবর পাওয়া যায় যে কোন স্ত্রীলোক গত রাত্রে কোন পুরুষের সঙ্গে বেরিয়েছিল কিন্তু এখনো ফেরেনি, সেই খবর যেন তৎক্ষণাৎ এই থানায় জানানো হয়।"

এই নির্দেশ প্রচারিত করার ঘণ্টা দুই পরেই সংবাদ এলো সিমলার তিনটি স্ত্রীলোক কাল সন্ধ্যায় বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। তাদের পরনে ভাল কাপড় ছিল আর গয়নাগাটিও পরা ছিল।

খবরটা পেয়েই আমি সিমলায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। যে বাড়ী থেকে স্ত্রীলোক তিনটি বেরিয়ে ছিল সেই বাড়ী খুঁজে বার করে জানতে পারলুম, নৃত্য নামে একটি প্রৌঢ়া তার দুটি মেয়েকে নিয়ে সন্ধ্যায় বাবুদের সঙ্গে বেরিয়ে যায় তারা কেউই এখনো ফেরেনি। এই খবর শুনে আমার মনে হল, পল্টু যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে যে স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ পাওয়া গেছে তা নৃত্য বা তার মেয়েদের কারুর লাশ নয়। কারণ তারা যখন তিনজন একত্রে গেছে তখন একজনের মৃতদেহ পাওয়া যাবে আর অন্য দুজনের কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না, তা তো হতে পারে না। তাহলেও মনের সন্দেহ মিটিয়ে নেওয়া দরকার। এই রকম স্থির করে সেই বাড়ীতে আর যেসব স্ত্রীলোক বাস করত তাদের দু'জনকে নিয়ে আমি বাগানে এলুম। মৃতদেহ দেখা মাত্র তারা বললে, এ গৌরবের মৃতদেহ। আমি জিগেস করলুম, 'গৌরব কে?' তারা বললে, 'নৃত্যর বড় মেয়ে; ছোট মেয়ের নাম সৌরভ।' আমি আবার জিগেস করলুম, 'কাল যখন তারা বেরিয়েছিল তখন তোমরা বাড়িতে ছিলে?' তারা বললে, 'ছিলুম। আমাদের সামনেই তারা বেরিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে চারজন বাবু ছিল। বাবুদের আমরা চিনি না। আগে কখনো দেখিনি।' তাদের কথা শুনে আমার মনে হল, পল্টু বোধ হয় এখনো সব কথা বলে নি। আমি ফিরে গিয়ে পল্টুকে ডেকে আবার-নানাভাবে প্রশ্ন করলুম। পল্টু তিনটি স্ত্রীলোকের কথা কোন মতেই স্বীকার করল না।

এইবার আমি কিন্তু বিমূঢ় বোধ করলুম। পল্টু সত্যি বলছে কি-না তা বুঝতে পারছিনা। তার কথা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ যদি একটি মাত্র স্ত্রীলোক অর্থাৎ গৌরব বাগানে এসে থাকে তাহলে নৃত্য আর সৌরভ গেল কোথায়? এ তো বিষম রহস্য দেখছি। তারাও কি অন্য কোথাও খুন হয়ে পড়ে আছে?

যাই হোক, আমি তখন আমার সঙ্গী স্ত্রীলোক দুটিকে নিয়ে আবার সিমলায় গেলুম। সেখানে আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক আছে, দেখে এসেছি। তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

সেখানে গিয়ে কিন্তু আর কোন খবর পেলুম না। এদিকে বেলা তিনটে বেজে গেল। তখনো আমার স্নানাহার হয়নি। শরীর ক্লান্ত লাগছে। আমি সেখান থেকে চলে আসতে উদ্যত হয়েছি এমন সময় একটি ভাড়াটে গাড়ী সেই বাড়ীর সামনে এসে থামল। গাড়ী থেকে দুটি স্ত্রীলোক নামল। একজন বেশ বয়স্কা, অপরজন তরুণী। আমার ধারনা হল, এরা নৃত্য আর সৌরভ।

বাড়ীতে ঢুকেই নৃত্য সামনে যাকে দেখতে পেল তাকে জিজ্ঞেস করল—'সৌরভ ফিরেছে?' উত্তরে স্ত্রীলোকটি বললে—'তোমার সৌরভের কথা ওই বাবুটি জানেন। ওঁকে জিজ্ঞেস কর।'

আমি খুব বিব্রত বোধ করলুম। হাজার হোক, মা তো, মায়ের কাছে মেয়ের এই নিদারুণ খুনের খবর কেমন করে দিই? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমায় বলতেই হল। সেই ভয়ংকর খবর শুনে নৃত্য অনেকক্ষণ বুকচাপড়ে কান্নাকাটি করল। কিছুক্ষণ পরে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম—'দেখ নৃত্য, যা হবার তা তো হয়েছে। অবিশ্যি তোমার কষ্ট আমি খুবই বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন যখন সৌরভ আর ফিরবে না তখন যাতে তার হত্যাকারী ধরা পড়ে শাস্তি পায় আর গয়নাগুলি উদ্ধার হয় সেই চেষ্টাকরা দরকার।'

আমার কথা শুনে নৃত্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—'আমাকে কি করতে হবে বলুন।'

বললুম—'কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু আগাগোড়া সব ঘটনা বল।'

নৃত্য বললে—'মশাই গো, সে অনেক কথা, আমি আমার মেয়ে দুটিকে নিয়ে এখানে থাকি। মেয়ে দুটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তাদের আমি বেশ্যাবৃত্তি করতে দিই না। ছোটবেলা থেকে তাদের নাচগান শিখিয়েছি। কোন ভদ্রলোক যদি তাদের বাগানে নিয়ে গিয়ে নাচগান করান তাতে আমি আপত্তি করি না। ভাল টাকা পেলে তাদের পাঠাই। কিন্তু একা যেতে দিই না। আমিও সঙ্গে যাই। গত পরশু সন্ধ্যার পর আমি আমার ঘরে বসে আছি, মেয়েরা নতুন গান রপ্ত করছে, এমন সময়ে সোনাগাছির রামা দালালের সঙ্গে একটি বাবু আমার ঘরে এলেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসাবার পর বাবুটি বললেন, মফঃস্বল থেকে এক বড় জমিদার কলকাতায় এসেছেন, রামা দালালের কাছে আমার মেয়েদের কথা শুনে তাঁর ইচ্ছে হয়েছে আমার মেয়েকে তিনি একদিন বাগানে নিয়ে যান। যদি আমার মেয়ে নাচগানে জমিদারকে খুসী করতে পারে তাহলে তিনি তাকে মাসিক তিরিশ টাকায় বাঁধা রাখবেন। ঘরে বসে সে মাসে মাসে টাকা পাবে। জমিদারবাবু কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে বাগানে গিয়ে নাচগান করবে। বাবুটির কথা শুনে আমি বললুম, তাতে আমার আপত্তি কি? তবে আমি দুটি মেয়েকেই নিয়ে যাব। জমিদারবাবুর দুটিকে দেখে যাকে পছন্দ হয় তাকে তিনি রাখবেন। বাবুটি বললেন, তিনি জমিদারবাবুর আর দুতিনটি বন্ধুকে নিয়ে কাল আসবেন, তাঁরাও মেয়ে দুটিকে দেখবেন এবং যদি তাঁদের পছন্দ হয় তো কাল সন্ধ্যেতেই বাগানে যাওয়া হবে। টাকার জন্যে আটকাবে না। পঞ্চাশ, একশো যা চাইবে তাই তাঁরা দেবেন। পরদিন সন্ধ্যায় তাঁরা এলেন। সব সুদ্ধ চারজন। রামা দালালকে দেখলুম না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্থির হল, মেয়ে দুটিকে নিয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে যাব। তারপর জমিদারবাবু নিজে দেখে শুনে পছন্দ করবেন। তাঁরা আমাদের তাড়াতাড়ি তৈরী হোয়ে নিতে বললেন। জমিদারের কাছে যাওয়া হচ্ছে তাই মেয়ে দুটি খুব সাজগোজ করল, গয়নাগাঁটি পরল। আমি একটি সাদাসিধে কাপড় পরলুম আর মেয়েদের রাত্তিরে যদি কাপড় বদলাবার দরকার হয় সেজন্যে দুখানা তাঁতের শাড়ী সঙ্গে নিলুম।

দুটো ভাড়া গাড়ীতে তাঁরা চারজন এসেছিলেন। গৌরব প্রথমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ীতে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে যে তিনজন লোক সেদিন এসেছিল তারা সেই গাড়ীতে উঠল। প্রথম দিন যিনি এসেছিলেন তিনি আমাকে আর সৌরভকে নিয়ে অন্য গাড়ীতে উঠলেন। বললেন, 'ওরা যখন উঠে বসেছে তখন আর গৌরবকে নামিয়ে আনবার দরকার নেই। দুটো গাড়ী তো একসঙ্গে যাবে। কোন চিন্তা নেই।' গাড়ী চলতে লাগল। দুখানা গাড়ীই একসঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত গেল। তারপর আমাদের গাড়ীর ঘোড়ার রাশ ছিঁড়ে গেল। রাশ বাঁধতে অনেক দেরী হল। ইতিমধ্যে অপর গাড়ীটা যে কোনদিকে চলে গেল, বুঝতে পারলুম না। আমাদের সঙ্গী বাবুটিকে জিগ্যেস করায় তিনি বললেন যে তারা বাগানে গেছে। আর খানিকটা পথ, সে-বাগান তো তাঁর চেনা, তাই এখনি সেখানে গিয়ে পৌঁছোবো, আমাদের কোন চিন্তা নেই। তাঁর কথা শুনে আমি চুপ করে বসে রইলুম। এদিকে গাড়ী যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। শহর ছেড়ে গাড়ীটা অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। ক্রমে রাত এগারোটা বেজে গেল। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী থামল। বাবুটি নামলেন, আমাদেরও নামতে বললেন। আমরা গাড়ী থেকে নামবার পর গাড়োয়ান তার গাড়ী নিয়ে চলে গেল। তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকলেন এবং বললেন, আর একটু এগিয়ে গেলেই আমরা বাগানে পৌঁছোবো, এই বলে তিনি জোরে জোরে যেতে লাগলেন, আমরা তাঁর পিছু পিছু। কিছুদূর যাবার পর আর তাঁকে দেখতে পেলুম না। সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাবু বাবু বলে অনেক ডাকলুম। কিন্তু কোন সাড়া পেলুম না। তখন আমাদের মনের যে অবস্থা তা বলে বোঝানো যাবে না। আমরা তখন যে রাস্তা থেকে গাড়ী থেকে নেমে এসেছিলুম সেদিকে যেতে লাগলুম। কিন্তু পথ ঠাওর করা মুস্কিল। চারদিকে বন বাদাড়। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোন্ দিকে যাচ্ছি তা জানি না। একখানা তাঁতের শাড়ী বার করে সৌরভকে দিয়ে বললুম, এটা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নে। গয়নাগুলো যাতে লোক দেখতে না পায়। এইভাবে চলতে চলতে রাত কাবার হয়ে গেল। আমাদের পা আর চলছে না। আমার সর্বশরীর ঝিমঝিম করছে। সৌরভ তো কাঁদতে শুরু করেছে। যাই হোক, ভোর বেলা লোকালয়ের মুখ দেখতে পেলুম, আর তারপর একজন পথ-চলতি লোক আমাদের কষ্টের কথা শুনে দয়া করে আমাদের জন্যে একটা গাড়ী ডেকে দিলেন। সেই গাড়ী করে এতক্ষণে আমরা এসে পৌঁছলুম।'

এই বলে নৃত্য আবার কাঁদতে লাগল। বুঝলুম, চারজনে একসঙ্গে মিলে এই কাজ করেছে। তিনজনে খুনের মধ্যে লিপ্ত ছিল, অপরজন এদের দুজনকে আলাদা সরিয়ে নিয়ে গিছল। বোধ হয় তারা ভেবেছিল তিনজন স্ত্রীলোক একসঙ্গে থাকলে একজনকে ঘেরে কাজ হাসিল করা সম্ভব হবে না।

অনুসন্ধানের রাস্তা পাওয়া গেল। রামা দালালের সন্ধান করে সোনাগাছিতে তাকে ধরলুম। যাকে সে প্রথম দিন নৃত্যর বাড়ীতে নিয়ে গিছল, রামা তাকে চিনত, তাই রামার সাহায্যে সেই ব্যক্তিকে পাকড়াও করা শক্ত হল না। সেই লোকটাই নৃত্য আর সৌরভকে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। শুঁতোর চোটে লোকটা সমস্ত কথা স্বীকার করবার পথ পেল না। তার কাছ থেকে তার সঙ্গী তিনজনের নাম ঠিকানা জেনে তাদেরও গ্রেপ্তার করা হল। তারা ভাবেনি যে এত তাড়াতাড়ি পুলিশ তাদের সন্ধান পাবে। তাদের কাছ থেকে চোরাই গয়নার প্রায়ই সবই পাওয়া গেল। গাড়োয়ানদেরও খুঁজে বার করা হল। তারা এবং শম্ভু মোকর্দমায় সাক্ষী হয়েছিল। বিচারে চারজন আসামীই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হল।

পুরাতন পাতা

[অগ্নিযুগের মহাসাধিকা সরলা দেবী চৌধুরাণী জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে বিপুল কর্মোদ্যমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন সারা পৃথিবীতে তার তুলনা মেলা ভার। শুধু বিপ্লবীদের তিনি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, সমাজ এবং দেশহিতকর বহু কাজে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন, সঙ্গীতে সাহিত্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা বিভাগেও তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং আরো একটি বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে যে সেই সুদূর অতীতে, যখন বঙ্গললনাদের মধ্যে শিক্ষিতার সংখ্যা খুবই অল্প ছিল, তিনি ভারতীর সম্পাদিকারূপে যে নৈপুণ্য, নিষ্ঠা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখে গেছেন তা আজকের দিনে কল্পনা করাও কঠিন। আমরা এই সংখ্যায় তাঁর সম্পাদকীয় জীবনের কিছু স্মৃতি-চারণ সংকলন করে পাঠক-পাঠিকাদের ও বিশেষকরে আজকের দিনের সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকদের উপহার দিলাম।—সম্পাদক, পল্লবগ্রাহী।

আমার সম্পাদকীয় জীবন

সরলা দেবী

সেই সময় (১৩০৬—১৩১৪) আমি একদিকে যেমন নানা বর্ম্মে জাতীয় জীবনকে প্রবাহিত করতে নিযুক্ত ছিলুম—সাহস, বল, বিদ্যা, একতা, স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্তশাসন এই ষড়বর্গে—অন্যদিকে 'ভারতীর' মধ্য দিয়ে সাহিত্য সেবায়ও একান্তভাবে নিবিষ্ট ছিলুম। নিজের লেখার প্রাচুর্য তো সে সময়ে ছিলই, কিন্তু নিজের লেখার আড়ালেই 'ভারতীর' সর্বাঙ্গ ভরে দেওয়ার অভিমান আমার ছিল না। বাঙ্গীর একটি সেবকমণ্ডলীকে ভারতীর পার্শ্বে আকৃষ্ট করে সমাদৃত করার লক্ষ্য ছিল আমার। আমার বোকার সামনের দেওয়ালে একটি লিষ্ট টাঙানো থাকত, প্রায় চল্লিশটি নাম, কলকাতায় বা কলকাতার বাইরে যাদের বহু সাহিত্য চর্চায় ও তাতে কৃতী হওয়ার পরিচয় বা ইঙ্গিতমাত্র কোনরকমে পেয়েছিলুম। পালা করে

মাসের মধ্যে একবার তাঁদের সঙ্গে আমার পত্রের আদানপ্রদান হত। কখন প্রয়োজন সম্বিনয়স্বারকলিপি এক একদিন একটি লেখার জন্ত। তাঁদের সৌজন্তে তাঁরা কোনদিন আমায় নিরাশ করেননি।

আমার সাহিত্য সেবার প্রয়োজনের তাগিদ ছিলনা। তাই আমি অর্থলাভের দিক দিয়ে নিরুদ্বিগ্ন ছিলুম। বরঞ্চ ভারতীর আয়ব্যয় খতিয়ে দেখতে গেলুম মাসে মাসে কাগজ, ছাপা, ম্যানেজমেণ্ট প্রভৃতি সমস্ত খরচ নির্বাহ করেও যথেষ্ট আয় উদ্বৃত্ত থাকে। এটি স্বত্বাধিকারীর তহবিলে জমা হয়, এতে তাঁরই পকেট ভরে। পত্রিকাখানির সৌষ্ঠব ও কাটতি যে লেখকদের লেখার ফল হয়, তাঁরা একটি কপর্দক পান না। আমার মনে হতে লাগল এটা ঠিক নয়। সম্পাদকের খাটুনি আছে বটে, তার ফল লাভের একটা নির্ধারিত অংশ সম্পাদকের প্রাপ্য, কিন্তু সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী যদি একই লোক হয় তবে ম্যানেজমেণ্টের খরচ বাদে বাকী সব উদ্বৃত্তটা স্বত্বাধিকারী একাই কেন গলাধঃকরণ করবেন? যেসব লেখকের সহযোগিতায় কাগজখানি গরীয়ান ও স্বত্বাধিকারী লাভবান, সেই লেখকেরা লভ্যাংশের কিছু কিছু পাবে না কেন? আমি নিয়ম করলুম ভারতীর প্রত্যেক লেখককেই কিছু না কিছু পারিশ্রমিক উপহার দেব। এখনকার অনেক লেখকদের শুনে আশ্চর্য লাগবে যে, সেকালে এমন লেখকও ছিলেন যাঁরা লিখে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা তাঁদের আত্মসম্মানের পক্ষে হানিজনক বলে মনে করতেন। তাঁদের মত এই—লিখব, সাহিত্য সেবা করব নিজের মনের আনন্দে, তার ফল অর্থ গ্রহণ কেন? যাঁরা অল্পমত ছিলেন তাঁদের সাধ্যমত অর্থ দান করে আমি আনন্দ পেতুম এবং অর্থ গ্রহণ অনেকদের কোন না কোন আকারে বাণীর প্রীতির নিদর্শন পাঠাতুম নববর্ষে বা আশ্বিনে, হয়ত একটি সোনার কাউনটেন পেন। নয়ত একখানি ভাল বই।

ভারতীর এই নিয়ম আমার কাল এই হল যে, প্রত্যেক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, স্বত্বাধিকারীরাই ভাল লেখকদের লেখার জন্তে পারিশ্রমিকের খাতা খুলতে বাধ্য হলেন। এর ফলে লেখকজাতির উপকার হল বটে, কিন্তু আমি নিজে ঠকলুম। কারণ ভারতীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবার জন্তে আমার চেয়ে অধিক বিত্তশালি সম্পন্ন বিজ্ঞ সম্পাদকেরা বিশেষ বিশেষ লেখকের পারিশ্রমিকের হার এত বাড়িয়ে দিলেন যে, তাঁরা তাঁদেরই একচেটে হয়ে গেলেন, আমি পড়লুম ফাঁপরে।

"ভারতী" হাতে নিয়ে মাসিক পত্রিকা জগতে আরও একটি নতুনত্ব আমি ঢুকিয়েছিলুম, punctuality যথাসাময়িকতা। দেখতুম, তখনকার দিনে সাময়িক পত্রিকা কখনই ঠিক সময়ে বেরোয় না—বৈশাখের পত্রিকা হয়ত আষাঢ়ে হতসভ হল, আশ্বিনের অগ্রহায়ণে দেখা দিলে। আমার দৃঢ়পণ হল, এই দোষটার সংশোধন করব। করলুমও। সময় অতিক্রান্ত করে বেরনোর অপবাদ ঘুচে দিলুম মাসিকপত্রিকা জগৎ থেকে। ছরোয়ান বেয়ারার হাতে প্রুফ আনান ও পাঠানর অপেক্ষা না রেখে, নিজে গাড়ি করে গিয়ে গাড়িতে বসে বসেই শেষ প্রুফটা দেখে ছাপাবার অর্ডার দিয়ে "ছাপাখানার ভূতদের" অস্থির করে তুলতুম। শুধু তাই নয়, দরকার হলে, চামড়ার গন্ধে ভরপুর বস্তরী পাড়ায় গিয়ে অপেক্ষা করে গাড়িতে করে ছুচারখানা পত্রিকা টাটকা বাঁধিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসতুম তারপর ভরসা হত ম্যানেজারকে ছেড়ে আসতে—সন্ধ্যের মধ্যে সবগুলো বাঁধিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে আসবে। শুধু ঠিক দিনে বেরনো নয়, ঠিক দিনে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছানো চাই। 'ভারতী' হাতে এলেই পাঠকরা সচেতন হয়ে বলতেন—ওঃ! আজ মাসের পয়লা যে, ভারতী এসে গেছে। দেখাদেখি অন্ত পত্রিকাদেরও চটপটে হতে হল। যথাসময়ে বেরনোই মাসিক পত্রিকা জগতে নিয়ম বেঁধে গেল। তার অন্তথা করাটা নিয়মের ব্যত্যয়।

লেখক তৈরী করা আমার আর একটি সম্পাদকীয় কাজ ছিল। তৈরী লেখকের লেখা দিয়ে পত্রিকার

পৃষ্ঠা ভরা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য সাধনা। কিন্তু তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতুম না। কোন কোন লেখা প্রথম দৃষ্টিতে রদ্দির টুকরিতে ফেলে দেওয়ার উপযুক্ত হলেও, তার ভিতরকার কতকগুলি মলমল উল্টে পাল্টে সাজালে দিব্যি জিনিষ দাঁড়াবে অনুমান করে নিতুম। যে লেখাটার শরীরখানা এখন মড়ার মত, টেবিল থেকে টেনে বাইরে ফেলে দেবার যোগ্য, তারই পা থেকে মাথা পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কাটাছেঁড়া করে নতুন করে বসিয়ে খাড়া করলে জীবন্ত হয়ে উঠবে এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার উপর অপারেশন আরম্ভ করতুম। কংকালের অস্থিগুলি reset করতুম, তার উপর মাংস ও চর্মের প্রলেপ দিয়ে রক্ত চলাচল করাতুম—তখন তা হ'য়ে উঠত একটি জীবন্ত বস্তু। এই রকম করে আমার হাতে দেকালে অনেক চলনসই সুলেখক গড়ে উঠলেন। আজকালকার মত তাঁদের এত প্রাচুর্য ছিলনা। কিন্তু genius-এর কুঁড়িও দু'একটি আবিষ্কার করেছিলুম। মালীরা যেমন মুদ্রিত পাপড়িগুলির এক একটি হাতে করে খুলে খুলে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম একটি লোকের সামনে ধরে, আমিও তেমনি এই প্রতিভা-পদ্মকুঁড়িগুলির পাপড়ি খুলে খুলে দিয়ে তাদের স্বরূপটি ফুটিয়ে ধরতুম। তারতীতে তাই আমার সম্পাদনাক্রিয়া কেবল mechanical ছিল না, শুধু মেশিনের মত কাজ নয়, মানবীয় রসে ভরা ছিল আমার সম্পাদকীয় জীবন। অথচ আত্মীয় ছাড়া আর কোন লেখকের সঙ্গেই আমার চাক্ষুষ পরিচয় হত না। চিঠি পত্রেই দেখা শোনা। যাঁদের লেখা একেবারে অচল বুঝতুম তাঁদেরও লেখক-হৃদয়ের প্রতি একটা মায়া দয়া রেখে, সৌজন্যের ত্রুটি না করে, লেখা ফেরৎ দিতুম। তবু যা অপ্রিয় তা অপ্রিয়ই হ'ত। লেখা ফেরৎ পাওয়ায় একজন আমাকে ক্ষোভভরে লিখেছিলেন—"you are a past-mistress in the art of denial." এই রকম অনিচ্ছাকৃত আঘাতের প্রতিঘাত পরজীবনে যে পাইনি একেবারে তা বলতে পারিনে।

সরলা দেবী বীরাষ্টমী-র অনুষ্ঠান করছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেন। ছেলেরা প্রকাশ্যে লাঠি ঘোরাবে, জাতীয় মঞ্চের ধ্বজা ছাড়বে—ব্রিটিশের চোখ যে লাল হয়ে উঠবে। দীনেশচন্দ্র সেন একদিন গিয়ে সরলা দেবীকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনার কথা জানালেন। হেসে বললেন সরলা দেবী—"দীনেশ বাবু! বাঙালীর মেয়েরাও যে আজ আর ভয় করে ঘরে বসে থাকে না, এ কথা জগতকে জানাবার সময় এসেছে। আমার ব্রত থেকে আমি বিচ্যুত হব না।"

রত্নাকর

God is the Playwright
And men His actors.
The Great Dramas
played upon Earth
Were Composed in Heaven.
—*Balzac*

নাট্য চিন্তা

নাটকের মধ্যে কোন দাবী বড়—শিল্পের দাবী, না বক্তব্যের? এ-নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে, কিন্তু কোনো মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয় নি। মীমাংসা হয়নি বলেই একই সমস্যা নিয়ে নাটক লেখা সত্ত্বেও দুজন নাট্যকারের ঘটনা সংস্থাপনা চরিত্রসৃষ্টি ও রসের অবেদন সম্পূর্ণ দু'রকম হতে পারে। অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ধান্দিক' ও শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'বিদিশ' এই দুটি একাঙ্ক নাটকের তুলনা করা যেতে পারে। প্রথমটির মধ্যে নাট্যকারের উগ্র ঘৃণা ও প্রবল শ্রেণী চেতনা স্পষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয়টির মধ্যে নাট্যকারের সহানুভূতি ও উদার সংশোধনী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। সন্তোষ সেনের 'এরাও মানুষ', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরাণীর জীবন', "চোর" ও "গ্রীট বেগার," পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত', কিরণ মৈত্রের 'অন্ধকারায়' প্রভৃতি নাটকে সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়ে সমাজ জীবনের নানা প্রকার সমস্যা আলোচিত হয়েছে। দর্শকদের করুণা ও সমবেদনা উদ্রেক করাই নাট্যকারদের উদ্দেশ্য, তাদের ঘৃণা ও উষ্মা তাঁরা উদ্রেক করতে চান নি। যেসব নাট্যকার ধান্দিক বস্তুবাদ অথবা সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের কথা বলে থাকেন তাঁরা একটি অপক্ষপাতী, সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়ে জীবনের রূপ দেখেন না। তাঁরা একটি নির্দিষ্ট মতবাদের মধ্যে দিয়ে জীবনকে বিচার করেন। সেজন্য জীবনের শিল্পরূপ অপেক্ষা জীবনের তত্ত্বরূপই তাঁদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। জীবনের অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও রস তাঁদের নাটকে ধরা পড়ে না। সমস্যার উৎপত্তি ও সমাধান সম্বন্ধে তাঁদের একটি বাঁধাধরা তাত্ত্বিক দৃষ্টি থাকে বলেই সব নাটকের ঘটনা ও চরিত্র-চিত্রণের একটা ফরমূলা-বাঁধা রূপ তাঁদের নাটকে ধরা পড়ে। এই প্রসঙ্গে নাটকে প্রচারধর্মিতার

আর এসে পড়ে। কোনো কোন নাট্যকার নাট্যপ্রযোজক এখন খুব জোরের সঙ্গেই বলছেন, নাটক মানেই প্রচার! নাট্যকার নিশ্চয়ই তাঁর নাটকে একটি বক্তব্য প্রকাশ করবেন, কিন্তু সেই বক্তব্য থাকলেই নাটক প্রচারধর্মী হয় না। নাটক প্রচারধর্মী তখনই যখন দেখি শিল্পের দাবী অপেক্ষা মতবাদের দাবী বড় হয়ে ওঠে। যখন চরিত্রগুলির মাধ্যমে নাট্যকার কথা বলতে আরম্ভ করেন, যখন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে কোন চরিত্র অতিমাত্রায় সোচ্চার হয়ে ওঠে তখনই নাটক প্রচারধর্মী হয়। আধুনিক কোনো কোনো নাট্যকার এত অসহিষ্ণু, এত উগ্র, এত সোচ্চার যে তাঁদের নাটক দেখতে দেখতে ক্লান্তি ও বিরক্তিতে মন ভরে আসে। যখন নাট্যকার চরিত্র সৃষ্টি ও রসসৃষ্টির নৈপুণ্য দ্বারা তাঁর উদ্দিষ্ট মতবাদ দর্শকচিত্তের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে পারেন, তখনই তিনি সার্থক নাট্যকার। আজকের সামাজিক মানুষ জীবন থেকে কখনো রাজনীতি বাদ দিতে পারে না। সেজন্য রাজনৈতিক আলোচনা ও মতবাদ আজকের নাটকে নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু নাটকের মধ্যে যে রাজনীতি আসবে তা কোনো রাজনৈতিক সভার রাজনীতি নয়। যেখানে জীবনকে উপলক্ষ করে রাজনীতিই মুখ্য হয়ে ওঠে সেখানে নাটক প্রচারধর্মী। কিন্তু যেখানে রাজনীতির সংঘাতে জীবনকেই দেখাবার চেষ্টা হয় সেখানে নাটক প্রচারধর্মী নয়। রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকৃতাঙ্গন ঠিক এক নয়, রাজনীতিক যেমন মাঝে মাঝে নাটকীয় হয়ে পড়েন, নাট্যকারকেও তেমনি সময় সময় রাজনীতিক হতে হয় বটে, কিন্তু তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে তিনি নাট্যকার, রাজনীতিক নন। কোনো তাত্ত্বিক মতবাদই নাটকের মধ্যে মুখ্য করে তুললে নাট্যকারের জীবন সম্বন্ধে সেই সমদৃষ্টি ও উদার মানবতাবোধ থাকে না, যা প্রত্যেক বড় শিল্পীর অপরিহার্য গুণ। আজকের কোনো কোনো উগ্রমতবাদী নাট্যকার উদার মানবতাবোধকে উনিশ শতকের জীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বলে উপহাস করে থাকেন। হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ ও উত্তেজনা এ-সবই কি জীবনের একমাত্র দিক, স্নেহ, প্রেম, ত্যাগ ও প্রশান্তি কি কিছুই নয়? জীবনের কয়েকটি চিরসত্য মূল্যবোধ ও চিরস্বীকৃত নীতি সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে কখনো বড় ও স্থায়ী নাটক লেখা সম্ভব হবে না।

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

নানা প্রসঙ্গ

যাত্রার কথা ও কাহিনী

রবিশংকর

পুরানো দিনের যাত্রাকর লোচনদাস অধিকারী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি অক্রূর সংবাদ ও নিমাই সন্ন্যাস পালাগানে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর দলে সেকালের সেরা কীর্তনীয়ারা গান গাইতেন। শ্রীখোল বাজিয়ে এসেছিল নবদ্বীপ ধাম থেকে।

লোচন অধিকারীর যাত্রাগান শুনে অনেকেই জ্ঞান হারা হতেন। শোনা যায় কলকাতার মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর ও কুমারটুলীর বনমালী সরকারের বাড়ীতে প্রায়ই লোচনের গান হতো। প্রতি আসরেই লোচনের যাত্রা গান শুনে শ্রোতরা বাহ্যজ্ঞান হারাতেন।

নিমাই-এর ভূমিকায় অভিনয় করতেন লোচন দাস। তিনি আসরে এলেই শ্রোতারা আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠতেন। মেয়েরা গায়ের গহনা ও পুরুষেরা অপরিমিত সংখ্যক মুদ্রা দান করতেন।

লোচন দাসের প্রতিদ্বন্দ্বী যাত্রাকররা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতেন। তাঁরা লোচনের নামে নানা

গুজব ছড়াতে থাকেন। লোচন যাত্রাগান করার নামে ডাকাতি করে। বনমালী সরকারের বাড়ীতে যাত্রাগান করে শ্রোতাদের বাহুজ্ঞান লুপ্ত করে লোচন দাস বহু অর্থ ও অলংকার লাভ করেছেন। ফলে, কলকাতার ধনীর গৃহে লোচনের আর ডাক পড়ে না। কেউ তাঁর অভিনয়ের আয়োজন করতে সাহসী হয় না।

প্রতিদ্বন্দ্বী যাত্রাকরদের চক্রান্তের কথা শুনতে পেলেন লোচনদাস। ছুটে গেলেন বনমালি সরকারের বাকীতে। গৃহকর্তা তখন সবে বৈঠকখানায় ইয়ার বক্সীদের সংগে ঠাট্টা তামাসায় মেতেছেন।

সকালের তামাটে রোদ যেমন রং বদলে সাদাটে হয়ে যায় লোচনের মুখ তেমনি হয়ে গেছে। হাত জোড় করে দাঁড়ালেন লোচন দাস। পাথরের চোখের মত নিশ্চল দৃষ্টি, চোখে পাতা পড়ে না। চোখের পাতায় জল যেন ভোরের ঘাসের উপর কয়েক ফোটা শিশির বিন্দু। ঠোঁট দুটি কাঁপছে অনবরত।

গৃহকর্তা তাকালেন লোচনের দিকে।

—"বাবু মশাই, আপনি আমাকে কোতয়ালীতে পাঠিয়ে দিন। আমি ডাকাত।"

ডুকরে কেঁদে ওঠেন লোচন দাস। দৃষ্টিতে অসহায় ভাব।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন গৃহকর্তা। বললেন, "আমিও শুনেছি হে।"

শ্রাবণের বাদল ভরা মেঘের মত মুখটা বিষণ্ণ করে লোচন বললেন, "আপনি এর একটা বিহিত করুন। নৈলে আমার যে অন্ন উঠলো।"

গৃহকর্তা জানালেন, যে গুজব কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। লোচন দাসকে উত্তোকারাই তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে প্রচুর অর্থ পুরস্কার স্বরূপ দান করেছিল। যাত্রাগানকে উন্নত শিল্প সুষমায় অভিষিক্ত করেছে লোচন, তাই উপহার তাঁর প্রাপ্য।

দীর্ঘদিন ভয়ে কেউ লোচনকে গান গাইতে ডাকতে সাহসী হয়নি। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে লিখেছেন: "কঠোর ব্রতে প্রাণিত হওয়ায় আশকোর কলিকাতার অন্য কোন ধনী ব্যক্তি ইহাকে গান গাইবার জন্য আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই।"

সেকালে কৃষ্ণযাত্রা শুনে যাত্রাগায়ককে প্রচুর পুরস্কার দান করা হতো, ভবদু. সি. বাড়ুয্যে কৃষ্ণযাত্রার বড় ভক্ত ছিলেন, তিনি প্রায়ই বলতেন, "উহু-হু, ওকথা আর মনে করে দিও না। কৃষ্ণযাত্রা শুনিলে পাগল হইতাম। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত এক আসরে বসিয়া গান শুনিতাম, আর কাঁদিতাম, আর হৃদয়ে কত ভাবই উঠিত এখন কি যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলেও দুই তিন দিন আমি বিভোর থাকিতাম। আমার বোধ হয় এখনও অশ্রুপাত না করিয়া কৃষ্ণযাত্রা শুনিতে পারিনা।" (নব্যভারত বাদশ খণ্ড, মাঘ ১৩০১ সন)

শোনা যায় বয়স্করা অল্প বয়স্ক ছেলেদের কৃষ্ণযাত্রা শুনতে দিতে চাইতেন না কৃষ্ণযাত্রা শুনে অনেকে বাউরী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছেন। অনেকে আবার যথা সর্বস্ব দান করে ফতুর হয়েছেন।

লোচন দাসকে যেমন ধনী ব্যক্তিরা ভয় করতেন তেমনি ভয় করতেন পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারীকে। রামযাত্রায় তিনি এক সময়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁর জুড়ি খুব কমই মিলতো, 'মহীরাবণ বধ' পালা গাইতেন তিনি। ১২৮৮ সনের মাঘ সংখ্যার ভারতী পত্রিকায় প্রেমচাঁদ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখেছেন, "এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কোন প্রসিদ্ধ ধনীর ভবনে একদা তিনি ঐ পালার যাত্রা করিয়া তাঁহার যথাসর্বস্ব লইয়া আসিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি যখন মহীরাবণ পুরীতে

ভদ্রকালীর নিকট শ্রীরাম লক্ষ্মণকে নরবলি দিবার জন্য হস্তবন্ধন পূর্বক লইয়া আসা এবং রাম লক্ষ্মণ দুই সহোদরের পরস্পর বিষাদপূর্ণ কথোপকথন ও কালিকার প্রসন্নতা লাভ ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত বক্তৃতা ও গীতালাপ করিতেন তখন পাষাণ-হৃদয় শ্রোতৃবর্গের মনও করুণাপ্লুত হইত।"

যাত্রাওয়ালা প্রেমচাঁদ যাত্রাজগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পূর্বে স্ত্রীলোকেরা কীর্তন গান গাইতেন না, তাঁদের গান গাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। প্রেমচাঁদ প্রথম সেই বাধা অপসারণ করেছিলেন। এই কারণে অনেকবার তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়েছে।

(২)

কৃষ্ণযাত্রায় ঢাকার কালাচাঁদ পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক লীলা যাত্রাগানে তিনি এক সময় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। পরমভক্ত কালাচাঁদের গান শোনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোক আসতো। তাঁর সম্পর্কে নানান কথা শোনা যায়। বিক্রমপুরে এক জমিদার বাড়ীতে একবার কালাচাঁদ পালের কৃষ্ণযাত্রা গান হচ্ছে। আসরে রঙ্গ পড়েছে। ঐক্যতান বাদন শেষ হলো। মঙ্গলাচারণ শেষ হলো। সূত্রধর এসে জানিয়ে গেল পালার বিষয়বস্তু।

সেকালে যাত্রাকররা বিশেষ করে পরমানন্দ আসরে ব্যাসদেবকে আমদানী করে কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদনা করেছিলেন। গৌর বন্দনার পর ব্যাসদেবের রসিকতা চলতো, তারপর শ্রীকৃষ্ণ, নারদ অথবা কোন শ্রোত্রী এসে আলাপ জমাতো, তা থেকেই কোন পালায় অভিনয় হবে শ্রোতারা তা জানতে পারতেন।

অভিনয় সুরু হয়েছে। আসরে গান গাইছেন কালাচাঁদ। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে সেই গান। হঠাৎ শরীরটা খারাপ হয়ে পড়ে কালাচাঁদের। ছুটে আসর থেকে বেরিয়ে যান। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে বসে পড়েন। তেহবমি করে টলতে টলতে এসে ঢোকেন সাজঘরে। পৃথিবী দুলছে। শুয়ে পড়েন কালাচাঁদ। মন উদ্বিগ্ন। কি হবে উপায়। গান যে ভেঙ্গে যাবে। হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকেন। ডান হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন।

আসর থেকে কালাচাঁদ যে বেরিয়ে গেল, আর যে ফিরলো না! চাপা গুঞ্জন উঠলো। কালাচাঁদ কৈ? কালাচাঁদকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। সেই যে আসর থেকে বেরিয়ে গেল এখনো তার ফেরবার নাম নেই।

আসরে আবার ঐক্যতান বাদন সুরু হলো।

কালাচাঁদের দলের এক বড় অভিনেতা চোখে অন্ধকার দেখলো। সর্বনাশ! গান যে বন্ধ হয়ে যাবে। অসহায়ের মত সে হাঁক দিয়ে ফিরতে লাগলো—কর্তামশাই, কর্তামশাই।

যাত্রা বন্ধ করে দিতেই হবে। এ ছাড়া আর উপায় কি। প্রমাদ গুণলো দলের সবাই। কালাচাঁদ ছাড়া অভিনয় অসম্ভব। যেন শিবহীন যজ্ঞ।

আসরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো; শ্রোতাদের চিৎকারে আসর ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হলো। গৃহকর্তা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দূর থেকে কালাচাঁদের গানের সুর ভেসে এলো। গোলমাল মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে আসরে প্রবেশ করলেন কালাচাঁদ।

একটা আলো যেন এগিয়ে এলো, সেই আলোতে আসর প্লাবিত, উদ্ভাসিত। কালাচাঁদ যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। দেহ থেকে এক অপূর্ব জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। গান ধরলেন কালাচাঁদ। তাঁর দুটি ভাগর চোখের কোল বেয়ে অশ্রুবিন্দু গাল বেয়ে আসছে। অশ্রুবিন্দু নয় যেন মুক্তাবিন্দু।

জমিদারবাবু তন্ময় হয়ে গেছেন। সোনালী ঝাড় লণ্ঠন ও রঙীন আলোয় স্বপ্নলোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সারা আসর জুড়ে।

অপূর্ব! অপূর্ব! কি গানই না গাইলে তুমি কালাচাঁদ।

জমিদার বাবু চিৎকার করে উঠলেন। মুখে তাঁর তৃপ্তির প্রশান্ত হাসি।

কালাচাঁদ চলে গেলেন। বাঁধ ভাঙা আনন্দে শ্রোতাদের হৃদয় উত্তাল হয়ে উঠলো। মেয়েরা উলুধ্বনী দিয়ে উঠলেন। আনন্দের ঢেউ খেলে গেল চারধারে।

চারিদিকে সুবাস, সে গন্ধ যেন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে। যাত্রা শেষ হলো।

সাজঘরে অঘোরে ঘুমচ্ছেন কালাচাঁদ। এক কিশোর প্রবেশ করলো সাজঘরে। চোখ মুখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। পায়ে ঘুংঘুর। চলতে ফিরতে রিমঝিম্ শব্দ হচ্ছে।

ওঠো কালাচাঁদ। ভোর যে হয়ে এলো।

কালাচাঁদকে স্পর্শ করলো কিশোর! সমস্ত শরীর তীব্র পুলকে শিহরণ জাগিয়ে তুললো কালাচাঁদের। উঠে বসলেন কালাচাঁদ। কৈ, কেউ তো ঘরে নেই। অথচ আশ্চর্য, শরীরের ক্লান্তি দেহ থেকে উবে কোথায় যেন চলে গেছে। নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করলেন কালাচাঁদ। শরীরে রোগের লেশ নেই।

উঠে দাঁড়ালেন কালাচাঁদ। সারা ঘর গন্ধে ভরপুর। নিশ্বাস নিলেন বুক ভরে। ভাবতে পারলেন না এ দিব্য গন্ধের উৎস কোথায়। বড় বড় চোখে তাকালেন বাইরের দিকে।

সবে ফর্সা হয়েছে। উষা দেবীর মাথায় নতুন বধূর মাথায় কুশণ্ডিকার দিনে সিঁদুর দেওয়ার মতই কে যেন এক থালা সিঁদুর ঢেলে দিয়ে গেছে। নববধূর লজ্জা রক্তিম আভা তার সারা দেহকে জড়িয়ে রয়েছে।

কালাচাঁদ বাস্তবে ফিরে এসেছেন। গত রাতের ঘটনা একে একে সব মনে পড়লো। যাত্রা নিশ্চয় হয়নি। কতই না কেলেংকারী হয়েছে। মনে এলো আতংক। চোখে মুখে বিবর্ণ আভা কালো মেঘের মত ছড়িয়ে পড়লো।

সাজঘর থেকে অপরাধীর মত মাথা নিচু করে বেরোলেন কালাচাঁদ। সামনে দেখলেন সারা গ্রামের লোক তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত জোড় করে দাঁড়ালেন কালাচাঁদ। কিন্তু কি আশ্চর্য—সবাই বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কারো মুখে রা নেই।

ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলেন জমিদার স্বয়ং। পেছনে দাস কর্মচারীরা থালায় মালা আর টাকা নিয়ে এলো। জমিদার এগিয়ে এসে কালাচাঁদকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'তুমি গত রাতে যা গেয়েছো তা আমরা কখনো ভুলবোনা।"

কালাচাঁদ বিস্মিত ও হতবাক। কাঁদতে লাগলেন কালাচাঁদ। বললেন, "বাবু মশাই, বড় আপনারা, গান আমি করিনি, ব্রজের কালাচাঁদ স্বয়ং এসে আপনার বাড়ী গান গেয়ে গেছেন।"

জলে চোখ ভেসে যাচ্ছে কালাচাঁদের। কালাচাঁদ জানালেন গত রাতের সব ঘটনা। ভেবে ঠিক করে জান হারিয়েছিল তাঁর। আজ ভোরে তার ঘুম ভেঙে কালাচাঁদই জাগিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। ঈশ্বর দর্শন তাঁর হোল না।

জমিদারের বুক ভরে গেল আনন্দে। দু'চোখে ধারা নেমে এল। কালাচাঁদকে বললেন, "তুমিই আমাদের ব্রজের কালা। আমার ঈশ্বর দর্শন হ'লো।"

গান ধরলেন কালাচাঁদ। সুরে আকুলতা ও অভিমান।

জমিদার চোখ বুজলেন, ভেতরের চোখ দিয়ে দেখলেন তাঁর সামনে গত রাতের কালাচাঁদ গাইছে। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। ধন্য হলেন জমিদার, ধন্য হলো গ্রামবাসীরা।

শোনা যায় সেই সাজঘরকে জমিদার বাবু মন্দিরে রূপান্তরিত করেছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালাচাঁদের এমনই বহু অলৌকিক ঘটনার কথা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল।

জীবনী ও স্মৃতিকথা

বিগত দিনের মঞ্চ-নায়ক
যাদের আমরা ভুলে যাচ্ছি

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৩-১৯৪৩

যেমন কান্তি তেমনি কণ্ঠ। মঞ্চে যখন দেখা দিতেন, মনে মনে হত যেন, গন্ধর্বলোক বা কিন্নরলোক থেকে কোন চিরযুবা মনোমোহন নেমে এলেন! বাংলা রঙ্গমঞ্চের সবচেয়ে সুদর্শন নট—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। যেন দেবসেনাপতি কার্তিকের অথবা পাশ্চাত্য পুরাণের অ্যাপোলো! তেমনি ভঙ্গী আর তেমনি ব্যক্তিত্ব আর নিজেকে প্রকাশ করবার তেমনি অনায়াস কুশলতা।

আধ মিনিটের একটা পার্ট! কর্ণার্জুনের বিকর্ণ! কিন্তু সেই স্বল্পতম প্রকাশের মধ্যেই "জানিয়ে" দিলেন তিনি। অশেষ ক্ষমতা না হলে কি আর তা সম্ভব হত! অপরেশবাবু পড়লেন মুস্কিলে। সখ করে থিয়েটার করতে এসেছে। বড় লোকের ছেলে। সুদর্শন আর সুকণ্ঠ বলে তাঁকে দিয়েছেন একটা ছোট ভূমিকা—অবশ্য ভূমিকাটিতে নাট্যকারের সহানুভূতি আছে! কিন্তু দর্শকদের মধ্যে এ কী কলরোল! একে তো আর ঠেকে রাখা যায় না! বড় পার্ট পেলেন দুর্গাদাস—দুঃশাসন। ব্যস! আর যায় কোথায়? "ছিল পক্ষ স্বামী, ষষ্ঠে কিবা তার" বলে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন প্রেক্ষাগারে তুমুল হর্ষ ধ্বনি তুলে, সেই থেকে আরম্ভ হল তাঁর অব্যাহত জয়যাত্রা। কী মঞ্চে, কী পর্দায়! প্রথমে নায়ক তারপর চরিত্রাভিনেতা। দু'প্রকার ভূমিকাতেই অনায়াস নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখলেন দুর্গাদাস! পরিণত প্রতিভায় যখন তিনি প্রোজ্জ্বল তখনই জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন।

২৪ পরগণার কালিকাপুরের জমিদার বংশে জন্ম। ছেলেবেলায় আদরও যেমন ছিল, শাসনও তেমনি। কিন্তু যে-ছেলে জন্মশিল্পী তাকে কি আটকানো যায়? আর্ট স্কুলে কিছুদিন শিক্ষা নেবার পর ১৯২০-২১ সালে ম্যাডান কোম্পানীতে ঢুকলেন সীন পেন্টার রূপে! পটুয়া। তারপর নির্বাক ছবিতে অভিনয়। ছেলেবেলার ডাক নাম ছিল—ঘণ্টা। ভাল নাম দুর্গাচরণ! ১৯২৩ সালে আর্ট থিয়েটারে যোগ দিলেন—দুর্গাদাস নাম নিয়ে। মঞ্চে কত ভূমিকায় যে অভিনয় করেছেন তার হিসাব দিতে গেলে অনেক জায়গা জুড়ে যাবে। চোখের সামনে ভাসছে, অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর অভিনয়—ইরাণের রাণীতে কাজী, চন্দ্রশেখরে প্রতাপ, আলমগীরে জীবন সিংহ, প্রতাপাদিত্যে প্রতাপ, চিরকুমার সভায় পূর্ণ, আবুল হাসানে হাসান,

শকুন্তলায় দুষ্মন্ত, মাকড়সার জালে স্বয়ম্বর, মাটির ঘরে অলক, কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলাল, সরলায় বিধুভূষণ, শেষ রক্ষায় গদাই, পতিব্রতায় রমেন্দ্র, রঙ্গদীপে সোনার হরিণ, কপালকুণ্ডলায় নবকুমার ; ভটিনীর বিচারে ডিফেন্স কাউন্সিল। ১৯৪২ সালে নভেম্বরে মিনার্ভায় শচীন সেনগুপ্তের কাটা ও কমল মুক্ত হয়। এই নাটকের নায়কের চরিত্রের অভিনয়ই তাঁর শেষ মহাযবতরণ।

চলচ্চিত্রে যে ব্যক্তি চণ্ডীদাস করলেন তিনিই যে ভাগ্যচক্র আর দিদিতে অমন টাইপ চরিত্রের অভিনয় করতে পারবেন তা কে ভাবতে পেরেছিল। অগণিত ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। নিউ থিয়েটার্সের তরফেই প্রায় সব অভিনয়। প্রিয় বান্ধবী তাঁর শেষ ছবি। এই ছবিতে অদ্ভুত ট্র্যাজিক এবং মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন যেমন খামখেয়ালী, তেমনি বন্ধুবৎসল, যেমন উচ্ছৃঙ্খল তেমনি কর্তব্য পরায়ণ! দর্শকদের চাহিদা সম্বন্ধে সব সময়ে সজাগ ছিলেন। কখনো যদি কর্তব্যে ত্রুটি ঘটত, অনুশোচনার অন্ত থাকতো না তাঁর! বলতেন, যারা আমাকে ভালবেসেছে, তাদের প্রতি যেন কখনো অবিচার না করি।

তুচ্ছতম সহকর্মীর প্রতিও তাঁর সহানুভূতি এবং উপচিকীর্ষা যে কত গভীর ও অকৃত্রিম ছিল তার একটি ঘটনা নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য সেদিন আমাদের বললেন। জীবনের শেষ ছ'সাত বছর। শ্রী ভট্টাচার্যের বহু নাটক তিনি প্রযোজনা করেছেন এবং সেই সব নাটকে অদ্ভুত সুন্দর অভিনয় করে দর্শকদের চমৎকৃত করেছেন, যথা মাটীর ঘর, বিশবছর আগে, রক্তের-ডাক, তুমি আর আমি ও চিরন্তনী। সেই ক'বছর শ্রী ভট্টাচার্য তাঁর প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন বললেই হয়।

রঙমহলে রক্তের ডাক চলছে। খুব বিক্রী। প্রতিরাত্রেই হাউসফুল। একদিন এক সিকটার ড্রেসিংরুমের সামনে এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল। কী ব্যাপার? সিকটারের মেয়ের বিয়ে। কিছু টাকার তা'র দরকার। কত টাকা? তা, পাঁচশ হলেই হয়। হ্যাঁ, পাঁচশ টাকার কমে একটা বিয়ে কি করে হয়। তা গিয়ে যামিনী বাবুকে বল্‌না। আজ্ঞে বলেছিলুম, তিনি বললেন এক পয়সাও দেবেন না, আমি সকলের কাছে কিছু কিছু সাহায্য নিচ্ছি। এক টাকা আট আনা করে অনেকেই দিয়েছেন। তাতে কত উঠেছে? তা তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকা হবে। দুর্গাদাস বললেন, এভাবে কতদিনে টাকা তুলবি? বিয়ে কবে? এই সামনের শনিবারে? আচ্ছা এক কাজ কর, শুক্রবার দিন সকাল বেলা আমার বাড়ী থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে যাস। কাঁদিসনি। তোর মেয়ের বিয়ে ঠিকই হবে।

বৃহস্পতিবার দিন যথারীতি অভিনয় হচ্ছে। তৃতীয় অঙ্কের গোড়ার দৃশ্যের সময় দুর্গাদাস দেখলেন স্টেজের এক কোনে দাঁড়িয়ে সিকটারটি হাউ হাউ করে কাঁদছে। কী হলরে আবার? পরশু মেয়ের বিয়েতো? সব ঠিক আছে? কাল সকালে আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে যাস। বললেন দুর্গাদাস। আজ্ঞে, টাকা আপনার কাছ থেকে ঠিকই পাব কাল, কিন্তু পরশু ছুটি পাব না। ছুটি না পেলে মেয়ের বিয়ে কেমন করে দেব বাবু? দুর্গাদাস অবাক হয়ে বললেন, সেকি! একদিন আর ছুটি দিতে পারলেন না যামিনী বাবু? কি বললেন তিনি? আজ্ঞে, তিনি বললেন, বড্ড ভিড়ের চাপ, ভেতরে লোক কম। তাই এখন ছুটি দেওয়া চলবে না। আর তারি তো বিয়ে, লোক আসবে আড়াইজন, খাবে দেড়জন। তার জন্যে আবার ছুটি কেন? থিয়েটারের পর গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিস। সিকটারের কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেন দুর্গাদাস, বললেন, আচ্ছা প্লের পর আমার সঙ্গে দেখা করিস। অভিনয় শেষ হল। দুর্গাদাস

নিজের ঘরে মেক আপ তুলছেন, শিফটার এসে দাঁড়াল। দুর্গাদাস হয়ত ইতিমধ্যে তার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে বলেছিলেন। বললেন, ওরা তো ছুটি দিলে না, কিন্তু তার জন্যে তো মেয়ের বিয়ে আটকাতে পারেনা। তুই শনিবার আসিসনা। শিফটার জোড় হাতে বললে, আজ্ঞে বাবু, তাহলে যে আমার চাকরি যাবে। দুর্গাদাস বললেন, সে আমি বুঝব। তোর কোনো ভয় নেই। আমি তোকে ছুটি দিলাম।

তারপর, শুরু বাদে শনিবার এল। ফুল হাউস। একসট্রা চেয়ার পড়েছে। রেকর্ড সেল—৩২০০ টাকা। ছটা বাজল, সাড়ে ছটা বাজল, সাতটা বাজতে চলল, দুর্গাদাসের দেখা নেই। ক্রমে প্রেক্ষাগারে গোলমাল শুরু হল, যাচ্ছেতাই ব্যাপার। সমস্ত টাকা দর্শকদের ফেরৎ দিতে হল। দুর্গাদাসের সেদিন আর দেখা পাওয়া গেল না।

পরদিন রবিবার যথাকালে দুর্গাদাস থিয়েটারে হাজির হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর বোমার মত বিদীর্ণ হলেন কর্তৃপক্ষ। ব্যাপার কি, কাল কি হয়েছিল? হয়নি কিছুই। এমনি এলায় না। আমাদের শিফটারটির মেয়ের বিয়ে ছিল, সেখানে গিয়েছিলাম। শুনে কর্তৃপক্ষের কী চিৎকার। আমাদের ইচ্ছে করে ক্ষতিগ্রস্ত করা, অপদস্থ করা। দুর্গাদাস হাসলেন, সেটুকু বোঝাবার জন্যেই তো আসিনি। মেয়ের বিয়ের দায় তোমারও যেমন আমারও তেমনি আর ঐ শিফটারেরও তেমনি। তোমার দরকার হলে থিয়েটারের তবিল থেকে পাঁচহাজার নিতে, দরকার হলে আমাকে দিতে, কিন্তু ঐ শিফটারটাকে পাঁচশোটা টাকা দিলে না। তাকে পাঁচশটা টাকা আর একদিনের ছুটি দিলে এই বত্রিশ শো টাকা গাঁটগচ্চা যেতনা। ভুলে যেওনা আমাদের এই নাট্যচালনায় শিফটারের প্রয়োজনও কম নয়। আর তার চেয়ে বড় কথা ভুলে যেওনা যে সেও মানুষ। তার মেয়ের বিয়ে, তার জীবনের মস্তবড় ঘটনা। মানবতার দিক থেকে তোমার আমার চেয়ে সে ঘটনা কিছুমাত্র কম নয়।

[আগামীবারে যোগেশ চৌধুরী]

নব নব রূপে

জেসপ রিক্রিয়েশন ক্লাব

গতমাসের নানা অভিনয়

কয়েকদিন আগে জেসপ ক্লাবের সভ্যরা স্টার মঞ্চে অভিনয় করলেন দীপক রায়চৌধুরীর লেখা নাটক 'ক্রীতদাস'। এই নাটকের নায়ক হামিদ ধর্মঘটের নেতারূপে শৃঙ্খলিত মানুষের মুক্তির সন্ধান খোঁজে। এই ব্রতে সে প্রেরণা পায় বহুযুগ আগেকার রোমান সাম্রাজ্যের বিদ্রোহী দাস-নেতা স্পার্টাকস-এর কাছ থেকে। নাটকটির মধ্যে নিঃসন্দেহে নতুনত্ব আছে এবং উপস্থাপনা, নির্দেশনা এবং অভিনয় গুণে নাটকটি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে। পরিচালনায় শ্যামাকান্ত দাস, আবহসঙ্গীতে শ্রীপতি দাস, আলোক সম্পাতে গোপাল দাস, ব্যবস্থাপনায় শশাঙ্ক হাজরা এবং অভিনয়ে সুপ্রকাশ বন্দ্যো:, সমর চৌধুরী, শিশির মণ্ডল, পান্না ঘোষ, রাম মল্লিক, মিহির দাসগুপ্ত, প্রমোদ দে, সুধীর সেন, সুশীল চট্টো, প্রফুল্ল দে, নিমাই দাস, গৌর চৌধুরী ও শ্রীমতী তৃপ্তি দাস স্ব স্ব দায়িত্ব বিশেষ নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে পালন করেন। দলগত অভিনয়ের উৎকর্ষ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নীলরতন মেডিকেল ক্লাব।

সম্প্রতি এই ক্লাবের সভ্যবৃন্দ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন 'রঙমহলে'। রমেশ রায়চৌধুরীর নির্দেশনায় এই নাটকটি নাট্য-রসিকদের প্রভূত প্রশংসা মিটিয়েছে। 'ছটবিহারী' 'মহাভারত, ও 'সুখোভন' চরিত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করেছেন ভবেশ চক্রবর্তী, সরোজ সেনশর্মা, ও রমেশ রায়চৌধুরী। রাহু রায় ও তনি মুখোপাধ্যায়ের 'কল্যানী' ও 'বিমলা' দুটি স্বচ্ছন্দ সু-অভিনয়। অন্যান্য চরিত্রে সু-অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পেয়েছেন—বিজেন চক্রবর্তী, মনীষ হোমরায়, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান সুদীপ, নীহার দত্ত, কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সরল বসু, গোপাল সরকার, ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ-গোস্বামী, বরেন চৌধুরী, কবিতা গঙ্গোপাধ্যায়, অতন্দ্রা সরকার, খুকু ভট্টাচার্য।

গ্রুকোমেট লিমিটেড।

কিছুদিন আগে এর সভ্যবৃন্দ নেতাজী সুভাষ মঞ্চে 'বহ্নিশিখা' নাটকটি পরিবেশন করেন। বিনেন বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকের সংঘবদ্ধ অভিনয় সার্থক হয়ে উঠেছিল। কয়েকটি চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন কিতীশ চক্রবর্তী, রতন রায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অলোক মল্লিক, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাদল সেনগুপ্ত, গীতা নাগ, অনন্তা কর, অলকা গঙ্গোপাধ্যায়।

মেট্ট ব্যাঙ্ক।

এই অ্যাসোসিয়েশনের শিল্পীবৃন্দ 'স্টার' রঙমঞ্চে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আবাহ' নাটকটি নিবেদন করেছেন। এই নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেছেন ইন্দ্রজিৎ সেন। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেন—সঙ্গীতময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ মুখোপাধ্যায় নীতীশ ঘোষ, তরুন তপন বসু, নরেন দত্ত, মনীন্দ্রলাল প্রামাণিক, ভূপাল বসু, সুকর্ণ বসু, সুরেন্দু বসু, মুরারি চক্রবর্তী, তরুন সেনগুপ্ত, সমীর বসু, সূর্য সান্যাল, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, রবীন মান্না, চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ সেন, রাহু রায়, সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও জয়শ্রী কর।

দুর্গাপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব।

সম্প্রতি এঁরা রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে এঁদের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে 'ও স্বর্গে যাবে না' নাটকটি পরিবেশন করেছেন। প্রদ্যোৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ সেনগুপ্ত নির্দেশিত এ নাটকের কয়েকটি ভূমিকায় রূপ দেন—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, মুক্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধীর মিত্র, দেবনারায়ণ দত্ত, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, লীলা দত্ত, মিতা ঘোষ, নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেনগুপ্ত।

ভারতী নাট্য পরিষদ (উত্তরপাড়া)।

এর শিল্পীবৃন্দ এই পরিষদের আটত্রিশ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' অভিনয় করেন। নাট্য নির্দেশক দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন—দীনেশ মুখোপাধ্যায়, রাজেন মুখোপাধ্যায়, অমর গোস্বামী।

বহুরূপ সাংস্কৃতিক সংস্থা।

সম্প্রতি এই সংস্থা প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে শ্রীসুধীর সরকার বিরচিত 'ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এটি একটি হাসির নাটক। নাটক নির্বাচনে, দলগত অভিনয়ে এবং সঙ্গীত পরিচালনায় বহুরূপের এই নবতম নাট্য-প্রয়াস সর্বাঙ্গীন সফলতা লাভ করেছিল।

মুক্তধারা'।

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক-অফ ইণ্ডিয়ার কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের অষ্টম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিশ্বরূপা মঞ্চে এক নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সভাপতি ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহেমচন্দ্র গুহ। প্রধান অতিথি, শ্রীমতি আশাপূর্ণা দেবী। আশীষকুমার সান্যালের একাংক 'বিয়োগ বিধুর' এবং অনিল দত্তের পূর্ণাংগ 'লৌহ-প্রাচীর' এই দুটি নাটক ঐ অনুষ্ঠানে অভিনীত হয়। নাটক দুটি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন চিত্রয় বিশ্বাস। সামগ্রিক অভিনয় উচ্চমানের। তার মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তপন মিত্র, আশীষ সান্যাল এবং চিত্রয় বিশ্বাস। এঁদের সঙ্গে ছন্দ বজায় রেখে সুঅভিনয় করেন, অরুণ দত্ত, সমর চ্যাটার্জী, প্রভাষ দত্ত, কানু পাল, অমল ঘোষাল, শিব সিংহ, চন্দ্র নিয়োগী, অজু সাহুলী, ও লতিকা দাসগুপ্ত। আবহসঙ্গীত পরিচালনা করেন মুরারী দত্ত। ঐ উপলক্ষ্যে প্রভাস দত্তের মূকাভিনয় ও শিপ্রা সেনের নৃত্য দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান

আশ্রমিক সঙ্ঘের সদস্যরা বছরে বছরে এবং মধ্যে মধ্যে যে সব রবীন্দ্র-নৃত্যগীতিনাট্যের অভিনয়ের আয়োজন করেন তাদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র এবং বিরল বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃশ্য, আলো, বাজনা এসবের মধ্যে থাকেনা চটকদার বাহুল্য, অভিনয় ও সঙ্গীতের সুর থাকে একটি অনতিক্রমনীয় এবং অনাবিল শুদ্ধতায় বাঁধা, পোষাক আসাক এবং দৃশ্য সজ্জায় থাকে নাটকানুযায়ী শিল্পকৃতির উৎকর্ষের ছাপ। এর ফলে যাঁরা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যগুলির বিশুদ্ধতম প্রকাশ দেখতে চান তাঁদের কাছে আশ্রমিক সঙ্ঘের অনুষ্ঠান, বহু ইপ্সিত এবং বহু প্রতীক্ষিত।

এবছর রবীন্দ্র সদনে তাঁরা তাঁদের সাফল্যমণ্ডিত এবং সার্থকভাবে রূপায়িত পালাগুলিরই অভিনয় করবেন, যথা, ৬ই ও ৭ই জুলাই মায়ার খেলা, ১০ জুলাই তাসের দেশ, ১১ই জুলাই বাল্মীকি প্রতিভা, ১৩ই জুলাই ভানুসিংহের পদাবলী ও ১৪ই জুলাই চিত্রাঙ্গদা।

এই নৃত্যনাট্যগুলির পরিবেশনে আশ্রমিক সঙ্ঘের শিল্পীরা ইতিপূর্বে যে বিশেষ প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, আশা করা যায় এবারকার অভিনয়েও সেই নৈপুণ্যেরই শুধু নয়, অধিকতর উৎকর্ষ-সম্পন্ন শিল্পসৃষ্টির পরিচয় প্রদান করবেন।

পি অ্যাণ্ড টি রিক্রিয়েশন ক্লাব (বাগবাজার)

সম্প্রতি বিনার্তা রঙ্গমঞ্চে পি এণ্ড টি রিক্রিয়েশন্ ক্লাব বাগবাজার ইউনিট কর্তৃক জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজা বদল' নাটকটির অভিনয় হয়। শামু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনা নৈপুণ্যে নাটকটি প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। দলগত অভিনয় মনোরম। দৃশ্যসজ্জাও চমৎকার। দর্শকদের প্রশংসা পান হীরালালের চরিত্রে শ্রীসাধন মৈত্র। প্রধান ডাক্তারের ভূমিকায় শ্রীঅনিল মিত্র তাঁর কর্মজীবনের (টেলিফোনে) শেষ অভিনয় অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। অন্যান্য চরিত্রে প্রভাস চক্রবর্তী, অরুনাভ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ রায়, সুবিমু দাসগুপ্ত, প্রকাশ ঘোষাল, সুধীর সরকার, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, রবীন চক্রবর্তী, অজিত চ্যাটার্জি, লালবিহারী ঘোষ, মেঘনাদ মুখার্জী ও অজিত রায়গুরু সুন্দর অভিনয় করেন। স্ত্রীচরিত্রে জোলার মা-এর ভূমিকায় মমতা ব্যানার্জি অপূর্ব অভিনয় করেন।

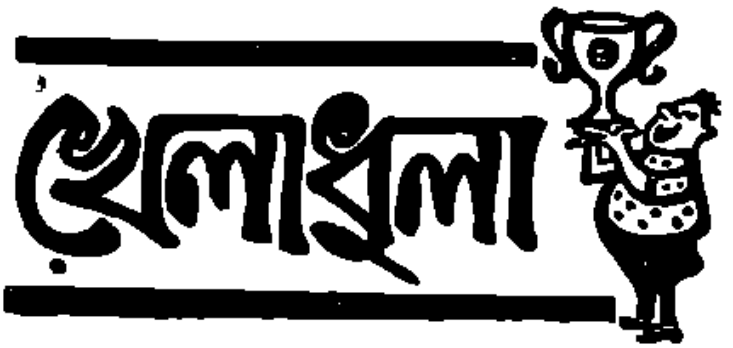

জ্যোতির্ময়

কাঙারু বনাম সিংহ

এ মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটদল ইংলণ্ড সফর করছে। প্রতিদিন দৈনিকপত্রে আমরা তাদের খেলার ফলাফল পড়ছি। সুতরাং সে সম্বন্ধে তাদের খেলার খতিয়ান পাঠক নিত্য পাচ্ছেন। সফরের শেষে একটি পরিসংখ্যান দেবার ইচ্ছা রইল। এই সংখ্যায় অস্ট্রেলিয়ান দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত, যাঁর খেলা দেখানোর ওপর অস্ট্রেলিয়ান দলের জয়-পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করছে, সেই দলপতি বা কাপ্তেন সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। একাধিক কারণে অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছেন। অধিনায়কের নাম আপনারা সকলেই জেনেছেন। বিল লরি। প্রথমত বিল লরি এই প্রথম অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। তাঁর আগে যে দুজন বাঘা বাঘা অধিনায়ক পর পর ছিলেন, যথা—রিচি বেনো এবং ববি সিমসন, জগতের শ্রেষ্ঠ অধিনায়কদের মধ্যে তাঁদের স্থান স্বীকৃত হয়েছে। তাঁদের পরেই বিল লরি। তরুণ অধিনায়কের পক্ষে এ এক দারুণ পরীক্ষা বই কি! বিল লরি। বছর ২৮ বয়েস। খড়্গনাসা। ছ'ফুট দু ইঞ্চি। প্রথম প্রথম তাঁর সাথীরা তাঁর নামকরণ করেছিল—দি ফ্যানটম। কারণ বিল লরি ঐ কৌতুকচিত্র-সিরিজ অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

১৯৬১ সালে রিচি বেনোর দলের সঙ্গে লরির প্রথম ইংলণ্ড অভিযান। সার্থক হয়েছিল তাঁর সে বছরকার সফর। প্রথম ছুটির ব্যাটস্‌ম্যানরূপে এই ন্যাটা খেলোয়াড় আর্থার মরিস-এর শূন্য স্থান পূর্ণ করলেন। প্রথম টেস্ট খেলবার আগেই চারটি সেঞ্চুরি হাঁকালেন। ওভ্যালে প্রথম ম্যাচে নেমেই ১৬৫ রাণ করলেন। লর্ডসে করলেন ১০৪ এবং ৮৪ নট্ আউট। ঐ মাঠেই প্রথম টেস্ট-এ নেমেই ১৩০ রাণ করে তিনি অতুলনীয়-বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। সে বছর তিনি ইংলণ্ডে মোট রাণ করেন ২০১৯। গড় ৬১'১৮। ৯টি সেঞ্চুরী। এর আগে ইংলণ্ডের মাটীতে মাত্র দুজন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটস্‌ম্যান্ ২০০০-এর ওপর রাণ করেন, ডন ব্র্যাডম্যান (১৯৩৮-এ ২৪২৮ রাণ) এবং নীল হার্ভে (১৯৫৩-তে ২০৪০ রাণ) সে বছর লরির টেস্ট খতিয়ান হল মোট ৪২০ রাণ (৫টি টেস্ট)। গড় ৫২'৫০।

ববি সিমসন-এর সঙ্গে ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গিয়ে লরি তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। অবশ্য একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে প্রথম উইকেট জুটির রাণ সম্পর্কে। সিমসন করেছিলেন ৩১১। লরি ১০৬। প্রথম উইকেটে রাণ উঠেছিল ২০১।

১৯৬৫ সালে সিমসন এবং লরি ওয়েস্ট ইণ্ডিজএ গিয়ে ব্রিজটাউন টেস্ট-এ হল, গ্রিফিথ, গিব্‌স এবং

সোবার্স—এদের বোলিংএর বিরুদ্ধে দুজনেই ২০০ ওপর রান করেছিলেন। প্রথম উইকেটের পতন হয়েছিল ৩৮১ রাণে। এটি একটি অষ্ট্রেলিয়ান রেকর্ড। বিশ্বরেকর্ডের চেয়ে ৩২ রাণ কম। এটি একমাত্র দৃষ্টান্ত যাতে প্রথম জুটির দুজনেই ২০০ ওপর রান করেছেন কোনো টেস্ট ম্যাচে। লরি ২১০। সিম্পসন ২০১। সেবছর টেস্ট ব্যাটিংএ শীর্ষস্থান পেলেন বিল লরি। মোট রাণ ৩৬৮। গড় ৫২'৫৭।

ইংলণ্ড সফরের আগে পর্যন্ত তাঁর টেস্ট গড় দাঁড়াল, ৬২ টেস্ট, মোট রাণ ৩৩৩০, গড় ৪৭'৫৭।

"একটি নমস্কারে প্রভু"

ক্রিকেট খেলতে নেমে ব্যাটসম্যান উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে খেলা শুরু করবার আগে চোখ বুজে হাত জোড় করে প্রার্থনা করছেন—এরকম দৃশ্য সত্যিই দেখা গেছে, এবং দেখা গেছে ইংলণ্ডের মাঠে খাস ইংলণ্ডবাসীর খেলায়। অর্থাৎ জুড়ে কুসংস্কারের হাত থেকে বুঝি কারুরই রেহাই নেই। কিন্তু তাই বলে ব্যাট করতে নেমে, আম্পায়ারের কাছে গার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে বোলার বল শুরু করবার আগে হঠাৎ দুহাত জোড় করে প্রার্থনা শুরু করে দেওয়া—এ দৃশ্য সত্যিই বড় বিরল এবং বিচিত্র।

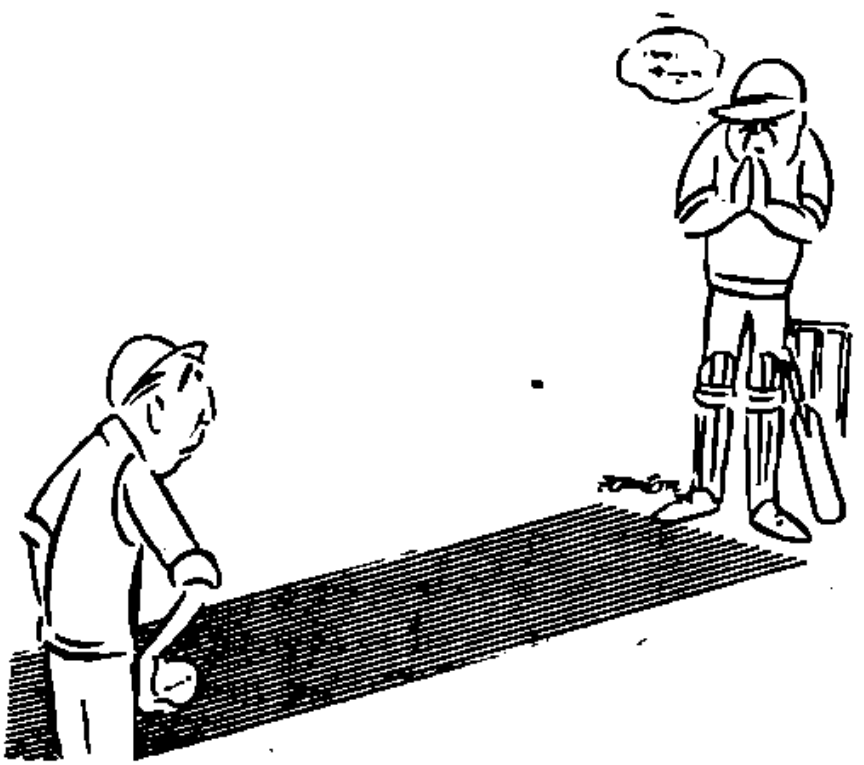

এই অদ্ভুত সংস্কারের নায়কের নাম এ. ই. নাইট, বিগত দিনের এক জনপ্রিয় খেলোয়াড়।

লিস্টারশায়ার দলের হয়ে খেলতেন। ১৯১১ সালে তিনি ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশেষ প্রশংসা এবং খ্যাতি অর্জন করেন। ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁর একটি প্রামাণিক বইও আছে।

অত্যন্ত শুদ্ধচরিত্র, ভদ্রলোক এবং ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন এ. ই. নাইট। সেজন্যে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি প্রার্থনায় অতিমাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন। বলতেন, যে কোনো কাজের আগেই আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করলে ফল পাওয়া যাবেই। তাই তিনি খেলতে নেমেই ব্যাটিং শুরু করবার আগে, একটু পাশে

ঘরে গিয়ে মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করে নিতেন। যারা এ দৃশ্য প্রথম দেখত তারা অবাক হয়ে যেত বৈকি। এ আবার কী ছুতুড়ে কাণ্ড!

সে সময়কার দুর্ধর্ষ বোলার ছিলেন ওয়ালটার ব্রিয়ারলি। তিনি সে বছর একটি কাউন্টি খেলায় নাইটের বিপক্ষে প্রথম খেলাতে নেমেছেন। এর আগে তিনি নাইটের ব্যাটিং দেখেননি। নাইট খেলতে নামলেন। গার্ড নিলেন। ব্রিয়ারলি ওদিকে থেকে বল করবার জন্যে প্রস্তুত, উদ্যত। এমন সময় নাইট যথারীতি তাঁর প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। বোলার ব্রিয়ারলি তো অবাক। বল করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। নিজের দলের অধিনায়কের দিকে চেয়ে হেঁকে উঠলেন, "লোকটা করছে কি!"

অধিনায়ক ম্যাকলারেন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলে উঠলেন—"শ্‌শ্‌শ্‌..... উনি প্রার্থনা করছেন।"

ব্রিয়ারলি চিৎকার করে উঠলেন—"প্রার্থনা! খেলতে নেমে এভাবে ভগবান ডাকানো, এ তো নীতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার! আমি এম. সি. সির কাছে অভিযোগ পেশ করব।"

আই. এফ. এ.

ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই নামটির গুরুত্ব সীমাহীন বলা যেতে পারে, কারণ এদেশে ফুটবলকে জনপ্রিয় করতে এই সংস্থার অতুলনীয় অবদানের কথা শুধু এদেশে নয়, ও দেশেও স্বীকৃত। বহুদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে আই. এফ. এ। সে সময় এই সংস্থাই ছিল ভারতীয় ফুটবলের সর্বনিয়ন্ত্রণ সংস্থা। ভারতের এই প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের বয়স হল পঁচাত্তর। এবছর তাই মহাসমারোহে এই সংস্থার প্লাটিনাম জুবিলি প্রতিপালিত হচ্ছে। আই. এ. এ. এর জন্ম হয় ১৮৯০ সালে। তখন তার কর্তৃত্বাধীনে ছিল মাত্র ২০টি ক্লাব। বর্তমানে তার অধীনে আছে ২৭৮ ক্লাব, ১৬ জেলা এসোসিয়েশন ৫ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪ অফিস ফেডারেশন। পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে আজ আই. এফ. এর অতীত দিনের অনেক কথাই মনে পড়ছে। তখন ছিল শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব আর প্রতাপ। তারই মধ্যে তাদের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে বাঙালী তথা ভারতীয়দের জন্যে সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেবার জন্যে যে ক'জন বাঙালী ক্রীড়াবিদ এই শহরে বাঙালী-ফুটবলের ভিত্তি সুদৃঢ় করে গেছেন তাঁদের নাম আজ বেবাক ভুলে গেছি আমরা। কিন্তু তাঁরা বাঙালী-ফুটবলের উন্নতির জন্যে যা করে গেছেন তা আই. এফ. এর ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হওয়া উচিৎ। শোভাবাজার ক্লাবের কালীচরণ মিত্র, নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ভালহৌসীর পি. কে. বিশ্বাস ও পরে মোহনবাগানের শৈলেন বসু—ফুটবল ছিল এঁদের ধ্যানজ্ঞান মন প্রাণ! কালীচরণ মিত্র ছিলেন আই এফ এর কার্যকরী সমিতির প্রথম ও একমাত্র ভারতীয় সদস্য। পরে অক্ষয় মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন বসু ওই সমিতিতে মনোনীত হন। শৈলেন বসু কিছুদিন আই এফ এর সম্পাদকও ছিলেন। তখনকার দিনের এই পাঁচজন বাঙালী ছিলেন কাজে কর্মে কথায় বার্তায় অকুতো সাহসে আর বীর্যে সাহেব-গোরাদের সমকক্ষ। কোর্ট উইলিয়মের দ্বারে দাঁড়িয়ে তাঁরা মদমত্ত গোরাদের সঙ্গে সামনা সামনি লড়াই করেছেন, ভয়ে পিঠ দেখান নি, সাহেবদের রক্তচক্ষুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে তাঁরা সভায় বসে নিজেদের দাবী পেশ করেছেন, দাবী আদায় করেছেন। তাঁরা ছিলেন রাজভক্ত প্রজা। কিন্তু তাঁদের স্বদেশ বা স্বজাতী প্রীতি কোন দেশ-নেতার চেয়ে কম ছিল না। যথাস্থানে সে সময়কার কিছু ঘটনা বলব।

নীচুতলার মানুষের মরমীয়া কাহিনী

[যে সব রুশ লেখক বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে নিজেদের দেশে তো বটেই বিশ্ব সাহিত্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে নতুন করে মানুষকে চিনিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে, পুশকিন, গোগোল, আন্দ্রিভ, তুর্গেনিভ, দস্তয়েভস্কি, গর্কি, টলস্টয় ও চেকভের সঙ্গে আরেকজনের নামও স্মরণীয় হয়ে আছে—ভ্লাদিমির গারশিন। গারশিন বেশী লেখেননি, কিন্তু যা লিখেছেন তার প্রত্যেকটি উচ্চ শ্রেণীর রসসৃষ্টিরূপে অভিনন্দিত হয়েছে। তাঁর 'সিগনাল' গল্পটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পসংকলনের মধ্যে স্থান পেয়েছে। বাংলাতে এটি বহুবার অনূদিত হয়েছে। 'সাকরিফাইস' নামে তাঁর যে গল্পটির অনুবাদ এ সংখ্যায় দেওয়া হল সেটি তাঁর সর্বপ্রথম রচনা—ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল।]

চাকরি নিতে পারলাম না

ভ্লাদিমির গারশিন

অনুবাদক : মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

নিকোলের মত পরিশ্রমী, সহিষ্ণু এবং ভাগ্যনিষ্ঠ ভৃত্য সচারাচর পাওয়া যায় না। জুতো সেলাই থেকে আরম্ভ করে বাইবেল পাঠ—সমস্ত কাজেই তার সমান দক্ষতা। কিন্তু তবুও বহুদিন নিকোলে চাকরীর অভাবে অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার দেহ শ্রান্ত, অবসন্ন, অন্তর সীমাহীন হতাশায় তিক্ত, বিষন্ন। জীবনের প্রতি তার মমতা চলে গেছে, ঈশ্বরকে সে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।

শুধু পথ পথ আর পথ। আশ্রয় নেই, আহার নেই—নিষ্ঠুর ভগবান বুঝি তার কপালে এই পথের ওপরেই আশ্রয়হীন অকরুণ মৃত্যু লিখে দিয়েছেন।

কিন্তু না, পরমেশ্বর অতখানি মমতাহীন নন। পথ চলতে চলতে শহরের কাছে এসে নিকোলে হঠাৎ তার এক খুড়োর দেখা পেল।

একটি সুন্দর প্রশস্ত বাংলো। তারই গেটের সামনে তার খুড়ো যেন ভগবানের আশীর্বাদের মতই অপেক্ষা করছিল।

খুড়োর বয়েস হয়েছে, কিন্তু এখনো তার স্বাস্থ্য আছে অটুট। পাকা পেয়ারার মত তার সারা দেহে প্রাণরসের প্রাচুর্য।

খুড়ো ওই বাড়ীতে কোচম্যানের কাজ করে। আলাদা ঘর। সুন্দর সাজপোষাক, উর্দ্দী। প্রচুর অবসর। মনিবের প্রিয়পাত্র সে। শুধু মনিব যখন বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোন খুড়ো তখন লাগাম ধরে। অন্য সময়ে ছুটী।

নিকোলে বলল—"আমায় বাঁচাও খুড়ো। ছ'মাস প্রায় অনাহারে আছি।"

"বলিস কি! তোর মত কাজের লোক···আচ্ছা দেখি।"

সন্ধ্যায় খুড়ো বলল—"সুবিধে দেখছিনা। এক ব্যাটা বুড়ো খানসামা আছে। ভারী বজ্জাত। দেখি তার জায়গায় তোকে বহাল করতে পারি কিনা। মনিব যে সহজে রাজী হবে তা মনে হচ্ছে না। আজ রাতে তুই আমার ঘরেই থাক।"

"তোমার কেনা হয়ে রইলাম খুড়ো।"

নিকোলে চাকরী পেল।

সগর্বে খুড়ো বলল—"খানসামাটা খালি আমার নামে চুক্‌লি করত। তাকে তাড়িয়েছি। তার জায়গায় তুই কাল থেকে কাজ আরম্ভ করবি। আমি সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দেব। তবুও খুব হুঁসিয়ার।"

নিকোলে ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে লাগল।

সন্ধ্যেবেলায় নিকোলে বাড়ীর আশপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছিল। মৃদু বাতাসে আন্দোলিত ফুলের মতই তার মনে খুসী উপচে উঠছিল। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ। কে বলে তিনি নেই?

পিছন দিকে ভৃত্যদের থাকবার সারি সারি ঘর। সেখান দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তার চলা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের ভিতর চাপা কান্নার শব্দ, তার সঙ্গে সকাতর কণ্ঠস্বর। কে ওরা? অত কাতরতাই বা কিসের? নিকোলে ঘরের পিছনে গিয়ে কান খাড়া করে দাঁড়াল।

ভিতরে নারীকণ্ঠ শোনা গেল—

"আমাদের কি হবে বাবা?"

নিঃশ্বাস ফেলে এক বৃদ্ধ বলল—"ভগবান জানেন, মা। বোধ হয় অনাহারে আমাদের প্রাণ যাবে। এ বয়সে আর কি কোথাও চাকরি যোগাড় করতে পারবো?"

মেয়ে বলল—"কালই কি আমাদের যেতে হবে?"

"হ্যাঁ, কাল সকালেই। কোচম্যানের ভাইপো আমার জায়গায় বহাল হয়েছে। মনিব প্রথমে আমায় তাড়াতে চাননি। আমার নামে লাগিয়ে লাগিয়ে শেষকালে কোচম্যান ওর ভাইপোকে এনে আমায় তাড়াল।"

"এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবো বাবা?"

"কোথায় যাব? তাত জানিনা মা। এখন থেকে পথে পথেই আমাদের দিন কাটবে।"

মেয়ে কেঁদে ফেলল—"হা ভগবান!"

নিকোলে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বাড়ীর সামনে গেটের কাছে এল। গেটের বাইরে সুদীর্ঘ পথ সামনে প্রসারিত। বহু লক্ষ মানুষের পদচিহ্ন তার বুকে আঁকা। সেই পথ ধরে আবার বুঝি তাকে চলতে হবে।

সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে মনিব বাড়ী ফিরলেন। আজ সন্ধ্যেবেলায় তিনি নতুন খানসামাকে দেখবেন। নিকোলে খুড়োর ঘরে গিয়ে বলল—"হল না খুড়ো।"

"হ'ল না! কি হ'ল না?"

"আমার দ্বারা এ চাকরী করা হ'ল না।"

খুড়ো হাঁ করে তার দিকে চেয়ে বলল—"তার মানে?"

নিকোলে বলল—"মানে, এ বড় শক্ত কাজ। আমি পেরে উঠবো না। তুমি কিছু মনে কোরোনা খুড়ো, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আর একটা চাকরী খুঁজে নেব। এখন আসি।"

বিস্ময়-বিহ্বল বিরক্ত খুড়োকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিকোলে পথে নেমে এল। সীমাহীন শুভ্র পথ যেন দুই হাত মেলে তাকে বরণ করে নিল। মাথার ওপর পাশাপাশি দুটি তারা জলজল করছে। করুণাময় ভগবান যেন দুই চোখের মমতাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছেন।

নিকোলে আবার পথ ধরল।

———

দানিয়ুব হলো নীল

গৌরীশংকর দে

[এক শ বছর আগে সুরকার স্ট্রস স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর নতুন সুর জগৎ জয় করে নেবে!]

একই সুর ঝ'রে পড়ছে তেহেরানের ট্রান্সমিশ্টর রেডিয়ো থেকে। পৃথিবীর নানা দেশের সংগীত ভবন মুখরিত একটি সুরে। যে নদীর নামে নাম তার তীরে-তীরে অগনন কাজে রমণীয় পরিবেশে মগ্ন; তার মুখেও ওই একই সুর। এমন জনপ্রিয় সুর পৃথিবীতে সত্যি খুব কম সৃষ্টি হয়েছে। এক'শ বছর আগে জোহান স্ট্রস বাজিয়েছিলেন ব্লু দানিয়ুব ওয়ালজ। নাচের ছন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো যুবক-যুবতীর বুকের রক্ত। একশ বছর কেটে গেছে। আজো ওই সুরের আবেদন ঠিক সেদিনকারই মতো।

শুনতে অবাক লাগে যে ওয়ালজ পরবর্তীকালে হলো লঘু-হৃদয় মনোহারী ভিয়েনা নগরীর সাংগীতিক প্রতীক, তার জন্ম দানিয়ুব নদীর তীরে নয়। ভিয়েনাতেও নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দেশে। ফ্রান্সে। ফ্রান্স থেকেই ওই সুরের জয়যাত্রা শুরু। এর জন্ম কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অগাধ ঐশ্বর্য, রূপসী নারী এবং কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র—এক কথায় উনিশ শতকের উপন্যাসের সব ক'টি উপকরণ।

১৮৬৭ সাল। প্যারিসে শুরু হয়েছে বিশ্ব মেলা। সুরকার স্ট্রস আসবেন। খবর পেলেন রাজকুমারী পলিন মেটারনিক। অষ্ট্রীয় রাজদূতের স্ত্রী।

পলিনের মনে হলো স্ট্রসের সুর মিলনের সেতু বেঁধে দেবে প্রমোদ-বিলাসী প্যারিসবাসী আর সুখ-পরায়ণ ভিয়েনাবাসীদের মধ্যে। তা-ই যদি হয় তো রাজনৈতিক বাঁধও কি যায় না বাঁধা? অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রী স্থাপিত হ'লে প্রতিহত করা সম্ভব হবে বিসমার্ক-পরিচালিত জার্মানীর উদ্ধত উত্থান। সংগীতের পথ ধ'রে স্থাপিত হবে রাজনৈতিক মৈত্রী।

অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক মহলে অবশ্য এই ধরণের চক্রান্ত তখন খুবই পরিচিত। বৈদেশিক সম্পর্ক তখন পারিবারিক ব্যাপার। সংগীতের স্থান তো তাতে থাকবেই।

অস্ট্রিয়ার সার্থরক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধিই নির্বাচিত করলেন রাজকুমারী। সুরের জগতে স্ট্রস তখন সকলের মাথার মণি। তার সুরে নাচের ছন্দ জেগে উঠেছে যখন-তখন নর-নারীর মনে। পা হয়ে উঠছে চঞ্চল। প্যারিসে চলেছে বিশ্বমেলা। রাজকন্যার চক্রান্তের উপযুক্ত দৃশ্যপট।

ওই বছরই নতুন আখ্যা লাভ করেছে প্যারিস। নাম হয়েছে তার আলোর শহর। প্যারিসের হাজার-হাজার বাড়ির ছাদ আর অগনন বুলেভার্ড আলোকিত হয়ে উঠেছে গ্যাসবাতির আলোতে। গোটা প্যারিস শহরটাকেই মনে হচ্ছে মত্ত, আলো-ঝলমল, মেলা।

ওয়াল্‌জ-এর রাজা জোহান স্ট্রসের উপস্থিতি উজ্জ্বল প্যারিসকে আরো উজ্জ্বল ক'রে তুললো। সমবেত হয়েছেন সুইডেন, তুর্কী, গ্রীস, এশিয়া, বেভেরিয়া, বেলজিয়াম পর্তুগাল ইত্যাদি দেশের রাজগণ। তাঁদের মধ্যে স্ট্রস ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাজার মতো। তাঁরও যে যথেষ্ট গৌরব রয়েছে। বাবা ওয়াল্‌জ-এর বরেণ্য শিল্পী।

বালক অবস্থায় স্ট্রসের বাবা ঘুরে বেড়িয়েছেন ভিয়েনার শহরতলীতে সরাইখানা থেকে সরাইখানায়। বিভিন্ন অর্কেস্ট্রা দলের বাদক হিসেবে। লতাপাতায় ঘেরা ওই সরাইখানাগুলিতে স্থানীয় বেহালা-বাদকেরা বাজাতো অস্ট্রিয়ার লোক সংগীতের বুনিয়াদে নতুন এক নাচের সুর। স্থানীয় বাদকেরা একে বলতো 'ঘূর্ণী নাচ'। ঘুরবার সময় কোনো কিছু ধরে রাখলে ঘুরতে সুবিধা হয়। এই ধারণা থেকে নর-নারীর মনে হলো নাচের সময় তো পরস্পরকে আলিঙ্গন করা সম্ভব।

নতুন নাচের রীতিতে সত্যি যুবক-যুবতীদের অন্তরঙ্গতার সুযোগ অনেকখানি। তাই একে বন্ধ করবার জন্য রক্ষণশীলেরা মারমুখো হয়ে ওঠলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নতুন নাচের রীতি ছড়িয়ে পড়লো ভিয়েনার ঝলমল নাচ-ঘরগুলিতে। কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত য়ুরোপে। ১৮৩৮ সালে স্ট্রস সুরের জগতে অপরাজিত। তাঁর ডাক পড়লো রাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক-উৎসবে বাজাবার জন্য।

কিন্তু দেখা দিলো প্রবল এক প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নয়; তাঁরই নিজের ছেলে।

১৮৪৪ সালের ১৪ই অক্টোবর তরুণ জোহান শুরু করলেন সুর রচনা। একই সঙ্গে চার চারটি নাচের সুর। ভিয়েনার লোকেরা জানলো ওয়াল্‌জ-এর নতুন রাজা হাজির হয়েছেন।

সেই দিন থেকে শুরু হলো জোহানের গৌরবময় জীবন। সে জীবন একটানা সাফল্যের। বিভিন্ন সংগীত ভবনে বাজিয়ে নানা দেশে বেড়িয়ে কাটে জীবন। রাজকুমারী পলিন যখন কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করতে চাইলেন, জোহানের বয়েস তখন একচল্লিশ। প্যারিস শহরে যখন হাজির হলেন তখন তিনি সত্যি রাজা। চেহারায়, পোশাক-পরিচ্ছেদে, সফলতায়। তাঁকে দেখা মাত্র পাগল হয়ে যায় প্যারিসের মেয়েরা, সুর শুনে মজে যায়।

রাজকুমারী কূটনীতির জাল বিছিয়ে দিলেন। এক জমকাল আসরে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ও সাম্রাজ্ঞী ইউজেনীর সামনে সুর-হিল্লোল তুললেন তরুণ স্ট্রস। মৃতাবাসের নাচঘর সবুজ আর সোনালী সাটিনের পর্দায় মনে হয় স্বর্গলোক। মাঝখানে কৃত্রিম ফোয়ারা। উৎসারিত জলধারা সহস্র গোলাপের সৌরভে সুরভিত।

কিন্তু সম্রাট এবং দূতাবাসের স্বর্গীয় পরিবেশকেও যেন ম্লান ক'রে দিলেন স্ট্রস। ওই সন্ধ্যায় সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন নয়, সম্রাট স্ট্রস। শ্রোতারা প্রথমটায় নবীন সুরের মাধুর্য তেমন ধরতে পারেন নি। একটু পরেই কিন্তু তাদের চমকিত, বিস্মিত, পুলকিত আর আপ্লুত ক'রে দানিয়বের নীল জলস্রোতের মতোই প্রবাহিত হয়ে নাচঘরটি পরিপূর্ণ ক'রে দিলো নতুন সুর 'নীল দানিয়ব'। সুর শেষ হয়ে গেলো তবু স্তব্ধ শ্রোতমণ্ডলী। তারপর বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালি।

সমস্ত মেলায় নতুন সুরের কথা ছাড়া হয়ে গেলো। বারবার স্ট্রসের ডাক পড়লো 'নীল দানিয়ব' বাজাবার জন্য। কিন্তুতেই বুঝি পুরোনো হবার নয়। প্যারিসের সবগুলি অর্কেস্ট্রা গ্রহণ করলো ওই সুর। গোটা মেলার আবহ সংগীতই হয়ে উঠলো 'নীল দানিয়ব।' আগন্তুকদের মন থেকে কিছুতেই যেতে চায় না। সুর তো নয়, নেশা। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ, দেশী-বিদেশী সবাইকে মাতিয়ে তুলেছে জীবন-রঙ্গে।

প্রিন্স অব ওয়েলস যেদিন ফিরলেন গুণগুণ ক'রে ওই সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে। দিন কয়েক পরেই ইংল্যাণ্ডে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন স্ট্রসকে। স্ট্রস আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কনসার্ট উদ্যানে যখন নতুন সুরটি বাজালেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মতো অভিজাত মহিলাও মাথা না নাড়িয়ে পারলেন না।

ভিয়েনাতে স্ট্রসের প্রকাশক তখন বুঝে ফেললেন 'নীল দানিয়ব' কী বিপুল আর্ট এনে দেবে। স্বরলিপির চাহিদা মিটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। তিনবেলা মুদ্রাযন্ত্র কাজ করে যেতে লাগলো। মেডিয়ো বা রেকর্ডের সাহায্য ছাড়া কেবল নিজস্ব জাদুতেই 'নীল দানিয়ব' পৌঁছালো জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

আমেরিকায় স্ট্রস পেয়েছিলেন দেবতার সম্মান। তার মাথার একগাছি চুলের জন্য পথে-ঘাটে তাঁকে ঘেরাও করতো মেয়েরা।

শুধু সাধারণ মানুষ নয়, সুর-জগতের দিকপালেরাও স্বীকার ক'রে নিলেন স্ট্রসের প্রতিভা। হেবনার বললেন, "এমন সুরেলা মগজ য়ুরোপে আর কারোর নেই শ্রোতাদের ওপর স্ট্রসের অপ্রতিহত প্রভাবের কারণ, বিখ্যাত সুরটিতে তিনি ধ'রে রাখতে পেরেছেন সমকালীন ভিয়েনার খাঁটি মেজাজ—উজ্জ্বল আনন্দের পাশেই এক অবলুপ্ত জগতের জন্য রোমান্টিক আর্তি।

সব শিল্পের মতো 'নীল দানিয়ব'ও শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা। কেন না, বাস্তবের যে দানিয়ব তার জল নীল নয়, ধূসর-সবুজ। একটু ঘোলাটেও বটে। দানিয়বের স্রোতধারা নীল হয়েছে স্ট্রসেরই কল্পনার গুণে।

চলতি দুনিয়া

বন্ধুর জন্যে আত্মহত্যা

মোটর দুর্ঘটনায় বন্ধুর মৃত্যুতে ওই মোটরের চালক জুলিয়ান টসিয়ার এমনই মানসিক আঘাত পান যে দুর্ঘটনার কয়েক মিনিটের ভিতরে পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। জুলিয়ানের বয়েস মাত্র তিরিশ। তিনি একটি সংরক্ষিত বনের মালিক। কয়েকজন বন্ধু রাত্রিবেলা বেড়াতে এসেছিলো। সকালে নিজের গাড়িতে তাদের এগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন জুলিয়ান। পথে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রায় সকলেই সামান্য আঘাত পান। কিন্তু দেখা যায় ৩২ বছরের মার্সেলি মৃত। তিনি সামনের সীটে বসেছিলেন। বিচলিত জুলিয়ান বাড়ি ফেরেন। স্ত্রী তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি চিৎকার ক'রে বলেন, "আমি মার্সেলিকে খুন করেছি। আমি নিজেও মরবো।" এর পরই স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে নিজের মাথা লক্ষ্য ক'রে গুলি করেন। তার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

অভিনব ছবি চোর

কয়ানী দেশে সম্প্রতি ছবি চোর এক অদ্ভুত পরিবার বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মা দুই ছেলেকে নিয়ে এই অপহরণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে থাকে একটা বেড়াল, একটা কুকুর আর একখানা গাড়ি। ছবি ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে ইতিমধ্যেই পরিবারটি ৮৫,০০০ পাউণ্ড রোজগার করেছে। সমস্ত ফ্রান্সের প্রায় পঞ্চাশজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পরিবারটির বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে। একই কৌশলে তাদের ঠকানো হয়েছে।

আমেরিকায় তৈরী একটা মোটর গাড়িতে পরিবারটি হাজির হয়। চালিয়ে নিয়ে যায় একজন চালক। মায়ের পরনে থাকে একটি পশমী কোট ও হাতে থাকে শ্যামদেশীয় একটি দামী বেড়াল।

এক ছেলের কাছে থাকে একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর।

দুই ছেলেই এমনভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যায় যেন তারা শিল্পের মস্ত সমঝদার।

ছবি পছন্দ করে। চেকও লিখে দেয়। তবে চেক-এ ভুল স্বাক্ষর দেয়। যাতে ব্যবসায়ী চেক ভাঙাতে না পারে। তারপর উধাও হয়ে যায় পরিবারটি।

পুলিশ আজো তাদের হদিশ পায়নি। জানা গেছে পরিবারটির গাড়ি, গাড়ির চালক, মহিলার গায়ের কোট সবই ভাড়া-করা। শুধের নিজের বলতে আছে বেড়াল, কুকুর আর ব্যাঙ্কে কিছু আমানত। ওই মূলধনের সাহায্যেই তারা লাভের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

কেবল নাক ডাকার জন্য

রাত্রিবেলা হঠাৎ আগুন লেগেছিলো হোটেলে। হোটেলের পনেরো জন আগন্তুকই হয়তো অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যেতো। বেঁচে গেছে তারা সে কুপারের নাক ডাকার জন্য।

নাক ডাকার শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে স্ত্রী তার ঘুম ভাঙায়। ঘুম থেকে উঠে কুপার ধোঁয়ার গন্ধ পায়। উঠে দেখে হোটেলের রান্না ঘরে আগুন লেগে গেছে। চিৎকার, ডাকাডাকি শুরু ক'রে দেয়। ফলে সকলের প্রাণ বাঁচে।

বিয়ের মাত্র দুদিন পরেই

বিয়ের মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেই ২৮ বছর বয়স্কা মিসেস পেট্রিসিয়া চককে পাওয়া গেলো গুলিবিদ্ধ, মৃত অবস্থায়। সন্দেহক্রমে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ এনেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ডেনিস পেরির বয়স ৩৭। পেট্রিসিয়ার স্বামীর বয়েস ২০। মিসেস চকের মাথায় গুলি লাগে।

রোমান্সের সন্ধানে গায়িকা

বিখ্যাত গায়িকা কাথি কাবি খোলাখুলি স্বীকার করলো, "সত্যি আমি নিঃসঙ্গ। আমি স্বামী চাই। কিন্তু কে হবে?"

২৭ বছর বয়স্কা চিত্রতারকা অকপটে বলছিলো রোমান্সের কথা, নিজের কথা।

কাথি সম্প্রতি গেছে লণ্ডনের মে ফেয়ার-এ ৭৫,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে নির্মিত একটি বাড়িতে। "অন্য একজনের সঙ্গে এই বাড়িতে আমি থাকতে চাই। এর চাইতে সুখের বিষয় আর কী হতে পারে?"

"আমি সন্তান চাই। কিন্তু বিয়ে করতে চাই নিশ্চিত হয়ে। যেন বিয়েটা স্থায়ী হয়।"

ইতিমধ্যে গুজব রটে গেছে কাথি না কি বিয়ে করবে ম্যানেজার বার্ট অ্যামব্রসকে। এগারো বছর ধরে তিনিই তো ওর জীবনের ধারা পরিচালনা করেছেন।

কিন্তু কাথি বলে, "বার্টকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু তা অন্যভাবে। তিনি আমার বাবার মতো। তাই তার সঙ্গে তো আমার বিয়ে হতে পারে না। তবে আমি জানি তার সাহায্য না পেলে আমি টিঁকে থাকতে পারতাম না।"

দাড়ির জন্যে চাকরি হলো না

রাণীর আস্তাবল-রক্ষীর পদের জন্য দরখাস্ত করেছিলো পেট্রিক আক্রারি। ঘোড়া বিষয়ে নিজের সব অভিজ্ঞতার কথাই সে লিখেছিলো। কিন্তু দরখাস্তে একটা বিষয় সে একেবারেই উল্লেখ করেনি। তার যে দাড়ি আছে সে-কথা একটিবারও বলেনি।

এর জন্যই চাকরীটা তার হলো না। রাণীর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াগুলিকে যিনি শিক্ষা দেন সেই ক্যাপ্টেন সিসিল পেট্রিকের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করে দেন।

৮০ বছর বয়স্ক ক্যাপ্টেন মন্তব্য করেন, "দাড়ি-আলা যুবকদের আমি একেবারেই পছন্দ করি না।

রাণীর ঘোড়ার শিক্ষক হিসেবে আমি উপযুক্ত প্রার্থী ছাড়া ধরে নিতে রাজী নই। দাড়ির দিন আর নেই। এই লোকটি ইয়র্কশায়ারে একবারও জানায় নি তার দাড়ি আছে। রোজ ভোরে আমার শিক্ষিত ঘোড়াগুলির পিঠে একজন দাড়ি-আলা লোক চেপে বসবে এ আমি সহ্য করতে পারবো না।"

স্ত্রী এবং প্রণয়িনী

মেয়ে টাইপিষ্টটি সুন্দরী এবং ভদ্রলোকের প্রেমিকা। তার সৌন্দর্যের উল্লেখ ক'রে ভদ্রলোক নিজের স্ত্রীকে বিদ্রূপ করলেন। স্বামী মিষ্টার জ্যাক রবিনসন দুজনের মধ্যে আরো নানা বিষয়ে তুলনা করলেন ; এমন কি কী ভাবে তারা প্রেম করে সে বিষয়ে পর্যন্ত। মিষ্টার রবিনসন স্ত্রী ভায়োলেটকে নিয়ে দীর্ঘদিন বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। সেই সুখে বাধা পড়লো প্রেমিকা হেইডি হেলউইসের আবির্ভাবের পর থেকে। মিসেস রবিনসনের জীবন অসহ্য হয়ে উঠলো। মিসেস রবিনসনের বয়েস বর্তমানে ৫৬। বিচারক বলেছেন, মিষ্টার রবিনসন যে দীর্ঘকাল পর নারীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত এতে সন্দেহ নেই। তিনি তাই মিসেস রবিনসনের বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।

দুই স্ত্রী থাকার কারেদানা

পাকিস্তানী আহমদ হোসেনের দুই স্ত্রী। ওই দুজনের মধ্যে তীব্র কলহ দেখা দেওয়ায় এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কোথায় থাকে তখন আর বাড়ির শান্তি! এক নম্বর স্ত্রী মিসেস সুরালেহা হোসেন আদালতে সতীন মিসেস আগা হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। হোভাষীর মাধ্যমে তিনি বলেছেন, "আগা হোসেন আমার দিকে একটা জুতার ব্রাশ ছুঁড়ে মারে। আমি স্বামীকে বলতে যাই। ইতিমধ্যে সে সিড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাকে চুলে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। আমাকে চড়-চাপড় মারে। আমার বুকের উপরে উঠে বসে। তখন আমি পুলিশ ডাকি।" শুনানী মুলতবী আছে। তবে শোনা যাচ্ছে মিষ্টার হোসেন নাকি বলেছেন, "আমরা তিনজন আবার সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছি। ঝগড়া-বিবাদ সব মিটে গেছে।"

লিলিয়ান ব্রাউন

"ভিড়ের মধ্যেও এই সুন্দরী চোখে পড়ে।" লিলিয়ান ব্রাউন সত্যি সুন্দরী। জন্ম তার ব্রহ্মদেশে। জাপানীরা যখন ওই দেশ আক্রমণ করে তখন সে পালিয়ে যায় ভারত হয়ে অষ্ট্রেলিয়ায়। মেলবোর্ণের এক আসরে দেখা হয় ভাবী স্বামী রিচার্ডের সঙ্গে। রিচার্ড পোস্যাণ্ডের লোক।

অঙ্গনা-সংবাদ

দেবযানী

সুন্দরী মিস্ ইংগার স্টিভেন্স-এর পরিচয় সুইডেন দুহিতা ব'লে। তিনি কিন্তু নিজেকে আমেরিকান বলে মনে করেন। তিনি বলেন, "আমার বয়স যখন তেরো বছর তখন আমি সুইডেন থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আসি। এখানকার কানসাস প্রদেশের অন্তর্গত ম্যানহাটানের একটি হাই স্কুল থেকেই আমি পরে গ্র্যাজুয়েট হই।" এইগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বয়সটাকে হিসেবে ধরলে তাঁকে আমেরিকার নাগরিক হিসেবে গণ্য করা উচিত ব'লে তিনি মনে করেন। মিস্ স্টিভেন্স ওয়ার্নার ব্রাদার্স ও 'মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার'-এর মূক প্রযোজনার ছায়াছবি "কায়ারক্লীক"-এ অভিনয় করেছেন। তাঁর সঙ্গে অভিনয়ে আছেন জেম্স্ স্টুয়ার্ট ও হেনরি ফণ্ডা।

• • •

বারো বছরের মেয়ে ক্রিস্টিয়েন টুটেন মাকে গিয়ে বললে, "মা, একটা 'বেবি ক্যারেজ' ধার নেব অমুকদের কাছ থেকে একটুখানি? আমি আর মাদেলিন ভাইটি 'মা-বাবা' খেলা খেলব।" মা ভাবলেন, কী আর হবে তাই সম্মতি দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। দুই ভাইবোন (অবশ্য সহোদর নয় ওরা) ঘণ্টাখানেক বাদে ঠেলাগাড়িটা নিয়ে বাড়ি ফিরে এল—গাড়িতে একটি সত্যিকারের জীবন্ত শিশুকে নিয়ে! "এ কে? কোত্থেকে নিয়ে এলিয়ে একে? কাদের বাড়ির বাচ্চা?" বোন জবাব দিল: "ওই অঞ্চলের মধ্যে পড়েছিল, কারুদের বাড়ির নয়, আমরা তুলে নিয়ে এসেছি—মানুষ করব, বড় করব বলে।" শুনে ক্রিস্টিয়েনের মা তো হতবাক্, মেয়ে বলে কী! পুলিশে খবর গেল এবং পুলিশও যথারীতি দু'মাস বয়সের বাচ্চাবাবা ঐ পুরুষশিশুটির আদি বৃত্তান্ত সংগ্রহে লেগে গেল। তবে সঙ্গে সঙ্গে কোনও হদিশ পাওয়া যায় নি।

• • •

ডাঃ আর্নস্ট আকেন জার্মানীর জনৈক ক্রীড়া চিকিৎসক। বহুকাল ধরে তিনি ক্রীড়াবিদ্ ও অ্যাথলীটদের চিকিৎসা ক'রে এসেছেন। তারই অভিজ্ঞতায় তিনি জেনেছেন যে মেয়েরা দূরপাল্লার দৌড়ের জন্যে শারীরিক ভাবে নিখুঁত রকম উপযুক্ত। এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত। তিনি মনে করেন, মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক ভাল কুটনীতিজ্ঞ হতে পারে, যেমন তারা ম্যারাথন দৌড়ে হতে পারে সাফল্যের অধিকারিনী। ডাক্তার সাহেব বর্তমানে কয়েকজন গিন্নীবান্নী মানুষকে (অবশ্য গিন্নী মানেই প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা নয়) 'কোচ' করছেন। এদের মধ্যে একজনকার বয়স আটাশ বছর এবং দুই সন্তানের জননী। এই ভদ্রমহিলা দু'ঘণ্টা পনের মিনিটে তিরিশ কিলোমিটার দূরত্ব দৌড়তে সমর্থ। আকেনসাহেবের বিশ্বাস এখন এই যে, মহিলাটি অদূর ভবিষ্যতে মহিলা ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর মধ্যে বেসরকারীভাবে রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারবেন।

• • •

বাংলাদেশের খবর। কল্যাণীতে এই সেদিন যে 'জাম্বুরী' হয়ে গেল (চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে যা শেষ পর্যন্ত পণ্ড হয়), সেই সময়ে দেখা গিয়েছিল যে ট্রেণে বিনা টিকিটের যাত্রী বেশির ভাগই হচ্ছে মেয়ে। ঐ ক'দিনে মোট ৪৮০ জন লোককে ধরা হয় টিকিট ফাঁকি দেবার অভিযোগে। তার মধ্যে, আশ্চর্যের কথা, ২৪১ জন স্ত্রীলোক। কথাটা কিন্তু সত্যি। এদের জন্যে অনকয়েক মহিলা টিকেট চেকারকে নিযুক্ত করা হয়। এরকম একজন চেকারের উদ্যমে মেয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া ও জরিমানা বাবদ প্রায় ৩১৫ টাকা আদায় হয়।—এটা সরকারী মহলের খবর।

• • •

'কাপ' (Special Commonwealth African Assistance Plan) প্রকল্পের একটি বৃত্তি নিয়ে পাঠরতা টানজানিয়ার মেয়ে হিসেবে প্রথম হচ্ছে তার-এল-সালামের কুমারী মোয়াতুম মটেনগেতি—এই মেয়েটি নিউজীলণ্ডে বি, এসসি ডিগ্রী অর্জন করেছে। এর জন্যে পাঁচ বছর ওকে নিউজীলণ্ডে থাকতে হয়। তারপর ও ওয়েলিংটনের এক সহরতলীর কলেজে 'সাধারণ বিজ্ঞান' বিষয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষিকা হিসেবে থেকেছে। মোয়াতুমের সঙ্গে আগে থাকতেই বিয়ের কথা হয়ে রাখা ছিল টানজানিয়ার ছেলে আলি মালাসে-র। মালাসেও 'কাপ' বৃত্তি নিয়ে নিউজীলণ্ডে এসেছিল। বিয়ের পর ওদের দেশে ফিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা।

• • •

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশের দক্ষিণ অংশে কেম্পসী বলে একটা জায়গা আছে। এখানকার শ্বেতাঙ্গ মহিলারা যখন শুনতে পেলেন যে, সাতটি আদিম অধিবাসী পরিবার ওঁদের প্রতিবেশী হতে আসছে, তখন ক্ষোভে দুঃখে একজায়গায় মিলিত হয়ে তাঁরা সমবেতভাবে চোখের জল ফেলেন। বর্ণ-বৈষম্যের বিষ এর মূলে, বোঝাই যায়। এখানকার শ্বেতাঙ্গরা পাশের বাড়ির প্রতিবেশী হিসেবে কালো আদিবাসীদের পেতে চাননা। এবং তাঁরা নিজেরা স্থানান্তরে যেতে রাজি। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে: মিসেস গ্রাহাম বলে জনৈকা শ্বেতাঙ্গ গৃহিণী বলেন, "শাদা চামড়ার পরিবার এমন অনেক আছে যাদের প্রতিবেশী হিসেবে অভ্যর্থনা ও স্বীকার করা শক্ত। আমি নিজে রং নিয়ে বাছাবাছি করি নে। এতে কী আসে যায়?"

• • •

টোরন্টো শহরে একদিন একটি বাইশ বছরের মেয়ে হৈচৈ লাগিয়ে দিল। মেয়েটির হাতে ছিল একটা গুলি-ভরা পিস্তল, পিছনে ছিল পুলিশের তাড়া। একটা সরাইখানা থেকে একটি পুরুষ মানুষ বেরিয়ে আসছিল, সেই সময় তাকে প্রথম গুলি করে মেয়েটি। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে চালককে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে জোরে চালাতে বাধ্য করে। ভয় দেখাবার জন্যে ট্যাক্সির মিটার ও রেডিও লক্ষ্য ক'রে কয়েকবার গুলিও ছোঁড়ে। চালক অবশ্য চেষ্টা করেছিল পিস্তলটা কেড়ে নেবার বা ফেলে দেবার, কিন্তু তার আগেই মেয়েটি তার কপালে আর গায়ে জখম ক'রে দিয়েছে। এরই পরে—সামনে ছিল পুলিশগাড়ির এক ব্যূহ—গাড়িখানা সশব্দে আটকে গেল তাইতে। ক্যারল অ্যান টমলিনসন নামের মেয়েটিকে তখন গ্রেপ্তার ক'রে জোড়া খুনের চেষ্টার দায়ে চালান দেওয়া হয়। আর ভীষণরকম আহত ট্যাক্সিচালককে পাঠান হল হাসপাতালে।

• • •

তামিল ভাষার ছায়াচিত্রের অভিনেত্রী দক্ষিণ ভারতের কুমারী কে, আর, বিজয়া তাঁর বর্তমান

পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন বলে জানা গেল। প্রতিভাময়ী এই অভিনেত্রীটি মাত্র দু'বছরের মধ্যে চরম খ্যাতি লাভ করেন। সিনেমাশিল্পের প্রতি বিরক্তির কারণে নয়, ব্যক্তিগত কারণেই তিনি অভিনয় করা ছেড়ে দেবেন বলে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছেন। এ-লাইনে আসবার আগেই নাকি এটা ঠিক করা ছিল। এই দু'বছরে নাম ও যশ পেয়েছেন প্রচুর, এবং নিজেই নাকি বলেন, 'আমি যা রোজগার করেছি তা দু'পুরুষ ধরে ভোগ করা চলবে'। খ্যাতনামা সাবিত্রী ও পদ্মিনী বিদায় নেবার পর উজ্জ্বল আলো ছিলেন বিজয়া। শক্তিশালী চিত্রশিল্পের খুব ক্ষতি হবে বিজয়াও বিদায় নিলে—সবাই বলছেন একথা।

• • •

ওহিওর অবারলিন কলেজের অধ্যাপিকা এলেন জনসন ভারতে প্রথম ত্রৈবার্ষিক বিশ্ব শিল্পকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে নয়াদিল্লীতে এসেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে পৃথিবীর ৩৫টি দেশের পাঁচশোর বেশি সমকালীন শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছিল। প্রদর্শনীর জন্যে এই শিল্পকর্মগুলি অধ্যাপিকা জনসনই নির্বাচন করেছিলেন।

• • •

কিছুদিন আগে ফ্রান্সের গ্রেনোব্‌ল্ নামক স্থানে দশম শীতকালীন ওলিম্পিক্‌স্ হয়ে গেল। সেই উপলক্ষ্যে মোট ২৪০ জন মহিলা ক্রীড়াবিদ যোগ দিতে আসেন এবং এরা সবাই প্রকৃত 'মহিলা' কিনা তা নির্ণয় করবার ভার ছিল একটি মেডিক্যাল কমিশনের ওপর। কমিশনের চেয়ারম্যান জানান যে, মাত্র ৫০ জন প্রতিযোগিনীকে পরীক্ষা করা হয় এবং সকলেই উৎরে যান ভালভাবেই। দৈহিক ও গবেষণাগারে পরীক্ষাকালীন কোন ঝঞ্ঝাট দেখা দেয়নি—সব প্রতিযোগিনীরাই যে 'মেয়ে' তা মেনে নেওয়া হয়। অনেক প্রতিযোগিনী নিজে থেকেই পরীক্ষিত হতে চান। একেলা নরওয়ে জনকে (২৪০ এর মধ্যে) কমিশন পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেননি।

এর আগে ফ্রাঙ্কফুর্টের এক খবরে জানা গিয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক অলেম্পাদার সংস্থা ঠিক করেছেন যে, আগামী মেক্সিকো ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু প্রতি ক্রীড়াবিদকেই 'নির্ভেজাল' পুরুষত্ব অথবা স্ত্রীত্ব প্রমাণের জন্যে ডাক্তারী পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হবে।

• • • •

এই প্রসঙ্গে স্বল্প পাল্লার দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারিণী পোল্যাণ্ডের মেয়ে ইভা ক্লোবুকোভস্কার কথা বলি। এঁর বয়স একুশ, শিল্প-সংক্রান্ত অর্থনীতির ছাত্রী ইনি। টোকিও ওলিম্পিকে তিনি একটি স্বর্ণ-পদক ও একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন—সে সময় পুঙ্খানুপুঙ্খ ডাক্তারী পরীক্ষার বালাই ছিলনা প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীদের। ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ার আগে বুদাপেস্টে তিনি চাক্ষুষ ডাক্তারী পরীক্ষায় পার হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরে গত ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতার সময় বিশদ পরীক্ষায় আটকে গেলেন।—এদিকে ইভা বাগ্‌ড়া।

এই আটক যাওয়ার ফলশ আন্তর্জাতিক অলেম্পাদার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন ইভার রেকর্ড বাতিল ক'রে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। আর এও বলে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে হয়ত তাঁর ওলিম্পিক পদকও কেড়ে নেয়া হতে পারে। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, বিতৃষ্ণা ও হতাশায় কাতর অশ্রুময়ী ইভা বললেন, "অত্যন্ত খারাপ লাগছে আমার। আমি তো জানি আমি কী ছেলে না মেয়ে! অনেক কষ্টে প্রচুর সাধনায় সাফল্যের শীর্ষে উঠেছিলাম। আমার মনোবেদনা আমারই কাছে, কে আর তা বুঝবে!

• • • •

ছাত্রী আর অধ্যাপিকা দুজনেই নেবেছিলেন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়—"মিস ফেমিনা, চণ্ডীগড়"। কুমারী নীতা মালহোত্র অবশ্য কুমারী আশা শেঠীর ঠিক সাক্ষাৎ ছাত্রী নন, নীতা (১৯ বছর বয়স) কলেজীয় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী —প্রতিযোগিতায় ইনি শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন বারোজন সুন্দরীর মধ্যে। আশা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা—তিনি দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন।

• • • •

কুমারী এওয়া আউলিন সুইডেনের মেয়ে, বয়স সতের, সুন্দরী। ১৯৬৬ সালে ইনি 'মিস টীন ইণ্টারন্যাশন্যাল' হয়েছিলেন। সম্প্রতি এ, বি, সি-সেলমুর প্রোডাকশন্সের 'ক্যাণ্ডি' চিত্রের জন্যে নির্বাচন প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। 'ক্যাণ্ডি'-তে অভিনয় করেছেন রিচার্ড বার্টন, রিঙ্গো স্টার, মার্লন ব্রাণ্ডো ঘুগার রে রবিনসন। নায়িকাচরিত্রের জন্যে সারা পৃথিবী জুড়ে নতুন মুখ খুঁজেছিলেন উদ্যোক্তারা। আউলিনকে পছন্দ করার পরে তাঁরা বলেন, "ও হচ্ছে প্রচণ্ড রকমের সুন্দরী। অভিনয়ের ক্ষমতাও প্রচুর। ভবিষ্যতে খুব নাম করবেই ও।" 'ক্যাণ্ডি' তোলা হচ্ছে টেরী সাদার্ণ লিখিত যৌনতাবিদ্রূপকারী একটি উপন্যাস নিয়ে।

• • • •

প্রয়োজন হলে প্রেম ছদ্মবেশও ধারণ করে।

লণ্ডন থেকে ৬০ মাইল দূরে একজায়গায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটা কড়াকড়ি পাহারার ঘাঁটি ছিল। সেখানকার পুরুষ ব্যারাকে বাইশ বছরের এক ইংরেজ যুবতী কয়েক হপ্তা নির্বিঘ্নে বাস করবার পর সম্প্রতি ধরা পড়েছে। তাও পড়ত না, যদি না পুলিশ হঠাৎ এসে চোরা গুপ্তচর ও মাদকের সন্ধানে সেখানে তল্লাসী চালাত। এই ঘটনার পরে মেয়েটি স্বীকার করে যে, তাঁর জনৈক পুরুষবন্ধুর সঙ্গে যাতে একত্রে থাকতে পারে সেজন্যই এই কৌশল করেছিল। ব্যারাকের অন্য পুরুষরা জানত কিন্তু সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে কেউ ভাঙেনি ব্যাপারটা। সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মের আড়ালে ছদ্মবেশ নিয়ে ছিল প্রেমিকা—খাটো কেশদাম আমেরিকান বিমান বাহিনীর টুপির মধ্যে ছিল ঢাকা। কেউ সন্দেহ করতে পারেনি ও স্ত্রীলোক।

• • • •

রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা 'আংটাড' ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে—দিল্লীতে যার অধিবেশন চলছিল। গত দু'মাস আমরা দুটি খবর দিয়েছি, এবারে আরেকটি ছোট্ট। প্রেমের দেবতা অনঙ্গ বিজ্ঞানভবনের এই সম্মেলনেও আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনেকগুলি ভারতীয় মেয়ে এই উপলক্ষ্যে কর্মে নিযুক্ত হন। দেখতে শুনতে ভালই—অতএব এদের মধ্যে অনেকেই বিদেশাগত অবিবাহিত কোন কোন প্রতিনিধির কাছ থেকে রঙিন আহ্বান পেয়েছিলেন। শাড়িশোভিত সুন্দরীরা অনেকেরই আকর্ষণের, কামনার পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে ইত্যা। পরে বিবেচনা। পাণিপ্রার্থীরা কেউ আফ্রিকার মানুষ, কেউ ইউরোপের এবং এঁরা অনেকেই প্রিয়াদের কাছ থেকে সম্মতিও পেয়েছেন বলে জানা গেছে। এরকম ক'টি প্রজাপতির নির্বন্ধ হয়েছে তা অবশ্য জানা যায় নি ; এটুকু আশা করা যেতে পারে—শুভস্য শীঘ্রম্।

• • • •

মিনিস্কার্ট ও ম্যাক্সিস্কার্টের মধ্যে 'লড়াই' বেধেছে লণ্ডন শহরে। যুদ্ধক্ষেত্র সুতোল আয়ু আর স্বপ্নই উদ্দেশ্য।

সমর্থক তথা সৈন্যসামন্ত দু'পক্ষেরই বর্তমান। কিন্তু ভবু ম্যাক্সিস্কার্ট মিনিস্কার্টের তুলনায় তার

অনুচরীদের কাছ থেকে সর্বদা সাহায্য পাচ্ছেন না। এই ক্যাপনঘুড়ের দর্শকরা—জনসাধারণ—দুই পক্ষকেই সমান উৎসাহ দিচ্ছেন উৎসুকাসহকারে। তাঁরা চান সংগ্রাম শেষে মিলিমিশি, আপোষ রফা একটা।

শ্রীমতী মেরী কোয়ান্ট তৈরি পোষাকের একজন নামকরা 'ডিজাইনার'। তিন বছর আগে তিনি তাঁর দোকানে ম্যাক্সিস্কার্ট রাখতে আরম্ভ করেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে, বেশি ঝুলওয়ালা পোষাক ও আরো বেশি সংখ্যায় 'ম্যাক্সি' নিয়ে কাজ করবেন।—মিনিস্কার্ট ত। বলে লোপ পাবে এমন সম্ভাবনা নেই। 'মিনি'র খুঁটি খুব শক্ত।

• • • •

য়াপাঘাটের এক খবরে জানা গেল, সম্প্রতি ওখানকার পুলিশ পঁচিশ জন বাঙালী 'বিট্‌লে'কে ধরে থানায় চালান করে। এদের মধ্যে দশজন হচ্ছে মেয়ে। যাদের পরনে ছিল বগলকাটা ব্লাউজ। এজাতীয় ব্লাউজ ও নলপ্যান্ট পরা ছেলেমেয়ে এখানে যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যাচ্ছিল কিছুদিন ধরে। এরা এবার পুলিশের ঝামেলায় বড় মুশকিলে পড়েছে—পুলিশের গাড়ি দেখলেই খোলা বড় রাস্তা থেকে সরু পথ বা অলিগলিতে সরে পড়ছে। আবার, কোন কোন মেয়ে পেট-পিঠ-বগলকাটা জামা পরা বন্ধ ক'রেও দিচ্ছে শুনে।

• • • •

জোহান্সবার্গ থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেল, উনিশ বছর বয়স্কা টাইপিষ্ট লিণ্ডা নৌন্তে না ঘুমিয়ে জেগে থাকার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বলে দাবী জানিয়েছে। লিণ্ডা নাকি ১২১ ঘণ্টা ২০ মিনিট একটানা না ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল। এই না ঘুমোনোর পালা অনুষ্ঠানের জন্যে সে বেছে নিয়েছিল একটি হ-রে-ক-ৃ-ন-যা মনোহারী দোকানের শো-কেস। এই জেগে কাটাবার কথাটা তার মাথায় আসে এইটা প্রমাণ করবার জন্যে যে, পুরুষেরা দেখুক মেয়েরা রেকর্ড ভঙ্গ করার ব্যাপারে পুরুষদের চাইতে কিছু কম যায়না।

• • • •

পূর্বে গল্পভারতীতে দিল্লীর মেয়ে আরতির কথা বলেছি। তার পরেকার আরেকটা ঘটনা বলছি। এখবরটাও সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। অল্প আয়ের এক পিতার বারো বছর বয়সের মেয়েটি চুরি গেল। এটাও দিল্লীরই ব্যাপার। বাপ ভদ্রলোক থাকেন সরকারী কলোনীতে। ঘটনার পরে তিনি থানায় ডায়েরি লেখাতে গেলেন, জানালেন কারা মেয়েকে চুরি করেছে, কোথায় কোথায় খোঁজ করলে তার হদিশ মিলবে, উদ্ধার সম্ভব হবে, ইত্যাদি। থানার ইনচার্জ সাহেব ডায়েরি লিখতে নারাজী। ওসব হবে টবে না বলে ভদ্রলোককে হাঁকিয়ে দিলেন। খেদিয়ে দিলেন বলাও চলে। বাপ তো বিফল হয়ে চলে এলেন।

তা বলে কিন্তু হাল ছাড়লেন না। ইন্‌চার্জ সাহেবের ব্যবহারের কথা তামাম কলোনীর মানুষের কাছে নিবেদন করলেন সবিস্তারে। তখন তাই শুনে এক এক করে লোক জমায়েত হতে আরম্ভ হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জনতার সংখ্যা হল প্রায় এক হাজার কি তার বেশি। চলল তারা থানা ঘেরাও আর চড়াও করতে এর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুইই ছিল। তখন ভারপ্রাপ্ত অফিসার ডায়রি লিখতে বাধ্য হলেন। কিন্তু করলে কি হবে, কাজের কাজ আর হয়না। দায়ে পড়ে ডাইরি লিখেছেন, সে অনুসারে কাজ করতে নানা গড়িমসি আরম্ভ করলেন। ছলছুতোর তো অভাব নেই, নানা ওজর তুলে আসল কাজ কেবলই চলে পেছিয়ে— এই হল সবশেষ পাওয়া খবর।

এই ধরণের চুরি ও ডায়রি করার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, মেয়ের অভিভাবক প্রথমে পুলিশের নীচু মহলে যায়। পরে ওপর মহলেও; অনেক সময় পার্লামেন্ট সদস্য ও মন্ত্রীমহাশয়দের বাড়িতেও দায়ে পড়ে ছুটোছুটি করে কিন্তু অদৃষ্টে কোথায় কী কলকাঠি নড়ে, কাজ এগোয়না প্রতিকার কখনই কিছু হাঁটতে সুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, থানা থেকে লোক এসে মাঝে মাঝে অভিভাবক বেচারা ওপর তাগিদ করে, যাচ্ছে নালিশ জানানর এবং মেয়ে উদ্ধারের ব্যাপারে এত চেষ্টাচরিত্র করার জন্যে।

———

এ মাসের রান্নাঘরে

বেলা দে

আমাদের দেশে ঋতুভেদে নানা রকম সুস্বাদু ফল জন্মে থাকে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু ও জনপ্রিয় ফল আম। ভারতবর্ষ আমের জন্মস্থান। সংস্কৃত ভাষায় আমকে আম্র, রসাল, সহকার ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। আমাদের দেশে এক হাজারেরও বেশী জাতের আম আছে। বিভিন্ন আম বিভিন্ন নামে পরিচিত। টাটকা এবং শুকনো, কাঁচা আর পাকা সকল অবস্থাতেই আমাদের দেশে আমের বহুবিধ ব্যবহার প্রচলিত। আমচুর, আমকাসুন্দী, আমের নানাবিধ আচার, মোরব্বা, চাটনী ঘরে ঘরে মেয়েরা প্রস্তুত করেন। পূর্ববঙ্গে কাসুন্দী প্রস্তুত প্রণালী তো রীতিমত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়ে। পাকা আম অতি সুস্বাদু। পাকা আম থেকে আমসত্ত্ব, ঝোলী, মিষ্টি আচার, ইত্যাদি নানা মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত হয়। কচি আমের অম্বল বাঙ্গালীর একটি প্রিয় খাদ্য। বিশেষ করে শোলমাছের আমের অম্বল।

এ ছাড়া এই সময় কালোজাম, জামরুল, ফলসা, খেজুর, কাঁঠাল, লিচু, ট্যাপারী, আশফল, প্রভৃতি প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। কাঁচা ফলই বেশীরভাগ খাওয়ার রীতি আছে। তবে লিচুর চাটনী ও পায়েস, ট্যাপারীর আচার, ফলসার আচার, খেজুরের চাটনী খুব ভাল খেতে হয়।

এ তো গেল গ্রীষ্মকালের ফলের কথা। কিন্তু এই সময় রান্না খাওয়ার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। যেমন আলু ও করলা সেদ্ধ করে অল্প পাঁচফোড়ন ও শুকনো লঙ্কা দিয়ে নাড়াচড়া করে খেলে বেশ লাগে। কাটোয়ার ভাঁটা মটর ডালের বড়া, কিংবা আলু দিয়ে বেশ মিষ্টি সহযোগে এই তরকারীটা রান্না করা হয়—এতে জিরে মরিচবাটা দিলে ভাল লাগে। কাঁচা মুগ ডাল উচ্ছে দিয়ে। বাগদা চিংড়ির ঝোল, বাগদা চিংড়ির বাল বেশ মুখরোচক হয়। ছোট চিংড়ি, উচ্ছে, নটেশাক, কাঁচকলা, বেগুন বেশ ভালই তরকারী হয়।

জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরমে বিকেলে একটু মেথুর সরবৎ, বেলের সরবৎ, ঘোল, এইগুলিই খাওয়া ভালো। আর রাত্রে হালকা কয়েকখানা রুটি, একটু মাছের ঝোল, একটু মিষ্টি চাটনী বা আম।

এই সময় বাজারে ছাঁচি কুমড়ো বা চাল কুমড়ো দেখতে পাওয়া যায়। কিছু কুমড়োর মিঠাই তৈরী করে রাখলে আসন্ন বর্ষার দিনে বেশ কাজে লাগে। একটী ছাঁচি কুমড়োর খোসা ছাড়িয়ে ভিতরের বীজগুলো বার করে ফেলবেন। এখন ঐ কুমড়োর অংশকে চাকা চাকা করে কেটে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ছ্যাঁদা করে রাখুন। একটী পাত্রে চুণ আর জলে এগুলি কিছুক্ষণ ভিজিয়ে তারপর তুলে শুকিয়ে নেবেন। এবারে

এ্যালুমিনিয়ামের কড়াই বা ডেকচিতে কুমড়োর ওজনের সমান চিনি নিয়ে তাতে পরিমাণমত জল দিয়ে চিনির রস প্রস্তুত করুন, যখন ফুটতে থাকবে তখন কুমড়োগুলো ছেড়ে দেবেন। এবারে খুন্তি দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন যখন বেশ ঘন হয়ে আসবে তখন নামিয়ে বেশ করে ঠাণ্ডা করে নেবেন। কড়ার চারধারে যে চিনি লেগেছে সেসব এই সঙ্গে মাখিয়ে বেশ শুকনো করে নেবেন। ইচ্ছে করলে একটু গোলাপজল দিতে পারেন।

বেলের মোরব্বা—এই সময় ছোটদের পেটের অসুখ করে, কাজেই একটু বেলের মোরব্বা করা থাকলে বেশ উপকার হয়।

কয়েকটি কাঁচা বেলের উপরের খোসা ছাড়িয়ে ফেলবেন। তারপর একটু পুরু করে কেটে ছুরি দিয়ে আঠা ও দানাগুলো বার করে ফেলে ঠাণ্ডাজলে কিছুক্ষণ ভাসিয়ে রাখুন। এবারে একটী পরিষ্কার এ্যালুমিনিয়ামের কড়াই বা ডেকচিতে কিছু জল দিয়ে বেলের টাকাগুলি সেদ্ধ করে নিন। পরে জলটী ফেলে দিয়ে অপর একটী পাত্রে পরিমাণমত চিনি ও জল দিয়ে রস তৈরী করুন। এখন ঐ টাকাগুলো রসে ফেলে দিন। রসের সঙ্গে বেলের মোরব্বা বেশ ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে কাঁচের বয়ামে তুলে রাখুন।

এবারে কয়েক রকম সিরাপ তৈরীর প্রণালী বলে দিচ্ছি—

লিমন সিরাপ—

লেবুর রস—১ সের
পাতিলেবুর খোসা—২ ছটাক
চিনি—২ সের

প্রথমে পাতিলেবুর খোসাগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে দু'ঘণ্টা আন্দাজ উনুনের অল্প আঁচে জাল দিয়ে নিন। পরে চিনি মিশিয়ে আবার একবার ফুটিয়ে নিন। আধঘণ্টা পরে নামিয়ে ঠাণ্ডা হলে ছেঁকে নিয়ে বোতলে রাখবেন।

কমলালেবুর সিরাপ—

কমলা লেবুর খোসা আধ পোয়া
কমলা লেবুর রস এক পোয়া
চিনি দু'সের
জল এক সের

প্রথমে জল ও চিনি মিশিয়ে উনুনে চাপিয়ে চিনির রস তৈরী করুন। এই সঙ্গে কমলালেবুর রস দিন। লেবুর খোসাকুঁচো সেদ্ধ করে ঐ জল মিশিয়ে দিন। যখন দেখবেন বেশ সেদ্ধ হয়ে গেছে তখন নামিয়ে ঠাণ্ডা করে বোতলে ভরে রাখুন।

আনারসের সিরাপ—

এই সময় বাজারে যথেষ্ট আনারস, কাজেই অনায়াসে এটী তৈরী করতে পারেন।

আনারস—এক সের
জল—তিন সের
চিনি—দু' সের

আনারসের খোলা ছাড়িয়ে চোখ বাদ দিয়ে জলে সেদ্ধ করে নিন। এদিকে চিনির রস তৈরী করে নেবেন। এবারে আনারসের জল সমেত রসটা ছেঁকে ঐ চিনির রসে ফেলে দেবেন। আর একবার ফুটিয়ে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে নেবেন তাহলেই হবে।

আমরা মেয়েরা যদি ঋতুভেদে খাদ্য তালিকা তৈরী করি তাহলে কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক থেকেও একটী পরিবার সুস্থ দেহ মন নিয়ে চলাফেরা করতে পারেন। আমার মনে হয় ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে কোনো পুরুষই তাঁর স্ত্রীকে কর্মজগতে সক্রিয় সঙ্গিনী অপেক্ষা শান্তিতে আরামদায়িনী রূপেই বেশী পছন্দ করেন। কারণ পুরুষ নারীকে দেখতে চান স্নিগ্ধ মূর্তি কমলারূপেই, যাঁর সুপরিচালনায় প্রতিটী গৃহের ভাণ্ডার হবে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!

ঘরকন্নার টুকিটাকি

শকুন্তলা দেবী

লেবু টাটকা রাখার প্রণালী—লেবু যদি ঠাণ্ডা জলে রাখা যায় এবং সেই জলটা প্রত্যহ বদলে দেন তাহলে লেবু অনেকদিন টাটকা থাকবে।

বর্ষার দিনে লবণ গলে যায়—যে পাত্রটীতে লবণ রাখবেন ঐ পাত্রটীর তলায় একটু চাল ছড়িয়ে তার ওপর নুন বসিয়ে রাখবেন। অথবা ঐ পাত্রটীর মাপে এক টুকরো ব্লটিং কাগজ কেটে লাগিয়ে দিলে নুন গলবে না।

ভাত বা ডাল ধরে গেলে যদি ধরা গন্ধ পাওয়া যায় তাহলে একটী আলাদা পাত্রে ভাত বা ডাল ঢেলে নিয়ে কয়েকটী আস্ত পান তাতে ফেলে ফুটিয়ে নেবেন আর গন্ধ থাকবে না।

তরকারীতে হলুদ বেশী হলে একটি খুন্তি উনুনে পুড়িয়ে লাল করে ঐ খুন্তিটা তরকারীর মধ্যে ডুবিয়ে দিলে হলুদ গন্ধ কেটে যাবে।

নারকেল তেজে যদি আধখানা তুলে রাখতে চান তাহলে ঐ ভাঙ্গা নারকেল জলে ভিজিয়ে রাখলে এবং প্রত্যহ জলটা বদলে দিলে ৩।৪ দিন পর্যন্ত তাজা থাকবে।

মাংস সেদ্ধ না হলে সুপারী দু'খানা করে অথবা কাঁচা পেঁপে দু'খানা করে মাংসে ফেলে দেবেন, তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে।

হলুদ বেশী বাটা হয়ে গেলে তার সঙ্গে একটু নুন মিশিয়ে রাখলে নষ্ট হবে না।

আলু তাজা রাখতে হলে বালির উপর সাজিয়ে রাখলে নষ্ট হয় না।

এরপরের মাসে ঘরকন্নার কথার আরো কিছু বলব।

ফল বলতে আম জাম আনারস আরো কত কি—

আভা পাকড়াশী

আমাদের বাংলা দেশে ফলের অভাব নেই আর এইতো ফলের সময়। ফলে ফলে বাজার ছেয়ে যায় এই সময়। সকল রুচির সকল বয়সের সুস্বাদু সুন্দর ফলে বাজার ভর্ত্তি। ফলের প্রয়োজন প্রত্যেকের। ফল ছেলেমেয়ে বুড়ো সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। ফলের গুণে দেহের যেমন পুষ্টিসাধন হয় তেমন আর কিছুতেই নয়। ভিটামিনে ভর্ত্তি। ফলের নাম শুনলেই আমরা চমকে উঠি, বলি পয়সা কোথায় যে অমন ফল খাবো! দু'বেলা ভাত খেতে পয়সা জোটে না। ডাক্তার হয়তো ফল খেতে বলেছে শরীর খারাপ বলে। আমরা ভাবতে আরম্ভ করলাম ডাক্তারতো সোজা বলে গেল। পয়সা দেবে কে ফল কেনবার। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি কি তাই! ফল যেমন নানা রকম—তার দামও নানা রকম। জায়গা থাকলে প্রতিটি বাড়িতেই ফলের গাছ লাগান যায়। ফল খেতে বললেই যে আঙুর বেদানা খেতে হবে এমন কথা নয়। যার যে ক্ষমতা নেই সে সস্তা দামের ফল খাবে। অল্প পয়সায় যথেষ্ট রকমের ফল পাওয়া যায়। আবার একটু কষ্ট করলে বাড়ীতে উৎপাদনও করা যায়।

যেমন ধরুন ভুট্টা। সেদ্ধ ভুট্টা দুধ নেবু দিয়ে খেতেও যেমন সুস্বাদু আবার এতে ভিটামিনও আছে প্রচুর! এই ভুট্টাই কাঁচা বয়লে 'কর্ণ ফ্লেক্স' সেজে প্যাকেটে বন্ধ হয়ে কিনে এনেই আমরা তাকে কত যত্নে কত পুষ্টিকর ভেবেই না খেয়ে থাকি! তাছাড়া জাম, জামরুল, আনারস, পপে, কলা, টম্যাটো, পেয়ারা এসবের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে নানা ধরণের ভিটামিন আছে। সুতরাং আপেল, বেদানা, আঙুর যদি নাগালের বাইরে থাকে থাক না,—আমরা এইসব সস্ত ফল দিয়েই আমাদের দেহের প্রয়োজন অনায়াসে মেটাতে পারি! আর সবচেয়ে সেরা ফল তো হল আম। যেমন স্বাদে, তেমনি পুষ্টিতে আম হল সবার সেরা! কাঁচায়, পাকায়, শুকনোয় কিসে না এর স্বাদ অতুলনীয়! আমের সময় চলে গেলেও তাকে ধরে রাখার আমাদের কতই না চেষ্টা! আচার, জেলি, আমসত্ত বারে বারে মনে করায় ফুরিয়ে যাওয়ার আগের মরশুমের সুরসাল স্বাদকে! আম অমৃত ফল! তার যত বা ভাত—তত বা নাম! তার লোভনীয় স্বাদেই সে পশুপাখী মানুষ সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়! তাই স্বাদে গন্ধে আনন্দে মানুষ এর নানারকম নামকরণ করেছে! কিষণভোগ, গোপালভোগ, গোলাপখাস, হিমসাগর, নেংরা এমনি আরও কত! কিন্তু যা বলছিলাম আমের ফসল উঠে গেলেও তার স্বাদটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করা তো আমাদেরই কর্ত্তব্য! তবে না ঘরণীর কর্ত্তা থেকে ছোট্ট শিশুটি পর্য্যন্ত, পরিতৃপ্তির সঙ্গে পাত খালি করে উঠবে।

—কাঁচা আমের জেলি বা মোরব্বা তৈরী করুন! এটি অনেক দিন থাকে!

উপকরণ:—একশোটি বা পঞ্চাশটি বড় কাঁচা আম, কিসমিস একশো গ্রাম, আদার রস—দু'চামচ (পছন্দ হলে) রসুন চার পাঁচ কোয়া, শুকনো লঙ্কা আড়াই গোটা চারেক। চিনি পরিমাণ মত!

প্রণালী :—আমগুলি ধুয়ে নিন ত! তারপর শক্ত কাপড়ে বেঁধে ভারী জিনিষ চাপা দিয়ে খানিকটা জল বার করে দিন! এবার এই আমের ওজনে সমান পরিমাণ চিনি নিন। তারপর আম নামান্ত ভাপিয়ে নিয়ে, চিনি আদার রস, কিসমিস, লঙ্কা, নুন সব এক সঙ্গে দিয়ে জাল দিতে থাকুন! বেশ ঘন হয়ে চিট ধরলে নামিয়ে নিন। ঠাণ্ডা হলে জারে তুলে দিন। খুব সুস্বাদু হয় এই জেলি!

আমের মোরব্বাও ঠিক এইভাবে করতে পারেন! শুধু আমগুলি না ধুয়ে ছাড়িয়ে কালা কালা করে কেটে কিছুক্ষণ নুনের জলে ডুবিয়ে রাখুন তারপর তুলে নিয়ে বেশ করে ধুয়ে নিয়ে একটু ভাপিয়ে ঠিক এরকম সমান পরিমাণ চিনি দিয়ে পাক করে মোরব্বা করুন! পাকা আমের খাঁটি চাটনীও খুবই সুন্দর খেতে। আবার থাকেও বেশ কিছুদিন!

—টুসটুসে পাকা ছোট ছোট ফিলি আম খোসা ছাড়িয়ে নিন। তাতে পরিমাণ মত চিনি দিয়ে পাক করুন! সঙ্গে চা চামচের দু-চার চামচ শুধু লেবুর রস আর ইচ্ছে হলে একটু কিসমিস দেবেন আর কিছুই লাগবে না! এতে চিনির খরচও কম আর দেখবেন বাচ্চারা কি ভালই না বাসবে এই খাঁটি চাটনী!

কালোজামও এই সময়ের ফল। এটিও শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এরও চাটনী করে তুলে রাখতে পারেন।

উপকরণ—জাম আধ কিলো। বিট নুন এক চামচ। জিরে এক চামচ। কালো জিরে এক চামচ। ধনে এক চামচ। পাতিলেবু আধখানা। জোয়ান আধ চামচ। গোলমরিচ চার পাঁচটি। নুন চিনি পরিমাণ মত।

প্রণালী—জামগুলি ভাপিয়ে নিয়ে খাঁটি আর শাঁস আলাদা করুন। বাটি নুন বাদে অন্য সব মশলাগুলি কাঠ খোলায় ভেজে মোটা করে পিষে নিন। এবার আন্দাজ মত নুন চিনি দিন ও জামের শাঁসে কিছুক্ষণ জাল দিন! জমে এলে নামাবার আগে এসব মশলা আর লেবুর রস দিন। নামিয়ে নিয়ে বাটি নুনের গুঁড়ো দিন। এটি পেটের গণ্ডগোলে ও ডায়বেটিস রুগীদের পক্ষে যেমন উপকারী, তেমনি স্বাদেও অপূর্ব্ব!

আনারসও খুবই সুস্বাদু ফল—এরও জেলি মোরব্বা চমৎকার হয়।

আনারসের চোখ বাদ দিয়ে পরিষ্কার করে কেটে, তারপর পিসে বেটে নিয়ে সমান পরিমাণ চিনি, আদার রস আর লেবুর রস দিয়ে পাক করলেও চমৎকার জেলি হয়। থাকেও অনেকদিন।

মা, বোনেরা, এবারের মত এইগুলিই পরখ করে দেখুন, কোনটি সব চেয়ে ভাল লাগল জানালে সুখী হব!

আমাদের নিবেদন—

আজকাল সবকিছুতেই মেয়েদের একটি দায়িত্ব রয়েছে, তা সে প্রত্যক্ষই হোক্ আর পরোক্ষই হোক। কারণ বহুব্যাপক জীবনক্ষেত্রের সর্বস্তরে আজ তারা ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরোক্ষ দায়িত্বভার মেয়েদের কর্তব্য-সচেতন করার পক্ষে যে আশীর্বাদ স্বরূপ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য দায়িত্ব পালন এবং কর্তব্য-সচেতনার ব্যাপারে এদেশের মেয়েদের সুনাম বহু দিনের। তবুও মনে হয় এখনো আমাদের অনেক কিছু করার আছে। দেশের বিভিন্ন সমস্যা গুলির যাতে সুষ্ঠু সমাধান আমরা করতে পারি তার জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে। এর জন্য চাই মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক আদান প্রদানের ব্যবস্থা।

মেয়েদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোন সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব নয়।

আষাঢ় মাসে গল্পভারতী ২৪ বছরে পদার্পণ করবে। এই আষাঢ় মাস থেকেই আমরা গল্পভারতীতে একটি বিশেষ বিভাগের আয়োজন করেছি। এই বিভাগে পত্রালাপ ও পত্রের মাধ্যমে ও পরস্পরের মধ্যে আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের সমাধানের আমরা প্রয়াস পাব।

দেশের সর্বত্র এমন কি বিদেশেও গল্পভারতীর যে সব সহৃদয় পাঠিকা বা লেখিকারা আছেন তাঁরা পূর্ণ সহযোগিতা করুন এই আমাদের নিবেদন। বিশেষ করে সমস্যাজর্জরিত বাংলার মেয়েদের কাছেই আমাদের আবেদন সর্বাগ্রে। জাতির এই দুর্দিনে প্রতিটি ক্ষেত্রে, সমস্যা এমন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যে আর কাল বিলম্ব না করে মেয়েদের সমবেত চেষ্টায় ও সাধনায় তার সমাধান না করলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

আজ ঘরে বাইরে সমস্যার অন্ত নেই। আমরা যদি আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে সমস্যাগুলির সমাধান করতে এখুনি না এগিয়ে আসি তবে ব্যর্থতার দুর্বিসহ যন্ত্রনায় আমাদের দগ্ধ হতে হবে। আমরা তাই একান্তভাবে আশাকরি গল্পভারতীর এই বিভাগটির মাধ্যমে বাংলার মেয়েরা দেশের মহাকল্যাণ করতে এগিয়ে আসুন।

বিনীতা

বেলা দে

মেয়েমজলিশ গল্প-ভারতী

বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান— ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
১১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা-৬

২। প্রকাশের সময়— মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম— শ্রীদোলবিহারী দত্ত
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ৮-সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৪। প্রকাশকের নাম— শ্রীদোলবিহারী দত্ত
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ৮-সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৫। সম্পাদকের নাম— শ্রীশৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ১৩৭।১, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

৬। যে সকল অংশীদার মোট মূলধনের এক-শতাংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—

শ্রীনীলিমা রাণী রায়—৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রী ভি. দেবী—৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

শ্রী এস. এল. রায়—৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আমি শ্রীদোলবিহারী দত্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

৩১।৫।৬৮

স্বাক্ষর—শ্রীদোলবিহারী দত্ত
প্রকাশক

বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

গল্প-ভারতী সমসাময়িক সাহিত্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব।

গল্প-ভারতী নবজাগ্রত জাতির মর্মরাগা মর্মকাহিনী।

গল্প-ভারতী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ।

গল্প-ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতির অন্তরের ব্যথা ও বেদনার কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

গল্প-ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

গল্প-ভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

গল্প-ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করেছে।

গল্প-ভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প-ভারতী জাতির ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে।

গল্প-ভারতী পূজাসংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা শুধু একটি উৎসব ঋতুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সেইজন্যেই দেশব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পূজা সংখ্যা গল্প-ভারতী বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে।

গল্প-ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

আজই গল্প-ভারতীর গ্রাহক হোন

সডাক বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ১৫৲

যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

আষাঢ়ে ২৪ বৎসরে পদার্পণ করবে

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-৩২২৪ ও ৫৫-১০৫৫

শুধু বাংলা নয় শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্ব জগৎ

আজ যে মহাজীবনের দিব্য-প্রকাশের দিকে চেয়ে আছে,

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সেই অপরূপ বিস্ময়কর আবির্ভাব,

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের

অমৃত জীবন-কাহিনী

লেখক—জীবনী-সাহিত্য রচনায় অদ্বিতীয়—সুবিখ্যাত সাহিত্যিক—**নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়**

জনক জননী

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর জননী সারদামণির অপরূপ মানবীয় লীলা, বাংলা ভাষায় এমন অনুপম সৌন্দর্য্য ইতিপূর্বে আর উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই অপূর্ব রচনা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিবে।

'জনক জননী'

বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্তি একটা নতুন যুগের রচনা···

বাংলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান ···

প্রত্যেক পাঠক এই কথা সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন।

মূল্য—২৲ বাঁধাই ২৷৷০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ**

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১৮০০

প্রকাশক—সতোন্দ্রলাল রায়, ৮সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬ ফোন : ৫৫-১০৫৫

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল, অক্ষুধা

কোনটী থেকে ভুগছেন ?

আমাদের

ভাস্কর লবণ

খেলে. নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।

যাঁরাই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

গল্প-ভারতী

[illegible]বিংশতিতম বর্ষ ॥ সপ্তম সংখ্যা ॥ পৌষ ১৩৭৯

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

স্বামী ভূতেশানন্দ। শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশের গুপ্তসমিতির অবদান

—মনোরঞ্জন গুপ্ত

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অবদান

—মন্মথ রায়

বন্দী বিধাতা। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের শেষাংশ

—প্রভাত মুখোপাধ্যায়

বর্ণাকন্যা। মনোরম ধারাবাহিক উপন্যাস

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মেয়ে মজলিস—বিবিধ খাদ্য ও পৌষপার্বণ (সচিত্র)

—বেলা দে, উষা ভট্টাচার্য

৬টি ছোট গল্প

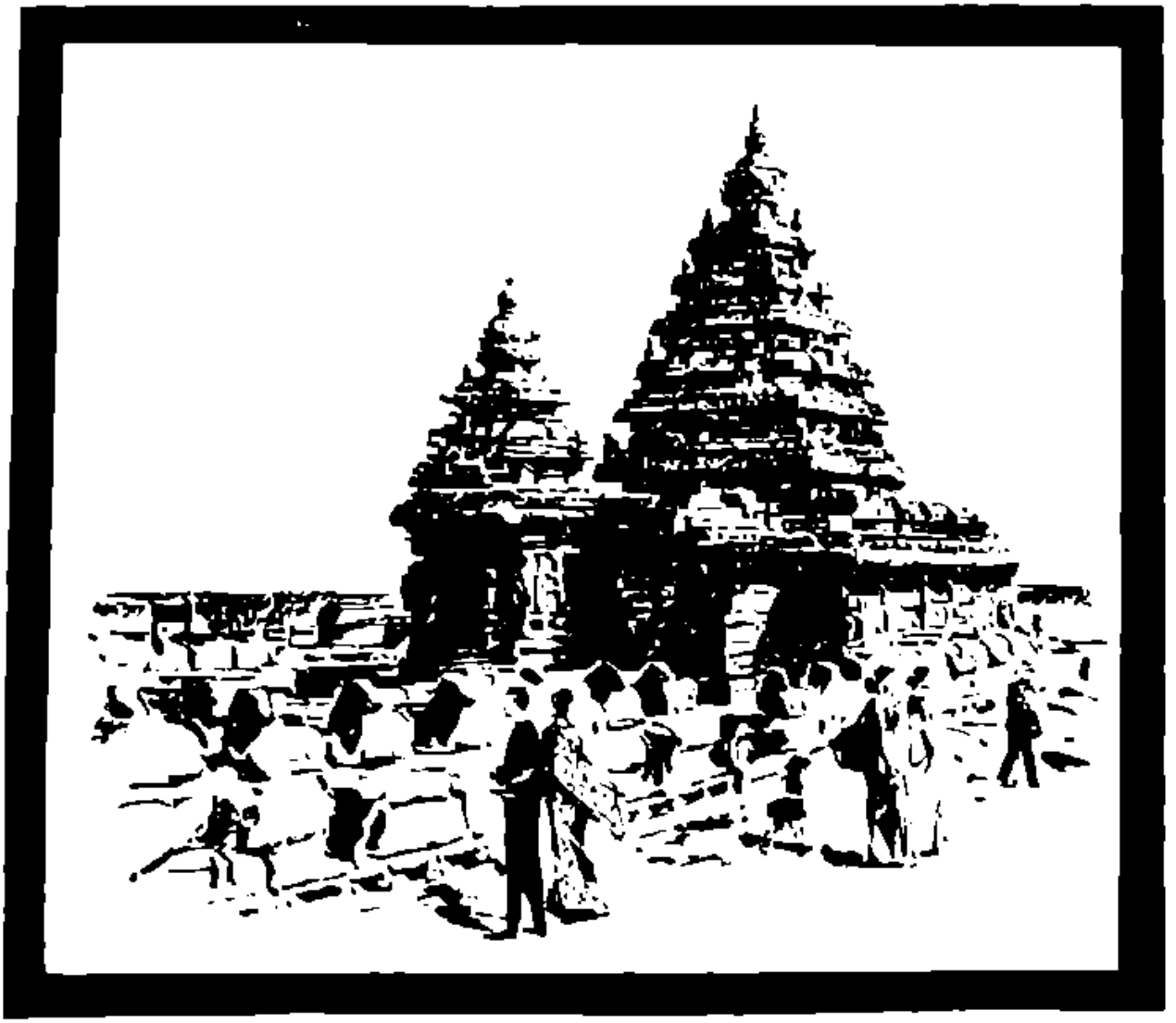

ভারতের
সাংস্কৃতিক
ঐতিহ্য

লিলি
বিস্কুট

LB·27/61

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি জননী। প্রতিবেশী অমর দত্তা 'সাধনা অশোকারিষ্ট' তাকে এই সুস্থ শিশুটি উপহার এনে তাকে আজ জননীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সাধনা
অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অথবা হোসেনচক রোড,

Regd. No. C3643

APR'58

প্রতিদিন প্রতিঘরে

লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও হৃদ্য হয়

LO 4107

শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত

সুস্থ, অসুস্থ
সব অবস্থাতেই
সমান
উপকারী

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

। নতুন নাটক খোলা হচ্ছে তখন সোভিয়েতে তার ও চাহিদা ... সারা সোভিয়েতে বর্তমানে ৫০০ পেশাদারী মঞ্চ আছে। অপেশাদারী নাট্য সংস্থা যে কত আছে তার হিসাব নেই। সবাই এই নাট্য প্রবাহে যোগদান করেছে। অফুরন্ত উদ্দীপনা আর কর্মচাঞ্চল্য। এই উপলক্ষ্যে তাসখন্দে একটি নতুন নাটমঞ্চের উদ্বোধন হল।

বিদেশী নাট্যকারদের সম্বন্ধেও সোভিয়েত দর্শক সমান শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী। একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে শেকস্‌পীয়রের নাটকগুলির অভিনয় লণ্ডনে যত হয় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী হয় মস্কোয়। রামায়ণের অভিনয় কশ মঞ্চের বিশেষ মরশুমী আকর্ষণ। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক ও কালিদাসের শকুন্তলা বহু রজনীতে দর্শকদের সবিস্ময় প্রশংসা আদায় করেছে এবং এই মরশুমেও তাদের পুনরভিনয়ের আয়োজন হয়েছে।

সোভিয়েত জনগনের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক স্বতন্ত্র আকর্ষণ। ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোভিয়েত নাটমঞ্চ রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'গোরা', 'শেষের কবিতা,' 'তাসের দেশ', প্রভৃতি নাটকের আয়োজন করেছে এবং দেশের বিভিন্ন মঞ্চে নাটকগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। জানা গেছে, সোভিয়েত বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত নাটকগুলি দেখবার জন্যে সোভিয়েত দর্শকের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। তারপরেই তাদের কাছে যে আকর্ষণ দুনিবার ও অপ্রতিরোধ্য তা হচ্ছে টাগোর সে।

নবনবরূপে

কুশীলব

গতমাসের নানা অভিনয়

দক্ষিণ কলিকাতার এই নাট্য সংস্থাটি সম্প্রতি মুক্ত অংগন মঞ্চে একটি অভিনব নাটকের অভিনয় করেন। নাটকটির নাম 'অবচেতন'। নাট্যকার আশিসকুমার সান্যাল। মূলত রহস্য নাটক হলেও অবচেতন নাট্য আলেখ্যতে মনস্তত্ত্বঘটিত

'কুশীলব' প্রযোজিত অবচেতন নাটকের বিশেষ মুহূর্তে কমলেশ ব্যানার্জী, নীরেন ঘোষ, নাট্যকার অশিস সান্যাল ও সুমন ব্যানার্জী।

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি জানেন। কুসুমকুমারী অরুণ কুমার
'সাধনা অশোকারিষ্ট' তার অনিদ্রা রোগ
করেছে। তাই তিনি আজ ঘুমাবার সঙ্গে
প্রার্থনা করেছেন।

সাধনা
অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অরুণ হোমিওপ্যাথিক হোম,

Regd. No. C3613

প্রতিদিন প্রতিঘরে

লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও শ্রদ্য হয়

আমেরিকার তিনজন নোবেল পুরস্কার-বিজেতা

বাঁ দিক থেকে— ডঃ চার্লস বেথে, ডঃ জন ওয়ালড্, এবং ডঃ হ্যেরল্ড কেরার হার্টলাইন।

পরমাণু ও আকাশতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য নিউইয়র্কের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বেথে (৬১) ১৯৬৭ সালে পদার্থ বিদ্যায় এই পুরস্কার লাভ করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ওয়ালড (৬০) এবং রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হার্ট লাইন (৬৩), সুইডেনের ডঃ বাগ্গানার্ড গ্রাণ্টের সঙ্গে মিলিতভাবে ১৯৬৭ সালে "মানুষ যে দেখতে পায়"-তার ভিত্তি কি, এই গবেষণায় কৃতিত্ব লাভের জন্য এই পুরস্কার পান।

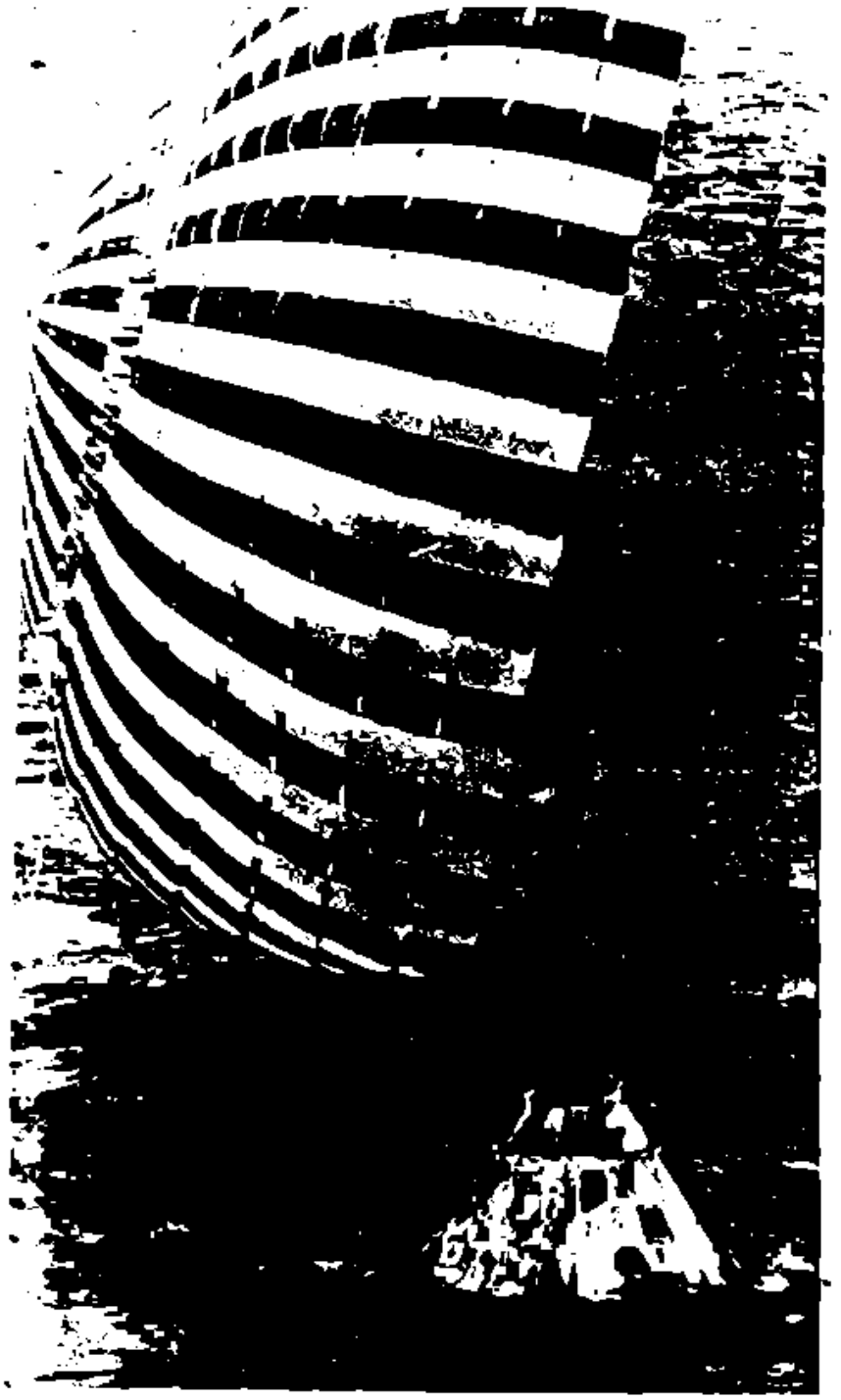

ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত সাটার্ন-৫

গত ৯ই নভেম্বর আমেরিকার এই অতিকায় রকেট মহাকাশ অভিমুখে তার যাত্রা শুরু করে—ছবিতে তারই দৃশ্য। ১১১ মিটার উঁচু এই মহাকাশযানটির ওজন ২·৮ মিলিয়ন কিলোগ্রাম এবং এটিকেই পৃথিবীতে এতাবৎ যত রকেট মহাকাশে পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভারী বলে গণ্য করা হয়। এরই মাথায় ছিল মানুষবিহীন যান অ্যাপোলো ৪। পরবর্তী সময়ে মানুষকে চাঁদে পাঠাবার কাজে

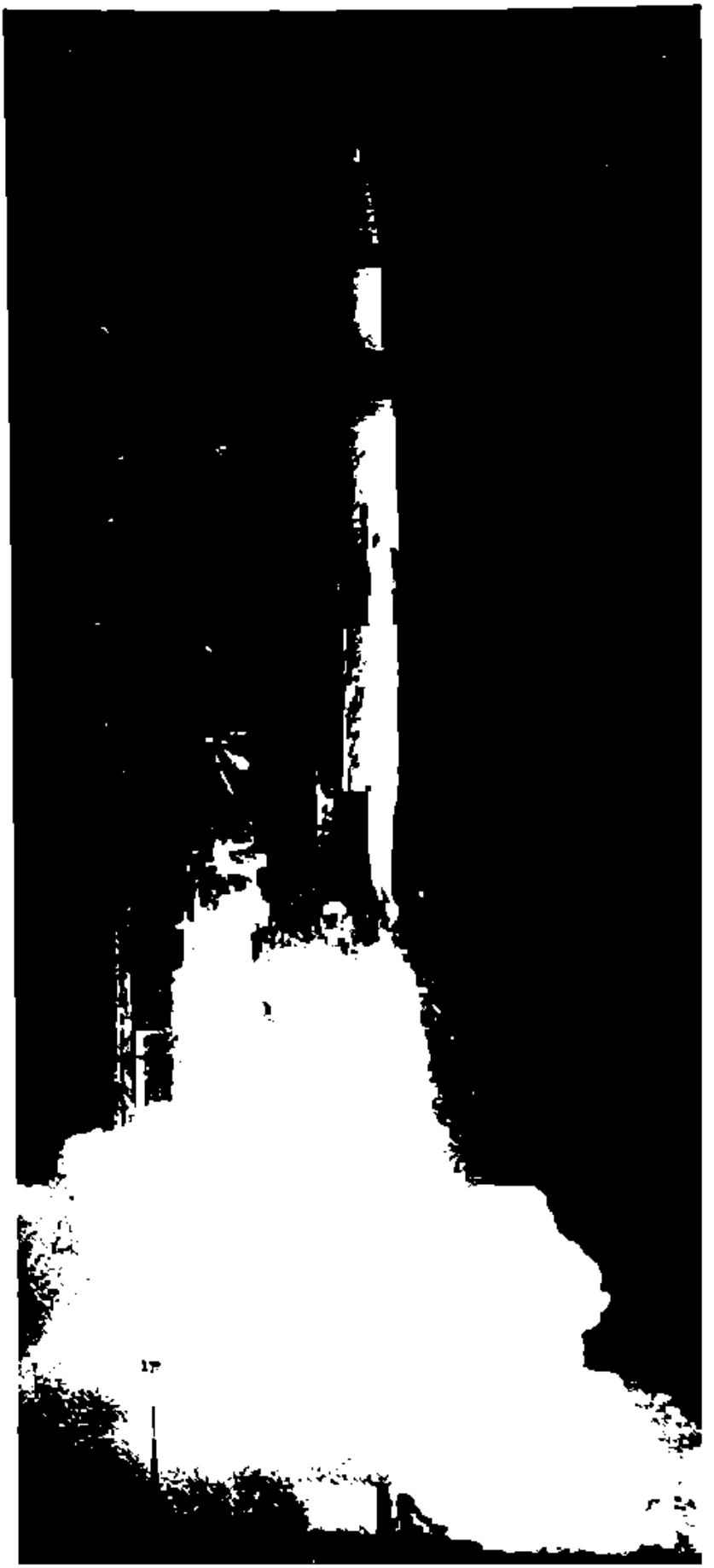

সমুদ্র বক্ষে ভাসমান এ্যাপোলো-৯

ক্যাপসুল। ওই মানুষবিহীন মহাকাশ যানে সাটার্ন ৫ রকেট যোগে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং মহাকাশ পরিভ্রমণের পর ১৮০০০ কিলোমিটার উচ্চ থেকে প্যারাসুটের সাহায্যে গত ৯ই নভেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরে মিডওয়ে দ্বীপের কাছে অবতরণ করে।

বিশ্ব-বাতায়ন

স্বামী অভেদানন্দ (পরিব্রাজক রূপে)

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি জননী। স্ত্রীরোগে অমৃত তুল্য 'সাধনা অশোকারিষ্ট' এর অটুট স্বাস্থ্য কোথায় এনে তাকে প্রকৃত জননীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সাধনা
অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অথবা হোমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,
[illegible] কলিকাতা কেন্দ্র

7/67

Regd. No. C3643

1 MAR 19

প্রতিদিন প্রতিঘরে

লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও শ্রদ্ধ হয়

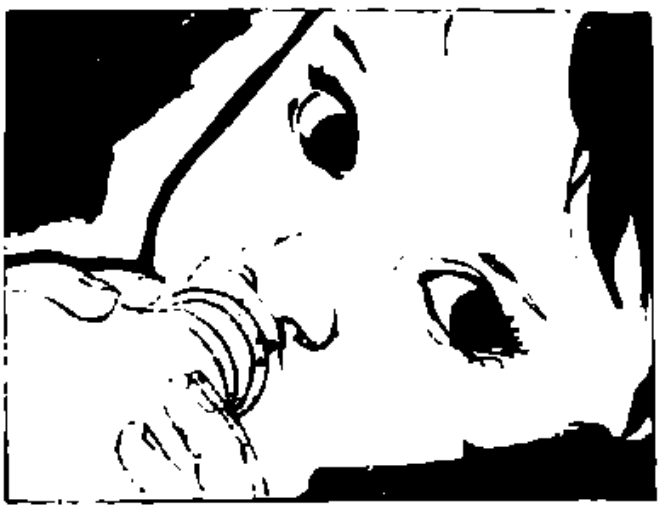

শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত

সুস্থ, অসুস্থ
সব অবস্থাতেই
সমান
উপকারী

লিলি বার্লি বিহার পাওয়ারলুম লিঃ কলিকাতা-৪

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি সুস্থ। প্রতিবেশ অনুত 'সুস্থ সাধনা অশোকারিষ্ট' এর মতো ওষুধ আপনার পরিবারে এনে তাকে সারা বছর সুস্থ রাখতে প্রতিষ্ঠিত পারেন।

সাধনা অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় প্রাঃ লিঃ, সাধনা নগর, কলিকাতা-৬৮

কলিকাতা কেন্দ্র

কালী
তরণী

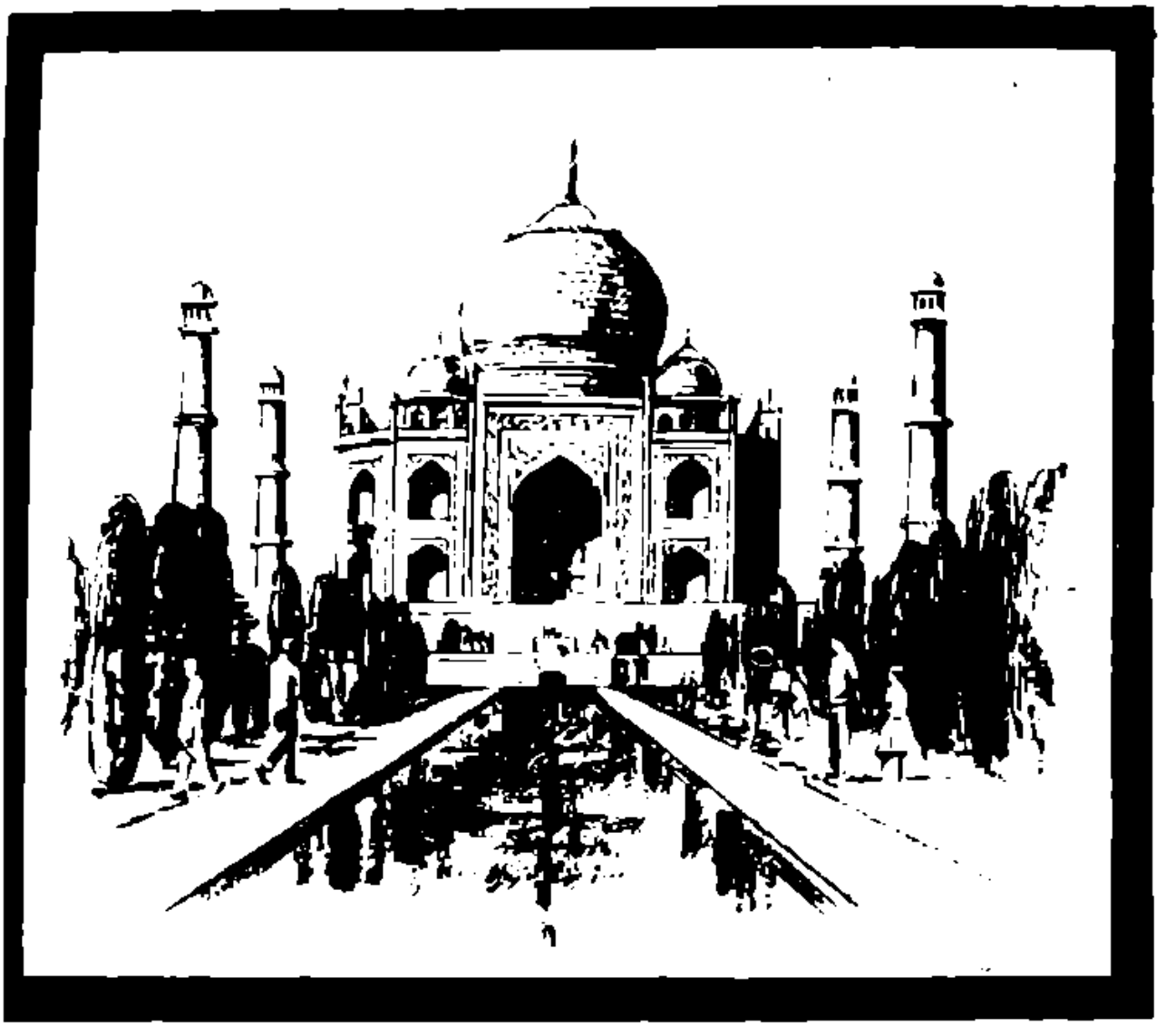

ভারতের
সাংস্কৃতিক
ঐতিহ্য

লিলি
বিস্কুট

যারা যিনি সমষ্টির মধ্যে উত্তীর্ণ, যাঁহাকে দেশের লোক যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; যিনি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই; নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত; নানা বিরোধী-পক্ষের বিরোধসমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; যিনি সুযোগাতার সহিত রাজার ও প্রকৃতি সাধারণের সম্মানীয়

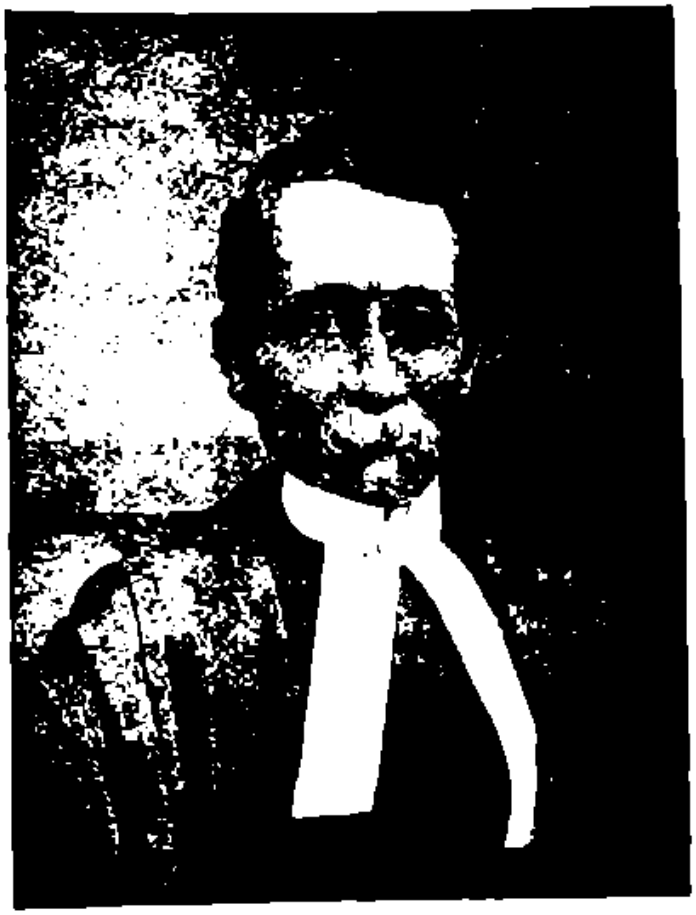

কর্মভার সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্যবান্ অক্ষুণ্ণ অবসর লাভ করিয়াছেন; সেই স্বদেশ বিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেই ধনসম্পদের মধ্যেও অবিচলিত তপোনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি। বুঝিতে পারিবেন, নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার, মতামত, আচার বিচার লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহি না—আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব, দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত সমাজের শূন্য রাজভবনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি।" (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১১)

দ্বিজোত্তম গুরুদাস।

এই একটিমাত্র অভিধার মধ্যেই যেন সার্থক-ভাবে, সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে গুরুদাসের চরিত্র-মহিমা। কবির এই সূত্রটি অবলম্বন করেই আমরা এই মহাপুরুষের জীবন ও জীবনাদর্শের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। গুরুদাসের কথা বলতে হলে তাঁর মায়ের কথা বলতে হয় সকলের আগে, কারণ জননী সোণামণি দেবীই পিতৃহীন পুত্রকে গুরুদাস বাঁড়ুয্যে করে গড়েছিলেন। মাতৃসৌভাগ্যে বিদ্যাসাগর যেমন ভাগ্যবান ছিলেন, গুরুদাসও ছিলেন তেমনি। বিদ্যাসাগর মানুষ হয়েছিলেন পিতা ঠাকুরদাস ও মাতা ভগবতী দেবীর স্নেহ ও শাসনের মধ্যে; গুরুদাস কিন্তু পেয়েছিলেন একমাত্র তাঁর মা সোণামণি দেবীকে, কারণ তাঁর বয়স যখন মাত্র আড়াই বছর সেই সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। কাজেই পুত্রের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদান বিষয়ে গুরুদাসের জননী একাই পিতা ও মাতার কর্তব্যভার গ্রহণ করেছিলেন। এক নিঃসম্বল ও স্বল্প শিক্ষিত বিধবা হিন্দু নারীর পক্ষে এটা বড়ো সহজ ছিল না। গুরুদাসের জীবনে তাই তাঁর মায়ের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট।

পিতামহ মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় থেকেই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার কলিকাতার পূর্বপ্রান্তে নারিকেল-ডাঙায় বসবাস করতে থাকেন। এইখানে মাণিকচন্দ্র কিনেছিলেন একটা কলাবাগান কুড়িটাকা কাঠা দরে। সেই কলাবাগান কেটে তৈরী হয় বন্দ্যোপাধ্যায়দের সাবেক একতলা বসতবাড়ি। উত্তরকালে পৌত্র গুরুদাস

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি জননী। সাধনা অশোকারিষ্ট তাঁর অটুট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে তাঁকে আজ জননীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সাধনা অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা ৪৮

Regd. No. C3643

2 JUN 1961

প্রতিদিন প্রতিঘরে

লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও হৃদ্য হয়

10 4/62

এই সংখ্যার

বিশেষ আকর্ষণ :

মন যেথা যেত ছুটে (স্মৃতিকথা)
—নরেন্দ্র দেব
যক্ষের মন্দির (ভ্রমণ কাহিনী)
—সুরেশকুমার চক্রবর্তী
বন্যাকন্যা—ধারাবাহিক উপন্যাস
(পূর্ব প্রকাশিত অংশ সহ)
—সন্তোষকুমার দেবগুপ্ত
নাট মঞ্চ পুরাতন পাঠা
খেলাধুলা চলতি দুনিয়া
মেয়ে মজলিশ বিশ্ব সাহিত্য
ব্যঙ্গ চিত্র

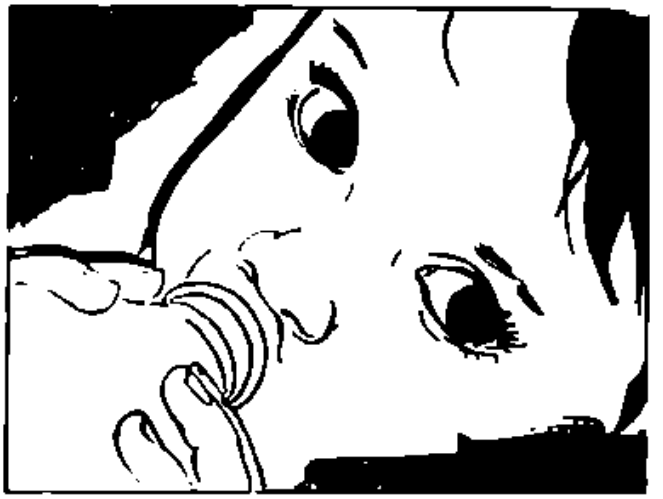

শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত

সুস্থ, অসুস্থ
সব অবস্থাতেই
সমান
উপকারী

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

নিয়মিত ব্যবহারে কেশমূলের পুষ্টিসাধন করে ও কেশগুচ্ছ সজীব করে।

আমলকি ইহার প্রধান উপকরণ

মূল্য :
৭০০ মিঃ লিঃ ১.৫০
২০০ মিঃ লিঃ ১.৭৫
১০০ মিঃ লিঃ ১.২০

এখন এই নূতন শিশিতে পাবেন

সাধনা আমলা কেশ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

স্বপ্ন সত্য হলো

এখন তিনি জননী। সারাবছর সমভাবে তুলে 'সাধনা অশোকারিষ্ট' এর এটুকু স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে তাঁকে আজ জননীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সাধনা অশোকারিষ্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা ৮৮

আমাদের অন্যান্য ঔষধ

Regd. No. C3643

31 AUG 1988

প্রতিদিন প্রতিঘরে

লক্ষ্মী ঘি

সকলকে তৃপ্তি দেয়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও হৃদ্য হয়

10 4107